প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

চতুর্দ্দশ ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড

১৩২১ সাল, কার্ত্তিক—চৈত্র

প্রবাসী কার্য্যালয়

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

প্রবাসী ১৩২১ কার্ত্তিক—চৈত্র,

১৪শ ভাগ ২য় খণ্ড,

বিষয়ানুক্রমণিকা।

লেখক ও তাঁহাদের রচনা।

চিত্রানুক্রমণিকা

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি।

শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

U. RAY & SONS,

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩২১

১ম সংখ্যা

শরতের গান

আলো যে
যায়রে দেখা।
হৃদয়ের পূবগগনে
সোনার রেখা।

এবারে
ঘুচল কি ভয়?
এবারে
হবে কি জয়?
আকাশে হল কি ক্ষয়
কালীর লেখা?

কারে ঐ
যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে
দাঁড়ায় একা?

ওরে তুই
সকল ভুলে
চেয়ে থাক্‌
নয়ন তুলে,—
নীরবে
চরণ-মূলে
মাথা ঠেকা॥

এই শরৎ আলোর কমল-বনে
আজ বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।

তারি সোনার কাঁকন বাজে,
আজি প্রভাত-কিরণ মাঝে,
তারি আকুল আঁচল খানি
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।

এলোচুলের পরিমলে
শিউলি-বনের উদাস বায়ু
পড়ে থাকে তরুর তলে।

হৃদয় মাঝে হৃদয় দুলায়,
বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তার চোখের চাওয়া
ছড়িয়ে দিল নীল গগনে।

১১ ভাদ্র,—সুরুল।

"তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে?
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ঐ চরণ মূলে?

শরৎ-আলোর আঁচল টুটে
কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এসেছে এলোচুলে,
মোহন রূপে কে রয় ভুলে?

কাঁপন লাগে বাতাসেতে,
তাই পাকা ধান কোন্ তরাসে
শিউরে ওঠে ভরা ক্ষেতে ?

জানি গো আজ হা হা রবে
তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রুসাগর-কূলে,
মোহন রূপে কে রয় ভুলে ?

১১ ভাদ্র,—সুরুল।

আমার গোপন হৃদয় প্রকাশ হল
অনন্ত আকাশে।
আমার বেদন-বাঁশি উঠ্‌ল বেজে
বাতাসে বাতাসে।

এই যে আলোর আকুলতা,
এ ত জানি আমার কথা,
ফিরে এসে আমার প্রাণে
আমারেই উদাসে।

বাহিরে যে নানা বেশে
ফের কতই ছলে,
আমার হাতের গাঁথা মালা
লুকিয়ে নেবে বলে'।

আজকে দেখি পরাণ-মাঝে
তোমার গলার সব মালা যে,
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে
গভীর সর্ব্বনাশে॥

১৩ ভাদ্র,—সুরুল।

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে,
বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে,
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।
মাণিক-গাঁথা ঐ যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।

কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়না ওড়ায় এ কি নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি॥

১৯ ভাদ্র,—সুরুল।

কোন্ বারতা পাঠালে মোর পরাণে
আজি তোমার অরুণ আলোয় কে জানে।

বাণী তোমার
ধরে না মোর গগনে,
পাতায় পাতায়
কাঁপে হৃদয় কাননে,
বাণী তোমার ফোটে লতা-বিতানে।
তোমার বাণী বাতাসে সুর লাগালো
নদীতে মোর ঢেউয়ের মাতন জাগালো।

তরী আমার
আজ প্রভাতের আলোকে
এই বাতাসে
পাল তুলে দিক পুলকে,
তোমার পানে যাক সে ভেসে উজানে॥

২৮ ভাদ্র,—সুরুল।

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে
আমার হৃদয় নইলে আর কোথাও কি ধরবে ?

এই যে আলো সূর্য্যে গ্রহে তারায়
ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায়
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।

তোমার ফুলে যে রং ঘুমের মত লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল।

যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণার পুলকে
সঙ্গীতে সে উঠবে ভেসে পলকে
যে দিন আমার সকল হৃদয় হরবে॥

১ আশ্বিন সন্ধ্যা,—সুরুল।

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো।
হৃদয় আমার উদাস করে'
কেড়ে নিল আকাশ মোরে
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।

দিগন্তের ঐ নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কান্নাতে।
মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে
বাহির হল কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশ্বিন,—শান্তিনিকেতন।

চরম নমস্কার

ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
সোণার অলঙ্কার।
ঐ যে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল
অঞ্জলি ভরি' ধরিল তারার ফুল
পূজায় তাহার ভরিল অন্ধকার।

ক্লান্তি আপন রাখিয়া দিল সে ধীরে
স্তব্ধ পাখীর নীড়ে।
বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা
জপিল সে বারবার।

ঐ যে তাহার লুকানো ফুলের বাস
গোপনে ফেলিল শ্বাস।
ঐ যে তাহার প্রাণের গভীর বাণী
শান্ত পবনে নীরবে রাখিল আনি
আপন বেদনাভার।

ঐ যে নয়ন অবগুণ্ঠন-তলে
ভাসিল শিশির জলে।
ঐ যে তাহার বিপুল রূপের ধন
অরূপ আঁধারে করিল সমর্পণ
চরম নমস্কার॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশ্বিন সন্ধ্যা,—শান্তিনিকেতন।

শেষের দান

ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেছে
শেষ হল মোর গান,
এবার প্রভু লওগো শেষের দান।

অশ্রুজলের পুষ্পখানি
চরণতলে দিলাম আনি,
ঐ হাতে মোর হাত দুটি লও
লওগো আমার প্রাণ।

ঘুচিয়ে লও গো সকল লজ্জা
চুকিয়ে লও গো ভয়।
বিরোধ আমার যত আছে
সব করে' লও জয়।

লও গো আমার নিশীথ রাতি,
লও গো আমার ঘরের বাতি,
লও গো আমারি সকল শক্তি
সকল অভিমান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭ আশ্বিন,—শান্তিনিকেতন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন।

আষাঢ়ের ও আশ্বিনের প্রবাসীতে জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তনের দুটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি। আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

জাপানের দৃষ্টান্ত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে চেম্বার্সের বিশ্বকোষের (Chambers's Encyclopaedia র) যে সংস্করণ ছাপা হয়, তাহার ষষ্ঠ খণ্ডের ২৮৫ পৃষ্ঠায় আছে ;—

"The Japanese have many excellent qualities: they are kindly, courteous, law-abiding, cleanly in their habits, frugal, and possessed with a keen sense of personal honour which makes sordidness unknown. This is associated, moreover, with an ardent patriotic spirit, quite removed from factiousness. Nowhere are good manners and artistic culture so wide-spread, reaching even to the lowest. On the other hand, the people are deficient in moral earnestness and courage, ... Civic courage has also to be developed."

ইহাতে জাপানীদের দয়া, সৌজন্য, আইনবাধ্যতা, পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা, আত্মসম্মান জ্ঞান, প্রবল স্বদেশানুরাগ, শিল্পানুশীলন, প্রভৃতির প্রশংসা আছে। কিন্তু তাহাদের নৈতিক বিষয়ে গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাব, এবং সাহসের অভাবের কথাও উল্লিখিত

হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যে তাহাদের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সাহস এখনও বিকশিত হয় নাই।

ঐ গ্রন্থের যে পৃষ্ঠায় এই সকল কথা আছে, তাহার পর পৃষ্ঠায় আছে ;—

"Although, the Japanese are a singularly united people, yet the nation divides itself into two portions, the governing and the governed. The former, representatives of the military class and numbering some 4000 families, are high-spirited and masterful ; the rest of the nation are submissive and timid. Many of the seemingly contradictory opinions given forth regarding the Japanese can be reconciled by a recognition of this fact."

ইহাতে বলা হইতেছে যে জাপানীদের বিশেষ ঐক্য থাকিলেও তাহারা দু ভাগে বিভক্ত—শাসক শ্রেণী ও শাসিত শ্রেণী। শাসকেরা যোদ্ধা শ্রেণীর লোক ; তাহাদের সংখ্যা মোটামুটি ৪০০০ পরিবার। তাহারা খুব তেজস্বী এবং প্রভুত্বপ্রিয় ও আদেশ মানাইতে অভ্যস্ত ও নিপুণ। অবশিষ্ট সমুদয় জাপানীরা ভীরু এবং সহজেই বশ্যতা স্বীকার করে।

১৮৯০ সালে জাপানীদের চরিত্র সম্বন্ধে এই সব কথা লেখা হয়। তাহার চারি বৎসর পরে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে, বৃহৎ চীনের সঙ্গে ক্ষুদ্র জাপানের যুদ্ধ হয়। তাহাতে জাপান জয়ী হয়।

তাহার পর আবার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্র জাপান বিশালকায় রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতেও জাপানের জিত হয়। ইউরোপের সমুদয় জাতির ধারণা ছিল যে চীনে রুশিয়া পোর্ট আর্থার বন্দরকে এমন কৌশলের সহিত ও দৃঢ়ভাবে দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছে যে উহা কেহই দখল করিতে পারিবে না। কিন্তু জাপানীরা অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বের সহিত উহাও অধিকার করে।

জাপানের যোদ্ধা সামুরাইদিগকেই চেম্বার্সের বিশ্বকোষে সাহসী বলা হইয়াছিল। তাহাদের সংখ্যাও ৪০০০ পরিবার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ৪০০০ পরিবারে যুদ্ধক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ খুব বেশী হইলেও ২০,০০০এর বেশী হইতে পারে না। কিন্তু সকলেই জানেন যে চীনের সহিত জাপানের এবং তার পর রুশের সহিত জাপানের যুদ্ধে কয়েক লক্ষ সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই নিশ্চয়ই সামুরাই বা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর লোক নহে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইহাদিগকেই ভীরু ও সাহসে হীন বলা হইয়াছিল। কিন্তু এখনতো জগতের লোকে জানে যে জাপানীরা কোনো দেশের লোকের চেয়ে কম সাহসী নয়।

প্রকৃত কথা এই যে সাহস কোনো জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সকলেই সাহসী হইতে পারে। তাহার জন্য সাধনা, শিক্ষা ও অনুকূল অবস্থা চাই। ইতিহাস পড়িলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়।

আর্মানীদের দৃষ্টান্ত—সার উইলিয়ম হাণ্টার ভারতবর্ষে একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও অন্য অনেক বহি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উড়িষ্যা (Orissa) নামক বহির ৩১৪—৩১৫ পৃষ্ঠায় আছে—

"The unwarlike Armenians whom Lucullus and Pompey blushed to conquer, supplied seven centuries later the heroic troops who annihilated the Persian monarcly in the height of its power."

আর্মানীরা এতই ভীরুছিল যে প্রাচীন রোমের সেনাপতি লুকুলাস ও পম্পী তাহাদিগকে পরাজিত করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন,—যেমন সিংহ-শিকারে অভ্যস্ত কোনো শিকারী ইন্দুর শিকার করিতে লজ্জা বোধ করে। কিন্তু এই আর্মানীরাই সাত শতাব্দী পরে, অভ্যুদয়ের উচ্চতম চূড়ায় অধিষ্ঠিত পারস্য সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করে।

বাঙ্গালীদের দৃষ্টান্ত—আমরা এ পর্য্যন্ত উন্নতিরই দৃষ্টান্ত দিয়াছি। এখন অবনতির একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। হাণ্টারের উড়িষ্যা গ্রন্থের ৩১৪—৩১৫ পৃষ্ঠায় দেখা যায়—

"The ruin of Tamluk as a seat of maritime commerce affords an explanation of how the Bengalis ceased to be a sea-going people In the Buddhist era they sent warlike fleets to the east and the west and colonised the islands of the archipelago. Even Manu in his inland centre of Brahmanism at the far north-west, while forbidding such enterprises betrays the fact of their existence. He makes a difference in the hire of river-boats and sea-going ships, and admits that the advice of merchants experienced in making voyages on the sea, and in observing different countries may be of use to priests and kings. But such voyages were chiefly associated with the Buddhist era, and became alike hateful to the Brahmans and impracticable to a deltaic people whose harbours were left high and dry by the land-making rivers and the receding sea. Religious prejudices combined with the changes of nature to make the Bengalis unenterprising upon the Ocean."

হাণ্টার বলিতেছেন যে বাঙ্গালীরা পূর্ব্বে সমুদ্রে খুব যাতায়াত করিত। বৌদ্ধযুগে তাহারা পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে যুদ্ধজাহাজ পাঠাইত এবং ভারতবর্ষের

অদূরবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু আবার যখন ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য স্থাপিত হইল, তখন সমুদ্র-যাত্রা কতকটা নিষিদ্ধ হইল, এবং নদীর পলি পড়িয়া নদীর মোহানায় নূতন করিয়া ভূমি নির্ম্মিত হওয়ায়, সমুদ্র বন্দরগুলি হইতে দূরে গিয়া পড়ায়, সমুদ্রযাত্রা আর সহজসাধ্য রহিল না। এই প্রকারে বাঙ্গালীরা সমুদ্রপথে যাতায়াতে অনভ্যস্ত ও অপটু হইয়া উঠিল।

আশার কথা—কিন্তু ইহাতে হাণ্টার নিরাশার কোন কারণ দেখেন নাই। তিনি বলেন :—

"But what they have been, they may under a higher civilization again become...... To any one acquainted with the revolutions of races, it must seem mere impertinence ever to despair of a people; and in maritime courage, as in other national virtues, I firmly believe that the inhabitants of Bengal have a new career before them under British rule."

ইহার তাৎপর্য্য এই—বাঙ্গালীরা যাহা ছিল, উচ্চতর সভ্যতার প্রভাবে আবার তাহা হইতে পারে। জাতীয় জীবনে যেরূপ বিপ্লব ঘটে তাহার সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের চক্ষে, কোন জাতি সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবেই হইবে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বৃটিশ রাজত্বে, সামুদ্রিক সাহসের ও অন্যান্য জাতীয় সদ্‌গুণের বিকাশসাধন ও পরিচয় দিবার জন্য বঙ্গের অধিবাসীদের নূতন কার্য্যক্ষেত্র ও সুযোগ জুটিবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের ব্যয়ে ভারতবর্ষের জন্য কতকগুলি রণতরী নির্ম্মাণের কথা চলিতেছিল। এখন এমডেনের দ্বারা যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে ও অন্যান্য কারণে এই প্রস্তাব পাইয়োনীয়ার প্রভৃতি কাগজ নূতন করিয়া উত্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ভারতবর্ষের একটা যে রণতরীবিভাগ স্থাপিত হইবে, ইহা একরূপ স্থির। এই সব জাহাজে বাঙ্গালী কাজ করিবার সুযোগ পাইবে কি?

আমরা অন্ততঃ একখানা সমুদ্রগামী জাহাজ কিনিয়া যদি তাহার অধস্তন কর্ম্মচারীর (officers) কাজগুলিতেও দেশী যুবকদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হাণ্টারের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সম্ভাবনা ঘটিত।

পরিবর্ত্তনে কত সময় লাগে—আমরা আষাঢ় ও আশ্বিনের প্রবাসীতে এবং বর্ত্তমান মাসের কাগজে যে সকল দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহাতে দেখা যায় যে কোন কোন জাতির চরিত্রে পরিবর্ত্তন ঘটিতে অনেক সময় লাগিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র এ নিয়ম খাটে না। জার্ম্মেনরা এক শত বৎসরেরও কম সময়ে বদলিয়া গিয়াছে। জাপানীরা ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই জাতীয় চরিত্রের চেহারা নূতন করিয়া ফেলিয়াছে। সময়টা গৌণ ব্যাপার। উন্নতির প্রকৃত ও মুখ্য কারণ প্রবল ইচ্ছা ও কঠোর সাধনা। যে জাতি যাহা হইতে চায়, তাহাই হইতে পারে, যদি—

(১) এই চাওয়াটা জাতির প্রবলতম ইচ্ছা হয়, বং

(২) এই ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য ঐ জাতি একাগ্রতার সহিত সাধনা করে।

অনেক জাতিকে ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। তাহার নানাদিক আছে। মন্দ এই যে তাহাতে লোকক্ষয়, ধনক্ষয় ও শক্তিক্ষয় হয়। আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না। অতএব, আমাদের সমুদয় শক্তি বাঞ্ছিত দিকে প্রয়োগ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাহা করিবার সুযোগও রহিয়াছে।

ইতিহাসের আবশ্যকতা

কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য এবং আশান্বিত হইবার জন্য ইতিহাস পাঠ একান্ত আবশ্যক। এই জন্য আমাদের দেশের এবং পৃথিবীর সমুদয় প্রধান প্রধান দেশের ইতিহাস অচিরে দেশভাষায় লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই কাজটি করিতে না পারিলে বুঝিতে হইবে যে আমরা বড় অকর্ম্মা জাতি। যত ছাত্র ইতিহাস পড়িয়া সম্মানের সহিত বি, এ, পাশ করেন, তাঁহারা প্রত্যেকে বাংলা ভাষায় একখানি করিয়া ইতিহাস লিখিলে তবে দেশের লোকদের প্রতি তাঁহাদের ঋণ কিঞ্চিৎ শোধ হইবে। যাঁহারা ইতিহাসে এম, এ, পাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের ত এই প্রকারে ঋণ শোধ করাই চাই। আট আনা কি জোর এক টাকা দামে বিক্রী হইতে পারে, সোজা ভাষায় এইরূপ একখানি করিয়া ইতিহাস লেখা চাই। ইতিহাসে কি থাকিবে, এবং ইতিহাস কেমন করিয়া লিখিতে হইবে, তাহার আলোচনা পরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

কৃষকের দুর্দ্দিন

যুদ্ধের জন্য পাটের বিক্রী প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গের চাষী গৃহস্থদের বড় কষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে দেশের লোকে যে যথেষ্ট মন দিতেছেন না, তাহার কারণও ঐ যুদ্ধ। এ বিষয়ে মন দেওয়া প্রত্যেক জেলার ও কলিকাতার নেতাদের একান্ত কর্ত্তব্য। বড়লাট বলিয়াছেন যে যে-কোন শ্রেণীর লোকের যুদ্ধজনিত অন্নকষ্ট নিবারণার্থ যুদ্ধে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ সংগৃহীত অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারিবে। অতএব রাজপুরুষদের দৃষ্টি বঙ্গের চাষীদের দিকে পড়া প্রার্থনীয়।

আমরা ত্রিপুরা জেলা হইতে একজন শ্রদ্ধেয় ও নির্ভরযোগ্য যুবকের নিকট হইতে কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে যে দুখানি চিঠি পাইয়াছি, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম পত্র।

"আমি ৬ই আশ্বিন চাঁদপুরে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলাম যে উকীল ও মুক্তারগণ হাহাকার করিতেছেন। পূজার সময় তাঁহাদের মক্কেলদের নিকট হইতে বাকী পাওনা সব আদায় হয়। এবার অতি সামান্য হইয়াছে। মহাজনদিগের টাকা পড়িয়া আছে, আদায় করিতে পারেন না। ছোট জমিদার ও তালুকদারগণ কোথা হইতে লাটের খাজানা দিবেন তাহাই ভাবিয়া অস্থির। প্রজার কাছে খাজানা চাহিলে তাহারা বলে 'আমাদের মাথায় বাড়ী দিন্ তথাপি আমরা এক পয়সাও দিতে পারিবনা।' দেশের এই দুরবস্থা দেখিয়া সব ডিভিজন্যাল অফিসার এই মহকুমা হইতে ইম্পীরিয়্যাল রিলীফ ফণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতে বিরত রহিয়াছেন।

পাটের দর ১॥০ হইতে ৩৲ টাকা মণ। অতি উৎকৃষ্ট পাট ৫৲ টাকা। সেই রূপ পাট অতি অল্প।

মাঝ খানে পাটের দর ৫৲ টাকা হইয়াছিল, তখন কৃষকেরা বিক্রী করে নাই। এখন মাথায় হাত দিয়া পড়িয়াছে। এমডেনের উৎপাতে মূল্য আবার নামিয়া গিয়াছে।

চাঁদপুর হইতে বাড়ী যাইতে দেখিলাম অনেক কৃষক পাট কাটে নাই। পাটের দানা পাকিয়া যাইতেছে, পাট পাকিয়া লাল হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহা কাটা হইতেছে না। যাহারা কাটিয়াছে তাহাদের কাটার মজুরী পোষান দায় হইয়াছে।

বাড়ী আসিয়া প্রতিবেশী যাহার যাহার সঙ্গে দেখা হয় সেই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করে "বাবু পাটের কি উপায় হবে? মূল্য বাড়িবে কিনা।" চাষারা ভীষণ নৈরাশ্যে হাহাকার করিতেছে।

গত কল্য একজন মুসলমান আমার বাড়ীর কাছে ঘুরিতেছিল। আমি তাহাকে ডাকিয়া বসাইয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার অবস্থা যাহা শুনিলাম নীচে বর্ণনা করিতেছি। সে বলিল—

"বাবু, আমার ধান চাউলের ছোট কারবার ছিল। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে গ্রামের চাষাদের বাকি দিয়াছি। মনে নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল যে পাট বিক্রী করিয়া সবাই শোধ দিবে। কিন্তু পাট বিক্রী বন্ধ হওয়াতে এই কয় মাসে এক পয়সাও আদায় হয় নাই। যার কাছে যাই সকলে ঘরের রাশীকৃত পাট দেখায়। মহাজনের নিকট হইতে কড়া সুদে মূলধন ধার করিয়াছিলাম। এখন মূলধন শোধ দূরে থাক নিজের অন্ন জোটে না। কারবার বন্ধ। নৌকা ঘাটে বাঁধা। ৫।৬টী পোষ্য। আজ একমাস পেট ভরিয়া আহার করিতে পারিতেছি না। সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াই। যাদের নিকট পাওনা আছে তাহাদের নিকট চাহিতে সাহস হয় না। সবাই বলে নিজে খাইতে পাই না তোমাকে দিব কোথা হইতে?"

তারপর আমার মুখের দিকে কাতর ভাবে তাকাইয়া সে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। এবং বলিল "বাবু, ৫।৬টী পোষ্য, আর কষ্ট সইতে পারিনা। কাচ্চা বাচ্চার কষ্ট দেখিয়া ইচ্ছা হয় গলায় ফাঁস দিয়া মরি!' তাহার সেই কাতর উক্তি সহ্য করা আমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হইতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক তার সেই কাতর দৃষ্টি। আমি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলাম। এই লোকটীর নাম বালা গাজী। বয়স ত্রিশের কিছু উপরে।

আরও দুই এক জনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এ অঞ্চলে অর্দ্ধেক কৃষক দুবেলা পেট ভরিয়া আহার করিতে পায় না। অনেকে ১॥০ টাকা ২৲ টাকা করিয়া পাট বিক্রী করিয়া খোরাক চালাইয়া রহিয়াছে। পাট ফুরাইলে ইহাদের হাতে এক পয়সাও থাকিবে না। পাটের আয় হইতে ইহারা দেনা শোধ দিয়া এক বৎসরের খরচের টাকা সংগ্রহ করিত। এখন বাধ্য হইয়া অতি সস্তায় পাট বিক্রী করিতেছে বলিয়া হাতে এক পয়সাও থাকিবেনা। পাটের অবসানে অন্য চাষ করিবার মূলধনও হাতে নাই। পাট ফুরাইলে বৎসরের বাকী অংশে যে দুর্গতি হইবে তাহা বিশেষ রূপে ভাবিবার বিষয়।

দ্বিতীয় পত্র।

চাঁদপুরের দক্ষিণে মেঘনার মোহনায় অনেক চর আছে। এ সকল চরে প্রচুর পাট হয়। কৃষকেরা ঘরে পাট বোঝাই করিয়া রাখিয়াছে। ১॥০, ২৲ টাকায় বিক্রী করিতেছে। তাহাতে চাষের খরচের সামান্যই উঠিতেছে। এই জন্য অনেকেই ঘরে প্রচুর পাট জমা করিয়া রাখিয়াছে।

হাইম চরে এক ব্যাপারী ২০০ মণ চাউল লইয়া ব্যাপার করিতে গিয়াছিল। চরের মুসলমান কৃষকেরা সমস্ত চাউল ওজন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ব্যাপারী মূল্য চাহিলে সকলেই বাড়ী হইতে পাট আনিয়া দিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে যে "আমরা টাকা দিব কোথা হইতে, পাট লইয়া যাও।" ব্যাপারী পাট না আনিয়া আদালতে নালিশ করিয়াছে।

চুরি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি আমার বাড়ীর

মৃত্যুশয্যায় সার্ তারকনাথ পালিত। টি, পি, সেনের তোলা ফোটোগ্রাফ।

নিকটের খবরই পাচ্ছি। সমগ্র মহকুমায় যাহা হইতেছে তাহার খবর নিতে পারিলে আরও লিখিতে পারিতাম। আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম যে প্রায় অর্দ্ধেক কৃষকই পেট ভরিয়া আহার পাইতেছেনা। শীঘ্রই ক্লেশ আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে।

৬০ হাজার টাকা হইলে এই মহকুমার কৃষকের দুঃখ দূর করা যাইতে পারে।

পত্র দুই খানি হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি পড়িলেই বুঝা যায় যে রাইয়ৎদের অবস্থা এখনই খুব শোচনীয় হইয়াছে। কলিকাতার নেতৃবর্গের এখন আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হইবে না। অবিলম্বেই অন্নকষ্ট মোচনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সার্ তারকনাথ পালিত।

গত আশ্বিন মাসে সার্ তারকনাথ পালিত দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে বিজ্ঞানকলেজ স্থাপনার্থ জীবিত কালেই ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন। সৎকার্য্যে অন্যান্য দানের মধ্যে ইহাই তাঁহার প্রধান দান।

বিজ্ঞানের অনুশীলন নানা কারণে আবশ্যক। ইহাতে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় ও জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিল্পে প্রযুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে মানুষের দরকারী বিস্তর জিনিষ প্রস্তুত হয়। স্থলপথে, জলপথে, ও আকাশপথে যাতায়াতের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রযুক্ত হওয়ায় পৃথিবীতে কিরূপ যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অস্ত্র নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হওয়ায় যেরূপ অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অতি ভয়ঙ্কর তাহাতে মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইতেছে, বলা কঠিন। আত্মরক্ষা, দুর্ব্বলের রক্ষা, স্বাধীনতারক্ষা, স্বাধীনতালাভ, বা এবম্বিধ কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বৈধ। কিন্তু এরূপ উদ্দেশ্য সেকালের যুদ্ধে সাধিত হইবার অধিক সম্ভাবনা ছিল, কি একালের যুদ্ধে অধিক সম্ভাবনা হইয়াছে, বলা কঠিন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের নানা ব্যাধির চিকিৎসার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় যে রোগ নির্ণয় ও রোগ চিকিৎসা পূর্ব্বাপেক্ষা

সহজ হইয়াছে, মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায় মানুষ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চ্চার আর একটি সুফল আছে, যাহা সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। অশিক্ষিত মানুষ সহজেই যা তা বিশ্বাস করে। তাহার মন বড় কুসংস্কারপ্রবণ। শিক্ষিত মানুষ অশিক্ষিতের চেয়ে একটু বেশী সংশয়বাদী; সে বিশ্বাস করিবার আগে একটু বেশী প্রমাণ চায়। শিক্ষিতদের মধ্যে আবার যাহারা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইয়াছে, তাহারা সহজে যা তা মানে না; যথেষ্ট প্রমাণ চায়। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের কোন শাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ এক কথা নহে। পর্য্যবেক্ষণ (observation) দ্বারা বা পরীক্ষা (experiment) দ্বারা, বা উভয় উপায়ে যাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, জড়বস্তুসংপৃক্ত এরূপ কোন ব্যাপারে বিশ্বাস না করা, প্রমাণ পাইলে তবে বিশ্বাস করা, ঐ দুই উপায়ে নূতন নূতন তথ্য ও সত্য আবিষ্কার করা, ইহাই বৈজ্ঞানিকের প্রকৃতি। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দ্বারা যদি জাতীয় চরিত্র এই রূপ বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি ও শক্তি লাভ করে, তাহা হইলেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সার্থক হয়। নতুবা বি এস্‌সি বা এম্ এসসি হইয়াও মানুষ যদি অশিক্ষিত মজুরের মত কুসংস্কারাবিষ্ট, নানা ভয়ে আড়ষ্ট থাকে, জগৎকে যদি সে নূতন চোখে দেখিতে না শিখে, তাহা হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা বৃথা।

পালিত মহাশয়ের দানের ফলে যদি কেবল আরও কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বাড়ে, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যদি বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির মানুষ দেশে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, এবং তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

"কোমাগাতা-মারু"র যাত্রীদের ভাগ্য।

"কোমাগাতা-মারু" জাহাজে কয়েক শত পঞ্জাবী কানাডার এক বন্দরে উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল, ডাঙ্গায় উঠিয়া পরিশ্রম ও চাষবাস ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন ও জীবিকা নির্ব্বাহ। কিন্তু তাহারা সেখানে জাহাজ হইতে নামিতেই পাইল না। যাহা হউক, মন্দের ভাল এই যে তথায় তাহারা উত্তেজিত হইয়া কাহারও প্রাণবধ করে নাই, অন্যকেহও তাহাদের কাহারো প্রাণবধ করে নাই। কিন্তু তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পর তাহাদের ভাগ্য আরো মন্দ হইল। তাহারাও অপরের প্রাণবধ করিল, অপরেও তাহাদের অনেকের প্রাণবধ করিল, অনেকে পুলিশের হাতে বন্দী হইল, এবং অনেকে এখনও আইনের ভয়ে পলাতক রহিয়াছে। কাহার দোষে এরূপ ঘটিল, নিশ্চয় করিয়া বুঝা যাইতেছে না। বজবজের হত্যাকাণ্ডের সরকারী বৃত্তান্তে সমুদয় দোষই শিখদের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। ইহা যে অন্যায় তাহা বলিবার মত কোন প্রমাণ আমাদের নিকট নাই; কিন্তু সমস্ত দোষ যে শিখদেরই, সরকারী বৃত্তান্তটি পড়িয়া সেরূপ নিঃসংশয় ধারণাও হয় না।

বড়লাট লর্ড হার্ডিং এর অনুরোধে ও প্রভাবে কানাডার বন্দরে শিখদের প্রতি জুলুম জবরদস্তী বলপ্রয়োগ হয় নাই। তাহারা নিঃসম্বল হইয়া পড়ায় জাপান হইতে তাহাদিগকে সরকারী ব্যয়ে ভারতবর্ষে আনাইবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। এসব তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতাও সহৃদয়তার পরিচায়ক। বজবজে জাহাজ হইতে নামিয়া শিখদিগকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে না দেওয়াটাই প্রথম ভুল হইয়াছে। তাহাদিগকে যদি তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে কলিকাতায় যাইতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে, আমরা যতটা বুঝিতে পারিতেছি, কোনই কুফল হইত না; তাহারা কলিকাতার জনসমুদ্রে কোথায় মিশিয়া যাইত। যদি বা তাহারা কোথাও কোথাও সভা করিয়া শিখদের দুঃখকাহিনী ও তাহাদের প্রতি কানাডাবাসিদের অত্যাচারকাহিনী বর্ণনা করিত, তাহাতে কি আসিয়া যাইত? এই এতমাস ধরিয়া তো এই সব কথা সংবাদপত্রের দ্বারা দেশবাসী জানিতেছে, তাহাতে তো কোথাও দাঙ্গা হাঙ্গামা রক্তপাত হয় নাই। কানাডাবাসীদের প্রতি মানুষ অসন্তুষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সেরূপ অসন্তুষ্ট হয় নাই। কিন্তু বজবজে রক্তপাত হওয়ায় ভারতবাসীর মন সংক্ষুব্ধ হইয়াছে, এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

বৎসর বৎসর হাজার হাজার কাবুলী ও পেশোয়ারী বাংলা দেশে আসিয়া টাকা ধার দিয়া ও ধারে কাপড় চোপড় বিক্রী করিয়া টাকা রোজগার করে। তাহাদের অনেকে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে, দরিদ্র নিরীহ লোকদের উপর জুলুম করে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত কাহাকেও অবাঞ্ছনীয় (undesirable) বলিয়া তাহাদের স্বদেশে বা অন্য কোথাও চালান করেন নাই। বজবজের হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে কানাডা-যাত্রী শিখদের বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার ছিল না। তাহারা তৎপূর্ব্বে কোনও আইন অনুসারে অপরাধী হয় নাই। সুতরাং তাহাদিগকে অন্ততঃ কাবুলীদের মত গতিবিধির স্বাধীনতা দিলে ফল ভালই হইত।

যাহা হউক, যখন তাহাদিগকে বজবজ হইতে একাইক পঞ্জাবে চালান করাই স্থির হইয়াছিল, তখন, গবর্ণমেণ্ট যে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ বা নির্ব্বাসিত করিবেন না,

বজবজ ষ্টেশনে পুলিশ পাহারাওয়ালা ও বন্দী শিখগণ। টি, পি, সেনের ফোটো।

গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যে কেবল তাহাদিগকে স্বদেশে পৌঁছাইয়া দেওয়া, তাহা তাহাদিগকে বিশ্বাস করাইবার সমুচিত উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল। ইহার জন্য পঞ্জাবী রাজকর্ম্মচারী ও পঞ্জাবে নিযুক্ত ইংরেজ রাজপুরুষকে ভার দেওয়া সুবিবেচনার কাজ হয় নাই। শিখরা কানাডার সরকারী লোক-দের নিকট হইতে যে ব্যবহার পাইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের মনে সরকারী কর্ম্মচারী ও সরকারী নিয়মের প্রতি বিরূপ হইয়াই ছিল। তদ্ভিন্ন কানাডার সরকারী কর্ম্মচারী ও এখানকার সরকারী কর্ম্মচারী-দের আবেষ্টনের (environmentএর) মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহাতে এখানকার রাজভৃত্যেরা শিখদের সহিত কানাডার সরকারী কর্ম্মচারীদের চেয়ে বেশী সাবধানতা ও সুবিবেচনার সহিত ব্যবহার করিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী মনে করা কাহারও উচিত ছিল না। কারণ, কানাডায় তাহারা সমকক্ষের সহিত ব্যবহারে অভ্যস্ত, এখানকার কর্ম্মচারীরা নিকৃষ্ট-বলিয়া-বিবেচিত-লোক-দের সহিত ব্যবহারে অভ্যস্ত। যদি গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত অভিপ্রায় যাত্রী শিখদিগকে বুঝাইবার জন্য পঞ্জাবের কয়েকজন সর্ব্বজনমান্য শিখ নেতাকে আনা হইত, এবং তাঁহারা বজবজে শিখ-দের সঙ্গে কথা কহিতেন, তাহা হইলে, খুব সম্ভব, কোন দুর্ঘটনা ঘটিত না।

কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার সার্ ফ্রেডরিক হ্যালিডে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে শিখদের বাক্স জিনিসপত্র সমস্ত থানাতল্লাসী করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা-দের পোষাক ও দেহ পরীক্ষা করা হয় নাই। দাঙ্গার সরকারী বৃত্তান্তে লেখা আছে যে শিখরা বন্দুক, তলোয়ার, ছোরা, লাঠি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছিল। বন্দুকগুলা যদি সমস্তই রিভলবার ছিল, তাহা হইলে ২।১ জনের পোষাকে এক আধটা লুকান সম্ভব; বড় রকমের কোন বন্দুক ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে তাহা লুকাইবার উপায় ছিল না। শিখেরা যে রকম পোষাক পরিয়াছিল ও পরে, তাহাতে তলোয়ার লুকাইবারও

বজবজের যে রাস্তা দিয়া শিখেরা কলিকাতা আসিতেছিল। টি, পি, সেনের ফোটো।

যায়গা থাকে বলিয়া ত মনে হয় না। বাস্তবিক জানিয়া শুনিয়া পুলিশ তাহাদিগকে অস্ত্র রাখিতে দিয়াছিল, ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। অথচ কোন কোন এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজে এইরূপ লেখা হইয়াছে যে শিখরা আগে হইতেই যেন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রাইফল্ বন্দুক তলোয়ার আদি অস্ত্র লইয়া নামিয়াছিল।* এই কথা প্রমাণ অভাবে বিশ্বাসযোগ্য মনে হইতেছে না। জাপানে অনাহারে মরিবার উপক্রম হইয়াছিল বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যাহাদিগকে দয়া করিয়া নিজব্যয়ে দেশে আনিলেন, তাহারা এত অস্ত্রশস্ত্র কিনিবার টাকা কোথা পাইল এবং কিনিলেই বা কোথায়, তাহার অনুসন্ধান হওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিক, অস্ত্রশস্ত্রসংগ্রহ সম্বন্ধে, এবং কোন্ পক্ষ কখন্ কি অবস্থায় অস্ত্রপ্রয়োগ করিল, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ, নানারূপ গুজব খুব ছড়াইয়াছে।

বজবজের যে ছুটা দোকান হইতে যুদ্ধ হয়। গুলির দাগ দ্রষ্টব্য।
টি, পি, সেনের ফোটো।

সরকারী বৃত্তান্তে দেখা যায়, যে, শিখেরা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া গুলি করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কেন তাহারা উত্তেজিত হইল, তাহা ঐ বৃত্তান্ত পড়িয়া একটুও বুঝা যায় না। অনেক মাস অনিশ্চিত অবস্থায় থাকিয়া, বিদেশে নানা লাঞ্ছনা সহিয়া, তাহাদের মন ঠাণ্ডা ছিলনা বটে। কিন্তু তবুও ত ৬০ জন সার উইলিয়ম ডিউকের কথায় স্পেশ্যাল ট্রেনে চড়িয়া কলিকাতা রওনা হইয়াছিল। তাহাতে মনে হয় যে তাহারা অবুঝ নয়। বাকী লোকদের স্বভাবচরিত্র মোটামুটি ঐ ৬০ জনের মত বলিয়া ধরিয়া লইলে অন্যায় হয় না। তাহারা হঠাৎ ক্ষেপিল কেন? অবশ্য ক্ষেপিবার কারণ থাকিলেই যে মানুষকে গুলি করিতে হইবে, এমন কথা নাই। উত্তেজনার সময়েও গুলিকরা আইনবিরুদ্ধ। গুলিচালানর সমর্থন করা যায় না। কেবলমাত্র আসন্ন মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আক্রমণকারীর প্রাণবধ আইনসঙ্গত। কিন্তু, সরকারী বৃত্তান্তে প্রকাশ, শিখদিগকে কেহ বধ করিবার চেষ্টা করে নাই। সুতরাং তাহাদের গুলি চালানটা আইনবিরুদ্ধ হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে।

রেলওয়ে ষ্টেশনে ভিড়ের সময় কোন কোন রেল-কর্ম্মচারী যাত্রীদের সঙ্গে, কথায় ও কার্য্যে, রূঢ় ব্যবহার করে। কোন কোন পুলিশ কর্ম্মচারী এবং পাহারা-ওয়ালাও কখন কখন এইরূপ দোষে দোষী হইয়া থাকে। শিখদের হঠাৎ উত্তেজিত হইবার মূলে এরূপ কোন কারণ ছিল কিনা, অনুসন্ধান করা উচিত। এমনও হইতে পারে যে তাহাদিগকে জেলে বা নির্ব্বাসনে পাঠান হইতেছে, এইরূপ একটা মিথ্যা ভয়ে তাহাদের মতিভ্রংশ হইয়াছিল। "আমরা নিরপরাধ, তথাপি স্বদেশে আমাদের স্বাধীনতায় কেন হাত দেওয়া হইতেছে?" মনে মনে এরূপ প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তর স্থির করিতে না পারাতেও তাহাদের এইরূপ ক্ষণিক উন্মত্ততা আসিয়া থাকিতে পারে।

যাহা হউক, তাহারা নানা ভাবে নানা রূপ কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, চূড়ান্ত শাস্তি যে মৃত্যু তাহাও তাহাদের অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তাহারা দাগী বদমায়েস বা পেশাদার গুণ্ডা নহে। হঠাৎ আইন ভঙ্গ করিয়া

* "The Sikhs were all well armed and possessed modern rifles, sabres and swords, all of which were of military pattern." *The Englishman.*

হইয়াছে। এখন ধৃত ও পলাতক সকলকে ক্ষমা করিয়া লর্ড মার্লি যদি তাহাদের সকলের বক্তব্য শুনেন, ও যথাসম্ভব পক্ষপাতশূন্য কমিশন দ্বারা সমুদয় ঘটনাটির তদন্ত করান, তাহা হইলে তাঁহার মত ধীরবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞের উপযুক্ত কার্য্য হয়, এবং দেশব্যাপী অসন্তোষও দূর হয়।

২রা অক্টোবর তারিখের পাইয়োনীয়ারে বজবজের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যে টেলিগ্রাম বাহির হয়, তাহাতে এই কথাগুলি ছিল :—

"The Bengal Government refuse to allow newspapers to publish details except as given in official *communiques*."

"বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সরকারী বৃত্তান্তে প্রকাশিত বিবরণ ছাড়া, সংবাদপত্রগুলিকে আর কোন বিবরণ প্রকাশ করিতে দিতে অস্বীকার করিতেছেন।"

বাস্তবিক গবর্ণমেণ্ট এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন একখানি এংলোইণ্ডিয়ান কাগজে এরূপ কথা বাহির হওয়ায় লোকে নানা রকম ভাবিতেছে। এই জন্যও তদন্তের প্রয়োজন।

বিদেশে এই দুর্ঘটনার ফল। এই দুর্ঘটনায় উপনিবেশসমূহে আমাদের প্রবেশাধিকার লাভ কঠিনতর হইল। উপনিবেশবাসীরা সহজেই আমাদিগকে মন্দ বলিয়া মনে করিতে চায়। এখন তাহারা এই বলিবার সুযোগ পাইল যে ভারতবাসীরা খুনে স্বভাবের লোক; তাহারা উপনিবেশসমূহে ঢুকিবার উপযুক্ত নহে। এই মিথ্যা অপবাদ ক্ষালন করিবার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টও যদি তদন্তের পর একটি রিপোর্ট বাহির করিয়া ভারতবাসীদের সম্বন্ধে এই সম্ভাবিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

একজন "স্বদেশী" মুসলমান।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলিকাতার নানাস্থানে এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহেও সভাস্থলে একজন বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোককে দেখা যাইত। তাঁহার নাম মৌলবী দেদার বখ্‌শ্‌। সম্প্রতি ৭৫ বৎসর বয়সে, গোরস্থান লেনের ৩৫ সংখ্যক ভবনে, তাঁহার নিজগৃহে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত

স্বর্গীয় মৌলবী দেদার বখ্‌শ।

পাণ্ডুয়া সহরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষালাভ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি স্বদেশীর সমর্থন করায় এবং দ্বিখণ্ডিত বঙ্গকে আবার অখণ্ড করিবার জন্য আন্দোলনে হিন্দুদের সহিত যোগ দেওয়ায় তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বী অনেকে তাঁহার উপর বিরক্ত হন। কিন্তু পরে তাঁহাদের মধ্যেও তাঁহার গুণের আদর হইয়াছিল। তিনি যে খুব বাগ্মী ছিলেন, বা খুব বিদ্বান ছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু তিনি আন্তরিক সৌজন্য, অমায়িকতা এবং সকলের প্রতি প্রীতি দ্বারা শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের সহিত অবাধে মিশিতে পারিতেন। আমরা একদিন এক সভায় শুনিলাম তিনি রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীকে বলিতেছেন, "আপনার বাড়ীতে গীতাপাঠ হইতেছে, আমাকে কেন জানান নাই? তাহা হইলে আমি যাইতাম।"

জার্ম্মেনী ৫ লক্ষ অষ্ট্রিয়া ১৪ লক্ষ ইটালি ১১॥০ লক্ষ,

ফ্রান্স ৪০ লক্ষ ইংলণ্ড ৬ লক্ষ রুশিয়া ৬০ লক্ষ

জার্ম্মেনী ২৯৬ ইটালী ১৬১ অষ্ট্রিয়া ১০৫

ফ্রান্স ৩৮২ ইংলণ্ড ৪৮৪ রুশিয়া ১৭০
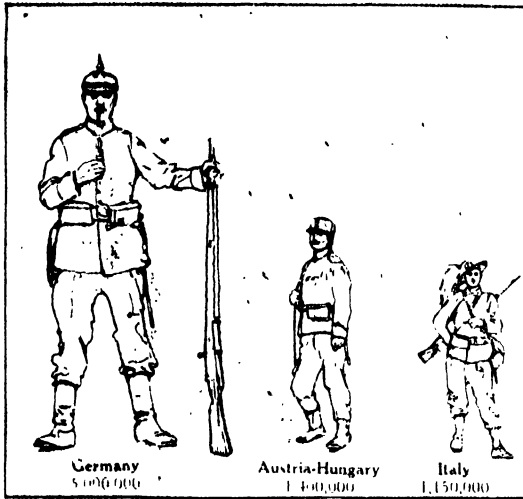
ইউরোপে যুদ্ধের আয়োজন কাহার কিরূপ।

ইউরোপে প্রধান প্রধান দেশের স্থলসৈন্য, রণতরী ও আকাশযুদ্ধযান, বর্ত্তমান সংগ্রাম আরম্ভের সময়, কিরূপ ছিল, তাহা আমেরিকার একখানি ও ফ্রান্সের একখানি কাগজ ছবি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সেই ছবিগুলির প্রতিলিপি দিতেছি। স্থলসৈন্যের সংখ্যা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সৈনিককে দীর্ঘকায় বা খর্ব্বকায় করিয়া আঁকা হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভের পর ইংলণ্ডের সৈন্যসংখ্যা ইতিমধ্যেই দ্বিগুণ হইয়াছে। নূতন সৈন্যেরা এখন শিক্ষাধীন। নৌসৈন্য ও যুদ্ধজাহাজে কাহার শক্তি কিরূপ, তাহা একটি সংখ্যা দ্বারা বুঝান হইয়াছে। সংখ্যার আধিক্য অনুসারে নৌশক্তির আধিক্য বুঝিতে হইবে। আকাশে যুদ্ধ করিবার জন্য এরোপ্লেন ও "চালনায়ত্ত" (dirigible) যে দেশের যত আছে, ঐ দুই যানের বৃহত্ব অনুসারে তাহা বুঝা যাইবে। এরোপ্লেনে সকলের চেয়ে বড় ফ্রান্স; তারপর যথাক্রমে রুশিয়া, জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড ও ইটালী। চালনায়ত্তে সকলের চেয়ে বড় জার্ম্মেনী; তার পর যথাক্রমে ফ্রান্স, রুশিয়া, ইটালী ও অষ্ট্রিয়া।

যুদ্ধবিরোধী পোপ দশম পায়াস্।

রোমান কাথলিক জগতের ধর্ম্মগুরু দশম পায়াস ৮০ বৎসর বয়সে গত আগষ্ট মাসে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। ইহাতে তিনি সাতিশয় ব্যথিত হন, এবং শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইবার কারণই এই যুদ্ধজনিত মনোবেদনা। মৃত্যুর পূর্ব্বে এইজন্য তাঁহার হৃদয় বিষাদমেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রাচীন কালে পোপের একটি কথায় যুদ্ধ বন্ধ হইতে পারিত, কিন্তু এখন তিনি শক্তিহীন।" তাঁহার সাদাসিদে চালচলন, দয়া ও সাধু জীবনের জন্য সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিত ও ভক্তি করিত। তিনি, যুদ্ধের অশুভ কারণসমূহ শীঘ্র দূরীকরণের জন্য, সমুদয়

ইউরোপের থিয়েটার।

রোমান কাথলিকদিগকে করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিয়া গিয়াছেন।
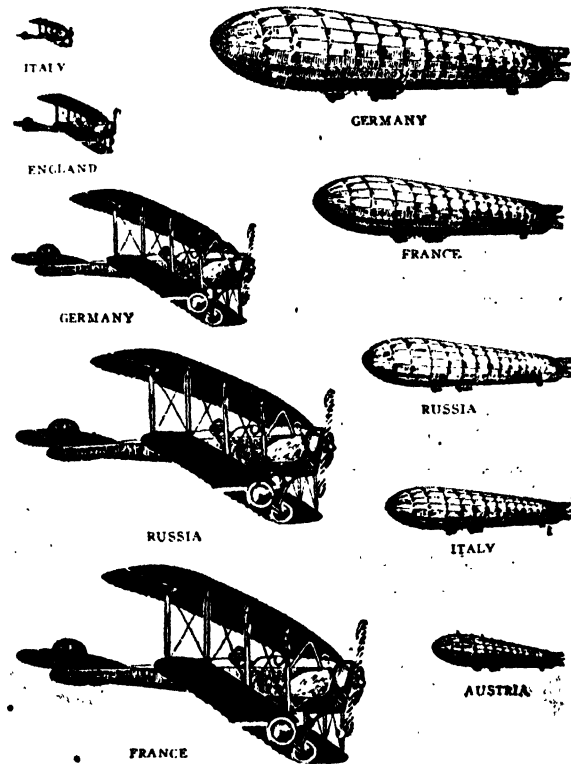
সভ্যতা ও সংগ্রাম।

পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির মধ্যে মৈত্রী যে সভ্যতার একটি চরম আদর্শ, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। অথচ, ইহাও সত্য যে জাপানীরা যুদ্ধ করিতে পারে দেখিয়া তবে ইউরোপের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা তাহাদিগকে সভ্য জাতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বাস্তবিক যুদ্ধপ্রিয়তায় সভ্য ও অসভ্যে, খৃষ্টিয়ান ও অখৃষ্টিয়ানে কার্য্যত তফাৎ দেখা যাইতেছে না। তাই পাশ্চাত্য এক-খানি কাগজে একটি ব্যঙ্গচিত্র বাহির হইয়াছে, যে, পৃথিবীর অসভ্য ও অখৃষ্টীয় লোকেরা ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে সভ্য খৃষ্টীয় লোকদের দ্বারা যুদ্ধের অভিনয় দেখিয়া আনন্দে বাহবা দিতেছে।

স্বর্গীয় পোপ দশম পায়াস্।

পুস্তক-পরিচয়

হিন্দী—

জিনেন্দ্রমত-দর্পণ—তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ গৃহস্থ-ধর্ম্ম। জৈনমিত্র-সম্পাদক ব্রহ্মচারী শীতলপ্রসাদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, জৈনমিত্র কার্য্যালয় বোম্বাই, শ্রীবীরনির্ব্বাণ সং ২৪৩৯, খৃঃ ১৯১৩, পৃষ্ঠা ৩৪০+১৫ মূল্য ১॥০।

ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ মহাশয় জৈনসম্প্রদায়ে সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ঐ সমাজে বিরল। এজন্য গত বৎসর কাশীতে জৈনমহামণ্ডলের সভায় ইহাঁকে আমরা সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইতে দেখিয়াছি। ইনি জিনেন্দ্রমতদর্পণ নামে তিন ভাগে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহার প্রথম ভাগে অতি সংক্ষেপে জৈনধর্ম্মের প্রাচীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সাহারাণপুরের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু বারাণসী দাস এম্ এ, এল্ এল্ বি মহাশয়ের ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধকেই (Jaina Itihas Society No 1) প্রধানত হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া এই অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের নাম দেওয়া হইয়াছে তত্ত্বমালা। ইহা পূর্ব্বে জৈন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে জৈনদর্শনের জীব প্রভৃতি সাতটি তত্ত্বের বর্ণনা করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় পুদ্‌গল ভিন্ন অন্যান্য অজীবতত্ত্বের অর্থাৎ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ ও কালের কেবল নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। আকাশ ও কালের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিলেও চলে, কেননা এই দুইটি সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু জৈন দর্শনের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অন্যান্য দর্শন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। ঐ দুই শব্দে সাধারণত আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, জৈনদর্শনে তাহা মোটেই নহে। অতএব এই দুইটি বর্ণনা করা উচিত ছিল। আলোচ্য তৃতীয়ভাগের নাম দেওয়া হইয়াছে গৃ হ স্থ ধ র্ম্ম। এই নাম হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি। বেদপাঠকগণের যেরূপ গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী, জৈনগণের সেইরূপ শ্রাবক ও সাধু বা মুনি। গৃহস্থ বলিতে শ্রাবককেই বুঝায়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই গৃহস্থগণের কিরূপে কোন কোন ধর্ম্ম আচরণীয় তাহাই নানা প্রমাণ প্রয়োগে সবিস্তর এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বেদপাথকগণের যেরূপ গর্ভাধানাদি সংস্কার আছে, এবং ঐ সমস্ত সংস্কারে যথাবিধি অগ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ হোমাদি করা হইয়া থাকে, জৈনগণেরও ঠিক সেইরূপ, অবশ্য মন্ত্র ও অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিভিন্নতা যথেষ্ট আছে। বেদপথিকগণের গার্হস্থ্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই ত্রেতা অগ্নিকে, এমন কি কোনো বৈদিক মন্ত্রকেও (যথা, "অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি" ইত্যাদি, ৩০ পৃঃ) জৈনগণের ক্রিয়া-কলাপে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রের ন্যায় মন্ত্র ও বীজমন্ত্রেরও ব্যবহার আছে। জৈনসমাজের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের সবিস্তর বিবরণ ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। সামাজিক ক্রিয়াকলাপের পর গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে কোন অজৈন ব্যক্তি কিরূপে জৈন হইতে পারে, কিরূপে অনুষ্ঠানাদির দ্বারা তাহাকে জৈনধর্ম্মে আনয়ন করিতে পারা যায়, এবং এইরূপে জৈন শ্রাবক বা গৃহস্থ হইলে কিরূপ আচার-অনুষ্ঠান ব্রত প্রভৃতির দ্বারা সে ক্রমশঃ মুনিধর্ম্ম লাভ করিয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে। শেষে জন্মমৃত্যুজনিত অশৌচ বিচার, গ্রন্থকার কৃত গৃহস্থগণের কার্য্যের সময় বিভাগ, রাজকীয় ও সামাজিক উন্নতির আলোচনা, পানীয় জল, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা ও নিত্য নিয়ম পূজা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। জৈনগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এইরূপ বর্ণবিভাগ আছে, এবং চণ্ডালাদিস্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজন নিষিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান বেদপাথকগণের সহিত জৈনগণের সামাজিক আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া-কাণ্ড প্রভৃতি যে কতদূর সুসদৃশ এই পুস্তকে তাহা বিশদরূপে জানা যাইবে। এইরূপ সাদৃশ্য ও ঐক্য আছে বলিয়াই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো অবাধে বিবাহাদি হইয়া থাকে। কোন কোন জৈনাভিমানী সম্প্রতি এইরূপ বিবাহাদির বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ইহা যে অত্যন্ত অহিতকর হইয়া উঠিবে, জৈ ন হি তৈ ষী র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নাথুরাম প্রেমী মহাশয় এ পত্রে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি হিন্দীতে লিখিত হইলেও আমরা বাঙ্গালী পাঠকগণকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। জৈনগণ-সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞান ইহাতে দূর হইবে। কিন্তু কেবল এইখানি পড়িয়াই কাজ হইবে না। ক্রমশ ইহাদের সাহিত্য ও দর্শনাদির আলোচনা

করিতে হইবে। তবেই তাঁহারা ইহাঁদিগকে যথাযথরূপে জানিতে পারিবেন।

গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত প্রাকৃত ও সংস্কৃত প্রমাণগুলিতে অত্যধিক ভুল থাকিয়া গিয়াছে, এবগুলিকে ছাপার ভুল বলা চলে না।

এখানে একটা কথা আলোচ্য আছে। গ্রন্থকার জৈনধর্ম্মের প্রসিদ্ধ তিনটি গুণব্রতকে এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন :—(১) দিগ্‌ব্রত, (২) অনর্থদণ্ডত্যাগ ব্রত, ও (৩) ভোগোপভোগ পরিমাণ। আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি এ বিষয়ে তাঁহার প্রমাণ রত্নকরণ্ড শ্রাবকাচার (৬৭)—

"দিগ্‌ব্রতমনর্থদণ্ডব্রতং চ ভোগোপভোগ পরিমাণম্।
অনুবৃংহণাদ্ গুণানামাখ্যান্তি গুণব্রতান্যার্য্যাঃ ॥"

কিন্তু সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি বহু স্থানেই (১) দিগ্‌ব্রত, (২) দেশব্রত, ও (৩) অনর্থদণ্ডত্যাগ ব্রত, এই তিনটিকে গুণব্রত বলা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—সর্ব্বার্থসিদ্ধি, ৭০২১; ধর্ম্মপরীক্ষা, ১৪৫৮; সুভাষিত রত্নসন্দোহ, ৮-৪; পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়, ১৩৭, ১৪০, ১৪৭। যুক্তিও এই মতকে সমর্থন করে, কেননা, দিগ্‌বিরতি ও দেশবিরতি একই রকমের; দিকের যেমন নিয়ম করা, দেশেরও ঠিক সেইরূপ নিয়ম করা। সূত্রপাঠও (তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র, ৭-২১) ইহা সমর্থন করিবে। অতএব এই মতটিই আমাদের নিকট সাধুতর বলিয়া বোধ হয়।

কর্ণাটক-জৈনকবি অর্থাৎ কানাড়ী ভাষার ৭৫ জন জৈন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, জৈনহিতৈষী হইতে উদ্ধৃত, লেখক শ্রীনাথুরাম প্রেমী। শ্রীজৈনগ্রন্থ-রত্নাকর কার্য্যালয়, হীরাবাগ, গিরগাঁও, বোম্বাই। মূল্য ।১০, পৃষ্ঠা ৩৮।

জৈন পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ন্যায় ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার গণিত জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বহু বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ দুই সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এ কথা সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কর্ণাটীয় ভাষা ও সাহিত্যেরও যে ইহারা অসাধারণ অভ্যুদয়ের কারণ ছিলেন শ্রীযুক্ত নাথুরাম প্রেমী মহাশয়ের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিবে। নিম্নে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল :—

অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কর্ণাটীয় ভাষায় জৈন ভিন্ন অপর গ্রন্থকার ছিলেন না। সেই সময় পর্য্যন্ত ঐ ভাষার যত গ্রন্থকার হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই জৈন। ইহাদ্বারা ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে যে, সেই সময়ে ঐ প্রদেশে জৈন ধর্ম্মের কীদৃশ প্রাবল্য ছিল। গঙ্গবংশীয় রাষ্ট্রকূট বংশীয় (রাঠোর), চালুক্যবংশীয় ও হয়শালবংশীয় রাজগণের সভায় জৈন কবিগণ প্রভূত সম্মানলাভ করিতেন, এবং সৌদত্তি, বিজয়নগর, মহীশূর ও কারকলেরও রাজাদের নিকট তাঁহারা আদৃত হইতেন। ঐ সময়ে জৈন কবিগণের যশোগীতি সমগ্র কর্ণাট দেশে গীত হইত। কিন্তু পরে আর এ অবস্থা ছিল না। রামানুজাচার্য্যের বৈষ্ণব মত প্রসারলাভ করিলে, বসবেশ্বরের লিঙ্গায়ত মত প্রচারিত হইলে, এবং কলচুরি রাজবংশ নষ্ট হইলে জৈন ধর্ম্মের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জৈন কবিগণেরও হ্রাস হইতে থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা নামশেষ হইয়া যান নাই, শত শত জৈন কবি কর্ণাট সাহিত্যের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, কর্ণাট সাহিত্যের প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন কাব্য নাটকাদির আনুমানিক তিন-তৃতীয় অংশ জৈন কবিগণের রচিত।

ইহাতে লিখিত হইয়াছে, গঙ্গরাজবংশে উৎপন্ন রাজা দুর্বিনীত খ্রীঃ ৪৭৮ হইতে ৫১৩ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। ইনি ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের প্রথম হইতে পঞ্চদশ সর্গ পর্য্যন্ত কর্ণাটীয় ভাষায় টীকা প্রণয়ন করেন। রাজা দুর্বিনীতের বৃত্তান্ত তাম্রলেখেও পাওয়া যায়। ইহা হইতে ভারবির সময় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যাইতেছে। বর্ণিত কবিগণের মধ্যে অনেকে আবার সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও গ্রন্থকার ছিলেন। আমরা এই পুস্তিকাখানি পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

অমরেন্দ্র—

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু, ঢাকা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশ ৩৯২ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা মূল্য দেড় টাকা। লেখিকার উদ্দেশ্য সাধু—তিনি সমাজের গোঁড়ামী ও কুসংস্কার দূর করিয়া সমাজকে সুসংস্কৃত ও উদারপন্থী করিতে চান এবং এই উপন্যাসটিতে তিনি প্রকৃত দেশভক্তির আদর্শ দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক স্থলেই আমরা লেখিকার সহিত একমত হইতে পারি নাই। তথাপি এই উদার সামাজিক ধারণা ও দেশভক্তি শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে উপন্যাসের গল্পটি মোটেই জমাট বাঁধে নাই এবং বইটির আগাগোড়াই একটা আড়ষ্ট ভাব রহিয়া গিয়াছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলি ও তাহাদের কথাবার্ত্তা অস্বাভাবিকতা-দুষ্ট এবং থিয়েটারী ভঙ্গিতে দার্শনিক কথাবার্ত্তা ছাড়া সাদা কথা কেহ কহে না। সহজ ও সাদা সাংসারিক কথাবার্ত্তার ও ঘটনার ভিতর দিয়া মানুষের জীবন যতটা প্রতিফলিত হয়, কৃত্রিম ঘটনা ও বক্তৃতার মত কথার ভিতর দিয়া তাহার কিছুই হয় না। বইটিতে দেশের যতগুলি সমস্যা সেই সমস্তগুলির সমাধান করিতে গিয়া ও পৃথিবীর যাবতীয় উচ্চভাব পুঞ্জীভূত করিতে গিয়া ইহা এরূপ জটিল ও নীরস হইয়া গিয়াছে যে কোনো বিষয়টি ভালো করিয়া ফুটে নাই এবং পড়িতেও মোটেই কৌতূহলের উদ্রেক হয় না। সব চরিত্রগুলিকেই আদর্শ করিবার চেষ্টাও ইহার অন্যতম কারণ।

মল্লিকা—

শ্রীমতী চারুবালা দেবী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবৃন্দাবন বসাক, এলবার্ট লাইব্রেরী, নবাবপুর, ঢাকা। ডাঃ ক্রাঃ ১৬ অংশ ৮৬ পৃষ্ঠা, পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা। ছাপা ও বাঁধানো সুন্দর। মূল্য আট আনা। বইটির খরচ হিসাবে দাম সস্তাই হইয়াছে। এখানি কবিতার বই ও সচিত্র। এটি নানা বিষয়ক কবিতার সমষ্টি এবং ইহাতে ব্যক্তিগত কবিতা, রাজা রাণীর অভিনন্দন ও শোকের কবিতাও স্থান পাইয়াছে। মিলের ত্রুটি অনেক স্থলে থাকিলেও মোটের উপর অধিকাংশ কবিতাই সুপাঠ্য হইয়াছে। তবে ভাব ও ছন্দে বৈচিত্র্য নাই। উহা মামুলী ধরণের তবু কবিতাগুলির মধ্যে একটা সহজ গতি আছে।

উদয়সিংহ—

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশ ১৮০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধানো মূল্য এক টাকা। ছাপা ও কাগজ বিশ্রী। এখানি নাটক এবং লেখক গিরিশীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গদ্যকে শুধু লাইন ভাঙ্গিয়া কবিতা সাজাইতে গেলে তাহা পদ্যও হয় না আর গদ্যও থাকে না। নাটকের ঘটনা পরম্পরার একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আদৌ নাই। রচনা নিতান্ত ব্যর্থ হইয়াছে।

শ্রী[illegible]কুমার রায়।

স্বরলিপি।

(জ্ঞা) ||

|| {সা া রা া । রঃর্জ্ঞঃ রমজ্ঞা রঃসঃ রা । রা পা া ধা । মঃপঃ ধঃপঃ মজ্ঞা রা} |
শ্রা ০ ব ণ হ ০ ০ য়ে ০ এ ০ লে ০ ফি ০ রে ০

মা পা া মা । ণা ধা পা া । পা র্সা র্সণা া । ধা া পা া |
মে ঘ ০ আঁ ০ চ ০ ০ লে ০ নি ০ লে ০ পি ০ রে ০

||
| র্সা া া র্রা । র্রঃর্সঃ র্র র্জ্ঞা ণা । সা রা া মা । মা পা া া |
সু ০ ০ র্য্য গ ০ রা য় গ ০ রা য় তা ০ রা ০

পা ণা া পা । না র্সা া া । র্সা র্রা া া । র্রঃর্সঃ র্রা র্জ্ঞা া |
আঁ ০ ধা ০ রে ০ প থ হ ০ য় যে গা ০ বা ০

র্মা া র্রা া । র্রা া র্সা পা । ণা ধা পা ধা । মঃপঃ ধঃপঃ মজ্ঞা রা ||
ঢে ০ উ দি য়ে ০ ছে ০ ন ০ দী ব না ০ রে ০

|| সা া া া । সা া া া । সা রা া া । রা মা া জ্ঞা |
স ০ ক ল আ ০ কা শ স ০ ক ল ধ ধ রা ০

মা পা া া । পা মা পা া । পঃমঃ পা দা া । ণা া পা া |
ব ০ ০ র্ষ ণে ০ রি ০ বা ০ নী ০ ভ ০ রা ০

না া া া । না পা না র্সা । র্সা া া া । র্সা না র্রা র্সা |
ঝ ০ র ০ ঝ ০ র ০ ধা ০ রা য় মা ০ তি ০

পা না র্সা া । র্সনা র্রা া া । র্সা র্রা ণা ধা । র্সণা ধা পা া |
বা ০ জে ০ আ ০ মা র আঁ ০ ধা র রা ০ তি ০

পা ধা ণা ধা । পা ধা পা া । র্সণা ধা পা ধা ।
বা ০ জে ০ আ ০ মা র শি ০ রে ০

মঃপঃ ধঃপঃ মজ্ঞা র { সা া রা া . জ্ঞা } || ||
শি ০ রে ০ { শ্রা ০ ব ণ.................................রে }

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রাবণ হ'য়ে এলে ফিরে
মেঘ আঁচলে নিলে ঘিরে

— রবীন্দ্রনাথ —

U. RAY & SONS,
100, Gurpar Road, Calcutta

গান

শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে ;
সূর্য্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয় যে হারা,
ঢেউ উঠেছে নদীর নীরে।

সকল আকাশ সকল ধরা
বর্ষণেরি বাণী ভরা ;
ঝর ঝর ধারায় মাতি
বাজে আমার আঁধার রাতি
বাজে আমার শিরে শিরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আদর্শে নিষ্ঠা

ভারতে ইংরেজ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে কতকগুলি বৈচিত্র্য আছে, তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি এই যে বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম পঁচিশ বৎসর সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা হইতে দেখা যায় ঐ সময়ে এদেশে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" এই বিধি সম্যক্ প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল এ কথা সহসা কিছুতেই বলা চলে না। কেন না, বার্ক, কন্‌ওয়ে, মেরিডিথ প্রভৃতি পার্লিমেণ্টের বিশিষ্ট সভ্যগণ, ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস, বারওয়েল আদি উর্দ্ধতন রাজপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত ইউরোপীয়দিগকে যে বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মভীরু বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় বৈচিত্র্য এই যে, যে সময়ে পলাশির আম্রকাননে বঙ্গলক্ষ্মী ইংরেজের শরণাগত হন, তখন উড়িষ্যা হইতে কন্যাকুমারিকা ও কন্যাকুমারিকা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র ভূভাগ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে মারাঠাগণের করায়ত্ত ছিল, অথচ ইহার পর কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তাহারা সম্পূর্ণরূপে হতবীর্য্য হইয়া পড়ে এবং ভারতের সর্ব্বত্র ইংরেজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুইটি বিচিত্র তত্ত্বের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে ইংরেজের জাতীয় চরিত্রে এমন কতকগুলি গুণ ছিল, যাহার অভাব বশতঃ ভারতবাসী সর্ব্বত্র তাহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সেই-সকল গুণকে আমরা হয়তো ধর্ম্ম-নামে অভিহিত করি না, কিন্তু যে ক্ষেত্রে যে গুণ আবশ্যক, সে ক্ষেত্রে তাহার অভাব ঘটিলে যে দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তাহা আমাদিগের অভিজ্ঞতাই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। যাহারা আত্মকলহে সুনিপুণ, তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির সমবেত শক্তির সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারিবে কেন? যাহারা স্বদেশের গৌরবের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম কি সেই জাতির কার্য্য যাহাদিগের আত্মবোধই উদ্দীপ্ত হয় নাই ও যাহারা স্বদেশ কি তাহা ধারণাই করিতে পারে নাই? একনিষ্ঠ স্বদেশ-সেবক ও আত্মপরায়ণ, সন্ন্যাসপ্রিয় ব্যক্তি; জ্ঞানদৃপ্ত সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ, ও অন্ধতমসাচ্ছন্ন, আত্মম্ভরী, স্বার্থসেবী স্বদেশদ্রোহী ; এই উভয়ের সংঘর্ষে কে বিনষ্ট হইবে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এক কথায় বলা যাইতে পারে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শতাব্দব্যাপী সংঘাতে পাশ্চাত্য জাতির superior organization বা শ্রেষ্ঠতর সমবেত কার্য্যকরী শক্তিই ভারতের উপরে জয় লাভ করিয়াছে। এই শক্তি বহু গুণের সমবায় ভিন্ন সম্ভাবিত হয় না। এই গুণগুলিও ধর্ম্মের অন্তর্ভূত, এই অর্থে যদি কেহ বলেন, এদেশে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হইয়াছে, তবে তাহাতে কাহারও আপত্তি হইবে না।

বিশেষজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, অভিজাতবর্গ (aristocracy) আপনাদিগের মধ্যে বিবাহ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে উর্ব্বরক্ষেত্র হইতে নবশোণিত আনীত হয় না, এজন্য তাঁহারা ক্রমে দেহ ও মনের শক্তি হারাইয়া ফেলেন। সভ্যতা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সভ্যতা নানা কারণে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল ; এই অবস্থা হইতে উহাকে উদ্ধার করিবার জন্য উহাতে নূতন রক্ত অনুপ্রবিষ্ট করাইবার

একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। ইংরেজ-শাসন পাশ্চাত্য সভ্যতা আনয়ন করিয়া সেই প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিয়াছে।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, জেতা ও জিতের ঘাত প্রতিঘাতে ত্রিবিধ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(১) বিজিতের সভ্যতা জেতার সভ্যতাকে পরাজিত করে। যেমন গ্রীস ও রোমক। গ্রীসের ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষাপদ্ধতি, শিল্প, বিজ্ঞান, কলা, এমন কি রন্ধন-প্রণালী রোমক জাতিকে গ্রাস করিয়াছিল।

(২) জেতার সভ্যতা পরাজিতের সভ্যতাকে নির্ম্মূল করে। যেমন স্পেনিয়ার্ডেরা মেক্সিকো ও পেরু জয় করিয়া তদ্দেশীয় আজটেক্ ও ইঙ্কা সভ্যতাকে নির্ম্মূল করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ভাষা, ধর্ম্ম, শাসনপ্রণালী প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে ঐ দুই দেশ ইয়ুরোপের অন্তর্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

(৩) জেতৃ জাতির সভ্যতা পরাজিতের সভ্যতাকে প্রভূতরূপে প্রভাবান্বিত ও পরিবর্ত্তিত করে; কিন্তু তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে না। ভারতবর্ষে ইহা পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইয়াছে। যেমন, ইসলাম ও আর্য্য সভ্যতা। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব প্রায় পাঁচ শতাব্দী বর্ত্তমান ছিল। এই কালে জেতা ও জিত পরস্পরের নিকট অনেক শিক্ষা করিয়াছে; কখনও বা উভয়ে মিলিত হইয়া এক হইবারও প্রয়াসী হইয়াছে; কবির, নানক, হরিদাস প্রভৃতি ভগবদ্ভক্ত সাধক আপন আপন জীবনে ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন; তথাপি আজও হিন্দু হিন্দু, মুসলমান মুসলমানই রহিয়াছে, একে অন্যকে আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ঘাত প্রতিঘাতেরও এতদনুরূপ ফলই উৎপন্ন হইয়াছে।

এতৎপক্ষে দুইটি সর্ত্ত (conditions) অপরিহার্য্য।

(১) পরাজিতের সভ্যতায় এমন কিছু থাকা চাই, যাহা তাহার নিজস্ব, ও জেতৃগণের সভ্যতায় যাহার অভাব আছে।

(২) উভয় সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতের প্রারম্ভেই এমন মহাপুরুষ চাই, যিনি উভয়কে পরস্পরের নিকটে পরিচিত করিয়া দিতে বা interpret করিতে পারেন।

প্রথমতঃ—ভারতীয় সভ্যতার নিজস্ব কি?—সকলেই বলিবেন, উহার অন্তর্লীনতা। প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া চিরকাল ইহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে; বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবির, তুকারাম, রামপ্রসাদ ইহাই সাধন করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন। বহির্ম্মুখীনতা যদি এ দেশের বিশেষত্ব হইত, তবে ইহার ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। উপনিষদ ও ধম্মপদ, গীতা ও ভাগবত, সাংখ্য ও বেদান্ত, পাতঞ্জল ও চৈতন্য-চরিতামৃত চিরদিন ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, সংসার অসার, জগৎ মায়া-মরীচিকা; এক আত্মাই সত্য ও সনাতন, ব্রহ্মনির্ব্বাণই চরম লক্ষ্য। এই জন্যই ভারতে ধর্ম্মসাধন এত বিচিত্র ও উহা এমন পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যদি ইহা কেহ অত্যুক্তি বিবেচনা করেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ করি, তিনি ইংরেজীতে ভক্তি শব্দের অনুবাদ করুন, এবং উক্ত সাহিত্যে উপনিষদ ও গীতার অনুরূপ কি আছে, বলিয়া দিন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিদ্যা ভারতের অতুল গৌরব, একথা সুপণ্ডিত বৈদেশিকেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন।

কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার গুরুতর অপূর্ণতা সামঞ্জস্য বা balanceএর অভাব। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জাতীয় চরিত্র অন্তর্লীনতার দিকে এমন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল যে তাহাতে বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টি ক্রমেই ক্ষীণ, ও তৎপ্রতি কর্ত্তব্যবোধ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় সভ্যতার জননী রোমক সভ্যতার সহিত বৈসাদৃশ্য দ্বারা এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করা যাইতেছে। রোমক কবি ভার্জ্জিল রোমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে রোমকগণ, শিক্ষা, শিল্প, কলা, গণিত, দর্শনে তোমরা গ্রীকদিগের নিকটে পরাভূত হইয়াছ, তাহাতে ম্রিয়মাণ হইও না, কেননা এগুলি তোমাদিগের নিজস্ব নয়; তোমাদিগের বিশেষত্ব সাম্রাজ্য শাসনে, এইটি ভুলিও না,—

কিন্তু তুমি হে রোমান রাখিও স্মরণে
কি রূপে শাসিতে হয় পরাজিত জনে?"

ভারতীয় সাহিত্যে এই প্রকার উক্তি কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? বরং দেখিতে পাই, যে ভারত সম্রাটের

পুণ্যপ্রভাব সুদূর আলেগ্‌জাণ্ড্রিয়া পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল, সেই "দেবানাং প্রিয় প্রিয়দশী" কলিঙ্গদিগকে পরাভূত করিয়া অনুতপ্ত হইতেছেন, এবং যাহাতে তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যে একটি প্রাণীও দুঃখ না পায়, ইহারই ব্যবস্থাতে আপনার শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। পৌরাণিক আখ্যান যদি খাঁটি ইতিহাস হইত, তবে অনায়াসেই বলা যাইতে পারিত, মান্ধাতার সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্তমিত হইত না। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে তো এমন দেখিতে পাই না, যে, কোনও ভারতীয় ভূপতি সসাগরা ধরণীকে গ্রাস করিবার জন্য বিজয়-বাহিনী লইয়া বহির্গত হইয়াছেন, নররক্তে মেদিনী প্লাবিত করিয়া পরম শ্লাঘা অনুভব করিতেছেন। ফলতঃ এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতের স্বাধীনতার দিনেও বহির্জগৎ ভারতবাসীর মনে একান্ত আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। সুতরাং জাতীয় জীবনের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতের প্রতি বিমুখতা যে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিবে, এবং এই বিমুখতার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মে বিতৃষ্ণা, পুরুষকারে অনাস্থা, স্বজাতির প্রতি উদাসীনতা ও সমবেত শক্তি নিয়োগে অক্ষমতা জাতীয় জীবনকে নির্ব্বীর্য্য ও হীন করিয়া ফেলিবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। এই ক্ষেত্রে ইয়ুরোপ ভারতের শিক্ষাগুরু। এবং ভারতবাসীকে ইয়ুরোপের স্বরূপ বুঝাইবার জন্যই রামমোহনের আবির্ভাব।

(২) ১৭৬৫ সনে কোম্পানী বাহাদুর সুবে বাঙ্গলার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতপক্ষে উহার সর্ব্বময় প্রভুত্ব লাভ করেন, আর তাহার ৭ বৎসর পরেই রামমোহন রায় ভূমিষ্ঠ হন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম সংঘাতে এই মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিয়াছিল। তিনি স্বয়ং এই দুই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফল, তাই তিনি এক দিকে যেমন ইয়ুরোপের নিকট ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মকথা অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তেমনি ইয়ুরোপ হইতে নব নব উপকরণ আহরণ করিয়া কিরূপে জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে, সে পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদবধি আরও কত মহাজন ভারতীয় সভ্যতার অপূর্ণতা দূর করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। এক্ষণে বহির্জগতের সহিত ভারতবাসীর পরিচয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, কর্ম্মে অরুচি অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে, সমবেত কর্ম্মকরী শক্তি ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। তবে একথাও বলা উচিত যে ইয়ুরোপীয় সভ্যতা আমাদিগের চিত্তকে যতই মোহিত ও অভিভূত করিয়া থাকুক না কেন, আমরা উহার গুণগুলি আত্মসাৎ করিয়া কতদিনে ইয়ুরোপীয় জাতি সমূহের সমকক্ষ হইতে পারিব, তাহা ধারণা করাও কঠিন। ভারতীয় জাতীয় জীবনের দুরূহ সমস্যা এইখানে। আমাদিগকে জাতীয় চরিত্রের চিরন্তন ব্যাধিগুলির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেই হইবে, নতুবা আমরা ধরার বক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইব। যদি আমরা সংসারকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিই, কর্ম্মকে হেয় জ্ঞান করি ও সন্ন্যাসেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে প্রয়াসী হই, তবে আমরা কখনই এই-সকল ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিব না। কিন্তু সম্প্রতি ইয়ুরোপীয় সভ্যতার যে বীভৎস মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ইয়ুরোপের শিরোভূষণ জর্ম্মনী অতিকায় দানবের মত অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বেলজিয়ামে যে তাণ্ডবলীলার সূচনা করিয়া দিয়াছে, তাহাতে স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে, তবে কি আমরাও অন্ধের ন্যায় ঐ প্রেতপুরীর দিকেই ধাবিত হইতেছি? ইহসর্ব্বস্ব ইয়ুরোপীয় সভ্যতা যদি এমনই করিয়া আত্ম-হত্যায় উদ্যত হইয়া থাকে, তবে আমরা কোন্ ভরসায় তাহার শিক্ষাকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করি? আজ ইয়ুরোপে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, রণক্ষেত্রের প্রলয় নৃত্যে ধরিত্রী বিমর্দ্দিত ও কম্পিত হইতেছে, কোটি মরণাস্ত্রের বজ্রনির্ঘোষে ঈশার মৃদু শান্তির বাণী ডুবিয়া গিয়াছে। এখন আমরা বিশেষরূপে ভাবিয়া লই, আমরা কোন্ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। নিশ্চেষ্টতা কখনই বরণীয় নহে; আত্ম-পরায়ণতা চিরকালই বর্জ্জনীয়; পরতন্ত্রপরায়ণতাও লোভনীয় নহে। বহির্ম্মুখীনতা ও অন্তর্লীনতার সামঞ্জস্য, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের সমন্বয়-সাধন আমাদিগের আদর্শ। আদর্শে নিষ্ঠা যাহাতে অটুট থাকে, এই সঙ্কট সময়ে তৎপ্রতি আমাদিগকে যত্নবান্

থাকিতে হইবে। বরং এ কথা বলিলেও অন্যায় হইবে না যে, এতদিন এদেশে যাহা ধর্ম্মের প্রাণ বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই এক্ষণে আমাদিগকে বিশেষ ভাবে অনুধ্যান করিতে হইবে। কবে আমরা ঐহিক সম্পদে ইয়ুরোপের সমপদবী লাভ করিব; কবে আমাদিগের বাণিজ্যপোত পণ্যসম্ভার লইয়া দেশদেশান্তরে গমন করিবে, কবে আমরা শিল্পবিজ্ঞানে প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিব,—এইরূপ ভাবনা হেয় না হইতে পারে, কিন্তু এখন এই-সকল মহাবাক্যই পুনঃপুনঃ আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে—"ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ত্বমানশুঃ, ত্যাগের দ্বারাই দেবগণ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন;" "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই;" "নহি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ, বিত্তের দ্বারা কখনও মানুষের তৃপ্তি হয় না।" আমরা অতি নগণ্য, সন্দেহ নাই; শুধু ধনৈশ্বর্য্যে নগণ্য তাহা নহে, কিন্তু কর্ম্মকরী মানসিক শক্তিতেও আমরা বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। তথাপি একথা বলিতেই হইবে, আমরা যে আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাই কালে সমগ্র জগতে গৃহীত হইবে। আমরা যোদ্ধা নই, মহাপুরুষও নই; জয়দৃপ্ত, ঐশ্বর্য্যমত্ত জাতি-সকলকে আমরা সুপথে আনয়ন করিব, এ চিন্তা পোষণ করাও বাতুলতা হইতে পারে; কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র জীবনেও যদি আদর্শের নিকট বিশ্বস্ততা রক্ষিত হয় ও সাধনে নিষ্ঠা অব্যাহত থাকে, তবে আমরাও ধন্য হইব, মানবের পক্ষেও তাহা বৃথা হইবে না। ইহাতেই তো বিশ্বাসের পরীক্ষা। এতদিন ব্রহ্মবাদ জনসমাজকে কর্ম্মে উদাসীন করিয়া রাখিয়াছিল, এখন কর্ম্মবাদ লক্ষজনের চিত্তকে ব্রহ্মের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিতেছে। বিশাল জনসংঘের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোক এই বিরোধের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইয়াছে; প্রাকৃত জনের পক্ষে ইহাতে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু আমরা জানি, এই মীমাংসা সাধিত না হইলে ভারতের কল্যাণ নাই, জগতের কল্যাণ নাই। আমরা কর্ম্মবিমুখতাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিব না, অথচ কর্ম্মক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া কখনই ভুলিব না—ভোগে নয় কিন্তু ত্যাগে, হিংসায় নয় কিন্তু প্রেমে, আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে কিন্তু আত্মসমর্পণেই পরিপূর্ণ সার্থকতা। ধনবল ও জনবলের প্রলয়ান্তক মহাসংঘর্ষের মধ্যে আমাদিগের চিত্তে নিরন্তর এই ধ্বনি উত্থিত হউক—

ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

ওরাওঁদের ঐতিহ্য

ঐতিহ্যকে মানিতে হইলে ওরাওঁজাতির আদি নিবাস যে দাক্ষিণাত্যে ছিল এ কথাটাও মানিয়া লইতে হয়। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদিগের সহিত ইহাদের জাতিগত এবং ভাষাগত অনেক সাদৃশ্যও আছে। ভাষাবিদ্‌গণের পরীক্ষার মাপকাঠিতেও দক্ষিণভারতের তামিল, উত্তর-ভারতের খোন্দ ও গোঁড়, বেলুচিস্থানের ব্রাহুই এবং ওরাওঁদের ভাষার ভিতরে যথেষ্ট ঐক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে।

ওরাওঁগণের কোনো নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহারা সাধারণতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দাক্ষিণ প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। অরণ্য-জাত ফলমূল এবং শিকারলব্ধ পশুই ইহাদের ক্ষুন্নিবারণের একমাত্র উপায় ছিল। রামচন্দ্রের বানরসৈন্যের মতো ইহাদেরও যুদ্ধাস্ত্র ছিল—লাঠি ও পাথর। সুতরাং ইহা-দেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের সাহায্যে আর্য্য রামচন্দ্র অনার্য্য রাজা রাবণকে পরাজিত করিয়াছিলেন—এ সিদ্ধান্ত একেবারেই অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

কৃষিবিজ্ঞানের সহিত পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরাওঁদের ভিতর শিকারের ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসে এবং তাহার পর হইতেই ধীরে ধীরে নর্ম্মদার উর্ব্বর উপত্যকা-ভূমিতে ওরাওঁপল্লীর পত্তন সুরু হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কৃষি-জীবনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই জাতির ভিতর শিল্পকলা উন্মেষলাভ করে। শিল্পের সম্বন্ধে ওরাওঁদের জ্ঞান অতিপরিমিত হইলেও তাহাদের তৈরী খড়ের গদি ও খড়ের বিড়ে প্রভৃতিতে শিল্প-নৈপুণ্যের আভাস স্পষ্টই বিদ্যমান। খুব সম্ভব এইস্থান

নমুনা—১ক।
ওরাওঁ বালিকার মুখপার্শ্ব।

নমুনা—২ক।
ওরাওঁ বালকের মুখ-সম্মুখ।

নমুনা—১।
ওরাওঁ বালিকার মুখ-সম্মুখ।
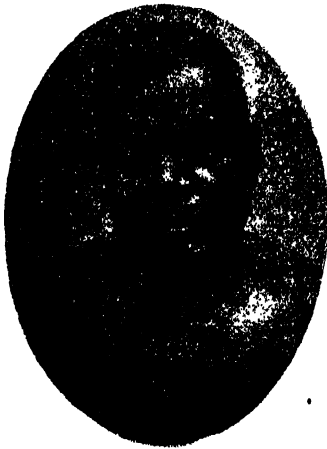
নমুনা—৩ক
ওরাওঁ পুরুষের মুখ-সম্মুখ।

নমুনা—৩
ওরাওঁ পুরুষের মুখপার্শ্ব।

নমুনা ২
ওরাওঁ বালকের মুখপার্শ্ব।

ওরাওঁ চেহারার নমুনা।

হইতেই তাহারা উত্তর ভারতের দিকে অগ্রসর হয় এবং নন্দনগড়, পিপড়িগড় প্রভৃতি স্থানে কিছুদিনের জন্য বাস করিয়া বিহারের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলায় প্রবেশ করে। প্রবাদ, এই সময়ে করোক্ষ নামে তাহাদের কোনো প্রাচীন অধিনায়ক অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠে। তাহারই নাম অনুসারে এইখানে করোক্ষ বা করুষ দেশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কালের আবর্ত্তনে কোল জাতীয় চেরোরা যখন বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল, ওরাওঁরা তখন সাহাবাদ জেলা পরিত্যাগ করিয়া রোহিতাস্য বা রোটাস অধিত্যকায় আশ্রয় লয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহা দুর্গাকারে গড়িয়া তোলে। এখানকার সুখশান্তি এবং আনন্দের কথা এখনও তাহাদের ভিতর বহু গল্পে এবং কাহিনীতে বর্ণিত হইয়া এখানকার অনেকগুলি দিনের স্মৃতিকে তাহাদের ভিতর উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

এই রোটাসগড়ে তাহারা সম্ভবতঃ অর্দ্ধহিন্দু চেরোদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু এখানে তাহারা আটঘাট এমন করিয়াই বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, পাহাড়ের প্রাচীর তুলিয়া গড়টাকে এতই মজবুত করিয়া গাঁথিয়া লইয়াছিল যে, পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আক্রমণের আঘাতেও তাহা যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল—একটুও টলিল না
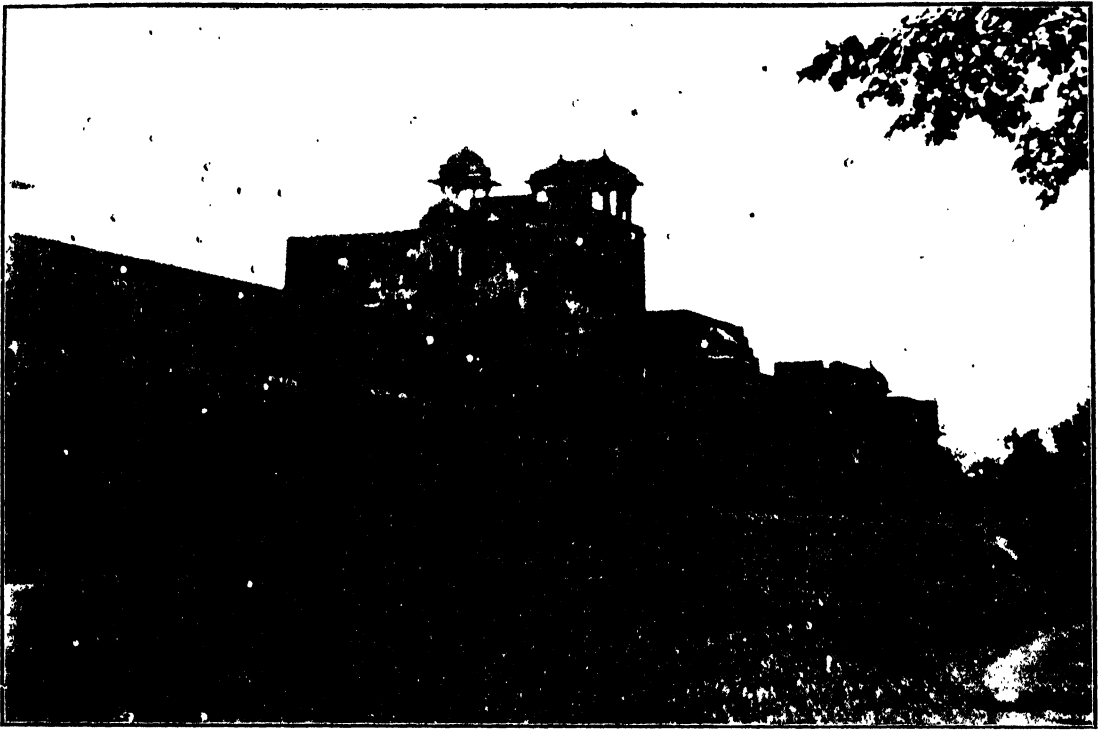
রোটাসগড়।

শত্রুরা তখন বাধ্য হইয়া দুর্গজয়ের অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে তৎপর হইল। ওরাওঁরাজের দুধওয়ালীর পরামর্শ অনুসারে খদ্দি বা সরহুল উৎসবের দিন যখন ওরাওঁরা মদের নেশায় একান্ত বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল তখন তাহারা অরক্ষিত গুপ্ত পথে দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসে। তখন ওরাওঁরমণীগণ উৎসবের জন্য উখলীতে করিয়া চাল কাঁড়াইতেছিল; তাহারা অমনি উখলীর কাষ্ঠদণ্ড শামাট হাতে করিয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য শত্রুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এই নারী সৈন্যকে পরাজিত করিতে চেরাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। শত্রুসৈন্যের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ওরাওঁ রাজা ও তাঁহার প্রজাবর্গ ভূগর্ভস্থ পথে দুর্গের বাহির হইয়া যায়। এক এক মণ তৈলপায়ী বড় বড় মশালের আলোকে আকাশের সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়াও চেরারা ওরাওঁদিগের অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। ওরাওঁ ছাড়া আরও অনেকে এই রোটাস দুর্গের প্রতিষ্ঠার দাবি করে—সুতরাং একথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন যে ওরাওঁরাই এ দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা।

রোটাসদুর্গ পরিত্যাগের পর ওরাওঁদিগকে যে পথ অবলম্বন করিতে হয় তাহা দুর্ভেদ্য বনের ভিতর দিয়া। কোয়েল নদীর তীর ধরিয়া তাহারা প্রথমে পেলামৌ, তার পর ছোটনাগপুরে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ছোটনাগপুর তখন মুণ্ডাদের অধিকারে। ওরাওঁদের বিশ্বাস এই মুণ্ডাদের সংস্পর্শে আসিয়াই তাহারা আচারে ব্যবহারে খাদ্যাখাদ্য বিচারে এতটা হীন হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা তাহারা এককালে সভ্যতার উচ্চাসনেই আরূঢ় ছিল। শরীরতত্ত্ববিদ্‌দের মত কিন্তু ভিন্ন রকমের। তাহারা এই দুই জাতির ভিতর শরীরগত যথেষ্ট সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাদের উভয়েরই মুখ চেপ্টা, আকার বেঁটে, মস্তক অপরিসর, এবং নাসা বিস্তৃত। ওরাওঁদের শরীরের রং গাঢ় তাম্রবর্ণ, চুল কালো,

রোটাসগড়ে যাইবার তোরণ বা ফটক।
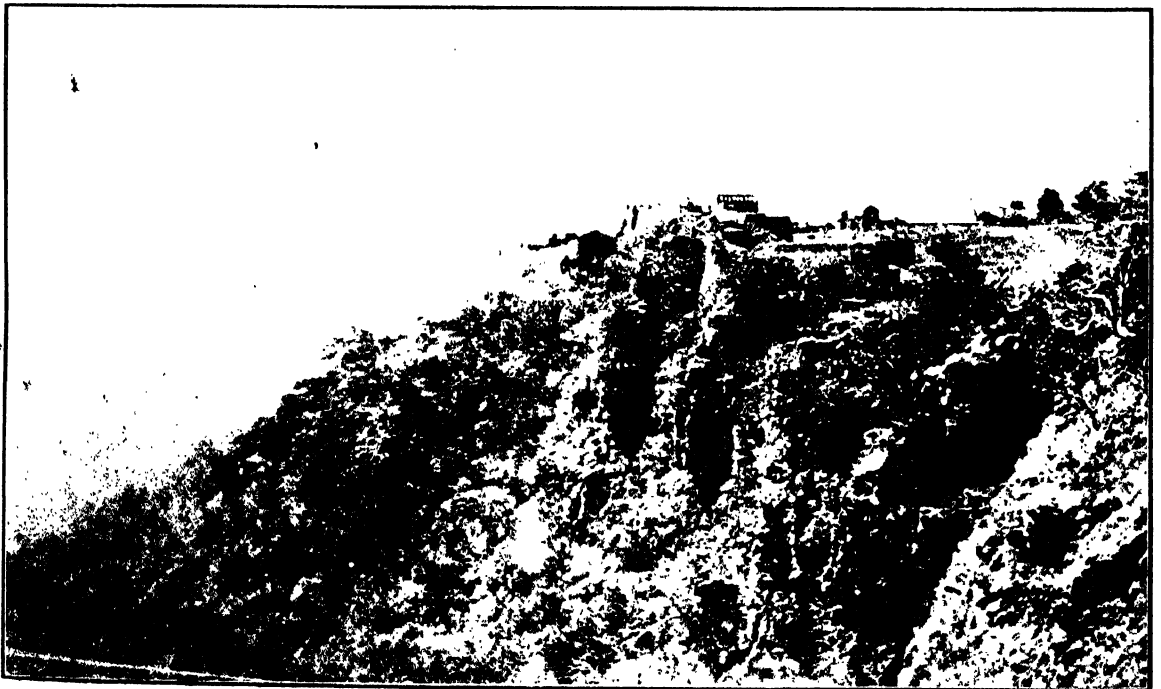
রোটাস পর্ব্বতের উপরে রোটাসগড়।

অমসৃণ এবং সাধারণতঃ কোঁকড়ান। ইহাদের চক্ষু মাঝারি রকমের, এমন কি ছোট বলিলেই চলে, চোয়াল সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া, ওষ্ঠ পুরু এবং নাসিকা গোড়ার দিকে চেপ্টা।

লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওরাওঁরা ছোটনাগপুরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে একেবারে জেলার ভিতর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক গ্রামেই একজন করিয়া নেতা থাকিত। সেই নেতাই ধর্ম্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে ওরাওঁদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিত। গ্রাম্য বৃদ্ধদের বৈঠকের বা পঞ্চায়তের হাতে বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল। সাত, বারো, একুশ বা বাইশটি গ্রাম লইয়া এক একটি করিয়া পাড়া। এই পাড়ার কোনো একটি গ্রামের নেতাই ছিল সমস্ত পাড়াটির রাজা। অন্যান্য গ্রামের নেতারা মন্ত্রণা দ্বারা রাজাকে সাহায্য করিত। গ্রামে গ্রামে বিবাদ বাধিলে বা সমস্ত জাতির সুবিধা অসুবিধা লইয়া কোনো প্রশ্ন উঠিলে এই পাড়ার আদালতে তাহার মীমাংসা হইত। রাজা নামটার ভিতর রাজতন্ত্রের গন্ধ থাকিলেও ওরাওঁদের শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ রূপেই প্রজাতন্ত্র ছিল। রাজারা বা নেতারা কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহাদিগকে সাধারণ লোকের মতই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। ওরাওঁদিগের আইন অনুসারে সমাজচ্যুতিই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর দণ্ড। ওরাওঁদের প্রজাতন্ত্র অনেকটা আধুনিক সভ্যজগতের মতই ছিল। সময় এবং সুবিধা পাইলে তাহাদের প্রজাতন্ত্র যে বর্ত্তমানের যে-কোনো প্রজাতন্ত্রের সমকক্ষ হইতে পারিত তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

অনেক দিনের পর ওরাওঁদের ভিতর আবার একটু একটু করিয়া জীবনের সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে। দেশের বালকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত চারিদিকে ইহাদের একটা চেষ্টার আভাস স্পষ্টরূপেই পরিস্ফুট। ইহারা নিজেরা সমবেত হইয়া চাদা তুলিয়া সেই অর্থের ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপন করিতেছে এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য সহরে ও স্কুলকলেজে ছাত্র পাঠানও সুরু হইয়া গিয়াছে। দরিদ্র অশিক্ষিত ওরাওঁরাও ১০ সের পরিমিত ধান ফসলের সময় ওরাওঁ-মুণ্ডা-শিক্ষা-সভায় সাহায্যরূপে দান করে। এই সমস্ত সাহায্য হইতে রাঁচিতে উচ্চশিক্ষাভিলাষী ওরাওঁ-বালকদের জন্য একটি বোর্ডিং হাউস, বা ছাত্রাবাসও স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের আত্মবোধ ও আত্মচেষ্টার সহিত খ্রীষ্টপন্থী মিশনরীদের ও গভর্মেণ্টের চেষ্টা যত্ন যুক্ত হইয়া ইহাদিগকে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

উন্নতি লাভের জন্য সত্যকার একটা চেষ্টা ইহাদের ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং এই-সব দেখিয়া শুনিয়া এ কথা স্বতই মনে আসিয়া পড়ে যে সেদিন খুব বেশী দূরে নহে যেদিন জ্ঞানে কর্ম্মে ইহারা ইহাদের প্রতিবেশী হিন্দু ও মুসলমানের সহিত একই স্তরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

মুর্শীদ কুলীখাঁর অভ্যুদয়

(আদি ফার্সী হইতে)

বাঙ্গলার প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শীদ কুলীখাঁ ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। ইস্ফাহান নগরবাসী হাজী শফী তাঁহাকে দাসরূপে ক্রয় করিয়া মুহম্মদ হাজী নাম দিয়া পুত্রের ন্যায় লালন পালন করেন। প্রভুর সঙ্গে বালক পারস্যদেশে যায়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে আসিয়া অল্পদিন বেরার প্রদেশের দেওয়ান (রাজস্ব বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী) হাজী আবদুল্লা খুরাসানীর চাকরী করিয়া পরে বাদশাহী কর্ম্মে প্রবেশ করে, এবং ক্রমে উপযুক্ত মনসব্ (ক্ষমতা ও সম্মানসূচক পদের শ্রেণী) এবং কার্তলব্ খাঁ এই উপাধি আওরাংজীবের নিকট প্রাপ্ত হয়। কিছুদিন হায়দরাবাদ প্রদেশের দেওয়ানী করে। পরে জীয়াউল্লা খাঁর স্থলে বাঙ্গলার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া মুর্শীদ কুলীখাঁ উপাধি লাভ করিয়া বাঙ্গলায় আগমন করে। (মাসির-উল্-উমারা, ৩, ৭৫১—৭৫২)

এ ঘটনা ১৭০১ খৃষ্টাব্দে ঘটে; তখন বাদশাহের পৌত্র আজীম-উশ্-শান বাঙ্গলার সুবাদার (শাসনকর্ত্তা)

ছলেন। ঢাকায় গিয়া মুর্শীদ কুলীখাঁ ঠিকভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যে-সব জমিদার ও জাগীরদার এতদিন পর্য্যন্ত খাজনা আদায় করিয়া নিজে খাইত এবং বাদশাহকে ফাঁকি দিত, তাহারা বিপদ দেখিল এবং নূতন দেওয়ানের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা নালিশ লিখিয়া বাদশাহের নিকট পাঠাইতে লাগিল। এমন কি কুমার আজীম্-উশ্-শানের মনও দেওয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল। কিন্তু মুর্শীদ কুলী প্রভুভক্ত ও সাধুকর্ম্মচারী, তিনি দৃঢ়ভাবে রাজকীয় প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে লাগিলেন এবং তাহা বাদশাহের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। তখন দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের জন্য বাদশাহের ঘোর অর্থাভাব। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার রাজস্বে তথাকার সরকারী খরচ চলিত না; সুতরাং এরূপ প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়া বাদশাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহার পর সব বিষয়েই দেওয়ানের কথা শুনিতেন এবং সুবাদারকে ধমকাইতেন। যুবরাজ দেওয়ানকে খুন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মুর্শীদ সে চেষ্টা বিফল করিয়া, ঢাকা ত্যাগ করিয়া মখ্-সুস্-আবাদ নগরে দেওয়ানী আফিস উঠাইয়া লইয়া আসেন, এবং পরে ঐ শহরকে মুর্শীদাবাদ নামে ভূষিত করেন।

দিন দিন তাঁহার ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল; তিনি বঙ্গ উড়িষ্যা ব্যতীত বিহার প্রদেশেরও দেওয়ান, এমন কি সুবাদারের নায়েব্ অর্থাৎ প্রতিনিধি, নিযুক্ত হইলেন (১৭০৩)। আজীম্-উশ্-শান বিরক্ত হইয়া বাঙ্গলা ছাড়িয়া পাটনায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং যখন আওরাংজীবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ বাধিল, তিনি নিজপুত্র ফরোখ্‌সিয়রকে প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকায় রাখিয়া দিল্লীর দিকে রওনা হইলেন। তখন মুর্শীদকুলী খাঁ বাঙ্গলায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। মুঘল বাদশাহদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইবার ফলে তিনি কালক্রমে বাঙ্গলায় প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু কখনও দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা অস্বীকার করেন নাই, এবং তাঁহার নিকট হইতে সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্ব এবং মুতমন্-উল্-মুল্‌ক্ আলা-উদ্-দৌলা জাফর খাঁ বাহাদুর আসদ্‌জঙ্গ * এই উপাধি ক্রয় করেন। (মাসির-উল্-উমারা)। ৩০এ জুন ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বেভেরিজ সাহেব একটি ফার্সী শ্লোক হইতে এই ঠিক তারিখটি উদ্ধার করিয়াছেন (১৮ জুলাই, ১৯০৮, এথেনিয়ম্ পত্রিকা দেখুন)। ষ্টুয়ার্ট রচিত বাঙ্গলার ইতিহাসে যে মৃত্যুর বৎসর ১৭২৫ খৃঃ লেখা হইয়াছে তাহার ভিত্তি মাসির-উল্-উমারা এবং রিয়াজ্-উস্-সালাতীন; কিন্তু এ দুই গ্রন্থেই ভুল তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

মুর্শীদ কুলীখাঁর বাঙ্গলার দেওয়ানীর প্রথম অংশে বাদশাহ আওরাংজীব তাঁহাকে যে চিঠি লেখেন তাহার কতকগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে। সম্রাটের শেষ বয়সের প্রিয় মুন্সী ইনাএৎউল্লাকে দিয়া বাদশাহ যে-সব চিঠি লেখান তাহার দুই সংগ্রহ আছে—একের নাম "কালিমাৎ-ই-তাইবাৎ", দ্বিতীয়ের "আহ্‌কাম্-ই-আলমগীরী।" যতদূর জানা গিয়াছে শেষোক্ত গ্রন্থের দুইখানি মাত্র হস্তলিপি জগতে বিদ্যমান আছে,—একখানি রোহিলখন্দে রামপুরের নবাবের নিকট, অপর খানি খুদা বখ্‌শ পুস্তকালয়ে। এই দুখানি মিলাইয়া পাঠ উদ্ধার করিয়াছি। সব চিঠিগুলিই বাদশাহের হুকুমে মুন্সীর জবানীতে লিখিত।

(ফার্সী পত্রের অনুবাদ)

(১)

এই সময় বাদশাহ বাহির হইতে শুনিয়াছেন যে—(ক) এই মন্ত্রীবর খাস্‌মহাল ও অন্যান্য পরগনাগুলি ইজারা দ্বারা বন্দোবস্ত (মুশখ্‌খস্) করিতেছেন,—ঐ প্রদেশে ইজারা শব্দ রাজস্বের জন্য দায়ী হওয়া [অর্থাৎ ঠিকা লওয়া] অর্থে ব্যবহার হয়,—এবং ইজারাদারগণ দুর্ব্বলের ও প্রজাগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে। পরগনাগুলির আবাদ প্রায় লোপ পাইয়াছে, এবং যদি আর একবৎসর এই প্রকারে চলে তবে নিশ্চয়ই প্রজাগণ ধ্বংস হইবে।

---

* মুর্শীদ কুলীকে 'আসদ জঙ্গ' উপাধি আরোপ করা মুদ্রিত ফার্সী 'মাসির' গ্রন্থের ভুল। তাঁহার উপাধি 'নসীরজঙ্গ' ছিল।

(খ) নওয়ারার ব্যাপার অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছে। যদিও নৌকাগুলি সজ্জিত করিবার জন্য বশারৎ খাঁকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তথাপি কাজটি সম্পন্ন হয় নাই।

(গ) তোপখানার যে-সকল কর্ম্মচারী নানা থানায় নিযুক্ত আছে তাহারা পূর্ব্বের (বাকী) বেতনের জন্য বড়ই ক্রন্দন করিতেছে। যদিও উহাদের বেতন দিবার জন্য আপনার প্রতি বাদশাহ আজ্ঞা দিয়াছেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত তদনুযায়ী কার্য্য হয় নাই।

অতএব বাদশাহ আপনাকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিতে বলিলেন—"ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের মনোবাঞ্ছা যে তাঁহার রাজ্য আবাদ হউক, দুর্ব্বল প্রবলের হাত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হউক, একজনের প্রতিও অত্যাচার বা অনুরাগ (? পক্ষপাত) দেখান না হউক। আপনি ঈশ্বরকে সর্ব্বদা উপস্থিত জানিয়া মহালগুলির আবাসবৃদ্ধি এবং প্রজাদের আরাম সর্ব্বদা নিজের দৃষ্টির লক্ষ্যস্বরূপ করিয়া, যেরূপ কার্য্য প্রজাদের অনিষ্টের কারণ হয় তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন,—কারণ রাজস্ব-বৃদ্ধি প্রজাদের হাতেই। নৌ-বলের কাজকর্ম্মের বিশৃঙ্খলা সংশোধন এবং তোপখানার কর্ম্মচারীদের প্রাপ্য বেতন প্রদান সম্বন্ধে অত্যন্ত চেষ্টা করিবেন। জানিবেন যে এই-সব বিষয়ে বাদশাহ অত্যন্ত তাকিদ করিতেছেন।"

[টীকা। 'বাহির হইতে'—প্রত্যেক প্রদেশে নিযুক্ত সরকারী সংবাদদাতা (ওয়াকেয়া-নবিস অথবা সওয়ানেহ নিগার) ভিন্ন অপর কোন লোকের পত্রে। 'অত্যাচার' —মুর্শীদ কুলীখাঁ যে রাজস্ব আদায় করিতে বড় কড়া-কড়ি করিতেন, তাহা ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে (Section VI) বিশদরূপে বর্ণিত আছে; ষ্টুয়ার্ট সিয়ার-উল্-মুতাখ্-খরীন ও রিয়াজ-উস্-সালাতীন্ অনুসরণ করিয়াছেন। নওয়ারা—বাঙ্গলায় যে-সকল সরকারী নৌকা যুদ্ধ ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য রাখা হইত, তাহার সমষ্টি। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইহার ব্যয়ের জন্য বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকার জমী নির্দ্দিষ্ট ও নৌকার সংখ্যা তিনশত ছিল। আমার *Historical Essays*, p. 120, দেখুন।]

(২)

বাদশাহের আজ্ঞা অনুসারে লিখিত হইতেছে যে— এখন বিহার প্রদেশের দেওয়ানের পদও আপনাকে অর্পণ করা হইয়াছে, সুতরাং আপনি স্বয়ং উড়িষ্যা যান ইহা ভাল নহে। তথায় এক প্রতিনিধি (নায়েব) রাখিয়া জাহাঙ্গীর-নগর [ফিরিয়া] আসিবেন, কারণ যুবরাজ [আজীম্-উশ্-শান্] কুমার [ফরোখ্ সিয়র্‌কে ঢাকায়] রাখিয়া নিজে পাটনা চলিয়া গিয়াছেন। আপনার অনেক কার্য্য, সুতরাং যথা হইতে সব স্থানের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন এরূপ কেন্দ্রস্থানে আপনার বাস করা উত্তম। সর্ব্বত্র কার্য্যাভিজ্ঞ এবং বিশ্বাসী প্রতিনিধি রাখিয়া বাদশাহের আজ্ঞানুসারে নিশ্চয়ই জাহাঙ্গীরনগর যাইবেন। আরও, বাদশাহ হুকুম করিতেছেন যে—

উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশ (সুবা), এক কোণে স্থিত। সর্ব্বদাই ইহার পৃথক শাসনকর্ত্তা থাকিত, এবং আপনার কার্য্যস্থলের (=বাঙ্গলার) সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এই প্রদেশের অবস্থা লিখিয়া জানাইবেন।

[জাহাঙ্গীরনগর=ঢাকা]

(৩)

ইতিপূর্ব্বে আপনার উকীলের উক্তি হইতে বাদশাহ [বাঙ্গলা প্রদেশের সরকারী-] সংবাদলেখকগণের অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন; এখন আপনার পত্রেও সেই বিষয় অবগত হইলেন। সলীম্-উল্লা ও মুহম্মদ খলীলকে নিজ নিজ পদ হইতে সরাইবার জন্য হুকুম দেওয়া গেল, এবং এই হুকুম ইয়ারআলী বেগকে জানান হইল।

আপনার [অধীনস্থ] আমীনী ও ফৌজদারী সংশ্রবে সংবাদলেখক নিযুক্ত করিবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছেন, বাদশাহ তাহা মঞ্জুর করিলেন।

আপনি লিখিয়াছেন—"আমার কার্য্যের অংশীগণ এবং অন্যান্য স্বার্থপর লোকেরা স্পষ্টই বলিতেছে, 'যাহা লিখিতে হয় তাহা [বাদশাহকে] লিখিব।' এবং এই সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় জমীদারগণ রাজস্ব প্রদান করিতে দেরি করিতেছে। বাদশাহ ইহার প্রতিকার স্থির করিয়া

রাখিবেন। নচেৎ মহামান্যবক্তিগণ আবার লক্ষ লক্ষ টাকা [রাজস্বের] হানি করিবেন।"

এসম্বন্ধে বাদশাহ হুকুম করিতেছেন যে—"এ বিষয়টা আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি পুর্ণক্ষমতা-প্রাপ্ত দেওয়ান ও ফৌজদার এবং [তোমার বিরুদ্ধে] কাহারও কথা আমি শুনি না।"

আপনি আরও লিখিয়াছেন, "আমার কার্য্যের অংশী-গণ শত্রুতা করিয়া [আমার বিরুদ্ধে] নানা কথা লেখে, এবং তদ্দ্বারা শাসনকার্য্য বিশৃঙ্খল করিয়া রাজকার্য্য নষ্ট করে। [অথচ] আমি এই দেশ আবাদ করাইয়া, ক্রোর ক্রোর টাকা সংগ্রহ করিয়াছি। স্বার্থপর লোকেরা যখন আমার কাজ ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, আমি আশা করি [এই দাসের স্থলে] অপর কোন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হউক।"

বাদশাহ উত্তর দিতেছেন যে—"কেন শয়তানের সন্দেহ করিতেছ ? ঈশ্বর তাহার পাপ হইতে আমা-দের রক্ষা করুন! তোমার 'অংশী' কে ? তাহাদের অভিপ্রায় কি ? তুমি বাদশাহের অনুগ্রহ ও স্নেহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এবং তাঁহার উপদেশ মানিয়া বাদশাহী রাজস্ব সংগ্রহে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক চেষ্টা করিবে, এবং ক্রমাগত খাজনা [সদরে] পাঠাইতে থাকিবে। কোন ভয় করিও না।"

[টীকা। ইয়ারআলী বেগ—বাদশাহের ডাকবিভা-গের প্রধান অধ্যক্ষ। সমস্ত প্রাদেশিক সংবাদলেখকগণ তাঁহার অধীনে ছিল। যদি কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সংবাদলেখককে ভয় দেখাইতেন বা অপমান করিতেন, ইয়ারআলী বেগ অমনি গিয়া বাদশাহের নিকট নালিস করিতেন, "সংবাদলেখকগণ বাদশাহের গোপনীয় চক্ষু-স্বরূপ। যদি তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার বা অপমান হইতে দেওয়া যায় তবে তাহারা সত্য কথা লিখিতে সাহস পাইবে না, এবং শাসনকর্ত্তারা বাদশাহকে ফাঁকি দিবে।" তখন সেই শাসনকর্ত্তার শাস্তির হুকুম হইত। এইরূপে ইয়ারআলী তাৎকালীন C. I. Dর প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া ফার্সী ইতিহাসে লিখিত আছে। আমার *Anecdotes of Aurangzib*, 130 দেখুন।

"অংশীগণ"—যুবরাজ আজীম্-উশ্-শান্, বাঙ্গলার নাজিম্ অর্থাৎ সৈন্য, বিচার ও শান্তির জন্য দায়ী শাসন-কর্ত্তা; অপর পক্ষে মুর্শীদ কুলীখাঁ শুধু রাজস্ববিভাগে প্রধান ছিলেন। "মহামান্য ব্যক্তিগণ"ও সেই অর্থে ব্যব-হৃত। গৌরবার্থে বহুবচন। মুর্শীদ কুলীখাঁর খাতিরে যুবরাজ আজীম্-উশ্-শান্‌কে বাদশাহ আওরাংজীব কেমন ধমকাইতেন তাহা ষ্টুয়ার্টে বর্ণিত আছে।]

(৪)

ইতিপূর্ব্বে বাদশাহের হুকুমে এই মন্ত্রীবরকে লেখা হইয়াছে যে প্রায় নব্বই লক্ষ টাকার সরকারী খাজানা যাহা বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং যাহার পরিমাণ আপনি বাদশাহকে লিখিয়া জানাইয়া-ছেন, ও তৎসঙ্গে অন্যান্য অধিক টাকা যাহা সংগ্রহ হইয়া থাকিবে, একত্রে যত দ্রুত সম্ভব এখানে পাঠাইবেন। এখন যুবরাজ [আজীম্-উশ্-শান্]কে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যে ঐ সকল টাকা প্রেরণ করিবার জন্য কড়া সজাওল নিযুক্ত করিয়া উহা এলাহাবাদ পর্য্যন্ত [রক্ষী সহ] পৌঁছাইয়া দেন। যদি আপনি পূর্ব্বে প্রেরিত আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বোক্ত টাকা সদরে রওনা করিয়া থাকেন, ভালই; নচেৎ এই পত্র পাইবামাত্র ঐ টাকা এবং অপর যাহা-কিছু আদায় হইয়াছে তাহা সমস্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রুততার সঙ্গে হুজুরে প্রেরণ করিবেন। জানিবেন যে বিলম্ব অবৈধ, কারণ এবিষয়ে বাদশাহ অত্যন্ত অধিক তাকিদ্ করিতে-ছেন। নিশ্চয়ই এই আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবেন।

[এই পত্রে আওরাংজীবের শেষ কয়েক বৎসরের টাকার অভাব এবং বাঙ্গলা হইতে প্রেরিত রাজস্বের আবশ্যকতা অতি স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। *Anecdotes of Aurangzib*, p. 10 and 125 দেখুন।]

(৫)

বাদশাহী নিয়মানুসারে খাস্ মহাল ও অন্যান্য পরগনাগুলি বন্দোবস্ত করা, এবং নওয়ারা ও তোপখানা সম্বন্ধে বাদশাহের হুকুমে আপনাকে যে পত্র লিখি তাহার উত্তর পাইলাম ও তাঁহাকে দেখাইলাম। আপনি যে জাহাঙ্গীরনগর পৌঁছিয়াছেন, রাজস্বের জন্য দায়ী

(জমীদারদিগের) নিকট হইতে মুচিল্‌কা গ্রহণ করিতেছেন, প্রজাদিগের প্রার্থনা ও মৃত কিফায়েৎ খাঁর কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া আপনি ঐ-সকল (জমীদারগণের) উপর রাজস্বের কিস্তি ধার্য্য করিয়া দিতেছেন, তাহা এবং অন্যান্য বিষয় বাদশাহ অবগত হইলেন।

আপনি লিখিয়াছেন—"তোপখানা, হস্তী এবং অন্যান্য প্রাদেশিক খরচের জন্য ফলুরিয়া ও অন্যান্য পরগনা স্থায়ী খাস মহাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি, এবং বাদশাহের আজ্ঞানুসারে তাহা মুহম্মদ হাদী নায়েব-দেওয়ানের হাতে অর্পণ করিয়াছি। যদি বাদশাহ হুকুম করেন তবে ঐ মহালগুলি বখ্‌শী বা বোইউতাতের হাতে দিতে পারি।" প্রদেশের বোইউতাতের হাতে ঐ মহালগুলি সমর্পণ করা বাদশাহ অনুমোদন করিলেন। নিশ্চয়ই আজ্ঞানুসারে কার্য্য হইবে।

[টীকা। কিফায়েৎ খাঁ মীর আহ্‌মদ্ বাঙ্গলার দেওয়ানের পদ হইতে চ্যুত হইবার পর ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে সদরের খাস মহাল বিভাগের পেশকার নিযুক্ত হয়, এবং ১৬৯৮ খৃঃ মে মাসে মারা যায়।

বখ্‌শীগণ সৈন্যদিগকে বেতনাদি বাঁটিয়া দিত ও তাহার হিসাব রাখিত। বোইউতাৎ—বাদশাহের গার্হস্থ্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী; ইহারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ফর্দ্দ করিত এবং তাহা হইতে বাদশাহের অংশ লইত।]

[৬]

শুজাউদ্দীন মুহম্মদকে উড়িষ্যায় নায়েবরূপে রাখিয়া উড়িষ্যা ও বালেশ্বরের খাজানা সহ আপনার বাঙ্গলা প্রদেশে রওনা হওয়া এবং অন্যান্য ঘটনা-পূর্ণ আপনার দুইখানি চিঠির সংক্ষেপ বাদশাহকে জানান হইল। আপনি লিখিয়াছেন, "উড়িষ্যার খাজনা আদায় হৈমন্ত শস্যের উপর নির্ভর করে; তাহা অনেক দিন ধরিয়া জমা করিয়া রাখা হয়, এবং কোন উপায়ে বিক্রয় করিতে পারা যায় না।"

বাদশাহ তদুত্তরে বলিলেন যে,—"আমি শুনিয়াছি যে বণিকেরা এই শস্য গ্রহণ করে এবং তাহার পরিবর্ত্তে যে জিনিষ চাওয়া যায় তাহা বন্দর হইতে আনিয়া দেয়।"

আপনি প্রস্তাব করিয়াছেন, "সমস্ত উড়িষ্যা প্রদেশটা যুবরাজের বেতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হউক, এবং [এখন] বাঙ্গলা ও বিহারে যে-সব খাস মহাল আছে তাহার পরিবর্ত্তে [অপর জমী] খাস করা, এবং হুজুর হইতে খাস মহালগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক।" তদুত্তরে বাদশাহ বলিলেন,—"মুর্শীদ কুলী তিন প্রদেশের এবং যুবরাজের সম্পত্তির ও পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত দেওয়ান। অতএব যে [শাসন-] প্রণালী উপযুক্ত সুবিধাজনক এবং লাভকর মনে করে তাহা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার [আজীম্-উশ্-শানের] মনঃস্তুষ্টি ও সম্মতি অনুসারে যেন করে।"

আপনি লিখিয়াছেন,—"আমার বিহার প্রদেশে যাওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। তথা হইতে ফিরিয়া মেদিনীপুর বা বর্দ্ধমান—যাহা আমার অধীনস্থ ফৌজদারী এলাকাগুলির কেন্দ্র—যেখানে হুকুম হইবে, তথায় যাইব। যদি উড়িষ্যা প্রদেশ যুবরাজের তন্‌খা নির্দ্দেশ করা মঞ্জুর হয়, তবে হৈমন্ত শস্য তাঁহার তন্‌খা স্বরূপ দেওয়া হইবে, এবং বাঙ্গলার খাসমহাল চাক্‌লাগুলির ফৌজদারীর বন্দোবস্ত বহাল রহিবে।" তদুত্তরে বাদশাহ বলিলেন,—"তুমি এই-সব বিষয়ে নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিতে পার।"

আপনি লিখিয়াছেন,—"যদি উড়িষ্যা অন্য কাহাকে প্রদান করা হয় তবে আমি বর্দ্ধমান ও অন্যান্য স্থানের কর্ম্ম হইতে অবসর লইব।" বাদশাহ বলিলেন "অন্য কর্ম্মচারীকে দেওয়া হইবে না, তোমাকেই বহাল রাখিলাম।" এই উপলক্ষে বাদশাহকে জানান হইল যে আপনি আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা অনেক ভালরূপে উড়িষ্যার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এবং জমীদারদিগের নিকট হইতে উপঢৌকন (পেশ্‌কশ্) লইয়া তাহা সরকারী কোষাগারে দাখিল করিয়াছেন। শুনিয়া বাদশাহ বলিলেন, বাহবা! বাহবা!

[টীকা। "মুর্শীদ কুলীখাঁ শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াই প্রথমে বাদশাহের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে বাঙ্গলার জাগীরগুলি রদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সকল কর্ম্মচারীকে উড়িষ্যায় জাগীর দেওয়া হউক।... প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইল।" (ষ্টুয়ার্ট, Sec. VI.)] শুজাউদ্দীন—মুর্শীদ

লীখাঁর জামাতা এবং বাঙ্গলার নবাব-পদে তাঁহার উত্তরাধিকারী।]

[৭]

আপনি [বাদশাহের সভাস্থ] আপনার উকীলকে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ বাদশাহকে দেখান গেল এবং তিনি সব বিষয়ের মর্ম্ম অবগত হইলেন। এই পত্রে আপনি লিখিয়াছেন—

"(ক) আমি উড়িষ্যা যাইবার সময় সৈন্যবিভাগের তন্‌খা ও সুবার অন্যান্য খরচ নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে-সব মহাল কর্ম্মচারীদের হাতে সমর্পণ করিয়া যাই, তাহা তাহারা নিজে দখল করিয়া লইয়াছে, এবং শাসন-কার্য্য ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে।

(খ) আমি [বাদশাহকে অথবা যুবরাজকে ?] জানাইতেছি যে বাঙ্গলাদেশে [বাদ্‌শাহী] সৈন্য উপস্থিত নাই, কর্ম্মচারীগণ ইচ্ছা করিতেছে যে সকলের বাকী বেতন শোধের জন্য তন্‌খা করা টাকা নিজে গ্রাস করিয়া একটা বিপ্লব ঘটায়।

(গ) যদি আমি উড়িষ্যা প্রদেশ ও আমার ফৌজদারীর অন্যান্য মহালের শাসন বহাল রাখিয়া, বাকী (রাজস্বের) টাকা ওসুল করিতে পারি, তাহাই যথেষ্ট। আমি সমস্ত [বঙ্গ-বিহার] প্রদেশের কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিতে পারিব ? বাদশাহ এ বিষয়ে উপায় নির্দ্দেশ করিবেন।

(ঘ) আমাকে সর্ব্বদা দেখিতে হয় যে যেখানে যাহা কিছু ঘটে অমনি নিন্দুকেরা যেন না লিখিতে পারে যে মুর্শীদ কুলীখাঁ [সৈনিকদিগের বাকী] বেতনের তন্‌খা দিতে আপত্তি করিয়াছে বলিয়া গোলমাল হইয়াছে।

(ঙ) শ্রীহট্টের জমীদারের গোমস্তা জানাইয়াছে যে—কার্‌তলব্‌ খাঁ নিজের পদচ্যুতির সংবাদ না পাইতেই শাসনকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছে। ঐ খাঁ শ্রীহট্টের এলাকায় যে থানা স্থাপন করিয়াছিল তাহা জয়ন্তীয়ার জমীদার ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, শ্রীহট্টের গ্রাম লুট করিয়াছে, বাদশাহী নওয়ারা হস্তগত করিয়াছে, এবং খাঁর নিকট হইতে দুইটা ঘোড়া, পাল্‌কী ও ছয়হাজার টাকা লইয়া তাহার সহিত সন্ধি করিয়াছে, এবং তৎপরে নিজদেশে ফিরিয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টের নিকট একদল সৈন্য রাখা হইয়াছে। নবনিযুক্ত ফৌজদার ইউসুফবেগ খাঁ নিজের পুত্রকে নায়েব স্বরূপ [শ্রীহট্টে] প্রেরণ করিয়া নিজে জাহাঙ্গীরনগরে আছে।"

মাসিক [বেতন] ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আপনার উত্তর পৌঁছিল।

মুর্শীদ কুলীখাঁ।

মন্ত্রীবর যখন (ঈশ্বর ধন্য হউন!) বাদশাহের অনুগ্রহের পাত্র, তখন স্থিরমনে রাজকার্য্য করিতে থাকিবেন, প্রজাদিগকে যত্নের সহিত বর্দ্ধিত করাইবেন, বেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগের প্রাপ্য বাকী বেতনের তন্‌খা দিতে আপত্তি করিবেন না, এবং অনবরত খাজানা পাঠাইতে থাকিবেন, [ইহাই বাদশাহের আজ্ঞা।]

[টীকা! কার্‌তলব্‌ খাঁ—শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরীর "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের" পূর্ব্বাংশের ২ ভাগ ২ খণ্ড, ৬৮ পৃষ্ঠায় এই ফৌজদারের নাম কারগুজার খাঁ বলা হইয়াছে। জয়ন্তীয়ার জমীদার—রাজা রামসিংহ (রাজত্ব ১৬৯৪-১৭০৮) হইবেন। (উক্তগ্রন্থ ২ ভাগ ৪ খণ্ড, ১৪ পৃঃ)]

[৮]

আপনি বাদশাহী রাজস্ব সংগ্রহে কিরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, এবং ১৬৬৪৮ আশরফী (স্বর্ণ মুদ্রা বা মোহর , দুই ক্রোর ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার পাঁচ শত তিপ্পান্ন টাকা এবং তিন শর্ত হুন্ (৪ টাকা মূল্যের দাক্ষিণাত্যের স্বর্ণ মুদ্রা) হুজুরে যে পাঠাইয়াছেন, এবং প্রার্থনা করিয়াছেন যে বাদশাহের স্বহস্তে লিখিত কয়েক ছত্র সহ এক ফর্মান আপনার নামে প্রেরিত হউক, তাহা সব বাদশাহ অবগত হইলেন। সম্রাট অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাকে এক উজ্জ্বল সম্মানসূচক পরিচ্ছদ (খেলাৎ) এবং স্বহস্তাক্ষরে ভূষিত ফর্মান প্রদান করিলেন।

নিশ্চয়ই এই সব অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ প্রকাশ করিতে ও রাজস্ব সংগ্রহ ও হুজুরে প্রেরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত পরিশ্রম করিবেন। ঈশ্বর করেন তবে অতি শীঘ্র খেলাৎ ও ফর্মান আপনার নিকট প্রেরিত হইবে।

[৯]

আপনি আপনার উকীলের নিকট যে চিঠিগুলি প্রেরণ করিয়াছেন তাহার আসল এখনও পৌঁছে নাই, কিন্তু তাহার নকল হইতে বাদশাহ লিখিত বিষয় অবগত হইলেন। আপনি এবং আপনার নায়েব যে সুচারুরূপে রাজকার্য্য করিতেছেন তাহা বারম্বার বাদশাহ জানিতে পারিয়াছেন ; তজ্জন্য সুফল (অর্থাৎ পুরস্কার) হইয়াছে, এবং (ঈশ্বর করুন) আরও ফল হইবে।

আপনি লিখিয়াছেন,—"পাঁচশত সৈন্যের নেতা (সেই পদের সঙ্গে ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য অতিরিক্ত যুক্ত আছে) এইরূপ মনসবদারদিগের জাগীর তন্‌খা দেওয়া হয় নাই। যে-সকল বাকী মহালের ডোলের উপর বাদশাহ 'স' অক্ষর লিখিয়াছেন, তাহা হইতে অর্দ্ধেকও [বাকী খাজানা] আদায় করা অসম্ভব। যতদিন পর্য্যন্ত লাভজনক জাগীর প্রদান না করা হয়, ততদিন সৈন্যদিগের তন্‌খা দান এবং রাজকার্য্য সম্পাদন কিরূপে করিব ?"

বাদশাহ উত্তর করিলেন যে এটা আপনার হস্তেই রহিয়াছে এবং মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট। আমি [অর্থাৎ ইনাএৎউল্লা] যাহা উচিত হয় তাহা বাদশাহকে জানাইলেই তিনি তাহা দিবেন। এ বিষয়ে আপনি যাহা লিখিবেন আমি তাহাই বাদশাহকে জানাইব। বাদশাহ আপনার নিম্নলিখিত প্রার্থনাগুলি মঞ্জুর করিলেন—

(ক) শূজাউদ্দীন মুহম্মদ্‌এর মনসবের শর্ত্তানুযায়ী অশ্বারোহীগুলির সংখ্যা পরীক্ষা (দাঘ) করা হইতে মাফ্ দেওয়া গেল।

(খ) হেদায়েৎউল্লা ও ইজ্জৎউল্লাকে কর্ম্মস্থলে (উড়িষ্যায় ?) প্রেরণ করা হইল।

(গ) বাঙ্গলার দেওয়ানের পেশকার ভূপৎরাম যদি তাঁহার (শূজাউদ্দীনের) সঙ্গে যায় তবে তাহার মনসব্ বহাল থাকিবে।

আমি বাদশাহকে জানাইলাম যে সেই উচ্চকর্ম্মচারী (অর্থাৎ শূজাউদ্দীন) তাঁহার [উড়িষ্যার] সুবাদারীর নজরস্বরূপ ১৪ হাজার টাকা কিস্তি কিস্তিতে রাজকোষে দিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

মৃত আস্‌কর খাঁর পোষ্যপুত্র মুহম্মদ কুলীকে মন্‌সব্ প্রদান, এবং প্রথমোক্ত খাঁর দুইপুত্র ঘুলাম হুসেন ও মুহম্মদ ইব্রাহিমকে দৈনিক সাহায্যদান সম্বন্ধে বাদশাহ বলিলেন—

"মৃত খাঁর জামাতা হুজুরে মন্‌সব্ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে যে খাঁর দাসীগর্ভজাত শিশুপুত্রগণের প্রতিপালন করিবে। [তাহারা] হুজুরে আসুক।"

[টীকা। ডোল—কোন মহাল হইতে একুনে কত টাকা রাজস্ব আদায় হয় তাহার তালিকা।

'স'—'সহি' অর্থাৎ শুদ্ধ এই শব্দের প্রথমাক্ষর। শর্ত্তানুযায়ী—অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যতদিন করিবে শুধু ততদিনই ঐ কর্ম্মচারী সেই মন্‌সবের বেতন ভোগ করিবে, নচেৎ নহে। শর্ত্তহীন মন্‌সব আরও উচ্চশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইত। দাঘ—মন্‌সবে নির্দ্দিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য ঠিক রাখা হইতেছে কি না দেখিবার জন্য তাহাদের একত্র করিয়া পরিদর্শন করা এবং তাহাদের অশ্বের পৃষ্ঠে জ্বলন্ত লোহা দিয়া বাদশাহী চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেওয়া। ভূপৎরাম—ষ্টুয়ার্ট 'ভূপৎরায়' লিখিয়াছেন।]

[১০]

আপনার পত্র হইতে বাদশাহ জানিলেন যে উড়িষ্যার ফৌজদারের শর্ত্তানুযায়ী সৈন্যসংখ্যা কম, এবং [আপনি] চল্লিশলক্ষ টাকার খাজনা হুজুরে রওনা করিয়াছেন। বাদশাহ উক্ত ফৌজদারের মনসবে পাঁচশত অশ্বারোহী বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, কিন্তু এই কার্য্য করার শর্ত্তে। আপনি যে বাদশাহের লাভ ও উন্নতি করিতেছেন তাহা বারম্বার তাঁহার শ্রুতিগোচর হওয়ায়—(ঈশ্বর ধন্য হউন !)—আপনার প্রতি বাদশাহের অনুগ্রহ দিনদিন বাড়িয়া যাইতেছে। আপনি হুজুরের নিকট ক্রমাগত খাজনা পাঠাইতে অত্যন্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিবেন।

[১১]

মন্ত্রীবরের পত্র হইতে বাদশাহ জানিলেন যে চন্দ্রকোণা জয় করিতে আপনি যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন তাহার পুরস্কারস্বরূপ যুবরাজ আপনাকে এক খেলাৎ ও দুইটি অশ্ব উপহার দিয়াছেন। বাদশাহ আপনাকে তাহা গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন।

[১২]

জগতের মাননীয় বাদশাহের আজ্ঞানুসারে আপনাকে লিখিতেছি যে—যুবরাজ মুহম্মদ আজীম ফর্মান পৌঁছার সময় পর্য্যন্ত যে-সব খাজানা ও হাতী সংগ্রহ হইয়া থাকিবে তাহা সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে বাদশাহের নিকট আসিতে আজ্ঞা পাইয়াছেন। তিনি তাঁহার বড় ছেলেদিগকে আজীমাবাদ (পাটনা) ও জাহাঙ্গীরনগরে রাখিবেন। আপনি উড়িষ্যা ও আপনার এলাকার অন্যান্য মহালে নায়েব বসাইয়া, শীঘ্র জাহাঙ্গীরনগর আসিয়া, যুবরাজের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত ভালরূপে সাবধান হইয়া থাকিবেন ; কারণ [প্রদেশটি] আপনার হাতেই ছিল। এ বিষয়ে হুজুরের বিশেষ তাকিদ জানিবেন।

[১৩]

যুবরাজ মুহম্মদ আজীমের পত্রপাঠে বাদশাহ জানিলেন যে মুকবুরমৎ খাঁ নিজের গ্রাস-করা টাকা না দিয়া এবং দেওয়ানীর হিসাব হইতে মুক্তিলাভ না করিয়াই বাঙ্গলা হইতে ঘাজীপুর যাইতে চাহিতেছে। যখন আপনার এই মর্ম্মে পত্র পাওয়া গেল যে উক্ত খাঁ অনেক টাকার জন্য দায়ী ও তাহা আদায় করা উচিত, এবং যদি হিসাব [পরিষ্কার] না করিয়া সে নিজ কার্য্যের মহালে যায় তবে সম্রাটের রাজস্বের ক্ষতি হইবে,—তখন যুবরাজ হুকুম দিলেন যে উক্ত খাঁ নিজের নায়েবকে ঘাজীপুর পাঠাইয়া স্বয়ং আপনার নিকট যাইবে, ও হিসাব হইতে মুক্ত হইয়া তবে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যদি বাদশাহের হুকুম হয় তবে যুবরাজ উক্ত খাঁকে সরকারী প্রাপ্য টাকা (শোধ) দিবার পূর্ব্বেই আপনার নিকট হইতে ডাকিয়া ঘাজীপুরে পাঠাইতে পারেন।

বাদশাহ উত্তর দিলেন,—"উহাকে ঘাজীপুর পাঠাও। উহার নিকট প্রাপ্য টাকা আদায় করা এই মন্ত্রীবরের কর্ত্তব্য।"

[১৪]

বাদশাহের আজ্ঞানুসারে লিখিত হইতেছে যে—

বিহারপ্রদেশের দেওয়ান পদে আপনাকে নিযুক্ত করার পর হইতে এ পর্য্যন্ত আপনি বিহারে আসিতে পারেন নাই। হকীম মুহম্মদ সা'ঈদের অবস্থা ত জানা আছে। যে নূতন নায়েবকে যুবরাজ মুহম্মদ আজীম নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার চরিত্র অজ্ঞাত। এজন্য তাহাকে নায়েব-দেওয়ান পদের সনদ (নিয়োগপত্র) দেওয়া হয় নাই। যুবরাজকে এখন হুজুরে ডাকা হইয়াছে। যদি আপনার মন ঐ নায়েব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়, তবে লিখিবেন, তাহার নামে সনদ পাঠান যাইবে। নচেৎ অপর নায়েব নিযুক্ত করিয়া তাহার বিষয় লিখিবেন, যে, বাদশাহকে জানাইতে পারি। *

যদুনাথ সরকার।

* এই ১৪ খানি চিঠি ইনাএৎউল্লা খাঁর 'আহকামের' বাঁকিপুরস্থ হস্তলিপির পৃঃ 219 a—223b তে আছে। দ্বিতীয় পত্রখানি কালিমাৎ-ই-তাইবাৎএর 336 পৃষ্ঠায়ও দেওয়া হইয়াছে।

মনের মতন

(গল্প)

গ্রীস্ মূর্ত্তিমতী প্রকৃতিরাণীর মত সুন্দরী !

তাহার একদিকে দেবতার লীলা-নিকেতন, সুউচ্চ ওলিম্পাস, বাণীর প্রিয় নিকেতন-রূপ অটিকা-পর্ব্বত-শ্রেণী, দিগন্তরে ইলিস দুর্গ অভেদ্য, অজেয় ; আবার পর্ব্বত-পাদদেশে হরিৎতৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ; অন্যদিকে গাঢ় হরিৎবর্ণ পত্রপুষ্পশোভিত সিথিরা নিকুঞ্জ ! টেম্প-মালভূমি নবজাত শ্যামদূর্ব্বাদলসুশোভিত ; রাখালের মধুর বংশীনিনাদে সে স্থান ব্রজভূমি বলিয়া বোধ হয় !

প্রত্যহ উষার আলোকে যখন পৃথিবী অন্ধকারমুক্ত হইয়া একটা স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিত, থারসেনডা ও ডরিস সেই সময় এই স্থানে প্রাতঃভ্রমণ করিতে আসিত। সারা গ্রীসের মধ্যে ডরিস তখন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, আর থারসেনডা সুন্দরশ্রেষ্ঠ ! যেন নিপুণ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্ত্তি দুইটি ! প্রকৃতি বুঝি মদন ও রতির আদর্শে এ দুইটিকে গঠন করিয়া ভ্রমক্রমে ধরায় পাঠাইয়াছিলেন।

বসোরা গোলাপও ডরিসের সেই সুন্দর যৌবনপুষ্ট লোহিতাভ কপোলের নিকট লজ্জিত হইয়া পত্রপুঞ্জে আপনাকে লুকাইতে প্রয়াস পাইত। তাহার প্রকৃতি-দত্ত সৌন্দর্য্য যৌবনের মোহন তুলিকাস্পর্শে শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার সেই উজ্জ্বল নয়ন-তারকা যে দেখিত তাহার মনে হইত বুঝি রাত্রের শুকতারা তাহা অপেক্ষা নিষ্প্রভ এমনি তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃষ্টি !

ডরিসকে একবার দেখিলেই যে-কেহ তাহাকে ভাল বাসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত ; ডরিস কিন্তু থার-সেনডা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভাল বাসিত না ; সারা পৃথিবীর মধ্যে তাহার একমাত্র প্রেমপাত্র হইয়াছিল থারসেনডা ! ডরিস মধ্যে মধ্যে মুকুরে ফলিত আপন প্রতিবিম্ব দেখিত, তাহার ভয় হইত বুঝি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপের উজ্জ্বলতাও কমিয়া যাইতেছে, আর বুঝি সে থারসেনডাকে আপন করিয়া রাখিতে পারে না ! তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার বসন-ভূষণ-রূপ-যৌবন সকলই যে থারসেনডার জন্য !

থারসেনডাও ডরিস বলিতে আত্মহারা হইয়া পড়িত। সর্ব্বদাই ডরিসের কথায় তাহার হৃদয় পূর্ণ থাকিত। তাহার নিকটে থাকিলে সে আর সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন আকাঙ্খার বস্তু খুঁজিয়া পাইত না।

তাহাদিগের এই পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে একটি মাত্র দুঃখ ছিল। তাহাদের স্বেচ্ছায় পরিণয় হইবার উপায় ছিল না। বসন্ত উৎসবে যে রমণী সারা দেশের মধ্যে রূপের রাণী বলিয়া নির্ণীত হইবে তাহার সহিত দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরের বিবাহ হইবে ইহাই তখন নিয়ম ছিল।

ডরিস ভাবিত থারসেনডা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ সুন্দর বলিয়া নির্ণীত হইবে, আর অন্য কোন রমণী শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া নির্ব্বাচিত হইবে। তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উভয়ে তাহারা পরিণীত হইবে। আর অভাগিনী ডরিস শুধু ব্যর্থ হৃদয়ে আকুল বেদনায় সারা জীবন কাঁদিয়া ফিরিবে ! উঃ কি দুর্ভাগ্য তাহার !

আবার থারসেনডা ভাবিত ডরিস নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া নির্ব্বাচিত হইবে, আর অন্য একজন নির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠসুন্দর যুবকের সহিত ডরিসের শত আপত্তি সত্বেও পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যাইবে। অভাগা সে চিরদিন শুধু অতৃপ্ত হৃদয়ের হাহাকার বুকের মধ্যে গোপন করিয়া জীবনে নরক ভোগ করিবে। কি কঠোর এই বিধিলিপি !

* * * *

দিনের পর দিন চলিয়া গেল। ক্রমে উৎসবের দিন আসিয়া পড়িল। সারা দেশটায় একটা উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া গেল। সুন্দর যুবক ও যুবতীর মহলে একটা আশা আতঙ্কের উর্ম্মী বহিয়া গেল। সকলেই আশা করিতেছে আজ আমিই শ্রেষ্ঠ রূপবান বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। আশা বা আনন্দের সঞ্চার হয় নাই শুধু ডরিস ও থারসেনডার চিন্তা-দষ্ট প্রাণে !

কি সে শঙ্কট মুহূর্ত্ত। হয় জীবন উৎসর্গ, আর না হয় প্রেমের জয়জয়ন্তী !

একে একে সুন্দরীর দল আসিয়া ভেনাস দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে লাগিল।

প্রথমে আসিল ইসমিনী।

উষার রক্তিম আলোকের মত পরিপূর্ণ তাহার রূপ, কবি-কল্পিত মানসী প্রতিমার মত সুঠাম তাহার কোমল দেহ-লতা। সে প্রতিমা ভেনাসের প্রতিমূর্ত্তি নয়, লাবণ্যের প্রতিচ্ছবি!

তাহার পর আসিল জারফি!

সে-দেহের সৌন্দর্য্য ও লালিমা, অঙ্গভঙ্গি ও গতি যেন বন-দেবীর মতই সুন্দর, মনোরম! মধ্যাহ্ণ-সূর্য্যের মত প্রখর তাহার চক্ষের চাহনি; তাহাতে স্নিগ্ধতা নাই, আছে শুধু উজ্জ্বলতা; সে সৌন্দর্য্য বাসনার উদ্রেক করিতে পারে কিন্তু প্রাণ প্রেমপ্লাবিত করিতে পারে না। তাহাকে জয় করিতে ইচ্ছা হয়, তুষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না।

তাহার পর আসিল ডারসী।

তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিনীদ্বয়ের সহিত তাহার কোন অংশেই সমতা ছিল না। বিশ্বপ্রেমই তাহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব; বিশ্বপ্রেমিকার রূপ না থাকিলেও ক্ষতি নাই, তাহারও তেমন রূপের চাকচিক্য ছিল না। তাহার প্রকৃতিগত ঔদ্ধত্য দেহের লালিত্যহানি করিয়াছিল। লাবণ্য তাহার সংস্পর্শে আসিতে শঙ্কিত হইত। উদ্ধতা জুনোর মত সে জয়মুকুট দাবী করিতে আসিয়াছিল, রূপ দেখাইয়া জয় লাভ করিতে আসে নাই।

তাহার পর আরও অনেক গ্রীক সুন্দরী আপনাদের রূপের আলোকে দিগ্‌দেশ উদ্ভাসিত করিয়া সেই প্রাঙ্গণ-ভূমে উপনীত হইল। সেই সুন্দরীগণের মিলিত রূপ-জ্যোতিতে সারা প্রাঙ্গণ জ্যোৎস্নার আলোকের মত রূপালোকে ভরিয়া উঠিল।

সকলের শেষে আসিল ডরিস্!

সেই শান্ত সুন্দর রূপ দেখিবার জন্য উন্মুখভাবে মিলিত সকল দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল। সকলেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। দর্শকদের মনে হইল বুঝি ভেনাস দেবী মানবী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপন মন্দির-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণা হইলেন!

ইতিপূর্ব্বে যে আপনাকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া স্থির করিয়াছিল ডরিসকে দেখিয়া এতক্ষণে সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। লজ্জায় তাহার সারা মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, পর মুহূর্ত্তেই দারুণ নৈরাশ্যে তাহার সারা হৃদয় ভরিয়া উঠিল। অস্থির চিত্তে সে চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিল।

অদূরে বিচারকগণ সারি দিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহারাও ডরিসের স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, স্তম্ভিত হইলেন।

ক্রমে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইল। বিচারকগণ গভীর মনোযোগ সহকারে প্রত্যেক সুন্দরীর রূপ দেখিলেন। শিল্পের চরম আদর্শ হইবার মত রূপ ডরিস ব্যতীত অন্য কাহারও দেখা গেল না। যে বাস্তব সুন্দরী তাহার সারা দেহখানিই সমান সুন্দর হইবে। যাহার মস্তকের গঠনটি অনুপম তাহার দেহের অন্যান্য অংশ তেমন সুন্দর নহে, কাহারও বা শরীরের আকৃতিটি সুন্দর কিন্তু রূপের উজ্জ্বলতা নাই, এমনি একটা একটা খুঁত বাহির হইতে লাগিল। এরূপ সুন্দরী এ জয়মুকুটের অধিকারিণী নহে। বিধাতা মুক্তহস্তে যাহাকে সকল সৌন্দর্য্য দান করিয়াছেন কেবল সে-ই এ মুকুটের অধিকারিণী।

কতক্ষণ পরে বিচারকার্য্য শেষ হইল।

মন্দির-মধ্যে ভেনাস দেবীর একটি প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সে মূর্ত্তি বিখ্যাত শিল্পী ফিডিয়াসের কল্পনা-প্রসূত। উহাই তাঁহার কৃত শ্রেষ্ঠমূর্ত্তি; প্রকৃতি তাঁহার কল্পনা-নেত্রের সম্মুখে যতটুকু সৌন্দর্য্যের আবরণ মোচন করিয়াছিল, কঠিন লৌহাস্ত্রে তিনি তাহার সবটুকুই নির্জ্জীব পাষাণ-বক্ষে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। এমন সুন্দর মূর্ত্তি গ্রীসে আর একটিও ছিল না।

প্রধান পুরোহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া ডরিসের মস্তকে জয়মুকুট পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"তুমিই এ মুকুটের অধিকারিণী। আজ থেকে তুমি রূপের রাণী হ'য়ে সুন্দরী মহলে রাজত্ব কর। এ নিষ্পত্তিতে কাহারও কোন অসন্তোষের কারণ থাকবে না,—থাকতে পারে না। আজ থেকে তারা রূপের রাজ্য তোমায় ছেড়ে দিতে বাধ্য; আর সুন্দরী ব'লে তারা গর্ব্ব করতে পারবে না।"

ডরিসের প্রধান শত্রুও তাহার এ বিজয়বার্ত্তায় আনন্দিত হইল। ডরিস কিন্তু এ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিল না। একটা ভয় তাহার সমস্ত আনন্দ পণ্ড করিয়া দিল। যদি থারসেনডা শ্রেষ্ঠসুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়! যদি না হয়! যদি বিচারকের দৃষ্টিতে সে সুন্দরতম প্রতিপন্ন না হইয়া অন্য কেহ প্রতিপন্ন হয়, তবে—তবে? তবে ডরিসকে তাহার গলাতেই মাল্যদান করিতে হইবে। উপায় নাই—ওগো উপায় নাই! হৃদয় কাঁদিয়া কাটিয়া লুটিয়া পড়িলেও ইহার অন্যথা হইবে না। জগতের সকলেই আজ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, সারা সংসারে কেহই তাহার প্রতি মমতা বা করুণা প্রকাশ করিবে না। হায় ভেনাস দেবী এ তাহার কি করিলে?

দেশের আচার অনুসারে একজন পুরোহিত ডোরাকে ভেনাস দেবীর মত সুন্দর পরিচ্ছদ পরাইয়া দিলেন। মস্তকে তাহার একটি আবরণ টানিয়া দেওয়া হইল। কে বলিয়া দিবে ডরিস এ আবরণ মোচন করিয়া কোন্ পুরুষের মুখ দর্শন করিবে?—কাহাকে স্বামী বলিয়া বরণ করিয়া লইবে?

যেখানে নবীন দম্পতির বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইবে সে স্থানটি প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একটা বীণার ঝঙ্কার ডরিসকে সেই স্থানে উপনীত হইতে ইঙ্গিত করিল। আবার ডরিসের সর্ব্বশরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কে জানে তাহার ভাগ্যে কি আছে? কম্পিত পদে আবৃতবদনা ডরিস পুরোহিতের সহিত অগ্রসর হইল। তাহার অবস্থা তখন দেবতার নিকট মানত-করা বলিদানের পশুটির মত ভয়কম্পিত, ভেনাস দেবীর প্রিয়পাত্রীর মত আনন্দ-চঞ্চল নহে।

এপোলো ও ভেনাসের প্রধান পুরোহিত দুইজন দম্পতি দুইজনকে দেবতার বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইতে বলিলেন। তাহাদের পরস্পরকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইল না। দেশাচার মত বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

যুবকের মুষ্টির মধ্যে ডোরার হাতখানি কাঁপিয়া উঠিল। ডরিস তখন আপনার ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছিল। মুখের আবরণ মোচন করিয়া সে কি দেখিবে?—এ যদি থারসেনডা না হয়! হায় প্রিয়তম থারসেনডা!

ক্রমে আবরণ মোচন করিবার সময় আসিল। ডরিস ক্রমাগত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আবরণ মোচন করিয়া সে আজ আবার কাহাকে স্বামীর আসনে দেখিবে? থারসেনডাকে সে যে বহুদিন পূর্ব্বে মনে মনে স্বামীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে! অশান্ত বেদনাপ্লুত হৃদয় চাপিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল থারসেনডার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সে একদিনও জীবিত থাকিবে না।

দেশাচার আর একটি মাত্র বাকি ছিল। এইবার বরকে কন্যার মুখাবরণ মোচন করিতে হইবে। পরে কন্যাকে বরের মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া দিতে হইবে; ইহাই দেশাচার; ইহার অন্যথা হইবার উপায় নাই!

যুবক ডরিসের মুখাবরণ মোচন করিয়াই বিস্ময়ে একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। ডরিস কি করিতেছে তাহা সে আপনিই বুঝিতে পারিল না। এ কণ্ঠস্বর থারসেনডার কি না তাহাও সে বুঝিতে পারিল না; মাত্র ইহাই বুঝিল যে যুবক তাহাকে ভাল বাসে। কিন্তু তাহাতে কি? থারসেনডা ব্যতীত গ্রীসের আরও অনেক যুবক ত' তাহাকে ভাল বাসে। শিরস্ত্রাণের বন্ধন খুলিতে ডরিসের হাত কাঁপিতে লাগিল; প্রাণ নব স্বামীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেও দেখিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। অবশেষে ডরিস শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিল। একি! আনন্দের আতিশয্যে ডরিসের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল; কাঁপিতে কাঁপিতে সে তাহার নবনির্ব্বাচিত স্বামীর প্রসারিত বাহুর মধ্যে পড়িয়া গেল। সে যে থারসেনডা!—সে যে তাহারই মনের মতন!

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিরাশা

আকাশের অস্তমান চন্দ্র ছাড়া আর
ঊর্দ্ধমুখী চকোরের ব্যাকুল হিয়ার
কেহ শোনে নাই বন্ধ্য আহ্বান কাতর
নিমেষে ছাইতে শূন্য পাণ্ডুর অম্বর!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পরিহাস

(গল্প)

(১)

বলবাহাদুর পাহাড়িয়া। পাহাড়েই তাহার জন্ম, পাহাড়ই তাহার বাল্যকালের লীলাভূমি, পাহাড়ের উপর বেড়াইয়া বেড়াইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বনের পাখী ধরিয়া ধরিয়া বলবাহাদুর আজ এত বড় হইয়াছে।

তাহার মনে পাহাড় ছাড়া অন্য কোন স্থানের ধারণা বড় নাই, কারণ যদিও তাহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি তবু সে নিজের গাঁ ছাড়া দেখিয়াছে শুধু দার্জ্জিলিং। সমতল ভূমির উপর যে কোন মানুষ বসবাস করে এ কথা তাহার বিশ্বাসই হয় না।

যাহারা অপেক্ষাকৃত তলদেশে বাস করে তাহাদেরও যেন সে ঘৃণার চক্ষে দেখে। জিজ্ঞাসা করিলে কেমন অশ্রদ্ধাসূচক কথায় বলে "ও নিচু-মা বৈঠতা হায়।" কারণ তাহার বাস উঁচুতে।

পাহাড়ে বাস করিয়া, চারিদিকে আকাশস্পর্শী নীরব গম্ভীরমূর্ত্তি পাহাড় দেখিয়া দেখিয়া তাহার দেহ ও মন সেই রকমই উন্নত ও গম্ভীর।

তাহার বাড়ীটি অতি ক্ষুদ্র কুটীর মাত্র। পাহাড়ের গায়ে ঠিক মাতার ক্রোড়ে শিশুর মত লাগিয়া রহিয়াছে। চারিদিকে বড় বড় সাল গাছ দিন রাত্রি হাওয়ায় সোঁ সোঁ করিতেছে। বাড়ীর ধারেই একটা ঝরণা—কোন অজানা জলাশয় হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে নির্ম্মল জল-রাশি বহন করিতেছে। পাহাড় প্রায় সব সময়েই মেঘে ঢাকা থাকে। যখন একটু পরিষ্কার হয় তখন সূর্য্যের আলোয় ঝরণার জল চকচক্ করে আর সেই উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব বাহাদুরের ক্ষুদ্র কুটীর-গবাক্ষে প্রতিফলিত হয়।

এ সংসারে বাহাদুরের কেহ নাই—আছে কেবল তাহার এক মাত্র সাত বৎসরের একটি মেয়ে।

সে তাহার "নানী"। বাহাদুর তাহার উন্নত বিশাল বুকের মাঝে তাহার বলিষ্ঠ দেহাবরণের মধ্যে যেটুকু দয়ামায়া রাখিত সে-সমস্তটুকুই এই নানীর জন্য। জগতে সে কাহাকেও খাতির করিত না—তাহার সহিত যদি কেহ কখনও চড়া কথা বলিয়াছে তবে আর তাহার মাথার ঠিক থাকিত না। একবার এক সাহেব এখানে চা-বাগান দেখিতে আসিয়াছিল। বলবাহাদুর তখন সেই বাগানের কুলির সর্দ্দার ছিল। উগ্রমস্তিষ্ক সাহেব একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া বাহাদুরকে মারিতে উদ্যত হইয়া-ছিল—কারণ তাহাকে সে ভাল করিয়া সেলাম করে নাই। সাহসী বলিষ্ঠ পাহাড়িয়া সে অপমান সহ্য করিল না। নিজের কোমর হইতে কুকরী টানিয়া বাহির করিল—সাহেব ত পলাইয়া বাঁচে। সেদিন হইতে বলবাহাদুর চা বাগানের কাজ ছাড়িয়া দিল। এত উগ্র, এত কঠিন, তবু তাহার "নানীর" কাছে তাহার কোমলতার শেষ থাকিত না। প্রচণ্ড পাষাণস্তূপের গভীরতম প্রদেশেও ঝরণার জলধারার মত তাহারও দয়ার শেষ থাকিত না।

(২)

চায়ের বাগানে কাজ ছাড়িয়া দেওয়া অবধি বাহাদুর এখানে এক বাঙ্গালীর ভৃত্যের কাজ করিতেছে। বাঙ্গালী বাবুটি আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া এই দূর পার্ব্বত্য প্রদেশে চা বাগানের কেরানীর কাজ লইয়া আসিয়াছেন—এখানে আসিয়া এই ভৃত্যটিকে পাইয়া তিনি তাহাকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইয়াছেন। পাহাড়িয়ার কর্ম্মক্ষমতায় তিনি সন্তুষ্ট হইতেন, তাহার আগ্রহ দেখিয়া প্রীত হইতেন, তাহার সরলতা ও সততা দেখিয়া তাহাকে ভাল বাসিতেন। বাহাদুরও প্রাণপাত করিয়া প্রভুর সেবা করিত, ভক্তিও করিত। সকাল ৭ টার সময় বলবাহাদুর বাবুর বাড়ী কাজে যাইত, দুপুর বেলা একবার খাইতে বাড়ী আসিত; আবার যাইত, সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিত। বলবাহাদুর নানীকে কোথায় পাইয়াছে তাহা কেহ জানে না, সে কখনও বিবাহ করে নাই। কেহ কেহ বলে উহাকে সে কুড়াইয়া পাইয়াছে। যাহা হউক সকলেই জানিত যে "নানী" তাহার কন্যারও অধিক। বাহাদুরের কুটীরখানি অতিশয় সাধারণ রকমের, পাতার ছাওয়া চালে কাঠের খুঁটির বেড়া দেওয়া। সেই কুঁড়েখানির ভিতর সে রাত্রিটুকু তাহার নানীকে বুকে লইয়া কাটাইত। ঘরের আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই। রাঁধিবার আয়োজন কিছু আছে।

ঘরের কোণে দড়িতে বাহাদুরের একটা পুরাণো পাইজামা আর নানীর একটা কোর্ত্তা ও একটা লালরঙের ওড়না ঝুলে। কতদিন হইতে ঝুলিতেছে তাহা বলা যায় না, তাহার উপর বেশ ধূলা জমিয়াছে। কাঠের দেওয়ালে দুইটা বড় বড় লোহার কাঁটা মারা আছে। তাহার একটাতে একখানা প্রকাণ্ড কুকরী সমস্ত দিন রাত্রি ঝুলিত; অপরটায় বাহাদুর বাড়ী আসিয়া তাহার নিজের কুকরীখানা ঝুলাইয়া রাখিত। যে দিকে রাঁধিবার আয়োজন তাহার অপর দিকে একখানা বাঁশের খাটিয়া পড়িয়া থাকিত। এগুলি তাহার ঘরের মধ্যে বেশ গুছানো থাকিত—সে ভার নানীর উপর। সকাল বেলায় বাহাদুর যখন ভুট্টা খাইয়া কাজে বাহির হইয়া যাইত তখন "নানী" খানিক দুর তাহার সঙ্গে যাইত এবং পাহাড়ের আঁকা বাঁকা রাস্তায় যখন বুড়া অদৃশ্য হইয়া যাইত তখন সে তাহার শূন্য কুটীরখানিতে শুষ্ক মুখে ফিরিয়া আসিত, আবার যতক্ষণ সে বুড়াকে না দেখিত ততক্ষণ তাহার মুখে হাসি ফুটিত না। ম্লান মুখে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া সে কাজে লাগিত—পাহাড়িয়ার সাত বৎসরের মেয়ে বলিয়া সে বালিকা ছিল না—তাহার শারীরিক ক্ষমতা তাহার বয়সের অপেক্ষা ঢের বেশী—সে সংসারের সমস্ত কাজ করিত—সে সমস্ত ঠিকঠাক্ করিয়া দুপুর বেলার আহারের জন্য ভুট্টা গুছাইয়া রাখিত। বাহাদুর তাহাকে রাঁধিতে দিত না, কি জানি বিপদ ঘটিতে পারে। কাজেই সে সমস্ত আয়োজন করিয়া বসিয়া থাকিত, বাহাদুর কর্ম্মক্লান্ত হইয়া যখন ফিরিয়া কুটীর অভিমুখে আসিত তখন দেখিত তাহার "নানী" অর্দ্ধেক পথে আসিয়া হাঁ করিয়া তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই সে তাহার ক্ষুদ্র শিশুহৃদয় খুলিয়া দিয়া ছুটিয়া আসিত। বাহাদুর তাহাকে তাহার বিশাল বক্ষে তুলিয়া কী অপূর্ব্ব শান্তিলাভ করিত কে জানে। তাহাকে কোলে করিয়া সে কুটীর পর্য্যন্ত লইয়া আসিত।

দুপুর বেলায় আহারাদি করিয়া যখন বাহাদুর পুনরায় কাজে যাইত তখন নানীর বড় ভাল লাগিত না। সকাল বেলার প্রফুল্লতা মুছিয়া চারিদিকে মধ্যাহ্নের নীরব গাম্ভীর্য্য যখন তাহাদের সেই পার্ব্বত্য প্রদেশটিকে ছাইয়া ফেলিত তখন নানীর বড় কষ্ট হইত। সে কোন কোন দিন তাহার বাপের সহিত বাবুর বাড়ী যাইত, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই সে একলা থাকিত। কারণ তাহার কুটীরটি ক্ষুদ্র বলিয়া কি গৃহ নহে। সে উহা অরক্ষিত রাখিয়া কোথাও যাইতে রাজি ছিল না। কাজেই সে অধিকাংশ সময়ই একাই থাকিত। দুপুর বেলায় অবশিষ্ট কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া নানী একা একা বসিয়া প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িত।

(৩)

বাঙ্গালা দেশে অসংখ্য-কেরানীকুল-তারণ রেলি ব্রাদার্স থাকিতে নীরদ বাবু যে কোন্ লোভে এই পাহাড়ের মধ্যে আসিয়া ৪০৲ টাকায় পড়িয়া আছেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তিনি শুধু চা আফিসের কেরানী নহেন, সরকার ম্যানেজার খাজাঞ্চী ইত্যাদি সমস্ত নামেরই তিনি অধিকারী। বাগানের চা পাতা উঠান হইতে আরম্ভ করিয়া চা প্যাক করিয়া চালান দেওয়া, কুলির হিসাব রাখা, মাহিনা দেওয়া, খরচপত্র টাকা কড়ি আদায় ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সমস্তই নীরদ বাবুকে করিতে হয়। তবে বাঙ্গালী যেখানেই থাকুক বাঙ্গালী মানে "বাবু", "বাবু" মানে "কেরানী", কেরানী মানে ১৫ হইতে ঊর্দ্ধতম ৫০ টাকা বেতনভোগী এক প্রকার জীব। কাজেই সকলে জানিত নীরদ বাবু কেরানী। সাহেব তাঁহাকে কখনও বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিয়া মানিয়া লইতে রাজি হইত না। তাহার কাছে নীরদ বাবু হুকুম অনুসারে কাজ করিবার সজীব যন্ত্র মাত্র।

কাজের ভিড়ে নীরদ বাবু সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন দিন এক ঘণ্টাও বিশ্রাম করিবার সময় পাইতেন না। আহারাদি করিবার সামান্য অবকাশ থাকিত; তাহাও এত অল্প যে যেদিন স্নান করিতেন সেদিন আর পেট ভরিয়া খাওয়া হইত না। বাহাদুর তাহার প্রভুর দুর্দ্দশা দেখিত এবং নিজের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমস্তই বেশ বুঝিতে পারিত। বাড়ীতে নানীকে ছাড়িয়া আসিয়া তাহার হৃদয়ের সমস্ত একাগ্রতা দিয়াই সে প্রভুর সেবা করিত। নীরদ বাবু যখনই তাহাকে ডাকিতেন তখনই

সে যেন উত্তর দিবার জন্য এবং আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত।

সকাল বেলায় নীরদবাবু যখন আফিস যাইবার ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া চোখ মেলিতেন তখন দেখিতেন তাঁহার ভৃত্যটি মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে।

বাবু ডাকিলেন—"বাহাদুর।"

উত্তর হইল "বাবু সাব।"

"পানি দেও।"

"বহুৎ আচ্ছা।"

ঝড়ের মত উড়িয়া সে কাজ করিত,—আদেশ মাত্রই অমনি কাজ সম্পন্ন। বাঙ্গালীর মত উঠিত নড়িতে বসিতে তাহার মাস কাবার হইত না। বাহাদুর কার্য্য-তৎপরতা ও কার্য্যক্ষমতার মূর্ত্তিমান পরিচয়।

রবিবার দিন বাবুর ছুটি থাকিত। সেই দিন বাহাদুর তাহার বাবুর সহিত অনেক সুখদুঃখের কথা বলিত। আর নীরদবাবু শুনিতে শুনিতে তাহার প্রভুভক্ত ভৃত্যটির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কথা ত বলিত তাহার মাথা আর মুণ্ড, জগতে সে ভাবিত কেবল একজনের জন্য এবং কথাবার্ত্তা সব সেই এক জনের সম্বন্ধেই।

"আমার একটা নানী আছে।"

বাবু—"একদিন আনিস, আমি তাকে দেখব।"

বাহাদুর একটু আশ্বাস পাইয়া বেশ রসাইয়া রসাইয়া তাহার নানীর কথা বলিতে আরম্ভ করিল—বলিল—"বড় ভাল আছে বাবু। এমন ভাল নানী আমি দেখেছে না" বলিয়া যেন সে বেশ একটু আনন্দ পাইল।

কঠোর বাহুবলের মধ্যে কোমলতার স্নিগ্ধ প্রস্রবণ দেখিয়া নীরদবাবুর কর্ম্মক্লান্ত কেরানীজীবনেও একটু বেশ আনন্দ হইল, স্নেহ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার বিয়ে দিবি না?"

কথাটা শুনিয়া বাহাদুর খানিক চুপ করিয়া থাকিল। তাহার মুখ চোখ ক্রমে নীল হইতে আরম্ভ হইল। অনেক দিন সে এ কথা ভাবিয়াছে। সে ভাবিয়াছে তাহার নানীর বিবাহ দিলে তাহার কী হইবে। সে ক্ষণমাত্রও এ চিন্তাটা মনোমধ্যে রাখিতে পারিত না যে এমন দিনও আসিতে পারে যখন সে এবং তাহার নানী দুই জন অনেক দিনের জন্য পরস্পরকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে। ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্থির করিয়াছে যে বিবাহ দিলেই নানীকে পরের ঘরে যাইতে হইবে—অতএব তাহার বিবাহ দেওয়া হইবে না—তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার জন্য সে ভাবিয়া রখিয়াছে, যে তাহার নানীকে বিবাহ করিতে চাহিবে তাহার মাথাটি কুকরী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিবেই করিবে।

বাবুর প্রশ্নে সেই সমুদয় কষ্টকর চিন্তা বাহাদুরের মনে উদয় হইতে লাগিল। তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া শেষে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার কঠোর গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল—তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া সংযত হইয়া বলিল "না বাবু। কভি নেহি। সাদী দিবো না। হামার নানীকে ছোড়তে পারবে না বাবু।"

নীরদবাবু সব দেখিলেন ও বুঝিলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশের নির্ম্মম দৃশ্যের মাঝে এই পাহাড়িয়ার চোখের জল তাঁহার মনে অপার শান্তি আনয়ন করিল। বাঙ্গালা দেশের সুদূর পল্লীতে নিজের "নানীর" মুখখানি মনে পড়িয়া দেখিতে দেখিতে দু ফোঁটা চার ফোঁটা অশ্রু শেষে অজস্রধারায় ঝরিয়া বাবুরও বুক ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

(৪)

মে মাস। চায়ের বাগানে কাজের ভারি ভিড়। রোজ প্রায় ১০০০ পাউণ্ড চা প্যাক করিয়া চালান হইতেছে। সকাল বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বাগানে কুলিরা চায়ের পাতা উঠাইতেছে। সন্ধ্যার পর হইতে আলো জ্বালিয়া কাজ করিয়াও তাহারা কাজের শেষ পাইতেছে না। নীরদবাবুর মাথার ঘাম পায়ে পড়িতেছে। কোন্ সকালে উঠিয়া গুদামঘরে গিয়া বসিয়াছেন, আর বেলা ১২-১টা ঠিক নাই কখন মুহূর্ত্তের জন্য বাড়ী আসিবেন, দুটা কাঁচা পাকা মুখে দিয়া আবার ছুটিবেন।

এ প্রদেশে এই কোম্পানীর মত এত বড় চায়ের বাগান আর কাহারও নাই। দার্জ্জিলিং চা বিখ্যাত এবং সেই দার্জ্জিলিং চায়ের প্রধান আড়ৎ এইখানে। সে দিন বেলা প্রায় ১১টা। নীরদবাবু গুদামের ধূলা মাখিয়া হাতে কাগজ পেন্সিল লইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চায়ের বাক্স প্যাক

করাইতেছেন। আজ প্যাকিংএর দিন, তাই ভোর হইতে প্রায় ৫০০ বাক্স চা প্যাক করা হইয়াছে, এখনও যে কত বাকী আছে তাহার শেষ নাই। কাজের তাড়নায় নীরদ বাবু খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। পাহাড়িয়া কুলীদের সঙ্গে সমানে কাজ করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ বড় সাহেবের বেহারা আসিয়া বলিল "সেলাম বাবু, বড়া সাব বোলাতা হায়।" নীরদবাবুর প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। না জানি কী অনির্দ্দিষ্ট বিপদ তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তা না হইলে এই অসময়ে সাহেবের কাছে ডাক পড়িবে কেন?

পাছে দেরী হয় এই ভয়ে সেই অবস্থাতেই বেহারার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন। সাহেবের বাঙ্গালায় যাইতে যাইতে সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেহারা! সাহেব কি করছেন?"

"আভি ত সাব বাহারমে খাড়া দেখা থা।"

ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ম্লান মুখে ধীরে ধীরে বেহারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। বেহারা বলিল "সাব ত আজ বহুৎ খাপা হ্যায়।"

"কেন? তুমি কিছু শুনেছ কি?"

"হাম ত নেহি শুনা হ্যায়, লেকিন বোলতা থা কি আফিসমে কাল বহুৎ হিসাবকা গোলমাল হুয়াথা উসবাস্তে।"

নীরদবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। "এঁ্যা হিসাবের গোলমাল?"

"হাঁ বাবু; ঐসৈ ত শুনা হ্যায়—"

সাহেবের বাঙ্গালায় আসিয়া নীরদ বাবু দেখেন সাহেব উগ্রমূর্ত্তিতে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

যথাসাধ্য দীর্ঘ সেলাম করিয়া নির্জীব নীরিহ বাঙ্গালী নীরদবাবু কুকুরের মত একদিকে দাঁড়াইলেন। সাহেব ডাকিলেন "নীরদবাবু!"

যথাসাধ্য সম্মানসূচক স্বরে নীরদবাবু উত্তর করিলেন "হুজুর!" সমস্ত ক্ষণ অবিশ্রাম খাটিয়া এ পর্য্যন্ত মুখে জল পর্য্যন্ত দেন নাই, তাহার উপর এই অজানিত বিপদের আশঙ্কায় নীরদবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল।

সাহেব ক্রোধগম্ভীর স্বরে পুনরায় বলিলেন "নীরদ-বাবু! তোমার একি কাজ?"

নীরদবাবু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া যূপকাষ্ঠের ছাগশিশুর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উত্তর না পাইয়া সাহেব উত্তরোত্তর স্বর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন—"ক্যাশ হইতে কাল রাত্রে ৫৫৩৲ টাকা চুরি গিয়াছে। কে লইল শীঘ্র বল।"

"পাঁচশ তিপ্পান্ন টাকা চুরি গিয়াছে! সর্ব্বনাশ!"

নীরদ বাবুর দম আটকাইবার জোগাড়। বাবুর এ অবস্থা দেখিয়া বুঝি সাহেবের দয়া হইল। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন—"আচ্ছা তোমাকে আমি জেলে দিব না, তুমি বল কে নিয়াছে।"

নীরদ বাবু শুষ্কমুখে শূন্য দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে চাহিয়া জীবনের সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া কোনো মতে বলিতে পারিল "সাহেব! আমি জানি না।"

ভালমানুষের কাল আর নাই দেখিয়া সজোরে মাটিতে বুট ঠুকিয়া সাহেব বলিলেন—"সে আমিও জানি না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি ৫৫৩৲ টাকা ক্যাশে না মিলাইতে পার তবে শুধু তোমার চাকরী যাইবে না—তোমাকে জেলে দিব। যাও—এখন হইতে ২৪ ঘণ্টা সময় দিলাম।"

দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সাহেব পুনরায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "যাও।"

অর্দ্ধস্ফুট স্বরে নীরদ বাবু বলিতে যাইতেছিলেন "সাহেব—আমি—"

ক্রোধান্ধ সাহেব তাঁহার পদতলস্থিত ভূমি বাঙ্গালীর মাথা মনে করিয়া পুনরায় সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "আমি কিছু শুনিতে চাই না—যাও। বেহারা!"

গত দিবস যখন হিসাব মিলান হয় তখন সাহেবের নিজের কাছে যে একখানা ৫৫৩৲ টাকার চেক ছিল সেখানা তহবিলে রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রাত্রিতে মদের আতিশয্যে যখন সাহেব জ্ঞানশূন্য তখন মেমসাহেব সেখানা সাহেবের পকেট হইতে দিব্য সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে সাহেবের যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলেন পকেটে চেক নাই। তহবিলে রাখিয়াছেন মনে করিয়া আফিসে গেলেন। সেখানে দেখেন

নাই। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য স্থির করার পূর্ব্বে একবার বাঙ্গালী কেরানীকে দুচার দাবড়ী দিয়া কি ফলাফল হয় দেখিবার জন্য সাহেব নীরদ বাবুকে ডাক দিয়াছিলেন।

সজোরে মাটিতে বুট ঠুকিয়া বাবুকে বেশ চোর বানাইয়া দিয়া সাহেব হাসিমুখে বাঙ্গালার ভিতর আরাম-কেদারায় শুইয়া শুইয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন "ড্যাম বাঙালী! দুই তাড়ায় পাঁচশ টাকার কাজ আদায় করা গেল—এমন না হইলে বাঙ্গলা দেশ!"

(৫)

প্রহৃত সারমেয়ের মত সাহেবের বাঙ্গালা হইতে নীরদ বাবু একেবারে বাসায় ফিরিলেন। টাকা চুরির ব্যাপারটা তাঁহার নিকট স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাই বলিয়া ত উদ্ধার নাই, এ যে সফল স্বপ্ন। ছার ৪০ টাকার জন্য দূরদেশে আসিয়া অপমানিত লাঞ্ছিত ক্ষতিগ্রস্ত। নীরদ বাবুর মনে মনে জীবনে ধিক্কার জন্মিল। পাহাড়ের প্রকাণ্ড উঁচু রাস্তা দিয়া আসিতে আসিতে এক একবার মনে হইতে লাগিল "এখান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এ অবমাননা লাঞ্ছনার শেষ করি। আর এ জীবনধারণে কাজ নাই। ৫৫৩ টাকা কোথায় পাইব? ৪০ মাহিনা পাই। খাই-খরচ বাদে যাহা থাকে বাড়ীতে এক বৃহৎ সংসারের ভরণপোষণের জন্য পাঠাইতে হয়। ৫০০ শত টাকা কখনও এজীবনে জমাইতে পারিব কিনা সন্দেহ। কিন্তু এ টাকা না দিলে ত চাকুরী থাকিবে না—শুধু তাই কেন? ইচ্ছা করিলেই সাহেব জেলে দিতে পারে।" মনের মধ্যে এ সমস্ত আলোচনা করিতে করিতে নীরদ বাবুর মনে হইতে লাগিল আকাশ যেন তাঁহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। চারিদিকের উচ্চ গিরিশৃঙ্গ যেন টলিয়া পড়িতেছে। কি উপায়ে এখন টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে সেই চিন্তা তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিল—"জগতে এমন কোন বন্ধু নাই যে চিঠি লিখিয়া বা টেলিগ্রাফ করিয়া পাঁচশ টাকা আনাই। তাই যদি থাকিবে তবে আজ এ দুর্দ্দশা কেন?"

ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিলেন—প্রাণের ভিতরটা যেন হু হু করিতে লাগিল। এ সময়ে এমন কেহ নাই যে একটা বুদ্ধির কথা বলিয়া সাহস দেয়। ইচ্ছা হইল একবার চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকেন। হঠাৎ মনে পড়িল বাহাদুর আছে। বাটীর চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিলেন "বাহাদুর!"

বাবুর আসিতে দেরী হইতেছিল দেখিয়া বাহাদুর একটু ব্যস্ত হইয়াছিল। বাবুর ডাক শুনিবা মাত্র গালভরা উত্তর দিল "বাবু সাব।"

সমস্ত পৃথিবী নীরদ বাবুকে উপেক্ষা করিলেও তাঁহার বাহাদুরের কাছে তাঁহার সম্মানের অভাব নাই। সাহেবের কাছে অপমানিত হইয়া নীরদ বাবুর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে এই প্রভুভক্ত পাহাড়িয়ার কণ্ঠস্বর যেন অপার শান্তি আনয়ন করিল, প্রাণের আবেগে একবার ইচ্ছা হইল তাহার বলিষ্ঠ দেহটা বুকে জড়াইয়া ধরেন।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একখানা চেয়ারে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। বাহাদুর কোন দিন বাবুর এরকম বৈলক্ষণ্য দেখে নাই। সে আজ একটু কেমন হইয়া গেল। তাহার মনে হইল হয় ত বাবুর অসুখ করিয়াছে। কাছে আসিয়া বলিল—"বাবু অসুখ করেছে নাকি?"

"না বাহাদুর, অসুখ করেনি।"

তাঁহার নামে যে ঘোর দুরপবাদ অর্পিত হইয়াছে তাহা তাঁহার পরম ভক্ত ভৃত্যের কাছেও বলিতে কষ্ট বোধ হইতেছিল। ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া এবং আশু-বিপদের চিন্তায় তাঁহার মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছিল।

"বাবু, দেশসে কি কোন খবর আইয়েছে?"

"না বাহাদুর, দেশ থেকে কোন খবর আসেনি।"

"তব আপনার কি হইয়েছে?"

"আমার মাথা হয়েছে, আমার মুণ্ড হয়েছে!" বলিয়া নীরদ বাবু চৌকি ছাড়িয়া বিছানার উপর মাথায় হাত দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বাহাদুর কোন বিশেষ কারণ বুঝিতে পারিল না। খানিক ভাবিয়া কি উপায়ে বাবুকে সুস্থ করা যাইবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। বলিল "বাবু স্নান করবেন না?"

নীরদবাবু চুপ করিয়াই রহিলেন।

"বাবু—জল গরম করিয়েছি।"

"আচ্ছা থাক, আমি একটু পরে চান করব।"

বাহাদুর মনে করিল এ অবস্থায় বাবুর কথা-মত কাজ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়, তাই জোর করিয়া তাঁহাকে চান করাইবার ও খাওয়াইবার জন্য বলিল—"বাবু! ভাত তৈয়ারী অনেক আগে করিয়েছি। ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে। এই তেল লিন" বলিয়া তেলের বাটি সরাইয়া দিল।

বিপদে মানবের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে—নীরদবাবুরও তাই হইয়াছিল। যত বেলা পড়িতেছিল ততই মনে মনে হতাশার ঘোর দুশ্চিন্তা তাহার মায়াজাল বিস্তার করিতেছিল। যখন মনে পড়িল যে যাহাই হউক না কেন না-খাইলে ত কোন উপকার হইবে না—তবে মিছামিছি কেন ঘোর মানসিক কষ্টের উপর আবার শারীরিক কষ্ট বাড়াই। তখন স্নান করিয়া দুটো খাইবার জন্য উঠিলেন।

বাহাদুর আহ্লাদে ব্যস্ত হইয়া সবই মুহূর্ত্ত-মধ্যে জোগাড় করিয়া দিল।

সে দিন আর আফিস যাওয়া হইল না। আর আফিসই বা কার? "যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫৫৩্ টাকা না দিতে পার তবে শুধু তোমার চাকরী যাইবে না তোমাকে জেলে দিব" সাহেবের এই কথাগুলা নীরদবাবুর কানে তখনও বাজিতেছিল।

ভাবিতে ভাবিতে দিনটা কাটিয়া গেল, কোন একটা উপায় স্থির হইল না।—সন্ধ্যার সময় নীরদবাবু একখানা চৌকিতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ছিলেন—বাহাদুর রোজ যেমন বাবুর কাছে বলিয়া রাত্রিতে বাড়ী যায় আজও সেই রকম বলিতে আসিলে নীরদবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন "বাহাদুর।"

"বাবু।"

"আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

"কি হয়েছে বাবু?" বাহাদুর অতি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"কাল আমাদের গুদাম থেকে ৫০০্ টাকা চুরি গেছে। সাহেব সেই টাকা আমার কাছ থেকে দাবী করছে। যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে টাকা না দিতে পারি তবে আমায় জেলে দেবে বলছে। আমি টাকা কোথায় পাব? আমায় জেলে যেতে হবে।"

এ সব শুনিতে শুনিতে বাহাদুরের মুখের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইল। সে খানিকটা কি ভাবিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু! কব চুরি হয়েছে?"

"কাল রাত্রিতে।"

"কত রুপিয়া?"

"পাঁচ-শ।"

বাহাদুর খানিক চুপ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল "বাবু!"

"কি বাহাদুর?"

"বাবু।" পুনরায় বাহাদুর যেন একটা কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছে অথচ সে পারিতেছে না। শুধু ডাকিল "বাবু!"

নীরদবাবু এবার বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখেন সন্ধ্যার আলোয় তাহার মুখখানা যেন অস্তগামী সূর্য্যের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চোখ ফিরিল না—তাহার মুখের দিকেই তাকাইয়া রহিলেন। বাহাদুর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল "বাবু—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, হামি আপনার চাকর বলে ঘৃণা করবেন না—সচ্ কথা বলবেন"—

"কি কথা বাহাদুর? বল আমি সত্য কথাই বলব।"

"বাবু—আপনি এ টাকা নিয়েছেন কি না বলুন—যদি নিয়ে থাকেন ত আমি এই শেষ সেলাম করে চল্লুম—আমার ঘরে একটা বেটী আছে তাকে নিয়ে যতদিন পারি দেশ দেশ ঘুরব আর আপনার কাছে এক মিনিটও থাকব না। আর যদি" বলিতে বলিতে বাহাদুরের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল "আর যদি আপনি টাকা না নিয়ে থাকেন ত বলুন—কোন সাহেব আপনাকে চোর বলেছে? হামার কাছে যতক্ষণ কুকরী আছে ততক্ষণ হামি সাহেবকে ভয় করি না—হামার মনিবকে যে ঝুটমুট চোর বানাবে তার শির তোড়ি ডালব। এতে জান থাকে আচ্ছা—যায় বহুত আচ্ছা" বলিতে বলিতে বাহাদুর নীরদবাবুর পা দুটি জড়াইয়া ধরিল।

একি? মুহূর্ত্ত মাত্র আগে যে নিজের অবস্থা এত

গ্রীক-দেবতা মার্কারী বা দেবদূত।

প্রাচীন গ্রীক মর্ম্মরমূর্ত্তির প্রতিলিপি।

যীশু খৃষ্টের আশীর্ব্বাদ।

থরওয়াল্‌ড্‌সেন্‌ কৃত প্রস্তরমূর্ত্তির প্রতিলিপি

U. RAY & SONS,
100, Gurpur Road, Calcutta
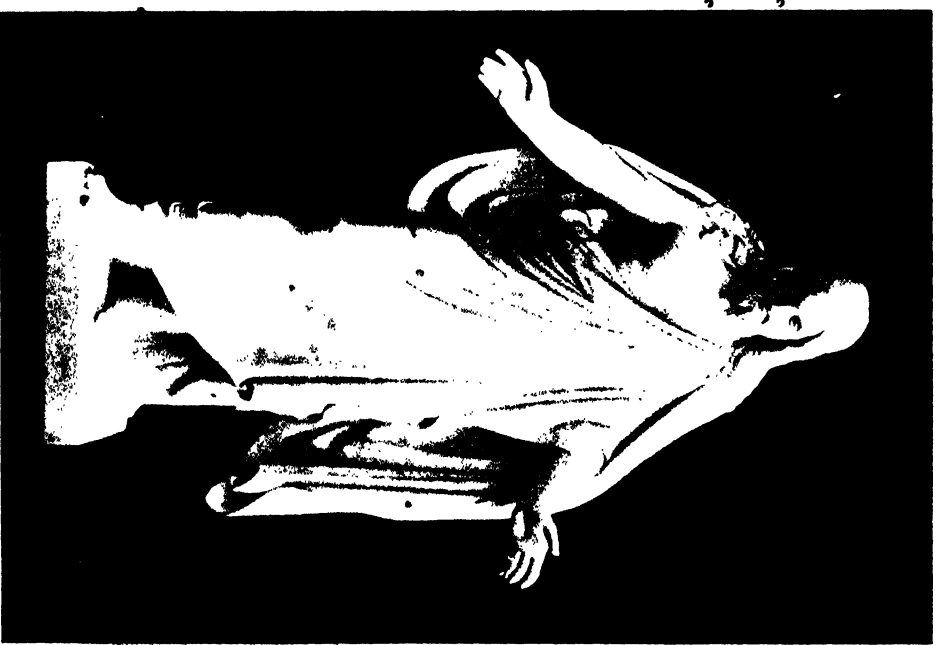
অসহায় মনে করিতেছিল তার এত সহায়—নীরদবাবু তাহার আদরের চাকরটিকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন—আর সামলাইতে পারিলেন না, পাহাড়িয়ার এই দেবত্ব দেখিয়া তাহার চক্ষু হইতে তপ্ত অশ্রু বাহাদুরের স্কন্ধ সিক্ত করিতে লাগিল—বলিলেন "বাহাদুর—তুমি যদি বিশ্বাস কর ত সত্য কথা বলি, আমি ঐ টাকার কথা কিছুই জানি না।"

বাহাদুর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "ধছৎআচ্ছা—হামরা বাবু কভি নেহি চোরী করবে। আব হামি দেখব কোন্ সহাব হামার বাবুকে চোর বানিয়েছে।"

নীরদ বাবু দেখিলেন বাহাদুর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। শান্ত করিবার জন্য একটু জোর করিয়া বলিলেন—"বাহাদুর—ওরকম করো না। ওতে কোন কাজ হবে না।"

বাহাদুর কোন উত্তর করিল না।

আরও খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "বাবু হামি যাচ্ছি। নানী একেলা আছে—সেলাম বাবু।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বাহাদুরের এই অসাধারণ ভাব দেখিয়া নীরদবাবু কিছু বুঝিতে পারিলেন না—যাইবার সময় তাহাকে আর এক বার ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যেন সে উত্তেজিত হইয়া কোন কাজ না করে।

ঘোর মানসিক দুশ্চিন্তায় নীরদবাবু ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন—রাত্রির খাবার যাহা ছিল খাইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। কল্য প্রাতে তাঁহার কি হইবে এই ভাবিতে ভাবিতে এবং কালকের কারাগারের যন্ত্রণা ও তজ্জনিত অবমাননা লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশার নানারূপ বিভীষিকা মনে মনে অঙ্কিত করিতে করিতে নীরদবাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি তখন কত হইয়াছে কে জানে। ঘোর অন্ধকার। নিশাচর পশুর মত নির্বিঘ্নে সমস্ত পাহাড়টাতেই মেঘেরা রাজত্ব করিতেছে। বৃষ্টি পড়ে নাই, তবে শীঘ্র জল আসিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাহাদুর এই সময় বিছানা ছাড়িয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় বাবুর বাড়ী হইতে গিয়া অবধি বাহাদুর কেবল এক কথা ভাবিতেছে—তার বাবুর কি হইবে? সাহেবকে মারিয়া ফেলিলে ত আর বাবুর উপকার করা হইবে না—তাহাতে বরং সে এবং তাহার বাবু উভয়েরই বিপদ বেশী রকম হইয়া পড়িবে। কাজেই যখন উত্তেজনা কাটিয়া তাহার মন শান্ত হইল তখন সে কি উপায়ে বাবুকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

মনে এই কথা চিন্তা করিতে করিতে বাহাদুর বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রোজ সন্ধ্যার সময় সে বাটী আসিয়া তাহার নানীর সহিত কত রকম গল্প করিত। তাহাকে বলিত ভাল কোর্ত্তা লাল ওড়না এসব দার্জ্জিলিংএ পাওয়া যায় এবং সে একদিন তাহার নানীকে দার্জ্জিলিংএ লইয়া গিয়া পছন্দমত নানা রকম কাপড় চোপড় কিনিয়া দিবে, এসব কথা বলিয়া তাহাকে আহ্লাদিত করিত। নানী একমনে শুনিয়া শুনিয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিত "বাবা দার্জ্জিলিং কত দূর?"

বাহাদুর নানীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার বালসুলভ আগ্রহাতিশয্য আরও বাড়াইবার জন্য বলিত "এই ত দার্জ্জিলিং। বেশী দূর নয়।" নানী কেবল জিজ্ঞাসা করিত—"বাবা সেখানে আর কি পাওয়া যায়?"

বাহাদুর নানা রকম জিনিষের নাম করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত সে কোনটা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসে?

জামা কাপড় খেলনার কথা শুনিয়া নানী তত সন্তুষ্ট হইত না, তাহার মনে হইত জামা কাপড় চাইতে যদি ভাল জিনিষ কিছু পাওয়া যায় তবে সে তাহাই পাইবে। কিন্তু যখন অনেক জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল তাহার মনের মত জিনিষ সেখানে নাই, তখন সে স্থির করিল আচ্ছা একটা লাল কোর্ত্তাই লওয়া যাইবে।

আজ কদিন হইল বাহাদুরের সহিত তাহার কথা স্থির হইয়াছে যে সে একটা লাল কোর্ত্তা চায়। কাজেই প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাহাদুরকে সে বলিত, "কই বাবা! আমার কোর্ত্তা কই?" বাহাদুর বলিত—"বেটী! আমি শীঘ্রই যাব।" দিন স্থির করিবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করিত "কবে যাবে?"

বাহাদুর একটা অনির্দ্দিষ্ট দিন বলিয়া দিত—নানী শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইত এবং রোজ রাত্রিতে মনে করিত কাল তার কোর্ত্তা আসিবার দিন।

আজ কিন্তু বাহাদুরের কাছে নানী একটাও কথার উত্তর পাইল না। সে ভারী দুঃখিত হইয়া বলিল—"বাবা! তোমার কোর্ত্তা চাই না।" বাহাদুর কি ভাবনায় অন্যমনস্ক ছিল, এ কথা শুনিয়া বলিল—

"না নানী! কাল কোর্ত্তা আনব।" নানী বলিল "ঠিক, সচ্ বাত?"

বাহাদুর বলিল "সচ্ বাত?"

(৬)

বাহাদুর যখন চায়ের বাগানে কুলীর সর্দ্দার ছিল তখন সে কিছু কিছু করিয়া টাকা জমাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য, এজগতে সে ছাড়া তাহার নানীর আর কেহ নাই, তাহার অবর্ত্তমানে নানীর জন্য একটা কিছু সম্বল করিয়া যাওয়া উচিত এই বিবেচনায় সে যাহা পারিত কিছু কিছু জমাইত। বাহাদুরের প্রতিবেশী জেঠমল্ দার্জ্জিলিংএ ব্যবসা করে। বাহাদুর অনেক ভাবিয়া তাহার টাকাগুলি জেঠমলের কাছে রাখিয়াছিল। জেঠমল সেজন্য তাহাকে সুদ দিত এবং যখনই চাহিবে তখনই ফেরৎ দিবার অঙ্গীকারও করিয়াছিল। বাহাদুরের টাকা বেশী হয় নাই, কতই বা মাহিনা? তবে মোটামোটি ৪।৫শ টাকা হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নীরদ বাবুর আকস্মিক বিপদ যখন বাহাদুরকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল তখন সে নানা রকম উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিল। কোন কিছু স্থির করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল যদি সে তাহার বাবুকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে তবেই তাহার জীবন সার্থক।

রাত্রি তখন কত কেহ জানে না। তখন ঘোর অন্ধকার। হঠাৎ বাহাদুরের মনে পড়িল "জেঠমলের কাছে ত তাহার টাকা আছে।"

একবার মনে হইল "সে টাকা ত তাহার নহে। সে ত নানীর!"

আবার মনে হইল "নানীর ভগবান আছেন।"

বাহাদুর চমকিয়া উঠিয়া শয্যা ত্যাগ করিল। রাত্রির অন্ধকার তখন ঘনাইয়া কালো কালির মত হইয়া উঠিয়াছে। সে মনে ভাবিল যদিই এ টাকা দিয়া বাবুকে জেল হইতে বাঁচাইতে হয় তবে ত আর সময় নাই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিবার কথা। টাকা ত দার্জ্জিলিংএ, এখান হইতে ১৮ মাইল দূরে। আজ রাত্রিতে না রওনা হইলে আর কাল যথাসময়ে টাকা পাওয়া যাইবে না।

বাহাদুর তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। একটা আলো জ্বালিল, দেখিল তাহার নানীর ঘুমন্ত মুখখানি যেন হাসিতেছে। সে কি ভাবিয়া সেই অবস্থাতেই নীচু হইয়া তাহার ঘুমন্ত শিশুর মুখে একটা চুমা খাইয়া লইল এবং মনে মনে বলিল "বেটীর জন্য দুইটা ভাল কোর্ত্তা আনব।"

বলিষ্ঠ পাহাড়ীরা ভয় কাহাকে বলে জানে না। কোমরে একখানা কুকরী বেশ করিয়া বাঁধিল। একবার কোষ হইতে খুলিয়া দেখিল ঠিক আছে কিনা। কুটীরের ম্লান প্রদীপের আলোয় সেটা ঝক ঝক করিয়া উঠিল। বাহাদুরের নিজের শানিত অস্ত্রে যেন বাৎসল্যস্নেহ জন্মিয়াছিল—কুকরীখানা চক চক করিয়া উঠিল দেখিয়া আপন মনেই বলিল—"সাবাস! বেটা! তোমসে হাম দুনিয়া লেনে সকতা হ্যায়।"

মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধিল। ছাতা লইল না। পাহাড়িয়া কি বৃষ্টিকে ভয় করে, বিশেষ যখন সে এমন কাজে যাইতেছে। সমস্ত সাজ ঠিক করিয়া সে সেই মুহূর্ত্তেই দার্জ্জিলিং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

বাহাদুরের বাটীর কিছু দূরে এক বৃদ্ধা বাস করিত। বাহাদুর তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া রাত্রিটা নানীর কাছে থাকিতে বলিয়া গেল।

পাহাড়ের ঘোর অন্ধকার পথে যখন বাহাদুর হন হন করিয়া চলিয়াছে তখন বেশ বৃষ্টি নামিয়াছে।

(৭)

রোজ সকালে বাহাদুর আসিয়া বাবুর মাথার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। আজ ঘুম ভাঙ্গিয়া নীরদ বাবু দেখেন বাহাদুর নাই। মনে হইল নিশ্চয় একটা কিছু গোলমাল হইয়াছে।

মনটা অত্যন্ত খারাপ। নীরদ বাবু ধীরে ধীরে আফিসে গেলেন। আফিসে গিয়া যথাযথ সমস্ত অনুসন্ধান করিলেন, সে টাকা কোথায় গেল। তহবিলের

কাগজ পত্র বারংবার নাড়িয়া চাড়িয়াও ৫৫৩ টাকার কোন হিসাব স্থির হইল না। নীরদ বাবু ক্ষুণ্ণ মনে আবার বাসায় ফিরিলেন। একবার সাহেবের কাছে যাইয়া কৃপা ভিক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল, আবার সে দিনের সেই রোষকষায়িত লোচনদ্বয় মনে পড়িয়া সাহস হইল না। বাসায় ফিরিয়া দেখেন—বাহাদুরের নানী তাঁহার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। নানী ইহার আগে আরও দুই একবার আসিয়াছিল, কাজেই সে নীরদ বাবুর কাছে অপরিচিত ছিল না। নানীর সঙ্গে সেই বৃদ্ধাও আসিয়াছিল। বৃদ্ধা আসিয়া নীরদ বাবুকে বলিল যে বাহাদুর কোন কাজে গত রাত্রে দার্জ্জিলিং গিয়াছে, অদ্যই ফিরিবে, এবং তাহার "নানী"কে বাবুর বাড়ী রাখিয়া আসিতে বলিয়াছে। তাই সে ঐ খবর দিতে আসিয়াছে।

বাহাদুরের এ সব কাণ্ড নীরদ বাবুর নিকট টাকা চুরি যাওয়া ব্যাপার অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল।

নানীকে নীরদ বাবুর কাছে রাখিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল। পাহাড়িয়ার সাত বৎসরের মেয়েকে দেখিয়া নীরদ বাবুর মনে হইতে লাগিল—পাহাড়িয়ার মেয়ের এত সুন্দর রূপ! তাহার কচি মুখখানি লাল ওড়নার পাশ দিয়া যেন লতার আড়ালে আধফুটন্ত ফুলের মত হাসিয়া উঠিতেছিল। নীরদ বাবু নানা-চিন্তা-দগ্ধ প্রাণে—নানা তাড়নার মাঝে নানীর মুখখানি হইতে যেন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইলেন। মনে হইল এ পৃথিবীটা কেবল টাকা কড়ির বিভীষিকার জন্য সৃষ্ট হয় নাই।

নানীকে কাছে ডাকিয়া নীরদ বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নানী! তোর বাবা কোথায়?" নানী বলিল "আমার বাবা দার্জ্জিলিং গেছে।"

"তোকে নিয়ে যায়নি কেন?"

"আমার লাল কোর্ত্তা আনবে বলে গেছে।"

"নানী! তোকে আমিও একটা লাল কোর্ত্তা কিনে দেবো।"

নানী তত সন্তুষ্ট হইল না। তাহার বাপের কাছ হইতে সে কোর্ত্তা চায় বলিয়া কি সকলের কাছ হইতেই চাহিবে। সে বলিল "আচ্ছা!" তবে আমার বাবা আগে আনবে, আমি দেখে বলব কি রকম আনতে হবে।"

(৮)

বাহাদুর যথাসময়ে দার্জ্জিলিং পৌঁছিয়া জেঠমলের সহিত দেখা করিল সে টাকাগুলি এক সঙ্গে উঠাইয়া লইতেছে দেখিয়া জেঠমল কারণ জিজ্ঞাসা করিল—

"বাহাদুর এত টাকা কেন নিচ্চিস, আবার সাদী করবি না কি?"

বাহাদুর হাসিয়া বলিল "হামি সাদী করবো না। একটী পূজা মানস করেছি তার জন্য খরচা করব।"

বাহাদুরের টাকা পাঁচ শয়ের কিছু বেশী ছিল। সে ৫০০ টাকা লইল। এত টাকাটা হাতে পাইয়া তাহার খুব আহ্লাদ হইল। পাছে বাবুর টাকা জমা দিতে দেরী হইয়া যায়—এই ভয়ে বাহাদুর জেঠমলের একজন বিশ্বাসী লোক ঠিক করিল এবং তাহার হাতে সে ৫০০ টাকা দিয়া তৎক্ষণাৎ নীরদবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিল। এ কাজ করার আরও এক কারণ ছিল—সে তাহার বাবুকে জানিতে দিতে চাহিল না যে সে নিজেই টাকা দিতেছে।

নির্ব্বিঘ্নে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়া বাহাদুর খুব আনন্দিত হইল। সে দিনটা দার্জ্জিলিংএর বাজার ঘুরিয়া নানীর জন্য দুইটা ভাল কোর্ত্তা ও একটা লাল ওড়না কিনিয়া লইল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাহাদুর একটু তাড়ি খাইয়া লইয়া পুনরায় বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল। নানীর কোর্ত্তা ও ওড়না দুইটা বেশ করিয়া নিজের বুকের কাছে জামার নীচে গুঁজিয়া লইল এবং বাড়ীতে নানীর হাস্যোৎফুল্ল মুখখানি মনে করিতে করিতে দ্রুতপদে পাহাড়ের বাঁকা বাঁকা পথে হন হন করিয়া চলিতে লাগিল। একটু তাড়ি খাইয়াছিল, সেজন্য পদক্ষেপ ঠিক ছিল না—আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া তাহার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না—যখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিয়াছে তখন বাহাদুর পাহাড়ের উঁচু মাথায় টলিতে টলিতে চলিয়াছে।

বেলা প্রায় ২টার সময় বাহাদুরের লোক নীরদ-

বাবুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়া পাঁচ খানা একশত টাকার নোট নীরদবাবুর হাতে দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীরদবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ টাকা কার?" সে বলিল "কার তা আমি জানি না। জেঠমল চা বাগানের নীরদ্ বাবুকে দিতে বলিয়াছে।"

"জেঠমল? সে কে?"

"দার্জ্জিলিংএর মহাজন।" নানী ইতিপূর্ব্বে জেঠমলকে দেখিয়াছে এবং সেও জানিত যে তাহার বাপ জেঠমলের কাছে কিছু টাকা জমা রাখিয়াছিল। সে ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিয়া বলিল—

"বাবু! জেঠমল আমার বাবার মহাজন। আমার বাবা জেঠমলের কাছে টাকা রাখে।"

নীরদ বাবু শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

"এ টাকা বাহাদুরের? আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার এত মহত্ত্ব, এত উদারতা? পাহাড়িয়ার বুকে এত দয়া?" নীরদ বাবু বাহাদুরের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চোখ দিয়া দু ফোঁটা অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল।

টাকাটা পাইয়া নীরদ বাবুর মনে হইল "এ পুণ্যাত্মার টাকা পাপকার্য্যে ব্যয় কখনই করিব না। এক জনের জীবনের অর্জ্জিত ধন অপব্যয় কখনই করিব না। এতে আমার জেল হয় হউক।"

অন্ততঃ নীরদ বাবু স্থির করিয়াছিলেন যে বাহাদুরের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া আগেই টাকা দেওয়া হইবে না। কাজেই তাহার সমস্ত মন বাহাদুরের আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

রাত্রির মধ্যে বাহাদুর আসিল না। বাহাদুরের বাড়ী লোক পাঠাইয়া খবর লইলেন-সেখানেও সে আসে নাই। খুব উদ্বিগ্ন হইয়া সকালবেলায় নীরদবাবু আফিস গেলেন, টাকা দিবার জন্য নহে, যেমন কাজে যান তেমনিই কাজে গেলেন। একদিন অনুপস্থিত ছিলেন, গুদামের কাজ কর্ম্ম খুব জমিয়াছে। আফিসে গিয়া দেখেন এক জায়গায় কতকগুলা কুলি সবে মাত্র কাজে আসিয়াই গল্প করিয়া সময় নষ্ট করিতেছে। নীরদ বাবু একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "এই! তোরা কি করছিস্। সকাল বেলায় গল্প করে সময় নষ্ট করছিস, আমি তোদের মজুরী কেটে নেবো।" নীরদ বাবুর পাশেই একটা কুলীর সর্দ্দার দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল "বাবু! কাল রাতে আমাদের পাহাড়ের নীচে একটা আদমী মরেছে ওরা সেই কথা বল্‌ছে।" নীরদ বাবু বলিলেন "কি হয়েছে?"

"বাবু! পাহাড় থেকে, তাড়ি খেয়ে পড়ে মরেছে।"

"কে সে?"

এক জন বলিল "বাবু! সে বাহাদুর, আপনার নফর।"

নীরদ বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন "কে? বাহাদুর?"

আর কিছু না বলিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহাদের এক জনকে সঙ্গে করিয়া সেই দিকে ছুটিলেন। প্রায় দুই মাইল দূরে একটা ঝরণা আছে। ঠিক সেই ঝরণার উপর প্রায় ৫০০ ফুট উঁচুতে যাতায়াতের রাস্তা। ঝরণার কিছু উপরে রাস্তা হইতে প্রায় ৪০০ ফুট নীচে দেখেন একটা কি পড়িয়া আছে।

নীরদ বাবুর সঙ্গের লোকটা দেখাইয়া দিল—"ঐ বাবু মুরদা গিরে আছে।"

শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া নীরদ বাবু ছুটিয়া গিয়া দেখেন—হতভাগ্য বাহাদুর তাহার নানার লাল কোর্ত্তাটা বুকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া মরিয়া রহিয়াছে।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া নীরদ বাবু পাগলের মত হইলেন। দুই হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে চীৎকার করিয়া বিকৃতস্বরে ডাকিলেন, "বাহাদুর! এই ও বাহাদুর?"

এতদিনে তাহার প্রভুভক্ত ভৃত্য আর কথা শুনিল না। বাহাদুরের মৃতদেহটা নীরবে পড়িয়া রহিল।

নীরদ বাবুর সঙ্গে যে লোকটা আসিয়াছিল সে তাঁহাকে জোর করিয়া ফিরাইয়া লইয়া গেল। এ দৃশ্য দেখিয়া তাহারও দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

অতি কষ্টে শোকসম্বরণ করিয়া নীরদ বাবুকে সে বাসায় পৌঁছাইয়া দিল। নীরদ বাবুর চোখে আর জল নাই। মনে হইল এখন হৃদয়ে বল দরকার। মৃত ব্যক্তিটার একটা অসহায়া কন্যা রহিয়াছে। তাহাকে দেখা আবশ্যক। এ সব মনে করিয়া নীরদ বাবু দৃঢ় মনে বাসায় আসিলেন।

নানী কাল হইতে বাড়ী যায় নাই। সে তাহার বাপের অবিদ্যমানে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া ছিল। নীরদ বাবু ঘরে ঢুকিতেই সংবাদ পাইবার জন্য ছুটিয়া আসিল।

নানীর মুখখানা দেখিয়া নীরদ বাবুর মনে হইল সে কাঁদিতেছে, মনে হইল খুব কাঁদিতেছে—মনে হইল বাপের জন্য কাঁদিবে না? কাঁদিবে বৈকি? আহা বাহাদুরের জন্য কাঁদিবে না?

নীরদ বাবু বলিয়া উঠিলেন "নানী কাঁদিস না?"

নানী কিছুই বুঝিতে পারিল না। নীরদ বাবুর চোখ তখন জলে ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইল নানী আরও কাঁদিতেছে। আবার বলিলেন "নানী কাঁদিস না।"

ক্রমে স্বর বিকৃত হইয়া আসিল—নানীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "তোর জন্য ওড়না লাল কোর্ত্তা এনেছে। কাঁদিস না—না—না।"

* * *

এ দিকে টাকার সম্বন্ধে গোলমাল ক্রমে মেম সাহেবের কানে পৌঁছিল। আগেই পৌঁছিয়াছিল, তবে সাহেবকে জব্দ করার পরিবর্ত্তে একজন নির্দ্দোষী কর্ম্মচারীর প্রাণ লইয়া টানাটানি হয় দেখিয়া তাহার দয়া হইল।

অবসর মত ধীরে ধীরে হাসিমুখে সাহেবের হাতে চেকখানা ফিরাইয়া দিয়া বলিল—"নিজের দোষ ওরকম করিয়া পরের ঘাড়ে চাপাও কেন? একটা নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করিতে একটু লজ্জা হয় না। এই নাও তোমার টাকা, ভবিষ্যতে সাবধানে থাকিও।"

সাহেব প্রণয়িনীর সম্ভাষণে যতই অসন্তুষ্ট হউক না ৫০০্ টাকা ফেরৎ পাইয়া অত্যন্ত খুসি হইয়া সাদরে তাহা গ্রহণ করিল এবং তৎক্ষণাৎ নীরদ বাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইল।

তখনও নীরদ বাবুর চোখের জল শুকায় নাই। সাহেব আদর করিয়া নীরদ বাবুকে ডাকিয়া কাছে বসাইল। বলিল

"Well, Nirod Babu, I am very sorry for the trouble I have given you. I have got the lost money. It was not stolen as I thought".

নীরদ বাবু শুনিলেন। শুনিয়া খানিক পরে বলিলেন "সাহেব তোমার ৫০০ টাকার জন্য আমার অমূল্য বাহাদুরকে হারিয়েছি। আমরা নিরীহ প্রাণী, আমাদের সঙ্গে এ পরিহাস কেন? তুমি ত Sorry হলে কিন্তু আমার বাহাদুরকে কে ফিরিয়ে আনবে?"

* * *

সেই দিনই কাজে ইস্তফা দিয়া নীরদ বাবু বাংলা দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নানীকে সঙ্গে লইলেন, কারণ তাহার আর কেহ ছিল না। নানী বাংলা দেশে আসিয়া তাহার মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু আজও তাহার বুড়া বাপের কথা ভোলে নাই। আজও সে সেই দুইটা লাল কোর্ত্তা ও ওড়না (যে দুইটা বাহাদুরের মৃতদেহ হইতে নীরদ বাবু সৎকারের সময় উঠাইয়া লইয়াছিলেন) তাহার বাক্সে অতি যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মহীপাল-প্রসঙ্গ

(মহীসন্তোষ)

পালবংশের তৃতীয় নরপতি দেবপাল দেব স্বীয় গৌরব-চ্ছটায় সমগ্র উত্তরাপথ আলোকিত করিয়া অন্তর্হিত হইলে গৌড়ের সিংহাসনে শান্তিপ্রিয় পাল নরপালগণের অধিষ্ঠান হইয়াছিল। গৌড়রাজ্যের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ যোগ্য। পূর্ব্বে প্রবল কামরূপ, পশ্চিমে কান্যকুব্জ, দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে বিস্তীর্ণ কলিঙ্গ রাজ্য এবং দক্ষিণে সমতট বঙ্গ। সর্ব্বদা সশস্ত্র এবং সজাগ না থাকিলে চারিদিকের এই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যসমূহের মধ্যে মস্তক বেশী দিন উন্নত রাখা কঠিন।

মনু ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে রাজগণ মধ্যে মধ্যে বিজয়যাত্রা করিবেন। রাজা ও রাজ্যের মধ্যে যখন স্বাস্থ্য ও সবলতা বিরাজ করে তখন নৃপতিগণ মনুর ব্যবস্থা মানিয়াই চলেন। কিন্তু যেই দুর্ব্বল প্রতিভাহীন রাজা সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, অমনি সমস্ত রাজ্যে অবসাদের লক্ষণ দেখা দেয় এবং সমস্ত রাজ্য-মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের নিবিড় আনন্দের চেয়ে প্রমোদালয়ের বা কুঞ্জভবনের লঘু আনন্দ বাঞ্ছিততর হইয়া উঠে।

দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গৌড়ে ধর্ম্মপাল প্রবল হইলেন; অমনি ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কামরূপ ইত্যাদি দেশের-রাজন্যবৃন্দের উন্নত শির তাঁহার বরেণ্য চরণে নত হইয়া পড়িল। পালবংশের পরবর্ত্তী নরপালগণের মধ্যে যিনিই যখন প্রবল হইয়াছেন তিনিই তখন পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে দুই এক ছোঁ মারিয়াছেন। সেনবংশের বিজয় সেন প্রবল হইয়াই—

গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপং
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়।
দেওপাড়া লিপি।

ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সময় পালরাজ্য গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে যতগুলি রাজ্য আছে তাহাদের কাহারও গৌরব দুই তিন পুরুষের বেশী স্থায়ী হয় নাই।

মৌর্য্যবংশে—চন্দ্রগুপ্ত বিন্দুসার অশোক; কুষাণ-বংশে—কণিষ্ক হুবিষ্ক বসুদেব; গুপ্তবংশে—সমুদ্র চন্দ্র কুমার গুপ্ত; বর্দ্ধন বংশে—রাজ্যবর্দ্ধন হর্ষবর্দ্ধন। বঙ্গের পালবংশেও এই ভারতের চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। দেবপাল দেবের উত্তরাধিকারী বিগ্রহপাল দেব দিগ্বিজয়-গৌরবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত অর্থ ও গৌরব উপভোগে মনোযোগ দিয়াছিলেন;—পালরাজগণের লেখমালায় তাঁহার বিজিগীষার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী রাজত্রয় নারায়ণপাল, রাজ্যপাল এবং দ্বিতীয় গোপালের সময়ও দেশবিজয় অপেক্ষা আত্মরক্ষাতেই পাল নরপালগণের শক্তি অধিক ব্যাপৃত ছিল, ইহার ফল অনিবার্য্য পতন আসিল পরবর্ত্তী রাজা দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের সময়। বিগ্রহপাল অজ্ঞাতনামা কাম্বোজবংশজ গৌড়পতির আক্রমণে গৌড় হারাইয়া বরেন্দ্র হইতে বিতাড়িত হইয়া বঙ্গদেশের পূর্ব্ব সীমান্ত সমতটে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার হতবল ছিন্ন ভিন্ন কটকসমূহ পূর্ব্বাঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহে লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। * ইহাই পালরাজবংশের প্রথম পতন।

* মহীপালের বাণগড় শাসন—১১শ শ্লোক। এই বিষয়ে ১৩২১ প্রতিভা শ্রাবণ, সংখ্যায় মল্লিখিত ময়নামতির গানের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রজাশক্তির সাহায্যে যে পালরাজবংশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, কোন আকস্মিক প্রবল বিপ্লবে তাহার পতন হইলেও প্রজাসাধারণের প্রিয় সেই পালবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে বিলম্ব হয় নাই। বিগ্রহপালের বীর পুত্র মহীপাল অচিরেই বিপক্ষ সকলকে পরাজিত করিয়া বাহুবলে অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। (বাণগড় লিপি ১২শ শ্লোক)

মহীপাল তাঁহার রাজত্বের প্রথম অবস্থায় পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি ছিলেন—কুমিল্লার নিকটস্থ বাঘাউড়া গ্রাম হইতে মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরের লিপি বাহির হইয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। সমতট প্রদেশে থাকিয়াই তিনি সৈন্য সংগ্রহ ও সৈন্য পরিচালনা করিয়া বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিলেও পালবংশের পূর্ব্বগৌরবের যে তিনি পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই তাহা নিশ্চিত। তাঁহার বাণগড়-লিপিতে যে লেখা আছে যে তিনি সমস্ত রাজন্যবৃন্দের মস্তকে চরণপদ্ম নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই কথাটা একান্তই অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে যাইয়া তাহাতে সফলকাম হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু সেই অবসরে পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। ১০২৪ খৃষ্টাব্দে বা কাছাকাছি সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্র সেন যখন বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে আসেন তখন তিনি উত্তর রাঢ়ে মহীপাল, বিহারে ধর্ম্মপাল, দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর এবং বঙ্গাল দেশে গোবিন্দচন্দ্রের দেখা পান। ধর্ম্মপাল হয়ত পালবংশেরই কেহ হইতে পারেন এবং হয়ত তিনি মহীপালের সামন্তরূপে বিহার শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু রণশূর ও গোবিন্দচন্দ্র যে মহীপালের অধীনস্থ রাজা ছিলেন তাহা অনুমান করিবার কোন কারণ নাই এবং প্রমাণও কিছুই পাওয়া যায় না।

তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছি যে উত্তর রাঢ় ও পিতৃরাজ্য বরেন্দ্র দেশের সহিতই মহীপালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মুর্শিদাবাদে গয়সাবাদ নামক প্রসিদ্ধ স্থানের অদূরে মহীপাল নামক এক নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া এবং তাহার অদূরে স্থিত সাগরদীঘি

নামক বিশাল দীঘি মহীপালের খনিত বলিয়া জনপ্রবাদ বর্ত্তমান থাকায় মুর্শিদাবাদ জেলাকেই রাজেন্দ্র চোলের কথিত উত্তর রাঢ় বলিয়া মনে হয়।* কাজেই বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগ ও মুর্শিদাবাদ জেলা লইয়া মহীপালের খাঁটি নিজ রাজ্য গঠিত ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়—

যোগীপাল মহীপাল গোপীপাল-গীত।
ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত॥

মহীপাল যে পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার নামে যে গাথা প্রচলিত হইয়াছিল ইহাই তাহার এক বড় প্রমাণ। আমাদের দেশে কৃতী পুরুষগণের গুণগাথা গাহিবার লোকের অভাব কখনই হয় নাই। এমন কি অত্যন্ত আধুনিক কাল পর্য্যন্তও এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। দেশে একজন কোন সাহসের বা সুখ্যাতির কাজ করিলে অমনি তাহার নামে বহু গাথা রচিত হইত এবং ভাটগণ তাহা দেশে দেশে গাহিয়া ফিরিত। প্রাচীন পুথির খোঁজ করিতে করিতে আমি মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ কান্তবাবু ও তাঁহার অধস্তন চারি পাঁচ পুরুষের কীর্ত্তিগাথাপূর্ণ এক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি দিনাজপুর জেলা হইতে আবিষ্কার করিয়াছি। পুথিখানির নাম কান্তনামা; পুথিখানি হইতে দেখা যায় যে কান্ত বাবুর নামে পর্য্যন্ত গাথা রচিত হইয়াছিল।

কিন্তু মহীপালের জনপ্রিয়তার আরও প্রমাণ আছে। মুর্শিদাবাদ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ ইত্যাদি জেলায় অসংখ্য স্থানের নামের সহিত "মহী" শব্দ যুক্ত আছে, যেমন মহীপাল, মহীনগর, মহীগঞ্জ, মহীভিটা, মহীপুর, মহীসন্তোষ, মহীগ্রাম ইত্যাদি। মহীপাল ভিন্ন অন্য কোন পাল রাজার নাম-সংযুক্ত এত স্থানের নাম দেখা যায় না। ইহা কি মহীপালের জনপ্রিয়তার পরিচায়ক নহে? মহীপাল হয়ত সেইসকল স্থানে নগরাদি নিজেই সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু নূতন নামগুলিকে চিরস্মরণীয় করিবার ভার ত ছিল জনসাধারণের উপর! জনসাধারণ যে মহী-নাম-যুক্ত স্থানগুলির স্মৃতি পুরুষপরম্পরাক্রমে জাগরূক রাখিয়া আসিয়াছে, ইহা মহীপালের জনপ্রিয়ত্ব সূচিত করিতেছে।

পালরাজগণের যে শেষ তিনখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে সে তিনখানিতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির মধ্যে স্থিত কোটিবর্ষ নামক বিষয়ে ভূমিদান করা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ভুক্তিগুলি অনেকটা আজকালের ডিভিজনের অনুরূপ ছিল এবং বিষয়গুলি জেলার অনুরূপ ছিল। ইহার নীচে আবার পরগণার অনুরূপ মণ্ডল নামক বিভাগ এবং তাহার চেয়েও ছোট খণ্ডল নামক বিভাগ ছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি সাধারণতঃ সমগ্র উত্তরবঙ্গ লইয়া গঠিত ছিল বলিয়া বলা হইয়া থাকে। কোটিবর্ষ বিষয়ের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিরও অবস্থান অনেকটা ঠিক হইতে পারে।

দিনাজপুর জেলায় বানগড় নামে এক প্রকাণ্ড প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই ধ্বংসাবশেষ দিনাজপুর সহরের প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বক্তিয়ার খিলিজির সময় এস্থান দেবীকোট নামে বিখ্যাত হইয়া উঠে, এবং এখানে তাঁহার উত্তরদিকের সৈন্যনিবাস স্থাপিত হয়। এই বানগড়ই প্রাচীন কালে কোটিবর্ষ নামে পরিচিত ছিল। ত্রিকাণ্ড শেষ ও হৈম কোষ এই উভয় অভিধানেই দেবীকোট, শোণিতপুর, বানপুর, কোটিবর্ষ, উষাবন ইত্যাদি শব্দ সমানার্থবোধক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কাজেই বর্ত্তমান বানগড়ই যে কোটিবর্ষ বিষয়ের কেন্দ্র ছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে তাম্রশাসন দ্বারা মহীপাল কোটিবর্ষে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহাও বানগড়ের মধ্যেই জঙ্গল পরিষ্কার করিবার কালে পাওয়া যায়। অন্য যে দুইখানা শাসনে কোটিবর্ষ বিষয়ে ভূমিদান করা হইয়াছে—৩য় বিগ্রহপালের আমগাছিলিপি, এবং মদনপালের মনহলি-লিপি—সেই দুইখানার প্রাপ্তিস্থান আমগাছি ও মনহলি গ্রামও বানগড়ের অদূরে অবস্থিত। মহীপালের শাসনখানি পোসলী-গ্রামবাসী মহীধর শিল্পী কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। তৃতীয় বিগ্রহপালের শাসনখানিও পোসলীগ্রামবাসী মহীধরপুত্র

* বল্লালসেনের সীতাহাটি শাসনে বর্দ্ধমানের উত্তরাংশকেও উত্তর রাঢ়মণ্ডল বলিয়া ধরা হইয়াছে।

শশিদেব কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। বানগড় হইতে দক্ষিণে পোরসা নামে বর্ত্তমানে মুসলমান জমীদারদের বাসস্থান এক বিখ্যাত গ্রাম আছে। তাহাই প্রাচীন পোসলী গ্রাম হইতে পারে। অবশ্য ইহা নামসাদৃশ্যে অনুমান মাত্র।

বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশ মালদহ জেলার পশ্চিমাংশ রাজসাহী জেলার উত্তরাংশ এবং রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলার পশ্চিমাংশ লইয়া কোটিবর্ষ বিষয় গঠিত ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। এই কোটিবর্ষ বিষয়ের সহিত পাল রাজগণের বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। পালরাজগণের শেষ তিনখানা তাম্রশাসন এই চতুঃসীমার মধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুরব মিশ্রের গরুড়স্তম্ভও এই সীমার মধ্যেই। ২য় মহীপালের রাজত্বকালে যে কৈবর্ত্তগণ বিদ্রোহী হইয়া পালরাজ্য উল্টাইয়া দিয়াছিল—সেই কৈবর্ত্তরাজা দিব্য ও ভীমের কীর্ত্তি ধীবর-দীঘি বা দিবর দীঘি এবং ভীমের জাঙ্গালও এই সীমারই মধ্যে। রামপাল বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিয়া যে জগদ্দল মহাবিহার ও রমাবতী নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার ধ্বংসাবশেষও এই চতুঃসীমার মধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে। আর রহিয়াছে এই সীমার মধ্যে মহীপালের স্মৃতি-বিজড়িত দুই তিনটি প্রাচীনকালের সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থানের ভগ্নাবশেষ। দিনাজপুরের দক্ষিণাংশে বালুরঘাট মহকুমা সহরের তিন মাইল দক্ষিণে মহীসন্তোষ ও তাহার পার্শ্বেই আত্রেয়ী নদীর তীরে মহীগঞ্জ এবং বালুরঘাট সহরের দুই মাইল উত্তরে আত্রেয়ীর তীরে মহীনগর এখনও মহীপালের স্মৃতি জাগরূক রাখিতেছে। আত্রেয়ীর পূর্ব্ব পারে মহীগঞ্জ, পশ্চিম পারে বহু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ-সমাকীর্ণ ভাটশালা গ্রাম। বরেন্দ্র দেশের কেন্দ্রস্থিত এই গ্রামটিই বোধ হয় বারেন্দ্র ভট্টশালী গ্রামীন ব্রাহ্মণ-গণের আদি বাসগ্রাম ছিল। মহীগঞ্জে এবং মহীনগরে এখন দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই, কিন্তু মহীসন্তোষে এখনও বিস্তীর্ণ ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীন রাজধানীর চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্থানীয় কিম্বদন্তী যে এস্থানে প্রাচীন রাজাদের মফঃস্বলের রাজধানী এবং বিলাসবাটিকা ছিল। মহীপালের বানগড় শাসনে দেখা যায় যে তাহা বিলাসপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। বিলাসপুর এই মহীসন্তোষ হইবার খুব সম্ভাবনা।

প্রাচীনকালে পুণ্যতোয়া আত্রেয়ী নদীর বাঁকের উপর স্থাপিত এ স্থানটির অবস্থান অতি মনোরম ছিল। এই প্রাচীন সুরক্ষিত স্থানটির বিবরণ পূর্ব্বে কেহ দিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। এই স্থানের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য।

বিস্তীর্ণ পরিখার মধ্যে উচ্চ প্রাকার গাঁথিয়া মহী-সন্তোষের দুর্গ প্রস্তুত হইয়াছিল। স্থানীয় লোকে বলে যে দুর্গের পরিখা ছাড়া সমস্ত সহরটি বেষ্টন করিয়া এক প্রকাণ্ড পরিখা ছিল। কিন্তু তাহার চিহ্ন আজকাল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্গপরিখা কিন্তু এখনও অতি সুন্দর অবস্থায় আছে। উত্তর, পূর্ব্ব, ও দক্ষিণ দিকে এখনও গভীর জল থাকে। পশ্চিমদিকের পরিখা শুকাইয়া গিয়াছে। এতৎসহ প্রকাশিত মানচিত্রে দেখা যাইবে যে দুর্গের পশ্চিম উত্তর দিকে একটি প্রকাণ্ড জলময় স্থান আছে; কেহ কেহ বলেন এখান দিয়া আত্রেয়ী নদী প্রবাহিত ছিল, পরে নদীর গতির পরিবর্ত্তন হইয়া এখানে বিল হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে এইটা একটা প্রকাণ্ড দীঘি ছিল। আত্রেয়ী হইতে জল আনিয়া পরিখা ভরা হইয়াছিল। দুর্গের প্রাকার এখনও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। মানচিত্রে দেখা যাইবে যে প্রাকারের কোণগুলি বর্ত্তুলাকার, এবং পশ্চিম ও পূর্ব্ব পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যদেশ তরঙ্গিত। এই আকারে প্রাকারটী দেখিতে অতি সুন্দর। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার কোনও পথ নাই, কেবল দক্ষিণধারে পরিখার মধ্যে একটি উচু স্থান আছে। এইটি বোধ হয় পরিখাসেতুর (Draw-bridge) অবতরণের স্থান ছিল। প্রাকারের উচ্চতা দেখাইবার জন্য যে চিত্র দেওয়া গেল তাহা হইতে দেখা যাইবে যে প্রাকার এখনও প্রায় ১২—১৩ হাত উঁচু রহিয়াছে।

দুর্গটির পরিমাণ অনুমানিক ৪০০ গজ × ৩০০ গজ। প্রাকারের অভ্যন্তরে অনেকগুলি ভগ্ন স্তূপ আছে, তাহাদের উপর অসংখ্য শতমূলির লতা হইয়া রহিয়াছে। ভগ্নস্তূপগুলির মধ্যে কেবল একটির নাম এখনও লোকে

...নে রাখিয়াছে। এক বৃদ্ধ সাঁওতাল বলিল যে ইহার নাম নবরত্ন। অন্য স্তূপগুলির কোন নাম কেহ বলিতে পারিল না।

সেতু-অবতরণ-স্থানের বরাবর দক্ষিণে রাস্তা হইতে একটু দূরে বারদুয়ারী নামে প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে। মানচিত্রে স্থানের অভাব হেতু বারদুয়ারীর অবস্থান ঠিক দেখান হয় নাই, কেবল বারদুয়ারী কোন দিকে হইবে তাহাই দেখান হইয়াছে। বারদুয়ারীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। চারি পাঁচটা কাল কঠিন প্রস্তরের স্তম্ভ এখনও ধ্বংসাবশেষের উপর মাথা তুলিয়া অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর যে কত পড়িয়া রহিয়াছে তাহার সংখ্যাই নাই। আমরা ছয় বন্ধু* মহীসন্তোষের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলাম, ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া কেবলি বিস্মিত হইতে লাগিলাম। বারদুয়ারীর চিত্রে দুই কোণায় দুইজন লোক দাঁড়াইয়া আছে দেখা যাইবে। উহাই বারদুয়ারীর উত্তর ও দক্ষিণ সীমা। ইহা হইতেই বারদুয়ারীর যে কত বড় প্রকাণ্ড আয়তন ছিল তাহা বুঝা যাইবে।
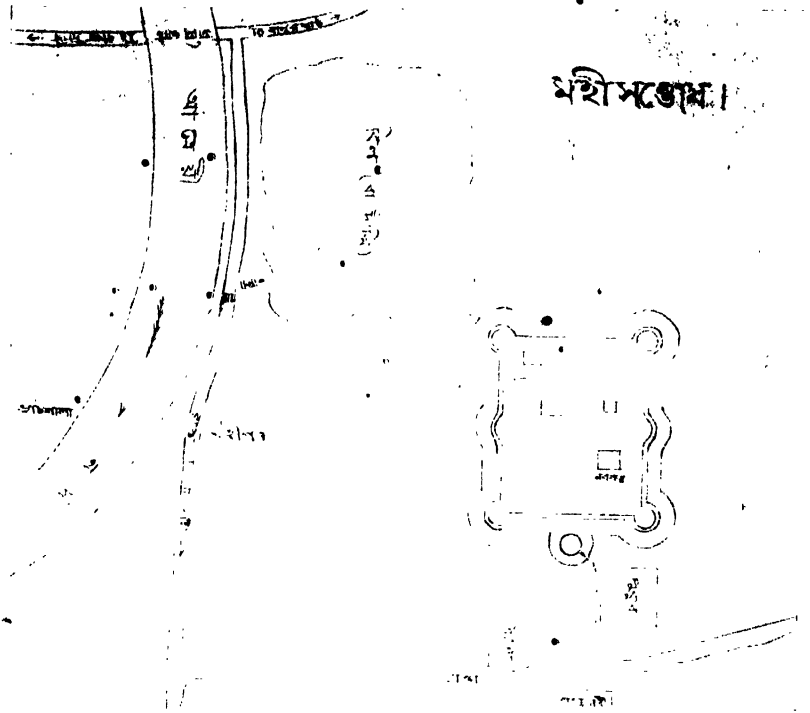
মহীসন্তোষের ম্যাপ।

দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দরগা। এই দরগা এই অঞ্চলে খুব বিখ্যাত। যিনি এই দরগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তিনি বোধ হয় এই অঞ্চলে আরও দরগা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কারণ মহীসন্তোষের দরগা নামে অভিহিত আরও তিন চারিটি দরগার কথা জানিতে পারিয়াছি। বালুরঘাট সবডিভিজ্যনেই অর্জ্জুনপুর গ্রামে ও পত্নীতলা থানার নিকট এক একটি মহীসন্তোষের দরগা নামে অভিহিত দরগা আছে। নিজ মহীসন্তোষের দরগার এখন কেবল ভগ্নাবশেষ দাঁড়াইয়া আছে। দরগায় এখনও প্রায় প্রতি দিনই সিন্নি পড়ে। দরগার চারিদিকে একটা আধুনিক মাটির গাথনীর প্রাচীরের বেষ্টন, স্থানে স্থানে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দরগার পাশেই প্রস্তর ও ইষ্টকের এক ভগ্নস্তূপ। পার্শ্বেই একটি প্রায় দুই গজ দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ডে একটি তোগরা অক্ষরে লেখা আরবি লিপি পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে এক মসজিদ নির্ম্মাণের বিবরণ লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে এই ভগ্নস্তূপ এই মসজিদেরই। কিন্তু মসজিদের পূর্ব্বেও যে এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার প্রমাণ-প্রাঙ্গনস্থিত প্রকাণ্ড প্রস্তরের কৃত্তিমুখটি। মন্দিরের দ্বারে কৃত্তিমুখ দেওয়ার নিয়ম ছিল। কৃত্তিমুখটি লোক-সাধারণের নিকট রাক্ষসের মাথা আখ্যা পাইয়াছে। কৃত্তিমুখ ওজনে প্রায় তিন মণ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১॥ হাত ×

* যথা:—শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চক্রবর্ত্তী বি, এ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ...ননাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র তরফদার এবং লেখক স্বয়ং। ইঁহারা অনুসন্ধান সময়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া সমস্ত ফটোগ্রাফগুলি উঠাইয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।—লেখক।

মহীসন্তোষের বারদুয়ারীর ভগ্নাবশেষ।

মহীসন্তোষের দুর্গপ্রাকার।

 হাত। এত বড় প্রকাণ্ড কৃত্তিমুখ যে-মন্দিরে ছিল সে-মন্দির যে খুবই প্রকাণ্ড ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আরবি লিপিটি পাঠে জানা যায় যে বঙ্গের স্বাধীন সুলতান বরাবক সাহার আমলে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ৮৭৫ হিজরীতে মসজিদটি নির্ম্মিত হয়। রাজা গণেশের বংশ লুপ্ত হইলে নসিরুদ্দিন আবুল মুজাফর মহম্মদ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁর আমলে অনেক স্থাপত্যকীর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। নাসিরুদ্দিন শাহ গৌড়ের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মিত করেন। প্রায়ই দেখা যায় যে নবাবের অনুকরণে নবাবের ওমরাহগণও তাহাদের নিজ নিজ জমীদারীতে মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপত্য কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসুক হইয়া উঠেন। নাসিরুদ্দিন স্থাপত্যকীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। বর্ত্তমান লিপি হইতে দেখা যায় যে তৎপুত্র বরাবক সাহের আমলেও ওমরাহগণ নাসিরুদ্দিনের সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বিরত হয় নাই। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে বোধ হয় কৃত্তিমুখযুক্ত মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপরই বরাবক সাহের ওমরাহ সরফ খাঁ স্বর্গে সপ্ততিসংখ্যক প্রাসাদ পাইবার আশায় মহীসন্তোষে মসজিদ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন।

লিপিটির অনুবাদ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক খাঁন বাহাদুর আওলাদ হোসেন সাহেব যেরূপ করিয়া দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'প্রেরিত পুরুষ—তাঁহার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক—বলিলেন—"যে এই পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্ম্মিত করে ভগবান (তাহার জন্য) স্বর্গে সপ্ততি সংখ্যক প্রাসাদ নির্ম্মিত করেন। এই মসজিদ সুলতান মহম্মদ শাহের পুত্র মহানুভব নরপতি সুলতানপুত্র সুলতান রুকনুদ্দিনোয়াদ দিন আবুল মোজাহিদ বরাবক শাহ সুলতানের আমলে নির্ম্মিত হইয়াছে। নির্ম্মাতা মহানুভব খাঁ ফারান্নরুজ খাঁ যোশী বড় খালিফা সরফ খাঁ ৮৭৫।'

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

মহীসন্তোষের দরগায় পতিত কীর্ত্তিমুখ।
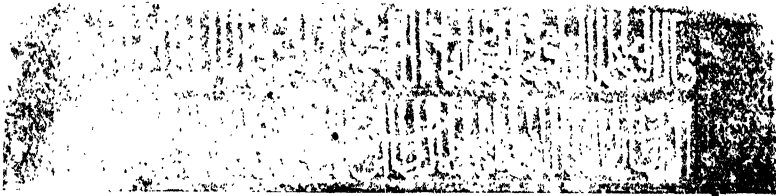
মহীসন্তোষের মসজিদলিপি, ৮৭৫ হিজরী।

শিউলীগাছের কীট ও তাহার প্রজাপতি

প্রজাপতি মহলে এবং কীটমহলে কত বৈচিত্র্য আছে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। বিলাতে নাকি কীটতত্ত্ববিদ্‌গণ কীট ও পতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া থাকেন। সেখানে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাপ্তাহিকে ও মাসিকে কীট পতঙ্গাদি সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করিয়া থাকেন। ইংরাজীতে কীট ও পতঙ্গ সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এবিষয় আলোচনা করার আবশ্যকতা অনুভূত না হওয়ায় কেহই বড় কীট ও পতঙ্গ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ করেন না। এজন্য ভারতে কীট ও পতঙ্গ সম্বন্ধে কোন ভাল গ্রন্থ নাই। আমরা চোখের সম্মুখে নিত্য বায়ুতরঙ্গে অজস্র সুন্দর নানা বর্ণের প্রজাপতি ও বিভিন্ন পতঙ্গাদিকে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখি অথচ আমরা সেই সকল পতঙ্গের জীবনী পর্য্যালোচনার কোন আবশ্যকতা বুঝি না। আমরা কেবল চোখ দিয়া তাহাদের বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়াই ক্ষান্ত থাকি। তাহাদের জীবন পর্য্যালোচনার উৎসাহের অভাব আমাদের ষোল আনাই আছে; অথচ আমরা তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি।

আমরা বিদেশীয়দের নিকট অনেক কিছু লাভ করিয়াছি। তাহাদের অনেক রীতিনীতিরও অনুকরণ করিয়াছি। কিন্তু এই সকল বিষয় অর্থাৎ কোন একটা

রহস্যকে অনুসন্ধান দ্বারা জানার উৎসাহ সঞ্চয় করবার চেষ্টার অনুকরণ তেমন মনোযোগের সঙ্গে করি না।

আমাদের আশ্রমের মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে অনেক শ্রেণীর কীট ও পতঙ্গ দৃষ্ট হয়। আমরা কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাদের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। মাঝে মাঝে আমাদের পর্য্যবেক্ষণের নোট পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদিত "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমাদের কোন কোন বন্ধু ইংরেজী পুস্তকের সাহায্যে এই পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলেন, কিন্তু আমরা আপাতত তদনুযায়ী কার্য্য করার বিরোধী। আপাতত আমরা কীট ও পতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণকে সাধারণ ভাবে আরম্ভ করিয়াছি সুতরাং ইহাতে ইংরাজী পুস্তকের সহায়তা লওয়া অনাবশ্যক মনে করি, স্বাধীনভাবে পর্য্যবেক্ষণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। সম্প্রতি শিউলী গাছে আমরা এক শ্রেণীর কীট পাইয়াছি। নিম্নে উক্ত কীট ও তাহার প্রজাপতির সম্বন্ধে আমাদের পর্য্যবেক্ষণের ফল যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা হইল।

সাধারণত বর্ষার সময় তরুলতার গায়ে বিস্তর কীটের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার প্রারম্ভেই শিউলীগাছেও পোকার আবিভাব হইয়া থাকে। গাছে যে পোকার আবির্ভাব হইয়াছে তাহা গাছের চেহারা হইতে বেশ বুঝা যায়। বর্ষার সরস চুম্বনে যদিও নিদাঘ-তপ্ত তরুলতা নব প্রাণরসে সিঞ্চিত হইয়া সুন্দর ও শ্যামল হইয়া উঠে তথাপি উহাদের পত্রে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। বর্ষায় একদিক দিয়া যেমন উদ্ভিদ্‌রাজি নবযৌবনের সৌন্দর্য্য লাভ করে তেমনি কীটমুখে নিদারুণ দংশনযন্ত্রণাও ভোগ করে।

ক্ষতচিহ্নবিশিষ্ট পত্রগুলিই অনেক সময় মানুষকে জানাইয়া দেয় যে তাহাদের বৃক্ষে কীটের আবির্ভাব হইয়াছে। বৃক্ষে যদি ঐ প্রকার চিহ্ন না থাকিত তাহা হইলে নিঃসন্দেহ পোকাগুলিকে ধরা অত্যন্তই কঠিন হইত। আত্মরক্ষা করার জন্য বিধাতা নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ও কীটপতঙ্গকে যে সকল উপায় বা অস্ত্র দিয়াছেন তাহা যৎসামান্য হইলেও তাহাদের প্রাণ রক্ষা করার বিশেষ সহায়তা করে। ছোট যে পিঁপড়ে তাহার দংশন খুব ছোট বটে কিন্তু তাহার জ্বালা যে কেমন তা বোধ করি কালি কলমে না লিখিলে কোন দোষ হইবে না। বোলত একটি ছোট পতঙ্গ, কিন্তু তাহার হুলের বিদ্ধনজ্বাল নিতান্ত অবহেলার ব্যাপার নয়! এগুলিকে সামান্য অস্ত্র বলা চলে না। কীটমহলে আত্মরক্ষার জন্য কতকগুলি ফাঁকীর উপায় অবলম্বিত হয়। ঐ উপায়কেই তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র বলা চলে।

বর্ণ অনুকরণ দ্বারা পাখীর চোখে ভ্রম জন্মাইয়া আত্মরক্ষা করা অধিকাংশ কীটের সাধারণ উপায়। যে কীট যে গাছে বাস করে—সেই গাছের পাতার বর্ণকে হুবহু অনুকরণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পাতার ধ্বংস সাধনে ব্যাপৃত থাকে। পাখী উড়িয়া আসিয়া হয়ত যে শাখায় কীটমহাশয় ধরিয়া বেড়াইতেছেন, ঠিক সেই শাখার উপর বসিল কিন্তু পোকার দেখা পাইল না। অবশ্য অধিকাংশ কীটই গাছের পাতার তলাংশে অবস্থান করে, সহজে পাতার উপরের পিঠে আসে না। কোন কোন কীট ইহা ছাড়া অন্য ধরণের উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে হয়ত তাহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সুতরাং বারান্তরে অন্য এক শ্রেণীর কীট ও তাহার প্রজাপতির বিষয় আলোচনা কালে তাহাদের আত্মরক্ষার বিভিন্ন উপায়ের বিষয়ও লিখিত হইবে।

শিউলী গাছের এই যে কীটের বিষয় বলিতেছি ইহারা গাছের পাতার বর্ণ অনুকরণ ও পাতার তল অংশে অবস্থান ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পক্ষিকুলের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অত্যন্ত শৈশবে ইহাদের ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল থাকে। সুতরাং তখন ইহারা অল্পায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় শিউলী পাতার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেয়। দীর্ঘক্ষণ মুখ চালাইবার পর সম্ভবত ক্লান্তি নিবারণের জন্য ইহারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। মিনিট কয়েক বিশ্রামের পর পুনরায় মুখ-যন্ত্রের ক্রিয়া বেশ সুচারুরূপে আরম্ভ হয় এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ইহারা শৈশব হইতে কীট অবস্থার শেষ পর্য্যন্ত কয়েকবার দেহের চর্ম্মাবরণ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে।

চর্ম্মাবরণ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি সাধন হয়। যতই ইহারা বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ততই ইহাদের ক্ষুধা ও চাঞ্চল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অবশ্য এই নিয়মটি মনুষ্যজীবনে অনেকটা একরূপ। এতক্ষণ পোকাটির বর্ণ ও খাদ্যাদির বিষয়ই বলা হইল। এক্ষণ উহার দেহের গড়ন ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।

ইহাদের দেহের গড়ন অনেকটা তসরের গুটি পোকার অঙ্গের অনুরূপ। তবে ইহারা তত বৃহৎ হয় না। তসরের গুটিপোকা স্বভাবত একটু স্থূল। তসরের গুটিপোকার অঙ্গের ন্যায় ইহাদের দেহও একাদশ খণ্ড গোল গোল চক্রাকৃতি মাংসের সমষ্টি। প্রত্যেক দুই খণ্ডের মাঝখানে একটি করিয়া খোঁচ আছে, অর্থাৎ যেখানে দুইখণ্ড মাংস আসিয়া যুক্ত হইয়াছে সেই সন্ধিস্থলে একটি করিয়া খোঁচ আছে। "ক" চিহ্নিত কীটের প্রতি দৃক্পাত করিলে তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে। উক্ত "ক" চিহ্নিত ছবির প্রতি ভাল করিয়া দৃষ্টি দিলে পাঠকবর্গ আরো দেখিতে পাইবেন যে পোকাটির দেহে সাতটি বাঁকান ডোরা আছে। চিত্রে ডোরার সংখ্যা একপাশে বলিয়া সাতটি দেখায় কিন্তু দুই পাশে ১৪টি। ঐ সাতটি ডোরার প্রত্যেকটির মূলে নীচের দিকে (অর্থাৎ পায়ের কাছে) এক একটি করিয়া দুই পাশে মোট চোদ্দটি ক্ষুদ্র শ্বেত বিন্দু আছে। ঐ বিন্দুগুলির কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া অতি ক্ষুদ্র রক্ত বিন্দুও থাকে। ঐ ডোরাগুলি যে কয়েকটি মাংসখণ্ড বাদ দিয়া কয়েকটি মাংসখণ্ডে স্থাপিত তাহা বোধ করি সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। নচেৎ মাংসখণ্ডের সংখ্যানুযায়ী ডোরার সংখ্যা সাতের পরিবর্ত্তে একাদশটি হইত। পোকাটির লেজের গোড়া হইতে ডোরাগুলি আরম্ভ হইয়াছে। এবং পর পর সাত খণ্ড মাংসের উভয় দিকে অর্থাৎ ডান ও বাম পাশে কিঞ্চিৎ ব্যবধান রক্ষা করিয়া স্থাপিত। এই ডোরাগুলি পোকাটির দেহের মাংসখণ্ডের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ে বিশেষ সহায়তা করে। ইহাদের মস্তক হইতে তিন থাক নিম্ন পর্য্যন্ত প্রত্যেক খণ্ড মাংসের উপরে অর্থাৎ পৃষ্ঠাংশে ছোট ছোট সাদা দৃঢ় রোম আছে। রোমগুলি দৃঢ় হইলেও তাহাদের আগায় কোন প্রকার তীক্ষ্ণতা নাই। এই সরোম তিনখণ্ড মাংসের গায় কোন ডোরা নাই। পোকাটির লেজে ছোট ছোট বিস্তর কাঁটা আছে কিন্তু সেগুলি বিষ ও তীক্ষ্ণতা বর্জ্জিত। এই লেজের দৈর্ঘ্য সাধারণত অর্দ্ধ ইঞ্চি হয়।

সাধারণতঃ পোকাগুলি দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন ইঞ্চি ও পাশে দেড় ইঞ্চি হইয়া থাকে। সময় সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতেও দেখা যায়। ইহাদের পদ সংখ্যা মোট ষোলটি। এই ষোলটি পদের মধ্যে যে ছয়টি পদ পোকাটির গলার কাছে স্থাপিত সেগুলি অবশিষ্ট দশটি পায়ের অনুরূপ নহে। এই ছয়টি পা অনেকটা তেলা বিছার পায়ের মত—তবে তত বড় বা তত তীক্ষ্ণ নহে।
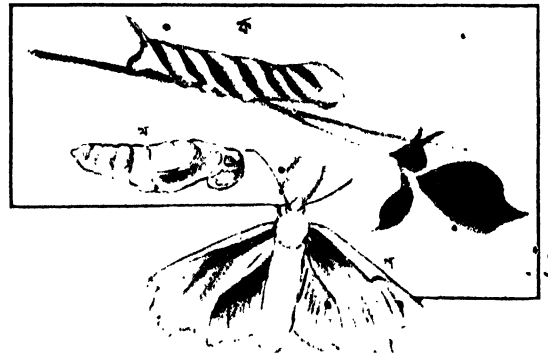
শিউলীগাছের কীড়া, পুত্তলা, প্রজাপতি।

অবশিষ্ট দশটা পদ আকারে রোহিত মৎস্যের দ্বিখণ্ডিত লেজের মত। অবশ্য অত বৃহৎ নয়। এই পা গুলির গায়ে এবং তলায় অনেক ছোট ছোট রোম আছে। ইহাতে পোকাগুলি পাতাকে আঁকড়িয়া ধরিতে সুবিধা পায়। এই ষোলটি পদ পোকাটির দেহে একটু নূতন ধরণে স্থাপিত। পাঠক হয়ত ভাবিতেছেন কেন্নো প্রভৃতি পোকার পা যেমন পর পর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্থাপিত ঠিক সেই অনুসারে ইহাদের পদও স্থাপিত। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। পোকাটির লেজের সহিত যে মাংসখণ্ড যুক্ত আছে তাহাতে দুইটি পা আছে, এই দুইটি পদযুক্ত মাংসখণ্ড বা চক্রের পর একখণ্ড মাংস বা চক্র বাদ দিয়া পর পর চারি থাকের মাংসে বা চক্রে প্রত্যেক পাশে একটি করিয়া দুই পাশে আটটি পা আছে। ইহার পর পর পুনরায় দুই থাক মাংসখণ্ড বাদ দিয়া পর পর তিনটি মাংসখণ্ডে প্রত্যেক পাশে একটি করিয়া,

দুই পাশে ছয়টি পা আছে। এই শেষ ছয়টি পায়ের গড়ন তেলা বিছার পায়ের ন্যায়। কোন কোন কীট-তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন এই শেষোক্ত পদ ছয়টিই পোকার আসল পা। কারণ পোকাটি প্রজাপতিতে পরিণত হইলে তাহার পা মাত্র ছয়টি হয়। ইহারা আরও মনে করেন যে ঐ যে অবশিষ্ট দশটি পা তাহার প্রকৃত পা নহে; উহারা মাত্র পোকাটিকে চলিতে সাহায্য করে। আমরা এসম্বন্ধে এখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই; সুতরাং এ বিষয়ে জোর করিয়া আপাতত কিছু বলিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পোকাটি শৈশব অবস্থা হইতে কীট অবস্থার শেষ পর্য্যন্ত কয়েকবার দেহের চর্ম্মাবরণ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহাদের কীট অবস্থার অবসান কালের কিছু পূর্ব্ব হইতে ইহারা আচম্‌কা আহার বন্ধ করিয়া গাছের নীচে নামিয়া আসিয়া শুষ্ক তৃণ লতার সন্ধান করিতে থাকে। সুবিধা মত তৃণ লতা জুটিলে ইহারা তাহা একত্রিত করিয়া মুখ দিয়া সুকৌশলে একটি কুটীর বা দুর্গ নির্ম্মাণ করে। এই দুর্গ নির্ম্মাণ কালে ইহাদের মুখ হইতে একপ্রকার তরল আঠা বাহির হইতে থাকে। ঐ লালা বা তরল আঠা তৃণগুলিকে পরস্পর আটকাইয়া রাখে। কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া পোকাটি তাহার সকল ছিদ্র সম্যকরূপে বন্ধ করিয়া দেয়। তখন কুটীরটি এমনি নিশ্ছিদ্র হইয়া যায় যে পিঁপড়ে জাতীয় কোন জীব তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

এই তৃণনির্ম্মিত দুর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পোকাটি কয়েক ঘণ্টা সম্পূর্ণ অবশ হইয়া থাকে। ঐ সময় উহার দেহ অত্যন্ত স্পর্শকাতর হইয়া পড়ে। একটু ছোঁয়া পাইলে ভয়ানক জোরে লাফ দিয়া উঠে। ক্রমে ধীরে ধীরে পোকাটির চর্ম্মাবরণ খসিয়া পড়ে। এই সময় চর্ম্মাবরণহীন পোকাটিকে একখণ্ড শ্বেত মাংসের ন্যায় দেখায়। তখন আর পোকার দেহে পায়ের কোন চিহ্ন থাকে না। সব পা লোপ হইয়া যায়। এই রূপে ঘণ্টা খানিকের পর পোকাটি ধীরে ধীরে বাঁকিতে বাঁকিতে একটি পুত্তলীতে পরিণত হয়। ক্রমে ঐ শ্বেত আবরণটি বাদামি বর্ণের হইয়া যায়। উক্ত পুত্তলীটির ঐ বাদামি আবরণ নিতান্ত কোমল হয় না। পুত্তলীটির গায়ে রংএর ন্যায় কয়েকটি খাঁচ পড়িয়া যায়। "খ" চিহ্নিত চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি দিলে পুত্তলীর আকার সম্বন্ধে পাঠকবর্গের যথার্থ ধারণা হইবে। বিশেষ দৃষ্টি দিয়া দেখিলে আরো দেখা যায় পুত্তলীর অগ্রভাগে নীচের দিকে বাঁকান একটি শুঁড় আছে।* এই সময় পুত্তলীর মধ্যে পোকাটি বোধ করি প্রজাপতির অঙ্গ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে কিম্বা পোকাটির দেহ ক্রমাগত প্রজাপতির তনুর অনুরূপ হইতে থাকে।

পুত্তলীতে পরিণত হওয়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ দিনের (অবশ্য সময় দুএকদিন অগ্র পশ্চাৎ হইতেও দেখিয়াছি) দিন পোকাটি পুত্তলীতে সম্পূর্ণ প্রজাপতিতে পরিণত হয় এবং সাধারণত দ্বাদশ দিনে অকস্মাৎ পুত্তলীটি ফাটিয়া গিয়া প্রজাপতিটি বাহিরে আসে। অনেকে মনে করেন তসরের গুটি পোকার প্রজাপতি যেমন গুটি কাটিয়া বাহিরে আসে ইহারাও তেমনি পুত্তলী কাটিয়া বাহিরে আসে। বস্তুত তাহা নহে। প্রজাপতির অঙ্গ বৃদ্ধির জন্য পুত্তলীর কোমল আবরণ আপনা হইতে ফাটিয়া যায়। তসরের গুটি-পোকাও গুটির ভিতরে পুত্তলীর অভ্যন্তরে জন্মলাভ করে এবং তাহার পুত্তলীও উক্ত শিউলীগাছের কীটের প্রজাপতির পুত্তলীর ন্যায় যথাকালে আপনাআপনি বিদীর্ণ হয়। যাহাহউক পুত্তলী হইতে প্রজাপতি বাহিরে আসিয়া কিছুক্ষণ পুত্তলীর গায়ে বসিয়া থাকে। এই সময় প্রজাপতির সারা অঙ্গে একপ্রকার তরল আঠাল পদার্থ লিপ্ত থাকে। এই তরল আঠাল পদার্থকে দেহচ্যুত করিবার জন্য প্রজাপতিটি ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে থাকে। ঐ স্পন্দনে সমস্ত আঠা তাহার অঙ্গ হইতে ঝরিয়া পড়ে। আঠা ঝরিয়া পড়িলে প্রজাপতিটি স্বেচ্ছায় গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করে।

* সাধারণতঃ পুত্তলীর অগ্রভাগে ওরকম বাঁকা শুঁড় থাকে না, থাকিলেও আমরা এপর্য্যন্ত যত গুলি প্রজাপতি কীট লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি তন্মধ্যে কোনটির পুত্তলীর অগ্রভাগে ওরকম শুঁড় নাই। এই শ্রেণীর শিউলী কীটের পুত্তলীর ঐ বিশেষত্ব। শিউলী গাছের অন্যান্য শ্রেণীর প্রজাপতি কীটের পুত্তলীরও অগ্রভাগে এই প্রকার কোন শুঁড়ের চিহ্ন নাই। লেখক।

এই শ্রেণীর প্রজাপতির বর্ণ ঘন ধূসর, গায়ে অত্যন্ত বেশী গুঁড়া। ইহাদের পায়ে করাতের দাঁতের ন্যায় অনেক তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে। উহার আঁচড় নিতান্ত আরাম দায়ক নহে। ইহারা দিনের বেলায় ঝোপে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে—রাত্রিতে বাহির হইয়া খাদ্যানুসন্ধানে ঘোরে। ইহারা ফুলের মধু পানেই রাজী নয়, ফুলের গাছের পাতার প্রতিও ইহাদের বেশ টান আছে। "গ" চিহ্নিত চিত্রটির দিকে তাকাইলে প্রজাপতির আকার আয়তনের কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

বোলপুর। শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

রামগড়

পথের কথা

গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমার এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সরকার বাহাদুরের তরফ থেকে ডাক পড়ল—প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের পক্ষ হ'য়ে আমাদের মধ্য-ভারতে সুরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত রামগড়গিরিগুহায় ছাদের নীচের খৃঃ পূঃ তিনশত বৎসরের প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি নিতে যেতে হ'বে। আমরা উভয়ে যথাসময়ে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের পেণ্ড্রারোড ষ্টেশনে উপস্থিত হলুম। এই পেণ্ড্রারোড ষ্টেশনটিতেই অমরকণ্টক তীর্থযাত্রীদের নামতে হয়।

যথাকালে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাদের সহযাত্রী মিষ্টার ব্ল্যাকিষ্টনের করমর্দ্দন করে করী পৃষ্ঠে আরোহণ করলুম। আমাদের সঙ্গে ছিল ৬০ জন কুলি। তারা তাঁবু, খাবার জিনিসপত্র, বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতি নেবার জন্য নিযুক্ত ছিল, আর আমাদের বহন করবার জন্য ছিল দুটো হাতী। প্রথম দিনের যাত্রাটী আমাদের অবশ্য খুবই উৎসাহে এবং আমোদে কেটেছিল, কিন্তু যখন শুনলুম ৬ দিনের যাত্রা শেষ করে ৭ দিনের দিন আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছব তখন উৎসাহের বেগ মন্দীভূত হ'য়ে পড়েছিল; কেননা, মধ্যভারতের দিবা-দ্বিপ্রহরের উত্তাপ এবং তার উপর ক্রমাগত প্রায় অনশনে পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করার কষ্ট প্রথম দিনেই আমরা যথেষ্ট অনুভব করেছিলুম। রামগড় পাহাড় ষ্টেশন থেকে একশত মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের প্রথম দিনের যাত্রা বিকেল তিনটার সময় শেষ হ'ল। আমাদের ক্রমাগত পর্ব্বত অতিক্রম করার জন্যে ওঠানাবায় যাত্রার গতি অত্যন্ত মৃদু হ'য়ে পড়ছিল। আমরা আমাদের বিশ্রামের চটী যেখানে পেলুম সেখানে গ্রামের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। একটী বেশ ছায়া-স্নিগ্ধ স্থানে আমাদের শিবির-নিবাস স্থাপিত হল। আমরা সেখানে পৌঁছাবার পূর্ব্বেই গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ মত রাজসরকারের অধীনস্থ স্থানীয় চৌকীদার এবং গ্রামের মোড়লেরা (খোর-পোষদারেরা) আমাদের শিবির স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ব্বাচন করে গোবর জল দিয়ে 'নিকিয়ে' পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে উনুন তৈরী করে জল কাঠ প্রভৃতির সরবরাহ করে আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক্ রেখেছিল; এমন কি চাল ডাল ঘি ময়দার সিধাও প্রস্তুত ছিল। তরকারীর মধ্যে শিম ছাড়া ওখানে অন্য কোন তরকারীই আমরা চোখে দেখিনি। প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে শিমগাছ আছেই আছে। শুনলুম আমাদের পথে যত চটী হ'বে সেখানকার স্থানীয় লোকেরা এই রকম ব্যবস্থাই ঠিক রাখবে। আমরা সকল স্থানেই এই রকম আয়োজন প্রস্তুত পেয়েছিলুম। কোন কোন স্থানে পাতার ছাওয়া ঘরও তৈরী করে দিয়েছিল। বাল্মীকি রামের বনবাসের উল্লেখকালে তাঁদের পর্ণকুটীরের যে বর্ণনা করেচেন আমাদের সেই পাতার ঘরে বাসের সময় সেই অরণ্য-বাসের কথাই পুনঃ পুনঃ মনে পড়ছিল!

আমাদের তাঁবুর কাছেই একটী স্বাভাবিক জলাশয় অর্থাৎ বাঁধ ছিল। তারই নিকটে একটী বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ একখণ্ড প্রকাণ্ড বড় পাথরের উপর এমন ভাবে জন্মিয়াছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় সেটা যেন পথিকদের বিশ্রামের জন্যে পাথর দিয়ে স্থানীয় লোকেরা বাঁধিয়ে রেখেচে! এই স্থানটীতে আমাদের বিশ্রাম করে এতই আরাম বোধ হয়েছিল যে সমস্ত পথের ক্লেশ যেন কোথায় অবসান হয়ে গেল। সে রাত্তিরটা যে কখন কেটে গেল আমরা কিছুই অনুভব করতে পারলুম না!

সমস্ত তাঁবু গুটিয়ে জিনিসপত্র বেঁধে সেগুলি কুলিদের দিয়ে সর্ব্বাগ্রে চালান করে দ্বিতীয় দিনের যাত্রা আরম্ভ কর্‌লুম। ক্রমে এইবার আমরা বিরল-বৃক্ষ অরণ্যের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ গহনবনের মাঝে এসে পড়লুম। আর যত সূর্য্যের তাপ বৃদ্ধি হোতে লাগল ততই কুঞ্জরপুঙ্গব তাঁর উদরভাণ্ডারের সঞ্চিত জল শুঁড় দিয়ে মুখগহ্বর থেকে বার করে বারবার পিঠের যে দিকটা তপনতাপে দগ্ধ হচ্ছিল সেই দিকটা ভিজিয়ে স্নিগ্ধ করতে লাগলেন। তাতে আরোহীরা ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়তে লাগল! অগত্যা আমরা স্থানে স্থানে পদব্রজে অগ্রসর হতে লাগলুম।

সেই পার্ব্বত্য আরণ্য পথে যে কত পদ্মসরোবর কত লতাপাতা ফুল ফল কত পাখীর কাকলি-কূজন প্রভৃতি আমাদের চিত্তকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করেছিল তা লেখাই বাহুল্য। আমরা গ্রামহীন রুমর্গা থেকে যথাসময়ে সেকৃড়া নামক গ্রামে এসে পৌঁছলুম। এখানে আমরা তাঁবুর হাঙ্গামা থেকে অব্যাহতি পেলুম। একটি সরাই আমাদের সেখানে পৌঁছবার অল্পদিন পূর্ব্বেই কোন রাজকার্য্যোপলক্ষ্যে তৈরী ছিল, আমরা সেইখানেই ঠাঁই পেলুম। এই স্থানটী একটি উঁচু পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। এই কুটিরটিতে বাস করে জানা গেল যে এখানকার লোকে দড়ি প্রস্তুত করতে জানে না। এখানে গাছের ছাল বা বাঁশের ছিলে দিয়েই দড়ির কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। সেকৃড়া গ্রামটির যে বিশেষত্বটি আছে সেটি জীবনে কখন ভুলব না।—সেটা হচ্চে, জলকষ্ট! এখানে একটি মাত্র কূপ আছে এবং তার জল এত অল্প যে দু-এক ঘড়া উঠালেই নিঃশেষ হয়ে যায়। পুনরায় দু তিন ঘণ্টাকাল অপেক্ষা না করলে আর এক ঘড়া পাওয়া যায় না! এই কারণেই বোধ হয় এই গ্রামটিতে লোকালয়ের সংখ্যা মাত্র চার পাঁচটি।

পুনরায় প্রাতে আমরা পাহাড়ের পর পাহাড় অরণ্যের পর অরণ্য নদের পর নদ পার হ'য়ে একটি অপেক্ষাকৃত বড় গ্রামে এসে পড়্‌লুম। এই গ্রামটির নাম পোরী। গ্রামের একপ্রান্তে আম্রকাননে আমাদের তাঁবু লাগ্‌ল। এখানে আমরা একজন শিশুর ন্যায় সরল হাসিখুসীমাখা সদাশয় অশীতিপর বৃদ্ধ খোর পোষদারকে পেয়েছিলুম। তিনি আমাদের আশাতীত আপ্যায়িত করেছিলেন। এমন কি তিনি অসঙ্কোচে তাঁর বৃদ্ধার অশেষ নিষেধসত্ত্বেও তাঁর একমাত্র শিমগাছ থেকে শিমকুল নির্ম্মূল করে আমাদের সেবায় লাগাতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হননি। এখানে সহসা একদল অভাবনীয় নটী ও নটের আমদানীতে আমাদের অত্যন্ত অতিষ্ঠ করে তুলেছিল! এরা বহুদূর-দেশ থেকে পদব্রজে পর্য্যটন করে গ্রামে গ্রামে তাদের বিকট সুর, স্বর ও অঙ্গভঙ্গিমা দেখিয়ে নিরীহ লোকেদের শ্রমলব্ধ অর্থের অনর্থসাধন করে বেড়াচ্চে। সৌভাগ্যের বিষয় সদাশয় ইংরাজ বন্ধুর কৃপায় আমাদের ঐ অনর্থে অর্থ ব্যয়িত হয়নি। তিনিই সে ভারটি গ্রহণ করে তাদের অর্থ দিয়ে বিদায় করেছিলেন। সেখানকার লোকেরা এতদূর নিরীহ যে গজপৃষ্ঠে মহাসমারোহে গ্রামের মধ্যে আমাদের প্রবেশ কর্‌তে দেখে কে কোথায় যে পালিয়ে লুকিয়ে পড়্‌বে সেই ভাবনায় অস্থির! এখানকার লোকেরা অধিকাংশই অসভ্যজাতীয়। এরা ছোটনাগপুরের মুণ্ডা বা ওরাওঁদের মতই অসভ্য। এদের কোরওয়া বলে। পূর্ব্বে সুরগুজারাজ্য ছোটনাগপুরেরই এলাকাভুক্ত ছিল। কোরওয়াদের গ্রামের কুটিরগুলির একটা বৈচিত্র্য আছে। এরা ঘরদুয়ার একপ্রকার রঙিন মাটি দিয়ে ভারি চমৎকার চিত্রিত করে থাকে এবং এদের এমনকি দীনহীনের জীর্ণ কুঁড়েটিও অতি সযত্নে একটু আধটু স্থাপত্য সজ্জায় সজ্জিত। এদের কুটিরের দাওয়ার কাঠের খুঁটির উপর মাটি দিয়ে এমন ভাবে থামের আকার তৈরী করেচে যে দেখ্‌লেই তাদের গৃহের শ্রী ও শান্তির কথা আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে! প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের থামের আকার ও কারুনৈপুণ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিকল্পনায় গঠিত। এই সকল থাম প্রভৃতির গঠন প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শনের সঙ্গে বরং কিছু মেলে, আর এদের ভিতর ইউরোপীয় প্রভাব একেবারেই প্রবেশ করেনি। উঠানের চারিপাশে রঙিন মাটি দিয়ে নানা রকম লতাপাতা এঁকেচে, আর মাঝখানে একটা সাদা মাটি দিয়ে লেপা বেদী। এখানে একপ্রকার সাদা মাটি পাওয়া যায়,

অনেকটা চুনের মতই সাদা। চীনা বাসন প্রভৃতি ঐরূপ মাটিতেই প্রস্তুত হয়ে থাকে।

আমাদের পোরী গ্রাম ত্যাগ করে 'আমথা' নামক একটা পার্ব্বত্য বিস্তৃত ও ভীষণ অরণ্য পার হ'তে হল। এই অরণ্যে শুনলুম বন্যহস্তীর বাস। ছেলেবেলা যে অজগর অরণ্যের গল্প শুনেছিলুম এখানে সেটা প্রত্যক্ষ করলুম! বনটি স্থানে স্থানে এত নিবিড় যে সহসা সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ লাভ করতে পায় না। আমরা ক্রমেই গভীরতম প্রদেশ দিয়ে যেতে লাগলুম। মধ্যে মধ্যে সেই গহন অরণ্যে কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটচে, তার শব্দ পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করচে, তার সঙ্গে বন্য কুক্কুট ও অন্যান্য পাখীরাও থেকে থেকে যোগ দিচ্চে। এই সমস্ত বনে হরিতকী আমলকী বয়ড়া প্রভৃতি গাছই প্রধানতঃ দেখা যায়। আমাদের এবারকার চটীটি 'কাব্রাডোল' নামক একটি গ্রামের নিকটে অরণ্য, পর্ব্বত ও নদীর বেষ্টনের মাঝে অবস্থিত। এই স্থানে একটা তৃষ্ণাতুর চিতাবাঘ নদীর দিকে যাচ্ছিল দূর থেকে দেখেছিলুম কিন্তু এই স্থানটির অরণ্যাতিশয্যের মধ্যে সে যে সহসা কোথায় অন্তর্হিত হয়ে পড়ল তা আর দেখা গেল না। এখানে একস্থানে কতকগুলি লোককে ঝড়েভাঙ্গা একটা গাছের গুঁড়ির মধ্যে থেকে হেঁট হয়ে জলপান করতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম; পরে শুনলুম পাড়ের দলে ঐরকম গাছের গুঁড়ির এরা কুপের বেড়া দেয়।

এইবারে আমরা কোর‍্যা রাজ্যের হাতী এবং লোকেদের ত্যাগ করে সুরগুজা রাজ্যের একটি হাতী, তিনটে ডুলি এবং ৬০ জন কুলির তত্ত্বাবধানে এসে পড়লুম। পরদিন আমাদের পর্ণকুটিরের আবাস ত্যাগ করে তাঁবু গুটিয়ে সুরগুজা রাজ্যের দিকে রওনা হলুম।

আমরা আমাদের কুলিদের দৈনিক ৵০ আনা পারিশ্রমিক দিতুম; তাতেই তারা যে কী সন্তোষই লাভ করত তা বলা যায় না! তাদের প্রসন্ন মুখগুলি দেখলে সত্যই আশ্চর্য্য বোধ হত! তাদের ভাবটা এই, সরকার বাহাদুরের কাজের আবার বেতন কি? আমাদের পেণ্ড্রী নামক একটি যায়গায় পর্ণকুটীরে বাস করতে হল। এই স্থানটি বৃক্ষ-বিরল—নিকটেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। পথে আমাদের যে কতকগুলি পার্ব্বত্য নদ ও নদী অতিক্রম করতে হল সেগুলিতে জল প্রায় শুকিয়ে গেছে; স্থানে স্থানে ক্ষীণ জলধারা নদীর প্রাণের পরিচয়টুকু মাত্র দিচ্চে! পরদিন পাথরী নামক স্থানে রওনা হলুম। এখানে পাহাড়গুলি দূরে সরে গেল, আমরা পার্ব্বত্য উপত্যকার সমতল ভূমিতে এসে পড়লুম। এস্থলে আমাদের ডুলির বিবরণ কিছু না দিলে শিল্প-তীর্থযাত্রার ইতিহাসই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একটা বাঁশ একটি সাড়ে তিন হাত লম্বা খাটিয়ার চারদিকের পায়ায় কঞ্চি বেঁধে ঝোলান, খাটটিতে বসলে সেটা আবার মাথায় ঠেকে। অর্থাৎ কোনগতিকে ঐ বাঁশের দোলায় একটা বস্তার মত গুটিয়ে গুটিয়ে শুইয়ে আমাদের ঝুলিয়ে কুলিরা ক্যাঁচর ক্যাঁচর রব ওঠাতে ওঠাতে সমস্ত পথ নিয়ে চল্ল—সেই গাছের ছালের দড়ি এবং বাঁশের সংঘর্ষে উত্থিত করুণ রোলে যেন 'বাঁশের দোলাতে উঠে কেহে বটে যাচ্চ চলে শ্মশানঘাটে' এই বাউল সঙ্গীতটি ক্রমাগত ধ্বনিত হতে থাকল! পাথরীর পথে আমাদের শিল্প-তীর্থাধিপ রামগড় গিরি তাঁর বৃহৎ মস্তক ও নাসিকা নিয়ে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলের মাথা ছাড়িয়ে আমাদের দুর্দ্দশা দেখে রহস্য করবার জন্যেই যেন থেকে থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্চেন! কিন্তু বলাই বাহুল্য আমাদের অবশ্য সে অবস্থায় তাঁর সেই রহস্যে যোগ দিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হচ্ছিল না!

আমরা কয়েকবৎসর পূর্ব্বে যখন অজণ্টা গুহায় চিত্রের প্রতিলিপি নিতে গিয়েছিলুম তখন সেখানে বাঞ্জার নামক এক জাতীয় লোক দেখেছিলুম। এখানেও ঠিক সেই জাতীয় নরনারীদের দেখলুম। তারা গরু এবং ঘোড়ার পিঠে পণ্যভার বোঝাই দিয়ে স্ত্রীপুত্রপরিজনদের নিয়ে পদব্রজে নির্ভয়ে অরণ্যপথে চলেচে। এই ভব-ঘুরেদের সদানন্দময় ভ্রমণ দেখলে আমাদের জীবন-পথের প্রতি-দিনের যাত্রার এবং তার সমস্ত সংশয়, সঙ্কট প্রভৃতির কথা তারই সঙ্গে যুগপৎ মনে জেগে উঠে!—তফাৎ এই, এরা অরণ্যের প্রতিপদের শত শত বিপদকে সহজভাবে দেখতে জানে, আর আমরা আমাদের বিপদকে গ্রহণ করতেই কাতর।

আমরা পরদিন উদিপুর গ্রামের পান্থাবাসের জন্য নির্ণীত স্থানে যখন পৌঁছলুম, সেখান থেকেও রামগড় গিরি চার মাইল দূরে স্থিত। শুনলুম, আমাদের উদিপুরেই তাঁবুতে বাস করতে হবে; কেন না, রামগড় পাহাড়টি এত অরণ্যময় এবং হিংস্রজন্তুসংকুল যে সেখানে শিবিরাবাসে থাকা কোন মতেই নিরাপদ নয়। একটা বিশাল শাখাপ্রশাখা-প্রসারিত অতি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নীচে আমাদের তাঁবু পড়ল। আমরা সেদিনকার মত বিশ্রাম নিলুম।

গিরি-কাহিনী

রামগড় পাহাড়টি তার পাদদেশ থেকে দু হাজার ফুট উঁচু। সেই পাহাড়ের মাথায় একটা অতি প্রাচীন জীর্ণ-কঙ্কাল মন্দির শৈলরাজের ভগ্ন কিরীটের মত তাঁর কোন্ স্মরণাতীত যুগের গৌরবের সাক্ষ্য দেবার জন্যেই যেন সেখানে বিরাজ করচে। আমরা প্রথমেই সেই মন্দিরটি দেখতে গেলুম। গজপৃষ্ঠে সমতল ভূমি এবং অরণ্যের কিয়ৎ অংশ পার হয়ে, পরে পদব্রজে প্রথমে খুব চড়াই পাহাড় কতকটা দূর উঠলুম ;—শেষে, একটা উঁচু উপত্যকায় এসে পড়লুম। এই উপত্যকাটি অতিক্রম করে সর্ব্বোচ্চ পাহাড়ে মন্দিরে যেতে হয়। সর্ব্বোচ্চ পাহাড়টির গায়ে ঠিক নীচেই ঐ উপত্যকার একটা ঝরণা ও কুণ্ড আছে। প্রবাদ এই যে এইখানে নাকি সীতাদেবী বনবাসের সময় রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে স্নান করেছিলেন। এই স্থানে যখন মেলা হয় তখন তীর্থযাত্রীরা এই ধারাকে অতি পবিত্র ভাগীরথীর চেয়েও পুণ্যপ্রদ বলে মনে করে। আমরা সেখানে কিছুকাল বিশ্রামের পর ক্রমে উঁচু পাহাড়টিতে উঠতে লাগলুম। পথিমধ্যে একটা প্রবেশ-দ্বারের পাথরের ভগ্নাবশেষ পেলুম, তার কারুকার্য্য কালের করাল গ্রাসে একেবারে অন্তর্হিতপ্রায়।—পূর্ব্বগৌরবের পরিচয়টুকু অতিকষ্টে আবিষ্কার করা যায়। সেটা অতিক্রম করে কিছুদূর অগ্রসর হলে কতকগুলি পাথরের খোদাই করা সতীস্তম্ভের মত স্তম্ভ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে দেখলুম। এগুলিও এত ক্ষয়প্রাপ্ত যে তার বিশেষ কিছু নির্ণয় করা গেল না। পথের ধারে আর একস্থানে একটা উচ্চ পাথরের বেদীর মত, তার উপরে ওঠবার সিঁড়ির ধাপ তার গায়েই কেটে তৈরী করা। এগুলির তাৎপর্য্য যে কি তা সহজে ধরা যায় না। তার আরও খানিকটা দূরে আবার একটা ছোট্ট নকল-মন্দির একটা ক্ষুদ্র পাথরের স্তূপ কেটে তৈরী।—এটা যেন তীর্থ-যাত্রীদের আশাপথের একমাত্র ভরসার মত বিরাজ করচে। এক জায়গায় পথের ধারে একটি নাতি-বৃহৎ চৌকো পাথরের গুহার মধ্যেটা ফাঁপা আর তাতে মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে ক্ষুদ্র দ্বার কেটে তৈরী করা। গুহা এবং দ্বারটি এত ছোট যে শিশু ছাড়া কেউই প্রবেশ করতে পারে না।

এইবারে আমাদের দুরারোহ খাড়াই পাহাড়ের আরও উচ্চ শিখরে উঠতে হল। বন্ধুবর সমরেন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি নিরস্ত হলেন। আমাদের সাথী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মিষ্টার ব্ল্যাকিষ্টন তাঁর সহকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়ে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। কোন গতিকে পাহাড়ের উপরে ওঠবার একটি-মাত্র পথ তীর্থযাত্রীদের পায়ে পায়ে তৈরী হয়েচে। অবলম্বনের মধ্যে সামনের পাহাড়ের গায়ের পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি যে কি করে এবং কি সাহসে ঐ পাহাড়ের উপরে উঠেছিলুম যখন নেবে এসে নীচে থেকে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম তখন তা ভেবেই স্থির করতে পারিনি! অনেকক্ষণ ক্রমাগত সরীসৃপের মত পাহাড়ে উঠে যখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, তখন সহসা একটা পাথরের চমৎকার কারুকার্য্যখচিত তোরণ দ্বার সম্মুখে দেখতে পেয়ে যে কি আনন্দ হল তা লিখে ব্যক্ত করা যায় না! আবার যখন সেই দ্বারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা বেশ পরিচ্ছন্ন পাথরের প্রাচীর ঘেরা মঞ্চস্থলের উপর এসে পড়লুম তখন সেখান থেকে দূরের নীচের শৈল-সৌন্দর্য্য যেন স্বপ্নলোকের মধ্যে আমাদের নিয়ে গেল! এই স্বপ্ন-কুহেলি-মাখা বিরাট ধরার শ্যামল কোলটি যে কি অপরূপ ও অনির্ব্বচনীয় তা সেখান থেকে যা উপভোগ করেছিলুম, আমরণ আমার মনে জাগরূক থাকবে। আমাদের দৃষ্টিপথে দিকচক্রবালের সীমান্তের তরঙ্গায়িত সুনীল পর্ব্বতশ্রেণী যেন নীল বিশ্বকমলের দলের মত সহসা বিকশিত হয়ে উঠল!—সে দিক থেকে চোখ ফেরাতে আর মন চায় না।

এখানকার তোরণ-দ্বারটীর দুপাশে দুটি চমৎকার থামের সারে সজ্জিত বারান্দা আর তার একটিতে নাগমূর্ত্তি; তার হাতে, মাথায় সাপ; যোড়হাতে বীরাসনে বসে। মূর্ত্তিটির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য ও গঠন-সৌকর্য্য এবং মুখখানিতে এমন একটা ভাব-সম্পদোজ্জ্বল কমনীয় কান্তি ফুটে উঠেচে যে সে রকম মূর্ত্তি বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। দ্বারের খিলেনের মাঝে একটি সুশোভন আলঙ্কারিক কমল তক্ষিত। আমাদের সে স্থান ত্যাগ করে পুনরায় আরো উপরে উঠতে হল। এবার অল্পকাল মধ্যেই পাহাড়টির চূড়ায় নিম্নভূমি থেকে দুশো ফুট উচ্চে গিয়ে উঠলুম। শীর্ষদেশটী বেশ সমতল। এখানেও একটা প্রবেশ দ্বারের ভগ্ন চিহ্নটুকু মাত্র বিরাজ করচে। কতকগুলি গণপতি দশভূজা প্রভৃতির মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অনাবৃত অবস্থায় পড়ে থেকে থেকে সে গুলির গঠন যদিও অদৃশ্যপ্রায় হয়ে গেছে, তবুও তাতে শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যের বেশ একটু আভাস পাওয়া যায়। পাহাড়ের চূড়ার উপরের মন্দিরটিই রামগড়-মন্দির। এটি যে খুব প্রাচীনকালের নিদর্শন তার গঠন এবং কারু-নৈপুণ্যের রীতি (style) দেখে বেশ বোঝা যায়। মন্দিরটি কতকটা পুরীর ভুবনেশ্বর প্রভৃতি প্রাচীনকালের মন্দিরের ধরণে গঠিত। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা পর্য্যবেক্ষণ করে দেখেচেন যে প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য্যের এবং পরবর্ত্তী ভাস্কর্য্যের একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পীরা কারুকার্য্যগুলির এবং মূর্ত্তিগুলির গঠনের উচ্চতা অর্থাৎ উচু উঁচু করে (relief করে) কখনও গড়তেন না। পরবর্ত্তী যুগে ক্রমশঃ উঁচু করবার দিকে ঝোঁক বাড়তে থাকে। এই মন্দিরের কারুকার্য্যের আকার সমস্তই চ্যাপটা ধরণের। এ থেকে এই মন্দিরটিকে প্রাচীন বলে স্থির করা যায়। এ সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ এই যে মন্দিরটি কোনরূপ মসলা দিয়ে গাঁথা নয়, একটা পাথরের উপরের আর একটা পাথর, এমনি করে সাজিয়ে তৈরী। মন্দিরটির অভ্যন্তরে ছাদের খিলেনও ঠিক ঐ ভাবেই গঠিত। অতি পুরাকালে কোন প্রকার মসলা দিয়ে গেঁথে বাড়ী তৈরী করার রীতি প্রচলিত ছিল না। মন্দিরের মধ্যে ৩।৪ টে বিগ্রহ আছে। একটিতে রাম, লক্ষ্মণ, সতীর মূর্ত্তি খোদাই করা, একটিতে কমণ্ডলুধারিণী যোগিনী মূর্ত্তি, অপরটিতে বিষ্ণুমূর্ত্তি, অন্যটি কমললোচন শ্রীরামচন্দ্র। এই মূর্ত্তিগুলি মন্দিরের পরবর্ত্তী কালের বলেই মনে হয়। বাইরে প্রাঙ্গণে দুয়ারের সামনে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। একটি পিতলের ঘণ্টা তার উপর টাঙ্গান রয়েচে। একটা আধুনিক প্রাচীর বেষ্টনের মধ্যে কতকগুলি ভগ্ন ও অর্দ্ধ ভগ্ন মূর্ত্তি রাখা আছে। এগুলির অবস্থা একেবারেই ভাল নয়! কোন্‌টা যে কি মূর্ত্তি তা স্থির করা এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে! এখানেও কতকগুলি সতী স্তূপের মত স্তূপ আমরা ইতস্ততঃ ছড়ান দেখেচি।

আমরা এবার যোগীমারা গুহা দেখবার জন্যে পাহাড়ের নীচে অবতরণ করলুম। কতকদূর নেবে আসার পর আমাদের পথের পাণ্ডা স্থানীয় পূজারী ব্রাহ্মণ পাহাড়ের শীর্ষে এক জায়গায় দুটো দস্যুর মাথার মত বড় বড় কাল কাল পাথর দেখিয়ে বল্লেন 'ও-দুটি রাবণের মাথা।' আমাদের সে দুটি দেখে আর কিছু বোধের উদয় হোক না-হোক্, পাথরের প্রকাণ্ড অংশটি পাহাড় ছাড়িয়ে আমাদের মাথার ঠিক্ সোজাসুজি ভাবে উপরে যে রকম ঝুলে বেরিয়ে রয়েচে তা দেখে আমাদের নিজেদের মাথা বাঁচান সম্বন্ধেই ভাবনা উপস্থিত হল।—এই বুঝি বা পড়ে! পূজারী ব্রাহ্মণটি মন্দিরের ভিতরের প্রতিমাগুলির যে সকল পরিচয় দিয়েছিলেন তা অতি বিচিত্র! দণ্ড-কমণ্ডলুধারিণী যোগিনী মূর্ত্তিটিকে তিনি যখন 'বালুকি মুনি' নামে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিতে গেলেন তখন আমরা সেটি যে কি পদার্থ অশেষ সাধনা সত্বেও বুঝতে পারলুম না। শিবিরাবাসে সমস্ত দেখেশুনে যখন ফিরে বন্ধু সমরেন্দ্রের সঙ্গে গবেষণা করে দেখলুম তখন বুঝলুম পুরোহিতপুঙ্গব বালুকি কথাটি দ্বারা বাল্মীকিরই নামকরণ করেচেন মাত্র।

পথে সমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সকলের সাক্ষাৎ হল। যোগীমারা গুহাটিতেই আমাদের দ্রষ্টব্য চিত্রগুলি ছিল। যোগীমারা গুহায় যাবার পথে আমাদের ১৮০ ফুট পাহাড়ের নীচে একটা স্বাভাবিক সুড়ঙ্গ পথ পার হতে হল। এই গহ্বর পথের নাম ডাঃ ব্লক লিখেচেন 'হাতীপোল।' কিন্তু, শুনলুম তার নাম হাতী ফোঁড়।—অর্থাৎ গহ্বরপথের

আয়তন এত চওড়া যে তার মধ্যে দিয়ে হাতী ফুঁড়ে পাহাড়ের এপার ওপার হ'য়ে যেতে পারে। সুড়ঙ্গটির সামনে গেলে মনে হয় যেন একটা ঐরাবতের মত প্রকাণ্ড দৈত্য ভীষণ মুখব্যাদান করে অনন্তকাল ধরে তার উদরপূর্ণ আহারের প্রতীক্ষায় বসে রয়েচে! সেই সুড়ঙ্গটির ভিতরে একধারে প্রবেশ পথের সম্মুখে পাহাড়ের গা থেকে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচের পাথরের উপর পড়চে! জল ক্রমাগত প'ড়ে প'ড়ে সেই স্থানটিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একটি গোল পাত্রের আকার ধারণ করেচে। সেখানকার সেই বিন্দু বিন্দু বারিপাতের মৃদু-গম্ভীর শব্দ চারি পাশের পর্ব্বত প্রাচীর গুহা-গহ্বরে, বৃক্ষে অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে দ্বিগুণতর বোধ হ'চ্চে,—যেন অনশনক্লিষ্ট গহ্বর-দৈত্যের দানবী ক্ষুধার তাড়নে তার অশ্রুবারি তার সমস্ত ধমনী শোনিতের নির্য্যাসের মত নিষ্যন্দিত হ'চ্চে! আমরা সেখানকার যুগ-যুগান্তের অনন্ত জলবিন্দুধারায় রচিত পাথরের শীতল জলপাত্রটি থেকে অঞ্জলি করে স্বচ্ছ ও অনাবিল জল পানে সকল ক্লেশ দুর করলুম। এই স্থানটিকে একটি রেখাদ্বারা পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে চিহ্নিত করা আছে। খুব সম্ভব গুহাবাসীরা এখানকার নির্ম্মল জলই পান করতেন বলে স্থানটি শোভিত করার উদ্দেশ্যে এরূপ চিহ্নিত করে রেখেচেন। সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে পুনরায় খানিকটা পাহাড়ে উঠলে পর যোগীমারা ও সীতা বেঙ্গরা নামক গুহাদ্বয়ের সাম্‌নে এসে পড়লুম। পথে একটা গুহা দেখতে পেয়েছিলুম কিন্তু সেটা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। স্বাভাবিক গুহা থেকে আদিমকালে গুহাবাসীরা তাদের বাসস্থান কি করে তৈরী করতেন এটিকে তার একটি নিদর্শন বলা যেতে পারে।

সীতাবেঙ্গরা গুহাটিকে ব্লক সাহেব সীতাবোঙ্গরা নামে অভিহিত করেচেন, কিন্তু ওদেশীয় লোকে বাসস্থানকে বেঙ্গরা বলে এবং এই গুহাটির সেই হিসাবে নামটি সীতাবেঙ্গরা। এই গুহাটিকে সহসা দেখলে একটা পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বাভাবিক পর্ব্বতগুহা বলে ভ্রম হয় কিন্তু তার অভ্যন্তরটি দেখলে সেটিকে স্বাভাবিক গুহা একেবারেই মনে হয় না। কেননা খোদাই করে ভিতরটা বাসের উপযোগী করে গঠিত। ডাঃ ব্লকও অপরাপর কয়েকটি প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে এই গুহাটি ভারতের প্রাচীন নাট্যমন্দিরের একমাত্র নিদর্শন এবং গ্রীকদের প্রাচীন নাট্যমন্দিরের অনুকরণে তৈরী। গুহাটির বাইরে চারকোনে চারটে বড় বড় ছিদ্র আছে। এর থেকে তাঁরা অনুমান করে স্থির করেছেন যে ঐ গর্ত্তের মধ্যে কাঠের খুঁটি দিয়ে যবনিকা টাঙান হত; আর বাইরের দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকার নীচে থেকে ক্রমশ উপরের দিকে গুহায় ওঠবার যে সিঁড়ি আছে সেই সিঁড়িগুলি দর্শকদের বসবার মঞ্চাসনরূপে ব্যবহৃত হত। কিন্তু দ্বারের বাইরের দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকার ভাবে সিঁড়িগুলি থাকায়, নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তরে নট নটীদের অভিনয় দেখা সম্ভবপর নয়। দর্শকের পশ্চাতে নাট্যমন্দির এবং সম্মুখে দৃশ্যপটটি থাকার যে কি সার্থকতা আছে তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। গুহাটির দ্বারের বাইরে এমন প্রচুর দাঁড়াবার স্থান নেই, যে, সেখানে নৃত্যোৎসবাদি ঐ অৰ্দ্ধবৃত্তাকার সিঁড়িতে বসলে দর্শকেরা সামনে দেখতে পায় এরূপভাবে সম্পাদিত হ'তে পারত মনে করা যেতে পারে। সেখানটা আবার খাড়া পাহাড়। তবে, অন্য কোন উপায়ে যদি বাইরে কাঠের স্থায়ী মঞ্চের উপর অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকত ত বলা যায় না। কিন্তু তারও কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় না। ডাঃ ব্লকের রিপোর্টেও এর উল্লেখ দেখিনি। আমাদের মনে হয় এই গুহাটি একটি স্বাভাবিক গুহা। প্রাচীনকালে এখানে ছোটখাট গানবাজনার স্থায়ী সভার জন্যে এবং বাসের জন্য দুই অর্থেই এটিকে এমনভাবে খোদাই করে তৈরী করেছে। আর বাইরে দুয়ারে রাত্রের জন্য কোন রকম আবরণ দেবার উদ্দেশ্যে ঐ গর্ত্তগুলি গুহার প্রবেশ পথের চার পাশে তৈরী করেছিল। গুহাটির ভিতরের উচ্চতা ছয় ফুট। কোন কোন স্থলে কিছু কমও আছে, সুতরাং ছাদ মাথায় ঠেকে। গুহার একেবারে ভিতরে দেয়ালের চারপাশটা উচু বেদী দিয়ে ঘেরা। এগুলির গঠন খুব স্থাপত্য-বিজ্ঞান অনুমোদিত ত নয়ই বরং বেশ একটু কদর্য্য। একটা বড় নালী ঐ বেদীটির নীচে দিয়ে দেয়ালের দিকে চলে গেছে। মেঝের উপর কতকগুলি গর্ত্ত বেশ যত্নসহকারে কেটে তৈরী। এ সকলের উদ্দেশ্য

কি ছিল তা বলা যায় না। উল্লিখিত নালীটির বিষয় একটি মজার প্রবাদ স্থানীয় লোকের কাছে শুনলুম। এই সীতাবেঙ্গরা গুহাটি যে পাহাড়ে অবস্থিত তার বিপরীত দিকে লছমন বেঙ্গরা নামে কতকগুলি গুহা আছে। সেগুলিতেও লোকের পূর্ব্বে বাস ছিল। সে সবগুলিতেও বেদীর মত বসবার এবং শোবার স্থান ভিতরে খোদাই করে প্রস্তুত করা আছে। সেই গুহার মধ্যে একটিতে একটা বৃহৎ নালী আছে! প্রবাদ এই যে বনবাসকালে লক্ষণ উপবাসী থাকৃতেন বলে জানকী দেবী স্নেহের দেবরকে তাঁর বেঙ্গরা থেকে ঐ নালী দিয়ে শ্রীফলের সরবৎ ঢেলে দিতেন, লক্ষণ তাঁর ঘরে বসে সেই অমৃততুল্য পানীয় পান করে বনবাসের অনশন-ক্লেশ অপনোদন করতেন। সীতাবেঙ্গরা গুহার মধ্যে ধনুকতূণীরধারী রামলক্ষণের একটি ভগ্ন বিগ্রহ রাখা আছে। বাইরের দক্ষিণ দিকের দেয়ালের উপর একপাশে একটি পাদযুগলের ছাপ আর তার মাঝে খোদাই করা রেখার দ্বারা আঁকা একটি মল্লের মূর্ত্তি। পাথরের তক্ষিত পদচিহ্নের উপর বৃষ্টি পড়েই হোক বা আপনা থেকেই হোক কাঁচামাটিতে পা চেপে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠিয়ে আনলে যেমন দাগটা দেখায় এটিও ঠিক সেই রকম। স্থানীয় লোকেরা সেটিকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম বলে অভিহিত করে থাকে।

এই সকল রহস্যজনক ব্যাপার দেখে আমরা যোগীমারা গুহায় গেলাম। এই গুহাটি একটি স্বাভাবিক গুহা। লম্বায় দশ ফুট, চওড়ায় ৬ ফুট মাত্র। এরই ছাদের নীচে কতকগুলি লাল রেখাদ্বারা ভাগে ভাগে আঁকা ছবি আছে। ছবিগুলিতে নীচে দাঁড়িয়ে সহজেই হাত পাওয়া যায়। গুহাটিতে আলোর কোনই অসদ্ভাব নাই। সমস্তটাই খোলা। ছাদের এক পাশে একটা আলোক-পথের মত বড় ছিদ্রপথও আছে। এত আলো থাকতেও ঐ ছিদ্রের প্রয়োজনীয়তা যে কি হতে পারে তা বলা যায় না! এই গুহার চিত্রগুলি প্রথম দর্শনেই আমাদের বাঙ্গলাদেশের প্রাচীন পাটার অতি নিকৃষ্ট উদাহরণের কথাই মনে হয়েছিল। আমরা নকল নেবার সময় পরে কতকগুলি ছবির নীচের রং, যা উপরের অন্য রংএ চাপা পড়ে গেছে, দুএক স্থানে উপরের বর্ণ উঠে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছে দেখেছি তাতে মনে হয় যে, পূর্ব্বে উৎকৃষ্টতর উদাহরণেরও হয়ত গুহাটিতে অসদ্ভাব ছিল না। পরবর্ত্তী কোন লোক (অবশ্য অতি প্রাচীন কালেই) পুনরায় রং দিয়ে ঐ সকল চিত্র ঢেকে তাঁর নিজের চিত্রচাতুর্য্যের নমুনা রেখে গেছেন। চিত্রের দক্ষিণ দিকের প্রথম অংশে কতকগুলি লোক একটা হাতীকে তাড়া করছে আর তার নীচে সাদা, লাল, এবং কাল রঙের আলঙ্কারিক রীতিতে আঁকা কয়েকটি অদ্ভুতদর্শন মকরের ছবি। সেগুলি যে জলের মধ্যে বিচরণ করছে পাছে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ জন্মায় সেই ভয়ে শিল্পী গোটাকতক গোল গোল কাল কাল রেখার তরঙ্গ তুলে বুঝিয়ে দিয়েছে। ২য় অংশে একটি তরুতলে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট। কি করছে বোঝা যায় না! বৃক্ষটিকে একটি গুঁড়ির উপর কয়েকটি ডাল আর দুচারটে পাতা এঁকে দেখান হয়েছে। পাতা আর গাছের রং লাল। ৩য় অংশে—একটি উদ্যান সাদাজমীর উপর কাল রেখা দিয়ে অঙ্কিত। বাগানটি আশ্চর্য্যভাবে কতকগুলি শুধু কুমুদ পুষ্পের মত ফুল এঁকে দেখান হয়েছে। স্ত্রী ও পুরুষের যুগল মূর্ত্তি একটি ঐ প্রকার বিচিত্র ফুলের উপর হাত ধরাধরি করে নৃত্য করছে! মনুষ্যমূর্ত্তি লাল রেখায় আঁকা, হাত, মুখ, পা, লাল রঙে একেবারে ভরান। চোখ নাকের খোঁজ তাতে বড় একটা পাওয়া যায় না। ফুল গুলিতে কোন রংই নেই, চিত্রের সাদা জমীটাই তার বর্ণ। ৪র্থ খণ্ডের চিত্র গুলি ভারি বিচিত্র! কতক গুলি 'হাত নলী নলী পা সরু, পেট ডাগরা গাল পুরু' মাটির ছেলে-ভুলানো খেলনার মূর্ত্তির মত লাল রংএর মনুষ্যমূর্ত্তি। আবার তার চোখের ভিতরগুলি সাদা এবং বাইরে ধারে চারিপাশে কাল রেখাদ্বারা সিয়াকলম * করে ফোটান। মূর্ত্তিগুলির কৌতুকাবহ চোখের ভাবের বা গঠনের ভঙ্গী দেখলে সত্যই হাসি ধরে রাখা যায় না! মূর্ত্তির অবয়বের

* ভারতবর্ষীয় চিত্রশিল্পের রীতিতে পূর্ব্বে ছবি আঁকার শেষে বিশেষ কাজ হচ্চে যথাযথাস্থানে কালো রেখা দিয়ে ছবিকে ফুটিয়ে তোলা। মোগল শিল্পীরা পূর্ব্বে এই কাজটিকে সিয়া কলম বলতেন। আধুনিক কালীঘাটের পোটোদের মুখেও এই কাজকে ঐ নামেই বলতে শুনেছি।

সীমারেখাগুলিও সিয়াকলম করা। একটা মানুষের মাথায় একটা পাখীর চঞ্চুটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে—তার কারণ বা উদ্দেশ্যের বিষয় জান্‌বার কা'রো প্রয়োজন হ'লেও জানবার উপায় নেই! এ রহস্য চির কালই অজ্ঞাত থাক্‌বে! ৫ম চিত্রে একটি মহিলা আসন-পিঁড়ি হ'য়ে বসে আছেন; কতকগুলি গায়ক ও বাদক নৃত্যগীতে মেতে আছে। এই ছবিটির রেখা এবং অঙ্কনচাতুর্য্য অজণ্টার নিকৃষ্ট চিত্রের লীলায়িত তুলিকার সঙ্গে প্রায় মেলে। অজণ্টার নৃত্যগীতোৎসবের একটা ছবির সঙ্গে খুবই সাদৃশ্য আছে। তবে সেটির মত উৎকৃষ্ট ছবি এটি একেবারেই নয়। ফল কথা, রামগড়ের সমস্ত ছবির মধ্যে এই ছবি-টিতেই একমাত্র শিল্পীর তুলির টানের পরিচয় পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ডের ছিত্রগুলি ক্রমেই অদ্ভুত ও অস্পষ্ট আকার ধারণ করেচে। চৈত্য মন্দিরের মত কতকগুলি প্রাচীন গৃহের চিত্রও কয়েকটি স্থানে আছে। আদিম যুগের রথের চিত্রের নমুনাও কয়েকটি স্থানে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের এবং প্রাচীন গ্রীসীয় রথের একটা অত্যা-শ্চর্য্য মিল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানকার চিত্রেও অবশ্য অন্যথা হয়নি। তবে দুভাগ্যবশত কোন্ দেশের রথের অনুকরণ করেচে সে বিষয় স্থির মীমাংসা করার শক্তি আমার নেই; অতএব সে ভার প্রত্নতত্ত্ববিদের হাতেই ন্যস্ত রইল। অজণ্টার ভিত্তি গাত্রের এবং ছাদের নীচের চিত্রগুলি যেমন গোবর মাটি তুঁষ প্রভৃতি দিয়ে পাথরের দেওয়ালের উপর একটা উঁচু ও সমতল জমী তৈরী ক'রে তার উপর আঁকা এখানকার চিত্রগুলি সে রকম কোন একটা বিশেষ ভাবে পট-ভূমি তৈরী করে বা সযত্নে আঁকা হয়নি। মাত্র সাদা, কালো এবং লাল এই তিনটি বর্ণ ছাড়া কোন বর্ণই চিত্রগুলিতে নেই। কয়েকস্থলে পীত বর্ণ দেখা গেলেও সেগুলি লাল গৈরিকেরই প্রাচীন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কালের আবর্ত্তে লালের রক্ত শোষণ ক'রে পীত-ক্লিষ্ট ক'রে তুলেচে! আমি পথের কথায় পূর্ব্বে যে সাদা মাটির বিষয় উল্লেখ করেচি চিত্রের সাদা রং সম্ভবত সেই রকম মাটি থেকেই উৎপন্ন। কেন না, এই স্থানে পাহাড়ের উপর রামগড় মন্দিরের নিকটেই তীর্থযাত্রীদের তিলক মাটির জন্যে ব্যবহার করবার উৎকৃষ্ট সাদামাটি একটি গুহাভ্যন্তরে প্রচুর পাওয়া যায়। ঘন গৈরিক রঙের পাথর পর্ব্বতপ্রদেশে বিরল নয়। মসীকৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তুত করা রামগড়ের অরণ্যবাসীদের পক্ষে খুবই সহজ। কেন না, হরিতকীভস্ম থেকে প্রাচীন কালে খুব উৎকৃষ্ট কালী তৈরী হ'ত। রামগড়ের বনকে হরিতকী-কানন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। স্পষ্ট বোঝা যায় রং দিতে বা প্রস্তুত কর্‌তে কোনোটাতেই অজণ্টার শিল্পীর মত এখানকার শিল্পী দক্ষ ত নয়ই, বরং নিতান্ত অপটু পটুয়া বলেই বিশ্বাস জন্মে। খালি সাদা রং পাহাড়ের অসমতল তরঙ্গায়িত পাথরের গায়ের উপর লেপন ক'রে ছবি আঁকার জমী তৈরী আর তারই উপর অবলীলাক্রমে আঁকাও হ'য়েচে। মোটের উপর, রামগড়ের চিত্রে একটা নির্ব্বিচার উৎসাহ এবং সাহসের পরিচয় পেয়ে আমরা ভারি একটা আনন্দ অনুভব করেছিলুম।

লছ্‌মন বেঙ্গরা, যোগীমারা, সীতাবেঙ্গরা প্রভৃতি ছাড়া আরো অনেকগুলি স্বাভাবিক গুহাকে বাসোপযোগী করে বাটালী দিয়ে কেটে তৈরী করা হয়েচে, এবং কতকগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এক একটি গুহায় সহসা প্রবেশ করা দুরূহ। কতকগুলিতে প্রবেশ করার আশা একেবারেই ত্যাগ কর্‌তে হ'য়েছিল। একটা স্বাভাবিক গুহা আছে তার বাইরেটা একেবারে একটা ঠিক চোখের মত হুবহু দেখতে। বৌদ্ধ গুহার সঙ্গে রামগড়ের গুহাগুলির কোন সাদৃশ্য নেই বা বৌদ্ধ আমলের কোন চিহ্নও কিছুই নেই।

আমরা প্রায় দু মাস শিবিরনিবাসে সেখানে অবস্থান করে, পেণ্ড্রারোড ষ্টেশনে ফেরবার পথে অপর এক-স্থানে একটি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে-ছিলুম। এটি একটি রাজপুতদের মন্দির। ভিতরে কোন প্রতিমাই নেই। রামগড়ের সতীস্তম্ভের চেয়ে ভাল অব-স্থার কতকগুলি স্তম্ভ মাটিতে এখানে সেখানে পোঁতা আছে। এ গুলি যে সতীস্তম্ভ তা তার কারুকার্য্য দেখ-লেই জানা যায়। স্তম্ভের উর্দ্ধদেশে একটী অলঙ্কার শোভিত স্ত্রীহস্ত এবং অধোদেশে অশ্বারোহিমূর্ত্তি সম্ভবত রাজপুতের প্রতিমূর্ত্তি। এই স্থানটি পর্ব্বতের অত্যুচ্চ উপত্যকায় অবস্থিত। পথের অন্যান্যস্থানের দৃশ্য অপেক্ষা

এই স্থানটিতে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের এক বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্য ছিল। হরিতকী, আমলকী, শাল, তমাল প্রভৃতি বৃক্ষ প্রায় নেই। এখানে চারিপাশে সবুজ বাঁশের বন, যেন 'হরিয়ার ফোয়ার' চল্‌চে! বাতাসে যখন বাঁশের অগ্রভাগের নত ও নবীন-সূক্ষ্ম শাখাগুলি আন্দোলিত হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁর কচি কচি পাতাগুলি উৎস উৎক্ষিপ্ত জল-কণিকার মত বারবার পবন-তরঙ্গে নৃত্য করতে থাকে, তখন হঠাৎ চোখ মেলে দেখলে সত্যই শত শত সবুজ-ফোয়ারা বলেই ভ্রম হয়!

রামগড়ের সীতা বেঙ্গরা এবং যোগীমারা গুহা দুটি-তেই প্রাচীর গাত্রে গভীর গর্ত্ত করে শিলালিপি খোদাই করা আছে। সে দুটিতে একজন নটীর এবং একজন ভাস্করের প্রণয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করা। ডাঃ ব্লক প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করেচেন এই লিপির অক্ষরগুলি অশোকের আমলের লিপির চেয়েও পুরাতন। এই শিলালিপি ধরেই এই স্থানের, গুহাগুলির প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়। ডাঃ ব্লক অজণ্টা গুহা, সিগিরিয়া প্রভৃতির চিত্র অপেক্ষা যোগীমারার চিত্রই অধিক প্রাচীন বলে নির্ণয় করেচেন। এশিয়াটিক সোসাইটীর জার্নেল নামের পত্রিকায়, বহুপূর্ব্বে ব্লক সাহেব রামগড়গিরির প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যা যা আবিষ্কার করেছিলেন, লিখেচেন। তিনি সীতাবেঙ্গরা যোগীমারা গুহা দুটিতে নটীর নাম উল্লেখ আছে দেখে সে দুটির মধ্যে সীতাবেঙ্গরাকে গ্রীকদের নকলে তৈরী নাট্যমন্দির বলেচেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ডাঃ ব্লক রামগড়ের প্রাচীন মন্দিরটির সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কোন আলোচনা করেন নি। কিন্তু আমাদের ঐ মন্দিরটি এবং গুহাগুলি দেখে মনে হ'য়েছিল এই সকল গুহাবাসীদের সঙ্গে মন্দিরের কোন-না কোন বিষয়ে যোগ ছিল। কেননা, প্রাচীন ভারতে মন্দিরের দেবসেবার উদ্দেশ্যে নৃত্য-কলাভিজ্ঞ দেবদাসী নিযুক্ত থাকৃত, তাদের নাচের ভঙ্গীর দ্বারাও দেবার্চ্চনার একদিকের কাজ অনুষ্ঠিত হ'ত। পূর্ব্বকালের রীতি অনুযায়ী এখনও দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন মন্দির গুলিতে ঐরূপ নৃত্যকলার প্রচলন আছে। সেই হিসাবে রামগড়ের মন্দিরটিতেও যে নটী নিযুক্ত ছিল একথা বোধ হয় অসঙ্কোচে বলা যেতে পারে এবং সেই দেবদাসীদের সঙ্গে গুহার গুহাবাসীদেরও যে একটা যোগ ছিল, একথাও নিতান্ত আনুমানিক নয়।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের শিবির নিবাস থেকে বর্ষায় মন্দাক্রান্তাছন্দের মত গুরুগম্ভীর দিবসে একদিন রামগড়ের গিরির শিখরদ্বয়ের মধ্যে তার উপত্যকার শ্যামল ক্রোলটিকে আচ্ছন্ন করে বিরহীর অশ্রুভারাক্রান্ত আঁখির মত বাষ্পভারে গদগদ্ বারিধিপুঞ্জ মন্থর গতিতে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হ'য়ে নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথে ভেসে চলেচে দেখলুম!—সেদিন আমাদের সেই প্রবাসে অরণ্য-বাসে আষাঢ়ের প্রথম দিবস না হলেও, 'বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ' প্রভৃতি কবিবর্ণনাগুলি যেন কল্পনার কল্পলোক থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের এই প্রত্যক্ষ নয়নপথে ধরা দিলে! কেন জানিনা, সেদিন আমাদের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছিল যে বুন্দেলখণ্ডের রামটেক এবং এই রামগড়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত মেঘদূতের কবিবর্ণিত রামগিরি? প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কেন জানিনা বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত পর্ব্বতকেই রামগিরি বলেন। কিন্তু যদি মেঘদূতের জনকতনয়া-স্নানপুণ্যোদক কিম্বা বাল্মীকিবর্ণিত চিত্রকূট পর্ব্বতের বৃক্ষাদির দ্বারা স্থানটির নির্দ্দেশ করতে হয় তবে রামগড়কেও অনায়াসে রামগিরি বলা চলে। রামটেকের চেয়ে রামগড়কেই রামগিরির অপভ্রংশ বলা যেতে পারে। রামগড় নামক স্থান ভারতবর্ষের অনেক স্থানে আছে সত্য, কিন্তু এখানে রামের বিষয়ে যত প্রাচীন কথা প্রচলিত আছে এমনকি মূর্ত্তি প্রভৃতিও আছে, অপর কোন খানেই তা নেই। দুঃখের বিষয় এই, রামগড়ের প্রকৃত-প্রস্তাবে কোন ইতিহাসই আবিষ্কৃত হয়নি। তার প্রধান কারণ এই স্থানটি সহজগম্য ত নয়ই, বরং দুরধিগম্য।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

অথর্ববেদ-সংহিতা

পুরাকালে পরব্রহ্ম সৃষ্টির নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার ফলে ভৃগুনামক মহর্ষির উৎপত্তি হয়। অথর্ব্বা তাঁহারই অপর নাম। অনন্তর অঙ্গিরা নামক মহর্ষির আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের দুইজন হইতে বিংশতিসংখ্যক অথর্ব্বা ও অঙ্গিরার উদ্ভব হয়। তপস্যা হইতে সেই বিংশতিসংখ্যক ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণের হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ বেদ সমুৎপন্ন হইয়াছিল। গোপথব্রাহ্মণে আছে—"শ্রেষ্ঠো হি বেদস্তপসোঽধিজাতো ব্রহ্মজ্ঞানাং হৃদয়ে সংবভূব"। ঐ মহর্ষিগণের নাম হইতে এই বেদ অথর্ব্বাঙ্গিরস বা অথর্ব্ববেদ নামে অভিহিত হয়। মহর্ষিরা সংখ্যায় বিশ জন ছিলেন বলিয়া এই বেদেরও বিশটী কাণ্ড হয়।

অথর্ব্ববেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্য গোপথব্রাহ্মণ সমর্থিত উক্ত আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদেরই একমাত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থ। কিন্তু অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদ্‌গ্রন্থ অনেকগুলি। মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, প্রশ্ন, শিরো, গর্ভ, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, যোগশিক্ষা, যোগতত্ত্ব, সন্ন্যাস, আরুণেয়, ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষুরিক, চুলিক, অথর্ব্বশিক্ষা, ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, নীলরুদ্র, কণ্ঠশ্রুতি, পিণ্ড, আত্মা, রামপূর্ব্বতাপনী, রামোত্তরতাপনী, রাম, সর্ব্বোপনিষৎসার, হংস, পরমহংস, জাবাল, কৈবল্য প্রভৃতি উপনিষদ্‌গুলি অথর্ব্ববেদান্তর্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রের প্রয়োগবিধিসম্বলিত সূত্রগ্রন্থ পাঁচখানি—কৌশিক, বৈতান, নক্ষত্রকল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প। এতদ্ব্যতীত একখানি পরিশিষ্টও আছে। অথর্ব্ববেদের প্রাতিশাখ্য চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

অথর্ব্ববেদের নয়টী শাখা—পৈপ্পলাদ, তৌদ, মৌদ, শৌনকীয়, জাজল, জলদ, ব্রহ্মবদ, দেবদর্শ এবং চারণবৈদ্য। শৌনকীয় শাখার সংহিতাগ্রন্থই এক্ষণে পাওয়া যায়। এই শাখার সংহিতাই মুদ্রিত হইয়াছে। পৈপ্পলাদ শাখার ভূর্জপত্র লিখিত একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ফটোগ্রাফির সাহায্যে প্রত্যেক পত্রের প্রতিকৃতি লইয়া উহার কয়েক খণ্ড নকল প্রস্তুত হইয়াছে।

গোপথ-ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায় যে অথর্ব্ববেদের পাঁচখানি উপবেদ—সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাসবেদ এবং পুরাণবেদ। চরক সুশ্রুতাদির গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপবেদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু বেদজ্ঞগণ উহাকে ঋগ্‌বেদের উপবেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম ঋক্‌, গদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম যজুঃ, এবং গানাত্মক মন্ত্রের নাম সাম। অথর্ববেদে প্রথমোক্ত দুই প্রকার মন্ত্র আছে। এজন্য, "অথর্ব্ববেদ ত্রয়ীর অন্তর্গত নহে, কারণ ত্রয়ী বলিতে ঋগ্‌, যজুঃ ও সাম বেদকে বুঝায়"—এরূপ বলা ভ্রমাত্মক।

অথর্ব্ববেদ সংহিতা পরিমাণে ঋগ্‌বেদ সংহিতা অপেক্ষা অনেক ছোট। ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রসংখ্যা প্রায় (কিঞ্চিদাধিক) দশ হাজার, অথর্ব্বসংহিতার মন্ত্রসংখ্যা প্রায় (কিঞ্চিন্ন্যূন) ছয় হাজার। প্রায় বারশত মন্ত্র উভয় সংহিতায় সাধারণ। এগুলি বাদ দিলে, অথর্ব্বসংহিতা ঋক্‌সংহিতার অর্দ্ধেকেরও কম হয়। কিন্তু ধর্ম্ম, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞানলাভার্থ উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা সমান। এমন কি ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ে অথর্ব্বসংহিতা হইতেই অধিকতর জ্ঞান লাভ করা যায়। এই ব্রহ্মবিদ্যার আকরও ব্রহ্মনামক ঋত্বিকের কর্ত্তব্যপ্রতিপাদক বলিয়া অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মবেদ নামেও অভিহিত হয়। সায়ণাচার্য্য অথর্ব্বসংহিতা-ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে লিখিয়াছেন—"এবং সারভূতব্রহ্মাত্মকত্বাদ্‌ ব্রহ্মকর্ত্তব্যপ্রতিপাদনাচ্চ অয়ং ব্রহ্মবেদ ইত্যপি আখ্যায়তে।"

সায়নাচার্য্যের মতে ঋক্‌, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদ স্বর্গরূপ পারলৌকিক ফল প্রদান করে মাত্র, কিন্তু অথর্ব্ববেদ ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার ফল প্রদান করে। ইহাতে নানা প্রকার ঐহিক ফলের মধ্যে সংগ্রামজয়, ইষুখড়্গাদিনিবারণ, শত্রুসৈন্যপ্রশমন প্রভৃতি রাজগণের উপযোগী অনেকগুলি ফলও বিহিত হইয়াছে। এজন্য রাজপুরোহিতের অথর্ব্বমন্ত্র ও ব্রাহ্মণের জ্ঞান আবশ্যক—ইহা নানা পুরাণ ও নীতি শাস্ত্রে উক্ত

হইয়াছে। অন্য বেদীয় পুরোহিত করণের দোষও উক্ত আছে। কালিদাস রঘুবংশীয় রাজগণের পুরোহিত বশিষ্ঠকে অথর্ব নিধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথর্ব বেদে সাধারণ লোকের উপযোগী নানা প্রকার শান্তি ও পৌষ্টিক কর্ম্মও বিহিত হইয়াছে। সকল গুলির নাম করিতে গেলে প্রকাণ্ড তালিকা হইয়া পড়ে। সায়ণাচার্য্য দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিতে গিয়া কোয়ার্টো পৃষ্ঠার প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করা যাইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বেদ হইতে ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু বেদের ভাষা দুর্বোধ। ঐ ভাষা কি উপায়ে বুঝিতে হইবে, সে বিষয়ে প্রথমতঃ বারান্তরে কিছু আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীধীরেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন।

পঞ্চশস্য

পথের ব্যথা—প্রতিদিন সহরের পথে পথে মানবজীবনের যে করুণ নাট্যলীলা অভিনীত হইয়া চলিয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য করিবার মতো দৃষ্টি, সহৃদয়তা ও অবসর আমাদের অনেকেরই নাই। সচেতন হইয়া দৃষ্টি মেলিয়া লক্ষ্য করিলে জানা যায় সেখানে দারিদ্র্য, উৎপীড়ন, অত্যাচার জাঁতার মতো সজোরে কত নরনারী ও শিশুকে পিষিয়া ফেলিতেছে। য়ুরোপের প্রাণবন্ত নরনারী কর্ম্মে, সাহিত্যে, শিল্পে এই পথের ব্যথায় ব্যথিত হওয়ার পরিচয় অহরহ দিতেছেন। আমরা সুখবিলাসীরা দুঃখকে ডরাই; এজন্য দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া থাকিলেও দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইতে সাহস করি না; দুঃখমূর্ত্তিকে সম্মুখে দেখিলে আমরা আৎকাইয়া উঠি, সে কঙ্কালসার করুণ ছবি আমরা পরিহার করিয়া চলিতে চাই। কিন্তু যাঁহারা সহৃদয়, পরের বেদনায় ব্যথিত, তাঁহারা কাহাকেও রেহাই দেন না; তাঁহারা সমাজের কুৎসিৎ বীভৎস মূর্ত্তি নানারূপে উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করেন। এ সব দৃশ্য দেখিয়া আমাদের অন্তর অশান্তি ভোগ করে, তবু না দেখিয়া উপায় থাকে না; প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যের ছবিকে অস্বীকার করাও চলে না।

এই পথের ব্যথাকে কেহ বা পরিশ্রমের জয় বলিয়া দেখিয়া সেইরূপে তাহাকে অঙ্কিত করেন; কেহ বা দেখেন শুধু কৌতুক ও হাস্যকর অসামঞ্জস্য; কেহ বা দেখেন তাহার সর্ব্বাবয়ব—হাসি ও অশ্রু, আনন্দ ও বেদনা, দুই পাশাপাশি।

এইরূপ একজন শিল্পী তেয়োফিল্ আলেক্‌জান্দ্র্ স্তেইলাঁ। ইনি ফরাসী। ইঁহার ছবিতে মানবজীবন বড় রূঢ় সত্য রকমে প্রকাশ পাইয়াছে। ইঁহার ছবি ঘরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত আরাম উপভোগ করিবার জো নাই। ইঁহার একখানি ছবির নাম "চোর।" একটি অনাহারশীর্ণ বালক ছিন্ন বস্ত্রে খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড়াইয়া দোকানের মধ্যে জামা কাপড় জুতা সাজানো রহিয়াছে দেখিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া চুরি করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে। "নর্ত্তকী" ছবিখানিতেও এইরূপ একটি শীর্ণ বালিকা পেটের দায়ে আপনার জীবনটাকে ধুলায় ফেলিয়া দিতেছে। কোনো ছবিতে বেকার মজুর সমস্ত দিন বৃথায় কাজের চেষ্টায় হয়রাণ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে; অপেক্ষমানা পত্নী ক্লান্ত পতিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। ইহা দেখিলে মনে হয়, জগৎ নিরবচ্ছিন্ন মরুভূমি নহে—এমন আনন্দ ধনীর অবহেলা, অত্যাচারীর উৎপীড়ন, দুঃখের তাণ্ডব অগ্রাহ্য করিয়া মুমূর্ষু চিত্তকেও সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। একখানি ছবিতে দেখানো হইয়াছে—একটি ধনীর প্রাসাদে

ভাবী নর্ত্তকী

স্তেইলাঁ এই চিত্রে দেখাইয়াছেন অনাহারকৃশ একটি বালিকা পেটের দায়ে সমাজের ঘৃণ্য ব্যবসায়ে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া তাহারই শিক্ষানবিশী করিতেছে, উচ্চ মঞ্চে উপবিষ্ট প্রচুর আহারপানে স্থূলদেহ ধনীকে ভবিষ্যতে বিলাসের উপকরণ জোগাইয়া জীবিকা সংগ্রহের আশায়।

ধনী মহিলার মাতৃত্ব একটি পথের ভিখারী মেয়েকে দেখিয়া উদ্বোধিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি তাহাকে ঘরে ডাকিয়া কোলে করিয়া তাহার দারিদ্র্যমলিন গণ্ডে চুম্বন করিতেছেন খোলা জানালা দিয়া দূরে কারখানাঘরের শ্রীহীন ধ্রেসের মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে, সেখানে পেটের দায়ে শিশুহৃদয় পর্য্যন্ত পিষ্ট হয়।

ইঁহার চিত্রগুলি অনেকটা ব্যঙ্গচিত্রের ধরণে এবং কতকটা ভবিষ্যশিল্পপন্থীদের কেবলমাত্র ভাবের ইঙ্গিত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। চা।

সুপ্রজনন বিদ্যার জন্মদাতা।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে Eugenics Education Society (ইউজেনিক্‌স্ এডুকেশন সোসায়েটী) Sir Francis Galton (সার্ ফ্রান্‌সিস্ গ্যালটন্) এর জন্মোৎসব করিয়াছেন। গ্যাল্টন্

পথের গাইয়ে।

স্তেইলাঁ এই চিত্রে সমাজব্যবস্থায় ধনী দরিদ্রের অবস্থার তারতম্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ধনীরা অলস বিলাসে প্রচুর পান ভোজনে পরিপুষ্ট; তাহাদিগকে সঙ্গীতে তুষ্ট করিতেছে পথবাসী উপবাসী জীর্ণ ক্লিষ্ট নরনারী।

পথের ভিড়।

স্তেইলাঁ পারীনগরের পথের নানাপ্রকারের চীৎকার একটি মুহূর্ত্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮২২ খৃঃ অব্দে ১৬ ফেব্রুয়ারীতে জন্মগ্রহণ করেন। এখন হইতে প্রতি বৎসর তাঁহার জন্মোৎসব হইবে, এইরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। গত উৎসবে Major Leonard Darwin (মেজর্ লিয়োনার্ড ডারুইন্) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের আরম্ভে গ্যাল্টনের গুণকীর্ত্তন করেন। ইনি যে কতদূর সম্মানের পাত্র এবং ইঁহার স্মৃতির সম্মান করা যে আমাদের কেন কর্ত্তব্য তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। মানব সমাজ গ্যাল্টনের নিকট অনেক বিষয়েই ঋণী—বংশোন্নতির ঠিক উপায়টির সন্ধান দিয়াছেন বলিয়া বিশেষভাবেই ঋণী। তাঁহার সুপ্রজনন বিদ্যার একমাত্র লক্ষ্য ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উৎকর্ষ সাধন এবং বংশমধ্যে যাহাতে সদ্গুণের ধারা প্রবাহিত হইতে পারে, তাহারই উপায় নির্দ্ধারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্যাল্টন্ যে শুধু মুখেই আপনার মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহার কথিত সদ্গুণগুলি যে কি, তাহা নিজের দৃষ্টান্তে সাধারণকে দেখাইতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণ শেষ হইলে Sir Francis Darwin (সার্ ফ্রান্সিস্ ডারুইন্) একটি বক্তৃতা করেন। সার্ ফ্রান্সিস বলেন—Galton (গ্যাল্টন্) অনেক সময় তাঁহার পরীক্ষাগুলি নিজের উপরই সম্পন্ন করিতেন। Bermingham Hospital (বার্মিংহাম হাঁসপাতাল)এ অধ্যয়নকালে তিনি ব্রিটিশ্ ফার্ম্মেকোপিয়া (British Pharmacopia)র উল্লিখিত সমস্ত ঔষধের ক্রিয়া আপনার দেহের উপর পরীক্ষা করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন এবং কিয়দ্দূর অগ্রসরও হইয়াছিলেন। যে সকল ঔষধের আরম্ভে A ও B অক্ষর আছে, সেগুলির পরীক্ষা নির্ব্বিঘ্নেই সমাধা হইয়াছিল। C অক্ষরের বেলায় Croton Oil (জয়পালের তৈল)এর পরীক্ষাকালে, তাঁহার প্রাণ সংশয় হইবার মত হইয়াছিল। সুতরাং পরীক্ষার সংকল্প তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সকল পরীক্ষার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক পরীক্ষাগুলি হইতেছে তাঁহার নিজের মনের উপর। গ্যাল্টনের পূর্ব্বে বোধ করি আর কেহই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (Free will)এর মধ্যে যে একটা নিগূঢ় রহস্য (Mystery) আছে তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহার জন্য তিনি কিরূপ ধারাবাহিক প্রণালীতে আত্মবেক্ষণ ও আত্মপরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয়। একবার তাঁহার মনে উদয় হইল—অসভ্য বর্ব্বর জাতি তাহাদের উপাস্য দেবতা মূর্ত্তিগুলিকে কি ভাবে ভয় করে, তাহা নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া দেখিতে হইবে। যেমন ইচ্ছা, অমনি তাহার উদ্যোগ আরম্ভ। গ্যাল্টন্ কল্পনা বলে আপনাকে অসভ্যের পদবীতে অবতীর্ণ করাইলেন। আর একবার পাগলের মনোভাব বুঝিবার জন্য তিনি কল্পনা সাহায্যে আপনাকে পাগলের পদবীতে অবস্থাপিত করিয়াছিলেন। সুপ্রজনন বিদ্যার আলোচনা কালে, তাঁহার এই সকল পরীক্ষা তাঁহার কার্য্যে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। গ্যাল্টন্ বলিতেন অন্যায় বিবাহ যে একরূপ পাপ কার্য, মানুষের মনে এ সংস্কারটা জন্মাইয়া দেওয়া একবারে অসম্ভব নয়। গ্যাল্টনের কল্পনাশক্তি অতিশয় প্রখর ছিল—কবির মত তাঁহার হৃদয় অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ছিল, সুতরাং সাধারণের নিকট যে সকল কাজ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত, গ্যাল্টনের কাছে তাহা অতীব সহজ বলিয়াই অনুমিত হইত। প্রথম জীবনে তিনি সাধারণের নিকট পর্য্যটক ও Meteorologist বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ইহার পর তিনি বংশানুক্রম (Heredity) ও সুপ্রজনন বিদ্যা (Eugenics)এর অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্ত্তি অমর বলিলেই হয়। ১৮৫৯ সালে ডারুইনের

Darwin)এর Origin of Species গ্রন্থ পাঠ করিয়া গ্যাল্টন্ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হন। তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের গবেষণাপক্ষে Origin of Speices খুবই সাহায্য করিয়াছিল। গ্যাল্টন্ বলিতেন Origin of Speices যে তিনি এত সহজে আপনার মত করিতে পারিয়াছিলেন তাহার কারণ Erasmus Darwin (এরেস্‌মাস্ ডারুইন্) Darwin (ডারুইন্) ও তাঁহার ঠাকুরদাদা বলিয়া। ১৮৬৫ সালে গ্যাল্টন্ Macmillazn's Magaine পত্রিকায় অভিব্যক্তিবাদ (Evolution) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্য সমূহের বীজ এই প্রবন্ধ দুইটির মধ্যেই নিহিত থাকিতে দেখা যায়। তাঁহার প্রথম পুস্তক Hereditary Cenius অনেকের নিকট তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। ডারুইন্ এই পুস্তক পড়িয়া এতদূর উল্লসিত হইয়াছিলেন যে তিনি গ্যাল্টন্‌কে এক পত্রে লিখেন—জীবনে এমন ভালো ও মৌলিক গবেষণা পূর্ণ পুস্তক আর একখানি যে পড়িয়াছ এমত তো মনে হয় না। সংখ্যা তালিকা (Statistical Methods) সাহায্যে বংশানুক্রমের নিয়মগুলির প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে গ্যাল্টনই করিয়াছিলেন। জগৎ চিরকালই গ্যাল্টন্‌কে সুপ্রজনন বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে শ্রদ্ধা করিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। সুপ্রজনন বিদ্যার (Eugenics) উন্নতি কল্পে তিনি University College (ইউনিভার্সিটী কলেজ) এ প্রভূত অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে উক্ত বিদ্যার প্রতি তাঁহার কিরূপ আন্তরিক অকপট শ্রদ্ধা ছিল তাহা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে।

সুপ্রজনন বিদ্যা ও সার্ জেম্‌স্ বার্।

"সুপ্রজনন বিদ্যা (Science of Eugenics)এর দুইটা দিক আছে এক হইতেছে আদেশকাণ্ড, অন্য হইতেছে নিষেধকাণ্ড—এক "হাঁ"র দিক—আর "না"র দিক। ইহার আদেশকাণ্ডে, যে সব ব্যক্তি যথার্থই উপযুক্ত ও সক্ষম—যাহাদের দেহ, মন ও নীতিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ পরিণত হয়েছে—কেবল তাহাদেরই বংশ রক্ষা ও বংশ বিস্তার করিবার অধিকার দেওয়া হয়েছে; আর এর নিষেধকাণ্ডে অনুপযুক্তদের বংশ বিস্তার করিয়া সমাজের অবনতি সাধন করিতে বারণ করা হইয়াছে।" উদ্ধৃত কথাগুলি সার্ জেম্‌স্ বার্ (Sir James Barr) এর। তিনি সম্প্রতি Shefield University (শেফিল্ড্ ইউনিভার্সিটী)তে "The Positive Aspect of Eugenics" নামে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্য হইতে উদ্ধৃত। বক্তৃতার বিষয় নির্ব্বাচনে Sir James (সার্ জেম্‌স্) যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ বলিতে হইবে। ইহাঁর পূর্ব্বে সুপ্রজননবাদীদের মধ্যে কেহই কর্ত্তব্য বিষয়ে অতোটা জোর করিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই। ইহাঁরা সকলেই কি করা উচিত সে সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকিয়া, কি করা অনুচিত সেই বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন মাত্র। "এ করোনা" বলা যত সহজ "এ কর" বলা ঠিক তত সহজ নয়। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা বড় অল্প নাই। সুপ্রজননবাদীরা সেটা বিলক্ষণ বুঝেন, তাই তাঁরা "হাঁ"র দিকে একবারেই নীরব। এ বিষয়ে সে কালে, Plato (প্লেটো) যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, একালে তাহা নিতান্ত দুর্লভ। প্লেটো বলেন দেশের যুবকদের মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে বা অন্যত্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহাদের একটা বিশেষ অধিকার এই দেওয়া উচিত যে, তাহারা যুবতীদের সহিত অবাধে মেলা মেশা করিতে পাইবে। এ অধিকার দিলে কালক্রমে দেশ যোগ্যতম পিতার যোগ্যতম পুত্রকন্যায় পরিপূর্ণ হইবে।" বংশ বিস্তার সম্বন্ধে সক্রেটিস্ (Socrates)এর সঙ্গে Glaucon (গ্লকন্)এর যে মতবিরোধ ছিল প্লেটো তাহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একথা যদি ঠিক হয় যে, গৃহ-পালিত পশুপক্ষীর বংশোৎকর্ষ যে নিয়মে সাধিত হয়, মানুষের বেলাতেও সেই একই নিয়ম কাজ করে, "তাহা হইলে" প্লেটো বলেন "নরনারীর মধ্যে যাহারা সকল বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহারাই পরস্পর যত বেশি সম্ভব মিলিত হউক—আর যাহারা নিকৃষ্ট তাহাদের মিলন যত কম হয় ততই মঙ্গল। উৎকৃষ্টের মিলন জাত সন্তানদের যত্ন পূর্ব্বক পালন কর আর অযোগ্যদের সন্তানদের যত্ন পূর্ব্বক পরিহার কর। এমন করিলে, তবেই তো জাতীয় উন্নতি চরমোৎকর্ষে উপনীত হওয়ার সম্ভব।" ইহার মধ্যে যে যুক্তিটুকু আছে, তাহা হয়তো অকাট্য হইতে পারে, কিন্তু প্লেটোর বিধি মানিয়া চলিতে গেলে লোকপ্রচলিত বিবাহ সংস্কার বেশি দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই কারণে খুব গোঁড়া সুপ্রজননবাদীরাও, ইচ্ছা করিয়াই, প্লেটোর যুক্তি অনুসরণ করা হইতে বিরত থাকিয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া প্লেটো যে "free love" (স্বাধীন প্রেম)এর পক্ষপাতী একথা ঠিক বলা চলে না। তিনি যোগ্যতম নরনারীর অস্থায়ী মিলনের অনুমোদন করিয়াছেন বটে কিন্তু মিলনের পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের মত লওয়া আবশ্যক হইত এবং এক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানও পালন করিতে হইত। সে যাহা হোক্ Sir James Barr (সার্ জেম্‌স বার্) তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটি কথাও বলেন নাই যাহা তাঁহার অতি বড় বিপক্ষের বিবেচনায় বর্ত্তমান একবিবাহ রীতির প্রতি গুপ্তাঘাত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। বরঞ্চ তাঁহার সেরূপ কোন উদ্দেশ্য মোটেই নাই একথা, তাঁহার বক্তৃতায় স্পষ্ট করিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আমেরিকার Jukes (যুকস্) পরিবারের সহিত Rev. Jonathon Edwards (রেভারেন্ড্ যোনাথন্ এড্‌ওয়ার্ডস্) পরিবারের তুলনা করিয়া পিতৃপুরুষের দোষগুণে ভাবী বংশের কি পরিমাণ অপকর্ষ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। Jukes (যুকস্) বংশে সম্প্রতি ১২৮০ জন লোক আছে। ইহাদের সকলকেই হীন ও পতিত বলা যাইতে পারে। স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তি বলিলে যাহাদের বুঝায়, ইহাদের মধ্যে একজনও তেমন খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ Jukes নিজেও ভাল লোক ছিল না—সে নষ্টস্বভাব ও বেকার নীরোগী ছিল। অন্য পক্ষে ধর্ম্মযাজক জোনাথান্ এড্‌ওয়ার্ডস্ বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। মনোবিজ্ঞানে তাঁহার প্রভূত দখল ছিল। ইহাঁর বংশে সম্প্রতি ১,৩৯৪ জন লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই ভালো লোক বলিয়া পরিচিত। এই বংশে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ জন প্রেসিডেণ্ট্, ৬৪ জন অধ্যাপক, ১০০ জন ধর্ম্মযাজক, ৬০ জন চিকিৎসক, ৬০ জন লেখক, ১৮০ জন বিচারক ও আইন ব্যবসায়ী, ৮০ জন সিভিল্ সার্ভাণ্ট্, ৩ জন সেনেটার এবং অনেকগুলি মেয়র (mayor) প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এ বংশের সকলেই কৃতী—সকলেই যোগ্য। *

---

* খুব ভাল লোকদের বংশেও অনেক দুরাত্মা জন্মে, এবং "দৈত্য-কুলে প্রহ্লাদ"ও অনেক জন্মে। ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ভাল লোকের ছেলে যদি ভাল হয়, তাহা হইলে তাহা কতটুকু বংশ-গুণে ও কতটুকু শিক্ষা ও সংসর্গের গুণে তাহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ এখনও সম্যক্‌রূপে হয় নাই। ভাল লোকের ছেলে মন্দ হইলে লোকে কুশিক্ষা, বা সুশিক্ষার অভাব, এবং কুসঙ্গের দোষ দেয়,

Sir James Barr (সার্ জেম্‌স্ বার্) এর বক্তৃতাটি পড়িয়া আমাদের এই মনে হয়—সমাজে অক্ষম, অযোগ্য ব্যক্তি যত অল্প জন্মায় এবং সক্ষম ও যোগ্য ব্যক্তি যত বেশি জন্মায় এইটিই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। তিনি বলেন "জাতির মধ্যে যাহাতে অধিক সংখ্যক বলবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি জন্মাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা চেষ্টার দ্বারা মৃত্যুর হার যখন কমাইতে সমর্থ হইয়াছি, তখন চেষ্টা করিলে, যোগ্য ব্যক্তির জন্মের হারই বা বাড়াইতে না পারিব কেন?"। তিনি যে অপরিমিত, অন্যায় আশাকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, একথা অবশ্য বলা যায় না। আমাদেরও বিশ্বাস বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই ঐরূপই ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কিন্তু কি প্রণালী অবলম্বন করিলে, শুভ ইচ্ছাটা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে হয়তো সকলে একমত হইবেন না। জোর জবরদস্তিতে বেশি ফল হওয়ার সম্ভব, না যাহারা দুর্ব্বল ও অযোগ্য তাহাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া বিবাহাদি কার্য্য হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিলে, বেশি ফল হওয়ার কথা—সেটাও ভাবিয়া দেখার আবশ্যক। Sir James (সার্ জেম্‌স্) তো জোর প্রয়োগের পক্ষে; তিনি আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন। সুপ্রজনন-বাদীদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকিতে পারেন, যাঁহারা সমাজে শুধু যোগ্যতর ব্যক্তির জন্মতে পরিতৃপ্ত নহেন। তাহারা চান, সমাজ কেবল যোগ্যতম ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ হউক। ইহার জন্য সমাজের বর্ত্তমান অনুষ্ঠানগুলি যদি বিনষ্ট করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নহেন। Sir James Barr (সার্ জেম্‌স্ বার্) বলেন —বিবাহিত পিতামাতার সন্তানদের অপেক্ষা জারজ সন্তানদের প্রায় অধিকতর যোগ্য ও বুদ্ধিমান হইতে দেখা যায়। জারজ সন্তানেরা বাপমার প্রবল মনোবেগ হইতে সম্ভূত। এই কারণে ইহারা সাধারণ সন্তানদের* অপেক্ষা যোগ্যতা বিষয়ে অনেক সময় অধিক উচ্চে বলিয়া বোধ হয়। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। ইহার স্বপক্ষে উদাহরণের অভাব নাই। যোগ্যতা বিষয়ে Leonardo (লিয়োনার্দো)র স্থান বড় কম উচ্চে ছিল না। অথচ ইনি বিবাহিত বাপমার সন্তান নয়।† আমরা তাঁহার বক্তৃতাটির জন্য সার্ জেম্‌সের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি। তিনি এমন অনেক বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, যে সকল বিষয় ইতিপূর্ব্বে চিন্তা করিয়া দেখিবার আমাদের কোনই সুযোগ ঘটে নাই। বিষয়টি খুবই জটিল। ইহা বিবিধ সামাজিক বিপ্লবের ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে যে সাহস ও নির্ভীকতার আবশ্যক, আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই তাহা আছে বলিয়া মনে হয়।

* কিন্তু ভাল লোকের ছেলে ভাল হইলে বিনা বাধাবাধে তাহা বংশের ফল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; তাহাতে সুশিক্ষা ও সুসঙ্গের প্রভাব কতটা আছে, তাহা বিবেচনা করা হয় না। বৈজ্ঞানিক রীতি এরূপ একদেশদর্শী হওয়া উচিত নহে। প্রবাসী সম্পাদক।

† কিন্তু ইহা ত জানা কথা যে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় মহত্তম ব্যক্তি পিতামাতার বৈধবিবাহজাত সন্তান। সার্ জেম্‌সের উক্তি হইতে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের উদ্ধার করা যায় যে যে দম্পতির মধ্যে পরস্পর প্রবল অনুরাগ আছে, তাঁহাদের সন্তান, বৈষয়িক কারণজাত অনুরাগ-শূন্য বিবাহের সন্তান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সুপ্রজনন-বাদীরা ভুলিয়া যান যে মানুষের দেহ ও বুদ্ধি ছাড়া ধর্ম্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতা বলিয়া একটা জিনিষ আছে। নরনারীর অবাধ অস্থায়ী মিলনে ইহার কি দশা হইবে? প্রবাসী সম্পাদক।

সুপ্রজনন বিদ্যা ও যুদ্ধবিগ্রহ।

অক্টোবর মাসের Eugenics Review পত্রিকায় Chancellor Dr. David Starr Jordan (চ্যানসেলার ডাক্তার ডেভিড্ ষ্টার জর্ডন্) Eugenics and War নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন। চ্যান্‌সেলার গর্ডনের প্রতিপাদ্য বিষয়টি এই যে, সুপ্রজননের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে যুদ্ধবিগ্রহ জাতীয় অধঃপতনের একটা প্রবল কারণ মনে করিতে হইবে। জাতির মধ্যে যাহারা বলবান ও সাহসী তাহারাই যুদ্ধে গমন করিয়া থাকে আর যাহারা দুর্ব্বল ও ভীরু তাহারাই ঘরে বসিয়া থাকে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অনেকেরই মৃত্যু সম্ভব। এ ছাড়া যতদিন যুদ্ধ চলিতে থাকে ততদিন সৈনিকদের মধ্যে বিবাহ বা সন্তানোৎপাদনের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। এ সময় দেশে যে সকল সন্তান জন্মায়, তাঁহারা যুদ্ধবিরত, কাপুরুষদেরই সন্তান; সুতরাং ইহারাও কাপুরুষ ও দুর্ব্বল হইতে বাধ্য। কোন জাতি যদি তাহাদের মধ্যেকার দীর্ঘকায়, বলবান সাহসী পুরুষদের নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা হইলে, তাহার পরবর্ত্তীকালে, সেই জাতির মধ্যে খর্ব্বকায়, ভীরু দুর্ব্বল পুরুষ ছাড়া আর কি আশা করা যাইতে পারে? অতএব যুদ্ধ বিগ্রহই জাতীয় অধঃপতনের কারণ না হইয়া যাইতে পারে না। চ্যান্‌সেলর গর্ডন বলেন কোন ধ্বংসোন্মুখ জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এই দুইটি বিষয় সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে— (১ম) সেই জাতিটির মধ্যে ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা পুরুষানুক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে; (২য়) পরাধীনতার মাত্রাও সেই সঙ্গে দিন দিন বাড়িয়া যাইতে থাকে। অতএব যে কার্য্যে জাতির মধ্যেকার যোগ্য ও সবল পুরুষদের সংখ্যা ক্ষয়ের সম্ভব, তাহা জাতীয় ধ্বংস সাধনের হেতু না হইয়া কি করিয়া থাকিতে পারে? চ্যান্‌সেলার গর্ডন (Chancellor Gordon) ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টির প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। Science Progress (সায়ান্‌স্ প্রোগ্রেস্) পত্রিকার সম্পাদকের মতে চ্যান্‌সেলার মহাশয়ের যে চেষ্টাটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি বলেন ইতিহাস অনেক স্থলেই চ্যান্‌সেলার গর্ডনের মতের পোষকতা না করিয়া, বরং তাহার বিপরীতই প্রমাণ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি Wars of the Roses (গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধ) এর পরবর্ত্তী সময়টার উল্লেখ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এ সময়টা উন্নতির যুগ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। Frederic the Great (ফ্রেডরিক্ দি গ্রেট)এর যুদ্ধের পর প্রশিয়া (Prussia)র যেরূপ উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছিল, এরূপ সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। রোমানরা যতদিন নিজেদের মধ্যে হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিত ততদিন ইহার গৌরবের আর সীমা ছিল না, কিন্তু যেদিন হইতে ইহারা বেতনভুক বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে, সেই দিন হইতেই তাহাদের পতনের আরম্ভ হয়। আফ্রিকার জুলু (Zulu) ও মাসাই (Masai)রা যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, তাহাদের সকলেরই দেহ বেশ উন্নত ও সুপরিণত হইয়াছে। শিখদের এক সময়, তাহাদের প্রতিবেশী পার্ব্বত্য জাতিদের সঙ্গে সর্ব্বদাই লড়াই করিতে হইত, তাহার ফলে তাহাদের আজ কতই না উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ভারতী সৈন্যদের মধ্যে শিখের সহিত আর কাহারও তুলনা হয় না। জাপানী ও গুর্খারা দীর্ঘাকার নয়, তাই বলিয়া সাহস ও রণনৈপুণ্যে ইহারা পৃথিবীর কোন বীর জাতি-দেরই অপেক্ষা কম নহে। যুদ্ধে নিযুক্ত থাকাতেই, ইহাদের এই সকল বৃত্তি পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছে। চ্যান্সেলার গর্ডনের

ত যে সব জাতি যুদ্ধব্যবসায়ে নিযুক্ত নহে, যাহারা যুদ্ধে যাইতে য় পায়, পৃথিবীতে তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা দৈহিক উন্নতি হইবার ধা—আর আফ্রিদী জুলু প্রভৃতি জাতি যাহারা যুদ্ধ করিতেই ভাল সে, তাহাদের ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী।

বিষয়টা চ্যান্সেলার গর্ডন যতটা সহজ মনে করিতেছেন স্তবিক পক্ষে তাহা নহে। ইহার সহিত এত জটিল প্রশ্ন সংযুক্ত াছে, যে, এক কথায় ইহার মীমাংসাই হইতে পারে না। এ বশ্য খুবই সত্য যে কালের মল্লযুদ্ধ আর একালের যুদ্ধ ঠিক এক ়। মল্লযুদ্ধে যাহারা দুর্ব্বল তাহাদেরই পতন হয়। মল্লযুদ্ধে হারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদের সকলকেই বলবীর্য্য বলিতে হইবে। তএব মল্লযুদ্ধকে জাতীয় অবনতির কারণ বলা কোন মতেই সঙ্গত ইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান শস্ত্রযুদ্ধ সম্বন্ধে একথা হয়তো তমন জোর করিয়া বলা চলে না। বর্ত্তমান কালে দেশের মধ্যে াহারা বলবান দীর্ঘকায়, ও সাহসী তাহাদেরই সৈনিক বিভাগে হণ করা হয়। যুদ্ধে ইহাদের সংখ্যা ক্ষয়ের সম্ভাবনা। ইহাতে েশের ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়। একথা অবশ্য সেই সকল জাতির িতই খাটে, যাহাদের মধ্যে সেনা বিভাগে প্রবেশ করা না করা াকদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু যে কল জাতির মধ্যে সকলকেই সৈনিক হইতে বাধ্য হইতে য়, তাহাদের সম্বন্ধে কথাটা খাটিতে পারেনা। এস্থলে আরও কটা বিষয় দেখিবার আছে। আসল যুদ্ধে যত মানুষ মরে, ক্ষেত্রে, সংক্রামক রোগের আক্রমণে তাহার অপেক্ষা অনেক র্শি লোক মারা থাকে। অতএব প্রশ্নটা যে অতিশয় জটিল কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দেশের সকলকেই দি যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে মোটের উপর অনিষ্ট অপেক্ষা ষ্টই অধিক হইয়া থাকে। ইহাতে দেশের সকলেরই দেহের ৎকর্ষ সাধিত হয়। যুদ্ধ কিছু প্রতিদিনকার ব্যাপার নয়, ইহা ালে ভদ্রে ঘটে। ইহাতে যে ক্ষতি হয়, দেশের লোকসাধারণের াস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই বিবেচিত হয় না। বশেষে আরও একটি কথা উল্লেখ করিবার আছে। দুর্ব্বল ব্যক্তির া সবল সন্তান হয় না এবং সবল ব্যক্তির দুর্ব্বল সন্তান হয় না- কথা জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। দেশের সকলেই যদি যুদ্ধ- দ্যা শিক্ষা করে, তাহা হইলে অঙ্গচালনা ও ব্যায়াম হেতু সকলেরই হ দৃঢ় ও উন্নত হইবারই কথা। বিজ্ঞান বিষয়ে যাহারা নোবেল রস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই জার্ম্মান ও রাসী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গত শতাব্দীতে যে সব বড় বড় দ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই দুই জাতির মধ্যে। সত্য থা বলিতে কি, মানবেতিহাসের আলোচনা করিলে, চ্যান্সেলার র্ডনের সিদ্ধান্তটি যে অভ্রান্ত এ কথা কোন মতেই বলা যায় না। দ্ধ ভীষণ জিনিষ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, তথাপি ইহার য একটা ভালো দিকও যে নাই, তাহাও নহে। ইহাতে জাতীয় াদর্শ উন্নত হয় লোকসাধারণের বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

রেডিয়মের দ্বারা গাছপালার ঘুম-ভাঙ্গান।

রেডিয়মের সাহায্যে অনেক প্রতিভাশালী পণ্ডিত উদ্ভিদের ও প্রাণীসকলের কোষ বৃদ্ধি করিতেছেন; ইহা দ্বারা বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তিও করা হইয়াছে। সম্প্রতি ইয়ুরোপের এক বিখ্যাত উদ্ভিদ্বিদ্যাবিৎ ভিয়েনাবাসী ডাঃ হান্স্ মলিশ রেডিয়ম ও উদ্ভিদ লইয়া আর এক আবিষ্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। রেডিয়ম শীতকালীন নিদ্রায় অভিভূত গুল্মের উপর কি প্রকার ক্রিয়া করে তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। এই পরীক্ষার ফল তিনি বার্লিনের Die Naturwissenschaften পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

"যে সকল বৈজ্ঞানিক বহুদিন ধরিয়া শীতকালে নিদ্রিত উদ্ভিদকে জাগাইয়া তাহাদের অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, সম্প্রতি তাঁহারা আশ্চর্য্যরূপ সফল হইয়াছেন। জোনা-সেনের ইথর সঞ্চার প্রণালী, মলিশের উষ্ণবারি সেচন, ওয়েবরের পীড়ন প্রণালী, জেসেঙ্কসের অম্লসেচন (acid method) ও ক্রেবের বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া সমস্তই সুফল প্রসব করিয়াছে। বহুকাল রেডিয়ম লইয়া কাজ করিবার পর ইহার সাহায্যে উদ্ভিদের বিশ্রাম কাল হ্রাস করা কিম্বা একেবারেই দূর করা যায় কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। ভিয়েনার দুইটি বিজ্ঞানালয়ে পরীক্ষা করিয়া আশানুরূপ ফল পাইলাম। কাচের নল ও থালায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রেডিয়ম-ঘটিত পদার্থ লইয়া এই তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

জাগন্ত ও ঘুমন্ত পত্রমুকুল।

(১) রেডিয়ম-কিরণে ৪৮ ঘণ্টা থাকিয়া বিকাশিত পত্রমুকুল; (২) ২৪ ঘণ্টা থাকিয়া বিকাশোন্মুখ; (৩) এক ঘণ্টা থাকিয়া জাগরণোন্মুখ; (৪) ঘুমন্ত, রেডিয়ম সম্পর্কে মোটেই আসে নাই।

"রেডিয়মের কিরণ যাহাতে যতদূর সম্ভব সমভাবে অঙ্কুরগুলির উপর পড়ে এরূপ ভাবে সেগুলিকে সাজাইয়া রাখা হইত। রশ্মিপাত এক ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চলিত। তাহার পর সেই পল্লবগুলিকে জলপূর্ণ পাত্রে তুলিয়া উদ্ভিদপালনগৃহের আলোকময় স্থানে রাখিয়া পরিচর্য্যা করা হইত। চিত্রে 'সিরিঙ্গা ভলগারিস' জাতীয় ফুলগাছের উপর রশ্মিপাতের ফল দেখান হইয়াছে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বীটা (beta) ও গামা (Gamma) রশ্মির প্রভাবে সিরিঙ্গা জাতীয় চারার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু নভেম্বরের শেষে ও ডিসেম্বর মাসে চারাগুলিতে রশ্মিপাতের প্রতিক্রিয়া বেশ ভাল করিয়াই দেখা দেয়। জানুয়ারী মাসের পরীক্ষার ফল ভাল হয় না, কারণ তখন স্বভাবতই গাছপালার ঘুম ভাঙ্গিবার সময় আসে। বিনা রশ্মিপাতে অনেক সময় রশ্মিপাত অপেক্ষা ভাল ফলও হয়। বিশ্রামকাল অতীত হইবার পর ১২ ঘণ্টা কিরণ বর্ষণ করিলে অনেক সময় উল্টা উৎপত্তি হইতে

পারে। এই জন্য রশ্মিপাত নভেম্বরের শেষে কিম্বা ডিসেম্বরে করা উচিত। নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা দীর্ঘকাল কিম্বা অল্পকাল কিরণ-পাত করা উচিত নয়। অল্প সময়ে কোনই ফল হয় না। দীর্ঘকালে অঙ্কুরের ক্ষতি হয়।"

বৈজ্ঞানিক মহাশয় ইহার পর আর একটি উৎকৃষ্টতর উপায় আবিষ্কার করেন

"নলের ভিতর রেডিয়ম রাখিলে অঙ্কুরগুলি সমভাবে রশ্মিভোগ করিতে পায় না। এই জন্য আল্‌ফা (alpha) রশ্মি বিষয়ে রেডিয়ম-ঘটিত বাষ্পের সাহায্য লওয়াই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। কারণ বাষ্প (gas) সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম। আমাদের আশা পূর্ণ হইল। নল ও থালায় করিয়া রেডিয়ম দেওয়াতে যেরূপ ফল হইয়াছিল, ইহাতে তদপেক্ষা অনেক ভাল ফল পাওয়া গেল। একটা ফাঁপা কাচের থামের মত ২৪ সেণ্টিমিটার উচ্চ ও ১৬·৫ সেণ্টিমিটার চওড়া পাত্রে চব্বিশ কি ৪৮ আট চল্লিশ ঘণ্টা অন্তর বাষ্প ভরিয়া দেওয়া হইত। পরীক্ষা প্রণালী ঠিক হইতেছে কি না দেখিবার জন্য বাষ্পশূন্য আর একটি অনুরূপ পাত্রে একই ঝাড় হইতে আনিত কয়েকটি শাখা রক্ষিত হইত।"
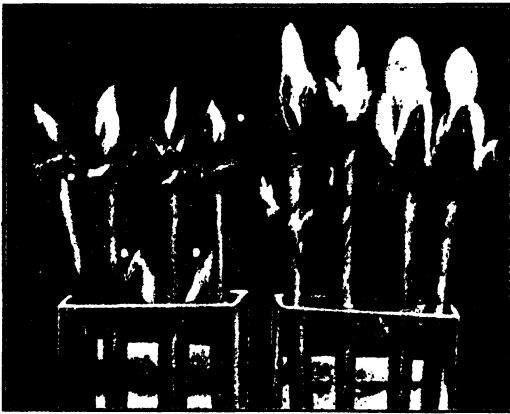
রেডিয়ম-কিরণে মুকুলের জাগরণ।

বাদামের ফুল স্বাভাবিক অবস্থায় ও রেডিয়ম-কিরণে একই পরিমাণ সময় থাকিলে কিরূপ তারতম্য ঘটে। বামদিকের ফুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থার; ডাহিন-দিকের-গুলি রেডিয়ম-কিরণে উদ্বুদ্ধ।

অধিকাংশ পরীক্ষাই সফল হইয়াছিল। কয়েকটা নিষ্ফলও হইয়াছিল। ফল বিভিন্ন প্রকার হওয়াটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কারণ ইথার সঞ্চার প্রভৃতি প্রণালীতেও বিভিন্নরূপ ফল দেখা গিয়াছে।

রেডিয়ম রশ্মিপাতে অঙ্কুর মধ্যে কি প্রকার কার্য্য আরম্ভ হয় তাহা এখনও জানা যায় নাই। ইথার প্রভৃতি অন্যান্য শক্তি বৃক্ষাভ্যন্তরে কি প্রকার পরিবর্ত্তন আনয়ন করে তাহাও এখন অজ্ঞাত আছে।

"রেডিয়ম এত মহার্ঘ যে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে এই আবিষ্কারের মূল্য খুবই কম, তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক দিয়া ধরিতে গেলে ইহা বহুমূল্যবান। রেডিয়ম আবিষ্কার কালে বিজ্ঞানরাজ্যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। সম্প্রতি ইহার অদৃশ্য কিরণ উদ্ভিদজগতে যে পরিবর্ত্তন আনিতেছে তাহা নিশ্চয়ই আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।" শা।

খনিতে বিপন্নের উদ্ধার কার্য্যে পক্ষীর সহায়তা।

ক্যানারী প্রভৃতি ছোট ছোট পাখী যে মানুষের জীবন রক্ষা করিতে পারে, ইহা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক খনিতে বিপদ্‌গ্রস্ত কুলিদের জীবন রক্ষা কার্য্যে ইহারা অদ্ভুত সহায়তা করে। ইঁদুর, পাখী প্রভৃতি ছোট ছোট জীব মানুষের বহু পূর্ব্বে দূষিত বায়ুর সান্নিধ্য অনুভব করিতে পারে। এইজন্য খনির অভ্যন্তরস্থ মজুর ও তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তাদিগকে বিষাক্ত বায়ুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সময় ইহাদের সাহায্য লওয়া হয় অনেক সময়ই তিন চারি মাইল ব্যাপী খনি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল খনির এক প্রান্তে বিষাক্ত বাষ্পের উৎপত্তি হইলে অপর প্রান্তে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। উদ্ধারকার্য্যে রত অনাবৃতমস্তক স্বেচ্ছাসেবকগণ বিপন্নদের রক্ষা করিবার সময় নিরাপদ স্থানের সীমা অতিক্রম করিয়া যান না। যাঁহারা শিরস্ত্রাণে মস্তক ও মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখেন, তাঁহারা দূষিত স্থানহইতে বিপন্নদের বাহির করিয়া দিলে শিরস্ত্রানহীন স্বেচ্ছাসেবক-গণ তাহাদের ভার গ্রহণ করেন। এই সকল উদ্ধারকারীরা এক একটি ক্যানারী পক্ষী লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে যান। পাখী যদি কোন প্রকার অসুস্থতার ভাব দেখায়, তাহা হইলেই তাঁহারা বিপদের সম্ভাবনা জানিয়া তদপেক্ষা নিরাপদ স্থানে প্রস্থান করেন। পাখীর খাঁচার সঙ্গে অম্লজান বাষ্প (Oxygen) থাকে, তাহার সাহায্যে তাহাকে পুনরায় সুস্থ করিয়া তোলা হয়। প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন,

"ছোট ছোট জীব সকল যে, খনির দূষিত বায়ুর সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, ইহা সকলেই জানেন। আমেরিকার সম্মিলিতরাষ্ট্রের খনিসমূহের পরিচালকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে গিনি-পিগ্, খরগোষ, ক্যানারী পাখী, কুকুর, ইঁদুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব এই কার্য্যে খুব নিপুণ। ক্যানারী অথবা ইঁদুরই এ কার্য্যের পক্ষে যোগ্যতম। জে, এস, হলডেন মহোদয় বলেন যে যে প্রাণীর ওজন যত কম, তাহার শরীরে দূষিত বাষ্পের আক্রমণের লক্ষণ তত শীঘ্র প্রকাশ পায় এবং তত শীঘ্রই দূর হইয়া যায়। খনিপরি-চালকগণ বলেন যে, ক্যানারীর অনুভবশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর। তাহারা এই কার্য্যে ইংলণ্ড প্রভৃতি ইয়ুরোপীয়দেশে ইতিপূর্ব্বেও ব্যবহৃত হইত।

ক্যানারী পাখী খুব সহজেই পাওয়া যায় এবং পোষ মানিতেও দেরি করে না বলিয়া, ইহাদের সাহায্যে কার্য্য নির্ব্বাহ করা আরও সুবিধাজনক। উদ্ধার কার্য্যের সময় যোগ্য লোকের হাতে পড়িলে ইহারা দূষিত বায়ুর আক্রমণে প্রায় মরে না।

পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ক্যানারী, ইঁদুর ও গিনি-পিগ্ প্রভৃতি বহুবার খনিজ বিষাক্ত বায়ুর মধ্যে রাখা হইয়াছে। কোন কোন বায়ুর আক্রমণ দুই মিনিটের মধ্যে তাহাদিগকে পীড়িত করিয়া ফেলে। বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত শতকরা ·২৫ বিষাক্ত বায়ু মিশাইয়া একটি ক্যানারীকে লইয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। পাখীটি একবার অজ্ঞান হইবার পর জ্ঞান সঞ্চারের জন্য তাহাকে আট দশ মিনিট সময় দেওয়া হয়, কিন্তু যেই সে পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পায় অমনই আবার তাহাকে দূষিত বায়ুর আক্রমণে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ বহুবার করিয়াও একই ফল পাওয়া যায়। পরীক্ষকগণ দেখিতে চাহেন যে পাখীটি ক্রমশঃ এই বিষাক্ত বায়ুতে অভ্যস্ত হইয়া যাইতেছে কি না। কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তাহার অজ্ঞান হইতে ঠিক সমান সময়ই লাগিয়া থাকে, এক মুহূর্ত্তও বেশী লাগে না। অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবের সাহায্যে ও বিভিন্ন পরিমাণ বিষাক্ত বায়ুর সাহায্যেও এইরূপ পরীক্ষা

বিজ্ঞাপনের চিত্রসৌন্দর্য্য।

বামদিকের ছবিতে আমেরিকার একটি বড় দোকানের চীনেমাটির বাসনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

ডাহিন দিকের ছবিতে ফরাশী চিত্রকর প্যাকঁ্যা কর্ত্তৃক পরিকল্পিত পোষাকের বিজ্ঞাপন। এই চিত্রটি প্রাচ্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত; রমণী-মূর্ত্তিটি হুবহু স্বভাবানুগত নহে।

ধবার কথা হইয়াছে। সকল পরীক্ষার ফলই পূর্ব্বোক্ত প্রকার ইয়া থাকে।

একই জাতীয় বিভিন্ন জীবের শরীরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিষাক্ত য়ুর ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। ফল প্রায় একই প্রকার।। ক্বচিৎ কখন আশ্চর্য্য বিভিন্নতাও দেখিতে পাওয়া যায়। র সম্বন্ধেই এই অনৈক্য ঘটে, ক্যানারী সম্বন্ধে ততটা ঘটেনা। াপি পাছে কোনও ভুল হয় এই মনে করিয়া অনুসন্ধান করিবার য় কয়েকটা বেশী পাখী সঙ্গে রাখাই ভাল। শাণ

বিজ্ঞাপন রচনায় শিল্পনৈপুণ্য—আধুনিক কালে ব্যবসা া বিজ্ঞাপনের জোরে। যে যত বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে রে তাহার সফলতা তত বেশি হয়; যে যত নূতন রকমে সুন্দর রয়া বিজ্ঞাপন রচনা করিতে পারে তাহার বিজ্ঞাপনের দিকে কের নজর পড়ে তত বেশী। এজন্য পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞাপন নাও একটি শিল্পকলার অন্তর্গত হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মানী ব্যবসায়ে একাল অগ্রগণ্য; সুতরাং তথাকার বিজ্ঞাপন-প্রণালীও সৃষ্টি-া। তাহারা বড় বড় শিল্পীদের দিয়া সুন্দর মৌলিক চিত্র রচনা াইয়া বিজ্ঞাপন দেয়; সস্তায় কলে ছাপা প্লাকার্ড পোষ্টার আঁটিয়া া সারে না। এই নূতন প্রথার প্রবর্ত্তকেরা বলেন যে, যে নষের বিজ্ঞাপন তাহাই চিত্রে প্রকাশ করিলে ব্যাপারটা খেলো া যাইবে; এমন সুন্দর চিত্র রচনা করিতে হইবে যে মুগ্ধ দর্শকের উদ্বোধিত হইয়া তাহাকে সেই উদ্দিষ্ট সামগ্রীর কথা ইঙ্গিতে স্মরণ করাইয়া দিবে। বিজ্ঞাপনে শিল্প-প্রবর্ত্তনের এই প্রথা জার্ম্মানী অথবা ফ্রান্সের উদ্ভাবনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ফ্রান্সে স্তেইলাঁ প্রভৃতি বড় বড় চিত্রকরেরা পোষাকবিক্রেতাদের নূতন ফ্যাশানের পোষাকের নক্সা আঁকিয়া দিয়া থাকেন: এ প্রথা ফ্রান্সে প্রাচীন। শিশুচিত্ররচনায় তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ চিত্রকর মরিস বুতে শিশুর পোষাকের নূতন নক্সা আঁকিয়া দিতেন। কার্লাইল বলিয়াছিলেন যে—দর্জ্জিতে মানুষ গড়ে। সুতরাং দর্জ্জির পেশা শিল্পীর সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না; মনুষ্যদেহের রূপের মাধুর্য্যের সহিত সুসঙ্গত পোষাকের সামঞ্জস্য বিধান করিতে সক্ষম একমাত্র শিল্পীই। এই কাজে ফ্রান্সের, জার্ম্মানীর বড় বড় শিল্পীদের সহিত রুষিয়ার শ্রেষ্ঠ আধুনিক শিল্পী লেয়োঁ বাক্‌স্ট্ যোগ দিয়াছেন।

যাঁহারা স্বভাব ও প্রচলিত প্রথার অনুকরণ না করিয়া চিত্রে নূতন-তর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, লেয়োঁ বাক্‌স্ট্ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। য়ুরোপের নরনারী যেরূপ ধরণের বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া থাকে, বাক্‌স্ট্ তাঁহার চিত্রিত নরনারীকে সেরূপ ভাবে সজ্জিত না করিয়া নিজের প্রমুক্ত উধাও কল্পনায় নূতনতর প্রথায় সজ্জিত করেন। ফলে তাঁহার কল্পিত বেশ ভূষাই ক্রমশ দেশের নরনারীর মধ্যে প্রচলিত হইয়া নব নব ফ্যাশানের সৃষ্টি করে। বাক্‌স্ট্ প্রতীচ্য চিত্রকলার রঙের প্রথা সম্পূর্ণ বদল করিয়া দিয়া নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রিত মূর্ত্তিগুলির মতো তাঁহার বর্ণ-বিন্যাসও যেন অধীর আনন্দে গলা ছাড়িয়া গান গাহিয়া আপনাদের জাহির করিতে চাহে। কিন্তু কোন বর্ণই খাপছাড়া স্বতন্ত্র হইয়া

(১) (২) (৩)

নব্য চিত্রকর লেয়োঁ বাক্‌ষ্টের পরিকল্পিত অঙ্গভঙ্গি ও পরিচ্ছদের সামঞ্জস্য।

(১) ও (৩) চিত্রের অঙ্গভঙ্গি, পরিচ্ছদ বিন্যাস, এবং তাহাতে বর্ণ সমাবেশের সামঞ্জস্য দেখিয়া সমঝদারেরা এই ছবিগুলিকে সুরে বসানো গীতিকবিতা বলিয়া তারিফ করিয়াছেন। (২) ছবিখানি শাহাবজাদী নামক একটি গীতিনাট্যের চিত্র; এই নাট্যে নবাবী দরবারের ষড়যন্ত্র, খুনখারাপি, বিলাস, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি প্রকাশ করিবার জন্য কেবল কৃষ্ণবর্ণের উপর স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার ও কারচুপি করা হইয়াছে; নির্ম্মলতার নিদর্শন শুভ্র বর্ণ কোথাও ব্যবহার করা হয় নাই। এই ছবিখানিকে ফরাশী পদ্যকাব্যরচয়িতা গতিয়ে বা ফ্লবেয়ারের রচনার সহিত এক শ্রেণীতে গণ্য করা হইয়াছে। এই ছবিখানি লেয়োঁ বাক্‌ষ্টের শ্রেষ্ঠ চিত্র রচনা বলিয়া স্বীকৃত। লেয়োঁ বাক্‌ষ্টের ছবিতে প্রাচ্য চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্ষুকে পীড়া দেয় না; সব পরস্পর সুসমঞ্জস, ললিত ছন্দে বিন্যস্ত। এজন্য তাঁহাকে কেহ বড় দরের মহাকাব্য-রচয়িতা বলে; কেহবা বলে বড় সূক্ষ্ম ভাবদ্যোতনায় দক্ষ গীতিকবি, তাহার প্রত্যেক বর্ণ এক একটি বিশেষ অর্থ সূচনা করিয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত হয়, সুতরাং চিত্রের রং দেখিয়া বাঞ্ছিত ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বাক্‌ষ্টকে অনেকে রঙের ছন্দের সঙ্গীতরচয়িতা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহার শিল্পপদ্ধতি মিশর, চীন ও পারস্য দেশের ভাবে অনুপ্রাণিত, প্রাচ্য প্রভাবে আন্তরিকতাপূর্ণ।

বার্লিনে একটি পোষ্টার ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহার শাখা ছড়াইয়াছে আমেরিকা পর্য্যন্ত। ইহারা Das Plakat নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন; তাহাতে বিজ্ঞাপন রচনায় চিত্রকরের তুলির লীলা প্রকাশ করা হয়; এখানিকে রীতিমত শিল্পকলার পত্রিকা বলিতে পারা যায়। ইহাতে য়ুরোপ আমেরিকার সকল দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা চিত্র প্রেরণ করেন এবং তাহা নানা রঙে ছাপা হয়। ইহাদের মারফতে জগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর সুন্দর প্লাকার্ডের নমুনা সংগ্রহ করা যায়। পাইবার ঠিকানা—

The International Art Service, Aeolian Building, New York, U. S. A.

প্রবন্ধাদির দৈর্ঘ্য

যাঁহারা প্রবাসীর জন্য প্রবন্ধাদি প্রেরণ করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ রাখিলে উপকৃত হইব যে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধাদি আমরা একটু বেশী সহজে ও শীঘ্র ছাপিতে পারি। প্রবন্ধ প্রবাসীর ৪।৫ পৃষ্ঠা অপেক্ষা লম্বা না হইলেই ভাল হয়। গল্প ইহা অপেক্ষা কিছু বড় হইলেও চলে। রচনা ক্রমশ প্রকাশ্য না হইয়া এক সংখ্যায় সমাপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃতশিক্ষা ও গুরুগৃহ

যে শিক্ষায় প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত তত্ত্ব ও সমস্ত মতবাদ প্রভৃতি জানিবার সুযোগ পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র তাহাই আয়ত্ত করিলে কাহাকেও আদর্শ শিক্ষিত বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। সে ব্যক্তি নিজেও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না, এবং একদেশদর্শীর যাহা পরিণাম, তাঁহারও তাহাই হইয়া থাকে। তাঁহার শিক্ষাকে কিছুতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সংস্কৃত শিক্ষার এই দশাই উপস্থিত হইয়াছে। কেবল মাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিলে কাহারও শিক্ষাকে আজকাল সম্পূর্ণ বলিতে পারা যায় না। কিন্তু প্রাচীনকালে সংস্কৃতের এ দশা ছিল না। এক সংস্কৃত পড়িলেই লোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। সংস্কৃত শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ রচিত হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত দেশ-দেশান্তরে যে কোন বিদ্যা যে কোন তত্ত্ব প্রচলিত বা আবিষ্কৃত ছিল সংস্কৃত সাহিত্য তৎসমুদয়কে নিজের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল; খগোল-ভূগোল গণিত-বিজ্ঞান ইত্যাদি যাহা কিছু সেই সময়ে মানবজ্ঞানের গোচরীভূত হইয়াছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে তৎসমস্তই যথাশক্তি যত্নপূর্ব্বক সঙ্কলিত হইয়াছে। সংস্কৃতসাহিত্যরসিকগণের নিকট তখন যাহা কিছু ভাল বোধ হইয়াছে তাহাই তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক সেই ভাষাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেশে ঐ সংস্কৃত ভিন্ন অপর কোন সমৃদ্ধ ভাষা ছিল না, যাহার নিকট কোন অধিক জ্ঞানের আশা করিতে পারা যাইত। আধ্যাত্মিকই হউক, আর বাহ্য ব্যাবহারিকই হউক, সমস্ত জ্ঞানই সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কৃত হইতেই লাভ করা যাইত। এই জন্ম সংস্কৃত পণ্ডিতগণের সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও উপযোগিতা সেই সময়ে উপযুক্তরূপে ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সংস্কৃত শিক্ষা সেরূপ নহে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দেশে দেশান্তরে বা জগতে যে জ্ঞান, যে তত্ত্ব, যে বিদ্যা যেরূপে যে পরিমাণে আবির্ভূত হইয়াছিল, আমাদের বর্ত্তমান সংস্কৃত পণ্ডিতগণ তাহার সহিত পরিচিত হইতে পারেন সত্য, কিন্তু কেবল তাহাতেই ত আজকাল কাজ চলিবে না। সেই প্রাচীন ভূগোল—সেই লবণসমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্রের কথায়, সেই কেবল সরস্বতী দৃশদ্বতীর কথায় বা কেবলমাত্র বিন্ধ্য হিমালয়ের কথায় অথবা কেবলমাত্র প্রাচীন রোমকের কথায় ত আজ লৌকিক ব্যবহার সম্পন্ন হইবে না। তাহার পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কতদিকে কত বিদ্যা কত তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হইয়াছে ইহার সহিত কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচয় না থাকিলে যে দশা উপস্থিত হইতে পারে, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের তাহা হইতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব আর তাঁহারা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

অতএব সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টির পর আজ পর্য্যন্ত যে সকল বিদ্যার প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদয়েরও সহিত সংস্কৃতপণ্ডিতগণের পরিচয় করিয়া দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। সমস্ত দেশেই সমস্ত বিদ্যা আবির্ভূত বা আবিষ্কৃত হয় না। এক এক দেশে যাহা হয়, অন্যান্য দেশে তাহাই নিজের সাহিত্যে আনয়ন করিয়া নিজের করিয়া লয়। পূর্ব্বে ভারতের সংস্কৃতজ্ঞগণ ইহা করিয়াছেন, এখনো তাঁহাদিগকে তাহা করিতে হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় এখনো তাঁহাদের বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েরই একটা সাধারণ জ্ঞান, encyclopedic knowledge, থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আজকাল সংস্কৃত সাহিত্য কেবলমাত্র ভারতে আবদ্ধ নহে। কেবল ভারতীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণই ইহা আলোচনা করেন না। সমস্ত পৃথিবীতেই মনীষীরা ইহা বিশেষরূপে অনুশীলন করিতেছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত পণ্ডিতগণের নিকট ইহা মোটেই পৌঁছিতেছে না, অথচ যাঁহাদিগকে লইয়া ইঁহাদের অন্নসংস্থান, তাঁহারা ঐ সকলেরই সহিত বিশেষ পরিচিত হওয়ায়, এবং অনেক স্থলে ঐ সকল মতবাদ প্রতিকূল-জাতীয় হওয়ায় অনেক সময়ে আমাদের নিজেদেরই মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হয়। এবং ইহার ফলে নানারূপ অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় ঐ দেশান্তরীয় মনীষিবর্গের মতবাদ ভ্রান্ত, কিন্তু তাহা প্রতিপন্ন করিবে কে? তাঁহাদের প্রচারিত মতে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের যদি কুৎসিত ব্যাখ্যাই হইয়া থাকে, তবে তাহা সংশোধন করিবে কে? কেবল কথায় বলিলে ত চলিবে

না যে, তাঁহাদের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। অতএব সংস্কৃত পণ্ডিতগণের যাহাতে ঐ দেশান্তরের মনীষিগণের সহিত এই বিষয়ে আলোচনার,—বাদপ্রতিবাদের একটা যোগ থাকে, তাহার একটা উপায় হয়, তাহা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যই যাঁহাদের আজীবন সেবনীয় ও ধর্ম্মের আদর্শপ্রদ, তাঁহাদের পক্ষে ইহা ত আশু ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

আজীবন সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিলেও আমাদের পণ্ডিত মহাশয়গণের অধিকাংশই বৈদিক সাহিত্যের সহিত একেবারে অপরিচিত থাকিতেছেন। বেদ যাঁহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র, যে কোনরূপেই হউক না কেন, বেদের দোহাই না দিলে যাঁহাদের দৈনিক কার্য্যকলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়, তাঁহারা তাহার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পাণ্ডিত্যাভিমানে দিন কাটাইতেছেন, আর যাঁহাদের কেবল ঔৎসুক্য চরিতার্থতাই শেষ প্রয়োজনরূপে দাঁড়ায়, তাঁহারা সাতসমুদ্র তেরনদীর পারে বসিয়া দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তাহাকে লইয়া কাটাইয়া দিতেছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? ইহার কি একটা প্রতীকার হইবে না? আমরা নিজের শাস্ত্রকে, নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রকে নিজে পড়িব না?

সংস্কৃত সাহিত্য বলিতে কেবল ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য বুঝা যায় না। ঐ যে ইহারই পার্শ্বে বৌদ্ধ ও জৈন নামে দুই বিশাল বহুবিস্তীর্ণ সাহিত্য পড়িয়া রহিয়াছে, সংস্কৃত শিক্ষার্থীকে কি তাহা আলোচনা করিতে হইবে না? কত কত উপাদেয় বিষয় যে, সংস্কৃত ভাষাতেই ঐ দুই সাহিত্যে রহিয়াছে বিশেষজ্ঞগণের নিকট তাহা অবিদিত নহে। তাহা ছাড়া পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য আমাদের সম্মুখে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার্থীরা যে, অতিসহজে ইহা আয়ত্ত করিতে পারেন; এবং তাঁহাদের ইহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ ও জৈন নামে এত বড় দুইটি ধর্ম্ম পাশাপাশি প্রচারিত হইয়া ভারতের সর্ব্ববিষয়েই কি পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে পরবর্ত্তী পুরুষগণের জন্য কি সমৃদ্ধিই রাখিয়া গিয়াছে, অনায়াসলভ্য হইলেও কেন আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতগণ তাহা আলোচনা করিবেন না? কেন তাঁহারা এদিকে চক্ষু নিমীলিত করিয়া থাকিবেন? তাঁহাদিগকে গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া ইহার রত্নরাজিসমূহ প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে।

সংস্কৃত শিক্ষাটাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। ইহাকে উদার ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে, এবং এইরূপ ছিল বলিয়াই আমাদের সংস্কৃত ভাষা রাজরাজেশ্বরী হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া-ছিলেন। ঐ আমাদের পাশেই—ঘরের এ দুয়ারে ওদুয়ারে কতকাল হইতে মুসলমানেরা বাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের আত্মীয়তাও বহুদিন হইতে জন্মিয়াছে এবং তাহা ঘনিষ্ঠ ভাবেই, কিন্তু কৈ, আমরা সংস্কৃত পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ধর্ম্মটা যে কি একবারও কি কখন কোরাণ-শরিফের এক-আধটা ছেঁড়া পাতাও উল্টাইয়া দেখিয়াছি? ভগবানের বিভূতি যে সর্ব্বস্থানেই প্রকাশিত হইতেছে; এবং তাহারই প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন সত্য প্রকাশ পাইয়াছে, পাইতেছে, এবং অন্য অন্য লোকেরা তাহাই গ্রহণ করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। আমরা যদি এই সকল দেশ দেশান্তরের মতবাদগুলির খোঁজ আর কিছুই না রাখি, তাহা হইলে এক দিকে ত কাহাকেও চিনি-লাম না, অপর দিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে নিজেকেও পরীক্ষা করিতে পারিলাম না। এবং তাহা হইলেই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না। কেন আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিত-গণ এই সমস্ত আলোচনা না করিবেন? যদি বা তাঁহাদের এই সকল মতে কোন প্রতিকূল কথা বা ভাব থাকে, তবুও কি তাহা কখনো আলোচনার অযোগ্য হইতে পারে? কৌৎসের মতও ত নিরুক্তকার লিখিয়াছেন, প্রজাপতি বা বৃহস্পতির কথাও ত উপনিষৎকার ও ভারতকার বলিয়া-ছেন। রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতবং ন রাবণাদিবৎ, ইহাও ত আমরাই শিক্ষা দিয়া থাকি। একদেশদর্শী এবং তাহাও অতি অসম্পূর্ণ ভাবে হইয়া থাকিলে সংস্কৃত পণ্ডিতগণের কিছুতেই চলিবে না।

দর্শন শাস্ত্র ত আমরা অস্মরণীয় কাল হইতে আলোচনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমরা কি প্রণালী

দেখিতে পাই ? দেখিতে পাই, একজনের মাত্র একটিমাত্র 'হাঁ' বা 'না' কথায় দর্শনশাস্ত্রের পাতা শেষ হয় না। পক্ষ প্রতিপক্ষ করিয়া নানা মতের উল্লেখে নানা বিচারচাতুরী ও যুক্তিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়াছে। দর্শন সম্বন্ধে যিনি যখন আলোচনা করিয়াছেন, তিনি তখনকার প্রচলিত সকলের কথাই উল্লেখ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার আলোচনা সম্পূর্ণ ও উপাদেয় হয়। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও যুক্তির সমাবেশে দর্শনশাস্ত্র ক্রমশই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বৃহৎ হইয়া বৃহত্তর হইয়াছে ; ইহাই তাহার স্বভাব, ইহাই তাহার অলঙ্কার। এক এক জন দার্শনিক এক একটি বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহাতেই দর্শনপাঠকের রসানুভব হইয়া থাকে। তাহাই যদি হয়, তবে কেন আমাদের সংস্কৃতে দার্শনিক পণ্ডিতগণ দেশান্তরীয় দর্শনাদির আলোচনা না করিবেন ? ভারতবর্ষের দার্শনিক মস্তিষ্কে পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের মনোবিজ্ঞানের আলোচনা যে অতি সহজে হইতে পারিবে, তাহা বলা বাহুল্য। কেন ইহাঁরা বঞ্চিত থাকিবেন ? ইহাঁদের নিকট যে, তাহা হইলে একটা নূতন চিন্তাক্ষেত্র উপস্থিত হইবে, ইহাঁরাই যে তাহা হইলে ঐ দেশান্তরের বিদ্যাটিকে যবন জ্যোতিষের মত নিজের শাস্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিয়া একবারে নিজের করিয়া লইতে পারিবেন। পরকে নিজের করাই যে, হিন্দুর স্বভাব। সে ত বহু স্থানে ইহার পরিচয় দিয়াছে। তবে কেন আমরা ঐ শস্ত্রাটিক এখনো পর করিয়া রাখিব ? তাহাকে যে একবারে আত্মসাৎ করিয়া জীর্ণ করিয়া সমাজের রক্তমজ্জার সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। হিন্দু যে বিদ্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, এইরূপেই তাহা সমাজে প্রচার করিয়াছে, এইরূপেই হিন্দুর বেদান্তের কথা দর্শনের কথা অতিনগণ্য পল্লীরমণীরও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দর্শনবিদ্যা দেশে ত বহুদিন হইল ঢুকিয়াছে, কৈ তাহা ভারতীয় আকার ধারণ করিল কৈ ? ঐ সব বিদ্যার আলোচনা কি ভারতে বাঞ্ছনীয় নহে ? যদি সত্য সত্যই বিদ্যাকে দেশে আনিতে হয়, তাহা হইলে এই সংস্কৃতেরই সাহায্যে আনিতে হইবে, সংস্কৃত হইতেই প্রাদেশিক ভাষায় করিতে হইবে। দেশে সংস্কৃতজ্ঞের অভাব নাই। কোন বাঙালী পণ্ডিত হিগেলের সংস্কৃত করিলে দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, মহারাষ্ট্রী সব পণ্ডিতই তখন ভাল বুঝিবেন আর নিজের নিজের ভাষায় করিবেন। দেশের পরিশ্রম বাঁচিবে, অর্থ বাঁচিবে, কাল বাঁচিবে, অল্প সময়ে অধিক কাজ হইবে। এই একটা প্রকাণ্ড নূতন ক্ষেত্রে কেন আমরা সংস্কৃত পণ্ডিতগণকে কৃষি করিবার জন্য আহ্বান করিব না ? ইহাঁদের অপেক্ষা যোগ্যতর কৃষক কোথায় মিলিবে ? এই জন্যই, যাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার অভ্যুদয় কামনা করেন, তাঁহাদিগকে এদিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সংস্কৃত পণ্ডিতগণের পক্ষে আপাতত এই পাশ্চাত্য দর্শনাদির আলোচনাই অতি সুন্দর হইবে বলিয়া প্রথমে এই দিকেই মনোভিনিবেশ করা উচিত। পরে অন্যান্য বিদ্যা সম্বন্ধেও এই প্রণালীতে কার্য্য করা যাইতে পারে।

এই ত হইল বাহিরের কথা, কতকগুলি পুঁথী পড়া। ভিতরের কথা কি ? কোন ভিত্তির উপর, কোন আদর্শে এই সংস্কৃত শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ?

ইহা শক্ত প্রশ্ন নহে। যে ভিত্তির উপরে ও যে আদর্শে দেশে প্রাচীনকালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কালবিপর্য্যাসে দুর্ব্বল দুর্ব্বলতর হইলেও এখনো যাহাতে ইহা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাতেই ইহাকে রাখিতে হইবে, সেই আদর্শেই ইহাকে চালাইতে হইবে। কেবল সংস্কৃত শিক্ষার কথা নহে, ভারতের সাধারণ শিক্ষারই গোড়ার কথা হইতেছে, "মন্ত্রবিৎ" ও "আত্মবিৎ" উভয়ই হইবে, "পরা" ও "অপরা" উভয় বিদ্যাই শিখিতে হইবে। উভয়েরই যোগ রক্ষা করিতে হইবে, সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

অপরাবিদ্যা—মন্ত্রবিদ্যা—ব্যাবহারিক বিদ্যাকে এরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত করিতে হইবে যে, যাহাতে তাহা বিদ্যার্থীকে পরা বিদ্যায় আত্মবিদ্যায় লইয়া যাইতে পারে। এবং সেই প্রণালীটি আর কিছুই নহে, শিক্ষার সহিত আচারের সামঞ্জস্য বিধান করা ; তাহারই ব্যবস্থা করা, যাহাতে বিদ্যার্থী "সত্য কথা বলিবে" শিখিলে সত্য কথাই বলিতে পারে, মিথ্যা যেন তাহার মুখ দিয়া বহির্গত না

হয়। সমগ্র জীবনে তাহাকে যেরূপ ভাবে চলিতে হইবে' শিক্ষার অবস্থায় সে যেন তাহা আচরণ করিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া, কার্য্যত তাহা অভ্যাস করিয়া যোগ্যতালাভ করিতে পারে। এই জন্য সেইরূপ প্রণালী চাই, যাহাতে তাহাকে শিক্ষার সহিত আচরণ শিখাইতে পারা যায়। ইহা না করিতে পারিলে শিক্ষা কখনো সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। ইহা দৈবী শিক্ষা হইতে পারে না, আসুরী হইয়া উঠে। ভারতের মহর্ষিগণ দিব্য চক্ষুতে ইহা দেখিয়া বুঝিয়া বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, আজ সমগ্র জগতে সুসভ্য জাতিরাও তাহারই দিকে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন ও তদনুসারে চলিতেছেন। আর্য্য মহর্ষিগণের এই সুচিন্তিত শিক্ষাপদ্ধতির নাম হইতেছে ব্রহ্মচর্য্য। বেদরূপ সমস্ত জ্ঞানরাশির নাম ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য যে ব্রত আচরণ, তাহারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। প্রাচীন ভারতবাসীরা সন্তানগণকে "লেখা পড়া" শিখাইতে পাঠাইতেন না, তাঁহারা পাঠাইতেন ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইবার জন্য। তাঁহারা জানিতেন শিক্ষা অপেক্ষা চরিত্রের মর্য্যাদাই অধিক। এই জন্য যাহাতে চরিত্র ভাল হয়, বিদ্যার্থী সদাচারপরায়ণ হয়, সমগ্রজীবনে তাহার আচরণ সুন্দর হয়, ইহাই বুঝাইবার জন্য তাঁহারা ব্রহ্ম-চর্য্য বলিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্ম-অধ্যয়ন অথবা ব্রহ্ম-পাঠ বলেন নাই। আর তাঁহারা সেইরূপ লোকেরই নিকট পাঠাইতেন যিনি সেই বিদ্যার্থীকে অনুরূপ আচরণ শিক্ষা দিতে পারিতেন,—যাহা তাহার সমগ্রজীবনের সম্বল হইবে। এই জন্য ইহাঁর নাম বৈদিক সাহিত্য সমূহে আচার্য্য বলা হইয়াছে। যে হেতু তিনি তাঁহার বিদ্যার্থীকে "আচারং গ্রাহয়তি", স্বয়ং আচরণ করিয়া কার্য্যত দেখাইয়া দিয়া আচার শিক্ষা দিতেন, সেই জন্যই তিনি আচার্য্য। বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে এই কথাই ভূয়োভূয়ঃ বলা হইয়াছে—আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে।" এই রূপেই গুরুগৃহে গমন করিয়া সর্ব্বদা গুরুর নিকট বাস করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, সদাচারের সহিত বিদ্যা লাভ করিয়া, বিদ্যার্থীরা মানুষ হইয়া উঠিত, দৈবী সম্পদে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত; দেশে শান্তি বিরাজ করিত, সর্ব্বত্র কল্যাণ দেখা দিত। আদর্শ গৃহস্থ হইয়া তাহারা জীবন যাপন করিত, ভোগকে সর্ব্বস্ব মনে না করিয়া তাহারা ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিত, তাহারা প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে আলিঙ্গন করিত। এইরূপ গৃহস্থকেই লক্ষ্য করিয়া মনু বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ"। কেবল সংস্কৃত শিক্ষার্থী নহে সমস্ত শিক্ষার্থীকেই যদি এইরূপই আদর্শ গৃহস্থ আদর্শ পৌর জানপদ হইয়া জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বালকগণের কবল হইতে দূরে রাখিয়া এইরূপে গুরুগৃহে আচার্য্য উপাধ্যায়ের সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস করিয়া যতদূর সম্ভব হিন্দুর সনাতন পবিত্র আদর্শ ও নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। তাহাকে যদি নানাবিধ কদভ্যাসে ও কুসংসর্গে অকালে মৃত্যুকবলে পতিত না হইয়া স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। আবার যদি ভারতবর্ষকে পুণ্য পবিত্র ধর্ম্মভাবে দেবভাবে অনুপ্রাণিত দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে এই ব্রহ্মচর্য্যই পালন করিতে হইবে—"সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ: নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।" ইহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। ইহারই জন্য আমাদের গুরুগৃহের প্রয়োজন; অপর আকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই। বিঘ্ন ত হইবেই; কিন্তু ভগবান প্রসন্ন হউন, আমাদের এই উদ্দেশ্য যেন সম্পূর্ণ হয়।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

কষ্টিপাথর

মা মা হিংসীঃ।

মানুষের সকল প্রার্থনার মধ্যে এই যে একটি প্রার্থনা দেশে দেশে কালে কালে চ'লে এসেচে—মা মা হিংসীঃ, আমাকে বিনাশ কোরো না, আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর—এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে শারীরিক মৃত্যু তার নিশ্চিত ঘটবে তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ প্রার্থনা করিতে পারে না, কারণ এমন অনর্থক প্রার্থনা ক'রে তার কোন লাভ নেই।

এমন যদি হ'ত যে তার শরীর চিরকাল বাঁচত, তা হ'লেও সেই বিনাশ থেকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। কারণ সে যে প্রতি মুহূর্ত্তের বিনাশ। সে যে কত রকমের মৃত্যু—একটার পর একটা আমাদের জীবনের উপর আসৃছে। যে গণ্ডী দিয়ে আমরা জীবনকে

ঘিরে রাখতে চেষ্টা করি, তারি মধ্যে জীবন কত মরা মরচে—কত প্রেম, কত বন্ধুত্ব মরচে—কত ইচ্ছা কত আশা মরচে এই ক্রমাগত মৃত্যুর আঘাতে সমস্ত জীবন ব্যথিত হয়ে উঠেচে।

জীবনের মধ্যে এই মৃত্যুর ব্যথা যে আমাদের ভোগ করতে হয় তার কারণ হচ্চে আমরা দুই জায়গায় আছি; আমরা তাঁর মধ্যেও আছি, সংসারের মধ্যেও আছি। আমাদের একদিকে অনন্ত, অন্য দিকে সান্ত। সেইজন্য মানুষ এই কথাই ভাবচে কি করলে এই দুই দিককেই সে সত্য করতে পারে। আমরা তাই সেই আর একজন পিতাকে ডাকছি যিনি কেবল মাত্র পার্থিব জীবনের নয় কিন্তু চির-জীবনের পিতা। তাঁর কাছে গেলে মৃত্যুর মধ্যে বাস করেও আমরা অমৃতলোকে প্রবেশ করতে পারি, এই আশ্বাস কেমন ক'রে যেন আমরা আমাদের ভিতর থেকেই পেয়েছি। এইজন্যই সংসারের সুখভোগের মধ্যে থাকতে থাকতে তার অন্তরের মধ্যে বেদনা জেগে ওঠে এবং তখন ইচ্ছাপূর্ব্বক সে পরম দুঃখকে বহন করবার জন্য প্রস্তুত হয়। কেন? কারণ সে বুঝতে পারে মানুষের মধ্যে কত বড় সত্য রয়েচে, কত বড় চেতনা রয়েছে, কত বড় শক্তি রয়েছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মরচে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দুঃখের পর দুঃখ আঘাতের পর আঘাত তার উপর আসবেই আসবে—কে তাকে রক্ষা করবে? কিন্তু যেমনি সে তার সমস্ত দুঃখ আঘাতের মধ্যে সেই অমৃত-লোকের আভাস পায়, অমনি তার এই প্রার্থনা আর সকল প্রার্থনাকে ছাড়িয়ে ওঠে, মা মা হিংসীঃ—আমাকে বাঁচাও বাঁচাও, প্রতিদিনের হাত থেকে ছোট'র হাতের মার থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি বড়—আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে, স্বার্থের হাত থেকে, অহমিকার হাত থেকে নিয়ে যাও। তোমার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের মধ্যে আমার জীবন যেতে চাচ্ছে—আপনাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে প্রতিদিন আপনার অহমিকার মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমার কোনো আনন্দ নেই। মা মা হিংসীঃ—আমাকে বিনাশ থেকে বাঁচাও।

যে প্রেমের মধ্যে সমস্ত জগতে মানুষ আপনার সত্য স্থানটিকে পায়, সমস্ত মানুষের সঙ্গে তার সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,—সেই পরম প্রেমটিকে না পেলে মানুষকে কে বেদনা ও আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে? এইজন্যই সংসারে ডাকের উপর আর একটি ডাক জেগে আছে—তোমার ভিতর দিয়ে সমস্ত সংসারের সঙ্গে যে আমার নিত্য সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে আমায় বাঁধো, তাহলেই মৃত্যুর ভিতর থেকে আমি অমৃতে উত্তীর্ণ হ'তে পারব।

পিতা নো বোধি। পিতা, তুমি বোধ দাও। তোমাকে স্মরণ করে মনকে আমরা নম্র করি। প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতা আমাদের ঔদ্ধত্যে নিয়ে যায়, তোমার চরণতলে আপনাকে একবার সম্পূর্ণ ভুলি। এই ক্ষুদ্র আমার সামায় আমি বড় হয়ে উঠছি এবং পদে পদে অন্যকে আঘাত করছি আমাকে পরাভূত কর তোমার প্রেমে। এই মৃত্যুর মধ্যে আমাকে রেখো না। হে পরম লোকের পিতা, প্রেমেতে ভক্তিতে অবনত হ'য়ে তোমাকে নমস্কার করি, এবং সেই নমস্কারের দ্বারা রক্ষা পাই। তা না হ'লে দুঃখ পেতেই হবে, বাসনার অভিঘাত সহ্য করতেই হবে, অহঙ্কারের পীড়ন প্রতিদিন জীবনকে ভারগ্রস্ত ক'রে তুলবেই তুলবে। যতদিন পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রতার সীমার মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছি, ততদিন পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে বিকট-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে চতুর্দ্দিককে বিভীষিকাময় ক'রে তুলবেই তুলবে।

সমস্ত ইউরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে—কত দিন ধ'রে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে' বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করিবে। এক এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উন্নত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। তারা কেবলি নানা উপায় উদ্ভাবন ক'রে নানা কৌশলে এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হ'তে পারে? এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করছে,—সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। সে মার থেকে রক্ষা পেতে গেলে বলতেই হবে—মা মা হিংসীঃ—পিতা তোমার বোধ না দিলে এ মার থেকে আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কখনো এটা সত্য হ'তে পারে না যে মানুষ আপনার ভিতরেই আপনাকে পাবে। তুমি আমাদের পিতা, তুমি সকলের পিতা—এই কথা বলতেই হবে। এই কথা বলার উপরেই মানুষের পরিত্রাণ। মানুষের পাপের আগুন এই পিতার বোধের দ্বারা নিভবে—নইলে সে কখনই নিভবে না।

মানুষের এই যে প্রচণ্ড শক্তি এ বিধাতার দান। তিনি মানুষকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন এবং দিয়ে ব'লে দিয়েছেন—যদি তুমি একে কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার কর, তবেই ভাল—আর যদি পাপের পক্ষে ব্যবহার কর, তবে এ ব্রহ্মাস্ত্র তোমার নিজের বুকেই বাজবে। আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে, তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারি বুকে বেজেছে। মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করে আজ রক্তের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে চলবে—আজ কে মানুষকে বাঁচাবে? এই পাপ, এই হিংসা মানুষকে আজ কি প্রচণ্ড মার মারবে—তাকে এর মার থেকে কে বাঁচাবে?

আমরা আজ এই পাপের মূর্ত্তি যে কি প্রকাণ্ড তা কি দেখব না? এই পাপ যে সমস্ত মানুষের মধ্যে রয়েছে এবং আজ তাই একজায়গায় পুঞ্জীভূত হয়ে বিরাট আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে, এ কথা কি আমরা বুঝব না? আমরা এ দেশে প্রতিদিন পরস্পরকে আঘাত করছি, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, স্বার্থকে একান্ত করে' তুলছি। এ পাপ কতদিন ধরে জমছে, কত যুগ ধরে জমছে। প্রতিদিনই কি আমরা তারই মার খাচ্চিনে? বহু শতাব্দী থেকে আমরা কি কেবলি মরচিনে? সেই জন্যই তো এই প্রার্থনা—মা মা হিংসীঃ। বাঁচাও বাঁচাও—এই বিনাশের হাত থেকে বাঁচাও। এই-সমস্ত দুঃখ শোকের উপরে যে অশোক লোক রয়েছে, অনন্ত-অন্তের সম্মিলনে যে অমৃতলোক সৃষ্ট হয়েছে, সেইখানে নিয়ে যাও। সেইখানে মরণের উপরে জয়ী হয়ে আমরা বাঁচব, ত্যাগের দ্বারা দুঃখের দ্বারা বাঁচব। সেইখানে আমাদের মুক্তি দাও।

আজ অপ্রেম ঝঞ্ঝার মধ্যে রক্তস্রোতের মধ্যে এই বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত মানব জাতিকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। এই বাণী যুদ্ধের গর্জ্জনের মধ্যে মুখরিত হ'য়ে আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

স্বার্থের বন্ধনে জর্জ্জর হ'য়ে, রিপুর আঘাতে আহত হ'য়ে, এই যে আমরা প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি—সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি একটা ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনারূপে রক্তস্রোতে গর্জ্জিত হ'য়ে উঠেছে। মা মা হিংসীঃ। মরচে মানুষ—বাঁচাও তাকে। কে বাঁচাবে? পিতা নোহসি। তুমি যে আমাদের সকলের পিতা, তুমি বাঁচাও। তোমার বোধের দ্বারা বাঁচাও। তোমাকে সকল মানুষ মিলে যে

দিন নমস্কার করব, সেই দিন নমস্কার সত্য হবে। নইলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মৃত্যুর মধ্যে যে নমস্কার করতে হয়, সেই মৃত্যু থেকে বাঁচাও। দেশদেশান্তরে তোমার যত মৃত সন্তান আছে, হে পিতা, তুমি প্রেমে ভক্তিতে কল্যাণে সকলকে একত্র কর তোমার চরণতলে। নমস্কার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হোক্। দেশ থেকে দেশান্তরে জাতি থেকে জাতিতে ব্যাপ্ত হোক্। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপের যে মূর্ত্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে, সেই বিশ্বপাপকে দূর কর। মা মা হিংসীঃ। বিনাশ থেকে রক্ষা কর।

(তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লোকশিক্ষা ও শিক্ষিত সমাজ—

পূর্ব্বে প্রাচীন জমিদারগণ অধিকাংশ সময়ে তাঁহাদের পল্লীভবনেই বাস করিতেন। তাঁহাদের উৎসব প্রভৃতি ধুমধামে পল্লীবাসী দরিদ্র প্রজাবর্গের যোগ দেওয়ার অধিকার ছিল। প্রতিবেশী প্রজার সুখ দুঃখের সঙ্গে তাহাদের জীবন জড়িত ছিল। দিঘী ও পুষ্করিণী খনন দ্বারা তাঁহারা সাধারণের অশেষ কল্যাণ করিতেন। মোটামুটি তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে যে অর্থ আদায় করিতেন, নানা প্রকারে তাহার অধিকাংশ প্রজার কল্যাণকল্পে ব্যয়িত হইত। এখন সে অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। হাল ফ্যাশানের ইংরেজীনবিশ জমিদারকুল সহরে সভ্যতার বিপাকে পড়িয়া পল্লী-সমাজের প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন।

হ্যামিল্টন ও হোয়াইট্‌ওয়ের বিলের তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহারা সময় সময় দরিদ্র প্রজাকুলকে স্মরণ করেন বটে, কিন্তু সেই স্মরণ তাহাদের পক্ষে মরণ-স্বরূপ হয়।

পাশ্চাত্যদেশে অধিকাংশ লোকই সহরে বাস করে। আমাদের দেশে হাজারের মধ্যে ৯৭৬ জন লোক পল্লীতে বাস করে। অতএব সমগ্র দেশের কল্যাণ করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় সহরের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ রাখিলে চলিবে না, পল্লীর দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হইবে।

এই ত ধনিসম্প্রদায়ের কথা। তারপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়। সকল দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও এই শ্রেণীই যথার্থ পক্ষে সমাজদেহের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ, যেখান হইতে প্রতিদিন সর্ব্বত্র প্রাণশক্তি নানা ধারায় সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হইতেছে। এই শ্রেণীর শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছেন উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার ইত্যাদি কলিকাতার স্বাধীনব্যবসায়ী বড়লোকগণ। ইঁহাদের যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধি ও যশ মানে যত বেশী উর্দ্ধে তাঁহাদের চিত্ত তত অধিক বহির্মুখীন। দেশের বারো আনার বেশী লোক যে ধরণে জীবন যাপন করে, বিবিধ কৃত্রিম বৈলাতিক অভ্যাস ইঁহাদিগকে সেই ধরণের জীবনযাত্রা হইতে বহু দূরে ঠেলিয়া রাখে। ইঁহাদের ত্রিসীমানায় পল্লীর হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে না। এই সম্প্রদায় ইয়োরোপের প্রাণস্বরূপ স্বজাতিপ্রেমকে বাদ দিয়া তাহাদের পার্থিব বিলাস ও ধনাভিমানকে অনুকরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া বিদেশীয় ভাষায় বাগ্মিতার তরঙ্গ তুলিয়া শিক্ষিত যুবকদিগকে তাক্ লাগাইতে পারিলেও—তাঁহাদের ভাব ও চিন্তা জনসাধারণের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাদিগের জীবনযাত্রার প্রণালী হইতে আরম্ভ করিয়া কথাবার্ত্তার ভঙ্গী পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যাপার প্রতিনিয়ত জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের ব্যবধানকে আরও দূরতর করিতেছে। এবং তাঁহারা নিজেরাও "নিজ বাসভূমে পরবাসী"র ন্যায় হইয়া থাকেন।

জনসাধারণের কল্যাণ করিতে হইলে, এ সকল কৃত্রিম ব্যবধান-গুলিকে দূর করিয়া জীবনযাত্রার সহজ সরল প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। ভারতে যাঁহারা সাধারণের কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—তাঁহারা জ্ঞানের গরিমায় একদিকে যেমন হিমালয়ের মত উন্নত ছিলেন, প্রেমের উদারতায় তেমনি আবার দীন হইতেও দীনের মত ছিলেন।

আমাদের দেশের শিক্ষার একটী গুরুতর ত্রুটি এই যে তাহা মানুষকে প্রাণবান্ করে না। একটী ফরাসী যুবক বন্ধুকে কথা প্রসঙ্গে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তুমি ভবিষ্যতে কি করিবে?" ফরাসী বন্ধুটি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "আমার প্রাণ উদ্যমে পরি-পূর্ণ, কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইতেছি না। আমি বলিলাম "কেন তোমাদের দেশে নানা বিষয়ে অসংখ্য কাজ করিবার ক্ষেত্র রহিয়াছে।" বন্ধু উত্তর করিলেন "সহস্র সহস্র লোক সে সকল ক্ষেত্রে সাধনা করিতেছে। আমি নূতন কর্ম্মক্ষেত্র চাই। যদি কোনও কর্ম্মক্ষেত্র না জুটে তবে মিশরের মরুভূমিতে অথবা ভারতের হিমালয়শৃঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইব।" প্রাণের অপ্রতিহত বেগকে রোধ করিতে না পারিয়া ইহারা দিগ্বিদিকে ছুটিয়া বাহির হইতে চায়। আমাদের দেশের শিক্ষা সেই প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিতেছে না। এই প্রাণের অভাবেই আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ স্বার্থান্বেষী ও আত্মসেবী হইয়া পড়ে। অপরের জন্য নিজেকে দেওয়ার শক্তি আমাদের মধ্যে বড় একটা জাগ্রত হয় না। তাহারই ফলে আধুনিক কোনও কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে জনসমাজের প্রাণের যোগ দেখা যায় না।

সুখের বিষয় এই যে এই উদাসীনতাকে দূর করিবার জন্য সর্ব্বত্র একটা নূতন প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ অবনত ও উপেক্ষিত জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতাতে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কুলি মজুরদিগকে শিক্ষাদানের চেষ্টা হইতেছে। কোনও কোনও সংবাদপত্র দরিদ্র পল্লীবাসীর অভাবাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া নবীন যুবক-সম্প্রদায়ের চিন্তা-স্রোতকে এই দিকে পরিচালিত করিতে সাহায্য করিতেছেন। এই শুভ সূচনার প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে দেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক তাহাদের চিত্ত-কমলগুলিকে মানব-কল্যাণের শুভ্র আলোকপানে উন্মুখ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এই সেবকদল সংখ্যায় নগণ্য হইলেও ইঁহারা শক্তিমান। কারণ ইহারা নীরব কর্ম্মী—ইঁহাদের পশ্চাতে যশস্বী নেতার উত্তেজনাবাণী নাই—বাহবাওয়ালাদের করতালিধ্বনি নাই।

পল্লীগ্রামের প্রধান অভাব শিক্ষার অভাব। কারণ স্বাস্থ্য ও অর্থের অভাব দূর করা সহজ হয় যদি উপযুক্ত শিক্ষা থাকে। সুখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। অনেক নূতন বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইতেছে। এ সময় আমাদের একটি বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—যাহাতে এই সকল বিদ্যালয়ের ভার উপযুক্ত শিক্ষকের উপর অর্পিত হয়। যাহারা শিশুদিগকে কলের মত শিক্ষা দেয় এরূপ শিক্ষকের সংখ্যাই অধিক। শৈশব হইতে শিশুর হৃদয়ে মহত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত করিতে পারে, তাহার অন্তরে কল্যাণকর্ম্মের শুভ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিতে পারে, এমন শিক্ষকের একান্ত অভাব। সেই অভাবের জন্যই আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে মনুষ্যত্ব বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখিয়াছেন

"শিশু বয়সে নির্জ্জীব শিক্ষার মত ভয়ঙ্কর ভার আর কিছুই নাই—তাহা মনকে যতটা দেয়, তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে ঢের বেশী।—আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতি দান করিবেন; আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।"

বাল্যকাল হইতেই আমাদের বিদ্যালয়ে ছেলেরা বড় বড় কথা মুখস্থ করে কিন্তু তদনুযায়ী কোনও অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ তাহারা পায় না। চিত্তবৃত্তির যথাযথ বিকাশ সম্ভবে না যদি বাল্যকাল হইতে মঙ্গল কর্ম্মের সুযোগ মানুষ না পায়। মঙ্গলকর্ম্মে ব্রতী শুভাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ শিক্ষিত যুবকগণ যেদিন ধনের পূজা পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে বিদ্যামন্দিরগুলিতে পৌরোহিত্যের কার্য্যে ব্রতী হইবেন এবং তাঁহাদের হৃদয়শতদলের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক তরুণ প্রাণ সর্ব্বত্র মঙ্গলকর্ম্মের মধুচক্র রচনা করিবে—সেদিন বঙ্গের পল্লীভবন মধুময় হইয়া উঠিবে। সেদিন দরিদ্রের পর্ণকুটীর ও কৃষকের শূন্য অঙ্গন জ্ঞান ও প্রেমের আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিবে। প্রায় বিংশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের একটী শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ধনমানের পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পিতৃভবনের জীর্ণকুটীরে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি তপস্বীর ন্যায় নীরবে লোক-চক্ষুর অগোচরে দীর্ঘকাল কর্ম্মরত ছিলেন—আজ ছয় শত তরুণ কিশোর তাঁহার চরণপ্রান্তে মনুষ্যত্ব লাভের শিক্ষার জন্য সমবেত। তিনি তাঁহার অধিকাংশ ছাত্রের চরিত্রেই স্বীয় জীবনের উন্নত আদর্শের একটি ছাপ লাগাইয়া দিয়াছেন। দারিদ্র্যপূর্ণ ক্ষুদ্র পল্লীতে শত প্রতিকূলতার মধ্যে অবস্থান করিয়া নীরব সাধনাদ্বারা তিনি যে মঙ্গল কর্ম্মটি গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা আমাদের বহুসংখ্যক সভাসমিতি হইতে অধিক মূল্যবান। আমরা সেইরূপ সেবক চাই।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৪২৩২৬৩১। শতকরা ২৬ জন মাত্র বিদ্যালয়ে পাঠ করে। তবেই দেখা যাইতেছে যে তিন ভাগের মধ্যে দুইভাগেরও বেশী ছাত্র নিরক্ষর থাকিয়া যাইতেছে। অনেকে বলেন অক্ষরপরিচয় ব্যতিরেকেও শিক্ষা হইতে পারে। যেমন আমাদের দেশে পূর্ব্বে যাত্রা, কবির গান, কথকতা, কীর্ত্তন ইত্যাদির সাহায্যে সাধারণ লোকে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিত। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে এ-সকল প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলির আবশ্যকতা যথেষ্ট আছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞাবশতঃ এই সকল অনুষ্ঠান ক্রমে প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে ইহা দুঃখের বিষয়। বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া ইহাদিগকে সংস্কার করিয়া লইলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। পাশ্চাত্যদেশে সিনেমাটোগ্রাফ লোক-শিক্ষার প্রধান সহায়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের যাত্রাদি অনুষ্ঠান যদিচ আমাদের সমাজের নিম্নস্তরে উন্নতভাবগুলিকে জাগ্রত রাখিতে সাহায্য করিয়াছে এবং কাব্যকলার সঙ্গে অধ্যাত্মরসের সংমিশ্রণ দ্বারা তাহাদের মানসিক শক্তিকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অক্ষরপরিচয়ের সাহায্যে যে শিক্ষা—তাহারও এদেশে যথেষ্ট আবশ্যকতা রহিয়াছে। কারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা মানুষের জীবনসংগ্রামের পথকে সুগম করিয়া দেয়। যে-সকল চাষা মহাজনের নিকট দেয় খতখানা পড়িয়া দেখিতে পারে না, গোমস্তার দাখিলার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না—তাহাদের উপর অর্দ্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য উপদেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশ মহাজন প্রভৃতি সকলেরই লোভ হওয়া স্বাভাবিক। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রত্যেক গ্রামেই আপনারা অহরহ দেখিতেছেন। মর্ম্ম না বুঝিয়া চুক্তিসর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া যাহারা জাভা ও মরিসাস্ দ্বীপে দাসত্ব করিতে যায় তাহাদেরও ঐ অবস্থা। বর্ত্তমানের দারিদ্র্যপীড়িত কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার যথেষ্ট আবশ্যকতা রহিয়াছে। বাহিরের অবিচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যও ইহার একান্ত প্রয়োজন। যতশীঘ্র সাধারণের মধ্যে শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে তত শীঘ্রই নিম্নস্তরের জনসমাজ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। এবং সামাজিক অবিচার ও অবজ্ঞাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ইহারা আত্মগৌরবের সহিত অপ্রতিহত-গতিতে উন্নতির পথে যাত্রা করিবে।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাকে ব্যাপ্ত করিতে হইলে শিক্ষাকে সুলভ করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ে যেখানে আট আনা (৷৷৹) বেতন ছিল, এখন সেখানে পাঁচসিকা (১৷৹) বেতন হইয়াছে। পাঠ্যপুস্তক খাতা ইত্যাদির ব্যয়ও পূর্ব্বাপেক্ষা তিনগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ঘর দরজা আসবাব পত্রের ব্যয়-বাহুল্যের ত কথাই নাই। অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষার যে অধিকতর সুব্যবস্থা হইয়াছে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুব্যবস্থার জন্য ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা দরিদ্র চাষার ভারবৃদ্ধি করা উচিত নহে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আচণ্ডাল সকলের জন্য বাণীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারই ফলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আজ শিক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু এই অভাব পূরণের উপযুক্ত আয়োজন কোথাও বর্ত্তমান নাই। জগতের সর্ব্বত্র দরিদ্রের পক্ষে শিক্ষা ক্রমেই সুলভ হইতে সুলভতর হইতেছে; আর আমাদের দেশে তাহা ক্রমেই অধিকতর মহার্ঘ্য হইবে কেন? যদি অর্থাভাবই বর্ত্তমানে শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায় হইয়া থাকে তবে অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও ধনী-সম্প্রদায়ের উপর শিক্ষাকর স্থাপিত হওয়া উচিত।

এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এই একটি গুরুতর অভিযোগ শোনা যায় যে, চাষার ছেলেরা 'ক'এর কান মোচড়াইবার পূর্ব্বেই লাঙ্গলের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে এবং নিম্ন প্রাইমারী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার সময় চাষের প্রতি তাহাদের বৈরীভাব আরো গাঢ় হইয়া দাঁড়ায়। পারিবারিক কর্ত্তব্যকর্ম্ম যে দাসত্ব নহে এ জ্ঞান তাহাদের থাকে না। শ্রমের গৌরব বিস্মৃত হইয়া অলসতাকেই যে সভ্যতা বলিয়া মনে করে। এ অবস্থা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। ইহা দূর করিতে হইলে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীকে সংশোধন করা আবশ্যক। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী ও আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া ও আঁক কসা ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়ের কোন-না-কোনটি বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয় যথা—স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গোষ্ঠবিজ্ঞান, কলকব্জা ও কাঠের কাজ, বাগানের জন্য সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান।

যে-সকল সহরে কলকারখানার প্রাধান্য আছে সেখানে যন্ত্রাদির কাজের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। মফঃস্বলের গ্রাম্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বাগান তৈয়ারি ও কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করে। আমাদের এই বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অঙ্কশিক্ষার সঙ্গে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। কোন্ সারে কি ফসল সর্ব্বাপেক্ষা বেশি উৎপন্ন হয়, কি উপায়ে বৃক্ষের ফল-উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়, কি উপায়ে কীট পোকার

হস্ত হইতে বাগান রক্ষা করিতে হয়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিশুর চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি জাগ্রত করিয়া দেওয়া যায়।

আমাদের দেশে প্রধানতঃ কৃষিই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত লোহা পিতল ও কাঠের কাজেরও এদেশে প্রচুর ক্ষেত্র রহিয়াছে। বাঁশ ও বেতের কাজ কোন কোন জিলায় অতি সহজে শিক্ষা দেওয়া যায়, কারণ তাহার ব্যবহার এদেশে প্রচুর। প্রত্যেক স্থানেই একই প্রকার শিল্পশিক্ষা সম্ভবে না। যে স্থানে যে শিল্পের উপাদান সহজলভ্য, সেই স্থানেই সেই শিল্পশিক্ষা দেওয়া বিধেয় হইবে।

আমাদের দেশের প্রত্যেক মিউনিসিপাল সহরে অন্ততঃ একটী করিয়া আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা প্রয়োজন, যেখানে লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক থানায় অন্ততঃ দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাগানে সহজ-ভাবে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে। এ-সকল বিদ্যালয়ে বাঁশ, বেত ইত্যাদির কাজ শিক্ষা দেওয়া সহজ, কারণ তাহাতে অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় না।

মিউনিসিপাল সহরে যে সকল শিল্প-বিদ্যালয় হইবে তাহার ব্যয় মিউনিসিপ্যালিটি বহন করিতে পারে। প্রত্যেক থানায় আমরা অন্ততঃ দুইটি গ্রাম পাইতে পারি যেখানকার অধিবাসীরা তাহাদের বিদ্যালয়ের তিন ভাগের এক ভাগ খরচ বহন করিবে এবং অবশিষ্ট অংশ জেলা বোর্ড হইতে সাহায্য স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার উপযুক্ত বয়সের যত বালিকা আছে তন্মধ্যে শতকরা ৯৫টি কোনও শিক্ষা লাভ করিতেছে না। বঙ্গচ্ছেদ হওয়ার পর পূর্ব্ববঙ্গের কর্ত্তৃপক্ষ স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঢাকাতে শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধানে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারীর জন্য ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। শিক্ষাপ্রণালীও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় বিস্তারের একটি প্রধান অন্তরায় এই যে তাহাতে ছাত্রী-বেতনের লোভ কম বলিয়া গুরুমহাশয়-দিগের সে বিষয়ে উৎসাহ খুবই অল্প। অর্থাৎ আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্রবিদ্যালয়ই গুরুমহাশয়দিগের নিজের চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া যাহাদিগকে বাড়ী বসিয়া থাকিতে হইয়াছে তাহারা অন্যান্য সংসারিক কর্ম্মের সঙ্গে পাঠশালার কাজ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন। ছাত্রবেতন এবং জেলা বোর্ডের সামান্য সাহায্যই ছিল তাহাদের লাভ। বালিকাগণ দূর হইতে আসিয়া পড়িতে পারে না বলিয়া বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রী-সংখ্যা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের অভিভাবকগণ বেতন দিয়া বালিকাদিগকে পড়াইতে চাহেন না। এসকল প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদিগকে গ্রামে গ্রামে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। আমাদের পরিবারের মহিলাকুলকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিতে না পারিলে আমরা পারিবারিক আনন্দকে সম্পূর্ণ করিতে পারিব না। পুরুষদিগের অনুপাতে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার না হইলে অনেক শিক্ষিত যুবককেই অশিক্ষিতা বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ মিলনে পারিবারিক জীবন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এবং ইহাতে সমাজের নৈতিক অবনতি সংঘটিত হয়।

বিশেষতঃ সুশিক্ষা ব্যতীত উপযুক্ত জননী হওয়া সম্ভব নহে। এ অবস্থায় আমাদের জাতির কল্যাণকল্পে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার যখন অত্যাবশ্যক তখন প্রতিকূলতা দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না। আমাদের ঐকান্তিক প্রয়াসকে সর্ব্ববিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে এমন একদল যুবক দেখা যায় যাঁহাদের ঘরে অন্নের সংস্থান রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাস পাশা দাবা খেলিয়া অতিবাহিত করেন। এই শ্রেণীর অলস যুবক-বর্গকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে। অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারের এবং প্রতিবেশীর কন্যাদিগকে শিক্ষা দান করিতে পারেন।

গ্রামের বিদ্যালয়গুলিকে ব্যবসায়ী শিক্ষকের হাতে সম্পূর্ণ সঁপিয়া না দিয়া যাহারা সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের উন্নতি বিধানে জীবনকে নিয়োজিত করিতে প্রস্তুত এরূপ প্রাণবান্ শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করা উচিত। কারণ বিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়াই পল্লী সংস্কার আরম্ভ করিতে হইবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পল্লীগ্রামের উপযোগী একটী ছোট লাইব্রেরী রক্ষা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদের সাহায্যে বাঙ্গালা পুস্তক অধ্যয়নের জন্য গ্রামে বিতরণ করিবেন ও পুনরায় পাঠান্তে তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। শিক্ষক নিজের চেষ্টায় শিশুদের মনে পাঠানুরাগ সঞ্চার করিবেন এবং তাহাদের সাহায্যে পল্লীতে তাহা পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবেন। এরূপ সার্কুলেটিং লাইব্রেরী স্থাপন করা খুব কঠিন নহে। গ্রামে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্রই বারোয়ারী ফণ্ডে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সেই অর্থই এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইতে পারে। আমেরিকায় সর্ব্বত্র এই গ্রাম্য পাঠাগার রহিয়াছে। এবং সেই সকল লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়াই সে দেশের কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণ্যের মধ্যে ভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। লাইব্রেরীয়ানের পক্ষে গল্প বলা একটী অত্যাবশ্যক গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। তজ্জন্য তাহাকে বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। সেই লাইব্রেরীয়ান রাস্তার ছেলেদিগকে ডাকিয়া মধুর ভাষায় গল্প বলিতে থাকেন এবং অবশেষে তাহাদিগকে বলেন "তোমরা যে গল্প শুনিলে তাহা এই পুস্তকে লেখা আছে। পড়ে দেখ্‌তে পার।" ইহা বলিয়া তাহাদের হাতে পুস্তকখানা তুলিয়া দেন। বালকেরা সেই-সকল পুস্তক গৃহে লইয়া গিয়া অন্যান্য বন্ধু বান্ধবকে পড়িয়া শোনায়। এইরূপে লাইব্রেরীর সাহায্যে সর্ব্বত্র জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত করা হয়।

ইয়োরোপের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এ দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমান নাই। শিক্ষাবিভাগে সবইন্‌স্পেক্টর ও সহকারী সবইন্‌স্পেক্টরের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এ জন্য যথেষ্ট অর্থও ব্যয় করা হইতেছে। অথচ ইহাদের দ্বারা তদনুযায়ী কাজ কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। এই সকল পরিদর্শকগণ জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার করিতে পারেন। তাঁহারা পরিদর্শন উপলক্ষে যখন নানা গ্রামে গমন করিয়া থাকেন তখন তৎসঙ্গে ছায়াচিত্রের সাহায্যে সরল ভাষায় বক্তৃতা করিয়া অনেক গ্রামের ছাত্র ও অভিভাবকদিগকে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন। কেবল বক্তৃতা দিয়া নহে, গ্রামের অধিবাসীদিগের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহাদের জন্য প্রদত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হয়। স্বাস্থ্য আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে একটী গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুচিন্তিত শিক্ষা প্রণালীর সাহায্যেই আমাদের দেশের পল্লীসমূহের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথকে বাধামুক্ত করা সম্ভব হইবে।

আমরা যদি যথার্থভাবে পল্লীসংস্কার করিতে চাই তবে পল্লীর

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে সমগ্র দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেরা কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। পবিত্র বিদ্যামন্দিরেও আমরা দলাদলির অলক্ষ্মীকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছি। লক্ষ্মী তাই আজ পল্লী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। তাই সোণার বাংলার পল্লীভবনে দরিদ্রের আশ্রয় নাই। নিরন্নকে উচ্ছন্ন করিয়া তাহার ভিটে-মাটী গ্রাস করিবার জন্য গৃধিনী শকুনীর মত শত শত মহাজন গ্রীবা প্রসারিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। যে দেশের পল্লীর ধূলিকণা মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের প্রেমাশ্রুতে পবিত্র হইয়াছে, যাহার অসংখ্য ভক্তবৃন্দের প্রেমহুঙ্কারে পাপীর প্রাণে একদিন আতঙ্ক সঞ্চার করিয়াছে, আজ সেখানে সর্ব্বত্র অধর্ম ও মিথ্যা সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। ধর্ম্ম, জ্ঞান ও স্বাস্থ্যের অভাবে পল্লীভূমি আজ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বাহির হইতে সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া আমাদের আন্তরিক চেষ্টাকে জাগ্রত করিতে হইবে। কর্ম্মবিমুখ অলস যাহারা, মানুষ ত দূরের কথা—তাহারা বিধাতারও কৃপাকটাক্ষ হইতে বঞ্চিত হইবে।

এই অসাড় জড় পল্লীসমাজের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে হইলে আমাদিগকে কঠোর ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ধন ও মানের পথকে পরিত্যাগ করিয়া করতালিবিহীন নীরব সেবার পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। শামলার লোভ পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে দীন শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল শিশুশিক্ষার ভারগ্রহণ করিলে চলিবে না। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ন্যায় বিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীবাসীদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের প্রয়াসকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।

জগজ্জননী অন্নপূর্ণা জগতের অন্তরালে থাকিয়া মানব হইতে পশুপক্ষী তরুলতা পর্য্যন্ত সকলকেই সেবা দ্বারা প্রতিনিয়ত পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। বৃষ্টি রূপে নিজকে দান করিয়া ধরিত্রীকে উর্ব্বরা করিতেছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহার মিলন সম্ভব হয় যদি তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছাকে মিলিত করি। সেবার মহান্ ব্রতকে বহন করিবার উপযুক্ত শক্তি তিনি আমাদের মধ্যে প্রেরণ করুন। তাহা হইলে আমরা নিজেরা মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া জনসমাজকেও মনুষ্যত্ব দান করিতে সক্ষম হইব।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা) শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

পাপের মার্জ্জনা—

আমাদের প্রার্থনা সকল সময়ে সত্য হয় না, অনেক সময় মুখের কথা হয়—কারণ চারিদিকে অসত্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকি ব'লে আমাদের বাণীতে সত্যের তেজ পৌঁছায় না। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে, জীবনের মধ্যে এমন এক একটি দিন আসে, যখন সমস্ত মিথ্যা এক মুহূর্ত্তে দগ্ধ হ'য়ে গিয়ে এমনি একটি আলোক জেগে ওঠে যার যে সামনে সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না। তখনই এই কথাটি বারবার জাগ্রত হয়—বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। হে দেব, হে পিতঃ, বিশ্বপাপ মার্জ্জনা কর।

আমরা তাঁর কাছে এ প্রার্থনা করতে পারি না,—আমাদের পাপ ক্ষমা কর; কারণ তিনি ক্ষমা করেন না, তিনি সহ্য করেন না। তাঁর কাছে এই প্রার্থনাই সত্য প্রার্থনা—তুমি মার্জ্জনা কর। যেখানে যত কিছু পাপ আছে, অকল্যাণ আছে, বারবার রক্তস্রোতের দ্বারা অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা সেখানে তিনি মার্জ্জনা করেন। যে প্রার্থনা ক্ষমা চায় সে দুর্ব্বলের ভীরুর প্রার্থনা তাঁর দ্বারে গিয়ে পৌঁছবে না।

আজ এই যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে, এর ভিতরে সমস্ত মানুষের এই প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে—বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—বিশ্বপাপ মার্জ্জনা কর। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে, সে যেন ব্যর্থ না হয়—রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনি পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হ'য়ে উঠে, তখনি তো তাঁর মার্জ্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে, তারি রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক্—বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হ'য়ে উঠুক!

যে হানাহানি হচ্ছে, তার সমস্ত বেদনা কোন্‌খানে গিয়ে লাগছে? ভেবে দেখ কত পিতামাতা তাঁদের একমাত্র ধনকে হারাচ্চে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্চে, কত ভাই ভাইকে হারাচ্চে। এই জন্যই তো পাপের আঘাত এত নিষ্ঠুর; কারণ সেখানে বেদনা বোধ সব চেয়ে বেশি, যেখানে প্রীতি সব চেয়ে গভীর, পাপের আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে। যার হৃদয় কঠিন, সে তো বেদনা অনুভব করে না। কারণ সে যদি বেদনা পেতো, তবে পাপ এমন নিদারুণ হ'তেই পারত না। যার হৃদয় কোমল, যার প্রেম গভীর, তাকেই সমস্ত বেদনা বইতে হবে। এইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের রক্তপাত কঠিন নয়, রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তা কঠিন নয়, কিন্তু ঘরের কোণে যে রমণী অশ্রুবিসর্জ্জন করছে তারি আঘাত সব চেয়ে কঠিন।

সেইজন্য এক এক সময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে—যেখানে পাপ, সেখানে কেন শাস্তি হয় না? সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হ'য়ে ওঠে? কিন্তু এই কথা জেনো যে মানুষের মধ্যে কোন্ বিচ্ছেদ নেই—সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্ব্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে এক জনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়, কারণ অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।

মানুষের এই ঐক্যবোধের মধ্যে যে গৌরব আছে তাকে ভুললে চলবে না। এইজন্যই আমাদের সকলকে দুঃখভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তা না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না—সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল, দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ করবে। যার চিত্ততন্ত্রীতে আঘাত করিলে সবচেয়ে বেশি বাজে, পৃথিবীর সমস্ত বেদনা তাকেই সবচেয়ে বেশি ক'রে বাজবে।

তাই বল্‌ছি যে, সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে এক ক'রে যে একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম আছেন, তিনি যদি শূন্য কথার কথা মাত্র হ'তেন তবে বেদনার এই গতি কখনই এমন বেগবান্ হতে পারত না। ধনীদরিদ্র, জ্ঞানীঅজ্ঞানী সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চির জাগ্রত আছেন ব'লেই এক জায়গার বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠছে।

তাই একথা আজ বল্‌বার কথা নয় যে, অন্যের কর্ম্মের ফল আমি কেন ভোগ করব? হাঁ, আমিই ভোগ করব, আমি নিজে একাকী ভোগ করব, এই কথা বলে প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি কর, তপস্যা কর, দুঃখকে গ্রহণ কর। তোমাকে যে নিজের পাপের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করতে হবে, নিজের রক্তপাত করতে হবে, দুঃখে দগ্ধ হয়ে হয়ত মরতে হবে। কারণ তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ না কর, তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্ম্মল

থাকবে কেমন করে, প্রাণবান্ হয়ে উঠবে কেমন করে? ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হ'তে হবে, সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই যৎভদ্রং তন্ন আসুব—যা ভদ্র তাই আসবে। ওরে তপস্বী, দুঃসহ দুর্ভর দুঃখভারে তোমার হৃদয় একেবারে নত হয়ে যাক্—তাঁর চরণে গিয়ে পৌঁছোক। নমস্তেঽস্তু। বল, পিতা তুমি যে আছ, সে কথা এমনি আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার কর। তোমার প্রেম নিষ্ঠুর—সেই নিষ্ঠুর প্রেম তোমার জাগ্রত হয়ে সব অপরাধ দলন করুক। পিতানো বোধি—আজই তো সেই উদ্বোধনের দিন। আজ পৃথিবীর প্রলয়দাহের রুদ্র আলোকে পিতা তুমি দাঁড়িয়ে আছ। প্রলয়-হাহাকারের ঊর্দ্ধে স্তূপাকার পাপকে দগ্ধ ক'রে সেই দহন-দীপ্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ, তুমি জেগে রয়েছ। তুমি আজ ঘুমোতে দেবে না, তুমি আঘাত করছ প্রত্যেকের জীবনে, কঠিন আঘাত। যেখানে প্রেম আছে জাগুক্, যেখানে কল্যাণের বোধ আছে জাগুক্—সকলে আজ তোমার বোধে উদ্বোধিত হয়ে উঠুক্। এই এক প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা তুমি সকল আঘাতকে নিরস্ত কর। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুঞ্জীভূত—তুমি আজ সেই পাপ মার্জ্জনা কর। দুঃখের দ্বারা মার্জ্জনা কর, রক্ত-স্রোতের দ্বারা মার্জ্জনা কর, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা মার্জ্জনা কর।

এই প্রার্থনা, সমস্ত মানবচিত্তের এই প্রার্থনা আজ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগ্রত হোক্। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্ব-পাপ মার্জ্জনা কর। এই প্রার্থনাকে সত্য করতে হবে—শুচি হতে হবে, সমস্ত হৃদয়কে মার্জ্জনা করতে হবে। আজ সেই তপস্যার আসনে পূজার আসনে উপবিষ্ট হও যে পিতা সমস্ত মানব সন্তানের দুঃখ গ্রহণ করছেন, যাঁর বেদনার অন্ত নেই, প্রেমের অন্ত নেই—যাঁর প্রেমের বেদনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে—তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট হ'য়ে সেই তাঁর প্রেমের বেদনাকে আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করি।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—

জ্যোতিবাবু বলেন যে "আমাদের অন্তঃপুরে আগে সেই "ভবিষ্যুক্ত" বৈষ্ণবীটি বাঙ্গালা পড়াইত। তার পর কিছুদিন একজন খৃষ্টান্ মিশ্‌নরী মেম আসিয়া ইংরাজী পড়াইয়া যাইত। ইহার পর অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। এই সময়ে আমার সেজদাদাও (হেমেন্দ্রনাথ) মেয়েদিগকে "মেঘনাদ বধ" প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। মেয়েদের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং তাঁহাদের হৃদয় মনের ঔদার্য্যও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা বেশ উপভোগ করিতেন। এর অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী (বর্ত্তমান ভারতী-সম্পাদিকা) কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেগুলি শুনাইতেন, আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখন তিনি অবিবাহিতা ছিলেন।

বঙ্গাব্দ ১২৮০ (ইংরাজী ১৮৭৭) সালে স্বর্ণকুমারীর দীপনির্ব্বাণ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরেই তাঁহার "ছিন্নমুকুল" নামে আর একখানি উপন্যাস এবং "বসন্ত উৎসব" নামে একখানি গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। ১২৮৭ সালে তাঁহার "গাথা" প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারীই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে গীতিনাট্য ও গাথা রচনা করেন। গাথা ও গীতিনাট্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদানুসরণ করিয়াছেন। এই সময়ে স্বর্ণকুমারী নিয়মিতরূপে ভারতীতে লিখিতেন। ১২৮৮ সালে তাঁহার "মালতী" নামে আর একখানি ছোট উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁহার ষষ্ঠ গ্রন্থ "পৃথিবী" ধারাবাহিকরূপে ভারতীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ। বাঙ্গলা দেশে এবং বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণকুমারী সর্ব্বপ্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যখ্যাতিতে তখন দেশবাসীর চক্ষে স্ত্রীশিক্ষার একটি অতি পবিত্র মাধুর্য্যপূর্ণ শুভঙ্করী মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছিল।

আগে আমাদের বাড়ীতে অবরোধ প্রথা খুবই মানিয়া চলা হইত। যে সকল পুরস্ত্রীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তাঁহাদিগকে ঘেরাটোপ-ঢাকা পাল্কীতে করিয়া লইয়া গিয়া গঙ্গার জলে পাল্কী শুদ্ধ ডুবাইয়া আনা হইত। কিন্তু মেজদাদা অবরোধ প্রথার উচ্ছেদকল্পে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফল ক্রমশ ফলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশ আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে গাড়ীর চলন হইয়া পড়িল।

"স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যখন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হয় তখন আমাদের অন্তঃপুরে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে আমাদের শুইবার ঘরে খাট বিছানা ছাড়া অন্য কোনও তেমন আসবাব পত্র থাকিত না; কিন্তু জানকী বাবু আসিয়াই তাঁহার ঘরটি নানাবিধ চৌকি কৌচ কেদারায় অতি পরিপাটিরূপে যখন সজ্জিত করিলেন, তখন তাঁহার অনুকরণে আমাদের অন্তঃপুরের সমস্ত ঘরগুলিরই শ্রী ফিরিল। মোটকথা অন্তঃপুরের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইল এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। জানকী আমাদের পরিবারে আরও একটা নূতন জিনিষের প্রবর্ত্তন করেন। সেটা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

"অক্রুর চন্দ্র দত্তের বাড়ীর রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় কলিকাতায় তখন সুবিখ্যাত amateur হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক। তিনিই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে হোমিওপ্যাথি তন্ত্রে দীক্ষিত করেন। জানকী তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসেন। রাজেন্দ্র বাবু এক রকম নূতন রান্না আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার নাম "রাজভোগ।" তাঁহার নবাবিষ্কৃত এই রান্নাটি খাইতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় তিনি একদিন আমাদের বাড়ীতে তাহার উদ্যোগ করিয়া দিলেন। চাল ও ডাল চড়াইয়া, আমাদিগকে বলিলেন "এইবার তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা, ইহাতে নিক্ষেপ কর।" এ কথায় আমরা কেউ আমসত্ব, কেউ তেঁতুল, কেউ মাছ, কেউ গুড়, কেউ লঙ্কা, কেউ রসগোল্লা প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই দিলাম। আহা, সে যে কি উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা আর কহতব্য নয়! তাঁহার সহিত আমরাও সারি বন্দি হইয়া "রাজভোগ" ভোজনে বসিয়া গেলাম, কিন্তু মুখে দিবা মাত্রই মাতৃদুগ্ধ পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

"গণেন্ দাদা একজন লেখক ছিলেন। নাট্যাকারে তিনি বিক্রম-উর্ব্বশী অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি অতি চমৎকার ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাও করিতে পারিতেন। "গাও হে তাঁহারি নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম" প্রভৃতি সুন্দর গানগুলি তাঁহারই রচিত। তিনি ইতিহাস খুব ভাল বাসিতেন। অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধও তিনি লিখিয়াছিলেন।"

এই সময়েই শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগ ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্য ও উৎসাহে "হিন্দুমেলা" প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্র-নাথমল্লিক মহাশয়েরা মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ এবং মনোমোহন বসুও এই মেলায় খুব উৎসাহী

ছিলেন। এ মেলায় তখন কৃষি, চিত্র, শিল্প ভাস্কর্য্য, স্ত্রীলোকদিগের সূচি ও কারুকার্য্য, দেশীয় ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শিত হইত। এ উপলক্ষ্যে কবিতা প্রবন্ধাদিও পঠিত হইত। নবগোপাল বাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ভারতবিষয়ক উত্তেজনাপূর্ণ একটা কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময় কবিতা লিখিতেন না, বা এর পূর্ব্বেও কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা লিখিলেন। কবিতা রচিত হইলে, নবগোপাল বাবু গণেন্দ্র বাবুকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। জ্যোতি বাবু সেখানে কবিতা পাঠ করিলে, তিনি (গণেন্দ্র বাবু) "বেশ হয়েছে, এটা এবার মেলায় পড়তে হবে" বলিয়া ইঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। সেখানকার মেলায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে শাস্ত্রী) শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও জ্যোতিবাবু—এই তিন জনের তিনটি কবিতা পঠিত হয়। জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে পাঠ করেন। সেবারকার মেলায় সভাপতি ছিলেন ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কোনপ্রকার বাড়াবাড়ি না হয়, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য বন্ধুভাবে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতে স্বদেশী ভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্তমহাশয় পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন : তাহার পর ৺রাজনারায়ণ বসু হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া ও ৺নবগোপাল মিত্র তাহা অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া এই স্বদেশী ভাবের প্রবাহে খুব একটা ঢেউ তুলিয়াছিলেন। বলিতে গেলে পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজই স্বদেশী ভাবের কেন্দ্র ছিল। যখন কেশব বাবু ও তাঁহার দলবল আদি ব্রাহ্মসমাজকে ত্যাগ করিলেন, তখন নবগোপাল বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের পতাকা গ্রহণ করিয়া, সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া ও মৌখিক বক্তৃতা করিয়া আদিসমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। স্বদেশীভাব প্রচার করিবার জন্য পিতৃদেবের অর্থসাহায্যে National Paper নামক এক ইংরাজি সাপ্তাহিক বাহির হইল। কতকগুলা "মড়া খেগো" ঘোড়া লইয়া তিনিই প্রথম বাঙ্গালী সার্কাসের সূত্রপাত করেন। তিনি এত করিলেন, এখন তাঁহার কেহ নামও করে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। তাঁহার একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকা খুবই আবশ্যক।"

(ভারতী) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

গীতিমাল্য

(১)

ইংরেজী গীতাঞ্জলির যতগুলি সমালোচনা বিলাতী কাগজে পড়িয়াছি, তাহার অধিকাংশেরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে "মিষ্টিক" বা মরমী কবি মনে করার জন্য মিষ্টিক সাহিত্যের সহিত তাঁহার কাব্যের সৌসাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বিলাতী সমালোচকেরা খৃষ্টান্ ভক্তি-সাহিত্যের সঙ্গে গীতাঞ্জলির তুলনা করিয়াছেন; কেহ কেহ বা হিব্রু সামগাথা,—ডেভিড্ আইসায়া প্রভৃতি ভক্তদের বাণীর সহিত তাঁহার কাব্যের সারূপ্য ঘোষণা করিয়াছেন। জলালুদ্দিন রুমি প্রভৃতি দু একজন সুফী কবির নাম পশ্চিমে বিখ্যাত হইয়াছে। সুফী কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়া কোন কোন সমালোচক গীতাঞ্জলির প্রসঙ্গে সুফী কবিদের রচনা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথকে 'মিষ্টিক' উপাধিতে ভূষিত করা ও মিষ্টিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের সৌসাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করাটা ইংরেজ সমালোচকের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র হয় নাই। এক সময় ছিল যখন নাটক লিখিলেই লোকে শেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে তুলনা করিত। এখন দেখিতে পাইয়াছে যে, শেক্সপীয়রের নাটকই নাটকের একমাত্র রূপ নয়। শেলির প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ড বা চেঞ্চিও নাটক; ব্রাউনিংয়ের প্যারাসেলসাস্ বা পিপা পাসেস্ও নাটক; আবার য়েট্‌সের শ্যাডোয়ি ওয়াটার্স্, মেটারলিঙ্কের ব্লুবার্ড, বার্ণাড শ'র ম্যান্ এণ্ড সুপারম্যান্, এবং ইব্‌সেনের পিয়ার গিণ্টও নাটক। নাটক ও খণ্ডকাব্যের রূপ ক্রমশঃই বিচিত্র হইতে বিচিত্রতর হইতেছে। অধ্যাত্ম কাব্যের রূপও যে খৃষ্টান্ ভক্তবাণী বা হিব্রু সামগাথা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে, এ ধারণা ইউরোপীয়দিগের মনে এখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। কারণ, খৃষ্টান ধর্ম্ম ছাড়া জগতে আর কোথাও যে ভক্তিধর্ম্ম থাকিতে পারে, সে দেশের নানাশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত লোকেরও মনে এ বিশ্বাস নাই। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনরীগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বাইবেলের ভক্তিবাদ শ্রবণ করিয়া এ দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে। কবীরের বাক্যাবলীর মধ্যে এক জায়গায় আছে যে, শব্দ হইতে সমস্তের উৎপত্তি, সকলের আদিতে শব্দ ছিল—তাহা পাঠ করিয়া কোন বিখ্যাত ইংরেজ বিদুষীর মনে হইয়াছিল যে কবীর সেণ্টজনের সুসমাচার হইতে নিশ্চয়ই ঐ ভাবটি ধার করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথকে খৃষ্টান ভক্তকবিদের সঙ্গে তুলনা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। খৃষ্টান ধর্ম্ম ভক্তিধর্ম্ম হইলেও প্রাচীন হিব্রু ধর্ম্মের বহু সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এই জগৎ যে জগদীশ্বরের দ্বারা আবাস্য নহে, তিনি যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মারূপে ইহার অন্তরতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত নাই—হিব্রুধর্ম্মের ইহা এক মূল কথা। জগৎপতি থাকেন এক কল্পিত স্বর্গলোকে এবং এই জগৎবস্তু তাঁহার 'হস্তের' দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাপী মনুষ্যের আবাসস্থান হইয়া আছে। যদিচ খৃষ্ট মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য এবং স্বর্গে পুনরায় লইয়া যাইবার জন্য পৃথিবীতে মানবরূপ পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের ব্যবধান তাঁহার দ্বারা দূরীভূত হয় নাই। তিনি মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং স্বর্গ হইতে অবতরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে তাঁহাকে ক্রুশের ব্যথা বহন করিতে হইয়াছিল। সেই ক্রুশ তাঁহার সকল ভক্তের জন্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন; সেই পরম দুঃখ স্বীকারের উপর স্বর্গের অধিকার লাভের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে। মানবের নিকটে ঈশ্বরের আত্মদান আনন্দের আত্মদান নহে, দুঃখের বলিদান—এই তত্ত্ব কোথায়, আর কোথায় উপনিষদের আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ হইতে সকল সৃষ্টির উদ্ভব—এই তত্ত্ব!—আমাদের শাস্ত্রে বলে, জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের আনন্দের একাত্মযোগ—জগৎ ঈশ্বরের আনন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ। জগৎ সসীম, ঈশ্বর অসীম; কিন্তু সসীমের মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই জগৎ তাহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। এ তত্ত্ব খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। সেই জন্য সসীম-অসীমের দ্বন্দ্ব সে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে।

রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের স্তন্যরসে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত—খৃষ্টীয় স্বর্গমর্ত্ত্যের কল্পিত ব্যবধানের তত্ত্ব, মনুষ্যের আদিম পাপের তত্ত্ব এবং খৃষ্টের আত্মবলিদানের দ্বারা সেই পাপ হইতে উদ্ধারের তত্ত্ব তাঁহার কাছে অত্যন্ত স্থূল ও ভ্রান্ত ভিন্ন আর কি প্রতিপন্ন হইতে পারে? সেই জন্য তাঁহাকে সেন্টফ্রান্সিস্ অব অ্যাসিসি বা ঐ শ্রেণীর খৃষ্টীয় সাধকদিগের সঙ্গে তুলনা করা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। উপনিষদের সঙ্গে বাইবেলের যেমন তুলনা চলে না, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি বা মঠাশ্রয়ী খৃষ্টীয় কোন সাধকের তেমনিই তুলনা চলে না।

আমি অবশ্য ভুলি নাই যে, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও প্লটিনসের ভাববাদ যেখানেই খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে তত্ত্বে এবং সাধনায় মিলিত হইবার সুযোগলাভ করিয়াছে, সেখানেই খৃষ্টান ধর্ম্মতত্ত্ব এবং সাধনা এমন একটি অভাবনীয় রূপ লাভ করিয়াছে যাহা বাস্তবিকই বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া থাকিতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্মে ঈশ্বরের সসীম ও অসীম স্বরূপের যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে—ঈশ্বর তাঁহার শক্তিতে অনন্ত কিন্তু প্রেমে সান্ত, এই যে তাঁহার দ্বৈত খৃষ্টধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে,—ইহাকে অবলম্বন করিয়া এক নিগূঢ় তত্ত্বের উদ্ভব জর্ম্মান দেশে ঘটিয়াছে। জেকব্ বইমে, এই তত্ত্বের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতা। জেকব বইমে, রুইজব্রুয়েক প্রভৃতি কোন কোন সাধকের সহিত আমাদের প্রাচ্য ভক্তিসাধকদিগের সৌসাদৃশ্য এই জন্য দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর খৃষ্টীয় সাধনা বলিতে উৎকট পাপবোধ ও তজ্জনিত ব্যাকুলতা এবং মানবরূপী ভগবান্ খৃষ্টের অনন্য শরণাগতির চিত্রই মনে জাগে। তাহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সাধনার সম্বন্ধ বড়ই অল্প।

উপনিষদের স্তন্যরসে রবীন্দ্রনাথ বর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যের মর্ম্মস্থলে উপনিষদের তত্ত্ব বিরাজমান একথা বলিলেও কেবলমাত্র উপনিষদ 'গীতিমাল্যে'র গানগুলির উৎস হইতে পারিত না। উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাব আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন। "শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত" হইয়া সাধক আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি, আত্মার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকেন। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলংধ্যায়মানঃ। জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলে ধ্যায়মান হইয়া মানুষ তাঁহাকে দেখিতে পায়। উপনিষদ যেখানে সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখিবার কথা বলিয়াছেন, সেখানেও আত্মস্থ হইয়া যোগস্থ হইয়া নিত্যোঽনিত্যানাং সকল

অনিত্যের মধ্যে তাঁহাকে নিত্যরূপে ধ্যান করিবার উপদেশই দিয়াছেন। উপনিষদের সাধনা এই অন্তর্মুখীন্ ধ্যানপরায়ণ সাধনা, অধ্যাত্মযোগের সাধনা। উপনিষদের ব্রহ্ম—দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং। তিনি লীলারসময় বিশ্বরূপ ভগবান্ নহেন। বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের আভাস উপনিষদের মধ্যে নানাস্থানে থাকিতে পারে, কিন্তু সেই তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে পরিস্ফুট আকার লাভ করিয়াছে একথা কোন মতেই বলা যায় না। লীলাতত্ত্বের কথা এই যে, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল বস্তু, সকল বৈচিত্র্য, মানবজীবনের সকল ঘটনা, সকল উত্থানপতন সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু—সমস্তই শ্রীভগবানের রসলীলা বলিয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। ভগবান্ অনাদি অনন্ত নির্ব্বিকল্প হইয়াও প্রেমে অন্তের মধ্যে ধরা দিয়াছেন; সেই জন্যই তো কোথাও অন্তের আর অন্ত পাওয়া যায় না। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"। সকল সীমাকে রন্ধ্র করিয়া সেই অনন্তের বাঁশী তাই নিরন্তর বাজিতেছে এবং তিনি বারবার জীবনের নানা গোপন-নিগূঢ় পথ দিয়া আমাদিগকে তাঁহার দিকে কত দুঃখক্লেশ কত আঘাত অভিঘাতের ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সমস্ত জীবনের এই সুখদুঃখবিচিত্র পথ তাঁহারি অভিসারের পথ। এই পথেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলন; এই পথেই কত বিচিত্ররূপ ধরিয়া তিনি দেখা দিতেছেন। এই যে বিশ্ব ও মানবজীবনের সকল বৈচিত্র্যকে ভগবানের প্রেমের লীলা বলিয়া অনুভূতি, বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের ইহাই সার কথা।

উপনিষদের যোগতত্ত্বে বেদান্তশাস্ত্র তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে কাব্যকলা সমুৎসারিত হয় না। বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বে অনুভূতির বিচিত্রতা ও প্রসার এমন বাড়িয়া যায়, যে কাব্যকলাকে আশ্রয় করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য উপনিষদ হইতে আমরা দর্শনশাস্ত্র পাইয়াছি, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদ হইতে কেবল দর্শন শাস্ত্র নহে, অপূর্ব্ব ভক্তিকাব্য সকলও সম্ভাবিত হইয়াছে। কেবল বাংলাদেশের বৈষ্ণব কবিতার কথা বলিতেছি না, পশ্চিমের কাব্য ও গান গুলিও সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে এবং রসগভীরতায় বাংলার বৈষ্ণব কাব্যের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা সে সকল কাব্য ও গানের কত অল্প পরিচয় পাইয়াছি। জ্ঞানদাস, রবিদাস, কবীর, দাদু, মীরাবাই প্রভৃতি ভক্ত কবিদের গানের যে দুএকটা টুক্‌রা কালের স্রোতে এখনকার ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে, তাহা শতদলের ছিন্ন পল্লবের মত সুগন্ধে প্রাণকে বিধুর করিয়া দেয়। মানুষের অন্তরের ভক্তি যখন তাহার অনুরূপ ভাষা লাভ করিয়া আপনাকে ব্যক্ত করে, তখন সে যে কি অপূর্ব্ব জিনিষ হয় তাহা এই উত্তরপশ্চিমের ভক্তিসাহিত্যে পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত নন্ এবং কেবলমাত্র বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের দ্বারাও অনুপ্রাণিত নন্। এই দুই তত্ত্বই তাঁহার জীবনের সাধনায় জৈবমিলনে মিলিত হইয়া এক অপরূপ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার ভক্তিকাব্যের এই নবরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার কি পরিমাণ অংশ উপনিষদের এবং কি পরিমাণ অংশ বৈষ্ণবভক্তিতত্ত্বের তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। কারণ এতো দর্শনশাস্ত্র নয়—এযে জীবনের জিনিস। এ গান যে জীবন হইতে প্রতিফলিত হইতেছে। সে জীবন আপনার অধ্যাত্ম পিপাসায় কোন রসকেই বাদ্ দেয় নাই—তাহার মধ্যে সকল বিচিত্র রস মিলিয়া জুলিয়া এক অভিনব মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্য বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বা গীতিমাল্যের তুলনাই চলে না। ঐ কাব্য দুটির মধ্যে যে বৈষ্ণবভাব বহুল পরিমাণে নাই এমন কথা বলি না; কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে যাহা বৈষ্ণব নয়, যাহা বৈষ্ণব ভাবাবলীর সঙ্গে সঙ্গত হইয়া তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছে।

আরও একটি কারণে রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈষ্ণব বা ভক্তকবিদিগের সঙ্গে তুলনা করা চলেনা। কেবল যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব মিলিয়াছে এবং বাণীরূপ লাভ করিয়াছে তাহা নহে। কবীর দাদু প্রভৃতির মধ্যেও এই একই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সুফীধর্ম্ম,

বেদান্ত এবং বৈষ্ণব 'ভক্তিবাদ এই ত্রিবেণীসঙ্গমের তীর্থোদকে কবীরের অমর সঙ্গীত অভিষিক্ত হইয়াছে। সেই জন্য তাহার অন্তরে যেমন কঠিন একটি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাধার, তাহার উপরে তেমনি ভক্তির রসোচ্ছ্বাস সঙ্গীতের তরল ধারায় নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেই সকল গানের সহিত গীতিমাল্যের গানের রূপভেদ আছে। 'গীতিমাল্য' ও 'গীতাঞ্জলি'র রবীন্দ্রনাথ যে 'সোনারতরী' 'চিত্রা' 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা'র ও রবীন্দ্রনাথ —যিনি প্রকৃতির কবি, মানব প্রেমের কবি, যিনি সকল বিচিত্ররসনিগূঢ় জীবনের গান গাহিয়াছেন, তিনিই যে এখন রসাণাং রসতমঃ, সকল রসের রসতম ভগবৎ প্রেমের গান গাহিতেছেন—ইহাতেই ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের ভক্তিসঙ্গীতের সঙ্গে আর এই নূতন ভক্তিসঙ্গীতের প্রভেদ ঘটিয়াছে। এমন ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটিয়াছে কি না জানিনা। কারণ ধর্ম্ম চিরকালই জীবনের অন্যান্য বৈচিত্র্য হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া সযত্নে সন্তর্পণে আপনাকে এক কোণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জীবনের গতি একদিকে, ধর্ম্মের গতি অন্যদিকে—জীবনের গতি প্রবৃত্তির দিকে, ধর্ম্মের গতি নিবৃত্তির দিকে। সেই জন্য কবি ও ভগবদ্ভক্ত —এ দুয়ের সম্মিলন দেখা যায় নাই। ভগবদ্ভক্ত হয়ত কবি হইয়াছেন—অর্থাৎ ভক্তির গান লিখিয়াছেন— কিন্তু জীবনের অন্যান্য রসের প্রকাশ তাঁহার মধ্যে ফুটিয়াছে কোথায়? পক্ষান্তরে কোন কবি যে ভক্তির গান লিখিয়া অমর হইয়াছেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় না। কবীর বা দাদু বা আর কোন ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথের মত প্রণয় কবিতা বা প্রণয় সঙ্গীত লিখিয়াছেন, ইহা কোন দিন যদি কোন ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রমাণ করিয়াও দেন, তাহা হইলেও আমরা বিশ্বাস করিতে পারিব না। কোন পুরাণো পুঁথির মধ্যে কবীরের লিখিত গানের এমন ছত্র বাহির হওয়া অসম্ভব :—

"ভালবেসে, সখি, নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখিয়ো
তোমার মনের মন্দিরে।"

কিম্বা "সখি প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে?
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।"

জীবনের সকল রস সকল অভিজ্ঞতার এমন অবাধ এমন আশ্চর্য্য প্রকাশ জগতের অল্প কবিরই মধ্যে দেখা গিয়াছে। পরিপূর্ণ জীবনের গান যিনি গাহিয়াছেন, তিনি যখন অধ্যাত্ম উপলব্ধির গান গাহেন, তখন এস্রাজের মূল তারের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশাপাশি যে তার গুলি থাকে তাহারা যেমন একই অনুরনণে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে' এবং মূল তারের সঙ্গীতকে গভীরতর করিয়া দেয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম উপলব্ধির সুরের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য রসোপলব্ধির সুর মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়তার সৃষ্টি করে। এই জন্য রবীন্দ্রনাথকে যে সকল বিলাতী সমালোচক খৃষ্টান ভক্তকবিদের সঙ্গে বা হিব্রু প্রফেটদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাঁহাদের তুলনা যেমন সত্য হয় নাই, সেইরূপ যাঁহারা এতদ্দেশীয় ভক্ত কবিদের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করেন, তাঁহাদেরও তুলনা ঠিক হয় বলিয়া মনে করিনা। বরং আধুনিক কালের যে সকল কবি জীবনের সকল বিচিত্রতার রসানুভূতিকে অধ্যাত্ম রসবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে চান—সেই সকল কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তুলনীয় হইতে পারেন। ওয়াল্ট হুইটম্যান, রবার্ট ব্রাউনিং, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার, উইলিয়ম ব্লেক্, ফ্রান্সিস্ টম্প্সন্, প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাব্যজীবনধারার সঙ্গে বরং রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনধারার তুলনা করিয়া অধ্যাত্ম রসবোধের বিকাশ কোন্ কবির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ব্রাউনিংএর শেষ বয়সের ধর্ম্মকাব্য Ferishtah'sFancies, ওয়াল্টের Sands at seventy, কার্পেন্টারের Towards Democracy এবং টম্প্সনের The Hound of Heaven প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বা গীতিমাল্যের তুলনা করিলে এই শ্রেণীর ধর্ম্মকাব্যে এই সকল কবির মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই অনুমিত হইবে।

আমার হাতের কাছে এই কাব্যগুলি নাই—কেবল টম্প্সনের The Hound of Heavenএর শেষ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"All which I took from thee I did but take,
Not for thy harms,
But just that thou might'st seek it in My arms.

All which thy child's mistake
Fancies as lost, I have stored for thee at home!
Rise, clasp my hand, and come."
Halts by me that footfall;
Is my gloom, after all
Shade of His hand, outstretched caressingly?

"লয়েছিনু যাহা কাড়ি
আমি, লই নাই তাহা ক্ষতির লাগি—
ভেবেছিনু তুমি এস্তে
মোর হাত হ'তে নিজে লইবে মাগি।
অবুঝ শিশুর মত
মনে ভেবেছিলে যাহা হারায়ে গেছে
জমিয়ে রেখেছি তাহা
দেখ, তোমারি লাগিয়া ঘরের মাঝে।
উঠ, ধর হাত, এসহে কাছে।"
থেমে গেল পদধ্বনি।
হায়, আমার মনের আঁধার রাশি—
সেকি তাঁর করচ্ছায়া,
তিনি, আদরের লাগি বাড়ান্ হাসি?

ইহার জুড়ি কবিতা গীতিমাল্যে আছে:—

এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে?
হাসিতে আকাশ ভরিলে॥
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি রাখে যাহা কিছু পায়
কতবার তুমি পথে এসে হায়
ভিক্ষার ধন হরিলে॥
ভেবেছিল চির কাঙাল সে এই ভুবনে
কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা, বড় ভয়ে ভয়ে
দিন শেষে এল তোমার আলয়ে
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে।

এই উদ্ধৃত ছোট গানটির মধ্যে অধ্যাত্ম সাধনার প্রথম অবস্থায় ত্যাগের রিক্ততার সুগভীর বেদনা এবং শেষ অবস্থায় ভগবানকে অনন্যশরণ জানিয়া আশ্রয় করিবামাত্র মিলনের অপূর্ব্ব আনন্দের সমস্ত ইতিহাস কি একটি সংহত রূপ লাভ করিয়াছে! টম্প্‌সন্ The Hound of Heavenএ এই ইতিহাসকেই কত ফলাও করিয়া স্তরে স্তরে উদ্ঘাটন করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা আশ্চর্য্য হইলেও গীতিমাল্যের এই গানের কলা-সংযম তাহাতে লক্ষিত হয় না।

(২)

গীতিমাল্যের গোড়ার দিকে নয়টি কবিতা আছে। এবং ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই একই সময়ে রচিত গোটা পনেরো গান আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সেই সেই অবস্থায় রচিত তাঁহার কাব্যের এমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণ-ভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবনের কথা কিছু কিছু জানা দরকারি হয়। পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোন কবির জীবন নিজ কাব্যের ধারাকে এমন একান্ত ভাবে অনুসরণ করিয়া চলে নাই। কবির জীবনের বড় বড় পরিবর্ত্তনগুলি প্রথমে কাব্যের মধ্য দিয়া নিগূঢ় ইঙ্গিত-মাত্রে প্রতিফলিত হইয়া শেষে জীবনের ঘটনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে অধুনা মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় subliminal consciousness বা মগ্নচৈতন্যের ক্রিয়াসম্বন্ধে বিচিত্রতথ্য সংগৃহীত হইতেছে। রবীন্দ্র-নাথের কাব্যজীবন ইহার যেরূপ সুস্পষ্ট উদাহরণ এমন বোধ হয় দ্বিতীয় উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। কোন কবির কাব্য যে তাহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই কাব্য যে জীবনের সচেতন কর্ত্তৃত্বের কোন অপেক্ষা রাখে নাই, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কোন কবির জীবনে ঘটিয়াছে কিনা জানিনা। এই জন্যই অন্য সকল কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার সময়ে তাঁহার জীবনের কথা বেশি করিয়া পাড়িতে হয়। ইহাকে অনেকে ব্যক্তিগত আলোচনা মনে করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুত ইহা তাহা নহে।

কবির কাব্যের সঙ্গে জীবন একসূত্রে গ্রথিত বলিয়া অন্য মানুষের জীবনে যে সকল ঘটনা অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য, কবির কাছে তাহারা একটি অভূতপূর্ব্ব অসামান্যতা লাভ করিয়া বিস্ময়করররূপে প্রতীয়মান হয়। দেশভ্রমণের বাসনা আমাদের সকলেরি মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে। যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহাকে যতটা পারি দেখিয়া লইব, এসাধ মনের মধ্যে গোপনে গোপনে থাকে, সুযোগ পাইলেই ইহা প্রবল হইয়া চরিতার্থতার পথ অন্বেষণ করে। কত সময় কত অভাবিতপূর্ব্ব কারণে এরূপ সুযোগ আসিয়াও আসেনা—মনের একান্ত ইচ্ছার পূরণ হয়না। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারই কবির কাছে এমন একটি প্রবল ব্যাপার যে তাহা সমস্ত মনকে সমস্ত চৈতন্যকে নাড়া দিয়া কাব্যের মধ্যে একটা অননুভূত

ভাবকে জাগাইয়া তোলে এবং জীবনকেও একটা নূতন রহস্যে মণ্ডিত করিয়া দেখে।

কবি যে ইউরোপ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাহা এমনি একটি অসামান্য ব্যাপার। অকস্মাৎ অজানা দেশে যাত্রার জন্য বিহঙ্গদলকে যেমন এক অশান্ত আবেগ ও চঞ্চলতা মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে প্রবৃত্ত করে, যাত্রার পূর্ব্বে ঠিক তেমনি একটি অকারণ চাঞ্চল্য কবি অনুভব করিতেছিলেন। কেন যাইতেছেন, সেখানে গিয়া কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে—এ সকল কোন প্রশ্নেরই জবাব দেওয়া তাঁহার পক্ষে শক্ত ছিল। যাত্রার যাহা একমাত্র কারণ তাহাতো কবিতায় বহু পূর্ব্বেই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন :—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।

কিন্তু এবারে সে কারণ ছিলনা। এবারে কোন কারণ না জানিয়াও তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে এ যাত্রা তাঁহার তীর্থযাত্রার মত—এ যাত্রা হইতে তিনি শূন্যহাতে ফিরিবেন না। এবার মহামানবতীর্থের যে শক্তিসমুদ্র-মন্থনজাত অমৃত তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিবেন, তাহাতে তাঁহার কাব্যের ও জীবনের মহা অভিষেক হইবে।

তীর্থযাত্রার জন্য এই ব্যাকুলতা যখন পূর্ণমাত্রায় মনকে অধিকার করিয়া আছে, তখন হঠাৎ স্নায়ুদৌর্ব্বল্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কবির যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল। কবি শিলাইদহে চলিয়া গেলেন। ষষ্ঠ হইতে ষট্‌ত্রিংশৎ (৬—৩৬) পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে কবিতা ও গানগুলি গীতিমাল্যে স্থান পাইয়াছে তাহারা সেখানে 'আমের বোলের গন্ধে অবশ' চৈত্রমাসে রুগ্ন অবস্থায় রচিত। তখন কাজকর্ম্ম, দেখাসাক্ষাৎ, সমস্তই বারণ হইয়া গিয়াছে :—

কোলাহল ত বারণ হ'ল
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবল মাত্র গানে গানে।

তাই বলিতেছিলাম যে বাহির হইতে দেখিতে গেলে এই এক সামান্য ঘটনার আঘাতে এই নূতন 'প্রাণের আলাপে'র সূত্রপাত হইল।

কিন্তু এই 'কানে কানে কথা'র রহস্যনিবিড়তাই এই সময়ের কবিতা ও গানগুলির বিশেষত্ব তাহা নহে। পৃথিবীর গভীরতম স্তরে যে উৎস জমাট হইয়া আছে তাহার পূর্ণতার তো কোন অভাব নাই; তথাপি বাহির হইবার বেদনায় তাহার সমস্ত অন্তর যেন ক্রন্দন করিতে থাকে। সেইরূপ এই 'কানে কানে কথা' যখন সবচেয়ে বেশি জমিয়াছে, যখন বিশ্বের একেবারে মর্ম্মস্থলে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার অবকাশ ঘটিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই তাহাতেই চরম পরিতৃপ্তি হইল না—এই কথাই বারবার নানা রকম সুরে বাজিতে লাগিল :—

"অনেক কালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে।
* * *
সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর
বড় কঠিন সাধনা যার
বড় সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে,
বাহির ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর।"
* * *
"এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী।"
* * *
"এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে।"

অথচ কবিতাগুলির মধ্যে এই সুর নাই। তাহাদের মধ্যে পরিচিত এক অভ্যস্ততম বস্তুর আবরণ উন্মোচিত হইয়া

"সকল জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়েছিল অজানা যে"—

সেই অজানাকে অত্যন্ত কাছাকাছি অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধির কথা আছে। ৯ম সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, এই নদীর পারে এই বনের ধারে যে সেই 'অজানা' ছিলেন, সে কথাতো কেহই তাঁহাকে বলে নাই। কখনো কখনো ফুলের বাসে, দখিণে হাওয়ায়, পাতার কাঁপনিতে মনে হইত যেন অত্যন্ত কাছেই তিনি। কিন্তু আজ এই "নয়ন-অবগাহনি" স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়ায় সেই বন্ধুর একি হাসি, একি নীরব চাহনি দেখা দিল!

U. RAY & SONS,
100, Garpar Road, Calcutta

'লক্ষ তারের বিশ্বরবীণা' এই নীরবতায় লীন হইয়া এইখানে আজ সুর কুড়াইতেছে, 'সপ্তলোকের আলোকধারা' এই ছায়াতে আজ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে! একাদশ সংখ্যক কবিতাটি আরও চমৎকার! বিশ্বের একেবারে অন্তরতম কেন্দ্রস্থলে সমস্ত জীবনের সুদীর্ঘ পথখানি গিয়া মিলিয়াছে এবং সেই নিভৃত কেন্দ্রলোকটির গোপন দ্বার সমস্ত "চরাচরের হিয়ার কাছে"ই আছে। এই জীবনপথিকের দীর্ঘ পথযাত্রার সেইখানেই অবসান। সেখানে কে আছে? যে আছে—

> অপূর্ব্ব তার চোখের চাওয়া
> অপূর্ব্ব তার গায়ের হাওয়া
> অপূর্ব্ব তার আসা যাওয়া গোপনে।

সেই 'জগৎ-জোড়া ঘর'টিতে কেবল দুটিমাত্র লোকের ঠাঁই হয়—সেই বিশ্বপদ্মের কেন্দ্রগত মধুকোষে যে অপূর্ব্ব লোকটি বসিয়া আছেন তাঁর এবং সেই কমলমধুপিয়াসী যে চিত্তভ্রমর তাহার উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার—কেবলমাত্র এই দুজনার। এই কবিতাগুলির প্রত্যেকটি-তেই সসীম-অসীমের, সরূপ অরূপের, জীব ও ভগবানের নিত্য প্রেমলীলার উপলব্ধির নিবিড় আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ লীলা বিশ্বের সেই নিভৃততম অন্তরতম কেন্দ্রটিতে উদ্‌যাপিত—এ লীলা বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যে, সকল আনন্দে, বিশ্বমানবের সকল বিচিত্রতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ছাপাইয়া পড়ে নাই। "সেখানে আর ঠাঁই নাইত কিছুরি।" সেই জন্যই ঐ আর একটি সুর আসিয়া এই নিভৃত বিলাসকে ভাঙিয়া দিল—ঐ বাহির হইয়া পড়িবার সুর।

> এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
> আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে।

কেবল এই কবিতাগুলির সুর যদি চিত্তকে ভরপুর করিয়া রাখিতে পারিত তাহা হইলে কখনই ঐ বাহির হইয়া পড়িবার সুর এমন প্রবলতা লাভ করিতে পারিত না। এই কবিতাগুলির সুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সুর—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাতত্ত্বে এই সুরইতো ফুটিয়াছে। সেই তত্ত্বে এই কথাই বলে যে, ভগবান জীবকে ভুলাইবার জন্যই সৌন্দর্য্যের বেশ পরিয়া দেখা দেন, অরূপ হইয়াও রূপ ধরেন, এবং দুঃখের দুর্গম পথের মধ্য দিয়া অভিসারে বিশ্বের অন্তরতম জায়গায় সেই নিভৃত নিকুঞ্জে সকল সংস্কারের পাশ ছিন্ন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনেন:—

> আমার পরশ পাবে বলে
> আমায় তুমি নিলে কোলে
> কেউ তজানেনা তা।
> রইল আকাশ অবাক্ মানি,
> করল কেবল কানাকানি
> বনের লতাপাতা।

কিন্তু সে সুরে কুলাইল না। লোহিত সমুদ্রে এই গান জাগিল:—

> প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
> মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।

"আরো আরো আরো" চাই। কেবল তৃপ্তির বিরতি চাই না, অতৃপ্তির চিরগতি চাই। কেবল উপলব্ধির শান্তি নয়, নব নব বেদনাময় চৈতন্য।

(৩)

ইংলণ্ডে, ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পথে জাহাজে এবং স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পরে ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ছয় মাসে, কবি যে গীতিমাল্য গাঁথিয়াছেন, সে গানগুলি একেবারে স্বচ্ছ, ভারমুক্ত, ফুলেরি মত নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। 'গীতাঞ্জলি'র কোন গানই এই গানগুলির মত এমন মধুর, এমন গভীর, এমন আশ্চর্য্য সরল নহে।

ইংলণ্ডে "জনসংঘাত মদিরা" স্বভাবতই মানুষকে কিছু না কিছু চঞ্চল করিয়া দেয়, তার উপর ইংলণ্ডের গুণী রসিকসমাজের স্তবমদিরা যখন পাত্র ছাপাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই শান্তিভঙ্গকারী উত্তেজনা-উন্মত্ততা হইতে আপনাকে নিবৃত্ত রাখিয়া 'তোমারি নাম বলব', 'ভোরের বেলা কখন্ এসে' প্রভৃতি সরলমধুর গান রচনা করা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়! এ সকল গানের নীচে Cheyne Walk, London লেখা না থাকিলে এ গানগুলি ইংলণ্ডে রচিত, এ কথা মনে করাই অসম্ভব হইত। ইংলণ্ডের গুণীসমাজ কবির গলায় যে প্রশংসার মণিহার পরাইয়া দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটিমাত্র গান গীতিমাল্যে আছে—'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'!

কবির সৌন্দর্য্য-সাধনা যেমন কড়িও কোমল ও চিত্রাঙ্গ-

দার ভোগপ্রদীপ্ত বর্ণ-উজ্জ্বলতায় প্রথম সূচনা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সোণার তরী-চিত্রার 'মানসসুন্দরী' 'উর্ব্বশী' প্রভৃতি কবিতার বর্ণপ্রাচুর্য্যে ও বিলাসে বিচিত্র হইয়া অবশেষে ক্ষণিকার বর্ণবিরল ভোগবিরত সুগভীর স্বচ্ছতায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া ক্রমশঃ কবির অধ্যাত্ম সাধনা এই গীতিমাল্যে বিচিত্রতা হইতে ঐক্যে, বেদনা হইতে মাধুর্য্যে, বোধ-প্রাখর্য্য হইতে সরল উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে। উপনিষদে আছে, পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেনাস্থতিষ্ঠেৎ। পাণ্ডিত্যকে (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নজনিত সংস্কারগত বুদ্ধিকে) দূর করিয়া বাল্যে (অর্থাৎ উপলব্ধির সারল্যে) প্রতিষ্ঠিত হও। গীতিমাল্যের ৩১ সংখ্যক কবিতায় আছে যে, কবি সমস্ত জীবনের পসরা মাথায় করিয়া হাঁকিয়া ফিরিয়াছেন কে তাঁহাকে কিনিয়া লইবে? মান নয়, ধন নয়, সৌন্দর্য্য নয়। কিন্তু সংসারসাগরতীরে যে শিশু ঝিনুক লইয়া আপন মনে খেলিতেছে, সেই তাঁহাকে বলিল "তোমায় অমনি নেব কিনে।" তাহারি কাছে সব বোঝা নামিল, সে-ই বিনামূল্যে কবিকে কিনিয়া লইল। তাই "যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে, শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে", সেই সুরে এই গীতিমাল্যের সরল গানগুলি বাঁধা হইয়াছে।

> বিনা প্রয়োজনের ডাকে
> ডাকব তোমার নাম।
> সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
> পুরবে মনস্কাম।
> শিশু যেমন মাকে
> নামের নেশায় ডাকে
> বল্‌তে পারে এই সুখেতেই
> মায়ের নাম সে বলে!
>
> *
>
> আমার মুখের কথা তোমার
> নাম দিয়ে দাও ধুয়ে
> আমার নীরবতায় তোমার
> নামটি রাখ থুয়ে।
>
> জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে
> রবে নামের মধু
> তোমায় দিব মরণক্ষণে
> তোমারি নাম বঁধু॥

ব্রাউনিংয়ের The Boy and the Angel নামক এক কবিতায় আছে যে একটি কাঠুরিয়া ছেলে বনে কাঠ কাটিত আর সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম করিত। সেই গান স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসনতলে গিয়া পৌঁছিত এবং তাঁহাকে পুলকিত করিত। তিনি স্বর্গের দেবতাদিগকে বলিতেন, সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারা যে দিবানিশি আমার বন্দনাগান করিতেছে, সে গানের সুর প্রাচীন, তাহা অনাদিকাল হইতে ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু ঐ যে একটি ছেলে আমায় ডাকে, এ ডাক আমার বুকে লাগিয়াছে—ঐ ডাকের মত মিষ্ট ডাক আর আমি শুনি নাই।

ঈশ্বরের এই কথা শুনিয়া স্বর্গের দেবতাগণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল পাখা মেলিয়া পৃথিবীতে চলিয়া আসিলেন এবং সেই বালকের দেহ ধারণ করিয়া সেই কাঠ কাটার কাজে নিরত রহিলেন। তিনি সেই কাঠ কাটেন এবং ঈশ্বরের নাম গান করেন।

বালক গেল মরিয়া। সে দেহান্তর ধারণ করিয়া রোমের পোপ হইল। পোপ হইয়া সে গির্জ্জায় বড় গলায় বড় সুরে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল।

ঈশ্বর বলিলেন, আমার সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গীত যে বন্ধ হইয়া গেল! I miss my little humam voice! আমি সেই ক্ষুদ্র মানবকণ্ঠটি যে আর শুনি না।

গ্যাব্রিয়েল সে সুর কেমন করিয়া পাইবে? আর পোপের সুর সেও যে স্বতন্ত্র।

গ্যাব্রিয়েল তখন লজ্জিত হইয়া পোপের প্রাসাদে আসিয়া পোপকে দেখা দিল। বলিল, আমি তোমার দেহ ধারণ করিয়া তোমার সুর সাধিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম। আমি পারিলাম না। যাও, তুমি তোমার স্থানে—পুনরায় গিয়া পূর্ব্ববৎ ঈশ্বরের নাম গান কর।

ব্রাউনিং এই The Boy and the Angel কবিতায় যে কথাটি বলিতে গিয়াছেন তাহা ঐ একটি মাত্র "তোমারি নাম বলব" গানে তত্ত্বরূপে নয় সেই "human voice" রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এই গানেই "তোমার সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে"—এই গান সত্য হয়। এ গানে তত্ত্বের কথা নাই, সাধনার কথা নাই। এ কেবল সেই একটি ডাক—সেই একটিমাত্র ডাক এমন

পরিপূর্ণ, এমন গভীর, এমন সরল যে তাহাতে এই আশ্বাস সুনিশ্চিতরূপে পাওয়া যায় ঃ—

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন্ হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠ্‌বে।

(৪)

গীতিমাল্যে অধ্যাত্ম সাধনার সংশয়-সংগ্রাম-বেদনা-অপেক্ষা-লীলান্বিত বিচিত্র অবস্থা ও অনুভাবের গান যথেষ্ট নাই, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। গীতাঞ্জলি হইতে গীতিমাল্যের এইখানেই শ্রেষ্ঠত্ব একথাও আমি বলিয়াছি।

বাস্তবিক গীতিমাল্যে কবি যেখানেই তাঁহার ভিতরকার সাধনার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেখানেই তিনি সাধনার পথ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে অধ্যাত্ম সাধনার যে সকল 'মার্গ' নির্দ্দিষ্ট আছে—সে সকল কোন পন্থারই তিনি পন্থী নহেন। বিবেক বৈরাগ্য বা শমদমাদি সাধন, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি যোগ সাধন, বৈষ্ণবের শান্তদাস্যাদি পঞ্চরসের সাধন, এ কোন সাধনপ্রণালীই তাঁহার জীবনের পক্ষে উপযোগী নয়। তাঁহার পথ তাঁহার আপনার পথ—কোন শাস্ত্র বা গুরুর দ্বারা সে পথ নির্দ্দেশিত হয় নাই।

ইউরোপীয় মিষ্টিক সাধকদিগের পন্থা প্রণালী বা সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সঙ্গেও তাঁহার পন্থার বা সাধনার অবস্থার কোন মিল নাই। প্রথমতঃ তাঁহারা যাহাকে 'Conversion' বলেন, অর্থাৎ চৈতন্যের অকস্মাৎ উদ্বোধন এবং ধর্ম্মজীবনের জন্য ব্যাকুলতা, তার পর যাহাকে Purgative stage বলেন, অর্থাৎ সংসারবৈরাগ্য, পাপবোধ, দীনতা এবং আত্মত্যাগ ; তার পর যাহাকে Illuminative stage বলেন, যখন ঈশ্বরের সহবাসজনিত ভূমানন্দ সাধকের চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে, যখন বহির্লোকে ঊর্দ্ধ পূর্ণ, অধঃ পূর্ণ, পূর্ণ সর্ব্ব চরাচর, এবং চিদ্ লোকে নানা visions বা দর্শন স্বেদ কম্প পুলক প্রভৃতি রসভাবকে উদ্রিক্ত করে এবং সর্ব্বশেষ চরম অবস্থা যাহাকে Unitive stage বলেন,—জীবাত্মা পরমাত্মায় অচ্ছেদ্য একাত্মকতা—সে সকল অবস্থা এবং সে সকল অবস্থা লাভের জন্য সাধনপ্রণালী রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনক্ষেত্রে মেলে কি না দেখিতে গেলে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের সাধনপন্থা না এদেশীয় না বিদেশীয় কোন সাধনপন্থার সঙ্গে মেলেনা। ইহাকে Subjective Individualism বল, স্বানুভূতি বল, আর যাই বল—তাহাতে কিছুই আসে যায় না। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে কোন সাধক যথার্থ কোন সত্য উপলব্ধিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এবং কোন সত্য বাণী প্রচার করিয়াছেন তিনি আপনার পথেই আপনি চলিয়াছেন। দশের পথে যান্ নাই, শাস্ত্রবাক্যকে অভ্রান্ত বলিয়া মানেন নাই, গুরু করণ করিয়া গুরুর হাতেই আপনার বুদ্ধিকে গচ্ছিত রাখেন নাই—একেবারে তীরের মত সোজা সেই পরমলক্ষ্যে গিয়া বিদ্ধ হইয়াছেন। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। সেই তন্ময়তা যে কোথা হইতে তাঁহারা পাইয়াছিলেন, যাহাতে বিষয়তৃষ্ণা আপনি বিনা চেষ্টায় তিরোহিত হইয়াছে, প্রেম সর্ব্বভূতে আপনি প্রসারিত হইয়াছে, হৃদয়গ্রন্থি সকল আপনি ছিন্ন হইয়াছে, তাহার কোন ইতিহাস নাই। পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সাধনার ধাপ অনুসরণ করিয়া কোন বড় সাধকের সাধনা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয় নাই। আগে Purgative পরে Illuminative পরে Unitive—এমন করিয়া ধাপে ধাপে খৃষ্টীয় কোন সাধকেরও সাধনের অবস্থাগুলি উন্নীত হয় নাই। শাস্ত্র, গুরু, মার্গ এসমস্ত দশের জন্য। তাহাদের পক্ষে Individualism বিপজ্জনক। কিন্তু যিনি আপনার পথে আপনি চলিবেনই চলিবেন এবং সেই চলার দ্বারাই যাঁহার উপলব্ধি গভীর হইতে গভীরতর হয়, তাঁহার পক্ষে নিজের পথে চলায় বিপদ কোথায়? তিনিই তো আসল Individual বা ব্যক্তি—তাঁহার Individualism বা ব্যক্তিত্বই তো যথার্থ রূপে সার্থক—কারণ তাহা তাঁহাকে ক্রমশঃ ব্যক্ত করিয়া তুলিবেই তুলিবে। সত্যে, আনন্দে, কল্যাণে, পূর্ণতায় ব্যক্ত করিয়া তুলিবে। গীতিমাল্যে তাই কবি কোথাও ব্যর্থতার কান্না কাঁদেন নাই—তিনি বেশ জোরের সহিতই বলিয়াছেন—

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার?
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।

পথ আমারে পথ দেখাবে! সে পথ একমাত্র Individual এর নিজস্ব পথ—সে পথের সঙ্গে অন্য কাহারো কোন পথের সাদৃশ্য নাই।

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস্ নি যে
ফিরে যারে।"
ফেরার পন্থা বন্ধ ক'রে
আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে।
জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে।

'জ্ঞানী' হচ্ছেন সেই সব লোক যাঁহারা বিচারে প্রবৃত্ত হন্ এ সাধনা 'বস্তুতন্ত্র' কিনা, এটা Subjective Individualism এর কোটায় পড়ে কিনা এবং যদি পড়ে তাহা হইলে এ সাধনার শেষ ফল কি দাঁড়াইবে—ইত্যাদি। এই সকল লোক একটা সোজা মোটা কথা ভুলিয়া যায় যে জীবন জিনিষটা কোন শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ধরা দিবার মত জিনিষ নহে। সূর্য্যাস্তের সময়ে মেঘের মধ্যে যখন বর্ণচ্ছটার পর বর্ণচ্ছটা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতে থাকে, তখন সেই সকল সূক্ষ্ম বর্ণবিভঙ্গের শ্রেণীনির্দ্দেশকার্য্য যেমন কোন মতেই সম্ভাবনীয় নহে, কারণ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার পরিবর্ত্তন দেখা দেয়—সেই রূপ জীবন যেখানে স্বভাবত বিকাশ লাভ করিতেছে, সেখানে তাহার নিত্য নবীন অভাবনীয় গতিশীল বৈচিত্র্যকে তত্ত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া শ্রেণীর খোপের মধ্যে পুরিবার চেষ্টা করা মিথ্যা। জীবন্ত সাধনার কতটুকু Subjective কতটুকু Objective, এ সকল বিচার করিতে যাওয়াই মূঢ়তা মাত্র—এতো জড়বস্তু নয় যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় গুঁজিয়া রাখা যাইবে—এ যে জৈববস্তু—এ যে নিত্য ক্রিয়াশীল, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। তাই কবি বড় খেদে বলিয়াছেন:—

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি
তোমায় আকাশ তোমার বাতাস
এইত সবি সোজাসুজি।

হৃদয় কুসুম আপনি ফোটে
জীবন আমার ভরে ওঠে
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি।

কান্টের Categories ভাঙিবার জন্য আধুনিক যুগে বার্গসঁ অভ্যুদয় হইয়াছে। কান্ট আইডিয়াকে স্থিত দেখিয়াছিলেন, ব্যার্গসঁ তাহাকে চিরচঞ্চল চিরগতিশীল বলিয়া প্রমাণ করিতে চান্। হেগেল Dialectic movement তত্ত্বে চিন্তার গতিশীলতা প্রতিপাদন করিলেও, নামে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। আশা করা যায় যে এক সময়ে আমাদের দেশে যেমন বৈষ্ণব আচার্য্যেরা দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদের বিচিত্র বাদানুবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' নামক এক অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোন তত্ত্ব ইউরোপেও উদ্ভাবিত হইবে। Vitalism একালের সেই তত্ত্ব। "Not law but aliveness, incalculable and indomitable is their motto; not human logic, but actual human experience is their text......The vitalists see the whole cosmos as instinct with spontaneity: as above all things free." অর্থাৎ নিয়ম নহে, কিন্তু অপরিমাণ ও অদম্য প্রাণময়তা এই তত্ত্বের আদর্শ; এই তত্ত্বের কথা এই যে লজিকের দ্বারা কোন সত্য স্থিরীকৃত হয় না, বাস্তব অভিজ্ঞতাই সত্য-নির্দ্ধারণের মানদণ্ড। এই তত্ত্বের তাত্ত্বিকগণ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্বতোস্ফূর্ত্ত দেখেন তাহা কোন নিয়ম-নিগড়ের দ্বারা কোথাও বদ্ধ নহে, সর্ব্বত্র মুক্ত। এক কথায় এই তত্ত্ব বলে যে, জীবন সকল তত্ত্বের চেয়ে বড়। এই নূতন জীবন-তত্ত্বই এই বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারে:—

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।

এই জীবনকে যতই জানা যাইবে, ততই জীবনের জীবনকেও বেশি করিয়া চেনা যাইবে। কারণ জীবনই একমাত্র তত্ত্ব। হুইটম্যান তাঁহা Assurances নামক কবিতায় বলিয়াছেন, I know that exterior has an exterior and interior has an interior—(আমার

ছত্রটি ঠিক স্মরণ নাই)—আমি জানি যে যাহাকে বাহ্ন বলি তাহারও একটি বাহির আছে, যাহাকে অন্তর বলি তাহারও একটি অন্তর আছে। সমস্ত বিশ্বতত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই অসীমের তত্ব আরও স্ফুটতর হইবে। যেমন অধুনা বিজ্ঞানের দ্বারা হইতেছে। আত্মতত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরমাত্মতত্ব আরও ব্যক্ততর হইবে। "এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা"।

(৫)

অনেক দিন হইতেই আমাদের দেশে দুইটি সাধনায় বিরোধ চলিতেছে—এক নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাধনা, আর একটি বৈষ্ণব সাধনা অর্থাৎ রূপরসের নিবিড় উপলব্ধির ভিতর দিয়া অতীন্দ্রিয় রসস্বরূপের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা। কেবল তত্বমাত্র-সার সাধনায় শুষ্কতা আনে, কেবলমাত্র ভক্তি রসবিহ্বল সাধনায় মাদকতা আনে। এ দুয়ের মিলন চাই। কিন্তু সে মিলন তত্বে হইলে চলিবে না। জীবনে হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই দ্বন্দ্বের সমাধান আমরা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। গীতিমাল্যের শেষ গান গুলিতে তাহার আভাস পাই।

ওদের সাথে মেলাও যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।
পাষাণ দিয়ে বাঁধা বাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু।
কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি
কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি।
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে
পাখীর মুখে এই যে খবর পেনু।

এ গান কোন ভক্ত বৈষ্ণবের রচনা হইতে পারিত।

কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গানের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি। সে গানটি কোন মতেই কোন বৈষ্ণবের দ্বারা রচিত হইতে পারিত না।

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তার অণু পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
* * * *
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগযুগান্তরের স্তন্য
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

এই নরদেহ গড়িয়া উঠিবার অভিব্যক্তির ইতিহাসের স্তরে স্তরে যে ভগবানের আনন্দলীলা বিরাজিত তাহা উপলব্ধি করা এ কালের কবি ভিন্ন আর কোন কালের কবির দ্বারা সম্ভাবনীয় ছিলনা। ভগবানের অসীম আনন্দকে সীমারূপের মধ্যে নিবিড় করিয়া উপলব্ধি বৈষ্ণব কবির মধ্যে আমরা দেখিয়াছি। আবার সেই সীমারূপকে অসীম দেশে ও অসীম কালে ব্যাপ্ত করিয়া সীমার মধ্যে অসীমতাকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি একালের ভক্তকবিদের মধ্যে দেখিতেছি। ব্রাউনিংএর Saul, টেনিসনের Flower in the crannied wall, ব্লেকের 'To see a world in a grain of sand'—এই শেষোক্ত উপলব্ধির কাব্যের নমুনা। 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ' এই শ্রেণীর কবিতা। ইহা হুইটম্যান বা এড্ওয়ার্ড কার্পেন্টার লিখিতে পারিতেন। এ কাব্য এভোল্যুশনে জীবলীলার কাব্য।

গীতিমাল্যের সম্বন্ধে আমার আলোচনা শেষ করিলাম। গীতিমাল্যের পরে আমরা আর কি শুনিব? কিন্তু কবির প্রার্থনা তো আমরা জানি :—

সুরে সুরে বাঁশি পুরে
মোরে আরো আরো আরো দাও তান।

অতএব আমরাও সেই 'আরো আরো আরো'র অপেক্ষায় রহিলাম।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

ধর্ম্মপাল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নগরে প্রবেশ করিয়া পুরুষোত্তম ও নন্দলাল কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা চক্রায়ুধকে লইয়া কোথায় যাইবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। নগরবাসী তখনও সুষুপ্তিমগ্ন, সূর্য্যোদয়ের তখনও বিলম্ব আছে, চির প্রথানুসারে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাসাদের

তোরণ মুক্ত হয় না, সুতরাং তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া যাইবারও উপায় নাই, অথচ তাঁহারা কান্যকুব্জের যুবরাজকে নিজ আবাসভবনে লইয়া যাইতেও সাহস করিতেছিলেন না; এই সময়ে আগন্তুক আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। জনশূন্য রাজপথে তাঁহাকে দেখিয়া পুরুষোত্তমদেব চমকিত হইলেন কিন্তু নন্দলাল তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "আপনাকে এই মাত্র মধুসূদনের ঘাটে দেখিলাম না?" আগন্তুক কহিলেন "হাঁ।"

নন্দ।— আপনি কোথায় যাইবেন?

আগ।— প্রাসাদে।

নন্দ।— প্রাসাদে? প্রবেশ করিবেন কেমন করিয়া?

রাজপথের পার্শ্বে জনৈক নাগরিকের গৃহে বাতায়ন-পথে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহার আলোক আসিয়া আগন্তুকের মুখের উপর পড়িল, দীপালোকে তাঁহার মুখ দেখিয়া পুরুষোত্তম চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আগন্তুকের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?"

আগন্তুক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "পুরুষোত্তম, বল দেখি আমি কে?" রাজপুরোহিত তখন আগন্তুকের পদপ্রান্তে রাজপথে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন "প্রভু, অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আপনাকে অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই।"

আগ।— এখন চিনিতে পারিয়াছ?

পুরু।— আপনি প্রভু বিশ্বানন্দ। প্রভু কখন গৌড়ে আসিলেন?

বিশ্ব।— তোমাদিগের দুই প্রহর পূর্ব্বে, রাত্রিকালে নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলাম।

পুরু।— প্রভু, নারায়ণ আপনার দর্শন মিলাইয়া দিয়াছেন, আমরা রাজ অতিথি লইয়া বিষম বিপদে পড়িয়াছি।

বিশ্ব।—রাজ অতিথি কোথায় পাইলে?

পুরু।— বারাণসীতে। মহারাজাধিরাজ আমাকে কান্যকুব্জে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ করিয়া গৌড়ে ফিরিতেছিলাম, পথে বারাণসীতে একদিন অপেক্ষা করিলাম। সেই দিন প্রভাতে আদি কেশ ঘাটে স্নান করিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম যে নগর জয়সিংহ একটি অল্পবয়স্ক যুবকের সহিত কথা কহিতে এবং তাহাকে সত্বর নগর ত্যাগ করিতে বলিতে

বিশ্ব।—তাহা শুনিয়া তুমি কি করিলে?

পুরু।—সেই যুবকের কাতরোক্তি শুনিয়া আ মনে বড় ক্লেশ হইল। আমি জল হইতে উঠিয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কে? তোমার কি হইয়াছে তাহার পরিচয়ে জানিলাম যে সে কান্যকুব্জের রাজ চক্রায়ুধ, তাহার পিতৃব্য ইন্দ্রায়ুধ তাহাকে সিংহাসনাচু করিয়াছে, এখন আর তাহার পিতৃরাজ্যে তাহার খু তাতের ভয়ে তাহাকে কেহই আশ্রয় দিতে চাহে ন আমি তাহাকে অভয় দিয়া বলিলাম তোমার ভয় না আমি তোমাকে আশ্রয় দিব।

বিশ্ব।—উত্তম করিয়াছ, পুরুষোত্তম তুমি গৌড়রা পুরোহিতের উপযুক্ত কাজ করিয়াছ। তোমার দে যে এত দয়া আছে তাহা আমি জানিতাম না। তোম মস্তিষ্কে যে এত চিন্তাশক্তি আছে তাহা গৌড়রাজ্যে বে জানিত কি না সন্দেহ।

পুরু।—কিন্তু প্রভু—

বিশ্ব।—কিন্তু কি পুরুষোত্তম?

পুরু।—প্রভু, আমি আর একটু কার্য্য করি আসিয়াছি।

বিশ্ব।—আবার কি?

পুরু।—প্রভু, আমি মনের আবেগে আবক্ষ জাহ্নবী সলিলে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি যে যেম করিয়া পারি চক্রায়ুধের পিতৃরাজ্য তাহাকে ফিরাইয় দিব।

বিশ্ব।—কি বলিলে?

পুরু।—প্রভু, পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া প্রতিজ্ঞ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন রক্ষা হইবে কেমন করিয় ঠাকুর? আমার কথা রক্ষা না হইলে কেবল যে আমার অপমান—তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে গৌড়রাজ্যের অপমান।

বিশ্ব।—পুরুষোত্তম শান্ত হও, তুমি কি বলিলে তাহ আমি ভাল শুনিতে পাই নাই।

পুরুষ।—প্রভু, আমি অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আদিকেশবের ঘটে পবিত্র জাহ্নবীসলিলে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি যে যুবরাজ চক্রায়ুধের পিতৃরাজ্য যেমন করিয়া পারি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিব।

সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া উত্তর না দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তম উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিঞ্চিদ্দূরে যুবরাজ চক্রায়ুধ ও নন্দলাল তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরিচারক ও সেনাগণ তাঁহাদিগের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। তখন পূর্ব্বদিকে আলোকের ক্ষীণরেখা দেখা দিয়াছে। রাজপথে দুই এক জন লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে পূর্ব্বদিকে নীল আকাশ উষালোকে শুভ্র হইয়া উঠিল, তৈলহীন প্রদীপের মত তারকাগুলি একে একে নিভিয়া গেল। বিশ্বানন্দ তখনও রাজপথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন।

তিনি ভাবিতেছিলেন—বুদ্ধিহীন সহৃদয় পুরুষোত্তম বারাণসীর প্রাচীনতম তীর্থ কেশবের মন্দির-ঘাটে পূত জাহ্নবীসলিলে দাঁড়াইয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে তাহার কি উপায় হইবে। পুরুষোত্তম অবশ্য অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাহার কোমল হৃদয় অপ্রাপ্তবয়স্ক, আশ্রয়বিহীন যুবার খেদোক্তি শুনিয়া দ্রবীভূত হইয়াছিল, কিন্তু সে ত চক্রায়ুধকে আশ্রয় দিয়া নিরস্ত থাকিলেই পারিত, সে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করিতে গেল কেন? কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া বজ্রায়ুধের পুত্রকে পিতৃসিংহাসনে পুনস্থাপিত করা সহজসাধ্য হইবে না। ভণ্ডারবংশ হীনবীর্য্য নহে। এতদ্ব্যতীত মরুভূমিতে পরাক্রমশালী গুর্জ্জররাজ্য ইন্দ্রায়ুধের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করিতে হইলে অবন্তি ও ভীল্লমালের দর্প চূর্ণ করা আবশ্যক। কেমন করিয়া পুরুষোত্তমের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে! এই সময়ে পথিপার্শ্বস্থিত বিটপিরাজির পাদমূলে ক্রোয়িত অন্ধকার হইতে বিশ্বানন্দের মানসিক উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া কে যেন বলিল "হইবে।"

বিশ্বানন্দ তাহা শুনিয়াও যেন শুনিলেন না। তাঁহার চিন্তাস্রোত বাধা পাইল না, তিনি ভাবিতে লাগিলেন—গৌড়রাজ্যে কি এমন শক্তি আছে যাহার বলে ধর্ম্মপাল রণে দুর্দ্ধর্ষ জাতির সম্মুখীন হন। এই শিশু সাম্রাজ্যের কোষে কি এমন অর্থ আছে যাহাতে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত-বিজয়যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। তখন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াই অন্ধকার হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল "আছে।" শব্দ শুনিয়া বিশ্বানন্দ চমকিয়া উঠিলেন কিন্তু দ্রুতপদে বৃক্ষতলে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন দূর হইতে আবার কে বলিয়া উঠিল "সময় হইয়াছে, চক্ররাজ! রাত্রিতে মণিদত্তের গৃহে আসিও।"

বিশ্বানন্দ দ্রুতপদে শব্দের দিকে ছুটিয়া চলিলেন, তাহা দেখিয়া পুরুষোত্তম, নন্দলাল ও চক্রায়ুধ ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু অরুণপ্রভায় ক্ষীণ অন্ধকারে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন বিশ্বানন্দ পুরুষোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার সহিত কে কথা কহিল?"

"কই কেহ ত কথা কহে নাই?"

"আমাকে কে যেন কি বলিল?"

"কই না, আমি ত কিছু শুনিতে পাই নাই?"

সহসা বিশ্বানন্দের মুখ উল্লাসে দীপ্ত হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিলেন "কান্যকুব্জরাজ কোথায়?"

পুরুষোত্তম চক্রায়ুধকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিলেন, তিনি আসিয়া সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বিশ্বানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "মহারাজের জয় হউক।" চক্রায়ুধ ও নন্দলাল বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অবসর বুঝিয়া পুরুষোত্তম সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, কি হইবে?"

"পুরুষোত্তম, তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইবে।"

সরলচিত্ত সহৃদয় ব্রাহ্মণ রাজপথের ধূলায় সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। তখন সকলে মিলিয়া প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব প্রাসাদের ঘাটে স্নান করিতেছেন।

অদ্য স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ গোপালদেবের শ্রাদ্ধ। গঙ্গাতীরে একজন পরিচারক নূতন বস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সোপানশ্রেণীর উপরে প্রতীহারগণ পথ হইতে ভিক্ষুগণকে সরাইয়া দিতেছে। মহারাজাধিরাজ স্নানান্তে দান করিবেন, ইহা শুনিয়া দুই তিন দিন হইতে গৌড় নগরে বহু দীন, অনাথ, দরিদ্র ভিক্ষুকের সমাগম হইয়াছে। ঘাটের সোপানের উপরে মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ ও ভাণ্ডাগারাধিকৃত দাঁড়াইয়া আছেন। ঘাটের এক পার্শ্বে বহু বস্ত্রাধারে রাশি রাশি ক্ষুদ্র রজতখণ্ড সজ্জিত রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে একজন খর্ব্বাকৃতি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন। ইনি অদ্য জাহ্নবীতীরে মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে একখানি গ্রাম দানস্বরূপ গ্রহণ করিবেন। তাঁহার পার্শ্বে কিঞ্চিৎ দূরে জনৈক বৃদ্ধ মহাব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন, তখনও উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ সকল সময়ে দানস্বরূপ সুবর্ণ গ্রহণ করিতেন না, মহাব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধাদির দান গ্রহণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের মহাব্রাহ্মণ আখ্যা হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর এই মহাব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান না করিলে অদ্য কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার দান গ্রহণ করিবেন না।

একজন দীর্ঘকায় গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে জনতা ভেদ করিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার উন্নত দীর্ঘ দেহ ও তেজোব্যঞ্জক মুখমণ্ডল দেখিয়া ভিক্ষুকগণ সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিতেছিল। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে ঘাটের নিকটে আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রতীহারগণ অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল! তিনি ঘাটে আসিলে মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ চন্দ্রনাথ শর্ম্মা ও ভাণ্ডাগারাধিকৃত রবিদত্ত ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ সর্ব্বগৌড়েশ্বর শ্রীমান ধর্ম্মপাল দেব স্নান শেষ করিয়া ঘাটের সোপানে দাঁড়াইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। রবিদত্ত স্বর্ণমুদ্রা-পরিপূর্ণ বস্ত্রাধার তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে মহারাজ পরিচারকের হস্ত হইতে গঙ্গাজল-পরিপূর্ণ সুবর্ণভৃঙ্গার গ্রহণ করিয়া ভূমিতে জলধারা নিক্ষেপ করিয়া মহাব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিলেন। তাহা দেখিয়া সমবেত ভিক্ষুকগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন চন্দ্রনাথ শর্ম্মা ভূর্জ্জপত্রে লিখিত শাসন লইয়া অগ্র হইলেন। এই সময়ে রজত মুদ্রার বস্ত্রাধার সম্মু অন্তরাল হইতে নির্গত সন্ন্যাসী ধর্ম্মপাল দেবের সম্মু হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌড়েশ্বর দণ্ডবৎ ভূমে পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী গৌড়েশ্বরের হস্ত ধারণ করিয়া উঠাই কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, অদ্য পুণ্যাহে সন্ন্যা বিশ্বানন্দ ভিক্ষার্থ গৌড়েশ্বরের সমীপে উপস্থিত।" ধর্ম্মপ দেব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "প্রভু, এই গৌড়রাে এমন কি আছে যাহা আপনার অধিকারভুক্ত না আপনাকে অদেয় আমার কি আছে?"

"ধর্ম্ম, যাহা চাহিতে আসিয়াছি তাহা সহজসা নহে, অথচ তোমার সাধ্যায়ত্ত।"

"প্রভু, আপনি চাহিবার পূর্ব্বে তাহা আপন হইয়াছে।"

"ধর্ম্ম, আমি তোমার নিকট একজন আশ্রয়হীনে জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, প্রবলের উৎপীড় হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিে আসিয়াছি। তুমি কি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে?"

"প্রভু, আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না তবে আশ্রয়হীনকে অবশ্য আশ্রয় দিব, প্রবলের উৎপীড় হইতে যথাসাধ্য দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব কিন্তু আপনি কাহার কথা বলিতেছেন?"

"গৌড়েশ্বর, কান্যকুব্জরাজ স্বর্গীয় বজ্রায়ুধের পু চক্রায়ুধ খুল্লতাতের চক্রান্তে সিংহাসনচ্যুত এবং অত্যাচার ভয়ে পলায়নতৎপর। চক্রায়ুধ আজ আশ্রয়ভিখার হইয়া গৌড়নগরে উপস্থিত, তুমি কি তাঁহাকে আশ্র দিয়া রক্ষা করিবে?"

"প্রভু, যুবরাজ চক্রায়ুধ লোকবিশ্রুত ভণ্ডীর বংশধর তিনি গৌড়নগরে আসিয়াছেন, তাহা ত আমি জানিতাম না। তিনি কোথায়?"

"নিকটেই আছেন, কিন্তু মহারাজাধিরাজ, তুমি আশ্রয়দানে স্বীকৃত না হইলে তাঁহাকে এই স্থানে লইয় আসিব না।"

"প্রভু, অবশ্য আশ্রয় দিব।"

"কিন্তু, ধর্ম্ম, ভাবিয়া দেখ, আশ্রয় দিলে হয়ত কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধের বিরাগভাজন হইবে, এমন কি মরুমাড়ে পরাক্রান্ত গুর্জ্জররাজও তোমার বিরোধী হইবেন।"

"আশ্রিত সংরক্ষণ রাজধর্ম্ম। ইতিহাসবিশ্রুত ভরতবংশ আশ্রিত সংরক্ষণের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। প্রভু, নবীন গৌড়সাম্রাজ্য যদি হারাইতে হয়, চিরগত পিতৃরাজ্য যদি পরহস্তে সমর্পণ করিতে হয়, তাও স্বীকার, কিন্তু ধর্ম্মপালের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ চক্রায়ুধ আশ্রয়চ্যুত হইবেন না। স্বর্গগত পিতার পুণ্য নাম লইয়া শপথ করিতেছি, কখনও চক্রায়ুধকে পরিত্যাগ করিব না।"

"সাধু, ধর্ম্ম, সাধু। ইহাই শুনিব বলিয়া তোমার নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়াছিলাম। আর একটি প্রার্থনা আছে, ভরসা করি গোপালদেবের পুত্রের নিকট বিমুখ হইব না।"

"কি প্রভু?"

"চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"

"প্রভু, যুদ্ধে জয়পরাজয় অনিশ্চিত। তবে এই জাহ্নবীসলিল হস্তে লইয়া মার্ত্তণ্ডদেব ও নররূপী নারায়ণ ব্রাহ্মণকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি, যতক্ষণ ধর্ম্মপালের দেহে একবিন্দু শোণিত থাকিবে, যতদিন গৌড়রাজ্যে এক মুষ্টি অন্ন থাকিবে, যতকাল আমার অধীনে অস্ত্রধারণক্ষম একজনও সেনা থাকিবে, ততক্ষণ চক্রায়ুধের জন্য যুদ্ধ করিতে বিরত হইব না। যদি বিশ্বজগৎ আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি গোপালদেবের পুত্র ভণ্ডির বংশধরের জন্য অস্ত্রধারণ করিবে।"

সন্ন্যাসী স্তম্ভিত হইয়া ধর্ম্মপালদেবের ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জয় মহারাজাধিরাজের জয়, জয় গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের জয়। ধর্ম্ম, আমি যথার্থ অনুমান করিয়াছিলাম, তুমি সত্য সত্যই আর্য্যাবর্ত্তের গৌরব।"

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জয়ধ্বনি শুনিয়া সহস্র সহস্র ভিক্ষুক সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন গৌড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, যুবরাজ চক্রায়ুধ কোথায়?"

"তিনি মহাপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মার সহিত জনতার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

"তাঁহাকে এই স্থানে আনিতে অনুমতি করুন।"

বিশ্বানন্দের আদেশে রবিদত্ত চক্রায়ুধের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন। চক্রায়ুধের সহিত পুরুষোত্তমদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপালদেব চক্রায়ুধকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সম্মুখে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন পুনরায় দান আরম্ভ হইল। (ক্রমশ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশের কথা

সম্প্রতি এই সমগ্র য়ুরোপব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের দুঃসহ কোলাহলে দেশের আর সর্ব্বপ্রকার সাড়াশব্দই প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। লোকের মুখে আর কোন কথা নাই, কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। সংবাদপত্রগুলিরও লিখিবার বিষয় আর কিছু নাই, শুধু জার্ম্মেনী আর অস্ট্রিয়া আর ফরাসী আর ইংরাজ। জার্মেনী বা অস্ট্রিয়া কিম্বা ফরাসী কি ইংরাজের দেশে এই ব্যাপারটা মোটেই অন্যায় নয়, বরং খুবই উচিত ও ন্যায়সঙ্গত বটে; কিন্তু আমাদের দেশে এতটা নেহাৎই বাড়াবাড়ি। একথা স্বীকার করি যে বর্ত্তমান যুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেশের যোগ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই এক যুদ্ধের হুজুগে আর সমস্ত একান্ত-প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির কথাই বা ভুলিলে চলিবে কেন? অনর্থক রক্তপাতের জন্য আমরা কেন সকল মানবাত্মাই দুঃখিত। কিন্তু দুঃখের ঠাট করিলে জগতের কাহারো বিন্দুমাত্র আসিয়া যাইবে না, একমাত্র আমাদের ছাড়া। বিশ্বপ্রেমিকতা সেই জাতিরই সাজে যে জাতির স্বদেশ-প্রেমিক হইবার পথে কোনোপ্রকার বাধা নাই এবং স্বদেশ যাহাদের অবনতি ও অশিক্ষার সর্ব্বনিম্নস্তরের জমাট অন্ধকারে পতিত নহে।

বর্ত্তমান যুদ্ধটা আমাদের বহু অসুবিধার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে উহা আমাদের একটা বিষম অসুবিধা এমনকি অবনতি হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়াছে। সে উপকারটা, আমাদের দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রটাকে অনেকাংশে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন ও নিষ্কণ্টক করায়। কিন্তু এত বড় কল্যাণটা তো আমরা চাহিয়া দেখিব না—আমরা চাহিব পৃথিবীর যতগুলি স্বাধীন, বাণিজ্য-ও-ধন-সম্পদে শক্তিশালী জাতি, তাহাদের সহিত জগৎ-ব্যাপারে মধ্যস্থতা করিতে! হা মূঢ়! নিজের মায়ের দৈন্য প্রতিদিন শতছিদ্র শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রের ভিতর দিয়া, তাঁহার তপ্ত অশ্রুর ভিতর দিয়া, প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে—আর আমরা যাই কিনা জগতের দরবারে সালিসী করিতে! বামন হইয়া আমরা যাই অতিকায়গণের সহিত সমানে চলিতে!

আমরা যতক্ষণ পরচর্চ্চা পরনিন্দা করি ও আলস্যে কাটাই তাহার দশমাংশও যদি দেশের উন্নতি ও অভ্যুত্থানের জন্য ব্যয় করি তাহা হইলে প্রচুর কাজ হয়। পৃথিবীর কোনো ঘটনায় বিক্ষিপ্তচিত্ত না হইয়া ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় হানাহানি না করিয়া অকৃতকার্য্যতায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিশ্বামিত্রের একাগ্রতা ও অধ্যবসায় লইয়া, ডিমস্থিনীসের মত, তাজনির্ম্মাণকারীদের মত, নগণ্য জীব মাকড়সার মত, নিজেদের কর্ত্তব্য—স্বদেশের উন্নতির ভিতর আপনাদের নিমজ্জিত করিয়া দিই তাহা হইলে জগতের জাতির ভিতর একটা জাতি হইতে পৃথিবীর দেশের ভিতর একটা জগৎমান্য দেশ হইতে কদিন লাগে? দেশের জন্য মেক্সিকো ২৫ বৎসর নুন না খাইয়া ছিল, আর আমরা সামান্য দুএকটি স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারি না! পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব দ্বেষই এখনো ঘুচিল না—তবে আমরা আর বড় হইব কিসে? কার কথা কেই বা শুনিবে?

তাই বলিতেছিলাম এই যে যুদ্ধটা আমাদের একটা বিষম অসুবিধা দুর করিয়াছে—স্বদেশী শিল্পকে কিয়ৎ পরিমাণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়াছে। এসুযোগ যেন আমরা হেলায় না হারাই। জার্ম্মেনীর সস্তা শিল্পদ্রব্য আমাদের দেশীয় শিল্পকে মাথা তুলিতে দিতেছিল না—এখন সে বাধা দুর হইয়াছে—এখন তবে স্বদেশী শিল্প নবীন তেজে সত্বর গজাইয়া উঠুক। এটা মোটেই ভাবে মগ্ন হইবার সময় নয়—স্বদেশী শিল্পের অভ্যুত্থানের জন্য এখন আমাদের শরীরের প্রত্যেক স্নায়ু প্রত্যেক পেশী প্রত্যেক কোষকে সজাগ ও উৎসাহের বিস্ফারণে উন্মুখ করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের বয়নশিল্প, রেশমশিল্প, পশমশিল্প নৌশিল্প ধাতুশিল্প ও অন্যান্য শিল্প আবার মাথা তুলিয়া উঠুক। কাগজ কলম নিব পেন্সিল ছুরি ক্ষুর প্রভৃতি অন্যান্য যন্ত্রাদি ঔষধপত্র বা রাসা দ্রব্যাদি লবণ চিনি চীনা ও ধাতুপাত্র, রং কলকার সূচ সূতা, পেরেক প্রভৃতি যে যে বিষয়েই অ পরমুখাপেক্ষী সেই সমুদয় দ্রব্যই আমাদের দেশে হইতে থাকুক—আর যেন ভবিষ্যতে আমাদের কা নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতে না হয়। আম দৈন্য ও অভাব লইয়া আমাদিগকে আর কোনো দে তাচ্ছিল্য বা বিদ্রূপ করিবার পথ আর যেন আমরা রাখি! আর যেন আমাদের দেশটা পৃথিবীর সব জা কাছে প্রাচীনকালের গোচারণভূমির মত সাধারণ স রূপে ব্যবহৃত হইতে না পায়।

কারিকর যাহারা শিল্পী যাহারা—যুগান্তের অ হইতে আজ তোমরা উঠিয়া এস—আজ তোমাদের মিলিবে—বিধাতা আজ তোমাদের প্রতি কৃপা চাহিয়াছেন। ধনী যাহারা অর্থশালী যাহারা—তোম আজ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও; দেশের শিল্প দেশের গৌরব উদ্ধার করিবার আজ তোমাদের ডাক পড়িয়া এ বড় অল্প সৌভাগ্য নয়। এর গর্ব্ব তোমরা বংশানু করিতে পারিবে এর গৌরব হাজার হাজার শিল্পী মি করিবে—সমগ্র দেশ তোমাদের কীর্ত্তি গাহিবে। য মত আর টাকার পুঁটুলী আগলাইয়া লাভ নাই—দে কার্য্যে দশের কার্য্যে তাহা ঢালিয়া দাও—সহস্র হইয়া তাহা ফিরিয়া আসিবে! কিন্তু দেশজন কাতরোক্তিতে কি কেহ কর্ণপাত করিবে?

স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্য—

'রংপুর দিকপ্রকাশে' একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকা হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ আমরা নীচে তুলিয়া দিলাম

সংস্কৃত ভাষায় একটা প্রবচন আছে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদ কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ" ॥ অ বাণিজ্যে লক্ষ্মী সম্পূর্ণ বাস করেন, চাষে তাহার অর্দ্ধ পরিব তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ রাজসেবায়, ভিক্ষার সহিত লক্ষ্মীর কোনু সম্বন্ধ নাই। কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য।

আমাদের দেশ শিল্পবাণিজ্যের লীলানিকেতন ছিল। ব মিশর, রোম, আরব ও ফিনিসীয় বণিক ভারত হইতে রাশি রা পণ্যদ্রব্য লইয়া ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন দেশ বিদেশে বিক্র করিত; কত চাঁদ সওদাগর কতদেশ হইতে অর্থ আনিয়া ভারতে ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করিত; তাজমহল, কত ঢাকাই মসলিন, কত কাশ্মী শাল কত শিল্পীর মহিমায় ভারতের গৌরব বর্দ্ধন করিত; ক পট্টবস্ত্র ইয়োরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল রোমে সাদরে গৃহীত হই ভারতীয় শিল্পকুশলতার চরণে ইয়োরোপের গর্ব্বিত শির অবন করাইত। ভারতভূমি রত্নপ্রসূ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। কিন্তু আ সেদিন চলিয়া গিয়াছে। ভারতবাসীর সে জ্যোতি নাই, সে লক্ষ্ম নাই, ভারতবাসী আজ লক্ষ্মীছাড়া। আমরা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে টাক রাখিব, তথাপি শিল্পবাণিজ্যের দিকে মুখ তুলিয়াও তাকাইব না

আমাদের এ মোহ কি কাটিবে না? আমরা বক্তৃতায় টাউনহল বিদীর্ণ করিব, ভারতের শিল্প ভারতের বাণিজ্য বলিয়া বড় বড় প্রবন্ধ লিখিব। কিন্তু হায় ভারতের শিল্প বাণিজ্য কোথায়? আমরা চীনা মিস্ত্রী ও বিলাতী এঞ্জিনিয়ার ডাকিয়া বাড়ী প্রস্তুত করাই, কিন্তু একবারও কি দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলের দেশী এঞ্জিনিয়ারদের কথা মনে করি? দিল্লীর নব রাজধানী নির্ম্মাণের নিমিত্ত হ্যাভেল বার্ডউড প্রভৃতি ইয়োরোপীয় মনীষিগণ ভারতীয় স্থপতি নিয়োগ করিবার জন্য অন্তরের সহিত অনুরোধ করেন, আর আমরা আমাদের অট্টালিকা প্রস্তুতির নিমিত্ত সাহেব বাড়ীতে ফরমায়েশ দি—আমাদের শিল্প বাণিজ্য কি আছে? সমগ্র ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য সমূহে যত অর্থ নিয়োজিত আছে তাহার শতকরা ৮৫ টাকাই ইয়োরোপীয়দের সুতরাং ভারতের শিল্প বাণিজ্য কোথায়? আরব্যোপন্যাসের আলাদিনের বিরাট প্রাসাদের ন্যায় তাহা অসীম শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি হারানো নিধি ফিরিয়া পাইবার আশা থাকে, যদি অতীত শিল্প বাণিজ্যের জন্য প্রাণে ব্যাকুল বাসনা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে এই তাহার সময়। অই যে মৃদুমন্দ বাতাস উঠিয়াছে, এই বাতাসে তরণী খুলিয়া দাও; নতুবা আর আমাদের কোন আশা নাই।

দেশের জমিদার ও ধনী সম্প্রদায়কে 'দিকপ্রকাশ' আর একটি মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন—

আমাদের দেশের জমিদার ও ধনিসম্প্রদায় এখন একবার পুনরায় প্রাচীন যুগের মত স্বদেশীয় শিল্পে উৎসাহ প্রদান না করিলে আমাদের আর উপায়ান্তর থাকিবে না। তাঁহারা কত অর্থ দান করিতেছেন, এখন যদি তাঁহারা প্রত্যেকে আপনাদের রুচি ও পছন্দ অনুসারে এক একটি শিল্প আপনাদের মনোমত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উপযুক্ত শিল্পী নিয়োগ পূর্ব্বক উহাকে আপনাদের জমীদারীর একটী বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট) বলিয়া মনে করেন ও আপনাদের জমীদারীর মতই উহার রীতিমত তত্ত্বাবধান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আয়ের পরিমাণও বহুপরিমাণে বাড়িয়া যাইবে, আমাদের এই দুরবস্থারও অনেকাংশে অপনোদন হইবে। তাঁহারা পৃথকভাবে ঐরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর মনে না করিলে মিলিত ভাবেও অনেক শিল্পের প্রাণ-দান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। বাড়ীতে একটা নূতন ফল উৎপন্ন হইলে বাজারের কেনা ফল অপেক্ষা উহাতে যে কত বেশী আনন্দ পাওয়া যায় তাহা সকলেই অবগত আছেন।

আমাদের দেশের জমিদারগণ ও ধনী সম্প্রদায়ের আয়ত্তের ভিতরই কত প্রকার ব্যবসার উপায় ও শিল্পের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। ইচ্ছা ও উৎসাহ থাকিলে তাঁহারা অনায়াসে দেশের দশের ও নিজের প্রভূত উপকার ও মঙ্গলসাধন করিতে পারিতেন ও পারেন। কিন্তু ঐ গোড়ায় গলদ। ইচ্ছা ও উৎসাহেরই একান্ত অভাব। জমিদার ও ধনীগণ ইচ্ছা করিলেই তুলা, রেশম, লাক্ষা, চিনি, তার্পিন, আলকাতরা, লিণ্ট'ও আরো নানাপ্রকারের প্রয়োজনীয় ও সহজসাধ্য জিনিস নিজেরা এবং নিজেদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদেরও লাভ বই লোকসান নাই। দেশেরও অপার মঙ্গল সাধিত হয়।

'পুরুলিয়া দর্পণ' লিখিতেছেন—

এ বৎসরে মানভূমে লাক্ষার ব্যবসা একপ্রকার বন্ধ হওয়ায় অধিকাংশ পল্লীগ্রামে অর্থের বিশেষ অভাব হইয়াছে। লা ও কয়লার ব্যবসায় মানভূমকে অর্থশালী করিয়া রাখিয়াছে। কয়লার ব্যবসা প্রায় সমস্ত মানভূমের ঔপনিবেশিকদিগের হস্তে আছে। লাক্ষার আবাদ ও বিক্রয় করিয়া পল্লীবাসীগণ আপনাদের পোষাক, পরিচ্ছদ ও অন্যান্য দ্রব্যের সংস্থান করে। লাক্ষার কারবারে লোকের অর্থাগমের উপায় বন্ধ হওয়ায় এ বৎসর পুরুলিয়ায় পূজায় বাজারও অত্যন্ত মন্দা যাইতেছে। বিলাসদ্রব্যের ব্যবসায়ীগণ একরূপ বসিয়া আছে বলিলেও চলে।

বাগেরহাটের 'জাগরণ' লিখিতেছেন—

বঙ্গদেশেও চিনির অভাব ছিল না। যশোহরে কোটচাঁদপুর, বসুন্দিয়া প্রভৃতি স্থানে খেজুরি গুড় হইতে অতি উৎকৃষ্ট চিনি হইত। খুলনা ও ফরিদপুর এবং উত্তর বঙ্গের দিনাজপুরে ও রংপুরেও প্রচুর পরিমাণে খেজুর গুড় হইত এবং তাহা হইতে চিনি উৎপন্ন হইত। আবগারী বিভাগের অনুকম্পায় এখন খেজুরি গুড় উৎপন্ন হইতে পারে না। খেজুর গাছ হইতে রস নির্গত করিতে এখন লাইসেন্স করিতে হয়। কাজেই যাহারা পূর্ব্বে খেজুর গাছ কাটিত তাহারা এ হাঙ্গামা করিতে চাহে না। সরকার বাহাদুর যদি অনুগ্রহ করিয়া গাছের উপরে এই আবকারি হাঙ্গামাটা উঠাইয়া দেন তবে বোধ হয় এখনও এদেশে খেজুরি চিনি হইতে পারে। আমাদের দেশের লোকের চেষ্টায় যে কিছু হইবে এরূপ আশা নাই। কারণ তারপুর চিনির কলের উদ্যোক্তাগণ সে পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। আর কেহ সাহস করিয়া এজন্য টাকা দিতে অগ্রসর হইবে না।

'বরিশাল হিতৈষী'তে 'স্বদেশী ও কয়েকজন লাভবান ব্যক্তি' শীর্ষক একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি দীর্ঘ; কাজেই সবটুকু আমরা তুলিয়া দিতে পারিলাম না।

আমাদের স্বদেশীর 'নেতা'দিগকে উদ্দেশ করিয়া 'বরিশালহিতৈষী' যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অতি খাঁটি কথা।

কিরূপে স্বদেশী শিল্পকে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে তাহাই 'বরিশালহিতৈষী' বলিতেছেন—

প্রতি বৎসর স্বদেশী মেলার উদ্বোধন কালে বলা হয় ইহাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে; কোথায় বা মেলায় স্থায়িত্ব, কোথায় বা স্বদেশীর উন্নতি। পরন্তু এই স্বদেশী মেলায় স্বদেশী লেবেল যুক্ত বহু বিদেশী মাল উচ্চদরে চলিয়া যায়। এই সমস্ত নেতৃবৃন্দের প্রথম ও প্রধান কার্য্য বড়লাট, গবর্ণর, প্রমুখ রাজপুরুষগণকে আমাদের লুপ্তপ্রায় শিল্প-বাণিজ্য উদ্ধারে অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করা। রাজার সাহায্য ব্যতীত কোনদিন শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি উন্নত হইতে পারে না।

আমাদের নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দরকার হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশীর প্রারম্ভে দেশে একটা ভাবের বন্যা আসিয়াছিল। তখন বক্তা মাত্রই নেতা গণ্য হইয়াছিলেন এবং তাহাদের উৎসাহ পাইয়াই লোক সকল বহু যৌথকারবারে অর্থ ন্যস্ত করিয়াছিল। তন্মধ্যে যে সমস্ত কারবার ফেল পড়িয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আজ কিছু বলিব না—তাহারা বরং ব্যবসায় লিপ্ত হইয়া ফেল পড়িয়াছে। কিন্তু যাহারা আদৌ ব্যবসায় লিপ্ত [হন নাই], তাহাদের নিকটে এখন কৈফিয়ৎ

চাহিবার সময় আসিয়াছে। আমরা একে একে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি।

নেভিগেশন কোম্পানী—দানশৌণ্ড গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় নেভিগেশন কোম্পানী চালাইবেন বলিয়াছিলেন। বারংবার পত্র এবং পত্রিকায় লিখিয়া তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

তারপুর চিনির কারখানা—হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ দেশভক্ত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই কারখানা খুলিবেন বলিয়া বহু অংশ বিক্রয় করিয়াছেন। সে টাকাগুলি কি হইল? আজ কি সে টাকাগুলি দিয়া তারপুর চিনির কারখানার উন্নতির চেষ্টা হইবে না?

বুট এণ্ড ইকুইপমেণ্ট ফেক্টরী—হুগলীর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র বি, এ, ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বুট এণ্ড ইকুইপমেণ্ট ফেক্টরীর অংশ বিক্রয় করিলেন; সে টাকাগুলি কি হইল? দেওঘরের আদর্শ কৃষিক্ষেত্র কোথায় গেল?

বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানী—বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানীর অংশ বিক্রয় করিয়াছেন। তাহার কি হইল?

ন্যাশন্যাল ফণ্ড—প্রতি বৎসর কন্‌ফারেন্সে ন্যাশন্যাল ফণ্ডের কথা উঠে—সে ফণ্ডটী কি ভাবে কেন পড়িয়া রহিল তাহার কোনও কৈফিয়ৎ দেশবাসী পায় নাই। আমাদের কলিকাতার সহযোগিগণ এ বিষয়ে ভদ্রতা বশতঃ নীরবতা রক্ষা করেন। আমরা আজ একান্ত অনিচ্ছায় এই অপ্রীতিকর কথাগুলির আলোচনা করিলাম। আশা করি দেশবাসী অন্ততঃ মফঃস্বলবাসী ব্যক্তিবর্গ এই প্রশ্নগুলির উত্তর চাহিয়া দেশবাসীর ভবিষ্যৎ মঙ্গল সাধন করিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষার অবনতি—

পাবনার 'সুরাজ' সংবাদপত্রে প্রাথমিক শিক্ষা নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নীচে তাহার সারসঙ্কলন প্রকাশ করা গেল।

"বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার গত বৎসরের সরকারী বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, একদিকে যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়াছে, অন্য দিকে সেইরূপ ছাত্রের সংখ্যাও কমিয়াছে। সরকার হইতে ইহার দুটি সাফাই যুক্তি প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত কারণ তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই।

মফঃস্বলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে ও সরকারী পরিদর্শক কর্ম্মচারীগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। তাঁহাদের উপরই বিদ্যালয়ের ইষ্টানিষ্ট জীবনমৃত্যু নির্ভর করিতেছে। যদিও তাঁহাদের কর্ত্তব্য ঐ বিদ্যালয়গুলিকে যথাপ্রয়োজন অর্থসাহায্যে উন্নতিশীল করা, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে এবিষয়ে তাঁহারা একান্ত উদাসীন ও অমনোযোগী।

দ্বিতীয়তঃ, মফঃস্বলের প্রায় সমস্ত অবস্থাপন্ন লোকেই সহরবাসী; ছেলেদিগকে ইংরাজী স্কুলে পাঠান। কাজেই গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের তাঁহারা তত্ত্বও লন না, তাহাদের সাহায্যও করেন না। গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়ে নিরক্ষর কৃষকদের ছেলেরা। তাহাদের অন্নই দুবেলা নিয়মিত ভাবে জুটে না; তাহারা বিদ্যালয়ের বেতন দিবে কি? বেতন যদিও কোনো রকমে জুটে তো বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ ও অন্যান্য খরচ জুটা অসম্ভব। অবস্থাপন্ন লোকেদের গ্রামের বিদ কোনো প্রয়োজন নাই; কাজেই কেহ খরচ দেন না। যদি বা দয়া করিয়া দিতে রাজী হন তবে সরকারী পরিদর্শক কর্ম্মচা লম্বা ফর্দ্দ দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হন। একটি প্রাথমিক স্কুলে হাজার বারশো টাকা কে দেয়? সুতরাং মণ তেলও পুড়ে না রাধাও নাচে না।"

যদি বা দরখাস্তের পর দরখাস্ত করিয়া কারো প্রার্থনা হইল তবে সম্পাদনের ভার P. W. D-র উপর পা তাহাদের পশ্চাতে মাস ছয় তৈল মর্দ্দন করিয়া ঘুরিতে ঘু লোকের আর ধৈর্য্য থাকে না। সুতরাং এইরূপে নূতন সাহ ও সহানুভূতির অভাবে অনেক স্কুল উঠিয়া যায় ও নূতন স্কুলও পায় না। বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় হ্রাসের ইহা অন্যতম কারণ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

'সুরাজে' সিংহলের প্রাথমিক শিক্ষার একটি স বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপ্রতি আমরা বাং শিক্ষাব্যবস্থাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় সম সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বিষয়ে কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদ জন্য প্রত্যেক স্কুলে এক একটি বাগান খুলিবার প্রস্তাব হয়।

প্রথমে মোটে ৫।৬টী স্কুল লইয়া কাজ আরম্ভ করা হয়, এত অল্প সময়ের মধ্যে উদ্দেশ্যটী এতদূর সফলতালাভ করিয়াছে আজ সিংহলে এইরূপ অন্যূন ২৫০টী স্কুল চলিতেছে।

স্কুলের ছাত্রেরাই বাগানের যাবতীয় কাজ করিয়া থাকে, এ পয়সা খরচ করিয়া কোনও মুটে মজুর খাটান হয় না। সকাল স্কুল বসিবার পূর্ব্বেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষকগণ ও তাঁ দের সহকারীদের তত্ত্বাবধানে বাগানের ভিন্ন ভিন্ন কাজ কা থাকে।

স্কুলসংক্রান্ত-বাগান প্রথার প্রবর্ত্তনদ্বারা স্কুলের বাহ্য আকৃতি সৌন্দর্য্যেরও সুন্দর পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে।

এই প্রথাদ্বারা গ্রাম্য ছাত্রগণের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির সীমা বা হইয়াছে। সমাজের যে স্তরে সাধারণতঃ তাহারা বসবাস ক সেই স্তরের প্রধান উপজীবিকা কৃষিবিদ্যার দিকেও তাহা মনোযোগ সম্যকরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রতিদিন বাগানে হা কলমে কাজ করায় কৃষিবিষয়ক প্রধান প্রধান তথ্যগুলি অ সহজেই তাহাদের আয়ত্তাধীন হইতেছে।

আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যাল যাহারা পড়ে তাহাদের অধিকাংশই কৃষকের ছেলে তাহাদিগকে যদি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে হাতে কলমে শি দেওয়া যায় তাহা হইলে উপকার বই অপকার না। অথচ কৃষিশিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা না থাকাতেও ই কেন যে অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাই আমাদের কাছে বিচি বোধ হয়। কৃষিবিদ্যার নূতন নূতন তথ্যগুলিও বৈজ্ঞানি পদ্ধতিগুলি এই উপায়ে অনায়াসে কৃষকদিগকে জ্ঞা করা যায় এবং কৃষক সমাজের প্রভূত উপকার সাধন ক যায়। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শিক্ষার হাল—

চট্টগ্রামের "জ্যোতিঃ" "দেশের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। নীচে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল—

আজকাল দেশে এক বিষম শিক্ষাসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট কি ভাবে এদেশের সমুদয় শিক্ষা অনুষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রাইমারী শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারকে রাজপুরুষেরা যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহাতে দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে তাহাই সকলের বিবেচ্য।

সকল দেশেই শিক্ষা অনুষ্ঠান সমূহে জনসাধারণের নেতৃত্ব রহিয়াছে। সমুদয় শিক্ষা অনুষ্ঠানের ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা প্রয়োজন বটে। কিন্তু সাহচর্য্য ও আনুকূল্য এক কথা আর গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস স্বতন্ত্র কথা। যে পরিমাণে গবর্ণমেণ্ট নিজশক্তিকে সর্ব্বতোমুখী করিয়া তুলিবেন ঠিক সেই পরিমাণে প্রজাবর্গের আত্মরক্ষা ও স্বাবলম্বনের ক্ষমতা খর্ব্ব হইবে। যেমন প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। উহা যদি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয় তবে তাহার দ্বারা দেশের যে বিশেষ কিছু উপকার হইবে তাহা আদৌ মনে হয় না।

বাস্তবিকই শিক্ষা সম্বন্ধে এতটা অবহেলা একমাত্র আমাদের দেশ ছাড়া সভ্যজগতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। চারিদিক হইতেই রব উঠিয়াছে শিক্ষার হাল ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে। নানা উপায়ে শিক্ষাটা সকলের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিবার নানা রকম কল বসিয়াছে। কলেজের নির্দ্দিষ্ট ছাত্রসংখ্যার কষাকষি, প্রাথমিক স্কুলের বিশেষ প্রকারের বহু ব্যয় সাপেক্ষ এক নির্দ্দিষ্টরূপ ঘর করিবার নিয়মের কড়াকড়ি প্রভৃতি দিন দিন অধিকমাত্রায় দেখা দিতেছে।' অথচ সরকার হইতে শিক্ষার ব্যয়ের জন্য টাকা যাহা মঞ্জুর হয় তাহা যথেষ্ট নহে।

'বরিশাল হিতৈষী'তে প্রকাশ—

সমস্ত ৮ কোটী পাউণ্ড রাজস্বের ভিতর মাত্র ৪০ লক্ষ পাউণ্ড শিক্ষা বিভাগে ব্যয় করার জন্য বাজেট করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে মাত্র ৮০ হাজার পাউণ্ড নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়। অবশিষ্ট টাকা বৃহৎ বৃহৎ স্কুল গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য ব্যয়িত হয়। যদি শিক্ষা বিভাগের উভয় প্রকার খরচই আমরা একত্র করি তাহা হইলেও ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগে যে টাকা খরচ করেন তাহার ৫ গুণেরও অধিক টাকা সৈনিক বিভাগে ব্যয়িত হয়। আর যদি শুধু সৈনক (?) ব্যয় আমরা ধরি তবে শিক্ষাবিভাগের ব্যয় সামরিক ব্যয়ের ৩৫০ ভাগের ১ ভাগ হইবে।

ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের খরচ সমস্ত রাজস্বের ২১ ভাগের ১ভাগ হইতেও কম হইবে। ১৯১১।১২ বড়োদা ষ্টেটের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট হইতে আমরা জানিতে পারি যে মোটামুটি রাজস্বের এক-দ্বাদশ অংশ শিক্ষা বিভাগে ব্যয়িত হয়। এ দিকে আবার পুলিশ বিভাগের খরচও শিক্ষা বিভাগের খরচ হইতে অনেক বেশী। পুলিশ বিভাগের খরচের পরিমাণ ৫২ লক্ষ তিন হাজার পাউণ্ড। রেলওয়ের ব্যয় ১ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ শিক্ষা বিভাগের প্রায় তিন গুণ। দুঃখের বিষয় আরও যে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট নাকি গত বৎসর এই অত্যল্প টাকাও খরচ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

এই ত দেশের অবস্থা যেখানে শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক অশিক্ষিত।

এই হারে যদি টাকা খরচ করা হয় ও এই দেড়শো বা দুশো বৎসরেও যদি অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৮৫ কি ৯০ জন থাকে তাহা হইলে সহস্র বৎসরেও আমাদের আর জ্ঞানলাভের আশা নাই। ভারতগবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে সজাগ হইবার যথেষ্ট সময় আসিয়াছে।

সৎকার্য্য।

বীরভূমের ইতিহাস।—আজকাল বঙ্গের প্রায় সকল জেলারই ইতিহাস লিখিত হইতেছে। আমাদের বীরভূমের কোন লিখিত ইতিহাস নাই এবং এজন্য কেহ কোন চেষ্টাও করেন না। হেতমপুরের বিদ্যোৎসাহী কুমার মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় এই ইতিহাস সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া লেখককে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবারও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় কেহই তখন একার্য্যে অগ্রসর হন নাই। কুমার বাহাদুর ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনঃ এই ইতিহাস সঙ্কলনে চেষ্টা করিতেছেন। আগামী ৫ই আশ্বিন হেতমপুরে এজন্য এক বিরাট সভার অধিবেশন হইবে। বীরভূমের অনেক ভদ্রলোক হেতমপুরের সভায় যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

হেতমপুরের কুমারের এই সাধু উদ্যম বাস্তবিকই প্রশংসার্হ ও প্রত্যেক ধনীর অনুকরণীয়। বীরভূমের ঐতিহাসিক সম্পদ নিতান্ত অল্প নহে। বীরভূমই সর্ব্ব প্রথমে বাংলার সাহিত্যে এক অমূল্য নিধি উপহার দিয়াছিল। সেই চণ্ডীদাসের স্মৃতিতে বীরভূম আজও গৌরবমণ্ডিত হইয়া আছে। অন্যান্য জেলার ধনীদিগেরও হেতমপুরের কুমারের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

বড় হইতে হইলে নিজেদের ভালো করিয়া আগে জানা দরকার। এইজন্যই প্রত্যেক জেলার ইতিহাস সঙ্কলন করা এত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। নিজেদের জানিবার স্পৃহা যতই বাড়িবে সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ততই উন্নত হইতে থাকিব। প্রত্যেক জেলাতেই এইরূপ একটা জাগরণের চাঞ্চল্য পড়িয়া যাওয়ার সময় আসিয়াছে।

'প্রতিকার' নলহাটী হইতে লিখিতেছেন—

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, এই জেলা বোর্ড আগামী ২০ বৎসর মধ্যে মুর্শিদাবাদের এলাকাধীন স্থান মাত্রেরই জলকষ্ট মোচন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এবার জেলাবোর্ড এতদর্থে ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। জেলাবোর্ড মুর্শিদাবাদের জলকষ্ট মোচন জন্য অর্থ নির্দ্ধারণার্থ জরীপাদি কার্য্যও সমাপন করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুর্শিদাবাদ এই জলকষ্টরূপ সঙ্কট উপস্থিত সত্ত্বেও ভাগ্যবান। ইহার কারণ যে, সহরে প্রাতঃ-স্মরণীয়া স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া এক জলের কল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই জেলার মধ্যস্থল দিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেছেন। আর ইহার পল্লীর জলকষ্ট মোচন জন্য লালগোলার প্রাতঃস্মরণীয় শ্রদ্ধাস্পদ রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রাওবাহাদুর নগদ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং সেই টাকার সুদ হইতে সন সন নানা স্থানে ইন্দারা ও কূপাদি খনিত হইতেছে।

আমাদের এই দুর্দ্দশাপন্ন দেশে জেলাবোর্ডের এরূপ কার্য্য ও ধনীদিগের এরূপ দান অতি সাধারণ হওয়াই উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জেলাবোর্ডও জেলার হাজার অসুবিধা থাকিলেও এবং সিন্দুকে হাজার টাকা থাকিলেও প্রায়ই কোনো লোকহিতকর কাজে হাত দিতে চান না—আর ধনীরাও অনেকে যক্ষের মত টাকার সিন্দুকই আগলা-ইয়া থাকিতে ভাল বাসেন—চক্ষের সাম্‌নে হাজার লোক অন্নাভাবে জলকষ্টে বা মহামারীতে মরিতেছে দেখিলেও একটি সিন্দুকের চাবি খোলা আবশ্যক মনে করেন না। যাহা হউক মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের কার্য্য ও লাল-গোলার মহারাজের দান অন্যান্য জেলাবোর্ড ও ধনীদের আদর্শ হওয়া উচিত।

সামাজিক দাসত্ব—

'বরিশাল হিতৈষী'তে সমাজ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে—

সামাজিক স্বাধীনতার অভাবে আমরা দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছি। মনুষ্য জীবন দুঃখের আকর মনে করিয়া নিজেকে ও নিজ জাতিকে ধিক্কার করিতেছি। ইহা আমাদের নিতান্তই অজ্ঞতা-জনিত কর্ম্মের ফল। আমরা কিরূপ ভাবে চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে অন্ধের মত দৃষ্টি ও বিচারশক্তিহীন হইয়া সমাজ কর্ত্তৃক চালিত হইতেছি তাহা চিন্তা করিলে আমরা যে ধীশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যজাতি তাহাতেই বিশেষ সন্দেহ জন্মে। আমরা স্বাধীন চিন্তার বিরোধী। বিংশশতাব্দী পূর্ব্বে যে সামাজিক নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহা আমাদের পক্ষে উপযোগী কিনা ইহা চিন্তা করিতেও পাপ আছে বলিয়া মনে করি। বলা বাহুল্য, চিন্তাই কর্ম্মের প্রসূতি। যাহারা স্বাধীন চিন্তায় কুণ্ঠাবোধ করে তাহারা স্বাধীন কার্য্যেও অক্ষম এবং স্বধ কার্য্য করিলে অপর সাধারণে কি বলিবে এই ধারণাই আমাদের উন্নতির পথে কণ্টক। যে কার্য্যকে আমরা নিরতিশয় হীন ও জঘন্য বলিয়া মনে করি সমাজের ভয়ে আমরা তাহাও করিতে বাধ্য হই; আবার যাহা অবশ্য করণীয়, যাহা না করিলে বিবেক ক্ষুণ্ণ ও পীড়িত হয় সমাজের ভ্রূকুটীভঙ্গি আশঙ্কায় তাহা করিতেও বিরত হই। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

আমরা দাসত্বের কিরূপ উপাসক তাহা বুঝাইবার জন্য বেশী বেগ পাইতে হইবে না। উপযুক্তরূপ শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই চাকরী করিতে হইবে ইহাই যে জাতির ধারণা সে জাতির অস্থিমজ্জায় দাসত্বের বীজাণু যে কিরূপ পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান যোগ্য। যে দেশ কৃষি ব্যবসায়কে উচ্চাসন দিতে কুণ্ঠিত, সে দেশ যে নিতান্তই পতিত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তাই আমরা স্বাধীন ব্যবসায়ের বিরোধী ও চাকুরীর পক্ষপাতী।

আলস্য, বিলাসিতা, সমাজের কুসংস্কারও প্রতিবন্ধক আলস্য, বিলাসিতা ও সমাজের সঙ্কীর্ণতা একত্র হইয়া আমাদি অধঃপতনের চরমসীমায় উপস্থিত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার একটী অপকৃষ্ট দোষ আছে। অপরের উপর নির্ভর মনকে সঙ্ক অনুদার করিতে প্রয়াস পায়। যাহার উপর নির্ভর, তাহার উন্ন মুক্তি নিতান্তই অসহনীয় হইয়া উঠে। তাই আজকাল অনেকের আক্ষেপের কথা শুনিতে পাই যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে শ্রেণীর লোকগুলি খারাপ হইয়া গিয়াছে; এখন আর দাস্যবৃত্তি করে না। তাই আমরা চাকরের পায় জুতা দেখিলে আ হইয়া উঠি এবং পতিত জাতির উন্নতি দেখিলে মনে কষ্ট পাই।

'বরিশাল হিতৈষী' আমাদের সামাজিক দাসত্ব স অতি খাঁটি কথা লিখিয়াছেন। এরূপ আলো মফঃস্বলের সংবাদপত্রে যত অধিক পরিমাণে হয় ত দেশের মঙ্গল। পল্লীর নিরীহ সরলচিত্ত লোকের পুরুষানুক্রমিক কুসংস্কার যাহাদিগকে সমাজের করিয়া তুলিতেছে, তাহারা—তাহাদের কর্ত্তব্য এ আলোচনা হইতে আহরণ করিতে পারে, তাহ আপনার ভ্রান্ত মত সংশোধন করিয়া লইতে পারে। কি দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক সংবাদপত্র গতানুগতিক একান্ত ভক্ত। নিজেরাই তাহারা এখনো মা হয় নাই। পরকে তাহারা মানুষ করিবে কি? তাহ দেশের লোকের মনকে সঙ্কীর্ণ ও ধারণাকে বিষ করিতেই প্রয়াস পায়। হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্ম্মের না অধিকাংশ কাগজই সমাজের অধস্তন শ্রেণীর লো প্রতি প্রগাঢ় ঘৃণা, স্ত্রীশিক্ষা একেবারে বন্ধ ক ছাগজাতীয় প্রাণীর জীবনপাত করিয়া রসনার তৃ সাধন করা, আমাদের জননী ভগিনীদিগকে বন্দি করিয়া রাখা, বিদেশযাত্রার বিরুদ্ধাচারী হও কবে কচু খাইতে নাই আর কবে ঘেঁচু খাইতে এই সবেরই ভগ্ন ঢাক পিটাইয়া থাকে। আর চির সংস্কারের বশে এই জিনিষগুলি দেশের অশিক্ষি লোকদের মনে এমন কঠিন প্রভাব বিস্তার করে সহজেই তাহারা ঐগুলি ধ্রুবসত্যের মত মানিয়া লয়। কি হিন্দুধর্ম্মের সার তত্ত্ব বুঝে ও বুঝায় কয়জন? এইরূ উপকার করা দূরে থাকুক কত সংবাদ পত্র পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ ভাবে দেশের দারুণ অপকার সা করিতেছে তাহা বলা যায় না। উদারপন্থী কাগ গুলির উচিত এই সকল কুপরামর্শদাতা কাগজগুলি সুপথে আনা, তাহাদের ভ্রান্ত মত তখনি তখনি খণ্ড করা। তাহা না হইলে কবে যে দেশের মধ্যে ঐক্য সাম্য স্থাপিত হইবে, কবে যে মারামারি হানাহানি ব হইবে, তাহা বলা যায় না।

শ্রীক্ষীরোদ কুমার রায়।

কলিকাতা ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
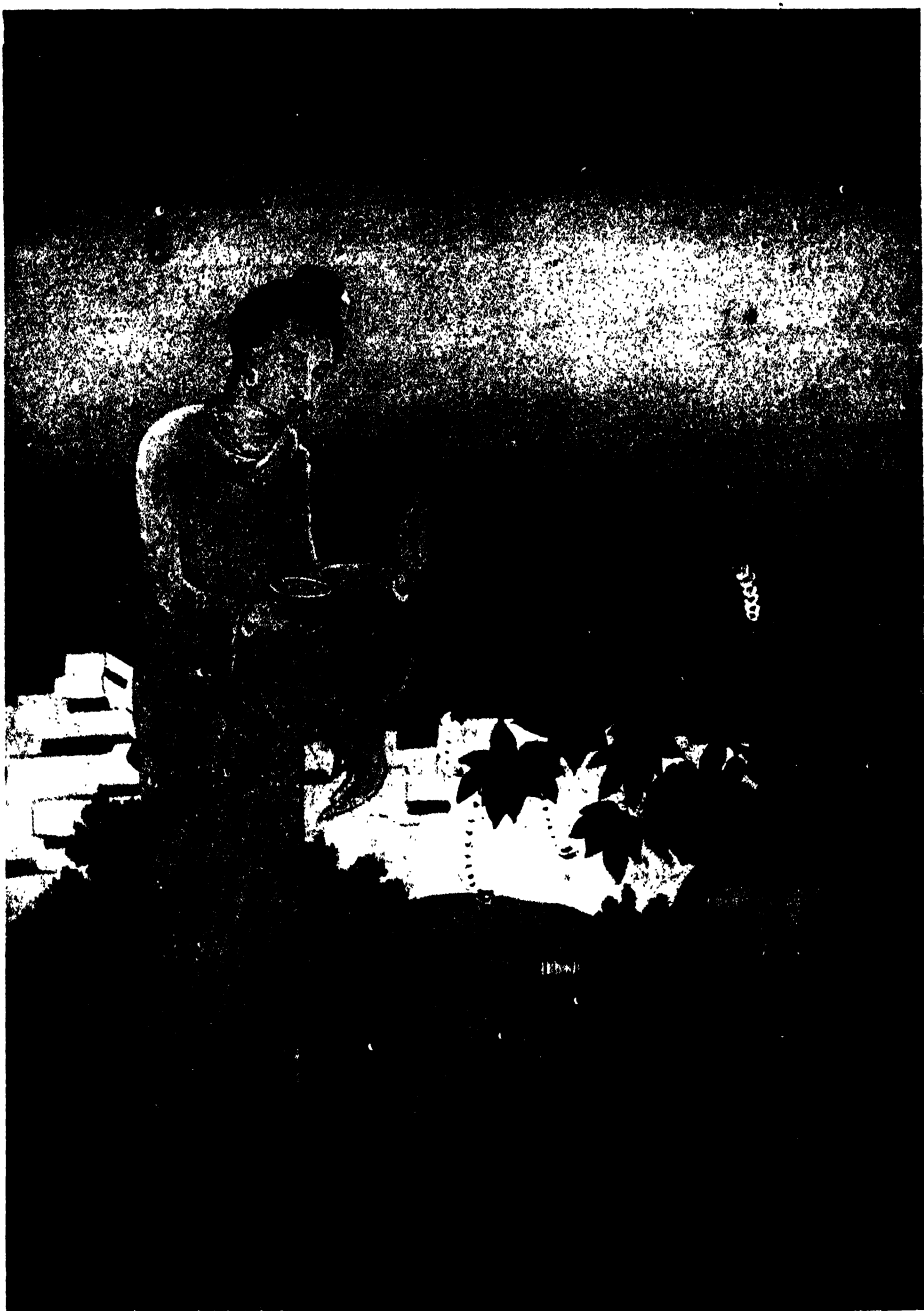
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা।

অরণ্য-আড়ালে রহি কোনো মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে ভূতলে

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

১৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩২১

২য় সংখ্যা।

গীতিগুচ্ছ

১

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নাম্‌ল
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থাম্‌ল।
মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায়
অর্পিনু হাতে তাঁর,
খেদ নাই, আর মোর
খেদ নাই।
বহুদিন-বঞ্চিত
অন্তরে সঞ্চিত
কি আশা
চক্ষের নিমেষেই
মিট্‌ল সে পরশের
তিয়াষা।
এতদিনে জানলেম,
যে কাঁদন কাঁদলেম
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য!

শ্রাবণ ১৩২১ শান্তিনিকেতন।

আমি হৃদয়ে যে পথ কেটেছি
সেথায় চরণ পড়ে
তোমার সেথায় চরণ পড়ে।
তাই ত আমার সকল পরাণ
কাঁপচে ব্যথার ভরে গো
কাঁপচে থরথরে।
ব্যথা-পথের পথিক তুমি
চরণ চলে ব্যথা চুমি',
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার
চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধরে'॥

নয়ন-জলের বন্যা দেখে
ভয় করিনে আর,
আমি ভয় করিনে আর।
মরণ-টানে টেনে আমায়
করিয়ে দেবে পার
আমি তরব পারাবার।
ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে
বইচে আজি তোমার পানে,
ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি
ঠেকব চরণ-পরে
আমি বাঁচব চরণ ধরে'॥

৬ ভাদ্র, কলিকাতা।

পথ চেয়ে যে কেটে গেল
কত দিনে রাতে,
আজ তোমায় আমায় প্রাণের বঁধু
বসব যে এক সাথে।
পড়ে' তোমার মুখের ছায়া
চোখের জলে রচবে মায়া,
নীরব হয়ে রইব বসে
হাত রেখে ঐ হাতে।

এরা সবাই কি বলে গো
লাগে না মন আর,
আমার হৃদয় ভেঙে দিল তোমার
কি মাধুরীর ভার।
বাহুর ঘেরে তুমি মোরে
রাখবে আজি আড়াল করে',
তোমার আঁখি রইবে চেয়ে
আমার বেদনাতে॥

৯ ভাদ্র, সুরুল।

৪

আমি যে আর সইতে পারিনে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।
হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারি নে।
আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কি হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্ম্মরে।
কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারিনে।

৯ ভাদ্র, সুরুল।

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা,
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা।
এতদিন যে তোমার মনে
কি ছিল গো সঙ্গোপনে,
আজকে আমার তারে তারে
শুনাও সে বারতা।

আর বিলম্ব কোরো না গো
ঐ যে নেবে বাতি।
দুয়ারে মোর নিশীথিনী
রয়েছে কান পাতি'।
বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়,
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে
তোমার ব্যাকুলতা॥

১২ ভাদ্র, সুরুল।

৬

আগুনের পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীবন পুণ্য কর
দহন দানে।
আমার এই দেহখানি
তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের
প্রদীপ কর,
নিশিদিন আলোক-শিখা
জ্বলুক গানে॥

আঁধারের গায়ে গায়ে
পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা
নব নব।

নয়নের　দৃষ্টি হতে
ঘুচবে কালো,
যেখানে　পড়বে সেথায়
দেখবে আলো,
ব্যথা মোর　উঠবে জ্বলে
ঊর্দ্ধ-পানে ॥

১২ ভাদ্র, সুরুল।

৭

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে' নেবে জিতে
পরাণটি তোমার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আসচে জীবন-মাঝে,
ও যে আসচে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার ॥

১৪ ভাদ্র, সুরুল।

৮

ঐ যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন-মাঝে চরা।
এরি গোপন হৃদয়-পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।

বিরহী তোর সেইখানে যে
একলা বসে থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
নামটি তোমার ডাকে।

দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিলবে তবে
সুধায় সুধায় ভরা ॥

১৬ ভাদ্র সন্ধ্যা, সুরুল।

৯

যে থাকে থাক্ না দ্বারে,
যে যাবি যা না পারে।
যদি ঐ ভোরের পাখী
তোরি নাম যায় রে ডাকি',
একা তুই চলে যা রে।
কুঁড়ি চায় আঁধার রাতি
শিশিরের রসে মাতি'।
ফোটা ফুল চায় না নিশা,
প্রাণে তার আলোর তৃষা
কাঁদে সে অন্ধকারে ॥

১৭ ভাদ্র সকাল, সুরুল।

১০

শুধু তোমার বাণী নয় গো,
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন করে' মেটাব যে
খুঁজে না পাই দিশা।
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়
সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

হৃদয় আমার চায় যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার
যা কিছু সঞ্চয়।

হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন,
দাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে, ভরব তারে,
রাখব তারে সাথে,—
একলা পথের চলা আমার
করব রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো॥

১৮ ভাদ্র, শান্তিনিকেতন।

১১

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়.
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বন পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ
তোমার পতাকা শিরে বয়॥

২২ ভাদ্র, সুরুল।

১২

না বাঁচাবে আমায় যদি
মারবে কেন তবে?
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে?
অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা,
চরণভরে কাঁপে ধরা,
জীবন-দাতা মেতেছ যে
মরণ-মহোৎসবে।
বক্ষ আমার এমন করে'
বিদীর্ণ যে কর,
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতর?
এই যে আমার ব্যথার খনি
জোগাবে ঐ মুকুটমণি—
মরণ-দুখে জাগাব মোর
জীবন-বল্লভে॥

সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে
২৬ ভাদ্র।

১৩

মালা-হতে-খসে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাওগো ধরতে দাও,
ঐ মাধুরী সরোবরের নাই যে কোথাও তল
হোথায় আমায় ডুবতে দাওগো মরতে দাও!

দাওগো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা,
নিভৃতে আজ বন্ধু তোমার আপন হাতের টীকা
ললাটে মোর পরতে দাওগো পরতে দাও।

বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও।
পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের সরতে দাওগো সরতে দাও!

তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন,
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভরে', ভরে না তায় মন,
অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও॥

২৭ ভাদ্র, সুরুল।

১৪

সামনে এরা চায় না যেতে
ফিরে ফিরে চায়,
এদের সাথে পথে চলা
হল আমার দায়।
দুয়ার ধরে' দাঁড়িয়ে থাকে,
দেয় না সাড়া তোমার ডাকে,
বাঁধন এদের সাধন-ধন
ছিঁড়তে যে ভয় পায়।

আবেশ-ভরে ধূলায় পড়ে
কতই করে ছল।
যখন বেলা যাবে চলে'
ফেলবে আঁখিজল।
নাই ভরসা, নাই যে সাহস,
হৃদয় অবশ, চরণ অলস,
লতার মত জড়িয়ে ধরে
আপন বেদনায়॥

২৮ ভাদ্র, শান্তিনিকেতন।

১৫

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?
আঘাত হয়ে দেখা দিলে
আগুন হয়ে জ্বলবে!
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হলে
নদী হয়ে গলবে।
ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে' আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে॥

২৮ ভাদ্র অপরাহ্ণ, সুরুল।

১৬

এই কাঁচা ধানের ক্ষেতে যেমন
শ্যামল সুধা ঢেলেছ গো,
তেমনি করে' আমার প্রাণে
নিবিড় শোভা মেলেছ গো!
যেমন করে' কালো মেঘে
তোমার আভা গেছে লেগে
তেমনি করে হৃদয়ে মোর
চরণ তোমার ফেলেছ গো।
বসন্তে এই বনের বায়ে
যেমন তুমি ঢাল ব্যথা
তেমনি করে' অন্তরে মোর
ছাপিয়ে ওঠে ব্যাকুলতা।
দিয়ে তোমার রুদ্র আলো
বজ্র আগুন যেমন জ্বালো
তেমনি তোমার আপন তাপে
প্রাণে আগুন জ্বেলেছ গো॥

৩১ ভাদ্র, সুরুল।

১৭

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও কি ধরবে?
এই যে আলো
সূর্য্যে গ্রহে তারায়
ঝরে' পড়ে
শত লক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে
এ প্রাণ যখন ভরবে।
তোমার ফুলে যে রং ঘুমের মত লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল।
যে প্রেম কাঁপায়
বিশ্ববীণায় পুলকে
সঙ্গীতে সে
উঠবে ভেসে পলকে
যে দিন আমার
সকল হৃদয় হরবে॥

১লা আশ্বিন, সন্ধ্যা, সুরুল।

১৮

তোমার অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে'
তোমার আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে।
তেমনি করে' আপন হাতে
ছুঁলে আমার বেদনাতে
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি
জীবন পরে।

বাজে বলেই বাজাও তুমি সেই গরবে
ওগো প্রভু আমার প্রাণে সকল সবে।
বিষম তোমার বহ্নিঘাতে
বারেবারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা
ব্যাথায় ভরে'।

১৩ আশ্বিন, রাত্রি, শান্তিনিকেতন।

১৯

কাণ্ডারী গো, এবার যদি এসে থাক কূলে,
হাল ছাড় গো, এখন আমার হাত ধরে' লও তুলে।
ক্ষণেক তোমার বনের ঘাসে
বসাও আমায় তোমার পাশে,
রাত্রি আমার কেটে গেছে ঢেউয়ের দোলায় দুলে।

কাণ্ডারী গো, ঘর যদি মোর না থাকে আর দুরে,
ঐ যদি মোর ঘরের বাঁশি বাজে ভোরের সুরে,
শেষ বাজিয়ে দাওগো চিতে
অশ্রুজলের রাগিণীতে
ঘরের বাঁশিখানি তোমার পথতরুর মূলে॥

১১ আশ্বিন প্রভাত, শান্তিনিকেতন।

২০

মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই,
সাগর বলে, কূল মিলেছে আমি ত আর নাই।
দুঃখ বলে, রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে;
আমি বলে, মিলাই আমি, আর কিছু না চাই।

ভুবন বলে, তোমার তরে আছে বরণমালা।
গগন বলে, তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে;
মরণ বলে, আমি তোমার জীবনতরী বাই।

১১ আশ্বিন, প্রভাত, শান্তিনিকেতন।

২১

আমার সুরের সাধন
রইল পড়ে'
চেয়ে চেয়ে কাটল বেলা
কেমন করে'।
দেখি সকল অঙ্গ দিয়ে,
কি যে দেখি বলব কি এ,
গানের মত চোখে বাজে
রূপের ঘোরে।
আমার সুরের সাধন
রইল পড়ে'।

সবুজ সুধা এ ধরণীর
অঞ্জলিতে
কেমন করে' ভরে উঠে
আমার চিতে;
আমার সকল ভাবনাগুলি
ফুলের মত নিল তুলি,
আশ্বিনের ঐ আঁচলখানি
গেল ভরে'।
আমার সুরের সাধন
রইল পড়ে'॥

১৮ আশ্বিন, শান্তিনিকেতন।

২২

পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিনল না সে মরণকে;
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে।
সবার নীচে ধূলার পরে
ফেলো যারে মৃত্যুশরে
সে যে তোমার কোলে পড়ে,
ভয় কি তাহার পড়নকে।

আরামে যার আঘাত ঢাকা
কলঙ্ক যার সুগন্ধ
নয়ন মেলে দেখল না সে
রুদ্রমুখের আনন্দ।
মজল না সে নয়নজলে,
পৌছল না চরণতলে,
তিলে তিলে পলে পলে
ম'ল যেজন পালঙ্কে।

১৯ আশ্বিন, শান্তিনিকেতন।

২৩

এবার কূল থেকে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে।
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পালটি তুলে।
যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে
সেখানে নয়,
যেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরণলীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।

এবার, বীণা, তোমায় আমায় আমরা একা,
অন্ধকারে নাইবা কারে গেল দেখা।

কুঞ্জবনের শাখা হতে যে ফুল তোলে
সে ফুল এ নয়,
বাতায়নের লতা হতে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়।
দিশাহারা আকাশ ভরা সুরের ফুলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে॥

আশ্বিন, শান্তিনিকেতন।

২৪

তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।
যেমনি নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পূরে
গানের সুরে।

সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে
গানের মত।
আলোক সেথা দেয় গো আনি
আকাশের আনন্দবাণী
গানের সুরে॥

শান্তিনিকেতন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জৈন মতে জীবভেদ

জৈনধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। ইহার দর্শনবিচার অসাধারণ পাণ্ডিত্য- ও গবেষণাপূর্ণ। জৈনদিগের দর্শন, সাহিত্য, ন্যায়, অলঙ্কার আদির ঔৎকর্ষ ও সর্ব্বাঙ্গীনতার প্রতি বহু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কর্ম্মই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং জীবই কর্ম্মের ভোক্তা। জৈনসুধীগণ জীবতত্ত্বের কিরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। অধুনা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ উদ্ভিদাদিতে চেতনা (sensation &c) ও খনিজ ধাতুতে রোগাদির (diseases &c) অস্তিত্ব ও ব্যাপকতা দর্শাইয়াছেন, জৈন মনীষীগণ খৃষ্ট শতাব্দীর বহুকাল পূর্ব্বে তদ্রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কৌতুহলী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছি। জৈন কেবলীগণ জ্ঞানমার্গে কতদূর উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইবে, এই জন্য জীবভেদের একটি নাম-লতা (chart) নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জীব

(১) সংসারী

(২) সিদ্ধগামী

তীর্থসিদ্ধ

অতীর্থসিদ্ধ

(ক) স্থাবর [একেন্দ্রিয়] (স্পর্শ)

(খ) ত্রস্

পৃথ্বীকায় (১ক)

অপ্‌কায় (২ক)

অগ্নিকায় (৩ক)

বায়ুকায় (৪ক)

উদ্ভিদ (৫ক)

সাধারণ (নিগোদ)

প্রত্যেক

দ্বীন্দ্রিয় (স্পর্শ ও রসনা) ১ খ

ত্রীন্দ্রিয় (স্পর্শ, রসনা ও ঘ্রাণ) ২ খ

চতুরিন্দ্রিয় (স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ ও নেত্র) ৩ খ

পঞ্চেন্দ্রিয় (স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ, নেত্র ও শ্রোত্র) ৪ খ

নারকীয়

তির্য্যক

মনুষ্য

দেবতা

জলচর

স্থলচর

খেচর

চতুষ্পদ

উরঃপরিসর্প

ভুজপরিসর্প

রোমজ

চর্ম্মজ

(১) রত্নপ্রভাবাসী
(২) শর্করাপ্রভাবাসী
(৩) বালুকাপ্রভাবাসী
(৪) পঙ্কপ্রভাবাসী
(৫) ধূমপ্রভাবাসী
(৬) তমঃপ্রভাবাসী
(৭) তমস্তমঃপ্রভাবাসী

কর্ম্মভূমিজ

অকর্ম্মভূমিজ

অন্তর্দ্বীপজ

ভুবনপতি (১০)

ব্যন্তর (৮)

জ্যোতিষ্ক (২)

বৈমানিক (২)

জৈনমতে "জীবন্তি কালত্রয়েঽপি প্রাণান্ ধারয়ন্তি ইতি জীবাঃ"। জীববৃন্দ দুই প্রকার (১) সংসারী ও (২) সিদ্ধগামী।

প্রথমতঃ সংসারী অর্থাৎ চতুর্গতিরূপ সংসারে যাহারা অবস্থিতি করিতেছে তাহাদের স্থূলবিভাগ দুইটি (ক) স্থাবর ও (খ) ত্রস্ (গতিবিশিষ্ট)। স্থাবর জীবের কেবলমাত্র একটি স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। ইহারা পাঁচপ্রকার—

(১ক) পৃথ্বীকায়—যথা স্ফটিক, মুক্তা, চন্দ্রকান্তাদি মণি (সমুদ্রজ), বজ্রকর্কেতনাদি রত্ন (খনিজ), প্রবাল, হিঙ্গুল, হরিতাল, মনঃশিলা, পারদ, কনকাদি সপ্তধাতু, খড়িমাটি, রক্ত মৃত্তিকা, শ্বেত মৃত্তিকা, অভ্র, ক্ষারমৃত্তিকা, সর্ব্বপ্রকার প্রস্তর, সৈন্ধবাদি লবণ, ইত্যাদি।

(২ক) অপ্‌কায়—যথা ভূমিগর্ভস্থ জল (কূপোদকাদি), বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, হিম, তুষার, শিশির, কুজ্ঝটিকা, সমুদ্র-বারি ইত্যাদি।

(৩ক) অগ্নিকায়—যথা অঙ্গার, উল্কা, বিদ্যুৎ, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি।

(৪ক) বায়ুকায়—যথা ঝঞ্ঝাবাত, গুঞ্জবাত, উৎকলি-কাবাত, মণ্ডলীবাত, মহাবাত, শুদ্ধবাত, ঘনবাত, তনুবাত* ইত্যাদি।

(৫ক) উদ্ভিদকায় দ্বিবিধ ঃ—সাধারণ ও প্রত্যেক।

যে উদ্ভিদে বহুবিধ (অনন্ত) উদ্ভিদকায় জীবাণু একই [শ]রীরে থাকে তাহারা সাধারণ উদ্ভিদ বা নিগোদ,—[য]থা কন্দ, অঙ্কুর, কিশলয়, শৈবাল, ব্যাংছাতি, আর্দ্রা, [হ]রিদ্রা, সর্ব্বপ্রকার কোমল ফল, গুগ্‌গুল, গুলঞ্চ [প্র]ভৃতি ছিন্নরুহ (ছেদন করিবার পরও যাহা পুনরায় [জ]ন্মে), যাহাদের শিরা, সন্ধি ও পর্ব্ব গুপ্ত থাকে ও [য]াহারা "সমভঙ্গ" (পানের ন্যায় যাহা ছিঁড়িলে অদন্তুর [ভা]বে ভগ্ন হয়) ও "অহীরক" (ছেদন করিলে যাহার [ম]ধ্য হইতে তন্তু পাওয়া যায় না) ইত্যাদি।

যে উদ্ভিদের এক শরীরে একটিমাত্র জীব থাকে [তাহ]া "প্রত্যেক" উদ্ভিদ নামে বিশেষত হইয়াছে। যথা [ফল], ফুল, ছাল, কাষ্ঠ, মূল, পত্র ইত্যাদি।

প্রত্যেক উদ্ভিদ ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার স্থাবর জীব "সূক্ষ্ম" ও "বাদর" হইয়া থাকে।

সংসারী জীবের দ্বিতীয় প্রধান বিভাগ "ত্রস্" জীব চারি প্রকার ঃ—

(১খ) দ্বীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ ও রসনা জ্ঞান আছে। যথা শঙ্খ, কপর্দ্দক, ক্রিমি, জলৌকা, কেঁচো ইত্যাদি।

(২খ) ত্রীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ, রসনা ও ঘ্রাণ এই তিনটি ইন্দ্রিয় আছে। যথা কর্ণকীট, উকুণ, পিপীলিকা, মাকড়সা, আরসোলা ইত্যাদি।

(৩খ) চতুরিন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ, ও নেত্র এই চারিটি ইন্দ্রিয় আছে। যথা বৃশ্চিক, ভ্রমর, পতঙ্গপাল, মশক, মক্ষিকা ইত্যাদি।

(৪খ) পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ, নেত্র ও শ্রোত্র এই পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। ইহাদিগকে 'নারকীয়' 'তির্য্যক্', 'মনুষ্য', ও 'দেবতা' এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে।

(১) 'নারকীয়' জীবেরা তাহাদের বাসস্থান ভেদে সাত প্রকার যথা—রত্নপ্রভাবাসী, শর্করাপ্রভাবাসী, বালুকা-প্রভাবাসী, পঙ্কপ্রভাবাসী, ধূমপ্রভাবাসী, তমঃপ্রভাবাসী, ও তমস্তমঃপ্রভাবাসী।

(২) তির্য্যক্ জীব ত্রিবিধ,—জলচর, (মৎস্য, কচ্ছপ, মকর, হাঙ্গর ইত্যাদি), স্থলচর ও খেচর।

স্থলচর তিন প্রকার—চতুষ্পদ, উরঃপরিসর্প, ও ভুজপরিসর্প।

চতুষ্পদ—যথা, গো, অশ্ব, মহিষাদি।

উরঃপরিসর্প—যথা, সর্প ইত্যাদি।

ভুজপরিসর্প—যথা, নকুল ইত্যাদি।

খেচর—ইহারা দুই প্রকার ঃ—রোমজ ও চর্ম্মজ। রোমজ—যথা—হংস, শারস ইত্যাদি। চর্ম্মজ—যথা—চর্ম্মচটিক ইত্যাদি।

যাবতীয় জলচর স্থলচর ও খেচর জীবগণ "সমূর্চ্ছিম" ও "গর্ভজ" এই দুই ভাগে বিভক্ত। মাতৃ পিতৃ নিরপেক্ষ-তায় যাহাদের উৎপত্তি তাহারা "সমূর্চ্ছিম"। গর্ভে যাহারা জন্মে তাহারা "গর্ভজ"।

---

* জৈনমতে রত্নপ্রভাদি ভূমি ও সৌধর্ম্মাদি বিমান লোকের [ঘনবা]ত' ও 'তনুবাত' আধারভূত আছে 'ঘনবাত' ঘৃত সদৃশ গাঢ় [ও 'তন]ুবাত' তাপিত ঘৃতবৎ তরল।

(৩) মনুষ্যের বিভাগও বাসস্থান ভেদে তিন প্রকার—(১) কর্ম্মভূমিবাসী, (২) অকর্ম্মভূমিবাসী, ও (৩) অন্তর্দ্বীপবাসী।

(১) কর্ম্মভূমি অর্থাৎ কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মপ্রধান ভূমি—পঞ্চভরত, পঞ্চঐরাবত, ও পঞ্চবিদেহ এই পঞ্চদশ প্রদেশকে 'কর্ম্মভূমি' বলে।

(২) অকর্ম্মভূমি অর্থাৎ হৈমবৎ, ঐরাবত, হরিবর্ষ, রম্যক, দেবকুরু ও উত্তরকুরু এই ষট্ অকর্ম্মভূমি পঞ্চমেরুর প্রত্যেক মেরুতে অবস্থিত আছে। তজ্জন্য মেরুভেদে অকর্ম্মভূমির মোট সংখ্যা ৩০।

(৩) অন্তর্দ্বীপের সংখ্যা ৫৬।

দেবগণ প্রধানতঃ চারিপ্রকার। যথা—(১) ভুবনপতি, (২) ব্যন্তর (৩) জ্যোতিষ্ক ও (৪) বৈমানিক।

ভুবনপতি দেবতা—অসুরকুমার, নাগকুমার, সুপর্ণকুমার, বিদ্যুৎকুমার, অগ্নিকুমার, দ্বীপকুমার, উদধিকুমার, দিগ্‌কুমার, বায়ুকুমার ও স্তনিতকুমার এই দশ প্রকার।

ব্যন্তর দেবতা—পিশাচ, ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, কিংপুরুষ, মহোরগ ও গন্ধর্ব্ব এই আট প্রকার।

জ্যোতিষ্ক দেবতা—যথা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ও তারা। ইহারা মনুষ্যক্ষেত্রে "চর" তদ্বহিঃ "স্থির" জ্যোতিষী।

বৈমানিক দেবতা—দুই প্রকার যথা—কল্পোপপন্ন ও কল্পাতীত।

সৌধর্ম্ম, ঈশান, সনৎকুমার, মহেন্দ্র, ব্রহ্ম, লান্তক, শুক্র, সহস্র, আনত, প্রাণত, আরণ, ও অচ্যুত, এই দ্বাদশ কল্পবাসী দেবতারা কল্পোপপন্ন।

সুদর্শন, সুপ্রবুদ্ধ, মনোরম, সর্ব্বতোভদ্র, বিশাল, সমনঃ, সোমনসঃ, প্রিয়ঙ্কর, নন্দীকর, এই নয় গ্রৈবেয়ক বিমানবাসী ও বিজয়, বৈজয়ন্ত, অপরাজিত, সর্ব্বার্থসিদ্ধ এই পঞ্চানুত্তর বিমানবাসী দেবতারা কল্পাতীত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

জীবের দ্বিতীয় বিভাগ "সিদ্ধগামী জীব", তীর্থসিদ্ধ ও অতীর্থসিদ্ধ ভেদে পঞ্চদশ প্রকার জৈন সিদ্ধান্তে বর্ণিত আছে। তাহাদের নাম—যথা (১) জিনসিদ্ধ, (২) অজিনসিদ্ধ, (৩) তীর্থসিদ্ধ, (৪) অতীর্থসিদ্ধ, (৫) গৃহস্থলিঙ্গসিদ্ধ, (৬) অন্যলিঙ্গসিদ্ধ (৭) স্বলিঙ্গসিদ্ধ (৮) স্ত্রীলিঙ্গসিদ্ধ (৯) পুরুষলিঙ্গসিদ্ধ (১০) নপুংসকলিঙ্গসিদ্ধ (১১) প্রত্যেকবুদ্ধসিদ্ধ (১২) স্বয়ংবুদ্ধসিদ্ধ (১৩) বুদ্ধপোষিতসিদ্ধ (১৪) একসিদ্ধ ও (১৫) অনেকসিদ্ধ।

বারান্তরে উপরোক্ত জীববৃন্দের শরীরপ্রমাণ, আয়ু, স্বকায়স্থিতি, প্রাণদ্বার ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার।

ভারতীয় প্রজা ও নৃপতিবর্গের প্রতি শ্রীশ্রীমান্ ভারত-সম্রাটের সম্ভাষণ

মানবজাতির সভ্যতা ও শান্তির বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব্ব আক্রমণ হইয়াছে, তাহা প্রতিরুদ্ধ ও পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া, আমার স্বদেশের ও সমুদ্রের-পরপারে-অবস্থিত সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রজাগণ, এক মনে ও এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছেন। এই সর্ব্বনাশকর সংগ্রাম আমার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় নাই। আমার মত পূর্ব্বাপরই শান্তির অনুকূলে প্রদত্ত হইয়াছিল। যে-সকল বিবাদের কারণ ও বিসম্বাদের সহিত আমার সাম্রাজ্যের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, আমার মন্ত্রিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে সেই-সমস্ত কারণ দূর করিতে ও সেই-সমস্ত বিসম্বাদ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে-সকল প্রতিশ্রুতি পালনার্থ আমার রাজ্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল সেই-সকল প্রতিশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া যখন বেল্‌জিয়ম্ আক্রান্ত ও তাহার নগরসমূহ বিধ্বস্ত হইল, যখন ফরাসি জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইল, তখন যদি আমি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আমাকে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে হইত ও আমার সাম্রাজ্য এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির স্বাধীনতা ধ্বংসের মুখে সমর্পণ করিতে হইত। আমার এই সিদ্ধান্তে আমার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ আমার সহিত একমত জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। নৃপতিগণের ও জাতিসমূহের কৃত সন্ধি, ও তাঁহাদের প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ইংলণ্ড ও ভারতের

সাধারণ জাতিগত ধর্ম্ম। আমার সমগ্র প্রজাবর্গ আমার সাম্রাজ্যের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য এক প্রাণে অভ্যুত্থান করিয়াছেন। যে কয়েকটি ঘটনায় ঐ অভ্যুত্থানের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আমার ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ এবং ভারতবর্ষের সামন্ত নৃপতিবর্গ আমার সিংহাসনের প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন ও সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনায় স্ব স্ব ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিবার যে বিরাট্ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমি যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছি এমন আর কিছুতেই হই নাই। [যু]দ্ধে সর্ব্বাগ্রগামী হইবার জন্য তাঁহারা একবাক্যে যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে; [য]ে প্রীতি ও অনুরাগের সূত্রে আমি ও আমার ভারতীয় প্রজাগণ আবদ্ধ আছি, সেই প্রীতি ও অনুরাগকে প্রকৃষ্টতম [ফ]ললাভের নিমিত্ত অনুপ্রাণিত করিয়াছে। দিল্লীতে [আ]মার অভিষেকোৎসবার্থ মহাসমারোহে যে দরবার [আ]হূত হয়, সেই দরবারের অবসানে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ফব্রুয়ারি মাসে আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, [ভ]ারত ইংরাজজাতির প্রতি অনুরাগ ও সৌহৃদ্যসূচক যে [প্র]ীতিপূর্ণ সম্ভাষণবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা অদ্য [আ]মার স্মরণপথে উদয় হইতেছে। গ্রেটব্রিটেন ও [ভ]ারতবর্ষের ভাগ্য পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে [ব]লিয়া আপনারা আমাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এই [স]ঙ্কট সময়ে আমি দেখিতেছি যে তাহা প্রচুর ও সুমহৎ [ফ]ল প্রসব করিয়াছে।

[৮]ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪।
[২৩]শে ভাদ্র ১৩২১।

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি ও পরিণতি

([ব]ঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটী শাখার অধিবেশনে পঠিত।)

ভরতমুনি নাট্যের প্রবর্ত্তয়িতা।

[প্রা]চীন সকল শাস্ত্রই দেবতার নিকট হইতে আগত। [ঋ]ষি বিশেষ ঋষি তপঃপ্রভাবে দেবতার নিকট হইতে [বি]ষয় বিশেষ শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভরতমুনি ব্রহ্মার নিকট নাট্যশাস্ত্র লাভ করিয়াছেন এবং সেইজন্য নাট্যশাস্ত্র বেদ-আখ্যা লাভ করিয়াছে। এই নাট্যবেদ সকল বেদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গঠিত। ঋগ্‌বেদ হইতে বাক্যাবলী গৃহীত, সামবেদ হইতে গীতভাগ গৃহীত, অভিনয় যজুর্ব্বেদ হইতে গৃহীত এবং অথর্ব্ববেদ হইতে রস গৃহীত।* অভিনবগুপ্তাচার্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এই নাট্যশাস্ত্রের যে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম 'ভরতনাট্যবেদবিবৃত্তি"। তিনিও ভরতকেই নাট্যবেদের রচয়িতা বা প্রযোক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সংস্কৃতনাটকের অভিনেতৃগণ ভরতপুত্র বা ভরতশিষ্য বলিয়া পরিচিত। সংস্কৃত নাটকের শেষভাগের আশীর্ব্বাদ-বাক্য ভরতবাক্য বলিয়া কথিত। ভরতমুনি স্বর্গে নাটকাদির প্রযোক্তা এইরূপ উল্লেখ আমরা সংস্কৃত নাটকাদিতে দেখিতে পাই। কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী'র তৃতীয় অঙ্কে ভরতশিষ্যদ্বয়ের একজন অপরকে বলিতেছে —"অপি গুরোঃ প্রয়োগেণ দিব্যা পরিষদারাধিতা।"— আমাদের গুরুদেবের অভিনয়কৌশলে স্বর্গীয় জনসমাজ সন্তুষ্ট হইয়াছে ত? ভবভূতির উত্তররামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে লব বলিতেছেন—"তং চ স্বহস্তলিখিতং মুনির্ভগবান্ ব্যসৃজদ্ ভগবতো ভরতস্য মুনেস্তৌর্য্যত্রিকসূত্রকারস্য"। বাল্মীকি মুনি রামায়ণের একাংশ অভিনয়ের উপযোগী করিয়া রচনা করিয়া অভিনয়ের জন্য তৌর্য্যত্রিকসূত্রকার (নৃত্য-গীত-বাদিত্র-শাস্ত্রাচার্য্য) ভরতের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। ভরতই নাট্যের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া পরিচিত।

নাট্যের প্রয়োগ।

নাট্যবেদের রচনা হইবার পর ভরতমুনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এক্ষণে এই নাট্যবেদ লইয়া আমি কি করিব?' ব্রহ্মা উত্তর দিলেন—'ইন্দ্রধ্বজ পূজার সময় উপস্থিত; এই সময়ে নাট্যবেদ 'প্রয়োগ' করিতে হইবে।'†

---

* সঙ্কল্প্য ভগবানেবং সর্ব্ববেদাননুস্মরন্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্ব্বেদাঙ্গসম্ভবম্ ॥
জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্‌বেদাৎ সামেভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্ব্বেদাদভিনয়ান্ রসানথর্ব্বণাদপি ॥
—ভরত নাট্যশাস্ত্র, ১ম অধ্যায় ১৬, ১৭।

† অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রস্য প্রবর্ত্ততে।
অত্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাম্ ॥
—নাট্যশাস্ত্র ১, ২১।

'দেবগণের নিকট অসুরের পরাজয়' এই বিষয় লইয়া এক নাটক অভিনীত হইল। ইহাতে দেবগণ অত্যন্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু অসুরগণ ভাবিল তাহাদের লাঞ্ছনা করিবার এক অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করা হইয়াছে। তাহারা দলে দলে আসিয়া অভিনয়ে বাধা দিতে লাগিল; অভিনেতৃগণের বাক্যস্খলন হইতে লাগিল; স্মৃতিভ্রংশ হইতে লাগিল। অভিনয়ের এইরূপ ব্যাঘাত দেখিয়া ইন্দ্র ধ্যানাবিষ্ট হইয়া কারণানুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যথার্থ কারণ অবগত হইয়া নিজের ধ্বজ গ্রহণ পূর্ব্বক অসুরগণকে ভীষণ প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে তাহারা জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল বলিয়া ইন্দ্রধ্বজের নাম হইল জর্জ্জর। * ভরত দেখিলেন যে, যখনই তিনি কোন নাটকের অভিনয় করিবেন তখনই দৈত্যকুল আসিয়া বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। তিনি নিজের পুত্রগণের (শিষ্য) সহিত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"রক্ষাবিধিং সম্যগাজ্ঞাপয় সুরেশ্বর (৪৪ শ্লোক)।" তখন ব্রহ্মা বুঝিলেন যে, বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে দৈত্যগণ বারংবার বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন লক্ষণযুক্ত একটি নাট্যগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। [কুরু লক্ষণসম্পন্নং নাট্যবেশ্ম মহামতে। ৪৫]

নাট্যগৃহ।

নাট্যগৃহ নির্ম্মিত হইলে ব্রহ্মা স্বয়ং পরিদর্শন করিলেন এবং নাট্যগৃহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ রক্ষা করিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবগণকে আদেশ করিলেন। চন্দ্রদেব মণ্ডপ রক্ষা করিলেন; নেপথ্যগৃহ (সাজঘর) মিত্র রক্ষা করিলেন; বেদিকা রক্ষণের ভার অগ্নির উপর পড়িল। দ্বারদেশ, ধারণ, শালা, দেহলী (চৌকাঠ threshold), রঙ্গপীঠ (নৃত্যস্থান), মত্তবারুণী (প্রাচীরগাত্রস্থিত স্থান বিশেষ; a bracket projecting from the wall) † ও অন্যান্য অংশ অপর অপর দেবগণ রক্ষা করিলেন। রঙ্গপীঠ রক্ষার ভার স্বয়ং মহেন্দ্র গ্রহণ করিলেন। পাতালবাসী যক্ষ, গুহ্যক ও পন্নগগণ রঙ্গপীঠের অধোভাগ রক্ষা করিল। জর্জ্জরদণ্ডটিও পাঁচজন দেবতা কর্তৃক রক্ষিত হইল। দৈত্যগণ দেখিল নাটকের বিঘ্ন উৎপাদন করা আর সম্ভব নহে। তখন তাহারা ব্রহ্মাকে বলিল *—'আমাদের লাঞ্ছনার জন্য এই উপায় আপনি কেন উদ্ভাবন করিলেন? আপনি যেমন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ অসুরসৃষ্টিও করিয়াছেন।' তখন ব্রহ্মা এই প্রকারে তাহাদিগকে বুঝাইলেন—দেখ, দেবতাদের উৎকর্ষ বা দৈত্যদের অপকর্ষ প্রদর্শন করা নাট্যের উদ্দেশ্য নহে। নাটক হইতে দেবতা এবং অসুর সকলেই উপদেশ লাভ করিবে। সাধারণতঃ যে যে ভাব জীবের মনোমধ্যে উদিত হয় তাহাই প্রদর্শন করা নাটকের উদ্দেশ্য। নাটক এমন ভাবে এইগুলি প্রদর্শন করে যাহাতে সকলেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। দেখ,—

> দুঃখার্ত্তানাং সমর্থানাং শোকার্ত্তানাং তপস্বিনাম্।
> বিশ্রান্তিজননং কালে নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্॥
> ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনং।
> লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি॥
> [১ম অধ্যায় ৮০, ৮১]

অতএব তোমরা দুঃখ করিও না। [৭৪-৮৬]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন হিন্দুদিগের রঙ্গপীঠ বা নাট্যগৃহ প্রভৃতি কিছুই ছিল না; রাজপ্রাসাদে বা উন্মুক্ত প্রান্তরে অভিনেতারা নাটকাভিনয় করিত। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ, নাট্যবেশ্ম, নেপথ্যগৃহ, রঙ্গপীঠ, মত্তবারুণী প্রভৃতি শব্দ ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই প্রদান করিতেছে। শুধু তাই নয়, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নানাবিধ নাট্যগৃহ বা প্রেক্ষাগৃহ বা নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও আছে।

নাট্যমণ্ডপের প্রকার ভেদ।

নাট্যমণ্ডপ তিন প্রকারের হইতে পারে; (১) বিকৃষ্ট—elliptical বৃত্তাভাস, (২) চতুরস্র—rectangular, চতুষ্কোণ, (৩) ত্র্যস্র—triangular ত্রিকোণ। ত্রিকোণ প্রেক্ষাগৃহ সর্ব্বাপেক্ষা 'কনিষ্ঠ', চতুষ্কোণ প্রেক্ষাগৃহ 'মধ্যম' এবং বিকৃষ্ট প্রেক্ষাগৃহ 'জ্যেষ্ঠ'। প্রথম প্রকার প্রেক্ষাগৃহ

* নাট্যশাস্ত্র ১ম, ৬৯।

† মত্তবারুণী—বাসবদত্তাতেও ইহার উল্লেখ আছে। হলায়ুধের অভিধানরত্নমালায় মত্তবারণ অর্থে অপাশ্রয়। রামায়ণে (৫, ১১, ১৯) এই অপাশ্রয়ের উল্লেখ আছে। অপাশ্রয় an awning spread over a court-yard—M. Williams. এই অর্থ আধুনিক।

* নাট্যশাস্ত্র ১ম, ৭০

(elliptical) দেবতাদিগের জন্য (দেবানাং তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠং), দ্বিতীয়টি (চতুষ্কোণ) রাজাদিগের জন্য (নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ), আর সাধারণ লোকের জন্য তৃতীয়টি (ত্রিকোণ) নির্দ্ধারিত হইবে।'

নাট্যমণ্ডপের আয়তন।

বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদের ইঞ্জিনিয়ার। তিনি (scale) পরিমাণদণ্ড ধরিয়া নিয়মিতরূপে মাপ করিয়া প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার পরিমাণদণ্ডের অংশবিভাগ এইরূপ ছিল :—

এক দণ্ড = ৪ হস্ত ; ১ হস্ত = ২৪ অঙ্গুল ;
১ অঙ্গুল = ৮ যব ; ১ যব = ৮ যূকা ;
১ যূকা = ৮ লিক্ষা ; ১ লিক্ষা = ৮ বাল ;
১ বাল = ৮ রজঃ ; ১ রজঃ = ৮ অণু।*

প্রথম প্রকার প্রেক্ষাগৃহের দৈর্ঘ্য ১০৮ হস্ত হইবে ; দ্বিতীয়ের দৈর্ঘ্য চতুঃষষ্টি হস্ত পরিমিত (৬৪) ও প্রস্থ দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত (৩২) হইবে ; তৃতীয় প্রকার প্রেক্ষাগৃহের প্রতিবাহু (৩২) দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত হইবে। চতুষ্কোণ প্রেক্ষাগৃহই মর্ত্ত্যদিগের (মনুষ্যদিগের রাজা ও তাহার পারিষদবর্গের) উপযোগী। প্রেক্ষাগৃহের আয়তন ইহা অপেক্ষা অধিক করিতে নাই। কেননা উচ্চৈঃস্বরে অভিনয় করিতে হইলে শ্রোতার নিকট অভিনেতার স্বর বিস্বর বোধ হইবে—মুখরাগাদি ও দৃষ্টি দ্বারা অভিনেতা যে ভাবসমূহ প্রকটিত করিতে প্রয়াস পাইবে, দূরস্থ দর্শকের নিকট তাহা অস্পষ্ট বোধ হইবে। এইজন্য চতুষ্কোণ প্রেক্ষাগৃহই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। †

রঙ্গপীঠ। Stage.

'সমা' 'স্থিরা' 'কঠিনা' 'কৃষ্ণা' ভূমি নির্ব্বাচিত করিয়া লাঙ্গল দ্বারা সেই ভূমি 'উৎকৃষ্ট' করিয়া অস্থি, কীলক, তৃণ, গুল্ম প্রভৃতি উৎসারিত করিতে হইবে। পরে অচ্ছিন্ন রজ্জু দ্বারা দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত ও প্রস্থে ৩২ হাত মাপিয়া লইতে হইবে। ইহার অর্দ্ধেক "প্রেক্ষক"-পরিষৎ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ রঙ্গপীঠ (stage)। রঙ্গপীঠের সর্ব্বপশ্চাদ্‌ভাগে চতুর্হস্ত পরিমিত ছয়টি দারুনির্ম্মিতস্থাণুসমন্বিত "রঙ্গশীর্ষ" গৃহ। এই স্থানে নানা দেবতার পূজা হইবে। রঙ্গশীর্ষের পরেই নেপথ্যগৃহ। নেপথ্যগৃহ ও রঙ্গশীর্ষের মধ্যে দুইটি দ্বার। নেপথ্যগৃহ হইতে রঙ্গপীঠে প্রবেশ করিবার এক বা দুই দ্বার থাকিবে। নাট্যমণ্ডপ দ্বিভূমিক (দোতালা) হইবে, * স্বর্গ বা অন্তরীক্ষলোকের ঘটনাবলি উপরের তালায় অভিনীত হইবে এবং পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা নীচের তালায় অভিনীত হইবে। উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতায়ন থাকিবে। বৃহৎ বাতায়ন থাকিলে বাদ্যযন্ত্রাদির "গম্ভীরস্বরতা" রক্ষিত হইবে না। প্রাচীরভিত্তি নির্ম্মিত হইলে তাহাতে লেপ (plaster) দিতে হইবে এবং পরে "সুধাকর্ম্ম" (চুনকাম whitewash ২য়।৭২) করিতে হইবে। ভিত্তি বেশ শুষ্ক হইলে তাহাতে নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে।

প্রেক্ষকপরিষৎ।

নাট্যমণ্ডপের অপরার্দ্ধ 'প্রেক্ষক'-পরিষৎ। ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের আসন থাকিবে। আসনগুলি সোপানাকৃতিভাবে সজ্জিত হইবে ও ইষ্টক অথবা কাষ্ঠনির্ম্মিত হইবে এবং এক পঙ্‌ক্তি অপর পঙ্‌ক্তি হইতে এক হস্ত ঊর্দ্ধে স্থাপিত হইবে। সমস্ত আসন এমন ভাবে সাজাইতে হইবে যেন সকল প্রেক্ষকই রঙ্গপীঠ

---

* নাট্যশাস্ত্র ২য় অধ্যায় ১৭।১৮।১৯
অণবোঽষ্টৌ রজঃ প্রোক্তং তান্যষ্টৌ বাল উচ্যতে।
বালাস্ত্বষ্টৌ ভবেল্লিক্ষা যূকা লিক্ষাষ্টকং ভবেৎ ॥
যূকাস্ত্বষ্টৌ যবো জ্ঞেয়ো যবাস্ত্বষ্টৌ তথাঙ্গুলম্।
অঙ্গুলানি তথা হস্তশ্চতুর্বিংশতিরুচ্যতে ॥
চতুর্হস্তো ভবেদ্দণ্ডো নির্দ্দিষ্টস্তু প্রমাণতঃ।
অনেনৈব প্রমাণেন বক্ষ্যাম্যেষাং বিনির্ণয়ম্ ॥

† নাট্যশাস্ত্র ২য় অধ্যায় ২১।২২।২৩ ২৪
অত ঊর্দ্ধং ন কর্ত্তব্যঃ কর্ত্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।
যস্মাদব্যক্তভাবং হি তত্র নাট্যং ব্রজেদিতি ॥
মণ্ডপে বিপ্রকৃষ্টে তু পাঠ্যমুখরিতস্বরম্।
অনিঃসরণধর্ম্মত্বাদ্ বিস্বরত্বং ভৃশং ব্রজেৎ ॥
যশ্চ ন্যাস্যগতো ভাবো নানাদৃষ্টিসমন্বিতঃ।
সর্ব্বেভ্যো বিপ্রকৃষ্টত্বাদ্ ব্রজেদব্যক্ততাং পরাম্ ॥
প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্ব্বেষাং তস্মান্মধ্যমমিষ্যতে।
যাবৎ পাঠ্যং চ গেয়ং চ তত্র শ্রব্যতরং ভবেৎ ॥

* ২য় অধ্যায়, ৬৯।

† ২য় অধ্যায় ৭৯।৮০।৮১
........সোপানাকৃতিপীঠকম্ ॥
ইষ্টকদারুভিঃ কার্য্যং প্রেক্ষকাণাং নিবেশনম্।
হস্তপ্রমাণৈরুৎসেধৈর্ভূমিভাগসমুত্থিতৈঃ ॥
রঙ্গপীঠাবলোক্যং তু কুর্য্যাদাসনজং বিধিম্।

অনায়াসে দেখিতে পান। সম্মুখে আসনগুলি ব্রাহ্মণদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ও শ্বেতস্তম্ভ দ্বারা লক্ষণান্বিত হইবে। ব্রাহ্মণের পরেই ক্ষত্রিয়ের আসন; এ স্থানের স্তম্ভসকল রক্তবর্ণ। ক্ষত্রিয়ের পশ্চাদ্‌ভাগে যে স্থান অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পশ্চিমোত্তর ভাগ বৈশ্য অধিকার করিবেন, পীতস্তম্ভ ইঁহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিবে; পূর্ব্বোত্তর ভাগ শূদ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, নীলস্তম্ভ ইঁহাদিগের স্থান প্রদর্শন করিবে। [২য় অধ্যায় ৪৮-৫১।]

গৃহপ্রবেশ।

নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মিত হইবার পর সপ্তাহকাল জপপরায়ণ ব্রাহ্মণ এবং গাভী-সকল তথায় বাস করিবে। পরে নায়ক (leader) ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া, সংযত ও শুদ্ধ হইয়া এবং অখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়া বিশেষ বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবেন:—মহাদেব, পিতামহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সরস্বতী, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মেধা, ধৃতি, মতি, সোম, সূর্য্য, মরুৎ, লোকপাল, অশ্বিনদ্বয়, মিত্র, অগ্নি, রুদ্র, কাল, কলি, মৃত্যু, নিয়তি, ও নাগরাজ বাসুকি। এতদ্ভিন্ন স্বর, বর্ণ, বিষ্ণুপ্রহরণ, বজ্র, সমুদ্র, গন্ধর্ব্ব, অপ্‌সরা, মুনিগণ, যক্ষ, গুহক, ভূতসংঘ, নাট্যকুমারী ও গ্রামের নায়কের পূজা করিয়া বলিবেন—রাত্রিতে আপনারা আসিয়া আমাদের নাটকের সিদ্ধিবিষয়ে সাহায্য করিবেন। তৎপরে জর্জ্জরপূজা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই জর্জ্জর ইন্দ্রধ্বজ। জর্জ্জর পূজার মন্ত্র;—(তৃতীয় অধ্যায়)

> মহেন্দ্রস্য প্রহরণং ত্বং দানবনিসূদন ॥১১
> নমিতস্ত্বং সর্ব্বদেবৈঃ সর্ব্ববিঘ্ননিবর্হণ।
> নৃপস্য বিজয়ং শংস রিপূণাংচ পরাজয়ম্ ॥১২
> গোব্রাহ্মণশিবং চৈব নাট্যস্য চ বিবর্দ্ধনম্ ॥১৩
>
> * * * *
>
> শিরস্তে রক্ষতু ব্রহ্মা সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ।
> দ্বিতীয়ং চ হরঃ পর্ব্বং তৃতীয়ং তু জনার্দ্দনঃ ॥১১
> চতুর্থং চ কুমারশ্চ পঞ্চমং পন্নগোত্তমাঃ।
> নিত্যং সর্ব্বেঽপি পান্তু ত্বাং পুনস্ত্বংচ শিবো ভব ॥১২

জর্জ্জর পূজার পর অগ্নিতে হোম করিতে হইবে। তৎপরে "নাট্যাচার্য্য" রঙ্গমধ্যে পূর্ণকুম্ভ ভগ্ন করিবেন এবং উজ্জ্বল আলোক (দীপিকা) দ্বারা "রঙ্গ" প্রদীপ্ত করিবেন। রঙ্গস্থানের পূজাবিধান না করিয়া যিনি দৃশ্যের প্রয়োগ করিবেন তাঁহার কর্ম্ম সফল হইবে না, তিনি তির্য্যগযোনি প্রাপ্ত হইবেন।

নাটক।

নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মিত হইবার পর ব্রহ্মা আদেশ করিলেন মদ্‌গ্রথিত"বস্তু" ধর্ম্মকামার্থসাধক "অমৃতমন্থন" নামক নাটক অভিনীত হউক। এই অমৃতমন্থন নাটকের অভিনয় দর্শনে দেবগণ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তখন ব্রহ্মা মহাদেবকে বলিলেন—আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া নাটকের অভিনয় দর্শন করুন। মহাদেব স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মা ভরতকে শিষ্যগণসহ প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিলেন। তখন নানা-নগর-সমাকুল বহুচৈত্যদ্রুমাকীর্ণ নানাবিধ-রম্যকন্দরনির্ঝর-পরিশোভিত হিমালয়পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে মহাদেবের সম্মুখে "ত্রিপুরদাহ" অভিনীত হইল।

নৃত্য।

অভিনয়দর্শনে প্রীত হইয়া মহাদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন, নাটকে নৃত্য দেখিলাম না। তুমি যে "পূর্ব্বরঙ্গ" প্রয়োগ করিয়াছ তাহা 'শুদ্ধ'; ইহার সহিত নৃত্যের যোগ করিয়া দিয়া ইহা "চিত্র" পূর্ব্বরঙ্গ হউক না কেন। * ব্রহ্মা বলিলেন সকল প্রকার নৃত্যের কর্ত্তা আপনি; আপনিই এই-সকল নৃত্যের 'অঙ্গহারাদি' প্রদর্শন করুন। তখন মহাদেব তণ্ডুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—ভরতকে একবার অঙ্গহারগুলি দেখাইয়া দাও। তণ্ডু তৎসমুদায় ভরতকে বুঝাইয়া দিলেন। তণ্ডুর নিকট প্রাপ্ত বলিয়া এই নৃত্যের সাধারণ নাম তাণ্ডব। (৪র্থ অধ্যায় ২৪৩)

নৃত্যের পরিভাষা ও প্রকার ভেদ।†

ভিন্ন ভিন্ন ভাবপ্রকাশক হস্তপাদসংযোগের নাম নৃত্যের করণ; দুইটি করণ লইয়া একটি নৃত্যমাতৃকা; দুই, তিন বা চারি নৃত্যমাতৃকা লইয়া একটি অঙ্গহার। স্থিরহস্ত, পর্য্যস্তক, সূচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, অক্ষিপ্তক, উদ্যোত্তিত, বিষ্কম্ভ, অপরাজিত, বিষ্কম্ভাপসৃত, মত্তাক্রীড়, স্বস্তিক, পার্শ্বস্বস্তিক, বৃশ্চিক, চমর, গতিমণ্ডল, পার্শ্বচ্ছেদ, বিদ্যুদ্দ্রান্ত প্রভৃতি দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অঙ্গহারের পরিচয় ভরত

* চতুর্থ অধ্যায় ১২-১৪।
† চতুর্থ অধ্যায় ২৯ ইত্যাদি।

দিয়াছেন। তলপুষ্পপুট, চলিতোরু, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্ত, ভুজঙ্গ-ত্রাসিত, ঘূর্ণিত, দণ্ডপক্ষ, ব্যংসিত, ললাটতিলক, গজক্রীড়িতক, গরুড়প্লুতক, গৃধ্রাবলীনক, তলঘট্টিতক প্রভৃতি অষ্টোত্তরশত (১০৮) প্রকারের করণ। সুন্দরভাবে নৃত্যের বিরাম প্রদর্শনের নাম রেচক। রেচক চতুর্ব্বিধ; (১) পাদরেচক, (২) কটিরেচক; তৃতীয় ও চতুর্থ-রেচকের নাম নাট্যশাস্ত্রের যে শ্লোকে (৪,২৩২) ছিল তাহার পাঠোদ্ধার করা যায় নাই। দক্ষযজ্ঞনাশের পর সন্ধ্যাকালে মহাদেব সকল দেবতার ভঙ্গি অনুকরণ করিয়া লয়তাল অনুসারে নৃত্য করিয়াছিলেন। নন্দী ও অন্যান্য প্রমথগণ তাহার নাম রাখিয়াছেন 'পিণ্ডীবন্ধ'। ভরত এতৎসমুদায় শিক্ষা করিলেন এবং নাট্যে প্রয়োগ করিলেন। নৃত্য নাটকীয় বস্তুর সহায়তা করে না বটে কিন্তু নাট্যের সৌন্দর্য্যবিধান করে। সাধারণ লোকে উৎসবাদিতে 'নৃত্যগীত' করিয়া থাকে এবং নৃত্য অতিশয় ভালবাসে। সেইজন্যই নাটককে জনপ্রিয় করিবার নিমিত্ত নাটকে নৃত্যের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। *

পূর্ব্বরঙ্গ।

পূর্ব্বে পূর্ব্বরঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বরঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি সংসাধিত করিতে হইবে। (১) প্রত্যাহার—বাদ্যযন্ত্রাদির (কুতপ) যথাস্থানে বিন্যাস; (২) অবতরণ—গায়ক ও বাদকদিগের যথাস্থানে নিবেশ; (৩) আরম্ভ—সুরের আরম্ভ; (৪) আশ্রাবণবিধি—আতোদ্য বা বাদ্যযন্ত্রাদির পরীক্ষা; (৫) বাদ্যযন্ত্রের সহিত কণ্ঠস্বরের সাম্যকরণ—বক্ত্রপাণি; (৬) পরিঘট্টনা—তন্ত্রীযন্ত্রের সহিত কণ্ঠস্বরের একীকরণ; (৭) সংস্বদনাবিধি—বাদ্যকরের যন্ত্রাদিতে হস্তবিন্যাস; (৮) মার্গসারিত—তন্ত্রীযন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রের সমাযোগ; (৯) আসারিতক্রিয়া—কালপাতবিভাগ বা 'তাল' রক্ষা; ও (১০) গীতবিধি—দেবগণের গুণকীর্ত্তন। † এই সকল "জবনিকা"র অন্তরালে হইবে। পরে জবনিকা উত্থিত হইলে ‡ "নান্দিপাঠক"§ রঙ্গপীঠে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে "পরিবর্ত্তন" করিয়া লোকপালগণের বন্দনা করিবেন এবং নান্দী পাঠ করিবেন।* ইহাই হইল 'শুদ্ধ' পূর্ব্বরঙ্গ; ইহার সহিত নৃত্য থাকিলেই ইহার নাম হইবে 'চিত্র' পূর্ব্বরঙ্গ। যে যে ক্রিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইল ইহাই পূর্ব্বরঙ্গের সাধারণ বিষয়; সূত্রধর কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক।

জবনিকা উত্থিত হইলে সূত্রধার পুষ্পাঞ্জলি হস্তে প্রবেশ করিবেন; তাঁহার সহিত ভৃঙ্গার-ও-জর্জ্জরধারী দুইজন "পারিপার্শ্বিক" (পার্শ্বচর) প্রবেশ করিবেন। প্রথমেই ব্রহ্মার পূজা করিবার উদ্দেশ্যে সূত্রধার রঙ্গপীঠের মধ্যস্থানের দিকে পঞ্চপদ অগ্রসর হইয়া 'ব্রহ্মমণ্ডলে' পুষ্পবিক্ষেপ করিবেন এবং 'সললিত' হস্তবিন্যাসকৌশলের সহিত ভূতলে হস্ত রক্ষা করিয়া তিনবার ব্রহ্মাকে প্রণাম পূর্ব্বক মধ্যলয় আশ্রয় করিয়া একবার 'পরিবর্ত্ত' করিবেন (ঘুরিবেন)। পরে ব্রহ্মমণ্ডলী প্রদক্ষিণ করিয়া পারিপার্শ্বিকের হস্ত হইতে ভৃঙ্গার ও জর্জ্জর গ্রহণ করিবেন। পরে বাদ্যযন্ত্রাদির (কুতপ) দিকে পঞ্চপদ অগ্রসর হইয়া আর একবার পরিবর্ত্ত করিয়া চতুর্দ্দিক্‌পতি, ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবেরকে প্রণাম করিবেন। এই অবসরে আর একজন পাত্র পুষ্পাঞ্জলি হস্তে প্রবেশ করিয়া জর্জ্জর, কুতপ ও সূত্রধারের পূজা করিয়া লয়তাল সহযোগে বিশেষ অঙ্গবিক্ষেপ প্রদর্শন করিতে করিতে প্রস্থান করিবে।

এইবার সূত্রধার 'নান্দী' পাঠ করিবেন—

> নমোঽস্ত সর্ব্বদেবেভ্যো দ্বিজাতিভ্যঃ শুভং তথা।
> জিতং সোমেন বৈ রাজ্ঞা শিবং গোব্রাহ্মণায় চ॥
> ব্রহ্মোত্তরং তথৈবাস্তু হতা ব্রহ্মদ্বিষস্তথা।
> প্রশাস্ত্বেমাং মহারাজ পৃথিবীং চ সসাগরাম্॥
> রাষ্ট্রং প্রবর্দ্ধতাং চৈব রঙ্গস্যাশা সমৃদ্ধ্যতু।
> প্রেক্ষা-কর্ত্তুর্ম্মহান্ ধর্ম্মো ভবতু ব্রহ্মভাবিতঃ॥
> কাব্যকর্ত্তুর্যশশ্চাস্তু ধর্ম্মশ্চাপি প্রবর্দ্ধতাম্।
> ইজ্যয়া চানয়া নিত্যং প্রীয়ন্তাং দেবতা ইতি॥
> [৫ম অধ্যায় ৯৯-১০২]

পাঠকালে প্রতি পদান্তরে পারিপার্শ্বিকদ্বয় "এবমার্য্য"—আর্য্য, এইরূপই হউক—বলিবেন। পরে আর্য্যাশ্লোকে

* চতুর্থ অধ্যায় ২৪৬-২৪৮।
† নাট্যশাস্ত্র ৫ম অধ্যায় ১১-২১।
‡ " ৫ম—২২।
§ " ৫ম—২৮ সূত্রধার স্বয়ং পাঠ করিবেন।

* ভরত নান্দীর লক্ষণ (৫, ২৫) দিয়াছেন—
আশীর্ব্বচনসংযুক্তা নিত্যং যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা॥

গ্রথিত শৃঙ্গার-রস-সংযুক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া সূত্রধার জর্জ্জর ধারণ করিয়া 'বিলাসবিচেষ্টিত' প্রদর্শন করিয়া পঞ্চপদ অগ্রসর হইবেন। এই ক্রিয়াবিশেষের নাম 'চারী'। পারিপার্শ্বিকের হস্তে জর্জ্জর ন্যস্ত করিয়া দ্রুত-লয়ান্বিত, ' ত্রিতালোৎক্ষিপ্ত, রৌদ্ররসসংযুক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া পশ্চাদ্‌দিকে পঞ্চপদ গমন করিবেন। ইহার নাম 'মহাচারী'। ইহার পরে প্ররোচনা।

প্ররোচনা।

ইহাতে শ্রোতৃবর্গকে আমন্ত্রণ করা হইবে ও কাব্যবস্তু (Plot) নিরূপণ করা হইবে। তৎপরে সূত্রধার পারিপার্শ্বিকদ্বয়ের সহিত প্রস্থান করিবেন।

পূর্ব্বরঙ্গ অতিবিস্তৃত করিতে নাই। পূর্ব্বরঙ্গ অতি-বিস্তৃত হইলে প্রেক্ষক ও প্রযোক্তার খেদ উপস্থিত হইতে পারে ; ইহারা বিরক্ত হইলে নাটকের অভিনয় ভাল হয় না। পূর্ব্বভাগ অতিরঞ্জিত করিলে শেষ ভাগে আর মাধুর্য্য রক্ষা করিতে পারা যায় না। *

স্থাপক।

সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক প্রস্থান করিলে 'স্থাপক' রঙ্গপীঠে প্রবেশ করিয়া নানা তাললয়ান্বিত সুমধুর বাক্যে প্রেক্ষকগণের প্রসাদ উৎপাদন করিয়া কবির নাম খ্যাপন করিবেন এবং নাটকের আরম্ভজ্ঞাপনরূপ প্রস্তাবনা করিয়া প্রস্থান করিবেন। ইহার পরে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইবে। †

নাটকীয় পরিভাষা।

ভরত নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই নাটকীয় রস, ভাব, সংগ্রহ, কারিকা, নিরুক্ত, ও নিঘণ্টুর পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—নাট্যশাস্ত্রের অন্তদর্শন সম্ভব নহে ; কেননা, শিল্পকলার ন্যায় ভাব প্রভৃতিও অনন্ত। সূত্রাকারে সঙ্ক্ষেপে আমি ভাব রস প্রভৃতির উপদেশ করিব। এই সূত্রাকার গ্রন্থই ৩৭।৩৮ অধ্যায়ব্যাপী নাট্যশাস্ত্র।

রস—আট প্রকার।

শৃঙ্গার-হাস্য-করুণা-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞাশ্চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥

ভাব তিন প্রকার—স্থায়ী, সঞ্চারী ও সাত্বিক।

অভিনয় চারি প্রকার—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্বিক।

বৃত্তি চারি প্রকার—ভারতী, সাত্বতী, কৌশিকী ও আরভটী।

প্রবৃত্তি চারি প্রকার—আচণ্ডী, দাক্ষিণাত্যা, অর্দ্ধ-মাগধী ও পাঞ্চালী (পঞ্চালমধ্যমা)।

নানা নামাশ্রয়োৎপন্নং নিঘণ্টুং নিগমান্বিতম্।
ধাত্বর্থহেতুসংযুক্তং নানাসিদ্ধান্তসাধিতম্ ॥

ইহার নাম নিঘণ্টু।

স্থাপিতোঽর্থো ভবেদ্‌যত্র সমাসেনার্থসূচকঃ।
ধাত্বর্থবচনেনেহ নিরুক্তং তৎ প্রচক্ষতে ॥

অন্যান্য নাট্যাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তানুসারে যে শব্দতালিকা গঠিত, যে-সকল শব্দের অর্থ লইয়া মতদ্বৈধ ছিল সেই শব্দসমষ্টির নাম নিঘণ্টু এবং যে-সকল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না সেই শব্দসমষ্টির নাম হইল নিরুক্ত।

সিদ্ধি দুই প্রকার—দৈবী ও মানুষী।

আতোদ্য চারি প্রকার—তত, অবনদ্ধ, ঘন ও সুষির।

গান পঞ্চবিধ—প্রবেশক, আক্ষেপক, নিষ্ক্রামক, প্রাপ্ত ও ধ্রুবাযোগ।

এইরূপ আরও নানা পারিভাষিক শব্দের পরিচয় নাট্য-শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে রস ও ভাব প্রকাশের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৮মে উপাঙ্গাভিনয়, ৯মে অঙ্গাভিনয়, ১০মে চারীবিধান, ১২শে যতিপ্রচার, ১৩শে করমুক্তি, ১৪শে ছন্দোবিধান, ১৫শে ছন্দের নানা প্রকার বৃত্ত, ১৬শে অভিনয়ের অলঙ্কার, ১৭শে বাগাভিনয়, ১৮শে লাস্য, ২৩শে নেপথ্যবিধান—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিনয়াদির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পূর্ব্বে বহু নাট্য-শাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল, তাহা ভরতের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। শুধু ভরতের সুবৃহৎ নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়-গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে 'নাট্যশাস্ত্র' রচনার পূর্ব্বেই সংস্কৃত নাটকের সম্পূর্ণ পরিণতি হইয়াছিল।

---

* ৫ম অধ্যায় ১৪৬-১৪৮।

† ৫ম—১৫০—১৫৪।

সংস্কৃত নাটকের বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণতি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পূর্ব্বরঙ্গে সূত্রধার পারিপার্শ্বিকদ্বয়ের সহিত কথোপকথনচ্ছলে নাটকের 'প্ররোচনা' করিবেন এবং পরে "স্থাপক" নাটকের আরম্ভদ্যোতকরূপ স্থাপনা করিবেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে পূর্ব্বরঙ্গ অতিবিস্তৃত হইবে না। সাধারণতঃ যে-সকল সংস্কৃত নাটক আমরা দেখিতে পাই তাহাতে প্রথমেই নান্দী-পাঠ হইয়া থাকে, পরে সূত্রধার অন্য দুই এক জন পাত্র বা পাত্রীর সহিত কথোপকথনচ্ছলে নাটকের প্রস্তাবনা করেন; স্থাপকের প্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না; নাটকের উপোদ্‌ঘাত অংশ প্রস্তাবনা নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বরঙ্গ পাছে অতিবিস্তৃত হইয়া পড়ে এইজন্যই বোধ হয় নাট্যকারগণ পূর্ব্বরঙ্গের যাবতীয় অভিনয় [চারী, মহাচারী ইত্যাদি] সঙ্কুচিত করিয়া, প্ররোচনা ও স্থাপনা একত্র মিশাইয়া "প্রস্তাবনা" করিয়া থাকেন। কালিদাসের শকুন্তলা হইতেই আমরা দৃষ্টান্ত উদ্ধার করি।—

নান্দী—যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা ইত্যাদি।

[শকুন্তলায় কোন প্রকার পূজার কোন প্রসঙ্গ নাই; পূজা হইত কি না নিশ্চিত বলা সুকঠিন। হয়ত পূজা হইত, পূজা নাটকের অন্তর্গত নহে বলিয়া তাহার উল্লেখ নাই। উত্তরচরিতে—"কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়াং" কথার উল্লেখ আছে। হয়ত পূজার কোন প্রকার আয়োজন হইত।]

প্ররোচনা—পরিষদের অভ্যর্থনা ইঙ্গিতে করা হইয়াছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' এই শব্দে নাটকের বস্তু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

স্থাপনা—"কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা" দ্বারা সূত্রধার কবির নাম নির্দ্দেশ করিয়াছে। পরে নটীর গীতমাধুর্য্যে মোহিত হইয়া নাটকের পরিচালনরূপ স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়াছে। ইহার দ্বারা, দুষ্মন্তের প্রতি অনুরাগবশতঃ শকুন্তলার তপোবনের কর্ত্তব্যে ত্রুটি নির্দ্দেশ করিয়া নাটকের আখ্যানভাগ জ্ঞাপন করিতেছে। পরে "তবাস্মি গীতরাগেন" ইত্যাদি শ্লোকে নাটকের আরম্ভ নির্দ্দেশ করিয়া সূত্রধার প্রস্থান করিল।

এইজন্য সমস্ত উপোদ্‌ঘাতটি প্রস্তাবনা নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে প্ররোচনা বা স্থাপনার পৃথক্ নির্দ্দেশ নাই। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের অনুগ্রহে "ভাস" কবির যে-সমুদায় নাটক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রস্তাবনার পরিবর্ত্তে "স্থাপনা"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাস কবি কালিদাসের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী (৪র্থ শতাব্দী খৃঃপূঃ বা তৎপূর্ব্ব); তাঁহার নাটকে নান্দীর শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। নান্দী পাঠ যে হইত তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কেননা তাঁহার নাটকের প্রথমেই "নান্দ্যন্তে" কথাটি দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাস কবির "স্বপ্নবাসবদত্তা"র আরম্ভ এইরূপ ;—

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)
সূত্রধারঃ। উদয়নবেন্দুসবর্ণাবাসবদত্তাবলৌ বলস্য ত্বাম্ :
পদ্মাবতীর্ণপূর্ণৌ বসন্তকম্রৌ ভুজৌ পাতাম্॥

পরে—

সূত্রধারঃ। ভৃত্যৈর্মগধরাজস্য স্নিগ্ধৈঃ কন্যানুসারিভিঃ।
ধৃষ্টমুৎসার্য্যতে সর্ব্বস্তপোবনগতো জনঃ॥

এই শ্লোকে নাটকের প্রথম দৃশ্যের ঘটনার সূচনা করিয়া সূত্রধার "নিষ্ক্রান্ত" হইল। ইহাই হইল "স্থাপনা"।

ভাস কবির যে কয়খানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে সকলগুলিরই আরম্ভে "নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ" এবং উপোদ্‌ঘাতের শেষে "স্থাপনা" এই শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থে "নান্দী" লিখিত না থাকা এবং সূত্রধার কর্ত্তৃক নাটকের আরম্ভ, ইহা ভাসের বিশেষত্ব। সেইজন্য "বাণভট্ট" হর্ষচরিতের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—

সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥

স্থপতি দ্বারা গঠিত বহুভূমিক পতাকাশোভিত দেবমন্দির নির্ম্মাণের ন্যায় সূত্রধারকৃতারম্ভ বহুপাত্রযুক্ত ও বহুসন্ধিসমন্বিত নাটক রচনার দ্বারা ভাস কবি (প্রভৃত , যশোলাভ করিয়াছেন।

নাট্যশাস্ত্রে আমরা তদানীন্তন নাটকের যে পরিচয় পাই তাহার উপোদ্‌ঘাত-অংশমাত্র পরবর্ত্তী নাটকে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রস্তাবনারূপে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য অংশের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। নৃত্য যে পরবর্ত্তী নাটকেও অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার নিদর্শন আমরা "মালবিকাগ্নিমিত্রে" দেখিতে পাই। শকুন্তলা

নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়—হংসপদিকা (একজন রাজ্ঞী) গান অভ্যাস করিতেছেন। বিদূষক রাজাকে বলিতেছেন—ভো বঅস্‌স, সংগীদসালন্তরে অবহাণং দেহি। কলবিসুদ্ধাএ গীদীএ সরসংজোও সুনীঅদি। জাণামি তত্তহোই হংসপদিআ বণ্ণপরিচঅং করই ত্তি।* বয়স্য সঙ্গীতশালার প্রতি মনোযোগ কর। মধুর বিশুদ্ধ গীতের স্বরসংযোগ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয় দেবী হংসপদিকা বর্ণাভ্যাস† করিতেছেন।

পৃথিবীতে নাটকের প্রচার।

এক্ষণে দেখিতে হইবে দ্যুলোকবাসী ভরতের নাট্যগ্রন্থ ও তাঁহার প্রচারিত নাটক পৃথিবীতে কিরূপে আসিল। ভরত বলিয়াছেন—তিনি তাঁহার নাটকের প্রয়োগ স্বর্গেই করিতেন; দেবগণ বিদ্যাধরগণ ও অপস্‌রোগণ তাঁহার নাটকের অভিনয় করিত। ক্রমে তাঁহার অভিনেতৃগণ স্বয়ং দক্ষ হইয়া নাটকাদি রচনা করিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহারা এমন নাটক রচনা করিলেন যাহাতে ঋষিগণ অপমানিত বোধ করিয়া শাপ দিলেন যে, অভিনেতৃগণ শূদ্রাচারী হইবেন ও নাট্যশাস্ত্ররূপ কুজ্ঞান বিনষ্ট হইবে (নাট্যশাস্ত্র ৩৬ অধ্যায় ২৩।২৪)। তখন ভরত ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে লইয়া ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিধ 'অনুনয় বিনয়' করিলেন। ঋষিগণ দ্বিতীয় শাপের প্রত্যাহার করিলেন, প্রথম শাপ পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিল।

ইহার কিছুকাল পরে নহুষ রাজা স্বর্গজয় করিলেন ও স্বর্গীয় নাট্য দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে তাঁহার রাজধানীতে এই নাটকের প্রয়োগ করা যায়। তিনি ভরতকে বলিলেন—

ইদমিচ্ছামি ভগবন্নদ্যমুর্ব্ব্যাং (?) প্রবর্ত্তিতম্।
(৩৭ অধ্যায় ৮ শ্লোক)

ভরত স্বীয় পুত্রগণ ও শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বুঝাইলেন—

> অয়ং হি নহুষো রাজা যাচতে নঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
> গম্যতাং সহিতৈর্ভূমিং প্রযোক্তুং নাট্যমেব হি ॥১৪॥
> করিষ্যামশ্চ শাপান্তমস্মিন্ সম্যক্ প্রয়োজিতে ॥১৫
> ব্রাহ্মণানাং নৃপাণাং চ ভবিষ্যথ ন কুৎসিতাঃ।
> তত্র গত্বা প্রযুজ্যন্তাং প্রয়োগা বসুধাতলে ॥

—শাপান্ত হইবার আশায় সকলে পৃথিবীতে গমন করিলেন। নহুষের রাজ্যে দিব্য অভিনেতৃগণ নাটকের অভিনয় করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন। স্বর্গে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে ইহাঁরা পৃথিবীতে নিজেদের পুত্রগণকে রাখিয়া গেলেন। তাঁহাদের সেইসকল পুত্র পৃথিবীতে নাটকের প্রচার করিল। ভরত স্বয়ং পৃথিবীতে আসেন নাই, শিষ্য কোলাহলকে (১৮) পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই কোলাহল বা কোহেল প্রমুখ বৎস শাণ্ডিল্য ও ধূর্ত্তিল নাট্যশাস্ত্রের প্রযোক্তা। যেমন মনুসংহিতা ভৃগুপ্রোক্ত, সেইরূপ "ভারতীয়" নাট্যশাস্ত্র কোহেলাদি-প্রোক্ত।

পূর্ব্বতন নাট্যকারগণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যক শ্লোকে ভরত বলিতেছেন—

> এবমেষোঽল্পসূত্রার্থো নির্দ্দিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ।
> অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সূত্রগ্রন্থবিকল্পনম্ ॥

এই নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থখানি অন্যান্য নাট্যগ্রন্থের সংগ্রহ মাত্র। ইহার পূর্ব্বে আরও অনেক নাট্যশাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল, আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারি। পাণিনি (খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০—গোল্ডষ্টুকার) ৪।৩।১১০,১১১ সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে শিলালি ও কৃশাশ্ব নামে দুইজন নাট্যসূত্রগ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রণীত নাট্যসূত্র জনসমাজে সমধিক প্রচলিত ছিল।*

---

* নাট্যশাস্ত্রের ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† বর্ণ—আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী ও সঞ্চারী এই চারি বর্ণ। ২৯ অধ্যায় ১৭।১৮।১৯

> আরোহী চাবরোহী চ স্থায়িসঞ্চারিণৌ তথা।
> বর্ণাশ্চত্বার এবৈতে হ্যলঙ্কারাস্তদাশ্রয়াঃ ॥
> আরুহন্তি স্বরা যত্র তদ্ধি আরোহী সংজ্ঞিতঃ।
> যত্র চৈবাবরোহী চ সোঽবরোহীতি ভণ্যতে ॥
> স্থিরাঃ স্বরাঃ সমা যত্র স্থায়ী বর্ণঃ স উচ্যতে।
> সঞ্চরন্তি স্বরা যত্র স সঞ্চারীতি কীর্ত্তিতঃ ॥

* ৪।৩।১১০ পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ পারাশর্য্যেণ প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রমধীয়তে পারাশরিণো ভিক্ষবঃ। (শিলালিনা প্রোক্তং নটসূত্রমধীয়তে) শৈলালিনো নটাঃ। ভট্টোজি ৪।৩।১১১ কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ—ভিক্ষুনটসূত্রয়োরিত্যেব। কর্ম্মন্দেন প্রোক্তমধীয়তে কর্ম্মন্দিনো ভিক্ষবঃ; (কৃশাশ্বেন প্রোক্তমধীয়তে) কৃশাশ্বিনো নটাঃ।—ভট্টোজি।

নাট্যশাস্ত্রের আদর যে বহু প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নাট্যকারগণের প্রভাব।

মনুর সময়ে নাট্যকারগণের প্রভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল ও সমাজে বোধ হয় কোনরূপ অনিষ্ট হইতেছিল। সেইজন্য নাট্যব্যবসায়ীদের জন্য সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে মনু বাধ্য হইয়াছিলেন। মনুর ব্যবস্থায় (তৃতীয় অধ্যায় ৫৫ শ্লোক) কুশীলব (নাটকীয় পাত্র) অপাংক্তেয়; শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ইঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হইবে না। (৪র্থ অধ্যায় ২১৪ শ্লোক)—শৈলুষ (নট)-প্রদত্ত অন্ন ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিবেন না। (৪র্থ অধ্যায় ২১৫ শ্লোক)—রঙ্গাবতারকপ্রদত্ত অন্ন ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিবেন না। [রঙ্গাবতারকস্য 'নটগায়নব্যতিরিক্তস্য রঙ্গাবতারণজীবিনঃ'—কুল্লুকভট্ট; অভিনয় করা যাহাদের পেশা তাহারা রঙ্গাবতারক] (৮ম অধ্যায় ৬৫ শ্লোক)—কুশীলবের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। ৮ম অধ্যায়ের ৩৬২ শ্লোকে মনু আরও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মনুসংহিতা অপেক্ষাও প্রাচীনতর গ্রন্থে [কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—৩০০ খৃঃপূ] রঙ্গালয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের সময়ে কুশীলবগণ এক প্রবল জাতি হইয়াছিল। তিনি ইহাদিগকে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইঁহার সময়েও "রঙ্গোপজীবী" পুরুষ ও রঙ্গোপজীবিনী "গণিকা"র অস্তিত্ব ছিল *। ইহাদের সম্বন্ধেও কৌটিল্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের একটি প্রকরণের নাম "গণিকাধ্যক্ষ।" প্রাচীনকালে নাটক সমাজের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার নিদর্শন অন্যান্য গ্রন্থেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভরতের নাট্যশাস্ত্ররচনার কাল।

প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে কর্ণেল আউসলি সরগুজায় রামগড় পর্ব্বতে দুইটি বিচিত্র গুহার আবিষ্কার করেন। দুইটিতেই শিলালিপি উৎকীর্ণ ছিল। এ লিপি অশোক-প্রচারিত অক্ষরে লিখিত। শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে ইহা কোন ঐতিহাসিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় "শাসন" নহে। ডাক্তার ব্লক্ (Dr. Bloch) এই গুহাদ্বয় দেখিতে যান ও শিলালিপি দেখিয়া ইহা নাট্যসম্বন্ধীয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

শিলালিপির 'লুপদখে' শব্দ তিনি "অভিনয়-কুশল" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। একটি গুহার মধ্যে তিনি একটি রঙ্গালয় দেখিতে পান। চিত্রাবলী অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে; প্রেক্ষকগণের উপবেশনের আসন সোপানাকৃতিভাবে গঠিত; দৃশ্যপট ঝুলাইবার জন্য বংশদণ্ড রক্ষা করিবার গর্ত্ত প্রাচীরগাত্রে এখনও দেখা যায়। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ রঙ্গালয় Dr. Bloch দেখিতে পান। * Dr. Bloch বলেন অন্ততঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে উক্ত রঙ্গালয় নির্ম্মিত ও শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। †

নাট্যশাস্ত্রের ২১ অধ্যায়ের ৮৮।৮৯ শ্লোকে লিখিত আছে—

> কিরাতবর্ব্বরান্ধ্রাশ্চ দ্রবিড়াঃ কাশিকোশলাঃ।
> পুলিন্দা দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রায়েণ ত্বসিতাঃ স্মৃতাঃ॥
> শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পাহ্লবা বাহ্লিকাশ্রয়াঃ।
> প্রায়েণ গৌরাঃ কর্ত্তব্যাঃ—

কিরাত ও দাক্ষিণাত্য জাতি প্রভৃতি যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবে তখন তাহারা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইবে। শক, যবন, পাহ্লব ও বাহ্লীকগণ গৌরবর্ণে রঞ্জিত হইবে। শক = Scythians; যবন = Ionians; পাহ্লব = Parthians; বাহ্লীক = Bactrians। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোক—

> পুণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
> পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাস্তথা॥

ইহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পহ্লব = Pahlav (Iranian নাম) = Parthava সংস্কৃত = Parthians. অধ্যাপক Noldeke বলেন খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে পহ্লব শব্দের

* কৌটিল্য—অর্থশাস্ত্র ২,২৭। ১৯০৯ সালের Asiatic Societyর Journalএর "অক্টোবর" সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

* Archaeological Annual Vol 2. Dr. Blochএর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের মতও (প্রবাসী কার্ত্তিক, ১৩২১) বিচার্য্য।—প্রবাসীর সম্পাদক।

† Asiatic Societyর Journal Vol V. No. 9, 1909 মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "নাটক" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উৎপত্তি হয় নাই। এই যুক্তির বলে তিনি মনুসংহিতাকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছেন। খৃষ্টীয় ২১-২২ অব্দে উৎকীর্ণ রুদ্রদামের গীর্ণার শিলালিপিতে পহ্লব শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার বহু বর্ষ পূর্ব্বে নিশ্চয়ই পার্থিয়ানরা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। * (Dr. Buhler) ডাক্তার বুহ্লারের মতে মনুসংহিতা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। এই মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের পহ্লব শব্দে পার্থিয়ানদের পরিচয় পাই। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে পহ্লব শব্দ পার্থব বা পাহ্লব শব্দের রূপান্তর মাত্র। একই শব্দের এই রূপান্তর ঘটিতে নিশ্চয়ই কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রে শব্দটি 'পাহ্নব' রূপেই পাওয়া যায়। ইহা হইতে বোধ হয় যে, নাট্যশাস্ত্র খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই বা তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল। প্রায় এই সময়েই রামগড়ের পর্ব্বতগুহাস্থিত 'রঙ্গালয়' নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নাট্যশাস্ত্র যে বহুপ্রাচীন তৎসম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ এই—যখন নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে তখন কষায়বসন-পরিহিত ভিক্ষু বা শ্রমির্ণদিগকে (শ্রমণ?) সে স্থানে যাইতে দেওয়া হইবে না। † বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাবের নিদর্শন নাট্যশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু ২য় অধ্যায়ের ৪০ শ্লোক দেখিয়া অনুমিত হয় যে নাট্যশাস্ত্র রচনার সময়েও বৌদ্ধপ্রভাব একেবারে প্রশমিত হয় নাই; লোকে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান পরিপোষক মহারাজ অশোকের মৃত্যু হয় ২৩১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে। ১৮৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পুষ্যমিত্র (পুষ্পমিত্র) মৌর্য্যবংশের উচ্ছেদ করেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে একটি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ‡ তখন রাজসহায়তায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনরায় সদর্পে মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে। ইহার কিছু পূর্ব্বে নাট্যশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

আমরা দেখিয়াছি ইন্দ্রধ্বজ বা জর্জ্জরের পূজা হইতে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি। জর্জ্জর নাটকের নিদর্শন-স্থানীয় হইয়াছে। বর্ষাকাল অতীত হইলে যখন আকাশ নির্ম্মল হয় তখন লোকে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া আকাশ নির্ম্মুক্ত করিয়া থাকেন বলিয়া পুরাকালে সকল লোক বোধ হয় তাঁহার পূজার আয়োজন করিত ও তাঁহার উদ্দেশে ইন্দ্রধ্বজ প্রোথিত করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিত। বিলাতের May pole কতকটা এই রকমের। এখনও নেপালে ইন্দ্রযাত্রা নেপালবাসীদের প্রধান উৎসবরূপে গণ্য। তাঁহারা ইন্দ্র-ধ্বজ প্রোথিত করেন না বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ইন্দ্রের ঊর্দ্ধবাহু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন ও নৃত্যগীতে মত্ত হন। সেই নৃত্যগীতের সহিত নানাবিধ হাবভাবমিশ্রিত অভিনয়ের আয়োজনও থাকে। বহুকালের পুরাতন উৎসব এখনও এইভাবে জীবিত রহিয়াছে। ইহা ভারতের নিজস্ব। * যাঁহারা মনে করেন যে, গ্রীকদের নিকট আমরা নাট্যকলা শিক্ষা করিয়াছি, তাঁহারা বোধহয় বুঝিবেন যে বহুপ্রাচীনকাল হইতেই, এমন কি পাণিনির বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতে নাট্যকলা আদৃত হইয়া আসিতেছে। আমরা একখানি 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থ এখন দেখিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে নাট্যসম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্র তাহাদের সংগ্রহমাত্র। †

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

* খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে Parthianরা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—Vincent Smith.

† উৎপার্ষাদানি ব্রনিষ্টানি পাষণ্ডা শ্রমিণস্তথা।
কষায়বসনাশ্চৈব বিকলাশ্চৈব যে নরাঃ॥
—নাট্যশাস্ত্র ২য় অধ্যায় ৪০।

‡ মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পঞ্চম অঙ্কে এই রাজসূয় যজ্ঞের উল্লেখ আছে। অগ্নিমিত্র পুষ্পমিত্রের পুত্র।
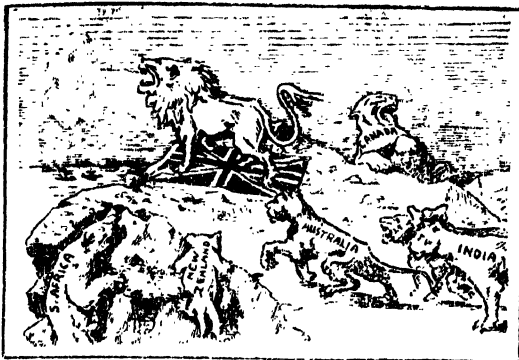
* Herr Nieseর মত ও তাহার খণ্ডন Vincent Smithএর Early History of Indiaতে দ্রষ্টব্য। Macdonell's History of Sanskrit Literature pp. 415-416 দ্রষ্টব্য।

† এই প্রবন্ধ রচনার সময় নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি—

(১) ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র।
(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "নাটকের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ। (Asiatic Society's Journal 1909. Oct.)
(৩) Dr. Buhler's Manu. (Sacred Books of the East)
(৪) ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের অনুগ্রহে প্রকাশিত ভাসকবির নাটক।
(৫) Monier Williams' Dictionary (New Ed)
(৬) হলায়ুধ—অভিধানরত্নমালা।
(৭) V. Smith—Early History of India. ইত্যাদি।

য়ুরোপীয় যুদ্ধের ব্যঙ্গচিত্র।

পশুরাজের আহ্বানে প্রজাগণ সমবেত হইয়াছে।

—ডেলি প্রভিন্স (ভ্যাঙ্কুবার)।

আ[illegible] বর্তমান নীতি—"খৃষ্টান সভ্যতা ধ্বংস কর"।

—ডেলি নিউস (শিকাগো)।

নির্লিপ্ত ভাবুক

বসিয়া বসিয়া যুধ্যমান সৈন্যদের প্রাধান্য লাভের দুশ্চেষ্টা
লক্ষ্য করিতেছে। এবং পরিণামে তাহাকেই যে সমস্ত দুর্ভোগ
ভোগ করিতে হইবে তাহাই ভাবিতেছে।

ত্রয়ী (মৃত্যু, ধ্বংস ও দুর্ভিক্ষ)।

— স

"খোদার কশম! আদমির উপর এমন জুলুম! হয়ত আমার উদাসীন থাকা চলবে না।"

খাটোদৃষ্টি অষ্ট্রীয়া
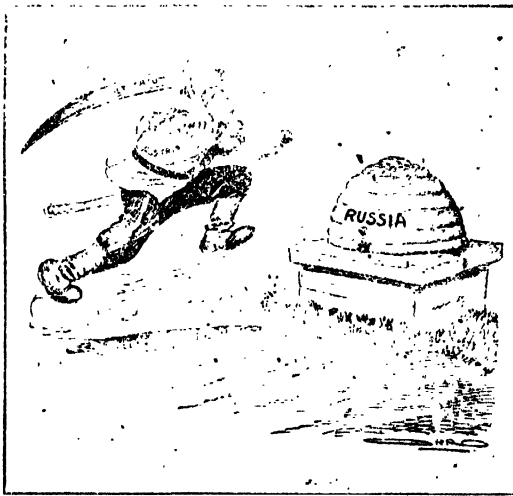
"হুল-ফোটানোর মজাটি টের পাইয়ে দেবো।" বলিয়া সার্ভিয়া-বোলতাকে মারিতে গিয়া রাশিয়ার মৌচাকে আঘাত করিতে যাইতেছে।

—টেনেসিয়ান (ন্যাশভিল)।

যুদ্ধের নির্লিপ্ত দর্শক শোক, দুঃখ, অনাহার ও দারিদ্র্য।

—ট্রাভেলার (বষ্টন)।

সখীত্ব।

"সখী ইটালী, এস এস বুকে এস।"

"রোসো, তোমার রকম দেখে মনে হচ্ছে আমার পোষাকটা বদলে নিতে হবে।"

—ফিসকিয়েত্তো (তুরীন)।

যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের উনিশ শতাব্দী পরে।

—ঈগল (ব্রুকলীন)।
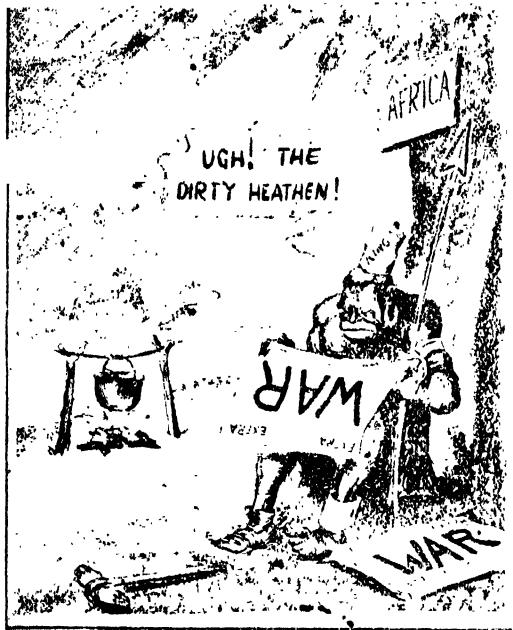
আফ্রিকার অসভ্য রাজা যুরোপের সুসভ্য জাতিদের বর্ব্বরতা দেখিয়া শিহরিতেছে।

—ষ্টার (সেণ্ট লুই)।

যুদ্ধের আহ্বান।

—লেজার (ফিলাডেলফিয়া)।

পৃষ্ঠপোষক।

যুদ্ধ ঘোষণার মুখে অষ্ট্রীয়া—সার্ভিয়ার রকমটা ভালো ঠেকছে না। নিশ্চয় কেউ পৃষ্ঠপোষক আছে।

—পাঞ্চ (লণ্ডন)।

মৃত্যুর আশীর্ব্বাদ!

"বৎসগণ, তোমাদের কল্যাণ হোক্‌!"

—ঈগল্‌ (ব্রুকলীন)।

যুরোপযাত্রী।
—ষ্টেট জার্নাল (উইস্‌কন্সিন)।

জন্মান্তরবাদ

'জগতে বৈষম্য কেন?' ইহা মীমাংসা করিবার জন্য অনেকে জন্মান্তরবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমরা প্রথম প্রবন্ধে এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

আত্মার পুনর্জ্জন্ম সম্ভব কিনা—ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পুনর্জ্জন্ম ও আত্মার একত্ব।

মনে কর 'শনি' নামক একজন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল! তাহার মৃত্যুর পর রবি নামক একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে। কেহ যদি বলিতে চাহেন যে শনিই রবি হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে শনি ও রবি একই ব্যক্তি। এই একত্ব প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে নির্ণয় করা যায়।

(১) সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা অধিকাংশ স্থলে দুই বস্তুর একত্ব নির্ণয় করিতে পারি।

(২) আত্মজ্ঞান দ্বারাও আমরা আপনাদিগের আত্মার একত্ব বুঝিয়া থাকি।

(১) সাদৃশ্যে একত্ব প্রমাণ।

আমরা প্রথমে সাদৃশ্যমূলক যুক্তির সাহায্যে পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিব।

প্রথম দৃষ্টান্ত।

মনে কর 'ন' নামক একটি নদী প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে উৎপত্তিস্থলে ইহা অবশ্যই অগভীর এবং অপ্রসর। এই নদী ১০ মাইল প্রবাহিত হইয়া এমন একস্থলে উপস্থিত হইল যে-স্থলে ইহা পরিসর এক মাইল এবং গভীরতা ৫০ হস্ত। এইস্থলে অকস্মা সমুদয় নদীটি জমিয়া বরফ হইয়া গেল। সুতরাং ইহার গতি নিরুদ্ধ হইল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সমুদয় বরফ একবারে এ নিমেষে গলিয়া গেল। নদীর বেগ যেস্থলে নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থল হইতেই নদী আবার পূর্ব্বের ন্যায় বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এমন ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল, যেন নদী কখন বরফে পরিণ হয় নাই এবং ইহার বেগও যেন নিরুদ্ধ হয় নাই। ঐ যে কয়ে ঘণ্টা নদী বরফ হইয়া বসিয়া ছিল উহা যেন নদীর বিশ্রাম বা নিদ্রা বিশ্রামের পূর্ব্বের নদী, ও বিশ্রামের পরের নদী একই নদী। এবিষে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। এবং কেহ কখন সন্দেহও করিবে না আর নদীর আত্মজ্ঞান থাকিলে নদী নিজেও ইহা বুঝিতে পারিত।

আমাদিগের নিদ্রার দৃষ্টান্তও গ্রহণ করিতে পারি। আমাদিগে আত্মাও যেন একটি নদী। জন্মের সময় ইহা অপ্রসর ও অগভীর এই আত্মা-নদী যতই অগ্রসর হইতেছে ততই ইহার প্রসার গভীরতা বৰ্দ্ধিত হইতেছে। নদী যেমন কিছুক্ষণ নিরুদ্ধ ছিল, আত্মা গতিও তেমনি নিদ্রার সময় নিরুদ্ধ থাকে। তুষাররূপ বিশ্রাম করি সেই পূর্ব্বের নদীই যেমন পূর্ব্বের ন্যায় বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে নিদ্রার পরও সেই পূর্ব্বের মানবই আবার পূর্ব্বের ন্যায় বেগে অগ্রস হইতে থাকে। বিশ্রামে নদীর একত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই নিদ্রাতেও মানবাত্মার একত্বের হানি হয় নাই। তুষার হইবা পূর্ব্বের নদী ও তুষার হইবার পরের নদী যেমন একই নদী, তেমি নিদ্রার পূর্ব্বের আত্মা এবং নিদ্রার পরের আত্মা একই আত্মা। যে স্থলে নদীর বেগ নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সে স্থলে ইহার প্রসার ছিল এক মাইল এবং গভীরতা ছিল ৫০ হস্ত। বিশ্রামের পর নদী যখ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল সে স্থলেও নদীর প্রসার এক মাইল এব গভীরতা ৫০ হস্ত। নিদ্রার পূর্ব্বে আত্মা যে প্রকার গভীর ও বিস্তৃ ছিল, নিদ্রার পরেও আত্মার গভীরতা ও বিস্তৃতি সেই প্রকারই ছিল এই ভাবে নদী যদি ক্রমাগতই বিস্তৃত ও গভীর হইয়া অগ্রসর হ তবেই আমরা বলিতে পারি সেই নদী বৰ্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে আত্মাও যদি এইরূপে ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিয়া অগ্রসর হয়, তাহ হইলে আমরা বলিতে পারি আত্মার ক্রমোন্নতি হইতেছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

ঐ নদীর দৃষ্টান্তই একটুকু পরিবর্ত্তিত করিয়া গ্রহণ করা যাউক মনে কর নদীটির নাম 'ন'। এই নদী ১০০ মাইল প্রবাহি হইয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল। যে স্থলে ইহা অন্তর্হি হইল সে স্থলে ইহার প্রসার এক মাইল ও গভীরতা ৫০ হস্ত ইহার পর 'না' নামক একটি নদী আবির্ভূত হইল। উৎপত্তি সময়েই ইহার গভীরতা ৫০ হস্ত এবং বিস্তৃতি ১ মাইল। 'ন নদীর জল যে প্রকার ছিল, 'না' নদীর জলও ঠিক সেই প্রকার অদৃশ্য হইবার সময় 'ন' নদী যে সমুদয় বৃক্ষলতাদি বহন করিয় আনিতেছিল, এই নূতন নদীর বক্ষেও ইহার আবির্ভাব হইবার সময়েই সেই সমুদয় বৃক্ষলতাদি দৃষ্টিগোচর হইল। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে ঐ 'ন' নদীর সহিত এই 'না' নদীর কি সম্বন্ধ? প্রায় সকলেই বলিবেন 'ন' নদীই আবার 'না' নদীরূপে

পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত এবিষয়ে সন্দেহও করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন "উভয় নদীর মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে; সাদৃশ্য থাকিলেই যে উভয় নদী এক হইবে তাহার প্রমাণ কি? 'এক প্রকার' হইলেই 'এক' হয় না; সাদৃশ্য এবং একত্ব এক কথা নহে।" এ যুক্তির যে সারবত্তা নাই তাহা নহে; কিন্তু বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ে আমরা ধরিয়া লইলাম যে 'ন' নদী এবং 'না' নদী একই নদী।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত।

পূর্ব্বোক্ত নদীর দৃষ্টান্ত আরও একটুকু পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করা যাউক। মনে কর 'ন' নদী ১০০ মাইল প্রবাহিত হইয়া অকস্মাৎ বিলীন হইয়া গেল: কোথায় যে গেল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। যে স্থলে ইহা অন্তর্হিত হইল, সেই স্থলে ইহার গভীরতা ৫০ হস্ত ও প্রসার ১ মাইল। ইহার পর দেখা গেল যে পৃথিবীতে তিনটি নূতন নদী গিরিগহ্বর হইতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। একটির নাম 'সমা', আর একটির নাম 'জ্যেষ্ঠা', তৃতীয়টির নাম 'কনিষ্ঠা'। উৎপত্তির সময়ে তিনটির মধ্যে কোন পার্থক্য অনুভূত হইতেছে না। ইহাও বুঝা যাইতেছে না যে ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টি 'ন' অপেক্ষা বড় হইবে, কোন্‌টি ছোট হইবে, আর কোন্‌টি 'ন' নদীর সমান হইবে। এখানে জিজ্ঞাসা করি—'ন' নদীর সহিত এই তিনটি নদীর কি কোন একত্ব আছে? এ স্থলে কি কেহ বলিতে পারেন যে 'ন' নদীই 'সমা'-রূপে, বা 'জ্যেষ্ঠা'-রূপে বা 'কনিষ্ঠা'-রূপে উৎপন্ন হইয়াছে? জগতে বোধ হয় কোন বিবেচক লোকই বলিবেন না এই তিনটি ঝরণার মধ্যে একটি পূর্ব্বজন্মে 'ন' নদী ছিল।

উৎপত্তির পর এই তিনটি নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। কালে এই তিনটি নদীই 'ন' নদীর ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে তিরোহিত হইবার সময়ে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় 'সমা' নদী 'ন' নদীর সমান, 'জ্যেষ্ঠা' 'ন' অপেক্ষা বড় এবং 'কনিষ্ঠা' 'ন' অপেক্ষা ছোট ছিল। এই তিনটি নদীর সহিত 'ন' নদীর কোন সম্পর্ক বা একত্ব আছে কি না ইহাদিগের জন্মের সময়ে সে বিষয়ে কিছুই বুঝা যায় নাই। ইহাদিগের মৃত্যুর সময়ে আমরা ইহাদিগের বিষয়ে কিছু নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এখন কি কেহ বলিতে পারেন যে এই তিনটি নদীর সহিত 'ন' নদীর একত্ব বা অন্য কোন সম্পর্ক আছে কি না? এখনও আমরা কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখানেও সকলকে বলিতে হইবে—'ন' নদীর মৃত্যু হইয়াছে, আর সমা জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা এই তিনটি নূতন নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

আমরা তিনটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছি। প্রথম দৃষ্টান্তে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তুহিন হইবার পূর্ব্বে যে নদী প্রবাহিত হইতেছিল, তুহিনরূপ অপগত হইবার পরও ঠিক সেই নদীই প্রবাহিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছি 'ন' নদীই 'না' নদীরূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে আমরা দেখিয়াছি যে 'ন' নদীর সহিত সমা, জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা নদীর একত্ব বা কোন সম্পর্ক নাই।

আত্মা ও এই তিনটি দৃষ্টান্ত।

(ক)

এখন আত্মার ঘটনা গ্রহণ করা যাউক। মনে কর 'শনি' নামক একজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পর রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ—ইত্যাদি অনেক লোকের জন্ম হইল। তুহিন অপগত হইবার পর যে নদী প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই আমরা বলিয়াছিলাম—এ নদী 'ন' নদীই। সেই প্রকার এই সমুদয় লোকের মধ্যে এমন একজন লোকও কি আছে যাহাকে দেখিবা মাত্রই বলিতে পারি এ লোক 'শনি'ই? সকলেই বলিবেন জগতে এ প্রকার কোন লোক জন্মগ্রহণ করে নাই।

(খ)

'ন' নদী অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহার পর 'না' নদী আবির্ভূত হইল। এখানে আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছি যে 'ন' নদীই 'না' নদীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। 'না' নদীর ন্যায় এমন একজন লোকেরও কি আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাকে দেখিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে যে এ ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে শনিই ছিল? সকলেই বলিবেন জগতে এ পর্য্যন্ত এ প্রকার কোন্ লোকের জন্ম হয় নাই।

(গ)

জগতে প্রথম দৃষ্টান্তের অনুরূপ কোন লোক জন্মগ্রহণ করে নাই, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের অনুরূপ কোন ব্যক্তিও আবির্ভূত হয় নাই। যে-সমুদয় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা সমা, জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা নদীর ন্যায়। তিনটি লোক অনুসন্ধান করিয়া লওয়া যাউক যাহারা উক্ত তিনটি নদীর উপমেয় হইতে পারে। মনে কর রবি সমা নদীর অনুরূপ; সোমের উপমান জ্যেষ্ঠা এবং মঙ্গল কনিষ্ঠার সদৃশ। যখন রবি, সোম, মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিল, তখন কি কেহ ইহাদিগকে দেখিয়া বলিতে পারিবে যে ইহাদিগের মধ্যে একজন পূর্ব্বজন্মে শনি ছিল? যেস্থলে সাদৃশ্য আছে সেইস্থলেই সব সময়ে দুইটি বস্তুর একত্ব নিরূপণ করা যায় না; আর যেখানে সাদৃশ্য নাই, সেস্থলে ত একত্বের কথাই উঠিতে পারে না। শনি যেপ্রকার অবস্থা লাভ করিয়া মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছিল, কোন নবপ্রসূত সন্তানের কি সেইপ্রকার অবস্থা হইতে পারে? ইহার এমনই অবস্থা যে শনির সহিত ইহার কোনপ্রকার সাদৃশ্যই থাকিতে পারে না। সুতরাং শনির সহিত কোন শিশুর একত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

রবি, সোম ও মঙ্গলের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা গেল, তাহার পর দেখা গেল রবি প্রায় শনির সমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, সোমের উন্নতি শনির উন্নতি অপেক্ষা বেশী, এবং মঙ্গলের উন্নতি শনির উন্নতি অপেক্ষা কম। এখন কি কেহ সিদ্ধান্ত করিবেন যে শনি রবি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিংবা সোম হইয়া, কিংবা মঙ্গল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? সকলকেই বলিতে হইবে শনির সহিত রবি, সোম ও মঙ্গলের কোন একত্ব দেখা যাইতেছে না। সমা, জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠার বেলায় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, এ স্থলেও সেই সিদ্ধান্তই করিতে হইবে। যুক্তির পথ অবলম্বন করিলে ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

(ঘ)

কিন্তু মানবের প্রকৃতি অতি অদ্ভুত। অদৃশ্য জগৎ বিষয়ে মানুষের সবপ্রকার সিদ্ধান্তই সম্ভবে। একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন জগতে কখন উন্নতি হয় না, History repeats itself, জগৎ পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও সেই অবস্থাতেই আছে। ইহাঁদিগের মধ্যে যদি কেহ জন্মান্তরবাদী থাকেন, তিনি হয়ত বলিবেন, শনি মরিয়া রবি হইয়াছে, কারণ উভয়ের জীবন একই প্রকার। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, জগৎ দিন দিনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই মতের কোন জন্মান্তরবাদী বলিতে পারেন, শনি মরিয়া সোম হইয়াছে, কারণ সোমের জীবন শনির জীবন অপেক্ষা উন্নত। তৃতীয় এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহাদিগের বিশ্বাস জগৎ দিন দিনই অধোমুখে ধাবিত হইতেছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন পুনর্জ্জন্মবাদী থাকিলে তিনি বলিবেন, মঙ্গলই পূর্ব্ব জন্মে শনি ছিল, কারণ মঙ্গলের জীবন শনির জীবন অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই প্রকার সিদ্ধান্তের উপর আর যুক্তি চলে না। প্রকৃত পক্ষে পুনর্জ্জন্মের যুক্তি এই প্রকারই। যাহার যাহা খুসী সে তাহাই বলিতেছে। লোকে ত বলিতেছেই শিয়াল, কুকুর, ইঁদুর, বিড়াল, শকুনী, গৃধিনী, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, দানব, সকলেই মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করে এবং মানুষও মরিয়া এই-সমুদয় রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এ-সমুদয় মতের কোন ভিত্তি নাই; এবং যাহার ভিত্তি নাই, তাহাকে যুক্তি তর্ক দ্বারা ভিত্তিবিহীন করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নহে।

স্মৃতি ও আত্মার একত্ব।

সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা দুই বস্তুর একত্ব অনুমান করিয়া থাকি কিন্তু স্মৃতি দ্বারাই আমরা আত্মার একত্ব অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করিয়া থাকি। স্মৃতি যদি না থাকিত, আমরা আত্মার একত্ব বুঝিতে পারিতাম না। বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত চৈতন্য ও স্মৃতির বিষয়ে এই প্রকার বলিয়াছেন ঃ—

Consciousness signifies, above all, memory. The memory may not be very extensive ; it may embrace only a very small section of the past, nothing indeed but the immediate past ; but, in order that there may be consciousness at all, something of this past must be retained, be it nothing but the moment just gone by. A consciousness which retained nothing of the past would be a consciousness that died and was reborn every instant—it would be no longer consciousness . . . .

All consciousness, then, is memory ; all consciousness is a preservation and accumulation of the past in the present (Bergson's Huxley Lecture).

অর্থাৎ আমরা চৈতন্য বলিতে সর্ব্বোপরি স্মৃতিই বুঝি। এই স্মৃতি যে বহুবিস্তৃত হইবে তাহা নহে; অতীতের অতি অল্পঅংশ মাত্র—এইমাত্র যে-সময়টুকু চলিয়া গেল সেইটুকু মাত্র থাকিলেই যথেষ্ট। আমরা যাহাকে চৈতন্য বলি, তাহাতে অতীতের কিছু থাকা চাই; আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, এইমাত্র যে-সময়টুকু চলিয়া গেল, অন্ততঃ তাহারও কিছু ইহাতে থাকা আবশ্যক। যে চৈতন্যে অতীত কালের কিছুই থাকে না, তাহা প্রতি-নিমিষেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে এবং প্রতি-নিমিষেই উৎপন্ন হইতেছে; ইহাকে আর চৈতন্য বলা যায় না। তাহা হইলে স্মৃতিই হইল চৈতন্য। অতীত জীবনকে আহরণ করিয়া বর্ত্তমান জীবনে তাহা সঞ্চয় করাই চৈতন্যের একটি বিশেষ কার্য্য। মানব স্মৃতি দ্বারা পূর্ব্বমুহূর্ত্তের ঘটনা ও বর্ত্তমানমুহূর্ত্তের ঘটনার সংযোগ করিয়া থাকে এবং

এই সঙ্গে আত্মার একত্বও অনুভব করে। এই স্থলেই মানব-চৈতন্যের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই ক্যান্ট চৈতন্যকে Synthetic Unity of Apperception বলিয়াছেন। আমরা স্বীয় আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা জানি, ইহাও বুঝি যে এই-সমুদয় অবস্থা আমার আত্মারই। আত্মা স্বয়ং এই-সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সমন্বয় করিয়া থাকে। এই যে সমন্বয়কার্য্য ইহা আত্মারই কার্য্য। এই সমন্বয় স্মৃতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা যদি স্মৃতিতে না থাকে, তবে কাহার সঙ্গে কাহার সমন্বয় করিব ? অতীতে আমার এক অবস্থা ছিল, স্মৃতি এই অবস্থাকে অতীত কাল হইতে বর্ত্তমানকালে আনয়ন করে এবং তখন এই অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার সমন্বয় হইয়া থাকে। যদি স্মৃতি না থাকিত তবে আমাদিগের জীবনের আর একত্ব থাকিত না।

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। এক ব্যক্তি উপদেশ দিলেন "সদা সত্য কথা কহিবে।" এস্থলে চারিটি কথা উচ্চারণ করা হইল। মনে কর চারি জন লোক চারিটি কথা শ্রবণ করিল—

প্রথম শ্রোতা শ্রবণ করিল	"সদা"
দ্বিতীয় „ „ "	"সত্য"
তৃতীয় „ „ „	"কথা"
চতুর্থ „ „ „	"কহিবে"

এক একজন শ্রোতা কেবল এক একটি কথাই শ্রবণ করিল। সুতরাং প্রথম শ্রোতার সহিত দ্বিতীয় শ্রোতার কোন সম্বন্ধ নাই, দ্বিতীয় শ্রোতার সহিত তৃতীয় শ্রোতারও কোন সম্বন্ধ নাই, তৃতীয় শ্রোতার সহিতও চতুর্থ শ্রোতার কোন সম্পর্ক নাই এবং কোন শ্রোতার সহিতই কোন শ্রোতার কোন সম্পর্ক নাই। এক শ্রোতা যাহা শ্রবণ করিল, তাহা দ্বারা অন্য শ্রোতা কোন প্রকারে উপকৃত বা অপকৃত হইল না।

এ ঘটনায় কি কোন ব্যক্তির এই জ্ঞান হওয়া সম্ভব যে "সদা সত্য কথা কহিবে" ? এখন মনে কর কেহ রামকে উপদেশ দিলেন 'সদা সত্য কথা কহিবে'। কল্পনা করা যাউক এই চারিটি কথা উচ্চারণ করিতে চারি নিমিষ লাগিল এবং রাম এক এক নিমিষে এক এক কথা শুনিল। প্রথম নিমিষে শুনিল 'সদা' এবং ইহা শুনিয়াই ভুলিয়া গেল। দ্বিতীয় নিমিষে শুনিল 'সত্য' এবং ইহা শুনিয়াই ভুলিয়া গেল। তৃতীয় নিমিষে শুনিল 'কথা' এবং ইহাও শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া গেল। চতুর্থ নিমিষে শুনিল 'কহিবে'।

এই উভয় দৃষ্টান্ত কি একই প্রকারের নহে ? প্রথম দৃষ্টান্তে যেমন চারি জন শ্রোতার মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই ; এক শ্রোতা যাহা শুনিয়াছিল, দ্বিতীয় শ্রোতা তাহা শুনে নাই ; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও ঠিক তাহাই। 'প্রথম রাম' 'দ্বিতীয় রাম' 'তৃতীয় রাম' 'চতুর্থ রাম'—চারিনিমিষের এই চারিজন রাম পরস্পর বিচ্ছিন্ন, ইহাদিগের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। প্রথম রাম প্রথম কথাটি শুনিয়াই মরিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় রাম মরিয়াছে দ্বিতীয় কথা শুনিয়া, তৃতীয় কথা শুনিবার পর তৃতীয় রামের মৃত্যু হইয়াছিল ; এখন জীবিত আছে চতুর্থ রাম ; সে কেবল শুনিয়াছে চতুর্থ কথাটি। প্রথম দৃষ্টান্তে প্রথম তিন জন যাহা শুনিয়াছিল, চতুর্থ ব্যক্তি তাহা জানে না ; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রথম তিন রাম যাহা শুনিয়াছিল, চতুর্থ রাম তাহা শুনে নাই। উভয় দৃষ্টান্তে প্রথম তিন জনের অভিজ্ঞতা দ্বারা চতুর্থ জন উপকৃত হয় নাই। এই চারিজন রাম যদি চারি জন না হইয়া একজন হয় তাহা হইলেই প্রথম তিন জনের অভিজ্ঞতা দ্বারা চতুর্থ জন উপকৃত হইতে পারে। ইহা সম্ভব হয় যদি ইহাদিগের স্মৃতি থাকে। তাহা হইলে ঘটনা দাঁড়াইবে এইরূপ :—

প্রথম নিমিষে রাম শুনিল—'সদা'

এই কথাটা তাহার মনে রহিয়া গেল এবং এই অবস্থাতেই সে শুনিল—"সত্য"

এখন সে পাইল এই দুইটি কথা—'সদা সত্য'

এই দুইটি কথা তাহার মনে রহিল এবং এই অবস্থাতেই সে শুনিল—'কথা'

এখন সে পাইল এই তিনটি কথা—'সদা সত্য কথা'

এই তিনটি কথা তাহার মনে রহিয়া গেল এবং এই অবস্থাতে সে শুনিল—"কহিবে"।

এখন সে এই সত্যলাভ করিল—"সদা সত্য কথা কহিবে"।

এই চারিটি কথার সমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, চারিটি রামেরও সমন্বয় হইয়া থাকে ; এই প্রকারেই প্রত্যেক মানব, আত্মার একত্ব অনুভব করে। স্মৃতি না থাকিলে এই চারি রামের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকিত না, একজনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অপর জন কোনপ্রকারে

উপকৃত বা অপকৃত হইত না। স্মৃতি যদি না থাকে আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি যে প্রথম কথাটি শুনিয়াই প্রথম রামের মৃত্যু হইয়াছে; তাহার পর দ্বিতীয় রাম জন্ম লাভ করিল, দ্বিতীয় কথা শুনিবার পর তাহারও মৃত্যু হইল; তাহার পর জন্ম হইল তৃতীয় রামের, তৃতীয় কথাটি শুনিবার পর সেও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল; তাহার পর চতুর্থ রাম জন্ম গ্রহণ করিল। এই চতুর্থ রামের কতটুকু জ্ঞান?

সুতরাং দেখা যাইতেছে স্মৃতিই মানব-চৈতন্যের বিশেষত্ব। যতই স্মৃতির বিনাশ হইতে থাকে ততই মানব পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং পশুর যতটুকু স্মৃতি আছে ততটুকুও যদি স্মৃতি না থাকে, তাহা হইলে সে উদ্ভিদ বা প্রস্তরাদির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

আমার যদি পূর্ব্বজন্ম থাকিত তাহা হইলে স্মৃতি তাহা আমাকে বলিয়া দিত এবং স্মৃতি সেতুস্বরূপ হইয়া 'পূর্ব্বজন্মের আমি'র সহিত 'বর্ত্তমান জন্মের আমি'র সংযোগ করিয়া দিত।

স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক পূর্ব্বজন্মে একটা কেহ ছিল। তুমি বলিতেছ "সেই লোকটিই আমি।" সে লোকটা আমিই হই, আর সে লোকটা তুমিই হও, তাহার জন্য আমিই শাস্তি বা পুরস্কার পাই, আর তুমিই শাস্তি বা পুরস্কার পাও, ফল একই।

পূর্ব্বজন্মে একটা কিছু ছিল, সেটি আমি না তুমি তাহা কেহই জানি না। সেটি পশু ছিল, না পক্ষী ছিল, কীট ছিল, না পতঙ্গ ছিল, দেব ছিল, না দানব ছিল, তাহা আমরা কেহই জানি না, তাহা জানিবার উপায়ও নাই এবং পূর্ব্বজন্মে ছিলাম কিনা তাহাই জানি না অথচ বিশ্বাস করিতে হইবে আমি ছিলাম।

জন্মান্তরবাদীগণের এই কথা শুনিয়া Taming of the Shrewএর Fryএর কথা মনে পড়ে। ফ্রাই বলিতেছে "ওগো আমি লাট্ (Lord) নই, আমি ফ্রাই।" কিন্তু কাহার কথা কে শুনে? বেচারা কাঁসারীকে লাটের আসনেই বসিতে হইল। আমাদিগেরও সেই দশাই উপস্থিত।

জন্মান্তরবাদীগণের উত্তর

জন্মান্তরবাদী ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন—তোমরা 'স্মৃতি' 'স্মৃতি' করিয়া এত হৈচৈ কর কেন? ইহজন্মের সব কথাই কি মনে থাকে? "আমরা সজ্ঞান ভাবে যে-সমস্ত পুণ্য বা পাপকার্য্য করি, তাহা ক্রমশঃ ভুলিয়া যাই, অথচ সেই-সকল কার্য্যের ফলস্বরূপ যে সু বা কু অভ্যাস, তাহা আত্মাতে বদ্ধমূল হইয়া জীবনে সুফল বা কুফল, সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে। অধ্যয়ন, উপদেশ, আলোচনা ও চিন্তা প্রভৃতি হইতে লব্ধ বিশেষ বিশেষ সত্যের অধিকাংশই বিস্মৃত হইয়া যাইতে হয়। অথচ এই-সমুদায়ের প্রভাবে বুদ্ধির যে তীক্ষ্ণতা ও ধারণাশক্তি জন্মে, তাহা আত্মার স্থায়ী সম্পত্তি হইয়া থাকে। তেমনি যে যে সজ্ঞান পুণ্যকর্ম্ম, পুণ্যকথা, পবিত্র চিন্তা দ্বারা নিঃস্বার্থ প্রীতি ও চিত্তশুদ্ধি লাভ করা যায়, যে সকল উপাসনা ধ্যান ধারণাদি সজ্ঞান সাধনা দ্বারা যোগ ও ভক্তি লাভ করা যায়, সে-সমুদায় কার্য্যের অধিকাংশই জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, অথচ তাহাতে অভ্যস্ত ও সঞ্চিত আধ্যাত্মিক সম্পত্তিসমূহ নষ্ট হয় না। পুণ্য সম্বন্ধে যেরূপ, পাপ সম্বন্ধেও সেরূপ। যে-সমস্ত সজ্ঞান পাপচিন্তা, পাপকথা, পাপব্যবহার দ্বারা হৃদয় শুষ্ক কঠোর পরপীড়নপ্রবণ, স্বার্থপর ও নীচ ভোগাসক্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মানুষ ক্রমশঃ ভুলিয়া যায়, কিন্তু তাহা ভুলিয়া গেলেও মনের অপবিত্র গঠন, মনোবৃত্তির অভ্যস্ত পাপাভিমুখী গতি, পরিবর্ত্তিত হয় না। এই ত গেল সাধারণ কথা, যাহা সকলের জীবনেই অল্লাধিক পরিমাণে ঘটে। এই-সকল স্থলে আমরা পূর্ব্বকথার বিস্মৃতিবশতঃ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত একতা নষ্ট হইল বলিয়া মনে করি না, অথবা যে-সকল কু বা সু অভ্যাস মানুষের দুঃখ বা সুখ ঘটাইতেছে, তাহার কারণরূপী সজ্ঞান পাপ বা পুণ্যকর্ম্মসমূহ কর্ত্তা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া ঈশ্বর তাহার সম্বন্ধে কোন অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন অথবা তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন এরূপ মনে করি না। তারপর আবার বিশেষ বিশেষ স্থলে, কোন উৎকট পীড়া বা বিপৎপাতবশতঃ পূর্ব্বস্মৃতি একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, জীবনের পূর্ব্বাংশের সঙ্গে অপরাংশের একত্ববোধ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, অথচ সেই-সকল স্থলেও প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিগত একতা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না এবং এই-সকল স্থলেও পূর্ব্বকৃত পুণ্য বা পাপকর্ম্মের ফল জীবনকে নিয়মিত করিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিস্মৃতি অল্লাধিক পরিমাণে এই জীবনেও ঘটে এবং ইহ জীবনেও বিস্মৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ইহ জীবনের এই-সকল ঘটনার যে ব্যাখ্যা, পূর্ব- বা পরজীবন সম্বন্ধেও সেই ব্যাখ্যাই খাটে।" (কোন চিন্তাশীল লেখকের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)।

আমাদিগের বক্তব্য

(১)

স্মৃতি বিষয়ে যে কথাটি বলা হইল, সে কথাটি ঠিক, কিন্তু ইহা অর্দ্ধ সত্য। অর্দ্ধ সত্য অসত্য অপেক্ষাও অনেক সময়ে আমাদিগকে অধিক বিপথগামী করে। এস্থলেও তাহাই। জীবনে বহুবার মদ্যপান করিয়াছি, কিন্তু কোথায়, কতবার কি ভাবে মদ্যপান করিয়াছি,

তাহা মনে নাই। তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে মদ্যপান করিয়াছি এই ব্যাপারটিই স্মৃতিতে নাই? মদ্যপানের জন্য শারীরিক ব্যাধি ভোগ করিতে হইতেছে, আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। কখন্ কোন্ ব্যাধি হইয়াছে, কোন্ কোন্ দিন বিশেষ আর্থিক কষ্ট হইয়াছে, কোন্ কোন্ দিন পরিবারের লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, তাহা স্মৃতিতে নাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে আমার যে দুর্গতি হইয়াছে তাহা আমি জানি না বা বুঝি না? বাল্যকাল হইতে পাঠ আরম্ভ করিয়া অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু কখন্ কোন্ পুস্তক পড়িয়াছি, কখন্ কোন্ অঙ্ক কষিয়াছি, কখন্ কোন্ শিক্ষক ও কোন্ সহাধ্যায়ী আমাকে সাহায্য করিয়াছে, কোন্ সালে কোন্ পরীক্ষা দিয়াছি ও তাহার কি প্রকার ফল লাভ করিয়াছি, তাহা মনে নাই কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে বহু বর্ষ পরিশ্রম করিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছি ইহাও ভুলিয়া গিয়াছি? উপাসনাদি দ্বারা জীবনকে নিয়মিত করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। কিন্তু কখন্ কোথায় নির্জ্জনে উপাসনা করিয়াছি, কখন্ কোথায় কাহার সঙ্গে সজন উপাসনা করিয়াছি, কখন্ উপাসনার ফল কি প্রকার হইয়াছে, কোন্ দিন উপাসনা সরস হইয়াছে, কোন্ দিন নীরস হইয়াছে; বক্তৃতা আলোচনাদি দ্বারা কখন্ কি প্রকার উপকার লাভ করিয়াছি, কোন্ রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়া কখন্ জয়লাভ করিয়াছি, কখন্ বা পরাস্ত হইয়াছি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ঘটনা মনে নাই; তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে উপাসনাদি দ্বারা জীবন যে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাও জানি না? জীবনের প্রত্যেক ঘটনা স্মৃতিতে নাই বটে, কিন্তু ইহা জানি যে সাধনভজনের জন্য বা দুষ্ট প্রবৃত্তি পরিচালনার জন্য বর্ত্তমানকালে জীবন এই প্রকার হইয়াছে; ইহা জানি অতীত কালে যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে সেই প্রকার ফল ভোগ করিতে হইতেছে।

অতীত কালের সমুদয় ঘটনাই যে মনে থাকা আবশ্যক তাহা নহে। বাল্যকালের আমি এবং অদ্যকার আমি—এই দুই আমি যে একই আমি তাহা অপরোক্ষ ভাবে স্মৃতিতে না থাকিতে পারে; 'কল্যকার আমি' এবং 'অদ্যকার আমি' একই আমি ইহা স্মৃতি দ্বারা বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। আর কাল পর্য্যন্ত যাইবারই বা আবশ্যক কি? ঠিক এই পূর্ব্বনিমিষের আমি এবং এই-নিমিষের আমি একই আমি এইটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই ভাবেই আত্মা বর্দ্ধিত হইয়া এবং আত্মার একত্ব অনুভব করিয়া আসিতেছে। প্রতি নিমিষেই আত্মা বুঝিয়া আসিতেছে "এই পূর্ব্বনিমিষে আমি এই প্রকার ছিলাম এবং এই-নিমিষে 'সেই আমিই' 'এই আমি' হইয়াছি।" স্মৃতি যদি এক-নিমিষের জীবনের সহিত পর-নিমিষের জীবনের সংযোগ স্থাপন না করিত তাহা হইলে জীবনের একত্বই থাকিত না। যদি স্মৃতি এই দুই নিমিষের আত্মার একত্ব অনুভব করিতে না পারে, তবে বলিতে হইবে এই দুই নিমিষের আত্মা দুইই; প্রথম আত্মার মৃত্যু হইয়াছে এবং নূতন এক আত্মার জন্ম হইয়াছে। স্মৃতি প্রতি-মুহূর্ত্তের আত্মার সমুদয় উন্নতি বহন করিয়া আনে বলিয়াই আমরা বুঝিতে পারি যে ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তের আত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহে। একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্ত ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছে!

আমরা এখানে ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে প্রকাশিত আত্মাকে প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি, তাহার পর বলিতেছি এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন আত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহে; ইহারা একই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আত্মা অবিভাজ্য। কেবল বুঝিবার সুবিধার জন্যই আত্মাকে এইভাবে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইরূপ কল্পনার সাহায্যে আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। জীবনের নির্দ্দিষ্ট কোন অংশকে ১০০ ভাগে বিভক্ত করা যাউক। ইহার প্রথম অংশকে প্রথম আত্মা, দ্বিতীয় অংশকে দ্বিতীয় আত্মা, তৃতীয় অংশকে তৃতীয় আত্মা এবং এইভাবে অগ্রসর হইয়া শততম অংশকে শততম আত্মা বলিব। প্রথম আত্মা ও দ্বিতীয় আত্মা যে একই আত্মা, স্মৃতি তাহা বলিয়া দিবে; এই প্রকারে স্মৃতির সাহায্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আত্মার একত্ব, তৃতীয় ও চতুর্থ

আত্মার একত্ব বুঝিতে পারিব। এইরূপে জানিতে পারিব ৯৯তম আত্মা এবং ১০০তম একই আত্মা। স্মৃতি যদি এইরূপ বলিয়া দেয় তাহা হইলেই সমস্ত জীবনের একত্ব সংস্থাপিত হইল। কেবল এই প্রকারেই যে, সমস্ত জীবনের একত্ব জানিতে পারি তাহা নহে। হয়ত ২০তম জীবনে যে কার্য্য করিয়াছি, ৩০তম জীবনে জ্ঞাতসারেই সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম। যৌবনকালে ও বৃদ্ধকালেও সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়; জ্ঞাতসারেই কি আমরা এই ফল ভোগ করি না? প্রাচীন জীবনের সব ঘটনা মনে থাকে না সত্য, কিন্তু প্রধান প্রধান ঘটনা কি প্রাণে জাগ্রত থাকিয়া আমাদিগকে জীবনের একত্ব বুঝাইয়া দিতেছে না?

আত্মার একত্ব প্রমাণ করিবার জন্য জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই এক একটি সাক্ষীস্বরূপ। জীবনে এইরূপ লক্ষ লক্ষ সাক্ষী রহিয়াছে, সহস্র সহস্র সাক্ষীর মৃত্যু হইতে পারে। কিন্তু সমুদয় সাক্ষীরই কি মৃত্যু হইয়া থাকে? সহস্র সহস্র সাক্ষীও কি জীবিত থাকিয়া জীবনের একত্বের সাক্ষ্য দিতেছে না? দুই একটি সাক্ষীও কি জীবিত থাকে না যাহারা এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে?

তর্কের খাতিরে সহজেই বলা যায় বর্ত্তমান জীবনের সব কথা মনে নাই, সেই প্রকার পূর্ব্বজন্মের কথাও মনে নাই। কিন্তু আমরা জীবনের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম যে অতীতের সব ঘটনা মনে নাই সত্য কিন্তু সব ঘটনাই ভুলিয়া গিয়াছি তাহা সত্য নহে। অনেক ঘটনা যেমন ভুলিয়া গিয়াছি, তেমনি অনেক ঘটনা মনেও আছে। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কোন ঘটনাই যে মনে নাই। পূর্ব্বজন্ম যে একবারেই সাদা কাগজ, একটি রেখাও যে নাই; কিন্তু বাল্য-জীবনের পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত আছে, তাহা সব পড়া না গেলেও কিছু ত পড়া যাইতেছে। পূর্ব্বজন্মের একটি ঘটনাও যদি মনে থাকিত, মোটামুটি ব্যাপারটাও যদি স্মৃতিতে থাকিত, তাহা হইলেও বুঝা যাইত পূর্ব্বজন্ম একটা ছিল।

অতীতের অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছি সত্য, কিন্তু যাহা মনে আছে তাহাই আত্মার একত্ব প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। যেখানে মানব, আত্মার একত্ব বুঝে না, সেখানে তাহার মানবত্বই বিকশিত হয় নাই। আমি পূর্ব্বে যাহা করিয়াছি, তাহারই ফলে জীবন এই প্রকার হইয়াছে—এই চিন্তা অবশ্যই সর্ব্বদা জাগরুক থাকে না; কিন্তু এ বিষয়ে যখনই মনোনিবেশ করি, তখনই ইহার সত্যত অনুভব করি; কিন্তু আমরা যদি গভীরতম অপেক্ষ গভীরতর ভাবেও মনোনিবেশ করি, তাহা হইলেও কি পূর্ব্বজন্মের সামান্য আভাসও লাভ করিতে পারি? যে জীবনের সহিত আমার বর্ত্তমান জীবনের একত্ব নাই যে জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া আমার বর্ত্তমান জীবন-স্রোতের সহিত মিশিতেছে না—সে জীবন আমার নহে।

(২)

দ্বিতীয় আপত্তিবিষয়েও আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। কখন কখন মানুষের স্মৃতি এতটা লুপ্ত হইয়া যায় যে, জীবনের পূর্ব্বাংশের সহিত অপরাংশের একত্ব-বোধ চলিয়া যায়। পুনর্জ্জন্মবাদী বলেন একত্বের বোধটিই চলিয়া যায় কিন্তু একত্বটি বিনষ্ট হয় না। পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধেও এই প্রকার। আমাদিগের বক্তব্য এই :—

(ক)

মানব এবং পশুর মধ্যে যেমন পার্থক্য, তেমনি একত্বও রহিয়াছে। মানবে পশুত্বও আছে, তাহা ছাড়া নূতন কিছু আছে। অর্থাৎ—

মানবত্ব = পশুত্ব + নূতন কিছু। মানব চৈতন্য = পশুচৈতন্য + নূতন কিছু। মানবস্মৃতি = পশুস্মৃতি + নূতন কিছু।

স্মৃতি নাশের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। এই-সমুদয়ের অনুরূপ দুই একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। মনে কর ৫০ বৎসর বয়সে গোবিন্দের স্মৃতি এমন ভাবে নষ্ট হইল যে তাহার আত্মার একত্বজ্ঞান ত নষ্ট হইলই, তাহা ছাড়া পাপ পূণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম লজ্জা সম্ভ্রম ইত্যাদি কোন বিষয়েরই জ্ঞান রহিল না। আহার বিহার সম্বন্ধে পশুবৎ আচরণ করিতে লাগিল। এখানে প্রশ্ন—এস্থলে গোবিন্দের আত্মচৈতন্যের একত্ব আছে কিনা। আমরা বলিব এখানে তাহার আত্মচৈতন্য প্রকাশিতই নাই। যদি

প্রকাশিত থাকিত, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারিত—স্মৃতি নাশের পূর্ব্বের গোবিন্দ ও স্মৃতি নাশের পরের গোবিন্দ একই গোবিন্দ কিনা। দেহ এক বলিয়া আমরা উভয়কেই গোবিন্দ বলিতেছি, নতুবা দ্বিতীয় গোবিন্দকে গোবিন্দ বলিতাম না। সুস্থাবস্থায় গোবিন্দে পশুত্বও ছিল এবং বেশী কিছুও ছিল। এই 'বেশী কিছু'টুকু থাকার জন্য এই পশুত্ব মানবত্বে উন্নীত হইয়াছিল। স্মৃতি-ভ্রংশ হইবার পর এই বেশীটুকু বিলুপ্ত হইল, সুতরাং ঐ মানবত্ব অবনত হইয়া পশুত্বে পরিণত হইল। এখন গোবিন্দ নরদেহধারী পশুবিশেষ। ঐ বেশীটুকু যখন ফিরিয়া আসিবে তখন সে আবার মানবত্ব লাভ করিবে। স্মৃতি নাশের পূর্ব্বে

গোবিন্দ=পশু গোবিন্দ+বেশীকিছু। এখনকার গোবিন্দ=পশু গোবিন্দ। যদি জিজ্ঞাসা কর পূর্ব্বের গোবিন্দ ও পরের গোবিন্দ এতদুভয়ের মধ্যে একত্ব আছে কিনা—আমরা বলিব পূর্ব্বের গোবিন্দের 'পশু গোবিন্দ' অংশ এবং পরের গোবিন্দ একই জীব।

জন্মান্তরবাদীগণ এই ঘটনা দ্বারা যে পুনর্জ্জন্ম সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন, আমাদের মনে হয় তাঁহাদের এ চেষ্টা বৃথা চেষ্টা। ইঁহারা বলেন এস্থলে আত্মচৈতন্যের একত্ব আছে কিন্তু একত্ববোধ নাই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। এস্থলে গোবিন্দ মানবত্ব হারাইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যেস্থলে মানবত্বের প্রকাশ নাই, সেস্থলে আত্মচৈতন্যের একত্ববিষয়ক প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

(খ)

স্মৃতিভ্রংশ হইলেই যে মানুষ সব সময়ে পশুত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, কখন কখন যুবক এইরূপ ঘটনায় বালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে—যেমন টমাস্ কার্সন্ হেনা (Thomas Carson Hanna) এবং মেরি রেনল্ডসের (Mary Reynolds) ঘটনা। বালকদিগকে যেমন প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হয়, ইহাদিগকেও তেমনি প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইয়াছিল। এখানে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন স্মৃতি নষ্ট হইবার পূর্ব্বের হেনা এবং স্মৃতি নষ্ট হইবার পরের হেনা কি একই হেনা নয়? আমরা বলিব ইহারা এক হেনা নয়। যাহাকে পরের হেনা বলিতেছ সে পরের হেনা নহে। সে পূর্ব্বের হেনারও পূর্ব্বতর হেনা—সে 'বাল হেনা'। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতিভ্রংশ পর্য্যন্ত হেনার মানবত্ব যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল, এই ব্যাধির সময়ে সেইটুকু লুপ্ত হইয়াছে। যুবক হেনা বাল হেনাতে পরিণত হইয়াছে। যখন হেনা আবার স্মৃতি লাভ করিবে, তখন সে আবার যুবক হেনা হইবে।

(গ)

কখন কখন মানুষের একাধিক বার স্মৃতিভ্রংশ হইয়া থাকে। যেমন (Miss Beauchamp) মিস্ বোস্যাম্পের ঘটনা। স্বাভাবিক অবস্থা ছাড়াও ইহার তিন প্রকার ব্যক্তিত্ব দেখা গিয়াছিল। (Dr. Morton Prince) ডাক্তার মর্টন প্রিন্স্ এই স্ত্রীলোকটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি বলেন এই তিন জনের মধ্যে এক জনের প্রকৃতি সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়, আর একজনের প্রকৃতি দেবতার ন্যায়, এবং তৃতীয় জনের প্রকৃতি অসুরের ন্যায়।

এপ্রকার ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি তাহা বলা কঠিন। আমাদিগের মনে হয়, স্মৃতিনাশই ইহার প্রধান কারণ। কবি বলিয়াছেন 'শত ভাগ মোর শতদিকে ধায়"—ইহা কবির কল্পনা নহে; এই প্রকার ভাব মানবপ্রকৃতিতেই নিহিত। মানব বহু ইচ্ছা এবং বহু ভাবের সমষ্টি। স্মৃতি এই-সমুদয়ের সমন্বয় করিয়া আত্মার একত্ব বিধান করে। স্মৃতিভ্রংশের জন্য এমন হইতে পারে যে সাধু ভাবের স্রোত এক দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, অসাধু ভাবের স্রোত অপর দিক দিয়া যাইতেছে, এতদুভয়ের সমন্বয় হইতেছে না। যখন যে ভাব প্রবল হইয়া স্মৃতিতে উত্থিত হয় তখন মানুষ সেই প্রকার জীবন প্রদর্শন করে। ঐ রমণীর জীবনেও কখন সাধু ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইত এবং অসাধুভাবের স্রোত অদৃশ্য হইত, কখনও বা সাধু ভাবের স্রোতই লুপ্ত হইত এবং অসাধু ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইত, যখন স্মৃতি থাকে তখন এই উভয় ভাব সংমিশ্রিত হইয়া জীবনকে স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন করিয়া থাকে।

এ ঘটনা দেখিয়াও পুনর্জ্জন্মবাদী বলিতে পারে না যে স্মৃতিভ্রংশ হইলেও জীবনের একত্ব থাকে। আমরা ত বুঝিতেছি যে একত্ব ত থাকেই না, বরং স্মৃতির অভাবে এক আত্মা বহুভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এ দৃষ্টান্ত দ্বারাও পুনর্জ্জন্ম প্রমাণের সুবিধা হইল না।

স্মৃতিভ্রংশমূলক ব্যাধি রহস্যময়; ব্যাপারটা কি এবং ইহার কারণ কি, তাহা এখনও নিঃসন্দেহরূপে নির্ণয় করা যায় নাই—বিষয়টি এখনও অজ্ঞাত; পূর্ব্বজন্মও অজ্ঞাত বিষয়। এক অজ্ঞাত বিষয়কে অপর এক অজ্ঞাত বিষয় দ্বারা প্রমাণ করিবার যে প্রয়াস তাহা বিফল প্রয়াস।

একত্ব জ্ঞান না থাকিলেও চলে।

কেহ কেহ বলেন—"শনির পুনর্জ্জন্ম হইল—ইহার অর্থ ইহা নহে যে রবি দ্বিতীয় শনি হইবে বা শনির আত্মজ্ঞান রবিতে প্রাদুর্ভূত হইবে। মৃত্যুর সময় শনির আত্মজ্ঞানই বিনষ্ট হইয়া যায় কিন্তু জীবনের আর সবই থাকিয়া যায় এবং এই-সমস্ত দিয়াই রবির জীবন গঠিত হয়। মৃত্যুর সময়ে শনির সমুদয় কর্ম্ম ও কর্ম্মফল, সমুদয় গুণগ্রাম আধ্যাত্মিক শক্তি ও অবস্থা থাকিয়া যায় এবং তাহাই রবির জীবনে কার্য্য করিতে থাকে। ইহাই জন্মান্তরের অর্থ।"

(ক)

'শনির গুণকর্ম্মাদি দ্বারা রবির জীবন গঠিত হয়,—আত্মা যেন ঘটী বাটি। ঘটী ভাঙ্গিয়া গেল—সেই ভাঙ্গা ঘটী দিয়া কিংবা তাহার সহিত নূতন মাল মসল্লা মিশাইয়া একটা নূতন ঘটী প্রস্তুত হইল। জড়বস্তুবিষয়ে এপ্রকার ঘটনা ঘটিতে পারে কিন্তু অধ্যাত্মবিষয়ে ইহার বিপরীত কথাই সত্য। একটি ঘটী বিনষ্ট হইবে না অথচ সেই ঘটী দ্বারা অপর ঘটী গঠন করা হইবে ইহা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু একজনের জ্ঞান প্রেম পবিত্রতাদি বিনষ্ট না হইলেই এই সমুদয় দ্বারা অপরের জীবন গঠন করা সম্ভব। তোমার জ্ঞান প্রেমাদি যতটুকু ব্যক্ত, ততটুকুই আমার জীবনে কার্য্য করে। এই সমুদয় যতটুকু প্রকাশিত হয়, ততটুকুই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। যাহা অব্যক্ত তাহা থাকিয়াও নাই। একজন আমাদের শিক্ষক হইয়া আসিলেন, এক সময়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল, কিন্তু এখন তাহা লুপ্ত হইয়াছে; ইহা দ্বারা কি আমাদের কোন উপকার হইবে? প্রত্যেক আধ্যাত্মিক বস্তু বিষয়েই ইহা সত্য। তুমি জগতে জ্ঞান বিলাও প্রেম বিলাও—তোমার জ্ঞান প্রেম বাড়িবে বই কমিবে না, অথচ জগৎ তোমার জ্ঞান ও প্রেম পাইয়া লাভবান হইবে।

তাহার পর যখন লোকের মৃত্যু হয় তখন তাহার গুণকর্ম্মাদি প্রাকৃত উপায়েই এই সংসারে থাকিয়া যায়। হোমার, সেক্ষপিয়ার, কালিদাস, সক্রেটিস্, প্লেটো, এরিষ্টটল্, ক্যাণ্ট, হেগেল, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি মহাত্মাগণের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা জগতে যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা অমর হইয়া রহিয়াছে। নাদির সা ভারত আক্রমণ করিল, রক্তস্রোতে দেশ ভাসিয়া গেল; কেহ অনাথ, কেহ অনাথা হইল দেশের দুর্গতির সীমা রহিল না। এখন নাদির জীবিতই থাকুক, বা মৃতই হউক, জগতে তাহার কর্ম্ম রহিয়া গিয়াছে। নাদির ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছে কিন্তু তাহার গুণকর্ম্ম রহিয়া গেল।

নাদিরের মৃত্যুর পর কেবল পৃথিবীতেই তাহার গুণকর্ম্ম থাকিয়া যায় এবং ইহা ভিন্ন আর কিছু থাকে না, ইহা আমরা বলিতেছি না। পরে আমরা দেখাইব যে পুনর্ব্বার মানবরূপে জন্ম লাভ না করিয়াও নাদির আত্ম-চৈতন্য সহ গুণগ্রাম লইয়া বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এখানে আমাদিগের বক্তব্য এই যে মানবের জীবিতাবস্থা-তেই তাহার গুণকর্ম্ম সংসারে থাকিয়া যায় এবং মৃত্যুর পরও প্রাকৃতভাবেই ইহা সমাজের নরনারীর উপর কার্য্য করে; এবং ইহাও বলিতে পারি মানব আত্মচৈতন্য ও গুণকর্ম্ম লইয়া পরলোকে বাস করিতে থাকে। সুতরাং কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্মান্তর কল্পনা অনাবশ্যক। মৃত্যুর সময়ে মানবের গুণকর্ম্মাদি আত্মচৈতন্য হইতে পৃথক হইয়া 'অতি-প্রাকৃত' ভাবে বীজাকার প্রাপ্ত হয়, আর সেই বীজ ব্যক্তিবিশেষের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার জীবনকে নিয়মিত করে, এপ্রকার কল্পনা করিয়া কোন লাভ নাই।

(খ)

পুনর্জ্জন্মবাদীগণ যে বলেন শনি মরিয়া রবি হইল, আমরা জিজ্ঞাসা করি এ পুনর্জ্জন্ম কাহার? রবি শনির চৈতন্য আর লাভ করিল না—লাভ করিল কেবল গুণ-কর্ম্ম। এস্থলে বলা উচিত, পুনর্জ্জন্ম হইল শনির গুণ-কর্ম্মের; শনির পুনর্জ্জন্ম হইল, ইহা বলা যাইতে পারে না। আত্মা বলিতে আমরা প্রধানতঃ আত্মচৈতন্যই বুঝি, কিন্তু এই চৈতন্য গুণকর্ম্মবিরহিত হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং আত্মা অর্থ আত্মচৈতন্য ও গুণকর্ম্ম উভয়ই। এই দুইটির মধ্যে একটিরও যদি বিনাশ হয় তবে আত্মার আত্মত্ব রহিল না। গুণকর্ম্মবিহীন আত্মা লুপ্ত আত্মা এবং চৈতন্যবিহীন আত্মা অনাত্ম-বস্তু। গুণ-কর্ম্মকে কখনই আত্মা-শব্দ-বাচ্য করা যায় না, ইহা অনাত্ম বস্তুই। এই যে পুনর্জ্জন্মবাদীগণ বলেন পূর্ব্বজন্মের গুণকর্ম্ম লইয়া রবি জন্মগ্রহণ করিল—ইহা কি গুণকর্ম্মের পুনর্জ্জন্ম নহে? বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে একটি অণু পরমাণুও ধ্বংস হয় না। সুতরাং মানুষ যখন মরিয়া যায় তখনও তাহার দেহের পরমাণু বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এই সমুদয় পরমাণু নূতন ভাবে থাকিয়া যায়, ইহাদিগের পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়। পরমাণুর পুনর্জ্জন্ম প্রমাণ করিলে যেমন দেহের পুনর্জ্জন্ম প্রমাণ করা হইল না, তেমনি গুণকর্ম্মের পুনর্জ্জন্ম যদি প্রমাণ করা সম্ভবও হয়, তাহা হইলেও ইহা প্রমাণিত হইল না যে কোন আত্মার পুনর্জ্জন্ম হইল। গুণকর্ম্মের পুনর্জ্জন্ম অনাত্মবস্তুরই পুনর্জ্জন্ম, আত্মার জন্মান্তর নহে।

(গ)

এক ব্যক্তি বোঝা বহন করিয়া আনিতেছিল, তাহার মৃত্যু হইল; অপরে সেই বোঝা গ্রহণ করিল; তাহার মৃত্যুর পর তৃতীয় এক ব্যক্তি সেই বোঝা বহন করিতে লাগিল। বোঝাটা বহন করিয়া আনা হইতেছে সত্য, কিন্তু এ কার্য্য একব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে না। জন্মান্তরবাদীদিগের যুক্তিকে যদি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে এইটুকু মাত্র প্রমাণিত হয় গুণকর্ম্মাদিকে বহন করিয়া আনা হইতেছে, কিন্তু এক-জন ব্যক্তি এই-সমুদয় বহন করিয়া আনিতেছে ইহা প্রমাণিত হইতেছে না।

(ঘ)

এই যে গুণকর্ম্মের জন্মান্তর, ইহার মুখ্য কথা এই যে গুণকর্ম্ম সংসারে রহিয়া যাইতেছে। যাহারা নাস্তিক, যাহারা পরকাল মানে না, তাহারা কি ইহা অপেক্ষা কিছু কম বলিতেছে? হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখ পণ্ডিতগণও কি বলিতেছেন না যে মানুষ মরিয়া যাইতেছে বটে কিন্তু তাহার জ্ঞান, ভাব, কর্ম্ম সমুদয়ই সাহিত্যে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সমাজে, পরিবারে থাকিয়া যাইতেছে? কেবল এই সমুদয়ে কেন, ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও কি লোকের গুণগ্রাম থাকিয়া যাইতেছে না? পুত্রকন্যা কি মাতাপিতা এবং পূর্ব্বপুরুষগণের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি এবং সাক্ষাৎ অবতার নহে? তফাৎ এই, নাস্তিকগণ বলিতেছেন গুণকর্ম্ম প্রাকৃত উপায়ে চক্ষুর সমক্ষে ফল প্রসব করিতেছে; আর জন্মান্তরবাদীগণ বলিতেছেন, গুণকর্ম্ম 'অতিপ্রাকৃত' উপায়ে চক্ষুর অগোচরে অজ্ঞাত কোন এক ব্যক্তির জীবনে ফল প্রসব করিতেছে।

নাস্তিকগণ বলিতেছেন, মৃত্যুর সময়ে আত্মচৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর এ চৈতন্য প্রকাশিত হয় না; জন্মান্তরবাদীগণও এই কথাই বলিতেছেন।

তবে আর জন্মান্তরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? বরং কোন কোন বিষয়ে নাস্তিকদিগের মতকেই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। নাস্তিকগণ অবলম্বন করিতেছেন 'প্রাকৃত উপায়', আর জন্মান্তরবাদীগণের আশ্রয় 'অপ্রাকৃত উপায়'।

(ঙ)

মৃত্যুকালে চৈতন্যের বিনাশ হয়, গুণকর্ম্ম থাকিয়া যায়; তাহার পর এই গুণকর্ম্ম আর-এক চৈতন্যের সহিত প্রকাশিত হয়। এখানে প্রশ্ন-এই, দ্বিতীয় চৈতন্য কোথা হইতে আসিল? একশ্রেণীর কর্ম্মবাদী বলেন "বীজ হইতে যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি হয় তেমনি কর্ম্মরূপ বীজ হইতেই চৈতন্যের উদ্‌গম হইয়া থাকে।" জন্মের পর জন্ম আসিতেছে, এক চৈতন্য আসিল, সে চৈতন্য বিলুপ্ত হইল

আর এক চৈতন্য আসিল, তাহাও আবার বিলোপ প্রাপ্ত হইল—কিন্তু একই গুণকর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং এ মতে গুণগ্রামই নিত্য এবং চৈতন্যই আগন্তুক। জড়-বাদীগণও ঐ কথাই বলেন তাঁহাদিগের মতে জড় ও জড়ের গুণ নিত্য; চৈতন্য কখনও আসে, কখন চলিয়া যায়। সুতরাং উভয় মতেই চৈতন্য আগন্তুক ও অনিত্য। জড়বাদীগণই যে কেবল চৈতন্যের অনিত্যতা সমর্থন করে তাহা নহে, জন্মান্তরবাদেরও এই পরিণাম।

আর একশ্রেণীর কর্ম্মবাদী বলেন "ঐ দ্বিতীয় চৈতন্য কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই, এ চৈতন্য ব্রহ্ম হইতে আসিয়া ঐ গুণগ্রামের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।"

চৈতন্যগুলি যেন কতকগুলি মাথা, আর গুণগ্রামগুলি যেন কতকগুলি কবন্ধ। মাথাগুলি জগতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর সুযোগ দেখিতেছে কোন্ কবন্ধের ঘাড়ে চাপিব। যে যাহাকে পাইল, সে তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। ধড় ও মাথা সম্মিলিত হইয়া মানবরূপে জন্ম-গ্রহণ করিল।

একটি পরিচিত দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। পূজার জন্য মূর্ত্তি গঠন করা হয়। তাহার পর হয় ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। গুণকর্ম্ম যেন ঐ দেবমূর্ত্তি, আর চৈতন্য যেন ঐ মূর্ত্তির প্রাণ। মূর্ত্তিতে যেমন প্রাণ প্রতিষ্ঠা, গুণ-কর্ম্মের সহিতও তেমনি চৈতন্যের সংযোগ।

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই—আত্মার সহিত আত্মার গুণের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এক অপর হইতে পৃথক থাকিতে পারে না। জ্ঞানী হইতে জ্ঞানকে, প্রেমিক হইতে প্রেমকে পৃথক করা যায় না। দেহের সহিত স্বাস্থ্যের যে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত আত্মার গুণেরও তেমনি সম্বন্ধ। এক দেহ হইতে স্বাস্থ্য বাহির হইয়া যেমন অপর দেহে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি জ্ঞান প্রেমাদি এক আত্মা হইতে বাহির হইয়া অপর আত্মায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। আজ তুমি এক পোষাক ব্যবহার করিলে, কাল আমি সেই পোষাক ব্যবহার করিলাম, তৃতীয় দিন তৃতীয় একব্যক্তি সেই পোষাক ব্যবহার করিল, এপ্রকার হয়। কিন্তু জ্ঞান প্রেম প্রভৃতিকে পোষাকের মত বদল করা যায় না। গুণের সঙ্গে আত্মার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আত্মা অবিভাজ্য; চৈতন্য একস্থলে রহিল এবং ইহার গুণগ্রাম অন্য স্থলে রহিল, এরূপ হয় না। জন্মান্তরবাদীগণ অবিভাজ্য আত্মাকে বিভাগ করিয়া পুনর্জ্জন্মের কল্পনা করেন।

গুণগ্রাম হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় এ মত যেমন গ্রহণ করা যায় না, তেমনি চৈতন্য আসিয়া কোন গুণকর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইল ইহাও গ্রহণের উপযুক্ত নহে।

(চ)

গুণকর্ম্মের পুনর্জ্জন্মবিষয়ে আমাদিগের আর একটি বক্তব্য এই :—

একজনের মৃত্যু হইল, তাহার গুণ ও কর্ম্ম রহিয়া গেল। এই গুণকর্ম্মেরই যে পুনর্জ্জন্ম হইতেছে ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক। শনির জীবিতাবস্থায় তাহার কতকগুলি গুণ দেখা গিয়াছিল; যদি দেখা যায় রবির জন্মের সময়েই এইসমুদয় গুণ তাহার জীবনে প্রকাশিত হইতেছে, তবেই বলা যায় যে শনির গুণ রবিতে পুনর্জ্জন্ম পাইয়াছে। কিন্তু জগতে এপ্রকার কি ঘটিয়া থাকে? এ প্রকার যখন দেখা যায় না তখন কেমন করিয়া বলিব যে শনির গুণ এবং কর্ম্মই জন্মান্তর লাভ করিয়াছে?

জন্মান্তরবাদী হয়ত বলিবেন "সেইসমুদয় গুণকর্ম্মই যে রবির জীবনে প্রকাশিত হইবে তাহা নহে, যে-পরিমাণ শক্তি থাকিলে ঐসমুদয় গুণকর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে কিংবা ঐসমুদয় গুণকর্ম্ম হইতে যে-পরিমাণ শক্তি লাভ করা যাইতে পারে, রবির জীবনে সেই-পরিমাণ শক্তিই প্রতিভাত হয়।"

আমাদের বক্তব্য এই—মনে কর ঐ শক্তির মূল্য ২০। মরিবার সময় শনির শক্তি ছিল ২০, জন্মিবার সময় রবির শক্তি হইল ২০। দেখা গেল রবির জন্মের পূর্ব্বে রাহু নামক একজন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহারও শক্তির পরিমাণ ছিল ২০। এখানে জিজ্ঞাস্য, কাহার শক্তি অর্থাৎ গুণ-কর্ম্ম রবিতে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে?

কেহ বলিবে শনির কর্ম্মই রবিতে জন্ম লাভ করিয়াছে, অপর কেহ হয়ত বলিবে রাহুর কর্ম্মই রবিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইটি মতের কোন্‌টি সত্য? একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। রবি এক মহাজনের নিকট

২০৲ ধার লইল। তুমি বলিলে শনি ঐ মহাজনকে ২০৲ টাকা ফেরত দিয়াছিল, মহাজন রবিকে সেই ২০৲ দিয়াছে। আর একজন বলিল—"না হে না, রাহু যে ২০৲ মহাজনকে দিয়াছে মহাজন চন্দ্রকে সেই ২০৲ টাকাই দিয়াছে। এ জল্পনা যেমন, জন্মান্তরবাদীদিগের জল্পনাও তেমনি।"

একজন লোক মারা গিয়াছে, তাহার মাল মসল্লা লইয়াই কি পৃথিবীর অন্য মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে? নূতন মাল মসল্লা কি নাই? ইহা কি হইতে পারে না যে বিধাতা শনি ও রাহুর জীবন-নিরপেক্ষ হইয়া রবিকে সৃষ্টি করিয়াছেন? ইহা কি সম্ভব নয় যে শনি ও রাহু আপনা-দিগের গুণগ্রাম আপনারাই সঙ্গে লইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীন জীবনের সহিত নূতন জীবনের একত্ব অনুভব করিয়া পরলোকে অগ্রসর হইতেছে?

উপসংহার

যে চৈতন্য ও যে গুণকর্ম্ম লইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে, সেই চৈতন্য ও সেই গুণকর্ম্ম তাহার জন্মিবার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল—ইহা প্রমাণ করা ত গেলই না, বরং ইহা অসম্ভব বলিয়াই প্রমাণিত হইল। আর প্রমাণিত যদি হইতও, তাহা হইলেও উভয়ের একত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নহে। আর শিশুর জীবনে যে-অব্যক্ত শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহাও কোন ব্যক্তির জীবন হইতে আসিয়াছে ইহাও প্রমাণিত হইল না—এবং এরূপ কল্পনা করিবার কোন আবশ্যকতাও দেখা গেল না। এ অবস্থায় পুনর্জ্জন্ম লইয়া এত কল্পনা জল্পনা কেন?

জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিবার জন্য আর কি কি যুক্তি থাকিতে পারে, ঐতিহাসিক ঘটনায় জন্মান্তরের কতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, শাস্তি ও পুরস্কারের আবশ্যক আছে কিনা, বিদেহ আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব কিনা, বিদেহ না হইয়াও আত্মা অন্যরূপে থাকিতে পারে কিনা—পরপ্রবন্ধে এই-সমুদয় আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

"আগুনের ফুল্‌কি"

পরাণ মণ্ডল বেশ সম্পন্ন কৃষক। গ্রামের মধ্যে অনেকে তাহার সুখে ঈর্ষা করিত। সংসারে তাহার অনেকগুলি পোষ্য ছিল—বৃদ্ধ পিতা হরিশ মণ্ডল, তিন পুত্র এবং একটি পুত্রবধূ, আপনি ও পত্নী।

তাহার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অনেক রকম ফসল হইত। সারা বৎসরের খরচের মতন পর্য্যাপ্ত পরিমাণ শস্য গোলায় রাখিয়াও সে অনেক টাকার শস্য বিক্রয় করিত। লক্ষ্মী শ্রী সে পরিবারে চিরবিরাজমান ছিল।

পরাণের পিতা হরিশ মণ্ডলের বয়স আশি পার হইয়া গিয়াছিল। সে আর কোন কাজ কর্ম্ম করিতে পারিত না। বসিয়া শুইয়া শেষের দিন কটা এক রকমে কাটাইয়া দিতেছিল।

পরাণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশানের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। মধ্যম পুত্রেরও বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। কনিষ্ঠ নরেশ তখন সবে দশ বৎসরের বালক। তাহা হইলেও সে গরুর জাব দেওয়া, খড় কাটা প্রভৃতি খুচরা কাজগুলা করিয়া দাদাদের সাহায্য করিত।

মোটের উপর পরাণের বেশ সুখেই দিন কাটিতেছিল। অসুখের মধ্যে ছিল তাহার প্রতিবেশী রমেশ ঘোষ। সে ঠিক শত্রু না হইলেও কয়েক বৎসর হইতে উভয়ের মধ্যে একটা মনোমালিন্য জাগিয়া উঠিয়াছিল।

উভয়ের বাড়ী পাশাপাশি। পূর্ব্বে হরিশ মণ্ডল যখন এ বাড়ীর কর্ত্তা ছিল এবং রমেশের পিতা রমণ ঘোষ জীবিত ছিল, তখন উভয় পরিবারের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল। একটা কিছু আবশ্যক হইলে একজন অপরের নিকট সাহায্য চাহিতে বা দিতে অসম্মত হইত না। এখন পুত্রদের উপর সংসারের ভার পড়ায় ক্রমে সে ভাব কাটিয়া গিয়া একটা রেশারেশি দ্বেষাদ্বেষির ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, উভয়ে উভয়ের সহিত সকল সম্বন্ধ তুলিয়া দিয়াছে। কারণ, উভয়েই গ্রামের মণ্ডল হইবার জন্য জেদ ধরিয়াছিল।

পরাণের কয়েকটা হাঁস ছিল। সেগুলা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরাণের পুত্রবধূ প্রত্যহ প্রাতে

উঠিয়া ডিমগুলি লইয়া আসিত। একদিন ছেলেদের তাড়া খাইয়া হাঁসগুলা ঘরে আসিল না, রমেশের বাড়ীর পাশে ঝোপের মধ্যে রাত্রি যাপন করিল। পরদিন পরাণের পুত্রবধূ ডিম লইতে আসিয়া দেখিল ঘর শূন্য, ডিম নাই! সে মনে করিল তবে বোধ হয় তাহার শাশুড়ি ঠাকুরাণী ইতিপূর্ব্বেই তাহা লইয়া গিয়াছেন। এরূপ তিনি মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন। সে গিয়া শাশুড়িকে ডিমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"কই বউমা! আমি ত আজ হাঁসের ঘরে যাইনি।"

"তবে ডিম কোথা গেল? বোধ হয় কেউ নিয়ে গেছে, কিন্তু নিলে কে?"

এই সময় নরেশ বাহির হইতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সে ডিমের কথা শুনিয়া বলিল,—"কিগা বৌদি?"

"আজকের ডিমগুলো কি হ'ল জানো ঠাকুরপো?"

"ওঃ ডিমের কথা বলছ? তা কাল ত তোমার হাঁস ঘরে আসেনি। ঐ রমেশ ঘোষের ঝোপের ভিতর বসেছিল। সকাল বেলা ঐখান থেকেই বেরুল! তবে বোধ হয় ঐখানেই ডিম পেড়েছে।"

পরাণের পুত্রবধূ ডিম খুঁজিতে রমেশের বাড়ীর দিকে গেল। দ্বারের নিকটেই রমেশের স্ত্রীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। রমেশের পত্নী প্রাতে তাহাকে আপনার বাড়ীতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল; বলিল,—"কি চাই বাছা, সকাল বেলাই যে এদিকে?"

"শুনলুম আমাদের হাঁসগুলো কাল এইখানে রাত কাটিয়েছে। এই সময় চারটে হাঁসই ডিম দিচ্ছিল তাই ডিম দেখতে এসেছিলুম।"

"কোথায় ডিম বাছা? আমাদের হাঁসও এই সময় ডিম দিচ্চে, আমাদের পরের ডিম নেবার দরকার কি?"

ক্রমে এই কথা লইয়া তাহার সহিত রমেশের স্ত্রীর কলহ আরম্ভ হইল। এক দিক হইতে রমেশের পুত্রবধূ ও অন্যদিক হইতে পরাণের স্ত্রী আসিয়া দলপুষ্ট করিল।

তাহাদিগের কলহের চীৎকারে রমেশ ও পরাণের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল; তাহারাও আসিয়া কলহে যোগ দিল। ক্রমে তাহারা উভয়ে হাতাহাতি লাগাইয়া দিল।

সেই দিন হইতে উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গেল, উভয়ে উভয়ের সহিত মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল।

সেদিন রাগের মাথায় পরাণ রমেশের দাড়ি টানিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছিল। রমেশ ব্যাপারটা সহজে ছাড়িল না। প্রথমে গ্রামের পঞ্চায়েৎ, তাহার পর গ্রাম্য পুলিশ, অবশেষে মহকুমার আদালত অবধি নালিশ করিয়া তাহার এ অপমানের প্রতিশোধ লইল।

এই ভাবে ঝগড়াটা ক্রমে পাকিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ হরিশ মণ্ডল প্রথম হইতেই এ অগ্নি নিভাইতে প্রয়াস পাইতেছিল। কিন্তু পুত্রেরা সে কথা কানেও তুলিল না। সে একদিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিল,—"এমন ছোট কথা নিয়ে তোমাদের এ ঝগড়া করা বড় মুখখুমি হচ্ছে পরাণ! আচ্ছা একবার ভেবে দেখ দেখি কথাটা কত তুচ্ছ! কি ছোট কথা নিয়ে তোমরা আদালত ঘর করছ! এই যে এত কাণ্ড হ'ল তার মূল ত সেই চারটে হাঁসের ডিম! তোমার ছোট ছেলে নরেশই যদি ডিম চারটে নষ্ট করত?—কি করতে তুমি বাপু তা হ'লে? ডিম চারটের দাম কি? ভগবান ত আমাদের যথেষ্ট দিয়েছেন, তবে এ তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে এত মারামারি কেন? আর ভাব দেখি, যদি একটা কিছু ভালমন্দ হ'য়ে যেত,—খুব সম্ভব এর ফল পরে সেই রকম একটা কিছু দাঁড়াবে। মানুষ ত অম্নিই কত পাপ করছে, আবার ইচ্ছে করে এ পাপের বোঝা বাড়াও কেন? এ আগুনের ফুলকি গোড়াতেই নিভিয়ে ফেল; বাড়তে দিও না, সর্ব্বগ্রাস করবে শেষকালে!"

পুত্র ও পৌত্রেরা হরিশের এ কথাগুলোর মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। যুবকে সাধারণতঃ বৃদ্ধের কথায় যেমন অনাস্থা স্থাপন করে তাহারাও তেমনি করিয়া কথাগুলো হজম করিল। ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

পাড়ার লোকের কাছে পরাণ কথাটা স্বীকার করিল না। সে তাহাদের আপনার ছেঁড়া চাদরখানা দেখাইয়া বলিল,—"আমি কেন রমেশের দাড়ি ছিঁড়তে যাব? ও নিজে নিজের দাড়ি ছিঁড়ে আমায় জব্দ করবার জন্যে ঐ কথা এখন লোকের কাছে ব'লে বেড়াচ্চে। ওর ছেলে বরং আমার এই নতুন চাদরখানাকে শত খণ্ড

ক'রে দিয়েছে। এই দেখনা।" বাস্তবিক কিন্তু রমেশের পুত্র তাহার চাদর ছিঁড়ে নাই, লোকের কাছে দেখাইবার জন্য সে আপনিই এখানি ছিঁড়িয়াছিল।

পরাণও রমেশের নামে নালিশ করিয়া আসিল। মহকুমার আদালতে, তাহার পর জেলার বড় আদালতে তাহাদের বিচার চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একদিন রমেশের গরুর গাড়ির গোঁজকাটি দুইটা হারাইয়া গেল। রমেশের পত্নী ও পুত্রবধূ বলিল এ দুইটি পরাণের পুত্র চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহারা ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

ইহা লইয়া আবার নালিশ হইল। বাড়ীতে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদটা একটা নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে পরাণের সহিত রমেশের হাতাহাতিও হইত। ছোট ছেলেরাও বাপ কাকার দেখাদেখি পরস্পর গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। নদীর ঘাটে জল আনিতে কাপড় কাচিতে গিয়া পাঁচজন পাড়ার স্ত্রীলোকের সম্মুখে দুইপরিবারের স্ত্রীলোকদের মধ্যেও ঝগড়াটা নিত্যই চলিত।

পুরুষদের মধ্যে আড়ি ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল। ক্রমে তাহারা সুবিধা- ও সুযোগ-মত অন্যের জিনিষ আনিয়া নিজের ঘরে পুরিতে আরম্ভ করিল। বালকেরাও পিতামাতার দেখাদেখি ঐরূপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের নালিশের জ্বালায় অস্থির হইয়া ক্রমে গ্রামের পঞ্চায়েৎ আর তাহাদের নালিশ শুনিত না। জীবনটা উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

একজন অপরকে কোন বিষয়ে শাস্তি দেওয়াইলে অন্যে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। দুইটা কুকুর যেমন যতই অধিকক্ষণ ঝগড়া করে ততই পরস্পরের প্রতি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে, সে সময় এক জনকে কোন লোক ঢিল মারিলেও সে যেমন অন্য কুকুর তাহাকে কামড়াইল মনে করিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়, এই কৃষকদ্বয়ের অবস্থাও ক্রমে সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

এইরূপে ছয় বৎসর ধরিয়া ঝগড়াটা কেবল বাড়িয়া চলিতে লাগিল। বৃদ্ধ হরিশ প্রায়ই পুত্রকে বলিত,—"আর কেন, ঝগড়াটা এবার মিটিয়ে ফেল;—নিজের কাজে মন দাও। যতই বেশী হিংসে করবে ততই ওটা বাড়তে থাকবে। এমন জিনিষ নয় ও,—আগুনের ফুল্‌কি।"

পরাণ কথাগুলো শুনিয়া যাইত; সেগুলা পালন করিবার প্রয়োজন একদিনও সে বুঝিতে পারিত না।

কলহের সপ্তম বৎসরে পরাণের মধ্যম পুত্রের বিবাহ হইল এই গোলমালের সময় পরাণের একটা দামড়া গরু হারাইয়া গেল। পরাণের পুত্রবধূ বলিল,—এ সেই মুখপোড়ার কাজ; কাল সন্ধ্যাবেলা সে গোয়ালের কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি নিজে চোখে দেখেছি।

কথাটা রমেশের কানে পৌঁছিতেই সে মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; হিতাহিতজ্ঞান তাহার লোপ পাইল; উন্মত্তের মত ছুটিয়া পরাণের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সে বলিল,—তবে রে হারামজাদি ছোট লোকের ঝি। আমায় তুই গরু চুরি করতে দেখেছিস—তবে এই দেখ—বলিয়া সে পরাণের পুত্রবধূকে সজোরে এক চড় মারিল। যুবতী তখন গর্ভবতী ছিল। চাষার মরদের একখানি চড় খাইয়াই সে শুইয়া পড়িল। পরাণ বা তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন বাড়ী ছিল না; কাজেই বিনা বাধায় রমেশ চলিয়া গেল।

পরাণ বাড়ীতে পা দিতেই তাহার স্ত্রী ঘটনাটা সালঙ্কারে তাহার গোচর করিল। কথাটা শুনিয়া পরাণের আনন্দের সীমা রহিল না। সে বলিল,—"হারামজাদাকে এবার ঘানি টানিয়ে তবে ছাড়ব।"

সে পঞ্চায়েতে নালিশ করিতে গেল কিন্তু পঞ্চায়েৎ সে কথায় মোটেই কর্ণপাত করিল না। তখন পরাণ আদালতে রমেশের নামে নালিশ করিল। পরাণ নাজিরকে হাত করিয়া মকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া লইল। জজসাহেব হুকুম দিলেন রমেশকে পঁচিশ ঘা বেত মারা হইবে।

পরাণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কথাটা শুনিয়া রমেশ কি করে দেখিবার জন্য সে তাহার মুখের দিকে চাহিল;—দেখিল সে শবের মত পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। রমেশকে কাটগড়া হইতে নামাইয়া লইলে পরাণও তাহার অনুসরণ করিল। রমেশ আপন মনে বলিয়া উঠিল,—"বেশ, আজ না হয় আমি বেত খাব; খানিকটা জ্বলবে; কিন্তু আমিও ওকে এমন জ্বলান জ্বলাব যে সে

জ্বালা এর চেয়ে লক্ষগুণে বেশী হবে।" কথাটা পরাণের কানে গেল। সে ছুটিয়া আদালতে ফিরিয়া আসিল।

"দোহাই ধর্ম্মাবতার, আপনি সুবিচার করুন। রমেশ বলছে ছাড়া পেলেই ও আমার ঘর দোর জ্বালিয়ে দেবে, আমাদের পুড়িয়ে মারবে।"

বিচারক আবার রমেশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ যা বলছে তা সত্যি?"

"আমি কিছু বলতে চাই না। আপনার ক্ষমতা আছে কাজেই আমায় বেত মারছেন;—যেন একাই আমি দোষী! কিন্তু ও যে অত্যাচার কর্‌ছে তার কি কিছু সাজা নেই?"

সে আরও কি বলিতে চাহিতেছিল কিন্তু ক্ষোভে দুঃখে বলিতে পারিল না। তাহার তখনকার অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল যে সে ছাড়া পাইলেই পরাণের একটা-না-একটা অনিষ্ট করিবেই করিবে।

বৃদ্ধ বিচারক কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"ওহে দেখ, এক কাজ কর, কেন মিছে রেষারিষি করছ? আচ্ছা বাপু, তোমার কি গর্ভবতী স্ত্রীলোককে অমন ক'রে মারাটা উচিত হয়েছে? তুমিই ভেবে দেখ দেখি, যদি একটা ভালমন্দ কিছু হ'য়ে যেত! এ কি উচিত হয়েছে বাপু? বেশ, দোষ করেছ, স্বীকার কর, পরাণের কাছে মাপ চাও, সকল আপদ চুকে যাক। তা যদি তুমি করতে পার ত আমি এ বিচারফল প্রত্যাহার করতে রাজি আছি।"

পেষকার দেখিল পরাণের টাকাটা হাতছাড়া হইয়া যায়, কাজেই সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল,—"হুজুর এ যে অন্যায় কথা বলছেন। একবার যা হুকুম দিয়েছেন সে ত কোনো ধারায় রদ করতে পারেন না।"

বিচারক তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন,—"চুপ কর। আমি তোমার সঙ্গে সে বিষয়ে তর্ক করতে চাই না। ভগবানকে মেনে চলাই, বিচারের প্রথম ধারা,—আর তিনি চান শান্তি!"

বিচারক রমেশকে আবার সেই কথা বলিয়া সম্মত করিতে প্রয়াস পাইলেন। রমেশ কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

"আসচে বছরে আমার পঞ্চাশ বছর বয়স হবে;—আমার উপযুক্ত বিবাহিত পুত্র রয়েছে, এই বুড়ো বয়সে পরাণ আমায় বেত খাওয়ালে, আমি আবার তারই কাছে মাপ চাইতে যাব? কিছুতেই না; অনেক সয়েছি আমি......পরাণ যেন কথাটা মনে ক'রে রাখে।"

আবার তাহার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সে আর কিছুই বলিল না।

পরাণ সন্ধ্যার সময় গ্রামে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে ঢুকিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। রমণীরা নদীতে গা ধুইতে জল আনিতে চলিয়া গিয়াছিল; পুত্রেরা তখনও মাঠ হইতে ফিরে নাই। পরাণ আপনার ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তখন তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে সাজার কথা শুনিয়া রমেশের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। সেই সময় তাহার মনে হইল তাহাকে যদি ঐরূপ সাজা কেহ দেওয়াইত তবে তাহার কিরূপ মনের অবস্থা হইত! হঠাৎ সে শুনিতে পাইল তাহার বৃদ্ধ পিতা পাশের ঘরে কাশিতেছে। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পিতার নিকট গেল।

বৃদ্ধ বহুক্ষণ কাশিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'ল? রমেশের কিছু সাজা হ'ল নাকি?"

"হ্যাঁ, পঁচিশ ঘা বেত দেবার হুকুম হয়েছে, আজই সাজা হবে।"

রমেশের দুঃখে সাহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধ মস্তক আন্দোলন করিল। বলিল,—"বড়ই কাজটা খারাপ হ'ল। বড় ভুল করছ পরাণ। এর মন্দ ফল তোমার ওপর যতটা ফলবে, ততটা আর কারো ওপর ফলবে না জেনো।......বেশ, আদালত যেন তাকে বেত মারলে,—কিন্তু তাতে তোমার লাভ কি হল বাপু?"

"এতে তার শিক্ষা হবে, এমন কাজ আর কখনও করবে না।"

"হ্যাঃ, আর করবে না সে! না, আরো বেশী করে' করবে? কিন্তু করেছে কি, আগে তাই বল ত? তোমার চেয়ে তার দোষ কোনখানটায় বেশী?"

"কি না করেছে সে? আর একটু হ'লেই আমার বউমাকে ত মেরেই ফেলেছিল! আবার এখন ত আমার

ঘর জালিয়ে দেবে বলছে। এততেও তার দোষ হ'ল না?"

হরিশ একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"পরাণ, তোমরা মনে কর আমি ঘরের মধ্যে পড়ে আছি কাজেই কিছুই বুঝতে পারি না, দেখতে পাই না, যত দেখ বোঝ তোমরা......হারে বোকা! তোমরাই বরং দেখতে পাওনা, প্রতিহিংসা যে তোমাদের কাণা ক'রে রেখেছে, দেখবে কি? তোমরা দেখতে পাও শুধু পরের দোষটা, নিজেদের দেখবার তোমাদের সামর্থ্য নেই! লোকে পরের কুঁজ দেখে হাসে কিন্তু দেখতে পায় না আপনার পিঠে কত বড় কুঁজ রয়েছে। জগতের নিয়মই এই, শুধু তুমি আমি নই, জগত সুদ্ধ এমনি কাণা, একচোখো! তোমরা বল 'অমুক এই অন্যায় করেছে!'—কি ক'রে যে বল তা বুঝতে পারি না। এক হাতে কখনও তালি বাজে? তুমি যদি না কথা কও ত সে একা কতক্ষণ বকবে? দুজনের দোষ না থাকলে কখনও একটা ঝগড়া হতেই পারে না। পরের মাথার টাকটা লোকের চোখে খুব শিগ্‌গির পড়ে কিন্তু নিজের মাথায় যে তার দ্বিগুণ টাক রয়েছে তা সে দেখতেও পায় না। রমেশ যদি একা মন্দ হত, আর তুমি আমি যদি তা না হতাম, তা হ'লে রমেশের সাধ্যি কি সে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে? প্রথমে তার দাড়ি টেনে ছিঁড়লে কে বাবা? আদালতের পথ দেখালে কে তাকে? এত করেও তুমি তার ঘাড়ে সব দোষটা চাপাতে চাও পরাণ? তোমরা সংসারের ভার নিয়েই একটা বিষম ভুল করেছ। আমাদের সময় কিন্তু এমন ছিল না।—আমাদের শিক্ষাও এমন নয়। এ তোমরা ভুল পথে চলেছ। আমরা কেমন ক'রে সংসার করতুম শুনবে? ঠিক প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যেমন ব্যবহার হওয়া উচিত রমেশের বাপের সঙ্গে আমার তেমনি ব্যবহার ছিল। রমেশের বাপের কিছু দরকার হ'লে, রমেশকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিত; রমেশ এসে বলত 'কাকা আমাদের অমুক জিনিষটার দরকার পড়েছে।' আমি বলতুম 'নিয়ে যাও না বাবা তোমার খুড়িমার কাছ থেকে'। আবার আমার কিছু দরকার হ'লে তোমাকে বলতুম 'যা ত পরাণ, তোর রমণ জ্যাঠার কাছ থেকে অমুক জিনিষটা চেয়ে আন ত।' তখুনি রমণদা তা পাঠিয়ে দিত। কেমন কাটিয়েছি আমরা বল দেখি? সংসারেও বেশ সুখ ছিল, রাতদিন এমন খিটিমিটি ছিলনা। আর এখন?......লোকে বলে কুরুক্ষেত্রে নাকি একটা খুব বড় যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তোমাদের দুজনের মধ্যে নিত্যি এই যে লড়াই চলেছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এর চেয়ে আর বেশী বড় কি? আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! অমনি ক'রে কি লোকে সংসার করে গা?......পূর্ব্বজন্মের অনেক পাপ না থাকলে এমনটা হয় না। তুমি বড় হয়েছ, সংসারের কর্ত্তা, এখন যা কিছু করবে সবের ঝুঁকিই তোমার ঘাড়ে পড়বে। এমনি ক'রে বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলোকে কি পথ দেখাচ্চ তা একবার ভেবে দেখেছ কি? সে দিন দেখি তোমার নাতি সুরে পাড়ার লোককে যাচ্ছেতাই গাল পাড়ছে, আর দোরের পাশে তার মা দাঁড়িয়ে মজা দেখছে আর হাসছে। এমন করে কি ছেলেমেয়ে মানুষ হয়? তাদের ভাল মন্দ, সুকু'র জন্যে তুমি দায়ী তা জান কি?......নিজের পরকালের কথাটা একবার ভেবে দেখছ কি? পারের জন্যে কি পারাণি দিচ্ছ? কেবল কতকগুলো মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা আর প্রতিহিংসা! একটাও জিনিষের মত জিনিষ নিয়েছ কি?......কি; কথা কচ্চ না যে? যা বল্লুম সেগুলো কানে গেল কি?"

পরাণ নীরবে পিতার কথাগুলা শুনিয়া যাইতেছিল।

বৃদ্ধ হরিশ একসঙ্গে অনেকগুলা কথা বলিয়া হাঁপাইয়া গিয়াছিল। তাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, বহুক্ষণ ধরিয়া সে কাশিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে কাশি থামিলে সে আবার বলিল,—"ভাব দেখি বাপু, এ বছর এই মামলা মকদ্দমায় কতগুলো টাকা জলের মত খরচ হ'য়ে গেল। সত্যি করে বল দেখি পরাণ, এ কুরুক্ষেত্র আরম্ভ হবার আগে ভাল ছিল, না এটা আরম্ভ হ'য়ে ভাল হয়েছে? এ বছর যে আউস ধানটা রোয়াই হ'ল না তার কারণ কি বলত? শুধু এই ঝগড়ার জন্যেই না? ....তাই বলচি বাপু, নিজের কাজে মন দাও; আগেকার মত ছেলেদের নিয়ে মাঠে কাজ আরম্ভ কর, মনে শান্তি পাবে। কেউ যদি অনিষ্ট করে, তবু ক্ষমা কোরো তাকে, ভগবান খুসি হবেন, প্রাণেও শান্তি পাবে।"

পরাণ নীরবে কথাগুলা শুনিল, একটাও উত্তর দিল না।

"বাবা পরাণ, এ বুড়োর কথাগুলো শোন্। এ ঝগড়া মিটিয়ে ফেল্। একবার এখুনি সদরে যা, রমেশের সাজাটা যাতে না হয় তাই কর্। এত শীগ্‌গির বোধ হয় সাজা দেবে না। কালই তুই মোকদ্দমা মিটিয়ে ফেলিস। কেন এ মিছে ঝগড়াঝাঁটি? যা, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ব'লে দে কেউ যেন পাড়াপড়শীর সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার না করে।"

পরাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। তখন তাহার মনে হইতেছিল পিতার কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য—দুর্ব্ব্যবহার সর্ব্বপ্রথম সেই ত করিয়াছে! কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না এ ঝগড়াটা মিটাইয়া ফেলিবে কি করিয়া?

বৃদ্ধ পুত্রকে নীরব দেখিয়া বলিল,—"যাও বাবা, কথাটা শোন। আগুন জ্বলবার আগে নিভিয়ে ফেল, দেরি হলে আর সময় পাবে না।"

বৃদ্ধ আরও কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময়ে বাড়ীর মেয়েরা নদী হইতে জল লইয়া কলরব করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। রমেশের সাজার কথা ও তাহার ঘরে আগুন লাগাইবার কথাটা ইতিমধ্যেই তাহাদিগের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাহারা আরও একটা নূতন সংবাদ দিল—রমেশ বেত খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। পরাণ সব কথা শুনিল। পিতার কথা শুনিয়া তাহার হৃদয়ে যে শান্তি আসিয়াছিল এখন এই নূতন সংবাদে তাহার হৃদয় হইতে সে শান্তির আলোকটুকু নিভিয়া গেল, রহিল শুধু তাহার জ্বালা ও কালি।

কাজ করিলে সংসারে কাজের অভাব হয় না। পরাণ স্ত্রীলোকদিগের সহিত কোন কথার আলোচনা না করিয়া বাহিরের কয়েকটা খুচরা কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিল। এই সময়ে তাহার পুত্রগণ মাঠ হইতে কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিল। পরাণ তাহাদের নিকট হইতে গরুগুলাকে লইয়া গোয়ালে বাঁধিয়া দিল। তাহার পর স্বহস্তে সে তাহাদিগের জাব মাখিয়া ডাবায় দিল। কাজটা শেষ হইলে তাহার মনে পড়িল অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হয় নাই। সে আপনার থেলো হুঁকাটি লইয়া নিজেই তামাক সাজিতে বসিল। কলিকায় ঠিকরা দিয়া তামাক লইতে গিয়া দেখিল তামাক নাই! ঠিক এই সময়ে সে বাহিরে রমেশের গলা শুনিতে পাইল। রমেশ বলিতেছে—"এতে আমায় ত ভারি-ই জব্দ করলে! কিন্তু এর প্রতিশোধ চাই!—আমায় অপমান করা—দশের মাঝে বেত খাওয়ান, বটে! খুন করব হারামজাদাকে, রক্ত না দেখে ছাড়ছি না;—না পারি ত আমি ঘোষের পো নই। দেখে নেব ওরই একদিন কি আমারই একদিন!" পরাণ কতকটা শান্ত হইয়াছিল কিন্তু রমেশের কথাগুলা শুনিয়া সে আবার হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিল। তামক সাজা ভুলিয়া গিয়া সে স্থির হইয়া রমেশের কথাগুলা শুনিতে লাগিল। তাহার কথা শেষ হইলে পরাণ হুঁকার মাথায় শূন্য কলিকাটি বসাইয়া দাওয়ায় গিয়া বসিল।

পরাণের পুত্রবধূ দাওয়ায় বসিয়া রাঁধিতেছিল। তাহার রন্ধন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অদূরে দেবরেরা পাত করিয়া বসিয়াছিল; শাশুড়ি তাহাদিগকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেষণ করিতেছিলেন; এমন সময় পরাণ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। রুক্ষ স্বরে বলিল,—"দরকারের সময় একটু তামাকও পাওয়া যায় না, ভাল জ্বালাতেই পড়া গেল দেখচি। সময় মত বল্লেই হয়, তা নয়। ওরে নরেশ, খেয়ে উঠে ও-পাড়ার মথুরের দোকান থেকে আধসের কড়া তামাক আনিস ত।"

এই বলিয়া পরাণ আবার শূন্য পাত্রটার কাছে ফিরিয়া আসিল এবং অবশিষ্ট যেটুকু ছিল, চাঁচিয়া ঝাড়িয়া তাহাই সাজিয়া খাইতে বসিল।

নরেশের ভাত খাওয়া হইলে সে মায়ের কাছ হইতে পয়সা লইয়া দা-কাটা কড়া তামাক আধসের আনিতে গেল। পরাণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির অবধি আসিল এবং দ্বারটা বাহির হইতে ভেজাইয়া দিয়া সে অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নানা কথা তখন তাহার মনে হইতেছিল; সে ভাবিতেছিল,—"চারিদিক ত খট্‌খটে শুক্‌নো, কোথাও ছিটে ফোঁটা জল নেই, গরমও বেশ ফুটেছে। সে যদি চোরের মত এসে একটা দেশলাই জ্বেলে চালের পাতায় ফেলে দেয় তা হলেই ত সব জ্বলে

উঠবে! বেটা আমার সর্ব্বস্ব পুড়িয়ে দিয়ে অমনি পালাবে? তা কিছুতেই হ'তে দেব না।......একবার যদি বেটাকে হাতে নাতে ধরতে পারি!" তখন তাহার রমেশকে ধরিবার ইচ্ছাটা এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে সে বাড়ীর ভিতর না ঢুকিয়া একবার বাড়ীর কানাচটা ঘুরিয়া আসিবার মৎলব করিল। সে চোরের মত ধীরে ধীরে চলিতেছিল। ঠিক বাঁকের মাথায় আসিয়া তাহার মনে হইল ঠিক তাহার বিপরীত দিকের মোড়ের কাছে কে যেন হঠাৎ নড়িয়া উঠিল। পরাণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল; চারিদিক আবার পূর্ব্বের মত স্থির ধীর! অন্ধকারটা প্রথম তাহার নিকট অত্যন্ত গাঢ় বলিয়া মনে হইতেছিল, কিছুক্ষণ থাকিবার পর সেটা চক্ষে সহিয়া গেল। সে দেখিল সেখানে একটা লাঙ্গল পড়িয়া আছে, আর কিছুই নাই। "তবে বোধ হয় ভুল হয়েছে! তা হোক তবু একবার চারিদিকটা দেখে আসি।" এমনি ধীর পদে মার্জ্জারের মত সে অগ্রসর হইতেছিল যে আপনার পদশব্দ আপনিই শুনিতে পাইতেছিল না। সে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত বাঁকের মাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। চকিতের মত লাঙ্গলটার কাছে কি একটা জ্বলিয়া উঠিয়া আবার তখনি নিভিয়া গেল। পরাণের বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল। সেইখানেই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা আলোক পূর্ব্বোক্ত স্থানে জ্বলিয়া উঠিল; সেই আলোকে পরাণ স্পষ্ট দেখিতে পাইল যে একজন লোক মাথায় গামছা বাঁধিয়া গুড়ি মারিয়া অগ্রসর হইতেছে; তাহার হাতে একটা খড়ের আঁটি ছিল, সে একমনে সেইটাই জ্বালিতেছিল। পরাণের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল; শরীরের প্রতি শিরা উত্তেজনায় স্ফীত হইয়া উঠিল। সে আত্মবিস্মৃতের মত বলিয়া উঠিল,—"পালাতে দিচ্চি না, যেমন ক'রে পারি ধরতে হবে।"

তখনও লোকটার কাছে পরাণ পৌছিতে পারে নাই; হঠাৎ দেখিল খড়ের আঁটিটা ধাউ ধাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এবার আগুনটা একটু তফাতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে পরাণের চালা জ্বলিয়া উঠিল; আর বিস্মিত পরাণ দেখিল সেই আগুনের কাছে খড়ের নুটি হাতে করিয়া রমেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বাজপাখীর মত সে রমেশকে ধরিতে ছুটিল। রমেশ বোধ হয় তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, কারণ সে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া ছুটিয়া পলাইল। পরাণ তাহার পিছু পিছু ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া উঠিল,—"পালাবে কোথা? সেটি হচ্চে না চাঁদ!" সে লাফাইয়া রমেশকে ধরিতে গেল কিন্তু পারিল না, কেবল তাহার কাপড়ের খানিকটা ছিন্নাংশ হাতে রহিয়া গেল। পরাণ ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। তখনই আবার উঠিয়া পড়িয়া সে ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে লাগিল,—"ওগো ধর, ধর! চোর! খুনে!" ইতিমধ্যে রমেশ তাহার বাড়ীর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পড়িল; পরাণও তাহার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল; প্রায় ধরে ধরে এরূপ সময়ে কি একটা আসিয়া তাহার মাথায় ভীষণ ভাবে লাগিল। রমেশ একটা বংশদণ্ড তুলিয়া লইয়া সজোরে পরাণের মাথায় মারিয়াছিল।

পরাণের মাথা ঘুরিয়া উঠিল; চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল আলোক যেন নিভিয়া গেল; সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় সে মাটিতে পড়িয়া গেল। যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল তখন সে দেখিল সেখানে রমেশ নাই, চতুর্দ্দিক দিবালোকের মত উজ্জ্বল আলোকে ভরিয়া গিয়াছে। গোয়ালের দিক হইতে একটা আর্ত্তনাদ একটা ছুটোপাটির শব্দ আসিতেছে। পরাণ চাহিয়া দেখিল আগুন—আগুন—কেবল চারিদিকে আগুন!

পরাণ বক্ষে ও কপালে করাঘাত করিয়া উঠিয়া বসিল। একবার মনে করিল চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবে, সাহায্য চাহিবে। কিন্তু হা অদৃষ্ট! এ তাহার কি হইল? গলা দিয়া স্বর বাহির হয় না যে মোটে! একি? একবার মনে করিল দৌড়িবে কিন্তু চেষ্টা করিয়াও সে উঠিতে পারিল না। হামা দিয়া অগ্রসর হইতে চাহিল কিন্তু দুই পদ গিয়াই সে হাঁফাইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নি অনেকটা পথ অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল। পাশে পাশে লাগোয়া বাড়ী,—সব চালাঘর; অগ্নিদেব যেন কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা উদরে পুরিয়া

সর্ব্বগ্রাসে উদ্যত হইয়াছিলেন। অগ্নিকাণ্ড দেখিতে বহুলোক আসিয়া জুটিয়াছিল কিন্তু কেহ অগ্নি নিভাইতে অগ্রসর হয় নাই; সকলে দূরে দাঁড়াইয়া জল জল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। যাহাদিগের বাটী পরাণের চালার পাশে তাহারা ক্ষিপ্রহস্তে স্ব স্ব গৃহ হইতে জিনিষ-পত্র বাহির করিয়া ফেলিতেছিল পরাণের সাহায্যার্থ একটি প্রাণীও অগ্রসর হয় নাই। দেখিতে দেখিতে রমেশের চালাতেও আগুন ধরিয়া গেল। এই সময় অগ্নিসখা পবনও বেশ জোরে বহিতেছিল, কাজেই অগ্নি সহজেই এক চালা হইতে অন্য চালায় অগ্রসর হইতে লাগিল।

পরাণের বাড়ীর লোকগুলা কোন মতে এক বস্ত্রে পরাণের বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া অগ্নির মুখ হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সংসারের একটা জিনিষও কেহ উদ্ধার করিতে পারিল না। বাক্স পেঁটরা, গরু বাছুর প্রভৃতি সকলই অগ্নিদেবের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার আহার হইল।

রমেশ গরু বাছুর ও আর কয়েকটা জিনিষ কোন মতে বাহিরে আনিতে পারিয়াছিল। তাহারও অবশিষ্ট সমস্ত পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

সারারাত্রি ধরিয়া এই অগ্নিকাণ্ড চলিল। পরাণ গোয়ালঘরের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল; মাঝে মাঝে বলিতেছিল,—"এ কি এ? অঁ্যা .....এসব কি?...... কেউ নিবুতে পার না; ওগো যাও না, সব গেল যে আমার!......ওগো!......"

ক্রমে ঘরের মটকা ভাঙ্গিয়া পড়িল। পরাণ পাগলের মত ছুটিয়া সেই অগ্নিসমুদ্রে প্রবেশ করিল; ইচ্ছা, যদি একটা গরুও বাঁচাইতে পারে! অগ্নি তখন লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল। বাড়ীর দুইজন রমণী দেখিতে পাইল পরাণ সেই অগ্নিসমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে! তখনই তাহারা ঈশানকে পাঠাইয়া দিল। সে যখন পরাণকে বাহিরে লইয়া আসিল তখন পরাণের চেতনা ছিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল, মাথার চুলগুলা পুড়িয়া গিয়াছিল। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—"একি এ? এ আমার কি হ'ল? ......এসব কি? অঁ্যা?......? এখন কি আর নেভাবার উপায় নেই? এখন কি আর নেভান যায় না?—হ্যাগা?"

সকাল বেলা গ্রামের পঞ্চায়েতের মণ্ডল প্রসাদ ঘোষের পুত্র পরাণকে ডাকিতে আসিল।

"পরাণকাকা তোমার বাবা যে মরমর হয়েছে! একবার শেষ দেখা দেখতে চায়। এস!"

পরাণের কোন কথা মনে ছিল না; শোকে তাহার স্মৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কে? বাবা? ডেকেছে?—কাকে ডেকেছে বল দেখি?"

"পরাণকাকা তোমায় ডেকেছে, একবার মরবার আগে শেষ দেখা করতে চায়। আমাদের বাড়িতে আছে, এস!"—বলিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

বৃদ্ধকে সময়-মত বাহির করা হইলেও কতকগুলা জ্বলন্ত পাতা তাহার গায়ে পড়িয়াছিল। ক্ষয়রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ তাহাতেই মৃতপ্রায় হইয়াছিল।

পরাণ যখন পিতার নিকট উপস্থিত হইল তখন সেখানে মাত্র প্রসাদ ঘোষের স্ত্রী উপস্থিত ছিল। বাড়ীর পুরুষরা অগ্নিকাণ্ড দেখিতে গিয়াছিল। কয়েকটা ছোট ছেলে উঠানে খেলা করিতেছিল। পরাণ পিতার কাছে আসিয়া হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ বলিল,—"বলেছিলুমনা পরাণ, যে, এ আগুনের ফুলকি এইবেলা নিভিয়ে ফেল? এই সারাগ্রামটা পুড়ল। কে পোড়ালে বল ত?"

"সে বাবা সে! আমি তাকে হাতে নাতে ধরেছিলুম, কিন্তু রাখতে পারলুম না! হায়, হায়, হায়! তখন যদি নিভিয়ে ফেলতে পারতুম, তাহলে আর এত কাণ্ড হ'তে পেত না!"

"পরাণ! আমি ত মরতে বসেছি, তুমিও একদিন মরবে, সত্যি ক'য়ে বল দেখি এ পাপের জন্যে দায়ী কে?"

পরাণ চুপ করিয়া পিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, একটা কথাও বলিতে পারিল না।

"বল পরাণ বল, চুপ ক'রে রইলে যে? মাথার ওপর

ঈশ্বর আছেন, সব দেখছেন তিনি, বল, বল! আমি ত আগেই বলেছিলুম তোমায়!"

চকিতে একবার পরাণের সহজ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে পিতার পায়ের কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া বালকের মত দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"পাপী আমি বাবা! ক্ষমা কর আমাকে! ভগবান! ভগবান! ক্ষমা কর পাপীকে!"—তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলিল; তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিল,—"তাই বল বাবা, তাই বল! ভগবান ক্ষমা করবেনই—পাপীকে ত্রাণ করাই তাঁর কাজ! তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় ক্ষমা পাবে।" বৃদ্ধের দুই চক্ষু বহিয়া ভক্তি-অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে বৃদ্ধ ডাকিল,—"পরাণ! বাবা পরাণ!"

"কি বাবা?"

"এখন কি করবে মনে করছ?

পরাণ বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। "জানি না বাবা কি করব, কি ক'রে যে সংসার চালাব তা ত বুঝতে পারছি না।"

"পারবে বাবা, পারবে। কোন ভাবনা নেই, যিনি সংসারে পাঠিয়েছেন তিনিই দুবেলা দুমুঠোর যোগাড় ক'রে দেবেন। তাঁর নির্দ্দেশ-মত চললে কোন কষ্ট পেতে হবে না।" বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিল,—"কথাটা মনে রেখো পরাণ! এ আগুনের কথা কাউকে ব'ল না, কে আগুন দিয়েছে তা যেন কেউ জানতে না পারে। এইখানে এই আগুন চাপা পড়ে যাক।"

* * * *

যথাসময়ে এ অগ্নিকাণ্ডের অনুসন্ধান হইয়াছিল কিন্তু পরাণ কাহারও নাম করে নাই।

রমেশ প্রথমটা বড়ই ভীত হইয়াছিল। কিন্তু পরাণ যখন কাহারও নাম করিল না তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে আসিয়া পরাণের হাতে ধরিয়া চোখের জলে নিজের সমস্ত অপরাধ ধুইয়া ফেলিয়া গেল। ধীরে ধীরে পরাণের সহিত তাহার শত্রুতা চুকিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব হইল।

পর বৎসর পরাণের জমিতে দ্বিগুণ শস্য হওয়ায় অগ্নিকাণ্ডের পর তাহার যে ঋণ হইয়াছিল তাহা অনেকটা পরিশোধ হইয়া গেল।*

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* টলষ্টয়ের গল্প অনুসরণে।

কষ্টিপাথর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

এতদিনে জ্যোতিবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। "কিঞ্চিৎ জলযোগ" নামক একখানি প্রহসন তাঁহার প্রথম রচনা। "এ সময়ে আমি পুরাতনপন্থী ছিলাম, তাই মেয়েদের স্বাধীনতা-ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম। এই বই লইয়া —নব্যপন্থীদলে—খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। "বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভালই বলিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় বিলাত হইতে দেশে ফিরেন। "কিঞ্চিৎ জলযোগ" পড়িয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এতে দোষের কথা ত আমি কিছুই দেখিতেছি না। নেশনল থিয়েটারে বইখানির অভিনয়ও হইয়া গিয়াছিল।

"এর কিছুদিন পরে মেজদাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্ত্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন তখন আমারও মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধপ্রথার বিরোধী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। তখন স্ত্রীস্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি "কিঞ্চিৎ জলযোগ" লিখিয়াছিলাম বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। "কিঞ্চিৎ জলযোগের" দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই। স্ত্রীস্বাধীনতার সম্বন্ধে শেষে আমি এত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, আমি যখন গঙ্গার ধারের কোন বাগান-বাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থান করিতেছিলাম, তখন আমার স্ত্রীকে আমি ঘোড়ায় চড়া শিখাইতাম। তারপর জোড়াসাঁকো আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায় দুজনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত রোজ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে দুইজনে ঘোড়া ছুটাইতাম। এইরূপে অন্তঃপুরের পর্দ্দা ত উঠাইলামই, সেই সঙ্গে আমার চোখের পর্দ্দাটিও একবারে উঠিয়া গেল! দারোয়ানেরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি তখন উদ্দাম নব্যভাবের নেশায় মাতোয়ারা।

"এর পরেই আমার উপর আমাদের জমিদারী পরিদর্শন ও সংসারের ভার পড়িল। হিন্দুমেলার পর হইতেই আমার মনে হইয়াছিল—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ-প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিলে বোধহয় কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত

হইয়া কটকে থাকিতে "পুরুবিক্রম" নাটক রচনা করিলাম। পুরু-বিক্রমের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে "পুরুবিক্রম বীররসের প্রতীয়ান্।"

"পুরুবিক্রম শেষে গুজ্‌রাটী ভাষায় অনূদিত হয়। ইয়ুরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী Sylvin Levi সাহেব গুজরাটী সাহিত্যের সমালোচনায় পুরুবিক্রমের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এখানি যে আমরাই পুরুবিক্রমের অনুবাদ, তাহা তিনি জানিতেন না।"

সত্যেন্দ্রনাথের "গাও ভারতের জয়" গানটি পুরুবিক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রেট ন্যাশানেল থিয়েটারে অভিনয়ের সময় ঐ গানটিতে যে সুর থিয়েটারওয়ালারা দিয়াছিলেন সেই সুরেই ইহা এখনও গীত হয়।

"তার পর বেঙ্গল থিয়েটারেও নাটকখানি অভিনীত হয়। ছাতুবাবুদের বাড়ীর শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুরু সাজিয়াছিলেন। শরৎ বাবুর একটি অতি সুন্দর শাদা আরব ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি যেমন তেজীয়ান্ তেমনি সায়েস্তাও ছিল। এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি উন্মুক্ত অসি হস্তে অল্পপরিসর নাট্যমঞ্চের উপর আস্ফালন-পূর্ব্বক ঘোরা-ফেরা করিতেন এবং সৈন্তদিগকে উত্তেজিত করিতেন। ঘোড়াটি কিন্তু এমন সায়েস্তা যে নীচে ফুটলাইট (foot light), চারিদিকে গ্যাসের উজ্জ্বল আলো, দর্শকগণের ঘনঘন করতালিধ্বনি, যুদ্ধের বাজনা প্রভৃতিতে কিছুমাত্র ভীত হইত না। এইরূপে এই দৃশ্যে বীররসের অতি চমৎকার অবতারণা করা হইত।

"ইতিপূর্ব্ব হইতে বড়লোকদের ভিতরে ঘোড়ায় চড়ার একটা খুব সখ্ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত শরৎবাবু, ঠাকুরদাস মাড়, অপু গুহ প্রভৃতি অনেকে মিলিয়া কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে একটা ঘোড়-দৌড়ের মাঠ ঠিক করিয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়ও দুই একবার হইয়াছিল। তারপর রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের পুত্র ঘোড়া হইতে পড়িয়া যেমন মারা গেলেন অমনি সকলের ঘোড়াচড়ার বাতিকও ঠাণ্ডা হইয়া গেল।"

তার পর কটক হইতে কলিকাতা আসিয়া জ্যোতিবাবু "সরোজিনী" রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীতে রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। জ্যোতিবাবু ও রামসর্ব্বস্ব দুই-জনে রবিবাবুর পড়ার ঘরে বসিয়াই "সরোজিনীর" প্রুফ সংশোধন করিতেন। রামসর্ব্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবিবাবু শুনিতেন ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া কোন্ স্থানে কি করিলে ভাল হয় এমনি মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতা-প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে জ্যোতিবাবুর একটা গদ্য রচনা ছিল, কিন্তু রবিবাবু তাহার স্থানে "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" কবিতাটি রচনা করিয়া সেই গদ্যটার স্থানে বসাইতে বলেন। জ্যোতিবাবু দেখিলেন যে এই কবিতাটিই সেখানে সুপ্রযুজ্য, তাই তিনি গদ্যের পরিবর্ত্তে এই কবিতাটিতে সুরসংযোগ করিয়া সেইস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন। "সরোজিনী প্রকাশিত হইবামাত্রই কলিকাতার সাধারণ থিয়েটারে অভিনীত হইয়া গেল। কলিকাতার আর্ট স্কুলের তদানীন্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বাক্‌চী মহাশয় সরোজিনীর শেষ দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সে চিত্রখানি পৌরাণিক দেব দেবীর চিত্রের সঙ্গে বাজারে বহুদিন পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছিল। যাত্রার দলেও সরোজিনী অভিনীত হইতে লাগিল। সরোজিনী যাত্রা একবার জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতেও হইয়াছিল। সরোজিনীর গান তখন সভায়, মজ্‌লিশে, বৈঠকে সর্ব্বত্র গীত হইত।

"সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে আমাদের দলে প্রোমোশন্ দিয়া উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত-ও-সাহিত্য-চর্চ্চাতে আমরা তিনজন হইলাম—আমি, অক্ষয় (চৌধুরী), ও রবি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার ভগিনী, এখনকার ভারতীসম্পাদিকা, আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায় সাহিত্য-চর্চ্চায় তাঁহাকেও আমাদের একজন সঙ্গীরূপে পাইলাম।"

ভারতী প্রকাশের ইতিহাস এইরূপ। একদিন জ্যোতিবাবু তাঁহার তেতালার ঘরে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত দুইজনের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে সাহিত্যবিষয়ক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে হইবে। যেমন কথা অমনি কাজ। তৎক্ষণাৎ জ্যোতিবাবু দ্বিজেন্দ্রবাবুকে এ কথা জানাইলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুও এ প্রস্তাবে মত দিলেন। এখন এ পত্রের নাম কি হইবে, এই সমস্যার সমাধানে সকলে যত্নবান্ হইলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু নাম বলিলেন "সুপ্রভাত" কিন্তু এ নাম জ্যোতিবাবুদের মনোনীত হইল না, কারণ ইহাতে যেন একটু স্পর্দ্ধার ভাব আছে, অর্থাৎ এতদিনে যেন বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রভাত হইল। সুপ্রভাত নাম যখন গ্রাহ্য হইল না, তখন দ্বিজেন্দ্র বাবু আবার তাহার নাম রাখিলেন "ভারতী"। সেই ভারতী আজও পর্য্যন্ত তাঁহার ভগিনীদেবীর যত্নে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের বাল্যস্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "ভারতী প্রকাশ উপলক্ষে আমাদের আর একজন বন্ধু লাভ হইল। ইনি কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত—একজন খাঁটি কবি। সর্ব্বদাই তিনি ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। যখন কোনও সাহিত্য-আলোচনা হইত অথবা কোনও বিষয় চিন্তা করিতেন, তখন তামাক টানিতে টানিতে চক্ষু দুইটি বুজিয়া তিনি ভাবে ভোর হইয়া যাইতেন। আমাদের বাড়ী যখনই আসিতেন তখনই তিনি আমায় বেহালা বাজাইতে বলিতেন। তন্ময় ভাবে বেহালা শুনিতেন।"

ভারতীর প্রথম বর্ষে 'সম্পাদকের বৈঠকে' "গল্পিকা" নামে একটা ভাগ ছিল। তাহাতে কেবল ব্যঙ্গকৌতুকের কথাই থাকিত। এই-ভাগে দ্বিজেন্দ্রবাবুই প্রায় সব লিখিতেন। জ্যোতিবাবু "উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ বা রানিয়াড্" নামে কেবল একটা নক্সা লিখিয়া-ছিলেন। জ্যোতিবাবু তখন অনেক বিষয়েই লিখিতেন। প্রথম বর্ষের "ভারতী"তে রবিবাবু ও অক্ষয়বাবুর লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল। "ভারতী'তে রবিবাবুর "মেঘনাদবধ' কাব্যের সমা-লোচনা ও কবিতা প্রথম বাহির হয়। অক্ষয়বাবু তখন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা এবং হৃদয়-ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেন, যেমন "মান ও অভিমানে কি প্রভেদ?" ইত্যাদি। লোকের এসব খুবই ভাল লাগিত। ভারতীর দ্বিতীয় বর্ষ হইতে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনায় পত্রিকার অনেক পৃষ্ঠা পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল।

অক্ষয়বাবুর কথায় জ্যোতিবাবু বলিলেন "অক্ষয় এম-এ বি-এল পাশ করিয়া এটর্নি হইয়াছিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনা আর কি! তাঁহার মত শিশুর ন্যায় সরল, বিশ্বাসপ্রবণ, ভাবুক এবং আসল কবি মানুষ কি কখনও সংসারকার্য্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে? তিনি সেক্‌সপীয়রের বড় ভক্ত ছিলেন; বাড়ীর কয়েকটি ছেলেকে তিনি সেক্‌সপীয়র পড়াইতেন; কিন্তু পড়াইতে পড়াইতে নিজেরই চক্ষুজলে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইত। তিনি যেখানে বসিতেন, সে জায়গাটা চুরুটের ভুক্তাবশেষ ছাই এবং দেশলাইয়ের কাঠিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। কোনও কল্পনা যদি কখনও তাঁহার মাথায় একবার ঢুকিত, তবে সেটা বাহির হওয়া বড়ই মুস্কিল

হইত। তাঁহাকে অতি সহজেই April fool করা যাইত। একবার রবি গোঁপ দাড়ি পরিয়া একজন পার্শী সাজিয়া তাঁহাকে বড় ঠকাইয়াছিলেন। আমি বলিলাম—বোম্বাই হইতে একজন পার্শী ভদ্রলোক এসেছেন, তোমার সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান। অক্ষয় অমনি তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। রবি ছদ্মবেশী পার্শী হইয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই রবিকে তিনি কতবার দেখিয়াছেন, কণ্ঠস্বর তাঁর পরিচিত, কিন্তু ঐ যে পার্শী বলিয়া তাঁর ধারণা হইয়াছে সে ত শীঘ্র যাইবার নয়! অক্ষয় বাবু বাইরন, শেলী প্রভৃতি আওড়াইয়া খুব গম্ভীর ভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ চলিতেছিল, আমরা হাস্য সংবরণ আর করিতে পারি না, এমন সময় শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই তিনি "এ কে?—রবি?" বলিয়া রবির মাথায় যেমন এক থাপ্পড় মারিলেন, অমনি কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ সব খসিয়া গেল। তখন অক্ষয়বাবু কিছুক্ষণ বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া রহিলেন; তখনও কল্পনার নেশাটা তাঁহার মাথা হইতে যেন সম্পূর্ণ ছুটে নাই। আরও দুই একবার তাঁহাকে এপ্রিল ফুল করিবার মৎলব করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার ঘরের চতুর মন্ত্রীটি সব ভণ্ডুল করিয়া দিতেন।"

"উদাসিনী" নামে একটি কবিতা তিনি প্রথম রচনা করেন। ইহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার খুব প্রশংসাও তখন হইয়াছিল। তারপর "ভারতগাথা" নামে কবিতায় তিনি একখানি ইতিহাস লেখেন। অক্ষয়বাবু বাঁয়া বাজাইতেও বড় ভালবাসিতেন। আসল যন্ত্রের অভাবে তিনি অনেক সময় টেবিলেই কাজ সারিয়া লইতেন। অক্ষয়বাবু প্রেমের গানই বেশী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সফর্দা—মধ্যমান

নিতান্ত না রইতে পেরে
দেখিতে এলাম আপনি
দেখ আর না দেখ আমায়
দেখিব ও-মুখখানি।
মনে করি আসিব না
এ মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে
কেন যে তাহা নাহি জানি।
এসেছি, দিব না ব্যথা,
তুলিব না কোন কথা,
সাধিব না, কাঁদিব না,
রব অমনি।
যেথা আছ সেথাই থাক
আর কাছে যাব না কো
চোখের দেখা দেখ্‌ব শুধু
দেখেই যাব এখনি॥

বেহাগ—মধ্যমান্

কেনইবা ভুলিব তোমায়
কে ভোলে হৃদয়-ধনে।
শূন্য হৃদয় লয়ে
কি সুখ বাঁচিয়ে প্রাণে।
আশাতে নিরাশা বলে'
তোমারে কি যাব ভুলে
সে ত নয় রে ভালবাসা
—সুখ-আশা মংগোপনে।
রাখিব না সুখ-আশা
চাহিব না ভালবাসা
ভাল বেসেই সুখী রব
মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমাখানি
দলিত হৃদয়ে আনি
জীবন-অঞ্জলি দিয়ে
পূজিব অতি যতনে॥

এক সময় জ্যোতিবাবু পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতেন। জ্যোতিবাবুর দুই পার্শ্বে অক্ষয়বাবু ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। জ্যোতিবাবু যেমন একটি সুর রচনা করিলেন অমনি ইঁহারা সেই সুরের ভাবের সঙ্গে কথা বসাইয়া গান রচনা করিতেন। একটি সুর তৈরি হওয়ার পর জ্যোতিবাবু আরও কয়েক বার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতেন। সে সময় অক্ষয়বাবু চক্ষু মুদিয়া বর্ম্মা সিগার টানিতে টানিতে মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্র ভাবে ধূম-প্রবাহ বহিত তখনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি চুরুটের টুকরাটি পিয়ানোর উপরেই রাখিয়া দিয়া, হাঁফ্ ছাড়িয়া, "হয়েছে হয়েছে" বলিয়া লিখিতে সুরু করিয়া দিতেন। রবিবাবু কিন্তু বরাবর শান্ত-ভাবেই রচনা করিতেন। অক্ষয় বাবুর যত শীঘ্র হইত, রবিবাবুর তেমন হইত না। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু ইঁহাদের এক উল্টা পদ্ধতি ছিল। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত।

স্বর্ণকুমারী দেবীও অনেকসময় তাঁহার সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য- এবং সঙ্গীত-চর্চ্চায় তাঁহাদের তেতালার মহলের আবহাওয়া তখন পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবিবাবুর প্রথম গীতিনাট্য "কালমৃগয়া" এবং পরবর্ত্তী গীতিনাট্য "বাল্মীকি-প্রতিভা"তেও উক্তরূপে রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।

একদিন জ্যোতিবাবুরা ষ্টীমারে চন্দননগর যাইতেছিলেন। পথে খুব ঝড় জল তুফান আরম্ভ হইয়া সমস্ত ষ্টীমারকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জ্যোতিবাবু সুর রচনা করিতেছিলেন ও অক্ষয়বাবু তার সঙ্গে গান বাঁধিতেছিলেন। ইঁহারা গান বাজনায় একবারে তন্ময় হইয়াছিলেন। এই দিনকার রচিত গানগুলি হইতে শেষে "মানভঞ্জ" নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়া গেল। "মানভঞ্জ" প্রথম জোড়াসাঁকো বাড়ীতে অভিনীত হয়। তার অনেক দিন পরে শেষে যখন "ভারতীয় সঙ্গীতসমাজ" স্থাপিত হয়, তখন জ্যোতিবাবু এই "মানভঞ্জের" আখ্যানবস্তু লইয়া পরিবর্ত্তিত আকারে "পুনর্বসন্ত" নামে আর একখানি পরিবর্দ্ধিত গীতিনাট্য প্রকাশ করেন। "পুনর্বসন্ত" সঙ্গীতসমাজে অনেকবার অভিনীত হইয়াছিল। লোকেরও এখানি খুব ভাল লাগিয়াছিল।

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জ্যোতিবাবুরা প্রতি বৎসর একটি "সম্মিলনী" আহ্বান করিতেন। উদ্দেশ্য—সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যাহাতে পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়। মহর্ষি যে চারিজন ছাত্রকে বেদ শিক্ষার জন্য কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়,

এই সম্মিলনের নামকরণ করিয়াছিলেন—"বিদ্বজ্জনসমাগম।" এ 'সমাগমে' তখন বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীগণকে নিমন্ত্রণ করা হইত। এই উপলক্ষ্যে রচনা, কবিতাদি পঠিত হইত, গীত বাদ্যের আয়োজন থাকিত, নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইত এবং শেষে সকলের একত্রে প্রীতিভোজ হইয়া শেষ হইত।

কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের সম্বন্ধে জ্যোতি বাবু এই মজার গল্পটি বলিলেন।

"রাজকৃষ্ণ বাবু যখন 'বিদ্বজ্জনসমাগমে' আসিতেন, তখন তিনি উদীয়মান কবি। সবে মাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার আমি, গুণুদাদা, আমার এক ভগ্নীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে যাইতেছিলাম। মধ্যে একটা কি ষ্টেশনে রোগা ময়লা-কাপড়-পরণে, খালি-পা, একটি ছোক্‌রা আসিয়া আমাদিগকে বলিল—আমি মামার বাড়ী যাইব, হাতে কিছুই পয়সা নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই। যদুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় ভাল বাসিতেন, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার?" বালক বলিল, "হাঁ পারি।" যদুবাবু অধিকতর কৌতূহলী হইয়া রহস্যচ্ছলে আবার বলিলেন "তা বেশ বেশ, দেখ এই কেদার আমার প্রেয়সী তারার নিকট হইতে আমায় ছিনাইয়া লইয়া চলিতেছে,—আর এমনি করিয়া আমায় দুঃখ দিতেছে। তুমি এই বিষয়ে একটা কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি।" বালক তৎক্ষণাৎ একখানি ছেঁড়া কাগজে পেন্সিল দিয়া ক্‌স্‌ ক্‌স্‌ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তার প্রথম দুই ছত্র আমার এখনও মনে আছে—

"কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা-ধনে হারা করে' আনিয়া হেথায়।"
ইত্যাদি।

এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।"

জ্যোতিবাবুর এ সময়ে শীকারের ঝোঁকটা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি রবিবারে দলবলে তিনি শীকারে বাহির হইতেন। এই দলে মেট্রোপলিটান্ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রজনাথ দে, রবীন্দ্রনাথ ও আরও অনেক লোক ছিলেন। বাটী হইতে প্রচুরপরিমাণ খাবার লইয়া ইঁহারা বাহির হইতেন। শীকারের জায়গা ছিল ধাপার মাঠ।

একদিন শীকার হইতে ফিরিতে ফিরিতে পথে একটা কাহার বাগানে দেখিতে পাইলেন বেশ সুন্দর সুন্দর ডাব রহিয়াছে—ডাব খাইতে হইবে। ব্রজবাবু বাগানে ঢুকিয়াই বলিলেন, "ওরে মালি, মামা কই?" মালি ভাবিল ইনি তবে বুঝি মালিকেরই ভাগিনেয়। সে বলিল, "তিনি ত' আসেন নাই।" তখন ব্রজবাবু তাহাকে কতকগুলি ডাব আনিতে বলিলেন। মালী শশব্যস্তে সে আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালন করিল।

বাঙ্গালীদের মধ্যে সৎসাহস বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য জ্যোতিবাবু এই বন্দুক ছোড়া ও শীকারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কবি অক্ষয়চন্দ্রকে কিন্তু কিছুতেই ইহার মধ্যে ভিড়াইতে পারেন নাই। একদিন জ্যোতিবাবু অক্ষয়বাবুকে ধরিয়া বসিলেন, তোমাকে বন্দুক ছুড়িতেই হইবে। অক্ষয়বাবু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তালু শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু জ্যোতিবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন—অক্ষয়বাবু প্রমাদ গণিলেন। কি করিবেন, উপায় নাই! শেষে তিনি চক্ষু বুজিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইলেন, আর জ্যোতি বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া বন্দুকের ঘোড়াটি টিপাইলেন। অনেকের ভয় এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়াছিল, অনেকে কিছু কিছু শিখিয়াও ছিল, কিন্তু অক্ষয় বাবুর ভয়ের আর ক্ষয় হইল না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পুথির কথা

ছাপাখানা আমাদের দেশে বেশী দিন হয় নাই। হাল্‌হেড সাহেব ১৭৭৯ সালে হুগলিতে ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন। তাহার পর ছাপাখানাটা ৬০।৭০ বৎসর হইল, খুব বেশী পরিমাণে হইয়াছে; তাহার আগে সকলেই হাতে লিখিয়া পড়িত, আমিও দুই একখানি পুথি হাতে লিখিয়া পড়িয়াছি। একখানা হাতের লেখা পুথি দেখিয়া দশ জন নকল করিয়া লইত। লোকের যাহা কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহিত্য-বিজ্ঞান ছিল, সব হাতের লেখা পুথিতেই থাকিত। ক্রমে যখন ইংরাজি পড়াশুনা খুব আরম্ভ হইল, ছাপা বহি খুব চলিতে লাগিল, লোকে আর পুথির তত আদর করিত না।

হাতের লেখা পুথি নষ্ট হইতেছে দেখিয়া অনেকের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ হয়। পঞ্জাবের সিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুরোহিত মধুসূদনের অনেক পুথি ছিল। তাঁহার পুত্র রাধাকিষণ লর্ড লরেন্সের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড লরেন্সকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পুথিরক্ষার জন্য এক পত্র দেন। লর্ড লরেন্স সেই পত্র ভিন্ন ভিন্ন গভর্মেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং সেই-সকল গভর্মেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া পুথিরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট এই জন্য ২৪০০০৲ টাকা বৎসর বৎসর খরচ করেন। বাঙ্গালার ভাগে ৩২০০৲ টাকা পড়ে। সে সময়কার সকল গভর্মেণ্টই কিছু কিছু পান। পঞ্জাব গভর্মেণ্টের টাকা অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের টাকা অনেক দিন বন্ধ ছিল, এখন দুই ভাগ হইয়াছে—একভাগ সংস্কৃত পুথির জন্য, আর এক ভাগ নাগরী পুথির জন্য দেওয়া হয়। মান্দ্রাজে ঐ টাকার এক অংশ আরকিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টকে দিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। বোম্বাইয়ে ঐ টাকায় পুথি খরিদ হয় ও ঐ পুথি দেকান কলেজের লাইব্রেরীতে রাখা হয়। বাঙ্গালায় ঐ টাকা এসিয়াটিক সোসাইটীর হাতে দেওয়া হয়, তাঁহারা ঐ টাকা খরচের ভার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাতে দেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আমাকে পুথি খোঁজার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় প্রায় ১১০০০ হাজার পুথি সংগ্রহ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে প্রায় ৮০০০, বোম্বাইয়ে ৮০০০ এবং মান্দ্রাজে ১৪০০০। জৈন-সাহিত্য বোম্বাই হইতেই প্রথম প্রচার হইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন কাশ্মীর, আলবার, নেপাল, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানেও অনেক নূতন পুথি বাহির হইয়াছে এবং তাহার রিপোর্ট ও তালিকা ছাপা হইতেছে।

রাজপুতানায় ভাট ও চারণদের পুথি সংগ্রহের জন্য ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ভাট-চারণের পুথি সমস্ত ভারতবর্ষের ব্যাপার লইয়া। তাই ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট নিজেই সে-সকল পুথি সংগ্রহ ও ছাপাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু অন্য

কোন চলিত ভাষার সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। যে দেশের ভাষা, সেই দেশের গভর্মেণ্টের তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং চেষ্টা হইতেছেও। এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালা পুথি খোঁজার জন্য বাঙ্গালী কি করিয়াছে।

যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গালা ভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না। তারপর শুনা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রামমোহন রায় ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালায় অনেক বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বিচারের বহিও আছে। ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাঙ্গালা ভাষায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেখাদেখি আরও দুই চারিখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল, কিন্তু সেগুলি সব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস সত্ত্বেও খৃষ্টাব্দের ৮০ কোটায় লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালাটা একটা নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে না, চিন্তা করিয়া নূতন বিষয় লিখা যায় না, লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজি, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড় কটমট হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। গানের বহি আর সঙ্কীর্ত্তনের বহি নয়, অনেক জীবন-চরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিণাম। সুতরাং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়া বুঝিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথমেই মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল পাওয়া গেল। পুথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেজ ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জামিন হইয়া মাসিক ১০৲ দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে ঐ পুথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী বসিয়া তাহা কপি করাই। সে পুথি বহুদিন হইল সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া গিয়াছে। আর একখানি পুথি পাইয়াছিলাম—শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিতের লেখা। ধর্ম্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি অনেক আছে এবং তাহার শেষে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামে একটি রামাই পণ্ডিতের লম্বা ছড়া আছে। সে ছড়া পড়িলে ধর্ম্মঠাকুর যে হিন্দু ও মুসলমানের বাহির, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ধর্ম্মঠাকুরের সেবকগণ তাঁহার নিকট উদ্ধার কামনা করিল। তিনি যবনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদের সর্ব্বনাশ করিলেন। রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয় মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বেশী পরেও নয়। মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের জব্দ করিয়াছিল দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুরের দল খুসী হইল, অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। শূন্যপুরাণ সাহিত্য-পরিষৎ ছাপাইয়াছেন। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমের পর, ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল; সেখানি বোধ হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা; কারণ, তাহাতে রাঢ়দেশে বর্দ্ধমান ও মঙ্গলকোট প্রধান জায়গা। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহা না বাঙ্গালা, না সংস্কৃত, এক অপরূপ ভাষায় লিখিত। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের শেষে আছে,—"বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।" অর্থাৎ যিনি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চান যে, তাহা রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের এক তত্ত্ব; সুতরাং হিন্দুদিগের একখানি প্রমাণ-গ্রন্থ। উহাতে ধর্ম্মঠাকুরের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। এই পুথিখানি হইতে আরও বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি তত্ত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও আমার মত অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়া এখন ইউনিভারসিটিকে দিয়াছেন। আমি প্রায় পাঁচ শত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

এই সময়ে কুমিল্লা স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি এ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। দীনেশ বাবুর সাহায্যে পরাগলির মহাভারত, ছুটিখাঁর অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খরিদ হয়।

যখন ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তখন ধর্ম্মঠাকুর যে বৌদ্ধ ঐ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া নেপালে হিন্দুরাজার অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে, দেখিতে যাইলাম।

আমি নেপাল হইতে আসিয়া প্রকাশ্যে বলিয়া দিই, ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ। তাহা শুনিয়া একজন বলিয়াছিলেন,—ছিঃ! জেলে মাল্লারা যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্ম্মঠাকুর কিনা বৌদ্ধ। ছিঃ!

আমি মনে করি, বাঙ্গালা পুথি খোঁজার এইটি প্রথম ও প্রধান সুফল। ইহার দ্বারা আমরা বেশ জানিতে পারি যে, কেন ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আদিশূর রাজা বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়া বসাইবার জন্য রাজারা এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং কেন বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি জাত আচরণীয় এবং কতকগুলি জাত একেবারে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ বাঙ্গালা পুথি খোঁজার আর একটি সুফল হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন আমি দুইবার নেপালে যাই, তখন কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। উহার মধ্যে মধ্যে একরূপ নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে; হয় সেগুলি সংস্কৃতে যাহা লেখা আছে তাহারই প্রমাণস্বরূপ, অথবা মূলটাই সেই ভাষায় লিখিত, টীকা সংস্কৃত। "ডাকার্ণব" নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহার মাঝে মাঝে এইরূপ নূতন ভাষায় অনেক লেখা আছে। ডাকার্ণব নাম শুনিয়াই আমি মনে করিলাম, সেগুলি ডাকপুরুষের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একখানি নকল লইয়া

আসি। পড়িয়া দেখি, সে বাঙ্গালা নয়, কি ভাষায় লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আর একখানি পুস্তক পাইলাম তাহার নাম “সুভাষিত-সংগ্রহ”। উহারও মধ্যে মধ্যে একটি নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে। এবং আর একখানি পুস্তক দেখিলাম “দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা”। ১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম “চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়,” উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম “চর্য্যাপদ”। আর একখানি পুস্তক পাইলাম—তাহাও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম সরোরুহবজ্র, টীকাটি সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নামও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে।

সুভাষিত-সংগ্রহের একটি দোঁহা এখানে দিতেছি—

গুরু উবএসো অমিঅ রস হবহিং ন পিঅ উজেহি।
বহু সহ মরুত্থলিহি তিসিএ মরিথউ তেহি।

এ ভাষাটি যে কি, বেণ্ডল তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তিনি প্রাকৃত অপভ্রংশ বলিয়াছেন। বাস্তবিক প্রাকৃত, অপভ্রংশ, পালি প্রভৃতি শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেই তাহাকে প্রাকৃত বলে। অশোকের শিলালিপিও প্রাকৃত, পালিও প্রাকৃত, জৈন প্রাকৃতও প্রাকৃত, নাটকের প্রাকৃতও প্রাকৃত, বাঙ্গালাও প্রাকৃত, মারহাট্টাও প্রাকৃত। প্রাকৃত ব্যাকরণে যে ভাষা কুলায় না, তাহাকে অপভ্রংশ বলে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন,—ভাষা চার রকম ;—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। দণ্ডী কোন্ কালের লোক, তাহা জানি না, তবে তিনি যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মহারাষ্ট্রভাষাকে ভাল প্রাকৃত বলিয়াছেন এবং সেই ভাষায় লিখিত ‘সেতুবন্ধ কাব্যে’র উল্লেখ করিয়াছেন। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে ভাষার আর এক রকম ভাগ আছে। তিনি বলেন,—সংস্কৃত ছাড়া দুইটা ভাষা আছে, ভাষা আর বিভাষা। তিনি মহারাষ্ট্র ভাষার নাম করেন না ; দাক্ষিণাত্য, অবন্তী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতিকে ভাষা বলেন ; আর আভিরী, সৌবিরী প্রভৃতিকে বিভাষা বলেন। তিনি প্রাকৃত একটা ভাষা বলেন না, উহাকে পাঠ বলেন—সংস্কৃত পাঠ ও প্রাকৃত পাঠ। সুতরাং যখন নাট্যশাস্ত্র লেখা হয়, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২।৩ শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল, ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা ; সেগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নয়, সেগুলি বিভাষা। তিনি বলিয়াছেন,—বিভাষাও নাটকে চলিতে পারে, কিন্তু অন্ধ, বাহ্লীক প্রভৃতি ভাষা একেবারে চলিবে না। ভরতনাট্যশাস্ত্রে ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ভয়ানক মতভেদ দেখা যায়। বররুচি “প্রাকৃত-প্রকাশে” মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী, চারিটি ভাষা প্রাকৃত বলিয়াছেন ; তাহার মধ্যে মহারাষ্ট্রীর প্রকৃতি সংস্কৃত, সৌরসেনীর প্রকৃতি মহারাষ্ট্রী, পৈশাচীর প্রকৃতি সৌরসেনী। আরও অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে। যিনি যখন প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, কতকগুলি প্রাকৃত বহি লইয়া একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন এবং যাহার সহিত মিলিবে না, তাহাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন। এইরূপে যে কত অপভ্রংশ ভাষা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাই রাগ করিয়া বুঁদির রাজার চারণ সূর্য্যমল বলিয়া দিয়াছেন, যে ভাষায় বেশী বিভক্তি নাই, সেই অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অধিকাংশ চলিত ভাষায় বিভক্তি নাই, তাহারা সবই অপভ্রংশ। আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়। এ-সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল এবং সে তর্জ্জমা তেঙ্গুরে আছে। ইংরাজি ৭ হইতে ১৪ শতের মধ্যে তিব্বতীরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জ্জমা করিত, শুদ্ধ সংস্কৃত কেন, ভারতবর্ষের সকল ভাষার বহি তর্জ্জমা করিত, অনেক সময়ে তাহারা তর্জ্জমার তারিখ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে এই বাঙ্গালা বহিগুলি ৭ শত হইতে ১৪ শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জ্জমা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৮।৯।১০ শতে এই-সকল বহি লেখা হইয়াছিল বলা যায়। প্রফেসর বেণ্ডল কয়েকটি দোঁহা মাত্র পাইয়াছিলেন, আমি দুইখানি দোঁহাকোষ পাইয়াছি,—একখানিতে তেত্রিশটি দোহা আছে, আর একখানিতে প্রায় এক শতটি আছে। শেষোক্ত দোঁহাখানির সর্ব্বত্র মূল নাই। টীকার মধ্যে অনেক স্থলে পুরা দোঁহাটি ধরিয়া দেওয়া আছে, অনেক স্থলে কেবল আদ্যক্ষর ধরিয়া দেওয়া আছে। তবে এক শতের অধিক হইবে ত কম হইবে না। দোঁহাগুলিতে গুরুর উপর ভক্তি করিতে বড়ই উপদেশ দেয়। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না। একটি দোঁহায় বলিয়াছে,—গুরু বুদ্ধের অপেক্ষাও বড়। গুরু যাহা বলিবেন, বিচার না করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে। সরোরুহপাদের দোঁহাকোষে এবং অদ্বয়বজ্রের টীকায় ষড়দর্শনের খণ্ডন আছে। সেই ষড়দর্শন কি কি? ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাংখ্য। জাতিভেদের উপর গ্রন্থকারের বড় রাগ। তিনি বলেন,—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল ; যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক ; যদি বল, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে। আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্য লোকে দিক্ না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্ব্ববেদের সত্তাই নেই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নেই। বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ ত আর শূন্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।

পুথির একটি পাতা না থাকায় সরোরুহ কি প্রকারে লোকায়ত ও সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। তিনি বলেন,—সহজ-মতে না আসিলে মুক্তির কোন উপায়ই নাই। সহজ-ধর্ম্মে বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের সম্বন্ধও নাই। যে যে-উপায়ে মুক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষ সকলকে সহজ পথেই আসিতে হইবে। তিনি বলেন,—মানুষ আপনার স্বভাবটাই বুঝে না। ভাবও নাই, অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ব্বাণে কোনও প্রভেদ নাই। দুই এক, সুতরাং সহজিয়ারা অদ্বয়বাদী। মানুষের স্বভাব যদি এই হইল, তখন তাহাকে বদ্ধ করে কে? সরোরুহপাদের শেষ দুইটি দোঁহা এই :—

পর অপ্পান ম ভন্তি করু সঅল নিস্তর বুদ্ধ।
এহু সো নিম্মল পরম পাউ চিত্ত স্বভাবে শুদ্ধ॥

আপনি ও পর, এ ভ্রান্তি করিও না (দুই এক) ; সকলই নিরন্তর বুদ্ধ, এই সেই নির্ম্মল পরমপদরূপ চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ।

অদ্বয় চিত্ত-তরুঅর হরউ তিহুঅনে বিস্থা
করুণা-ফুল্লিঅ ফল ধরই নামে পর-উআর।

অদ্বয় চিত্ত-তরুর অবস্থা ত্রিভুবন হরণ করেন, তখন করুণা'র ফুল ফোটে এবং ফল ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকার।

সহজিয়া ধর্ম্মের যত বই আছে, সকলেরই মূল কথা ঐ এক, কিন্তু ইহাতে একটি মুস্কিল আছে; সেটি এই যে সহজিয়া ধর্ম্মের সকল বইই সন্ধ্যা'ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে, আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই-সকল উঁচু অঙ্গের ধর্ম্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে।

সরোরুহপাদের সময় সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র জানি যে, দোঁহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্রের গ্রন্থ হইতে অভয়াকর গুপ্ত অনেক জিনিষ লইয়াছেন। অভয়াকর গুপ্ত বরেন্দ্রের রাজা রামপালদেবের রাজত্বের পঁচিশ বৎসরে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অদ্বয়বজ্রের এই কয়খানি পুস্তক তেঙ্গুরে তর্জ্জমা হইয়াছে—তত্ত্বদশক, যুগলদ্ধ-প্রকাশ, মহাসুখপ্রকাশ, তত্ত্বপ্রকাশ, সেককার্য্যসংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত সেকপ্রক্রিয়া, প্রজ্ঞোপায়, দয়াপঞ্চক, মহাযানবিংশতি, অমন সিকার-তত্ত্ব, মহাযানবিংশতি, দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা অর্থাৎ যে দোঁহাকোষের কথা আমরা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। অদ্বয়বজ্রকে তেঙ্গুরে কোথাও মহাপণ্ডিত, কোথাও আশ্চর্য্য, কোথাও অবধূত বলিয়াছে। সরোরুহ-পাদেরও কয়েকখানি পুস্তক তেঙ্গুরে তর্জ্জমা আছে; যথা,—বুদ্ধ-কপালতন্ত্র-পঞ্জিকা, জ্ঞানবতীনং, বুদ্ধকপালসাধনং, সর্ব্বভূতবলিবিধি, শ্রীবুদ্ধকপালনামমণ্ডলবিধিক্রমপ্রদ্যোতন।

এসিয়াটীক সোসাইটীর পুথি-খানায় ৯১৯০ নম্বরে তিনখানি তালপাতা আছে, উহাতে শান্তিদেবের জীবন-চরিত দেওয়া আছে। তালপাতাগুলি নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত, অক্ষরের আকার দেখিয়া বোধ হয়, ইংরাজী ১৪ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল। শান্তিদেব একজন রাজার ছেলে, যে দেশের রাজা, সে দেশের নামটি পড়া যায় না। রাজার নাম মঞ্জুবর্ম্মা।

শান্তিদেব বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় নামে তিনখানি অথার্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই তিনখানির দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, ছাপানও হইয়াছে। কেবল সূত্রসমুচ্চয় পাওয়া যায় নাই। শান্তিদেবের নালন্দায় ভিক্ষু অবস্থায় নাম হয় ভুসুক। পূর্ব্বে যেমন সরোরুহপাদের গানের কথা বলিয়াছি, সেইরূপ ভুসুকুপাদেরও কতকগুলি গান আছে। কিন্তু গানগুলি সহজযানের ও পুথিগুলি মহাযানের। শিক্ষা-সমুচ্চয়ে তান্ত্রিক মতের অনেক কথা আছে। এসিয়াটীক সোসাইটীর পুথি-খানায় ৪৮০১ নম্বরের যে পুথি আছে, তাহাও ভুসুকুপাদের লেখা। পুরামাত্রায় সহজযানের পুথি। ইহাতে সহজিয়াদিগের কুটী-নির্ম্মাণ, ভোজন-বিধি, শয়ন-বিধি প্রভৃতি নানা বিধি আছে। ইহাতে মদ খাওয়া ও তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপারেরও ত্রুটি নাই। ইহাতেও বাঙ্গালা গান আছে, এই পুথির অক্ষরও খুব প্রাচীন। ইহা হইতে একটি বাঙ্গালা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

রবিকলা মেলহ, শশিকলা বারহ বেণি বাট বহন্ত।
তোড়হ সমস্তা সমরস জাউ ন জায়তে ফাগণ জগফলা খায় ॥

আরও— অম্বু পসিরতু চন্দন বরাহ অক্কহেঠ কমল করি শয়ন অঙ্ক।
সুরচাপি শশি সমরস জায় রাউত বোলে জরমরণ ভয়
বেঅদণ্ড চউদ্দ চর্য্যাহ সূত্রকায় চ্ছাড়ি ন যাই
সো দুর যোগীএ ন জানহ খোজ গুরু নিন্দা করি
ধুরুস্তি যোগ।

শান্তিদেব শান্তিদেব নামেই একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সে গ্রন্থখানির নাম শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবলিবিধি। এইখানে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ী ছিল জাহোর। জাহোর কোথায়, জানা যায় না। কিন্তু রাউত ভুসুকুর বাড়ী যে বাঙ্গালায় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে ভুসুকুর একটি গান আছে; সেটি এই,—

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥ ধ্রু ॥
ডহি জো পঞ্চধাট লই দিবি সংজ্ঞা ণঠা
ন জানমি চিঅ মোর কঁহি গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
সোন তরুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥ ধ্রু ॥
চউকোড়ী ভণ্ডার মোর লইআ সেস
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেস ॥ ধ্রু ॥

বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মখালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গাল দেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভুসু, আজ তুমি সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলে, যেহেতু নিজ ঘরিণীকে (চণ্ডালী) করিয়া লইলে।

সহজ-মতে তিনটি পথ আছে;—অবধূতি, চণ্ডালী, ডোম্বি বা বঙ্গালী। অবধূতিতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে; চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান আছে বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়; কিন্তু ডোম্বিতে কেবল অদ্বৈত, দ্বৈতের ভাঁজও নাই। বাঙ্গালার অদ্বৈত মত অধিক চলিত, সেই জন্য বাঙ্গালা অদ্বৈত মতের সেন আধারই ছিল। গ্রন্থকার এখানে বলিতেছেন,—রে ভুসুকু, তোমার নিজ ঘরিণী যে অবধূতী ছিল, তাহাকে চণ্ডালী করিয়াছিলে, এইবার তুমি বঙ্গালী হইলে অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈত হইলে।

তুমি মহাসুখরূপ অনলের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত সমস্ত দগ্ধ করিয়াছ। তোমার সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে। এখন জানি না, আমার চিত্ত কোথায় গিয়া পঁহুছিল, আমার শূন্য তরুর কিছুই রহিল না। সে আপন পরিবারে মহাসুখে থাকিল, আমার চার কোটী ভাণ্ডার সব লইয়া গেল, এখন জীবনে ও মরণে কিছুই বিশেষ নাই।

জহোর কোথা না জানিলেও এ গানে বেশ বোধ হয়, রাউত ভুসুকু ও শান্তিদেব বাঙ্গালী। রাউতের আর একটি গানের শেষে এইরূপ আছে -

রাউতু ভনই কট ভুসুকু ভনই কট সঅলা আইস সহার
জইতো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছ তু সদ্গুরু পাব ॥ ধ্রু ॥

রাউতু বলেন,—কি আশ্চর্য্য, ভুসুকু বলেন—কি আশ্চর্য্য। সকলেরই একই স্বভাব। রে মূর্খ। তোর যদি ভ্রান্তি থাকে, তবে সদ্গুরুর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা কর।

শান্তিদেব মধ্যদেশে গিয়া মগধের রাজার সেনাপতি বা রাউত হন; এখন এই রাউত গন্ধবেণেদের চারি আশ্রমের এক আশ্রম; রাউতাশ্রমের বেণেরা শুধু ছাউনিতে মসলা বিক্রয় করে। এই প্রস্তাবে স্থির হইল যে, শান্তিদেব, রাউতু ও ভুসুকু এক। তিনি মহাযান ও সহজযান, উভয় যানের লোক, তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা দুই ভাষাতেই লিখিয়াছেন এবং তাঁহার বাড়ী বাঙ্গালায়ই ছিল। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৬ সালের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণাচার্য্যের একখানি পুস্তক আছে, তাহার নাম দোঁহাকোষ। উহাতে তেত্রিশটি দোঁহা আছে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে কাহ্নুপাদের অনেকগুলি গান আছে।

এই কৃষ্ণাচার্য্য এককালে বাঙ্গালার একজন অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, তাঁহার বিস্তর গ্রন্থ আছে। তাঁহার দোঁহাকোষ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহার গানগুলির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি হেরুকহেবজ্র প্রভৃতি দেবতার তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে অনেক বহি লিখিয়াছেন ও তাঁহার টীকা লিখিয়াছেন। ইনি একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। তিব্বতদেশে এখনও সিদ্ধাচার্য্যগণের পূজা হইয়া থাকে। তাঁহাদের সকলেরই দাড়ি আছে ও মাথায় জটা আছে এবং প্রায় উলঙ্গ থাকে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের মতে লুই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধাচার্য্য। ঐ গ্রন্থে তাঁহার অনেকগুলি গান আছে।

তেঙ্গুরে যতটুকু ক্যাটালক বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা দেশের লোক, তাঁহার আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার কোন কোন গ্রন্থের টীকা প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞান করিয়াছেন। প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশিলা বিহার হইতে ৭০ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন রত্নকীর্ত্তি। রত্নকীর্ত্তি প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞানেরও পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। বোধ হয়, শান্তিদেব ও লুই একই সময়ের লোক, বরং তিনি কিছু পূর্ব্বে হইতে পারেন।

লুই আচার্য্যের শিষ্যপরম্পরায় সিদ্ধাচার্য্য হইতেন, তন্মধ্যে দারিক নামে একজন লুইকে আপনার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের বংশে তিলপাদ নামে আর একজন সিদ্ধাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সহজিয়া গান লিখিয়া গিয়াছেন। এগুলি কীর্ত্তনেরই পদ। সে কালেও সঙ্কীর্ত্তন ছিল এবং সঙ্কীর্ত্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্ত্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন 'চর্য্যাপদ' বলিত। কেবল বৌদ্ধেরাই সে কালে বাঙ্গলা গান লিখিত না, নাথেরাও সে কালে বাঙ্গালা লিখিত। মীননাথের একটি কবিতা পাইয়াছি,—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমলমধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা॥

অন্যান্য নাথেরা যে বাঙ্গলায় বহি লিখিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। তবে এই দাঁড়াইল যে খৃষ্টীয় ৮ শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুই সহজ-ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময় তাঁহার চেলারা অনেকে সংকীর্ত্তনের পদ লেখে ও দোঁহা লেখে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অথচ তাহার একটু পরেই নাথেরা নাথপন্থ নামক ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহারও অনেক বহি ও কবিতা বাঙ্গালায় লেখা। নাথও অনেকগুলি ছিলেন, কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, কেহ কেহ হিন্দু হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে গোরক্ষনাথ একজন। তারানাথ বলেন,—গোরক্ষনাথ যখন বৌদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল অনঙ্গবজ্র। কিন্তু আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি, তখন তাঁহার নাম ছিল রমণবজ্র। নেপালের বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথের উপর বড় চটা। উহাঁকে তাহারা ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে। মৎস্যেন্দ্রনাথের পূর্ব্বনাথ মচ্ছঘ্নপাদ অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্ধদিগের স্মৃতিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যাহারা নিরন্তর প্রাণিহত্যা করে, সে-সকল জাতিকে অর্থাৎ জেলে মালা কৈবর্ত্তদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে না। সুতরাং মচ্ছঘ্নপাদ বৌদ্ধ হইতে পারেন না। কৌলদিগের সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, তাহা পড়িয়া বোধ হয় না যে, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি নাথপন্থীদিগের একজন গুরু ছিলেন অথচ তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা হইয়াছেন।

সহজযান, নাথপন্থ, বজ্রযান, কালচক্রযান, যামল, ডামর, ডাকপন্থ প্রভৃতি যত লোকায়ত ধর্ম্ম ছিল, ইদানীন্তন লোকে তাহার প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া সমুদয়গুলিকে তন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। এই যে-সকল ধর্ম্মের নাম করিলাম, ইহাদের মধ্যে আবার পরস্পর মেশামেশি হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ঐ ভুলটা পাকিয়া গিয়াছে। আবার ইদানীন্তন লোকে না বুঝিয়া ঐ-সকল ধর্ম্মের গ্রন্থকে প্রমাণ বলিয়া সংগ্রহ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে ভুলটা আরও পাকিয়া গিয়াছে। এখন দরকার হইতেছে যে, কতকগুলি লোক ধীরে ধীরে বহুকাল ধরিয়া এই-সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, মেশামেশি ও লয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেয়। যতদিন সে ইতিহাস না হয়, ততদিন আমরা আমাদিগকে চিনিতে পারিব না; আমাদের কোথায় গলদ আছে, ধরিতে পারিব না: আমাদের কোথায় কি গুণ আছে, বুঝিতে পারিব না; কোন্ বিষয়ে আমাদের সংস্কার আবশ্যক, তাহা জানিতে পারিব না। কিন্তু এরূপ ধীরভাবে বহুদিন ধরিয়া পড়িবার লোক কই? যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অর্থাগমের উপায় লইয়াই ব্যস্ত, পেটের জ্বালায় পড়াশুনাই করিতে পারে না; যাহাদের সে জ্বালা নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহাদের সেরূপ করিয়া পড়িবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আমাদের ইতিহাস যে অন্ধকারে আছে, সেই অন্ধকারেই থাকিবে। মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হইবে, কিন্তু না বুঝিয়া না জানিয়া কোন কাজ করিতে গেলে যাহা হয়, তাহাই হইবে, সে চেষ্টা বৃথা হইয়া যাইবে। তাহাতে আমাদের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হইবে না।

বাঙ্গালা পুথি খোঁজা হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়টি উপকার হইয়াছে;—১। বাঙ্গালা দেশে আজিও যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম জীয়ন্ত আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ২। মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ৩। সে সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, দুই ধর্ম্মেরই উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। ৪। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলো প্রবেশ করিয়াছে। পুথি কিন্তু ভাল করিয়া খোঁজা হয় নাই। কতদিকে কত দেশে কতরকম পুথি যে পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একটা জিনিস হইয়াছে, ইতিহাস জানিবার জন্য দেশের মধ্যে একটা উৎকট আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। সে আগ্রহ কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষাজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি জানিবার জন্য যে আগ্রহ, তাহাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ইহাই কিন্তু ঠিক। সকলের আগে আমি কি, সেটুকু চেনা চাই; সেই চেনার জন্য আগ্রহ হইয়াছে। সেই আগ্রহটিকে ঠিক পথে চালান আমাদের বড়ই দরকার। সে বিষয়ে চেষ্টারও অভাব নাই। বঙ্গদেশের ধনীগণ ইহার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, অর্থব্যয় করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। অভাব কেবল দুই জিনিষের, যাহারা

পথ দেখাইয়া দিবে, তাহার অভাব; ও যাহারা সেই পথে চলিয়া কাজ করিবে, তাহার অভাব।

এত উৎকট আগ্রহের উপরও যদি পথ দেখাইবার ও কাজ করিবার লোক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপাল মন্দ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যদি শিক্ষিত লোক সকলে নিত্য এক ঘণ্টা কাল ইতিহাস আলোচনা করেন, অনেক নূতন নূতন পথ বাহির হইবে; নানা উপায়ে আমরা আমাদিগকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের ধর্ম্মকে, আমাদের দেশকে, আমাদের সাহিত্যকে এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি, তাহা বুঝিতে পারিব। যতদিন তাহা না বুঝিতে পারি ততদিন আমাদের উন্নতির পথই দেখিতে পাইব না। আপনাকে জানিতে হইলে দেশের পুথি খোঁজার দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায় মন চিত্ত লাগাইয়া পুথি খুঁজিতে হইবে ও পুথি পড়িতে হইবে।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিলাতের জনসাধারণ

সম্প্রতি পার্লামেণ্টের এক সমিতি হইতে ইংলাণ্ড ও স্কটলাণ্ডের ভূমিবিষয়ক অনুসন্ধানের ফলসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত—১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে অনুসন্ধানকারীরা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেগুলি পাঠ করিলে বিলাতের কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদিগের চরিত্র ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদেশীয়েরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন, "ভারতীয় জনসাধারণ নিতান্তই মূর্খ, নিরক্ষর এবং শিক্ষালাভে উদাসীন ও অনিচ্ছুক। নূতন নূতন কৃষি-প্রণালী, শিল্প-প্রণালী, ও ব্যবসায়প্রণালী ইহারা অবলম্বন করিতে চাহে না। মামুলি পথ পরিত্যাগ করা ইহাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ।" এই-সকল কথা তোতা পাখীর মত মুখস্থ করিয়া ভাবি যে বোধ হয় পাশ্চাত্য সমাজে জনগণ সর্ব্বদা নব নব আবিষ্কার কাজে লাগাইবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত Report of the Land Inquiry Committee (vol. I Rural, Vol. II. Urban) পাঠ করিলে এ ভুল বিশ্বাস থাকিবে না।

অনুসন্ধানকারীরা দুঃখ করিয়াছেন—"ইংল্যাণ্ডের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শিক্ষার মর্য্যাদা এখনও বুঝে নাই। ইহাদিগকে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার করান বড় সহজ ব্যাপার নয়। কৃষিকর্ম্মে কো-অপারেটিভ নীতির অবলম্বন ইংল্যাণ্ডে শীঘ্র সফল হইবে না। পুরাতন প্রথার প্রতি ইংরাজ নরনারীগণ এত আসক্ত যে নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্য গবর্মেণ্টের যৎপরোনাস্তি অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।"

এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্থিতিশীল অবৈজ্ঞানিক (!) ভারতবাসীতে এবং গতিশীল বিজ্ঞানাবলম্বী পাশ্চাত্য নরনারীতে বিশেষ প্রভেদ বুঝা যায় কি? বস্তুতঃ, চোখ কান খুলিয়া বিশ্বশক্তির পরিচয় লইলে বুঝিব যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতবাসী যাহা কিছু শিখিবার সুযোগ পাইয়াছে প্রায় সকলই একদেশদর্শী, একচোখো, অসম্পূর্ণ, সুতরাং মিথ্যা। বিশেষতঃ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভেদ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট যে জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহা নিতান্তই অবজ্ঞেয়। বিংশশতাব্দীতে আমাদিগকে নূতন করিয়া স্বদেশ ও বিদেশের প্রাচীন এবং বর্ত্তমান তথ্য বুঝিতে হইবে।

(গৃহস্থ, কার্ত্তিক)

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

(সমালোচনা)

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু প্রণীত পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত। প্রকাশক শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু, দীনধাম, ৩০।১, মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা। মূল্য প্রতি খণ্ড ১॥০ টাকা, ভাল বাঁধা ২৲ টাকা।

আমরা এই পুস্তকের প্রথম দুই খণ্ড অনেকদিন হইল পাইয়াছি। সমালোচনা করিতে বিলম্ব হইল, তজ্জন্য দুঃখিত আছি। তৃতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত আছে। ইহা আট খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন;—"এই ব্যাখ্যার নাম 'বিজয়া ব্যাখ্যা' রাখা হইল। বস্তু নির্দ্দেশের জন্য অনেক স্থলে নামের প্রয়োজন। প্রতি শ্লোকের অনুবাদ অবলম্বন করিয়া এই ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। এই অনুবাদ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। মূল শ্লোকের বাক্যার্থ বুঝিবার জন্য এ অনুবাদ অক্ষরানুবাদ মাত্র। ছন্দ অধিক হৃদয়গ্রাহী এবং আবৃত্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এ কারণ মূলের ন্যায় এ অনুবাদও ছন্দে গ্রথিত। এ ছন্দ প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মিত্রাক্ষর ছন্দে অক্ষরানুবাদ সর্ব্বথা সুসাধ্য নহে।

"এই ব্যাখ্যা বিস্তৃত। ইহাতে কোন প্রাচীন ভাষ্য বা টীকা কিংবা তাহার অনুবাদ না থাকিলেও—শাঙ্কর ভাষ্য, রামানুজ ভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা, আনন্দগিরির ভাষ্যটীকা, মধুসূদনের ব্যাখ্যা, বলদেবের ব্যাখ্যা প্রভৃতির সার সার অংশ প্রয়োজন-মত গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রয়োজনীয় পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ, এবং বিভিন্ন শ্লোকের এই-সকল ব্যাখ্যাকারগণের ভাবার্থ, এ ব্যাখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে; এবং এই সকল বিভিন্ন অর্থ সমালোচনা করিয়া যে অর্থ যে স্থানে সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহা গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণের ভাষ্য ও টীকা না পড়িয়াও যাহাতে এই ব্যাখ্যা হইতেই তাঁহাদের ব্যাখ্যার সমুদায় প্রয়োজনীয় অংশ জানিতে পারা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

"সর্ব্বোপনিষদ্-সার গীতার উল্লিখিত মূলতত্ত্ব-সকল বুঝিতে হইলে সেই-সকল তত্ত্ব উপনিষদে কিরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিতে হয়। এই ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র প্রয়োজন-মত উপনিষদ্-মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া গীতোক্ত তত্ত্ব সকল বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। গীতাতে বেদান্ত-ও-সাংখ্যদর্শন-প্রতিপাদিত মূলতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং বিভিন্ন দর্শনের আপাত-বিরোধী মতের সামঞ্জস্য ও সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দর্শনশাস্ত্রের অনেক দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব গীতায় উক্ত হইয়াছে। গীতায় এই সকল তত্ত্ব অনেক স্থলে সূত্ররূপে, অনেক স্থলে বার্ত্তিক বা কারিকাগ্রন্থের ন্যায়, অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা বুঝিতে হইলে সেই-সকল দর্শনোক্ত মত, বিশেষতঃ বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনে প্রতিপাদিত তত্ত্ব-সকল ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। এই ব্যাখ্যায় এজন্য উক্ত বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্ব-সকল বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এবং গীতায় বিভিন্ন বিরোধী দার্শনিক মত কিরূপে সামঞ্জস্য করা হইয়াছে তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতোক্ত দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব-সকল যাহাতে একরূপ বুঝিতে পারা যায়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে এবং এ কারণ অনেক স্থলে সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্তও উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতোক্ত দার্শনিক তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা এ ব্যাখ্যার এক বিশেষত্ব।"

পুস্তক সমাপ্ত না হইলে পুস্তকের সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর নহে।

কিন্তু এই পুস্তকের যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় ইহা ভগবদ্গীতার একখানা অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ হইবে। ফলতঃ স্বর্গীয় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের "গীতাসমন্বয়-ভাষ্য" ও তাঁহার বঙ্গানুবাদের পর ভগবদ্গীতার এরূপ চিন্তা-ও-পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা বোধ হয় আর প্রকাশিত হয় নাই। "সমন্বয় ভাষ্যের" ন্যায় সংস্কৃত ভাষ্য এই গ্রন্থে নাই, কিন্তু ইহার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা উক্ত ভাষ্যানুবাদের অপেক্ষা অনেক বিস্তৃততর।

"সমন্বয় ভাষ্যের" সহিত যদি এই ব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ তুলনাই করিলাম, তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে একটি বিষয়ে এই ব্যাখ্যা উক্ত ভাষ্য হইতে অতিশয় ভিন্ন এবং আমাদের মতে নিকৃষ্ট। উক্ত ভাষ্যে আধুনিক সমালোচনার ভাব (critical spirit) তাদৃশ না থাকিলেও তাহাতে ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাব অবলম্বিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা স্পষ্টতঃই প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাসের পক্ষপাতী। ইহাতে অধুনাতন পাশ্চাত্য দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা অনেক আছে, কিন্তু ইহার আদর্শ ও প্রণালী মূলে প্রাচ্য ও প্রাচীন। যাহা হউক, গ্রন্থকারের সুদীর্ঘ "ব্যাখ্যাভূমিকার" সমালোচনা-ব্যপদেশে আমরা তাঁহার দার্শনিক মত ও প্রণালী সংক্ষেপে দেখাইব।

প্রথমতঃ, গীতার বক্তা কৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি কোন ঐতিহাসিক সমালোচনা করেন নাই। ঐতিহাসিক সমালোচনা (Historical Criticism) নামে যে একটা জিনিষ আছে এবং তাহাতে যে বহু শতাব্দীর সযত্ন-গঠিত পৌরাণিক কুসংস্কাররূপ অনেক অট্টালিকা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে, তাহার আভাসমাত্র তিনি জানেন বলিয়াও প্রকাশ করেন নাই। মহাভারতের কৃষ্ণ যে ঋগ্বেদের অনার্য্য যোদ্ধা কৃষ্ণ, সূক্তকার আঙ্গিরস কৃষ্ণ, ছান্দোগ্যের সাধক কৃষ্ণ এবং বহু যুগের কল্পনা ও কবিত্বের অদ্ভুত মিশ্রণ হইলেও হইতে পারেন, এই চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার মতে গীতোক্ত কৃষ্ণ পরমেশ্বরের পূর্ণ অবতার ও সাধকের আদর্শ। তিনি বলেন,—"ভগবান্ যে কেবল এই পূর্ণ ধর্ম্মের—মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের—উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে।......তিনি সেই আদর্শ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ ও স্থাপন জন্য স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞাতা সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বভোক্তা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ......আমাদের সেই পরম লক্ষ্য—পরম আদর্শ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আমাদের জ্ঞানে অধিগম্য পূর্ণ অবতার।"

প্রাচীন তন্ত্রের লোকেরা শাস্ত্রের মাহাত্ম্য দেখাইতে গিয়া মানবের স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তির ক্ষীণতা কীর্ত্তন করেন। দেবেন্দ্রবাবু স্বতঃ পরতঃ তাহাই করিয়াছেন। সাধারণ মানবের পরমার্থতত্ত্ব জানিবার শক্তি থাকিলে যেন আর শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকে না। শাস্ত্র প্রাচীনদিগের চিন্তা ও সাধনের লিপি, ইহা সাধারণ মানবের চিন্তা ও চেষ্টাকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ ভাবে সত্য দর্শনে সমর্থ করে,—শাস্ত্র সম্বন্ধে ইহাই আধুনিক ও প্রকৃত মত। এই মতে শাস্ত্রকে শ্রদ্ধাসমন্বিত সমালোচনার (reverent criticism) ভাবে অধ্যয়ন করিতে বলে। দেবেন্দ্রবাবুর মত তাহা নহে। তাঁহার মতে শাস্ত্রের শিক্ষা প্রথমতঃ অন্ধ বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, পরে যোগচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে শাস্ত্রের মর্ম্ম সাক্ষাৎগোচর হইবে। চারিদিকে এত ভ্রমের সম্ভাবনা সত্ত্বে কেন ব্যক্তি বা গ্রন্থবিশেষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিব, আর যোগচক্ষু-গোচর জ্ঞানের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে কিনা, তাহা তিনি এই ব্যাখ্যা-ভূমিকায় কুত্রাপি বলেন নাই। তিনি বলেন, "আমাদের যদি এই ত্রিলোকের অন্তর্গত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তবে বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আর যদি এই ত্রিলোকের অতীত—এ সংসারের অতীত—সেই প্রপঞ্চাতীত রাজ্যের সংবাদ জানিতে হয়, সে রাজ্যে প্রবেশের মার্গ অনুসন্ধান করিতে হয়, তবে বেদান্ত উপনিষদ্ ও গীতা—এই পরাবিদ্যারূপিণী মোক্ষশাস্ত্রের শরণ লইতে হয়—তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।" বেদান্ত দর্শন শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই বেদান্তদর্শন নাকি আবার শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণ। দেবেন্দ্রবাবু বলেন,—"এই পরাবিদ্যা লাভের জন্য যে উপনিষদ্ ও গীতা প্রামাণ্যস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমরা বেদান্তদর্শন হইতে জানিতে পারি। বেদান্তদর্শন এই উপনিষদ্—শ্রুতি ও স্মৃতি (বা) গীতা প্রমাণের উপর স্থাপিত।" রামের সাক্ষী শ্যাম, আবার শ্যামের সাক্ষী রাম—এরূপ প্রমাণ সুবিচারক দেবেন্দ্রবাবুর এজলাসে গৃহীত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চয় জানি। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুর ধর্ম্মবিশ্বাসের রাজ্যে ইহার চেয়ে ভাল প্রমাণ আর নাই।

"কিন্তু শাস্ত্রে আপাততঃ অনেক বিরোধী কথা পাওয়া যায়, সুতরাং শাস্ত্রপ্রমাণ কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে? বেদান্তদর্শন এই প্রশ্ন উপলক্ষ করিয়া তৃতীয় সূত্রে বলিয়াছেন—'তৎ তু সমন্বয়াৎ।' শাস্ত্রসমন্বয় দ্বারা সমুদয় আপাতবিরোধী কথার সামঞ্জস্য করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। এই স্থলে যুক্তিতর্কের স্থান আছে।" "যুক্তিতর্ক" কাহাকে বলে, ইহার প্রকৃতি কি, প্রণালী কি, দর্শন-সাহিত্যে, বিশেষতঃ আধুনিক প্রতীচ্য দর্শন-সাহিত্যে, তাহা কি ভাবে প্রযুক্ত হয়, এই-সকল বিষয়ে দেবেন্দ্রবাবুর পরিষ্কার ধারণা আছে বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বলেন, "দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রমাণ অনুমান। অনুমান প্রমাণ প্রধানতঃ তিন রূপ ; তাহাদের মধ্যে কারণ হইতে কার্য্যের অনুসন্ধান (পূর্ব্ববৎ) ও কার্য্য হইতে কারণের অনুসন্ধান (শেষবৎ) প্রধান। শেষবৎ অনুমানকেই ইংরাজীতে Inductive বা *a posterior* method এবং পূর্ব্ববৎ অনুমানকে ইংরাজিতে Deductive বা *a prior* method বলে। অন্যরূপ অনুমানের নাম সামান্যতঃ দৃষ্ট। তাহার ইংরাজী নাম analogy। দর্শনশাস্ত্রে প্রায়শঃ এই তিনরূপ অনুমানই গৃহীত হইয়া থাকে। সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান এক অর্থে উক্ত Inductive methodএর অন্তর্গত। এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া দর্শনশাস্ত্র অজ্ঞেয় তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বলিয়াছি ত এই উপায়ে দর্শনশাস্ত্র অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনের জন্য এ-সকল উপায় ব্যতীত অন্যরূপ উপায়ও গৃহীত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে এক উপায়ের নাম Dialectic method, আর এক উপায়ের নাম Comparative বা Historico-comparative Method। ইহাও প্রত্যক্ষভূয়োদর্শন- ও অনুমান-মূলক। বলিয়াছি ত, এই-সকল উপায়ের মধ্যে কোন উপায়েই প্রকৃত পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। আধুনিক দর্শন যে Principles of Identity and Contradiction অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হন, তাহাতেও এই অজ্ঞেয় রাজ্যে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। অনেকে বুদ্ধির বা বৃত্তিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধারণার উপর বা Categories অর্থাৎ কতকগুলি মূলতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারাও যুক্তিতর্কের সহায়ে কখন বা কল্পনার লঘুত্বের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হন। তাই তাঁহারাও অধিক দূর যাইতে পারেন না।" দেবেন্দ্রবাবু যে ভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-প্রণালীগুলির নাম ও উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমাদের সন্দেহ হয় তিনি এই-সকল প্রণালীর বিশেষ কোন সংবাদ রাখেন কি না। তিনি তাঁহার ভূমিকার নানা

স্থানে ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকের নাম করিয়াছেন এবং এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহাদের প্রদর্শিত প্রণালীতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না। ইঁহাদের প্রদর্শিত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সমালোচনা দিয়া এই কথা বলিলে কতকটা যুক্তিযুক্ত হইত, কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু তাহা করেন নাই। তিনি ক্যাণ্টের অজ্ঞেয়তাবাদের একটু বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ক্যাণ্ট্ তত্ত্বজ্ঞানের পথ কত দূর সুগম করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি শেলিং হেগেলেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যে ভাবে তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে এই প্রণালীর প্রকৃত ভাব ধারণ করিয়াছেন কি না বোঝা গেল না। তিনি বলিয়াছেন, "এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্বে সর্ব্ববিরোধ মীমাংসার মূল সূত্র যে শ্রুতিতে পাওয়া যায়, কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য জার্ম্মান পণ্ডিত তাহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্ববিরোধের ও সর্ব্বদ্বন্দ্বের মধ্যে (principle of contradictionএর মধ্যে) এই সর্ব্বসমন্বিত একত্ব (principle of identity) আলোচনা করিয়া, বাদ (thesis) ও বিবাদের (antithesis) মধ্যে একত্ব ধারণা (synthesis) করিয়া, এই অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মান পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া তাহাতে যে বাদ বিবাদরূপ বিরোধ (যে antinomy of Pure Reason অথবা principle of contradiction) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার মীমাংসার মূলসূত্র পান নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিত হেগেল সেলিং প্রভৃতি সমন্বয় (synthesis) দ্বারা সেই মূলসূত্র দেখাইয়াছেন। তাহা—জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ একত্বধারণার আকাঙ্ক্ষা (principle of identity), জ্ঞানে সর্ব্বমধ্যে একের ধারণা এবং একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান লাভের প্রয়াস। শ্রুতি আমাদিগকে এই মূলসূত্র দেখাইয়া দিয়াছেন, একবিজ্ঞানে কিরূপে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হইতে পারে তাহারও উপদেশ দিয়াছেন।" হেগেল ও সেলিং যদি সমন্বয় দ্বারা ক্যাণ্টের অপ্রাপ্ত মূলসূত্র দেখাইয়া দিয়া থাকেন তবে তাঁহারা শ্রুতি অপেক্ষা কম করিলেন কি? তাঁহারা যদি শ্রুতির ন্যায় "একবিজ্ঞানে কিরূপে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হইতে পারে" তাহা কেবল মৃৎপিণ্ড ও লৌহমণির দৃষ্টান্তদ্বারা না দেখাইয়া জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও একটি ধারাবাহিক যুক্তিপ্রণালী দ্বারা দেখাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা বরঞ্চ শ্রুতি অপেক্ষা বেশীই করিয়াছেন। অবশ্য, তাহাতে শ্রুতির পূর্ব্বতনত্ব ও মৌলিকত্ব নষ্ট হয় না। কিন্তু যাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানপ্রণালী সম্বন্ধে দেবেন্দ্রবাবুর স্পষ্ট ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহা থাকিলে তাঁহার কৃত পাশ্চাত্য দর্শনের নিন্দা ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্রকারান্তরে অজ্ঞেয়তাবাদ প্রচার বোধ হয় সম্ভব হইত না। আমাদের বিশ্বাস যে কাণ্টের Critical Method ও হেগেলের Dialectic Methodএর এক এক খানা ভাল গ্রন্থ পাঠ করিলে,—যেমন কেয়ার্ড-কৃত ক্যাণ্টের ব্যাখ্যা ও ম্যাক্‌টেগার্ট-কৃত হেগেলের ব্যাখ্যা,—বিশেষতঃ আরো অধুনাতন দার্শনিক ও ধর্ম্মবিজ্ঞানবিৎদিগের কোন কোন গ্রন্থ, যেমন ব্র্যাডলি-কৃত "Appearance and Reality" ও Royce-কৃত "The World and the Individual", পাঠ করিলে পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে এই হীন ধারণা চলিয়া যায়, আর মানবের তত্ত্বজ্ঞানশক্তি সম্বন্ধীয় সন্দেহের অমূলকত্বও অনেক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হয়। আমাদের এরূপ সন্দেহের লেশমাত্রও নাই। আমরা জানি মানবের তত্ত্বজ্ঞান-শক্তি না থাকিলে উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশ ব্যর্থ হইত। আরো জানি দেবেন্দ্রবাবু যাহাকে 'যোগজ প্রত্যক্ষ' বলিয়াছেন তাহা লাভ করিবারও একটা পরিষ্কার প্রণালী আছে। গীতা ও পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রে কেবল আসন ও মনঃস্থৈর্য্যাদি বিষয়েই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, 'যোগজ প্রত্যক্ষ'-লাভের ধারাবাহিক প্রণালী কিছুই ব্যাখ্যাত হয় নাই। কিন্তু সেই প্রণালীর ইঙ্গিত আমাদের মোক্ষশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়ান আছে। পাশ্চাত্য উচ্চ দর্শনে এই প্রণালী অনেক পরিমাণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। উভয় দর্শনের সাহায্যে এবং চিন্তা ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া আমাদিগকে এই প্রণালী আবিষ্কার করিতে হইবে। শাস্ত্রাক্ততার দিন চলিয়া যাইতেছে। সহস্র সহস্র শিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহা একবারে চলিয়া গিয়াছে। স্বাধীন শাস্ত্রনিষ্ঠাই এখন সম্ভব ও সহায়। স্বাধীন চিন্তাযোগে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করা যায়, ইহা না দেখাইলে লোকে শাস্ত্রোক্ত যোগপথ অবলম্বন করিবে না। আশা করি দেবেন্দ্রবাবুর গীতাব্যাখ্যা শাস্ত্রাক্ততার পক্ষপাতী হইলেও চিন্তাশীল পাঠক তাহা অতিক্রম করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও শাস্ত্রানুরাগের সাহায্যে স্বাধীন ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মসাধনের দিকে অগ্রসর হইবেন।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

ধর্ম্মপাল

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজ গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া যান। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া ধর্ম্মপাল দেব দুর্গ হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্য অমৃতানন্দকে যুবরাজ ও কল্যাণী দেবীর সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে সংবাদ পৌঁছিল যে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাডুবির পর সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়াছেন। গৌড় হইতে মহারাজকে খুঁজিবার জন্য দুই দল সৈন্য প্রেরিত হইল। পথে ধর্ম্মপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। এবং গোপালদেব ধর্ম্মপাল ও কল্যাণী দেবীকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কল্যাণীর মাতা কল্যাণীকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত পুরুষোত্তম খুলতাত-কর্ত্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত কান্যকুব্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মরুপ্রান্তে।

শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ পঞ্চনদ প্রদেশের নিম্নে জনহীন, তৃণহীন, জলশূন্য, দিগন্তবিস্তৃত, বালুকাময় প্রান্তর; প্রাচীন কালে ইহারই নাম ছিল মরুমাড়। খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে দুর্দ্ধর্ষ গুর্জ্জর জাতি এই বিস্তৃত মরু প্রদেশের অধিবাসী ছিল। সেই সময়ে হূণাপর নামধারী গুর্জ্জরগণ চিরতুষারাবৃত গান্ধার হইতে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিল। দীর্ঘকাল আর্য্যাবর্ত্তবাসের ফলে বর্ব্বরগণ আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্য-ভাষা গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ কুরুবর্ষের রীতিনীতি বিস্মৃত হইতেছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মরুবাসী গুর্জ্জরগণ অত্যন্ত বলশালী হইয়া উঠে। তাহারা নির্ম্মম নিষ্ঠুর মরুভূমিতে বাস করিয়া অত্যন্ত বলশালী ও কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সে সময়ে উর্ব্বর পঞ্চনদবাসী গুর্জ্জরগণ পদে পদে তাহাদিগের নিকটে পরাজিত হইতে-ছিল। মালবের নিকটবর্ত্তী মরুময় প্রদেশ হইতে গুর্জ্জর-রাজগণ ক্রমশঃ সরস্বতীতীরস্থিত স্থাণ্বীশ্বর ও জাহ্নবীতীর-বর্ত্তী সুদূর কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন গুর্জ্জররাজধানীর অপর নাম ছিল ভিল্লমাল।

মরুভূমির দক্ষিণ সীমান্তে ভিল্লমাল নগর অবস্থিত, বিশাল জনশূন্য মরুভূমি যেস্থানে পর্ব্বতমালায় শেষ হইয়াছে, সেই স্থানে পর্ব্বতমালার সানুদেশে দুর্ভেদ্য দুর্গ-শ্রেণী-বেষ্টিত গুর্জ্জররাজধানী শোভা পাইত। গুর্জ্জর-রাজধানী ক্ষুদ্র নগরী, দৈর্ঘ্যে এক ক্রোশ, ও প্রস্থে পঞ্চশত হস্ত মাত্র, কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকে ভীষণদর্শন পাষাণ প্রাকার ও সুগভীর পরিখা, তোরণে তোরণে লৌহনির্ম্মিত দ্বারত্রয় এবং তাহার পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ। নগরের উপরে শৈলমালার প্রতিশৃঙ্গে পাষাণনির্ম্মিত দুর্গসমূহ দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে অন্ধকার গুহা ও পাষাণ প্রাকারের দ্বারা পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। পানীয় জলের অভাব না হইলে গুর্জ্জররাজধানী দুর্জ্জেয়, আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে এই জনশ্রুতি ছিল।

হেমন্তের মধ্যাহ্নে ভিল্লমালের নগরপ্রাকার হইতে তিন ক্রোশ দূরে একজন পথিক পথিপার্শ্বে খর্জ্জুরকুঞ্জের স্বল্প ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। তাহার সম্মুখে দুইটি উষ্ট্র সুদীর্ঘ গ্রীবা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বালুকাক্ষেত্রে সংলগ্ন করিয়া খর্জ্জুরকুঞ্জের নিকটবর্ত্তী পঙ্কিল জলাশয় হইতে দীর্ঘকাল পরে পানীয় গ্রহণ করিতেছিল। উষ্ট্রের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু পশু বিরল; এই উষ্ট্র যখন সুদীর্ঘ গ্রীবা ভূমিতে রক্ষা করিয়া বিশ্রাম করে তখন উষ্ট্রপাল বুঝিতে পারে সে তাহার সহিষ্ণুতার সীমান্তে উপনীত হইয়াছে। রৌদ্রদগ্ধ বালুকাক্ষেত্র হইতে তীব্র তপ্তবায়ু ও শত শত সূচীবৎ তীক্ষ্ণ বালুকাকণা আসিয়া পথিককে দগ্ধ করিতেছিল, সে ব্যক্তি বস্ত্রখণ্ড জলাশয় হইতে বারবার আর্দ্র করিয়া লইয়া মুখে ও মস্তকে জলসেক করিতেছিল।

অদূরে ভিল্লমালনগর, উষ্ট্রপৃষ্ঠে মাত্র দুইদণ্ডের পথ, কিন্তু তাহার পক্ষে প্রখর রৌদ্রে যাত্রা করা অসম্ভব, কারণ তাহার বাহনদ্বয় তখন পথ চলিতে অশক্ত। পথিক অগত্যা খর্জ্জুরকুঞ্জের ক্ষীণছায়ায় বসিয়া মরুমাড়ের অগ্নি-বৎ পবন-হিল্লোলে শ্রান্তিদূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার পশ্চাতে জলাশয়ের সম্মুখে একটি প্রাচীন দেবালয়, তাহার একটি মাত্র প্রাচীর অবশিষ্ট আছে। মধ্যাহ্নকাল, সুতরাং জীর্ণ দেবালয়ের কোন স্থানে ছায়ার চিহ্নমাত্রও নাই। অকস্মাৎ পথিক পদশব্দ শুনিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতে পাইল, জীর্ণ দেবালয়ের তোরণে একজন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছে। পথিক তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কারণ সে যখন জলাশয়ে আসিয়াছিল, তখন সেই স্থানে কেহ ছিল না। সন্ন্যাসী বস্ত্রমধ্য হইতে অলাবুপাত্র বাহির করিয়া ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু পথিক মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল যে সে ভিক্ষা দিতে পারিবে না। তখন সন্ন্যাসী কহিল, "অর্থ চাহি না, খাদ্য আছে?" পথিক বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার নিকটে নাই, দূরে ঐ নগরে আছে।" সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিল, "তাহা আমি জানি, সে কথা তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না। নগর এখনও এক প্রহরের পথ, সমস্তদিন কিছুই আহার হয় নাই, সেই জন্যই তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছিলাম। শিব শম্ভো!

প্রভাতে মিলিল না, সন্ধ্যায় মিলিলেও মিলিতে পারে। তবে কি জান, অনর্থক লোকের মনে কষ্ট দিতে নাই, একদিন তোমাকেও হয়ত আমারই মত ভিক্ষা করিতে হইবে।" সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া পথিক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং কহিল "তুই আমাকে শাপ দিতেছিস্? তোকে ভিক্ষা দিলাম না বলিয়া—"

"বাপুহে, শান্ত হও, আমরা সন্ন্যাসী, কাম ক্রোধ লোভ মোহ বিবর্জ্জিত, আমরা কখনও কাহাকে অভিশাপ দিই না। তবে কি জান—"

"রাখ ঠাকুর তোমার তবে কি জান, অভিশাপ দিও না বলিতেছি।"

"শুন, চক্রের পরিবর্ত্তনে আজি তুমি রাজচক্রবর্ত্তী, কিন্তু কালি দীনহীন ভিখারীরও অধম হইতে পার—"

"আবার! ঠাকুর ভাল হইবে না বলিতেছি!"

"বাপু, তুমি ত এখনও রাজচক্রবর্ত্তী হও নাই।"

"যদি হই?"

"এখনই হও, আমার কোনই আপত্তি নাই।"

"ভাল।"

"কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কেন?"

"তুমি কখনও রাজচক্রবর্ত্তী হইবে না,—তাহাই বলিতেছিলাম।"

"ঠাকুর মহাশয়ের কি সামুদ্রিক বিদ্যা অধীত আছে?"

"যাহা ছিল ক্ষুধাতৃষ্ণায় এখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।" সন্ন্যাসী এই বলিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে একটি চর্ম্মনির্ম্মিত আধার বাহির করিল ও জলাশয় হইতে জল লইয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিল, পথিক উৎসুকনেত্রে তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। সন্ন্যাসী চর্ম্মাধার হইতে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ ভিক্ষাপাত্রে ঢালিয়া লইয়া তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পান করিল। তাহা দেখিয়া পথিক ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর মহাশয়, উহা কি?" সন্ন্যাসী প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ভিক্ষাপাত্র ধুইয়া বস্ত্রমধ্যে রক্ষা করিল এবং দণ্ডে ভর দিয়া উঠিল। পথিক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর মহাশয়, কোথায় যাইতেছেন?"

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "যেখানে ভিক্ষা পাওয়া যায়,—নগরে।"

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?"

"একটা ছাড়িয়া একশতটা জিজ্ঞাসা করিতে পার, কিন্তু বাপু, আমার সময় অল্প, এখনও তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইবে।"

"যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার দুইটা উষ্ট্রের একটায় আরোহণ করেন তাহা হইলে একপ্রহরের পরিবর্ত্তে দেড়-দণ্ডে পৌঁছিতে পারিবেন।"

"বাপুহে, তুমি একমুষ্টি অন্ন দিতেই প্রস্তুত নহ, তোমার উষ্ট্রে আরোহণ করিতে চাহিলে ত আমার মাথাটাই কাটিয়া ফেলিবে।"

"দেব, অপরাধ হইয়াছে, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

"আমি তোমার কথায় ক্রুদ্ধ হই নাই, তুমি এখন কি বলিতে যাইতেছিলে বল।"

"ঠাকুর কি এই ভীষণ রৌদ্রে পায়ে হাঁটিয়া নগরে যাইবেন?"

"হাঁ, গুরুপ্রদত্ত যে অমৃতরস পান করিয়াছি, তাহার বলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপ ও ক্লান্তি সমস্তই জয় করিয়াছি।"

"সত্য নাকি?"

"বাপুহে, আমি কি তোমাকে মিথ্যা কথা শুনাইবার জন্য মধ্যাহ্নকালে এই প্রাচীন দেবমন্দিরে আসিয়াছি?"

"না, না, আমি কি তাহা বলিতে পারি।"

"তবে কি?"

"এই বলিতেছিলাম কি—আমার নিবাস কান্যকুব্জে। কান্যকুব্জে নিবাস বটে, কিন্তু অবস্থান করি প্রতিষ্ঠানে—এত উত্তাপ সহ্য করা আমাদিগের অভ্যাস নাই। তাই বলিতেছিলাম কি, যে, প্রভুর অনুগ্রহ হইলে—প্রভুর প্রসাদস্বরূপ—"

"তুমি অমৃতরস পান করিতে চাও?"

"প্রভুর প্রসাদ পাইলে চরিতার্থ হইয়া যাই।"

"এখনই দিতেছি।"

সন্ন্যাসী এই বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে চর্ম্মাধার বাহির করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ তরল পদার্থ ভিক্ষাপাত্রে

ঢালিয়া দিলেন এবং জলাশয় হইতে জল লইয়া ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া পথিকের হস্তে প্রদান করিলেন। পথিক তাহা এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল। পান করিয়া সে কহিল, "প্রভু অমৃতরস বড়ই মধুর।" সন্ন্যাসী কহিল "এইবার তুমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, উত্তাপ সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যাইবে।" পথিক কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, "সত্য প্রভু, মনে হইতেছে যেন কুঞ্জবন হইতে ঝির্ ঝির্ করিয়া মলয়-মারুত বহিয়া আসিতেছে, আর দেখুন— কেমন চাঁদনী রাত্রি, আমার একটু একটু শীত করিতেছে।" পথিক এই বলিয়া খর্জ্জুর বৃক্ষে ভর দিয়া উপবেশন করিল, এবং ঈষৎ হাসিয়া সন্ন্যাসীকে কহিল, "সখি, তুমি কে ভাই?"

সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, নগরে যাইবে না?"

পথিক অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে চাহিয়া কহিল, "কে তুমি, এমন সময়ে রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছ? এখন সরিয়া পড়,—বড় শীত, গ্রীষ্মকালে যাইব।" পথিক এই বলিয়া ভীষণ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকাক্ষেত্রে শয়ন করিল, এক মুহূর্ত্ত পরে তাহার নাসিকাধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

সন্ন্যাসী যখন দেখিলেন যে সে সম্পূর্ণরূপে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে, তখন ধীরে ধীরে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে তাহার যে দ্রব্যসম্ভার ছিল তাহা ভূমিতে নামাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন দ্রব্য অপহরণ না করিয়া সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সমস্ত পরীক্ষা শেষ হইলে উষ্ট্রদ্বয়ের পৃষ্ঠের আসন পর্য্যন্ত পরীক্ষিত হইল। অবশেষে সন্ন্যাসী পথিকের পরিধেয় বস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। বস্ত্র, কটিবন্ধ, উষ্ণীষ, অঙ্গরক্ষ, শিরস্ত্রাণ সমস্তই পরীক্ষিত হইল। সন্ন্যাসী হতাশ্বাস হইয়া পথিকের পদদ্বয় হইতে ছিন্ন পাদুকাদ্বয় লইয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকাদ্বারা তাহা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। পাদুকাদ্বয়ের তলদেশে দুই খণ্ড মসৃণ চর্ম্ম মিলিল। সন্ন্যাসী চর্ম্মের লেখন পাঠ করিয়া তাহা পুনরায় পাদুকামধ্যে সন্নিবেশ করিলেন, পথিক তখন পানীয়ে মিশ্রিত মাদকের গুণে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

সন্ন্যাসী খর্জ্জুর-কুঞ্জের বহির্দ্দেশে আসিয়া বংশীধ্বন করিলেন, দূরস্থিত পর্ব্বতসদৃশ বালুকাপিণ্ডের অন্তরাল হইতে একজন অশ্বারোহী আর একটি অশ্ব লইয়া তাঁহার নিকটে আসিল। সন্ন্যাসী তাহাকে কহিলেন, "মন্দ, তোমার কথাই সত্য, এই ব্যক্তি ইন্দ্রায়ুধের দুত, ইহার পাদুকাতলে ইন্দ্রায়ুধের পত্র লুক্কায়িত ছিল। সে অমৃতরসভ্রমে ধুতুরার কালকূটপানে গভীর নিদ্রায় অচৈতন্য হইয়াছে।"

অশ্বারোহী কহিল, "উত্তম! প্রভু, চলুন আমরা নগরে ফিরিয়া যাই।"

উভয়ে অশ্বখুরোত্থিত ধূলিমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গুর্জ্জর-রাজসভা।

হেমন্ত প্রভাতের মৃদুসূর্য্যকিরণ যখন বিন্ধ্যের উচ্চ চূড়াগুলি সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিল, তখন নগরের তোরণে তোরণে মঙ্গলবাদ্যধ্বনিতে গুর্জ্জরপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তরুণ অরুণকিরণ যখন পর্ব্বতের পাদমূলস্থিত ভিল্লমাল নগরীর উচ্চ প্রাসাদশিখরগুলি স্পর্শ করিল, তখন গুর্জ্জররাজ নাগভট্ট সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। বিচিত্র বসন ও বিবিধ বর্ণরঞ্জিত উষ্ণীষ পরিধান করিয়া গুর্জ্জরপ্রধানগণ সভামণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন, মণ্ডপের বহির্দ্দেশে তাঁহাদিগের অস্ত্রধারী অনুচরগণ কোলাহল করিতেছিল। তাহাদিগের পশ্চাতে ভিল্লমালের নাগরিক ও গুর্জ্জরদেশের কৃষকগণ রাজ-দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাজা আসিলে প্রধানগণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাদিগের অনুচরবর্গের কোলাহল কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জ রাজদর্শন পাইল না।

প্রধানগণ পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিলে গুর্জ্জররাজ্যের মহাসান্ধিবিগ্রহিক কক্কুক রাজসমীপে নিবেদন করিলেন যে মহোদয় কান্যকুব্জপতি ইন্দ্রায়ুধ রাজসমীপে দুত প্রেরণ করিয়াছেন। অপ্রসন্নবদনে নাগভট্ট কান্যকুব্জরাজের দুতকে সভায় আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। গুর্জ্জরের মহাপ্রতীহার বাউক মণ্ডপের তোরণ হইতে পাঠকবর্গের পূর্ব্বপরিচিত পথিককে সভামধ্যে আনয়ন করিলেন। কান্যকুব্জরাজের দুতের নয়নদ্বয়

তখনও মাদকের প্রভাবে রক্তবর্ণ ও নিদ্রালস, তিনি গুর্জ্জরপতিকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে ইন্দ্রায়ুধের পত্র প্রদান করিলেন। রাজাদেশে প্রধানামাত্য বাহুকধবল লিপিপাঠ করিলেন —

"পরমেশ্বর পরমমাহেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌নাগভট্টদেব সমীপে, সমস্ত-আর্য্যাবর্ত্ত-ক্ষৌণীশরাজচক্রবর্ত্তী ভণ্ডিকুলাবতংস মহোদয়াধিপতি পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ইন্দ্রায়ুধদেবের নিবেদন,

"রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত স্বর্গগত মহারাজাধিরাজের পুত্র রাজাদেশে কান্যকুব্জেশ্বরের সীমান্ত হইতে তাড়িত হইয়া বংশপরম্পরানুক্রমে রাজদ্রোহী এবং সম্প্রতি সম্রাট উপাধিধারী গৌড়পতির আশ্রয়লাভ করিয়াছে, বারাণসী-ভুক্তি ও বারাণসীমণ্ডলের তরিক ও কুমারামাত্যগণ মহোদয়ে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে যে বিদ্রোহী গৌড়-পতির পুরোহিত পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে পূতসলিলা জাহ্নবীজলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে গৌড়পতি আমরণ রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত চক্রায়ুধকে রক্ষা করিবে এবং তাহাকে মহোদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিবে।

"রাজাদেশে লিখিত মহাকুমারামাত্য তক্ষদত্ত।"

লিপিপাঠ শেষ হইলে নাগভট্ট হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "দূত, কান্যকুব্জপতি কি নিঃসহায় ভ্রাতুষ্পুত্রের ভয়ে উন্মাদ হইবেন?" দূত নিরুত্তর রহিল, তখন নাগভট্ট বাহুকধবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহুক, গৌড়দেশ কোথায়? সরস্বতীতীরে, না দৃশদ্বতীতীরে?"

বাহুক।— ভট্টারক, গৌড়দেশ মগধের পূর্ব্বসীমান্তে অবস্থিত। প্রভুর স্মরণ থাকিতে পারে গৌড়বঙ্গের অধিবাসী-গণ স্বর্গগত মহারাজাধিরাজ বৎসরাজের প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া যুদ্ধের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে গৌড়বঙ্গের ধবল রাজছত্রদ্বয় স্বেচ্ছায় প্রেরণ করিয়াছিল।

বাহুকধবলের কথা শুনিয়া গুর্জ্জরপ্রধানগণ প্রথমে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইলেন। গৌড়বঙ্গবাসীগণ বৎসরাজের ভয়ে যে শ্বেত রাজছত্রদ্বয় বিনা যুদ্ধে সমর্পণ করিয়াছিল, রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবধারাবর্ষ বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া তাহা মান্যক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই পরাজয় তখনও গুর্জ্জরগণের বক্ষে শেলসম বিদ্ধ ছিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া নাগভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌড়ে সম্রাট হইল কবে?"

কন্যকুব্জরাজের দূত উত্তর করিলেন, "সম্প্রতি গৌড়ের প্রধানগণ একজন সামন্তকে সম্রাট পদবী প্রদান করিয়াছেন।"

"সে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি কত দূর?"

"লৌহিত্যতীর হইতে হিরণ্যবহা পর্য্যন্ত।"

নাগভট্ট পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, "এই সাম্রাজ্যের সম্রাটের ভয়ে মহোদয়পতি যদি ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে বলিবেন।" গুর্জ্জররাজের কথা শুনিয়া গুর্জ্জরপ্রধানগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, লজ্জারক্তনেত্র কান্যকুব্জরাজদূত অধো-বদন হইয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নাগভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কতদিন পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে যাত্রা করিয়াছেন?"

"প্রায় চারিমাস পূর্ব্বে।"

"ভিন্নমালে কি অদ্যই আসিয়াছেন?"

"না, কল্য নগরপ্রান্তে আসিয়াছি।"

"কল্যই নগরে প্রবেশ করেন নাই কেন?"

"মহারাজাধিরাজ, নগরপ্রান্তে আমাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।"

"আপনি দূত, আপনার কি বিপদ?"

"মহোদয়পতির আদেশে আমি ছদ্মবেশে আসি-য়াছি।"

"আপনি যে বেশেই আসুন, নগরপ্রান্তে আপনার কি বিপদ হইতে পারে?"

"একজন সন্ন্যাসী মরুপ্রান্তে জলাশয়তীরে আমাকে মাদকমিশ্রিত পানীয় দিয়া প্রায় তিন প্রহর চেতনাশূন্য করিয়া রাখিয়াছিল।"

"আপনার কোন সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে?"

"কিছু নহে।"

"তবে কেন মাদক সেবন করাইল?"

"কিছু বুঝিতে পারিলাম না।"

"আপনি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রাতে কান্যকুব্জপতির পত্রোত্তর দিব। ইতিমধ্যে চোরের সন্ধান করিতেছি।"

কান্যকুব্জদূত অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন।

নাগভট্ট তখন বাহুকধবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহুক, নগরপ্রান্তে কে রাজদূতকে মাদকমিশ্রিত পানীয় দিয়া তাঁহাকে চেতনাশূন্য করিল, অথচ কোন দ্রব্য অপহরণ করিল না?"

প্রবীণ অমাত্য অবনতমস্তকে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

তখন সভামণ্ডপের অপরপ্রান্তে বৃদ্ধ পুরোহিত প্রহ্লাদ শর্ম্মা কুশাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও রোষকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ, বশিষ্ঠগোত্র চিরকাল গুর্জ্জরপ্রতীহারবংশের শুভাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন। চালুক্যবংশীয় অমাত্যরাজ বাহুকধবল বুঝিতে পারেন না বিস্তৃত গুর্জ্জররাজ্যে এমন কি সমস্যা আছে? শুন, বাহুকধবল, লজ্জার অনুরোধে রাজসমীপে মিথ্যা কহিও না, আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে দেবতা ও ব্রাহ্মণের শত্রু কে আছে তাহা কি তুমি জান না? ভণ্ডীর বংশ ও অগ্নিকুল কাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান? হর্ষের মৃত্যুর পরে কাহারা দস্যুতস্করের ন্যায় অন্ধকারে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়? তাহারাই কান্যকুব্জরাজদূতকে মাদকের প্রভাবে অচেতন করিয়া লিপিপাঠ করিয়াছে।"

বৃদ্ধ পুরোহিতের কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন, কেবল বৃদ্ধ অমাত্য বাহুকধবল সিংহাসনের সম্মুখে পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রোধে নাগভট্টের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি কম্পিতপদে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রহ্লাদ শর্ম্মা পুনরায় কহিলেন, "মহারাজ, পিতৃবন্ধুর উপদেশ গ্রহণ করুন, বৌদ্ধই রাজ্যের প্রকৃত শত্রু, বৌদ্ধ বিনাশ করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করুন, নৃগ নহুষ যযাতি ও অম্বরীষের ন্যায় ত্রিভুবনবাসী আচন্দ্রার্কক্ষিতি-সমকাল আপনার যশোরাশি কীর্ত্তন করিবে।"

তখন নাগভট্ট বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার কথাই সত্য, বৌদ্ধগণই আর্য্যাবর্ত্তের প্রকৃত শত্রু, বৌদ্ধবিনাশ না করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। আমি বৎসরাজের পুত্র, তাহারা আমাকেও এমন ভাবে অপমান করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। এ অপমান অসহ্য। বাউক—"

"মহারাজাধিরাজ।"

"বিহারস্বামী নাগসেন কোথায়?"

"এই নগরেই আছে।"

"এই দণ্ডে তাহাকে বন্দী করিয়া সভায় লইয়া আইস।"

মহাপ্রতীহার বাউক অভিবাদন করিয়া মণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন প্রবীণ অমাত্যের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তিনি গুর্জ্জরপতির হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "তাত, স্মরণ করিও, আমিও তোমার পিতৃবন্ধু, স্মরণ রাখিও যে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল ধরিয়া চালুক্যবংশের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাত, আমি বৌদ্ধ, তাহা তুমিও জান, সকলেই জানে, কিন্তু জগতে এমন কেহ নাই যে বলিতে পারে বাহুকধবল প্রতীহার বংশের অমঙ্গল কামনা করে। পুত্র, বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেন অথবা কোন শ্রমণ বা ভিক্ষু যদি কান্যকুব্জরাজদূতকে মাদকমিশ্রিত পানীয় দিয়া অন্যায় উপায়ে রাজলিপি পাঠ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অবশ্য দণ্ডনীয়। তুমি রাজা, প্রকৃতিপুঞ্জের জীবনমরণের অধীশ্বর, তোমার অঙ্গুলি হেলনে আর্য্যাবর্ত্ত বৌদ্ধশোণিতে প্লাবিত হইয়া যাইবে, একজন অপরাধীর সহিত শত শত নিরপরাধ ব্যক্তির ছিন্নমুণ্ড তোমাকে অভিসম্পাত করিবে। তুমি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান; ধৈর্য্য অবলম্বন কর, ক্রোধের বশীভূত হইয়া অন্যায় আচরণ করিও না। যথারীতি বিচার করিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধান করিও, বৃদ্ধ চালুক্যের ইহাই একমাত্র অনুরোধ।"

"বাহুক, আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে বিচার না করিয়া কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিব না। মহাধর্ম্মাধিকৃত ও মহাদণ্ডনায়ক নাগসেনের বিচার করিবেন।"

গুর্জ্জররাজের উক্তি শুনিয়া মহাপুরোহিত প্রহ্লাদ

শর্ম্মা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। একজন প্রতীহার আসিয়া নিবেদন করিল যে মহাপ্রতীহার বাউক বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেনের সহিত তোরণে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা শুনিয়া বাহুকধবল তদ্দণ্ডে সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন। পরক্ষণেই নাগসেন ও বাউক অপর তোরণ দিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাগভট্টকে অভিবাদন করিয়া মহাপ্রতীহার বাউক বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ দাসানুদাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন! আচার্য্য নাগসেনকে বন্দী করিবার আদেশ পাইয়া আমি অশ্বারোহণে সর্ব্বাস্তিবাদীর বিহারে যাইতেছিলাম, পথে আচার্য্য নাগসেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি কহিলেন, যে, তিনি স্বয়ং রাজদর্শনে আসিতেছেন, সেজন্যই তাঁহাকে বন্দী করি নাই।" নাগভট্ট তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি রাজসভায় আসিতেছিলেন কেন?"

নাগসেন।—রাজদ্বারে নগরপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব বলিয়া।

নাগভট্ট।—কি অভিযোগ?

নাগসেন।—কল্য রাত্রিতে দুইজন ভিক্ষু নগরপালের আদেশে নগরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

নাগভট্ট।—তাঁহারা কোথায় গিয়াছিলেন?

নাগসেন।—গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে।

নাগভট্ট।—উত্তম, সে বিচার পরে হইবে, সম্প্রতি আমার নিকটে বৌদ্ধসঙ্ঘের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ আসিয়াছে।

নাগসেন।—কি অভিযোগ, মহারাজ?

নাগভট্ট।—কল্য মধ্যাহ্নে কান্যকুব্জরাজদূত মহারাজাধিরাজ ইন্দ্রায়ুধের নিকট হইতে পত্র লইয়া আমার নিকটে আসিতেছিলেন, নগরপ্রান্তে আপনি অথবা আপনার দলভুক্ত কোন ব্যক্তি রাজদূতকে মাদকমিশ্রিত পানীয় সেবন করাইয়া তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য করিয়া গোপনে সেই পত্র পাঠ করিয়াছেন।

নাগসেন।—মহারাজ, ধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া কহিতেছি, অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য।

নাগভট্ট।—আপনারা নিরপরাধ তাহা প্রমাণ করুন।

নাগসেন।—যিনি অভিযোগ করিতেছেন, তিনিই প্রথমে অপরাধ প্রমাণ করুন।

নাগভট্ট।—উত্তম, কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সময় লাগিবে। যতদিন বিচার শেষ না হয়, ততদিন আপনাদিগকে অবরুদ্ধ থাকিতে হইবে।

নাগসেন।—আমাকে?

নাগভট্ট।—কেবল আপনাকে নহে, গুর্জ্জররাজ্যবাসী সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে।

নাগসেন।—প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

দশম পরিচ্ছেদ

মণিদত্তের দান।

শ্রাদ্ধান্তে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব অলিন্দে বিশ্রাম করিতেছেন, গর্গদেব সমবেত ব্রাহ্মণগণকে যথোপযুক্ত দানে সম্মানিত করিয়াছেন। প্রাসাদের অপরপ্রান্তে মহাকুমার বাক্‌পাল ও প্রধান রাজপুরুষগণ লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন করিতেছেন। এই সময়ে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ ধীরে ধীরে অলিন্দে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মপাল সুখাসনে বসিয়া করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বিশ্বানন্দকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন।

বিশ্বানন্দ ধর্ম্মপালের নিকটে আসিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "ধর্ম্ম, তুমি অদ্য সন্ধ্যার পরে অন্তঃপুরে যাইও না।"

সম্রাট বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, প্রভু?"

"অদ্য সন্ধ্যার পরে তোমাকে একস্থানে লইয়া যাইব।"

"কোথায় প্রভু? অদ্য শ্রাদ্ধের দিন, অদ্য গ্রামান্তরে যাওয়া নিষেধ, নদীপার হওয়াও নিষেধ।"

"গ্রামান্তরে যাইতে হইবে না, নদীও পার হইতে হইবে না।"

"তবে কোথায় লইয়া যাইবেন, প্রভু?"

"এই নগরে।"

"এই নগরে?"

"হাঁ, ধর্ম্ম, গৌড়নগরেরই একস্থানে যাইতে হইবে। অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিও না।"

"কেন, প্রভু?"

"তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না।"

"আত্মরক্ষার আবশ্যক হইবে না ত?"

"ধর্ম্ম, বিশ্বানন্দ জীবিত থাকিতে কেহ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না?"

"প্রভু, আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করুন। কিন্তু গন্তব্যস্থান অবগত হইবার জন্য আমি বড়ই উৎসুক হইয়াছি।"

"যাত্রাকালে প্রাসাদের সীমার বাহিরে গিয়া বলিব।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইল, গৌড়েশ্বর ভোজনান্তে পুনরায় অলিন্দে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখনও প্রাসাদের অঙ্গনে শত শত দরিদ্র অনাথ ভিক্ষোপজীবী ভোজন করিতেছিল, গর্গদেব ও বাক্‌পাল তখনও কার্য্যশেষ করিতে পারেন নাই। অন্ধকার হইয়া আসিলে চারিদিকে দীপমালা প্রজ্বলিত হইল, কিন্তু গৌড়েশ্বর অলিন্দের আলোকগুলি নির্ব্বাপিত করিতে আদেশ করিলেন। অর্দ্ধদণ্ডপরে নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে বিশ্বানন্দ অলিন্দে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী অদ্য গৈরিকের পরিবর্ত্তে রক্তাম্বর ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের পরিবর্ত্তে মহাশঙ্খের মালা ও হস্তে নর-কপাল-নির্ম্মিত যষ্টি। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ধর্ম্মপালদেব গাত্রোত্থান করিলেন, বিশ্বানন্দ দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্ম, তুমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত?"

উত্তর হইল, "হাঁ, প্রভু।"

"তবে আইস।"

উভয়ে আলোকমালাশোভিত প্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বানন্দ দুইখণ্ড উত্তরীয়বস্ত্র আনিয়াছিলেন, উভয়ে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। প্রাসাদের সীমা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, অদ্য কোথায় যাইতে হইবে?"

সন্ন্যাসী অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "মণিদত্তের গৃহে। ধর্ম্ম, অদ্য মণিদত্তের দান গ্রহণ করিতে হইবে।"

"প্রভু, এখন ত তাহারা দিবে না বলিয়াছে, আমি ত এখনও সে ধনের যোগ্যপাত্র হই নাই?"

"তুমি অদ্য হইতে সুযোগ্যপাত্র হইয়াছ।"

"কেন, প্রভু?"

"প্রভাতের কথা স্মরণ কর।"

"কি কথা?"

"চক্রায়ুধকে আশ্রয় দান।"

"ওঃ, ইহা কি তাহাদিগের কর্ণে পৌঁছিয়াছে?"

"নিশ্চয় পৌঁছিয়াছে।"

উভয়ে বাক্যব্যয় না করিয়া প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণ গলিপথ অবলম্বন করিলেন। অন্ধকারময় বক্রপথ অতিবাহন করিয়া প্রায় একদণ্ড পরে একটি জীর্ণ আলোকশূন্য অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপালদেব তাহা দেখিয়া চিনিলেন, তাহাই বণিক মণিদত্তের গৃহ।

জীর্ণগৃহদ্বারে কেহই নাই, তাহা কবাটকশূন্য, নগরের সে অংশে তখন গৃহে গৃহে দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, অধিবাসীগণ সুষুপ্তিমগ্ন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে দুই একটা নিশাচর পক্ষী সশব্দে আকাশমার্গে উড়িয়া যাইতেছে। ধর্ম্মপাল অভ্যাসবশতঃ অসির অন্বেষণে কটিদেশে হস্তার্পণ করিলেন, কটিদেশে অসি নাই দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার স্মরণ হইল যে বিশ্বানন্দের আদেশে প্রাসাদে অস্ত্র রাখিয়া আসিয়াছেন।

বিশ্বানন্দ অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া উভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, কারণ সেই স্থান হইতে বহু মানবের পদশব্দ শ্রুত হইতেছিল। চারিদিকে অন্ধকার, সূচীভেদ্য অন্ধকার, পুরাতন গৃহে আবর্জ্জনারাশির মধ্যে বারবার তাঁহাদের পদস্খলন হইতেছিল। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ধর্ম্মপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, কিছু শুনিতে পাইতেছেন কি?" সন্ন্যাসী অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "হাঁ, পাইতেছি, কিন্তু ভয় পাইও না।" গৌড়েশ্বর হাসিয়া কহিলেন, "না, ভয় পাই নাই। মনে হইতেছে যেন অনেক মানুষ পথ চলিতেছে, অথচ গৃহ অন্ধকার, আবর্জ্জনাপূর্ণ, যেন বহুকাল ইহাতে জনমানব পদার্পণ করে নাই।"

"সত্য সত্যই বহু মানব অদ্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছে, অবিলম্বেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে।"

উভয়ে পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটি অন্ধকারময় কক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু প্রবেশ করিয়াই পূর্ব্বদিনের মত দ্বার হারাইয়া গেল, মনে হইল গৃহের চারিদিকে ইষ্টকময় প্রাচীর, তাহাতে প্রবেশের কোন উপায় নাই। এই সময়ে দূরে নগরতোরণে রজনীর দ্বিতীয় যামের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, দেবমন্দিরসমূহে মধ্যরাত্রির আরত্রিকের শঙ্খঘণ্টার ক্ষীণধ্বনি আসিয়া তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। তোরণের বাদ্য শেষ হইবামাত্র অন্ধকার হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন. "আমি চক্ররাজ বিশ্বানন্দ।"

"আর কে?"

"গৌড়েশ্বর মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব।"

"স্বাগত।"

নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া করুণ কোমল কণ্ঠে ক্ষীণ সঙ্গীতধ্বনি উঠিয়া গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিল, ধর্ম্মপালের মনে হইল বহুদূরে বামাকণ্ঠে সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীত শেষ হইল, অন্ধকার হইতে পুনরায় জিজ্ঞাসা হইল, "চক্ররাজ বিশ্বানন্দ ও গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল, তোমরা কি চাহ?"

"বণিক মণিদত্তের সম্পত্তি।"

সহসা তীব্র নীল আলোকে কক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মপালদেব দেখিলেন পূর্ব্বে তাঁহারা যে কক্ষে আসিয়াছিলেন, আজিও সে কক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। গৃহের এক পার্শ্বে দেবপ্রতিমা, তাহার পশ্চাৎ হইতে নীল আলোক আসিতেছে এবং প্রতিমার সম্মুখে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপরিচিত কুব্জপৃষ্ঠ শীর্ণকায় খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আছে। কক্ষ আলোকিত হইলে বৃদ্ধ পুনরায় কহিল, "স্বাগত।" তাহার পর নতজানু হইয়া ধর্ম্মপালদেবকে প্রণাম করিল, বিশ্বানন্দের দিকে চাহিয়াও দেখিল না। বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মহারাজাধিরাজ, দীনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, মহাসঙ্গীতির আদেশে আপনাকে অন্ধকারে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অদ্য আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভট্টারক আর্য্যমহাসঙ্গীতি ভট্টারকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আপনি এই পথে আসুন।"

ধর্ম্মপাল ও বিশ্বানন্দ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে হইল না, তাঁহাদিগের সম্মুখে চিত্রপটের ন্যায় কক্ষের একদিকের প্রাচীর সরিয়া গেল। ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া দেখিলেন সম্মুখে আলোকমালায়সজ্জিত বিস্তৃত কক্ষ, তাহাতে অর্দ্ধবৃত্তাকারে দণ্ডায়মান শতাধিক মুণ্ডিতশীর্ষ ভিক্ষু, কক্ষমধ্যে গৃহতলে সুবর্ণনির্ম্মিত বেদী এবং তাহার উপরে একটি ক্ষুদ্র চৈত্য, একখানি পুস্তক ও একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। ধর্ম্মপাল ও বিশ্বানন্দ সাষ্টাঙ্গে রত্নত্রয়কে প্রণাম করিলেন।

তখন ভিক্ষুকমণ্ডলীর মধ্যস্থল হইতে একজন ভিক্ষু অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, স্বাগত, ভারতবর্ষের ভট্টারক আর্য্যমহাসঙ্গীতি আপনার দর্শনলাভের জন্য অদ্য এইখানে সমাগত।"

ধর্ম্মপালদেব ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া ভিক্ষুগণকে প্রণাম করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত বর্ষীয়ান মহাস্থবিরগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া গৌড়েশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মপাল তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষু অগ্রসর হইয়া ধর্ম্মপালের হস্তধারণ করিলেন ও তাঁহাকে লইয়া বেদীর নিকটে আসিলেন এবং কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, ত্রিরত্ন স্পর্শ করিয়া শপথ করুন অদ্য যাহা দেখিবেন বা শুনিবেন তাহা কখনও জনসমাজে প্রকাশ করিবেন না।" ধর্ম্মপাল ত্রিরত্ন স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন। তখন বৃদ্ধ ভিক্ষু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গৌড়েশ্বর আমি মহাসঙ্গীতির স্থবির বুদ্ধভদ্র. আপনার সম্মুখে যাঁহারা দণ্ডায়মান আছেন, ইঁহারাই আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধসঙ্ঘের নেতা। অদ্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এইস্থানে সম্মিলিত হইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে গৌড়বাসী বণিক মণিদত্ত রাঢ়ে গঙ্গাতীরে আপনাকে তাহার অতুল সম্পত্তি দান করিয়াছিল, কেমন?"

"হাঁ।"

"আপনি ও চক্ররাজ বিশ্বানন্দ কিছুদিন পূর্ব্বে মণিদত্তের ধন গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন?"

"হাঁ।"

"তখন সঙ্ঘের আদেশে এই বৃদ্ধ আপনাকে কহিয়াছিল যে আপনি এখন ধন পাইবেন না, উপযুক্ত হইলে পাইবেন ?"

"হাঁ।"

"অদ্য কান্যকুব্জের নিরাশ্রয় রাজকুমারকে আশ্রয় দিয়া আপনি মণিদত্তের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য হইয়াছেন। দুর্ব্বলের অধিকার প্রবলের গ্রাসমুক্ত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনি যে মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, স্থবিরগণ তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে মণিদত্তের উত্তরাধিকার আপনার হস্তে অপব্যয় হইবে না। গৌড়েশ্বর, আর্য্যাবর্ত্তে সদ্ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, বঙ্গে ও লাটদেশে শাক্যরাজকুমারের ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র আছে, তাহাও ধ্বংসোন্মুখ। দক্ষিণাপথে অনার্য্য হীনযান প্রচলিত, সেস্থানেও মহাযানের আদর নাই। সদ্ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, সদ্ধর্ম্মীমাত্রেরই বাসনা যে জীব জন্মবন্ধনমুক্ত হইয়া প্রকৃত নির্ব্বাণ লাভ করে। মহারাজাধিরাজ হর্ষের তনুত্যাগের পর হইতে আর্য্যাবর্ত্তে সদ্ধর্ম্ম অবলম্বনহীন। মহাসঙ্গীতি তদবধি আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছেন। আর্য্যাবর্ত্তে বৈশ্যগণ সদ্ধর্ম্মানুরাগী, সদ্ধর্ম্মানুসারে পুত্রহীন বৈশ্যের সম্পত্তি সদ্ধর্ম্মের সেবায় ব্যয় হয়, সুতরাং মণিদত্তের সম্পত্তি মহাসঙ্গীতির সম্পত্তি। মহাসঙ্গীতি বহু বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে এই সম্পত্তি যদি সদ্ধর্ম্মের সেবায় ব্যয় হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত।"

"সদ্ধর্ম্মের সেবা কি ?"

"বৌদ্ধের রক্ষণ।"

"সদ্ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে অন্য ধর্ম্মের উৎপীড়ন আবশ্যক নহে ত ?"

"না।"

"তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।"

"গৌড়েশ্বর-সমীপে মহাসঙ্গীতির আর একটি নিবেদন আছে।"

"কি ?"

"গৌড়েশ্বর সদ্ধর্ম্মনিরত, পরাক্রান্ত ও ন্যায়পরায়ণ। মহাসঙ্গীতি অনুরোধ করিতেছেন যে গৌড়েশ্বর সমগ্র ভারতবর্ষে অত্যাচারপীড়িত সদ্ধর্ম্মীর রক্ষার ভার গ্রহণ করুন।"

"সানন্দে গ্রহণ করিলাম।"

"দ্বিতীয়বার বিবেচনা করুন।"

"কোন বাধা দেখিতেছি না।"

"তৃতীয়বার বিবেচনা করুন।"

"দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।"

ধর্ম্মপালের কথা শেষ হইবামাত্র সমবেত স্থবিরমণ্ডলী ও বুদ্ধভদ্র পুনরায় ধর্ম্মপালকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন বুদ্ধভদ্র পুনরায় কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, সত্য রক্ষার জন্য পুনরায় শপথ করিতে হইবে। বলুন, আমি মহারাজাধিরাজ গোপালদেবের পুত্র, পরমেশ্বর, পরম-সৌগত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল রত্নত্রয়কে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অদ্য হইতে সদ্ধর্ম্মের রক্ষায় ও সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলাম।"

ধর্ম্মপাল বুদ্ধভদ্রের উক্তি পুনরুচ্চারণ করিলেন। শপথ শেষ হইবামাত্র সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া ত্রিরত্ন ও ধর্ম্মপালকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে বুদ্ধভদ্র ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। সকলে ত্রিশরণমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রত্নত্রয়কে প্রণাম করিলেন। তখন বুদ্ধভদ্র কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, ভাণ্ডারে আসুন।" ধর্ম্মপাল অগ্রসর হইয়াছেন এমন সময়ে দূরে নগরতোরণে চতুর্থযামের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, দেবালয়ে দেবালয়ে আরত্রিকের শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত হইল। ধর্ম্মপাল বিশ্বানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, এখন কত রাত্রি ?" সন্ন্যাসী কহিলেন, "রাত্রি শেষ হইয়াছে।" বুদ্ধভদ্র, বিশ্বানন্দ ও ধর্ম্মপাল ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ভাণ্ডার শূন্য। ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাস্থবির, মণিদত্তের ধন কোথায় ?" বৃদ্ধ মহাস্থবির হাসিয়া কহিলেন, "তাহা জগদ্ধাত্রীর ঘাটে নৌকায় প্রেরিত হইয়াছে, নৌকা প্রাসাদে লইয়া যান।" (ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিঞ্জরের বাহিরে

(গল্প)

১

ভাই ললিতা,

অনেক দিন তোমার কোনো খবর পাই নি; আমিও তোমায় চিঠি লিখতে পারি নি। আমার জীবনের ওপর দিয়ে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে; আমি অনেক রকম নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সেই-সমস্ত খবর তোমায় ছাড়া আর কাকেই বা বলি? তাই তোমায় সব কথা খুলে বলবার জন্যে মনটা আমার ব্যাকুল হয়েছে।

আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। এখন আমার মা, আর ছোট ভাই-বোন দুটির অভিভাবক আমিই। এখন বুঝতে পারছি মেয়েমানুষ বাস্তবিকই অবলা। কবিরা তাদের লতার সঙ্গে তুলনা করে—সদাই দুর্ব্বল, পরনির্ভর; একটু তাত্ লাগলেই আমূলে নেতিয়ে পড়ে, একটু আঁচ লাগলেই মুষড়ে যায়, একটু ধাক্কা খেলেই ধূলায় লুণ্ঠিত হবার আশঙ্কা। আমি তাদের নদীর স্রোতের সঙ্গে তুলনা করি—তটের বন্ধনের মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তার গতি শোভন সুন্দর; ততক্ষণই প্রাণের ও প্রাচুর্য্যের, আনন্দের ও সৌন্দর্য্যের হাস্যধারা; ততক্ষণই তার সম্মুখে অনন্তের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা; কিন্তু যেই সে কূল ছাড়িয়ে উপচে ছড়িয়ে পড়ে, অমনি সে নিজেকে ত হারায়ই, পরকেও ডোবায়,—চারিদিককার আনন্দ, সৌন্দর্য্য, প্রাণের খেলা নষ্ট ভ্রষ্ট করে ফেলে। এমনই অক্ষমতা নিয়ে আমরা জন্মেছি, বিশেষ ত এই বাংলা দেশে। আমার মতন এমন একজন অক্ষমার ঘাড়ে একটি অসহায় সংসারের ভার ভগবান চাপিয়ে দিয়েছেন। আমাকে সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, পরের উপর নির্ভরের আশা ছেড়ে পরের ভর সইতে হবে!

অন্নের সন্ধানে আমাকে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুতে হয়েছে। কিন্তু কোথায় অন্ন, কেমন করে সংগ্রহ করতে হয়, আমি কি ছাই জানি? আমরা অন্নপূর্ণা ততক্ষণই যতক্ষণ পুরুষেরা অন্নে ভাণ্ডার পূর্ণ করে রাখে। আমরা চিরকাল পিঞ্জরের ভিতর বন্ধ থাকি, যারা আমাদের পোষে তারা তাদের খেয়াল-মত যখন খুসি একটু ছাতু ছোলা দুধ জল দিয়ে যায়, আর আমরা দিব্য নিশ্চিন্ত হয়ে মধ্যে মধ্যে শিশ দিয়ে গান করি আর গানের সমের ঘরে চুমকুড়ি দি। পিঞ্জরের ভিতর বন্ধ থেকে প্রাণটা যে হাঁপিয়ে না ওঠে এমন নয়; শিকের ফাঁকে ফাঁকে মুক্ত আকাশের নীল চোখের ইসারা আর তরুপল্লবের হাতছানি দেখে মনটা খুবই উড়ু উড়ু করে। কিন্তু কোনো দিন খাঁচার দরজা খোলা পেলেও উড়তে সাহস হয় না, বুক দুরদুর করে, পাখা যেন অবশ হয়ে আসে। যিনি আমাদের খাঁচার মালিক, তিনি যদি কোনো দিন দয়া করে' খাঁচার দরজা খুলে ধরে' উড়ে যেতে বলেন তখন মালিকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। ভয় হয় অত বড় ফাঁকা জায়গায় আমি এতটুকু ভীরু প্রাণী কোথায় পাব একটু আশ্রয়, আর কোথায় পাব ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল। অপরিচয়ে সোজা পথটাকেও বাঁকা লাগে, নিরীহ জিনিসটাকে দেখেও ভয় লাগে, স্বাভাবিক ঘটনাকেও বিপদের সূচনা বলে আশঙ্কা হয়। তাই যদি কোনো দিন আমাদের মালিকের অভাব হয় অমনি আমরা পিঞ্জরের ভিতর বসে বসে ঠায় শুকিয়ে মরি, বাইরে বেরিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতেও পারিনে।

আমি ভাই, অসাধ্যসাধন করে ফেলেছি, বাইরে বেরিয়ে পড়েছি।

বাইরে বেরিয়েই আমার সব চেয়ে বেশী ভয় লেগেছিল ঐ পুরুষগুলোকে দেখে। নিঃসম্পর্ক পুরুষের সঙ্গে ত আমাদের মোটেই পরিচয় নেই। বাপ-খুড়োদের কোলেই আমরা জন্মাই, আর ভাই-ভাইপোদের আমরা কোলেই পাই; তাদের সঙ্গে পরিচয় আমাদের পাতাতে হয় না। পরিচয় পাতাতে হয় যে-একটি অচেনা লোকের সঙ্গে, তাকে দেখে প্রথম-প্রথম ভয় লাগলেও সে একলা বলে' সাহস থাকে। কিন্তু একেবারে পুরুষের হাটের মধ্যে ছেড়ে দিলে আমাদের দশাটা হয় সিংহের খাঁচার মধ্যে রোমান্ গ্লাডিয়েটরের মতন—যত বড়ই বীর আর সাহসী হোক, মৃত্যু তার অনিবার্য্য, পরাভব তার জানা কথা। আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে যে সেকালের রাজকন্যারা কেমন করে' স্বয়ম্বর-সভায় নিজেদের বর

বাছাই করতে যেত! ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যেত না?. দাড়ি আর চৌগোঁপ্পা চুমরে চারিদিকে আমিষ-লোলুপ মার্জ্জারের মতন অতগুলো পুরুষ প্যাঁটপ্যাঁট করে চেয়ে রয়েছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাছাই করব কাকে? ভয়ে লজ্জায় সেদিকে তাকাতেই ত পারা যাবে না! অথচ তারা প্রত্যেকে লোলুপ হয়ে আমার দিকে তাকিয়েই আছে! আমার ত মনে করতেই গা শিউরে ওঠে! সত্যি ভাই, পুরুষগুলো কি বিচ্ছিরি করেই যে তাকায়!

আমি শেয়ালদা ষ্টেসনে টিকিট বিক্রী করবার একটা চাকরী পেয়েছি। সামান্য মাইনে। রোজ ত আর গাড়ী করে আপিসে যেতে পারিনে, কাজেই ট্রামে করে' আপিসে যেতে হয়। যেদিন ভাই প্রথম ট্রামে করে' আপিসে যাব বলে' বেরুলাম, সেদিন মনের অবস্থা যে কি হয়েছিল তা অন্তর্য্যামীই জানেন। ফাঁশীকাঠে চড়বার সময় মানুষের মন বোধ হয় এমনি করে।—পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল, ঠোঁট শুকিয়ে উঠছিল, মুখ অকারণ লজ্জায় কেমন ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে পড়ছিল, বুক দুরদুর করছিল। আমি জোর করে' ত নিজেকে এক রকম টেনে নিয়ে গিয়ে ট্রাম থামবার থামের কাছে ফুটপাথের ধারে রাস্তার দিকে মুখ করে' দাঁড়ালাম।

পথিক পুরুষদের মধ্যে অমনি একটা চঞ্চলতার ঢেউ জেগে উঠ্‌ল। ভাগ্যিস্ ভগবান মাথার পেছন দিকে চোখ দেননি। সামনে পেছনে পুরুষদের বাঁদরামি লক্ষ্য করতে হলে একেবারে ক্ষেপে উঠতে হ'ত। একদিকে যে অনেকখানি অদেখা থেকে যায় সেটা মস্ত বাঁচোয়া!

ট্রামে উঠেও কি ছাই নিস্তার আছে? আমি ট্রামের পাদানে উঠ্‌বামাত্রই ট্রামযাত্রী পুরুষগুলো অমনি উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, আমি কোন্ কামরায় না-জানি ঢুকি।

পুরুষগুলো ভাই এমনই হাস্যকর জীব যে তাদের দেখে আমাদের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে ওঠে; তার ওপর আবার ওরা নানান্ রকম ভঙ্গী করে লোক হাসায় যে কেন তা বলতে পারি নে।

প্রথম নজরেই তাদের বিকট মূর্ত্তির বিচিত্র রূপ ভারি কৌতুককর মনে হয়। কারো মুখে গোঁপদাড়ির নিবিড় জঙ্গল, তার ভেতর চোখ দুটো বনবিড়ালের মতো ওত পেতে বসে থাকে। কারো দাড়ি কামানো, শুধু গোঁপ জোড়া একজোড়া ঝাঁটার মতো মুখের দরজার মোটা কপাট জোড়ার ওপর ঝোলানো রয়েছে, যেন কুনজর না লাগে। কেউ বা দাড়িগোঁপ সমস্ত চেঁছেছুলে নির্ম্মূল করে' আমাদের মুখের অনুকরণ করতে চায়—কিন্তু ও চাষাড়ে চেহারা শুধু দাড়িগোঁপ কামালেই বা মোলায়েম হবে কেন? কাউকে কাউকে মন্দ দেখায় না বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই মাকুন্দ মতন বিশ্রী লাগে। কারুর বা দাড়িগোঁপ দুই ছাঁটিয়া মাফিকসই করিয়া রাখা—তাদের তত মন্দ লাগে না। পুরুষ বেচারারা দাড়িগোঁপগুলো নিয়ে যেন মহা গণ্ডগোলে পড়ে গেছে, ঠিক করেই উঠতে পারছে না জঙ্গলমহাল রাখবে, ছাঁটবে, না কাটবে!

তারপরে মাথার টেড়িরই বা কত রকম রূপ! তোলা, লতানো, ঢেউখেলানো, কোঁকড়ানো; সিঁথি মাঝে, ডাহিন দিকে, বাঁ দিকে; কারুর সারা মাথায় টাক, সামনের দুটিখানি পাতলা চুলেই টাক ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টায় টেড়ির ক্ষীণ আভাস দেখা যায়; কাহারো মাথার সামনে টেড়ি, পশ্চাতে টিকি! এই দৃশ্যটি দেখে আমার এমন হাসি পেয়েছিল যে অসভ্যগুলোর মধ্যে আমিও আর একটু হলে অসভ্য হয়ে পড়তুম।

পোষাকেরই বা কত রকম বিচিত্রতা। ওরা এখনো ঠিক করতেই পারেনি কেমন সজ্জা ওদের ঠিক মানায়। কারো পূরো দস্তর সাহেবী সজ্জা—কিন্তু পাজামাটা হয়ত সরুঙ্গে, কোটটা ঢলঢলে, টাইটা বাঁকা, কলারটা শার্ট ছেড়ে ঠেলে উঠে পড়েছে, হ্যাটটা কতককেলে পুরোণো ময়লা—তবু সাহেব সাজতে হবে! কারো ধুতির ওপর চাপকান, তার ওপর চাদর, মাথায় কিছু নেই; কারো গায়ে কোট, কারো শার্ট, কারো পিরান। কারো জামা ঘামে তেলে একেবারে জরে উঠেছে, দুর্গন্ধে পাশের লোককে অতিষ্ঠ করে তুলছে, ছেড়ে ধুতে দেবার তাড়া নেই; কারো জামায় কাপড়ে পানের পিক ছিটিয়ে পড়েছে, কানে-গোঁজা দাঁতখোঁটা খড়কের মুখে চিবানো পানের কুচি আর ছোপ লেগে আছে। ওরই মধ্যে দুএকজনকে বেশ ভদ্রলোকের মতন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও দুটি শ্রেণী আছে—

এক একেবারে ফুলবাবু, আতিশয্যে উগ্র ; অপর শ্রেণী সাদাসিধে, বেশ শান্ত-দর্শন।

ট্রামে যখন উঠি তখন একটু সরে বসে আমায় একটু জায়গা দেওয়া যে দরকার, এ বোধটাও পুরুষ বর্ব্বরদের থাকে না, সবাই হাঁ করে' দৃষ্টি দিয়ে যেন আমায় গিলতে থাকে ; আমি যেন সদ্য চন্দ্রলোক থেকে নেমে এসেছি। ওদের চোদ্দ পুরুষে কখন যেন মেয়ের মুখ দেখেনি। পুরুষগুলোর তখনকার সেই গদগদ আত্মবিস্মৃত চঞ্চল ভাব দেখলে আমার সেকালের স্বয়ম্বরসভার একটি পরিষ্কার ছবি মনের সামনে ফুটে ওঠে। কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-সভার বর্ণনায় একটুও যে অত্যুক্তি করেন নি, তা আমি এখন বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছি।

লোকগুলোকে ঠেলেঠুলে জায়গা করে যদি বসা গেল তবেই যে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল তা নয় ; পরে যারা ট্রামে চড়্‌তে আসে তাদের মধ্যেও নানা রকম মনস্তত্ত্বের খেলা দেখতে পাওয়া যায়।—কেউবা যে-কামরায় আমি থাকি ঠিক সেই ভরা কামরাতেই ভিড় বাড়াতে আসে, অন্য কামরা খালি থাকলেও সেদিকে যেতে চায় না ; কেউবা সামনের কামরায় উঠে এমন জায়গা বেছে নেয় যেন ঠিক আমার সামনাসামনি মুখোমুখী হয়ে বসতে পারে ; কেউবা ঠিক পিছনের কামরায় উঠে ঠিক আমার পিঠের কাছে বসে' নানান ভঙ্গীতে হেলান দিবার চেষ্টা করতে থাকে ; কেউবা গাড়ীতে উঠেই এমন একটা অতিসম্ভ্রমের ত্রস্ত ভাব দেখিয়ে ছিটকে তফাতে গিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে, যেন স্ত্রীজাতিটার প্রতি তাঁরা এমন অতিসম্ভ্রমশীল যে প্রায় উদাসীন বল্‌লেও হয়—যেন এক-একটি শ্রীচৈতন্যের অবতার! তাদের সেই অশোভন ব্যবহার দেখে আমার হাস্যসংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অতি ব্যাপারটাই যে খারাপ! যারা অসম্ভ্রম প্রকাশ করে তারা যেমন পুরুষচরিত্রের বর্ব্বরতার একটা দিক, অতিসম্ভ্রমশীলেরাও তেমনি ভণ্ডামির আর-একটা দিক প্রকাশ করে মাত্র! কদাচিৎ দু-একজনকে দেখতে পাওয়া যায় যারা নারীকে দেখতে যে তাদের ভাল লাগে, নারীর সঙ্গ যে তাদের মধুময় লাগে, তা লুকোতেও চেষ্টা করে না, অথচ কদর্য্য অশোভন ভাবে প্রকাশও করে না,—তারা নারীকে ভালও বাসে, সম্ভ্রমও করে। এমন একটি পুরুষের কথা পরে বলব, সে লোকটিকে আমার লেগেছে ভাল। ভাল লেগেছে শুনে তুমি হাসছ বোধ হয়? কিন্তু ভাল-লাগা ভাল-বাসা নয়, এটা আমি আগে থাক্‌তেই তোমায় বলে রাখছি।

ট্রামে চড়বার সময় যেমন, নামবার বেলাও তেমন আমাদের দেখে পুরুষদের অশেষ রকম লীলা-চতুরতা প্রকাশ পায়। কেউবা আমার কাছ দিয়ে যাবার সময় আমার পায়ের ওপর দিয়ে কোঁচার ফুলটি বুলিয়ে চরণ-ধূলির নিছনি নিয়ে যায়।

আমি যখন নামি তখনও ওদের নানারকম লীলা লক্ষ্য করি। আমি নেমে গেলে সকল জানলা থেকেই মুখ ঝুঁকে পড়ে, দেখতে চায় আমি কোন্ পথে কোথায় যাই—আমার চারিদিকে যেন একটা মস্ত রহস্য জড়িয়ে আছে, সকলেরই চেষ্টা উঁকি মেরে সেই লুকানো কাহিনীটা জেনে নেবে।

পুরুষগুলো যে অমন তার জন্যে প্রকৃতিই দায়ী। প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তিগুলোকে প্রকৃতিস্থ কর্‌তে পারেনি বলে' বেচারাদের ওপর করুণা হয়, রাগ করা চলে না। বিশেষ ত আমাদের দেশের পুরুষদের ওপর। বেচারারা অপরের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের মুখ ত কখনো দেখতে পায়ই না, নিজের স্ত্রীরও যে খুব বেশী পায় তাও ত মনে হয় না। দুষ্প্রাপ্য জিনিসের প্রতি লোলুপতা ত স্বাভাবিক!

পুরুষ যে নারীর প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগী ও মনোযোগী এতে নারীরা মুখে পুরুষের ওপর যতই চটুন, মনে কিন্তু বেশ সন্তুষ্টই হন ; কারণ তাঁরা যে বন্দিতা, আরাধিতা, এ কথা জান্‌লে খুসি হওয়া স্বাভাবিক। আমি যে খুসি হই তা আমি স্পষ্টই স্বীকার করছি। পুরুষেরা যে আমাদের অতটা শ্রদ্ধা সম্ভ্রম দেখায় তার আর-একটা কারণ আমার মনে হয় যে, তারা প্রবল আমরা দুর্ব্বল, তারা আশ্রয় আমরা আশ্রিতা ; সংসারের সঙ্গে পদে পদে বোঝাপড়া করে' আপোষ-মীমাংসা করে' চলতে হয় বলে' তাদের একটা সহগুণ আর ভদ্রতা

চরিত্রগত হয়ে গেছে বলেও কতকটা। এটা আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করি যখন আর-একজন অপরিচিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে গ্রাহ্যও করে না। কিন্তু সে যদি পুরুষ হত তা হলে আমাকে দেখতে পেয়েই সে কৃতার্থ হয়ে যেত। পুরুষের এই ভদ্রতা যে শুধু আমাদেরই বেলায়, তা নয়; সে স্বজাতির প্রতিও যথেষ্ট খাতির দেখিয়ে চলে। যেখানে অনেক অপরিচিত মেয়ে একত্র হয়, সেখানে একটু গায়ে গা ঠেকলে কি কাপড় মাড়িয়ে ফেললে আর রক্ষা থাকে না; যার ত্রুটি সেও ক্ষমা চাইতে জানে না, যার অসুবিধা ঘটেছে সেও ক্ষমা করতে পারে না; অতি তুচ্ছ কারণে কোন্দল বাধিয়ে কলরব করতে লেগে যায়। কিন্তু ট্রামে আকস্মাৎই দেখি, একজন পুরুষ হয়ত অপরের পা মাড়িয়ে ফেললে, কিংবা অপরের গায়ে ঢলে পড়ল, তাতে সে ব্যক্তি শুধু একটি নীরব নমস্কার করলেই সকল গোল মিটে যায়। এক বাড়ীতে দুজন রক্তসম্পর্কে পরমাত্মীয় স্ত্রীলোক থাকলে ঝগড়ার চোটে চালে কাগ চিল বসতে পারে না; কিন্তু এক মেস নিঃসম্পর্ক পুরুষ দিব্য বনিবনাও করে' মানিয়ে সামলে থাকে দেখা যায়। এত যে তারা ভাল মানুষ, পরস্পরের সঙ্গে ভাব করে থাকে, মাঝখানে একটি মেয়েলোক এসে পড়লে আর তখন ভাব থাকে না—ভাই ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে পারে না। বাস্তবিক মন আর মর ভাঙাতে স্ত্রীলোক যত পটু, পুরুষ তেমন নয়। সে বিষয়ে রমণীর কুখ্যাতি একেবারে জগৎ-জোড়া! মেয়েরা স্বজাতিকে সুনজরে ত দেখেই না, পুরুষকেও যে খুব খাতির করে' চলে তাও নয়। যতটুকু দয়া সে যেন অনুগ্রহ, কাঙালকে একটু তাচ্ছীল্যের দান! এতে আমাদের কিন্তু লাভ আছে—পুরুষগুলো আমাদের কাছে চিরকালই ভিখারীর মতন অবনত হয়েই পড়ে থাকে—কিন্তু গৌরব নেই।

তারা অতৃপ্ত বলেই আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা তাদের জীবনের সম্বল; আমাদের একটু দেখতে পাওয়া, একটু মিষ্টি কথা শোনা, তাদের পরম লাভ বলে মনে হয়। দুজন আলাপী পুরুষ এক সঙ্গে মিলেছে কি অমনি আমাদেরই কথা। মানুষ মাত্রেরই জীবনের কতকটা অংশ যে গোপন রাখা দরকার, এই সামান্য বুদ্ধিটুকুও ঐ গোঁয়ারগোবিন্দগুলোর ঘটে নেই। রবিবাবু যে তাঁর স্বজাতির জবানীতে স্বীকার করেছেন যে—

"আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি!"

সেটা কবির অত্যুক্তি একটুও নয়, একেবারে খাঁটি স্বভাবোক্তি। ওদের ব্যবহার দেখে লজ্জা যেন লজ্জা পেয়ে বিদায় নিয়েছে; কিন্তু আমি লজ্জায় মারা যাই। ওরা যদি কোথাও বেশ সহজ হতে পেরেছে! ওরা রেল-ষ্টেসনে টিকিট নেবার ঘুলঘুলি দিয়ে এমন হাঁ করে' তাকিয়ে থাকে যে, ট্রেন ছেড়ে যাবে, কি কেউ পকেট কাটবে, তার খেয়ালই থাকে না। অনেক বাবুকে দেখি আমার হাত থেকে টিকিট কিনে নোট-ভাঙানি টাকা পয়সা ফেরত নিতে ভুলে যান। মূর্খগুলো জানে না যে ওতে ওদের আমরা ঘৃণাই করি।

পুরুষদের আর একটি ভারি মজা দেখি যে তারা আমাদের কোনো একটু তুচ্ছ কাজ করে' দিতে পেলে যেন বর্ত্তে যায়! আমার সঙ্গে যদি কোনো দিন কিছু জিনিসপত্তর থাকে, তা হলে আমি নামবার সময় অন্তত চতুর্ভুজ উদ্যত হয়ে ওঠে; তার মধ্যে যে ভাগ্যবান্ আমার সেবা করবার অধিকার পায় তার তখনকার কৃতার্থ মুখের ভাব, আর অন্য সকলের তার দিকে সপ্রশংস অথচ ঈর্ষা-আকুল চাওয়া বাস্তবিক দেখবার জিনিস।

এমনি করে' একটি লোক তার সহযাত্রীদের ভারি ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে।

এই ঈর্ষাটা পুরুষচরিত্রের ভারি একটা চিরন্তন দিক। পশুজগৎ থেকে আরম্ভ করে' মনুষ্যজগৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায় যে রমণীর করুণা যে পায় তার সঙ্গে, ব্যর্থ যারা তারা সকলে একৃকাট্‌ঠা হয়ে লাগে। কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দগুলো বোঝে না যে একজন ছাড়া আর সকলের নিরাশ ত হতেই হবে; যে ভালবাসা পেয়েছে সে না পেয়ে আর একজন পেলেও সেই একজনেরই লাভ। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে অজ বেচারাকে ইন্দুমতীর ভাল লেগেছিল বলে' সমস্ত রাজাগুলো একেবারে ক্ষেপে

মারমুখো হয়ে উঠল! কেন রে বাপু? বেচারার অপরাধ? সে যদি শ্রীকৃষ্ণের মতন রুক্মিণী-হরণ বা অর্জ্জুনের মতন সুভদ্রা-হরণ করত তাহলে না হয় ওরা বলতে পারত যে অজ্ঞ অন্যায় করেছে, ইন্দুমতীকে পছন্দ করবার সুযোগ দিলে না, হয়ত তার শ্রীহস্তের বরমাল্য তাদের কাল্মো গলায় পড়তে পারত। কিন্তু ইন্দুমতী ত তাদের সে ক্ষোভটুকু করবারও অবসর রাখেনি।

আহাম্মকেরা এটুকুও বুঝতে পারে না যে যাকে তারা প্রার্থিত রমণীর সম্ভাব্য ভালবাসা থেকে দূরে রাখতে যায়, তাকে নির্য্যাতিত দেখে সেই রমণীর অসম্ভব ভালবাসাও করুণায় যে সম্ভব হয়ে আসে। তাকে দূর করতে গিয়েই তাকে আরো নিকট করে' তোলে!

এমনি করেই ওরা ভাই, দশচক্রে আমায় একজনের অনুরক্ত করে তুলছে। এই অনুরাগটা বিপন্ন আশ্রিতের প্রতি করুণা ছাড়া আর কিছু নয়; ভালবাসা মনে করলে ভুল করবে।

এ আমার ট্রামের সহযাত্রী। প্রায় রোজই ট্রামে দেখা হয়। হঠাৎ একদিন দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার কারণ ঘটে গিয়েছিল। একদিন আমার আপিস যেতে বড় বেলা হয়েছিল। যখন ট্রাম ধরতে গেলাম তখন আপিসে যাবার ঠিক মুখোমুখী সময়। ট্রামগুলো একেবারে লোকে লোকারণ্য। লোকগুলো পাদানের ওপর দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। অমন গাছে ঝোলা অভ্যাস ত আমাদের নেই; পুরুষগুলো পূর্ব্বপুরুষের যে নিকট জ্ঞাতি গোঁপদাড়ি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ; আমরা বিবর্ত্তনে এগিয়ে এসেছি বলে, আমরা অমন গেছো কসরৎ পারিও না, পারলেও লজ্জা নামক মনুষ্যধর্ম্মটা আমাদের পুরা মাত্রাতেই আছে। অনেক ক্ষণ অপেক্ষার পর একখানা ট্রামে কেউ ঝুলছে না দেখে একটা কামরায় উঠে পড়লাম। একটিও জায়গা খালি নেই। মনে করলাম, পুরুষগুলো রমণীর সেবা করবার কাঙাল, এখনি কেউ-না-কেউ উঠে আমায় জায়গা করে' দেবে। কিন্তু একটাও একটু নড়ল না!

কেউ উঠল না দেখে যখন আমি ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে কি করব ঠিক করতে পারছিনে, তখন দু কামরা দূর থেকে একটি তরুণ যুবক দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বল্লে—আপনি এইখানে আসুন, আমি উঠে দাঁড়াচ্ছি।

তার কথায় আমার যে কি আরাম হল তা আর বলতে পারিনে। আমি যেন এক খাঁচা বুনো ভালুকের কবল থেকে অব্যাহতি পেয়ে বেঁচে গেলুম!

ট্রামের ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম থামিয়ে সে আমাকে নিজের জায়গাটিতে নিয়ে গিয়ে বসালে এবং নিজে গাড়ীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার মুখ তখন একগাড়ী লোকের ওপর জয়ের আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠেছে! আর বাকি লোকগুলোও তার দিকে এমন করে' তাকাতে লাগল যেন বলতে চাচ্ছে—এঃ! বড্ড জিতে গেল!—এ জিত ত তারাও জিততে পারত। কিন্তু যারা থাকে সুযোগের টিকি ধরবার জন্যে, তাদের সুযোগ ফস্কেই যায়; যে বুদ্ধিমান, সে সুযোগের সামনের ঝুঁটি ধরেই সুযোগকে কাবু করে' ফেলে! এ দেশটা কেবলই পেছু ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে টিকির মমতা করেই গেল!

এখন আমি ট্রামে ওঠবার সময় একবার সব কামরায় উঁকি মেরে দেখি সে আছে কি না। যদি তাকে দেখতে পাই তা হলে সে যে কামরায় থাকে সেই কামরায় গিয়ে উঠি, আর কেউ জায়গা না দিলেও সে আমায় জায়গা ছেড়ে দেবে, মাত্র এই আশায়। আমি যে রোজ তারই কামরা বেছে উঠি, এটা সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে; আমি ওঠবামাত্রই সে একমুখ হাসি নিয়ে ধী ও শ্রীর জ্যোতিতে ভরা চোখ দুটি আরাত্রিক যুগল প্রদীপের মত আমার দিকে একবার তুলে ধরে, পরক্ষণেই নিজের হাতের বইখানির ওপর নামিয়ে রাখে। এইখানে আসল পুরুষের পরিচয় পেয়ে আমিও আমার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা সাজিয়ে ধরি।

ওদের একটি দল আছে ভারি মজার। ওরা জগৎ-সংসারের কাউকে রেয়াৎ করে' ছেড়ে কথা কয় না—সকলেরই নিরিখ কষতেই ব্যস্ত। এরা বোধ হয় সাহিত্যিক, কারণ সাহিত্যের আলোচনাই বেশি শুনি। এদের একজন নাকি কবি। তার দুনিয়ার দুচার জন লোক ছাড়া আর কারো লেখা বড় একটা ভালো লাগে না—সে এমনি খুঁৎখুঁতে আর একগুঁয়ে যে যা গোঁ ধরে

তা ওর বন্ধুরা শত যুক্তি তর্কেও টলাতে পারে না। এরা দেখি সবাই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু এই কবিটির মত ভারি অদ্ভুত ধরণের; উনি বলেন বাইরে বেরুবে শুধু সুন্দরী তন্বীরা; মোটা, কালো, কুৎসিত যারা তাদের অবরোধে বদ্ধ থাকাই উচিত। এ কথা শুনে আমার মিল্টনের কোমাসের যুক্তি মনে পড়ল—Beauty is Nature's brag, প্রকৃতির গর্ব্বের ধন সৌন্দর্য্য, যাদের তা আছে তারা লুকিয়ে থাকবে না; ঘোমটায় মুখ ঢাকবে যারা কুৎসিত। কিন্তু যিনি একথা বলেন, তিনি যে খুব সুপুরুষ তা ত মনে হয় না। মানলাম না হয় উনি কবি, সৌন্দর্য্যের উপাসক। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি শুধু চোখেই ধরবার জিনিষ? রমণী কি শুধু ফুলের মতই রমণীয় না হলে সুন্দর বলে' স্বীকৃত হবে না? ইংরেজীতে একটা কথা আছে—স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য। রূপসী না হলেও ত সুন্দরী হতে বাধে না। যাদের রং বা চেহারা দৈবগতিকে নয়নরঞ্জন হয়নি তাদের কি পৃথিবীটা দেখে জানবার শিখবার আনন্দ পাবার দরকার নেই? জগতের সংস্পর্শে সংঘর্ষে না এলে তারা মানুষ হবে কেমন করে'—দেহ ও মনের স্বাস্থ্য বল সঞ্চয় করবে কোথা থেকে? আমার মনের প্রশ্নটাই যেন কেড়ে নিয়ে তার এক বন্ধু বল্লে—"তবে তোমার আমারও বাইরে বেরুনো উচিত নয়; তুমি যেমন মেয়েদের বলছ, মেয়েরাও ত তেমনি বলতে পারে—হোঁদলকুৎকুতে রকমের পুরুষদের মুখদর্শন আমরা করব না।" কবির যুক্তি—"তা কেন? আমরা চিরকাল বাইরে আছি, বাইরেই থাকব, বিশেষত আমাদের যখন জীবিকা অর্জ্জন করতে হয়।" আহা কি আহ্লাদে যুক্তি! যদি রোজগারের কথাই বলেন, তা হলে আমাদের দেশের কত মধ্যবিত্ত ও গরীব ঘরের মেয়ে উপবাসে থাকে, তাদের কি বাঁচবার জন্যে বাইরে বেরুতে হবে না? তারা বাইরে বেরুতে পারে না, সকল মেয়েই বাইরে বেরোয় না বলে', বর্ব্বর পুরুষগুলোর চোখে নারী জাতির স্বাধীনতা সয়ে যায়নি বলে'! পুরুষদের ভাল লাগে না বলে তারা খাঁচায় বদ্ধ থেকে অনাহারে মরে, তবু বেরোয় না। তারপর অসহ্য হলে তারা যখন বেরোয় একেবারেই বেরোয়! পথে বাড়ীর মেয়েরা বেড়ালে আমাদের দেশের পুরুষপুঙ্গবদের মাথা হেঁট হয়! কিন্তু তাঁরা যখন অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে' অবলাকে পথে বসান, তখন মাথাটা খুব উঁচু করেই চলতে পারেন বোধ হয়! বেহায়াদের এই সব কথা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বলতে একটু লজ্জাও করে না।

এই নিয়ে ওদের প্রায়ই খুব তর্ক বেধে যায়। আমার বন্ধুটি—বন্ধু বলছি শুধু নাম জানিনে বলে', এটা লোকটাকে বোঝাবার জন্যে একটা সংজ্ঞা বা চিহ্ন মাত্র, অন্য কিছু ভেবো না যেন। বন্ধুটি একেবারে জ্বলে ক্ষেপে উঠে খুব জোর দিয়ে বলে—"মেয়েরা যদি বাইরে না বেরোয় ত মরুভূমিতে আর কতকাল চরা যাবে?" সে যে আমাকে শুনিয়েই কথাটা বলে তা আমি খুব বুঝি। আমি যেন তার কাছে স্ত্রী-স্বাধীনতার অগ্রদূত। বন্ধুর কথা শুনে তার বন্ধু একটি তরুণ সুকুমার যুবক এক দিন বলে উঠল—"আমাদের লোককে বলবার কোনো অধিকার নেই। আমরা নিজেরা স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে কিছু কি করছি?" আমার বন্ধু অমনি বলে উঠল—"আরে এখন করব কি? আগে স্ত্রী হোক তারপর ত স্বাধীনতা দেবো! বিয়ে হোক আগে, তখন দেখবে আমাদের দৃষ্টান্তে ২৫ বছরের মধ্যে পথঘাট সুন্দরীতে ছেয়ে যাবে!" বোঝা গেল বন্ধুর বিয়ে হয়নি। সুন্দর যুবাটি বলে উঠল—"আরে পঁচিশ বছর পরে যখন চোখে ছানি পড়ে যাবে তখন সুন্দরীতে পথ ছাইলেই বা আমাদের কি!" তখন ব্যাপারটাকে চটপট আগিয়ে আনবার পরামর্শ চলতে লাগল। সেই সুন্দর যুবাটি বল্লে—"এস, এক কাজ করা যাক। রবিবাবুর 'আমরা ও তোমরা' গানটা গেয়ে নগরসঙ্কীর্ত্তনে বেরিয়ে পড়া যাক্! সুন্দরীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্ত্তনাদ করে' বলা যাক্—

'তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি!'

মেয়েদের একবার বিদ্রোহী করে' তুলতে পারলে একদিনে সব অবরোধ ভেঙে চুরমার করে দেওয়া যাবে!" বন্ধু বল্লে—"বিদ্রোহ করবে মেয়েরা? পুরুষদেরই বড় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আছে, তা আবার মেয়েদের!"

পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ছোট করে' দেখার ভাবটা আমার ভালো লাগল না। এর জন্যে আমরাই অনেকখানি দায়ী। আমরা পুরুষের সমকক্ষ হতে কি চেষ্টা করেছি? যা আমাদের হক্, তা আমরা দাবী করে আদায় করতে কি জানি? আমরা অবলা, পিঁজরের পাখী!

আমাদের পরে যে-সমস্ত মেয়ে অবরোধের বাইরে বেরিয়ে স্বাধীন হবে, তাদের অবস্থাটা আমরা অনেক সহজ ও নিষ্কণ্টক করে' দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কণ্টকবেধের বেদনা আমাদের সর্ব্বাঙ্গে দারুণ লজ্জার লালিমায় ফুটে ফুটে উঠছে! অগ্রদূতের ভাগ্যই এই রকম, দুঃখ করা বৃথা!

আজ তবে আসি ভাই, পত্র বিরাট ও ডাকের সময় নিকট হয়ে এল। ইতি—তোমার স্নেহাসক্ত লাবণ্য।

২

ভাই লাবণ্য,

তোর মজার চিঠি পড়ে' আমি এমন হেসেছি যে তোর পিতৃবিয়োগের দুঃখটা অনুভব করবার অবসরই পাইনি। তুই পুরুষদের যে চিত্র এঁকেছিস সেটা এমন মজার হয়েছে যে পুরুষগুলোকে না পড়াতে পারলে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। মনে কর্‌ছি চিঠখানা নকল করে' প্রবাসীতে পাঠিয়ে দেবো—তোর বন্ধুর সাহিত্যিক দল দুনিয়ার লোকের নিরিখ পরখ করে' ফেরেন, তাঁদের নিজেদেরও নিরিখটার পরখ হয়ে যাওয়া ভাল।

তুই অবলা মানুষ, পুরুষের ভিড়ে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া কি তোকে সাজে? এক কাজ কর না, তোর বন্ধুর শরণাপন্ন হ না। তোরও ভাল লেগেছে তাকে, তারও ভাল লেগেছে তোকে, তোদের বিয়েও এক একটা করতে হবে, তবে না হয় শুভ কার্য্যটা তোরা দুজনেই সেরে নিলি। একটু সাহস করে' আলাপটা করে ফ্যাল্। বলে' দিচ্ছি দেখে নিস, তোর বন্ধু মোটেই গররাজি হবে না। কথায় বলে না যে, 'ক্যাঙলা ভাত খাবি?' ক্যাঙলা বলে 'পাতা পাতব কোথায়?' তোর বন্ধু ত পাতা পাতবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে, তুই একবার, ভাত খাবে কি না, জিজ্ঞাসা করলেই হয়। এই পত্রের উত্তরে সুখবর শোনবার প্রত্যাশায় রইলুম। ইতি—তোর ললিতা।

৩

ভাই ললিতা,

তোর উপদেশ পাবার আগেই আমার বন্ধুর সঙ্গে একদিন দৈবগতিকে আলাপ হয়ে গেছে। কি ভাগ বেহায়া লোক, ছি!

একদিন আমি টিকিট-ঘরে বসে আমার সহকর্ম্মী আর-একজন মেয়ের সঙ্গে গল্প কর্‌ছি, এমন সময় ঘুলঘুলি দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটি টাকা দুই আঙুলে ধরে' কে একজন বলে উঠল—"আমায় একখানা দমদমার টিকিট দিন ত।" সেই স্বর শুনে চমকে উঠে যেমন সেই দিকে তাকিয়েছি অমনি দেখি ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে সে-ই উঁকি মেরে হাসছে। আমাকে ফিরতে দেখেই কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে' অন্য দশজন লোকের সামনেই জিজ্ঞাসা করে' বসল—'আপনি কি এখানে কাজ করেন?" দেখেছ কি রকম দুষ্টবুদ্ধি! কেবল ইচ্ছে করে' আমাকে অপ্রস্তুতে ফেলা। দেখছ ত আমি টিকিট-ঘরে রয়েছি, সেখানে কাজ করতে না ত কি নেমন্তন্ন খেতে গেছি? এ যেন সেই রকম কাঠ লৌকিকতা—তেলমেখে ঘাটে আছে দেখেও লোকে জিজ্ঞাসা করবে, নাইতে এসেছ? কিংবা বাজারে মাছ তরকারী কিনছে দেখেও জিজ্ঞাসা করবে, বাজার করতে এসেছ? যদি কিছু সন্দেহ থাকে, হয় চশমা নেও গিয়ে, নয় বুদ্ধি বাড়াবার জন্যে কবিরাজের ব্রাহ্মী ঘৃত খাও গিয়ে, অমন বোকার মতন প্রশ্ন করে' লোক হাসিয়ো না। ও যখন আমায় জিজ্ঞাসা করলে "আপনি এখানে কাজ করেন?" তখন সত্যি ভাই, লজ্জায় আমার মাথাটা যেন কাটা গেল। আমি এই সামান্য কাজ করি, এ ত নিত্য হাজারো পুরুষ দেখে যাচ্ছে, কিন্তু ও দেখলে বলে' আমার অমন লজ্জা হল কেন কি জানি। আমি যে লেখাপড়া জানি, গাইতে বাজাতেও পারি, জগৎব্যাপারের হালনাগাদ খোঁজ রাখি, তাকে এ কথা জানাবার অবসর ঘটল না; অবসর ঘটল কিনা তার দেখে যাবার যে আমি ষ্টেসনে যত রাজ্যের র‍্যাঙলা লোককে টিকিট বেচি! আমি লজ্জায় জড়সড় হয়ে মুখ লাল করে' শুধু বলতে পারলাম "হ্যাঁ।" এই আমাদের প্রথম কথা কওয়া।

এর পর থেকে ভাই, ওর প্রায়ই দমদমায় যাওয়া দরকার হয়ে উঠল। দমদমায় যাওয়া ত নয়, দমবাজি। টিকিট নিতে এসে কত যে অনাবশ্যক প্রশ্ন করে তার আর ঠিক্‌-ঠিকানা নেই। নাইনটিন ডাউন প্যাসেঞ্জার কোন্ প্ল্যাটফরমে আসবে, সেভেন আপ ক'টার সময় ছাড়বে, ব্যারাকপুরের রিটার্ন টিকিটের দাম কত, উঈক-এণ্ড টিকিটে মঙ্গলবারে ফেরা যায় কি না,—এমনি সব অকেজো প্রশ্ন, এমন গুছিয়ে প্রশ্নটি করে যে এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় না, আমায় বকিয়ে বকিয়ে মারে। কিন্তু কি যে বলছি তাই কি ছাই মন দিয়ে শোনে? হাঁ করে আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে। লোকে যে লক্ষ্য করচে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। কি বেহায়া লোক ভাই!

পূজোর ছুটি হয়ে গেছে। আপিস আদালত বন্ধ। কলকাতা ভোঁ-ভাঁ। সবাই ছুটি উপভোগ করছে, আমার কিন্তু নিত্য হাজরি দিতে যেতে হয়। সে লোকটির সঙ্গে আর দেখা হয় না—ট্রামেও না, দমদমাও যায় না। আপিস না হয় বন্ধ, দমদমা ত বন্ধ নয়, মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতে কে মানা করে? পুরুষ মানুষ কিনা, বাইরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে এমন অরুচি হয়ে যায় যে ছুটি পেলেই ঘরের কোণ আঁকড়ে পড়ে থাকে। আমরা হলে ছুটির দিনেই বেশি করে' বেড়াতে যেতুম।

সেদিনও একে ছুটি, তায় রবিবার, তায় দুপুর বেলা। ট্রামে জনমানব নেই। কেবল এক কামরায় দেখি শ্যাম-সুন্দর বসে আছেন। আমাকে দেখেই এক গাল হেসে ফেললে। আচ্ছা, হাসলে কি বলে' ভাই একজন অচেনা মেয়েকে দেখে?—ওর হাসি দেখে আমিও হাসি সামলাতে পারলুম না। ভারি বদ লোক ও, অমন করে পথে ঘাটে মেয়ে মানুষকে হাসানো কি উচিত? আমি ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে সারা গাড়ীটা খালি থাকতেও উঠে পড়লুম ওরই কামরাটাতে। গাড়ীতে উঠে পড়ে' আমার হুঁস হল। ভারি রাগ হল ঐ লোকটার ওপর; একবারটি আমায় বারণ করতে পারলে না! আমি না পারি তখন নামতে, আর না পারি বসতে। কট্‌মট্‌ করে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, আর ও কিনা দিব্যি বসে বসে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এমন সময় ট্রামটা চলতে সুরু করলে, আমি হুমড়ি খেয়ে একেবারে পড়ে গেলুম ঐ লোকটার গায়ে! ও অমনি খপ করে আমায় ধরে ফেললে। আমি তাড়াতাড়ি ওর সামনেই বসে পড়লুম; ও কিন্তু তখনো আমার হাত ছাড়েনি—হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলে "আপনার লাগেনি ত?" আমার রাগে গা জ্বলে গেল—আমার লাগুক না-লাগুক তোর অত মাথাব্যথা কেন? আমি সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বল্লুম "আপনার গায়ে পড়ে গেছি, মাপ করবেন।" বেহায়াটা বল্লে কিনা আমার মুখের ওপর "এ সৌভাগ্যের জন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।" রাগের চোটে আমি একেবারে ভুলেই গেলুম যে আমার একখানা হাত বর্ব্বরটার দু-হাতের মধ্যেই রয়ে গেছে। ওর কি আমায় মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না? ও আমায় বলতে লাগল "দেখুন, আপনিও আমাকে অনেক দিন থেকে দেখছেন, আমিও দেখছি, অথচ দুজনের পরিচয় না হওয়াটা কি ভাল? আমি আপনার পরিচয় সংগ্রহ করেছি—আপনার নাম লাবণ্য, নামটি আপনার রূপের উপযুক্ত বটে, রামমণি হলে মোটেই মানাত না। আপনাদের হরিশ পরামাণিকের গলিতে বাড়ী পর্য্যন্ত আমি দেখে এসেছি; লজঞ্চুষ দিয়ে আপনার বোন পুঁটি আর ভাই নরুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েও ফেলেছি। এখন আমার পরিচয়টা আপনার জানা দরকার।" ওর পরিচয় জানবার জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে না! আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলুম, বকে মরছে বকুক, আমি ত আর শুনতে চাইনে। আমি শুনি আর না-শুনি সে সবটা বলেই গেল—"আমার নাম দীনেশ, বাড়ী কাঁসারীপাড়ায়, শালবনি টি ষ্টেটের কলকাতার আপিসের ম্যানেজারের কাজ করি, মাইনে পাই মোটে আড়াই শ টাকা। বাড়ীতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই; চাকর বামুনের অনুগ্রহে নির্ভর করে কোনো রকমে বেঁচে আছি। আমি খুঁজছিলুম যদি তেমন একজন মনের মতন লোক পাই যে আমার এই অগোছালো জীবনটার একটা বিলি ব্যবস্থা করে দিতে পারে। মাপ করবেন আমার ধৃষ্টতা, আপনাকে বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছি, আপনি যদি কিছু না মনে

করেন তবে দয়া করে আমার একটা উপায় করলে আমি বেঁচে যাই। কথা শুনে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে গেল—আমি কি ওর কাছে চাকরীর উমেদারী করতে গিছলুম যে ও আমায় চাকরী দিতে চায়! আমি মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলুম, হাঁ না কিছুই বলতে পারলুম না।

লোকটা ভাই ভয়ানক নাছোড়বান্দা রকমে ধরে বসেছে, যে, তার একটা বিলি ব্যবস্থা আমায় করে' দিতেই হবে। মাও তারি পক্ষে। পুষি আর নরুরও খুব তাগাদা দেখছি—নিশ্চয় লজঞ্চুষের ঘুষের খাতিরে। আমি ভাই একেবারে নাচার হয়ে পড়েছি। আমার কিছুমাত্র আগ্রহ আছে মনেও ভেবো না। পাঁচজনের অনুরোধে মানুষ এমন বিপদেও পড়ে!

পোষা পাখী উড়ে গেলে খাঁচা দেখালেই আবার ফিরে এসে খাঁচায় ঢোকে। সে বুঝতেই পারে না খাঁচার বাইরে স্বাধীনতার আনন্দই ভাল, না খাঁচার মধ্যে নিশ্চিন্ত দানাপানির ব্যবস্থাটাই আরামের। পিঁজ্‌রে-ভাঙা পাখীর গতি কি, বল্‌ত ভাই!—ইতি—তোমার লাবণ্য।

শ্রীমতী সত্যবাণী গুপ্তা।

যুদ্ধের যন্ত্র

আধুনিক যুদ্ধসাধন অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রাদির একটি তালিকা ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

যুদ্ধের কথা বলিতে গেলেই প্রথমেই কামানের কথা মনে পড়ে। কামান প্রধানত ছয় প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) যুদ্ধক্ষেত্রে সহজে ও সর্ব্বদা ব্যবহার করিবার জন্য হাল্কা ওজনের কামান; (২) ভারী কামান; (৩) অশ্বসাদী সৈন্যের ব্যবহার্য্য খুব হাল্কা কামান; (৪) কেল্লাধ্বংসী কামান; (৫) জাহাজী কামান; (৬) আকাশযান ভাঙিবার কামান।

(১) যুদ্ধক্ষেত্রে সহজে ও সর্ব্বদা ব্যবহার করিবার উপযুক্ত হাল্কা ওজনের যে কামান তাহাও আবার দুই রকমের—(ক) ফীল্‌ড গান বা ময়দানী কামান, ইহার ফাঁদলের ব্যাস ৩ বা ৩॥ ইঞ্চি, যখন আওয়াজ করা যায় তখন ইহা লাফাইয়া উঠে না বা পিছু হটে না। (খ) হাউইট্‌জার বা বেঁটে খাটো ঊর্দ্ধমুখ কামান; ইহার গোলা উঁচুদিকে ছুটিয়া বাঁকিয়া আসিয়া বহু দূরে গিয়া পড়ে। এই কামান দাগিয়া শত্রুকে মারিতে হইলে অঙ্কশাস্ত্রে জ্ঞান থাকা দরকার; কত দূরে শত্রু থাকিলে কতখানি ঊর্দ্ধমুখে গোলা ছুড়িলে গোলা বাঁকিয়া গিয়া ঠিক শত্রুর উপর পড়িবে তাহা স্থির করিতে না পারিলে অনেক গোলা বারুদ অপব্যয় হইয়া যায়। এই হাউইট্‌জার কামানের ফাঁদলের ব্যাস ময়দানী কামান অপেক্ষা বড়, কাজেই ইহাতে যে-সমস্ত শেল শ্রাপনেল বা ফাঁপা গোলা ছোড়া হয় তাহারও ওজন ময়দানী কামানের গোলার চেয়ে ঢের বেশী। ইংরেজদের ময়দানী কামানের গোলার ওজন মোটামুটী ৯ সের, ফরাসীর ৮ সের, জর্ম্মানির ৭॥০ সের, রুষের ৭ সের, অষ্ট্রীয়ার ৭।০ সের। ইহাদের পাল্লা ৫৫০০ হইতে ৯০০০ গজ। ইংরেজদের ময়দানী হাউইট-জারের ফাঁদলের ব্যাস ৪॥ ইঞ্চি, এবং শেলের ওজন ১৭॥০ সের। ময়দানী কামানের এক শ্রেণী আছে তাহা কলে আওয়াজ হয়, একজন লোক কেবল টোটার মালাটি ঘুরাইয়া দেয় মাত্র, এই-সব কামান নির্ম্মাতার নামে পরিচিত—যেমন, ক্রুপের কামান, ম্যাক্সিমের কামান। এই-সব কলের কামান হইতে খুব দ্রুত ঘন ঘন গোলা ছোড়া যায়—মিনিটে হাজার বার আওয়াজ হইয়া প্রায় সাড়ে তিন শত মণ ওজনের গোলা বর্ষণ করা যায়। ময়দানী কামানের উপর ঢাল আবরণ থাকে, তাহাতে গোলন্দাজেরা শত্রুর বন্দুকের গুলি বা শ্রাপনেলের আঘাত হইতে রক্ষা পায়। কোনো কোনো কামানে তাড়িৎ ব্যাটারী যোগ করিয়া দেওয়া হয় এবং বিদ্যুৎ-বেগে গোলা ছুটিতে থাকে।

(২) ভারী কামান এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নড়ানো কষ্টকর; ইংরেজদের ভারী কামান হইতে ৩০সের ওজনের এক একটি শেল ছোড়া যায়। ইহার ব্যাস ৫ ইঞ্চি; ওজন ৩৯ হন্দর বা প্রায় ২৭ মণ; পাল্লা ১০০০০ গজ। ফরাসীর এক রকম বামন কামান আছে, নির্ম্মাতা
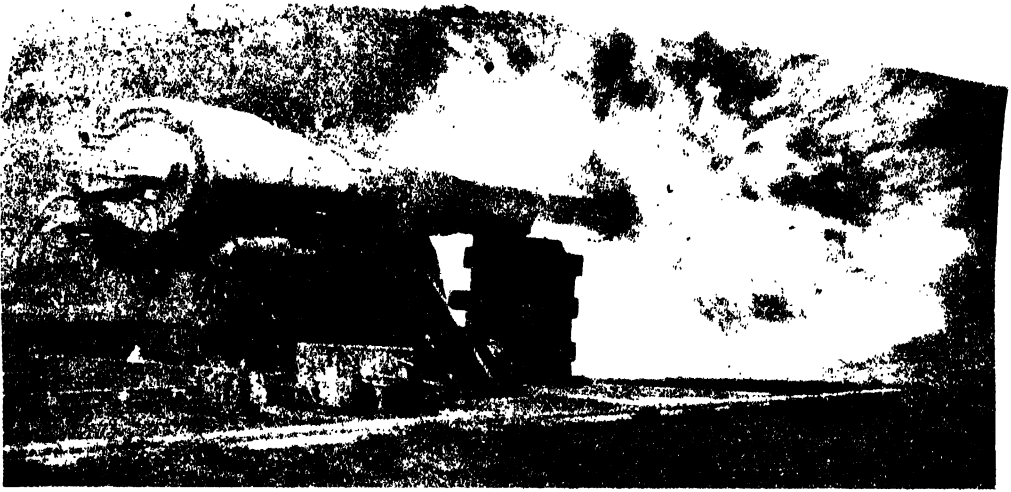
১২ ইঞ্চি ফাঁদলের কামানের শক্তি পরীক্ষা। মুখের কাছে শাদা দাগ ধোঁয়া নহে, আগুন। এইরূপ আকারের আধুনিক কামান হইতে মিনিটে ১০ মণ ২৫ সের ওজনের দুটি গোলা ছাড়া যায়। এইরূপ কামান "ড্রেডনট বা অকুতোভয়" জাহাজে থাকে; সেই সঙ্গে ১৩½ ইঞ্চির কামানও থাকে; ১২ ইঞ্চি কামানের গোলা যে স্থানে প্রতিহত হয় সেখানে ইহার ১৫ মণ ২৫ সের ওজনের গোলা একেবারে দুর্ব্বার।
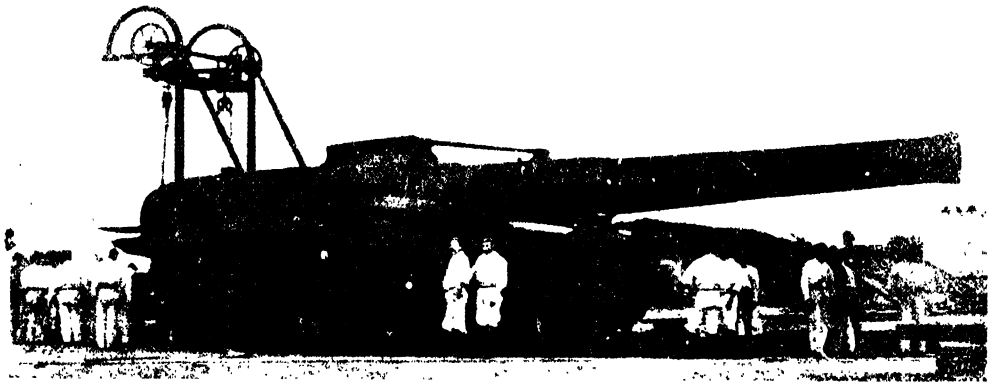
১৬¼ ইঞ্চি কামান, ওজন ১১০½ টন; ইহার গোলার ওজন ২২॥০ মণ। এই কামানটির শক্তি পরীক্ষার সময় একটা গোলা চাঁদমারিতে লাগিয়া ছিটকাইয়া ৮ মাইল তফাতে গিয়া পড়িয়াছিল। এ কামানও যুদ্ধজাহাজে ব্যবহৃত হয়।

'রিমেলহো'র নামে পরিচিত, তাহার ব্যাস ৬ ইঞ্চি, ২ মণ ১৪ সের ওজনের এক একটি শেল ছোড়ে; পাল্লা ৭০০০ গজ; ইহার ওজন ৪৭ হন্দর বলিয়া ইহা বেশী ব্যবহার হয় না। জার্ম্মানীর ভারী কামানের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, শেলের ওজন ২ মণ ১০ সের, কামানের ওজন ৫৩ হন্দর। জার্ম্মানীর ৪ ইঞ্চি ব্যাসের, ১৫ সের শেল ছুড়িবার, এক রকম ছোট কামান আছে; কিন্তু তাহা বিশেষ ভাবে প্রস্তুত একটা মেঝে বা পাটাতন তৈরি করিয়া তাহার উপর বসাইয়া তবে ছুড়িতে পারা যায়। রুষ সৈন্যেরও ইঞ্চি ৬ ইঞ্চি ব্যাসের কামান আছে; কিন্তু উহাদের বিবরণ গুপ্ত রাখা হয় এবং প্রকাশ করাও নিষেধ। মোটর গাড়ী হওয়াতে ভারী ভারী কামান বহিয়া লইয়া বেড়ানো খুব সহজ হইয়া আসিয়াছে। বড় ভারী কামানের গাড়ীর চাকা মাটিতে বসিয়া যাওয়ার কথা

কিন্তু জর্ম্মানেরা চাকার নীচে কব্জায়-আঁটা চৌকা চৌকা ধাতুপত্র সারি সারি আঁটিয়া এই অসুবিধার প্রতীকার করিয়াছে; এরূপ চাকাকে Caterpillar wheel বা কীড়াপদী চাকা বলে—গাছের পাতার মধ্যে যে এক রকম লম্বা লম্বা পোকা বা কীড়া থাকে, তাহা যেমন করিয়া আপনাকে একবার ঠেলিয়া পরক্ষণেই গুটাইয়া লইয়া চলে, এই চাকাও সেই রকম করিয়া চলে, তাহাতে চাকা মাটিতে পুঁতিয়া যাইবার অবসরই পায় না। এই-সব দানবীয় শক্তি-সম্পন্ন কামানের আবির্ভাবে দুর্গ প্রভৃতিতে লুকাইয়া নিরাপদ হইবারও আর উপায় থাকিতেছে না; ইহাতে দুর্গ প্রায় অনাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।
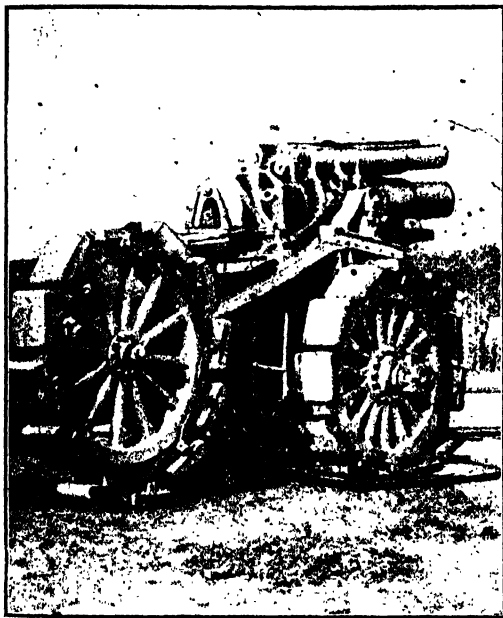
কীড়াপদী চাকাযুক্ত কামান।

(৩) অশ্বসাদী সৈন্যের কামান ময়দানী কামান অপেক্ষাও হাল্কা; ময়দানী কামানে দুজন গোলন্দাজ কামানের গাড়ার উপর বসিয়া থাকে, আর অশ্বসাদী কামানে সকল গোলন্দাজই অশ্বারূঢ়। ইংরেজদের অশ্বসাদী কামানের ব্যাস ৩ ইঞ্চি, ৬।৹ সের ওজনের শেল বা শ্র্যাপনেল ছুড়িতে পারে। এই কামানের শ্র্যাপনেলের মধ্যে ২৬৩টা গুলি থাকে, ময়দানী কামানের শ্র্যাপনেলে থাকে ৩৭৫টা। সাদী কামানের ওজন ৬ হন্দর, ময়দানী কামান ৯ হন্দর।

(৪) কেল্লাধ্বংসী কামান সব চেয়ে বড় ও ভারী। জার্ম্মানীর কেল্লাধ্বংসী কামানই সর্ব্বাপেক্ষা জবরদস্ত; তাঁহারা ১৯ ইঞ্চি ফাঁদলের কামানও তৈয়ার করিয়া এই যুদ্ধে ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু এরূপ প্রকাণ্ড ভারী কামান দাগিবার ও বহন করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন আবশ্যক; মেঝে কংক্রিট করিয়া পাকা পোক্ত হইলে তাহার উপর এই কামান বসাইয়া ছাড়িতে হয় এবং এক একটি কামানের পিছনে অনেক লোককে খাটিতে হয়। এই ভারী কামানের জন্য সৈন্য চালনায় বিলম্ব ঘটে, কিন্তু কাজ যা হয় জবর রকমের—তার সাক্ষী বেলজিয়মের সমস্ত গড়বন্দী শহরগুলি, বিশেষ ভাবে এণ্টওয়ার্পের কেল্লার ডবল বহর। ইংরেজ এবং জর্ম্মান উভয় পক্ষেরই ৮।৯ ইঞ্চির কামানগুলিই সাধারণত উৎকৃষ্ট; তড়িঘড়ী কাজের পক্ষে ত কথাই নাই। ইহা হইতে ৩ মণী শেল ছোড়া যায়; ১২ইঞ্চির হাউইটজার হইতে ছোড়া যায় ৯ মণ ১৫ সেরের শেল; লীয়েজ, নামুর, ভ্যার্দ্যাঁ প্রভৃতি অবরোধের সময় জর্ম্মানরা ১২ হইতে ১৭ ইঞ্চি কামান ছুড়িয়া ১১ মণ হইতে ২৫ মণ ওজনের এক একটা শেল দাগিয়াছিল। ইংরেজদের কেল্লাধ্বংসী কামান ৯ ইঞ্চির, ৪ মণ ৩০ সেরের শেল ছোড়ে; এই কামানগুলি খুব কাজের; সেবাষ্টোপোল অবরোধের সময় এক-একটা কামান হইতে ৪০০০ আওয়াজ করা হইয়াছিল, মাত্র দুটি ফাটিয়া গিয়াছিল। বড় কামান হইতে এত আওয়াজ করা চলে না, গরম হইয়া ফাটিয়া গলিয়া যায়। ইংরেজরা ১৪॥ ইঞ্চির কামানও তৈয়ার করিয়াছে, তাহা ২০ মণ ওজনের শেল ছুড়িতে সক্ষম। জার্ম্মানীর ১৯ ইঞ্চির কামান হইতে ২৮ মণ শেল ছোড়া যায়। এরূপ চারিটি মাত্র কামান কোনো শহরের ৪।৫ মাইল দূরে দূরে চারিদিকে বসাইয়া গোলাবৃষ্টি করিতে পারিলে সেই সহরটিকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিতে দুই মিনিটের বেশী সময় লাগে না। কেল্লাধ্বংসী কোনো কোনো কামানের পাল্লা ৯।১০ মাইলও আছে; ২৬।২৭ মাইল পাল্লার কামানও তৈয়ার হইয়াছে—পানামা খাল
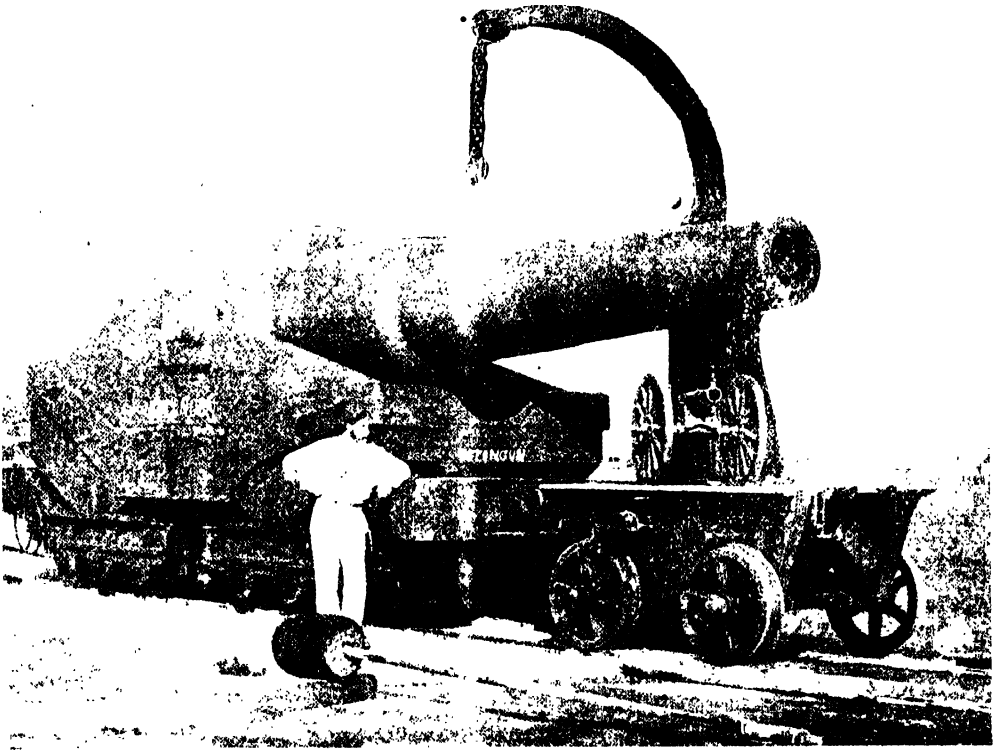
নল-ঠাসা পুরাতন ধরণের কামান, ওজন ১০০ টন বা ২৮০০ মণ, মুখের ফাঁদলের ব্যাস প্রায় ১৮ ইঞ্চি, গোলা ছোড়ে এক একটি ২৫ মণ ওজনের। বড় কামানের কোলে একটি আধা ময়দানী কামান। আধা হাউইটজার রহিয়াছে, যেন দানবের কোলে দানবশিশু।
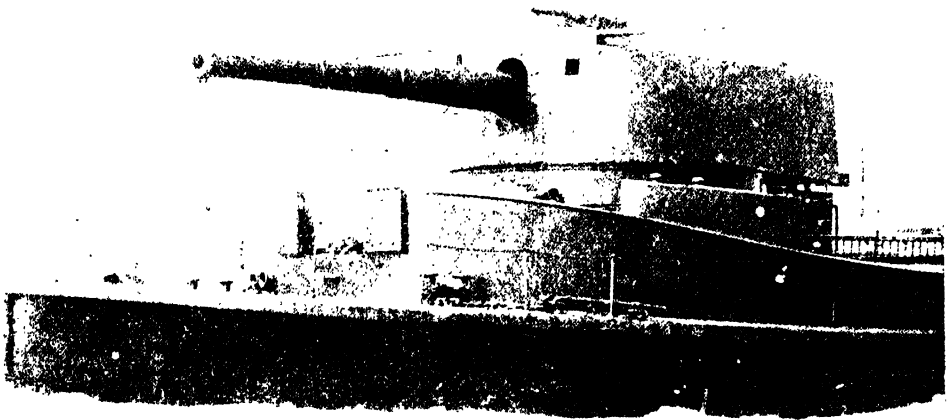
যুদ্ধজাহাজের কামানের শক্তি পরীক্ষার জাহাজ। নূতন কামান এই জাহাজে চড়াইয়া দূর সমুদ্রে লইয়া গিয়া শক্তি পরীক্ষা করা হয়।
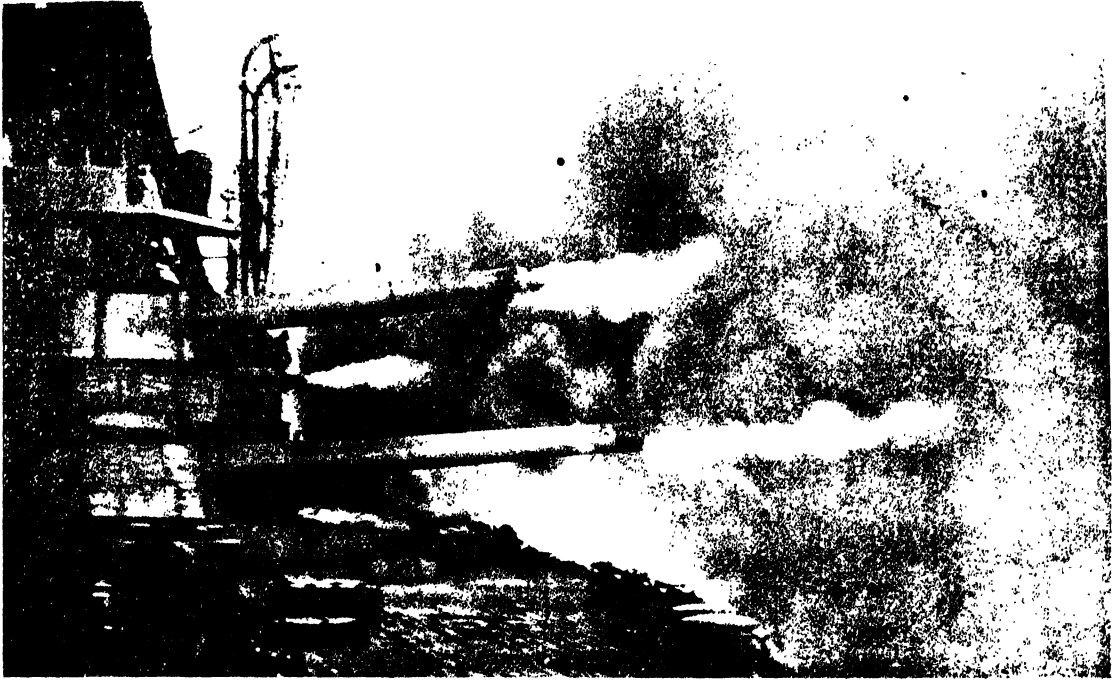
অকুতোভয়-জাহাজের এক পাশের সমস্ত (দশটি) কামানের আওয়াজ। দশ দশটি কামানের যুগপৎ আওয়াজে এমন বিকট শব্দ হয় যে গোলন্দাজদের কান একেবারে কালা হইয়া যাইতে পারে। এজন্য তাহারা কানে তুলা গুঁজিয়া কান আচ্ছা করিয়া বাঁধিয়া তবে কাজ করে।
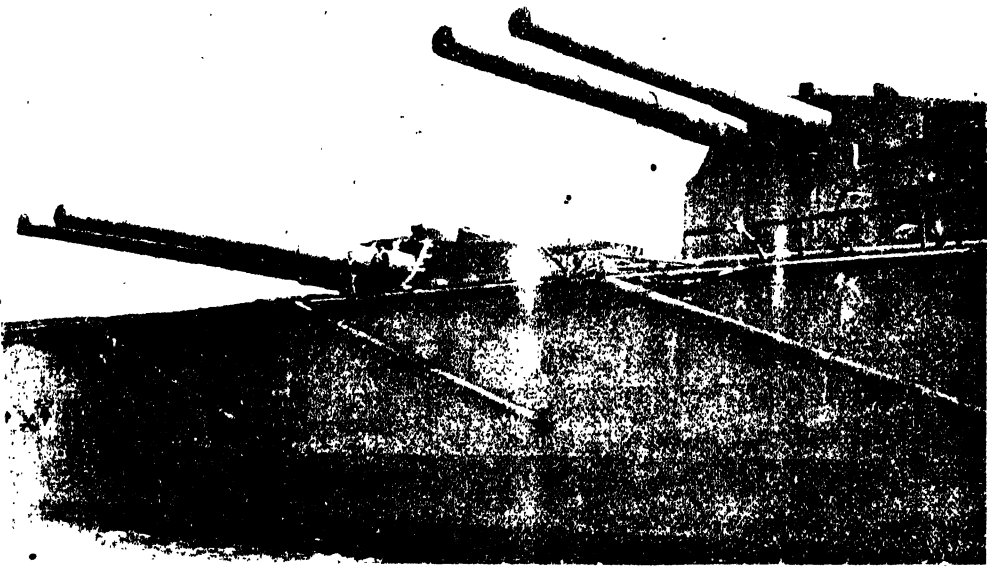
যুদ্ধজাহাজের ১৩½ ইঞ্চি ফাদলের কামান, ওজন ৮৬ টন, লম্বায় ৫২ ফুট। এক সঙ্গে দশটা আওয়াজ করা যায়। এত শীঘ্র শীঘ্র আওয়াজ করা যায় যে একটা গোলা লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় গোলা তাহার পিছে পিছে ছুটিয়া রওনা হইয়া যায়।

পাহারা দিবার জন্য যে একটি কামান তৈয়ার হইয়াছে সেটিই সব চেয়ে বড় ও বেশী পাল্লাদার। ফ্রান্সের ১০॥ ইঞ্চি ব্যাসের কামান ৬ মণ ৩৫ সের শেল দাগে; রুষিয়ার ১২ ইঞ্চির কামান ১০ মণ শেল দাগে। কেল্লা ঘিরিয়া কোনো একটা বিশেষ দুর্ব্বল স্থান বাছিয়া সেইখানে উপর্য্যুপরি কামান দাগিয়া ভাঙা হয়; সেই সঙ্গে সঙ্গে আঁকাবাঁকা পগার কাটিতে কাটিতে তাহার মধ্য দিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে এবং ভগ্ন স্থান দিয়া কেল্লার মধ্যে হুড়মুড় করিয়া গিয়া পড়িয়া আক্রমণ করে।
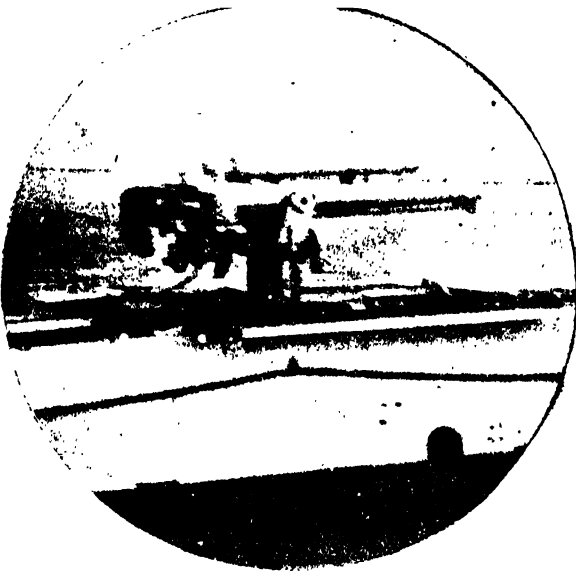
ডুবন্ত জাহাজের কামান। পূর্ব্বে ডুবন্ত জাহাজ সমুদ্রের উপরে নিতান্ত অসহায় ছিল, এখন তাহারও কামান বহিবার দাগিবার লড়িবার শক্তি হইয়াছে।

(৫) জাহাজী কামানগুলি খুব লম্বা হয়; যে কামান যত লম্বা তাহার তেজ ও পাল্লা তত বেশী হয়। ইংরেজদের "ড্রেডনট বা অকুতোভয়" জাহাজগুলির কামান ৫২ ফুট লম্বা; কামানের ব্যাস ৪ ইঞ্চি হইতে ১৩॥ ইঞ্চি পর্য্যন্ত; পাল্লা ৬।৭ মাইল; সুতরাং ৬।৭ মাইল দূর হইতেই জলযুদ্ধ অথবা কোনো উপকূলস্থ নগর ধ্বংস করা যাইতে পারে। জাহাজী কামানগুলি প্রকাণ্ড অতিকায় হইলেও কলকব্জায় এমন সায়েস্তা যে নিমেষমধ্যে তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অত্যন্ত ভারী শেল ভরিয়া আওয়াজ করা যায়। জাহাজী কামান দু'রকম—(১) ভা[সন্ত] জাহাজের (২) ডুবন্ত জাহাজের। ডুবন্ত জাহাজ সাঁতার কাটিয়া গিয়া শত্রুর জাহাজকে চোরাগো[প্তা] ভাবে জখম করিয়া পালাইতে পারে; ভাসিয়া উ[ঠিয়া] অপর জাহাজের সঙ্গে কামান ছুড়িয়া লড়াই ক[রিতে] পারে; কিন্তু ডুবিয়া ডুবিয়া অপর ডুবন্ত জাহা[জের] সঙ্গে লড়াই করিতে এখনো পারে না, শীঘ্র পা[রিবে] আশা হইতেছে। জাহাজের কামানগুলিতে এ[মন] ব্যবস্থা আছে যে একটি ছিদ্র দিয়া গোলন্দাজ ল[ক্ষ্য] দেখিতে পাইলেই কামানের অবস্থান ঠিক হইয়া যা[য়;] কামান কতখানি উঁচু করিয়া কিরূপ কোণ রা[খিয়া] মারিলে গোলা ঠিক লক্ষ্যস্থানে গিয়া পৌঁছিবে ত[াহা] হিসাব করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না; সেই ছি[দ্র] এমন স্থানে তৈয়ারী যে তাহার ভিতর দিয়া লক্ষ্য দেখি[তে] পাইলেই কামানের মুখ ঠিক কতখানি উঁচু করিতে হই[বে] আপনা-আপনি ঠিক হইয়া যাইবে। আজকাল দু[র্গের] কামানেও এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে; দুটি স্থ[ান] হইতে লক্ষ্য স্থির করিয়া টেলিফোঁ ও টেলিগ্রাফ দ্বা[রা] দুর্গপ্রাকারে খবর পাঠানো হয় কত ডিগ্রি কো[ণ] করিয়া কামান বাঁকাইতে হইবে। ইহাতে এমন ঠি[ক] লক্ষ্য হয় যে যেখানে চায় ঠিক সেইখানে গো[লা] ফেলা যায়।

(৬) আকাশযান ভাঙিবার কামান, ক্রুপ ম্যাকি[ম] হাউইটজার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কামানের ন্যায়, জার্ম্মানীতে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। উহার নির্ম্মাতা ডাসেলডর্ফনিবা[সী] এহ্‌র্‌হার্ডট্‌। ইহার উর্দ্ধমুখ পাল্লা ৫ মাইল; এখ[নো] কোনো এয়ারোপ্লেন বা আকাশযান তিন মাইলের উ[র্দ্ধে] উঠিতে পারে নাই। ২৮০ গজ উর্দ্ধে ১৫০০ গজ দূ[রে] জোর বাতাসে সঞ্চরমান একটি বেলুন উড়াইয়া পরীক্ষ[া] করা হইয়াছিল; এই কামানের পাঁচটি গোলাতেই বেলু[ন] আগুন ধরিয়া ভূমিসাৎ হইয়াছিল। ইহার শেলের ওজ[ন] ৪॥ সের। যখন ৭৫ ডিগ্রি কোণ করিয়া কামান প্রায় খাড়[া] হইয়াও থাকে তখনো ইহাতে শেল ভরিতে কোনে[া] অসুবিধা হয় না; ইহাও কলে ভরা ছাড়া যায়। ইহ[া] আওয়াজ হইলে ধাক্কা মারে না। মোটর গাড়ীতে এ
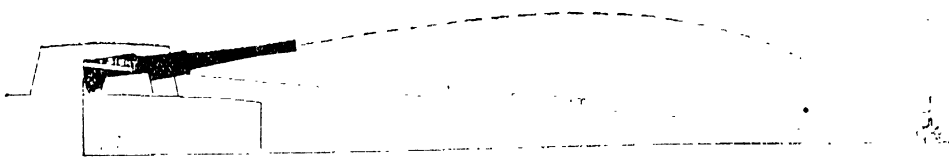
কামানের দৃষ্টি। কামানের সঙ্গে একটি দৃষ্টিঘর থাকে, কামান উঁচু নিচু করিয়া সেই দৃষ্টিঘরের ভিতর দিয়া দেখিয়া লক্ষ্য ঠিক করিতে হয়; চোখের সহিত লক্ষ্যের দেখা হইলেই বুঝা যাইবে যে কামানের মুখের অবস্থান এমন ঠিক হইয়াছে যে গোলা ছুড়িলে ঠিক সেই লক্ষ্যে গিয়াই পৌঁছিবে।
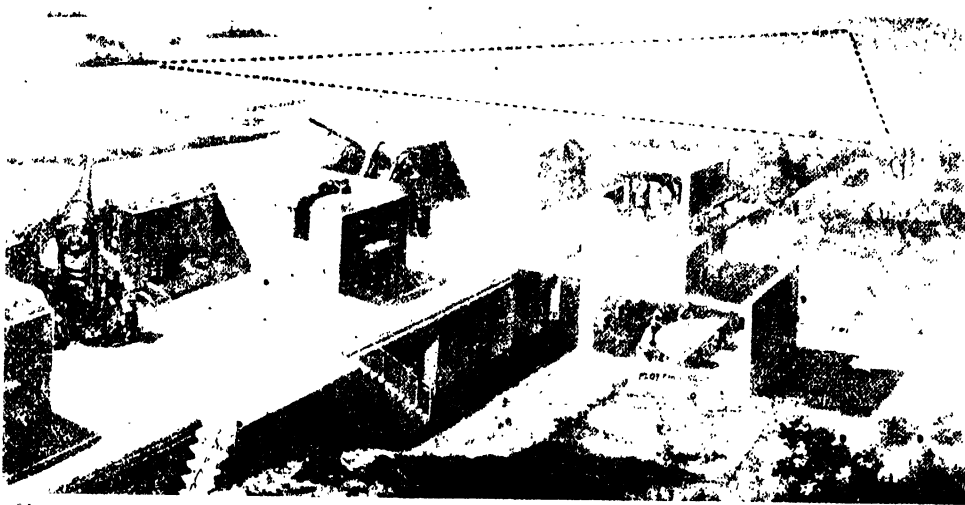
কেল্লা হইতে কামানের লক্ষ্য স্থির। কামান লইয়া যুদ্ধের প্রধান গণ্ডগোল শত্রুর বা লক্ষ্যের দূরত্ব নির্দ্ধারণে। কেল্লা প্রভৃতি হইতে কামান ছাড়িবার সময় গোলন্দাজদের আত্মরক্ষার জন্য লুকাইয়া কাজ করিতে হয়, সুতরাং তাহারা শত্রু বা লক্ষ্য চোখে দেখিয়া স্থির করিতে পারে না। এজন্য কেল্লায় দুটি ঘাটী থাকে—A ও B, সেখান হইতে লক্ষ্য বা শত্রুকে দেখিয়া তাহারা ঘাটী হইতে কোন কোণে আছে ঠিক্ করা হয়; সেই কোণের মাপটি ঘাটী হইতে দিকে দিকে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোঁ করে; সেই অনুসারে গোলন্দাজেরা কামান বাঁকাইয়া গোলা দাগে, এবং লক্ষ্য এমন নির্ভুল হয় যে লক্ষ্যের ঠিক যে জায়গাটিতে আঘাত করিতে ইচ্ছা সেই জায়গাতেই গোলা ফেলিতে পারে।

কামান চড়ানো থাকে বলিয়া আকাশযানকে তাড়া করিয়া মারিবার সুবিধা হয়।

কামান হইতে যে শেল বা শ্র্যাপনেল ছোড়া হয় তাহা ইস্পাত বা লোহার একটা ফাঁপা ক্যানেস্তা, কতকটা মোচার আকৃতির; তাহার মধ্যে লিডাইট, কর্ডাইট বা বারুদ—কোনো রকম একটা বিস্ফোরক পদার্থ ও গুলি ভরা থাকে। এই শেল দু'রকমে আওয়াজ হয়—ধাক্কা-জ্বলন অথবা সময়-জ্বলন উপায়ে। কামান হইতে আওয়াজ হইয়া ছুটিয়া যাইয়া শেলের ছুঁচলো নাকটা জমিতে, জলে, বাড়ীর দেয়ালে, অথবা শত্রুর জাহাজ বা কামানের গায়ে গিয়া ঠুকিয়া ধাক্কা লাগিলেই শেল আপনিই ফাটিয়া শতখণ্ড হইয়া যায়। অথবা শেলের মধ্যে এমন একটি কল থাকে যাহাতে শেলটি কতক্ষণ পরে আঘাত ব্যতীতও আওয়াজ হইবে ঠিক করিয়া দেওয়া যায়। শেলের গায়ে একটি ছোট গুলি ঝুলে; কামান হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার সময় সেই গুলিটি ছিটকিয়া গিয়া একটি ছোট ক্যাপের উপর ঘা মারে, তাহাতে যে তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপে একটা লম্বা পলতেতে আগুন ধরিয়া যায়; সেই পলতেটির দৈর্ঘ্য এমন ঠিক করা থাকে যে অভিলষিত কয়েক সেকেণ্ড
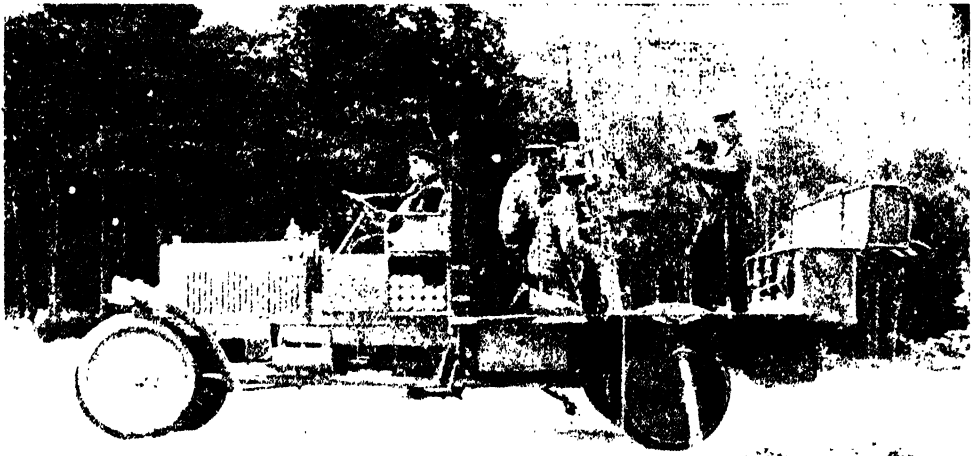
আকাশযান-মারা জর্মান কামান। ইহার পাল্লা ৫ মাইল; গোলার ওজন ৪½ সের, ১৩৩ গজ সেকেণ্ডে ছুটে—এই গতিবেগ সাধারণ ময়দানী কামানের গোলার চেয়েও বেশি। কামানের নলটি এমন সুকৌশলে স্থাপিত যে নলটি প্রায় খাড়া হইয়া থাকিলেও তাহাতে অক্লেশে নিমেষমধ্যে গোলা ভরা যায়। কামানের মুখ আপনি খুলে, গোলন্দাজ গোলা ভরিয়া দিলে আপনিই বন্ধ হয়, আপনিই আওয়াজ হয়, আওয়াজের পর আবার মুখ খুলিয়া গোলার কার্তুজের ঠোঙা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া নূতন গোলা গিলিবার জন্য অপেক্ষা করে।

কামান চাগানো। শুবেরীনেসের গোলন্দাজী স্কুলে উচ্চস্থানে কামান উঠাইবার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কামানটির ওজন ২২ টন অর্থাৎ প্রায় ৬০০ মণ।

অথবা এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময় পরে তাহা শেলের লিডাইট বা বারুদে আগুন পৌঁছাইয়া দেয়; যেই বারুদে আগুন লাগা আর অমনি শেল শতখণ্ড। কোনো শেল গোলন্দাজের হাত হইতে পড়িয়া গেলে যাহাতে না ফাটে তাহার প্রতীকার-ব্যবস্থা প্রত্যেক শেলের সঙ্গেই থাকে। কামানের ফাঁদল অনুসারে শেল বড় ছোট হয়, এবং তাহার ওজনেরও তারতম্য ঘটে—ইংরেজী সওয়া তিন ইঞ্চি মুখের ময়দানী কামানের শেল ৯ সের, ৬ ইঞ্চির ১ মণ ১০ সের, ১২ ইঞ্চির ১০ মণ ২৫ সের, ১৩½ ইঞ্চির ১৫ মণ ২৫ সের অথবা ১৭½ মণ। যে শেল ইংরেজ গোলন্দাজ জেনেরাল হেনরী শ্র্যাপনেল আবিষ্কার করেন, তাহা তাঁহার নামেই পরিচিত হইয়াছে। ইহার ক্যানেস্তার দেয়াল খুব পাতলা হয় ও তাহার মধ্যে অধিক সংখ্যক গুলি থাকে; ইহাতে শ্র্যাপনেল শেল ফাটিয়া বহু খণ্ডে
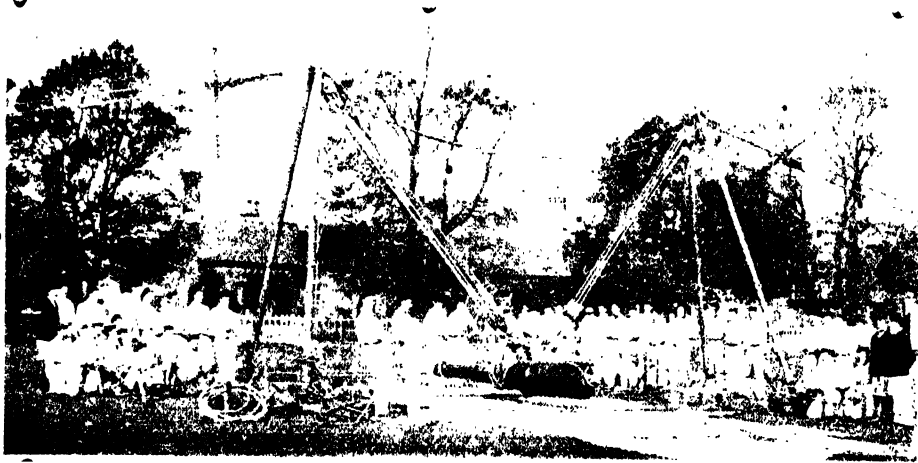
কামান নদীপার করা। চিত্রে মাটিতে-পাতা শাদা কাপড়খানি যেন নদী, তাহার উপর পুল নাই, করাও যায় না, অথচ কামান পার করিতে হইবে। নদীর দুপারে খুঁটি পুঁতিয়া কপিকল দিয়া এমন কৌশলে কামান দড়িতে ঝুলানো হয় যে একখেই দড়ি টানিয়া আর একখেই ঢল করিয়া করিয়া কামানটিকে ক্রমশ একপার হইতে অপর পারে উত্তীর্ণ করা যায়। যে কামানটি পার করা হইতেছে তাহার ওজন ৫।টন বা প্রায় ১৪০ মণ।

চূর্ণ হইয়া আপনার চারিধারে মরণ বৃষ্টি করিতে থাকে। ইংরেজী ময়দানী কামানের শেলে গুলি থাকে ৩৭৫টা, সাদী সৈন্যের কামানে থাকে ১৬৩টা; ফরাশী ও জর্ম্মান ময়দানী কামানের শেলে গুলি থাকে ৩০০, রুষিয়ার ময়দানী কামানে থাকে ২৬০। শ্র্যাপনেল ফাটিয়া গেলে ৫০০০ গজ দূর পর্য্যন্ত তাহার ভাঙা টুকরা ও গুলি ছড়াইয়া পড়ে। জাপানী শিমোজের

এন্টওয়ার্পের দুর্গব্যূহ। লোকের ধারণা ছিল যে ইহা অজেয়; জর্ম্মান কামানের কাছে দিন কয়েকেই পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।
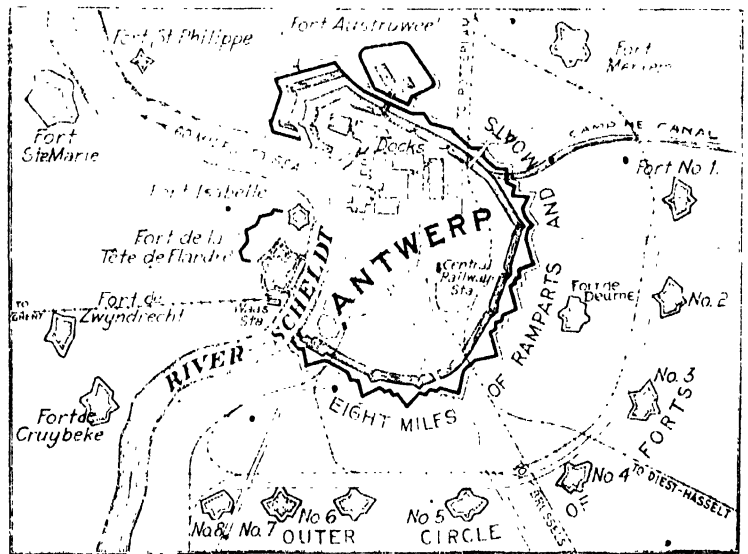
যে-সব শেল ভরা হয় তাহা অতি সহজে এবং অসংখ্য খণ্ডে ফাটিয়া যায়। লিডাইট, কেণ্ট জেলার লীড সহরে পিক্রেট অফ পটাশ দিয়া প্রস্তুত একপ্রকার বিষম বিস্ফোরক পদার্থ, দেখিতে উজ্জ্বল হলদে রঙের। খুব জোরে ঘা না লাগিলে বিস্ফুরিত হয় না বলিয়া ইহা লইয়া নাড়াচাড়া বিপজ্জনক নহে। জাপানী শিমোজ, ফরাশী মেলিনিৎ বা তার্পিনিৎ লিডাইটের সমতুল্য বিস্ফোরক পদার্থ। জর্ম্মানরা -নাইট্রো-টোলুওল নামক এক প্রকার বিষম বিস্ফোরক ব্যবহার করে; তাহাও পিক্রিক এসিড (অঙ্গারকমিশ্র নাইট্রিক এসিড) দিয়া প্রস্তুত, লিডাইট বা মেলিনিতের তুল্যধর্ম্মী; কিন্তু খুব কঠিন ও দৃঢ় ইস্পাতের কাঁতিতে বন্ধ করিয়া অত্যন্ত জোরে ঘা খাইলে তবে ইহা বিশেষ রকমে বিস্ফুরিত হয়। কর্ডাইটও এক রকম বিস্ফোরক; ইহা দেখিতে পাকানো দড়ি

বা কর্ডের মতন বলিয়া ইহার এই নাম। গান্‌-কটন (তূলা), নাইট্রো-গ্লিসেরিন এবং ভ্যাসেলিন খুব ভালো করিয়া মিশাইয়া কাই করা হয়; সেই কাই একটা ইস্পাতের প্লেটের গায়ের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া ঝাঁঝরি ভাজার মতন ঠেলিয়া দড়ির মতন লম্বা আকারে অপর দিক হইতে বাহির করা হয়; এই-সব লম্বা লম্বা দড়ি

শেল ও তাহাতে ভরিবার কর্ডাইট। এই শেল ইস্পাতের গড়া ফাঁপা চোঙার মতো, তাহার মধ্যে লিডাইট ভরিয়া কামান হইতে ছোড়া হয়; শেলের ডগা কঠিন স্থলে জোরে ঠেকিয়া গেলে অথবা স্বয়ংক্রিয় কলের কৌশলে উহা আওয়াজ হইয়া ফাটিয়া যায়। ইহা প্রাচীন গোলা অপেক্ষা সমধিক বলশালী এবং দুর্বার।

পাকাইয়া আবশ্যক আকারের মাপে কাটিয়া লওয়া হয়। ইহা দেখিতে পুরানো দড়ির মতোই, মেটে রঙের। ইহাতে আগুন লাগাইলে অথবা হাতুড়ি দিয়া পিটিলে বিস্ফুরিত হয় না; কিন্তু আঁটো জায়গায় বদ্ধ করিয়া আগুন লাগাইলে আর রক্ষা থাকে না। ইহার মধ্য দিয়া গুলি চালাইলেও বিস্ফুরিত হয় না, জলে ডুবাইয়া রাখিলেও নষ্ট হয় না। এজন্য ইহা ইংরেজদের যুদ্ধ-ব্যাপারে কুড়ি বৎসর ব্যবহৃত হইয়া আসিলেও কখনো কোনো শেলেহ খানা বিস্ফুরিত হইয়া ধ্বংস হয় নাই। কর্ডাইট শেল দিয়া আওয়াজ করিলে কামানের মুখ হইতে কমলা বা লাল রঙের আলো ও ঘন ধোঁয়া বাহির হয়, সে ধোঁয়া শীঘ্রই ছড়াইয়া পড়ে। জর্ম্মান যুদ্ধজাহাজে গান্‌-কটনে তৈয়ারী নাইট্রো-সেল্যুলোজ নামক এক প্রকার বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়; ইহাতে কামানের নল খারাপ হয় না, কিন্তু ইহা কর্ডাইট অপেক্ষা ভারী, বড় এবং দামী।

কামানের পরেই বন্দুকের কথা বলিতে হয়। এই যুদ্ধের বন্দুককে রাইফ্‌ল্‌ বলে, ইহার নলের ভিতরে পেঁচের আকারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খাঁজ কাটা থাকে; তাহাতে গুলি নল হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার সময় বনবন করিয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে যায় এবং সেইজন্য গুলি দূর পাল্লা পর্য্যন্ত সটান সোজা গিয়া ঠিক লক্ষ্যে গিয়া লাগে। নির্ম্মাতার কৌশল ও নাম অনুসারে বন্দুকের প্রকারভেদে নাম হইয়াছে অনেক প্রকার। লী-এনফীল্ড, মিনিয়ে, মার্টিনি-হেনরী, শাসপো, মান্‌-লিকার, রেমিংটন, লী-মেটফোর্ড, মজার, নাগাণ্ট ইত্যাদি। ইংরেজদের উদ্ভাবিত লী-এনফীল্ড ও মার্টিনি-হেনরী। লী-এনফীল্ডের ওজন প্রায় ৪৸০ সের, নল ২৫ ইঞ্চি লম্বা, নলের মধ্যে সাত প্যাঁচ খাঁজকাটা। একটা টোটাঘরে দশটা টোটা ভরা যায়, একবার ভরিয়া পুনঃ-পুনঃ দশবার আওয়াজ করা চলে। জার্ম্মান বন্দুকের নাম মজার, ওজন ৪৸০ সের, নলের ফুটো ·৩১১ ইঞ্চি, নলের মধ্যে ৪টি খাঁজের প্যাঁচ। ফরাশী 'লেবেল' বন্দুকের ওজন ৪৸০ সেরের কিছু বেশী, নলে ৪ খাঁজের প্যাঁচ; টোটাঘরে ৫টা বা ৮টা টোটা ধরে। রুষের বন্দুকের নাম নাগাণ্ট, চার-প্যাঁচা, ৪৸০ সের, টোটাঘরে ৫টা টোটা খায়। ইতালীয় ও অষ্ট্রীয়ার বন্দুকের নাম মান্‌লিকার, নলের ফাঁদল ·৩১৫ ইঞ্চি, ৪।০ সের। সার্ভিয়া মজার জাতীয় এক প্রকার বন্দুক ব্যবহার করে, তাহাতে ৫টা টোটা খায়।

আধুনিক যুদ্ধে যে-সব গুলি ব্যবহৃত হয়, তাহা

সীসারই; কিন্তু সীসা গলিয়া গলিয়া বন্দুকের নলে একটা লেপ পড়িয়া নলের প্যাঁচোয়া খাঁজ ভরিয়া তোলে, এজন্য সীসার গুলি নিকেলের একটা ঠোঙার মধ্যে মোড়া থাকে; সেই ঠোঙার আকার লম্বাটে ডিম্বার্দ্ধের মতন। গোল গুলির অপেক্ষা আধুনিক কালে ছোলং আকারের এক-মুখ-ছুঁচলো গুলি বেশি চলে; ইহা হাল্কা, দূর পাল্লা পাড়ি দিতে পারে এবং অত্যন্ত গভীর ভাবে বিদ্ধ হয়। ইংরেজী গুলির ব্যাস ·৩০৩ ইঞ্চি, ওজন ২১৫ গ্রেন হইতে ১৭০ গ্রেন
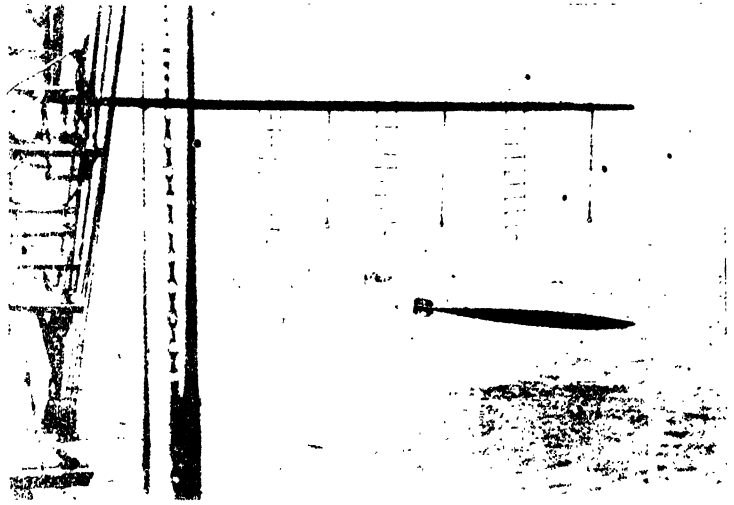
টর্পেডো চলিয়াছে।
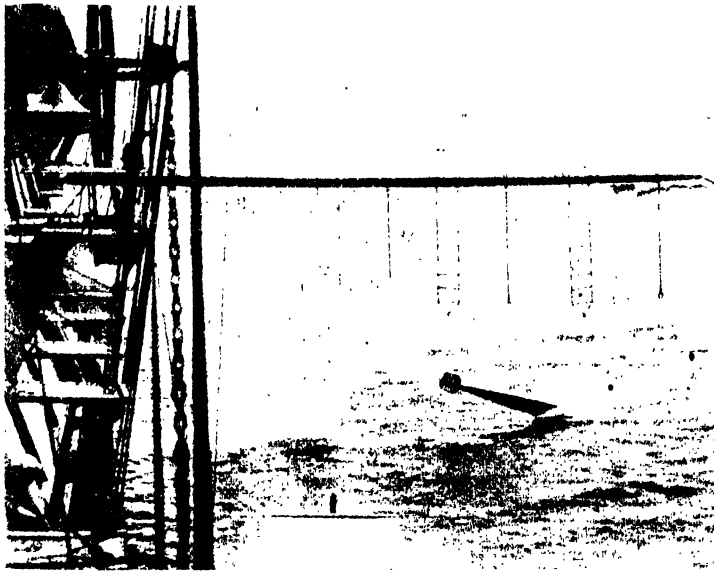
টর্পেডো—চলিতেছে।

বা আধ আউন্স; জর্ম্মান গুলির ব্যাস ৩১১ ইঞ্চি, ওজন ১৫৪ গ্রেন; ফরাশী গুলির ব্যাস ৩১৫ ইঞ্চি, ওজন ১৯৮ গ্রেন—ইহা তামা ও দস্তার মিশালে তৈয়ারী, ইহার গায়ে নিকেল ঠোঙা মোড়া থাকে না। দমদম গুলি আমাদেরই বাংলা দেশের দমদমার কারখানায় উদ্ভাবিত, নাকি একজন বাঙালী কামার মিস্ত্রীর বুদ্ধির ফল। দমদম গুলি বড় সাংঘাতিক; সাধারণ গুলির নিকেল ঠোঙার ছুঁচলো ডগায় একটা ছিদ্র করা থাকে, তাহাতে গুলির সীসা দেহ ভেদ করিয়াই ছত্রাকারে ছড়াইয়া যায় এবং গভীর বৃহৎ ক্ষত করে। সাধারণ গুলির নিকেল ঠোঙার চূড়ায় ছিদ্র করিয়া দিলেই দমদম গুলির কাজ হয়। এই গুলি নাকি ভারতসীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ প্রাণবন্ত পাঠানদের জব্দ করিবার জন্য প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল; তাহারা সাধারণ গুলিতে জখম হইয়া কিছুতেই কাবু হইতে চাহে না, এমনি তাহাদের প্রচুর জীবনীশক্তি! সভ্য (!) জাতির সংগ্রামে এই দমদম গুলি চালানো রীতিবিরুদ্ধ।

বন্দুকের ডগায় তরোয়ালের ন্যায় যে ফলক সংলগ্ন থাকে তাহাকে সঙ্গিন বলে। আজকাল তরোয়াল ও বর্শা বল্লমের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়, দূর হইতেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়; হাতাহাতি যুদ্ধে

টর্পেডো—গেল।

সঙ্গিন, বর্শা, বল্লম, তরোয়াল রিভলভার পিস্তল ব্যবহার হয়।

যুদ্ধজাহাজ হইতে কামানের গোলা ছাড়া আর একরূপ কামান হইতে একপ্রকার জাহাজধ্বংসের অস্ত্র ছোড়া হয়, তাহাকে টর্পেডো বলে। টর্পেডো একপ্রকার বৈদ্যুতিক-শক্তি-বিশিষ্ট মারাত্মক মাছের নাম তাহার স্পর্শে মোহ বা মৃত্যু ঘটে। তাহারই নামে এই অস্ত্রের নাম; এই অস্ত্রও দেখিতে অনেকটা শুশুক বা হাঙরের মতন—সিগার চুরুটের যেমন আকার ঠিক তেমনি। সিগার-আকারের একটা ইস্পাতের চোঙের মাথার দিকে গান কটন ভরা থাকে, মধ্যস্থলে জাঁত-দেওয়া বাতাসের ঠেলায় দুটি স্ক্রু ঘুরিয়া তাহাকে গতি দেয়, এবং পশ্চাতে গাইরোস্কোপ (ঘূর্ণী)-সংযুক্ত একটা হাল টর্পেডোর গতি ঠিক সোজা বজায় রাখে। জাহাজে টর্পেডো টিউব নামক এক রকম কামান হইতে জাঁত-দেওয়া বাতাসের বা কোনো রকম মৃদু বিস্ফোরকের ঠেলায় এই টর্পেডো যন্ত্র ছোড়া হয়; উহা জলের মধ্যে ডুবিয়া ডুবসাঁতার কাটিয়া গিয়া শত্রুর জাহাজে ঢু মারিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া ফাটিয়া যায়। এই টর্পেডো জলের উপর হইতে (যেমন যুদ্ধজাহাজে) বা জলের তল হইতে (যেমন ডুবন্ত জাহাজে) ছাড়া চলে। বহুবিধ টর্পেডো ব্যবহৃত হয়। ইংরেজ বহরে পুরানো ধরণের যে টর্পেডো ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যাস ১৪ ইঞ্চি, ৮০০ গজ পাল্লা, মাথায় প্রায় দু মণ গান্-কটন গাদা থাকে; নূতন ধরণের টর্পেডোর দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট ২১ ইঞ্চি ব্যাস, ওজন ২৮ হন্দর, পাল্লা ৭০০০ গজ, ৩ মণ ৩০ সের গান্কটন ভরা থাকে। টর্পেডো ছাড়া-পাওয়ার পর ৪ মিনিটে লক্ষ্য স্থানে গিয়া পৌঁছে। জার্মান টর্পেডোও ইহার কাছাকাছি। ভবিষ্যতে অ-তার টেলিগ্রাফের কৌশলে টর্পেডো চালনা করিবার কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেছে। টর্পেডো ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার লুঁই বেনাঁ সি-বি উদ্ভাবন করেন। টর্পেডোকে সমুদ্রের মশা বলে; সমুদ্রের কুকুর হইল যুদ্ধজাহাজ।

প্রত্যেক জাহাজে ২৫০০০ বাতির আলোর সমান আলোর তল্লাসী আলো থাকে ; উহার আলোয় টর্পেডো ধরা পড়িয়া যায়। তল্লাসী আলোর চোখে ধূলা দিবারও চেষ্টা ও অনুসন্ধান চলিতেছে।

ডুবন্ত জাহাজের মরণ-ছলের নক্সা ও টর্পেডো।

বিশেষজ্ঞদের মতে ডুবন্ত জাহাজের আবির্ভাবে ভাসন্ত যুদ্ধজাহাজ অকেজো হইয়া উঠিয়াছে। ভাসন্ত যুদ্ধজাহাজে কখন্ যে ডুবন্ত জাহাজ হইতে টর্পেডোর চোরা ঘা খাইয়া ডুবিয়া যাইবে তাহা বলা যায় না ; ডুবন্ত জাহাজকে ডুবন্ত জাহাজ দিয়া মারিবার উপায়ও এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই : সুতরাং জলযুদ্ধ আজকাল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ও অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধের আর একটি অস্ত্র মাইন। মাইন দুই প্রকার—স্থলের ও জলের। শত্রুর পথে মাটির মধ্যে, পুলের তলায় বা সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া শত্রুর দুর্গের নীচে বিস্ফোরক রাখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতে সময়-জ্বলন-যন্ত্র যোগ করা থাকাতে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা শত্রুর গতিতে আঘাত পাইয়া তাহা বিস্ফুরিত হইয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলে। জলে যে মাইন পাতা হয় তাহা এক একটা চৌকা ক্যানেস্তার মতো ; তাহার মধ্যে বিস্ফোরক থাকে ; এই মাইন জলের উপরে বা জলতলের ৯।১০ ফুট নীচে ভাসে ; শত্রুর জাহাজ চলিতে চলিতে তাহার সংস্পর্শে আসিলে একটি কল ঘুরিয়া গিয়া বিস্ফোরক জ্বালিয়া তোলে এবং সেই জাহাজকে একেবারে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। এই মাইন আত্মরক্ষা ও শত্রুদমন উভয় কার্য্যেই সাহায্য করে। এক প্রকার মাইন বন্দরের মুখে পাতা থাকে, শত্রু আক্রমণ করিতে আসিলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইয়া ফাটাইয়া ফেলা হয়। কোনো কোনো মাইনের মধ্যে কাচের নলে সালফিউরিক এসিড বা গন্ধক-তেজাব থাকে, জাহাজের ধাক্কায় কাচ-নল ভাঙিয়া গিয়া সেই তেজাব লাগিয়া গানকটন বিস্ফুরিত হইয়া উঠে। জলের মাইন নোঙর করা থাকে ; নোঙর ছিঁড়িয়া গেলে উহা ভাসিয়া বেড়ায় এবং হয়ত যাহারা পাতিয়াছে তাহাদেরই জাহাজের সর্ব্বনাশ ঘটায়। অথর্ব্ববেদে শত্রুর পথে প্রহরণ নিক্ষেপ করার কথা ও ব্যবস্থা আছে।

আজকাল এয়ারোপ্লেন ও জেপেলীন নামক আকাশ-যান যুদ্ধের প্রধান সহায়। জেপেলীনগুলি ৪০০-৫০০ ফুট লম্বা, ৫০-৬০ মাইল ঘণ্টায় চলে ; উহাতে গুলিতে অভেদ্য বর্ম্ম পরানো থাকে, তাহাতে বন্দুক কামানের গুলিতে উহার কিছু হয় না। উহা ২০।৩০ জন লোক বহন করিতে পারে এবং সঙ্গে অতার টেলিগ্রাফ, ছোট কামান, বোম প্রভৃতি লইয়া উড়ে। ৬০০০ ফুট উপর হইতে ১৪ মণ ওজনের বোম ফেলিয়া একটা জেপেলীন একখানা গ্রাম একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। জেপেলীনের একটা মঞ্চের উপর কামান বসানো থাকে ; শত্রুর এয়ারোপ্লেন তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে সেই কামান দাগে। এত-সব আকাশচারী শত্রুর অতর্ক আক্রমণের হাত হইতে শহর গ্রাম সৈন্যদল,

রসদভাণ্ডার, গোলা বারুদের ঘর রক্ষা করা এক সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। এয়ারোপ্লেনের কাছে সাবমেরিন অর্থাৎ ডুবন্ত জাহাজ জব্দ; উর্দ্ধ হইতে দেখিলে ডুবন্ত জাহাজ বা মাইন অনেক সময় ধরা পড়িয়া যায়। সুতরাং এয়ারোপ্লেন হইতে বোম ফেলিয়া মাইন ও ডুবন্ত জাহাজ ধ্বংস করিবার কল্পনা চলিতেছে। এয়ারোপ্লেনের ন্যায় সাপ্লেন বা সমুদ্রচারী যানও একরকম উদ্ভাবিত হইয়াছে। আকাশযানে যে বোম থাকে, তাহার ওজন সচরাচর দশ সের, তাহার মধ্যে ৩৪০টি গুলি থাকে। এই বোম উপর হইতে ২০০ ফুট না পড়িলে আওয়াজ হয় না; সুতরাং হঠাৎ ফাটিয়া বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। বোম ফেলিয়া দিলে নীচে নামিতে নামিতে উহাতে সংলগ্ন একটি প্যাঁচ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোমের বিস্ফোরকে অগ্নিসংযোগ করে। জর্ম্মানরা এক রকম বোম করিয়াছে তাহা ফেলিয়া দিলে উজ্জ্বল আলো হয়, তাহাতে অন্ধকার রাত্রে বেশ বোঝা যায় বোমটি গিয়া কোন্ জায়গায় পড়িল। আকাশযানে তল্লাসী আলোও থাকে। আর এক রকম জর্ম্মান বোম ফাটিয়াই অত্যন্ত ধোঁয়া করে; সেই সুযোগে এয়ারোপ্লেন পলায়ন করিতে পারে। এক রকম জর্ম্মান বোম ফাটিলে বিষাক্ত গ্যাস বাহির হয়, তাহাতে ১০০০ গজের মধ্যে যত লোক থাকে সব মরে; ২০০০ গজ পর্য্যন্ত যত লোক থাকে তাহারা পীড়িত হয়।

এই-সমস্ত ছাড়া মোটর গাড়া, বাস, লরী, সাইকেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ প্রভৃতি কত কি যে যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে চলে তাহার ইয়ত্তা নাই।

অনেক সময় শত্রুর পথে তার ঘিরিয়া বেড়া দিয়া রাখা হয় এবং সেই তারের ভিতর দিয়া প্রবল বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হইতে থাকে। শত্রু-সৈন্য দূর হইতে তার দেখিতে না পাইয়া বেগে ছুটিয়া আসিয়া যেই তারের উপর পড়ে অমনি তারের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া বিদ্যুৎস্পর্শে মরিয়া মরিয়া পড়িতে থাকে।

প্রত্যেক দেশেই অস্ত্রতত্ত্ব, যুদ্ধবিদ্যা, সৈন্য চালনা ও সংস্থাপন, নৌযুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ প্রভৃতি শিখাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্কুল আছে। ইংলণ্ডে কামান চালনা শিখাইবার স্কুল আছে শুবেরীনেস নামক স্থানে টর্পেডো স্কুল হয় দুখানা জোড়া জাহাজে, তাহার নাম ভার্নন। এই জাহাজ থাকে পোর্টস্‌মাউথ বন্দরের কাছে পোর্চেষ্টার খাড়ির মধ্যে এই স্কুল ১৮৭৩ সালে স্থাপিত এখানে নাবিকদিগকে বৎসরে চারমাস করিয়া আসিয়া সদা-উন্নতিশীল নৌযুদ্ধবিদ্যার হালনাগাদ ব্যাপারে তালিম হইয়া যাইতে হয়। নাবিকদিগকে কামান চালানো শেখানো হয় হোয়েল দ্বীপের গোলন্দাজী স্কুলে। টর্পেডো স্কুলে যাহারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়, তাহারা গ্রীনউইচ নেভাল কলেজে উন্নত তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া নায়ক পদের যোগ্য হয়। টর্পেডো স্কুলে মাইন সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাড়িৎতত্ত্ব, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ, অতার টেলিগ্রাফ, হাইড্রোফোঁ বা জলতলচারী টেলিফোঁ—ইহা দ্বারা অন্ধকারে বা কুয়াসায় লুকাইয়া অপর জাহাজ নিকটে আসিতে চেষ্টা করিলে ধরা পড়ে—প্রভৃতি বহু আনুষঙ্গিক ব্যাপার শিক্ষা দেওয়া হয়। ফি বৎসর সরকার হইতে ৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৫০ টাকা করিয়া নূতন সামরিক অস্ত্র যন্ত্র বা কৌশল উদ্ভাবনের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। কোনো নাবিকই গোপনীয় যন্ত্রতত্ত্ব অর্থলোভেও এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করে নাই।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বন্দ্ব

(গী দ্য মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

১৮৭১ সাল। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে; জর্ম্মানরা ফ্রান্স দখল করিয়া বসিয়াছে; সমস্ত পরাজিত দেশ যেন বিজেতার পায়ের তলে অবনত হইয়া পড়িয়া আছে।

প্রাণাধিক প্রিয় পারী নগরী এখন দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট, ভয়ে সন্ত্রস্ত; সেখান হইতে ফ্রান্সের নূতন সীমানার দিকে প্রথম যাত্রী ট্রেনগুলি মন্থর গতিতে মাঠ ও গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতেছিল। ট্রেনের যাত্রীরা গাড়ীর জানালা হইতে দুধারি ছন্নছাড়া ক্ষেত খামার আর পোড়া ভাঙা ঘরবাড়ী দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। প্রত্যেক বাড়ীর দরজার সামনে জর্ম্মান সৈন্য খাড়া আছে, তাহাদের

মাথায় কালো রঙের টুপির উপর তামার চূড়া চকচক করিতেছে; কেহ কেহ বা চেয়ারের উপর ঘোড়ায় চড়ার মতন করিয়া বসিয়া তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতেছে। কেহ কেহ যেন বাসিন্দাদেরই পরিবারের লোকের মতো তাহাদের কাজ করিয়া দিতেছে, বা তাহাদের সহিত গল্পগুজব করিতেছে। শহরের পাশ দিয়া যাইবার সময় ফৌজের কাওয়াজ দেখা যাইতেছিল, এবং অত গোলমালের মধ্যেও সৈন্যচালনার কর্কশ হুকুমের শব্দ শোনা যাইতেছিল।

ম্যসিয় দুবুই, পারী অবরোধের সমস্ত সময়টা জাতীয় সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; এক্ষণে তিনি সুইজার-ল্যাণ্ডে স্ত্রীকন্যার কাছে যাইতেছিলেন; পারী অবরোধ হইবার পূর্ব্বক্ষণেই সাবধান হইয়া তিনি তাহাদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

অনাহার উদ্বেগ ও পরিশ্রমে তাঁহার গদিয়ান মহাজনী ভুঁড়ি একটুও কমে নাই। তিনি মানুষের বর্ব্বরতাকে দু'চারিটি কড়া কথা শুনাইয়া বেশ শান্ত নিরুপায় ভাবেই এই দারুণ দুর্দৈবটাকে সহিয়া গিয়াছিলেন। এখন যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার পর ফ্রান্সের সীমানার কাছে তিনি এই সবপ্রথম কতকগুলো জর্ম্মানকে দেখিলেন; যদিও তিনি দুর্গপ্রাকারে উঠিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, এবং শীতের কনকনে রাত্রি জাগিয়া শহর পাহারা দিয়াছেন, তবু ইহার পূর্ব্বে জর্ম্মানের চেহারা তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

এই-সব দাড়িওয়ালা সশস্ত্র লোকগুলা যেন নিজের বাড়ীর মতো বেপরোয়া রকমে ফ্রান্সের বুকে যে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মনের মধ্যে একটা তীব্র স্বদেশ-প্রীতির জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু যে অতি-সাবধানতা তখন সমস্ত দেশটাকে পাইয়া বসিয়াছে তাহার দ্বারা তিনি সেই মনের জ্বালা দমন করিয়া রাখিলেন।

তাঁহার কামরায় দুজন ইংরেজ ছিল, তাহারা গম্ভীর ভাবে কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়া ফ্রান্সের দুর্দ্দশা দেখিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা দুজনেই খুব হৃষ্টপুষ্ট, নিজেদের ভাষাতেই কথা কহিতেছিল, এবং মাঝে মাঝে কোনো একটা জায়গা দেখাইয়া চেঁচাইয়া উঠিতেছিল।

একটা ছোট শহরে আসিয়া গাড়ী ষ্টেসনে থামিল। একজন জর্ম্মান সেনানায়ক গাড়ীর পাদানে আপনার লম্বা তরোয়াল ঠুকিয়া ঠুকিয়া সশব্দ আড়ম্বরে সেই কামরায় আসিয়া উঠিল। তাহার আকার প্রকাণ্ড; উর্দ্দির চাপে প্রকাণ্ড দেহখানি যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে; তাহার বিপুল দাড়ি চোখের কোল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। তাহার সেই লাল লম্বা দাড়ি অগ্নিশিখার ন্যায় লক্‌লক্ করিয়া দুলিতেছিল, এবং তাহার লম্বা কটা গোঁফ জোড়া তাহার হাঁড়িপানা মুখ ছাড়াইয়াও দুই ধারে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, যেন সেইখানে তাহার মুখখানা দুফাঁক হইয়া কাটিয়া গিয়াছে।

ইংরেজ দুজন কৌতুহল চরিতার্থ হওয়ার হাসিমুখে তাহাকে দেখিতে লাগিল। ম্যসিয় দুবুই একখানা খবরের কাগজ পড়িতে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি, পুলিশ দেখিয়া চোরের মতো, এক কোণে জড়সড় হইয়া যেন নিজেকে লুকাইতে চাহিতেছিলেন।

ট্রেন চলিতে লাগিল। ইংরেজ দুজন কোন্ কোন্ জায়গায় ঠিক যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাই স্থির করিবার জন্য পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল। তাহারা একটা গ্রামের দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইতেই সেই জর্ম্মান সেনানী তাহার লম্বা পা দু-খানা ছড়াইয়া দিয়া পিঠটাকে খুব হেলাইয়া দিয়া ভাঙা ভাঙা ফরাশী ভাষায় বলিয়া উঠিল—এই গাঁয়ে আমি এক ডজন ফরাশীকে মেরে ফেলেছি, শয়ের ওপর কয়েদ করেছি!

ইংরেজ দুজন এই খবরে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এই গাঁয়ের নাম কি?

—ফার্সবুর্গ। আমি ফরাশী পাজিগুলোর কান আচ্ছা করে মলে দিয়েছি!

এই বলিয়া সে তাহার দাড়ির জঙ্গলের মধ্য হইতে মিট মিট করিয়া দুবুইয়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

ট্রেন যতগুলি গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিল তাহার সবগুলির বুকেই জর্ম্মানরা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে। গ্রামের ধারে ধারে সারা পথটাই জর্ম্মান সৈন্যে ছাইয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছিল; কেহবা মাঠে দাঁড়াইয়া

আছে, কেহবা কোথাও বেড়ার উপর বসিয়া আছে, কেহবা কাফিখানায় গল্পগুজব করিতেছে—পথে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্রই জর্ম্মান সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

জর্ম্মান সেনানী হাত বাড়াইয়া দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিল—যদি আমার ওপরে ভার থাকত, তা হলে আমি প্যারী দখল করে' সব পড়িয়ে তবে ছাড়তাম! একটি লোককেও জ্যান্ত রাখতাম না! ফ্রান্সের নাম একেবারে লোপ করে দিতাম!

ইংরেজ দুজন ভব্যতার খাতিরে, উত্তর না দিলে নয় বলিয়া, শুধু বলিল—ও! বটে!

জর্ম্মানটা বলিতেই লাগিল—আর কুড়ি বছর পরে, দেখে নিয়ো, সমস্ত য়ুরোপটাই আমাদের অধীন হয়ে যাবে। জর্ম্মানীর জোরের কাছে আর কোনো দেশ কি দাঁড়াতে পারবে?

ইংরেজ দুজন অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহাদের লম্বা লম্বা গোঁপ যেন তাহাদের মুখের উপর গালা-মোহরের মতন আঁটিয়া বসিল। তাহা দেখিয়া জর্ম্মানটা খুব হাসিতে হাসিতে তেমনি ভাবে হেলিয়া পড়িয়া খুব দম্ভের সহিত সম্ভব অসম্ভব বকিয়া যাইতে লাগিল। সে ফ্রান্সকে ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার বড়াই করিয়া পরাজিত শত্রুর দেশের বুকে বসিয়া তাহাদের অপমান করিতে লাগিল; বিনা যুদ্ধে সে অষ্ট্রীয়া দখল করিতেছিল; সে আপনাদের গোলন্দাজি, সৈন্য পরিচালনা, যুদ্ধকৌশল, বল ও শক্তির বৃথা গর্ব্ব করিয়া বিষম আস্ফালন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিল না। সে শুনাইয়া দিল যে স্বয়ং বিসমার্ক যুদ্ধে-কাড়িয়া-আনা কামান দাগিয়া একটা লোহার শহর চুরমার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এবং কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ সে তাহার বুটবদ্ধ পদযুগল ম্যসিয় ত্বুবুইয়ের বেঞ্চির উপর চাপাইয়া দিল; ত্বুবুই মুখ ফিরাইয়া ইহা দেখিলেন, এবং তাঁহার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইংরেজরা দ্বীপের বাসিন্দা, সমস্ত জগৎসংসারের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন, এজন্য তাহারা কাহারো সহিত যেন মিশ খায় না। তাহারা জর্ম্মানটার ব্যবহার দেখিয়াও উদাসীনের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

জর্ম্মানটা তাহার তামাকের পাইপ বাহির করিয়া ফরাশী লোকটির দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিল—এই, তোমার কাছে তামাক আছে?

ম্যসিয় ত্বুবুই বলিলেন—না মশায়।

জর্ম্মান বলিল—গাড়ী থামলে তুমি আমায় একটু তামাক কিনে এনে দেবে, বুঝলে!

তার পর সে খুব হাসিতে হাসিতে বলিল—আমি তোমায় কিছু জলপানী বকশিশ দেবো।

ট্রেন বাঁশি বাজাইয়া গতি মন্থর করিতে লাগিল একটা পোড়া ভাঙা ষ্টেসনের সামনে আসিয়া ট্রেন থামিল।

জর্ম্মানটা উঠিয়া এক হাতে গাড়ীর দরজা খুলিয়া অপর হাতে ম্যসিয় ত্বুবুইয়ের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—এস এস আমার হুকুম তামিল কর, ওঠ ওঠ জল্‌দি জল্‌দি!

একদল জর্ম্মান ফৌজ সেই ষ্টেসন দখল করিয়া দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল। কতকগুলি সৈন্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঠের গেটের গরাদের ভিতর দিয়া উঁকি মারিতেছিল। এঞ্জিনের বাঁশি বাজিয়া ট্রেন ছাড়িবার সঙ্কেত করিল। ম্যসিয় ত্বুবুই চট করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর লাফাইয়া পড়িলেন, এবং ষ্টেসন-মাষ্টারের বাধা সত্ত্বেও তিনি পাশের কামরায় উঠিয়া পড়িলেন।

কামরায় তিনি একা। তাঁহার বুক ধড়াস ধড়াস করিতেছিল! তিনি জামার বোতাম খুলিয়া ফেলিলেন এবং হাতের উপরে মাথা রাখিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

ট্রেন আবার এক ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। হঠাৎ সেই জর্ম্মান সেনানী সেই কামরার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং সেই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কৌতুহলাকৃষ্ট হইয়া ইংরেজ দুজনও আসিয়া উঠিল।

জর্ম্মানটা ফরাশী লোকটির ঠিক সাম্‌নে বসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—আমার হুকুম শোনবার কোনো রকম গা দেখছি না তোমার।

ত্বুবুই বলিলেন—না মশায়।

ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল।

জর্ম্মান বলিল—তবে তোমার গোঁপ জোড়া ছিঁড়ে আমার পাইপ সাজব।

এই বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া ফরাশী লোকটির গোঁপ ধরিতে গেল।

ইংরেজ দুজন স্থির দৃষ্টিতে অবাক হইয়া মজা দেখিতেছিল।

জর্ম্মানটা ফরাশী ভদ্রলোকটির এক দিকের গোঁপ ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করাতে ফরাশী লোকটি হাতের এক ঝটকায় তাহার হাত ছাড়াইয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বেঞ্চির উপরে পাড়িয়া ফেলিলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার রগ ফুলিয়া উঠিয়াছিল, চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; তিনি এক হাতে তাহার গলা জোরে টিপিয়া ধরিয়া শোয়াইয়া রাখিয়া অপর হাতে তাহার মুখের উপর ঘুষির বৃষ্টি করিতেছিলেন। জর্ম্মান আপনার বুকের উপর উপবিষ্ট শত্রুর হাত হইতে মুক্ত হইয়া তরোয়াল খুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু দুবুই তাহার প্রকাণ্ড একখানা পা জর্ম্মান সেনানীর ভুঁড়ির উপর চাপিয়া ধরিয়া এক দমে অবিশ্রাম কেবল ঘুষির পর ঘুষি চালাইতেছিলেন, তিনি দেখিতেছিলেন না সে-সব ঘুষি কোথায় কেমন ভাবে পড়িতেছে। রক্তারক্তি হইতেছিল; জর্ম্মানটার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল; সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া গড়াগড়ি দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চাহিতেছিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা—যে লোক মরীয়া হইয়াছে, যাহার ঘাড়ে খুন চাপিয়াছে, তাহার কবলে পড়িয়া উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা বৃথা! জর্ম্মান এই বিপুলবপু ফরাশীকে বুক হইতে টলাইতে পারিল না।

ইংরেজেরা ভালো করিয়া মজা দেখিবার জন্য উঠিয়া আগাইয়া আসিল এবং কৌতুক ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কে জয়ী হইবে তাহাই বিচার করিতে লাগিল।

হঠাৎ দুবুই অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটি কথাও না বলিয়া আপনার জায়গায় গিয়া বসিলেন।

জর্ম্মানটা তাঁহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল না; সে ভয়ে লজ্জায় দুঃখে একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। যখন সে একটু দম লইয়া সামলাইয়া উঠিল, তখন সে বলিল—যদি তুমি পিস্তল নিয়ে এর জবাবদিহি না কর, তা হলে তোমায় আমি খুন করব!

দুবুই বলিলেন—আপনার যেমন অভিরুচি। আমার তাতে আপত্তি নেই।

জর্ম্মান বলিল—ঐ ত ষ্ট্রাসবুর্গ শহর দেখা যাচ্ছে; আমি সেখান থেকে দুজন অফিসারকে আমার সাক্ষী ডেকে নেব।

দুবুই এঞ্জিনের মতো ফোঁস ফোঁস করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ইংরেজদের জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা অনুগ্রহ করে আমার সাক্ষী হবেন?

তাহারা দুজনেই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল—ও! নিশ্চয়!

ট্রেন আসিয়া থামিল।

এক মিনিটের মধ্যেই জর্ম্মান অফিসার তাহার দুজন সঙ্গী ও এক জোড়া পিস্তল খুঁজিয়া আনিয়া হাজির করিল। তখন তাহারা ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইংরেজ দুজন ঘন ঘন ঘড়ী দেখিতে দেখিতে খুব জোরে পা চালাইয়া গিয়া দ্বন্দ্বের আয়োজন চটপট ঠিক করিয়া ফেলিল—ট্রেন ফেল করিবার ভয়ে তাহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

মাসিয় দুবুই জীবনে কখনো পিস্তল ছোড়েন নাই। সাক্ষীরা তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে কুড়ি কদম দূরে দাঁড় করাইল। তাহার পর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—ঠিক তৈরি ত?

দুবুই 'হাঁ মহাশয়' বলিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইলেন, দেখিলেন ইংরেজরা রোদ বাঁচাইবার জন্য ছাতা খুলিয়া মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কে বলিয়া উঠিল—পিস্তল ছাড়।

দুবুই পিস্তলের ঘোড়া টানিয়া দিলেন, এবং আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন জর্ম্মানটা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে আকাশে হাত তুলিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে খুন করিয়াছেন।

একজন ইংরেজ চরিতার্থ কৌতূহলের আনন্দে কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—সাবাস!

অপরজন একহাতে ঘড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সে দুবুইয়ের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে জিমনাষ্টিক করার ন্যায় লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ষ্টেসনের দিকে লইয়া চলিল।

প্রথম ইংরেজ দুই কোমরে হাত দিয়া তাহাদের পিছনে পিছনে রীতিমত দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

টং টং! টং টং!

তাহারা তিনজনে প্রকাণ্ড ভুঁড়ির ভার অবহেলা করিয়া তিনটি ব্যঙ্গচিত্রের মতন মূর্ত্তিমান হাস্যরসের অবতারণা করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। তাহারা তাহাদের কামরায় লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। তখন সেই ইংরেজ দুজন তাহাদের মাথা হইতে টুপি খুলিয়া উঁচু করিয়া ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে তিন বার চীৎকার করিয়া উঠিল—হিপ হিপ হুরে! হিপ হিপ হুরে! হিপ হিপ হুরে!

তারপর তাহারা গম্ভীর ভাবে একে একে দুবুইয়ের ডাহিন হাত ধরিয়া নাড়িয়া দিল, এবং আপনাদের জায়গায় গিয়া পাশাপাশি খুব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবরের দেশে দিন পনর

প্রথম দিবস—পোর্টসৈয়দ, কাইরো।

মিশরে পদার্পণ করিলাম। খালের প্রায় শেষ সীমায় বন্দরের এক ঘাটে উচ্চ মঞ্চের উপর একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সুয়েজখালনির্ম্মাতা ফরাসী এঞ্জিনীয়র লেসেপ্সের স্মরণার্থে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে।

পোর্টসৈয়দ নিতান্তই নূতন স্থান—খাল কাটা হইবার পূর্ব্বে বোধ হয় ইহার অস্তিত্ব ছিল না। এক্ষণে নানা জাতির এবং নানা ভাষাভাষীর বাস। গ্রীকদিগের সংখ্যা খুব বেশী।

নামিবা মাত্র রেজিষ্ট্রেশন আফিসে নাম লিখাইতে লইয়া গেল এবং পাশপোর্ট আফিসের লোকেরাও নাম ধাম লিখিয়া দিতে বলিল। তার পর শুল্কগৃহ, এখানে অনেকক্ষণ কাটাইতে হইল। বাক্স খুলিয়া কর্ম্মচারীরা সমস্ত জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিল। একজন সহযাত্রীর বাক্‌সে নানা প্রকার কিংখাব এবং রেশমী ও সোনালি দ্রব্য ছিল। ইনি ইউরোপে বিক্রী করিবার জন্য এগুলি সঙ্গে আনিয়াছেন কিন্তু মিশরে বেচিবেন না। কাজেই মিশরবাসীরা ইঁহার নিকট শুল্ক আদায় করিতে পারে না। কিন্তু পোর্টসৈয়দ বন্দর হইতে মিশরের ভিতরে এগুলি লইয়া যাইতে অনুমতি পাইলেন না। তিনি যে মিশরের ভিতর এই-সমুদয় বস্তু বেচিবেন না তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং শুল্ক-গৃহের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে এই জিনিষগুলি আলেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দরে এখনই স্বনামে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য করিল। আলেক্‌জান্দ্রিয়া হইতেই আমরা মিশর ত্যাগ করিব—এইরূপ ইহাদিগকে বলিয়াছিলাম। নূতন দ্রব্য আমদানী করিলেই বন্দরে শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু নিজ ব্যবহারের কোন জিনিষের উপর কর বসাইবার নিয়ম নাই। ব্যবসায়ের সামগ্রীর উপরই শুল্ক আদায় করা হইয়া থাকে।

পোর্টসৈয়দে নূতন কিছু দেখিবার নাই। সাধারণ পাশ্চাত্য ফ্যাসনের দোকান, হোটেল ইত্যাদি প্রধান। দুইটি মাত্র হিন্দু দোকান আছে। আমরা সহরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম কলিকাতার বড়বাজারের সৌধগুলি এবং বোম্বাই নগরের বড় বড় "চ'ল" (Chawl) সমূহের ন্যায় এখানকার অট্টালিকাসমূহ আকাশে মাথা তুলিয়াছে। অধিকাংশই তিনচারিতলবিশিষ্ট। গৃহগুলি পৃথক পৃথক সন্নিবিষ্ট ও প্রস্তরনির্ম্মিত, প্রায়ই নূতন। রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত থটখটে ও পরিষ্কার।

একটা মসজিদ দেখা গেল। ভারতবর্ষের মসজিদ হইতে ইহার নির্ম্মাণপ্রণালী কিছু স্বতন্ত্র। একটিও গম্বুজ নাই। চতুষ্কোণ গৃহের পূর্ব্বপ্রাচীরের মধ্যস্থলে একটি উচ্চ স্তম্ভ রহিয়াছে। আগ্রার তাজমহলের চারিকোণস্থ স্তম্ভ অথবা দিল্লীর কুতবমিনার প্রভৃতির ন্যায় এই স্তম্ভ দুইতিনতলবিশিষ্ট। উচ্চতায় মসজিদের ত্রিগুণ। মসজিদের পশ্চাতেই একটি বিদ্যালয়। ১২টার সময়ে দেখিলাম মসজিদের ভিতর মুসলমানেরা পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িতেছে, কারণ মক্কা এখান হইতে পূর্ব্ব দিকে। অনতিদূরে ভূমধ্যসাগর। সম্মুখস্থ রাস্তা হইতে সমুদ্রের জল ও তরঙ্গ দেখা যায়।

মসজিদ হইতে উত্তর দিকে যাইয়া সমুদ্র দেখিতে পাইলাম। পুরীর সমুদ্র-কূলে বালির রাস্তা যেরূপ
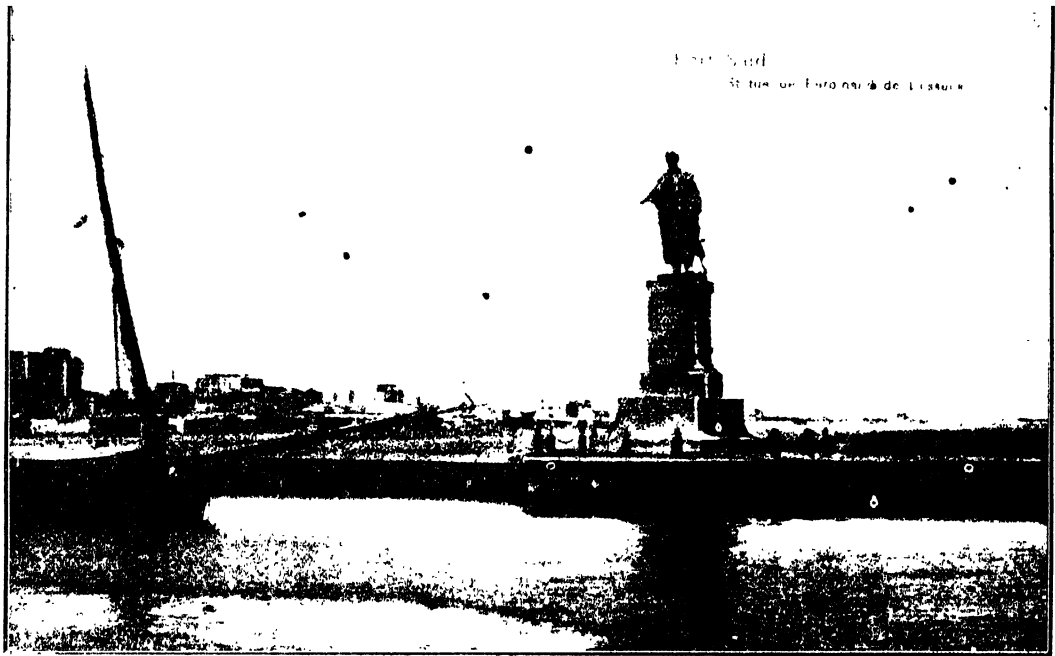
পোর্ট সৈয়দ সুয়েজ খালের ধারে ফরাসী এঞ্জিনীয়ার লেসেপ্সের প্রতিমূর্তি।

কথঞ্চিৎ উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত এবং তাহার উপর বাস-গৃহ নির্ম্মিত,—এখানেও সেইরূপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমুদ্র-কিনারায় রাস্তা, তাহার উপর সমুদ্র হইতে অল্প দূরে সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত। উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে গৃহের উপর ২৪ ঘণ্টা সমুদ্রবায়ু বহিয়া যাইতেছে, সমুদ্রের কলকলধ্বনি সর্ব্বক্ষণ শুনা যায় এবং কূলে তরঙ্গাঘাত দেখা যায়। বালেশ্বরে এবং এডেনে জোয়ারের সময়ে প্রায় এক আকারেই সমুদ্রের ঢেউ আসিতে থাকে। দূর হইতে দেখা যায় অসংখ্য শ্বেত-ফেন-বিশিষ্ট জলরাশি কূলের দিকে গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। পোর্ট সৈয়দের কূলে দাঁড়াইয়াও ভূমধ্যসাগরের সেই মূর্ত্তি দেখিয়া লইলাম।

পোর্ট সৈয়দের উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্ব্বে সুয়েজখাল, দক্ষিণে মরুভূমি এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের সংলগ্ন একটি হ্রদ। এই হ্রদের কোণেই ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর বন্দর অবস্থিত।

সহরের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দেশীয় লোক-জনকে দেখিতে লাগিলাম। পুরুষেরা সকলেই 'গালাবি' নামক একপ্রকার পোষাক পরে; উচ্চ নিম্ন সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই ইহা সাধারণ পোষাক। ভারতীয় মুসল-মানেরা আচ্‌কান চাপকান চোগা ইত্যাদি ব্যবহার করে; ইহা সেরূপ নয়, ইহা গলা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝুলিতে থাকে; গলার নীচে বুকের সম্মুখে কিছু কাটা, গেঞ্জিফ্রকের মত পরিতে হয়; চাপকানাদিতে কোটের মত বোতাম থাকে—এই গালাবিতে তাহা নাই। রমণীদিগের পোষাকও বিচিত্র। তাহারা সর্ব্ব অঙ্গ আবৃত করিয়া চলা-ফেরা করে। কাল রঙের এক প্রকার শাল তাহাদের আবরণ। মুখও তাহাদের ঢাকা। ইহাদের নাক ও মুখের উপর একটা লম্বা রুমাল ঝুলান, তাহাতে মাত্র চোখ দুটি বাহির হইয়া থাকে। নাকের উপর দিয়া একটা সোনার নল কপাল হইতে ঝুলিতে দেখা গেল। সকলের পায়েই দেশীয় জুতা।

রাস্তার স্থানে স্থানে দেখিলাম সরবৎ বিক্রী হইতেছে। ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশে যেমন চক্রযুক্ত গাড়ীর উপর জিনিষপত্র রাখিয়া ফেরিওয়ালারা সেইটা ঠেলিয়া লইয়া যায় এবং তাহা হইতে বিক্রী করে, এখানে সরবৎ বেচিবার প্রথাও সেইরূপ। গাড়ীর মধ্যে আমরা ইহাদের জলপাত্র

দেখিয়া আমাদের কমণ্ডলুর কথা স্মরণ করিলাম। এগুলি বদনার মত একেবারেই নয়। পিত্তলের কমণ্ডলুতে করিয়া এখানকার মুসলমান জনগণ জলপান করিতেছে দেখা গেল।

সহর দেখিয়া আমরা রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিলাম, কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ। সহরের অন্যান্য বাড়ীগুলি ইট ও পাথরে প্রস্তুত। নগরে ও বন্দরে যত মিশরীয় লোক দেখিলাম সকলেরই শরীর হৃষ্টপুষ্ট, চেহারায় দুর্ব্বলতার কোন লক্ষণ নাই, ইহারা সাধারণতঃ দীর্ঘকায় এবং প্রায়ই
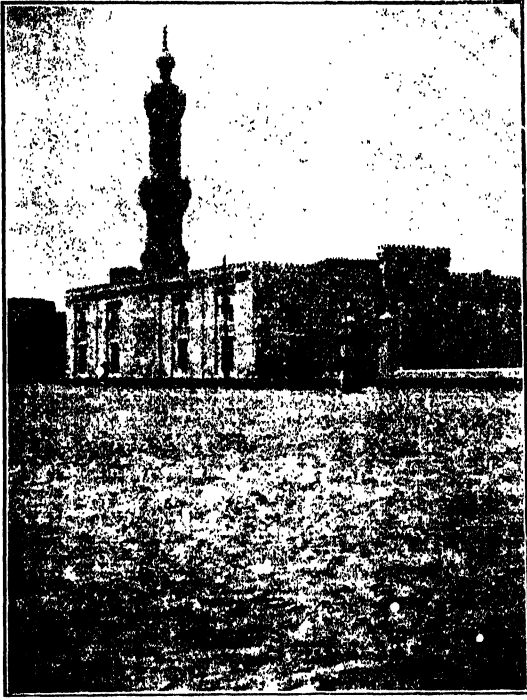
পোর্টসৈয়দ—মসজিদ।

শ্বেতাঙ্গ। চুলের রং কিছু কাল। ইহাদের লাল টুপি না থাকিলে ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জ হইতে পৃথক্ করা কঠিন। এই টুপিকে ফেজ্ বলে। পোর্ট সৈয়দে কলিকাতার সাধারণ পাল্কীগাড়ী বা যুক্তপ্রদেশ ও মহরাষ্ট্রের টোঙ্গা দেখিলাম না—বোম্বাই নগরের ন্যায় ফিটন ও ভিক্টোরিয়া এখানকার বিশেষত্ব।

কাইরো যাইবার জন্য ডাকগাড়ীতে চড়িলাম। ঠিক দার্জ্জিলিঙ্গ মেলের ন্যায় ইহার বন্দোবস্ত। এক কামরা হইতে যে-কোন কামরায়ই গাড়ীর ভিতরকার বারান্দা দিয়া যাওয়া যায়, প্লাট্‌ফর্ম্মে নামিবার প্রয়োজন হয় না। ভোজনালয়ের জন্য একটা স্বতন্ত্র বৃহৎ কামরা গাড়ীর সঙ্গেই সংলগ্ন—সেখানে যাইবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

ফরাসী ও আরবী সংবাদপত্রের প্রাধান্য দেখিলাম। আমরা একটা ইংরেজী পত্র কিনিয়া লইলাম। এক নব-বিবাহিত ইতালীয় দম্পতি আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য বহু ইতালীয় পুরুষ ও রমণী ষ্টেসনে আসিয়াছেন। ইহাঁরা পার্শীদের মত উচ্চ টুপি পরিধান করেন। দেখিলাম সকলেই একটা ঝুলি হইতে চাউল বাহির করিয়া নববধূর উপর বর্ষণ করিতেছেন। আমাদের কামরায় একজন প্যাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ইতালীয় এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তিনি কিছু কিছু ইংরেজী বলিতে পারেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি। তিনি বলিলেন, 'বিবাহের উৎসব—চাউল বিকিরণ মঙ্গলসূচক অনুষ্ঠান।' আমি বলিলাম—"বিবাহে গুড়মাখা চাউল এবং সাধারণ মঙ্গলকর্ম্মে খৈ ছড়ান হিন্দুরও কায়দা।" তিনি হাসিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। সুয়েজ খালের পশ্চিম কূলে কূলে রেলপথ। জাহাজ হইতেই ইহা দেখিয়াছিলাম। আমরা ভূমধ্যসাগরের দিক হইতে সোজা দক্ষিণ যাইতেছি। এজন্য খাল এখন আমাদের বামে। জাহাজ হইতে কিনারায় যে গাছপালা দেখিতে পাইতেছিলাম এক্ষণে সেইগুলির ভিতর দিয়া আমরা যাইতেছি। আমাদের উভয় পার্শ্বেই সবুজ তৃণ পত্র গাছ গাছড়া। গাড়ী হইতে খালের নীল সবুজ জল সম্পূর্ণ দেখা যায়—অপর কিনারাও দেখিতে পাইতেছি—তাহার পর এশিয়ার অনন্ত মরুভূমি।

আমাদের বামদিকে রেলওয়ে ষ্টেসনসমূহ খালের উপর অবস্থিত। রাণীগঞ্জের টালির ন্যায় টালি দ্বারা বাঙ্গলো গৃহের ছাদ নির্ম্মিত। প্রাচীরসমূহ কাষ্ঠময়।

ইংরেজী সংবাদপত্রের নাম The Egyptian Morning News. নামের সঙ্গে এক পংক্তি ব্যাখ্যাও আছে "in support of Egyptian interests." অর্থাৎ
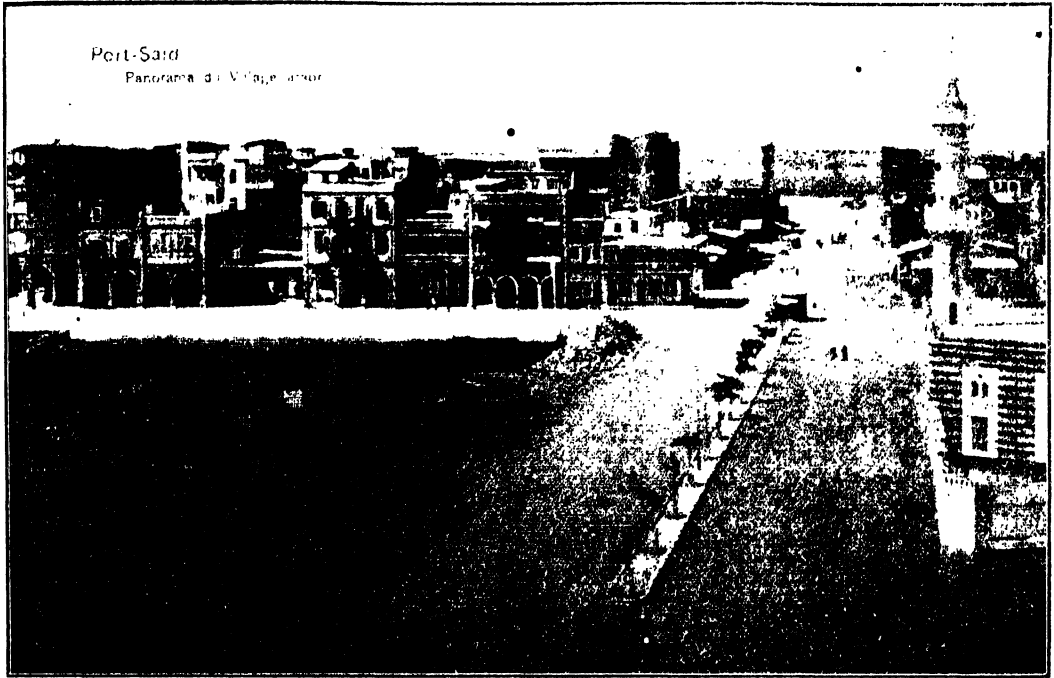
ভূমধ্যসাগরের কূলস্থিত আরবমহাল্লা—পোর্টসৈয়দ।

মিশরবাসীর স্বার্থ পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এই সংবাদ-পত্র প্রচারিত। দেখিয়াই মনে হইল কলিকাতার 'Statesman"এর কথা—যাহার অপর নাম 'ভারতবন্ধু' বা "Friend of India." আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়। পরে একজন মিশরীয় উকালের সঙ্গে আলাপে বুঝিলাম—কাগজটা ইংরেজ কর্ত্তৃক পরিচালিত—এবং "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" ভাবে সম্পাদক ৮।১০ বৎসর হইতে মিশরের পরম হিতৈষী সাজিয়া কাগজ চালাইতেছেন।

কাগজে পড়িলাম এসিয়ামাইনরের স্মার্ণা নগরে বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জন আরব্ধ হইয়াছে। মুসলমানের প্রস্তুত দ্রব্য ভিন্ন মুসলমানেরা আর কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবে না—এই প্রতিজ্ঞা প্রচারিত হইতেছে। বক্তারা নানা স্থানে বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশী আন্দোলন পরিপুষ্ট করিতেছেন।

আর দেখিলাম অষ্ট্রীয়া দেশের ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫০জন ছাত্র তাঁহাদের অধ্যাপকের সঙ্গে মিশর-পরিদর্শনে আসিয়াছেন।

দুই তিনটা ষ্টেসন পার হইতে হইতেই দেখি—উদ্ভিদ্ কমিয়া আসিতেছে—ক্রমশঃ বিরল হইল। আমরা খালের ধারে ধারেই চলিতেছি—কিন্তু বাগান ও চাষ আবাদ এদিকে এখনও বিস্তৃত হয় নাই। আমাদের চারিদিকেই মরুভূমি মাত্র। রাজপুতনার ও সিন্ধুদেশের কোন কোন অংশে ইহা অপেক্ষা ভীষণ মরুভূমির মধ্য দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

দণ্টাখানেকের কিছু বেশী সময়ে ইস্মাইলিয়া নগরে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। সুন্দর নব-নির্ম্মিত নগর। বাগান, মাঠ ইত্যাদিতে স্থানটা মরুদেশের উর্ব্বর ভূমির ন্যায় দেখাইতেছে। ভারতবর্ষের গাভী, ছাগল, মেষ, মুরগী ইত্যাদি এখানে দেখা গেল। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ নিউবিয়ান জাতীয় লোকও অনেক দেখিলাম।

এইখানে আমাদের গাড়ী সুয়েজ খাল ছাড়িয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলিল—আমাদের বামে তিম্‌সা হ্রদ। এই হ্রদের ভিতর দিয়া সুয়েজ খাল প্রবাহিত হইতেছে। এখান হইতে আমরা নাইল খাল দেখিতে পাইলাম।

এই খালের পার্শ্বে চষা জমি—সবই আমাদের বাম দিকে। বলদের সাহায্যে সাধারণ লাঙ্গলে এখানে চাষ চলিতেছে। উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অশ্ব ইত্যাদির উপর চড়িয়া লোকেরা চলাফেরা করিতেছে। এই সবুজ উদ্যান ও আবাদভূমির দক্ষিণে বালুকারাশি সমুদ্রের ন্যায় চক্চক্ করিতেছে। আমাদের ডাহিনে অর্থাৎ উত্তর দিকেও কেবল মরুভূমি।

আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেই চলিতেছি। বাইবেলের সুবিখ্যাত "গশেন" ভূমি আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে।

চাষীরা স্ত্রীপুরুষে কর্ম্ম করে দেখিতেছি। সকলেই সর্ব্বদা পূরা পোষাক পরিয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের কৃষকগণের ন্যায় ইহারা খালি গায়ে মাঠে কাজ করে না। খেজুর গাছ, স্থানে স্থানে কলাগাছ ইত্যাদিই বড় গাছের মধ্যে বেশী দেখা যায়। চষা জমি কৃষ্ণবর্ণ।

ইস্মাইলিয়া-নগরে আমরা সুয়েজের রেলপথ দক্ষিণে ছাড়িয়া আসিয়াছি। এক্ষণে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আসিয়া আবু হাম্মাদ নগর অতিক্রম করিয়া চলিলাম। এখন হইতে অতিশয় উর্ব্বর ক্ষেত্র দিয়া যাইতেছি। সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি ব্যতীত ভারতবর্ষে এরূপ সুশ্রী ও কোমল এবং নয়ন-তৃপ্তিকর স্থান আর আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের উভয় পার্শ্বেই যতদূর দৃষ্টি পড়ে কেবল চষা জমি দেখিতেছি। পীত গোধূম শস্য, কৃষ্ণবর্ণ তুলার জমি, গবাদির জন্য সবুজ ঘাস এবং শাক-শব্জী—এই-সমুদয় নানা রঙ্গে রঞ্জিত কৃষিক্ষেত্র আমাদের চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই দৃশ্য ভুলিয়া যাওয়া কঠিন। এমন ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মনোরম স্থান জগতে বোধ হয় বেশী নাই। মিশরীয় বদ্বীপের এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সত্য সত্যই বড়াই করিতে পারে—

"ধনধান্য-পুষ্পে-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা॥"

অবশ্য মিশর যে "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" সে বিষয়ে ত কোন সন্দেহই নাই।

গাড়ী জাগাজিগ্ ষ্টেসনে আসিল। ইহাই এই পথে সর্ব্বপ্রধান নগর। ইহা বড় বড় কারবারের কেন্দ্র। রেলপথে চলিতে চলিতে দেখিলাম—বদ্বীপের মধ্যে নগর পল্লী ইত্যাদি অতি ঘনসন্নিবিষ্ট। জনপদগুলি খুবই লাগালাগি। নগরের গৃহসমূহ ইষ্টক- ও প্রস্তর-নির্ম্মিত। পল্লীগ্রামের গৃহ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। বোধ হয় বাঁশ বা চাটাইয়ের বেড়ার দুই দিকে বালি লেপিয়া দেওয়াল নির্ম্মিত হয়। কি নগর, কি পল্লী, কি ইষ্টকনির্ম্মিত ভবন, কি মৃত্তিকাময় কুটীর, সকল গৃহ নির্ম্মাণেই এক কায়দা অনুসরণ করা হইয়াছে। গৃহমাত্রেই চতুষ্কোণ। জ্যামিতির নিয়মে যেরূপ ক্ষেত্র নির্ম্মিত হয়, এই গৃহগুলি সেইরূপ। বারান্দা

মিশরীয় রমণী।

প্রায়ই নাই—ভূমির উপর গৃহসমূহ মস্জিদের ন্যায় দণ্ডায়মান। দেওয়াল চুনকাম করা অথবা মস্জিদের নিয়মে চিত্রিত। সকল গৃহই এই ধরণে গঠিত।

আমরা কাইরো নগরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমাদের দক্ষিণে কাইরো এবং পূর্ব্বে ইহার সন্নিহিত পল্লী হেলিয়ো পোলিস। এই পল্লীতে মিশরের খেদিভ সাধারণতঃ বাস করেন। এই দুই নগরের পশ্চাতে শক্ত

বালুকাময় পর্ব্বত দেখা যাইতেছে। যেন পর্ব্বতের পাদদেশেই এই দুই জনপদ অবস্থিত।

রেলওয়ে ষ্টেসন ভারতবর্ষের বৃহৎ ষ্টেসনগুলির সমান। তবে নির্ম্মাণপ্রণালী এবং কারুকার্য্য সমস্তই মিশরীয় ধরণের। চতুষ্কোণ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের নিয়মানুসারে সৌধ নির্ম্মিত, দেওয়াল দেখিয়া মসজিদের ভিতরকার প্রাচীর বলিয়া কিছু ভুল হয়। সমগ্র মিশরদেশের অন্যান্য গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালীই এই ষ্টেসনঘরের জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য নগরের শোভাসম্পদ ইহাতে একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। সৌন্দর্য্য হিসাবে কলিকাতা ও বোম্বাই নগরদ্বয়ের নির্ম্মাণ অতি জঘন্য শ্রেণীর অন্তর্গত। আমাদের জাহাজে এক ওলন্দাজ চিত্রকর বোম্বাই নগরের গৃহ-নির্ম্মাণব্যাপারে এই খিচুড়ি কায়দার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি গোয়ালিয়ার নগরের সৌধনির্ম্মাণপ্রণালী দেখিয়া সন্তুষ্ট. কারণ সেখানকার শিল্পকার্য্য এক বিশিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয়, সকল গৃহই এক নিয়মে প্রস্তুত। কাইরো নগরে এবং মিশরীয় বদ্বীপের পূর্ব্ব অঞ্চলে সাধারণতঃ গৃহ-

মিশরীয় কৃষিক্ষেত্রের কূপ।
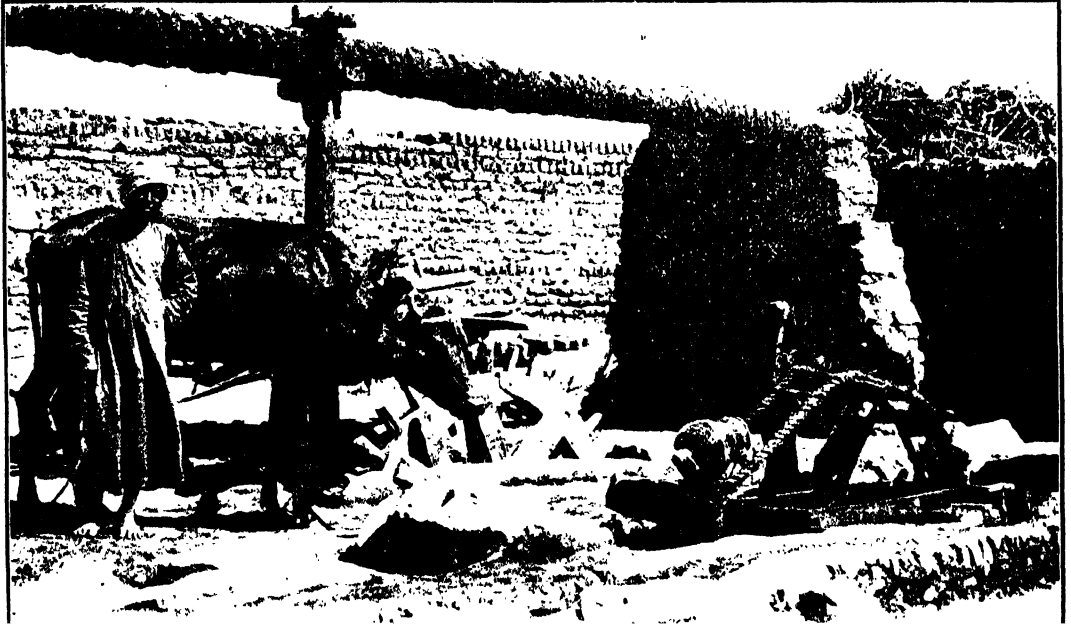
সহরে প্রবেশ করিয়াই দেখি—এই নির্ম্মাণ-প্রণালীই সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। কি আফিস, কি হোটেল, কি দোকান, কি কারখানা, সর্ব্বত্র এক ছাঁচ, এক ধরণ, এক কায়দা। ইহাতে কলা-কৌশলের ঐক্য ও সামঞ্জস্য সর্ব্বদা চোখে পড়ে। আধুনিক ভারতবর্ষের গৃহনির্ম্মাণে কোন বিশিষ্ট কায়দার অনুসরণ করা হয় না। কেহ প্রাচীন প্রথায়, কেহ নবাবী আমলের কায়দায়, কেহ ইউরোপীয় মধ্যযুগের নিয়মে, কেহ 'গথিক্ ষ্টাইলে,' কেহ গ্রীক 'ষ্টাইলে', যাহার যাহা খুসী সে সেইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করে।

নির্ম্মাণ-কৌশলের যেরূপ সামঞ্জস্য, ঐক্য ও শৃঙ্খলা দেখা যায় তাহাতে গোয়ালিয়ারের কথাই মনে পড়িবে। অবশ্য গোয়ালিয়ারে ভারতীয় হিন্দুকায়দা, আর এখানে মিশরীয় ফরাশী প্রভাবযুক্ত মুসলমানী কায়দা. এই যা প্রভেদ।

রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট কাইরোর বাড়ীঘরগুলি দেখিয়া বোম্বাই সহরের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্ ষ্টেসনের সমীপবর্ত্তী বাড়ীঘরের কথা মনে পড়ে। কাইরো এক-প্রকার পাশ্চাত্য ইউরোপীয় সহর বলিলেই চলে।
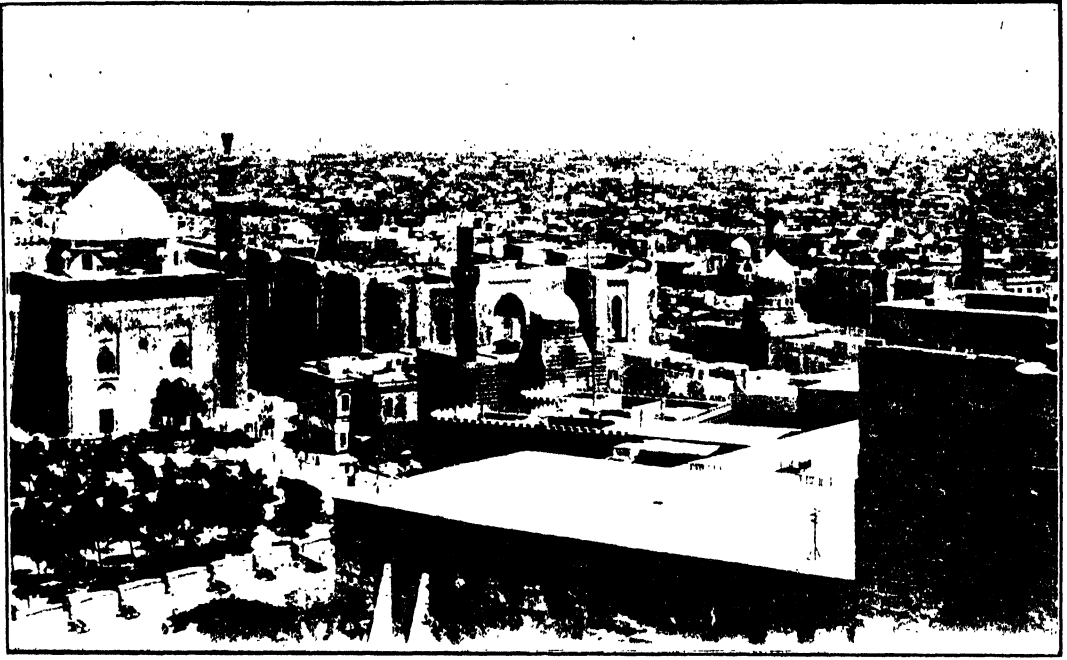
কাইরো নগরের মুসলমানপাড়া।

কলিকাতায় বা বোম্বাই নগরে এতগুলি বড় বড় প্রাসাদ-তুল্য পাশ্চাত্য হোটেল, আফিস, দোকান ইত্যাদি নাই। সহরের অধিকাংশই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বড় বড় ফুটপাথ। এরূপ প্রশস্ত খট্‌খটে রাস্তা কলিকাতায় চৌরঙ্গী রোড ভিন্ন আর একটিও নাই। বোম্বাই নগরেও একাধিক দেখি নাই।

এই সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু বাস্তু-শাস্ত্রের নিয়মে গঠিত জয়পুর-নগরের নির্ম্মাণকৌশল উল্লেখ করা যাইতে পারে। সৌন্দর্য্য, সামঞ্জস্য, বাহ্যশোভা, ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দুজাতির কিরূপ দৃষ্টি ছিল, জয়পুরে তাহা বুঝা যায়। জয়পুর দেখিয়া ভারতীয় সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান অনুমান করা যায়। তাহার মধ্যে গৃহ-রচনা-কৌশলের এবং নগর-নির্ম্মাণ-রীতির ঐক্য সবিশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। বোম্বাই কলিকাতা ইত্যাদির তুলনায় জয়পুর অত্যুচ্চ কলাজ্ঞানের পরিচায়ক। লক্ষ্ণৌনগর-নির্ম্মাণেও ভারতীয় মুসলমানী কায়দার একাধিপত্য দেখিয়া পুলকিত হওয়া যায়। পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত মিশরীয় মুসলমানী কায়দায় নির্ম্মিত কাইরো নগর লক্ষ্ণৌ নগর হইতে স্বতন্ত্র নিয়মে স্থাপিত। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে একটা নিজস্ব সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার জ্ঞান পরিস্ফুট। লক্ষ্ণৌর প্রধান লক্ষণ গম্বুজ ও মিনার বা স্তম্ভ। ভারতীয় সকল মুসলমানী সৌধ নির্ম্মাণেই এই রীতি অবলম্বিত। কিন্তু কাইরো নগর গঠনে গম্বুজের বাহুল্য নাই দেখিতেছি। স্থানে স্থানে গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ আছে মাত্র—এবং মাঝে মাঝে মিনার দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এগুলি বোধ হয় এখানকার বিশেষত্ব নয়।

কাইরো নগরে অসংখ্য প্রকার ইউরোপীয় ও এশিয়াবাসী জাতিপুঞ্জের বাস ও কারবার। কাজেই ডাচ্, গ্রীক, ইতালীয়, ব্রিটিশ, ইত্যাদি নানা শ্রেণীর গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালীর প্রভাবও লক্ষিত হয়। কিন্তু সকলগুলির ভিতর দিয়া মোটের উপর একটা মুসলমানী রীতির পরিচয় পাইয়া থাকি।

দ্বিতীয় দিবস—মুসলমানের কাইরো।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর Dr. R. Von Wettsteinএর সঙ্গে দেখা করিলাম। ইনি প্রায় ৪০০ ছাত্র সঙ্গে করিয়া মিশর ভ্রমণে আসিয়াছেন। ইনি

কাইরোর জনসাধারণ।

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের অধ্যাপক—ইংরেজী জানেন না। আমাদের মিশর-প্রদর্শক মহাশয় দোভাষী—তিনি ফরাসীতে কথা বলিয়া আমাদের মধ্যে আলাপ করিয়া দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন, ভাষা ইত্যাদি বিষয় চর্চ্চার ব্যবস্থা আছে কি?" তিনি বলিলেন "বড় বেশী না। একজন প্রাচ্যদেশীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপক আছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাঁহার নাম অধ্যাপক D. Schroider." আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছাত্রগণ যে বিদেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে তাহার খরচ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনভাণ্ডার হইতে বহন করা হইবে?" তিনি বলিলেন "কিছু খরচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রমণ-ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হয়। ছাত্রদের নিজেও কিছু খরচ করিতে হয়।"

আলাপে জানা গেল—এই ছাত্রদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটই প্রায় ⅓ অংশ। ইহাঁরা মিশর হইতে সীরিয়া, প্যালেষ্টিন, ক্রীট, কাণ্ডিয়া, ইতালী ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিবেন। প্রতিবৎসরই এইরূপ ৪০০।৫০০ ছাত্র ইউরোপের নানাদেশে পর্য্যটন করিতে বাহির হইয়া থাকে। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে এখনও কেহ ভারতবর্ষে আসে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বসমেত ১০,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করে।

আমরা আধুনিক কাইরো-নগরের একটা জর্ম্মান হোটেলে বাস করিতেছি। এই অঞ্চলের বাড়ীঘরগুলি দেখিতে সবই নূতন—এই-সমুদয় একশত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মিশরীয় সুলতান মহম্মদ আলির আমলে এই বিভাগের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিলাম। ঐ দিকে মিশরের স্বদেশী মহল্লা—প্রাচীন কাইরো-নগরের জনপদ।

যাইতে যাইতে একপ্রকার গাড়ী দেখিলাম। ইহাতে ৮।১০ জন লোক বসিতে পারে। ট্রামগাড়ীর মত টিকেট লইয়া আরোহীরা এই গাড়ীতে চড়ে। গলিতে গলিতে এইগুলি যায়। সুতরাং এক হিসাবে এসমুদয় ইলেকট্রিক ট্রামের প্রতিদ্বন্দ্বী—অন্য হিসাবে ট্রাম অপেক্ষা ইহার

দ্বারা বেশী উপকার। সাধারণতঃ দেশীয় লোকেরা এই ভাড়াটিয়া গাড়ী ব্যবহার করে! ইহার নাম "সুয়ারেস"।

পূর্ব্বভাগের এক স্থানে বিশাল মস্‌জিদ-বিদ্যালয়। ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং পারী, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ হইতেও ইহা প্রাচীন। ইহাতে ২৫,০০০ ছাত্র ও শিক্ষক পঠন পাঠন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাই প্রধান। সমস্তই প্রাচীন রীতিতে নির্ব্বাহিত হয়। এই মসজিদের চারিদিককার আবহাওয়া মুসলমানী ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতার অনুকূল। ভারতবর্ষের বড় বড় মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যেরূপ হিন্দুধরণের দোকান-বাজার, ধর্ম্মশালা, ইত্যাদি অবস্থিত, এই মস্‌জিদ দেখিয়াও সেইরূপ ধারণা হয়। কাশীর বিশ্বেশ্বর-মন্দির, পুরীর জগন্নাথ-মন্দির, কামাখ্যার মাতৃমন্দির, ইত্যাদি মন্দিরের ন্যায় এই মস্‌জিদ-বিদ্যালয় নানাপ্রকার জাতীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে পরিবেষ্টিত। ইহার আবেষ্টন এবং চারিদিককার ভাব ধারণা কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালী সবই মুসলমানী রীতির পরিপোষক।

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি পার হইয়া এই মস্‌জিদে আসিতে হয়। আমরা প্রায় বেলা ৩টার সময় পশ্চিম দরজায় উপস্থিত হইলাম। তখন নামাজের সময়। আমাদের মাথায় পাশ্চাত্য টুপি ছিল—এজন্য আমরা প্রবেশ করিতে পারিলাম না। অন্য সময়ে ভিতর দেখিতে পাইব আশা পাইলাম।

এই মস্‌জিদ-বিদ্যালয়ের অনতিদূরে সৈয়দ হাসান-মস্‌জিদ। কারবালার যুদ্ধে হাসানের মৃত্যুর পর তাঁহার মস্তক আরব হইতে মিশরে আনা হইয়াছিল। এই স্থানে মস্তকের কবর। ইহার মধ্যেও ইউরোপীয়েরা প্রবেশ করিতে পারে না। মহরমের সময়ে মুসলমানেরা দলে দলে আসিয়া এখানে শোকপ্রকাশ করে। শোকপ্রকাশের সময়ে ইহারা এত প্রচণ্ড ও অধীর হইয়া পড়ে যে ইহাকে সৈন্য দ্বারা রক্ষা করা হইয়া থাকে। তাহা না হইলে শোকার্ত্ত মুসলমানেরা এই সৌধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অগ্রসর হয়।

কাইরোর স্বদেশী বাজার।

সৈয়দ হাসানের নিকটেই "কাদির প্রাসাদ"। ইহা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। কেবল দুই দিকের সামান্য দুই অংশ মাত্র বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের ও ফটকের খানিকটা দেখিতে পাইলাম। আর ইহারই সংলগ্ন দক্ষিণদিকে একটা সুন্দর উচ্চ হল দেখা গেল। এই

হল দোতলায় অবস্থিত। নীচে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা। এই হলে বসিয়া বিচারকার্য্য বা খোসগল্প হইত। হল বেশ সুচিত্রিত। সোনালি অক্ষরে কোরানের বয়েৎ ইহার দেওয়ালে এবং ভিতরকার ছাদে লিখিত, এই লেখাগুলিই আবার সৌধের অলঙ্কার-স্বরূপ। "কাদি" প্রাচীন আমলের রাজকর্ম্মচারীর নাম। বিবাহভঙ্গ-ঘটিত বিচার-কার্য্যের জন্য কাদি নিযুক্ত হইতেন। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনটি সেই বিচারালয় ছিল।

পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের বহির্ভাগে দেখিলাম—এক কোণে একটা জলের ঘর রহিয়াছে—পথিক ও মস্‌জিদের লোকজনের জন্য এখানে জল সঞ্চিত হইত। এই গৃহের ভিতরকার ছাদ সোনালি অলঙ্কারে সুচিত্রিত। প্রাচীরের অন্যান্য ভাগে কতকগুলি স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। এই-গুলি একএকখানা পাথরে নির্ম্মিত—গোলাকার ও বেশ মসৃণ। স্তম্ভের উপরিভাগে প্রাচীন গ্রীসের "কোরিন্থীয়" অথবা "ডোরিক" রচনা-রীতির কারুকার্য্য। সন্ধান
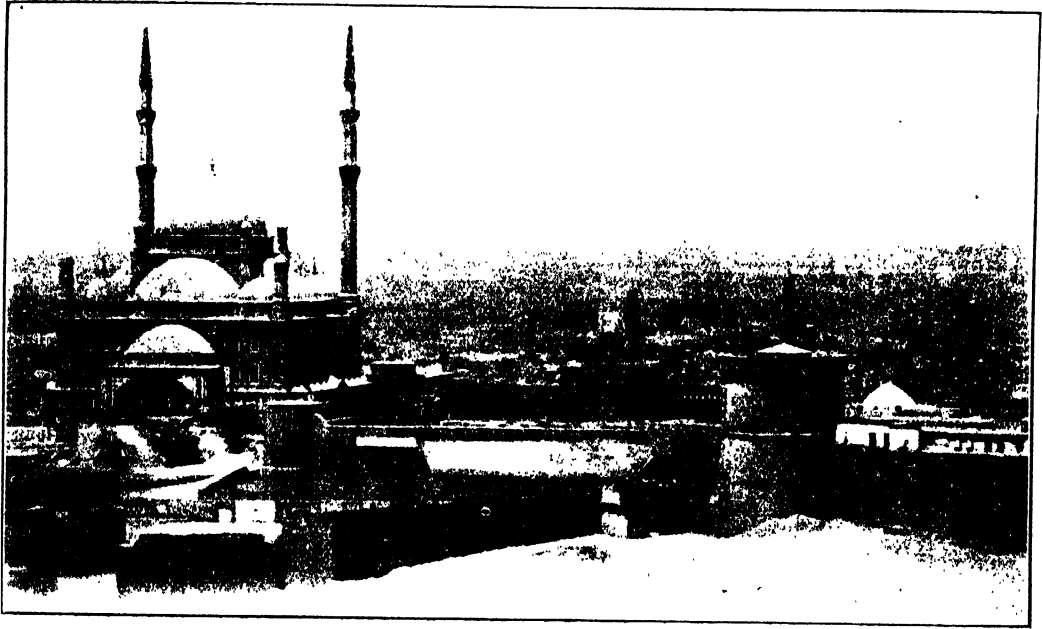
প্রাচীন সালাদিন দুর্গে মহম্মদ আলির মর্ম্মর-মসজিদ।

এখান হইতে অল্প দূরে কলাবন সুলতানের মসজিদ, কবর এবং পাগলা-গারদ বা হাঁসপাতাল। এই সুলতান একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকও ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি রোগীদিগের জন্য একটা হাঁসপাতাল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই হাঁসপাতাল মসজিদের সংলগ্ন ছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কবরও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই-সমুদয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি "ওয়াকুফ্" বা দেবোত্তর করেন। মধুর ব্যবসায় হইতে যে আয় হইত তাহার কিয়দংশ এই মস্‌জিদের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছিল। লোকে এই সৌধগুলিকে পাগলা-গারদ-মসজিদ নামে জানে।

লইয়া জানিলাম—মিশরে প্রাচীনকালে অনেক খ্রীষ্টান গির্জ্জা ছিল। সেই-সকল গির্জ্জায় রোমান এবং গ্রীকেরা স্বজাতীয় গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী অবলম্বন করিতেন। সেই-সমুদয় বিনষ্ট করিয়া সেখান হইতে মালমসলা, ইষ্টক, প্রস্তরস্তম্ভ, অলঙ্কার ইত্যাদি মুসলমানেরা বহন করিয়া আনিত। পরে মুসলমানী প্রাসাদ, ধর্ম্মমন্দির, কবর ইত্যাদির গঠনে সেই-সমুদয় ব্যবহৃত হইত। পাগলা-গারদ মসজিদের বাহিরে ও ভিতরে এইরূপ অনেক গ্রীক ও রোমান গির্জ্জার উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে। নানাপ্রকার স্তম্ভই প্রধান। ভারতবর্ষেও মুসলমানেরা হিন্দু মন্দির-সমূহ ধ্বংস করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মসজিদ ও কবর নির্ম্মাণ

করিত। মন্দিরের উপকরণগুলিই মুসলমানী সৌধের মসলায় পরিণত হইত। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ তাহার সর্ব্বপ্রধান সাক্ষী। কাইরোয় এই মসজিদ দেখিয়া আদিনার কথা মনে পড়িল।

কলাবন মসজিদ প্রস্তরনির্ম্মিত। পূর্ব্বদিকের ফটক দিয়া প্রবেশ করিলাম। প্রবেশপথ বেশ প্রশস্ত ও উচ্চ গৃহের ন্যায়। গ্রীষ্মকালে রোগীরা এই স্থানে বিশ্রাম শয়নাদি করিত। এই পথের ছাদে কড়ি বরগা ইত্যাদি নাই।

যীশুজননীর সিকামোর বৃক্ষ - হেলিয়োপোলিস।

কবরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে অতি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে চক। চকের স্তম্ভগুলিতে খ্রীষ্টীয় গ্রীক সাম্রাজ্যের রচনারীতি পরিস্ফুট। এই-সমুদয় অন্য স্থান হইতে আনীত হইয়া এই মসজিদে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কবরের গৃহ বা mausoleum প্রস্তরনির্ম্মিত; কঠিন গ্রানাইট পাথর, ঈষৎ ধূসর বর্ণ; মিশরের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত আসোয়ানের পর্ব্বতে এই পাথর পাওয়া যায়। আদিনা মসজিদের গ্রানাইট পাথর কৃষ্ণবর্ণ। কলাবনের পাথর সেরূপ নয়।

মসলিয়ামের ভিতর চারিটি প্রকাণ্ড উচ্চ এবং স্থূল স্তম্ভ উপরের গম্বুজ ধারণ করিয়া আছে। স্তম্ভগুলির পরিধি দুইজন লোকে বহু প্রসারিত করিয়া বেষ্টন করিতে পারে। এক একখানা বৃহদাকার অখণ্ড প্রস্তরে প্রত্যেকটি নির্ম্মিত।

গম্বুজের ভিতরকার অংশ অষ্টকোণবিশিষ্ট। উল্লিখিত চারিটি গোলাকার স্তম্ভ ভিন্ন অপর চারিটি চতুষ্কোণ ইষ্টকাদিনির্ম্মিত স্তম্ভ এই গম্বুজের খুঁটিস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। এই আটটি স্তম্ভের ভিতর কাষ্ঠনির্ম্মিত চতুষ্ক। চতুষ্কের দৈর্ঘ্য উত্তরে দক্ষিণে। সিকামোর বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা এই সুন্দর অলঙ্কৃত আবেষ্টন বা চতুঃসীমা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আবেষ্টনের ভিতরে কবর অবস্থিত।

সমস্ত মসলিয়ামের প্রাচীর ও ছাদ নানা অলঙ্কারে ভূষিত। মোটা মোটা সোনালি অক্ষরে কোরানের বচন লিখিত। স্থানে স্থানে নানা প্রকার মণি মাণিক্য প্রস্তরটুকরা দ্বারা প্রাচীরগাত্র অলঙ্কৃত। তাজমহলে এইরূপ প্রস্তরখচিত অলঙ্কার বেশী দেখা যায়। এই অলঙ্কার-রচনা-প্রণালী জ্যামিতিক ক্ষেত্রের নিয়মানুযায়ী। অষ্টকোণ, ষট্‌কোণ, পঞ্চকোণ ইত্যাদি ক্ষেত্রের বাহুল্য দেখিতে পাইলাম। ভারতীয় মুসলমানী সৌধেও এই অলঙ্কার-রচনা-প্রণালী সুপ্রচলিত।

কলাবনের কোন কোন স্থানে দেখিলাম সোজা সোজা রেখা দ্বারা প্রাচীর চিত্রিত। রেখাসমূহ নানারঙ্গের প্রস্তরে গঠিত। আমাদের গাইড্ মহাশয় বলিলেন "ঐ রেখাগুলি কেবল মাত্র জ্যামিতিক আকৃতিবিশিষ্ট অলঙ্কার নয়। এই-সমুদয় কুফিক ভাষার বর্ণলিপি। প্রত্যেক দুই তিন রেখা দ্বারা আল্লার নাম লিখিত হইয়াছে। আরবী অক্ষর বক্রাকৃতি—সেগুলি প্রধানতঃ কোরানের বয়েৎ। কিন্তু এই সোজা রেখাগুলির দ্বারা কেবলমাত্র আল্লার নাম প্রচারিত হইতেছে।"

আরও কয়েক স্থানে কতকগুলি চিহ্নস্বরূপ অলঙ্কার-রচনা দেখিলাম। এগুলির অর্থ বুঝা গেল না। গাইড্ বলিলেন, "আজকাল Freemason সম্প্রদায়েরা যেরূপ নানা প্রকার সঙ্কেত ও গুহ্য চিহ্ন ব্যবহার করিয়া
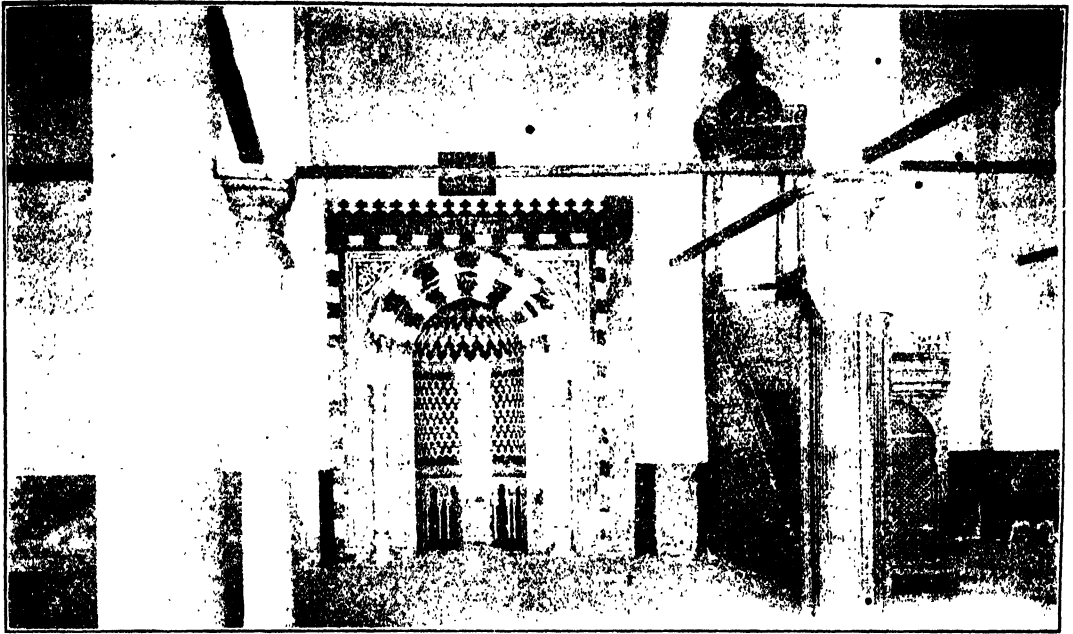
কাইরো সহরের সর্ব্বপুরাতন মসজিদ।

থাকে, এগুলি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত।" প্রাচীরের স্থানে স্থানে কতকগুলি নূতন ধরণের অলঙ্কৃতি দেখা গেল। ভারতবর্ষে মুসলমানী শিল্পে সেগুলি কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত মসজিদে নানা প্রকার রংবিশিষ্ট প্রস্তর, ধাতু, মণি, অক্ষর, রেখা ইত্যাদি অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ দেখায়। রংফলান অতি সুন্দর। এরূপ রঙের খেলা বেশী শিল্পকর্ম্মে দেখিতে পাই না।

কলাবনের পূর্ব্ব প্রাচীরের জানালা হইতে একটি জীর্ণ পুরাতন মসজিদ দেখিতে পাইলাম। ইহার নির্ম্মাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রাচ্য ভারতে যাহাকে গৌড়ীয় ইট বলে তাহা কেবল মাত্র গৌড়েরই বিশেষত্ব নয়। উত্তর ভারতের নানা স্থানে সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাল্কা ইট দেখিয়াছি। সেই ইট কাইরোর প্রাচীন মসজিদেও দেখিতেছি। এই দেশে ইহাকে রোমীয় ইষ্টক বলা হয়। প্রাচীনকালে দুনিয়ার সর্ব্বত্র কি একরূপ ইটই ব্যবহৃত হইত? কলাবন মসজিদের পূর্ব্ব প্রাচীরের "কিব্‌লায়" লক্ষ্য করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রত্যেক মসজিদ, কবর, মসলিয়ামেই "কিব্‌লা" থাকে। মক্কার "কাবা" যে দিকে অবস্থিত সেই দিকে মুখ করিয়া মুসলমানেরা নামাজ পড়িয়া থাকেন। মসজিদাদির সেই দিকের মধ্যভাগে দেওয়ালের ভিতর কিছু অর্দ্ধগোলাকার স্থান শিল্পীরা নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য। সেই স্থানের নাম "কিব্‌লা"। কিব্‌লাতে বসিয়া ধর্ম্মগুরু নামাজ আরম্ভ করিলে তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী জনগণ নামাজ পাঠ করেন। ভারতবর্ষ মক্কার পূর্ব্বে, এজন্য ভারতীয় মসজিদে কিব্‌লা পশ্চিম দিকে থাকে; ভারতীয় মুসলমানেরা পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া নামাজ পড়ে। কিন্তু মিশর মক্কার পশ্চিম দিকে, এজন্য এখানকার মসজিদে কিব্‌লা পূর্ব্বদিকে; মিশরীয় মুসলমানেরা পূর্ব্বদিকে মুখ রাখিয়া নামাজ পড়েন।

কলাবনের কিব্‌লার দুইদিকে তিনটা করিয়া গ্রানাইট প্রস্তরের স্তম্ভ আছে। গোলাকার অংশের কারুকার্য্য অতি চমৎকার। নানাপ্রকার মুক্তা মাণিক্য পক্বিরি ইত্যাদি ইহার গায়ে খচিত। নীল মণি, শ্বেত মুক্তা, কৃষ্ণ রক্ত ও পীত পক্বিরি এবং অন্যান্য ধাতুর টুকরা দ্বারা প্রাচীরের অলঙ্কার তৈয়ারী হইয়াছে।

ছাদের তলভাগ নানা রঙে চিত্রিত। সোনালি কাজের প্রভাবে সমস্ত কিব্‌লা উদ্ভাসিত। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মর্ম্মরপ্রস্তর কিবলার গাত্রে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই-সমুদয় ইহার একটা বিশেষত্ব।

এই কিব্‌লা সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিলাম। যাহারা সকল জিনিষ পীত দেখে, অথবা যাহাদের মাথাঘুরার ব্যারাম, তাহারা ডাহিনদিকের প্রস্তর তিনটিকে জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া অর্দ্ধগোলাকার অংশে প্রবেশ করিত। তাহার মধ্যে তাহারা লাটিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে বামদিকের গ্রানাইট স্তম্ভগুলির নিকট আসিত। সেই পাগলের নিদ্রা বেশী হইত না তাহাদিগকে ঘুম পাড়াইবার জন্য ইনি বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। তাহাদের শয্যাপার্শ্বে উৎকৃষ্ট গল্পকথকেরা কথা বা কাহিনী শুনাইত। অথবা নিকটবর্ত্তী কোন গৃহে বসিয়া বাদক ও গায়কেরা সঙ্গীত চর্চ্চা করিত। এইসকল গল্প ও গান শুনিতে শুনিতে রোগীরা ঘুমাইয়া পড়িত। তিনি আরও একটা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। রোগীদিগকে বিছানায় শোয়াইয়া তাহাদের পায়ের তলা মালিস করিবার ব্যবস্থা করিতেন। তাহাতেও সহজেই ইহাদের নিদ্রা আসিত।

ব্যাবিলনের কপ্টগির্জ্জা—যীশুজননীর আশ্রয়স্থান।

তিনটিকে আবার চাটিয়া তাহারা কাষ্ঠাবেষ্টনের মধ্যে কবরের নিকট যাইত। সেখানে একটা লাল প্রস্তর-ফলকে লৌহময় পদার্থ জলে ঘষিয়া তাহাদিগকে লাল-ধাতুমিশ্রিত জল পান করান হইত। শুনা যায় এই ঔষধে মাথাঘুরা পীত দেখা ইত্যাদি অসুখ দূরীভূত হইত।

সুলতান কলাবন এই চিকিৎসার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসাপ্রণালীর আরও কয়েকটা তথ্য গাইড্‌ মহাশয়ের নিকট শুনিলাম। যে-সকল

এই মসজিদের নানাস্থানে নানাপ্রকার স্তম্ভ দেখা গেল। এইগুলি অন্য স্থান হইতে আনা হইয়াছে। কোন কোন স্তম্ভ প্রাচীন মিশরীয় যুগের ধরণে প্রস্তুত। সেগুলির উপরে কোরিন্থীয় রীতির শিরোভাগ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কতকগুলি নূতন প্রকার অলঙ্কারও দেখা গেল। মোচার মত ত্রিকোণ অলঙ্কার প্রাচীরগাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর দ্বারা রচিত। দুই এক স্থলে সরু পাথরের সূত্রের দ্বারা দেওয়ালের উপর গাছের চিত্র লিখিত হইয়াছে।

কবর হইতে আমরা পাগলা-গারদের দিকে গেলাম। গারদের কোন অংশই বর্ত্তমান নাই। কেবল প্রশস্ত পথটা মাত্র রহিয়াছে—ইহার মেজে বাঁধান এবং ছাদও খিলানযুক্ত। এই পথকে গ্রীষ্মের সময়ে দিবাভাগে শয়ন-গৃহরূপে ব্যবহার করা হইত। পাগলা-গারদের এই প্রশস্ত পথে প্রবেশ করিবার সময়ে একটা প্রস্তরনির্ম্মিত জালের দিকে গাইড্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সেই জালের মধ্যে আরবী অক্ষর কৌশলের সহিত লিখিত হইয়াছে। তিনি পড়িয়া দিলেন—"আল্লা"।

কলাবনের মসজিদ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে অন্যান্য মসজিদের ন্যায় ওয়াকৃফ সম্পত্তির নিয়মে রক্ষিত হইতেছে। মিশর রাষ্ট্রে ওয়াকৃফ্ বিভাগের কার্য্যাবলীর জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রণা-সভা আছে। খেদিভ এই সভার নায়ক।

কলাবন দেখিয়া দেশীয় বাজারের ভিতর দিয়া চলিলাম। ভারতের যুক্তপ্রদেশের পুরাতন সহরগুলির প্রায় অনুরূপ। বাজার, দোকান, গলি, জিনিষপত্র, শাকশব্জী সবই প্রায় ভারতবর্ষের মত। তরকারীও আমাদের পরিচিত। দোকানীরা বড় বড় ফরশীর নলের সাহায্যে গুড়্গুড়ি হইতে তামাকু সেবন করিতেছে। এখানে পান জন্মে না, কাহাকেও পান খাইতে দেখিলাম না। এখানকার লোকেরা মাথায় বা গায়ে তেলও মাখে না।

বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে নগরের একটা পুরাতন প্রাচীর দেখিতে পাইলাম—তাহার একটা ফটকও পার হইতে হইল। প্রাচীন কালে ভারতের সর্ব্বত্রই নগরের চারিদিকে প্রাচীর থাকিত। কাইরো নগরেও ছিল বুঝিতেছি। কোন কোন গলিতে দেখিলাম—মাথার উপর বারান্দা ঝুলিতেছে, এবং দোতালার বা তিন তালার ছাদ বাড়াইয়া দিয়া গলির ছাদ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই ছাদের দ্বারা সূর্য্যের তাপ হইতে নীচের লোকেরা রক্ষা পায়। পথে বহু মসজিদ ও মসলিয়াম পড়িল। অনেকগুলিতেই গম্বুজ আছে।

খানিক পরে আমরা প্রাচীন দুর্গে প্রবেশ করিলাম। ইহা সুলতান সালাদিনের সময়ে নির্ম্মিত। পুরাতনের বড় বেশী কিছু অবশিষ্ট নাই—অধিকাংশই নূতন তৈয়ারী। আজকাল এখানে ইংরেজ-সৈন্য বাস করে। ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ৪০০০এর কিছু বেশী। মিশরে ইংরেজেরা শান্তি রক্ষার জন্য এই সৈন্য রাখিতে অনুমতি পাইয়াছেন। প্রতি রবিবার দুর্গে ইংরেজ-পতাকা উড়ান হয়—এবং শুক্রবারে মুসলমানী নিশান উড়িতে থাকে।

এই দুর্গ কাইরোর সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত—প্রায় পাহাড়ের মত উচ্চ ভূমির উপর ইহা নির্ম্মিত। এখান হইতে কাইরো-নগর অতি সুন্দর দেখায়। দুর্গের মধ্যে আমরা মহম্মদ আলির মসজিদ দেখিলাম। ইহাকে মর্ম্মর মসজিদ বলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহম্মদ আলি মিশরে নবজীবন সঞ্চারিত করিতেছিলেন। তিনি ইউরোপের নানা স্থানে মিশরীয় ছাত্র পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহারা ভাস্কর্য্য ও এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ফরাসী জাতির ও ফরাসী শাসনকর্ত্তাদিগের বিশেষ বন্ধুত্বও ছিল। এই কারণে ফরাসী প্রভাব তাঁহার আমলে মিশরে প্রবলরূপে প্রবেশ করে। এই মসজিদ আয়তনে দিল্লীর জুম্মা মসজিদের মত। আগ্রার সিকান্দ্রা হইতে ইহা বড়। মর্ম্মরের কার্য্য হিসাবে ইহাকে তাজমহলের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু শিল্পের রীতি হিসাবে ইহা ভারতীয় সৌধগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কনষ্টাণ্টিনোপল নগরের সেইণ্টসোফিয়া গির্জ্জা-মসজিদের অনুকরণে ইহা নির্ম্মিত।

মসজিদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে নূতন একপ্রকার জুতা পরিতে হইল। যে জুতা পায়ে ছিল তাহা ত্যাগ করিলাম না, দ্বাররক্ষকেরা মিশরীয় চটি-জুতার দ্বারা আমাদের জুতা আবৃত করিয়া দিল। আমরা মিশরের নৌকাতুল্য পীত স্বদেশী জুতা পায়ে দিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থলে হাত পা ধুইবার জন্য মর্ম্মরনির্ম্মিত জলের কল। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে বারান্দা, বারান্দার ছাদের উপর বারটা করিয়া অর্দ্ধ-গম্বুজ। এই গম্বুজসমূহের মাথায় ত্রিশূলাকার অর্দ্ধচন্দ্র। এক বারান্দায় একটা ঘড়ি। ফরাসী রাজা লুইফিলিপ মহম্মদ আলিকে ইহা উপহার দিয়াছিলেন।

পশ্চিমদিক হইতে মসলিয়ামে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—উৎকৃষ্ট কার্পেটে মেজে ঢাকা। প্রকাণ্ড হল—বোধ হয় আট হাজার লোক এক সঙ্গে বসিয়া নামাজ পড়িতে পারে। প্রায় দুইশত কাচের লণ্ঠন ছাদ হইতে ঝুলিতেছে, সকলের মধ্যখানে একটা প্রকাণ্ড মোম বাতির ঝাড় বোধ হয় ৩০০ ডালওয়ালা। ইহা অপেক্ষা ছোট কিন্তু বেশ বড় ঝাড় আরও ৮।১০টা হলের নানা স্থানে ঝুলিতেছে। ছাদ হইতে পিত্তলের শিকলে গোলাকার চক্র ঝুলান হইয়াছে। এই চক্রের সঙ্গে কাচের লণ্ঠনগুলি সংলগ্ন। এতদ্ব্যতীত বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থাও মসজিদের অভ্যন্তরে দেখিতে পাইলাম।

প্রধান গম্বুজ একটি। অর্দ্ধগম্বুজ চারিটি। পশ্চিম প্রাচীরে দুইটি প্রকাণ্ড মিনার। এই মিনার ও গম্বুজগুলি কাইরো-নগরের বহুদূর হইতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মসলিয়ামটা সমস্তই মর্ম্মরনির্ম্মিত। দেওয়াল ও ছাদ সুবর্ণের অক্ষর, রেখা এবং জ্যামিতিকক্ষেত্রে সুচিত্রিত। আরবী কোরানের বয়েৎও অনেক। অর্দ্ধ-পদ্মফুলের চিত্র, গৃহদ্বার, এবং অন্যান্য অনেক প্রকার অলঙ্কারের দ্বারা গম্বুজের ভিতরকার ছাদ সুশোভিত।

এই মর্ম্মর মসজিদের কিব্‌লার দিকে একটা নূতন জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। ডাহিন দিকে সিঁড়ির সাহায্যে একটা উচ্চ বেদীর উপর উঠা যায়। এই বেদীর উপরি-ভাগে হিন্দুদেবালয়ের শিখরের ন্যায় শিরোদেশ। তাহার উপর ত্রিশূলাকার অর্দ্ধচন্দ্র। বেদীর তলদেশ হইতে শিখরের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত সমস্তটা দেখিলে একটা হিন্দু-মন্দির বলিয়া মনে হয়।

এই বেদীর উপর বসিয়া ইমাম বা প্রধান পুরো-হিত ধর্ম্মবক্তৃতা পাঠ করেন। তিনি তখন পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া থাকেন—শ্রোতৃমণ্ডলী পূর্ব্বমুখ হইয়া বসে। বক্তৃতান্তে তিনি নামিয়া আসেন এবং কিব্‌লায় যাইয়া অন্যান্য লোকের ন্যায় পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া নামাজ আরম্ভ করেন। তাঁহার পর সকলে নামাজ পাঠ করিতে থাকে।

এই মসজিদের ভিতর দিয়া উপরিভাগে উঠা যায়। সেখানে চারিদিকে বারান্দার মত স্থান আছে। পূর্ব্বে যখন বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা ছিল না তখন ভৃত্যেরা উপরে উঠিয়া বাতি জ্বালিয়া দিত।

আজ রাত্রে একবার সহর দেখিতে গেলাম। প্রত্যেক রাস্তায় অসংখ্য 'কাফে' বা কাফি, মদ, তামাক ইত্যাদির দোকান ও হোটেল। এত হোটেল ও খানাঘর ভারত-বর্ষের কোন নগরেই নাই। বোম্বায়ের চাকাফির দোকানও সংখ্যায় এত বেশী নয়। কাইরোর মধ্যে এই-সকল দোকান ও হোটেল একটা প্রধান দেখিবার জিনিষ। গ্রীক, ইতালীয়, মিশরীয়, আরব, ইহুদি, ইত্যাদি জগতের সকল জাতি আসিয়া এই নগরে জুটিয়াছে। যেখানে সেখানে মদ্যপান, কাফিপান, মাংস ভোজন ইত্যাদির আয়োজন। শত শত লোক ২৪ ঘণ্টা এই-সকল হোটেলে যাওয়া-আসা করিতেছে। রাত্রিকালেই এই-সমুদয়ের পশার। এই সময়ে কাইরো-নগর দেখিলে মিশরীয় জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। ইহারা অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়, চরিত্রহীন, ও ব্যয়শীল। ইহাদের মধ্যে গাম্ভীর্য্য, দৃঢ়তা, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আদৌ আছে কি না সন্দেহ। রাস্তার অর্দ্ধেক ভাগ জুড়িয়া হোটেলের চেয়ার টেবিল সাজান হইয়াছে। খোলা আকাশের নীচে বসিয়া বিলাসী মুসলমান খৃষ্টান সকলে আমোদ প্রমোদে মগ্ন। দুই তিনটা মাত্র রাস্তার কাফে ও হোটেলগুলি দেখিয়াই মনে হইল বোধ হয় ১০০০ লোক রাত্রিকালে এই উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছে।

একটা আরব নৃত্যগীতের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—সেখানে প্রকাণ্ড ভাবে চরিত্রহীনতার ও অসংযমের চূড়ান্ত আয়োজন চলিতেছে। কাহারও কোন চক্ষুলজ্জা নাই। নাচ গান হাসি ঠাট্টায় কিছু মাত্র বাধা নাই। নীতিভ্রষ্ট দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী এই অসংযমে যোগদান করিতে দ্বিধা বোধ করে না। মোটের উপর এই গৃহটা রাত্রিকালে জঘন্য পিশাচ-জীবনের তাণ্ডব-লীলায় পরিপূর্ণ থাকে। অথচ সহরের মধ্যস্থলে জনগণের সম্মুখে এই উৎকট ক্রিয়ার অভিনয় হয়!

আরবী গীত শুনিয়া আমাদের যাত্রাদলের কথা মনে পড়িল। সেই চোগাচাপকানপরা জুড়িমহাশয়গণের

গান—তাহাদের লম্বা লম্বা রাগিণীর টান, কানে হাত দিয়া চেঁচান, আরবীগণের কসরতে দেখিতে পাইলাম। দেখিতেছি হিন্দু ও মুসলমানের কালোয়াতি অনেকটা একরূপ। এখানে সেতার, তবলা, বেহালা, এই-সবই প্রধান বাদ্যযন্ত্র। হার্ম্মোনিয়ামের ব্যবহার দেখিলাম না। করতাল বাজান হইতেছিল। বাদ্যযন্ত্রের সুরে ভারতীয় বাজনার আওয়াজ পাওয়া গেল। তবে গানের সুর কিছু একঘেয়ে বোধ হইল। নাচিবার কায়দাও স্বতন্ত্র; অবশ্য পাশ্চাত্য বল নাচের সঙ্গে কোন মিল বা সংযোগ নাই; ভারতীয় বাই, খেমটা ইত্যাদি নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করা চলিতে পারে; কিছু সাম্য আছে।

তৃতীয় দিবস মুসলমানের কাইরো।

আজ মিশরবাসীদিগের এক জাতীয় উৎসবের দিন। খৃষ্টান মুসলমান সকলে মিলিয়া আজ আনন্দে মগ্ন। মিশর রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ছুটি। দোকানবাজার সবই বন্ধ। সকল শ্রেণীর লোকই উৎসবে যোগদান করিতে প্রবৃত্ত। উৎসবের নাম "শিম্মানেসিম্" বা বায়ুর ঘ্রাণ গ্রহণ। বাগানে মাঠে গাছতলায় দলে দলে লোক সমবেত হইতেছে। অনাবদ্ধপ্রকৃতির মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে আসিবার জন্য জনগণ নানাপ্রকার বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ঘরবাড়ীর বাহিরে বেড়াইতেছে। ভারতের বসন্তোৎসব, হোলী ইত্যাদির সঙ্গে বোধ হয় এই উৎসব একশ্রেণীভুক্ত। উদার আকাশের তলে খোলা মাঠের বায়ুসেবন করাই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের, দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনার কোন সংস্রব নাই। শিল্প, ব্যবসায় বা ধনসম্পত্তি সম্পর্কিত কোন হাট বাজার বা সম্মিলনও কোথাও দেখিতেছি না। বরং দোকানী বাজারী সকলেই ব্যবসায় বন্ধ রাখিয়াছে। কোনরূপ রাষ্ট্রীয় ঘটনা বা সংগ্রামে-জয়পরাজয়-ঘটিত অনুষ্ঠানেরও প্রভাব লক্ষ্য করা গেল না। বৎসরের মধ্যে একদিন মিশরবাসীরা প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া মিশিবার জন্য উদ্‌গ্রীব; এজন্য মন খুলিয়া পাখীর মত স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করে। এই স্বাধীনতার ইচ্ছাই, এই প্রকৃতির সহবাসের আকাঙ্ক্ষাই মিশরের এই সার্ব্বজনীন উৎসবের মূলকারণ বিবেচনা করা যাইতে পারে।

এই উৎসব বহুপ্রাচীন, মুসলমানদের নূতন সৃষ্টি নয়; অথচ মুসলমানেরা ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা যখন মিশর অধিকার করে তখনই ইহা সমগ্র-জাতির মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমানেরা মিশরের এই সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠানকে বর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া রক্ষা করিয়াই আসিয়াছে। রোমান ও গ্রীক আমলে ইহা বর্ত্তমান ছিল। পুরাতন মিশরীয়দিগের দ্বারা বোধ হয় ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। নাইল পূজার ন্যায় ইহা মিশরদেশের অধিবাসীগণের প্রকৃতিপূজার অন্যতম অঙ্গ।

এই প্রাচীনতম অনুষ্ঠানে মিশরের আধুনিক গ্রীক, ইহুদি, আর্ম্মিনিয়ান, কপ্ট্, আরব, ইতালীয়, ফরাসী, জার্ম্মান, সীরিয়, সকল জাতিই সমান উৎসাহী। যুগে যুগে সকল জাতিই মিশরের এই স্বদেশী উৎসব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের আধুনিক হিন্দুগণ যেসকল পূজা উৎসব ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে সেগুলির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে বুঝা যায় কত অহিন্দু অনুষ্ঠান ক্রমশঃ হিন্দু অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান, সকল প্রকার ধর্ম্মের বহু অঙ্গ আধুনিক হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে।

আজ কাইরোনগরের উত্তরপূর্ব্বদিকে হেলিয়োপোলিস্ নগর দেখিলাম। রেলে যাত্রা করা গেল। ডাহিনে সুন্দর সুন্দর নবনির্ম্মিত গ্রীক, ডাচ, ফরাসী জাতিদিগের প্রাসাদতুল্য সুরম্য অট্টালিকা। বামে কৃষিক্ষেত্র ও উদ্যান। পথে খেদিভের বাসভবন "কুব্বা" ও তৎসংশ্লিষ্ট বাগান। তাহার ডাহিনে নূতন প্রতিষ্ঠিত নগরের হর্ম্ম্যসমূহ। আমরা এই নূতন অট্টালিকা দেখিবার জন্য নামিলাম না। বরাবর প্রাচীন হেলিয়োপোলিস নগরের উদ্দেশ্যে চলিলাম।

ষ্টেশন হইতে নামিয়া তুঁতগাছের সারি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। খানিকদূর হাঁটিয়া যাইয়া একটা বাগানে প্রবেশ করিলাম। লেবুগাছের সুন্দর গন্ধ আমাদিগকে পুলকিত করিতে লাগিল। এই বাগানে বাইবেল-বিখ্যাত সিকামোর বৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। প্রবাদ এই যে এই তরুতলে কুমারী মেরি

সন্তান যীশুকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেরডের অত্যাচারে জোসেফ মেরি এবং যীশু গর্দ্দভপৃষ্ঠে মরুভূমি পার হইয়া মিশরের এই স্থানে পলাইয়া আসেন। এইখানে একটা কূপও আছে। এই কূপের জল সুমিষ্ট। অথচ এ অঞ্চলে অন্যান্য সকল কূপের জলই ঈষৎ লবণাক্ত। খৃষ্টানগণের বিশ্বাস,—ভগবৎসন্তান এই কূপের জল পান করিয়াছিলেন, এই জন্যই ইহার মাহাত্ম্য।

সিকামোর বৃক্ষ জীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। ভারতবর্ষের "অক্ষয় বট" বৃক্ষগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মেরির এই তরুটি অনেকবার শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে নূতন নূতন চারা জন্মিয়া ইহার পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে গাছটা দেখিলাম তাহা প্রায় ৩০০ বৎসরের হইবে। বৃক্ষটি গোড়া হইতেই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষত্বক্ শুকাইয়া গিয়াছে। গাছের পাতা একটি শাখায় সামান্য মাত্র দেখিতে পাইলাম। গাছের গায়ে নানা লোকে ছুরি দিয়া নাম লিখিয়া রাখিয়াছে।

কূপের জল তুলিবার জন্য দুইটি পারস্যদেশীয় চক্র ব্যবহৃত হয়। চক্র দুইটির পরিধিতে কতকগুলি জলপাত্র সংযুক্ত আছে। চক্র ঘুরিতে থাকিলে পরে পরে ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্র হইতে জল পাওয়া যায়। দুইদিকে দুইটি বলদ তেলের ঘানি ঘুরাইবার রীতিতে ঘুরিতেছে। বলদের ঘুরার ফলে কূপ হইতে জল উঠিতে থাকে। এই দুইটি চক্রের জল একটি স্রোতে চালিত করা হইয়াছে। এই জলের দ্বারা বাগানের উদ্ভিদ্গুলি সতেজ রাখা হয়। এরূপ ঘটীচক্র ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টানের এই তীর্থক্ষেত্রে ধর্ম্মঘটিত কোন অনুষ্ঠান দেখিলাম না। গাছতলায় খৃষ্টানেরা বসিয়া বা শুইয়া রহিয়াছে মাত্র। কোন পূজা উপাসনা বা প্রার্থনা কিম্বা বক্তৃতা হইল না।

এই উদ্যান রোমীয় আমলে ক্লীয়োপেট্রার প্রমোদকানন ছিল। মিশরের এই রাণী তাঁহার বিভিন্ন প্রেমাকাঙ্ক্ষীগণকে যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য এই বাগানে বাল্সাম এবং অন্যান্য মাদক উদ্ভিদের চাষ করিতেন। এই-সকল উদ্ভিদ উপহার দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতেন।

এই বাগান হইতে উত্তর দিকে মাইল খানেক যাইয়া প্রাচীন হেলিয়োপোলিস বা সূর্য্য-নগরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। কতকগুলি তুঁত গাছের বীথির ভিতর দিয়া একটা গ্রানাইট প্রস্তরের চতুষ্কোণ স্তম্ভ দেখা গেল। ইহা বিখ্যাত ওবেলিস্ক। প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরের দ্বাদশ রাজবংশসম্ভূত সম্রাট সীসষ্ট্রিস একটি উৎসবের স্মরণচিহ্নস্বরূপ দুইটি ওবেলিস্ক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত সূর্য্যমন্দিরের সম্মুখে এই ওবেলিস্ক দুইটি অবস্থিত ছিল। মন্দিরের কোন অংশই এখন বর্ত্তমান নাই; প্রাচীন নগরেরও কিছুই এখন আর দেখা যায় না। মাত্র ওবেলিস্ক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীন দেওয়ালের মৃত্তিকারাশি পাহাড়ের স্তূপের ন্যায় দেখা যাইতেছে।

প্রাচীন মন্দিরের ভূমিতে এক্ষণে তুলা, ইক্ষু, শব্জী, ঘাস, গোধূম ইত্যাদি নানা শস্যের চাষ হয়। পুরাতন ভগ্ন গৃহ ও নগরের চুন সুরকী হইতে মাটিতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়, এজন্য এই ভূমি অতিশয় উর্ব্বর।

ওবেলিস্কের নিম্নভাগ প্রায় ৭।৮ ফুট বিস্তৃত। ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া ইহা উর্দ্ধে উঠিয়াছে। শিরোভাগ বেশী সঙ্কীর্ণ নয়। সর্ব্বোপরি পিরামিডের ন্যায় একটা ত্রিকোণ। উচ্চতায় স্তম্ভটি ৬৬ ফুট। একখানা ঈষৎরক্ত গ্রানাইট পাথরে ইহা নির্ম্মিত। আসোয়ানের পর্ব্বত হইতে এই লাল গ্রানাইট সংগ্রহ করা হইত। এই বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির প্রাচীন মিশরের বিদ্যালয় ও ধর্ম্মশিক্ষালয় ছিল। এইখানেই মিশরীয় প্রধান প্রধান দেবতার পূজারীদিগের শিক্ষালাভ হইত। পরবর্ত্তী কালে গ্রীক ও রোমান পণ্ডিত সকলেই এই মন্দিরে আসিতেন। দার্শনিক প্লেটোও এইখানে ১২ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য ওবেলিস্ক সেই প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান মানবকে মহা অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। হেলিয়োপোলিস এই কারণে দুনিয়ার বাণী-সেবক মাত্রেরই তীর্থক্ষেত্র।

ওবেলিস্ক স্তম্ভের চারি গাত্রে হায়েরোগ্লিফিক অক্ষরে

লেখা আছে। উর্দ্ধ হইতে নিম্ন ভাগের দিকে পাঠ করিতে হয়। কোন্ সময়ে কে কি জন্য এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এই লেখার দ্বারা তাহা বুঝা যায়।

ওবেলিস্ক দেখিয়া গর্দ্দভপৃষ্ঠে চড়িয়া ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিলাম। মাথায় মিশরীয় লাল ফেজ। দূর হইতে কাইরো নগরের গৃহগুলি দেখিতে দেখিতে এবং প্রকৃত মিশরবাসীর ন্যায় প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে করিতে ষ্টেসনে আসা গেল। গর্দ্দভে আরোহণ ভিন্ন এ অঞ্চলে গতি নাই।

আজ মস্‌জিদ-বিদ্যালয় দেখিতে পাইলাম। মাথায় মিশরীয় মুসলমান ফেজ ছিল। কেহ প্রবেশ করিতে বাধা দিল না। সাধারণ মসজিদের নিয়মেই এই অট্টালিকা নির্ম্মিত। পশ্চিম দিক হইতে প্রবেশ করিয়া সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে হয়। এই প্রাঙ্গণে ৫০,০০০ লোক বসিতে পারে। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে চক্‌মিলান বারান্দা। উত্তর-দক্ষিণের বারান্দার ভিতর বড় বড় হল। পূর্ব্বদিকের হল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—প্রায় ৩০০ প্রস্তরস্তম্ভবিশিষ্ট।

এইখানে বর্ত্তমানে ১০,০০০ ছাত্র এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। ওয়াকৃফের সম্পত্তি হইতে ইহাদের এবং শিক্ষকগণের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয়। ইহা দেখিয়া প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীঘর জীবন-ব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রণালী, চালচলন সবই অনুমান করিতে পারিলাম। সরল জীবন যাপন, মাদুরের উপর শত শত ছাত্রের উপবেশন, পঠন পাঠনে অনুরাগ, বিলাসবর্জ্জন জ্ঞানসঞ্চয় ও জ্ঞানবিতরণে অধ্যবসায়, এই সকলই ভারতবর্ষের বিদ্যাদানবিষয়ক বিধিব্যবস্থার অনুরূপ। মিশরীয় মুসলমানদিগের অবৈতনিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেখিলে সমগ্র প্রাচ্য জগতের হাবভাব, আদর্শ ও চিন্তা অতি সহজে বুঝিতে পারা যায়। আফিসী কায়দার শাসন নাই—সকলেই স্বাধীনভাবে আনন্দের সহিত নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালন করিতেছে। দশম শতাব্দীতে যখন মুসলমানেরা প্রথম কাইরো নগরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন তখনই তাঁহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিগত ১০০০ বৎসর ধরিয়া নানা রাষ্ট্রীয় দুর্য্যোগ সত্ত্বেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুনিয়ার মুসলমানছাত্র শিক্ষা পাইয়া আসিতেছে। সমগ্র মুসলমান সমাজের ইহাই চিন্তা-কেন্দ্র। এখানকার আদর্শই ভারতবর্ষে, বোর্ণিয়ো সেলিবিস ও যবদ্বীপে, আফগানিস্তানে, তুরস্কে, মরক্কোতে সকলস্থানে অনুসৃত হয়। এখানে শিক্ষিত হইয়া ছাত্রগণ মুসলমান-জগতের সর্ব্বত্র উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, প্রচারক, অধ্যাপক, পুরোহিত ইত্যাদির পদে নিযুক্ত হন। মিশরের অধিকাংশ রাষ্ট্রমন্ত্রীরা এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র। এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের সুনাম সুপ্রচারিত। মহম্মদ আলি ইহাঁদিগকে ভয় ও সম্মান করিয়া চলিতেন।

এখানে ধর্ম্মগ্রন্থপাঠই বিশেষরূপে হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরবী ভাষার সাহায্যে অন্যান্য বিদ্যারও জ্ঞান বিতরণ করা হয়। ছাত্রদের জন্য বাস করিবার স্বতন্ত্র ঘরবাড়ী আছে। হলের প্রাচীরের পার্শ্বে দেখিলাম কতকগুলি আলমারীর সারি রহিয়াছে। উহার মধ্যে ছাত্রেরা তাহাদের ব্যবহার্য্য পুস্তকাদি রাখিয়া থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভাগে সমীপবর্ত্তী স্থানে অসংখ্য গ্রন্থালয় দেখিয়াছি। মোটের উপর এই স্থানকে মুসলমান সভ্যতার প্রধানতম কেন্দ্র বলিয়া মনে হইল।

অবশ্য নব্য-পাশ্চাত্য-আলোক প্রাপ্ত মিশরীয়েরা আজকাল এই বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছেন। তাঁহারা মনে করেন এখানে শিক্ষালাভ কিছুই হয় না। তাঁহারা এইসব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ধরণের বিদ্যালয়াদি গড়িতে চাহেন। অথচ স্বাধীনভাবে নবনব শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা ইহাঁদের নাই।

এতগুলি বিভিন্ন জাতীয় যুবক ও প্রৌঢ় মুসলমান একস্থানে দেখিয়া ভাবিলাম—মুসলমানেরা নিতান্তই শান্তিপ্রিয়। ইহাদিগকে উগ্রস্বভাব, তীব্রপ্রকৃতি, ভয়াবহ জাতিরূপে বর্ণনা করা উচিত নয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির চেহারার পার্থক্য অবশ্য লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু সকল মুসলমানের মধ্যে একটা কমনীয় ভাব—একটা কোমলতা, সৌজন্য ও নম্রতা দেখিতে পাইলাম। এমন কি যাহাদের শারীরিক গঠন খুব লম্বা চৌড়া শক্ত ও

পালোয়ানোচিত, তাহাদিগকেও শান্ত শিষ্ট বোধ হইল। আর মিশরের ভিতর দোকানে, হোটেলে হাটে বাজারে যত লোক দেখিয়াছি তাহাদের কাহাকেও প্রচণ্ডপ্রকৃতিব ভাবিতে পারি নাই। ইহাদের সর্ব্ব অঙ্গে, চোখে, মুখশ্রীতে বেশ শান্তিপ্রিয়তা বিরাজ করিতেছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় দেখা হইয়া গেলে আজ আবার দুর্গে প্রবেশ করিলাম। তাহার পশ্চিম কোণ হইতে সমগ্র কাইরো-নগরের দৃশ্য দেখা যায়। সেখানে দাঁড়াইয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত নগরীর অট্টালিকা, প্রাসাদ, মসজিদ, মিনার, গম্বুজ ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। এই নগরের পশ্চিমে নাইল নদের উজ্জ্বল জলরাশি—তাহার পশ্চাতে অপরকূলে আবার নগর পল্লী ও প্রান্তর। সমস্ত কাইরো সহর এক সঙ্গে দেখিলে মনে হইবে ভারতবর্ষের কোন স্থানে এমন বৃহৎ ও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নগর বোধ হয় নাই। নানাপ্রকার সৌধ—গ্রীক ষ্টাইল, রোমান ষ্টাইল, তুরকী ষ্টাইল, আধুনিক ইউরোপীয় ষ্টাইল—সকল ষ্টাইলই সাধারণ মিশরীয় মুসলমানরীতিতে নির্ম্মিত হর্ম্ম্যমালার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তথাপি একবার দেখিলেই মুসলমান-নগর বলিয়া বুঝিতে ভুল হয় না।

সহরের কোথায়ও খোলার ঘর বা চালার ঘর নাই। সবই ইষ্টক- বা প্রস্তরনির্ম্মিত। কাইরো-নগরের সৌধসমূহ দেখিলে মিশরীয়দিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে বড় বড় কারবার, কৃষি, ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক, সবই বিদেশীয়গণের হাতে। মিশরীয়দিগের স্বদেশী কৃষি শিল্প বা ব্যবসায়ের কোন অনুষ্ঠান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কাইরো-নগর ইউরোপের বাজারে পরিণত হইয়াছে। আজকাল যে সম্পদ্ দেখিতেছি তাহা মিশরীয়দের পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত ধনের সাক্ষী। আধুনিকগণের বেশভূষা, পোষাক পরিচ্ছদ, কায়দাকানুন, চলাফেরা, সবই বিলাসিতার এবং সুখভোগেচ্ছার পরিচায়ক। নগরের বাহ্য শোভা—দোকান বাজার, উদ্যান, হোটেল, 'কাফে,' জনগণের যাতায়াত, ভিক্টোরিয়া গাড়ী ও ট্রাম গাড়ীর লোকসংখ্যা সকলই এক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মিশরের ধনধান্য এই দেশবাসীকে সুখী বিলাসী করিয়া তুলিয়াছে। আজ ইহাদের কোন ব্যবসায়ই স্বহস্তগত নয়। জার্ম্মান, ফরাসী, গ্রীক, ইতালীয়, ইংরেজ, ওলন্দাজ, আর্ম্মেনিয়ান, ইহুদ—জগতের সকল জাতি মিশরের বুকে বসিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। চারিদিককার শোভা সৌন্দর্য্য এই বিদেশীয় বণিকদিগেরই কৃতিত্বের এবং ঐশ্বর্য্যের ফল। ভবিষ্যতে মিশরবাসীর অবস্থা কিরূপ হইবে ভাবিয়া স্থির করা কঠিন। মিশরীয়দিগের ঘুম কবে ভাঙ্গিবে কে বলিবে?

দুর্গের পশ্চিমকোণ হইতে পূর্ব্বদিকে তাকাইয়া দেখি বালুকাময় প্রস্তরপূর্ণ শৈলমালা দণ্ডায়মান। তাহার পাদদেশেই এই দুর্গ। পাহাড়ের উপর সমতলক্ষেত্র বা টেব্‌লল্যাণ্ড। তাহাতেও একটা দুর্গ। পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ দূরে একটা মস্‌জিদ। ইহা অতি পুরাতন। এই পর্ব্বতে বাইবেলবিখ্যাত মকাওম শৈল। এখানে নোয়ার জাহাজ জলপ্লাবনের সময়ে ঠেকিয়াছিল। মিশরের বহু স্থানের সঙ্গে প্রাচীন খ্রীষ্টানধর্ম্ম, সমাজ ও ইতিহাসের অনেক কথা বিজড়িত। মিশর খ্রীষ্টানদিগের তীর্থক্ষেত্র।

পশ্চিমকোণে দাঁড়াইয়া আবার পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। যতদূর দেখা যায় দেখিতে লাগিলাম। নাইল নদের উভয়কূলে নগর পল্লী উদ্যান প্রান্তর। মিশরের এই ভূমি ধনধান্যপুষ্পেভরা, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। মধ্যভাগে নদী, দুইধারে জনপদ ও লোকাবাস—পূর্ব্বে আরব দেশীয় মোকাতাম পর্ব্বত ও মরুভূমি, পশ্চিমে আফ্রিকার লীবীয় পর্ব্বতশ্রেণী ও মরুভূমি। এই দুই পর্ব্বতমালা পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রাচীরের ন্যায় মিশরের উর্ব্বরভূমিকে রক্ষা করিতেছে। এই ভূমির উপরই যুগে যুগে মানবসভ্যতার বিকাশ সাধিত হইয়াছে।

পশ্চিম দিকে দেখিলাম—সম্মুখেই কাইরো নগরের অতি সন্নিকটে তিনটি পিরামিড বা ত্রিকোণস্তম্ভ। এই জনপদের নাম গীজা। কিয়দ্দূরে, দক্ষিণে, নাইলের পশ্চিমে আরও কতকগুলি পিরামিড দেখিতে পাইলাম। এই স্থানে উর্ব্বরক্ষেত্রের শস্যসম্পদও দেখা গেল। ঐ জনপদের নাম সক্কারা। এইখানেই প্রাচীন মেম্ফিস্-নগর। গ্রীক ও মিশরীয় ইতিহাসে এই স্থান অতি

প্রসিদ্ধ। এইস্থানের বৃষবাহন "তা" দেবতা সূর্য্যদেবের ন্যায় প্রাচীন মিশরের প্রধান দেবতা।

কুতুবমিনারের শিরোভাগে দাঁড়াইয়া দিল্লীর নবীন প্রাচীন জনপদগুলি যেরূপ দেখায়, কাইরোদুর্গের এই স্থানে দাঁড়াইয়া সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। সত্য সত্যই এদেশ "স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপ, প্রাচীন মন্দিরাদির চিহ্ন, অজর অমর শিল্পকার্য্য, পুরাতন মসজিদ প্রাসাদ, এই সমুদয়ের দৃশ্য অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে নূতন নূতন ঐশ্বর্য্য ও কারুকার্য্যের পরিচয়স্বরূপ অট্টালিকাসমূহ সতেজে দণ্ডায়মান। কিন্তু এই-সমুদয় যে কোন্ "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী" তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। আধুনিক মিশরীয়-দিগের কোন স্বপ্ন বা আশা আছে কি ?

দুর্গের মধ্যে এক স্থানে একটা সুগভীর কূপ আছে। প্রবাদ এখানে জোসেফ নামধারী এক ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার কাহিনী কোরানে, বাইবেলে এবং ফার্শী কবি জামি প্রণীত "ইউসুফ-জুলেখা" নামক কাব্যগ্রন্থে বিবৃত আছে। এই কূপের নিম্নে যাওয়া যায়। কুতুবমিনারে যেমন নিম্নভাগ হইতে শিরোভাগে উঠা যায়, এই কূপেও সেইরূপ উপরিভাগ হইতে নিম্নতম স্থানে জলের নিকট যাওয়া যায়। কূপের পথ মিনারের ন্যায় গোলাকার। আমরা অর্দ্ধ ভাগ পর্য্যন্ত নামিলাম। দেখা গেল—প্রকাণ্ড প্রস্তরপ্রাচীরে নির্ম্মিত চতুষ্কোণ গহ্বর, প্রত্যেক দিক প্রায় ১২ ফুট বিস্তৃত। কূপ প্রায় ৪০০ ফুট গভীর। বহু নীচে জল। গাইড বলিলেন—উহা নাইল নদের জলের সঙ্গে সংযুক্ত।

এই অন্ধকারময় পথের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে জোসেফের কাহিনী শুনা গেল। তাঁহাকে এখানে সাত বৎসর বাস করিতে হইয়াছিল। মিশরের রাজা একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এ দিকে দেশময় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরম্ভ হইল। এক ব্যক্তি রাজাকে খবর দিল—একজন সাধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। জোসেফকে মুক্তিদান করা হইল। পরে তিনি মিশরের খেদিভপদে নিযুক্ত হন।

এই কূপ সম্বন্ধে আর একটা কথা শুনিলাম। দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার সময়ে সৈন্যগণের জন্য জল সরবরাহই এই কূপ খননের উদ্দেশ্য ছিল। কথাটা সমীচীন বোধ হইতেছে। এই দুর্গ ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে সালাদিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রস্তরসমূহ গীজা পিরামিডের সমীপস্থ ভূমি হইতে আনীত হয়। পুরাতন মেম্‌ফিস্ সাকারা-আবুসির গীজা-ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষের উপকরণে মধ্যযুগের মুসলমান কাইরো-নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

তারপর পুরাতন কাইরো-নগরের অবস্থিতি দেখিতে গেলাম। গ্রীক ও রোমীয় যুগে উহা ব্যাবিলন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে মিশরীয় সর্ব্বপুরাতন মুসলমান মসজিদ দেখিলাম। মুসলমানেরা মিশর দখল করিবামাত্র যে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন তাহা এই স্থানে অবস্থিত। নাম "ওমারের মসজিদ।" খলিফা ওমারের আমলে মিশর মুসলমান-দখলে আসে। অবশ্য ১১০০ বৎসরের পুরাতন মসজিদ অনেকবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রাচীনকালের কিবলা মাত্র বর্ত্তমান। ১৪০টা স্তম্ভ মসজিদের হলের ভিতর দেখিলাম। মসজিদ-বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ক্ষুদ্র নয়। অবশ্য সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য এখানে কিছুই পাইলাম না। প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার ভিতর কয়েকটা গাছ পালা। হলের মধ্যে একটা স্তম্ভ দেখিলাম। ইহা নাকি মক্কা হইতে উড়িয়া আসিয়া এই স্থানে পড়িয়াছিল। এই স্তম্ভ কিবলার সমীপস্থ ইমামের আসনের (মেম্বার) পাদদেশে দণ্ডায়মান। হলের মধ্যে অন্ততঃ ১২০০০ লোক বসিতে পারে। স্তম্ভগুলি মর্ম্মরময়—গ্রীক-ও-রোমান রচনা-রীতির নিয়মে গঠিত।

ওমারের সেনাপতি যে স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন ঠিক সেই স্থানেই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মসজিদ হইতে ব্যাবিলনের প্রাচীন জনপদের দিকে অগ্রসর হইলাম। পুরাতন নগরের ক্ষুদ্রইষ্টকনির্ম্মিত উচ্চ দেওয়ালের কিয়দংশ স্থানে স্থানে দেখা গেল। প্রাচীন রোমীয় অট্টালিকাসমূহের সামান্য সামান্য চিহ্ন নানা জায়গায় বিদ্যমান।

এই জনপদে এক্ষণে একটি পুরাতন খৃষ্টান গির্জ্জা

প্রধান দ্রষ্টব্য। কপ্ট জাতির এখানে বসবাস। ইহারা খৃষ্টান—মিশরীয় কায়দাতেই অবশ্য বেশভূষা করে এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের রং ফরসা। ইহুদিদিগের সঙ্গে থাকিলে ইহাদিগকে চেনা যায় না। আজকাল দেখা যায় যতদিন ইহারা দরিদ্র ততদিন ইহারা মিশরের সাধারণ মুসলমানদিগের কায়দাকানুন মানিয়া চলে। কিন্তু হাতে পয়সা হইলেই ইহারা ইউরোপীয়দিগের চালচলন শিখে। ইহারা পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত হইতেছে। আফিসে, ব্যাঙ্কে ইহারা বেশ সুদক্ষ কেরানী ও কর্ম্মচারী হইয়া থাকে।

এই কপ্ট জাতি যখন প্রথম খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে তখন রোমীয়দিগের এখানে প্রতিপত্তি ছিল। তাহারা এই নূতন খৃষ্টানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একটা মহাল্লা প্রস্তুত করিয়াছিল। এই মহাল্লার ফটক দিয়া আমরা প্রবেশ করিলাম। সেই ফটকের পুরাতন কাঠের দরজা আমাদিগকে দেখান হইল—অতি স্থূল ও বৃহদাকার সিকামোর বৃক্ষের কাষ্ঠে এই ফটক নির্ম্মিত।

রোমীয়-ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের ভিতরে ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গলি। এই-সকল গলির ভিতর দিয়া পুরাতন গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। এই গির্জ্জার এক অংশে জোসেফ, মেরী এবং যীশু একমাস বাস করিয়াছিলেন। হেলিয়োপোলিসের নিকটবর্ত্তী কূপে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া তাঁহারা এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

শ্রীপর্য্যটক।

পঞ্চশস্য

বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গৃহশিক্ষা (B. M. J)।

গত জুলাই মাসে এপ্‌সম কলেজ-গৃহে সার্ হেন্‌রী মরিস্ শিক্ষা-বিষয়ে একটি মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। প্রবন্ধটিতে সার্ হেন্‌রী স্কুলশিক্ষার দোষ গুণ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুশীলনের সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটির আরম্ভে সার্ হেন্‌রী বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর দোষটির উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান দোষ এই যে—ইহাতে শিশুকে একই সময়ে অনেকগুলি বিষয় অধ্যয়ন করিতে হয়। সার্ হেন্‌রীর মতে শিশুর উপর এ এক রকমের অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম ভিন্ন আর কিছু নয়। তিনি বলেন শিশুকে এক সময়ে একটি, খুব জোর দুইটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। ইহার অধিক শিক্ষা দিতে গেলে, হতভাগ্য শিশু কোন বিষয়ই ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না। গ্লাড্‌ষ্টোন্ বলিতেন—তাঁহাদের সময় এক রকম কিছু না শিখিয়াই ইটন কলেজ হইতে বাহির হইতে পারা যাইত বটে, কিন্তু তাঁহারা যেটুকু শিখিতেন,—খুব ভাল করিয়াই শিখিতেন—সে বিদ্যাটুকু তাঁহাদের চিরজীবনের সঙ্গী হইত। কিন্তু এখন ছাত্রদের কত বিদ্যাই না শিখিতে হয়? বেচারার স্মৃতিশক্তির উপর কি দুর্ব্বহ ভারই না চাপান হয়? ইহার ফলে ছাত্রটি কোন বিষয়ই ঠিক আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হয় না—কাজেই কিছু দিন বাদে তাহার মনে বড় একটা কিছু থাকিতে দেখা যায় না। ছেলেকে কোন একটা বড় স্কুলে দেওয়া ভাল, না বাড়ীতে পড়ান ভাল, সার্ হেন্‌রী তাহারও মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ছেলেকে স্কুলে দেওয়াই উচিত। কিন্তু তিনি কতকগুলি বড় লোকের নাম করিয়াছেন যাঁহারা স্কুলের কোন ধারই ধারেন নাই। ডেমোস্থেনিস্, পিট, চার্লস্ বেল্, বেন্‌জামিন ব্রডি, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্, জন্ হাণ্টার ও টমাস্ হেন্‌রী হাক্সলী প্রভৃতি মনস্বীগণের সাধারণ শিক্ষা-ব্যাপার গৃহেই সম্পন্ন হয়। ডারুইন্ শ্রুজবেরী বিদ্যালয়ে কিছুদিন গিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে নামে মাত্র যাওয়া। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, স্কুলে তিনি কিছুই শিখিতে পারেন নাই। কিন্তু ইঁহারা অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। ইঁহাদের নিয়ম সাধারণের প্রতি কোন কালেই খাটিতে পারে না। স্কুলের বাঁধাবাঁধি নিয়ম মানিতে গেলে, ইঁহাদের মানসিক শক্তির পরিণতির পক্ষে নিশ্চয়ই বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত, এমন কি তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রতিভার বিকৃতি ঘটাও অসম্ভব ছিল না। অন্যপক্ষে, সাধারণ ছেলেদের পক্ষে স্কুলে শিক্ষার একটা মস্ত সুবিধা আছে। স্কুলে ছেলেদের মধ্যে পরস্পর মেলামেশার সুযোগ ঘটে, ভাবের আদান-প্রদান ও বিনিময় চলে, হৃদয়ে হৃদয়ে পরস্পর সংঘর্ষ হয়। ইহাতে শিক্ষা-ব্যাপারটা অনেক অগ্রসর হয়। ছেলেরা, বিশেষতঃ যুবকেরা, এই উপায়েই পরস্পরকে শিক্ষিত করিয়া তুলে। ছেলেবেলায় জ্ঞান-পিপাসা অতিশয় প্রবল থাকে। হাক্সলী এই পিপাসাকে "Divine Curiosity to know" বলিতেছেন। প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণে এই জ্ঞানপিপাসা যেমন বর্দ্ধিত হয়—এমন শুধু পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া হয় না। জ্ঞানার্জ্জনের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও উত্তম উপায়টি হইতেছে, আমাদের চারিধারে, বনে জঙ্গলে মাঠে ঘাটে, নদীতে সরিতে, যে-সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতেছে, সেইগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা। হাণ্টার, হাক্সলী, ডারুইন্ প্রভৃতি মনীষীগণ প্রকৃতির বিরাট পুস্তক হইতেই জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। ইহা না করিয়া যদি তাঁহারা শুধু পুস্তক পাঠে নিরত থাকিতেন, তাহা হইলে জগতে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইত কি না সে বিষয়ে খুবই সন্দেহ আছে। হেন্‌রী মরিস্, র‍্যাবেলের শিক্ষাপ্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। র‍্যাবেলে ষোড়শ শতাব্দীর লোক। সে সময় সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। আশ্চর্য্য এই যে র‍্যাবেলে দেশপ্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীকে উপেক্ষা করিয়া, ছাত্রদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ, এবং ব্যায়াম ও অঙ্গচালনা দ্বারা দেহের পরিণতি করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন। রুসো তাঁহার এমিলি নামক গ্রন্থেও এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীরই অনুমোদন করিয়াছেন। মণ্টেন ও লকেরও শিক্ষা-সম্বন্ধে ঐরূপ মতই থাকিতে দেখা যায়। সার্ হেন্‌রী স্বীকার করেন কতকগুলি ছেলে থাকে—দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি শেলী ও ফ্রান্‌সিস্ টম্‌সনের নাম করিয়াছেন—

তাহাদের প্রকৃতি এরূপ যে, স্কুলের শিক্ষা বা শাসন তাঁহাদের পক্ষে কিছুতেই সহ্য হয় না। এরূপ ছেলের সংখ্যা কখনই খুব বেশী হইতে দেখা যায় না। মোটের উপর বলিতে গেলে অধিকাংশ বালকের পক্ষেই স্কুলের শিক্ষা অধিকতর উপযোগী বলিয়াই বোধ হয়। সার্ হেনরীর মতে গৃহশিক্ষার প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে মানুষকে অতিরিক্ত পরিমাণে সঙ্কীর্ণমনা করিয়া তুলে। দশ জনের সঙ্গে মিলিলে মিশিলে, চরিত্র ও মনের যে একটা উদারতা জন্মায়, ইহাদের বেলায় তাহা হইতে পারে না। ইহাদের আত্মগৌরব ও আত্মাদরজ্ঞান খুবই বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু আত্মনির্ভরশক্তি তেমন পরিস্ফুট হইতে পারে না। স্কুলশিক্ষায় মানুষকে চালাক করিয়া তুলে—মুখচোরাভাবটা কাটিয়া যায়; শাসন মানিয়া চলিবার প্রবৃত্তি জন্মায়। স্কুল-শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল গুণটি এই যে, ইহাতে পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের ভাব পরিবর্দ্ধিত হয়; একজোট ও একমন হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি জন্মায়। ভাবী জীবনে এসব গুণের যে একান্ত আবশ্যকতা আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

ক্লোরোফর্ম্মের আবিষ্কার (B. M. J)।

সম্প্রতি ৮২ বৎসর বয়সে ট্রেয়াথুম নগরে, শ্রীমতী এগ্‌নিস্ টমসন্ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ক্লোরোফর্ম্ম আবিষ্কারের ইতিহাসের সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন শ্রীমতী এগ্‌নিস্ তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইঁহার মৃত্যুতে ক্লোরোফর্ম্ম-আবিষ্কারক-দলের কেহই জীবিত রহিলেন না। এগ্‌নিস টমসন, সার্ জেম্‌স্ সিম্‌সনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ক্লোরোফর্ম্ম লইয়া যেদিন সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষা হয়, শ্রীমতী টমসন সে সময়ে তাঁহার খুড়ার বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষাটা সন্ধ্যার সময় আরম্ভ হয়। সিম্‌সনের দুহিতা কুমারী ইভ্‌ব্র্যাণ্টায়ার তাঁহার পিতার জীবনীতে সেদিনকার ঘটনাবলির একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা, পিতার সহকারী ম্যাথ্‌স্ ডান্‌কান্ এবং জর্জ্জ কিথ—ইঁহারা তিন জনেই তাঁহাদের নিজের উপর পরীক্ষা করেন। সর্ব্বপ্রথমে কিথ ক্লোরোফর্ম্মের ঘ্রাণ লইলেন, তাঁহার উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া সিম্‌সন্ ও ডান্‌কান্‌ও ইহার ঘ্রাণ লইতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে ইঁহারা সকলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ইঁহাদের অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত মহিলাদের মনে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল। একটু জ্ঞান ও চৈতন্য হওয়া মাত্রই সিম্‌সন্ বলিয়া উঠিলেন—"ইহা ভালো—ঈথার অপেক্ষা অনেক ভালো"। ডান্‌কানের তখনও জ্ঞান হয় নাই। তিনি দিব্য নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিলেন। আর কিথ্ অনবরত টেবিলে লাথি ছুড়িতেছিলেন। পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সিম্‌সন্‌পত্নী, তাঁহার ভগ্নী, ভগ্নীপতি, ভগ্নীপুত্রী প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর আরও কয়েকবার ক্লোরোফর্ম্ম লইয়া পরীক্ষা হয়। একবার কুমারী পেটি্‌কের উপরও পরীক্ষা করা হয়। ইঁহার অল্পদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। কুমারী পেটি্‌ক্ ক্লোরোফর্ম্মের বশে, অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় বলিয়া উঠেন—"আমি দেবদূত—সুন্দর দেবদূত। ওগো মর্ত্তবাসী তোমাদের কুশল তো?" কিন্তু ক্লোরোফর্ম্মের বশে কিথ্ বড় বিকট মুখভঙ্গি করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহিলারা সকলেই বিশেষ ভয় পাইতেন। ম্যাথ্‌স ডান্‌কানের শীঘ্র নেশা হইত না; তাঁহাকে শয্যায় শোয়াইয়া রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। তিনি জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন আর ক্রমাগত চীৎকার করিতেন—"ডান্‌কান্ গর্জ্জন কর, সিংহের মতন গর্জ্জন কর।" তাঁহার বিকট গর্জ্জনে একে একে সকলেই গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। সংজ্ঞালোপের উদ্দেশ্যে সিম্‌সন্ অনেকগুলি ঔষধেরই পরীক্ষা করেন, কিন্তু কোনটাই তাঁহার মনের মত হয় না। ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা সংজ্ঞালোপ হইবে একথা সর্ব্বপ্রথমে ডেভিড ওয়াল্‌ডি তাঁহাকে বলেন—এবং পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে কতকটা ক্লোরোফর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া দিবেন, এমন আশ্বাসও দেন। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় ওয়াল্‌ডি তাঁহার কথা রাখিতে পারেন নাই। সিম্‌সন আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, এডিন্‌বরা নগরের ডান্‌কান্ এণ্ড ফ্লক্‌হার্টের দোকান হইতে কতকটা ক্লোরোফর্ম্ম আনাইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার পরীক্ষার ফল বিদ্বৎসভায় উপস্থিত করেন। সে যাহা হোক্, ক্লোরোফর্ম্মের চৈতন্যাপহারক শক্তির কথা সর্ব্বপ্রথমে যে, ডি,ওয়াল্‌ডির মনে উদিত হয়, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। ১৯১৩ সালের Statesman and Friend of India (ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ এণ্ড ফ্রেণ্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়া) পত্রিকায় প্রকাশ যে ওয়াল্‌ডির স্মৃতি রক্ষার্থে এবং ক্লোরোফর্ম্ম আবিষ্কার ব্যাপারের সহিত তাঁহার নামটি অবিচ্ছিন্ন রাখার উদ্দেশ্যে এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল্ গৃহে তাঁহার নামে একখানি পিত্তলফলক সংস্থাপিত হইয়াছে। ওয়াল্‌ডি ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবর্ষে রাসায়নিক কারখানা স্থাপনের তিনিই অগ্রণী। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত রসায়নশালা ডিঃ ওয়াল্‌ডি এণ্ড কোঃ নামে অদ্যাপি কোন্নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই রসায়নশালায় সর্ব্বপ্রকার মিনারেল্ এসিড্ এবং বিবিধ ঔষধাদি প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল-এম-এস।

অপূর্ব্ব ব্যবসায়—

মানুষ অভাবে পড়িলেই অভাব মোচনের নানারকম উপায় উদ্ভাবন করে। যে দেশে জিনিষপত্রের দাম দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে, অথচ মাহিনা এক পয়সাও বাড়িতেছে না, সে দেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ক্রমশই শক্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। কাজেই দায়ে পড়িয়া লোককে নূতন নূতন অপূর্ব্ব ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিতে হইতেছে। কোন রকম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে বলিয়া আজকালকার দরিদ্র জাপানীরা উপার্জ্জনের নানা রকম ছোট-খাটো উপায় বাহির করিতেছে। ইহার মধ্যে টোপসংগ্রহ করা প্রভৃতি কতকগুলি খুবই অদ্ভুত ধরণের। এই টোপওয়ালারা কীট সংগ্রহ করিয়াই দিন কাটায়। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাও খুব বেশী। পাশ্চাত্য দেশের মত জাপানে মাটির মধ্যে এই কীটের সন্ধান করা হয় না; খাল ও নদীর কাদার ভিতরেই ইহাদের পাওয়া যায়। তোকিওতে এই ব্যবসায় খুব চলে। এই সহরে অনেকগুলি নদী ও খাল আছে। ভাটা পড়িবামাত্রই ঝুড়ি ও কাদা-খোঁচান কাঁটা হাতে করিয়া দলে দলে মেয়েরা পাথরের বাঁধ বাহিয়া খালের কাদার মধ্যে নামিতেছে দেখা যায়। কাদার মধ্যে অনেকখানি পা ডুবাইয়া তাহারা পোকাগুলিকে খোঁচাইয়া তুলে; আলোর মুখ দেখিয়া সব লাল লাল কেঁচো কিল্‌বিল্ করিয়া উঠে, অমনি তাহারা সেগুলিকে ঝুড়ির মধ্যে তুলিয়া নেয়। এই পোকা সাধারণ কেঁচো অপেক্ষা একটু মোটা এবং গুম্ফধারী, তাহাদের শরীরের বিভিন্ন ভাগ আছে। পোকা রাখিবার পাত্রগুলি হয় ঝুড়ি, নয় বাল্‌তি; তাহাতে পোকা ফেলিবার জন্য উপর দিকে ছোট ছোট ফোঁকা মুখ থাকে। পাত্র পূর্ণ হইলেই দোকানে আনিয়া বিক্রী করিয়া ফেলা হয়। এই-সকল টোপের দোকান হইতে জেলেরা ছিপের জন্য পোকা কিনিয়া

লইয়া যায়। জাপানের খরচের তুলনায় কীটসংগ্রহকারিণীদের দৈনিক আয় খুবই সামান্য; প্রত্যহ দশ আনা (৮০ সেন) পাইলেই যথেষ্ট; স্বামী অন্য কার্য্যে পনের আনা (ষাট সেন) আন্দাজ উপার্জ্জন করে, মোটের উপর এই এক টাকা ন' আনায় তাহাদের খরচ চলে। গ্রীষ্ম কালে কাজ করিবার সময় যদিও সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে হয়, তথাপি ইহা ততটা কষ্টদায়ক নয়। কিন্তু শীতকালে কষ্টভোগটা যথেষ্টই করিতে হয়; ঘণ্টার পর ঘণ্টা বরফের মত ঠাণ্ডা কাদায় দাঁড়াইয়া থাকাতে পা জমিয়া যাইবার উপক্রম হয়। এই ব্যবসায়ের ফলস্বরূপ কেঁচোওয়ালাদের বেরিবেরি, শোথ, উদরী প্রভৃতি রোগে প্রায়ই ভুগিতে হয়। এই সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহাদের পরিশ্রম ও রোগভোগ দুই করিতে হয়। জীবিকা অর্জ্জনের এই উপায়কে জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ও দুঃখদায়ক ব্যবসায় মনে করে।

ছাইওয়ালাদের (হাইকাই) ব্যবসায়ও আর একটি হীন ব্যবসায়। ইহারা বাড়ী বাড়ী ছাই সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। জাপানী গৃহস্থের উনানে প্রত্যহ যে অল্প পরিমাণ ছাই জমে, তাহা লইয়া যাওয়াই ছাইওয়ালাদের কার্য্য। একটা ঠেলা গাড়ীতে নানা রকম ছাইএর পাত্র সাজাইয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় "ছাই নেই নাকি গো?" বলিয়া হাঁকিয়া যায়। ছাই কিন্তু বিনা পয়সায় মেলে না, পয়সা দিয়া কিনিতে হয়। গৃহস্থদের অবশ্য ছাই বিক্রী করিয়া বিশেষ কিছু লাভ হয় না, খুব বেশী ছাই হইলে বড় জোর দুই তিন পয়সা জোটে। গাড়ী বোঝাই হইলে ছাইওয়ালা ছাইএর দোকানে গিয়া ছাইএর সংগ্রহ বিক্রয় করিয়া আসে। তুষের ছাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। ইহা সহরে পাওয়া যায় না, গ্রামে কৃষকদের নিকট গিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। কাঠের কয়লার ছাই দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত। ইহার মধ্যেও আবার নানা রকম শ্রেণী বিভাগ আছে। ক্রেতা কিনিবার সময় ছাই চাখিয়া শ্রেণী নির্ণয় করে। পাথুরিয়া কয়লার ছাই রংএর কারখানায় ব্যবহৃত হয় না বলিয়া, ইহার দাম সর্ব্বাপেক্ষা কম। যাহাদের ইহা ভিন্ন অন্য ছাই থাকে না, তাহারা ছাই সরাইয়া লইবার জন্য উপরন্তু পয়সা দিতে বাধ্য হয়। নীল রং করিবার জন্য ক্ষারজল করিতে উৎকৃষ্ট ছাই ব্যবহৃত হয়। আজকাল তোকিও সহরে ঘরকন্নার সব কাজেই গ্যাসের চলন হওয়াতে ছাইওয়ালারা বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে।

"আমে জাইকুয়া" নামক আর এক দল দরিদ্র লোক এইরূপ অনিশ্চিত উপায়ে জীবন নির্ব্বাহ করে। চালের পিঠালার ছাঁচ তৈরি ইহাদের ব্যবসায়। নানা রংএর কাগজের নিশানে দেহ সাজাইয়া, একটা বাঁশের আগায় কিম্বা ছোট একটা গাড়ীর উপর একটি বাক্স চড়াইয়া ঢাক পিটিতে পিটিতে সে সহরের অগণ্য রাস্তায় সারাদিন যাওয়া আসা করে। জাপানী শিশুরা 'আমে' নামক চালের পিঠালীর বা জেলীর (মোরব্বা?) বিশেষ ভক্ত। একদল ছেলে মেয়ে জড় হইলেই 'আমে'ওয়ালা রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া মাছ, পাখী প্রভৃতি নানারকম ছেলেভুলান জিনিষ গড়িয়া তাহাদের আমোদ দেয়। সেইগুলি ছোট একটি বাঁশে লাগাইয়া প্রায় বিনামূল্যে শিশুদের নিকট বিক্রয় করে। কাচনির্ম্মাতারা যেমন নলের ভিতর দিয়া ফুঁ দিয়া কাচের শিশি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, 'আমে'ওয়ালা সেইরূপ করিয়া 'আমে'র গোলক ও পেটফোলা মাছ, জীব জন্তু প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতে পারে। যে শিশুর যেটি মনের মতন হয় সে তাহাই ক্রয় করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি কাগজের নিশানও পায়। এই জিনিসগুলি আবার স্বাভাবিক রঙে রঞ্জিত করিয়া দিতে হয়। আমেওয়ালারা বেশ চালাক লোক; কোন্‌খানটিতে যাইলে যে ছেলের পালের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা সে ঠিক জানে। কবে কোন্ মন্দিরে উৎসব আছে, কোন্ মেলাতে ছেলেমেয়ের ভিড় হইবে, সমস্তই সে মনে করিয়া রাখে। সে-সব স্থানে যাইলেই তাহাকে হাজির দেখা যায়। জাপানের অন্যান্য দরিদ্র খাবারওয়ালাদের অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা ভাল; ইহারা মাঝে মাঝে দিনে দুই টাকা আড়াই টাকাও পায়। বর্ষাই ইহাদের প্রধান শত্রু; এই সময় ইহাদের ব্যবসায় এক রকম বন্ধ থাকে। বৃষ্টির দিনের লোকসানটা ধরিলে মোটের উপর বিশেষ লাভ হয় বলা চলে না। কোন কোন 'আমে'ওয়ালা শিশুদের আনন্দ বাড়াইবার জন্য মাঝে মাঝে একটু আধটু নাচিয়াও দেখায়।

জাপানে ছেঁড়াকাপড়ওয়ালা, বোতলওয়ালা প্রভৃতি আরও অনেক দরিদ্র ব্যবসায়ী আছে; তবে তাহাদের সকলের অবস্থাই পূর্ব্বোল্লিখিতদের অপেক্ষা ভাল।

শ।

জলগর্ভে মৃত্যু—

সমুদ্রস্নানের জন্য সাগরতীরে অবস্থিত কয়েকটি স্থান বিশেষ বিখ্যাত। গ্রীষ্মকালে এই সকল স্থান হইতে প্রায়ই অনেক সুস্থ সবল ও তরুণ মানবের অকালমৃত্যুর সংবাদ আসে। ইঁহারা সকলেই স্নানের সময় হঠাৎ জলের ভিতর তলাইয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। হৃদ্‌রোগ, সন্ন্যাসরোগ, অত্যধিক শ্রান্তি, শারীরিক উত্তাপের হঠাৎ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি এইরূপ মৃত্যুর কারণ বলিয়া দেখান হয়। কিন্তু মৃতদেহ পরীক্ষাকালে এইসকল কারণের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। অল্পবয়স্ক ও সন্তরণপটু হইলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইয়া মৃত্যু প্রায়ই হয় না। ডাক্তার গিউটলিস্ নামক কোন জর্ম্মান বিশেষজ্ঞ ইহার অন্য কারণ প্রদর্শন করেন। লা রিভিউ পত্র বলেন :—

"ফ্রাঙ্কফর্ট চিকিৎসালয়ের অন্তর্ভুক্ত ডাক্তার গিউটলিস মনে করেন যে, কর্ণের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র বিবরের বিশেষ অবস্থাই ইহার কারণ। এই বিবরের কোন দোষ ঘটিলে বধিরতা ও এক প্রকার চক্ষুপীড়ার উৎপত্তি হয়। কর্ণপটহের জালীর উপর ক্ষত থাকিলেই এই-সকল হয় এবং এই প্রকারে কর্ণমধ্যে শীতল জল প্রবেশ করে। কর্ণবিবরস্থ যন্ত্রের এইসকল ত্রুটিই হঠাৎমৃত্যুর কারণ। শিশুকাল হইতেই অনেকের কর্ণপটহে অজ্ঞাতসারে এইরূপ ছিদ্র থাকে। এই জন্য হঠাৎ জলে ঝাঁপ দিলে কর্ণের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। ঠাণ্ডা জল কানের ভিতর দিয়া হঠাৎ প্রবেশ করিয়া পাকস্থলী কিম্বা মস্তিষ্ক আক্রমণ করিতে পারে। সেইজন্য ভরা পেটে জলে নামা স্নানকারীর পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। যাঁহাদের কর্ণপটহের দোষ আছে, ডাক্তার গিউটলিস্ তাঁহাদিগকে কানে তুলার ছিপি লাগাইবার উপদেশ দেন। ডুব দিবার সময় এইরূপ সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন।"

যাঁহাদের কানে কোন দোষ আছে বলিয়া মনে হয়, এবং যাঁহারা বাল্যকালে হামজ্বর প্রভৃতিতে ভুগিয়াছেন, তাঁহারা বিচক্ষণ চিকিৎসকের নিকট কর্ণপটহ পরীক্ষা করাইয়া লইলে, বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্য্য হয়। শ।

বেহালার পরদা—

বেহালাবাদক বেহালার সুরের উচ্চতা, গভীরতা ও স্থায়িত্ব প্রভৃতির জন্য স্বয়ং দায়ী; ইহা তাঁহার একটা বিশেষ সুবিধা এবং অসুবিধা দুইই। পরদা-বাঁধা যন্ত্রে সুর বাঁধা থাকে; সুরের উপর বাদকের কোন হাত থাকে না। যিনি সুর বাঁধিয়া দেন, তিনিই প্রধানতঃ যন্ত্রের স্বরের জন্য দায়ী; তদুপরি শীত, আতপ, আর্দ্রতা প্রভৃতি প্রকৃতির হাতের কার্য্যও আছে। পিয়ানোবাদক সুস্বরের ধ্বনি তুলিতে পারিলে, তাহাকে বিশেষ বাহাদুরি দেওয়া চলে না, কারণ যন্ত্রের সুর ভাল
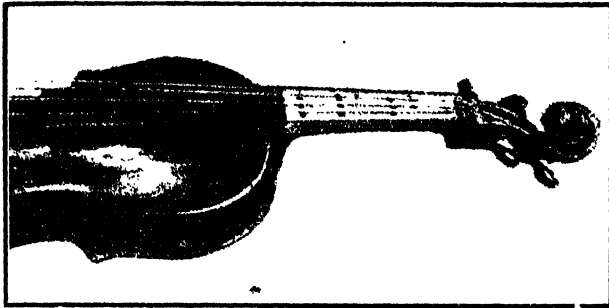
বেহালার সুরবাঁধা পর্দ্দা।

থাকিলে তাঁহার সুস্বর তোলা ভিন্ন গতি নাই। কিন্তু বেহালাবাদক যদি বেসুরা বাজান, তাহা হইলে দোষটা তাঁহারই হয়, কারণ তাঁহার তার কষা ও অঙ্গুলিচালনার উপরই সুরের খেলা নির্ভর করে। শিক্ষা-নবীশরা সহজে এই নৈপুণ্য লাভ করিতে পারে না। সুইজর্‌ল্যাণ্ড দেশীয় একজন বেহালাশিক্ষক ছাত্রদের সুর ঠিক রাখিবার জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা নবীন পিয়ানো-বাদকদের মত ঠিক সুর তুলিবার সুবিধা হয়, কিন্তু চিরকালের মত যন্ত্রের অধীনও হইতে হয় না। জেনেভার সঙ্গীতবিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাত বেহালাবাদক ফ্রাঙ্ক চৌসি, ছাত্ররা বেহালাশিক্ষার সময় প্রায়ই সুর ঠিক রাখিতে পারে না বলিয়া তাহাদের সাহায্যার্থ একটি খুব সোজা যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই যন্ত্র ("Joujuste") কেবল মাত্র একটুকরা কাগজ দ্বারা প্রস্তুত। কাগজের উপর কয়েকটি দাগ কাটা থাকে, একএকটি দাগ একএকটি পরদার মত সুরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। ঠিক এই চিহ্ন অনুসারে বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীর উপর আঙ্গুল ফেলিলে খাঁটি সেই সুর বাহির হইবে। কাগজটি না থাকিলে ছাত্রের পক্ষে যথাস্থানে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া সুর তোলা অসম্ভব হয়। ইহার সাহায্যে শীঘ্রই সমস্ত ভুল দূর হইয়া যায়, আঙ্গুলগুলি যথাস্থানে পড়িতে অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং শিক্ষাও খুব সহজ হইয়া উঠে।

ছাত্র কাহারও সাহায্য না লইয়া ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা প্রত্যেক স্বরের যথার্থ স্থান শিখিয়া লইতে পারেন। এই অত্যাবশ্যক পদ্ধতিটি প্রথমে ছড়ি না লইয়া অভ্যাস করিলেই ভাল হয়। ছাত্র বেহালাটি সাধারণ-নিয়ম-মত কাঁধে ঠেকাইয়া কিম্বা ডান হাতের নীচে রাখেন, 'Joujuste'এর উপর সঞ্চরমাণ আপনার অঙ্গুলির দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন। অঙ্গুলিকে যথাসাধ্য হাতুড়ির মত করিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া সুরগুলি মুখে বলিতে থাকেন।

কাগজের নৌকা—

জাপানের রিয়ার-এড্‌মিরাল যোকোয়ামা বলিতেছেন:—যত রকম জাহাজ আছে তাহার মধ্যে জলতলসঞ্চারী (submarine) জাহাজই সর্ব্বাপেক্ষা সহজে বিপন্ন হয়। একবার কোন গুরুতর আঘাত পাইলে, কি নৌকা কি যাত্রী কাহারও আর রক্ষা নাই। আমি কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইহাদের উদ্ধারের কোন উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতাম। এই-সকল জাহাজে স্থান এত অল্প যে, জীবন রক্ষার কোন আয়োজন করিয়া রাখা প্রায় অসম্ভব; অতি সামান্য জায়গার মধ্যে রাখিবার কোন কৌশল না করিতে পারিলে, এই জাহাজে জীবনতরী (lifeboat) রাখা সম্ভব নয়। সেইজন্য আমি একটা ফাঁপা ধরণের নৌকা তৈয়ার করাই ঠিক করিলাম; ইহা আবশ্যক-মত বায়ুপূর্ণ করিয়া কাজে লাগান যায় এবং অন্য সময় বেশ পাট করিয়া তুলিয়া রাখাও যায়। রবারনির্ম্মিত নৌকা হইলে প্রচুর খরচ হয় বলিয়া জাপানী কাগজ দ্বারা প্রস্তুত করাই মিতব্যয়িতার লক্ষণ মনে করিলাম।

তুঁতগাছের-তন্তু নির্ম্মিত "হাশিকিরাজু" নামক কাগজ খুব শক্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী; ইহা আমার অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী। এই কাগজের দ্বারা পুলিন্দা বাঁধিবার দড়ী ও মেয়েদের চুল বাঁধিবার ফিতা প্রভৃতি শক্ত জিনিষ তৈরী হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এই কাগজে বৃক্ষতন্তুগুলি লম্বালম্বি ভাবে সাজান হয় বলিয়া ইহা পাশের দিক দিয়া ছেঁড়া খুবই শক্ত। এই রকম দুইখানা কাগজ আড়াআড়ি ভাবে এক সঙ্গে জুড়িয়া এক রকম বেশ পাতলা কাগজ হয়; তাহা সহজে নষ্ট হয় না।

এখন কাগজটা জলের অভেদ্য হওয়া আবশ্যক। এক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কাগজের জল আটকাইবার ক্ষমতাও হইল এবং তাহার সূতাগুলি আরও শক্ত হইয়া উঠিল। দুই জন মানুষ দুইদিক ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে টানিলেও এইরূপ একখানা কাগজ ছিঁড়িতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলেও ইহার কোন ক্ষতি হয় না। আমার আবিষ্কৃত এই কাগজ তৈল
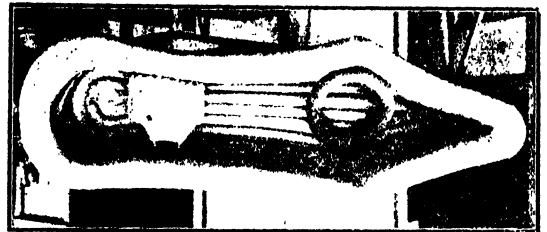
দ্বারা নির্ম্মিত সাধারণ জাপানী জলবিরোধক কাগজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইহা যথেষ্ট চাপ ও ধাক্কা সামলাইতে এবং বৃষ্টি বাদল প্রভৃতি সব রকম প্রকৃতির অত্যাচার সহ্য করিতে পারে।

উপাদান ত হইল, এখন নৌকা নির্ম্মাণের সমস্যা উপস্থিত। প্রথম চেষ্টায় আমি মাঝখানে চাপা প্রকাণ্ড একটা বায়ুপূর্ণ বালিশ তৈয়ার করিলাম। কিন্তু একটা ভয়ও হইল, এত বড় একটা থলি যদি এক জায়গায় হঠাৎ ফুটা হইয়া যায়, তাহা হইলে ত বিপদ—

কয়েকটি সরু সরু বায়ুপূর্ণ নল ভেলার মত পাশাপাশি বাঁধিয়া দ্বিতীয় নৌকাটি নির্ম্মিত হইল। এই নৌকাখানা ধ্বংস হওয়া খুবই শক্ত; কারণ দুই একটা নল ফুটা হইয়া কিম্বা ফাটিয়া যাইলেও ইহা সমুদ্রে গমনোপযোগী থাকিবে। জলের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া সন্তোষজনক ফলই পাইলাম। সমস্ত নৌকাখানা এক ঘনফুট স্থানের মধ্যে রাখা যায়; সমুদ্রতলস্থ জাহাজের ইহাই আবশ্যক।

নৌকাখানা সম্পূর্ণ হইবামাত্রই দেখিলাম যে আমার এই উপাদান অসংখ্য কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিপন্ন আকাশ-যান উদ্ধারের জন্য ইহার আবশ্যক হইতে পারে। আকাশযানের ডানা আচ্ছাদিত করিবার জন্য অনেক দাম দিয়া উপাদান আমদানী করিতে হয়, তৎপরিবর্ত্তে এই কাগজ ব্যবহার করিলে এক চতুর্থাংশ অপেক্ষাও অল্প মূল্যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

বিশ্বজোড়া কাগজের কারখানা—

এডমিরাল য়োকোয়ামার নবাবিষ্কৃত এই কাগজ, গৃহনির্ম্মাণের সময় মাঝের দরজা করিবার বেশ উপযোগী। ইহার উপর ছবি আঁকিয়া বেশ সুচারুরূপে অলঙ্কৃত করা যায়। জল আট্‌কাইতে পারে বলিয়া, ইহা ধুইয়া মুছিয়া সর্ব্বদা নূতন করিয়া রাখাও বেশ সহজ। দেয়ালের গায়ে লাগাইবার পক্ষেও এই কাগজ খুব উপযোগী। সস্তায় গালিচার কাজ এই কাগজ দ্বারা বেশ চালান যায়। ঘর ছাওয়াইবার জন্য ইহা ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। সমুদ্রতলে ব্যবহার্য্য রজ্জু নির্ম্মাণের জন্যও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এই নবাবিষ্কৃত জলাভেদ্য কাগজ ইয়ুরোপের অনেক বিচক্ষণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ফ্রান্স জর্ম্মানী প্রভৃতিতে ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। ফরাশীগণ ইহা দ্বারা দরিদ্রদের শবাধার নির্ম্মাণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

এই কাগজ নির্ম্মাণের কারখানার জন্ম-উপলক্ষে কিছু দিন পূর্ব্বে একটি ভোজ হইয়াছিল। ভোজনশালায় ব্যবহার্য্য পাত্র ও আসবাব প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ কাগজ দ্বারা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল; এমন কি মদের বোতল, পানপাত্র প্রভৃতিও এই উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। একজন নিমন্ত্রিত আনন্দাতিশয্যে তাঁহার পানপাত্রটি আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পাত্রটা পুড়িল না। এই আকস্মিক ঘটনা উদ্ভাবনকর্ত্তার যথেষ্ট উপকার করিল। ইহা যখন অগ্নিদেবের হস্তেও নষ্ট হয় না, তখন ইহাকে অনায়াসেই সৈন্যদের কার্য্যে লাগান যাইতে পারে। জলের বোতল, খাবারের বাক্স প্রভৃতি জিনিষ কাগজের হইলে খুবই হাল্কা হইবে এবং তাহাতে সৈন্যদের বহনেরও খুব সুবিধা হইবে। বরফের থলি, ভাসমান বয়া, জীবনরক্ষাকারী জামা, ডাকের থলি, রেশমের গুটি রাখিবার থলে, তাঁবু, হাওয়ার বালিশ প্রভৃতি অসংখ্য সামগ্রী ইহা দ্বারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক ব্যাপারেও ইহার ব্যবহার হইতেছে। বলিতে গেলে ইহা লৌহের স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশে অনেক কার্য্যে কাগজ ব্যবহার করা হয়; কিন্তু পাশ্চাত্য কাগজ মণ্ড হইতে নির্ম্মিত; ইহা তুঁতবৃক্ষের আঁশে নির্ম্মিত জাপানী কাগজের মত দীর্ঘকালস্থায়ী ও সর্ব্বকার্য্যোপযোগী হয় না। এই জাপানী কাগজের ব্যবহার খুব বাড়িয়া চলিতেছে বলিয়া অনেকেই তুঁতগাছের চাষ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে এই জাতীয় কোন জিনিষ সহজে পাওয়া যায় না বলিয়া বোধ হয় সেখানেই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচার হইবে।

আজকাল নিত্য নূতন কাগজের জিনিষের আবির্ভাব হইতেছে। বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যে পৃথিবীটা আগাগোড়াই কাগজের হইয়া যাইবে। প্রোমীথিউস্ পত্রের একজন লেখক বলেন,

"কাগজের মণ্ডের মত সর্ব্বকার্য্যোপযোগী আর কোনও জিনিষ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাগজে নির্ম্মিত গাড়ীর চাকা আমাদের যথেষ্ট বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল, কিন্তু এখন কাগজের বস্তনী, দাঁতওয়ালা চাকা, পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই সুপরিচিত। সিকাগো চিকিৎসালয়ে এই পোষাক ব্যবহার করা হয়; ব্যবহারের পর পুড়াইয়া ফেলা হয়। আমেরিকাতে কাগজের মোজা ও তোয়ালে ব্যবহৃত হয়, উত্তর-জর্ম্মান রেলপথে কাগজের তোয়ালে চলিত আছে। আমেরিকায় বৃষ্টি আট্‌কাইবার জন্য কাগজের কোট ব্যবহার করা হয়; এই কোটগুলি পাট করিয়া বেশ পকেটের মধ্যে রাখা যায়। জাপানে ত দেয়াল, কপাট, জানালা সবই
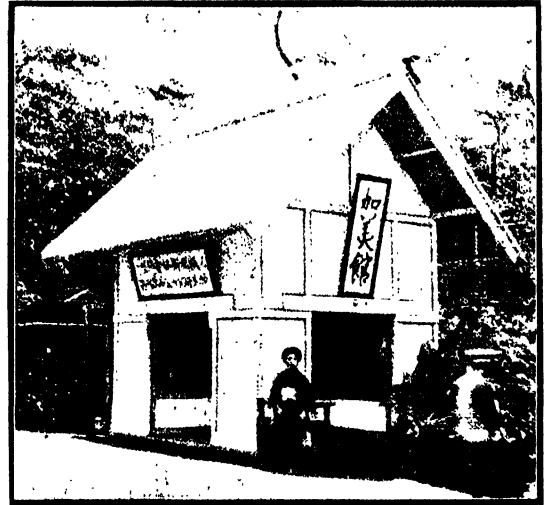
কাগজের বাড়ী।

কাগজের; সেখানে কলিরা দুই চার আনায় একটা কাগজের কোট কিনিয়া সারা বৎসরের বৃষ্টি কাটাইয়া দেয়। অনেক বাড়ীতেই কাগজের পিপা, জলপাত্র, স্নানের গামলা, রান্নার বাসন, তক্তা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কাগজের ফরাস্, পরদা, ও গ্যাসের নলও কিছু নূতন জিনিষ নয়। এই জাতীয় নকল চামড়া, সূতা, কাপড়েরও অন্ত নাই। কাগজের পাল একটা নূতন জিনিষ বটে। একবার ব্যবহার করিয়াই ফেলিয়া দেওয়া চলে বলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আজকাল কাগজের পানপাত্র খুব চলিত হইয়া উঠিয়াছে। জিনিষপত্র প্যাক্ করিবার জন্য জমান কাগজ ও অন্যান্য নানারকমের কাগজ খুব চলিত হইয়াছে। হাল্কা বলিয়া আজকাল জাহাজ তৈরি প্রভৃতি ব্যাপারে, কাগজ অনেক স্থলে কাঠের স্থান অধিকার করিতেছে। কাগজের তক্তাকে সহজেই অনেক রকম আকার দেওয়া যায় বলিয়া ইহা কাঠের তক্তা অপেক্ষা সস্তা হয়। এইপ্রকার কাগজের তক্তা অতি সহজেই নবাবিষ্কৃত কাগজের স্ক্রু দ্বারা একসঙ্গে জোড়া দেওয়া যায়। এই বিবরণ দেখিয়া মনে হয় আজকাল সর্ব্বত্র কাগজের ব্যবহার চলিতেছে।

গাছের পাতা ও গাছের বয়স—

গাছের পাতা পরীক্ষা করিয়া তাহার বয়স নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফেলিপ্স. জে, কক্ এই বিষয়ে The Technical World Magazineএ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাচীন বৃক্ষের নবীনতম কিশলয়ও বয়সে সেই বৃক্ষেরই মত প্রাচীন। তিনি বলেন, "সিন্‌সিনাটি (Cincinnati) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এইচ. এম্. বেনিডিক্ট উদ্যানপালকদিগের বিশ্বাসের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে গিয়া এই সত্যে উপনীত হইয়াছেন। কোন ফলবৃক্ষের শাখা দেখিয়া তাহার বয়স এবং তাহা চারাগাছ হইতে কি অন্য গাছের কলম হইতে উৎপন্ন ইহা তিনি প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়া দিতে পারেন। ফলবৃক্ষপালকের একটি একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র থাকিলে আর তাঁহাকে নূতন চারা ভ্রমে পুরাতন বৃক্ষের কলম কিনিতে হইবে না। গাছের বয়স যত বাড়িতে থাকে, তাহার পাতার শিরাগুলি ততই ঘননিবিষ্ট হইতে থাকে। অধ্যাপক বেনেডিক্টের আবিষ্কারসমূহ নিউইয়র্ক সরকারী কৃষি বিভাগে কার্য্যতঃ প্রয়োগ করা হইতেছে। কিছুদিন হইতে ফল-উৎপাদনকারীগণ বলিয়া আসিতেছেন যে কলমগাছের ফলপ্রসব-ব্যাপারে তাহার বৃক্ষজননীর বয়সের প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ইহা চিরকালই অস্বীকার করিয়া আসিতেছে। এতদিনে হাতে-কলমে-শেখা উদ্যানপালকের কথার সত্যতা প্রমাণ হইয়াছে। বাহিরের অবস্থার কোনও পরিবর্তন না হইলেও জরাই ইহার প্রকৃত কারণ। ডাক্তার বেনেডিক্ট বলেন, প্রাচীন ও নবীন উভয়কেই জরা সমভাবে আক্রমণ করে। কোন কোন জীবদেহে ইহা খুব অল্প বয়সেই দেখা যায়। বৃক্ষের যে অঙ্কুরস্তরের সাহায্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় তাহা সেই বৃক্ষেরই সমবয়স্ক। এই তথ্যটি পুরাতন উদ্ভিদ্‌বিদ্যার বিরোধী। বসন্তকালে বৃক্ষের পুরাতন শাখায় যে নবীন পল্লবের অভ্যুদয় হয়, তাহা বাস্তবিক নবীন নহে। ঐ বৃক্ষেরই ন্যায় প্রবীণ। গাছ যত বড় হইতে থাকে, পাতার পুষ্টিসংগ্রহকারী কোষগুলি ততই আকারে ক্ষুদ্র ও সংখ্যায় অধিক হইতে থাকে। ইহা দ্বারাই উদ্ভিদ্বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই নূতন তথ্যে উপনীত হইতে পারিয়াছেন।

জাপানী চুলের গহনা (কাঞ্জাশী)—

জাপরমণীরা কতদিন হইতে কেশপ্রসাধন আরম্ভ করিয়াছেন তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে একহাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে কেশরচনার প্রচলন ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। খোঁপা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই চিরুণী কাঁটা প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, এবং শীঘ্রই সেগুলি অলঙ্কারে পরিণত হয়। নারার হোর্যাজি মন্দিরে সম্রাজ্ঞী কোকেনের একটি রূপার চুলের কাঁটা (কাঞ্জাশী) আছে। দেখিলেই বুঝা যায় যে ইহা অলঙ্কারের জন্য নির্ম্মিত নহে, মাথার চূড়ায় খোঁপা আটকাইয়া রাখিবার জন্যই নির্ম্মিত। ইয়ুরোপীয় মহিলাদের চুলের কাঁটার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য নাই; টুপি-আট্‌কান-কাঁটার (hat pin) সহিত খুবই সাদৃশ্য আছে। সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেবলমাত্র উচ্চবংশীয়া মহিলাদের মধ্যেই মাথার উপর খোঁপা বাঁধার রীতি ছিল। মধ্যম শ্রেণীর ও নিম্ন শ্রেণীর রমণীরা ঐরূপ কেশরচনা করিত না, কাজেই তাহাদের কাঁটারও বিশেষ আবশ্যক হইত না। কিন্তু কেশ অলঙ্কৃত করিবার সখটা তাহাদের উত্তমরূপেই ছিল, সেইজন্য তাহারা পুষ্প ও পত্রের দ্বারা কুন্তল ভূষিত করিত। পুরাতন জাপানী কবিতায় চুলের পুষ্পালঙ্কারের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, রমণীরা অনেকেই মুক্তকেশ পুষ্পপত্রে শোভিত করিয়া রাখিতেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই প্রথা বর্ত্তমান ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে পুনরায় কৃত্রিম অলঙ্কার আবির্ভূত হয়। এই সময়ে অনেক চীনদেশীয় প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। চুলের কাঁটার উল্টাদিকে কানখুস্কি রাখা ঐরূপ একটি চীনা প্রথা। কানখুস্কিটা সাবধানে রাখিবার জন্যই চুলে গুঁজিয়া রাখা হইত, কি, চুলের কাঁটার সঙ্গে কানখুস্কিটা পরে যোগ করা হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না; তবে এই প্রথাটি যে বিশেষ সুরুচির পরিচায়ক ছিল তাহা বলা যায় না। এই জাতীয় পুরাতন কাঁটাগুলিতে একটিমাত্র কাঠি থাকিত বলিয়া ইহার প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যটিই প্রধান বলিয়া মনে হয়। ক্রমশঃ এই কাঁটার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ইহার উপর কৃত্রিম ফুল পাতা বসান আরম্ভ হইল।

এই সময় মাথার গহনা প্রস্তুত করা একটা রীতিমত ব্যবসায় হইয়া

পাঁচ বৎসরের পুরাতন গাছের পাতার শিরা। | নয় বৎসরের গাছের পাতার শিরা। | কুড়ি বৎসরের গাছের পাতার শিরা। | ত্রিশ বৎসরের গাছের পাতার শিরা। | পঞ্চাশ বৎসরের গাছের পাতার শিরা।

পাতার শিরা দেখিয়া গাছের বয়স নির্ণয়।

গাছ যত পুরাতন হয় ততই তাহার পালনী কোষগুলি আকারে ছোট ও সংখ্যায় অধিক হইতে থাকে।
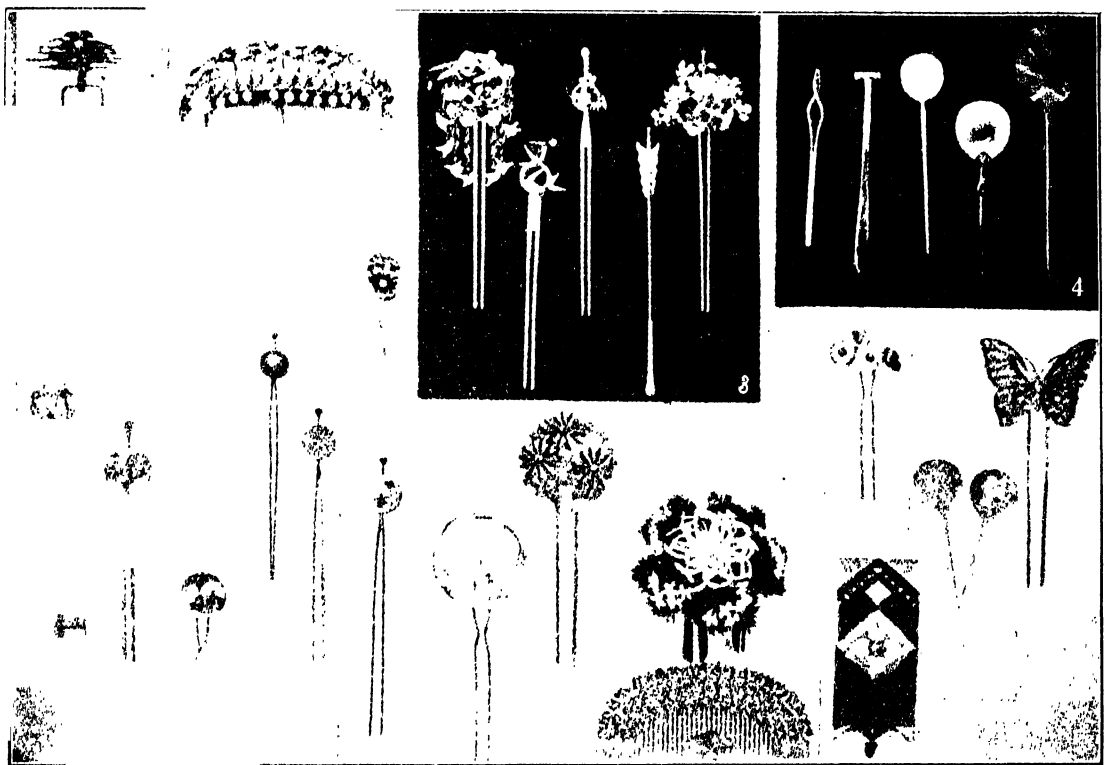
জাপানীর চুল বাঁধিবার চিরুনী, কাঁটা, ফুল ইত্যাদি গহনা।

দাঁড়াইল। সকলের কাঁটা ব্যবহার আরম্ভ করাতে নিপুণ শিল্পীদের বেশ সুবিধা হইল। খোঁপা বাঁধা, মাথা চুলকান ও কান পরিষ্কার করা তিন কাজই ইহা দ্বারা সম্পন্ন হইত।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাঁটা, সোনা রূপা কিম্বা কচ্ছপের খোলা হইতে নির্ম্মিত হয়। সাধারণ কাঁটাগুলিতে উপর দিকে ফুল পাতা কিছু একটা থাকিলেই যথেষ্ট শোভা হয়, তার উপর যদি ঘুঙুর ধরণের কিছু থাকে তাহা হইলে ত কথাই নাই, ভূষিতা রমণীর প্রতি-পাদক্ষেপে অলঙ্কারের রিনিঝিনি ধ্বনি উঠিতে থাকিবে। কম দামের কাঁটাগুলি সচরাচর কাগজ কিম্বা সেলুলয়েডের রঙীন ফুল দিয়া সাজান হয়। চুলের কাঁটার আভরণরূপে কলফুল, চন্দ্রকলা প্রভৃতির খুব প্রচলন আছে। এক সময় এই সব অল্পদামী জমকাল কাঁটার এত বেশী আদর ও প্রচলন হইয়া উঠিয়াছিল যে গভর্ণমেণ্ট কাঁটা নিবারণের ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে সামুরাই ও অন্যান্য উচ্চবংশীয়া মহিলাদের মধ্যে এই রীতি উঠিয়া যায়, এবং তাহাদের হেয় প্রথাটি নর্ত্তকী সম্প্রদায় ও বণিক সম্প্রদায়ের গৃহে বিরাজ করে। তোকগাওয়া শাসনবিভাগ অনর্থক বিলাসিতায় অর্থ নষ্ট হয় বলিয়া সোনা রূপার কাঁটা ব্যবহার নিষেধ করিয়া দেন। পরে এইসব ব্যক্তিগত বিষয়ের শাসন শিথিল হইয়া যাওয়ায় ইহার পুনরভ্যুদয় হয়। কিন্তু এই নিষেধের ফলে শিল্পীরা হাতীর দাঁত, হাড়, শাঁখ, ঝিনুক প্রভৃতি নূতন নূতন জিনিসের সুশোভন কাঁটা তৈয়ারী আরম্ভ করিল। আজ পর্য্যন্ত উচ্চবংশীয় মহিলারা পুরাকালের সেই মূল্যবান চুলের গহনা আর ব্যবহার করেন না। নিম্ন শ্রেণীতেই ইহার ব্যবহার আবদ্ধ। সামান্য সোনা-রূপার কাজকরা কচ্ছপের খোলার সাদাসিধা চিরুণীর ও অতি সামান্য অলঙ্কৃত কাঁটাই ভদ্রগৃহে অধিক প্রচলিত। আজকাল স্কুলের মেয়েদের মধ্যে খুব চওড়া রেশমি ফিতার ফাঁস দিয়া চুল বাঁধা একটা রীতি হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ক্রমশঃ সকল শ্রেণীর মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তোকিও সহরে প্রচলিত কোন কোন কাঁটা এক একটি বিরাট ব্যাপার। কাঁটার উপর গাছ, তাহার উপর রূপার ডালে ডালে ছোট ছোট পাখী ডানা মেলিয়া রহিয়াছে, যেন গাছপালার ভিতর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে; কোন-কোনটিতে ছোট ছোট রূপার টুকরা ঝুলান থাকে, মাথা নাড়িলেই পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়া বেশ টুংটাং করিয়া বাজিয়া উঠে। এইগুলি নর্ত্তকীরা (গেইশা) খুব ব্যবহার করে। দাইমো বংশের পরিচারিকারা মাথার কাঁটার উপর একটা ছোট থালায় সেই বংশের কৌলিক চিহ্নসকল আঁকিয়া রাখিত।

প্রাচীনকালে স্ত্রীপুরুষ সকলেই বড় চুল রাখিত, এবং সামান্য দুই একটা কাঁটা ও চিরুণী দিয়া চুল বাঁধিত। জাপানী প্রাচীন সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাহাদের মধ্যে চিরুণীর ব্যবহার আছে। এইসকল চিরুণী কাঠ, হাতীর দাঁত, সোনা রূপা প্রভৃতি দিয়াই তৈয়ারী হইত। কাঠের চিরুণীগুলি বার্ণিশ করা এবং খুব সুন্দর কাজকরা হইত। তাহাতে হীরা ও অন্যান্য দামী পাথরও বসান হইত। আজকাল কচ্ছপের খোলার
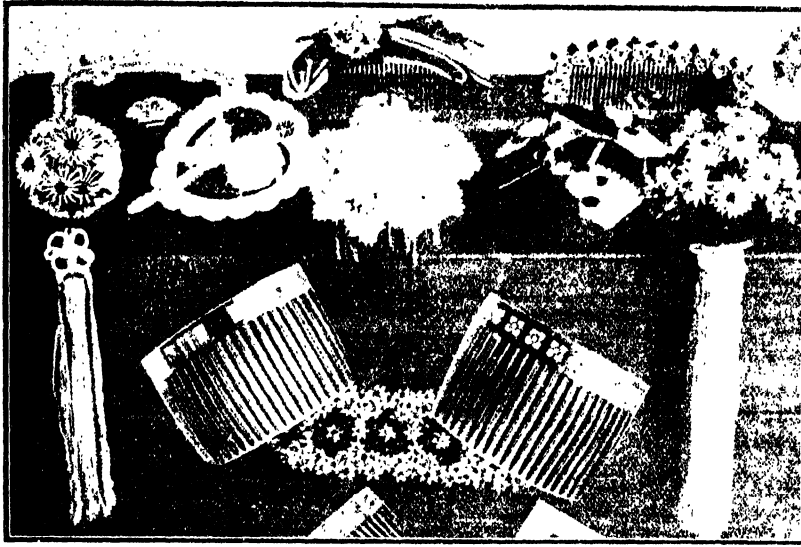
জাপানীর চুল বাঁধিবার চিরুনী ফুল কাঁটা ইত্যাদি।

অনুকরণে সেলুলয়েড দ্বারা চিরুণী নির্ম্মিত হয়। জাপানে ইয়ুরোপীয় ছাঁচের চিরুণীও হয়। বিদেশী আদবকায়দার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ধরণের চিরুণীরও প্রচলন হইতেছে। চুল ফাঁপাইবার জন্য মাথার স্প্রিংএর গোল একটা জিনিষ দিয়া তাহার উপর দিয়া চুল ফেলিয়া বিদেশী কেতায় চুল বাঁধাও চলে। তবে ইহার জন্য যে চিরুণী কি কাঙ্গাশীর ব্যবহার বন্ধ হইয়াছে তাহা নয়।

শ।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ কর্ত্তৃক প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ছয় আনা।

(১)

এই সন্দর্ভের সহিত বঙ্গীয় পাঠকগণের অনেকেই পরিচিত আছেন। ইহার আলোচনাও হইয়াছে অনেক। তথাপি গ্রন্থকারের ইচ্ছায় আজ আবার আমাকেও ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

"সংস্কৃত ভাষায় যে-সমস্ত শব্দ বা পদ, অপভ্রংশরূপে নহে, অবিকৃতভাবে বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে, সেগুলি কোন্ ব্যাকরণের শাসনে আসিবে?" এই প্রশ্ন উল্লেখ করিয়া ললিতবাবু সংস্কৃতানুরাগী ও সংস্কৃতবিরাগী উভয় পক্ষের যুক্তি উল্লেখপূর্ব্বক বর্ত্তমান বঙ্গভাষার অবস্থাটা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। সীতার বনবাস প্রভৃতিরই ভাষা যদি সাধু ভাষা হয়, তাহা হইলে সংস্কৃতানুরাগী পক্ষ যদি "নিয়ম করিতে চাহেন যে, সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে অধিকার লাভ না করিয়া যেন কেহ বাঙ্গালা সাধুভাষার চর্চ্চা করিতে না আসে," তবে এই উক্তিটিকে নিতান্ত অসঙ্গত বলা যায় না। এই যে সাধুভাষা ইহা কখনই খাঁটি বাঙ্‌লা নহে। অতএব কেবল খাঁটি বাঙ্‌লা জানিলে এই সাধুভাষাকে যথাযথ ভাবে জানিতে পারা যায় না। "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ও অজ্ঞানিদিগের মধ্যে রাজাশাসন ও শব্দ শাসন করিতে লাগিলেন। সংস্কৃতের অন্ততঃ স্থূল জ্ঞান না থাকিলে কেহ এরূপ রচনা করিতে পারিবেন না, বা সংস্কৃত অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না।"

ইহাদের প্রত্যেকের ভাষা খাঁটি বাঙলা। সংস্কৃত না জানিলেও ইহা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে ও রচনা করিতে পারা যায়। সংস্কৃত না শিখিয়াও পালি পাঠ ও পড়া লেখা বুঝা যায়। খাঁটি বাঙলা সম্বন্ধেও এইরূপ। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গভাষা খাঁটি বাঙলা নহে, খাঁটি (সংস্কৃত বিভক্তিহীন) সংস্কৃতও নহে; ইহা উভয়ের সম্মিশ্রণ। সাধুভাষাতেও উভয়ের সম্মিশ্রণ আছে।

যাহারা বলেন (৩ পৃঃ) "বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ-সম্পদ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু শব্দগুলি ব্যবহার করিবার সময় নিজের এক্তিয়ার মাফিক ব্যবহার করিবে।...তাহারা বাঙ্গালার আইন কানুন মানিতে বাধ্য।" তাঁহারা যদি বাঙলার নিজের "এক্তিয়ার" ও "আইন কানুন"টা কি, একবার ভাল করিয়া দেখেন, ঠিক করিয়া লন, তাহা হইলে অনেক গোলমাল চুকিয়া যায়। কিন্তু এদিকে তাঁহাদের অনেকেরই দৃষ্টি কম। কোন আইন কাহার উপর খাটিবে না খাটিবে, এই বিচার না করিয়া খামখেয়ালী কাজীর মত যেখানে-সেখানে যাহার-তাহার উপর জোর জবরদস্তির সহিত খালি হুকুম চালাইলে সুবিচার হইবে কেন? কাজীসাহেবকে যদি কেহ ঐ আইনটার উল্লেখ করিতে বলে, তাহা হইলে তিনি তখন শ্মশ্রু-কণ্ডূয়ন করিবেন। অপর পক্ষে যাঁহারা সর্ব্বত্রই সংস্কৃতের জয়-পতাকা উড়াইতে চাহেন, তাঁহাদেরও আশা কখনই হইবে না; কারণ বঙ্গভাষার স্বাধীনতাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অতএব সাধুভাষাই হউক, আর সাধারণ ভাষাই হউক,—এই বঙ্গভাষাটিকে যদি অপক্ষপাতে সত্যভাবে লিখিতে পড়িতে জানিতে বুঝিতে হয়, তাহা হইলে, তুমি সংস্কৃতানুরাগীই হও বা সংস্কৃত-বিরাগীই হও, তোমাকে সংস্কৃতও জানিতে হইবে, আর যাহাতে বঙ্গ-ভাষার বিশুদ্ধ প্রকৃতিটি জানিতে পারা যায়, তাহাও জানিতে হইবে। অন্যথা তোমার অভিমান পোষণ করা হইতে পারে, আসল কাজ করা হইবে না। উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া তুমি নানা স্থানে এক-একটা কিম্ভূত-কিমাকার জিনিস করিয়া ফেলিবে। ললিত বাবু ইহার উদাহরণ দিয়াছেন। ক্রমশ তাহা আলোচিত হইবে।

জগতের সমস্ত কার্য্যই এক একটা নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিতেছে, খাম-খেয়ালী ভাবে কিছুই হইতেছে না, আজ হয়ত কোনো নিয়ম অজ্ঞাত থাকিতে পারে, দুই দিন পরে তাহা প্রকাশিত হইবে। ভাষারও এইরূপ একটা নিয়ম আছে। এই নিয়মানুসরণকেই যদি বন্ধন বলিতে হয়, বল; কিন্তু ইহা না মানিলে চলিবে না, চলিতে পারেও না। তুমি যদি ইহা না মানিয়া অস্বাভাবিক ভাবে তাহার উপর কিছু চাপাইয়া দাও, তবে সে তাহা স্বীকার ত করিবেই

না, ছাড়িয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিবে; ইহাতে অসমর্থ হইলে ইহা তাহার একটা ব্যাধি বলিয়া পরিগণিত হইবে। শরীরের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের কিছু ঢুকাইয়া দিলে, যেরূপেই হউক, তাহা বাহির করিয়া ফেলিবার জন্য ইহার একটা নৈসর্গিক চেষ্টা থাকে। অতএব নূতন শব্দ উদ্ভাবন করিবার সময় লেখককে তাহার নিয়মটা লক্ষ্য রাখিতেই হইবে, তাহা হইলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, অভিজ্ঞ পাঠকেরা তাহা পাঠ করিয়া রসানুভব করিতে পারিবেন; অন্যথা তাঁহাদের রসাস্বাদে ঐ সকল অদ্ভুত শব্দ বিঘ্ন ঘটাইবে, এবং সেই জন্যই তাহারা দুষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

বঙ্গভাষার এই নিয়ম বা প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিতে হইলে ইহার প্রাচীন স্বরূপের ন্যায়, যাহাদের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ তাহাদেরও স্বরূপ প্রণিধানপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সংস্কৃতের ত কথাই নাই; তাহা ছাড়া পালি-প্রাকৃতের আলোচনা যে অত্যাবশ্যক, ইহা আর আজকাল কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিতে হয় না। কিন্তু ইহাতেও হইবে না। উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখার গ্রন্থরাজির মধ্যে গাথা নামে এক ভাষা আছে। বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী নেপাল তিব্বতে এই-সকল গ্রন্থ প্রচুর পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশিতও হইয়াছে। এই ভাষা আলোচনা করিয়া কখনো বলিতে পারিব না যে, বঙ্গভাষায় ইহার সামান্য প্রভাব আছে। আমি এ সম্বন্ধে এখানে কিছু বিশেষ ভাবে বলিব না। ইহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস বঙ্গীয় পাঠকগণ আমার পালি-প্রকাশের ভূমিকায় (৪৮-৬৪ পৃঃ) দেখিতে পারেন। হিন্দী, মৈথিলী, ও গুজরাটীর ন্যায় বঙ্গভাষারও সহিত অপভ্রংশ প্রাকৃতের অতি-নিকট সম্বন্ধ। হেমচন্দ্র ও মার্কণ্ডেয়ের (প্রাকৃত-সর্ব্বস্ব,—ভিজাগা-পটম) প্রাকৃত ব্যাকরণে অপভ্রংশ প্রাকৃতের কিছু বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহা পর্য্যাপ্ত নহে। এই ভাষার দুই একখানি পুস্তক পাওয়া গেলে আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইবে। আশা করা যায় কয়েক বৎসরের মধ্যে এতাদৃশ পুস্তক সকলের সুলভ হইবে।*

হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রাদেশিক ভাষাগুলিও অপরিবর্জ্জনীয়। এইরূপে একটা আলোচনা করিতে পারিলে বঙ্গভাষার 'এক্তিয়ার' ও "আইনকানুন" কি † তাহা মালুম হইবে। শুধু চীৎকার করিয়া ফল নাই।

ইংরেজী ভাষায় এরূপ হইয়াছে, ফরাসী ভাষায় সেরূপ হইয়াছে, অতএব বঙ্গভাষাতেও এরূপ সেরূপ হইবে না কেন?—এ ন্যায় ন্যায়ই নহে। সংস্কৃতও ভাষা, ইংরেজীও ভাষা; সংস্কৃতে যখন দ্বিবচন আছে, তখন ইংরেজীতেও কেন তাহা থাকিবে না? এরূপ তর্ক করিলে বেশ একটা হৈচৈ গোলমাল হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত তাহা তর্কই নহে। অতএব এরূপ যুক্তিতে ভাষাকে লইয়া টানাটানি করিলে কোন সুফলের আশা নাই।

অরুন্তুদ দেখিয়া মর্ম্মন্তুদ, অথবা অরণ্যানী দেখিয়া বনানী লিখিবার অনুকূলে কোন নিয়ম বা যুক্তি নাই। লেখক উত্তর করিতে পারিবেন না তিনি এই অভিনব শব্দ উদ্ভাবনে সংস্কৃত বা বঙ্গ-ভাষা অনুকরণ করিয়াছেন, তাঁহার ঐ শব্দ দুইটি না সংস্কৃত না বাঙ্‌লা। রহস্য হইতেছে এই যে, তিনি অনুরূপ সংস্কৃতই চাহিতেছিলেন কিন্তু অজ্ঞতাবশত ঐ এক অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা একবারে অমার্জ্জনীয়। নূতন শব্দ উদ্ভাবন করিতে হয় কেন করিব না? কিন্তু সংস্কৃতই কর, আর বাঙ্‌লাই কর, একটা নিয়ম অনুসরণ করিয়া কর। অন্যথা তাহা দুষ্ট ও বর্জ্জনীয় হইবে।

কিন্তু যতই কেন নিয়ম থাকুক না, যতই কেন বন্ধন দেওয়া যাউক না, প্রত্যেক লেখকের নিকট বসিয়া কেহ তাঁহার লেখাগুলি শোধন করিয়া দিতে পারে না। আর লেখক, শোধক, সকলেই সর্ব্বত্র পূর্ণশক্তি হয় না; ভ্রম, প্রমাদ, অজ্ঞতা, অল্প বা অধিক মাত্রায় সকলেরই থাকে। ইহার ফলে যে-সকল দুষ্টপদ ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাদের কতকগুলি অনাদৃত না হইয়া সাধু বলিয়াই কালে চলিয়া যায়। পরবর্ত্তী নিয়মকর্ত্তারা নিয়মাবলীতে এগুলি গ্রহণ করিয়া লন। কিন্তু তাহা বলিয়া লেখনীর অসংযমকে ত প্রশ্রয় দিতে পারা যায় না। আর যতদিন ভবিষ্যৎ নিয়মকর্ত্তারা মর্ম্মন্তুদকে মানিয়া না লইবেন, ততদিন ত তাহা অগ্রাহ্য। মর্ম্মন্তুদ-লেখক মহাশয়েরা অবশ্যই মনে রাখিবেন সেই নিয়মকর্ত্তারা ইহা মানিবেন কি ফেলিবেন তাহা ঠিক নাই, আর তাঁহাদের আবির্ভাবের কালও এখনো অনিশ্চিত। তাঁহারা নিজে বর্ত্তমান, এবং বর্ত্তমান পাঠকগণের জন্য লিখিতেছেন: এই বর্ত্তমান পাঠকগণের নিকট তাঁহাদের এই-সকল পদের আদৃত হওয়ার সম্ভাবনা ত দূরে, বরং পদে-পদে তিরস্কৃতই হইতে হইবে। ব্যাকরণ-বিভীষিকা এই শ্রেণীর লেখকগণের চক্ষু ভাল করিয়া ফুটাইয়া দিবে।

ললিতবাবু স্পষ্টতই বলিয়াছেন (৫ পৃঃ), তিনি "শিক্ষা ও সংস্কার-বশে অনেক স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগের দিকে কিছু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন।" সংস্কৃতের এতটা ঝোঁক বাঙ্‌লা সামলাইতে পারিবে না: জোর করিলে তাহাকে জড়সড় হইয়া পড়িতে হইবে। বিশেষত অনাবশ্যক অতটা ঝোঁক দিবার প্রয়োজনই বা কি, এবং আমাদের অধিকারই বা কি আছে। দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। ললিতবাবু

* সেদিন জেকোবি সাহেব (Dr. H. Jacobi) ভারতভ্রমণে আসিয়া দুই তিন খানি অপভ্রংশ প্রাকৃতে লিখিত পুঁথি পাইয়াছেন। Jaina Swetambara Conference Herald, Vol X, No 8-9, pp.255-256.)

† "সে কি খাইয়াছে," এবং "সে কী খাইয়াছে," এই দুইটার ভেদ বুঝাইতে গিয়া মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিছুদিন হইল কী চালাইয়াছেন, এবং কতিপয় লেখক তাহা অনুসরণও করিয়াছেন। বিদ্যাপতির রচনায় কতকটা ইহা সমর্থন করা যায়:—

"বিদ্যাপতি কহ কী কহব আর।" ৫৭-১০ (পরিষৎ-সংস্করণ)।

"আওর কী কহব সিনেহ তোর।
সুমরি সুমরি নয়ন লোর॥ ৯৮-১০।

এইরূপ অনেক। দ্রষ্টব্য—১১১-৪, ২৮৪-৪; ৩৯১-৬; ৪২২-৬, ৮; ৪৬১-১৩; ইত্যাদি। আবার

"শুনি কহে জটিলা ঘটল কি অকুশল।
ঘর সঞে বাহর হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি হেরহ যোগি
কিয়ে অকুশল কহ মোয়॥" ৫০৪-৪;

জটিলা (ললিতার কথা) শুনিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল (বধূর) কি অমঙ্গল হইয়াছে? তখন বধূর হাত ধরিয়া যোগীকে বলিল যে, হে যোগী, বধূর কি যে অমঙ্গল হইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন।

কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ নহে—"কি কহব রে সখি" (৩৬৪-২)। এ প্রকার আরো আছে। পুস্তকের পাঠশুদ্ধির দিকে কতটা নির্ভর করিতে পারা যায়, তাহাও বিবেচ্য।

বলিয়াছেন (৬ পৃঃ) বঙ্কিমচন্দ্র সিঞ্চন, সিঞ্চিত চালাইয়াছেন। যদিও এই পদ চলিতেছে, তথাপি সেচন, সিক্ত লেখাই তাঁহার নিকট সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু বাঙ্‌লার ধারা অনুধাবন করিলে বলিতে হইবে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রবর্ত্তক নহেন, এবং খাঁটী বাঙলায় তাহার প্রয়োগও কোনোরূপে দূষণীয় নহে সেচন, সিক্ত লিখিব, আবার সিঞ্চন, সিঞ্চিত ও লিখিব। পূর্ব্বাচার্য্যেরা ইহাই উপদেশ দিয়াছেন—

"নীরজ নয়ানে নব ঘন সিঞ্চনে
পূরল মুকুল অবলম্ব।"
গোবিন্দদাস, বৈষ্ণবপদাবলী (বসুমতী) ২৪৯ পৃঃ।

"দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিঞ্চুক ধারা।"
বিদ্যাপতি, ঐ ৫২ পৃঃ।*

পালি ও প্রাকৃতে এরূপ অনেক, এবং ব্যাকরণ অনুসারে কোনো বাধাই নাই।

"সিঞ্চিও (সিঞ্চিতঃ = সিক্তঃ) তুহ বলেন বলেহিং।"
কুমারপালচরিত, ৬-৬১।

আবার সিত্ত (সিক্ত) পদও হয়। ঐ, ২-৬৫ ; গউড়বহ, ৬৪৭। সংস্কৃতেও ইহার সদ্ভাব আছে, ইহা আমার পালিপ্রকাশের ভূমিকায় (৮৮ পৃঃ) দেখাইয়াছি। রামায়ণে (২-১০৭-৯) অভিসিঞ্চন আছে। হেমাদ্রির চতুর্বর্গ চিন্তামণিতে সিঞ্চন আছে (M. M. Williams তাঁহার অভিধানে ইহা বলিয়াছেন)। ইহার ন্যায় কর্ত্তন স্থলে কৃন্তন পদের বহুল প্রচারের কথাও সেখানে বলিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আরো কয়েক স্থানে পাইয়াছি, তাহাই এখানে বলিব। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে (১-১৯-১৪) শল্যকৃন্ত (পালিতে কিন্তু শল্লকত্ত)। আবার দিব্যাবদানে (৫৩৭-১৪, ৫৩৯-৫) নিকৃন্তিত (= নিকৃত্ত), ছান্দোগ্যোপনিষদে (৬-১-৫) নিকৃন্তন। বৈদিক কৃন্তত্র শব্দও সুপ্রসিদ্ধ (ঋগ্বেদ, ১০-৮৬-২০ ; অথর্ববেদ, ২০-১২৬-২০ ; ইত্যাদি ; দ্রষ্টব্য উণাদী সূত্র, ৩-১০৮)। এইরূপেই ভাগবতে (১-১৮-৪৪) বিলুম্পক (= বিলোপক) দেখা দিয়াছে। পালিতে এরূপ অনেক আছে, এবং ব্যাকরণানুসারে তাহা অনুমোদিত। মহাসঙ্গীতিতে ৪২২ পৃঃ) ঠিক এই পদটিই আছে। তুলঃ আলিম্পন (লেপন করা) ; অগ্নিসংযোগ অর্থে এই পদটি মিলিন্দপ্রশ্নেও (২-২-৩ ; ৩০ পৃঃ আমার সংস্করণ) আছে ; নিলিম্প (দেবতা)।*

ললিতবাবু স্বয়ংই দেখাইয়া দিয়াছেন, ভারতচন্দ্র অসকৃৎ সৃজন লিখিয়াছেন (৬ পৃ), তবুও তিনি কেন বলিলেন অক্ষয়কুমার তাহা চালাইয়া দিয়াছেন ? চণ্ডীদাস যে আরো বহুপূর্ব্বে লিখিয়াছেন

"নারীর সৃজন অতি সে কঠিন
কেবা সে জানিবে তায়।" রমণীমোহন-
সংস্করণ, ২৫৯ পৃ-; বৈষ্ণবপদাবলী (বসুমতী) ১৫০ পৃ।

* পরিষৎ-প্রকাশিত পুস্তকে "শুন শুন মাধব কি কহব আন" ইত্যাদি পদটি নাই।

পাণিনি ইহা ধরেন নাই, তাঁহার বার্ত্তিককার ধরিয়া ফেলিলেন "নৌ লিম্পেঃ", ৩-১-১৩৮। ইনি আরও একটি ধরিলেন গোবিন্দ, —"গবি চ বিদেঃ সংজ্ঞায়াম্"। কিন্তু ভাষ্যকার বলিলেন, ইহাও অতি অল্পই বলা হইল, কেবল গো শব্দ বলিলে হইবে না, গ বা দি বলিতে হইবে :—"অত্যল্পমিদমুচ্যতে গবীতি, গবাদিষ্বিতি বক্তব্যম্।" (যথা অরবিন্দ।)

সংস্কৃত ব্যাকরণের অধিকারের মধ্যে এই জাতীয় পদকে না আনিয়া প্রাকৃত বা বঙ্গভাষার ব্যাকরণের অধিকারে আনা উচিত। কিন্তু ইহা হইলেও নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র ইহাদের প্রয়োগ শোভন হইবে না। এ বিষয়ে রচনা-রীতিকে অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। যেরূপ রচনায় পূর্ব্বাচার্য্যেরা ইহাদিগকে প্রয়োগ করিয়াছেন আধুনিক লেখকগণের সেইরূপ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। অথবা তিনি যদি বিশেষ কোন রীতি উদ্ভাবন করিয়া ঐ-সকল পদের দ্বারা রচনার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতে পারেন, করিবেন। বঙ্গভাষায় ঐ-জাতীয় পদ অশুদ্ধ নহে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের সক্ষম তাঁহার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে ; আমরাও ইহার সমর্থনে অক্ষম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উভচর, মনান্তর এবং ললিতবাবুর আর আর কথা আমরা ক্রমশ আলোচনা করিয়া দেখিব।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা

মরিস মেটারলিঙ্ক বিরচিত।

ব্যক্তিগণ।

আর্কেল, আলিমণ্ডির অধিপতি।
গেনেভিভ, পিলীয়াস ও গোলডের মাতা।
পিলীয়াস }
গোলড } আর্কেলের দৌহিত্র।
মেলিস্যাণ্ডা।
শিশু ইনিয়লড, গোলড ও তাহার প্রথম স্ত্রীর পুত্র।
জনৈক ডাক্তার।
দ্বাররক্ষক।
পরিচারিকাগণ, ভিক্ষুকগণ, ইত্যাদি।

[পাত্রপাত্রীদের নামগুলি গ্রীক ; সুতরাং উহাদের ফরাসী উচ্চারণ না দিয়া, বানান-অনুসারে ইংরেজি উচ্চারণ যেরূপ হয় সেইরূপই দেওয়া হইল]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দুর্গতোরণ-সম্মুখে।

পরিচারিকাগণ [ভিতর হইতে]

দুয়ার খোল ! দুয়ার খোল !

দ্বাররক্ষক [ভিতর হইতে]

কে তোমরা ? এখানে এসে কেন তোমরা আমায় জাগালে ? ছোট দুয়ার দিয়ে বাহিরে যাও, ছোট দুয়ার দিয়ে যাও ; তা অনেক আছে !...

জনৈক পরিচারিকা [ভিতর হইতে]

আমরা তোরণ, শিলাপাট আর সিঁড়ি ধুতে এসেছি ; খোল ! খোল !

অন্য পরিচারিকা [ভিতর হইতে]

এখানে মস্ত ব্যাপার সব হবে !

তৃতীয় পরিচারিকা [ভিতর হইতে]

এখানে খুব আমোদ-প্রমোদ হবে ! শীঘ্র খোল !...

পরিচারিকাগণ

খোল ! খোল !

দ্বাররক্ষক

থাম ! থাম ! এ দুয়ার খোলবার সামর্থ্য আমার নেই ...এ দুয়ার কখনও খোলা হয় না...সকাল হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর...

প্রথম পরিচারিকা

বাহিরে যথেষ্ট আলো হয়েছে ; ফাঁক দিয়ে আমি সূর্য্য দেখতে পাচ্ছি...

দ্বাররক্ষক

এই নাও বড় চাবিগুলো...উঃ ! উঃ ! কি ভয়ানক কড়্ কড়্ শব্দ, হুড়কোগুলোর আর তালাগুলোর !... একটু সাহায্য কর আমাকে ! সাহায্য কর !

পরিচারিকাগণ

আমরা টানছি, আমরা টানছি...

দ্বিতীয় পরিচারিকা

এ কিছুতেই খুলবে না...

প্রথম পরিচারিকা

হ্যাঁ ! এই যে ! খুলছে ! ধীরে ধীরে খুলছে...

দ্বাররক্ষক

কি ভয়ানক ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ করছে ! সমস্ত বাড়ীটা এ জাগিয়ে তুলবে...

দ্বিতীয় পরিচারিকা [চৌকাঠের উপর আসিয়া]

ওঃ ! বাহিরে এর মধ্যে কত আলো হয়েছে !

প্রথম পরিচারিকা

সমুদ্রের উপর সূর্য্যোদয় হচ্ছে !

দ্বাররক্ষক

এইবার দুয়ার খুলেছে !... সম্পূর্ণ খুলেছে !...

[পরিচারিকাগণ চৌকাঠের উপর আসিয়া চৌকাঠ অতিক্রম করিল।]

প্রথম পরিচারিকা

আমি শিলাপাট হতে ধুতে আরম্ভ করব।

দ্বিতীয় পরিচারিকা

এ সমস্ত পরিষ্কার করতে আমরা কখনও পেরে উঠব না।

অন্যান্য পরিচারিকাগণ

জল আন ! জল আন !

দ্বাররক্ষক

হাঁ, হাঁ ; জল ঢাল, জল ঢাল, সমুদ্রের সমস্ত জল এনে ঢাল ; তা হলেও এর কিছু করতে পারবে না...

* *
*

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটি অরণ্য।

[একটি নির্ঝরের পার্শ্বে মেলিস্তাণ্ডা উপস্থিত। গোলডের প্রবেশ।]

গোলড

বন হতে বেরোতে আর কিছুতেই পারব না। জন্তুটা যে আমায় কোথায় এনে ফেললে তা ভগবানই জানেন। মনে করেছিলাম আমি তাকে মরণঘাই দিয়েছি ; আর এই ত এখানে রক্তের দাগ সব দেখছি। এইমাত্র সেটাকে আমি হারিয়েছি ; আমি নিজেই হারালাম না কি— আমার কুকুরগুলোও আর আমায় খুঁজে পাবে না।— যে পথে এসেছি সেই পথ দিয়েই ফিরি...কে যেন কাঁদছে না...ঐ যে ! ঐ ! জলের ধারে ও কি ?... না ? জলের ধারে বসে ছোট একটি মেয়ে কাঁদছে ? [কাশিলেন।] বোধ হয় শুনতে পেলে না। আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। [অগ্রসর হইতে হইতে মেলিস্তাণ্ডার স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন।] তুমি কাঁদছ কেন ? [মেলিস্তাণ্ডা চমকাইয়া উঠিলেন ও পলাইবার উপক্রম করিলেন।] কোনও ভয় নেই। ভয়ের তোমার কোনও কারণ নেই। এখানে একলাটি বসে কাঁদচ কেন ?

মেলিস্তাণ্ডা

আমায় ছুঁয়ো না ! আমায় ছুঁয়ো না !

গোলড

কোনও ভয় নেই...আমি তোমার কোনও...ওঃ ! তুমি সুন্দরী !

মেলিস্যাণ্ডা

আমায় ছুঁয়োনা! আমায় ছুঁয়োনা! নাহলে আমি জলে ঝাঁপ দেব!...

গোলড

আমি ত তোমায় ছুঁচ্ছি না...দেখ, আমি এইখানে দাঁড়ালাম, ঠিক গাছে পিঠ দিয়ে। ভয় পেয়ো না। কেউ তোমায় আঘাত করেছে?

মেলিস্যাণ্ডা

ওঃ! হাঁ! হাঁ! হাঁ!

[অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।]

গোলড

কে তোমায় আঘাত করলে?

মেলিস্যাণ্ডা

ওরা সকলেই! ওরা সকলেই!

গোলড

কি করে ওরা আঘাত করলে?

মেলিস্যাণ্ডা

আমি বলব না! আমি বলতে পারব না!

গোলড

শোন; ওরকম করে' কেঁদো না। কোথা থেকে আসছ তুমি?

মেলিস্যাণ্ডা

আমি পালিয়ে এসেছি! আমি পালিয়ে এসেছি!

গোলড

তা বুঝলাম; কিন্তু কোথা থেকে পালিয়ে এসেছ?

মেলিস্যাণ্ডা

আমি হারিয়ে গেছি!...হারিয়ে গেছি!...ওঃ! এইখানে হারিয়েছি...আমি এখানকার নয়...আমি ওখানে জন্মাই নি...

গোলড

কোথা থেকে আসছ তুমি? কোন্ দেশে তোমার জন্ম?

মেলিস্যাণ্ডা

ওঃ! ওঃ! এখান হতে অনেক দূরে...দূরে...দূরে...

গোলড

জলের তলে অত ঝক্‌ঝক্ করছে ওটা কি?

মেলিস্যাণ্ডা

কোথায়?—আ! ওটা তার-দেওয়া সেই মুকুট। কাঁদবার সময় ওটা পড়ে গেছে...

গোলড

মুকুট!—কে তোমায় মুকুট দিলে? আমি ওটা তোলবার চেষ্টা করছি...

মেলিস্যাণ্ডা

না, না; আমার চাই না! আমার চাই না!...তার আগে আমার মরণ ভাল...এখনি মরা...

গোলড

আমি সহজেই ওটা তুলতে পারি। জল ওখানে খুব বেশী নয়।

মেলিস্যাণ্ডা

আমি চাই না! তোল যদি তুমি, তাহলে আমি জলে ঝাঁপ দেব!...

গোলড

না, না; থাকগে যাক ওখানেই ওটা। সে যা হোক, সহজেই ওটা পাওয়া যেতে পারত। খুব চমৎকার মুকুট বলেই মনে হচ্ছে।—অনেক দিন হল কি, তুমি পালিয়ে এসেছ?

মেলিস্যাণ্ডা

হাঁ, হাঁ।...তুমি কে?

গোলড

আমি রাজপুত্র গোলড—আলিমণ্ডির বৃদ্ধ রাজা আর্কেলের দৌহিত্র...

মেলিস্যাণ্ডা

ওঃ! এর মধ্যেই তোমার চুল পেকেছে?...

গোলড

হাঁ; কয়েকটা মাত্র, এই কপালের উপর...

মেলিস্যাণ্ডা

আর তোমার দাড়িতেও...ওরকম করে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন?

গোলড

আমি তোমার চোখ দুটি দেখছি। তুমি কখন চোখ বোজ না?

মেলিস্যাণ্ডা

হাঁ, হাঁ বুজি বৈকি; রাত্রে বুজি...

গোলড

এত আশ্চর্য্য হয়ে দেখছ কি ?

মেলিস্যাণ্ডা

তুমি কি কোনও অসুর ?

গোলড

অন্য সব মানুষের মত আমিও একজন মানুষ...

মেলিস্যাণ্ডা

তুমি এখানে এসেছিলে কি জন্যে ?

গোলড

আমি নিজেই তা জানিনা। বনে আমি শিকার করছিলাম। একটা বনবরার পিছু নিয়েছিলাম। তারপর পথ হারালাম!...তুমি দেখতে খুব ছোট। বয়স কত তোমার ?

মেলিস্যাণ্ডা

আমার একটু একটু শীত করছে...

গোলড

আমার সঙ্গে আসবে ?

মেলিস্যাণ্ডা

না, না ; আমি এইখানেই থাকব..

গোলড

একা এখানে তুমি কিছুতেই থাকতে পারবে না। সমস্ত রাত্রি এখানে তুমি কিছুতেই থাকতে পারবে না... তোমার নাম কি ?

মেলিস্যাণ্ডা

মেলিস্যাণ্ডা।

গোলড

একা থাকলে তোমার ভয় পাবে। কেউ বলতে পারে না এখানে কি ঘটতে পারে...সমস্ত রাত্রি... একেবারে একা...কিছুতেই সম্ভব নয়। মেলিস্যাণ্ডা, এস, তোমার হাত দাও...

মেলিস্যাণ্ডা

উঃ! আমায় ছুঁয়ো না...

গোলড

চীৎকার করো না...আর তোমায় আমি ছোঁব না। শুধু আমার সঙ্গে এস। আজ রাত্রিটা খুব অন্ধকার হবে, খুব ঠাণ্ডা হবে। সঙ্গে এস আমার...

মেলিস্যাণ্ডা

কোনদিকে যাচ্ছ তুমি ?

গোলড

জানিনা...আমি নিজেই হারিয়ে গেছি...

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গপ্রাসাদের একটি দরদালান।

[আর্কেল ও গেনেভিভ উপস্থিত।]

গেনেভিভ

পিলীয়াসকে তার ভাই এই কথা লিখছে:—"এক দিন বনে আমি পথ হারিয়েছিলাম! সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাকে আমি এক ঝরণার পাশে বসে কাঁদতে দেখে-ছিলাম। তার কত বয়স তা জানিনা, কে সে তাও জানিনা, আর কোথায় তার দেশ তাও জানি না; এ সব বিষয়ে তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি না, কারণ সে আগে থেকেই কিছু হতে খুব ভয় পেয়েছে; যখনি তাকে জিজ্ঞাসা করি কি হয়েছিল তখনি সে ছোট ছেলের মত কেঁদে ওঠে, আর এত ভয়ানক কাঁদে যে দেখলে মনে ভয় হয়। যেই আমি তাকে ঝরণার পাশে দেখতে পেলাম অমনি তার মাথা হতে একটি সোনার মুকুট খসে জলের ভিতর পড়ে গেল। তার পোষাক পরিচ্ছদ কাঁটাতে ছিঁড়ে গিয়েছিল, তবু তার বেশ রাজকন্যার মতই ছিল। ছ মাস হল আমি তাকে বিবাহ করেছি, তবুও তার পরিচয় প্রথম দিনকার চেয়ে বেশী আর কিছু জানি না। পিলীয়াস, যদিও আমরা এক পিতার পুত্র নই, তা হলেও আমি তোমাকে ভাইয়ের অধিক ভালবাসি; এর মধ্যে, তুমি আমার প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করো ... আমি জানি আমার মা আমায় সানন্দে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি রাজাকে, আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধ মাতামহকে, ভয় করি; তাঁর দয়ার হৃদয় সত্ত্বেও আমি আর্কেলকে ভয় করি, কেননা এই অভূতপূর্ব্ব বিবাহ করে আমি তাঁর রাজনৈতিক জল্পনায় ঘা দিয়েছি; আর আমার মনে এই ভয় হচ্ছে যে সেই জ্ঞানীর চক্ষুর দৃষ্টির সম্মুখে মেলিস্যাণ্ডার রূপসৌন্দর্য্য

আমার নির্ব্বুদ্ধিতার ক্ষমার কারণ হতে পারবে না। সে যা হোক, এ সমস্ত সত্ত্বেও যদি তিনি মেলিস্যাণ্ডাকে নিজের কন্যার মত আদর করে গ্রহণ করতে রাজী হন, তা হলে চিঠি পাবার তিন দিন পরে সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের দিকের বরুজের উপর একটি আলো জ্বেলে রেখো। "আমাদের জাহাজের উপর হতে আমি সেটা দেখতে পাব; যদি তা না পাই, তা হলে আমি আরও এগিয়ে যাব, আর কখনও ফিরব না ..." এতে আপনার কি মত?

আর্কেল

কিছুই না। যা করবার ছিল হয়ত তাই সে করেছে। আমি খুব বুড়ো হয়েছি, তবুও আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার নিজের অন্তরটা ভাল করে দেখতে পাইনি; তবে অন্যের কাজ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করব কি করে? মৃত্যু হতে আর আমি বেশী দূরে নেই, কিন্তু তত্রাচ নিজের কাজই বিচার করবার আমার শক্তি হয়নি ... যতক্ষণ না চোখ বোজা যায় ততক্ষণ সকলেই সমস্ত ভুল করে ফেলে। ও যা করে ফেলেছে সেটা আমাদের কাছে আশ্চর্য্য লাগতে পারে; এইমাত্র। ওর বয়সও যথেষ্ট হয়েছে, তবুও ছেলেমানুষের মত একটি ছোট মেয়েকে ঝরণার পাশে পেয়ে বিবাহ করে ফেলেছে ... এটা আমাদের কাছে আশ্চর্য্য বোধ হতে পাবে; কারণ আমরা ভাগ্যচক্রের উল্টো দিকটাই শুধু দেখতে পাই ... এমন কি নিজেদের ভাগ্যলিপির উল্টো পিঠটাই দেখতে পাই ... এ পর্য্যন্ত আমার পরামর্শ অনুসারেই সে চলেছে; রাজকন্যা উরসুলার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে আমি তাকেই সুখী করতে চেয়েছিলাম ... ও একা থাকতে পারত না, আর ওর স্ত্রীর মৃত্যুর পর হতে একা থাকতে হলেই ও মনে কষ্ট পেত; এই বিবাহটা হতে পারলে বহুকালের যুদ্ধ বিগ্রহ আর বহুদিনের শত্রুতার অবসান হত ... ওর তা ইচ্ছে নয়। ওর যা ইচ্ছে তাই হোক। কখনও আমি কারও ভাগ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইনি; আর ওর ভবিষ্যৎ আমার চেয়ে ও-ই ভাল জানে। এ জগতে উদ্দেশ্যবিহীন ঘটনা বোধ হয় কিছু হতে পারে না। ...

জেনেভিভ

গোলড সব সময়েই খুব বুদ্ধিমান, খুব গম্ভীর, খুব দৃঢ় ... যদি পিলীয়াস এ রকম করত তবে না হয় বুঝতে পারতাম ... কিন্তু ও ... এত বয়স হয়েছে ... আমাদের মাঝে কাকে আনবে, কাকে? রাস্তার ধার থেকে একটা অজানা লোককে কুড়িয়ে আনছে ... ওর স্ত্রীর মৃত্যুর পর হতে ও কেবল ওর ছেলে ইনিয়লডের জন্যেই বেঁচে রয়েছে; আর যদিও ও আবার বিবাহ করছিল, সে কেবল আপনার ইচ্ছে বলে' ... বনের মধ্যে একটা ছোট মেয়ে ... ও সমস্ত ভুলে গেছে ... কি করি এখন আমরা?

[পিলীয়াসের প্রবেশ।]

আর্কেল

কে আসছে?

জেনেভিভ

পিলীয়াস আসছে। ও কাঁদছিল।

আর্কেল

এসেছ তুমি, পিলীয়াস? আর একটু কাছে এস, আলোয় তোমায় ভাল করে দেখি...

পিলীয়াস

দাদা মশায়, আমার ভাইয়ের চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আর একখান চিঠি পেলাম; সেটা আমার বন্ধু মার্সেলাসের। বন্ধু আমার মরণাপন্ন, সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে...

আর্কেল

তোমার ভাই ফেরবার পূর্ব্বেই তুমি যেতে চাও?— তোমার বন্ধু নিজেকে যতখানি অসুস্থ মনে করেন হয়ত তাঁর তত অসুখ নয়...

পিলীয়াস

তার চিঠিটি এত দুঃখের যে তার প্রত্যেক দু ছত্রের মাঝে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাওয়া যায়...মৃত্যু কোন্ দিন তার কাছে এসে উপস্থিত হবে তা সে ঠিক জানে, সে তাই লিখেছে...আরও লিখেছে যে যদি আমি ইচ্ছে করি তাহলে তার মৃত্যুর আগেই আমি সেখানে পৌঁছতে পারি, কিন্তু সময় নষ্ট করলে চলবে না। অনেক দূর

যেতে হবে। আর যদি আমি গোলডের ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি তাহলে হয়ত আর...

আর্কেল

তা হলেও একটু অপেক্ষা করা ভাল। এই নূতন লোকের আসার ফলে আমাদের কিসের জন্য প্রস্তুত হতে হবে তা এখন বলতে পারা যায় না। আর তা ছাড়া তোমার বাবা এখানে রয়েছেন না, এই উপরের ঘরে, খুব অসুখ হয়েছে না, হয়ত তোমার বন্ধুর চেয়ে বেশী...বাপ আর বন্ধুর মধ্যে কাকে চাও তুমি... ?

[প্রস্থান।]

গেনেভিভ

আজই সন্ধ্যায় আলোটি যেন নিশ্চয় জ্বেলে দিও, পিলীয়াস...

[পৃথকভাবে প্রস্থান।]

*

* *

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গপ্রাসাদের সম্মুখে।

[গেনেভিভ ও মেলিস্যাণ্ডার প্রবেশ।]

মেলিস্যাণ্ডা

বাগানে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কি প্রকাণ্ড বন, প্রাসাদের চারিদিকে কি মস্ত বন !...

গেনেভিভ

হাঁ ; আমিও যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন এতে খুব আশ্চর্য্য বোধ করেছিলাম, আর সকলেই এতে আশ্চর্য্য বোধ করে। অনেক এমন জায়গা আছে যেখানে সূর্য্যের আলো আদৌ দেখতে পাওয়া যায় না। তা হলেও খুব শীঘ্রই সব সয়ে যায়...অনেকদিন আগে... অনেকদিন আগে...প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে আমি এখানে এসেছিলাম...অপর দিকে তাকাও, সমুদ্রের আলো দেখতে পাবে...

মেলিস্যাণ্ডা

নীচে একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি...

গেনেভিভ

ঠিক ; কেউ এখানে উপরের দিকে আসছে...আ ! পিলীয়াস আসছে...তোমাদের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করায় ও যেন এখনও ক্লান্ত হয়ে রয়েছে...

মেলিস্যাণ্ডা

এখনও আমাদের দেখতে পায়নি।

গেনেভিভ

আমার মনে হয় দেখতে পেয়েছে, কিন্তু কি যে করতে হবে তা ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না...পিলীয়াস পিলীয়াস, ওখানে কি তুমি ?

পিলীয়াস

হাঁ !...আমি সাগরের দিকে আসছিলাম...

গেনেভিভ

আমরাও তাই আসছিলাম ; আমরা আলোকের সন্ধানে বেরিয়েছি ! অন্য জায়গার চেয়ে এই খানটায় একটু বেশী আলো রয়েছে ; তবুও আজ সাগর বিষাদময়।

পিলীয়াস

আজ রাত্রে ঝড় হবে। ক দিন ধরে প্রতি রাত্রেই ঝড় হচ্ছে, তা হলেও এখন চারিদিক কি রকম শান্ত...না জেনে এখন পাড়ি দিতে বেরোলে তাকে আর ফিরতে হবে না।

মেলিস্যাণ্ডা

বন্দর ছেড়ে কি যেন চলেছে...

পিলীয়াস

ওটা নিশ্চয় একটা মস্ত জাহাজ...ওর আলোগুলো খুব উঁচুতে, এখনি যখন ঐ আলোর জায়গায় এসে পড়বে তখন আমরা ওটাকে দেখতে পাব...

গেনেভিভ

দেখতে পাব বলে আমার মনে হয় না...সমুদ্রের উপর এখনও কুয়াশা হয়ে রয়েছে...

পিলীয়াস

বোধ হচ্ছে যেন কুয়াশা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে...

মেলিস্যাণ্ডা

হাঁ ; ঐ ওখানে আগে আলো ছিলনা, এখন দেখতে পাচ্ছি...

পিলীয়াস

ওটা জাহাজ-পথের আলো ; আরও আলো আছে, আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি না।

মেলিস্যাণ্ডা

জাহাজটা আলোর জায়গায় এসেছে...এর মধ্যেই অনেক দূরে চলে গেছে...

পিলীয়াস

ওটা বিদেশী জাহাজ। আমাদের সব জাহাজের চেয়ে ওটা মনে হচ্ছে বড়...

মেলিস্যাণ্ডা

ঐ জাহাজটাই আমায় এখানে এনেছিল !...

পিলীয়াস

সমস্ত পাল তুলে দিয়ে ওটা চলে যাচ্ছে...

মেলিস্যাণ্ডা

ঐ জাহাজটাই আমাকে এখানে এনেছিল। ওর মস্ত মস্ত পাল আছে...ওর পাল দেখেই আমি ওটাকে চিনতে পারছি...

পিলীয়াস

আজ রাত্রে ওকে অনেক ভুগতে হবে...

মেলিস্যাণ্ডা

আজই ওটা চলে যাচ্ছে কেন?...আর ওকে দেখা যাচ্ছে না...বোধ হয় ওটা ডুবে যাবে...

পিলীয়াস

খুব তাড়াতাড়ি আঁধার ঘনিয়ে আসছে...

[সকলের নিস্তব্ধ ভাব।]

গেনেভিভ

আর কি কেউ কথা বলবে না?...পরস্পরকে তোমাদের আর কি কিছু বলবার নেই?...এখন ভিতরে যাবার সময় হয়েছে। পিলীয়াস, মেলিস্যাণ্ডাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। আমি এখন চললাম, ইনিয়লডকে একটু দেখতে হবে।

[প্রস্থান।]

পিলীয়াস

সমুদ্রের উপর এখন আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না...

মেলিস্যাণ্ডা

আমি আরও অন্য আলো সব দেখতে পাচ্ছি।

পিলীয়াস

ও-সব জাহাজ-পথের আর আর আলোগুলো... সাগরের ডাক শুনতে পাচ্ছ কি?...ও হচ্ছে ঝড় ওঠার শব্দ...এস এই দিকে ফিরে যাই। তোমার হাত ধরব কি?

মেলিস্যাণ্ডা

এই দেখ, আমার হাত ভর্ত্তি রয়েছে ..

পিলীয়াস

তাহলে আমি তোমার বাহু ধরছি, পথটা উঁচু, ছাড়া বড় অন্ধকার...আমি বোধ হয় কাল এখান হ যাচ্ছি...

মেলিস্যাণ্ডা

ওঃ!... কেন, যাচ্ছ কেন?

[প্রস্থান]

সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

বুধাদিত্য ভেদযোগ

জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতেরা পূর্ব্বেই গণনা করিয়া বলিয়া ছিলেন যে, সন ১৩২১ সালের ২১ কার্ত্তিক শনিবা বুধাদিত্য ভেদযোগ হইবে। অর্থাৎ ঐ দিন সূর্য্যমণ্ডলে উপর দিয়া বুধ গ্রহকে গমন করিতে দেখা যাইবে বাংলাদেশে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির মধ্যে একমাত্র বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা এই বুধাদিত্য ভেদযোগের কথা প্রচা করিয়াছিলেন। এই পঞ্জিকার মতে কলিকাতায় বহিস্পর্শ ৩ ঘঃ ৫০ মিঃ ৪৩ সেঃ, ভেদারম্ভ ৩ ঘঃ ৫২ মিঃ ৫৭ সেঃ আর সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের ৩ ঘঃ ২৯ মিঃ ৩০ সেঃ এবং ৩ ঘঃ ৩০ মিঃ এতদুভয়ের মধ্যে ভেদারম্ভ হইবে। পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে পতিত হইলে চন্দ্রমণ্ডল দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল আবৃত হইয়া সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। আমরা চন্দ্রকে খুব বড় দেখিতে পাই, তজ্জন্য সূর্য্যগ্রহণকালে সূর্য্যের কতকাংশ, কোন গ্রহণে বা অধিকাংশ, চন্দ্র কর্ত্তৃক আবৃত হইতে দেখি। কিন্তু বুধ প্রভৃতি গ্রহগণকে পৃথিবী হইতে অতি ক্ষুদ্র দেখায়, সেই জন্য পৃথিবী বুধ ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে পতিত হইয়া বুধ কর্ত্তৃক যে সূর্য্যগ্রহণ হয়, তাহাতে সৌরমণ্ডল আবৃত হয় না, সূর্য্যবিম্বের উপর দিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি বুধকে একটি কালির কোটার ন্যায় ধীরে ধীরে গমন করিতে দেখা যায়। ইহাকে ইংরেজিতে Transit এবং আধুনিক বাংলায় উপগ্রহণ বলে। এইরূপ উপগ্রহণ সচরাচর ঘটে না, বহুবর্ষ অন্তর এক একবার এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই সকল উপগ্রহণ খালি চক্ষে দেখা অসম্ভব।

আমরা এই দুর্লভ উপগ্রহণটি দেখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলাম, এবং ২১ কার্ত্তিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি আফিসের কাজ সারিয়া বাটী আসিয়া দেখিলাম যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের ৩ ঘঃ ৩৫ মিঃ হইয়া গিয়াছে সুতরাং তখন ভেদারম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে দূরবীক্ষণসংযোগ আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমাদের ৩ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দূরবীণে এই বুধাদিত্য ভেদযোগ অতি চমৎকার দেখা গিয়াছে। দূরবীণে দৃষ্ট সূর্য্যমণ্ডলে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বের নিম্নে ভেদারম্ভ হইয়াছিল। একটি দুয়ানীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বুধগ্রহ কেমন ধীরে ধীরে সূর্য্যের পরিধি হইতে প্রায় ৩ ইঞ্চি ভিতর দিয়া উপরের দিকে গমন করিতে লাগিল, সে দৃশ্য অভিনব ও মনোরম। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আমরা উহা দেখিতে লাগিলাম। বুধ তাহার গম্য রেখার অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত যাইবার পূর্ব্বেই অস্ত হইয়া গেল, সুতরাং অন্ত দেখা আমাদের ভাগ্যে আর ঘটিল না। বঙ্গদেশের অথবা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান হইতে আর কেহ এই বুধাদিত্য ভেদযোগ দেখিয়াছেন কি না জানি না, তবে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার কর্ত্তৃপক্ষগণ যে এই ঘটনা দূরবীক্ষণযোগে দেখিয়াছেন এরূপ অনুমান হয়। এই বুধাদিত্য ভেদযোগ দেখিয়া বিশ্বাস হয় যে এই পাঞ্জিকার গণনা শ্রেষ্ঠ এবং ইঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতেই গণনা করিয়া থাকেন। এই বুধাদিত্য ভেদযোগ দেখিতে গিয়া সূর্য্যমণ্ডলের ঠিক নিম্নদিকে দুইটি বিশাল সৌর কেতু (Solar spot) দেখিয়াছি, উহাদিগকে এখনও কিছুদিন দেখা যাইবে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

জ্যোতিষদর্পণ ও আকাশের গল্প

(সমালোচনা)

অধ্যাপক শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রথম পুস্তক, এবং শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল দ্বিতীয় পুস্তক লিখিয়াছেন। জ্যোতিষ দর্পণে ২২২+১৬ পৃষ্ঠা, আকাশের গল্পে ১২৬পৃষ্ঠা আছে। দুইখানিরই আকারপ্রকার, বিষয়-আশায় প্রায় এক। জ্যোতিষদর্পণের বিষয়,—আকাশমণ্ডল, সূর্য্য সৌরজগৎ পৃথিবী চন্দ্র বুধ শুক্র মঙ্গল গ্রহ-কক্ষর বৃহস্পতি শনি ইন্দ্র বরুণ ভচক্র ও রাশিচক্র, গ্রহণ, ধূমকেতু উল্কাপিণ্ড ও উল্কাস্রোত, নক্ষত্রমণ্ডল ও নক্ষত্রজাতি, ছায়াপথ সৌর-জগতের গতি। আকাশের গল্পের বিষয়,—ব্রহ্মাণ্ড, মাধ্যাকর্ষণ, দূরবীক্ষণ বর্ণবীক্ষণ ফটোগ্রাফী, সৌরজগৎ, সূর্য্য চন্দ্র জোয়ার ভাঁটা [ভাটা ?] গ্রহণ, বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ, বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচ্যুন [নেপচুন], ধূমকেতু উল্কা, নক্ষত্রের সংখ্যা শ্রেণী দূরত্ব গতি মণ্ডল পুঞ্জ, পরিবর্ত্তনশীল অস্থায়ী ও যুগল নক্ষত্র, রাজসূর্য্য [?], নীহারিকা, ছায়াপথ, জগতের পরিণাম। অতএব "গল্পে" জ্যোতিষের মনোহারী বিষয় কিছু অধিক আছে। ইহাতে দৃষ্টি অংশ অধিক, "দর্পণে" গণিত অধিক। দুইই কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর যোগ্য, ও গল্প অনেক স্থলে বালপাঠ্য। দুইতেই আমাদের জ্যোতিষের কিছু কিছু উল্লেখ আছে। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে একটু থাকিলেও গল্পের প্রতি সাধারণ পাঠক অধিক আকৃষ্ট হইবেন। দুইএরই মলাট একরকম, কিন্তু কাগজ ছাপা, বিশেষতঃ চিত্র অধম। দর্পণের কিছু ভাল, কিন্তু বৃহস্পতি শনির যে প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা আজিকালি সাজে না। চন্দ্র মঙ্গল প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেওয়া হয় নাই; যেমন-তেমন চিত্র দেওয়া অপেক্ষা না দেওয়াই ভাল। কারণ পাঠক শিশু নহে যে সে ক এ করাত দেখিতে পাইলে ক মনে রাখিবে।

এখন জ্যোতিষ বলিতে ফল-জ্যোতিষ বুঝাইয়া থাকে। জ্যোতিষ-কল্পদ্রুম, জ্যোতিষ-রত্নাকর জ্যোতিষ-সারাবলী প্রভৃতি ফল-গ্রন্থের সহিত জ্যোতিষ-দর্পণ নামে বেশ মিশিয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকারও বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "কালক্রমে ভারতবর্ষে ফলিত জ্যোতিষই একমাত্র জ্যোতির্ব্বিদ্যা নামে পরিচিত হইতে লাগিল।" যখন এ আশঙ্কা আছে তখন জ্যোতির্ব্বিদ্যা নাম রাখিলে মন্দ হইত না। গ্রন্থকার পরে লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষে এযাবৎ আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। এই অভাব বিদূরণ করাই বর্ত্তমান গ্রন্থের [জ্যোতিষদর্পণের] উদ্দেশ্য।" ভারতবর্ষে হয় নাই বলাতে একটু অতিশয়োক্তি ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের কোথায় কি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহার সংবাদ আমার অজ্ঞাত; কিন্তু দেখিতেছি বঙ্গদেশেই আকাশের গল্প, বোধ হয়, এক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। মনে হইতেছে, বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি, আকাশ-কাহিনী নামের আর একখানা বহি প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানা দেখি নাই, তাহার বিষয়-আশয় জানি না। নাম হইতে অনুমান হয়, আকাশের গল্পের তুল্য হইবে। আকাশের গল্প—এ নামটাও ভাল লাগিতেছে না। গল্প জল্প ত এক, কাল্পনিক মিথ্যা প্রবন্ধ; আকাশের গল্প কিন্তু গল্প নহে, গুজব নহে, জ্যোতিষ্কের বিবরণ। আকাশের গল্প—আকাশসম্বন্ধীয় গল্প, যেমন বাঘের গল্প। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "পাষাণের কথা" লিখিয়াছেন। বহিখানির নাম হইতে মনে হইয়াছিল, পাষাণসম্বন্ধীয় কথা (a book on petrology)। কিন্তু দুই এক পৃষ্ঠা পড়িবার পর বুঝিলাম, পাষাণ কথক বলিয়া তাহার কথা এবং যদিও নিজের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছে, পরের, মানুষের সম্বন্ধেই বেশী বলিয়াছে। সার্থক নামের গুণে পাঠক জোটে; পুস্তকের নামে কুহেলিকার আবরণ যুক্তিযুক্ত নহে।

জ্যোতিষ-দর্পণ সম্বন্ধে আরও কিছু লেখা আবশ্যক মনে করিতেছি। কারণ এই গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ নিজ-প্রচারিত

বলিতেছেন। সাহিত্য-পরিষদের অভিপ্রায় অনুসারে ইহা লিখিত কি না, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে না। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "পরিশেষে জ্যোতিষ-দর্পণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের অন্তর্ভূত করিবার জন্য [করাতে ?] আমি পরিষদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।" সে যাহা হউক, যখন পরিষৎ নিজের নামে গ্রন্থখানি প্রচার করিতেছেন, তখন মনে হয় দেশে ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান প্রচারের কামনায় করিতেছেন। ইহা আনন্দের কথা। অদ্যাবধি পরিষৎ অনেক বহি প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একখানি ছাড়া অবশিষ্ট সব প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক, কয়েকখানা সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। এই একখানি অধ্যাপক ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের লিখিত নব্য রসায়নী বিদ্যা। জ্যোতিষ-দর্পণ ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক হইল।

বাঙ্গালা ভাষায় ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানপুস্তক প্রচারিত হয় নাই, এমন নহে। বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠের নিমিত্ত কয়েকখানা প্রকাশিত হইয়াছে। অপর পাঠের নিমিত্তও কয়েকখানা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ মাসিকপত্রে, এমন কি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতেও, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। আকাশের গল্পের ভূমিকায় অধ্যাপক শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন, "পাঠশালার বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সমাদর একেবারে নাই কি ? পঞ্চাশ বৎসর আগে যে আদরটুকু ছিল, এখন তাহাও নাই কি ? কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মনস্বীরা যাহার বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহা এমন নিষ্ফল হইল কেন ?" আমার মনে হয়, তাহা নিষ্ফল হয় নাই ; নিষ্ফল হইলে মাসিকপত্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে কে ?

বাঙ্গালাতে ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানপ্রচারে একটা অসুবিধা ঘটিয়াছে। সেটা আমাদের ইংরেজীতে শিক্ষা। আজিকালি কলেজে শত শত যুবক ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিতেছে ; পূর্ব্বে শিক্ষার প্রসার হয় নাই বলিয়া লোকে বাঙ্গালাতে বিজ্ঞান শিখিতে চাহিত। ইংরেজী প্রচলনের দিনে যেমন-তেমন-লেখা বিজ্ঞান-বহির আদর হইতে পারে না। কাজেই ইংরেজী শিক্ষিতকে বাঙ্গালার দিকে টানিতে হইলে কেবল বিজ্ঞানের নামের জোরে চলিবে না, অপর গুণ চাই। ইংরেজীতে শিখিয়া বাঙ্গালাতে শিখিবার একটা ক্লেশ আছে। পাঠক সে ক্লেশ কেন সহিবেন ? ইচ্ছা থাকিলে তিনি ইংরেজীতে এত বিভিন্ন ধরণের বহি পাইবেন যে তাহা ছাড়িয়া বাঙ্গালায় পুস্তক আছে কি না তাহা অন্বেষণও করিতে চাহিবেন না।

কিন্তু দেশের সকলেই ইংরেজী-শিক্ষিত নহে, কিংবা সকলেই কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা করে না। ইহাদের নিমিত্ত বহি চাই। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের প্রতি ইহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। অথচ সে-সব পাঠ্যপুস্তকের হাজার দোষ স্বীকার করিলেও যাহাদিগকে বিজ্ঞানের প্রথম ভাগ শিখিতে হইবে তাহাদিগের পক্ষে বালপাঠ্য-পুস্তক ত মন্দ নহে। যে বিষয় যে না জানে সে বয়সে বৃদ্ধ হইলেও সে বিষয়ে বালক। পাঠ্যপুস্তক বলিয়া দোষ হয় না ; লেখার দোষে, লেখকের কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে সকল পুস্তকই অপাঠ্য হইতে পারে। জ্ঞানার্জ্জনের সোপান আছে ; নিম্ন সোপান হইতে আরম্ভ না করিলে উচ্চে উঠিতে পারা যায় না। বিদ্যালয়ের নিমিত্ত লিখিত পুস্তক নিম্ন সোপান বলা যাইতে পারে।

কিন্তু বালপাঠ্যে অল্প থাকে, বালকের বুদ্ধির উপযোগী বিষয় থাকে। গোরুর চারি পা দুই শিং দেখাইয়া যুবজনকে ভুলাইতে পারা যায় না। ইহাদের নিমিত্ত পুস্তকে বিষয়-বাহুল্য থাকিলেও চলে না, রচনায় গুণ থাকা চাই। রচনার গুণে জানা কথাও পড়িতে ইচ্ছা যায়, দুরূহ বিষয়ের সব স্পষ্ট না হইলেও একটা স্থূল জ্ঞান পাওয়া যায়। যাঁহারা ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিয়াছেন, তাঁহারাও রচনায় আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এমন লেখক আছেন যিনি রচনা-চাতুর্য্যে অনিচ্ছুক পাঠককেও নিজের লেখা না পড়াইয়া ছাড়েন না। কিন্তু অমুক বিদ্যায় অমুক পারদর্শী বলিয়া তিনি তাহা অন্যের নিকট প্রচারেও পারগ না হইতে পারেন। কারণ নিজে জানা শেখা এক, অন্যকে জানানা শেখানা আর এক। ভাষায় অধিকার, রীতিতে সৌকুমার্য্য, ব্যাখ্যায় প্রসাদ, রচনায় অলঙ্কার না থাকিলে পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে কেন ? শুষ্ক ইন্ধনের প্রয়োজন পাকশালায় পাচকের নিকট ; ইন্দ্রশালায় সভ্যের নিকট নহে। জ্যোতিষদর্পণের ও আকাশের গল্পের ভাষা প্রায়ই প্রাঞ্জল কিন্তু রচনার অন্য গুণ প্রায় নাই। জ্যোতিষদর্পণে স্থানে স্থানে অপ্রসিদ্ধ ভাষা থাকাতে বরং রসভঙ্গ ঘটিয়াছে। "যেহেতু গতিবিজ্ঞানের উপরেই গ্রহজ্যোতিষের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, অতএব 'নিউটন সিদ্ধান্ত' নামে নিউটনের গতিবিজ্ঞান-বিষয়ক Principia নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদই বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বাদৌ আবশ্যক হইবে এবং তাহারই [?] বাঙ্গালা ভাষায় গণিতের প্রসার বৃদ্ধির প্রথম উপায় বলিয়া গণ্য হইবে।" "চন্দ্র ও সূর্যের উদয়াস্তকালীন ঈষৎ ডিম্বাকৃতি দর্শায়ন ভূবায়ু কর্ত্তৃক আলোক-রেখার ঐরূপ বক্রত্ব সাধনের ফল।" এইরূপ ক্লিষ্ট ভাষায় পাঠক ধাঁধায় পড়িয়া যাইতে পারেন। আমাদের শিক্ষা ইংরেজীতে। ইংরেজী পড়িয়া পড়িয়া কালে তাহা মাতৃভাষার তুল্য হয়, বাঙ্গালায় চিন্তা করিতে ভাবনা ব্যক্ত করিতে অসুবিধা ঠেকে। জ্যোতিষদর্পণের মলাটের উপরে সোনার কালীতে ছাপা আছে, "সাহিত্যপরিষদ্ গ্রন্থাবলী নং ৪২।" বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ যখন নং ৪২ প্রকাশের ভাষা পান নাই, তখন অন্যে পরে কা কথা। সাহিত্য-পরিষদের মহামহোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ব্যক্ত করিয়াছেন, বঙ্গীয় শব্দটা সংস্কৃত নহে, বঙ্গীয় সাহিত্য—ইহার অর্থে অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটিয়াছে। শাস্ত্রী সভাপতি মহাশয় নানা ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও ইংরেজীর কুহক এড়াইতে পারেন নাই ; তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "খৃষ্টাব্দের ৮০ কোটায় লোকের ধারণা ছিল।" (পরিষৎপত্রিকা ২১ ভাগ ১ সংখ্যা)। কম লোকের বয়স আশির কোটায় যাইতে পারে ; কিন্তু "খৃষ্টাব্দের ৮০ কোটা" নূতন পাইতেছি।*

অভ্যাস বড় বালাই ; তাই বাল্যকালে বাষ্পীয় যান শিখিলেও ট্রেন শব্দটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। জজকে জজ, হাইকোর্টকে হাইকোর্ট বলা নিষিদ্ধ, ও বিচারক, সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় বলা বিহিত হইলে কোন্ বাঙ্গালীর সুবিধা হইত, অদ্যাপি তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই। দত্ত-মহাশয় নেপচুন ইয়ুরেনস, এমন কি মঙ্গল বৃহস্পতির উপগ্রহগুলারও নাম বদলাইয়া কাহার সুবিধা করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি বলেন, "ইয়ুরোপীয় নাম আমাদের ভাষায় কর্কশ শুনায় বলিয়া

---

* খৃষ্টাব্দ, না খ্রীষ্টাব্দ ? কৃষ্ণ ও খৃষ্ট এক হইলে, ঐক্য দেখাইতে খৃষ্ট বানান সঙ্গত হইত। সংস্কৃতে ক্রিমি কৃমি, এবং গ্রাম্যজনের লেখায় গ্রীষ্ম স্থানে গৃষ্ম দেখিয়াছি, কিন্তু খৃষ্ট বানান কি সেইরূপ ? বঙ্গ শব্দ সংস্কৃত ; তাহাতে ঈয় দিলে বঙ্গীয় শব্দ সংস্কৃত হইল না। খৃষ্ট শব্দে ঈয় দিয়া খৃষ্টীয় করিলে শাস্ত্রী মহাশয় দোআঁশলার বাহিরে যাইতে বলিবেন। এটা বঙ্গীয় তুল্য দেশী সঙ্কর নহে, দেশী বিদেশীর সঙ্কর। এইরূপ ইয়ুরোপীয়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা লা-চার হইয়া পড়িতেছে।

তাহার [ইয়ুরেনসের] এবম্বিধ নাম-[ইন্দ্র] করণ করা হইয়াছে।" ইয়ুরেনস যদি কর্কশ হয়, ইয়ুরেন বা উরেন মধুর হইত না কি? নেপচুন নাম শ্রুতিকটু বলিতে পারি না। শনির উপগ্রহ টাইটান দত্ত-মহাশয়ের নিকটে তিতান হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষেও গ্রীক নাম ক্রোনস কোণ হইয়াছিল, কিন্তু ক্রোনসের আভিধানিক অর্থ ধরিয়া সংস্কৃতে তর্জমা হয় নাই। তা ছাড়া, শ্রুতিকটু হইলে নাম বদলাইতে হইবে, ইহাও ত বিষম বিধি। বুডহাউস্ সাহেবের নাম মিষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু কাষ্ঠগৃহ কি দারুসদন বলিলে কে চিনিবে? ইন্দ্র বরুণ কত কালের দেবতা, কে জানে। হঠাৎ তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিয়া গ্রহ-পঙক্তিতে বসাইতে হিন্দু রাজি হইবে না। সাহিত্যপরিষদের কোন কোন সদস্যের এইরূপ ভাষাশুচিতা বহুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। শুচিবাই অধিক হইলে রোগের মধ্যে গণ্য হয়। আকাশের গল্প লেখক এই বাতিকে পড়েন নাই।

বহুদিন হইতে সাহিত্যপরিষৎ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা লইয়া মস্তিষ্ক ক্লান্ত করিতেছেন, অদ্যাপি পরিভাষা নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই। এদিকে কিন্তু কালস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, লেখকগণ যাবৎ-তাবৎ শব্দ রচনা করিয়া পরিভাষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতেছেন। মাসিকপত্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে যে কত রকম শব্দ পাওয়া যায়, তাহা পরিষৎ নিশ্চয় লক্ষ্য করিতেছেন। ইংরেজীতে বিজ্ঞান জানা না থাকিলে সে-সকল শব্দ বোঝা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এক এক লেখকের এক এক শব্দ প্রিয়; দত্তমহাশয়ের এক প্রিয় শব্দ, পরিমাপ আছে। এখানে ভাষাশুচি হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালা মাপ মাপা আছে; কিন্তু সংস্কৃত উপসর্গ জুড়িয়া পরিমাপ শব্দ রচনার কি প্রয়োজন ছিল? স্থান-পরিমাপ, কাল-পরিমাপ, বস্তু-পরিমাপ ইত্যাদি না বলিয়া পরিমাণ বলিলে বুঝিতে পারা যাইত না কি? "দর্পণে" ইংরেজী mass অর্থে বস্তু, "গল্পে" জিনিস করা হইয়াছে। জিনিস অপেক্ষা বস্তু ভাল, বস্তু অপেক্ষা জড়, এবং জড় অপেক্ষা পিণ্ড ভাল বোধ হয়। দুই পুস্তকেই ফুট শব্দের বহুবচনে ইংরেজী ফিট গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় ফিট শব্দ নাই, হইতে পারে না। যে কারণে দশ জন সাধু দশজন সাধব হয় না, ঠিক সেই কারণে ফিট হয় না। বহুকাল হইতে আয়তন শব্দ ভুলে ঘনফল অর্থে চলিতেছে। আয়তন বরং পৃষ্ঠফল ক্ষেত্রফল বুঝাইতে পারে, ঘনফল বুঝাইতে পারে না। "দর্পণে" আয়তন কোথাও ঘনফল, কোথাও (১০১ পৃষ্ঠা) ক্ষেত্রফল হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দ ঠিক হইয়া গেলে বাঙ্গালাতে বিজ্ঞান লিখিবার প্রথম বাধা দূর হয়। আকাশের গল্পলেখক লিখিয়াছেন, "বৈজ্ঞানিক পুস্তক লেখা কঠিন কার্য্য।" কিন্তু কোন্ পুস্তক লেখা সোজা? পুস্তকের মতন পুস্তক লিখিতে বিদ্যা বুদ্ধি শ্রম লাগেই।

বাঙ্গালা ভাষায় ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান লেখা সহজ মনে করি। কারণ বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা; বাঙ্গালা যত সহজে হৃদয়ঙ্গম করি ইংরেজী তত সহজে করি না; ইংরেজীতে অভ্যাস থাকিলেও বিদ্যার সংস্কার জন্মিতে স্থায়ী হইতে সময় লাগে। ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইংরেজী ভাষা মজলিশী পোষাকের তুল্য তোলা থাকে, নিত্য জীবনে কাজে সহসা লাগে না। এই কারণে আমাদের ইস্কুল কলেজে অধীত বিদ্যা প্রায় নিষ্ফলা হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা ত একটা নূতন মানব জাতি নই যে পার্থিব যাবতীয় ব্যাপার সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় আমাদের সব নূতন ঠেকিবে। অনেক কালের সঞ্চিত জ্ঞান কিছু কিছু আছে; বাস্তু আছে তাহার উপর ভিত্তি তুলিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার ন্যায় কয়েক বিজ্ঞানের পোত গভীর ও আয়ত আছে। ইহার উপর উচ্চ ভিত্তি বিনা বিঘ্নে স্থাপন করা যাইতে পারে। সুখের বিষয় দুই গ্রন্থকার এই লাভ বিস্মৃত হন নাই। কোন কোন বিষয়ে গোড়াপত্তন আর একটু বিস্তৃত করিলে ভাল হইত।

বিজ্ঞানে দেশ কাল পাত্র পরিবর্ত্তন করিতে হয় না; অমুক দেশে সত্য, অমুক কালে সত্য, কিংবা তুমি আমি সে সত্য গ্রহণ করিতে পারিব না, এমন নাই। বিজ্ঞানপুস্তকে ইয়ুরোপের আবিষ্কারকের ও কর্ম্মীর নাম আসিতে পারে; তাহাও ঐতিহাসিক রীতিতে গ্রন্থ লিখিতে হইলে আসে, নতুবা নহে। বাংলার মাটি বাংলার জল, ভারতের আকাশ বায়ু পর্ব্বত প্রান্তর নদী সাগর অরণ্য পশু পক্ষী মানুষ প্রভৃতি সব, যাহা লইয়া আমরা, আমাদের সংসার, তাহার বর্ণনা ও উল্লেখহেতু তাহার চিত্রসমাবেশহেতু বিজ্ঞান রমণীয় করিয়া তুলিতে পারা যায়।

কিন্তু বিজ্ঞান লইয়া কাব্য রচনা সম্ভব হইলে সে কাব্য পড়িয়া বিজ্ঞান শেখা যায় কি? সে শেখা শেখা নহে যাহা আমার হয় না, সে শেখা পরের মুখে ঝাল খাওয়া হয়। অবশ্য অনেক বিষয় এই রকম শিখিতে হয়, অন্যের কথা শুনিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয়। সেটা শেখা হয় বটে, কিন্তু জানা হয় না। বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, জানিতে হইবে। যে পুস্তকে জানিবার উপায় বলা না থাকে, তাহা সম্পূর্ণ সফল নহে। অমুকে দেখিয়াছে মাপিয়াছে, জানিয়াছে; অতএব তুমি তাহা মানিয়া লও, মুখস্থ করিয়া রাখ—এই রকম আপ্তবাক্যে আজিকালির পাঠক সহজে আস্থা স্থাপন করেন না। সেটা নিজে জানিতে পারা যায়, সেটা বেলাও আপ্তবাক্য গ্রহণ করিলে জানিবার কিছুই থাকে না। সমালোচ্য দুই পুস্তক আপ্ত প্রমাণে লিখিত। দেখিতে জানিতে পাঠককে বলা হয় নাই।

ইহাতে কৃতিত্বের হ্রাস হইয়াছে। কারণ, পাঠককে নিশ্চেষ্ট রাখা হইয়াছে, তাঁহার কৌতূহল জাগাইয়া বাড়াইবার উপায় করা হয় নাই। যে বিজ্ঞান-গ্রন্থপাঠে কৌতূহল না জাগে তাহা নিষ্ফল; যাহাতে তাহার বৃদ্ধি না হয়, তাহাও প্রায় নিষ্ফল। পাঠককে বিজ্ঞানকর্ম্মে উদ্‌যুক্ত করিতে হইবে, তাঁহাকে স্বয়ং কৃতী করাইতে হইবে। তাহা হইলে গ্রন্থ সার্থক, গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক। গল্প এ-কানে শুনি ও-কান দিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু স্বয়ংকৃতীর নিকট গল্প বাস্তবে পরিণত হয়। শ্রুতকর্ম্মা অপেক্ষা দৃষ্টকর্ম্মা শ্রেষ্ঠ, দৃষ্টকর্ম্মা অপেক্ষা কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ।

কথায় কথায় পুথি বাড়িয়া যাইতেছে। সাহিত্যপরিষৎ বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশ করিতে যাইতেছেন দেখিয়া একটা আদর্শ ধ্যান করিতেছি। কেননা, সে সব পুস্তক বিদ্যালয়ের মাপকাঠির মতে রচিত হইবে না, রচনায় লেখকের প্রচুর স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু লেখকের স্বাধীনতা থাকিবে বলিয়া তাঁহাকে অপর এক দুই জন বিচারক বা সংশোধকের অধীনে রাখা আবশ্যক হইবে। লেখক যিনি হউন, যত বিজ্ঞ বিদ্বান হউন, এক মাথা অপেক্ষা দুই তিন মাথা নিশ্চয় সুফলদায়ক হইবে। বিশেষতঃ যখন বিভিন্ন লেখকের রচনা পুস্তকের প্রমাণ, আকার প্রকার, পারিভাষিক শব্দের সমতা সম্পাদন আবশ্যক, তখন এক কি দুই সংশোধক আবশ্যক। সাহিত্যপরিষৎ এ পর্য্যন্ত সংশোধকও নিয়োগ করেন নাই। ফলে দেখিতেছি পরিষৎ-প্রকাশিত নব্য-রসায়নী-বিদ্যা ও জ্যোতিষ-দর্পণ দুই রকমের হইয়াছে। সংশোধক থাকিলে নব্য-রসায়নী বিদ্যার প্রথম অংশে ও শেষ অংশে লঘুগুরু প্রকট হইত না, কিংবা এক অংশের সহিত অপর অংশ যোজিত হইত না। জ্যোতিষদর্পণের উপক্রমণিকার অমূর্ত্তকাল বিচার লুপ্ত হইত, এবং স্থানে স্থানে

ভাষার ও পারিভাষিক শব্দের পরিবর্ত্তন ও চিত্রের যোজনা হইত।

অন্যান্য বিজ্ঞানে যেমন, জ্যোতির্বিদ্যায় তেমন অনেক অনুমানের কথা আছে। অনুমানের কথাকে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত বলিতে ভাল বাসেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে পূর্ব্বপক্ষ নিরাস ও সিদ্ধপক্ষ স্থাপন থাকে। ইংরেজী theory এরূপ নহে। এই অর্থে মত বলা যাইতে পারে। বিজ্ঞানের যে শাখাই লিখি না, তাহাতে সিদ্ধান্ত ও অনুমান পৃথক রাখা উচিত। নতুবা বিজ্ঞান বি-জ্ঞান থাকে না।

এখন দুই এক ক্ষুদ্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি। জ্যোতিষদর্পণের এক স্থানে (১৫২ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে, "রাশিচক্র বিভাগ মহাভারত রচনার সমকালে (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কিংবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।" কিন্তু "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থে মহাভারত রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী লিখিত আছে। সে যাহা হউক, রাশিচক্র কল্পনায় জ্যোতির্বিদ্যার সর্ব্বাধিক জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছিল, এমন মনে হয় না। নক্ষত্রচক্র ছিল: তাহা দ্বারা গ্রহস্থিতি-জ্ঞাপন চলিত, এবং অদ্যাপি চলিতেছে।

এদেশে কত পূর্ব্বকালে বৃহস্পতি গ্রহ আবিষ্কার হইয়াছিল, দত্ত মহাশয় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পুষ্যা বৃহস্পতিযোগ দেখিয়া আবিষ্কার হইয়াছিল। প্রথমে মহারাষ্ট্রীয় বেঙ্কটেশ কেতকার মহাশয় এই যোগকাল গণনা করিয়া বলেন খ্রীষ্টের জন্মের ৪৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে বৃহস্পতি, গ্রহ বলিয়া জানা পড়িয়াছিল। আমি এই কাল গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এত বড় একটা কথা, যে কথায় বেদাদি গ্রন্থের প্রাচীনতা জড়িত, সেটা সিদ্ধ করা আবশ্যক মনে করিয়া বিলাতে যিনি বৃহস্পতিগণিতে নিপুণ তাঁহাকে পুষ্যাবৃহস্পতিযোগ-কাল গণনা করিতে অনুরোধ করি। তিনি গণিত পাঠাইয়া দেন এবং লেখেন এই যোগ খ্রীষ্টের ৪০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এ বিষয় প্রবাসীর ৪র্থ ভাগে "আমাদের নক্ষত্রচক্র ও রাশি" প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি দত্ত মহাশয় এই লব্ধ কাল অদ্যাপি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে এই যোগ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৭০০ বর্ষে ঘটিয়াছিল। সে যাহা হউক, উপস্থিত পুস্তকে এই সব কালবিষয়ক তর্ক না থাকিলে চলিত। আকাশের গল্প-লেখক নিবেদন করিয়াছেন, আকাশের গল্পের "অধিকাংশ উপাদানই [ই কেন ?] ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।" তা হউক; কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে, তাহা জানাইলে পাঠকের সুবিধা হইত, যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহারা সে সে গ্রন্থ পড়িয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। এই পুস্তকের পাদটিপ্পনীতে কয়েক স্থানে সংস্কৃত জ্যোতিষ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কেন হইয়াছে, তাহা বুঝিলাম না। লেখকের এত কথা যখন পাঠককে মানিতে হইবে, তখন হিন্দু জ্যোতিষের দুই একটা কথা মানা পাঠকের পক্ষে গুরুতর হইত না। বস্তুতঃ যে পুস্তকে দিবারাত্রির কারণ বুঝাইতে ইংরেজী বালপাঠ্য হইতে লম্প লইয়া জ্বালিতে হইয়াছে, সে পুস্তকে শ্রুতি ও জ্যোতিষসিদ্ধান্ত উদ্ধার নিতান্ত পাণ্ডিত্য ঠেকে। যে পুস্তকে "তোমরা হয়তো মনে করিতেছ তোমরা মঙ্গলের লোক হইলে" ইত্যাদি বালসম্বোধন আছে, সে পুস্তকে "জগতের পরিণাম" চিন্তায় গুরুলঘু অভাব বোধ হয়।

গণিতাধ্যাপক দত্ত মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষদর্পণ-রচনা কাম্য হইয়াছিল। কাম্য কর্ম্মসম্পাদনে ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু ফলের লাঘব হয় না। ইতি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

আলোচনা

মহীপাল-প্রসঙ্গ।

গত কার্ত্তিকের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের "মহীপাল-প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নে লিখিলাম। আশা করি নলিনী বাবু বিচার করিয়া দেখিবেন এবং প্রবাসীর পাঠককে জানাইবেন।

(১) নলিনী বাবু লিখিয়াছেন—"কুমিল্লার নিকটস্থ "বাঘাউড়া" গ্রাম হইতে মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরের লিপি বাহির হইয়া সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে, তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। সমতট প্রদেশে থাকিয়াই তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন।" লিপিখানিতে কি আছে তাহা আমরা জানি না, আশা করি নলিনী বাবু তাহার মর্ম্ম প্রবাসীতে প্রকাশ করিবেন। তাহাতে মহীপালের বংশপরিচয় থাকিলে তাহাও লিখিবেন।

সমতট হইতে সৈন্য চালনা করিয়া যে পালবংশীয় ১ম মহীপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন নাই, তাহা বলিতে পারা যায়। ঐ সময় দক্ষিণ বরেন্দ্রে দেওপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্ন শূর রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে মহীপাল জয় করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। সমতট হইতে উত্তর বরেন্দ্র গেলে দক্ষিণ বরেন্দ্র জয় না করিয়া যাওয়া যায় না। মহীপাল উত্তর বরেন্দ্রই প্রথম জয় করিয়াছিলেন।

(২) মুর্শিদাবাদ জেলার বিখ্যাত সাগরদীঘি দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র ১ম মহীপালের খনিত নহে। ঐস্থানে একখানি প্রস্তর-লিপি আছে, তাহাতে জানা যায় ১১০ বা ১৪০ শকে ঐ দীঘি খনিত হইয়াছে। ১১০+৭৮=১৮৮ খৃষ্টাব্দ বা ১৪০+৭৮=৮১৮ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু ১ম মহীপাল দশম শতাব্দীর শেষে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন। সুতরাং সাগরদীঘি খননকর্ত্তা মহীপাল স্বতন্ত্র।

(৩) নলিনীবাবুর মতে, "যোগীপাল মহীপাল গোষ্ঠীপাল গীত। ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত।" এই গীত দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র ১ম মহীপালের উদ্দেশ্যে রচিত। আমার মতে এই গাথা দ্বিতীয় মহীপালকে লক্ষ্য করিয়া রচিত। তিনি অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। রামচরিতে তাঁহার চরিত্র অতি জঘন্য ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তিনি বাস্তবিক সেরূপ ছিলেন না। নলিনীবাবু রাম-চরিতের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন—"২য় মহীপালের রাজত্ব-কালে কৈবর্ত্তগণ বিদ্রোহী হইয়া পালরাজ্য উল্টাইয়া দিয়াছিলেন।" এই কথাটা একেবারেই ভুল। গত শ্রাবণ মাসের "গৃহস্থ" পত্রিকায় আমি একথা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছি, বোধ হয় নলিনীবাবু তাহা পাঠ করেন নাই। মদনপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

> "তন্নন্দনশ্চন্দনবারিহারী
> কীর্ত্তিপ্রভানন্দিতঃ বিশ্বগীতঃ।
> শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ঃ
> দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভুব॥ ১৩

অর্থাৎ সেই (বিগ্রহপাল দেবের) চন্দনবারিমনোহর কীর্ত্তিপ্রভা-পুলকিত বিশ্বনিবাসিকীর্ত্তিত শ্রীমান মহীপাল নামক নন্দন মহা-দেবের ন্যায় দ্বিতীয় দ্বিজেশমৌলি হইয়াছিলেন।" *

এই শ্লোকে কেবল "নন্দন" শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায়, মহী-পাল পিতা বর্ত্তমানেই শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা হইলে

* গৌড়লেখমালা-বাণগড়লিপি।

অবশ্যই রাজা ভূপতি, নৃপতি ইত্যাদি কোন শব্দ থাকিত। তিনি যে শিবের ভক্ত ছিলেন তাহাও এই শ্লোকে জানা যাইতেছে। "ধান ভানিতে শিবের গীত," "ধান ভানিতে মহীপালের গীত" ইত্যাদি প্রবচন দ্বারাও তাহা সমর্থিত হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, মহীপাল রাজা না হইলে তাঁহার নাম তাম্রশাসনে বংশতালিকায় লিখিত হইয়াছে কেন? ইহার উত্তর ঐ শ্লোকেই দেওয়া হইয়াছে। মহীপালের কীর্ত্তিপ্রভা এত উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছিল যে বিশ্ববাসী তাহা কীর্ত্তন করিত। এই উক্তির সহিত "যোগীপাল মহীপাল" ইত্যাদি গাথা মিশাইলে তিনিই যে এই গাথায় স্থান লাভ করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। যিনি চন্দনবারিমনোহর কীর্ত্তিপ্রভাপুলকিত বিশ্বনিবাসিকীর্ত্তিত, তিনি কখনই রামচরিতের চিত্রের ন্যায় পাষণ্ড হইতে পারেন না। তিনি পাষণ্ড ছিলেনও না। অতএব উক্ত গাথা যে ২য় মহীপালের উদ্দেশ্যে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন পুণ্যাত্মা ঊর্দ্ধতন পুরুষের নামে পরিচিত হইতে কে না আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে? পালবংশের ইতিহাস কয়জন জানে? কিন্তু মহীপালের নাম আজিও গাথা সহ কীর্ত্তিত হইতেছে।

(৪) দিনাজপুরের অন্তর্গত মহীসন্তোষের সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নলিনীবাবু এই স্থানকে ১ম মহীপালের তাম্রলিপিলিখিত বিলাসপুর স্থির করিয়াছেন: তাহা হইতেই পারে না। বাণগড়লিপির, "স খলু ভাগীরথী-পথ-প্রবর্ত্তমান" ইত্যাদি শব্দে জানা যায় বিলাসপুর ভাগীরথীতীরে ছিল। আত্রেয়ী নদী অবশ্যই ভাগীরথী নহে।

(৫) আত্রেয়ীর পশ্চিম পারে বহুপ্রাচীন ভগ্নাবশেষসমাকীর্ণ ভাটশালা গ্রাম প্রাচীন ভটশালী গ্রাম হইতে পারে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

রাজপুতনায় বাঙ্গালী রাণী।

গত আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসীর "রাজপুতনায় বাঙ্গালী উপনিবেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে (৬৭৯ পৃঃ) অম্বররাজ মানসিংহের দুইজন বাঙ্গালী রাণীর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিকই মানসিংহের দুইজন বাঙ্গালী রাণী ছিলেন; ভৌমিক কেদার রায়ের কন্যা ও কোচবিহার-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ভগ্নী। কেদার রায়ের কন্যা মানসিংহ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইবার বিবরণ একাধিক বার মাসিকপত্রে ও গ্রন্থবিশেষে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের ভগ্নীর কোন সংবাদ বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে কি না অবগত নহি। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় সন্দেহপরবশ হইয়া লিখিয়াছেন যে "* * * তাহা হইলে অম্বররাজ মানসিংহের দুইজন বাঙ্গালী রাণী ছিলেন।"

আইন আকবরিতে (এইচ ব্লকমান অনুবাদিত ১ম, ৩৪০ পৃঃ) ও আকবর-নামায় মানসিংহের কোচবিহার-বিবাহ-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। "লছমীনারায়ণনে বাদসাহকো আপনা মদদ্‌গার বনানে কি লিয়ে, রাজা মানসিংহসে মেলনে চাহা: রাজা সলিম নগরসে (সেরপুর বগুড়া) আনন্দপুরমে গয়া, ওধারসে লছমীনারায়ণ ৪০ কোশ চল্‌কর্‌ আয়া। বতারিখ্‌ ১৭ জমাদিয়াল আউয়ালকো ছয়-ছওয়ারি দোনোকে মোলাকাত হুই। লছমীনারায়ণনে কুছ্‌ দিনোকে বাদ আপনে বহনকে সাদি রাজাকে সাথ কর দি।" (আকবরনামা, যোধপুর উর্দ্দু ও হিন্দি সংস্করণ ২৪৪ পৃঃ)

মাড়ওয়ারী ভাষায় বংশতালিকায় লিখিত "মহলরাজকী বেটী রাণী বঙ্গালনী পরভাবতী (প্রভাবতী)," কোচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ভগ্নী ও মল্লদেব বা মল্লরাজের কন্যা (বেটী) ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। মল্লদেব বা মল্লরাজ উচ্চারণবৈষম্যে "মহলরাজ" হইয়া থাকিবে। যথা প্রতাপাদিত্য—পরতাপদি, শিলাদেবী—সল্লাদেবী, প্রভাবতী—পরভাবতী ইত্যাদি লক্ষ্মীনারায়ণের পিতা মহারাজ মল্লদেব পরবর্ত্তীকালে নরনারায়ণ নামে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত রত্নমালা ব্যাকরণের মুখবন্ধে ও তাঁহা স্বনির্ম্মিত কামাখ্যা-মন্দিরের দ্বারলিপিতে, তাঁহার মল্লদেব নাম লিখিত আছে। কোচবিহারের ইতিহাসে তিনি মল্লদেব ও নরনারায়ণ উভয় নামেই পরিচিত।

প্রভাবতী নামটি কোচবিহার-রাজকন্যাগণের নামের অনুরূপ লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্রী রূপমতী নেপালরাজ প্রতাপমল্লের প্রধান মহিষী ছিলেন। আশা করি প্রবন্ধলেখক মহাশয় রাজা মানসিংহের বাঙ্গালী রাণী প্রভাবতীর সম্বন্ধে অধিক তথ্য সংগ্রহে শ্রম স্বীকার করিবেন। প্রভাবতী স্বামীসহ সহমৃতা হইয়াছিলেন; তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের কোন সংবাদ সংগ্রহ হইতে পারে না কি?

শ্রীআমানত উল্যা আহম্মদ।

বাঙ্গালা-শব্দকোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম, এ, বিদ্যানিধির সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দকোষ একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। বাঙ্গালা-সাহিত্য ভাণ্ডারে এরূপ একখানি কোষগ্রন্থের অভাব ইদানীং বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছিল, মনস্বী যোগেশবাবু আমাদের এই গুরুতর অভাব বিমোচনকল্পে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালাভাষাভাষী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে বঙ্গসরস্বতীর গৌরবোজ্জ্বল কিরীট আর একখানি মহার্ঘ রত্নের অপূর্ব্ব প্রভায় দীপ্তি লাভ করিবে।

একই শব্দ বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নার্থে প্রচলিত দেখা যায়। এজন্য এক প্রদেশের লোকের নিকট অন্য প্রদেশের ভাষা দুর্ব্বোধ্য। এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক যাহাতে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর সার্ব্বজনীন ভাষারূপে পরিগৃহীত হইতে পারে কোষকারের তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সম্পূরণার্থ গ্রাম্যলক্ষণাক্রান্ত শব্দাবলীর বিভিন্নাঞ্চলে প্রচলিত যাবতীয় অর্থের উল্লেখ করা উচিত কি না কোষকারকে তদ্বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, প্রবাসীর ১৪শ ভাগ ১ম খণ্ডের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় বাঙ্গালা শব্দকোষের আলোচনা-প্রসঙ্গে যেসকল শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি ভিন্নার্থে রঙ্গপুরে প্রচলিত। চারুবাবু সকল শব্দের ধাতুগত অর্থ খুঁজিয়া পান নাই এবং ব্যুৎপত্তিও নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোষকারের বিচারার্থে আমি তাহার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া ঐ-সকল শব্দের রঙ্গপুরে প্রচলিত অর্থ লিখিলাম। কোষকার বিচার করিয়া উক্ত শব্দগুলি কোন অর্থে প্রযুক্ত হওয়া সুসঙ্গত তাহা স্থির করিবেন।

পয়রা—যব

পাটনী—ডোম

পিসু—শিশু

পোয়ান—পোহানের অপভ্রংশ, উত্তাপ গ্রহণ

প্যাচ্‌প্যাচ্‌—কোন বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা

পাঁড়—ধান্য গাছ নামক কীটবিশেষ
পুরিয়া—ঔষধাদির মোড়ক যেমন সিঁদুরের পুরিয়া
ফাঁদি—ফাঁদ পাতিয়া হাতী ধরে যাহারা
ফিচা—পাখী বা মাছের পুচ্ছ
বিত্তি—বৃহতী
বিড়ি—পানের খিলি
বিনা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বোধ হয় বীণা শব্দের অপভ্রংশ
বেতরিবৎ—অশিক্ষিত।

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীস।

মন্তব্য। প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় সেহানবিস মহাশয়ের বক্তব্য আমায় পড়িতে দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা শব্দের প্রতি সেহানবিস মহাশয়ের অনুরাগ আছে। নচেৎ সে বিষয়ে লিখিতেন না। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর ভাষাই ত আছে। এই ভাষার কয়েকটা ভাখা আছে এবং ভাখা ভাষার একরূপতার বিরোধী। অতএব ভাষার শ্রীবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিলে ভাখার লোপও আকাঙ্ক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয় আমি বাঙ্গালা ভাষা নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। শব্দকোষ সমাপ্ত হইলে এ বিষয়ের সবিস্তর আলোচনা করিবার সুযোগ হইবে। ইতি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

যুদ্ধের উপকারিতা।

যুদ্ধের মধ্যে মন্দ যাহা, ভীষণ বীভৎস পৈশাচিক যাহা, তাহা সহজেই মনে আসে। সে-সকল কথা আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। কিন্তু ইহার সপক্ষে বলিবার যে কিছু নাই তাহা নয়। যে জাতি আক্রান্ত হইয়া বা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে জীবনের আর সমুদয় ব্যাপার ভুলিয়া গিয়া তুচ্ছ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ঠিক্‌ করিয়া লইতে হয় যে তাহারা প্রাণটাকেই বড় মনে করিবে, কেবল বাঁচিয়া থাকাটাকেই বড় মনে করিবে, না, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে। এরূপ স্থলে যুদ্ধ মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে প্রাণ এবং প্রাণের চেয়েও বড় কিছু একটা, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয় যাহা তাহা বাছিয়া লইতে হইবে। বেল্‌জিয়মকে জার্ম্মেনী বলিল, "তোমরা আমাদিগকে তোমাদের দেশের মধ্য দিয়া ফ্রান্স্‌ আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে দাও; যুদ্ধের শেষে তোমাদের দেশ ছাড়িয়া যাইব, তোমাদের স্বাধীনতায় হাত দিব না। কিন্তু যদি যাইতে না দাও, তাহা হইলে তোমাদের দেশ অধিকার করিব।" বেলজিয়ম দেখিল যে একবার জার্ম্মেনদিগকে দেশের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য লইয়া আসিতে দিলে, ফ্রান্সের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করা ত হয়ই, অধিকন্তু জার্ম্মেনীও দেশ দখল করিয়া বসিয়া থাকিবে। অতএব জার্ম্মেনীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করাই ভাল। যুদ্ধে আপাততঃ বেলজিয়ম হারিয়াছে বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেয় নাই। যদি যুদ্ধের শেষে বেলজিয়মকে পরাধীন থাকিতেও হয়, তাহা হইলেও একথা বেলজীয়রা পুরুষানুক্রমে বলিতে পারিবে যে তাহারা কাপুরুষ নয়। এই স্মৃতি ভবিষ্যতে আবার তাহাদিগকে মহৎ করিবে।

যুদ্ধে একএকটা জাতি যে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত দেখায়, তাহার মানেই এই যে সেই সেই জাতির অন্তর্গত একএকটি করিয়া মানুষ সুখ স্বার্থ বলি দেয়। বেলজিয়মের প্রধান কবি ও নাট্যকার মাত্যার্‌লিঙ্কের বয়স এখন ৫২ বৎসর। এখন তাঁহার আর সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার উপায় নাই। সেইজন্য তিনি, যে-সব কৃষক যুদ্ধ করিতে যাওয়ায় শস্যসংগ্রহ হইবার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, তাহাদেরই জায়গায় স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদের সঙ্গে মাঠে শস্য কর্ত্তন ও অন্যান্য চাষের কাজ করিতেছেন। খুব উৎসাহের সহিত করিতেছেন। সার্‌ হেনরি রস্কো বিলাতের একজন প্রধান রাসায়নিক। তাঁহার বয়স ৮০র উপর। তিনি যুদ্ধ করিতে যাইতে পারেন না। এইজন্য বলিয়াছেন যে যদি কোন রাসায়নিক-জিনিষের কারখানার কোন যুবা কর্ম্মচারীর যায়গায় আমাকে খাটাইয়া তাহাকে যুদ্ধে পাঠান চলে, তো, আমি তাহার কাজ করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাঁরা সব জগদ্বিখ্যাত মানুষ। কিন্তু জনসমাজে অপ্রসিদ্ধ হাজার হাজার লোক যুদ্ধে ব্যাপৃত প্রত্যেক দেশেই অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ ও সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। তাহারা সবাই যে অর্থের জন্য সৈনিক হইতেছে, তাহা নয়। অবশ্য বেতন লইলেই যে সাহসের মূল্য কমিয়া যায়, তাহাও নয়। এই কলিকাতা সহরের সেণ্টপল্‌স্‌ ক্যাথীড্রাল মিশন কলেজের একজন ইংরেজ অধ্যাপক এখানকার কাজ ছাড়িয়া দিয়া যুদ্ধে গিয়াছেন।

কত ধনী ব্যক্তি আহত সৈনিকদের চিকিৎসার

হাসপাতাল করিবার জন্য নিজের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দিতেছেন। দান ত কত লোকে কত প্রকারেই করিতেছেন। তাহার পর, শত শত পুরুষ ও নারী যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবাশুশ্রূষার জন্য গিয়াছেন। যুদ্ধে মানুষের নৃশংসতা যেমন দেখা যাইতেছে, তেমনি মানুষের দয়া ও অপরের সেবা করিবার প্রবৃত্তিরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু প্রাণের চেয়ে বড় যে আরও কিছু আছে, তাহা দেখাইবার জন্য যুদ্ধই যদি একমাত্র উপায় হইত, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে সেটা সৌভাগ্য বা সম্মানের বিষয় মনে করা যাইতে পারা যাইত না। বস্তুতঃ মানুষ যুদ্ধেই যে প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াছে, তাহা নহে। মানুষ নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য সবদেশেই ভীষণ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে; পুড়িয়া মরিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, কিন্তু তথাপি মিথ্যাচরণ করে নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই। ধর্ম্মপ্রচারের জন্যও নানা ধর্ম্মের উপদেষ্টারা প্রাণপণ করিয়াছেন ও প্রাণ দিয়াছেন। ক্রীতদাসে পরিণত হতভাগ্য মানুষদের মুক্তির জন্য, প্রতারিত পাপব্যবসায়ে নিযুক্ত নারীদের উদ্ধারের জন্য, ভীষণ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার জন্য, এবং এইরূপ আরো নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যের জন্য কত মহাত্মা প্রাণ দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য, সুমেরু ও কুমেরু মণ্ডল ও অন্যত্রস্থিত অজ্ঞাত দেশসকল আবিষ্কার করিবার জন্য, কত সাহসী পুরুষ প্রাণ দিয়াছেন। সুতরাং যদি কখন দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ উঠিয়া যায়, তাহা হইলেও এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই, যে, যুদ্ধের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চূড়ান্ত সাহস ও স্বার্থত্যাগ উদ্দীপন, বিকাশ ও প্রদর্শনের সুযোগও লয় পাইবে।

যুদ্ধের আর একটা ফল এই, যে, ইহার দ্বারা পৃথিবীর অলস, অকর্ম্মণ্য ও ভীরু, এবং রোগ, বিলাসিতা বা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় জীর্ণ জাতিসকল সম্পূর্ণ বা অংশত লোপ পায় এবং তাহাদের জায়গা দৃঢ়তর ও অধিকতর কর্ম্মঠ ও সাহসী জাতি দখল করে। জীর্ণ জাতিরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইলে প্রবলতর জাতির সহিত সংমিশ্রণে বা তাহাদের সহিত সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে তাহারা ক্রমশ মানুষ হইয়া উঠে। অতএব রণস্থলে মৃত্যুর তাণ্ডব কেবল ভয়াবহ ব্যাপার নহে। উহার সুফলও আছে।

তবে ইহাও ঠিক যে জীর্ণ জাতিকে স্থানচ্যুত বা বিলুপ্ত করিবার উপায় একমাত্র যুদ্ধই নহে। শ্রমের প্রতিযোগিতায়, শিল্পদক্ষতার প্রতিযোগিতায়, বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায়, অযোগ্যের স্থান যোগ্য অধিকার করিতেছে। ইহা দেখিবার জন্য বিদেশে যাইতে হয় না। আমাদের বাংলা দেশে পঁচিশ বৎসর আগেও মুটে মজুর মিস্ত্রী মাঝি মাল্লা মুদি ময়রা মুচ্ছুদ্দি ঝি চাকর রাঁধুনি আড়তদার প্রভৃতির কাজ প্রধানত কাহারা করিত এবং এখন কাহারা করে, তাহার খবর লইলেই বুঝিতে পারা যায়, বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে কেমন করিয়া কর্ম্মঠ আসিয়া অকর্ম্মণ্যকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে হটাইয়া দেয়।

যুদ্ধের আর এক ফল, পৃথিবীতে নানা দেশের ও নানা জাতির সভ্যতার আদান প্রদান। আলেকজাণ্ডার যখন এশিয়ার নানা দেশ জয় করিয়া পঞ্জাবের কিয়দংশ দখল করিলেন, তখন গ্রীক ও হিন্দুর মধ্যে সভ্যতা ও নানা বিদ্যার আদান প্রদান চলিতে লাগিল। যখন বিদেশী মুসলমানেরা ভারতের নানা প্রদেশ দখল করিল, তখনও আবার এইরূপ বিনিময় চলিতে লাগিল।

কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের উপায় একমাত্র যুদ্ধই নহে। বাণিজ্য ইহার অন্যতম উপায়। আরবেরা যে-সকল দেশ জয় করে নাই, যে-সব দেশে তাহারা কেবল বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করিয়াছে, সেখানেও আরবীয় সভ্যতার আলোক কিয়ৎ পরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে। কোন জাতির পক্ষে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্যান্য দেশের বিদ্যা শিক্ষা করা ও বিদেশী সভ্যতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়াও অসম্ভব নহে। জাপানীদের দেশ আধুনিক সময়ে বিদেশী দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত হয় নাই। কিন্তু জাপানীরা পাশ্চাত্য বিদ্যা কল কৌশল খুব শিখিয়াছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহাদিগকে খুব একটা ধাক্কা দিয়া তাহাদের প্রাণটাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে।

জাপানের দৃষ্টান্তের সমালোচনা করিয়া একথা বলা যাইতে পারে যে জাপান বিজিত হয় নাই বটে, কিন্তু

আমেরিকার নৌসেনাপতি (Commodore) পেরীর রণ-তরী-সকলের ভয়ে বিদেশীদিগকে জাপান আপনার বন্দরগুলিতে প্রবেশের ও বাণিজ্যের অধিকার দিয়াছিল। এবং সেই সূত্রে জাপানীদের পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত পরিচয় ঘটিয়াছে। অতএব দৈহিক বলপ্রয়োগ বা তাহার ভয় প্রদর্শন ব্যতিরেকেও সভ্যতা বিস্তারের অন্য দৃষ্টান্ত ইতিহাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। এই মহত্তম দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ হইতেই পাওয়া যাইবে। এখন আর ইহা নূতন কথা নয় যে তিব্বত, চীন, মধ্যএশিয়া ও জাপানে ভারতীয় বিদ্যা, সভ্যতা ও ধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছিল। ইহা যোদ্ধাদের দ্বারা হয় নাই। বণিক-দিগের দ্বারা কতদূর হইয়াছিল, বলিতে পারিনা। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টাদিগের দ্বারাই যে প্রধানত হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষের এই মহত্তম দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে সভ্যতাবিস্তারের জন্য যুদ্ধ ও বিদেশজয় একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। অতএব যদি ভবিষ্যতে কখনও যুদ্ধের আর চলন না থাকে, তাহা হইলেও, সভ্যতাবিস্তার বন্ধ হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই।

ব্রহ্ম, শ্যাম, আসাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে এবং জাভা, সুমাত্রা আদি দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার বিজেতা, বণিক, ঔপনিবেশিক ও উপদেষ্টাদিগের সমবেত চেষ্টায় হইয়াছিল।

এম্‌ডেনের বিনাশ।

জার্ম্মেন ক্রুজার এমডেন ইংরেজের অনেক বাণিজ্য-জাহাজ নষ্ট করিয়াছিল, মান্দ্রাজের দুর্গের উপর গোলা চালাইয়া কয়েকজন মানুষের প্রাণ বধ ও কিছু সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষেরই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনার হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। উহাতে ভারত-বর্ষের বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে বাণিজ্য-জাহাজের যাতায়াত বন্ধ হইতেছিল। যখন চলিতেছিল তখনও এমডেন জাহাজগুলি নষ্ট করিতে পারে এইরূপ ভয় থাকায় জাহাজে মালের ভাড়ার এবং মাল বীমার (Insurance) হার অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। পাট ও পাটনির্ম্মিত জিনিষের চালান বন্ধ হওয়ায় পাট বিক্রী বন্ধ ছিল। বিক্রী হইলেও চাষীদিগকে উহা মাটীর দরে ছাড়িয়া দিতে হইতেছিল। ইহাতে পাটচাষীদের অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এম্‌ডেন্ জাহাজ বিনষ্ট হওয়ায় এখন বাণিজ্যের অসুবিধা বহু পরিমাণে দূর হইল। ইহাতে চাষীদের ও ব্যবসাদারদের এখন কিছু সুবিধা হইতে পারে।

ভারতমহাসাগরে সুমাত্রা দ্বীপ হইতে কিছু দূরে কীলিং দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। নারিকেল ইহার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য বলিয়া ইহাকে নারিকেল দ্বীপপুঞ্জও বলে। এই কীলিংএ এম্‌ডেন সমুদ্রগর্ভস্থিত ইংরেজদের টেলি-গ্রাফের তার কাটিয়া দিয়া তারে খবর চলাচল বন্ধ করিতে গিয়াছিল। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। অষ্ট্রে-লিয়ার সীড্‌নী নামক একটি ক্রুজার তাহাকে তাড়া করে। এম্‌ডেন্ অগভীর জলে গিয়া পড়িয়া চড়ায় আটকা-ইয়া যায়। সেই অবস্থায় উহা পুড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধও কিছু হইয়াছিল। তাহাতে জার্মেনদের অনেক লোক মরিয়াছে; ইংরেজদেরও কিছু মরিয়াছে। যে-সকল জার্মেন বন্দী হইয়াছে, তাহাদিগকে বীরোচিত সম্মান দেওয়া হইতেছে।

জার্ম্মেনীর হারিবার একটি কারণ।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত কাহারা হারিবে, বলা যায় না। আপাততঃ যেরূপ সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রিয়া এখন যেরূপ হারিতেছে, শেষ ফলও সেইরূপ হইবে।

দেখা যাইতেছে যে যাহাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আধু-নিক সময়ে হইয়াছে, তাহারা জিতিতেছে। নয় বৎসর আগে রুশিয়া জাপানের সঙ্গে লড়িয়াছে। রুশিয়া জিতিতেছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স্ আফ্রিকার উত্তরে মরক্কোর সহিত লড়িয়াছে। ফ্রান্সও জিতিতেছে। বার বৎসর আগে ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ারদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত দেশেও ছোটখাট যুদ্ধ

প্রায়ই হয়। দশ বৎসর আগে তিব্বতের সঙ্গেও ইংরেজদের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সব অভিজ্ঞতা ইংলণ্ডকে জয়লাভে সমর্থ করিতেছে। সকলের চেয়ে অল্প দিন আগেকার, বলিতে গেলে এক বৎসর আগেকার, অভিজ্ঞতা সার্ভিয়া ও মণ্টিনিগ্রোর সৈন্যদের। তাহারা খুব লড়িতেছে ও জিতিতেছে।

অপর দিকে জার্ম্মেনী ৪৪ বৎসর আগে ফ্রান্সের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার পর আর কোন কঠিন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাহাদের নাই। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় ১৯০৩-৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা লড়িয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা অসভ্য জাতিদের সঙ্গে, এবং তাহাতে তাহাদের কেবল বিশ হাজার সৈন্য যুঝিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া প্রশিয়ার সঙ্গে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর ৩০ বৎসরেরও পূর্ব্বে বস্নিয়াতে সামান্য রকমের যুদ্ধ করিয়াছিল। আধুনিক সময়ে কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাহাদের নাই।

অষ্ট্রিয়ার দুর্ব্বলতার একটি কারণ।

অপর পাতায় অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের যে মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দুটি ছোট জায়গা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, এবং বাকী সমস্ত দেশটি ভিন্ন ভিন্ন রকমে রেখা টানিয়া তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ভাগের সংখ্যা চারিটি। এই চারিটি ভাগে প্রধানতঃ চারিটি জাতির লোক বাস করে—ইতালীয়, স্লাভ, জার্ম্মেন ও মড্যর (Magyar)। তাহার পর আবার স্লাভজাতীয়েরা পোল্, সার্ব, স্লোভাক্, প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত; তাহাদের ভাষা স্বতন্ত্র। এইরূপ নানা-ভাষাভাষী নানা জাতিতে বিভক্ত হওয়া দুর্ব্বলতার একটি কারণ। ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, সুইট্জার-লণ্ডেও তিনভাষাভাষী লোক আছে, আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রেও বহুভাষাভাষী বহুজাতির বাস; তাহারা ত দুর্ব্বল নয়। কিন্তু এই-সব দেশের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার একটু পার্থক্য আছে। সুইট্জারলণ্ড এবং আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী এরূপ যে তাহাতে সেই সেই দেশের বাসিন্দারা, ভাষা বা জাতি যাহাই হউক, প্রত্যেকে আপনাকে স্বাধীন দেশের স্বাধীন অধিবাসী মনে করে, এবং সকলেই একটি মহা-জাতির অংশ এইরূপ মনে করে। অষ্ট্রিয়ার ব্যবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। প্রথমতঃ, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী, সাম্রাজ্যের এই দুটি প্রধান ভাগ। তাহাদের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার পর বস্নিয়া ও হের্জোগাবীনা প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা আর এক রকমের। সেখানে যে ব্যবস্থাপক সভা আছে, তাহাতে অধিবাসীরা আপ-নাদের জাতি ও ধর্ম্ম অনুসারে নিজের নিজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। প্রতিনিধির সংখ্যা অধিবাসীদের সংখ্যার অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হয়। গ্রীকধর্ম্মমণ্ডলীভুক্ত লোকদের সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী; তাহারা ৩১ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে; মুসলমানেরা ২৪, রোমান ক্যাথলিকেরা ১৬ এবং ইহুদীরা ১ জন নির্ব্বাচন করে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্ব্বদা আপনাদিগকে স্বতন্ত্র দলের লোক বলিয়া মনে করে; সকলে জমাট ভাবে একটা মহাজাতি গড়িতে পারে না। হাঙ্গেরীর অধিবাসী মড্যররা মনে করিতে পারে, আমরা ত প্রায় পৃথক্ আছিই, কেন অকারণ অষ্ট্রিয়ার জন্য লড়িব? পোল্‌রা ভাবে আমরা জার্ম্মেনীর অধীন পোল ও রুশিয়ার অধীন পোলদের সঙ্গে মিলিয়া একটা স্বাধীন পোলাণ্ডে বাস করিব। বস্নিয়া-হের্জেগোবীনার অধিবাসীরা সার্বজাতীয়, তাহারা সার্বিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে এক হইয়া একটা বৃহৎ সার্বিয়া রাজ্য স্থাপন করিতে চায়। এইরূপ নানা কারণে অষ্ট্রিয়াহঙ্গেরী খুব বড় দেশ এবং সার্বিয়া ছোট দেশ হইলেও সার্বিয়া জিতিতেছে। কেননা সার্বিয়ার লোকেরা একপ্রাণ।

ভারতবর্ষের মুসলমানেরা ব্যবস্থাপক সভায় আলাদা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছেন, অধিকন্তু অন্য সব অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকারও তাঁহাদের আছে। যে-সব প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম, তথায় তাঁহারা সংখ্যার অনুপাতে যে কয়জন প্রতিনিধি পাইতে পারেন, তদপেক্ষা বেশী প্রতিনিধিও পাইয়াছেন। তাঁহারা এখন জেলাবোর্ড, লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপালিটিতেও স্বতন্ত্র প্রতিনিধি
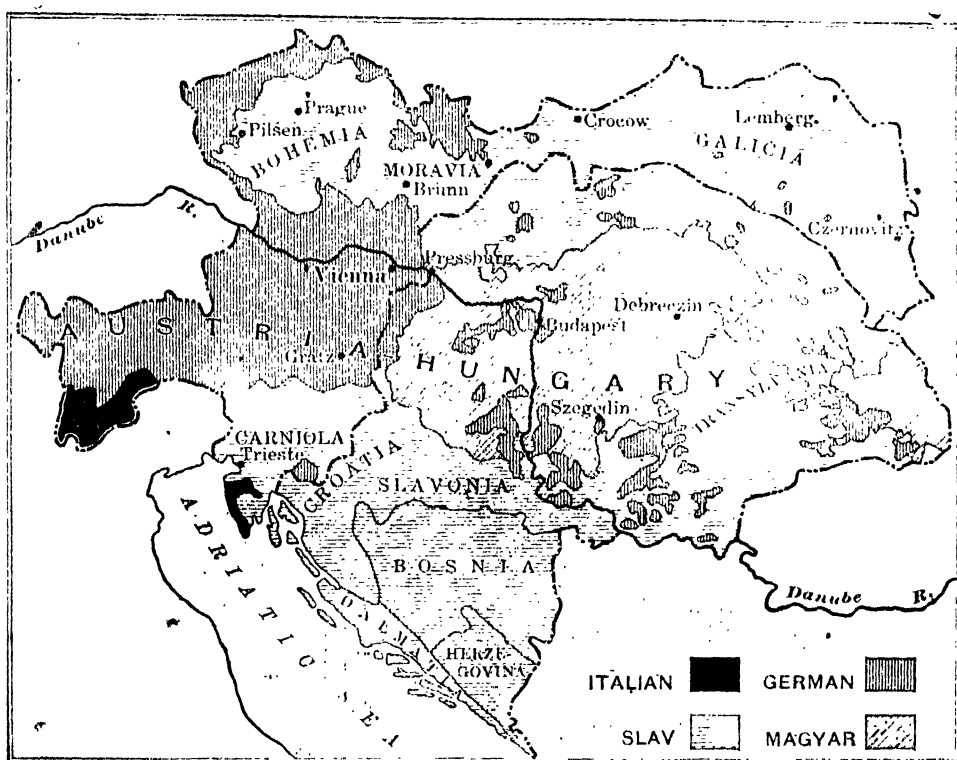
অষ্ট্রীয়াতে বিভিন্ন বহু জাতীয় লোকের বাসহেতু রাষ্ট্রীয় মিলনের সমস্যা।

নির্ব্বাচনের অধিকার চাহিতেছেন। যে-সব মুসলমান ভারতবর্ষকে শক্তিশালী দেখিতে চান, তাঁহাদের এইরূপ দাবী হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্টেরও এইরূপ সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া উচিত। এরূপ ব্যবস্থা রাখিলে ভারতবর্ষ দুর্ব্বল থাকিয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের জন্য ভারতবর্ষের সাহায্য দরকার হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষাও বেশী সাহায্য আবশ্যক হইতে পারে। ভারতবর্ষ যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমুদয় রাষ্ট্রীয় অধিকার পায় এবং এক ও শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে উহা পৃথিবীর যে-কোনও জাতির দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে। যদি কখন এশিয়ায় ভারতবর্ষ লইয়া পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিদের মধ্যে সংগ্রাম হয়, তখন সন্তুষ্ট, ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ ও শক্তিশালী ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যেরূপ সাহায্য করিতে পারিবে, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ধর্ম্মমূলক ও জাতিমূলক নানা দলে বিভক্ত ভারতবর্ষ সেরূপ পারিবে না। কারণ নানা দল থাকিলেই তাহাদের স্বার্থ-বুদ্ধি ভিন্নমুখী হইয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পথে চালিত করিতে পারে।

জয়পরাজয়ে আশঙ্কা।

অল্পসংখ্যক পোল ছাড়া জার্ম্মেন সাম্রাজ্যের আর সব অধিবাসই জার্ম্মেন। অষ্ট্রিয়ারও এক কোটি অধিবাসী জার্ম্মেনজাতীয়। সুইট্জার্লণ্ড, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মেও টিউটনিক অর্থাৎ জার্মেন জাতীয় লোক আছে। ইউরোপের যতখানি জায়গায় জার্ম্মেনজাতীয় লোকের বাস, তাহা পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত ইউরোপের মানচিত্রে কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে। জার্ম্মেনীর আকাঙ্ক্ষা এই যে এই-সমস্ত দেশ তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, অন্ততঃ তাহার অভিভাবকত্ব স্বীকার করে। জার্ম্মেনী জিতিলে তাহার এই অভিলাষ যে পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ
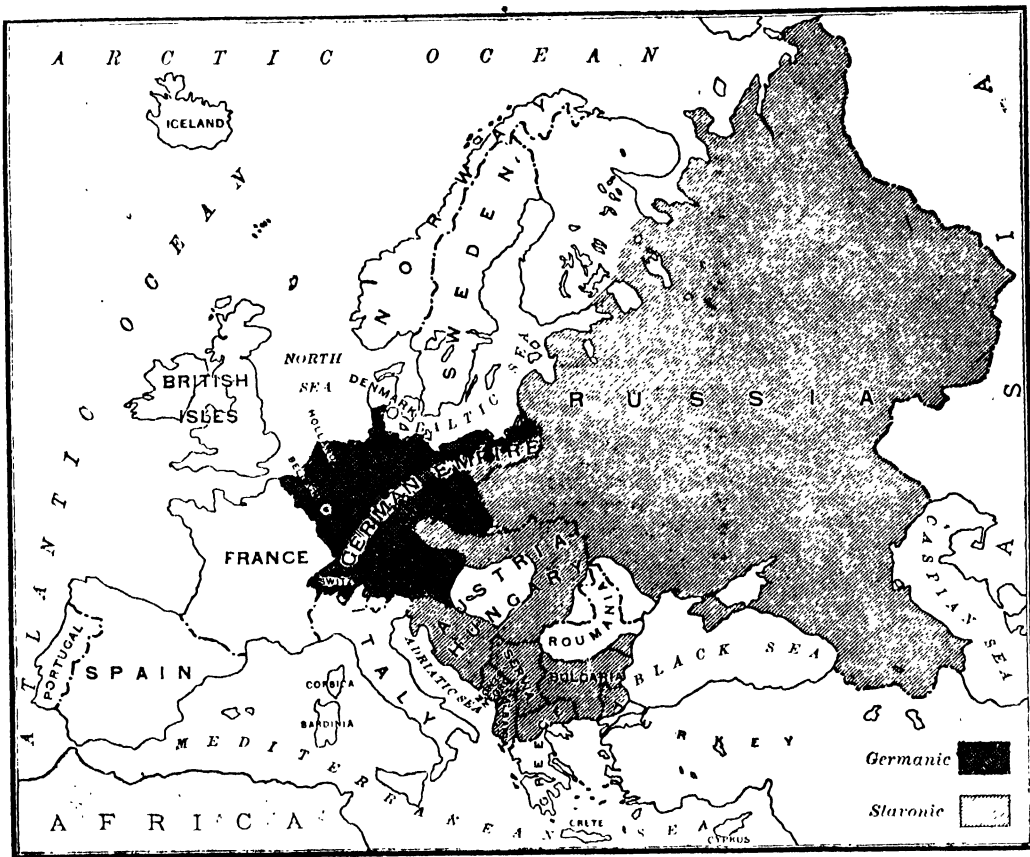
ইউরোপে স্লাভ ও জর্ম্মান জাতীয় লোকের বাসভূমি।

নাই। তদ্ভিন্ন সে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনীয়া, গ্রীস ও তুরস্ক দখল করিতে, অন্ততঃ নিজের প্রভাবের অধীন করিতে চেষ্টা করিবে। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম যদি জার্মেনীর অধীন হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিপদাশঙ্কা ঘটিবে। কারণ হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের বন্দর-সকল হইতে জলপথে ইংলণ্ড আক্রমণ করা চলিবে। আবার যদি জার্মেনী আলবেনিয়া, গ্রীস ও তুরস্কে প্রভুত্ব করিতে পায়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের পক্ষে ভূমধ্যসাগর দিয়া যাতায়াত সকল সময়ে নিরাপদ হইবে না। তাহা হইলে এশিয়ায় ব্রিটিশ বাণিজ্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে ?

অতএব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের নিমিত্ত জার্মেনীকে পরাজিত করা আবশ্যক।

অপর দিকে জার্মেনীর পরাজয়ের অর্থই রুশিয়ার জয়। রুশিয়ার জয়ে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন আশঙ্কা নাই, তাহা বলা যায় না। রুশিয়ার লোকেরা স্লাভজাতীয়। এই স্লাভজাতীয় লোক রুশিয়ার বাহিরেও অষ্ট্রিয়া, জার্মেনী, সার্বিয়া, প্রভৃতি দেশে বাস করে। ইউরোপের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে ইউরোপের বেশীর ভাগ জায়গায় স্লাভদের বাস। স্লাভদের অধ্যুষিত স্থানসকলের বার আনারও অধিক বর্ত্তমান সময়েই রুশিয়ার অন্তর্গত। বাকীটুকু গ্রাস করা, অন্ততঃ নিজ অভিভাবকত্বের মধ্যে আনা রুশিয়ার অভিপ্রেত। রুশিয়ার যদি জয় হয়, তাহা হইলে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তাহার অর্থ এই যে তুরস্কও রুশিয়ার অধীন হইবে, কনষ্টাণ্টিনোপল তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে। তাহা হইলে, ভূমধ্যসাগর দিয়া যাতায়াত ব্রিটিশ রণতরী ও বাণিজ্য জাহাজের পক্ষে এখন যেমন নিরাপদ

ও আশঙ্কারহিত আছে, সকল সময়ে তখনও কি তেমনই থাকিবে ?

তাহার পর রুশিয়ার আরও দুই দিকে অভিসন্ধি আছে। ইউরোপের উত্তরাংশে রুশিয়া ফিনল্যাণ্ড গ্রাস করিয়াছে। তাহার পরই সুইডেন ও নরওয়ে। তাহার সুইডেন লইবার ইচ্ছা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ; তজ্জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে সুইডেনের রাজা নিজের সৈন্যদল বৃদ্ধির আয়োজন করিয়াছেন। এখন রুশিয়া জার্ম্মেনীর ও অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় সুইডেনের বিরুদ্ধে মতলবটা চাপা আছে। জার্ম্মেনী হারিলে ও রুশিয়া জিতিলে রুশিয়া এরূপ শক্তিশালী হইবে যে তাহার পক্ষে সুইডেন নরওয়ে দখল করা কঠিন হইবে না। কিন্তু সুইডেন নরওয়ে রুশিয়ার দখলে আসিলে তাহার সামুদ্রিক শক্তি এত বাড়িবে এবং তাহার কার্য্যক্ষেত্র ইংলণ্ডের এত নিকটবর্ত্তী হইবে, যে, উহা ইংলণ্ডের মঙ্গলের পক্ষে বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে।

রুশিয়ার অপর অভিসন্ধি এশিয়ায়। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম, মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া হাত করিয়া জাপানকে কাবু ও চীনকে ক্রীড়াপুত্তল করা। মাঞ্চুরিয়া হাতে আসিলে রুশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে বন্দর পাইবে, এবং এশিয়ায় অনেক রণতরী রাখিতে পারিবে। চীনকে ক্রীড়া-পুত্তল করিতে পারিলে সে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভয় দেখাইতে পারিবে। তিব্বতের দ্বারাও ভয় দেখাইতে পারিবে। দেখাইবে কিনা কেহই বলিতে পারে না। এশিয়ায় রুশিয়ার অভিসন্ধির দ্বিতীয় অংশ পারস্য অধিকার করা। ইতিমধ্যেই পারস্যের উত্তর অংশ কার্য্যতঃ রুশিয়ার হস্তগত হইয়াছে। জার্ম্মেনীকে পরাজিত করিয়া রুশিয়া যদি আরও শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে সে প্রকাশ্য ভাবে পারস্য দখল করিবে বলিয়া বোধ হয়। পারস্যের সমস্ত লইবার চেষ্টাও করিতে পারে। যদিও তাহাতে ইংলণ্ডের খুবই বাধা দিবার কথা। যাহা হউক, পারস্যের উত্তর অংশ অধিকার করিলেও রুশিয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষতি করিবার ক্ষমতা বাড়িবে।

এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষকে খুব শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে সৈন্য ও ভলাণ্টীয়ার গ্রহণ করিলে এবং ভারতের সকল জাতি ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোককে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় অধিকার দিলে, ভারতবর্ষ শক্তিশালী হইবে। কেবল উত্তর-পশ্চিম, উত্তর, ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলে, এবং কতকগুলি বেতনভোগী দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য রাখিলে ভারতবর্ষ যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী হইবে না।

রুশিয়ার সম্বন্ধে আশঙ্কা যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই আমাদের মনে উদিত হইয়াছিল। ইংরেজদের মনেও যে নাই, তাহা নয়। রিভিউ অব রিভিউজের নূতন সংখ্যায় সম্পাদক লিখিতেছেন —

"This revelation of Russian strength, though welcome at the present time, has raised misgivings in the minds of some as to what will happen when this war is over. May not Russia want to impose on Europe the World Dominion that was Germany's ideal?"

ইংরেজ সম্পাদক অবশ্য বলিতেছেন যে, "রুশিয়ার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার এখন সময় নয় এবং সন্দেহ করিবার কোন কারণও নাই।" ইহা ঠিক্ কথা। কিন্তু সাবধান থাকা কোন সময়েই অনাবশ্যক নহে।

তুরস্কের নির্ব্বুদ্ধিতা।

তুরস্ক জার্ম্মেনীর পক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিয়াছে। তাহার ফল এই হইবে, যে তাহার সাম্রাজ্য যাইবে। রুশিয়া যে ইউরোপীয় তুরস্ক লইবে, কিম্বা রুশিয়ার কর্ত্তৃত্বাধীন বল্কান রাজ্যগুলি লইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এশিয়ায় তুরস্কের যে সাম্রাজ্য আছে, তাহাও ভাগাভাগি হইয়া যাইবে। নির্ব্বুদ্ধিতা ত হইয়াছেই; অধিকন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে ত কেহই তুরস্কের ক্ষতি করিতেছিল না; সুতরাং তাহার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কোন কারণও ছিল না।

জার্ম্মেনীর জিতিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কিন্তু যদি জার্ম্মেনীর জয় হয়, তাহাতেও তুরস্কের

লাভ নাই। কারণ জেতা জার্ম্মেনীও তাহাকে গ্রাস করিবে বা নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিবে।

যুদ্ধের প্রথম ফল ত এই হইয়াছে যে ইংলণ্ড সাইপ্রাস্ দ্বীপ অধিকার করিয়াছে। অবশ্য এই দ্বীপ নামে মাত্র তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল; শাসনকার্য্য, ১৮৭৮ সালের এক বন্দোবস্ত অনুসারে, ইংলণ্ডই চালাইয়া আসিতেছে। কিন্তু তুরস্ক কখনও রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহে সুদক্ষ হইলে উহা ইংলণ্ডের কাছে ফেরত চাহিতে পারিত। তদ্ভিন্ন সুলতান ১৮৭৮ সালের বন্দোবস্ত অনুসারে ইংলণ্ডের নিকট হইতে সাইপ্রাসের জন্য বৎসরে তের লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা পাইতেন। এখন হইতে তাহা আর পাইবেন না।

মিশরদেশ বাস্তবিক ইংরেজদের কর্ত্তৃত্বাধীন হইলেও, নামে এখনও তুরস্কের একটি করদ রাজ্য। তুরস্কের সুলতান এখনও বৎসরে মিশরের নিকট হইতে এক কোটি তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার দুই শত পঞ্চাশ টাকা কর পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় তুরস্কের এই আয়ের পথ যে বন্ধ হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং তুরস্কের মহা ভ্রম হইয়াছে।

ভারতীয় মুসলমানগণ ও তুরস্ক।

তুরস্কের সুলতানকে মুসলমানগণ আপনাদের খলিফা মনে করেন। প্রথম প্রথম খলিফাগণ মুসলমানদের ঐহিক শাসনকর্ত্তা এবং ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ-ও-ব্যবস্থাদাতা ছিলেন। এখন কেবল ধর্ম্মবিষয়েই তাঁহাকে মান্য করা হয়। কেহ কেহ বলেন বটে, যে, সুলতান খলিফা অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের উত্তরাধিকারী নহেন। কিন্তু সে তর্কে আমাদের প্রবৃত্ত হইবার দরকার নাই, যোগ্যতাও নাই। সাধারণতঃ মুসলমানগণ তাঁহাকে খলিফা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি ঐহিক বিষয়ে যে, সমুদয় মুসলমানের প্রভু নহেন, তাহার প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। অল্প দিন আগেও তুরস্কের সৈন্যদের সঙ্গে পারস্যের সৈন্যদের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অথচ পারস্য মুসলমান রাজ্য। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে ধর্ম্মবিষয়ে ছাড়া অন্য বিষয়ে মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানের অনুসরণ বা আদেশ পালন করেন না; সম্ভবতঃ তাঁহাদের ধর্ম্ম অনুসারে করিতে বাধ্যও নহেন।

রোমান কাথলিক খৃষ্টিয়ানদের অবস্থা এ বিষয়ে অনেকটা মুসলমানদের সমতুল্য। রোমের পোপ তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু। পূর্ব্বে পোপের রাষ্ট্রীয় শক্তি ছিল, তিনি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপও করিতেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোন রোমান কাথলিক ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী হইলে পাছে তিনি রোমের পোপের কথা শুনিয়া ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় শক্তির হ্রাস বা অন্য কোন অনিষ্ট সাধন করেন, এই জন্য ১৭০১ খৃষ্টাব্দে একট অব্ সেটল্‌মেণ্ট নামে একটি আইন করা হয়, তদনুসারে কোন রোমান কাথলিক ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী হইতে পারেন না। বাস্তবিক দেশের রাজা থাকিবেন একজন, আর দেশের কতকগুলি লোক বিদেশী (বা স্বদেশী) একজন ধর্ম্মগুরুর আদেশ ঐহিক পারত্রিক উভয় ব্যাপারেই শিরোধার্য্য করিবে, এরূপ অবস্থায় কোন দেশে কখনও শান্তি থাকিতে পারে না, দেশও সুশাসিত হইতে পারে না। যতদিন রোমের পোপের ঐহিক ক্ষমতা ছিল, ততদিন তাঁহার দ্বারা কখন কখন কোন কোন যুদ্ধ বা অপর গর্হিত কাজ নিবারিত হইত বটে, কিন্তু ইউরোপে অনেক রাষ্ট্রীয় বিপ্লব এবং কলহ ও অশান্তিও যে ঐ কারণে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তুরস্ক ইংলণ্ডের বিপক্ষদলের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় ভারতীয় মুসলমানগণ যে বিপথচালিত হন নাই, ইহাতে তাহারা সুবুদ্ধির কাজই করিয়াছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্য।

এইরূপ সংবাদ আসিতেছে যে ভারতবর্ষের নানাজাতীয় সিপাহীরা অসাধারণ শক্তি, সাহস ও কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, এমন কি তাহারা কোন কোন সময় পরাজয়ের আশঙ্কাকে জয়ে পরিণত করিতেছে। ভারতবর্ষের সিপাহীরা যে যে-কোন জাতির সৈন্যের সমান, ইহা আনন্দের বিষয়। যখন তাহারা উচ্চ সেনানায়কের কাজ করিবে তখন আনন্দের মাত্রা পূর্ণ হইবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ।

যুদ্ধে হত ও আহত ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারীদের ন্যায় হত ও আহত ভারতীয় সুবেদার, জমাদার, রেসালদার প্রভৃতির তালিকাও বাহির হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে রাঠোর, পবার, আদি উপাধিধারী রাজপুত ক্ষত্রিয় ত আছেনই, মিশ্র, দুবে, চৌবে উপাধিধারী ব্রাহ্মণও আছেন। তাঁহাদের নাম তালিকার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের সৈন্যেরা ইউরোপে যুদ্ধ করিতে এই প্রথম গিয়াছেন। কিন্তু জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়া যুদ্ধ করিতে তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে আরও অনেকবার গিয়াছেন। এই যোদ্ধা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের ত জা'ত যায় না; এ কল্পনাও তাঁহাদের বা তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বদের মনে স্থান পায় না। কিন্তু যাঁহারা অল্পাধিক ইংরাজী শিখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাই, সমুদ্র অতিক্রম করাকে বিলক্ষণ ভয় করেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও তাঁহাদিগকে পাতিত্যের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু এই সব গ্রাম্য যোদ্ধা দুবে চৌবে মিশ্রের ত কখনও পাতিত্য ঘটে না, ঘটিবেও না। ইংরেজীর জল বেশী করিয়া পেটে পড়িলে যে সব সময় ভালই হয় তাহা নয়।

প্লীহা ফাটা।

বোম্বাই বন্দরে ঢোণ্ডু নামক একজন দেশী মজুর কাজ করিতেছিল। সে কাজে ভুল করিয়াছিল। তাহাতে কাজের পরিদর্শক মার্টিন্ ফর্ব্স্ তাহার পেটে আঘাত করে। তাহাতে আধ ঘণ্টার মধ্যে ঢোণ্ডু মারা যায়। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার হয়। পাওএল নামে এক ডাক্তার মজুরটির মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে আঘাত খুব মৃদুই হইয়াছিল; কিন্তু মজুরের প্লীহার পীড়া ছিল বলিয়া তাহা ফাটিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ফর্বসের ২৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় লোকদের এইরূপ প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু এই প্রথম হইল না, মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। দেশী লোকের আঘাতে দেশী লোকের প্লীহা ফাটার কথা প্রায় শুনা যায় না; ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গীর আঘাতেই এইরূপ ঘটনা ঘটার সংবাদ সাধারণতঃ পাওয়া যায়। এইরূপ দুর্ঘটনা বহু বৎসর হইতে ঘটিতেছে। এই জন্য ভারতবর্ষীয়দের প্লীহা যে ব্যাধিগ্রস্ত এবং ঠুন্‌কো, তাহা ইউরোপীয়রা জানে না বলিয়া মনে করা উচিত নয়। সুতরাং অকস্মাৎ প্লীহা ফাটিয়াছে বলিয়া আঘাতকারীকে লঘু দণ্ড দেওয়া কখনই উচিত নয়। ইহাও ইউরোপীয়দের খুব জানা কথা যে শরীরের মধ্যে একমাত্র পেটেই সামান্য আঘাতে মানুষের মৃত্যু হইতে পারে; শরীরের অন্য কোথাও সামান্য আঘাতে মানুষ মরে না। সুতরাং চটিয়া উঠিলে পেটটা বাদ দিয়া আঘাত করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। তাহাদের দেশের ঘুষোঘুষি লাথালাথি প্রভৃতি কুস্তীতে কোমরবন্ধের নীচে আঘাত করা (hitting below the belt) নিষিদ্ধ; সেরূপ করা কাপুরুষতা ও শঠতা বলিয়া পরিগণিত। ইহা একটা আকস্মিক নিয়ম বলিয়া মনে হয় না। আমাদের ধারণা, পেটে আঘাত সাংঘাতিক হয় বলিয়াই এরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। সুতরাং নানাদিক দিয়া দেখা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষীয় লোকদের পেটে আঘাত করিলে যে তাহা সাংঘাতিক হইতে পারে, তাহা ইউরোপীয়দের জানা থাকিবারই কথা। অতএব এ বিষয়ে তাহারা অভিযুক্ত হইলে তাহাদের অজ্ঞতা ধরিয়া লইয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া বা সামান্য দণ্ড দেওয়া কখনই উচিত নয়। মেন সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি-বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে কেহ যদি জানে যে কোন জেলায় প্লীহারোগের প্রাদুর্ভাব আছে এবং জানে যে প্লীহারোগীকে আঘাত করিলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে, এবং এরূপ জানিয়াও যদি সে কাহাকেও আঘাত করে, তাহা হইলে, আঘাতপ্রাপ্ত লোকটির প্লীহারোগ ছিল কি না, আঘাতকারী তাহা না জানিলেও, তাহার বিরুদ্ধে সদোষ নরহত্যার (culpable homicide) অভিযোগ আসিতে পারে। কিন্তু বিচারকেরা দেখিতেছি কখন কখন মেনের মত গ্রহণ করেন না।

ভারতবর্ষের এখন প্রায় সকল প্রদেশেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। সুতরাং বড় পিলের অভাব কোথাও নাই। বাংলা দেশে ত খুব বড় বড় পিলে দেখা যায়। এই-সব প্রদেশে চাষবাস লইয়া মধ্যে মধ্যে খুব দাঙ্গা মারামারি

হয়। কখন কখন বক্‌রীদ প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়াও মারামারি হয়। এই-সব দাঙ্গায় কখন কখন মানুষ মারা পড়ে। মারামারির সময় দাঙ্গাকারীরা এমন জোরে লাঠি চালায় যে মানুষের মাথার খুলি যে এমন শক্ত জিনিষ তাহাও ফাটিয়া যায়। কিন্তু এই-সকল দাঙ্গায় কখনও কাহারও প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। এইজন্য আমাদের মনে হয়, ডাক্তার প্লীহা ফাটিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিলেই তাহা বেদবাক্য বলিয়া মান্য করা উচিত নয়। ডাক্তারের কথা যে সত্য তাহারও প্রমাণ চাওয়া কর্ত্তব্য।

ইউরোপীয়ের বা ফিরিঙ্গীর আঘাতে দেশী লোকের মৃত্যু হইলেই তাহাকে জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক খুন (murder) বলিয়া মনে করা যেমন একদিকে ঠিক নয়, তেমনি সবগুলিই হঠাৎ ঘটিয়াছে মনে করাও ঠিক নয়। এই-সকল স্থলে মৃতদেহ পরীক্ষা একজন ডাক্তারের দ্বারা হওয়া উচিত নয়। একজন সরকারী ডাক্তার যেমন পরীক্ষা করেন, তেমনি তাঁহার সঙ্গে একজন বেসরকারী ডাক্তার থাকা অবশ্যক; এবং পরীক্ষার সময় একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিবার আইন হওয়া প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আইন করিলে হয়ত সুবিচারের কিছু আশা হয়।

ইউরোপীয় আঘাতকারীরা তাহাদের সমকক্ষ স্বদেশীদিগের দিকে সহজে হাত পা চালায় না। ইহাতেই তাহাদের কাপুরুষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জন্য মনে হয়, যদি কখন আমাদের হতভাগ্য দেশী মজুরেরা যথেষ্ট আহারে পুষ্ট সুস্থ সবল সাহসী হয়, তাহা হইলে কাপুরুষেরা আর তাহাদিগকে আঘাত করিবে না। এই-সব মোকদ্দমার বিচারক ও ডাক্তারদের ধর্ম্মবুদ্ধি আরও সজাগ হইলেও বিচার ভাল হইবার কথা। ভারতবাসীরা অধিক পরিমাণে শিক্ষিত ও সুস্থ এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত বিচারক ও ডাক্তারদের ধর্ম্মবুদ্ধি হয়ত এখনকার চেয়ে সচেতন হইবে।

অন্নাভাব।

বঙ্গের অধিকাংশ জেলায় অন্নাভাব ঘটিয়াছে। কোথাও বৃষ্টির অভাবে, কোথাও ধানে পোকা লাগায়, এবার বেশী ধান পাওয়া যাইবে না। যে-সব জেলায় পাট বেশী হয়, সেখানেও চাষী গৃহস্থদের খুব দুরবস্থা হইয়াছে। এখন এম্‌ডেন জাহাজ নষ্ট হওয়ায় পাটের কাটতি বাড়িলে পাটের দরও বাড়িবে। তাহাতে চাষীদের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। চাষীর পেটে অন্ন পড়িলে যে-সব লোক ভাল পোষাক পরিয়া বেড়ান, তাঁহাদেরও সুবিধা হইবে। আমরা সচরাচর চাষীদের কথা ভাবি না। প্রাণের টান, ধর্ম্মবুদ্ধি আমাদের এতটা নাই, যে, তাহাদের জন্য উদ্বেগ হয়। স্বার্থবুদ্ধিতে তাহাদের দুর্দ্দশার দিকে আমাদিগকে দৃষ্টিপাত করাইতে পারিবে কি?

স্বার্থবুদ্ধি মানুষের প্রাণকে কঠিনও করে। কাগজে এইরূপ খবর বাহির হইয়াছে যে পাটের কাটতি না থাকায় পাটচাষীরা বিপন্ন হইয়াছে দেখিয়া ঢাকার মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সরকারের পক্ষ হইতে টাকা ধার দেওয়া হউক এইরূপ প্রস্তাব করেন। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের ইউরোপীয় বণিক্‌সমিতি ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পাটচাষীদিগকে চাউল সাহায্য করা হউক, কিম্বা যেখানে মজুরী করিয়া তাহারা দুপয়সা পাইতে পারে, এরূপ রাস্তা বাঁধ আদি প্রস্তুত করান হউক। কথাটা এই যে পাটচাষীরা যদি টাকা ধার পায়, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন খাজনা দেওয়া সবই চলিবে; সুতরাং তাহারা এখন মাটীর দরে পাট ছাড়িবে না। কিন্তু যদি শুধু চাউল দেওয়ার বা মাটী কাটাইয়া কয়েক পয়সা মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে অনেকেই ত ভিক্ষার চাউল লইবেনা ও মজুরী করিবে না, যাহারা ভিক্ষা লইবে বা মজুরী করিবে, তাহাতে তাহাদের সব খরচ চলিবে না। সুতরাং সকলেই পাট বেচিতে বাধ্য হইবে, এবং নারায়ণগঞ্জের পাট-ব্যবসায়ীরা তাহা খুব সস্তায় পাইয়া খুব লাভ করিবে।

জানি না, সহৃদয় মাজিষ্ট্রেটের প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে, না স্বার্থান্বেষী বণিক্‌দের কথাই গ্রাহ্য হইয়াছে।

বেলজিয়মের প্রধান কবি।

বেলজিয়মের প্রধান কবি মরিস্ মাত্যারলিঙ্ক্ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

তাঁহার রচিত যে-সকল নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পেলেয়াস এ মেলিসান্দ (Pelleas et Melisande) নাটকের অভিনয়ই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। তাঁহার রচনার কিছু কিছু অনুবাদ আমরা পূর্ব্বে ছাপিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় এই নাটকটির অনুবাদ ছাপিতে আরম্ভ করিলাম। মাত্যারলিঙ্ক ও তাঁহার পত্নীর চিত্র আমরা পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছি।

তিনি কবিতা ও নাটক ব্যতীত দার্শনিক পুস্তকও লিখিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক রচনাবলীতে নোবালিস্, এমার্সন, হেলো এবং ফ্লেমিশ কাথলিক মর্ম্মীদিগের (mystics) শিষ্য বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরে উপরে দেখিলে মানুষের সাধারণ দৈনিক জীবন এক রকম দেখায়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিতে জানিলে, যাহা সহজে চোখে পড়ে না, এমন অনেক রহস্য উহার মধ্যে আছে, বুঝিতে পারা যায়। দর্শন, নাটক, গীতিকবিতা, মাত্যারলিঙ্ক যাহা কিছু লেখেন, সকলের মধ্যেই তিনি মানবজীবনের এই প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় মর্ম্মস্থল, পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া, দেখাইতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিনি খুব সোজা ভাষায় লেখেন, এবং এ প্রকার রূপক ব্যবহার করেন যে মনে হয়, যেন তিনি জীবনের কোন বাস্তব চিত্র আঁকিতেছেন, তাহার উপর কোন অলঙ্কারের আবরণ নাই। জীবনকে তিনি এমন করিয়া আঁকেন যে উহার অদ্ভুতত্ব ও উহার ব্যাখ্যাতীত উপাদানগুলি আমাদিগকে চমকিত করে। তাঁহার অনেকগুলি নাটক মানবহৃদয়ের অপ্রত্যক্ষ ভাব-সমূহের অতি করুণ মর্ম্মস্পর্শী লিপি। তাহাতে মানবাত্মাই নায়কনায়িকা। উহারই আধ্যাত্মিক শোকহর্ষ বিপদসম্পদ ও অবদানপরম্পরা তিনি বর্ণন করেন। তাঁহার নাটক-গুলির পাত্রপাত্রীর কার্য্যকলাপের উপর সাধারণ দেশকালের ব্যাপারসমূহের কোন প্রভাব নাই। এই-সব পিতৃমাতৃহারা রাজনন্দিনী, এই-সব অন্ধ, এই-সব নির্জ্জন দুর্গের বৃদ্ধ রক্ষী, এই-সব সন্ধ্যার ধূসর আলোতে আচ্ছন্ন প্রদেশ,—কে ইহারা, কোথায় ইহারা, কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, আমরা জানিতে পাই না। তাহাদের মধ্যে বাহ্যবস্তুতন্ত্র কিছুই নাই। তাহাদের জীবন প্রগাঢ় তীব্র তীক্ষ্ণ ভাব ও শক্তিতে পূর্ণ। সবই কিন্তু আধ্যাত্মিক। আত্মার জোয়ার ভাটা, চলাফেরা, পরিবর্ত্তনের গতিবিধির যে রহস্য, সেই রহস্যে সমস্তই আচ্ছন্ন।

অকপটতার প্রমাণ।

সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ লণ্ডনের নিউষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজে লিখিয়াছেন যে লর্ড কর্জন বলিয়াছেন বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষ যেরূপ বিশ্বস্ততা দেখাইয়াছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। লর্ড কার্জন আরও বলিয়াছেন, ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা, সুশাসন, দয়া ও সত্যাচরণের ভিত্তির উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত। সার উইলিয়ম বলিতেছেন—"আমরা ন্যায়পরতা চাই বলিতেছি; আচ্ছা, এই কথা যে বৃথা বড়াই নয়, তাহা দেখাইবার এখন সুযোগ উপস্থিত। ভারতবর্ষের সমুদয় রাজকার্য্যে কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে একটি রাজকীয় কমিশন বসিয়াছে। এই কমিশনের কাছে আমি দুটি প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি: (১) তাহারা ইহাই ধার্য্য করুন যে ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে ভারতবাসীদের দাবী আছে, এবং সুতরাং কোনও কাজে কোন বিদেশীকে নিযুক্ত করা হইলে, কেন নিযুক্ত করা হইল তাহার সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে হইবে। (২) করদাতা ভারতবাসীদের মঙ্গলের জন্য সমুদয় বেতন বাজারদর অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হউক (অর্থাৎ বিজ্ঞাপন দিলে যে কাজের জন্য যতটাকা বেতনে লোক পাওয়া যায়, তাহাই সেই পদের বেতন বলিয়া স্থির করা হউক), শ্রেণী-বিশেষের খেয়াল অনুযায়ী সৌখীনী মোটা মাহিনা রহিত হউক, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাজারদরে যোগ্য দেশী কর্ম্মচারী পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ ঐরূপ মোটা মাহিনায় বিদেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে না। এই বিষয়টি দ্বারা ব্রিটিশ অকপটতা পরীক্ষিত হইবে বলিয়া ভারতবাসীরা মনে করিবে।"

সিবিলিয়ানদের ভাতা।

সরকারী সকল বিভাগের কর্ম্মচারীদের কিয়দংশ সব সময়েই ছুটিতে থাকেন, কখনও রাম শ্যাম হরি, কখন জন্ স্মিথ্ হেনরি, কখনবা আর কেহ কেহ। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও এইরূপ সিবিলিয়ান ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা অনেকে ছুটিতে ছিলেন। যুদ্ধ বাধায় তাঁহারা ছুটি হইতে প্রত্যাহূত হইয়াছেন। উপরওয়ালারা ছুটি লইলে অধস্তন কর্ম্মচারীদের অস্থায়ী ভাবে পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হয়। ছুটি বন্ধ হওয়ায় এই লাভটা সিবিলিয়ানদের হইল না, এই ওজুহাতে গবর্ণমেণ্ট, যতদিন যুদ্ধ চলিবে, ততদিন সমুদয় সিবিলিয়ানের (যাহাদের লোকসান হইল শুধু তাহাদের নয়) বেতন বাড়াইয়া দিলেন। অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। সিবিলিয়ানরাই বাস্তবিক দেশের শাসনকর্ত্তা। সুতরাং তাঁহাদের সুবিধাটা সব সময়েই হওয়া স্বাভাবিক। টাকার দাম কমিয়াছে বলিয়া একবার সব ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর বেতন বাড়িয়াছে; তারপর শীঘ্র শীঘ্র পদোন্নতি হইতেছে না

বলিয়া কোন কোন প্রদেশের সিবিলিয়ানদের বেতন বাড়িয়াছে; এখন আবার আর একটা কারণে বাড়িল। যুদ্ধের জন্য সর্ব্বসাধারণ করদাতাদের এবং সরকারের গরীব কর্ম্মচারীদের অসচ্ছলতা হইয়াছে। তাহাদেরও কিছু উপকার গবর্ণমেণ্ট করুন। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের মোটা মাহিনা বৃদ্ধি করিবার জন্য যখন অর্থাভাব ঘটিতেছে না, তখন স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য টাকা চাওয়া অসঙ্গত হইবে না। কেন না রাজকোষে অসচ্ছলতা নাই দেখা যাইতেছে।

কলের কামান (Machine Guns)।

কলের কামান নানা রকমের। ম্যাক্সিম কামানের ওজন ২৫ হইতে ৩০ সের, ইহা হইতে মিনিটে ৪৫০ বার গোলা ছুড়া যায়, এবং ২৫০০ গজ দূরে লক্ষ্যবেধ করা যায়। হচ্‌কিস্‌ কামানের ওজন ২৬ সের, মিনিটে ৫০০ হইতে ৬০০ বার ছুড়া যায়, এবং ২০০০ গজ দূরে লক্ষ্যবেধ হয়। কোল্ট কামানের ওজন ২০ সের, মিনিটে ৪০০ বার ছুড়া যায় এবং ২০০০ গজ দূরে লক্ষ্যবেধ করা যায়।

দেশের কথা

পূজার পর মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলির স্তম্ভে একটি বিষয় এমন একান্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই চোখে পড়ে। সেটি ফসলের দুরবস্থা। এই যুদ্ধ বিপ্লবের দরুন চাল বিদেশে রপ্তানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে—দেশে অন্নের প্রাচুর্য্য হইবারই কথা, কিন্তু চিরদারিদ্র্যময় ভারতবর্ষে তাহা নিতান্তই যেন হইবার নহে। সুতরাং নানাপ্রকার অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও এবারও ভারতের চিরানুগত প্রথানুসারে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা এখন হইতেই ঘনাইয়া দুঃখ-দৈন্য-ও-ক্লেশে-জর্জ্জর ভারতবাসীর মাথায় ভাঙিয়া পড়িবার জন্য বজ্রের মত উদ্যত হইয়া উঠিতেছে। সময়ে সুবৃষ্টির অভাবে শস্যে পরিপূর্ণ ক্ষেতগুলি পুড়িয়া যাইতেছে। চারিদিকে কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

এই গেল-বছর দামোদরের ভীষণ বন্যায় হাজার হাজার লোক গৃহহীন-অন্নহীন হইয়াছে। যাহারা বড়-লোক ছিল তাহারা কোনো প্রকারে মধ্যবিত্তের ঠাটে দিন কাটাইতেছে; যাহারা মধ্যবিত্ত ছিল আজ তাহারা দরিদ্র; আর যাহারা দরিদ্র ছিল, সেই ভীষণ বন্যার পরও যাহারা জীবিত ছিল, আজ তাহাদের ভিতর অনেকেই আর এজগতে নাই।

তারপর গত বৎসর বন্যার ফলে বালি জমিয়া অনেক জমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অন্ততঃ দুই চারি বৎসর তাহাতে ফসলের আশা নাই। সে-সকল জমিতে এবার চাষ হয় নাই—সুতরাং অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা চাষের পরিমাণ এবার কমই হইয়াছে। কিন্তু তবু ফসল যদি ভালো হইত তাহা হইলে কোনরূপে এবছর লোকে দুটি ভাত পাইত ও গেলবছরের ক্ষতি-গ্রস্ত লোকেরা তাহাদের ক্ষতি কতকটা পূরাইয়া আনিতে পারিত। কিন্তু সে আশা দূরে যাক এখন তাহাদের বাঁচিয়া থাকাই দায় হইয়া উঠিয়াছে। এবছর ফসলের অবস্থা নিতান্ত খারাপ। তাহার উপর যাহারা চাল কিনিয়া খায়, পাটের দুরবস্থায় তাহাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কাহারো অজানা নহে। ইহার উপর আর এক বিপদ। বন্যাপীড়িত লোকেদের নিকট হইতে গত বৎসর খাজনা আদায় করা হয় নাই, তাই এবছর ও গেলবছরের খাজনা এবার একসঙ্গেই আদায় করা হইবে শুনা যাইতেছে। তাহার উপর এই যুদ্ধের দরুন অন্যান্য সকল জিনিসের দরই চড়িয়া গিয়াছে—অথচ বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বপ্রধান অভাব হইয়া পড়িয়াছে টাকার। টাকা থাকিলে লোকে বেশী দাম দিয়াও জিনিস কিনিতে পারিত, কিন্তু সে উপায়ও নাই। চারিদিকে জলের দারুণ অভাবে লোকে অতি কদর্য্য জল পান করিতেছে—তাহার ফলে ওলাউঠা, আমাশয় প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগকে ডাকিয়া আনা হইতেছে। ইহার উপর আমাদের বাঙালী-জীবনের নিত্যসহচর ম্যালেরিয়া তো আছেই। সুতরাং এইসকল বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে আর বেশী বাকি থাকেনা যে এবৎসর কিরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশায় আমাদিগকে পড়িতে হইবে—কিরূপ ভয়ঙ্কর অদৃষ্ট আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে! কিন্তু "অদৃষ্ট" বলিয়া তো হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকা যায় না, প্রতিকারের চেষ্টা করাটাই মানুষের কর্ত্তব্য। সুতরাং এসম্বন্ধে প্রতিকারের হাত যাঁহাদের আছে—তাহারা অবস্থা বুঝিয়া এখন হইতে যদি ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে যত্নবান হন তাহা হইলে এই অবশ্যম্ভাবী দুর্দ্দশার কিছু লাঘব হইলেও হইতে পারে। নীচে মফঃস্বলের কাগজগুলি হইতে ফসলের অবস্থার কথা তুলিয়া দেওয়া হইল—

ফসলের অবস্থা—

বাঁকুড়া-দর্পণ।—বহুদিন বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া ধান্যের বড়ই ক্ষতি হইতেছে। কেহ কেহ ভবিষ্যতে অন্নকষ্টের আশঙ্কা করিতেছেন। বাঁধ পুষ্করিণী সকল কাটাইয়া সেচনকার্য্য চলিতেছে। ভবিষ্যতে আবার জলকষ্ট না হইলেই মঙ্গল।

বীরভূমবার্ত্তা।—এ বৎসর এ সময়ে উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে ভাবী-শস্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়াই বোধ হইতেছে। যে-সকল জমীর নিকটে পুকুর ও গড়ে ছিল, দিবা রাত্রি তাহা হইতে কৃষকগণ জল সেচন করিয়াও বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় এখানে আট আনা পরিমাণ ধান্যই জলাভাবে মারা যাইবে। সম্প্রতি ইউরোপের যুদ্ধে এদেশ হইতে জাহাজাদি প্রেরণের নানা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় চাউল রপ্তানী হইতেছে না, নচেৎ ইহার মধ্যেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত। ভবিষ্যতে কি হইবে ভগবানই জানেন।

রংপুর দিক্‌প্রকাশ।—ধান্য মরিয়া গেল, পাট বিক্রয় হইল না, লোকের দশা হইবে কি? আশ্বিন মাস চলিয়া গেল, একটু বৃষ্টি হইল না, ধান্য ফুলিল বটে কিন্তু চাউল হইল না। মাটী ফাটিয়া গেল, গাছও শুকাইয়া উঠিল। পুকুর ছেঁচিয়া আর কত বাঁচাইবে? পাট এখানে ৩৲ দর। চাউল এখনও ৯৷৷০ সের দশ সের কাঁচি।

গৌড়দূত।—এবার বৎসরের যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে তাহাতে লোকের মনে বিশেষ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। হৈমন্তিক ধান্যের ফসল সম্পূর্ণরূপে পাইবার আশা কতক কৃষকদের মনে জাগরূক ছিল কিন্তু এখন সে আশা বিলুপ্ত হইয়াছে। কারণ বৃষ্টি একেবারে নাই। একটা বৃষ্টির অভাবে ধান্যবৃক্ষসকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। যতই দিন যাইতেছে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ততই প্রবল হইতেছে।

পুরুলিয়াদর্পণ।—এ বৎসর বঙ্গদেশের কোনও স্থানে ধান্য ভাল উৎপন্ন হয় নাই। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় অধিকাংশ স্থানে রোপিত ধান্য শুকাইয়া গিয়াছে। বিদগ্ধ ধান্যক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কৃষকের করুণ ভবিষ্যৎ চিত্র হৃদয়ে উদিত হইয়া শঙ্কার ভাব জাগাইয়া দেয়।

ইহা ছাড়া আর এক বিপদের কথা নানা সংবাদপত্রেই দেখা যাইতেছে। পোকা ও পঙ্গপালের উৎপাতে যাহা কিছু ধান হইয়াছে তাহাও উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।

নীহার।—আমাদের কাঁথি মহকুমার প্রায় সর্ব্বত্রই মাসাধিক হইল ধান্যক্ষেত্রে "লোহা দোড়া" নামক একপ্রকার পোকা পরিয়া বা ব্যাধি হইয়া অনেক ক্ষেত্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ইহার উপর আশ্বিন মাসের প্রারম্ভ হইতে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় প্রায় তিন ভাগ ধান্যক্ষেত্রের জল শুকাইয়া গিয়াছে। জলাভাবে ডাঙ্গা জমিসমূহের ধান্যগাছগুলি ত সমূলে শুকাইয়া নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

'ডায়মণ্ড-হারবার-হিতৈষী' পোকার হাত হইতে ফসল রক্ষার এক উপায়ের কথা লিখিয়াছেন। কৃষকেরা অনায়াসে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।

কোন কোন কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন, ধান্যক্ষেত্রে একটি করিয়া কদলীবৃক্ষ রোপণ করিলে কিম্বা বাসকের ডাল পুতিয়া দিলে কীট নষ্ট হয়।

প্রজাদের বিপদের সময় গবর্ণমেণ্টের উচিত কৃষিকলেজ বা অনুসন্ধান সমিতির গবেষণার ফলগুলি কৃষকদের গোচর করা। পোকা মারিবার ঔষধ ত বহুকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখন তাহা আর নূতন করিয়া করিতে হইবে না, কিন্তু তথাপি কৃষকেরা কেন পোকার হাতে এত বিড়ম্বনা সহ্য করে? ইহার একটা উপায় হয় না?

প্রজাদিগের দুর্দশার ও দুর্ভিক্ষের প্রথমাবস্থার একটি চিত্র 'সুরাজে' প্রকাশিত হইয়াছে—

মফঃস্বলের অবস্থা এতদূর শোচনীয় যে, অনেকে প্রতিদিন অনাহারে দিন যাপন করিতেছে, অন্নের পরিবর্ত্তে অনেকে কচু কুমড়া খাইয়া জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছে। রোগী রোগশয্যায় চিকিৎসা ও পথ্যাভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে।

স্বাস্থ্য—

প্রতিকার।—আজকাল এই সহরের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। জ্বর, আমাশয়, উদরাময়, কলেরা প্রভৃতি রোগে অনেক গৃহস্থই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

পুরুলিয়া দর্পণ।—ম্যালেরিয়া নিম্ন বঙ্গ হইতে এ বৎসর মানভূমের পার্ব্বত্য কঙ্করময় স্থানেও দেখা দিয়াছে। বাঁকুড়া জেলার কোন স্থান ম্যালেরিয়া-শূন্য নাই।

বীরভূমবার্ত্তা।—বীরভূমে এবৎসর ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রকোপ দেখা যাইতেছে। অনেক স্থানে এরূপও শুনা যাইতেছে যে কেহ কাহাকে পথ্য পাচন দেয় এমন লোকও সুস্থ শরীরে নাই। ডাক্তারী ঔষধের মূল্য ক্রমেই চড়িয়া যাইতেছে। যেমন এ বৎসর শস্যের অবস্থা তেমন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ।

বীরভূমবাসী।—এ বৎসর বীরভূমের সকল পল্লীতে অল্প বিস্তর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা যাইতেছে। নান্নুর থানার অধীন কববাটী গ্রামের মধ্যে ১৮০ জন পীড়িত অর্থাৎ শতকরা ৫০ জন পীড়িত অর্থাৎ শতকরা ৫০ জনেরও অধিক রুগ্ন। সংলগ্ন জামনা গ্রামের অবস্থাও এইরূপ। গরিব লোকে খাটিয়া খায়, তাহারা রুগ্ন হইয়া পড়ায় বিষম দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। মজুরের অভাবে গৃহস্থের জমি আবাদ হয় নাই। ভদ্রলোকে ঔষধ পথ্য ব্যবহার করিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু গরিব লোকের ঔষধ ও পথ্য কিনিবার অর্থ নাই। এইজন্য জনৈক গ্রামবাসী এই দুইখানি গ্রামে একটি ডাক্তার পাঠাইবার জন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। ভরসা করি ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাঁহার এই আবেদনে কর্ণপাত করিবেন।

চারুমিহির। আমরা টাঙ্গাইলের নানাস্থান হইতে পুনরায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সংবাদ পাইতেছি। শীঘ্র ম্যালেরিয়া-মুক্তির কোন উপায় অবলম্বিত না হইলে টাঙ্গাইল ও জামালপুরের বহুস্থান অচিরে জনশূন্য হইবে। প্রত্যেক পল্লীবাসী এই সময় চেষ্টা করিয়া আপন আপন বাড়ীর জঙ্গল পরিষ্কার, গ্রামের নিম্ন স্থানের জল বহির্গমনের উপায় অবলম্বন করিলে ম্যালেরিয়া ক্রমশঃ দূর হইতে পারে। গ্রামবাসীর সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এই-সকল কার্য্য হইতে পারে না। জঙ্গলশূন্য বালুকাময় স্থানেও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড জঙ্গল পরিষ্কার ও গ্রাম হইতে জল বহির্গমনের জন্য প্রত্যেক গ্রামে কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারেন। এবার টাঙ্গাইল ও জামালপুর অঞ্চলে বহু লোক অর্থাভাবে এক প্রকার উপবাসে দিন কাটাইতেছে;

এই সময় জঙ্গল পরিষ্কার, জলপথসমূহ সংস্কারের উদ্যোগ হইলে এই-সকল দরিদ্র ব্যক্তিগণেরও কর্মপ্রাপ্তি হয়। এ-সকল বিষয় ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রশংসনীয় উদ্যম—

যশোহর।—আমরা অবগত হইলাম যে, নড়াইলের সবডিভিসনাল অফিসার মহোদয়ের সহানুভূতি ও ৪নং সার্কেলের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়ৎ ভুবন বাবুর চেষ্টায় ৪ নং সার্কেলের অন্তর্গত স্থানসমূহের জঙ্গলাদি পরিষ্কৃত হইতেছে। জঙ্গল যে পল্লীবাসীর শস্য ও স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রতিকূল তাহা যশোহরবাসী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়াছেন। সবডিভিসনাল অফিসার মহোদয় এবং ভুবন বাবুকে আমরা শত সহস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যশোহরের বহু পল্লী জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ফলে যাঁহারা পিতৃপুরুষের ভিটার মাটি আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আধিব্যাধি ও বন্যজন্তুর উপদ্রব নীরবে সহ্য করিতে হইতেছে। এই-সকল অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইলে প্রত্যেক পল্লীবাসীকে এবং স্থানীয় রাজপুরুষদিগকে এ বিষয়ে মনোযোগ বিধান করিতে হইবে।

অভাব ও অভিযোগ—

গত বৎসরের বন্যাপীড়িত অঞ্চলের অবস্থার কথা মেদিনীপুর-বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছে—

বিগত বৎসর বন্যায় মেদিনীপুর জেলার যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা "মেদিনী-বান্ধব" পত্রিকার পাঠকপাঠিকাগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। গত বৎসর বন্যার পর বহু যুবক অনশন-ক্লিষ্ট দরিদ্র ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর অর্থের অভাব হওয়ায় সব শেষ হইয়া গিয়াছে। পাঁচ শত স্কোয়ার মাইল ব্যাপিয়া প্রায় ৩ লক্ষ লোক বিপন্ন হইয়াছিল, তথায় এখন কি হইতেছে তাহার সংবাদ লইবার কি কেহ নাই!

পাঁচটি থানার বিপন্ন ব্যক্তির সংখ্যা দুই লক্ষের অধিক, এতদ্ব্যতীত কাঁথি, রামনগর ও নন্দীগ্রাম প্রভৃতি থানার বিপন্নের সংখ্যা দেড় লক্ষের কম নহে। ইহারা সকলেই গত বৎসর ধান্য ফসল হারাইয়াছে। তৎকালে অধিকাংশ ব্যক্তি কেবল মাত্র সাহায্য-সমিতির উপর নির্ভর করিয়া দিনযাপন করিয়াছে। এখন বন্যাপীড়িত অঞ্চলে ১ মণ ধান্য ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ধান্য আনিয়া অনেকে বিক্রয় করিতেছে। এরূপ ধান্যও সহজে সর্বত্র পাওয়া যায় না, মূল্য প্রতি মণ ৩৲ ৩।০।

চাষ আবাদের পরে অনেকেই নানা স্থানে মাটির কাজ করিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন যুদ্ধ বাধায় অনেকে কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় কুলীরা পলাইয়া আসিতেছে। তাহাদের আর কোন আশা নাই। তারপর এ বৎসর দুই বৎসরের খাজনা একবারে দিতে হইলে সকলকেই অন্ধকার দেখিতে হইবে। দেশে কাহারও নগদ অর্থ নাই, ধান্য বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। পৌষ মাস পর্য্যন্ত ফসল সংগ্রহের সময়; মাঘ মাসে ফসল ঝাড়াই মলাই করিয়া বিক্রয়যোগ্য না করিলে কেহই লইবে না। তারপর দেশে সকলের অর্থাভাব হওয়ায় টাকা না পাইলে কে শস্য লইবে? এখন যুদ্ধ বাধায় ইতিমধ্যেই ধান্যের দর কমিয়া গিয়াছে; রপ্তানী না থাকায় কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে অধিক ধান্য কেহ লইবে না। আবার সকলেই যদি তথায় ধান্য লইয়া যায়, তাহা হইলে অনেকের ধান্য একবারে বিক্রয় না হইতে পারে। এমতাবস্থায় ফসল বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে খাজনা দেওয়া অসম্ভব। এই প্রকার কারণে পৌষ মাসের মধ্যে একবারে দুই বৎসরের খাজনা আদায় দিতে হইলে সমূহ প্রজা ঘোরতর বিপদজালে জড়িত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবে। দুই বৎসরের খাজনা আদায় দেওয়া দূরের কথা, কেবল এক বৎসরের খাজনা ফসল বিক্রয় ব্যতীত কেহই আদায় দিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া দুই লক্ষাধিক টাকা তাগাবী ঋণ দান করিয়াছেন। সুতরাং প্রজার অবস্থা গবর্ণমেণ্টের জানিতে বাকী নাই।

এ খবর বোধ করি দেশের শতকরা নব্বই জন লোক রাখেন না ও বাকী দশ জনের নয় জন এই চিন্তায় মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করা আবশ্যক মনে করেন না। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে বেলজিয়মের কোন্ জেলার কোন পল্লীগ্রামটিতে সশস্ত্র মোটর গাড়ীতে চড়িয়া জার্মেনির একদল দুর্দান্ত উলূহান সেনা কী পাশবিক অত্যাচার করিয়া গিয়াছে ও স্থানীয় গীর্জ্জার পাদ্রী সাহেবকে কি একটা অশ্রাব্য কটু কথা বলিয়া কিরূপ অস্ত্রের সাহায্যে কি ভাবে হত্যা করিয়াছে তাহা দেখিয়া জনৈক নারী কেমন করিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিল, এ-সমস্ত খবর প্রত্যক্ষ ঘটনার মত তাঁহাদের নখদর্পণে জানা আছে এবং ইহার ঔচিত্য বা অনৌচিত্য লইয়া তাঁহারা অনাহূত ভাবে কত লোকের সহিতই যে তর্ক করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অথচ অন্নকষ্ট-ও-ব্যাধিপীড়িত লোকগুলির কাতর আর্ত্তনাদে ও বহুসংখ্যক স্থানীয় সংবাদপত্রের আবেদন ও নিবেদনে যে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়াছে, কে তাহা শুনিবে—যাহারা শুনিবার তাহাদের কানগুলি যে সব বেলজিয়মের সীমান্তে বাঁধা পড়িয়া আছে! পরের দুঃখে এতটা বিগলিত হওয়া তাহাদেরই সাজে যাহাদের আপনার ঘর দুবেলা অন্নহীনের বিলাপ-ক্রন্দনে মুখরিত নহে! যাহার মা, বাপ, ভাই বোন চারিদিকে এক মুঠা ভাতের জন্য হাহাকার করিতেছে, কত কাতর প্রার্থনা জানাইতেছে, সে যদি বিশ্বপ্রেমিক হইয়া তাহাদের পানে আদৌ না চাহিয়াই পরের দুঃখে বিগলিত-হৃদয় হইয়া আপনার ভাণ্ডার পরকে ঝাড়িয়া দিতে থাকে, তাহা হইলে মানুষের বিচারেও সে সম্মান পাইবে না, পরন্তু ভগবানের দরবারেও তাহাকে গুরু দোষে

দোষী হইতে হইবে; সে অপরাধী ছাড়া আর কিছু হইবে না। ইংরেজীতে একটা প্রবচন আছে যে দাতব্যটা ঘর হইতেই সুরু করিতে হয়—কথাটা নিতান্ত উড়াইয়া দিবার মত নহে! আমাদের আবেদন এই যে, তাঁহারা দেশের দারিদ্র্য-পীড়িত অনশনক্লিষ্ট তাঁহাদেরই মুখাপেক্ষী তাঁহাদেরই স্বদেশীয় ভাইবোনদের করুণ মুখগুলির কথা একবার যেন মনে করেন।

কলের জল।—

যশোহর।—আজ প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল যশোহরে জলের কল খোলা হইয়াছে, কিন্তু এত দীর্ঘকালের মধ্যেও কর্তৃপক্ষ কলের জলের পোকা বিনষ্ট করিতে বা তাহার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হন নাই। সহরবাসী কলের জন্য উচ্চহারে ট্যাক্স দিয়া পোকা মাকড় খাইতে বাধ্য হইতেছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে জলের পোকা লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। সহরবাসী অধিকাংশই দরিদ্র সুতরাং দরিদ্রের কর্ম্মশক্তি যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইতেছে। অর্থাৎ সকলেই অসুবিধা ভোগ করিতেছে সত্য, কিন্তু তেমন তীব্রভাবে আন্দোলন উপস্থিত হইতেছে না। মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের উচিত স্যানিটেশন বিভাগের কোন উচ্চ কর্ম্মচারীকে আনাইয়া ইহার প্রতিকার বিধান করেন। কলের জলের দুর্গন্ধ ও পোকা বিনষ্ট না হইলে এবং জল সম্পূর্ণরূপে পানের উপযোগী না হইলে কলের জলের ট্যাক্স আদায় করা অসঙ্গত।

ইহা আমাদেরই কলঙ্কের কথা। অন্যান্য অসংখ্য স্থানে জলের পোকা মরিল, আর যশোহরেই মরিল না, ইহা আশ্চর্য্য বটে! পোকা মারিবার উপায় প্রত্যেক বার প্রত্যেক যায়গায় নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে হয় না। এক যায়গার ও একবারকার অনুসন্ধানলব্ধ উপায়ের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধ হয়। সে উপায় যশোহরের মিউনিসিপ্যালিটি অবলম্বন করিলে পোকা মরিবে না তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। এসব গুরুতর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অবহেলা আদৌ উচিত নয়। এই সামান্য ব্যাপারই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতে বেশী সময় লাগে না। ওলাউঠা, আমাশয় প্রভৃতি আর কি করিয়া হয়!

স্বদেশী শিল্পের পরমুখাপেক্ষিতা।—

যশোহর।—যশোহরের চিরুণীর কারখানায় যে-সকল উপাদান ব্যবহৃত হয়, তাহার সমস্তই জর্ম্মনী হইতে আমদানী হইত। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে জর্ম্মনী হইতে আমদানী বন্ধ হওয়ায় কারখানার কার্য্য একপ্রকার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। অশন-বসন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে আমরা পরের মুখাপেক্ষী। এখন পরের ঘরে বিপদ উপস্থিত সুতরাং আমরা দূরে থাকিয়াও পরের বিপদের অংশভোগী হইতেছি। আমরা আশা করি গবর্ণমেন্ট অতঃপর দেশের কৃষি বাণিজ্যের উন্নতিবিধানে সমধিক মনোযোগ বিধান করিবেন।

এই সময় জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়া হইতে যে সকল শিল্পজাত ভারতে আসিত সেই-সকল শিল্প-দ্রব্য ভারতে উৎপন্ন করিবার জন্য সহৃদয় ভারত গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিতেছেন, যে-সকল শিল্পশালা প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন; ইহা অতীব সুখের বিষয়। তাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে অবিলম্বে যশোহরের চিরুণী কারখানার প্রতি গবর্ণমেন্টের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। ভারতবর্ষে একটি সেলুলয়েড্ প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা হউক। নতুবা যশোহরের কেন ভারতের সমুদয় চিরুণীর কারখানার অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিদেশী সূতা না হইলে দেশী কাপড় হইবে না—বিদেশী শিক, বাঁট ও কাপড় না হইলে দেশী ছাতার আশা নাই—এরূপভাবে শিল্পের উন্নতি হয় না ইহাতে শিল্পোন্নতির গতি প্রতিরোধই হয়। আশা করি তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে এবং ঠেকিয়া সকলে প্রতিকার-বিধানে যত্নবান হইবেন।

সৎকার্য্যে বাধা।—

যশোহর।—আজ কয়েক বৎসর যাবৎ স্থানীয় কতিপয় সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্রলোক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া মৃতের সৎকারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। সুখের বিষয় ক্রমেই এই পরোপকারী দলের অঙ্গপুষ্টি হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সুখের কোলে লালিত পালিত হইয়া আসিতেছেন,—যাঁহাদিগকে জীবনে কখনও এখানকার তৃণগাছা ওখানে সরাইয়া ফেলিবার শ্রমটুকু সহ্য করিতে হয় নাই বা কখনও হইবে না, এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ শবদেহ স্কন্ধে করিয়া ঝড় বৃষ্টি, আতপ আঁধার উপেক্ষা করিয়া সানন্দে শ্মশান-ক্ষেত্রে গমন করিতেছেন। ইহা যে বাস্তবিক মনুষ্যত্বের নিদর্শন, আনন্দের বিষয়, কে ইহা অস্বীকার করিবে? আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, স্থানীয় জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই আদর্শ অনুষ্ঠান-প্রিয়তাকে হুজুগ বলিয়া নিন্দা করিতে শ্লাঘা বোধ করিয়াছেন। তিনি জনৈক ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "আপনারা নীলগঞ্জ যাইয়া বসিয়া থাকুন, তাহাতে চাকুরীর আয় অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন হইবে।"

যশোহর ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন বটে কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার তো কিছুই আমরা দেখিলাম না। যাহাদের পক্ষে ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে চিত্তকে প্রসারিত করা ও সহানুভূতিকে ব্যাপ্ত করা অসম্ভব ব্যাপার তাহাদের পক্ষে পরের উপকার করাটা হয় একান্ত বাড়াবাড়ি কিম্বা কোনো রূপ গোপন-লাভের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্য্য ছাড়া আর কি মনে করা সম্ভব হইতে পারে? ইহারাই ঘরের মড়া ছাড়িয়া পরের মড়া ফেলিতে ছুটিতে চাহে; মা বাপ ভাই বোনকে অনশনে রাখিয়া পরের দেশের দুঃখে অভিভূত হইয়া সর্ব্বস্ব চাঁদা দিতে ছুটে। উক্ত ভদ্রলোকটি

আমাদের বর্ত্তমান সুবিধাধর্ম্মী ও স্বার্থসর্ব্বস্ব সমাজের পোষ্যদিগের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। অধিকাংশ লোকই তো ঐরূপ। আমাদের দেশে এরূপ দুষ্প্রভাবের ভিতর থাকিয়াও কতকগুলা লোকও ভালো হয় কিরূপে তাহাই আমাদের নিকট আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

পুস্তক-পরিচয়

জৈনধর্ম্ম—

(বঙ্গীয় সার্ব্বধর্ম্ম পরিষদ্ গ্রন্থমালার অন্তর্গত) শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত, প্রকাশক কুমার শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈন, মন্ত্রী, সার্ব্বধর্ম্ম পরিষৎ, কাশী, পৃ ১১৭+২৭।

গ্রন্থকার জৈনধর্ম্মের ও দর্শনের কথা সংক্ষিপ্তভাবে বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে শ্রাবক অর্থাৎ গৃহস্থ ও সাধু অর্থাৎ সন্ন্যাসী এই দুই সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় আচার-ব্যবহার ও কার্য্যকলাপাদির বর্ণনা করিয়াছেন। খুব সম্ভব বঙ্গভাষায় এতাদৃশ গ্রন্থ ইহাই প্রথম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ইহা পাঠ করিয়া সুখী হইতে পারি নাই। উপেন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থের উপকরণগুলি যথাযথভাবে সাজাইয়া লিখিতে পারেন নাই। এই-সমস্ত উপকরণের অধিকাংশই হিন্দী বা ইংরেজীতে লিখিত বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত; যদিও তিনি বিশেষভাবে কোন স্থানে ইহা স্বীকার করেন নাই। স্পষ্টই বুঝা যায় তাঁহার পুস্তকখানি পরের নিকট হইতে ধার-করা মাল মশলা লইয়া লিখিত, মূল পুস্তক হইতে তিনি কিছু সংগ্রহ করেন নাই। এজন্য যেরূপ ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক, সমগ্র বইখানিতে তাহা হইয়াছে। তিনি বাদও দিয়াছেন যথেষ্ট, ভুলও করিয়াছেন যথেষ্ট। কোন কোন স্থলে তিনি যাহা বলিতে গিয়াছেন, মনে হয়, স্বয়ং নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বইখানি সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকগণের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে, দেখিলেই বোধ হয়; কিন্তু আমাদের মনে হয়, আমূল সংশোধন না করিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না।

তিনি একস্থানে বলিতেছেন (৬৯ পৃ পাদটীকা) বেদসংহিতার মধ্যে তিনি "স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রটিকে দেখিতে পান নাই, অথচ তাহা পাওয়া তাঁহার দরকার, তাই বলিতেছেন যে সম্ভবত তাহা সংহিতার মধ্যে সংহত হয় নাই। তিনি বাজসনেয়িসংহিতায় (শুক্লযজুঃ, ২৫ ১৯) ইহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, ঋষভ বা অরিষ্টনেমি শব্দ বেদের মধ্যে থাকিলেই কেবল ইহারই দ্বারা নিঃসংশয়রূপে বলিতে পারা যায় না যে, জৈনধর্ম্মের ঐ দুই তীর্থঙ্কর সেই সময় ছিলেন বা নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বেদের ব্যাখ্যাকারগণ যৌগিক অর্থে ঐ-সকল শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। যাঁহারা বলিতে চাহেন যে, তাঁহারা বেদের সময়ে ছিলেন, বা ঐ দুই শব্দ সংজ্ঞাবাচী ও ঐ তীর্থঙ্করদ্বয়কেই বুঝাইতেছে, তাঁহাদিগকে এজন্য অপর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

আর একটা ভুল সংশোধন করা দরকার। শ্রীযুক্ত বারাণসী দাস এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের যে প্রবন্ধটিকে, ব্রহ্মচারী শীতল প্রসাদজী হিন্দীভাষায় জিনেন্দ্র মত দর্পণ নামে প্রকাশ করিয়াছেন, খুব সম্ভব উপেন্দ্র বাবু তাহা হইতেই, Indian Antiquary (Vol. 30, July 1901) নাম দিয়া, ঋগ্বেদের (১০-১৩৬-২) একটা কথা তুলিয়াছেন, "মুনয়ো বাতবসনাঃ," কিন্তু, বস্তুত পাঠ আছে "মুনয়ো বাতরশনাঃ," যদিও অর্থগত ভেদ নাই। এই ভুল পাঠটি সমস্ত প্রবন্ধেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও (১১-৬-৪৭) আছে "বাতবশনা ঋষয়ঃ," অবশ্য এখানে এ পাঠও আছে, মনে হয় "বাতরসনা মুনয়ঃ," "বাতরশনা মুনয়ঃ।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত অপর দৃঢ়তর প্রমাণ দর্শিত না হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা বলিতে পারিব না যে, এই পঙ্‌ক্তিটি নির্গ্রন্থ বা জৈনগণকে বুঝাইতেছে।

দুই আনার টিকিট মাশুলের জন্য পাঠাইলে বইখানি বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক মাসে একটি কি দুটি প্রশ্ন মুদ্রিত করিব; প্রবাসীর সকল পাঠকপাঠিকাই অনুগ্রহ করিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। যে মত বা উত্তরটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক ব্যক্তি পাঠাইবেন আমরা তাহাই প্রকাশ করিব। কোন উত্তর সম্বন্ধে অন্তত দুইটি মত এক না হইলে তাহা প্রকাশ করা যাইবে না। বিশেষজ্ঞের মত বা উত্তর পাইলে তাহা সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইবে। পাঠকপাঠিকাগণও প্রশ্ন পাঠাইতে পারিবেন; উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহা আমরা প্রকাশ করিব এবং যথানিয়মে তাহার উত্তরও প্রকাশিত হইবে। ইহাদ্বারা পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে চিন্তা উদ্বোধিত এবং জিজ্ঞাসা বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আশা করি। যে মাসে প্রশ্ন প্রকাশিত হইবে সেই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে উত্তর পাঠাইতে হইবে।—প্রবাসীর সম্পাদক]

প্রশ্ন

বাংলাভাষার ১০০ খানি শ্রেষ্ঠ পুস্তকের ও তাহাদের রচয়িতার নাম কি?

[কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রহসন, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, চিকিৎসা, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জাতি বা নৃতত্ত্ব ইত্যাদি, জীবন-চরিত, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সমালোচনা, ধর্ম্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অভিধান, ব্যাকরণ, ভাষার ইতিহাস, ভ্রমণ—এই সকল বিভাগ হইতে সর্ব্বসমেত ১০০ খানি পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে হইবে। কোনো বিভাগে উল্লেখ-যোগ্য পুস্তক না পাইলে সে বিভাগ বাদ দিতে পারিবেন। কেহ যদি ১০০ খানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক না পান তো যে কয়খানি উল্লেখযোগ্য মনে করেন সেই কয়খানির নাম লিখিয়া পাঠাইবেন। তবে একশতের অধিক নাম কেহ পাঠাইতে পারিবেন না।

পুস্তক নির্ব্বাচন করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে উহা মৌলিক সৃষ্টি হওয়া চাই। পুস্তকের নামগুলি নম্বর দিয়া পৃথক পৃথক পংক্তিতে পরে পরে লিখিতে হইবে।]

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥

কুমারসম্ভব, ৫, ৮৫।

অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩২১

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শীতে প্রয়াগে গঙ্গার মূর্ত্তি

প্রয়াগে শীত পড়িতেছে। দারাগঞ্জ প্রয়াগের একটি পাড়া, গঙ্গার তীরে অবস্থিত। দারাগঞ্জে গঙ্গার উঁচু পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, গঙ্গার স্রোত দেখা যায় না; কেবল বালী আর বালী। অনেক দূর বালী ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখিলাম, স্রোত মরে নাই, খর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পাড় ভাঙ্গিয়া নদীর গর্ভে পড়িতেছে। আজ যেখানে ডাঙ্গা, কাল সেখানে বালীর, মাটীর, কোন চিহ্নই নাই।

মনে পড়িল, বর্ষাকালে যখন স্রোতের জল দুই কূল ছাপিয়া উঠে, যখন ক্রোশাধিক ব্যাপিয়া কেবল জল আর জল, কেবল তরঙ্গভঙ্গ চোখে পড়ে, স্রোতের গম্ভীর মন্দ্র কানের ভিতর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করে,—তখন পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রালোকে কেমন দৃশ্য হয়। তখন মনে হয় না যে এই গঙ্গার স্রোত শীতকালে শীর্ণদেহে দুস্তর বালুকারাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়; মনে হয় না যে শীতকালে এই গঙ্গার বুকের উপর দিয়া নৌকার সেতু বাঁধা হয়, এবং তাহার উপর দিয়া মানুষ গরু গাধা ছাগল ভেড়া নিত্য যাতায়াত করে। বর্ষায় কিন্তু এই সেতুবন্ধের চিহ্নও থাকে না।

প্রতিবৎসরই গঙ্গার এই দুই মূর্ত্তি দেখিতে পাই।

কত কত দেশে জাতীয়জীবন-গঙ্গারও দুই মূর্ত্তিই দেখা গিয়াছে। কিন্তু প্রতিবৎসর সর্ব্বত্র তাহা দেখা যায় না। হয়ত প্রতি শতাব্দীতেও নহে। কিন্তু সকল জাতির জীবনেই গঙ্গার দুই মূর্ত্তি আছে। কোন্ জাতির শীত ও বর্ষার মধ্যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু বিধাতা এই ব্যবধান অপরিবর্ত্তনীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন নাই। পুরুষকার শীতের শীর্ণতা দূর করিয়া বর্ষার প্লাবন আনিতে পারে। আবার, মনুষ্যত্ব যতদিন থাকে, বর্ষার প্লাবনও তত দিন থাকে।

শীতের শীর্ণতা ও বিলাপ অমানুষের জন্য। যাহার মনুষ্যত্ব আছে, চোখ আছে, সে ই দেখিতে পায় বর্ষার প্লাবন সকলের জন্যই রহিয়াছে। কিন্তু উহা আনিতে জানা চাই। ভগীরথ কেবল একবার একটি দেশে গঙ্গা আনেন নাই, বা আনিয়া নিবৃত্ত হন নাই। গীতার "সম্ভবামি যুগে যুগে" কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথা নহে; ভগীরথেরও বটে।

তরল ইতিহাস

বিদেশী লোকেরা যখন ইংলণ্ড যান, তখন অনেকে টেম্‌স্ নদী দেখিয়া বিস্মিত হন। ইংরেজেরা এই ক্ষুদ্র নদীর এত গৌরব করেন! ইহা বিদেশীদের চোখে একটা ময়লা জলের বড় নর্দ্দামা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জন্ বার্ন্স্* এই টেম্‌স্‌কে "তরল ইতিহাস" (liquid history)

* জন্ বার্ন্স বিলাতের বর্ত্তমান উদারনৈতিক মন্ত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন। জার্ম্মেনীর সহিত যুদ্ধ করা অনুচিত বা অনাবশ্যক

বলিয়াছেন। বাস্তবিক, নদী, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, দুর্গ, বন্দর জড় পদার্থ মাত্র; ঐতিহাসিক স্মৃতিই তাহাদিগকে সজীব করে, শক্তিশালী করে। টেম্‌স্‌ কত মাইল লম্বা, কত গজ চৌড়া, কত হাত গভীর, উহার জল নির্ম্মল বা ময়লা, তাহার দ্বারা উহার গৌরবের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায় না। উহার বক্ষে, উহার তীরে, উহার মোহানায় কত পুরুষ, কত নারী কত কীর্ত্তির স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। এই-সকল স্মৃতিই টেম্‌সের প্রাণ।

কিন্তু কেবল টেম্‌স্‌ই কি "তরল ইতিহাস?" আমরা জলময়া গঙ্গাকে চোখে দেখি, হাতে স্পর্শ করি, তাহাতে স্নান করি; কিন্তু ইতিহাসরূপিণী গঙ্গার কথা ভাবি কি? গঙ্গার জল স্পর্শ করিবামাত্র ঐতিহাসিক স্মৃতির বিদ্যুৎ শিরায় শিরায় খেলিতে থাকে কি? গঙ্গোত্রী হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত নানা তপোবনে, আশ্রমে, দুর্গে, ঘাটে, দেবালয়ে, সমাধিমন্দিরে, গ্রামে, নগরে, কত জ্ঞান, কত ত্যাগ, কত ধ্যান, কত স্বপ্ন, কত তপস্যা, কত শ্রম, কত শৌর্য্যের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে, সে-সব কথা আমাদের মনে পড়ে কি? আবার, ঐ-সকল স্থানের কত বিলাসিতা, কত আলস্য, কত পশ্বাচার, কত কাপুরুষতা, কত স্বার্থপরতা ও কত অমানুষতার কালিমা জাতীয় জীবন-গঙ্গাকে ধুইয়া ফেলিতে হইবে, তবে আমাদের ইতিহাস আবার শুভ্র, শুচি, নিষ্কলঙ্ক হইবে, তাহা কি আমরা ভাবি?

গঙ্গাকে দেখিতে, গঙ্গার কথা শুনিতে, গঙ্গায় স্নান করিতে জানিতে হয়।

গঙ্গাযমুনা সঙ্গম

এই প্রয়াগে ভারতের ইতিহাসের স্রোত অনেকবার বাঁক ফিরিয়া নূতন পথে গিয়াছে। ঋগ্বেদে ইহার উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব এখানে প্রচার করিয়াছিলেন। অশোক প্রয়াগ দর্শন করিয়া এখানে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য বুধমণ্ডলীর সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি স্তম্ভ দুর্গের মধ্যে অবস্থিত আছে। রাজা হর্ষবর্দ্ধন এখানেই তাঁহার সাম্রাজ্যের পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত সমুদয় ধনসম্পত্তি দান করিয়া নিঃস্ব হইয়াছিলেন। চীন পর্য্যটক য়ুয়ান চাং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই অপূর্ব্ব দানযজ্ঞের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কুম্ভমেলা প্রয়াগে যে কত শতাব্দী ধরিয়া হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মুসলমান-রাজত্বকালেও প্রয়াগের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। এখানে এখন যে দুর্গ আছে, সম্রাট আকবর তাহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানেই ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলম বাদশাহ ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করেন। তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজ-রাজত্বের আরম্ভ হয়। তাহার পর সিপাহীযুদ্ধের শেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে সাক্ষাৎভাবে ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করেন। *

ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্রোত যে যুগে যুগে নূতন নূতন দিকে গিয়াছে, তাহাকে কেবল রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন বা রাজবংশের পরিবর্ত্তন মনে করা উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে, জাতীয় জীবনের গভীরতম প্রদেশে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উত্তরভারতে ও দক্ষিণভারতে কেবলমাত্র প্রাচীন হিন্দু সমাজের রীতিনীতি প্রথা ব্যবস্থা লক্ষ্য করিলেই এই সত্যের উপলব্ধি হয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্রোত কেন নূতন নূতন দিকে প্রবাহিত হইল, প্রয়াগে আসিলে সে চিন্তা প্রাণে উদিত হয়। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সময়, পুরাতন কি দিয়া গেল, কি দিতে না পারায় তাহার অন্তর্ধান হইল, নূতনের কি শক্তি কি প্রদাতব্য তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিল, আবার কি কারণে তাহাও পুরাতনের ভগ্নস্তূপের মধ্যে গিয়া পড়িল, এ-সকল কথা অনুধাবনযোগ্য। নদী চিরকাল এক খাত দিয়া বহে না। পুরাতনে জল স্থির পঙ্কিল হয়, চড়া পড়ে, নূতন খাত দিয়া স্রোত বহিতে থাকে। জাতীয় জীবনের স্রোতেরও এই দশা। প্রাচীন কালের নানা পরিবর্ত্তনের কারণ চিন্তা করিলে ভবিষ্যতে স্রোত কোন্‌দিকে বহিবে, তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারিলেও ঠিক্‌ কিছু বলা যায় না।

মনে হওয়ায় লর্ড মর্লী, ট্রিভেলিয়ান ও তিনি স্ব স্ব পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

* প্রয়াগের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত "Prayag or Allahabad" নামক পুস্তকে লিখিত আছে।

জগতে ভগবানের শক্তিই জড়ে চেতনে সর্ব্বত্র কাজ করিতেছে। কিন্তু মানুষ সেই শক্তিরই সাহায্যে ভগবানের সহকারিতা করিতে পারে। মানুষের সৃষ্টিকাল হইতে সে বিদ্যুতের আলোকে এবং বজ্রের কড়কড় নাদ ও সংহারশক্তিতে বিস্মিত ও ভীত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ সেই মানুষ বিশ্বকর্ম্মার সহকারী বলিয়া আপনাকে চিনিতে পারিয়া তাড়িতশক্তি দ্বারা গ্রাম নগর ঘরবাড়ী আলোকিত করিতেছে ও নানাপ্রকার কল চালাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের শতকাজ সুসাধ্য করিয়া তুলিতেছে। নদীর জল প্রাকৃতিক নিয়মে কখনও পুরাতন, কখনও বা নূতন খাতে প্রবাহিত হইত। মানুষ ছোট বড় কৃত্রিম খাল কাটিয়া তাহার মধ্য দিয়া জল বহাইয়া নিজের কার্য্য সাধন করিতেছে। সুয়েজ এবং পানামা ছিল যোজক; মানুষের বুদ্ধি, সাহস, শ্রম ও অধ্যবসায়ে যোজক দুটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খালে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্য দিয়া বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিতেছে।

বিধাতার সহকারিতা করিয়া মানুষ বৈজ্ঞানিক কৌশলে নূতন নূতন ফুলফলের সৃষ্টি করিতেছে। এইরূপ উপায়ে নূতন রকমের কুকুর, পায়রা প্রভৃতি প্রাণীর এবং অন্যবিধ জীবেরও সৃষ্টি মানুষের দ্বারা হইয়াছে।

মানবসমাজে যেরূপ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়, তাহাও মানুষের সাধ্যায়ত্ত। পৈশাচিক দাসত্বপ্রথা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ হইতে মানুষের চেষ্টাতে উঠিয়া গিয়াছে। নারীদেহের পাপব্যবসা উঠাইবার চেষ্টাও সফল হইবে। বিধাতার নিয়ম-সকল অনুসন্ধান ও চিন্তা দ্বারা জানিয়া লইয়া সেই-সব নিয়মের সাহায্যে তাঁহার সহকারিতা করিয়া অভিলষিত পরিবর্ত্তন মানুষ সাধন করিতে পারে।

ইতিহাসের নানারূপ

ইতিহাসের তরল মূর্ত্তি কেবল গঙ্গাতেই দ্রষ্টব্য, তাহা নয়। গঙ্গা যেমন ইতিহাসরূপিণী, যমুনাও তেমনি ইতিহাসরূপিণী। ভারতের ক্ষুদ্রতম নদীও ইতিহাসরূপিণী। প্রত্যেকের কূলে প্রত্যেকের বক্ষে শৌর্য্য, ত্যাগ, দয়া, সতীত্ব, মানুষের সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য, কখন লোকচক্ষুর সম্মুখে কখনবা লোকচক্ষুর অন্তরালে, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রত্যেকের বালুকণার সহিত কত সাধুর, কত সাধ্বীর, কত বীরের, কত বীরাঙ্গনার দেহের ভস্মাবশেষ মিশিয়া গিয়াছে।

ইতিহাসের মৃন্ময়ী এবং পাষাণময়ী মূর্ত্তিও ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। চিতোর পাষাণময় মৃন্ময় ইতিহাস। অশোকের স্তম্ভগুলি পাষাণময় ইতিহাস। অজণ্টা, ইলোরা, কার্লী, প্রভৃতি কত গুহা ইতিহাসের শৈলমূর্ত্তি। বোধগয়া ইতিহাসের পাষাণী ও মৃন্ময়ী মূর্ত্তি।

কাগজে ছাপা ইতিহাস পড়িলেই বা কণ্ঠস্থ করিলেই ইতিহাস পাঠের ফল পাওয়া যায় না। তরল ইতিহাসে স্নান করিতে, ও ধ্যান করিতে হয়। পাষাণময় ইতিহাস দেখিয়া স্পর্শ করিয়া তাহার ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ধ্যানের দ্বারা স্বপ্নদর্শন দ্বারা তাহার শক্তি মর্ম্মে মর্ম্মে সঞ্চিত করিয়া রাখিলে তবে আমরা নূতন প্রাণ পাইতে পারি। এই প্রকারে যাহার পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়, এই প্রকারে যে দ্বিজ হয়, সে ভারতের বাণী শুনিতে পায়। সেই বাণী অলঙ্ঘনীয় আদেশ। তাহা পালন না করিয়া থাকিবার জো নাই। পালনেই আনন্দ, পালনেই জীবন, পালনেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ।

জীর্ণ জাতি ?

মানুষ প্রাচীন হইলেই জীর্ণ ও অক্ষম হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতা যে যে জাতির, ইতিহাস যাহাদের প্রাচীন, তাহারাই জীর্ণ জাতি, তাহারাই জগতের অগ্রগতির সঙ্গে সমানে সমানে পা ফেলিয়া চলিতে অক্ষম, একথা সত্য নহে। এশিয়ার প্রাচীনতম সব জাতিই ত জীর্ণ, অক্ষম, অগ্রগতিবিমুখ, অগ্রগতিতে অসমর্থ নহে। দৃষ্টান্তের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ অনাবশ্যক। ইউরোপের প্রাচীনতম জাতিরাও জরাজীর্ণ নহে।

যে-কোন জাতিকে জীর্ণ বলিয়া মনে হয়, তাহার শিশুগুলিকে দেখুন। তাহারা পাকাচুল ও ঢিলা চামড়া লইয়া ত জন্মে না। তাহারা নূতন মানুষ; নূতন উদ্যম, নূতন চোখকান, নূতন কৌতূহল, নূতন ভাঙ্গিবার গড়িবার শক্তি ও ইচ্ছা লইয়া জন্মিয়াছে। যদি কেহ তাহাদিগকে বাস্তব ও কাল্পনিক জুজুর ভয় দেখাইয়া, অতি-

রিক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া অমানুষ করিয়া না তোলে, তবে ত তাহারাও কিছু হইয়া কিছু করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে। হইতে পারে, যে, দেশে সামাজিক কুপ্রথা থাকায়, কাঁচা বয়সের বাপমার সন্তান হয় বলিয়া, দেশ ব্যাধিপূর্ণ হওয়ায় পিতামাতার দেহ ও তাহাদের নিজেদের দেহ দুর্ব্বল বলিয়া, এবং দেশে দারিদ্র্য থাকায় তাহাদের পিতামাতারা ও তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য পায় না বলিয়া,—যেখানে অন্য দেশের শিশুরা ৭০ বৎসরে পা দিয়াও কার্য্যক্ষম থাকে, সেখানে এই তথাকথিত জীর্ণজাতির শিশুরা ৫০ বা ৫৫ বৎসরের পর কাজ করিতে পারে না। কিন্তু, তাহারা জীর্ণজাতির মানুষ, তাহারা অক্ষম, তাহারা দুর্ব্বল, জন্মাবধি এই মন্ত্র তাহাদের কানে না ফুঁকিলে, তাহারা এই ৫৫ বৎসর-পরিমিত জীবনও ত মানুষের মত যাপন করিতে পারে। তা ছাড়া, সামাজিক কুপ্রথা দূর করা অসাধ্য নহে। চীন জাপান পারস্য তুরস্ক রাজপুতানা দূর করিয়াছে ও করিতেছে। আমরা কেন পারিব না? ইতালী হইতে, পানামা হইতে, আরও কত কত দেশ হইতে ম্যালেরিয়া প্লেগ আদি দুরীভূত হইয়াছে। আমাদের দেশ হইতেই হইবে না কেন? বিদেশী আমাদের দেশে কুবেরের সমান ধনী হয়। আর আমাদিগকে না খাইয়া মরিতেই হইবে, বিধাতার এমন কোন আজ্ঞা নাই।

অতএব, আমরা প্রাচীনজাতি বলিয়া যে জীর্ণজাতি, এ মিথ্যা কল্পনা দূর হউক। শিশুদিগকে ধমক ও ঠেঙ্গার চোটে গোবেচারা করিবার দুশ্চেষ্টার অবসান হউক।

একবার দেশকে জাতিকে ভাল বাসিয়া ভাল করিয়া উন্নতির চেষ্টায় সকলে প্রবৃত্ত হই।

স্বদেশপ্রেম ও বিদেশীবিদ্বেষ

বিদেশীকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখা খুব সহজ। কিন্তু ইহার কুফলও তেমনি ভয়ানক। ইউরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধ তাহার একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহার মানে এ নয় যে কোন বিদেশী কাহারও স্বদেশের অনিষ্ট করিলেও সে চুপ করিয়া থাকিবে। সে অবশ্যই তাহাতে বাধা দিবে।

কিন্তু অনিষ্টকারীর দুরভিসন্ধিতে বাধা দেওয়া, কিম্বা যাহাতে বা যাহার দ্বারা ক্ষতি হইতেছে তাহার সমালোচনা করাই স্বদেশপ্রেমের সার অংশ নহে।

দেশের লোকের জন্য আমাদের প্রাণ কার্য্যতঃ কতটুকু কাঁদে, আমরা তাহাদের জন্য কতটুকু নিজের শক্তি, নিজের টাকা, নিজের সময় দিয়া থাকি, দেশ আমাদের চিন্তা, কল্পনা, স্বপ্ন ও চেষ্টাকে কি পরিমাণে গ্রাস করিয়াছে, তাহা দ্বারা স্বদেশপ্রেম পরীক্ষিত হয়। আরও বেশী পরীক্ষা হয়, যদি আমরা দেশের জন্য ইন্দ্রিয়সেবা, বিলাসিতা, সুখ, স্বার্থ, মনের নিরুদ্বেগ নিরাপদ ভাব ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করি। দেশের জন্য প্রেমিক, ত্যাগী, শ্রমী, সাহসী, প্রজ্ঞাবান্ যিনি তিনিই দেশভক্ত!

যে দেশে একজনও প্রেমিক, ত্যাগী, সাহসী, শ্রমী, ধীর, প্রজ্ঞাবান্ মানুষ আছেন, সে দেশের আশা আছে। সেই মানুষ সহজে মিলে না।

দেশ হইতে জাতি হইতে আপনাকে পৃথক্ ভাবিলে দেশহিতব্রত হওয়া যায় না! "আমি" ও "তাহারা" এরূপ ভাবিলে চলে না। সবাই "আমরা"।

বোথার অভিধানে কুলীর অর্থ

ইংরেজদের সঙ্গে বুরদের যখন যুদ্ধ হয়, তখন বোথা বুরদের একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি এখন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী। তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে এক বক্তৃতায় "ভারতসন্তান" অর্থে কুলী শব্দটি প্রয়োগ করেন। তাহাতে দক্ষিণআফ্রিকাবাসী ভারতসন্তানদের অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়া বোথাকে পত্র লেখেন। বোথা বলেন, "বুরদের মাতৃভাষা ডচ্ভাষায় ভারতবাসী অর্থে কুলী কথার ব্যবহার আছে। আমি আপনাদিগকে ক্লেশ দিবার জন্য বা অপমান করিবার জন্য উহা ব্যবহার করি নাই।"

বোথা ভারতবাসী মাত্রকেই কুলী বলায় ভারতবর্ষেরও অনেক সম্পাদক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

যাহারা কুলীর কাজ করে, তাহারা গরীব; ভাল কাপড়, ভাল ঘরবাড়ী তাহাদের নাই। শিক্ষাও সামান্য রকমের অতি অল্প লোকেরই আছে। সুতরাং সমুদয়

ভারতবাসীকে যাহারা কুলী বলে, তাহাদের কাহারও কাহারও মনে এইরূপ কু অভিপ্রায় থাকিতে পারে, যে, ভারতবর্ষের সমুদয় লোককে অশিক্ষিত অনুন্নত কেবল শারীরিক শ্রমে সমর্থ অসভ্য বলিয়া জগদ্বাসীর নিকট পরিচিত করিলে, তাহাদিগকে মানবলভ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, এবং তাহাদের এরূপ অধিকার না পাওয়াটা "সভ্য" জগতের কাছে বেশী অন্যায় বলিয়াও মনে হইবে না। বোথার মনের কোণে এরূপ কোন ভাব লুক্কায়িত আছে কি না জানি না। কিন্তু কোন বিদেশী যদি আমাদের সকলকে কুলী বলে, তাহাতে আমাদের অপমান বোধ করা বা অভিমান করা কি শোভা পায়? ভাল-কাপড়চোপড়-পরা লেখাপড়া-জানা আমরা কতকগুলি লোক, কুলী হইতে স্বতন্ত্র উচ্চশ্রেণীর জীব, ইহা জগদ্বাসীর নিকট প্রচার করিলে ও তাহারা তাহা স্বীকার করিলে আমাদের লজ্জা বেশী, না গৌরব বেশী? আমার ভাই দাসেরই মত লাঞ্ছনা সহ্য করে, আর আমি বিলাসসুখ ভোগ করি, ইহা আমার লজ্জা না গৌরবের কথা?

আমরা কতকগুলি লোক কুলী নহি, ইহা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার চেয়ে ভাল চেষ্টা আছে। শারীরিক শ্রম সম্মানের জিনিষ, এই বিশ্বাস যাহাতে দেশমধ্যে বদ্ধমূল হয়, এরূপ চেষ্টা সুচেষ্টা। ধর্ম্মে জ্ঞানে অর্থে যাহাতে দেশবাসী সকলেরই অবস্থা উন্নত হয়, এরূপ চেষ্টা সুচেষ্টা। দেশের অধিকাংশ লোক যখন বাস্তবিক কুলীনামে অভিহিত হইবার যোগ্য, তখন বাকী কতকগুলি লোকের "কুলী নই" বলিয়া চীৎকার করিয়া কি লাভ?

আর, কুলীরা যে বাস্তবিক অকুলীদের চেয়ে সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট এমন ত মনে হয় না। কোদাল কুঠার করাত হাতে লইয়া কাজ করা, কলম হাতে লইয়া কাজ করার চেয়ে অসম্মানের বিষয় নহে। সৎপথে থাকিয়া, চুরী ডাকাতি প্রবঞ্চনা না করিয়া, যে যে-ভাবে পরিশ্রম করে, তাহাই ভাল। আলস্যই নিন্দার্হ। সভ্যজগতের সর্ব্বত্র, কোথাও কম, কোথাও বেশী, এইরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে যে, যে যত অসহায় অক্ষম, যে যত বেশীসংখ্যক চাকরের সেবার সাহায্যের অপেক্ষা রাখে, সে তত সম্ভ্রান্ত।* বাস্তবিক কিন্তু মনুষ্যত্ব তাহারই বেশী যে নিজের সব কাজ ত নিজে করিতে পারেই, অধিকন্তু অপরের কাজও করিয়া দেয়। অতএব আত্মনির্ভরক্ষম কুলী শতদাসদাসীসেবিত অলস অকর্ম্মণ্য ধনী অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ নহে, তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে।

কুলীরা স্বভাবচরিত্রবিষয়ে অকুলীদের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে। কোন কোন কুলী চুরী করে, কোন কোন "ভদ্র" লোকও চুরী করে। অনেক স্থলে প্রভেদ এই যে কুলী পেটের দায়ে চুরী করে, এবং এই পেটের দায়ের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বহুপরিমাণে দায়ী; "ভদ্র" ধনীলোকেরা চুরী করে দুরাকাঙ্ক্ষা, বিলাসলালসা, বা পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য। মিথ্যাবাদিতা, চাটুকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহিতা, কুলীদের মধ্যে বেশী, অকুলীদের মধ্যে কম, একথা বলিবার জো নাই। সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা, প্রভৃতি গুণে কুলীরা অকুলীদের কাছে হার মানিবে না, ইহা নিশ্চিত।

মানবজাতি দুই প্রধান দলে বিভক্ত। একদল নিজের দেশের কাজ নিজেরা চালায়, কখন কখন অন্য দেশের কাজও চালায়; অন্যদল আজ্ঞাবহমাত্র, নিজের দেশের কাজ করিতে তাহারা পায় না বা পারে না। আমাদের দেশের কুলী অকুলী সব ঐ দ্বিতীয় দলের লোক। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ একবার বিলাতের শ্রমজীবীদলের অন্যতম পার্লেমেণ্টের সভ্য কেয়ার হার্ডীকে "শ্বেত সর্দ্দারকুলী" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন! জগৎ হাসিয়াছিল; কেন, তাহা মহারাজাধিরাজ এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন।

কুলীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছে, লিখনপঠনক্ষম লোক আছে। যাঁহারা জাতিবিচার করেন, বা লিখিতে পড়িতে জানাটাকেই পরম পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহারাও কুলী বলিয়াই কুলীকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না।

ভারতবর্ষের সম্মান ও স্বজাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় কুলী পুরুষ ও নারীরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, শীতাতপ পরিশ্রম অনশনক্লেশ বন্দিদশা সহ্য করিয়াছেন, মা-শিশুহারা হইয়াছেন। ভারতমাতার

* "সম্+ভ্রান্ত" অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে ভ্রান্ত বটে।

ক্রোড়াসীন কোনও প্রসিদ্ধ নেতাকেই এরূপ কঠোর পরীক্ষার উপযুক্ত বলিয়া বিধাতা মনে করেন নাই। এরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারতবর্ষে কেহ হন নাই। আধুনিক কালে মনুষ্যত্ব-হিসাবে ভারতের নাম ভারতের মান *এই কুলীরাই* ভাল করিয়া রাখিয়াছে। গান্ধি প্রভৃতি অকুলী যাঁহারা এই গৌরবের অংশী, তাঁহারা কুলীদের সঙ্গে অভিন্নাত্মা হইয়া সমাচারী সমবসনী সমদুঃখভাগী হইয়াছিলেন বলিয়াই এই সৌভাগ্য তাঁহাদের ঘটিয়াছিল। আমরা এই কুলীদের সমশ্রেণীস্থ নহি বটে; কিন্তু তাহাদের চেয়ে বড় বলিয়া নহে, তাহাদের চেয়ে ছোট বলিয়া।

কুলী ও অকুলীর ভেদবুদ্ধি চলিয়া যাওয়াই ভাল। "তাহারা" তাহারা এবং "আমরা" আমরা, এরূপ কেন ভাবি? সবাই আমরা।

লিখিলাম বটে, কিন্তু রেলের গাড়ীতে তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে ত যাতায়াত করিতে সবাই পারে না। সত্য বটে, তথায় বড় ভীড়, বড় লাঞ্ছনা, তথায় দরিদ্রের দেহের বস্ত্রের দুর্গন্ধ; রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু সমদুঃখভাগী না হইলে দেশহিতব্রত হওয়া যায় না। স্বেচ্ছায় সমদুঃখভাগী কয়জন হয়? যদি ভারতবাসীর কেবল তৃতীয়শ্রেণীতে যাতায়াত করাই বিধি হইত, তাহা হইলে সকলের একত্ববোধ জন্মিত, প্রকৃত আত্মমর্য্যাদার উন্মেষ হইত, বাস্তবিক ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থা কি ও স্থান কত নিম্নে তাহা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিত, এবং তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী এবং তাহার আরোহীদের অবস্থার উন্নতি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র হইতে পারিত।

রেলের গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীটা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইল। ভারতবাসীর জীবনের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থা আছে।

কোথায় জন্ম বাঞ্ছনীয়?

কোন্ মানুষ যে কোথায় জন্মিবে, তাহা ত তাহার জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার ইচ্ছাধীন ছিল না। সুতরাং কেহ প্রবলের দেশে জন্মিয়াছে বলিয়াই বড়, এবং আর একজন দুর্ব্বলের দেশে জন্মিয়াছে বলিয়া ছোট, এরূপ ভাবা অযৌক্তিক। তথাপি নিজ নিজ দেশের অবস্থা অনুসারে আপনাকে উচ্চ বা হীন মনে করা লোকের পক্ষে অভ্যাসদোষে প্রায় স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও উহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না।

যে যে দেশ বড় হইয়াছে, তাহার ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে, এই বড় হওয়ার মূলে অগণিত লোকের অনুরাগ, ত্যাগ, শ্রম, সাহস, তপস্যা রহিয়াছে। শক্তিশালী ঐশ্বর্য্যশালী দেশকে সুদশায় রাখিতে হইলেও ঐরূপ ব্রতপালন চাই।

উন্নতিসাধন এবং উন্নত অবস্থা রক্ষার জন্য এই যে অবিরত চেষ্টা, দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে এই যে বিরামহীন সংগ্রাম, ইহাতেই মানবজীবনের মহত্ত্ব।

জড়তা, আলস্য, ও অপৌরুষের আবেশে মনে হইতে পারে বটে, "যদি আমি মার্কিন হইতাম, যদি ইংরেজ হইতাম, যদি ফরাশি, জার্ম্মেন, জাপানী বা রুশ হইতাম।" কিন্তু যদি হইতে, তাহা হইলেও তোমার ঐ উদ্যমবিহীন, কর্ম্মবিহীন, জড়, অমানুষ প্রাণটা যে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে ছোটই করিয়া রাখিত।

ভারতের এখনও এমন কিছু কি নাই, যাহার জন্য উহাকে অন্যদেশের সমপদস্থ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করা যাইতে পারে? কিন্তু থাক্ সে কথা।

ধরিয়া লইলাম, ভারত এখন সর্ব্ববিষয়ে অধঃপতিত। কিন্তু এইজন্যই কি এখানেই পুরুষের জন্ম বাঞ্ছনীয় নহে? যেখানে যত বাধাবিঘ্ন, সেইখানেই ত চেষ্টার, সংগ্রামের তত গৌরব। মানুষ যদি প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিবে না, তাহা হইলে সে মানুষ কিসের জন্য? কেহ যদি পৃথিবীতে আসিবার আগে জন্মস্থান সম্বন্ধে বিধাতার নিকট বর চায়, ত, ভারতবর্ষের মত দেশে জন্মিবার বরই চাওয়া উচিত।

কৃতী লোকের সন্তান হইয়া উত্তরাধিকারসূত্রে সম্মান বা ঐশ্বর্য্য পাইব, এরূপ ইচ্ছা কাপুরুষেই করে। পুরুষ যে, সে নিজেই কৃতী হইতে চায়।

প্রবল অভ্যুদিত ঐশ্বর্য্যশালী দেশে জন্মিয়া সুখে

থাকিব, এ অভিলাষ কাপুরুষের যোগ্য। পুরুষ নিজেই দেশের জন্য শক্তি অর্জ্জন করিবে।

ভারতের ভক্তসন্তান যিনি, তাঁহার ত কথাই নাই। মানুষের যদি মানবরূপে পুনর্জ্জন্ম থাকে, তাহা হইলে ভারতভক্ত ত কেবল এই কারণেই পুনঃ পুনঃ ভারতে আসিবেন যে মাতৃভূমির চরণে তাঁহার মন পড়িয়া আছে। তাঁহার মা যেমনই হউন, তিনি যে তাঁহারই মা।

দেশের উন্নতির উপায়

দেশের উন্নতি কেবলমাত্র একটি কোন উপায়ে হইতে পারে না। যাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, যাঁহার মনের ঝোঁক যে দিকে, তদনুসারে তিনি বিশেষ কোন একটি উপায়কে শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র উপায় মনে করেন। কেহ বলেন, মানুষের যদি স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, মানুষ যদি ভাল করিয়া খাইতে না পায়, তাহা হইলে সে ত আধমরা হইয়া থাকিবে। সুতরাং সে কেমন করিয়া শিক্ষালাভ করিবে, রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের চেষ্টা করিবে, সামাজিক কুপ্রথা-সকল দূর করিতে চেষ্টা করিবে, সদ্ধর্ম্ম নিজ আত্মায় লাভ করিয়া উহার প্রচার করিবে, কলকারখানা চালাইবে, বাণিজ্য বিস্তার করিবে? উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, বর্ত্তমান কালের উপযোগী জ্ঞানলাভ করিয়া কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি না করিলে ভাল করিয়া খাইতে কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে, ইতালী প্রভৃতি দেশের মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর না করিলে কেমন করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, দেশ হইতে অকাল-পিতৃত্ব ও অকালমাতৃত্ব দূরীভূত না হইলে কেমন করিয়া প্রভূতজীবনীশক্তিবিশিষ্ট মানুষ জন্মিবে, শিক্ষাদ্বারা জ্ঞান না জন্মিলে সামাজিক ব্যবস্থার ভাল মন্দ বিচারশক্তি কোথা হইতে আসিবে, তাহা না আসিলে ভালর সংরক্ষণ ও মন্দের বিনাশসাধন কিরূপে হইবে, রাষ্ট্রীয় অধিকার না পাইলে ট্যাক্সের দ্বারা লব্ধ টাকা যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হয় তাহার উপায় কেমন করিয়া হইবে, ধর্ম্ম- ও সমাজ-বিষয়ে সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া মানুষের মনে উদারতা ও ভ্রাতৃত্ব না জন্মিলে খুব জমাট দলবদ্ধ ভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের চেষ্টা কেমন করিয়া হইবে, শিক্ষা ব্যতিরেকে এই উদারতা ও ভ্রাতৃত্ব কোথা হইতে আসিবে, রাষ্ট্রীয় অধিকার না পাইলে প্রজাদের ট্যাক্সের টাকা যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে কে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিবে? অতএব দেখা যাইতেছে যে একটি কোন উপায় অবলম্বন করিতে গেলেই অন্যগুলিতে টান পড়ে।*

কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে উপায় অবলম্বনের আগে, উপায় অবলম্বন যে আবশ্যক এই বোধ জন্মান দরকার; আমরা যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং সেই দুর্গতির প্রতিকার আমরা নিজেই করিতে পারি, এইরূপ ধারণা হওয়া প্রয়োজন। এক কথায়, সমুদয় জাতিটির সজাগ সচেতন অবস্থা সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বনের ও উন্নতির মূল। শিক্ষা-ব্যতিরেকে এই অবস্থা আসিতে পারে না। মুখে মুখে শুনিয়া অনেক শিক্ষালাভ হয়; কিন্তু মানুষ যাহা শিখে তাহা তো চিরকাল মনে থাকে না। তাহা লিখিয়া রাখিলে, ভুলিয়া গেলে আবার জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া লওয়া যায়। তা ছাড়া, শুনিবার সময় ও সুযোগ অপেক্ষা পুস্তক পড়িবার সময় ও সুযোগ সহস্রগুণে অধিক। শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের আর-সমুদয় উপায়ের বিন্দুমাত্রও লাঘব আমরা করিতে চাই না। কিন্তু লিখিতে ও পড়িতে জানা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ যদি শিক্ষার উচ্চতম লক্ষ্য বাদ দিয়া মানুষকে চাষবাস শিল্প বাণিজ্য স্বাস্থ্যরক্ষা রোগীর সেবাশুশ্রূষা প্রভৃতি অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়-সকলও শিখাইতে চাহেন, তাহা হইলেও দেখিবেন, লিখন-পঠন-ব্যতিরেকে এইরূপ শিক্ষা সম্যক্‌রূপে দেওয়া যায় না। তাহার প্রমাণ, যে যে দেশে শিক্ষার বিস্তার বেশী তথায় কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি খুব হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে।

শিক্ষার অভাবে যে সম্যক্ উন্নতি হয় না, তাহার একটি দৃষ্টান্ত আফগানিস্তান, কিন্তু একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে। আফগানদের স্বাস্থ্য ভাল, তাহারা খাইতেও পায়; তাহাদের বলিষ্ঠ চেহারা দেখিলেই তাহা বুঝা যায়।

* এ বিষয়ে ১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "সর্ব্ববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাহারা ব্যবসাতে নিপুণ। তথাপি, রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, প্রভৃতি বিষয়ে আফগানরা পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য শক্তিশালী কোন জাতির সমকক্ষ ত নহেই, কাছাকাছিও যায় না।

দেশের সমুদয় লোককে জ্ঞান দিতে হইবে। তাহার উপায়স্বরূপ সকলকে লিখিতে পড়িতে শিখাইতে হইবে।

লেখাপড়া শিখিবার উপায়।

এখন পৃথিবীর প্রায় সমুদয় সভ্য দেশে প্রত্যেক বালক ও বালিকাকে লেখা পড়া শিখিতে বাধ্য করা হয়। ভারতবর্ষের কোন কোন দেশীয় রাজার রাজ্যে এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বৃটিশশাসিত ভারতে এখনও এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাহা হইলে দেশের সকল লোককে লেখাপড়া শিখাইবার উপায় চিন্তা আমাদিগকে করিতে হইত না।

লেখাপড়া শিখাইবার সর্ব্বপ্রধান উপায় স্কুল পাঠশালা স্থাপন। বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য দিবাকালীন বিদ্যালয়ই যথেষ্ট ও প্রশস্ত। কিন্তু কৃষক ও অপর শ্রমজীবী-শ্রেণীর সন্তানেরা যেখানে যেখানে বাপমাকে উপার্জ্জনে সাহায্য করে, বা স্বাধীনভাবে রোজগারের কাজ করে, তথায় তাহাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় আবশ্যক। তদ্ভিন্ন প্রাপ্তবয়স্ক রোজগারী লোকদের জন্য সর্ব্বত্র নৈশ বিদ্যালয় প্রয়োজন।

দিবাকালীন বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট নিজে স্থাপন করিতে পারেন, অপর কর্তৃক স্থাপিত এরূপ বিদ্যালয়ে সাহায্য দিতে পারেন, কিম্বা এরূপ বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-ব্যতিরেকে স্থাপিত ও পরিচালিত হইতে পারে। বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা যথাসাধ্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী এবং বাহ্য আসবাব ও সরঞ্জামের আদর্শ বড় উঁচু করা হইয়াছে। যেরূপ বন্দোবস্ত করিলে ও নিয়ম পালন করিলে বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণকে সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়, তাহাও পূর্ব্বাপেক্ষা খুব দুঃসাধ্য করা হইয়াছে। এই কারণে বিদ্যালয় স্থাপন যথেষ্ট শীঘ্র যথেষ্ট সংখ্যায় হইবার আশা কম।

সুতরাং বিদ্যালয় স্থাপন ছাড়া আরও কি কি উপায়ে লেখাপড়া শিখান যাইতে পারে, তাহা প্রত্যেক দেশ-হিতৈষীর চিন্তনীয় ও অবলম্বনীয়। প্রত্যেক লিখনপঠন-ক্ষম ব্যক্তি অন্ততঃ একটি নিরক্ষর বালক, বালিকা বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে লিখিতে পড়িতে শিখাইবার ব্রত গ্রহণ করুন। উপায়ের ভার তাঁহার উপর। তিনি যদি শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া তাহার বেতন পুস্তকাদি দিয়া তাহাকে শিখাইতে পারেন, ভাল; নতুবা অন্য উপায় তাঁহাকেই করিতে হইবে। ব্রতটি দেখিতে সামান্য; কিন্তু ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রহণ করিলে দেশে সুবিস্তৃত গভীর শুভপরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে।

কোথাও কোথাও পর্য্যটক শিক্ষকের ব্যবস্থা আছে। যে-সকল গ্রামে বিদ্যালয় নাই, শিক্ষক তথায় কয়েক মাস থাকিয়া পড়িবার বয়সের বালকবালিকাদিগকে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়া আর এক স্কুলবিহীন গ্রামে চলিয়া যাইবেন। এইরূপ অনেক শিক্ষক থাকিলে খুব কাজ হয়। ইহাঁদের দারিদ্র্যব্রতধারী হওয়া আবশ্যক।

লোকশিক্ষার জন্য কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সুলভ পুস্তকের প্রয়োজন। তাহা কেবল কাগজ, ছাপাই ও সেলাইয়ের ব্যয় লইয়া বিক্রী করা আবশ্যক; স্থলবিশেষে বিনামূল্যেও দেওয়া দরকার।

বিষয়টি এরূপ একান্তপ্রয়োজনীয় যে লোকহিতব্রত চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার সাহায্য প্রার্থনীয়। সহজে অবলম্বনীয় সদুপায়ের কথা কেহ খুব সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইলে আমরা তাহা ছাপিতে চেষ্টা করিব।

তুরস্ক-সাম্রাজ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে শিক্ষিত লোকদের মনে এইরূপ একটি ধারণা আছে যে ইউরোপের সকল দেশের মধ্যে তুরস্কের অবস্থা নিকৃষ্টতম, এবং তথায় শিক্ষার ব্যবস্থাও নিকৃষ্টতম। ইহা সত্য কি না জানি না। তুলনায় তুরস্কে শিক্ষার অবস্থা যাহাই হউক, প্রকৃত অবস্থাটি কি তাহা এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা নামক সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ব-কোষ এবং ষ্টেটস্‌ম্যান্স ইয়ার-বুক হইতে আমরা সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

সাধারণতঃ যেরূপ অনুমান করা হয়, তুরস্ক সাম্রাজ্যে তাহা অপেক্ষা জনসাধারণের শিক্ষা অনেক অধিক বিস্তৃত। * ইস্কুলগুলি দুরকমের, সরকারী ও বেসরকারী। সরকারী শিক্ষা তিনশ্রেণীর; প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক, এবং ৭ হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকলেই শিখিতে বাধ্য; উচ্চতর শিক্ষা হয় অবৈতনিক নতুবা ছাত্রবৃত্তির সাহায্যে সুলভ্য ("Primary education is gratuitous and obligatory, and superior education is gratuitous or supported by bursaries")। তুর্কিভাষা, কোরান, পাটীগণিত, ইতিহাস, ভূগোল, এবং নানাবিধ হস্তকার্য্য (handwork) প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিনপ্রকারের স্কুল আছে—(১) শিশুদের জন্য; এরূপ স্কুল প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া আছে ("infant schools, of which there is one in every village")। † (২) বড় বড় গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ। (৩) উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়সকল। মধ্যশিক্ষার জন্য প্রত্যেক বিলায়েৎ অর্থাৎ জেলার সদর নগরে একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে। ইহাতে ১১ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের ছাত্রেরা প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়গুলি ছাড়া ফরাশিভাষা, জ্যামিতি এবং নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা করে। উচ্চশিক্ষার জন্য (১) কনষ্টান্টিনোপলে বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তথায় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসাদি, বিজ্ঞান, আইন, ধর্ম্মতত্ত্ব ও চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়। (২) তা ছাড়া শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য নর্ম্যালস্কুল, ললিতকলা (fine arts) বিদ্যালয়, সামরিক-চিকিৎসা-শিক্ষালয় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয় আছে।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌স্‌ ইয়ার-বুক্‌ একখানি সুপরিজ্ঞাত বার্ষিক লৌকিকতত্ত্ব-সংগ্রহের বহি। ইহার ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সংস্করণে দেখা যায় যে তুরস্কসাম্রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ২,১২,৭৩,৯০০ দুইকোটি বারলক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শত। ৩৬,২৩০ ছত্রিশ হাজার দুইশত ত্রিশ সংখ্যক সর্ব্ববিধ বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ১৩,৩১,২০০ তেরলক্ষ একত্রিশহাজার দুইশত। অর্থাৎ মোট অধিবাসীদের প্রত্যেক ষোলজনের মধ্যে একজন শিক্ষা পাইতেছে।

ভারতগবর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্‌ অব্‌ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া নামক কতকগুলি রিপোর্ট বাহির করিয়া থাকেন। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত ইহার সপ্তম অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়কখণ্ডে দেখা যায় যে ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-শাসিত ভারতে সর্ব্ববিধ শিক্ষালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৭,৫৫,৯৭১ সাতষট্টিলক্ষ পঁচানব্বইহাজার নয়শত একাত্তর। ঐ বৎসর ব্রিটিশভারতের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৪,৪২,৬৭,৫৪২ চব্বিশকোটি বিয়াল্লিশলক্ষ সাতষট্টিহাজার পাঁচশত বিয়াল্লিশ। অর্থাৎ মোট অধিবাসীদের প্রায় প্রত্যেক ছত্রিশ জনের মধ্যে একজন শিক্ষা পায়।

উপরে যে-সকল তথ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় তুরস্কে শিক্ষার অবস্থা খুব খারাপ নয়। এইজন্য তুরস্ক যে ভ্রান্তিবশতঃ যুদ্ধে যোগ দিয়াছে, তাহাতে প্রাচ্য কোনও দেশের লোকেরা দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ, তুর্কিরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। সে পথ বন্ধ হইল।

ইতালীর জার্মেনীর সহিত যোগ না দিবার কারণ

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্মেনী অষ্ট্রিয়া ও ইতালীর বন্ধুত্ব ছিল। তাহা সত্ত্বেও অষ্ট্রিয়া ও জার্মেনীর সহিত ইতালী যোগ দিতেছে না। তাহার কোন কোন কারণ সংক্ষেপে এই যে বহুকাল ধরিয়া অষ্ট্রিয়া ইতালীর অংশবিশেষে রাজত্ব ও অত্যাচার করিয়াছিল। ইতালী এখনও সে কথা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। ইংলণ্ডের লোকেরা ইতালীকে স্বাধীন হইতে সাহায্য করিয়াছিল। ইতালীয়েরা কৃতজ্ঞতার এই ঋণও ভুলে নাই। ঈ. পী. ওএগল (E. P. Weigall) নামক একজন ইংরেজ লেখক অক্টোবর মাসের ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিউতে আর একটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা অসম্ভব মনে হয় না। তিনি বলেন, ইতালী যে তুরস্কের হাত হইতে ত্রিপলীদেশ যুদ্ধ করিয়া কাড়িয়া লইতে পারিয়াছে, তাহা কেবল ইংলণ্ডের পরোক্ষ সাহায্যে। তাঁহার বক্তব্য এই:—মিশরদেশ ইংলণ্ড কর্তৃক শাসিত হইলেও উহা তুরস্কের একটি

* "Public instruction is much more widely diffused throughout the empire than is commonly supposed." Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Vol. XXVII, p. 428.

† ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ভারতগবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স অব্‌ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া নামক রিপোর্টসকলের সপ্তম অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক খণ্ডে আছে:—"The total number of institutions in 1911-12 was 176,447,......The total number of villages served by these schools is 582,728, and the number of towns...... is 1,594." অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের মোট ৫,৮৪,৩২২টি গ্রাম ও নগরের মধ্যে অন্ততঃ ৪,০৭,৮৭৫টি লোকালয়ে কোন শিক্ষালয় নাই। "অন্ততঃ" বলিতেছি এই জন্য যে, যে-সকল গ্রামনগরে শিক্ষালয় আছে, তথায় একএকটি করিয়াই আছে, হিসাবে এইরূপ ধরিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক অনেক নগরে ও কোন কোন গ্রামে একাধিক শিক্ষাশালা আছে। সুতরাং স্কুলবিহীন গ্রামের সংখ্যা আরও বেশী।

করদ রাজ্য। যদি ইংলণ্ড তুর্কিসৈন্যদিগকে মিশরের ভিতর দিয়া ত্রিপলীতে যুদ্ধ করিতে যাইতে দিত, তাহা হইলে ইতালীর ত্রিপলী আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। কিন্তু ইংলণ্ড, মিশরের ভিতর দিয়া তুর্কিসৈন্য যাইতে দিবে না, এইরূপ পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায়, এবং লর্ড কিচ্‌নার ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কঠোর উপায় অবলম্বন করায়, ইতালী তুরস্কের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করে ও ত্রিপলী অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইংলণ্ড, একমাত্র ইংলণ্ডই, ইতালী কর্ত্তৃক ত্রিপলীজয় সম্ভব করিয়াছিল! ওএগল বলেন, ইহার ফলে ইংলণ্ড ও ইতালীর মধ্যে একটি অলিখিত বন্দোবস্ত হইয়াছে।

জার্ম্মেনীর ব্যবসা দখল করা

একটা কথা উঠিয়াছে যে এখন যুদ্ধের দরুন জার্ম্মেনীর সস্তা জিনিষ সব বাজারে আসিতেছে না; এই সুযোগে সেই রকমের জিনিষ সব প্রস্তুত করিয়া বাজার দখল করিয়া বসা কর্ত্তব্য। কথাটা শুনিতে বেশ। কিন্তু দখল করিবে কে? আমরা দখল করিতে পারি, ইংরেজ পারে, মার্কিন পারে, জাপানী পারে, আরও কত জাতি পারে। যাহার কলকারখানা, নিপুণ কারিগর, অভিজ্ঞ কারখানা-পরিচালক ও মূলধন পাইবার যত সুবিধা হইবে, সেই তত সহজে বাজার দখল করিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট যাহার যত সহায় হইবে, বাজার দখল করা তাহার পক্ষে তত সহজ হইবে। ইংরেজের উপর নিজের দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার ভার আছে, এবং ভারতবর্ষের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভারও আছে। অধিকন্তু ভারতবর্ষের বাণিজ্যও প্রধানতঃ ইংরেজের হাতে। এ অবস্থায় ইংরেজ, ভারতবর্ষের বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে যেখানে যেখানে জার্ম্মেনী বেদখল হইয়াছে, তথায় নিজেদের অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করিবে, না ভারতবাসীকে দখলী করিতে চেষ্টা করিবে, তাহা ইংরেজরাই স্থির করিবে। তাহাদের নির্ব্বাচন আমাদের সুবিধা অসুবিধার অনুযায়ী হইবেই, এরূপ আশা করা যায় কি? ইতিমধ্যেই জাপান নিজের অধিকার কতকটা বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে।

ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ অপেক্ষা মূলধন, উদ্যোগ, কারখানা-পরিচালন করিবার লোক, দক্ষ কারিগর, সবই বেশী আছে। তাহার উপর গবর্ণমেণ্টও সকল রকমে আন্তরিক সাহায্য করিতেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পূর্ব্বে নানাদেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ হইতে নানারকমের রং তৈরী হইত। যেমন আমাদের দেশে নীলের গাছ হইতে নীল রং হইত, এখনও সামান্য পরিমাণে হয়। জার্ম্মেনীতে রাসায়নিক উপায়ে সর্ব্বপ্রকারের রং প্রস্তুত হওয়ায় উদ্ভিজ্জ ও জৈব রঙের চলন খুব কমিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড যে শিল্পে এত উন্নত দেশ, সেখানেও রং আমদানী হইত জার্ম্মেনী হইতে। এখন যুদ্ধের জন্য তাহা বন্ধ হওয়ায় ইংলণ্ডকে নিজে রং প্রস্তুত করিতে হইবে। পূর্ব্বে রয়টার কোম্পানী তারে এই সংবাদ দিয়াছিল, যে, এই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে একটি কোম্পানী দ্বারা এক কারখানা স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট নিজে মূলধনের কিয়দংশ যোগাইবার জন্য কোম্পানীর অংশ খরিদ করিবেন। এক্ষণে সংবাদ আসিয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট ঐরূপে সাহায্য করা ছাড়া অধিকন্তু ২,২৫,০০,০০০ দুইকোটি পঁচিশলক্ষ টাকা মূলধনের সুদ যাহাতে অংশীদারেরা পায় তজ্জন্য জামীন বা অঙ্গীকারবদ্ধ রহিবেন। অর্থাৎ যদি প্রস্তাবিত রঙের কারখানায় লাভ না হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট নিজে অংশীদারদিগকে তাহাদের মূলধনের সুদ দিবেন।

ইংলণ্ডের মত ধনী, উদ্যোগী, শিল্পনিপুণ দেশে যখন এইরূপ সরকারী সাহায্য, অঙ্গীকার ও উৎসাহদানের প্রয়োজন রহিয়াছে, তখন ভারতবর্ষের মত দেশে যে শতগুণ অধিক সহায়তা আবশ্যক, তাহা বুঝিতে খুব বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। কিন্তু এরূপ সাহায্য কি পাওয়া যাইবে?

পাওয়া না গেলেও হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকেও বাংলা দেশেই অন্ততঃ দুটি কিঞ্চিৎ বড় রকমের কারখানা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাই অঞ্চলে অনেক আগে হইতেই অনেকগুলি দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আশা আছে।

অতীত গৌরব

যেমন অন্যান্য অনেক বিষয়ে তেমনি শিল্পেও আমরা ভারতবর্ষের অতীত শ্রেষ্ঠতার গর্ব্ব করিয়া থাকি। কিন্তু এই কথা ভাল করিয়া আমাদের স্মৃতিপটে মুদ্রিত থাকা উচিত, যে, যাহার অতীত যত গৌরবময়, তাহার বর্ত্তমান হীন দশা তত বেশী লজ্জাকর। অতীত গৌরবের স্মৃতি যদি আমাদিগকে নিজেদের মহত্ত্বসম্ভাবনায় দৃঢ়বিশ্বাসী করিয়া আমাদের চেষ্টাকে দ্বিগুণিত না করে, যদি উহা কেবল আমাদিগকে অলস অকর্ম্মণ্য বাচাল অহঙ্কারী করিয়া তোলে, তবে সে স্মৃতি যত শীঘ্র লোপ পায়, ততই মঙ্গল। আমেরিকায় যে-সকল কাফ্রি নিগ্রো দাসত্বে বিক্রীত হইত, তাহাদের ও তাহাদের সন্তানদের অতীত গৌরব ছিল না বলিয়া কি তাহারা উন্নত হইতে পারিতেছে না? তাহাদের মধ্যে ৫০ বৎসরের চেষ্টাতেই অনেক ধার্ম্মিক, শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বক্তা জন্মিয়াছে।

কৃতী বিদ্যার্থী

শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এদেশে শিক্ষার পথে কতক দূর অগ্রসর হইয়া সংসারী ও কর্ম্মী হইয়াছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষাপরিষদের শিক্ষাশালায় অধ্যাপকতা করিতেন, এবং কয়েকখানি বাংলা বহিও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল, জ্ঞানপিপাসা ছিল। উদ্যোগিতা থাকায় ও মনের বল থাকায় তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই লীন হয় নাই। তিনি নিজের চেষ্টায় সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমেরিকার নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় শিক্ষা করিতেন এবং

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিএ উপাধি লাভ করেন। পুনর্ব্বার অল্প সময়ের মধ্যে এম্‌এ উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার এই কৃতিত্বে আমরা আনন্দিত। তিনি এক্ষণে উচ্চতর পীএইচ, ডী, উপাধির জন্য প্রসিদ্ধ প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়তেছেন। আমেরিকার বর্ত্তমান দেশপতি উড্রো উইলসন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ছোটনাগপুর উচ্চইংরাজী বালিকাবিদ্যালয়, গিরিডি

গিরিডি অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। নানাস্থান হইতে নানা সম্প্রদায়ের অনেক ভদ্রলোক এখানে সপরিবারে বাস করিতেছেন। স্বাস্থ্যলাভের জন্যও আবার প্রতি-বর্ষে অনেক লোক আসিয়া থাকেন। খাদ্যদ্রব্যাদিও অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং সহজলভ্য। এই-সকল সুবিধা দেখিয়া কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি দ্বারা এখানে, প্রায় চারি বৎসর হইল, বালিকাদের জন্য একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম বৎসর যে পাঁচটি বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়, তাহারা সকলেই প্রথমবিভাগে উত্তীর্ণ ও তিন জন বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের এইরূপ উন্নতি দর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য মাসিক ৪৮০৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন। বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাসের জন্য গৃহনির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন।

প্রায় আট মাস হইল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই বিদ্যালয়ের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহীতাবসর সরকারী ভূতত্ত্বনির্ণয়বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত, বি, এস্‌সি (লণ্ডন), মহাশয় ইহার সম্পাদকের কর্ম্মভার গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনজন বিএ-উপাধিধারিণী মহিলা, তিনজন এফ্‌এ-পাশ এবং আরও কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন। বালিকারা যাহাতে মাতার যত্ন ও ভগিনীর ভালবাসা লাভ করিয়া দেহমনের উন্নতিলাভ করিতে পারে; নীতি, ধর্ম্ম, গৃহ-কার্য্য প্রভৃতিতে শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদের আহারাদির ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই ছাত্রীনিবাসে সকল সম্প্রদায়ের বালিকারই স্থান আছে। বর্ত্তমানে ১২।১৩টি হিন্দুপরিবারের কন্যা এই ছাত্রীনিবাসে বাস করিতেছে। যাঁহারা কন্যাদিগকে স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিয়া শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে গিরিডি বিদ্যালয় উপযুক্ত মনে করি।

কোন-না-কোন রকমের ব্যায়াম ও বিশুদ্ধবায়ু সেবন সকল মানুষেরই প্রয়োজন। যাহারা মস্তিষ্কচালনা করে, তাহাদের আরো বেশী দরকার। যে-সকল বালক ও যুবক লেখাপড়া করে, তাহারা ইচ্ছা করিলেই অন্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারে। কিন্তু ছাত্রীদের এরূপ সুবিধা নাই। কলিকাতার মত বড় সহরে তাহাদের পক্ষে ভ্রমণ ও বিশুদ্ধবায়ু সেবন অতি দুর্ঘট। গিরিডির বালিকাবিদ্যা-

লয়ের এই একটি বিশেষ সুবিধা আছে যে এখানে তাহাদের নিরাপদে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণের ব্যবস্থা হইতে পারে ও আছে। এইজন্য বালিকাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য এরূপ স্থানই প্রশস্ত।

কোমাগাতা মারুর যাত্রীদের কথা

কোমাগাতা মারু জাহাজের যাত্রীগণ, ফৌজ ও পুলিশের মধ্যে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহার কারণ, তজ্জন্য কে দায়ী, ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য নির্ণয়ার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে। রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই। শুনা যাইতেছে, বন্দী যাত্রীদের কতকগুলি লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আশা করি, গবর্ণমেণ্ট পলাতক ও লুক্কায়িত যাত্রীদিগের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। তাহা হইলে গুরুদিৎ সিংহ প্রভৃতির সম্বন্ধে ঠিক্ খবর পাওয়া যাইবে। ক্ষমা ঘোষিত হইলে সকলেই নিজ নিজ বাসস্থানে যাইবে। এরূপ ঘোষণার পরেও যাহাদিগের সন্ধান পাওয়া যাইবে না, তাহারা মারা পড়িয়াছে বুঝিতে হইবে। দাঙ্গায় গুরুদিৎ সিংহের মৃত্যু হইয়াছিল, এরূপ গুজব দাঙ্গার পরেই রটিয়াছিল। তাহা সত্য কি না, ক্ষমা ঘোষিত হইলে বুঝা যাইবে।

সার্ আর্থার্ কোনান ডইল্ একজন নামজাদা ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তিনি কিছুদিন আগে বিজ্ঞতাপূর্ব্বক লণ্ডনের ডেলী ক্রনিকল্ কাগজে একটা প্রবন্ধে অনুমান করিয়াছিলেন যে জার্ম্মেনরা ষড়যন্ত্র করিয়া, ভারতগবর্ণমেণ্টের সহিত একটা গোলযোগ বাধাইবার জন্য, এই শিখগুলিকে কানাডা পাঠাইয়াছিল। তাহার পর সম্প্রতি একটা খবর আসিয়াছে যে ডেলী ক্রনিকল্ বলিতেছেন যে কানাডা-গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছেন যে কোমাগাতামারুতে অতগুলি পাঞ্জাবীর কানাডা যাত্রা জার্ম্মেন ষড়যন্ত্রেরই ফল। বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অপ্রকাশ গুপ্ত মহাশয় একখানা অমুদ্রিত ইতিহাসের হস্তলিপি পাইয়াছেন; তাহাতে দেখান হইয়াছে যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ জার্ম্মেন ষড়যন্ত্রের ফল। প্রশিয়ার রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়মের বাতিক ছিল অতিকায় সৈন্যদল গঠন। এই সৈন্যদলে ভারতবর্ষীয় সুদীর্ঘ সৈন্যও ছিল। কথিত আছে, ফ্রেডরিক উইলিয়মের পুত্র ফ্রেডরিক দি গ্রেট্ বলিয়াছিলেন যে তিনি শিখদের মত সৈন্য পাইলে পৃথিবী জয় করিতে পারেন। তদবধি ভারতবর্ষের প্রতি জার্ম্মেনদের দৃষ্টি থাকা অসম্ভব নহে। এবম্বিধ নানা কারণে বাগবাজারের অপ্রকাশ গুপ্ত মহাশয় পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক পুঁথির আবিষ্কার করিয়াছেন।

যাহা হউক, কোনানডইল-ডেলীক্রনিকল্-কানাডা-গবর্ণমেণ্টের আবিষ্কৃত তথাকথিত জার্ম্মেন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পাইয়োনীয়র একটি আপত্তি তুলিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যা। অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ হত হন জুলাইয়ের শেষ ভাগে, জার্ম্মেনীর সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধঘোষণা হয় আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে; এবং জার্ম্মেনী প্রথমে মনে করে নাই যে ইংলণ্ড যুদ্ধ করিবে। কিন্তু এই-সব ঘটনার কয়েকমাস পূর্ব্বে কোমাগাতামারু ভাড়া করিয়া গুরুদিৎ সিং যাত্রী লইয়া কানাডা যাত্রা করেন। পাইয়োনীয়রের জবাবে বুঝা যাইতেছে যে এক্ষেত্রে জার্ম্মেন ষড়যন্ত্রের অনুমানটা অমূলক।

কমিটির রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ

পূর্ব্ববঙ্গে নানাস্থানে ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও লোকে দু তিন দিন অন্তর একবেলা খাইতে পাইতেছে। অনাহারে মৃত্যুর কথাও শুনা যাইতেছে। বোলপুর শান্তিনিকেতন হইতে পিয়ার্সন সাহেব ইংরেজী কোন কোন দৈনিকে এবিষয়ে একটি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলেন ঢাকা জেলার পাঁচদোনা গ্রামে অন্নকষ্টপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ পঞ্চায়েতের সভাপতির হাতে গবর্ণমেণ্ট ১৭১ টাকা দিয়াছেন, এবং বেসরকারী সাহায্যেও ঐগ্রামে ৫৫ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ঐ গ্রামের একজন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন যে নইকাদী-নিবাসী শেখ বাখর অনাহারে মরিয়াছে। সত্য বটে যে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে দুএকদিন সামান্য জ্বর হইয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রতিবেশীরা সকলেই মনে করে যে তাহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অন্নাভাব। হতভাগ্য বাখরের স্ত্রী ও সন্তানগণ আছে। দয়ালু পঞ্চায়েৎ-সভাপতি তাহাদের অন্নাভাবের কথা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কনিষ্ঠ শিশুটির জীবনের আশা কম। এই ভদ্রলোকটি বলেন যে শেখ বাখরের ও তাহার পরিবারের দুরবস্থার মত হৃদয়বিদারক কাহিনী আরও অনেক শুনিতে পাওয়া যাইবে।

উপেক্ষিত শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার উদ্যোগকর্ত্তা ঢাকানিবাসী বাবু হেমেন্দ্রনাথ দত্ত বোলপুরে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইয়াছেন—"স্কুল সব্‌ইন্‌স্‌পেক্টর আজ দাখির-পাড় মুচদের ইস্কুল দর্শন করেন। তিনি এই মন্তব্য করিয়াছেন যে তিনি ছাত্রদিগকে এই কারণে পরীক্ষা করিলেন না যে তাহারা দুই তিন দিন খাইতে পায়
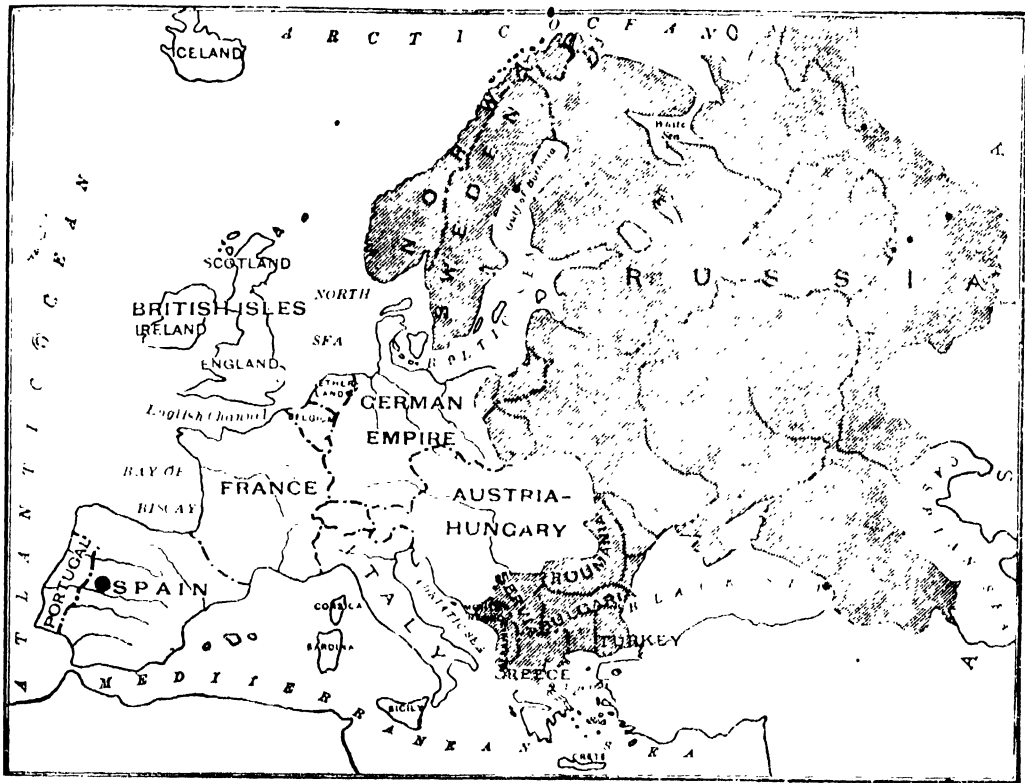
রুশের রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা।

আটলান্টিক মহাসাগরে ও মধ্যধরণী সাগরে অবাধ বন্দর-পথ পাইবার ও সমস্ত স্লাভ জাতির বাসভূমি একচ্ছত্রাধীন করিবার জন্য রুশ ইয়ুরোপের যতখানি দখল করিতে চায় তাহার মানচিত্র।

নাই। দয়া করিয়া আমাকে অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা পাঠাইবেন।"

পিয়ার্সন্ সাহেব লিখিয়াছেন—"যুদ্ধ যাহাদিগকে বিপন্ন করিয়াছে এরূপ লোক ফ্রান্স কিম্বা বেলজিয়ম্ অপেক্ষা আমাদের ঘরের নিকটতর স্থানেই রহিয়াছে। যাহাদের সামর্থ্য আছে, এই-সকল লোকদের দারুণ ক্লেশ দূর করা তাঁহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।"

কিন্তু দয়া অপেক্ষা রাজপুরুষদের তুষ্টিসাধনের জন্যই অনেক টাকা প্রদত্ত হয়।

বোলপুর শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা চিনি ও ঘি না খাইয়া যতটাকা বাঁচাইতে পারিবে, তাহা দুঃস্থ লোকদের সাহায্যার্থ ব্যয় করিবে স্থির করিয়াছে। তাহাদের প্রাণ যেন চিরজীবন এমনই পরদুঃখকাতর থাকে।

বোলপুরে একটি রিলীফ ফণ্ড বা সাহায্যনিধি খোলা হইয়াছে। তাহাতে যাঁহারা টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন—Mr. W. W. Pearson, Santiniketan P. O. (Birbhum).

জার্মেনী ও রুশিয়ার আকাঙ্ক্ষা

গতমাসের প্রবাসীতে "জয়পরাজয়ে আশঙ্কা" নামক একটি নিবন্ধিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে জার্মেনী জিতিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আশঙ্কার কারণ আছে। অপর দিকে ইহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে যদি জার্মেনী এবং অষ্ট্রিয়া পরাজিত হয়, তাহা হইলে ইউরোপে এবং এশিয়ায় রুশিয়া খুব প্রবল হইয়া উঠিবে। ইউরোপে রুশিয়া সুইডেন ও নরওয়ে দখল করিতে চায়। তাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কি আশঙ্কা তাহা আমরা গত মাসে দেখাইয়াছি। ভূমধ্য সাগরের নিকট প্রবল হওয়াও রুশিয়ার অভিপ্রায়। তাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কি অসুবিধা হইতে পারে, তাহা আমরা অগ্রহায়ণের কাগজে লিখিয়াছি। এশিয়া মহাদেশে রুশিয়ার কি কি অভিসন্ধির প্রমাণ খুব আধুনিক ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়, তাহারও উল্লেখ আমরা করিয়াছি।

ওআর্ল্ড্‌স ওআর্ক নামক ইংরেজী মাসিকে দুটি

জার্ম্মেনীর প্রাচ্য দেশে প্রভাব বিস্তারের কল্পনা।
জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রীয়াযুক্ত সাম্রাজ্য হইয়া তুর্কী দখল করিয়া এশিয়া মাইনরে আধিপত্য বিস্তার করিলে অষ্ট্রীয়া-জার্ম্মেনীর রাজ্যবিস্তার ও বাণিজ্যের পথ খোলসা হইবে কিরূপে তাহার মানচিত্র।

মানচিত্র দ্বারা জার্মেনী ও রুশিয়ার উদ্দেশ্য বুঝান হইয়াছে। তাহা আমাদের অনুমান ও আশঙ্কার সমর্থন করে। আমরা ঐ দুটি মানচিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিতেছি। দুইটিই ইউরোপের মানচিত্র।

একটিতে কাল কাল রেখা দিয়া যে-সমস্ত ভূখণ্ড চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহাই ইউরোপে রুশিয়ার বর্ত্তমান এবং আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে উত্তর-পশ্চিমে সুইডেন ও নরওয়ে দখল করা তাহার অভিপ্রায়ের অঙ্গীভূত। দক্ষিণে তাহারা যে যে দেশ অধিকার করিয়া ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত যাইতে চায়, তাহাও কালকাল রেখাগুলি দ্বারা দেখান হইয়াছে।

অপর মানচিত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ কালকাল রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে জার্ম্মেনী তাহার বন্ধু অষ্ট্রীয়ার অধিকৃত সার্ভিয়া তুরস্ক প্রভৃতি দেশ দিয়া এশিয়ায় পৌঁছিয়া এশিয়া-মাইনর, সীরিয়া প্রভৃতি অধিকার করিয়া প্রাচ্য মহাদেশে দিগ্বিজয় যাত্রা করিতে চায়। বাগদাদ রেলওয়ে প্রভৃতি তো প্রায় প্রস্তুতই আছে। তাহার পর পারস্য হইয়া ভারতবর্ষে আগমন যে তাহাদের অভিসন্ধির অন্তর্ভূত এরূপ অনুমান করা যায়।

রুশিয়া বা জার্ম্মেনী কাহারও যদি বাস্তবিক এইরূপ উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ না হইলেই মঙ্গল।

কল্পনা ও আবিষ্ক্রিয়া

কবিকল্পনা কথাটার বেশী প্রচলন থাকায় এইরূপ মনে হয় যেন কল্পনা কবিরই নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু কল্পনা ব্যতিরেকে যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হইতে পারে না. তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। দূর হইতে মানুষের কথা শুনা যায়, এইরূপ কল্পনা আগে আসিয়াছে, তাহার পরে টেলিফোনের সৃষ্টি হইয়াছে। উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, এইরূপ অনুমান আগে মানুষের মনে আসিয়াছে; তাহার পর বৈজ্ঞানিক নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে অনুমান সত্য। কল্পনা

ও আবিষ্ক্রিয়া, অনুমান ও প্রমাণ, যখন একই মানুষে করে, তখন কল্পনা ও অনুমানের মূল্য সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু যদি কল্পনা কেহ আগে করিয়া থাকে, এবং আবিষ্ক্রিয়া কেহ তাহার অনেক পরে করে, তাহা হইলেও কল্পনা করাতেও যে বাহাদুরী থাকিতে পারে, তাহা কি অস্বীকার করা যায় ?

প্রাচীন হিন্দুরা বন্দুকাদি আগ্নেয় অস্ত্র আবিষ্কার করিয়া ব্যবহার করিতেন কিনা, তাহার আলোচনা অনেকবার বাংলা ও ইংরেজীতে হইয়া গিয়াছে। যদি তাঁহারা এরূপ আবিষ্ক্রিয়া করিয়া থাকেন, ত, তাহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব আছে। কিন্তু যদি কেবল কল্পনাই করিয়া থাকেন, তাহাতেও ত মানসিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পুষ্পক রথের বর্ণনা প্রাচীন সংস্কৃত নানা কাব্যে আছে। পুষ্পক রথে আকাশমার্গে ভ্রমণ করিলে নীচের নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন দেখায়, খুব উঁচু হইতে ক্রমে ক্রমে নীচে নামিলে পৃথিবী কেমন ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হইতে থাকে, তাহারও বর্ণনা আছে। যেমন রঘুবংশে ও উত্তর-রামচরিতে। আকাশে উঠিয়া দুই পক্ষ যুদ্ধ করিতেছে, এরূপ বর্ণনাও রামায়ণে আছে। এই-সমুদয় বর্ণনা হইতে কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চান যে প্রাচীন হিন্দুরা আকাশচারী যান নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন, এবং এই-সব আকাশযান যাতায়াত, আমোদ-প্রমোদ ও যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করিতেন। হিন্দুদের ঠিক পরেই মুসলমানেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন। মুসলমানেরা এমন একটা জিনিষের কোনই বাস্তব চিহ্ন দেখিতে পান নাই বলিয়া, পুষ্পকরথ আদি আকাশযান সত্য সতাই ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করি। কারণ, উহা ত দেবমূর্ত্তি বা দেবমন্দির নহে, যে, পৌত্তলিকতাবিদ্বেষী মুসলমানেরা নষ্ট করিয়া দিবেন। এমন কাজের জিনিষ নষ্ট না করিয়া তাঁহারা নিজেদের কাজে লাগাইবেন, এইরূপ অনুমানই তো আগে মনে আসে। তাহা তাঁহারা কেন করিলেন না ? মুসলমানদেরও আগে যে-সব অসভ্য বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ ও ভারতে বসবাস করিয়া-ছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষীয় এবং হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল; এইজন্য তাহাদের বিষয় বিবেচ্য নহে। তাহাদের মুসলমানদের মত এত বেশী ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি ছিল না বোধ হয়।

যাহা হউক আমাদের এ আপত্তিরও হয় ত খণ্ডন আছে। কিন্তু যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে সে-কালে পুষ্পক রথ বা অন্য কোন প্রকারের আকাশযান বাস্তবিক ছিল না, উহা কল্পনা মাত্র, তাহা হইলেও আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের কল্পনার বৈচিত্র্য এবং ঐ কল্পনার বাস্তবে পরিণমনীয়তার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

জেপেলিন্ নামক আকাশজাহাজ ও অন্য কোন কোন আকাশযানে জার্মেনী যে উন্নতি করিয়াছে, তাহার সহিত জার্মেনীতে ইউরোপের অন্য কোন দেশ অপেক্ষা সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকতর চর্চ্চার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না কি ? আমরা এরূপ বলিতেছি না যে ইউরোপীয় আকাশ-যানগুলির কল্পনা সংস্কৃতসাহিত্য হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু লওয়া হইতেই পারে না, এমনও তো বলা যায় না। আরব্য উপন্যাসের আকাশে উড্ডীয়মান ও আকাশচারী গালিচা হইতেও এরূপ কল্পনা আসিয়া থাকিতে পারে।

কিছুদিন আগে কাগজে পড়িতেছিলাম যে ফ্রান্সে একরূপ কামান নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহা হইতে এরূপ তীব্র বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ শেল্ ছুড়া হইবে, যে, শত্রুদের মধ্যে ঐ শেল্ পড়িয়া ফাটিয়া গেলেই গ্যাস নাকের মধ্যে যাইতে না যাইতেই ৫০০ গজের মধ্যে সব মানুষ মারা যাইবে। সত্যসত্যই এরূপ কামান প্রস্তুত হইয়াছে কিনা জানি না। আবার এরূপ শেলের কথাও পড়া যায়, যাহার ভিতরকার গ্যাস্ নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলেই শত্রুরা অচেতন হইয়া পড়িবে। ইহাও আবিষ্কৃত হয় নাই বোধ হয়। কিন্তু এইসব আবিষ্ক্রিয়ার গুজবের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রের সম্মোহন অস্ত্রের খুব সাদৃশ্য আছে। এইরূপ বর্ণিত আছে যে সম্মোহন অস্ত্র দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলা হইত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বাস্তবিক সম্মোহন অস্ত্র ছিল কি না, ঠিক্ বলা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের কল্পনাটা যে কখন-না-কখন বাস্তবে পরিণত হইবে ইহা মনে করা যাইতে পারে। রামায়ণে নাগপাশের বর্ণনা আছে। ভবিষ্যতে এরূপ বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ গোলা বা শেল্ প্রস্তুত হইতে পারে, যাহা শত্রুসৈন্যদিগকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিবে। তাহাদের চেতনা থাকিবে, কিন্তু তাহারা হাত পা নাড়িতে বা পাশ ফিরিতে পারিবে না।

শেষ যুদ্ধ

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে যেসকল জাতি প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের কেহ কেহ এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করিতেছে যে এই যুদ্ধটা এমন করিয়া করিতে হইবে, শত্রুপক্ষকে এমন করিয়া বলহীন ও সর্ব্বস্বান্ত করিতে হইবে, যেন ইহাই শেষ যুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাকে শেষ যুদ্ধ মানবীয় শক্তি কোন মতেই করিতে পারিবে না।

প্রথমতঃ, যদি এমনই হয় যে এই যুদ্ধের শেষে এক পক্ষ কেন দুইপক্ষই একেবারে নাস্তানাবুদ ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও এই-সব জাতি ছাড়া পৃথিবীতে, ইউরোপে, আরও তো জাতি আছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কি জাতিগত বিদ্বেষ,

বাণিজ্যিক ঈর্ষ্যা, ঐতিহাসিক প্রতিহিংসার ভাব ইত্যাদি কোন একটা যুদ্ধের কারণ ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে না? তাহাদের কেহই কি, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে হীনবল কোন দেশের কিছু সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার জন্য কিম্বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য ভবিষ্যতে যুদ্ধ করিতে পারে না?

কিছুকাল পূর্ব্বে বল্কান রাজ্যগুলি দু'বার যুদ্ধ করিয়াছে; একবার তাহাদের সাধারণ শত্রু তুরস্কের বিরুদ্ধে; আর একবার, তুরস্ক পরাজিত হইবার পর, পরস্পরের মধ্যে। বর্ত্তমান যুদ্ধ শেষ হইবার পর এরূপ কিছু একটা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, কে বলিতে পারে?

বর্ত্তমান যুদ্ধে একদিকে জার্মেনী ও অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী, এই দুটি সাম্রাজ্য; অপর পক্ষে সার্ভিয়া, মণ্টিনিগ্রো, বেলজিয়ম্, ফ্রান্স্, জাপান, রুশিয়া, ও ইংলণ্ড, এই সাতটি রাজ্য ও সাম্রাজ্য। তুরস্ক সম্প্রতি যোগ দিয়াছে; উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়; ধরিলেও একদিকে তিন ও অন্য দিকে সাত। সুতরাং যুদ্ধের শেষে যখন জার্মেনী পরাজিত হইবে (যেরূপ সংবাদ আসিতেছে তাহাতে তাহাই খুব সম্ভব মনে হইতেছে), তখন জার্মেনরা কখনই এরূপ মনে করিবে না যে তাহারা তাহাদের শত্রুপক্ষীয় কোনও একটি জাতির চেয়ে যুদ্ধে নিকৃষ্ট। কারণ এক একটি জাতির বিরুদ্ধে ত এক একটি জাতির যুদ্ধ হইতেছে না; জলযুদ্ধেও কোন কোন স্থলে ইংলণ্ড ও জাপান একযোগে জার্মেনীকে হারাইতেছে। সুতরাং আপাততঃ পরাস্ত হইলেও জার্মেনী মনে মনে কখনও আপনাকে বিশেষ কোন একটি জাতির চেয়ে ছোট মনে করিবে না। এখন যেমন দল বাঁধিয়া অন্যেরা তাহার দর্প চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, ভবিষ্যতে সেও তেমনি দল বাঁধিয়া নিজের নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারে। কারণ কোন রাষ্ট্রীয় দলই চিরস্থায়ী নহে। ভাঙ্গা গড়া বরাবর চলিয়া আসিতেছে। একটা কথা উঠিতে পারে, যে, জার্মেনীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই লুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর মনে হয় না। ইউরোপের বাহিরে দেশকে-দেশ কবলিত করা এখনও ইউরোপের মতে বৈধ হইলেও, ইউরোপে এখন আর সেটা (জার্মেনী রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে পোলাণ্ড ভাগের মত) ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। জার্মেনীর উপনিবেশগুলি এবং তাহার অধিকৃত পোলাণ্ডের অংশ এবং এলসাস্-লোরেন বেদখল হইতে পারে বটে। অতএব জার্মেনীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবার সম্ভাবনা, এবং তাহা থাকিলে এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ হইবে না, বলিয়া মনে করি।

ইউরোপীয়েরা যে-সকল দেশের আদিম বা বর্ত্তমান অধিবাসী বা প্রভু নহে, সেগুলি সব লা-ওয়ারিশ সম্পত্তি, প্রবলের ভোগ্য, এই বিশ্বাস যতদিন ইউরোপে থাকিবে, ততদিন এইসব লা-ওয়ারিশ দেশের রাজত্ব ও বাণিজ্য লইয়াও যুদ্ধের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিবে।

যুদ্ধের আসল কারণ মানুষের মনে। লোভ, ঈর্ষ্যা, হিংসা, বিজাতি-ও-বিদেশী-বিদ্বেষ, ভিন্নধর্ম্মীর প্রতি অবজ্ঞা ও তাহাদের জন্য নরকে স্থাননির্দ্দেশ, স্বদেশপ্রেমের মানে অন্যজাতিকে খাট করা বা তাহাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখা এইরূপ ধারণা,—এই-সব মানুষের মধ্যে থাকিতে যুদ্ধের বিলোপ কেমন করিয়া হইবে? আগুনের দ্বারা আগুন নিবান যেমন অসম্ভব, যুদ্ধের দ্বারা অপ্রেমের দ্বারা যুদ্ধের বিনাশসাধন তেমনি অসম্ভব।

মুখে নয়, কাজে, আচরণে, যদি প্রবল ও দুর্ব্বল জাতিরা প্রেম ও মৈত্রীর সাধনা করেন, তাহার জন্য যদি রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক প্রাধান্যের মত বিশাল স্বার্থও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবেই জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিলোপ কল্পনা করা যাইতে পারে।

যুদ্ধের ব্যঙ্গচিত্র (৩১৫-৩১৬ পৃষ্ঠা)

যুদ্ধ এত সামান্য কারণে ঘটে যে মনে হয় আপনি আপনিই ঘটিল; কিন্তু যুদ্ধ থামান বড় কঠিন। অপ্রেমের আগুন জ্বালান খুব সোজা; আগুন নিবান শক্ত। প্রথম ব্যঙ্গচিত্রের ইহাই ইঙ্গিত।

দ্বিতীয় ব্যঙ্গচিত্রের ভালুক রুশিয়া এবং শিকারী জার্মেনীর সম্রাট।

মার্কিন জাতিকে পরিহাস করিয়া আঙ্কল্ সাম্ বা সাম্ চাচা বলা হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে, উভয় পক্ষই তাহার অনুমোদন পাইতে চেষ্টা করিতেছে। এইজন্য বিবদমান জাতিদিগকে বালক সাজাইয়া, তাহারা সাম্-চাচার কাছে, "ও ঠিক নিয়মমত খেলছে না," পরস্পরের নামে এইরূপ নালিশ করিতেছে বলিয়া ৩য় ব্যঙ্গচিত্রে দেখান হইয়াছে।

পঞ্চম ব্যঙ্গচিত্রে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে যুদ্ধশেষে সব রাজাই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কার্নেগীপ্রদত্ত বিনি পয়সার ভোজ খাইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিবে।

যুদ্ধটা যে বাস্তবিক স্বভাবতই ভীষণব্যাপার, হাজার চেষ্টা করিলেও তাহাকে সভ্য সুন্দর করা যায় না, তাহাই ষষ্ঠচিত্রে ব্যক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠার নীচে যে ছবিটি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জার্মেনী ও তাহার সম্রাটকে এই বলিয়া ব্যঙ্গ করা হইয়াছে যে তাহাদের অভিপ্রায় সমুদয় পৃথিবীকে জার্মেনগ্রস্ত করিয়া তাহার উপর জার্মেন সম্রাটের ছাপ মারিয়া দেওয়া। এইজন্য পৃথিবীটা ক্রমবিকাশক্রমে জার্মেন সম্রাটের চেহারা পাইয়াছে, এইরূপ ছবি আঁকা হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ভারতবর্ষে আর্য্যসভ্যতার অভ্যুদয় হইতে মুসলমান-শাসন-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে কাল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই প্রাচীন কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই কালের পরিমাণ ন্যূনকল্পে চারি হাজার বৎসর। সুবিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক গ্রোট্ (Grote) তাঁহার গ্রীসের ইতিহাসে প্রাচীন গ্রীসের জীবনকাল হোমরের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতে সেকেন্দর সাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত অর্থাৎ ন্যূনাধিক এক হাজার বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে এই এক কারণেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-রচনা প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস-রচনা অপেক্ষা চতুর্গুণ শ্রমসাধ্য। অন্যান্য কারণে এই শ্রম বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই কারণগুলি ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে।

ইতিহাস ত্রিবিধ।
(১) সমসাময়িক।

অমরকীর্ত্তি গ্রীক ঐতিহাসিক থ্যুকিডিডীস (Thucydides) স্বপ্রণীত ইতিহাসের প্রারম্ভেই বলিতেছেন, "আথেন্সবাসী থ্যুকিডিডীস পেলপনীসীয় ও আথীনীয়দিগের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত প্রথমাবধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : তিনি যুদ্ধারম্ভেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, গ্রীসে এতবড় যুদ্ধ আর হয় নাই।" থ্যুকিডিডীসের ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস। এই শ্রেণীর ইতিহাসের দোষ গুণ দুই-ই আছে। ইহার গুণ এই যে ইহাতে সত্যনির্ণয়ের সম্ভাব্যতা পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস অপেক্ষা অধিক। দোষ এই ঘটিতে পারে যে লেখক সমসাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার মতে অত্যধিক আস্থাবান্ ও প্রতিপক্ষের প্রতি একান্ত বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া ঘটনার যাথার্থ্য নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া পড়িতে পারেন। বলা বাহুল্য যে অসমসাময়িক ঐতিহাসিকের পক্ষেও এই বিপদ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। থ্যুকিডিডীস এই দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহাতে ইতিহাস-লেখকের পক্ষে অত্যাবশ্যক বহুগুণের মিলন হইয়াছিল, এজন্য তাঁহার গ্রন্থখানি ইতিহাসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। ইয়ুরোপে এই শ্রেণীর পুস্তক বিস্তর আছে। প্রাচীন ভারতের এই প্রকার কোনও ইতিহাস আজও আবিষ্কৃত হয় নাই।

(২) সমসাময়িক গ্রন্থাদি অবলম্বনে পরবর্ত্তীকালে লিখিত ইতিহাস।

থ্যুকিডিডীস, ট্যাসিটাস (Tacitus) প্রভৃতির ন্যায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক দুর্লভ। এবং এমন কোন দেশ নাই, যাহার দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক, সমসাময়িক ইতিহাস আছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইতিহাস রচনা করেন, তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিতকালের সমসাময়িক ইতিহাস, জীবন-চরিত, সংবাদপত্র, পুস্তিকা (pamphlets), কাব্য, নাটক প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া তথ্য নির্ণয় করিতে হয়। গ্রোট্ স্বীয় গ্রীসের ইতিহাসে হীরডটস, থ্যুকিডিডীস, জেনফোন প্রভৃতি সমসাময়িক ঐতিহাসিক হইতে বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অন্যান্য কত পুস্তক হইতে সত্যনির্ণয়ে সাহায্য পাইয়াছেন। গিবনও (Gibbon) রোমের ইতিহাস-প্রণয়নে এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন। এমন কি, সজিমস (Sozimos), জসিমস্ (Zosimos) প্রভৃতি যে-সকল সমসাময়িক ঐতিহাসিকের নামও এখন কেহ জানে না, গিবন তাঁহাদিগের গ্রন্থও উপেক্ষা করেন নাই। এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে যাইয়া মেকলেকে কি দুরন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনচরিতে বিবৃত রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতের এই শ্রেণীর ইতিহাস-রচনা অসম্ভব।

(৩) জাতীয় সাহিত্য, মুদ্রা, অনুশাসনলিপি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিত ইতিহাস।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইতিহাস মুখ্য বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বনে লিখিত; তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাসের নির্ভর গৌণ বা পরোক্ষ প্রমাণের উপরে। প্রাচীন মিসর, আসীরিয়া, বাবিলোনীয়া প্রভৃতির যে-সকল ইতিহাস লিখিত হইতেছে, তাহা এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। গ্রোট্-প্রণীত গ্রীসের ইতিহাসে উপরে উক্ত উপকরণগুলি উপেক্ষিত হয় নাই; কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সঙ্কলনে এইগুলিই একমাত্র বা প্রধান অবলম্বন। মনস্বী রমেশচন্দ্র

দত্তের "প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস" এই প্রণালীতে লিখিত। তিনি মেগাস্থেনীস, হুয়েনসাং, ফাহিয়ান, প্রভৃতি বৈদেশিক লেখক হইতেও অনেক তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়াছেন, কিন্তু জাতীয় সাহিত্য হইতে তিনি যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার তুলনায় উহার পরিমাণ অল্প।

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য—উহার তিন বিভাগ।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ভাষাভেদে সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত, এবং ধর্ম্মভেদে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। ইতিহাস-রচনার দিক্ হইতে আমরা উহাকে অপররূপে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছি।

(১) বেদ, উপনিষদ, ধর্ম্মপদ, ভগবদ্গীতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ।

(২) রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ললিতবিস্তর, মহাবংশ, জাতক গ্রন্থাবলি, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি অল্পাধিক ঐতিহাসিক ভিত্তিবিশিষ্ট গ্রন্থ।

(৩) রঘুবংশাদি কাব্য, অভিজ্ঞানশকুন্তলাদি নাটক, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য সাহিত্য।

এতদ্ভিন্ন দর্শন, তন্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির পরোক্ষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কামন্দকীয় নীতিসার প্রভৃতি রাজনীতির আলোচনায় প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থের কাল ও স্তর।

কিন্তু এই-সকল গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দুইটি কার্য্য একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ, প্রত্যেক গ্রন্থের রচনা-কাল নির্ণয়; দ্বিতীয়তঃ, উহার স্তর-নির্ণয়; অর্থাৎ উহা একজনের রচিত কি না, এককালে রচিত কি না, উহাতে প্রক্ষিপ্ত কিছু আছে কি না, থাকিলে তাহা কোন্ সময়ের রচনা —ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা।

(১) ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তক-গুলির কালনির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তগুলি সকলের মনঃপূত হয় নাই। যেমন ঋগ্বেদ। মোক্ষমূলর প্রভৃতি উহার রচনাকাল খৃঃ পূঃ তিন সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না; শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক ওরায়ণ (Orion) গ্রন্থে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ঋগ্বেদ ঈশার অন্ততঃ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। উভয়কালের ব্যবধান অনেক। কেহ বলেন, ঋগ্বেদ মানবের আদিম সাহিত্য; কেহ বলেন, উহা চীনদেশীয়, মিসর দেশীয়, আসীরীয়, এমন কি ইহুদী সাহিত্যেরও পরবর্ত্তী। যতদিন এদেশীয় পণ্ডিতেরা ইয়ুরোপীয় প্রণালী অনুসারে এই-সমুদয় বিসংবাদী মতের মীমাংসা না করিবেন, ততদিন ভারতীয় সাহিত্য হইতে সর্ব্বজনসম্মত ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্ণয় সুদূরপরাহত থাকিবে।

(২) ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থগুলির স্তর-নির্ণয়-কার্য্যটি এখন পর্য্যন্ত আরব্ধই হয় নাই, একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মহাভারতখানি যে-আকারে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে উহা খুলিলেই দেখা যায়, উহাতে অনেক কর্ম্মীর হাত আছে। উহার বহু অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা একান্ত শাস্ত্রান্ধ ব্যক্তিকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু প্রকৃত, আদিম ও অকৃত্রিম মহাভারত কতখানি, তাহা আজও কেহ প্রদর্শন করেন নাই, করিতে যত্নবান্‌ও হন নাই। উহাতে কত বিভিন্ন স্তরের সভ্যতার নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু আজও এদেশে আপামর সাধারণের বিশ্বাস, উহা আগাগোড়াই বেদ-ব্যাসের রচনা। তারপর রামায়ণের কথা। মহাভারতের অনেক স্থল প্রক্ষিপ্ত, ইহা বরং চিরস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণে কিছু প্রক্ষিপ্ত আছে কিনা, সে প্রশ্নই এতদিন এদেশে উত্থাপিত হয় নাই।* ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ইলিয়ডের সহিত রামায়ণের তুলনা করিয়া থাকেন। ইলিয়ড সম্বন্ধে কি দেখিতে পাই? উহাতে ১৫৬৮১ পংক্তি। উহার প্রত্যেকটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। কোন্ পংক্তি হোমারের লিখিত, কোন্ পংক্তি পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইলিয়ডের কোন্ কাহিনী প্রথমে রচিত হইয়াছিল, কোন্ কাহিনী পরে যোজিত হইয়াছে, ইত্যাদি প্রশ্নগুলি নিঃশেষে

* রামায়ণের উত্তর কাণ্ড যে পরে সংযোজিত তাহা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

—প্রবাসীর সম্পাদক।

আলোচিত হইয়া গিয়াছে। এক ইলিয়ড্ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় সাহিত্যে এত পুস্তক আছে যে তাহাতেই একটি ছোটখাট গ্রন্থাগার পূর্ণ হইতে পারে। রামায়ণ সম্বন্ধে কি আছে? একমাত্র এই কিংবদন্তী যে উহা পূর্ব্বাপর আদিকবি বাল্মীকির বিরচিত। কিন্তু রামায়ণ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিষ্কর্ষ করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে উহাতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে কি না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রামায়ণের অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর অরণ্য-কাণ্ডে "ক্রুদ্ধা, সংরক্তলোচনা" সীতা লক্ষ্মণকে বলিতেছেন,

"সন্তুষ্টস্ত্বং বনে নূনং রামমেকোঽনুব্রবসি
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ, প্রযুক্তো ভরতেন বা।

রে দুষ্টহৃদয়, গোপনচারী, তুমি নিশ্চয় আমারই লোভে, কিংবা ভরতের প্ররোচনায় একাকী বনে রামের অনুগমন করিতেছ।"

"তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।

কিন্তু (তৎ, মৎপারিগ্রহরূপম্) আমাকে বিবাহ করিবার বাসনা কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না।"

এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সীতাহরণ-কাহিনী যেকালে লিখিত হয়, তখন দেবরবিবাহ আর্য্যজাতির মধ্যে প্রচলিত, অন্ততঃ সম্ভাবিত ছিল। কিন্তু দেবরবিবাহ সভ্যতার যে স্তর নির্দ্দেশ করিতেছে, সেই স্তরে কি ব্রাহ্মণ প্রাধান্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? আমরা কোন পক্ষেই মত দিতেছি না; প্রশ্নটি বিচারযোগ্য, শুধু ইহা বলাই আমাদিগের অভিপ্রায়। রামায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ আরও বহু প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়াছে।

ইতিহাস ও অন্যান্য বিদ্যা।

এই-সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে সমাজতত্ত্ব (Sociology) জানা আবশ্যক। এই বিদ্যাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এদেশে উহা এখনও বহুলরূপে অধীত হইতে আরব্ধ হয় নাই। এতদ্ব্যতীত, ভাষাবিজ্ঞান Science of Language), মানববিজ্ঞান (Anthropology), শব্দতত্ত্ব (Philology), জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা (Geology) প্রভৃতির সাহায্য ভিন্ন প্রাচীন সাহিত্য হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। এই-সকল বিদ্যার মূলসূত্র সম্বন্ধে ঐকমত্যের অভাব-বশতঃই কেহ বলিতেছেন, ঋগ্বেদ কৃষাণের গীত; কেহ বলিতেছেন, উহা উচ্চতর সভ্যতার পরিচায়ক; কেহ বলিতেছেন, আর্য্যজাতির আদি জন্মভূমি পঞ্চনদ প্রদেশ; কেহ বলিতেছেন, মধ্য এসিয়া; কাহারও মতে মঙ্গোলিয়া; কাহারও মতে বাল্টিকসাগরতীর; তিলক বলিতেছেন, সুমেরুমণ্ডল। প্রত্নতত্ত্বালোচনার বিপদ এখানেই শেষ হয় নাই। বিজ্ঞানানুমোদিত সাহিত্যালোচনায় আমরা এখনও এত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি যে যিনি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসক্ষেত্রে নূতন কিছু করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার পক্ষে এক দিকে যেমন সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতে ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক, তেমনি অপর দিকে ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মন ও ইটালীয় সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় অপরিহার্য্য। লাটিন ও গ্রীক না জানিলে তো অসুবিধা আরও বাড়িয়া যাইবে। এতগুলি বা ইহা অপেক্ষাও অধিক ভাষা জানেন, য়ুরোপে এমন লোকের সংখ্যা বিস্তর, এদেশে মুষ্টিমেয়। এজন্য আমাদের পক্ষে সমবেতশ্রম (Collaboration) বাঞ্ছনীয়। ইহার অভাবে অনেক কর্ম্মীর শ্রম বৃথা হইতেছে। এইস্থলে একথাও বলিয়া রাখা উচিত যে বুদ্ধি মার্জ্জিত ও শৃঙ্খলমুক্ত না হইলে, এবং বর্ত্তমানকালোপযোগী বিচারপদ্ধতিতে নৈপুণ্য না জন্মিলে কাহারও পক্ষে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

কোন কোনও লেখক মনে করেন, শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিলেই বক্তব্য বিষয় প্রমাণিত হইয়া গেল। শাস্ত্রের বচন নির্ব্বিচারে গ্রহণযোগ্য কি না, সে তর্ক এখানে উপস্থিত করিব না। কিন্তু শাস্ত্রদ্বারা আলোচ্য প্রশ্নটির সম্যক্ মীমাংসা হইল কি না, তাহাও যে সর্ব্বত্র বিবেচিত হয় না, ইহাই আমরা দেখাইতে চাহিতেছি।

* শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ গুহ-সঙ্কলিত "লঘুরামায়ণম্, ১৯৭ পৃঃ।

যুদ্ধকাণ্ডের শেষ সর্গে রামরাজ্যের যে বর্ণনা আছে *, তাহা আদর্শের প্রতিবিম্ব, না ধ্রুব সত্য? অনেকে তর্কস্থলে উহা ধ্রুব সত্য রূপেই উপস্থিত করিয়া থাকেন। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে রাজামাত্রেই "নররূপী মহতী দেবতা" ছিলেন, না তাঁহারাও বর্ত্তমান যুগের উইলিয়াম, লিওপোল্ড, নিকোলাস প্রভৃতির মত দোষগুণসমন্বিত মানুষ ছিলেন? অনেক লেখক ঐ অধ্যায় হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই ভাবিয়া পরম শ্লাঘা অনুভব করেন যে অতীত কালে ভারতবর্ষ বিংশ শতাব্দীর ইয়ুরোপ অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ ছিল। মনু প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—

"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥

তরুলতাগুল্মাদিরও অন্তরে চৈতন্য আছে, এবং ইহারাও সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, তাহা এদেশের অতি পুরাতন তত্ত্ব। এই শ্রেণীর লেখকেরা ভাবিয়া দেখেন না যে ধ্যানোপলব্ধ সত্য ও প্রমাণলব্ধ প্রত্যক্ষ সত্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দুইজন জ্যোতিষী গণিতের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে সৌরজগতের প্রান্তদেশে একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহ বিদ্যমান আছে; কিন্তু যতদিন না গ্রহটি দূরবীক্ষণ-সাহায্যে দৃষ্টিপথে আনীত হইয়াছিল, ততদিন আডাম ও লাভেরিয়ে নেপচুনের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন নাই। এদেশে এমত শিক্ষিত লোকের অসদ্ভাব নাই, যাহারা রামায়ণে পুষ্পকরথের বর্ণনা শুনিয়া বা পাঠ করিয়া বলিয়া থাকেন, তবে তো প্রাচীনকালে ভারতে aeroplane, airship, dirigible, Zeppelin সবই ছিল। কবিকল্পনা বা আদর্শ-চিত্র যদি খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য হয়, তবে, দুই শত বৎসর পরে কোনও ইতিহাসলেখক মহারাণীর ঘোষণাপত্র উদ্ধৃত করিয়া অনায়াসেই বলিতে পারেন, ভারতে ইংরেজরাজত্বে রাজকার্য্যে বর্ণভেদ মোটেই স্বীকৃত হইত না; যথা, ভূদেব মুখোপাধ্যায় শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চপদে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, রমেশচন্দ্র দত্ত ছোটলাটের পদ লাভ করিয়াছিলেন, যোগ্য ও সুশিক্ষিত ভারতবাসী শিক্ষাক্ষেত্রে ইয়ুরোপীয়দিগের সমান বেতন ও সমান মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন, প্রভিন্স্যাল ও ইম্পিরিয়াল সার্ভিস নামক কথা দুইটি শত্রুর রটনা।

তবে কি শাস্ত্রবচনের কোনই প্রামাণিকতা নাই? আছে, কিন্তু তাহা অন্যরূপ। মনুর অষ্টম অধ্যায় দণ্ডবিধি; উহাতে বর্ণভেদে দণ্ডভেদের ব্যবস্থা রহিয়াছে; আর বলা হইয়াছে, "ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্বপি স্থিতম্—ব্রাহ্মণ যত জঘন্য অপরাধই করুক না কেন, তাহার কদাপি প্রাণদণ্ড হইতে পারে না।" এই অধ্যায়টি লেখকের মনোভাব (trend of thought) প্রকাশ করিতেছে; লেখক তৎকালে স্বীয় প্রতিভাবলে জনসমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, নতুবা তিনি সংহিতাখানি লিখিতে পারিতেন না, কিংবা লিখিলেও উহা কালক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইত না; অতএব সংহিতাকারের সমকালে যাঁহারা সমাজের পরিচালক ছিলেন, তাঁহারা সমাজস্থিতির পক্ষে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য-রক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন—এই অর্থে এই অধ্যায়টি পাঠ করিলে কোনও আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু যদি কেহ উহা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন, প্রাচীনকালে যাঁহারা রাজদণ্ড পরিচালন করিতেন, তাঁহারা মনুবাক্য একচুলও লঙ্ঘন করিতেন না, এবং চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তী রাজদ্রোহী ব্রাহ্মণের বধচিন্তাও মনে স্থান দিতেন না—("তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ") —তবে তিনি গুরুতর ভ্রমে পতিত হইবেন। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মৃচ্ছকটিক নাটকে শর্ব্বিলক নামক ব্রাহ্মণ চোর চারুদত্তের গৃহে সিঁধ কাটিতে কাটিতে বলিতেছে, "বাহাবা, যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের কত কাজে লাগে! ইহাতে সিঁধের মুখ মাপা যায়, গাত্রের অলঙ্কার আত্মসাৎ করা যায়, কপাটের হুড়কা টানিয়া দ্বার খোলা যায়, সর্প দংশন করিলে আহত অঙ্গ বাঁধা যায়।" এই উক্তি হইতে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই এমত

* লঘুরামায়ণম্, ৩৫৭ পৃঃ।

সিদ্ধান্ত করিবেন না যে মৃচ্ছকটিকের যুগে ব্রাহ্মণমাত্রেই চোর ছিল, কিংবা চোরমাত্রেই ব্রাহ্মণ ছিল। অথচ বাক্যটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কেননা, ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সেই সময়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিলক্ষণ অধোগতি হইয়াছিল ; তাহা না হইলে নাট্যকার একজন ব্রাহ্মণকে চোররূপে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিয়া তাহার মুখে ঐ সকল কথা দিতে পারিতেন না।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ।

প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনাতে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই। লেখক যাহা বলিতে চাহিতেছেন, অনেক স্থলেই তাহা আদর্শানুরূপ বলিয়া যাইতেছেন, সুতরাং বর্ণিত বিষয় বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি কখনও কখনও যেন অজ্ঞাতসারে এমন কথা বলিয়া ফেলেন, যাহা মুখ্য বক্তব্য নয় বলিয়াই ইতিহাসের পক্ষে সমধিক মূল্যবান্। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম রাজধর্ম্ম বহুলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার অধিকাংশই আদর্শোচিত কথা। হঠাৎ কোথা হইতে বর্ত্তমান কালের রাজনীতি আসিয়া পড়িল? ভীষ্ম বলিতেছেন, "যদি কোন বলবান্ ব্যক্তি অরাজক রাজ্যে আগমনপূর্ব্বক উহা গ্রহণাভিলাষে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুদ্গমন করিয়া সম্মানিত করা প্রজাবর্গের অবশ্যকর্ত্তব্য" (৬৭ অধ্যায়)। ভারতে ইংরেজরাজত্ব-প্রতিষ্ঠায় ভীষ্মের উপদেশই কি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয় নাই? পুনশ্চ, "যিনি প্লবস্বরূপ হইয়া লোকদিগকে বিপদসাগর হইতে ত্রাণ করেন, তিনি শূদ্রই হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তাঁহাকে সম্মান করা অবশ্যকর্ত্তব্য।" (৭৯ অধ্যায়)। তবে না ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কেহই রাজা হইতে পারে না? আবার, "জলৌকা যেপ্রকার লোকের দেহ হইতে ক্রমে ক্রমে শোণিত পান করে, ব্যাঘ্রী যেরূপ শাবকদিগকে নিপীড়িত না করিয়া দশন দ্বারা গ্রহণ করে, মূষিক যেমন অলক্ষিতভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থিত মাংস ভোজন করে, অর্থাভিলাষী ভূপতি সেইরূপ প্রজাদিগকে সমূলে উন্মূলিত বা সাতিশয় নিপীড়িত না করিয়া অলক্ষিতভাবে উহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন।" (৮৮ অধ্যায়)। একেই বলে কাজের কথা অর্থাৎ practical politics. স্বয়ং ম্যাকিয়াভেলিও (Macchiavelli) ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপদেশ দিতে পারিতেন না। প্রত্নতত্ত্বান্বেষীর নিকটে এই শ্রেণীর গৌণ প্রমাণ (indirect evidence) অতিশয় আদরণীয়।

উপসংহার।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাহার নানা কারণ আছে। যাঁহারা গোঁড়া খৃষ্টীয়ান, তাঁহাদিগের আপত্তি এই যে ভারতের সভ্যতা ঈশার চারি সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, একথা স্বীকার করিলে উহা জগৎ-সৃষ্টিরও পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। যাহারা অতিরিক্ত গ্রীক্-ভক্ত, তাঁহারা ভারতভূমিকে গ্রীসের জ্যেষ্ঠা সহোদরা বলিয়া কিছুতেই মানিতে চাহেন না। আর যাঁহারা একান্ত স্বদেশানুরাগী, তাঁহারা আপনাদিগের অর্ব্বাচীনতা দেখিয়া ভারতকে প্রাচীনত্বের গৌরব অর্পণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ভারতবাসী দ্বারা লিখিত হইলে যেমন হয়, অপর কাহারও দ্বারা তেমন হইবার সম্ভাবনা নাই। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য এক অতলস্পর্শ সমুদ্র। ইহা হইতে রত্নোদ্ধার করিতে হইলে অসংখ্য ডুবুরীর প্রয়োজন। অতএব সকলের শ্রমই আদরণীয়। যিনি যে রত্ন লাভ করেন, তিনি তাহা জনসমাজে উপস্থিত করুন ; তবে যাহা উপস্থিত করা হইল, সেটি প্রকৃত রত্ন কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা জনসাধারণের কর্ত্তব্য। এই কথাটি বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। ইহাতে প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না, কেননা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন তাহাতে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

আগে ও পরে

মরণে ছিল না ভয়,　　জীবনে ছিল না সুখ
তোমারে দেখিনি যবে হে মনোমোহন।
এখন জীবন মোর　　যত দীর্ঘ হোক্ না কো
মনে হয় অতি অল্প, -সুখের স্বপন।

শ্রীকালিদাস রায়।

পোষ্টকার্ড

(গল্প)

ইন্দুলেখা মাসিকপত্রিকার সম্পাদক মনমোহনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। লোকটিকে আমার বড় ভালো লাগে; বিনয়ী অমায়িক অনাড়ম্বর নিরীহ লোকটি, তপস্বীর মতো সর্ব্বদা লেখাপড়ার মধ্যে যেন নিমজ্জিত হইয়াই থাকে; একান্ত নিষ্ঠার জোরে সামান্য আরম্ভ হইতে ইন্দুলেখাকে আজ একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র করিয়া তুলিয়াছে, মনমোহনের গল্প উপন্যাস পড়িবার জন্য ঘরে ঘরে বহু নরনারী প্রতিমাসের ইন্দুলেখার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। আমি মাঝে মাঝে তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহার সহিত সাহিত্য-আলোচনা করিতাম; কিছু-না-কিছু নূতন শিখিয়া বাড়ী ফিরিতাম।

সেদিন মনমোহনের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। মনমোহন বিবাহ করে নাই, বাড়ীতে অন্য কোনো স্ত্রীলোক আত্মীয়ও থাকেন না, কাজেই আমি অসঙ্কোচে বরাবর তাহার খাস কামরাতেই চলিয়া যাইতাম। মনমোহনের টেবিলের অপর দিকে বসিয়াই সেদিন আমার নজর পড়িল একখানি অতিসুন্দর সোনারূপার মিশালী কাজকরা হাতীর দাঁতের ফটোফ্রেমের উপর। এমন বহুমূল্যবান্ সুন্দর ফটোফ্রেমে মনমোহন কাহার ফটোগ্রাফ রাখিয়াছে জানিতে অত্যন্ত কৌতূহল হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কার ফটোগ্রাফ?

মনমোহন লজ্জিত হইয়া বলিল—ফটোগ্রাফ নয়।

—তবে কি?

মনমোহন অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—ও বিশেষ কিছু নয়, ও আমার একটা পাগলামি।

আমি উঠিয়া হাত বাড়াইয়া ফ্রেমখানিকে ঘুরাইয়া আমার দিকে মুখ করিয়া বসাইয়া দিলাম। দেখিলাম—ফ্রেমে ফটোগ্রাফ নয়, রঙে-আঁকা চিত্র নয়, আছে একখানি ডাকে-আসা পোষ্টকার্ড! আমি কৌতূহলী হইয়া পড়িলাম—পোষ্টকার্ডখানিতে প্রেমের কথা নাই, কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা নাই; আছে অপরিচিতকে সম্বোধন করিয়া দুটি মাত্র কাজের কথা! পোষ্টকার্ডখানিতে লেখা আছে—

ওঁ

শ্রীযুক্ত ইন্দুলেখা সম্পাদক মহাশয়েষু—

সবিনয় নিবেদন,

আমি কার্ত্তিক মাসের ইন্দুলেখা পাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে ১০৪ পৃষ্ঠার পরই ১১৩ পৃষ্ঠা রহিয়াছে, মাঝের কয় পৃষ্ঠা নাই; এবং শেষের দিকে ১২৮ হইতে ১৩৬ পৃষ্ঠা দুবার আছে। ইহাতে "সোনার কাঠি" গল্পটি অসম্পূর্ণ হইয়াছে। যে কয়েক পৃষ্ঠা নাই সেই কয়েক পৃষ্ঠা অনুগ্রহ করিয়া সত্বর পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। ইতি—

নিবেদিকা শ্রীইন্দুলেখা সেন।

কেয়ার অফ বাবু তারকেশ্বর সেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

ভগবানপুর।

গ্রাহক-নম্বর ৪৭৬৫।

আমি হাসিয়া বলিলাম—এত গ্রাহক গ্রাহিকা থাকতে এই চার হাজার সাত শ পঁয়ষট্টি নম্বরের বিশেষ গ্রাহিকাটির ওপর তোমার এমন পক্ষপাত কেন আমায় বলতে হবে।

মনমোহন লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল—ও কিছু নয়, আমার একটা খেয়াল মাত্র। এর মধ্যে যতটা রোমান্স আছে ভাবছ তার কিছুই নেই।

আমি নাছোড় হইয়া ধরিয়া বসিলাম—এ রহস্য প্রকাশ করে' বলতেই হবে? ইন্দুলেখা তোমার কে?

মনমোহন গম্ভীর বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মনমোহন তাহার জীবনের করুণ কাহিনী বলিতে লাগিল—

ইন্দুলেখা আমার কেউ না। ইন্দুলেখা আমার সব। প্রথম যৌবনে যখন আমি নিবান্ধব একলা হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন এই ইন্দুলেখাকে দেখিয়া বড় আপনার বলিয়া মনে হইয়াছিল।

ইন্দুলেখাকে যেদিন আমি প্রথম দেখি সেদিনকার স্মৃতিটি বড় সুন্দর। বৈশাখ মাসের বিকাল বেলা; বাগানের গাছে পথে তখনি জল দিয়া গিয়াছে; জল-পাওয়া তাজা ফুলের, আর ভিজা মাটির গন্ধে বাতাসটি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; সেই বাগানের কেয়ারির মধ্যে দাঁড়াইয়া একটি কিশোরী মেয়ে ফুল তুলিতেছিল। সে ফুলেরই মতো সুন্দর, চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালার মতো। সেই অচেনা জায়গায় অচেনা মেয়েটি আমায় দেখিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় যে স্নিগ্ধ হাসিটি হাসিল তাহা আমার মর্ম্মে আজও বিদ্ধ হইয়া আছে।

তাহার সহিত আলাপ হইতে বিলম্ব হইল না।

তাহাদের বাড়ী আমার দিদির বাড়ীর ঠিক লাগোয়া; তাহাদের সকলের সঙ্গে দিদির খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমি তখন দিদির বাড়ীতেই থাকিয়া পড়িব বলিয়া বাঁকিপুরে গিয়াছিলাম।

আমার মা অল্প বয়সেই মারা যান। তারপর এণ্ট্রান্স পরীক্ষার আগেই বাবাও মারা গেলেন, কিন্তু আমার খাওয়া পরা বা লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিবার মতো কোনো কিছুই সঙ্গতি রাখিয়া গেলেন না। আমি এণ্ট্রান্স পাশ করিলে দিদি আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমার ভগ্নীপতি বাঁকিপুরে ওকালতি করিতেন। আর ইন্দুলেখার পিতা পতিতপাবন বাবু ছিলেন সেখানকার সবজজ।

ইন্দুলেখাদের বাগানের ধারেই একটি ঘরে আমার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ একটা গোলাপ ফুলের মার খাইয়া চমকিয়া জানলার দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইতাম দুইহাতে দুই গরাদে ধরিয়া ইন্দুলেখা খিলখিল করিয়া হাসিয়া কুটিকুটি হইতেছে। কোনো দিন হঠাৎ একরাশ যুঁই ফুল ইন্দুলেখার হাসির মতো ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া আমার বইয়ের লেখা ঢাকিয়া আমার পড়া বন্ধ করিয়া দিত। কখনো সে চুপিচুপি আসিয়া পিছন হইতে চোখ টিপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হাসি চাপিতে গিয়া খুক খুক শব্দ করিত; আমি বলিতাম—"এই জানকিয়াকে মাঈ, আঁখি ছোড়ি দে গে!"—অমনি সে হাত ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া কেবলি বলিত—"কেমন ঠকিয়েছি। কেমন ঠকিয়েছি! ওমা, আমি কিনা-জানকিয়া কে মাঈ!" এমনি একই ভুল আমি রোজই করিতাম, কিন্তু তাহাতেও তাহার হাসির কমতি কোনো দিনই হইত না।

আমার সহিত ইন্দুলেখার ভাব বেশি করিয়া জমিয়া উঠিল তাহার চুরি করিয়া বাংলা মাসিকপত্র আর উপন্যাস পড়িবার নেশায়। তাহার কৃপণ সবজজ বাপ মাসিকপত্র প্রভৃতি লইয়া বাজেখরচ করিতেন না; প্রকাশ্যে উপন্যাস পড়া চোদ্দ বৎসরের মেয়ের মানাইত না; এজন্য তাহার চুরির রশদ জোগাইতে হইত আমাকে।

এমনি আনন্দে কয়েক বৎসর গেল।

আমি তখন বি-এ পড়িতেছি। শুনিলাম ইন্দুলেখার বিবাহের কথা হইতেছে। আমার মনে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল, ভাবিতে লাগিলাম—ইন্দুলেখার বিবাহ এত সত্বর! কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলাম ইন্দুর বয়স তখন ষোল পার হইতে চলিয়াছে। প্রবাসী বাঙালী বলিয়া ইহার আগেই তাহার বিবাহ হইয়া চুকিয়া যায় নাই। যতই ইন্দুর বিবাহের কথা চারিদিকে শুনিতে লাগিলাম, ততই যেন আমার মনের কোণায় হাহাকার জমিয়া উঠিতে লাগিল।

এখন আর ইন্দু আমার উপর পুষ্পবৃষ্টি করে না, এখন আর সে চোখ টিপিয়া ধরিয়া হাসিয়া কুটিকুটি হয় না। সেদিনকার সেই এতটুকু ইন্দু আজ বিবাহের সম্ভাবনায় গম্ভীর ভারিক্কি হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন আমি ইন্দুকে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইন্দু, বিয়ের কোথাও কিছু ঠিক হল?

ইন্দু ছলছল চোখে ভর্ৎসনা ভরিয়া একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি লজ্জিত ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর আর কোনো দিন ইন্দুলেখার কাছে তাহার বিবাহের কথার উল্লেখ করিতে পারি নাই।

বিবাহ হইবে ইন্দুলেখার, কিন্তু আমার দিনের কাজ আর রাতের বিশ্রাম বন্ধ হইয়া আসিল। আমি আর ইন্দুর সহিত সহজ ভাবে দেখা করিতে পারি না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার সহপাঠী বন্ধু অনাদির শরণ লইলাম।

অনাদি পতিতপাবন বাবুর সঙ্গে এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞাসা করিল—ইন্দুর বিয়ের কোথাও কিছু কি ঠিক হল?

পতিতপাবন বাবু বলিলেন—না হে, কিছু ত এখনো ঠিক করতে পারিনি। তোমাদের সন্ধানে ভালো পাত্র টাত্র আছে?

অনাদি বলিল—আমাদের মনমোহনের সঙ্গে বিয়ে দিন না।

পতিতপাবন বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কে,

মোনা? ভগ্নীপতির গলগ্রহ যে তার সঙ্গে ইন্দুর বিয়ে দেবো? তার চেয়ে মেয়েটাকে হাতপা বেঁধে জলে ফেলে দিলেই হয়!

তারপর পতিতপাবন বাবু যেরূপ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া উঠিলেন তাহাতে এ প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে কাহারো কিছু সন্দেহ রহিল না।

তথাপি অনাদি বলিল—কেন, মনমোহন ত ছেলে মন্দ নয়। স্বভাবচরিত্র ভালো, খুব বুদ্ধিমান, বি-এ পাশ করে চাইকি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হতে পারে; ওকালতী পাশ করলেও ভগ্নীপতির আর আপনার সাহায্যে শিগ্‌গির পশার করতেও পারবে।

পতিতপাবন বাবু বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিলেন—গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল না দিয়ে বরং একজন তৈরি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কি পশারওলা উকিলের সন্ধান বলতে পার ত বল। আর মোনাকে বলে দিয়ো সে এইসব আকাশকুসুম ছেড়ে দিয়ে এখন লেখাপড়া করুক।

ইহার পর আর কথা চলিল না। কিন্তু কথাটা লইয়া উভয় পরিবারে আলোচনা হইল বিস্তর। আমি ত লজ্জায় আধমরা হইয়া উঠিলাম। ইন্দুর সঙ্গে দেখা করাও দায় হইয়া উঠিল। আমি যে তাহাকে ভালবাসি তাহা কোনো দিন মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। এই ব্যর্থ প্রস্তাবে তাহা ব্যক্ত হইতে গেল কেন?

একদিন একটি নবীন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রাহু সাজিয়া ইন্দুলেখাকে গ্রাস করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মাথায় টিকি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে মাদুলি, তর্জ্জনীতে অষ্টধাতুর আংটি; দেখিয়া বুঝিলাম হাঁ ডেপুটি বাবুটি নিষ্ঠাবান বটে।

বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেলা আমি পতিতপাবন বাবুর বাড়ী গিয়া বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা ও ভোজের আয়োজনে সাহায্য করিতেছিলাম। পতিতপাবন বাবু বলিলেন—মনু, আমার শোবার ঘর থেকে কার্পেটখানা এনে বিয়ের জায়গাটায় পেতে রাখগে ত।

আমি এক ছুটে গিয়া পতিতপাবন বাবুর শোবার ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ইন্দু কমলরঙের একখানি চেলী পরিয়া চণ্ডীর পুথি কোলে করিয়া আলপনা-দেওয়া পীঁড়ির উপর একলাটি চুপ করিয়া বিবাহের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে; তাহার সামনে দুটি শামাদানে দুটি বাতির সোনালি আলো কনে-চন্দন-আঁকা ইন্দুলেখার মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে একটি দিব্য শ্রী দান করিয়াছে।

ইন্দু একবার মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার কপোলের পত্রলেখা ধুইয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তারপর আমি কি করিয়াছিলাম মনে নাই। অনাদি আসিয়া আমাকে ঠেলা দিয়া ডাকিল—মনু, মনু, তোকে পতিতপাবন বাবু খুঁজছেন, চ।

আমার হুঁস হইল। দেখিলাম, কখন আমি আমার ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছি। আমি কষ্টে অশ্রুর উচ্ছ্বাস রোধ করিয়া বলিলাম—বলগে আমার জ্বর হয়েছে, আমি যেতে পারব না।

অনাদি নীরবে তাহার হস্তের স্নেহস্পর্শ আমার কপালে বুলাইয়া দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন বরকনে বিদায় হইবে। আমি ইন্দুর সামনে হয়ত আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিব না, তাই আমি তাহাদের বাড়ীতে গেলাম না। আমার ঘরের বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিলাম; যখন আমারই ঘরের সম্মুখ দিয়া ইন্দুর গাড়ী যাইবে, তখন তাহাকে শেষ দেখা একবার দেখিয়া লইব; তারপর আমার গোপন দুর্গে শীঘ্র আশ্রয় লইতে পারিব।

কিছুক্ষণ পরে ছাদে নূতন বাক্স বহন করিয়া বরকনেকে লইয়া গাড়ী পতিতপাবন বাবুর বাড়ীর ফটক হইতে বাহির হইল। গাড়ীর দরজা জানলা নিশ্ছিদ্র রকমে বন্ধ, যেন পুলিশ-আদালত হইতে কয়েদীর গাড়ী জেলখানায় চলিয়াছে—যে ভিতরে আছে তাহার সমস্ত আলোক আনন্দ, আশা ভালবাসা বাহিরে ফেলিয়া সে দুঃখের অন্ধকারে বন্দী হইয়া চলিয়াছে! আমার চোখের সামনে দিয়া ইন্দুলেখা অস্ত গেল, আমি কিন্তু তাহাকে একটিবার দেখিতেও পাইলাম না।

কিছুদিন পরে আর না থাকিতে পারিয়া ইন্দুকে একখানি চিঠি লিখিলাম। যাহাকে মুখে কোনো

প্রণয় নিবেদন করিতে পারি নাই তাহাকে চিঠিতেও তাহা পারিলাম না, লিখিলাম শুধু একটি কুশলপ্রশ্ন, তাহাকে অনুভব করিবার মতো শুধু তাহার একছত্র হাতের লেখা পাইবার প্রত্যাশায়। অনেক দিন বৃথাই গেল, ইন্দুর চিঠি আসিল না। একদিন পতিতপাবন বাবু আমায় ডাকিয়া আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন—"পড়"। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে ভয়ে খাম হইতে চিঠি বাহির করিতেই দেখিলাম, আমি ইন্দুকে যে একছত্রের চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম সেইখানির সঙ্গে আর একখানি চিঠি রহিয়াছে। আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। আমার হাত হইতে চিঠি খসিয়া পড়িয়া গেল। পতিতপাবন বাবু আবার বলিলেন—"পড়"। যন্ত্রচালিতের ন্যায় চিঠি কুড়াইয়া লইয়া পড়িলাম ইন্দুলেখার স্বামী লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু—

কে একজন মনমোহন আমার স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছে। আমার স্ত্রীকে জেরা করিয়া জানিলাম মনমোহন আপনাদের প্রতিবেশী, বয়সে যুবক। আমি ইচ্ছা করিনা যে কোনো পরপুরুষ আমার স্ত্রীকে পত্র লেখে। উক্ত ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আপনি একথা সমঝাইয়া দিবেন। বারদিগর এরূপ করিলে আমি তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ করিতে বাধ্য হইব। ইতি শ্রীতারকেশ্বর সেন।

পত্র পড়িয়া বুঝিলাম ইন্দুলেখার স্বামী হাকিম বটে! আমি ফৌজদারী আসামীর মতন ভয়ে লজ্জায় অভিভূত হইয়া আস্তে আস্তে চিঠি দুখানি পতিতপাবন বাবুর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া দণ্ড শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলাম। পতিতপাবন বাবু চিঠি দুখানি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিলেন—মনু, এ কাজটা তোমার ভালো হয়নি। হয়ত এর জন্যে ইন্দু স্বামীর কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করবে। এমন কাজ আর কখনো কোরো না। আমি তারককে বুঝিয়ে চিঠি লিখে দেবো।

আমি লজ্জায় মাটি হইয়া বাড়ী ফিরিলাম, এই রকম লজ্জাতেই পড়িয়া দেবী জানকী একদিন মাতা বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ হইয়া লজ্জা ঢাকিতে ডাকিয়াছিলেন। আমার কানে কেবলই বাজিতে লাগিল "হয়ত এর জন্যে ইন্দু স্বামীর কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করবে।" হায় হায় আমার কেন অমন কুবুদ্ধি হইয়াছিল।

• সে আজ এগার বৎসরের কথা। তারপর আমি বি-এ, এম-এ পাশ করিয়াছি। পতিতপাবন বাবু বাঁকিপুর হইতে কটকে বদলি হইয়া গিয়াছেন। আমার ভগ্নীপতির জেদ সত্ত্বেও আমি ওকালতী করার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আটবৎসর হইল এই ইন্দুলেখা কাগজখানি চালাইতেছি। রাজা রামচন্দ্র স্বর্ণসীতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, দরিদ্র আমি আমার পৈতৃক ভিটামাটি বিক্রয় করিয়া এই কাগজের ইন্দুলেখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমার সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি অর্থ ইহারই সেবায় নিবেদন করিয়া দিয়াছি। ইন্দুলেখা যে মাসিকপত্র পড়িতে বড় ভালবাসিত! তাহাকে পত্র লেখার পথ যখন বন্ধ হইয়া গেল, তখন ভাবিতে ভাবিতে এই খেয়াল মাথায় আসিল—তাহারই নামে একখানি কাগজ প্রতিষ্ঠা করিব; তাহার বুকে আমার মর্ম্মকাহিনী লিখিয়া লিখিয়া দিকে দিকে প্রেরণ করিব, যদি দৈবাৎ কোনোটা কোনোদিন ইন্দুলেখার চোখে পড়িয়া যায়। সেদিন হইতে আমার সমস্ত সাধনা হইল তাহাকেই ঘিরিয়া ঘিরিয়া নব নব বিচিত্র দুঃখবেদনার গল্পজাল বয়ন করা। ভক্ত পূজারীর মতো দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া যাইতাম, জানিতাম না আমার পূজায় দেবতার আসন টলিতেছে কিনা। কায়মন-পরিশ্রমে শুধু চেষ্টা করিতেছি কেমন করিয়া এই ইন্দুলেখাকে এমন সুন্দর শোভন উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিব যে ইহা ঘরে ঘরে পঠিত হইবে। এমনি করিয়া একদিন-না একদিন আমার পূজার অর্ঘ্য দেবতার চরণে পড়িলেও পড়িতে পারে কেবলমাত্র এই ক্ষীণ আশায়!

মাঝে মাঝে এক এক সময় মন বড় দমিয়া যাইত, কর্ম্মে নিরুৎসাহ জন্মিত, কোথাও কিছু এতটুকু আশ্রয় খুঁজিয়া পাইতাম না। ইন্দুলেখা আমার প্রতিবেশিনী ছিল; আমাদের বয়সও ছিল অল্প; আমি তাহার কোনোই স্মরণচিহ্ন সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি নাই, রাখা আবশ্যকও মনে হয় নাই। এখন কিন্তু তাহারই অভাবে আমার জীবন শূন্য বোধ হইতেছে—এক ছত্র হাতের লেখাও যদি আমার কাছে থাকিত!

একদিন দিদিকে বলিলাম—দিদি, ইন্দুদের কোনো চিঠিপত্র পাও?

দিদি বলিলেন—না। কে কোথায় আছে তাই জানিনে।

কিন্তু আমি ত জানি, ইন্দু কোথায় আছে। ফি হপ্তায় কলিকাতা-গেজেট পড়িয়া ইন্দুলেখার স্বামীর বদলি হওয়ার খবরটা যে জানিয়া রাখা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে। আমি ইতস্তত করিয়া বলিলাম—ইন্দুর স্বামী এখন ভগবানপুরে আছে। তাকে একখানা চিঠি লিখো না।

দিদি নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন—ওরা কেউ খোঁজ খবর নেয় না, আমি আর গায়ে পড়ে' লিখতে পারিনে।

আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। ওরা খোঁজ না লউক, আমার যে ইন্দুর খোঁজ লওয়া একান্ত আবশ্যক তাহা আমি দিদিকে কেমন করিয়া বুঝাইব? মনের মধ্যে নিরাশার হাহাকার পুষিয়া আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতেই হইবে। আমার এ দুঃখ কাহাকেও বুঝাইবার নয়।

একদিন হঠাৎ এই চিঠিখানি আমার ম্যানেজার আনিয়া আমাকে দেখাইয়া দপ্তরীর নামে নালিশ করিল; এবং আমার কাছে যে ফাইলের ফর্ম্মা আছে তাহা চাহিল,—সেই ফর্ম্মা পাঠাইয়া ইন্দুলেখার অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া দিবে।

আমি চিঠিখানি হাতে করিয়া এক মুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিলাম না। এই ইন্দুলেখার হাতের লেখা! সে আমার কাগজের গ্রাহিকা! কবে সে একদিন আমার অজ্ঞাতসারে এমনি একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া তাহারই-নামে-নাম-রাখা আমার কাগজের গ্রাহক হইয়াছে; সেই দুর্লভ চিঠি আমার চোখে পড়ে নাই; তাহার কদর না বুঝিয়া ম্যানেজার হয়ত তাহার বুক ফুঁড়িয়া ফাইল করিয়াছে, নয়ত ছিঁড়িয়া আবর্জ্জনার ঝুড়িতে ফেলিয়া দিয়াছে! আজ ভাগ্যক্রমে তাহার আর-একখানি পোষ্টকার্ড আমার হাতে আসিয়া পড়িল। আজ আমার সমস্ত সাধনা সার্থক হইয়াছে! আজ আমার পূজায় তুষ্ট দেবতার বর পাইয়াছি। দপ্তরীকে তাহার ভুলের জন্য আমার সর্ব্বস্ব বকশিশ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল! আমি আপনাকে একটু সম্বরণ করিয়া লইয়া ম্যানেজারকে বলিলাম—ফর্ম্মা পাঠাবার দরকার নেই; একখানি খুব ভালো দেখে ইন্দুলেখা মোড়ক বেঁধে আমার কাছে পাঠিয়ে দিনগে; আমি ঠিকানা লিখে দেবো।

সেইদিন হইতে ৪৭৬৫ নম্বরের গ্রাহিকার নামের লেবেলখানি আমি নিজের হাতে লিখিয়া দিই। আর সেই অপরিচিতের মতন লেখা কাজের চিঠিখানিকেই আমার সমস্ত হাসিকান্না দিয়া ঘিরিয়া আমার চোখের সামনে রাখিয়া দিয়াছি।

১১ কার্ত্তিক। } চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবরের দেশে দিন পনর

চতুর্থ দিবস—জগতের সর্ব্বপুরাতন রাষ্ট্রকেন্দ্র

কাইরো হইতে লুক্সর যাত্রা করিলাম। কাইরোর নিকটেই রেলওয়ে-পুলে নাইল পার হইতে হয়। গাড়ী হইতে দেখিলাম, নদী গ্রীষ্মকালের যমুনা অপেক্ষা প্রশস্ত নয়। জল বেশ ফরসা। নীলনাইল-অংশ কত নীল বা কাল তাহা এখান হইতে ধারণা করা গেল না।

গাড়ী এক্ষণে কাইরোর অপর পার অর্থাৎ নাইলের পশ্চিম কিনারা দিয়া যাইতে লাগিল। আমাদের পূর্ব্বে আরবের মকাওম শৈলশ্রেণী, পশ্চিমে আফ্রিকার লীবিয়া পাহাড়—মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুই দিকে শস্যশ্যামল উর্ব্বর ভূমি এবং নাইলনদ—সকলই উত্তরদক্ষিণে সমান্তরাল-ভাবে বিস্তৃত। আমাদের রেলপথও এই সকলের সঙ্গে সমান্তরালরূপে নির্ম্মিত। গাড়ীতে বসিয়া সমস্ত মিশরের প্রাকৃতিক শোভা এবং পূর্ব্বপশ্চিমের বিস্তৃতি একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত ভারতবর্ষের পশ্চিমঘাটের মত উচ্চ ও সমতলভূমি-যুক্ত দেখাইতেছে। উদ্ভিদ্‌শূন্য, ঈষৎ রক্তবর্ণ, বালুকা প্রস্তরময় মকাওম শৈল দেখিতে দেখিতে বিন্ধ্য ও সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের টেব্‌ল্‌ল্যাণ্ডের কথা মনে পড়িল। পশ্চিমদিকে কোন নগর বা পল্লী চোখে পড়িতেছে না। কেবল কৃষিক্ষেত্র। 'ফেলা'-নামক মিশরীয় কৃষক, কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ 'গালাবিয়া' পরিয়া জমি
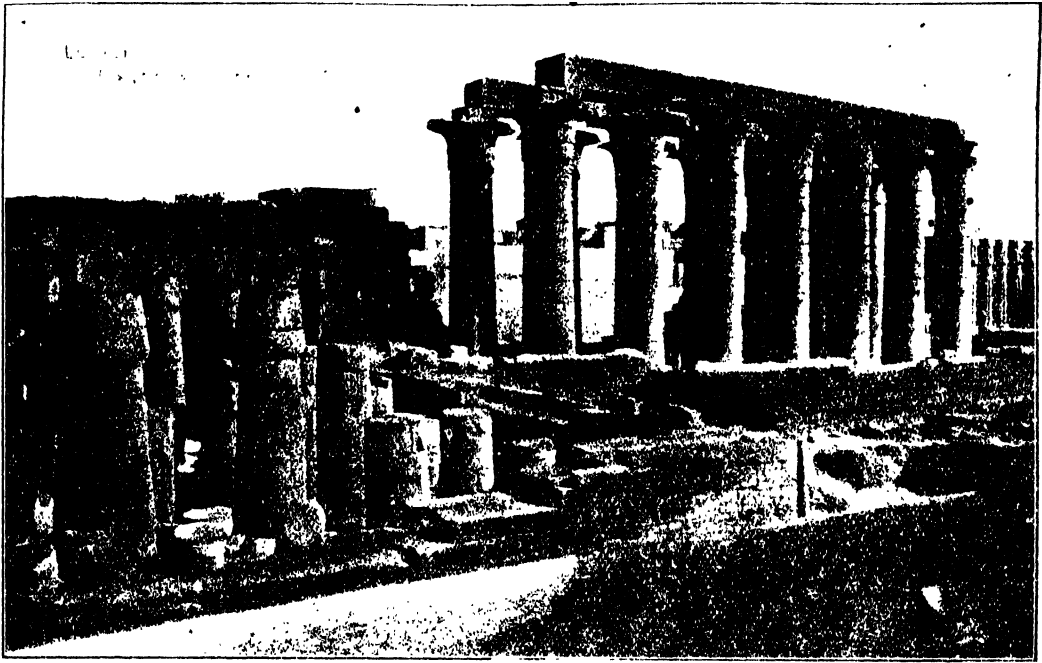
লুক্সারের মন্দির।

চষিতেছে। অদূরে গীজা পল্লীর তিনটি পিরামিড্‌। দূরবীণ দিয়া দেখিলাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরামিডের মধ্যে স্ফিঙ্কস্‌ বিরাজিত। মধ্যে মধ্যে তাল ও খেজুর বৃক্ষের সারি। এই গীজার দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম—লীবিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে প্রথম তিনটি পিরামিডের প্রায় একই সরলরেখার মাপে অন্যান্য পিরামিড্‌ অবস্থিত। প্রথমে আবুসিরের তিনটি পিরামিড্‌, পরে সাক্কারা পল্লীর পিরামিড্‌শ্রেণী।

কাইরো হইতে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে আমরা প্রাচীন মেম্‌ফিস নগরের ক্ষেত্র অতিক্রম করিলাম। এই স্থানেই আবুসির ও সাক্কারা। ভগ্ন গ্রানাইট প্রস্তরের বিক্ষিপ্ত টুকরা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাদা-মাটির পাত্র ইত্যাদি এক্ষণে প্রাচীন জনপদের সাক্ষ্য দিতেছে।

এই জনপদ মিশরীয় সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপুরাতন কেন্দ্র। উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের সঙ্গমস্থলে মেম্‌ফিস্‌-নগর অবস্থিত ছিল। মিশরের প্রথম ১১ রাজবংশের রাষ্ট্রকেন্দ্র এই অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রাজা মিনিস উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে এক রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া এই সঙ্গমস্থলে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। মেম্‌ফিস্‌ নগর দক্ষিণদিক হইতে ক্রমশঃ উত্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। সাক্কারা, আবুসির, গীজা, কাইরো, হেলিয়োপোলিস ইত্যাদি জনপদসমূহ একই নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। এইরূপে মিশরের প্রাচীনতম রাজধানী প্রায় ৪০ মাইল উত্তরে দক্ষিণে বিস্তারলাভ করিতেছিল। মধ্যযুগের মুসলমানী কাইরো-নগর ব্যাবিলনপল্লীর সীমা হইতে উত্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহম্মদ আলির আমলে আধুনিক পাশ্চাত্য ফ্যাশনের নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার ফলে আধুনিক নগর মুসলমানী সহরের উত্তরাংশ হইতে নবগঠিত হেলিয়োপোলিস-নগর পর্য্যন্ত অবস্থিত। এই হেলিয়োপোলিস নগর প্রাচীন হেলিয়োপোলিসের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে। বর্ত্তমান খেদিভের কুচ্চা বা প্রাসাদ ও উদ্যান এই নবনির্ম্মিত নগরেরই এক অংশে বিরাজিত।

গাড়ী হইতে উত্তরদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাইরো-নগরের পরিমাণ ও বিস্তৃতি এবং প্রাচীন ও আধুনিক

স্থানপরিবর্ত্তন বুঝিতে লাগিলাম। আমাদের হস্তিনাপুর ইন্দ্রপ্রস্থ, হিন্দু দিল্লী মুসলমানী দিল্লী, এবং ইংরেজের প্রস্তাবিত নূতন দিল্লী—এই সমুদয়ের অবস্থান এবং পরিবর্ত্তন কল্পনা করিতে লাগিলাম। কুতুবমিনারের শিরোদেশ হইতে ৪০।৫০ মাইল বিস্তৃত ভূমি যেরূপ প্রাচীন ও আধুনিক দিল্লীনগরের যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস-কথা বুঝাইয়া দেয়, গাড়ীতে বসিয়াও সেইরূপ মেম্ফিস—কাইরো—হেলিয়োপোলিসনগরের যুগযুগান্তরব্যাপী ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনসমূহ কল্পনা করিয়া লইলাম।

বাচক যে-সমুদয় প্রস্তর, 'মামি' এবং গৃহ ও পিরামি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রায়ই ৪০০০—২৫০০ খ্রী পূর্ব্বাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তী মিশরী যুগের শিল্প এবং কলার সাক্ষ্যও এই স্থানে পাওয়া যায় ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের পর মিশরের রাজধানী, মেম্ফিসনগ হইতে থীব্‌সনগরে স্থানান্তরিত হয়। আমরা সেই থীব্‌ নগর দেখিবার জন্যই কাইরো হইতে ৪০০ মাইল দক্ষি যাত্রা করিয়াছি। সেই জনপদের আধুনিক নাম লুক্‌সর কিন্তু থীব্‌সের অভ্যুদয়যুগেও মেম্‌ফিসের প্রভাব নিতা
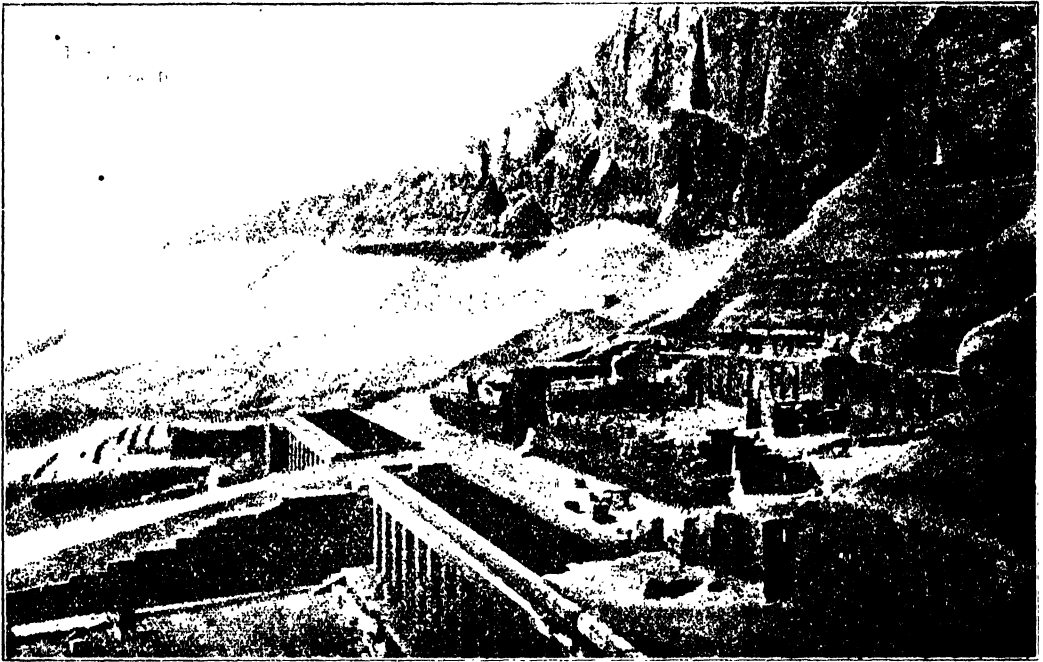
স্তর-বিন্যস্ত মন্দির।

প্রাচীন হিন্দুবৌদ্ধ গৌড়নগরের চতুঃসীমার পরিবর্ত্তনসমূহও স্মরণে আসিল। বোধ হয় এই জনপদ দিল্লী অপেক্ষাও প্রাচীন। মেম্‌ফিসের প্রতিষ্ঠাতা মিনিসের যুগ আজকাল পণ্ডিতেরা ৩৯০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ফেলিতেছেন। এমন পুরাতন স্মৃতিময় স্থান ভারতবর্ষে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই প্রাচীন নগরের জনপদে কত প্রাসাদ, কত মন্দির, কত কবর, কত পিরামিড নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? এখানে প্রাচীন স্মৃতি-

মলিন হয় নাই। থীব্‌সের নরপতিগণ মেম্‌ফিসেও স্বীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া যাইতে চেষ্টিত হইতেন। পারস্য-সম্রাট ক্যাম্বাইসিস্ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মেম্‌ফিসনগর দখল করিয়াই মিশরে রাজ্য বিস্তার করেন। পরে গ্রীক ও রোমানদিগের আমলেও মেম্‌ফিসের গৌরব লুপ্ত হয় নাই। এমন কি মুসলমানেরা যখন সপ্তম শতাব্দীতে মিশর জয় করেন তখনও মেম্‌ফিসের প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি সবই বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা এই নগর পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তরে ব্যাবিলনের নিকটে
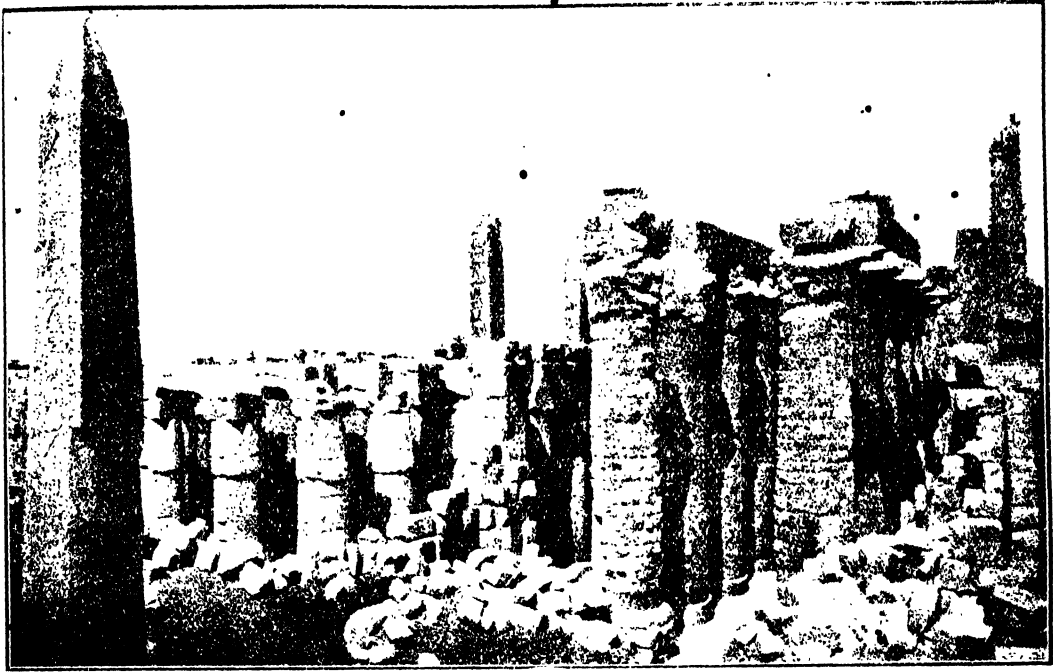
য়ামেন-মন্দিরের এক অংশ।

নূতন নগর আরম্ভ করেন। এই নগর নির্ম্মাণের জন্য তাঁহারা প্রাচীন মেম্‌ফিস হইতে স্তম্ভ, প্রস্তর, ইত্যাদি লইয়া আসিতেন। এই উপায়েই খলিফা ওমারের মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবদুল লতিফের সময়েও মেম্‌ফিসের ধ্বংসাবশেষ কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান ছিল। তাহার পর হইতে সবই লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে কেবলমাত্র সাক্কারা ও আবুসিরের পিরামিড্‌, এবং অন্যান্য কবরের স্থান বর্ত্তমান।

অন্যান্য কবরের মধ্যে মেম্‌ফিস নগরের অধিষ্ঠাতৃ-দেব "তা" (Ptah) এবং তাঁহার বাহন বৃষের কবরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। মেম্‌ফিসের গৌরবযুগে তা-দেব সমগ্র মিশরে পূজা পাইতেন। পরে থীব্‌সের অভ্যুদয়-কালে সেই জনপদের দেবতা য়ামেনের প্রতিপত্তি তা-দেবের ক্ষমতা লুপ্ত করিয়াছিল। কিন্তু দুই নগরের দেবতত্ত্ব এবং ধর্ম্মতত্ত্বই হেলিয়োপোলিসের সূর্য্যদেব, সূর্য্যমন্দির, এবং তাহার পূজারী অধ্যাপকগণের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। কি তা-দেব, কি থীবসের য়ামেন-দেব উভয়ই সূর্য্যদেবের ক্ষমতার দ্বারা পরি-চালিত হইতেন। হেলিয়োপোলিস প্রাচীন মিশরের ধর্ম্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই সূর্য্যনগরের পুরোহিত ও অধ্যাপকগণ চিরকালই মিশরবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইয়া আসিয়াছেন। মেম্‌ফিস এবং থীব্‌সের প্রবল-প্রতাপ নরপতিগণও ইহাদের প্রভাব পুরাপুরি অতিক্রম করিয়া স্বীয় জনপদের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে সূর্য্যপূজা-তত্ত্বের অনেক কথা তা-তত্ত্বের এবং য়ামেন-তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইয়াছিল। সূর্য্যপূজক অধ্যাপকগণও এই-সকল রাজবংশের উপর অসামান্য ক্ষমতা বিস্তার করিতেন।

পৃথিবীর এই সর্ব্বপুরাতন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মিশরে আমাদের দুই সপ্তাহমাত্র আয়ু। কাজেই মেম্‌ফিসের কাহিনী গাইডের মুখে ও পুস্তকের সাহায্যে জানিয়া লইলাম। এখানকার মন্দির ও কবরগাত্রে নানাপ্রকার চিত্র আছে। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ-বিহার-চৈত্য-স্তূপসমূহে যেরূপ দৃশ্য ও অভিনয় দেখা যায়, এখানকার মস্তাবা ও রাজকবরাদিতে সেইরূপ প্রাচীন-চিত্র রহিয়াছে। এইগুলি

দেখিয়া প্রাচীন মিশরের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাষ্ট্রশাসন ইত্যাদি সকল বিষয়ই অবগত হওয়া যায়। ভারহুত ও সাঁচিস্তূপগাত্রে খোদিত চিত্রের সাহায্যে বৌদ্ধ-ভারতের সকল বৃত্তান্তই আমরা জানিতে পারি।

সাক্কারায় প্রাচীন রাজকর্ম্মচারী বা জমিদারগণের কয়েকটা কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলিকে "মস্তাবা" বলে। এই মস্তাবার গাত্রে যে-সমুদয় কাহিনী চিত্রিত রহিয়াছে তাহার কয়েকটা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। কোথায়ওবা আফিসের কর্ম্মচারী ও কেরাণীরা বসিয় খাতাপত্র লিখিতেছে। কোন চিত্রে গোশালা, গোদোহন লাঙ্গল-চালান, গোচারণ, মাছধরা, ইত্যাদি দেখা যায় কোথাও অনেক গাভীর দলকে নদী পার করান হইতেছে কৃষকপত্নীরা মাথায় করিয়া নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার লইয় যাইতেছে—এরূপ চিত্রও বিরল নয়। মাথার চুপড়ীগুলি দেখিয়া বুঝা যায় মাছমাংস, শাকশব্জী, ফলমূল, পাখী পানীয় ইত্যাদি বহুপ্রকার খাদ্যদ্রব্য দেবতার জন্য আনীত হইতেছে। রাস্তায় বাহকদিগের সারি দেখিয়া আধুনিক
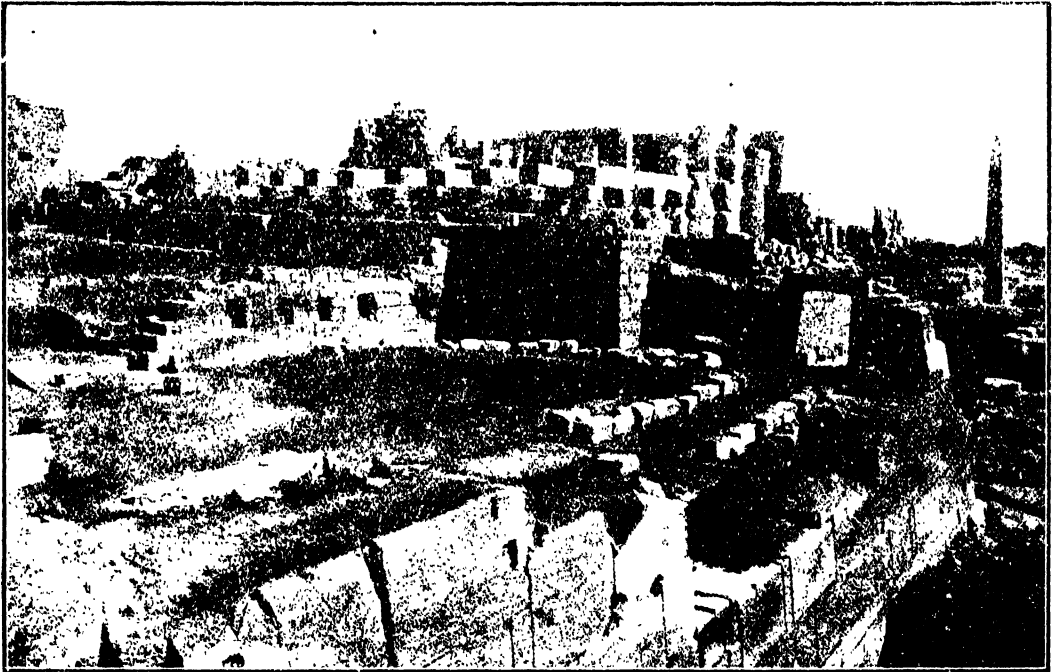
য়্যামন-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

কোন স্থানে একটি জাহাজ সমুদ্র বাহিয়া যাইতেছে। কোথায়ওবা মিশর-রমণীরা শস্য ঝাড়িতেছে। কোন চিত্রে প্রাচীনকালের শস্যরোপণ- ও শস্যকর্ত্তনপ্রণালী দেখিতে পাই। এক এক অংশে দেখা যায় বহু সূত্রধর সমবেত হইয়া কাঠ চিরিতেছে, এবং জাহাজ তৈয়ারী করিতেছে। চিত্রগুলি জীবন্ত বোধ হয়, যেন আমাদের সম্মুখে বসিয়া কারিগরেরা হাতিয়ার চালাইতেছে। কোন স্থলে রাষ্ট্রশাসনের এক চিত্র দেখিতে পাই, সাক্ষ্য দিবার জন্য পল্লীর প্রবীণ ব্যক্তিরা বিচারালয়ে আসিয়াছে। কলিকাতায় "বিবাহের তত্ত্ব" পাঠাইবার দৃশ্য মনে আসে। এই-সকল চিত্র দেখিলে মনে হয়—৫০০০।৬০০০ বৎসর পূর্ব্বেও মানবজাতি তাহার আধুনিক বংশধরগণের ন্যায়ই ছিল, তাহাদের জীবন-যাত্রায় আর আজকালকার জীবন-যাত্রায় বড় বেশী প্রভেদ নাই। খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা, লেনদেন, সকল বিষয়েই প্রাচীন মিশর-বাসীরা আধুনিক লোকসমাজের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত। ভারতবর্ষের আধুনিক ও প্রাচীন গোচারণ, কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, রাষ্ট্রকার্য্যপরিচালন, ইত্যাদি অনেক অনুষ্ঠানেই
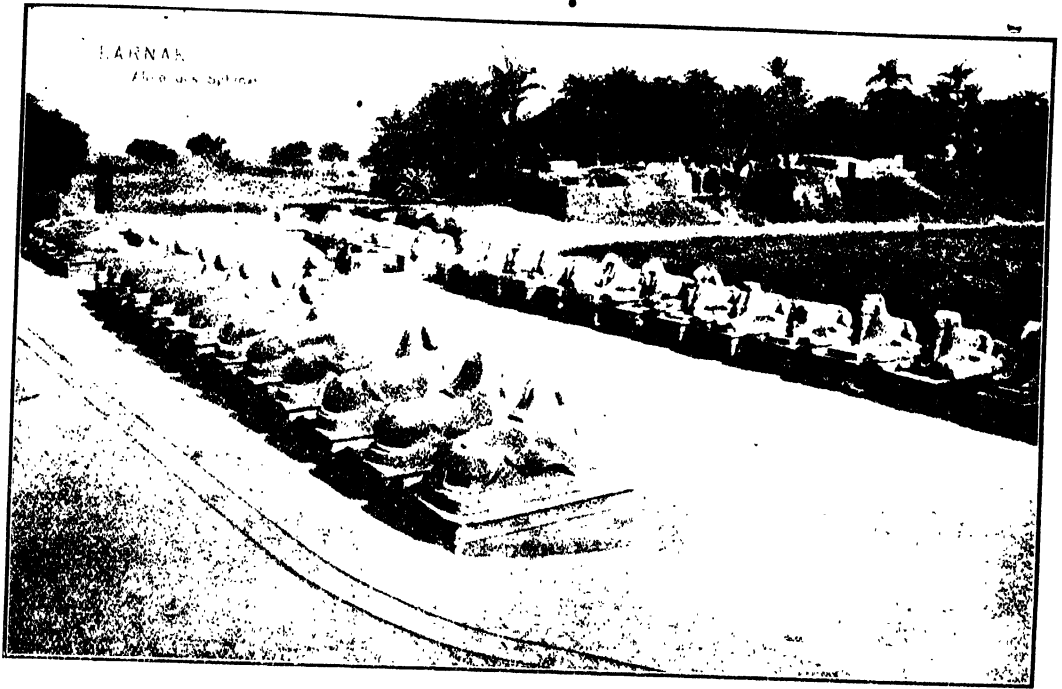
কার্ণাক—য়্যামন মন্দিরের প্রবেশপথে স্ফিঙ্কস্।

প্রাচীন মিশরের জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখিতে পাই। মিশরে ও হিন্দুস্থানে একই আদর্শের চরিত্রগঠন, একই ছাঁচের সমাজগঠন, একই ধরণের জীবন-গঠন হইয়াছিল কি? হিন্দু ও মিশরীয়েরা কি একই নিয়মে বিশ্বে বসতি করিয়াছিল? এই-সকল প্রশ্নের আলোচনা এখনও হয় নাই।

মেম্‌ফিসের ধ্বংসাবশেষগুলি ছাড়াইয়া নাইলকে বামে রাখিয়া সোজা দক্ষিণে চলিলাম। সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে যতদুর দেখা যায় সেই এক দৃশ্যই দেখিতেছি। সেই লীবিয়া ও মকাওমের শৈলশ্রেণী, সেই তাল ও খেজুর বৃক্ষের সারি, সেই তুলা গোধুম শব্জীর কৃষিভূমি, সেই নাইলনদ ও সেই নাইলনদের খালসমূহ। মধ্যে মধ্যে নগর ও পল্লী। তাহাও সেই এক ছাঁচে গড়া। চতুষ্কোণ, বারান্দাহীন, হাওয়াহীন, মসজিদতুল্য অট্টালিকা। চালার ঘর বা টালির ঘর একখানাও দেখি না—নগরের গৃহসমূহ সবই প্রস্তরনির্ম্মিত বোধ হয়—পল্লীর গৃহগুলি রৌদ্রে-শুকান নাইল-মৃত্তিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে গঠিত। মিশরের উত্তর হইতে দক্ষিণসীমাপর্য্যন্ত এই এক দৃশ্য, এক প্রকৃতি, এক বাড়ীঘর, এক চাষ আবাদ। কোথাও কোন বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা নাই। একটি পল্লী দেখিলেই সকল পল্লী দেখা হইল, একটি নগর দেখিলেই সকল নগর দেখা হয়। কোন একস্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা বুঝিলেই সমস্ত মিশরদেশের জলবায়ু, মাঠঘাট, বুঝা হইয়া যায়। মিশরের বাহ্য প্রকৃতি নিতান্তই একটানা একঘেয়ে।

কেবল কি বাহ্যপ্রকৃতিই বৈচিত্র্যহীন? তাহা নহে। মিশরের যেদিকে তাকাই সেই-দিকেই একঘেয়ে একটানা বৈচিত্র্যহীনতার পরিচয়। আধুনিক মিশরীয় জীবনের কথাই ধরা যাউক। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইব—গ্রীক্, ইতালীয়, ফরাসী, জার্ম্মান, আমেরিকান, ইংরেজ, আর্ম্মিনিয়ান, ইহুদী ইত্যাদি অসংখ্য বিদেশীয় জাতি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য যত্নবান্। মিশরের মুসলমান সর্ব্বত্রই হতপ্রভ ও হীনবীর্য্য। মুসলমান-সমাজের উপরে পাশ্চাত্য ও বিদেশীয় সমাজের একটা স্তর বেশ শক্ত ও দৃঢ়ভাবে বসিয়া গিয়াছে।

এই পাশ্চাত্য স্তরবিন্যাস কৃষিতে দেখিতে পাই, শিল্পে দেখিতে পাই, বাণিজ্যে দেখিতে পাই, শিক্ষায় দেখিতে

পাই। কোথায়ও যেন মিশরবাসীর স্বদেশী জীবন নাই। বাড়ীঘর, আদবকায়দা, লেখাপড়া, ব্যাঙ্ক, কৃষি, চিনির কল, ময়দার কল, ইস্কুলকলেজ, সংবাদপত্র, রাষ্ট্র-পরিচালনা—কোন দিকেই মিশরীয়কে প্রথম স্থানে দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য ও বিদেশীয় সমাজ মিশরের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। মিশরের উত্তরে দক্ষিণে এই পাশ্চাত্য প্রভাবের একটানা দৃশ্য দেখিতে পাই। সকল নগরে ও পল্লীতে একঘেয়ে একটানা বিদেশীয় প্রভাব। স্তরবিন্যাস যুগপৎ দেখিতেছি। এই জন্যই বলিতেছিলাম, একটি নগর দেখিলেই সকল নগর দেখা হয়।

তাহার পর প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ, হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও অট্টালিকাবলী। এগুলিও মিশরের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। কোন স্থানই পুরাকাহিনীশূন্য নয়—কোন জনপদই প্রাচীনস্মৃতিহীন নয়। সর্ব্বত্রই 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' স্থান—পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি।
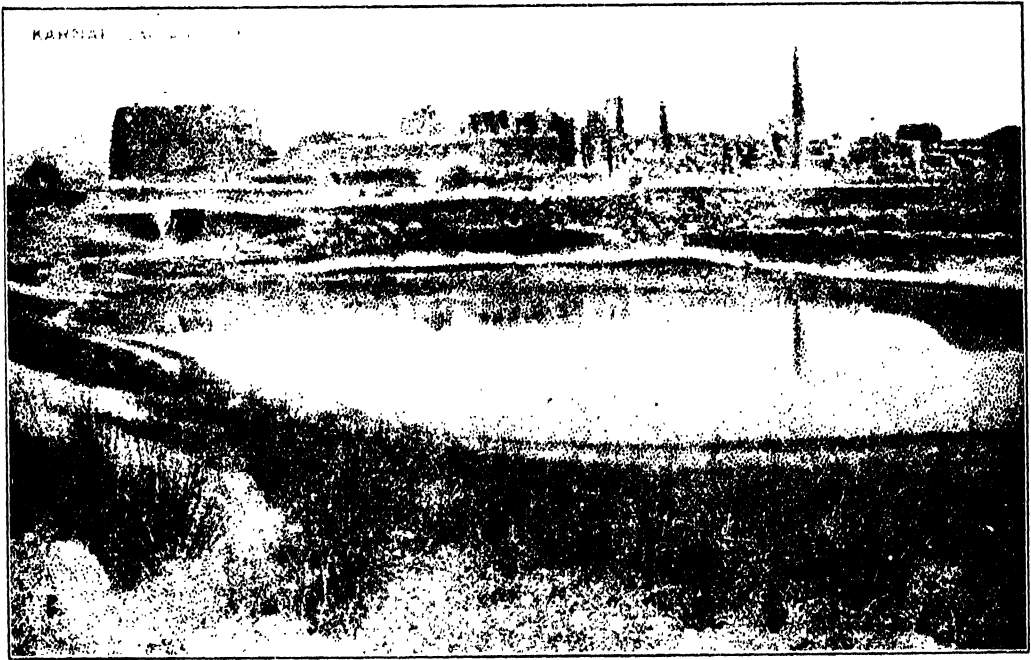
আমন-পুরোহিতগণের সরোবর।

গৃহরচনার প্রণালীতে এই বিদেশীয় স্তরবিন্যাস বেশ বুঝা যায়। পোর্ট সৈয়দ হইতে যতদূর দক্ষিণেই যাই না কেন কাইরো-নগরের সৌধ-নির্ম্মাণ-রীতি দেখিতেছি। মুসলমানী মসজিদতুল্য চতুষ্কোণ হর্ম্ম্যাবলীর উপর গ্রীকো-রোমান, গথিক, বাইজেন্টাইন, তুরকী, ওলন্দাজ, ফরাসী ইত্যাদি নানাবিধ বিদেশীয় কায়দার অলঙ্কার ও স্তম্ভ, বারান্দা, ব্যাল্কনি ইত্যাদি। একঘেয়ে মুসলমানী কায়দার নিম্নস্তর—তাহার উপর এই ইউরোপীয় কায়দার প্রভাব। যে পল্লী বা যে নগরেই যাই—এই উভয়বিধ

প্রথমতঃ মধ্যযুগের পুরাকীর্ত্তি। এগুলি মুসলমান অধিকারের যুগ, খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব্ধ হইয়াছে। মহম্মদ আলির আমল পর্য্যন্ত ১০০০।১১০০ বৎসর কাল এই যুগ চলিয়াছে। এই সময়ের মসজিদ, গম্বুজ, মিনার, মসলিয়াম, কবর ইত্যাদিতে সমস্ত মিশরদেশ পরিপূর্ণ। এই-সমুদয়ের মধ্যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক ও রোমীয় যুগের কীর্ত্তিও মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ মুসলমানী শিল্পে গ্রীকো-রোমান কায়দার প্রভাব লক্ষ্য করিতে বেশী সময় লাগে না। এইরূপ

মুসলমানী সৌধমালার দ্বারা সমগ্র মিশর-রাজ্যে একটানা একঘেয়ে দৃশ্যও কম সৃষ্ট হয় নাই।

তারপর প্রাচীনতম যুগের কথা—৫০০০ বৎসর পূর্ব্বেকার কাহিনী। তাহাতে মিশরের সর্ব্বনিম্ন স্তর রচনা করিয়াছে। তাহার স্মৃতি মধ্যযুগের এবং আধুনিক মিশরের সকল কাজকর্ম্মের সঙ্গে ন্যূনাধিক বিজড়িত। তাহা আর এক্ষণে সজীব নাই—তাহার আদর্শে আর আধুনিক মিশরবাসীর জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় না। সে ধর্ম্ম, সে চিত্রকলা, সে ভাস্কর্য্য, সে কবর, সে 'ফ্যারাও' সম্রাট আর নাই। কিন্তু পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয়ের পাদদেশে নাইলনদের কিঞ্চিৎ দূরে সেই যুগের স্মৃতিচিহ্ন উত্তর-দক্ষিণে অসংখ্য রহিয়াছে। পিরামিড্, ওবেলিস্ক, মস্তাবা, মন্দির, প্রাচীর ইত্যাদিতে মিশরদেশ পরিপূর্ণ। এইজন্য থীব্‌স্ দেখিলেই মেম্‌ফিস দেখা হইল, মেম্‌ফিস দেখিলেই থীব্‌স্ দেখা হইল।

দক্ষিণ মিশরকে উচ্চতর মিশর বলে। উত্তর মিশরকে নিম্নতর মিশর বা বদ্বীপ বলে। মিশর রাজ্যের এই দুই বিভাগ ৬০০০ বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী মিশরদেশকে এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। আধুনিক কাইরো ও হেলিয়োপোলিস-নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান এই দুই বিভাগের সঙ্গমস্থল। প্রাচীন মেম্‌ফিস—ব্যাবিলন—সূর্য্যনগরও এই সঙ্গমস্থলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আমরা সাক্কারা ছাড়াইয়া উচ্চতর মিশরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিবার নূতন কিছুই আর নাই। এই অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ প্রধান—উত্তর অঞ্চলে বা বদ্বীপে তুলার চাষ প্রধান, এই যা প্রভেদ। এই অঞ্চলে কতকগুলি চিনির কল আছে। পূর্ব্বে এই-সমুদয় খেদিভের সম্পত্তি ছিল; এক্ষণে সবই বিদেশীয় বণিকগণের সম্পত্তি। স্থানে স্থানে বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের সাহায্যে চাষ হইতেছে—মাঝে মাঝে দুইএকটা বাজার দেখিতে পাইলাম। এইগুলি দেখিতে ভারতবর্ষের হাটবাজারের ন্যায়। বাজারের দুইএকটিমাত্র আবৃত স্থান। প্রায়ই অনাবৃত—'ফেলা'-রমণীরা কেনাবেচা করিতেছে। পুরুষের সংখ্যা কম।

এই অঞ্চলে মিনিয়া একটি প্রধান নগর। এখানে বড় বড় জমিদারগণের সম্পত্তি আছে। কাহারও কাহারও আয় প্রায় দেড় কোটি টাকা। এই জমিদারেরা পূর্ব্বে স্বদেশী ভাবে জীবনযাপন করিতেন। এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রভাবে চরিত্রহীন, নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন।

লুক্‌সারের পথে আর-একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পাইলাম। প্রাচীন য়্যাবাইডস্-নগরের ধ্বংসাবশেষ এখানে রহিয়াছে। আধুনিক জনপদের নাম বালিয়ানা। এইখানে আসিরিস দেবের মন্দির সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। খননকার্য্য এখনও চলিতেছে। পণ্ডিতেরা আশা করেন আসিরিস দেবের কবর ও মামি তাঁহারা খুঁজিয়া পাইবেন।

কাইরোর নিকটেই একবার নাইল পার হইয়াছি। নাগা হাম্মাদি ষ্টেসনে আর একবার নাইল পার হইলাম। অনতিবিলম্বে প্রাচীন থীব্‌স্-রাজধানীর অবস্থানক্ষেত্র লুক্‌সরে আসিয়া পৌঁছিলাম। লুক্‌সর নাইলের পূর্ব্বতীরে কাইরো-নগরের কূলে। আমরা সকাল ৮॥ টায় কাইরো ছাড়িয়াছিলাম। রাত্রি ১১টায় লুক্‌সরে উপস্থিত হইলাম। কাইরোর একজন গুজরাটী হিন্দু দোকানদার আমাদিগকে স্বদেশী খাদ্য দিয়াছিলেন। বেলে চাপাটি রুটি, তরকারী, আলুভাজা ইত্যাদি খাইতে খাইতে আসিয়াছি। নাইল-নদের উপরেই—পূর্ব্বকূলে আমাদের হোটেল। এখান হইতে পশ্চিমকূলের সমতলভূমি ও পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায়।

পঞ্চম দিবস—য়্যামন-দেবের নগর, কার্ণাক

আমাদের হোটেল লুক্‌সরের মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে। আমরা প্রথমেই কার্ণাক দেখিতে গেলাম। হোটেল হইতে নদীর ধারে সোজা উত্তর দিকে যাইতে হইল। পূর্ব্বে লুক্‌সরের মন্দির হইতে কার্ণাকের মন্দির পর্য্যন্ত দুইসারি স্ফিঙ্কস প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে কেবলমাত্র তাহাদের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

আমরা 'খন্‌স্' বা চন্দ্রদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই "পাইলন" বা ফটক। ফটক টলেমির নির্ম্মিত। হেলিয়োপোলিসের ওবেলিস্কের ন্যায় ইহা উচ্চ
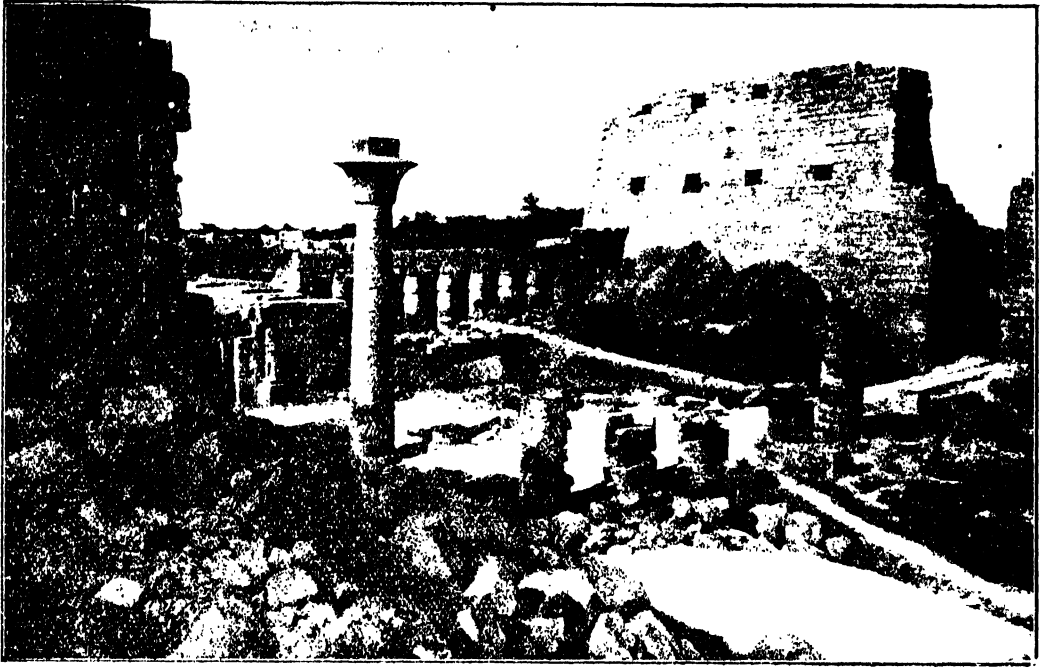
কার্ণাকের ধ্বংসস্তূপ।

—দেখিতেও ইহা সেইরূপ। নিম্নে প্রশস্ত, শিরোভাগ সঙ্কীর্ণতর। ফটকের দুইপার্শ্ব হায়েরোগ্লিফিক লিপিদ্বারা উৎকীর্ণ। গাত্রে টলেমির চিত্র। নানা থীবস্-দেবতার নিকট তিনি প্রার্থনা করিতেছেন। দক্ষিণ ও উত্তর উভয়দিকেই একপ্রকার শিল্প ও চিত্র। উত্তরে ও দক্ষিণে ফটকের উপরিভাগে পক্ষযুক্ত সূর্য্যমূর্ত্তি। এই ফটকে টলেমি তাঁহার স্বদেশীয় গ্রীকো-রোমান পোষাকে ভূষিত।

এই ফটক হইতে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্ফিঙ্কসের গলির ভিতর দিয়া প্রাচীনতর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এই মন্দির উত্তরে দক্ষিণে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে প্রবেশদ্বার। এই দ্বারের গাত্রে সম্রাট্ রাম্‌সেস নানাভাবে চিত্রিত। 'রা' এবং অন্যান্য মিশরীয় দেবগণের উদ্দেশ্যে তিনি লতা-পাতা, পদ্ম এবং অন্যান্য উপহারদ্রব্য প্রদান করিতেছেন।

এই প্রবেশদ্বারের পর উত্তরদিকে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের উভয়দিকে স্তম্ভশ্রেণী। এক একদিকে ১২টা স্তম্ভ। স্তম্ভগুলি 'প্যাপিরাস' নামক নলতরুর চিত্রসংযুক্ত। স্তম্ভ-গাত্রে এবং প্রাচীরে ও ছাদে নানাপ্রকার লিপি ও চিত্র। রামসেস দেবতাগণকে পূজা করিতেছেন—এইরূপ বুঝা যায়। প্রাঙ্গণের পার্শ্বে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরজা—এইগুলি দিয়া পুরোহিতেরা সমীপবর্ত্তী সরোবরে স্নান করিতে যাইতেন।

প্রাঙ্গণ হইতে একটি ক্ষুদ্রতর গৃহে প্রবেশ করা গেল। ইহাতেও সর্ব্বসমেত ১২টা স্তম্ভ। তাহার পর আর একটা গৃহ—তাহাতে দুই পার্শ্বে দুইটা করিয়া স্তম্ভ এবং তাহার পার্শ্বে কিছু কম উচ্চ স্তম্ভদ্বয়। সর্ব্বসমেত ৮টা স্তম্ভ। স্তম্ভগুলি দেখিতে একপ্রকার। স্তম্ভের শিরোভাগে চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ড।

এই গৃহের পর মন্দিরের প্রধান অংশ। তাহার উত্তরপার্শ্বে কয়েকটা অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহ।

মন্দির সর্ব্বাংশে প্রস্তর-নির্ম্মিত—সাধারণ লাইমষ্টোন প্রস্তর আরব্য মকাওম পর্ব্বত হইতে আনীত হইত। মন্দিরের ছাদে কোন শিখর বা গম্বুজাদি কিছুই নাই। সাধারণ গৃহছাদের ন্যায় সমতল। কোন খিলান কোথাও নাই। আগাগোড়া সুচিত্রিত। মিশরীয় ধর্ম্মতত্ত্বের নানা কথা এই চিত্রে বুঝান হইয়াছে। যে রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার নাম এবং মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পূজা, আরাধনা, যজ্ঞ, দান ইত্যাদি ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানও প্রাচীরগাত্রে এবং ভিতরকার ছাদে উল্লিখিত। নৌকার ভিতর দেবতা বসিয়া আছেন। এবং রাজা তাঁহাকে ভক্তিভরে পূজা করিতেছেন—এই দৃশ্য অতি সাধারণ। পক্ষযুক্ত সূর্য্যমূর্ত্তিও ফটকমাত্রের উপরিভাগে দেখিতে পাইলাম।

মন্দির-নির্ম্মাণকৌশলে কিছু কিছু হিন্দু দেবালয় নির্ম্মাণের রীতি মনে পড়ে। ফটক, প্রাঙ্গণ, স্তম্ভ, ভোগ-মন্দির, পার্শ্বগৃহ, প্রধানমন্দির—ইত্যাদি ভারতীয় মন্দিরের নানা অঙ্গ। জগন্নাথের মন্দির, কালীঘাটের মন্দির, কামাখ্যার মন্দির, বিশ্বেশ্বরের মন্দির ইত্যাদির সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে প্রাচীন থীব্‌সের দেবমন্দিরসমূহের তুলনা করা চলে।

মন্দিরের শেষভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে একটা দরজা ছিল। ইহার ভিতর দিয়া নিকটবর্ত্তী য়্যামনদেবের মন্দিরে যাওয়া যাইত। এই দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে তাকাইয়া দেখিলাম। 'খন্‌স' মন্দিরের ভিতরকার অংশ সমস্ত একেবারে দেখা গেল। বিরাট স্তম্ভসমূহই ইহার বিশেষত্ব, এবং সর্ব্বসমেত পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন গৃহ বা প্রাঙ্গণের সমবায়ে মন্দির রচিত। ভিতরকার গৃহে অর্থাৎ প্রধান মন্দিরে কোন স্তম্ভ নাই—ইহা চতুষ্কোণ। ইহার চারিদিক সমান। দুই পার্শ্বে বারান্দার ন্যায় পার্শ্বগৃহ আছে। ভিতরকার পথ অন্যান্য গৃহের ভিতরকার সমান বিস্তৃত। এই গৃহের কোন্ স্থানে দেবতার পীঠ ছিল বুঝা যায় না।

কোন কোন প্রাচীরে ও স্তম্ভে দেখিলাম গ্রানাইট প্রস্তরের কার্য্য। প্রাচীন মিশরবাসীরা আসোয়ান পর্ব্বত হইতে এই পাথর আনাইত।

প্রধান মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণ-গৃহে যে চারিটা স্তম্ভ দুইপার্শ্বে দেখা যায় তাহার গঠনকৌশল কিছু নূতন। স্তম্ভের পাদদেশ পদ্মফুলের পাপ্‌ড়িযুক্ত এবং শিরোদেশ পুষ্পের সর্ব্বোপরিস্থ আবরণের আকৃতিবিশিষ্ট।

চন্দ্রমন্দির দেখিয়া জগদ্বিখ্যাত য়্যামন-মন্দিরে গেলাম। এই মন্দির নাইলের পূর্ব্ব কিনারায় অবস্থিত, নদী হইতে উঠিয়াছে বলা যায়। পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব-দিকে ইহার বিস্তৃতি। নাইল হইতে উঠিবার পথে প্রথমেই দুই সারি স্ফিঙ্কস্ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সারিতে ২০টা করিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত মেষ উচ্চ প্রস্তরমঞ্চের উপর উপবিষ্ট। এগুলি এখনও নষ্ট হয় নাই, পূর্ব্বেকার মতই সজীব সতেজ আছে।

এই স্ফিঙ্কস্ শ্রেণীদ্বয়ের শেষসীমার নিকটে খানিকটা বাঁধান প্রাঙ্গণ। তাহার পাদদেশে ভূমিগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গ দিয়া নাইলের জল মন্দিরের চরণতল ধৌত করিত। এই স্থান হইতে পশ্চিমে নাইলের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া সমস্ত মন্দিরের বিস্তৃতি ও আয়তন দেখিয়া লইলাম। সম্মুখেই অত্যুচ্চ ফটক বা "পাইলন।" মাদুরার এবং দাক্ষিণভারতের "গোপুরম্-" গুলির ন্যায় এই পাইলনের গাম্ভীর্য্য ও উচ্চতা চিত্তে অভিনব জগতের বার্ত্তা আনিয়া দেয়। হেলিয়ো-পোলিসের ওবেলিস্ক এবং চন্দ্রমন্দিরের ফটক ইহার তুলনায় বামন মাত্র। কি স্থূলতা, কি বিশালতা, কি দৃঢ়তা, কি উচ্চতা, সকল বিষয়েই য়্যামনদেবমন্দিরের ফটক হৃদয়কে বিস্ময়াপ্লুত করে। ধীরে ধীরে স্ফিঙ্কসের সারির মধ্যকার গলির ভিতর দিয়া ফটকের নিম্নে আসিলাম। তাহার পর উন্মুক্ত বিশাল প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলাম। প্রাঙ্গণের সম্মুখে, পার্শ্বে, সর্ব্বত্র বিরাট ও বিপুল স্থাপত্য এবং বাস্তুবিদ্যার নিদর্শন। নানা স্তম্ভে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটাই একএকটা মিনার ওবেলিস্ক বা শিখরের তুল্য গরীয়ান্।

প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়া উত্তর দিকের দরজার নিম্নে আসিলাম। ঊর্দ্ধে তাকাইয়া দেখি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডে দরজার ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন খিলান বা কাষ্ঠা-শ্রয় নাই। ২০ ফুট আন্দাজ বিস্তৃত দরজা একখণ্ড শিলার দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। এই দরজা দিয়া মন্দিরের উপরে উঠিলাম। সেখান হইতে মন্দিরের যে দৃশ্য দেখা গেল জগতে আর কোথাও তাহা দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। সর্ব্বত্র অসীম অনন্ত শিল্পকার্য্যের সাক্ষীস্বরূপ অসংখ্য বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে। সুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে মানব-সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনগুলি স্তূপীকৃত ধ্বংসাকারে অথবা অর্দ্ধপরিষ্কৃত অবস্থায় দেখা যাইতেছে। কোথাও

ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা, হীনতা, পঙ্গুতা, দুর্ব্বলতার চিহ্ন মাত্র নাই। প্রবল রাষ্ট্রশক্তি, প্রবল ধনশক্তি, বিরাট অতুল ঐশ্বর্য্য, অগণিত শ্রমজীবীকুল, কর্ম্মকুশল স্থপতি ও ভাস্কর, ধর্ম্মভাবের ও ভক্তিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা—এই-সকল কথাই সেই উর্দ্ধস্থান হইতে কল্পনা ও ধারণা করিতে লাগিলাম। এখানে মিশরীয়দিগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং কলা-নৈপুণ্যের কথা চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। তাহাদের বিপুল বিস্তৃত অধ্যবসায়, জগদ্ব্যাপী সাধনা এবং অসাম ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাইয়াই স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। মানব-শিল্পের এরূপ বিরাট্ কাণ্ড জগতের কোন এক স্থানে পুঞ্জীকৃত ভাবে আর কখনও দেখিতে পাইব কি ?
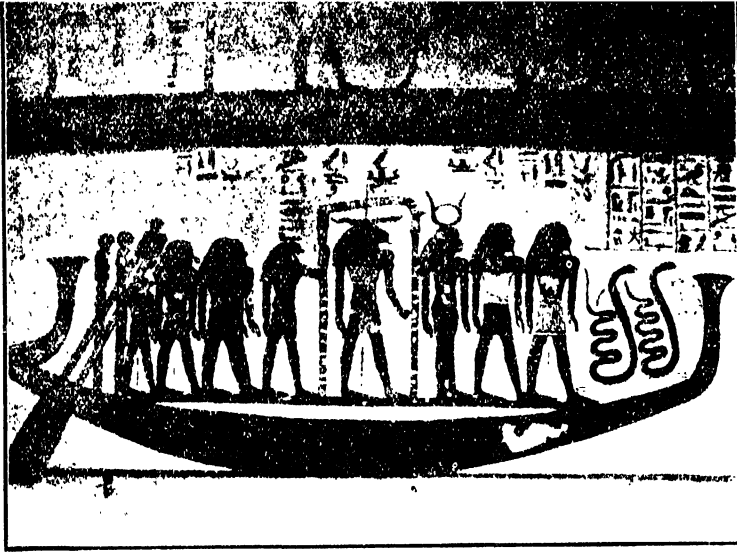
পর্ব্বতকন্দরস্থিত কবরের প্রাচীর চিত্র।

প্রথমে পশ্চিম দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। দেখা গেল—নিম্নে স্ফিঙ্কসের সারি গঠিত গলি এবং পুরাতন রোমীয় ইষ্টকের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীরের স্তূপ। তারপর খেজুর বৃক্ষের কুঞ্জ এবং কৃষিভূমি। তাহার পাদদেশে নৌকা-শোভিত নাইল নদ। অপর পারে আবার চাষ আবাদ—শেষে আফ্রিকার লীবিয় পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গাবলী।

উত্তর দিকে দেখিলাম—সম্মুখে পুরাতন মন্দির ও নগর বা পল্লীসমূহের ধ্বংসীভূত স্তূপীকৃত ইষ্টক ও আবর্জ্জনারাশি। প্রাচীন দেওয়ালের উপকরণসমূহও যথাস্থানে দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ন্যায় দেখাইতেছে। কোন মন্দিরে প্রবেশ করিবার পথস্বরূপ একটা ফটক বা 'পাইলন'। পরে অসংখ্য উদ্ভিদ্‌রাজি—খেজুর বৃক্ষের বন।

পূর্ব্বদিকে দেখা গেল—ভগ্নস্তূপ ও পুরাতন প্রাচীর, বৃক্ষরাজি এবং কৃষিক্ষেত্র। বহুদূরে মকাওম পর্ব্বতের ধূসর প্রস্তর বালুকার ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে।

সর্ব্বশেষে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। পুরাতন প্রাচীরের চিহ্ন সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ইষ্টক এবং আবর্জ্জনার স্তূপের ত অন্ত নাই। সম্মুখেই চন্দ্র-মন্দির। তৎপার্শ্বে খেজুর বন। পরে শ্যামল বৃক্ষরাশির অভ্যন্তরে লুক্‌সর-নগরের হর্ম্ম্যাবলী।

সমস্ত মন্দির এবং চারিদিককার আবেষ্টন এক দৃষ্টিতে দেখিয়া সমগ্র অট্টালিকার আয়তন ও পরিমাপের সম্যক ধারণা জন্মিল। একটা প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ ক্ষেত্র। প্রত্যেক ভুজ প্রায় ½ মাইল লম্বা। প্রথমে বৃক্ষশ্রেণীর চতুর্ভুজ—পরে রোমীয় ইষ্টকের প্রাচীরনির্ম্মিত চতুর্ভুজ। তাহার ভিতর য়্যামন-মন্দির বা য়্যামন-নগর। ইহাকেই গ্রীকেরা শতদ্বারবিশিষ্ট নগররূপে জানিত। দক্ষিণ দিকের চন্দ্রমন্দিরের ন্যায় উত্তরে এবং পশ্চিমেও দুইটি মন্দির, বোধ হয় এই আবেষ্টনেরই অন্তর্গত ছিল।

চতুঃসীমা দেখিয়া মন্দিরের ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। সেই উচ্চ স্থান হইতে দেখা গেল—পাদদেশে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। এত বড় প্রাঙ্গণে বোধ হয় দিল্লীর সমস্ত জুম্মা মসজিদ অবস্থিত হইতে পারে। প্রাঙ্গণের দুই ধারে বারান্দা। বারান্দার সম্মুখে স্তম্ভরাশি। স্তম্ভগুলির শিরোভাগে চতুষ্কোণ প্রস্তরফলক। স্তম্ভশ্রেণীর সম্মুখে স্ফিংক্সের সারি। প্রাঙ্গণের ভিতরে পূর্ব্বে-পশ্চিমে দণ্ডায়মান স্তম্ভসমূহ, তাহাদের কয়েকটি মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান। এইগুলির শিরোদেশ পুষ্পের সর্ব্বোপরিস্থ আবরণের আকৃতিবিশিষ্ট।

প্রাঙ্গণের পর গৃহ—গৃহের ভিতর বহুস্তম্ভ। সেই উর্দ্ধভূমি হইতে বেশী দেখা গেল না। তাহার পূর্ব্বে একটি ওবেলিস্ক দেখিতে পাইলাম। ঐ স্থানে একটা নিম্নতর ওবেলিস্কও আছে। তাহা দেখা গেল না। সমস্ত মন্দির পূর্ব্বে-পশ্চিমে বিস্তৃত; চন্দ্র-মন্দির উত্তরে-দক্ষিণে বিস্তৃত। প্রাচীন মিশরের মন্দিরগুলি সমচতুর্ভুজ নয়—চৌড়া অপেক্ষা লম্বায় বড়। য্যামন-মন্দিরের কুত্রাপি শিখর বা গম্বুজ দেখিতে পাইলাম না।

প্রাঙ্গণের ভিতরে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আর একটা মন্দির। এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। চন্দ্র-মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরটি পঞ্চগৃহবিশিষ্ট:—(১) পাইলন, (২) প্রাঙ্গণ, (৩) গৃহ, (৪) গৃহ (৫) মন্দির।

ফটকে রাম্‌সেসের দুইটি বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি, ফটকের বাহঃপ্রাচীরে নানা চিত্র। রামসেসের যুদ্ধকৌশল এবং সংগ্রামে জয়লাভ এবং য্যামনদেবের আশীর্ব্বাদ চিত্রিত রহিয়াছে। প্রাঙ্গণে রাম্‌সেসের মূর্ত্তি—এক এক দিকে আটটি। চন্দ্রমন্দির দেখা থাকিলে এই মন্দির-নির্ম্মাণের কারিগরি নূতন করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হয় না। তবে এই মন্দিরে তিনটি দেবতার স্থান—মধ্যস্থলে য্যামন, ডাহিনে চন্দ্র, বামে 'মত'। প্রত্যেক দেবতাই নৌকায়-আরূঢ়-রূপে চিত্রিত। রাম্‌সেস বাম হস্তে ধূপ জ্বালাইয়াছেন, এবং দক্ষিণ হস্তে জলপাত্র হইতে পূজার জল ঢালিতেছেন, এইরূপ বুঝা যায়।

রাম্‌সেসের এই ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া প্রাঙ্গণের ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণ হইতে প্রধান মন্দিরের পূর্ব্বদিকের গৃহে গমন করিলাম। এই গৃহ প্রায় অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে। প্রায় ২০৭ স্তম্ভ। স্তম্ভে নানা সম্রাটের নাম ও কীর্ত্তি খোদিত এবং তাঁহাদের উপাস্যদেবগণের পূজা চিত্রিত। অধিকাংশ স্তম্ভের শিরোদেশে চতুষ্কোণ প্রস্তর-ফলক; কতকগুলিতে পুষ্পের সর্ব্বোপরিস্থ আবরণের আকৃতি। প্রাচীরগাত্র, স্তম্ভগাত্র, এবং ভিতরকার ছাদ সবই নানা রংএ চিত্রিত। কয়েকটি মাত্রের রং এখনও দেখা যাইতেছে।

এই গৃহের বিস্তৃতি ৩৩৮ ফুট এবং উচ্চতা ১৭০ ফুট। ১৬ সারি স্তম্ভ ইহার ভিতর বিদ্যমান। সকল স্তম্ভই এক সময়ে এক কাহারও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই। এক এক অংশ এক এক জনের আমলে প্রস্তুত। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন রাজা ও ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম দেখা যায়। লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথাও বিভিন্ন।

লিপিগুলি আলোচনা করিলে মিশরের প্রাচীন ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে। কোন চিত্রে হেলিয়োপোলিসের সূর্য্য-মন্দিরে তরুতলে সম্রাট্ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইতেছেন। কোন চিত্রে য্যামন-মন্দিরের পুরোহিতগণ মাথা কামাইয়া ভক্তিভাবে দেবতার নৌকা বহন করিতেছেন। কোন চিত্রে অতি সুন্দর নানা রংএর প্রতিমূর্ত্তি দেবতার সম্মুখে পূজার উপকরণ লইয়া দণ্ডায়মান। প্রাচীরগুলির বহির্ভাগে যে-সকল চিত্র ও লিপি রহিয়াছে তাহা দেখিলে প্রাচীন লড়াইয়ের দৃশ্য বুঝা যায়। দেখিলাম নানাপ্রকার গাড়া ঘোড়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অথবা যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মিশরবাসীরা এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত। ভিন্ন ভিন্ন জাতির আকৃতি, বেশভূষা, কেশবিন্যাস ইত্যাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপায়ে দেখান হইয়াছে। নদী পার হইবার চিত্রে দেখা গেল—প্রস্তরের উপর তরঙ্গাকার রেখা উৎকীর্ণ হইয়াছে। তাহার মধ্যে কুমীর, হাঙ্গর, কচ্ছপ, মৎস্য ইত্যাদির চিত্র। কোথায়ও শত্রুগণকে বন্দী করিয়া রাজা স্বদেশে ফিরিতেছেন। কোথাও শত্রুরমণীগণ কৃপাভিক্ষা করিতেছে। বন্দীদিগকে বাঁধিয়া আনিবার নানা চিত্র দেখিতে পাইলাম। যুদ্ধের শকটও দেখা গেল। একটা দুর্গ আক্রমণের চিত্র বেশ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সকল চিত্রেই লোকজনের দৃঢ়তা, সজীবতা, তেজস্বিতা অথবা অন্যান্য ভাব অতিশয় দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

বৌদ্ধমন্দিরাদির প্রাচীরগাত্রে যে-সকল ইতিহাস-চিত্র দেখিয়াছি, এগুলি সেই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের ও মিশরের মন্দিরনির্ম্মাণে, চিত্রকলায় এবং স্থাপত্য-শিল্পে একই আদর্শ, একই নৈপুণ্য, একই ক্ষমতা দেখিতে পাইতেছি।

য্যামন-মন্দিরের প্রধান গৃহ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে

আসিলাম। এখানে দুইটি ওবেলিস্ক রহিয়াছে—পূর্ব্বে আরও ছিল।

এই পূর্ব্বদিকেই য়্যামন-মন্দির প্রথম নির্ম্মিত হয়। দ্বাদশ রাজবংশ যথন থীব্‌স্‌নগরে রাজধানী প্রবর্ত্তন করেন তখন এই অংশেই তাঁহাদের উপাস্য দেবতার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ফ্যারাওগণ নিজ নিজ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি অনুসারে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে হইতে নাইলের কিনারায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ যে চমৎকার গৃহ দেখিতে পাইতেছি তাহা পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণের প্রস্তুত। ইঁহারা ১২০০—১০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ কালের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমেনহপিস, থুটমসিস, সেথস্‌, রামসেস ইত্যাদি এই বংশীয় রাজগণের নাম।

পূর্ব্বদিকের একটা গৃহগাত্রে উদ্যানের চিত্র অঙ্কিত দেখিলাম। অষ্টাদশ রাজবংশের ইহা কীর্ত্তি। ১৫০০—১৩০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দকালে এই বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। থুটমাসস এই রাজবংশের প্রবর্ত্তক। এই উদ্যানে নানাবিধ জীবজন্তু ও উদ্ভিদের চিত্র দেখা গেল। কতকগুলি উদ্ভিদ্‌ চিনিতে পারা গেল না। সেগুলি বোধ হয় আধুনিক মিশরে আর পাওয়া যায় না।

মন্দিরের পূর্ব্বদিক শেষ করিয়া বাহিরে আসিলাম। পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে একটা সরোবর দেখিলাম। এই সরোবরে আসিবার জন্য য়্যামনমন্দির হইতে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ আছে। এই সরোবর ভূগর্ভস্থ স্বাভাবিক জলস্রোত দ্বারা পুষ্ট হয়। এই সরোবরের উত্তরপূর্ব্ব কোণে একটি উচ্চ মঞ্চের উপর একটি গোলাকার জন্তু দেখিতে কচ্ছপের মত। ইহার নাম "স্কারাব"। এই জন্তুই প্রাচীন মিশরের ধর্ম্মতত্ত্বে আদি জীব। সূর্য্যদেবের প্রভাবে এই জীব জগতের সকলপ্রকার জীবের সৃষ্টি করে।

আর একটি সরোবর ইহার পার্শ্বে পশ্চিমদিকে ছিল। তাহার মধ্যে ৭০০০।৮০০০ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এগুলি এক্ষণে কাইরোর মিউজিয়মে রক্ষিত হইতেছে। সরোবরের জল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে—এবং মৃত্তিকা দ্বারা ইহাকে পূর্ণ দেখিতে পাইলাম।

কর্ণাকের মন্দির দেখিলে লুক্‌সরের মন্দির না দেখিলেও চলে। রচনা-কৌশল একপ্রকার—সম্রাটের ক্ষমতা, শিল্পীদিগের কল্পনা, ইত্যাদি সকলই একপ্রকার মনে হয়। কোন বিষয়ে খর্ব্বতা লক্ষ্য করিবার নাই। লুক্‌সর আয়তনে কিছু ক্ষুদ্র।

কার্ণাকের ন্যায় লুক্‌সরও যুগে যুগে পরিবর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। এখানেও স্তম্ভসমূহই বিশেষত্ব, প্রাচীরগাত্র এবং ছাদসমূহ লিপি-খোদিত। স্তম্ভসমূহের শিরোদেশে
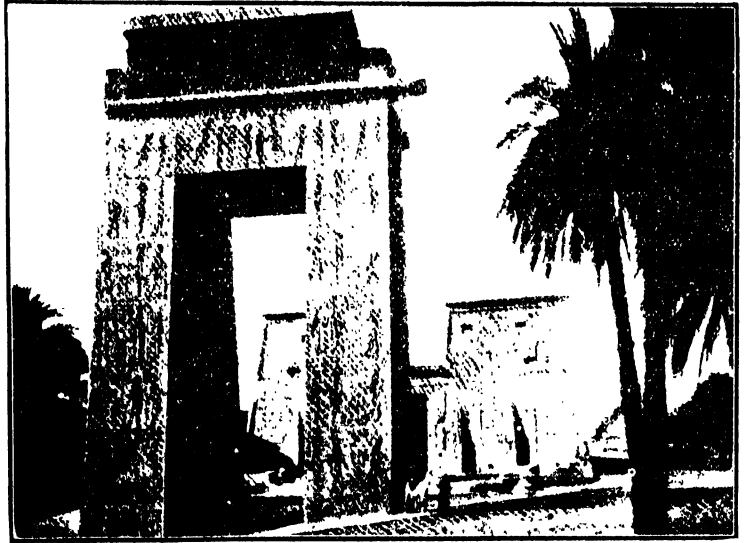
কার্ণাকের একটি 'পাইলন' বা গোপুরম্‌।

প্রস্তরফলক অথবা পুষ্পের বহিরাবরণের আকৃতি। তবে স্তম্ভগাত্রে লিপি ও চিত্রসংখ্যা কিছু অল্প। এবং মন্দির উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। কিন্তু য়্যামনমন্দির পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত।

সর্ব্বপুরাতন অংশ অষ্টাদশ রাজবংশের আমেনহোপিস ফ্যারাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই অংশ দক্ষিণদিকে অবস্থিত। রোমায়েরা এই অংশকে গির্জ্জায় পরিণত করিয়াছিল।

ঊনবিংশ রাজবংশীয় রামসেস উত্তরদিকে মন্দিরকে

পরিবর্দ্ধিত করেন। তাঁহার আমলের স্তম্ভগুলি অতিশয় বৃহদাকার গাম্ভীর্য্যবিশিষ্ট এবং বিপুলায়তন। এই অংশে রামসেসের কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি আছে। মর্ম্মরের ন্যায় শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি প্রস্তরাসনে সস্ত্রীক উপবিষ্ট। তাহার উত্তরে, প্রাঙ্গণের ভিতরে স্তম্ভের মধ্যে একটি করিয়া দণ্ডায়মান গ্রানাইট প্রস্তরের রামসেস-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি লুকসর মন্দিরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। দুইটি কৃষ্ণ গ্রানাইট-পাথরের মূর্ত্তি প্রাঙ্গণের শেষে গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মস্তকে দক্ষিণ বা উত্তর মিশরের রাজমুকুট। কোন কোন রামসেস-মূর্ত্তির পার্শ্বভাগে তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি খোদিত অথবা প্রস্তর-নির্ম্মিত। এই অঙ্কন ও খোদাইকার্য্যে শিল্পনৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এই অংশের কতকগুলি স্তম্ভ ও মূর্ত্তি আবর্জ্জনার মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। আবর্জ্জনারাশির উপর নূতন মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং মৃত্তিকাখনন করিয়া অনুসন্ধান করা এক্ষণে অসম্ভব।

উত্তরাংশের প্রাঙ্গণে, প্রাচীরের একস্থানে সমস্ত লুকসরমন্দিরের রচনারীতি চিত্রিত আছে।

রামসেসের মূর্ত্তিগুলি দুইশ্রেণীর অন্তর্গত। উত্তরদক্ষিণে দণ্ডায়মানগুলির মস্তকে কোন আভরণ নাই। পূর্ব্ব-পশ্চিমে দণ্ডায়মানগুলির উপর মুকুট আছে। সকলেরই দাড়ি দেখিলাম। বাম পা অগ্রসররূপে তৈয়ারী। মূর্ত্তিগুলি বিশাল ও তেজস্বী।

এই মন্দিরের পাইলনও রামসেস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মন্দিরের উত্তরে ইহা অবস্থিত। ইহার গাত্রে রামসেসের সমর-কাহিনী চিত্রিত, সীরিয়ার হিটাইটেরা তাঁহার দ্বারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছে।

ষষ্ঠদিবস—পর্ব্বত-গুহায় মিশরীয় শিল্প।

কাল প্রাচীন থীব্‌স-নগরের পূর্ব্বার্দ্ধ দেখিয়াছি। আজ পশ্চিমার্দ্ধ দেখিতে গেলাম। হোটেলের নৌকায় নাইল পার হওয়া গেল। একগণ্ডুষ জল মুখে দিলাম। স্বাদ মন্দ নয়—জলে বালু কিম্বা অন্য কোন ময়লা ভাসে না। মোটের উপর জলের বর্ণ ঈষৎ পীত। এপ্রিল মাস—গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে—জলের স্রোত বেশী নাই। নদীর বিস্তৃতিও অল্পই। মথুরায় যমুনা যত বড়, লুকসরে নাইল প্রায় তত বড়। আমরা সমুদ্র হইতে প্রায় ৬০০ মাইল উর্দ্ধে আছি। কানপুরের গঙ্গা হইতে বঙ্গোপসাগর যতদূর, আমরা এক্ষণে নাইলের মুখ হইতে ঠিক ততদূরে রহিয়াছি। এজন্য নদী এখানে কম প্রশস্ত হইবারই কথা। অবশ্য কাইরোর নিকটেও নাইল বেশী প্রশস্ত নয়।

নৌকাবক্ষ হইতে পূর্ব্বতীরের সৌধসমূহ দেখিতে সুন্দর। লুক্সর-মন্দিরের স্তম্ভশ্রেণী ঈষৎ রক্তবর্ণ আভায় অন্যান্য গৃহাবলী হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমরা যে হোটেলে আছি সেইটাই নদীর ধারের আধুনিক গৃহগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও বৃহৎ।

নদীবক্ষে কতকগুলি ফেরিনৌকা লোকজনকে পার করিতেছে। শীতকাল চলিয়া গিয়াছে। পর্য্যটক এখন একেবারেই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে দুই চারিজন আছেন তাঁহাদিগকে অপর পারে লইয়া যাওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গাধা ঘোড়া গাড়ী কুলী ইত্যাদিও চলিয়াছে। আরও কতকগুলি নৌকা নদীবক্ষে দেখা গেল। এই-সমুদয় ব্যবসায়-তরণী। 'সকল' নৌকায়ই দুইটি করিয়া মাস্তল ও পাল। দেখিতে মন্দ নয়।

আমাদের মাঝিরা গান ধরিয়াছিল। গানের বিষয় মহম্মদের স্তুতি। গান শুনিতে শুনিতে পূর্ব্বতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। আমাদের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে নদী বাঁকিয়াছে। পূর্ব্বদিকের মকাওম পাহাড়ে ঠেকিয়া নদীর গতি বাধা পাইয়াছে, এজন্য নদী কিছু পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়াছে। নৌকা হইতে দেখা গেল যেন পূর্ব্বদিকের পাহাড় নদীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হইতে হইতে দক্ষিণদিকে আসিয়া নাইলের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে।

পাঁচ মিনিটের ভিতরেই নদীর অপর পারে পৌঁছিলাম। কেবল বালুকারাশি। ইহা মরুভূমির বালি নয়। বর্ষাকালে নদী বাড়িলে পশ্চিমকূল ছাপাইয়া উঠে। যতখানি পর্য্যন্ত জল যায় ততখানি পলি পড়ে। এই বালুর সঙ্গে সেই পলি মিশ্রিত। সুতরাং ইহা অতিশয় সূক্ষ্ম ও কথঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ। বালুকার উপর দিয়া আমাদের গাড়ী

চলিতে লাগিল। যতখানি নদী, বালুকারাশির বিস্তৃতিও ততখানি। গ্রীষ্মকালে নদী প্রায় অর্দ্ধেক শুকাইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালাদেশে নদীর ধারে পলিমাটির এবং বালির উপর যে সকল শস্য জন্মে নাইলনদীর ধারেও সেই-সমুদয় দেখিলাম। তরমুজ, শসা, পেঁয়াজ, মটরশুটি, কুমড়া ইত্যাদি নানাপ্রকার শাকশব্জীর চাষ হইতেছে। মেষ ও ছাগলের পাল চরিতেছে। গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের পৃষ্ঠে লোকেরা যাতায়াত করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গোধূম-ক্ষেত্র ও খেজুরবন। এখানে ভূমির এত উর্ব্বরতা শক্তি যে সামান্য চাষেই অতিঘনসন্নিবিষ্ট উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়। চাষের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল নাইলের পলি-মাটিতে বিঘায় প্রায় ২০।২৫ মণ গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্জাবের খালের সমীপবর্ত্তী জমি এবং যুক্ত-প্রদেশের গঙ্গার কিনারা ব্যতীত এত পরিমাণ শস্য ভারতবর্ষের আর কোথাও বোধ হয় জন্মে না।

বরাবর উত্তরদিকে চলিলাম। নাইলের একটা খাল রাস্তায় পড়িল। আখের ক্ষেতের ভিতর দিয়া একটা ছোট রেলপথও দেখিতে পাইলাম। চিনির কলের জন্য এই রেল প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের রাস্তায় কুশের ঘাসও দেখা গেল। স্থানে স্থানে দেখিলাম—কুম্ভকারেরা বড় বড় মাটির ভাঁড় তৈয়ারী করিতেছে। কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য পারস্যচক্রে এই-সকল ভাঁড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের পাঁজাও মাঠের মধ্যে দেখা গেল।

পূর্ব্বদিকে লীবিয় পাহাড়ের পাদদেশে পুরাতন অট্টালিকার বহু ধ্বংসাবশেষ গাড়ী হইতে দেখিতে পাইলাম। আমরা প্রথমেই এখানে নামিলাম না। পাহাড়ের ভিতরকার একটা নবনির্ম্মিত রাস্তা দিয়া আমরা ইহার অপরদিকে যাইতে লাগিলাম। দুই পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বত-গাত্র। সর্ব্বত্র শ্বেত অথবা ঈষৎলাল লাইমষ্টোন পাথর। রাস্তা প্রস্তরময়। পাহাড়ের গায়ে একটি তৃণও জন্মে না। কোন স্থানে একটা ঝরণাও নাই। চারিদিক্ রৌদ্রে পুড়িয়া যাইতেছে। আমরা একটা অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতেছি বোধ হইল।

নাইলের অপর পারে যেখানে কার্ণাকে য়ামন-মন্দির, আমরা পশ্চিম পারের ঠিক সেই স্থানে এই রৌদ্রতপ্ত পার্ব্বত্য উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছি। বিন্ধ্যপর্ব্বত বা দাক্ষিণাত্যের শৈলমালার ন্যায় এই পর্ব্বতশ্রেণী। আমরা পাহাড়ের ভিতর দিয়া দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলাম। চারিধারের প্রস্তরচূর্ণ ও পর্ব্বতগাত্র দেখিয়া মনে হইল ইহার কর্দ্দমে অত্যুৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হইতে পারে।

প্রায় আধঘণ্টা এই পথে আসিয়া বিবান-এল্-মুলকে উপস্থিত হইলাম। প্রাচীন ফ্যারাও-সম্রাটগণের এখানে অসংখ্য কবর পর্ব্বতগহ্বরে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

এই পর্ব্বতের পাদদেশেই বহু উত্তরে কাইরোর সন্নিকটে সাক্কারা, আবুসির ও গীজার পিরামিড ও অন্যান্য সৌধসমূহ বিরাজিত। সেইগুলি অতি পুরাতন। মিশরের প্রথম সপ্তদশ রাজবংশীয় নরপতিগণ কবরের জন্য পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিতেন। কিন্তু অষ্টাদশবংশীয়গণের আমল হইতে পিরামিড রচনা স্থগিত হইয়াছে। তখন হইতে পর্ব্বতের ভিতর গুহা খনন করিয়া তাহার মধ্যে শব-রক্ষা করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। বিবান এল্-মুলকে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ রাজবংশের ফ্যারাও দিগের সমাধি রহিয়াছে। সুতরাং এই স্থানে ১৫০০ খ্রীঃ-পূর্ব্ব যুগের পরবর্ত্তীকালের গৃহনির্ম্মাণ, শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কন দেখিতে পাওয়া যাইবে :

কাল দেখিয়াছি—অপরপারে কার্ণাক ও লুক্সরের সৌধশ্রেণী। সেই-সমুদয়ে দ্বাদশরাজবংশীয়কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী যুগের শিল্পজ্ঞান এবং বাস্তুবিদ্যার পরিচয় পাইয়াছি। তাহাতে প্রাচীন মিশরীয়দিগের কল্পনাশক্তির বিপুলতা, বিশালতা এবং নির্ভীকতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আজ তাহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, মাধুর্য্য-বোধ, ললিতকলা, এবং রং ফলাইবার ক্ষমতা ইত্যাদি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

গিরিগহ্বরে গৃহনির্ম্মাণ এবং চিত্রাঙ্কন দেখিবামাত্র দাক্ষিণাত্যের কার্লি, ভাজা, অজন্তার কথা মনে পড়িল। গোয়ালিয়ারের প্রস্তরদুর্গেও এইরূপ সুচিত্রিত গহ্বরগৃহ দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষের সেই গৃহগুলি মঠের জন্য, বিহারের জন্য, ও বিদ্যালয়ের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মিশরের এই গৃহসমূহের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। এইগুলি সম্রাট-শবের প্রাসাদ। কোন লোকে না দেখিতে পায় এই উদ্দেশ্যেই পর্ব্বতের ভিতর কবর প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই প্রভেদ প্রথমে বুঝিয়া লইলে ভারতীয় এবং মিশরীয় শিল্পে বোধ হয় আর কোন প্রভেদ পাওয়া যাইবে না। পাহাড়ের গা কাটিয়া দ্বার নির্ম্মাণ করা, ভিতর খুঁড়িয়া ঘর প্রস্তুত করা, গৃহগুলির ভিতরকার প্রাচীর ও ছাদ সুচিত্রিত করা, এবং চিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট দক্ষতা, বৈচিত্র্য ও কারিগরি দেখান—এই-সমুদয়ই দুই শিল্পে বর্ত্তমান। এক শিল্পীই ভারতে ও মিশরে কর্ম্ম করিয়াছেন—একথা বলিলে বোধ হয় দোষ হয় না। দুই স্থানের কাজেই এক হাতের পরিচয় পাই। তবে ভারতবর্ষের চিত্রে যে-সকল তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারিত করা হইয়াছে, মিশরের চিত্রে সে-সকল বিষয় প্রকাশ করা হয় নাই। দুই দেশের ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। কিন্তু দুই দেশে বোধ হয় এক শিল্পবিজ্ঞানের নিয়মই অনুসৃত হইয়াছে। ভারতীয় কারিগর এবং মিশরীয় কারিগর একই শিল্পবিদ্যালয়ের সহপাঠী ও গুরুভাই হওয়া অসম্ভব নয়।

অষ্টাদশরাজবংশের অন্যতম সম্রাট্ দ্বিতীয় আমেনহোপিসের (১৪৪৭-১৪২০ খৃঃ পূঃ) শব যে-কবরে রক্ষিত আছে আমরা সেইটার ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রবেশদ্বার পূর্ব্বদিকে। যে পর্ব্বতগাত্রে ইহা অবস্থিত তাহা দ্বারের ঊর্দ্ধদেশ হইতে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ। ঈষৎ রক্তবর্ণ লাইমষ্টোন পাহাড় আমাদের সম্মুখে মাথা তুলিয়া পূর্ব্বদিকে নাইলের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া লুক্সর ও কার্ণাকের মন্দিরসমূহ দেখিতেছে।

গহ্বরের সকল অংশ দেখাইবার জন্য আজকাল ইহার ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শীতকালে যখন দর্শকসংখ্যা বেশী হয় তখন এই-সকল বাতি জ্বালাইবার হুকুম হয়। আমরা এপ্রিলমাসে গরমের দিনে আসিয়াছি—এখন বেশী লোকজন দেখিতে আসে না। কয়েকজন আমেরিকান ও জার্ম্মানমাত্র আসিয়াছেন। কাজেই হাতে মোমবাতি জ্বালাইয়া কবর-রক্ষক আমাদিগকে কবরের ভিতর লইয়া গেল। বলাবাহুল্য উপযুক্ত আলোকের অভাবে গৃহগুলির সৌন্দর্য্য তত বেশী উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

গড়ান রাস্তা দিয়া পর পর দুইটি গৃহ পার হইলাম। সবগুলিই প্রায় ১৪ ফুট উচ্চ এবং ৭ ফুট চওড়া। প্রাচীরগুলি ধূসরবর্ণ বালুকাময় প্রস্তরে নির্ম্মিত। পাহাড়ের উপরিভাগ কিন্তু লালবর্ণ। কোন গৃহ চিত্রিত ও লিপিযুক্ত, কোন গৃহে লেখা বা চিত্রাদি নাই।

এই তিন ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে অনেকটা গভীরস্থানে পৌঁছিলাম। তাহার পর চতুর্থ ঘর। এটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত। ইহার মেজে তৃতীয় গৃহের মেজে অপেক্ষা ২৫ ফুট নিম্নে বোধ হইল। এই চতুর্থ গৃহের ছাদে কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ প্রলেপ। তাহার উপর শ্বেত বা পীতবর্ণ তারকাসমূহের চিহ্ন। ইহার প্রাচীরগাত্রে লাল কাল পীত ইত্যাদি নানা রংএ চিত্রিত অসংখ্য স্তম্ভের শ্রেণী অঙ্কিত রহিয়াছে। এই গৃহ পার হইবার জন্য একটা ক্ষুদ্র পুলের উপর দিয়া যাইতে হইল। চতুর্থ গৃহ পার হইয়া পঞ্চম গৃহে আসিলাম। এই গৃহে দুইটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ। এতক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে আসিয়াছি। এইবার পঞ্চমগৃহের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে গেলাম। সেখানে একটা গড়ান সিঁড়ির সাহায্যে প্রায় ১০ফুট নীচে নামিতে হইল। নামিয়াই একটা প্রকাণ্ড গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

এই গৃহ উত্তরে-দক্ষিণে লম্বা। সর্ব্বসমেত ছয়টা চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে। এইগুলির সাহায্যে ছাদ সুরক্ষিত। ছাদে আকাশ ও তারকার চিত্র। প্রাচীর ও স্তম্ভের গাত্রে নানাপ্রকার ধর্ম্মতত্ত্বের কাহিনী চিত্রিত। চারিটা স্তম্ভ পার হইয়া দক্ষিণদিকের শেষ দুই স্তম্ভের নিকট আসিলাম। সেইখানে কবর-রক্ষক আলোক নামাইয়া দেখাইল গৃহের দক্ষিণতম অংশ সাধারণ মেজে অপেক্ষা প্রায় ৮।১০ ফুট নিম্নতর। কিন্তু তাহার ছাদ একই। এই নিম্নতর মেজের ভিতরে, একটা "সার্কোফেগাস্" বা পাথরের সিন্দুক। পাথরের গায়ে চিত্র অঙ্কিত ও লিপি খোদিত। এই সিন্দুকের ভিতর মানবমূর্ত্তি—জীবন্ত মানুষের মত এই শব দূর হইতে দেখা যাইতেছে। মুখমণ্ডলের ভাব কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। মস্তক

পশ্চিমদিকে শায়িত। পূর্ব্বে একখানা প্রস্তরের সিন্দু-কের ঢাকনি ছিল। এক্ষণে তাহা নিকটে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে একটা কাচের আবরণে সিন্দুক ঢাকা রহিয়াছে, এবং মুখের নিকট একটা বৈদ্যুতিক আলোর বাতি রক্ষিত হইয়াছে। বাতি জ্বালিলে শবের নিকট হইতে সমস্ত মুখদেহ ও মস্তক অতি সুন্দর দেখায়। এই দেহটি সম্রাট আমেনহোটেপের। তিনি ৩৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

এই সুবৃহৎ গৃহের পশ্চিমে একটা ক্ষুদ্র গৃহ। তাহার মধ্যে দেখিলাম তিনটি 'মামি', একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী ও অপরটি ইহাদের কন্যা। স্ত্রীদ্বয়ের চুল এখনও রহি-য়াছে—পাটের চুলের মত পাকা দেখাইতেছে। অবয়ব কিছু শীর্ণ—মুখের গঠন কিছুই বিকৃত হয় নাই, দেখি-লেই চিনিতে পারা যায়। শরীরের স্বাভাবিক রং নষ্ট হইয়াছে। পেটের ভিতরকার নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছিল। এই শবদেহগুলি বোধ হয় সম্রাটের আত্মীয় ব্যক্তিগণের হইবে, পাশের এই গৃহে রক্ষিত ছিল। পশ্চিম পার্শ্বেও দুই একটি ক্ষুদ্র কামরা আছে দেখিলাম। ইহাতেও এইরূপ 'মামি' ছিল। সেগুলিকে কাইরোর যাদুঘরে সরান হইয়াছে।

এই কবরের 'মামি' কয়েকটা যথাস্থানেই রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আধুনিক তত্ত্ববিদ্যায়কগণ দর্শকদিগকে প্রাচীন প্রথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য মামি-গুলির আবরণ-বস্ত্রসমূহ খুলিয়া ফেলা হইয়াছে। অনাবৃত শরীর দূর হইতে সকলেই দেখিতে পাইবেন।

আমেনহোটেপের কবর দেখিয়া তৃতীয় রামসেসের কবর দেখিলাম। ইনি ১২০০-১১৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কবরটি প্রথম অপেক্ষা বিস্তৃত এবং বৃহৎ। গৃহসংখ্যা এবং গৃহের নির্ম্মাণপ্রণালী একরূপ, কেবল প্রথম তিনটি গৃহের দুই পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা আছে, কিন্তু প্রথম কবরে এই-সমুদয় কামরা নাই। এই কামরাগুলির প্রাচীর নানা চিত্রে সুশোভিত। রন্ধন, পশুহত্যা, নৌচালন, তারকাদের গতি, নাইল দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রদান, যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র ও সাজ-সজ্জা, কৃষ্ণ বৃষ ও কৃষ্ণ গাভী, রাজকোষ ও অলঙ্কার, শিল্প বোতল, পেয়ালা, নানা প্রকার তৈজসপত্র, হাতীর দাঁত, গহনা, এবং আরও বহুবিধ বিষয়ের চিত্র এই দশ এগারটা গৃহের মধ্যে দেখা গেল। মিশরের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের নানা তথ্য এই গৃহগুলির কারুকার্য্যের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। অন্যান্য গৃহের প্রাচীরগাত্রেও অতি সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত। সর্ব্বত্র রং ফলাইবার ক্ষমতা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইতে হয়। বদনমণ্ডলের লাবণ্য অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

একে একে সকল গৃহ দেখা হইয়া গেল। ইহার ভিতর হইতে সার্কোফেগাস এবং মামি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কাইরো-মিউজিয়ামে এই-সমুদয় এক্ষণে রক্ষিত হইতেছে।

সকল কবরের রচনাপ্রণালী একরূপ। গৃহসংখ্যা এবং প্রাচীর ও পার্শ্বগৃহের চিত্রাঙ্কন এক নিয়মেই পরিচালিত। কোন কোন অংশে কথঞ্চিৎ বৈচিত্র্য লক্ষিত হইবে না। কিন্তু সকলগুলিই যে এক ছাঁচে গড়া তাহা বুঝিতে দেরী লাগে না।

প্রাচীরের চিত্রগুলিতে মিশরের ধর্ম্মকাহিনী দেবতত্ত্ব এবং প্রেততত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। প্রাচীন মিশরবাসীরা বিবেচনা করিতেন, মৃত্যুর পর মানুষ পাতালে প্রেরিত হয়। সেইখানে প্রেতাত্মা রাত্রিকালে নৌকা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পাতালে মৃত ব্যক্তির এই ভ্রমণ-কাহিনী মিশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বহু গ্রন্থে আমরা জানিতে পারি। সেই-সকল গ্রন্থে যে-সমুদয় বচন ও উপদেশ আছে প্রধানতঃ সেই-সমুদয়ই প্রাচীরগাত্রে চিত্রিত ও অঙ্কিত হইত। মিশর-বাসীদিগের বিশ্বাস ঐ-সকল গ্রন্থের সারমর্ম্ম জানা থাকিলে মৃত ব্যক্তি সহজে যথাস্থানে পৌঁছিতে পারে।

তৃতীয় রামসেসের কবর পাহাড়ের পশ্চিম দিকের পাদদেশে। এই পাহাড়ের পূর্ব্ব ভাগের পাদদেশে রাণী হাৎসেপ্সুটের মন্দির। পাহাড় পার হইয়া পূর্ব্ব দিকে যাওয়া যায়। পাহাড়ের পৃষ্ঠ হইতে লুক্সর, কার্ণাক, নাইলের উভয় কূল, মকাতম পর্ব্বত এবং ইহার পূর্ব্ব-চরণাস্থিত মন্দির, কবর, প্রতিমূর্ত্তি, ধ্বংস, স্তূপ প্রভৃতি একদৃষ্টিতে দেখা যায়। কিন্তু দ্বিপ্রহরে এত গরমের মধ্যে পাহাড়ে উঠিবার বাসনা ত্যাগ করিয়া যেপথে

আসিয়াছি গাড়াতে সেই পথেই চলিলাম। পাহাড়ের উপত্যকা শেষ করিয়া উত্তর দিক দিয়া উহার পুষ্প-চরণতলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উত্তর সীমায় কার্ণাকের মন্দির নাইলের অপর পারে দেখিয়াছিলাম। দক্ষিণ সীমায় লুক্সরের মন্দির নাইলের অপর পারে দেখিতেছি। এইখানে দেরেল-বাহারির মন্দির।

এই রাণী অষ্টাদশ রাজবংশসম্ভূতা ছিলেন। সম্রাট তৃতীয় থুটমসিস ইহার ভ্রাতা ও স্বামী। ইহাঁরা ১৫০০-১৪৪৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছেন। ইহাঁদের উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, পরস্পর প্রতিযোগিতা অতিশয় প্রবল ছিল।

এই মন্দিরের রচনাকৌশল বিচিত্র। লুক্সর ও কার্ণাকে দেখিয়াছি, প্রথমে যেস্থানে মন্দির নির্মিত হয় পরবর্ত্তী সম্রাটেরা সেখান হইতে উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে ইহার আয়তন বাড়াইয়া দিতেন। এইরূপে প্রাথমিক ক্ষুদ্র দেবালয় বিশাল ধর্ম্ম-মন্দিরে পরিণত হইত। দেরেলবাহারিতেও সেই পরিবর্দ্ধন দেখিতেছি। কিন্তু এই পরিবর্দ্ধনের রীতি স্বতন্ত্র। এখানে ক্রমশঃ নিম্ন ভাগ হইতে ঊর্দ্ধভাগে মন্দির পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। নদীর ঘাটে ইষ্টক বা প্রস্তরের সিঁড়ি যেরূপ দেখায়, এখানকার মন্দিরও সেইরূপ নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে সিঁড়ির মত উঠিয়াছে।

এই মন্দির বর্ত্তমানে তিনটি থাকে বা স্তরবিন্যাসে সম্পূর্ণ। প্রত্যেক স্তর-বিন্যাসই সুবিস্তৃত এবং বিশাল—প্রকাণ্ড মাঠ বা প্রাঙ্গণের মত প্রত্যেকটি স্তর। তিনটি থাকেরই মধ্যভাগ দিয়া একটা সিঁড়ান প্রশস্ত রাস্তা নিম্নভাগ হইতে ঊর্দ্ধ দিকে গিয়াছে। এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক স্তরের অর্দ্ধাংশ। উঠিতে গেলে ডাহিনে ও বামে প্রত্যেক স্তরকে দুই অংশে বিভক্ত দেখা যায়। সুতরাং সর্ব্বসমেত ছয়টি অংশে এই মন্দির সম্পূর্ণ— উত্তরে তিনটি, দক্ষিণে তিনটি।

প্রত্যেক স্তরবিন্যাসে সাধারণ মন্দির-রচনার রীতি কথঞ্চিৎ দেখিতে পাইলাম। সর্ব্বোচ্চ স্তরেই একটা পূর্ণাঙ্গ মন্দির রহিয়াছে। ফটক, প্রাঙ্গণ, স্তম্ভের সারি, গৃহ, ইত্যাদি সবই এই স্তরে দেখা গেল। কিন্তু মন্দিরের

পশ্চাদংশে উচ্চ—স্তম্ভবহুল গৃহগুলি এখনও দেখা যায় না। দেওয়ালগুলি নানারূপ চিত্রিত ও অঙ্কিত।

এই মন্দিরের প্রত্যেক থাকেই কতকগুলি নির্ম্মাণ করা গৃহ ও বারান্দা আছে। দ্বিতীয় স্তরের উত্তরাংশের বারান্দায় দেখিলাম রাণী পান্টদেশে বাণিজ্যতরী পাঠাইতেছেন। সেখান হইতে ধূপ, হাতীর দাঁত মূল্যবান ধাতু ইত্যাদি জাহাজে করিয়া আনা হইতেছে। দক্ষিণাংশে রাণীর জন্ম হইতে রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত নানা অবস্থার চিত্র অঙ্কিত। এই অংশের অঙ্কনগুলি দেখিয়া মিশরীয়দিগের জীবনতত্ত্ব এবং দেবতাদের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধবিষয়ে জ্ঞান সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। এই অংশের প্রাঙ্গণে দেখিলাম, একটা বৃহৎ কূপাকার গর্ত্তের প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া আছে। এখনও নানা টুকরায় হইয়া পড়িয়া আছে। সর্ব্বোচ্চ স্তরের একটি বৃহৎ প্রাচীর দেখিয়া প্রাচীন মিশরের সকল দেবতা এক স্থানে বুঝিয়া লইলাম। মিশরের প্রত্যেক জেলা হইতে লোকেরা নিজ নিজ বিশিষ্ট উৎ-পন্ন দ্রব্য বহিয়া আনিয়াছে। এইগুলি রাণীর নিকট উপ-হার প্রদত্ত হইতেছে। কোন স্থানে দেখিলাম গো-পূজা ও গো-সেবার চিত্র। এক চিত্রে রাণী গাভীর বাঁট হইতে পবিত্র দুগ্ধপান করিতেছেন। আর একস্থানে কুমারী রাণীকে দেবতারা পরিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেছে।

এই মন্দির কোন একসময়ে বা একজনের আমলে সম্পূর্ণ হয় নাই। কোন কোন স্থানে দেখিলাম রাণীর চিত্র ও নাম প্রাচীর হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। উঁহার স্বামী তৃতীয় থুটমসিস যখন উঁহাকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্য গ্রহণ করেন তখন তিনি রাণীর চিত্র যথা-সম্ভব বিনষ্ট করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

নাইলের পশ্চিম পারের কবরসমূহ এবং এই মন্দিরটি দেখিয়া প্রাচীনকালের বিশেষভাবে মিশরীয় চিত্রশিল্পেরই পরিচয় পাইলাম। এই-সকল চিত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। রেখাপাতে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয়ই হইয়াছে। চিত্র-গুলি কোন কোন স্থলে খোদিত—কোন কোন স্থলে [illegible] রঙে আঁকা। উভয়প্রকার শিল্পেই রেখার বৈচিত্র্য ও সামঞ্জস্য প্রকটিত। রংএর সমাবেশে ও

রীতিতে মাধুর্য্যের এবং সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। চিত্রগুলি দেখিলে মনে হয় আমরা জীবন্ত নরনারীর সঙ্গে চলাফেরা করিতেছি। পশুপক্ষী তরুলতাগুলিও জগতের যথার্থ উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর অনুরূপ। মূর্ত্তিগুলির অবয়বের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা এবং যথোচিত অনুপাত রক্ষা করা হইয়াছে। চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে কোনরূপ ভুল হয় না।

কোন চিত্রে দুর্ব্বলতা, হীনতা, বা দৈন্যের পরিচয় পাইলাম না। জীবজন্তুগুলি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ। সর্ব্বত্র সজীবতা, তেজস্বিতা, প্রফুল্লতা এবং শক্তিমত্তার চিহ্ন ও নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি। বৃহদাকার মূর্ত্তি ও চিত্রের মধ্যে একসঙ্গে তেজ ও লাবণ্য, শক্তি ও কমনীয়তা প্রকাশ করা সহজ কথা নয়। এইরূপ আশ্চর্য্য সমন্বয় কেবল একটি বা দুইটিমাত্র চিত্রে আছে তাহা নয়। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র বৃহৎ মধ্যমাকৃতি চিত্রের অঙ্কনে শিল্পীরা এই অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

এই গেল চিত্রাঙ্কনের ও মূর্ত্তিগঠনের বহিঃশিল্প বা টেক্‌নিক। মূর্ত্তিগুলির ভিতরকার কথাও অতি সুচারুরূপে প্রকটিত। হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, নানাবিধ মনোভাব, হিংসাদ্বেষ, শত্রুতা, প্রেম, স্নেহ, সৌহার্দ্দ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বাৎসল্য ইত্যাদি সবই আমরা এই চিত্র-জগতে দেখিতে পাই। ছবি দেখিলেই বুঝিয়া লইতে পারি—কোন্ আদর্শ, কোন্ মনোভাব, কোন্ চিন্তা প্রচার করিবার জন্য শিল্পী বাটালি ও তুলি হাতে লইয়াছিলেন। মিশরের প্রাচীন ইতিহাস, জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গ, বিচিত্র অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, সংগ্রাম ইত্যাদি সকল বিষয়ই কেবলমাত্র চিত্রসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে শিখিতে পারি। এই চিত্রসমূহই প্রাচীন মিশরবাসীর প্রকৃত ইতিহাস।

চিত্রগুলির মধ্যে মিশরীয়দিগের ভক্তিভাব অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মতত্ত্বে পশুপক্ষী তরুলতার মর্য্যাদা খুব বেশী। হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বে যেমন জগতের নিকৃষ্ট জীবজন্তু উদ্ভিদাদি উচ্চস্থান পাইয়াছে, মিশরবাসীর ধর্ম্মেও সেইরূপ। চিত্রগুলি দেখিলে দেবতার আদর্শ, পূজারীদিগের চরিত্র, যজমানের মনোভাব, সাধকের ধর্ম্মজ্ঞান, পশুপক্ষীর উচ্চসম্মান, জীবে দয়া, সর্ব্বস্বদানের প্রবৃত্তি, পরলোকে বিশ্বাস, ইহজীবনে অনাস্থা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সকল চিত্রের মধ্যে জীবজন্তু এবং নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অতিশয় পরিস্ফুট। হিন্দুস্থানের শিল্পে আমরা যে ভক্তির পরিচয় পাই, এই শিল্পেও আমরা সেইরূপ ভক্তিপ্রবণতা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছি।

ফিরিবার সময়ে মেমননের দুইটি বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া আসিলাম। বহুকাল হইতে প্রবাদ উত্তরদিকের মূর্ত্তি হইতে সূর্য্যোদয়কালে একটা গান উত্থিত হয়। বস্তুতঃ তাহার কোন প্রমাণ নাই।

শ্রীপর্য্যটক।

বার্লিন অবরোধ

(আল্‌ফঁস্ দোদে'র ফরাশী হইতে)

ডাক্তার ভী'র সঙ্গে আমরা পারী শহরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে পারী শহরের অবরোধের সময় কামানের গোলায় ভগ্ন প্রাচীর দেখাইয়া দেখাইয়া অবরোধের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। বিজয়তোরণের চারিদিকে যে-সমস্ত বড় বড় অট্টালিকা আছে তাহারই কাছে দাঁড়াইয়া একটি বাড়ী দেখাইয়া ডাক্তার এই গল্পটি বলিলেন—

এই বারান্দার পিছনে চারটি জানালা বন্ধ রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন? সেই বিষম ঝঞ্ঝাবিপ্লবের আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে এই বাড়ীতে একটি বীর সৈনিকের মূর্চ্ছার চিকিৎসার জন্যে আমার ডাক এসেছিল। এই বাড়ীটার তিনিই মালিক, তাঁর নাম কর্ণেল জুভ; তিনি নেপোলিয়নের সময়কার সৈনিক, সুতরাং বৃদ্ধ; জাতীয় মর্য্যাদা ও স্বদেশপ্রীতিতে তাঁর প্রাণ একেবারে জ্বলন্ত! যুদ্ধের আরম্ভ থেকেই বৃদ্ধ এই বাড়ীতে এই বারান্দার ধারের ঘরটিতে বাসা নিয়েছিলেন। কেন জানেন? আমাদের বিজয়ী সৈন্য যখন যুদ্ধ শেষ করে' সগৌরবে ফিরে আসবে, তখন তাদের তিনি অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিতে পারবেন বলে'।......আহা বেচারা! একদিন তিনি খেয়ে টেবিল থেকে যখন উঠছেন তখন উইসেম্বুর্গ যুদ্ধে আমাদের হারের

খবর এসে পৌঁছল ; এই পরাজয়ের সংবাদ শুনেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে' গেলেন !

আমি গিয়ে দেখলাম সেই বৃদ্ধ সৈনিক তাঁর ঘরে কার্পেটের উপর সটান লম্বা হয়ে পড়ে আছেন ; তাঁর মুখে রক্ত চড়ে' লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু জীবনের কোনো স্পন্দন মাত্র নেই। তাঁর পাশে তাঁর পৌত্রী হাঁটুগেড়ে বসে অঝোরে কাঁদছে। সেই মেয়েটিকে দেখতে ঠিক তার ঠাকুরদাদারই মতন ; একজনকে আর-এক জনের পাশে দেখে মনে হল যেন একখানি ছাঁচ থেকে দুটি ছাপ তুলে নেওয়া হয়েছে—কেবল একজন বুড়ো, পুরানো বলে চেহারার চোখা ভাবটা একটু ক্ষয় হয়ে গেছে ; অপর জন টাটকা আনকোরা নতুন, প্রতি অঙ্গে অঙ্গে তার উজ্জ্বলতা ঝলমল করছে, মকমলের জলুস ঠিকরে পড়ছে !

এই তরুণীর দুঃখ আমার মনে গিয়ে লাগল। তার ঠাকুরদাদা সৈনিক ছিলেন ; তার বাবাও সৈনিক, ফরাশী সেনাপতির সহকারী। এই বৃদ্ধকে অচেতন হয়ে পড়ে থাকতে দেখে, আর একটা এমনি দারুণ দুঃখের সম্ভাবনায় আমার মনের মধ্যে কেঁপে উঠল। আমি যথাসাধ্য তাকে সান্ত্বনা আর আশ্বাস দিলাম ; কিন্তু অবশেষে দেখে শুনে আমার আর বেশি ভরসা রইল না। তিন তিন দিন রোগীর অবস্থা এমনি নিস্পন্দ অঘোরেই কেটে গেল।

ইতিমধ্যে রাঁস্কোফেন যুদ্ধের খবর এসে প্যারীতে পৌঁছল। জানেন ত সে কি ভাবে খবরটা এসেছিল ? সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমরা খুব জবর রকমে জিতে গিয়েছি—বিশ হাজার জার্ম্মান মারা পড়েছে, জার্ম্মানার যুবরাজ বন্দী হয়েছেন ! ......জানিনে কেমন করে' এই জাতীয় আনন্দের প্রতিধ্বনি আমাদের সেই মূর্চ্ছার কোলের বধিরের কানে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। তাতে সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎস্পর্শ লেগে চেতনা সাড়া দিয়ে উঠেছে। সেইদিনকার সন্ধ্যা থেকে আমি দেখলাম সে মানুষ যেন আর সে মানুষ নয়। তাঁর চোখের ঘোলাটে ভাব কেটে গিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, জিভের জড়তা অনেক কেটে গেছে। আমাকে দেখে তিনি একটু হাসতে চেষ্টা করে দুবার গোঁঙিয়ে গোঙিয়ে বললেন—জ...য় ! জ...য় !

—হাঁ, কর্ণেল, খুব জবর রকমের জয় হয়েছে !

যখন আমি চলে যাচ্ছি তখন সেই তরুণী মেয়েটি বিবর্ণ পাণ্ডাশ মুখে আমায় এগিয়ে দিতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি তার হাতখানি ধরে বললাম—কিন্তু এতে উনি বেঁচে উঠলেন !

সেই বেদনাতুর বেচারী আমার কথার কোনো উত্তর দিতে পারলে না। তখন পথে পথে রাঁস্কোফেন যুদ্ধের সত্য সংবাদ টাঙিয়েদেওয়া হয়েছে—আমাদের সেনাপতি পলাতক, আমাদের সমস্ত সৈন্য একেবারে বিধ্বংস।...আমরা দুজনে দুজনের দিকে কাতরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। আমাদের দুজনের দৃষ্টিতেই ভয় ফুটে উঠেছিল। তরুণী তার বাপের কথা ভাবছিল, আর আমি ভাবছিলাম আমার রোগীর কথা। খুব সম্ভব, এই নূতন ধাক্কা রোগী সামলাতে পারবে না।......এখন করা কি ?......যে আনন্দ রোগীকে উজ্জীবিত করে তুলেছে, সেই আনন্দের মিথ্যা মায়ায় তাঁকে ভুলিয়ে রাখতে হবে !...কিন্তু এই মিথ্যার জাল রচনা করবে কে ?

"বেশ, আমিই মিথ্যা কথা বলে ভুলিয়ে রাখব।" বলে' সেই শক্তিমতী তরুণী চট করে চোখের জল মুছে ফেললে। তারপর মুখখানিতে হাসির ফুল ফুটিয়ে তুলে সে তার ঠাকুরদাদার ঘরে চলে গেল।

সে এই কঠিন কাজ অক্লেশে স্বীকার করে' নিলে। প্রথম প্রথম এর জন্যে তাকে বেশি কষ্ট করতে হয়নি ; সেই ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক তখনো খুব দুর্ব্বল, শিশুর মতো অসহায় তিনি শুয়েই থাকতেন, তাঁকে যা বোঝানো যেত শিশুর মতন সহজে তাই মেনে নিতে দ্বিধা করতেন না। যেমন যেমন স্বাস্থ্য ভালো হয়ে আসতে লাগল, তাঁর চিন্তা আর ধারণাশক্তিও তাজা হয়ে উঠতে লাগল। তখন তাকে সৈন্যদের দিনকার দিনের চলাফেরার হালের খবর শোনাতে হবে, যুদ্ধের অবস্থা বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই তরুণী, জার্ম্মানার প্রকাণ্ড একখানি ম্যাপের উপর ছোট ছোট নিশান পুঁতে কাল্পনিক ফরাশী সৈন্যের

জার্ম্মান জয়ের দৈনিক ইতিহাস উদ্ভাবন করছে দেখে মনে বড় ক্লেশ হত।

তাকে খবর দেওয়া হচ্ছে রোজই আমরা শহরের পর শহর দখল করছি, যুদ্ধের পর যুদ্ধ জিতছি। তবু তাঁর মন ওঠে না,—তাঁর মনের মতন তাড়াতাড়ি আমরা কেন জিততে পারছি না! এই বৃদ্ধের মন আর কিছুতেই ভরে না, তৃপ্তি আর মানে না!...প্রত্যেক দিন পৌঁছেই আমি তাঁর কাছে থেকে আমাদের সৈন্যের নূতন নূতন বীরকাণ্ডের খবর পাই। তিনি আগের দিন সৈন্যদের সংস্থান থেকে যে-রকম জয় আন্দাজ করেন, পরের দিন ঠিক সেই রকমই খবর পান। এতে বৃদ্ধ সৈনিকের তৃপ্ত গর্ব্ব লুকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ত।

"ডাক্তার, আমরা মেয়ঁাস দখল করে নিয়েছি!" বলতে বলতে মুখে একটি বেদনাকম্পিত হাসির রেখা ফুটিয়ে সেই মেয়েটি আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি অমনি শুনতে পেলাম দরজার ওপার থেকে ক্ষীণকণ্ঠে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—"একেই ত বলে এগিয়ে যাওয়া! একেই ত বলে চড়াও হওয়া!...আর দিন আটেকে আমরা বার্লিনে চড়াও করব।"

বাস্তবিক তখন জার্ম্মানরা পারী থেকে মাত্র আটদিনের পথের মাথায় এসে পড়েছিল।......আর আটদিনে হয়ত জার্ম্মানরা পারীতে এসে চড়াও করবে!

বৃদ্ধকে পারী থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত কিনা এই নিয়ে আমরা পরামর্শ করতে লাগলাম। কিন্তু পারীর বাহির হলেই দেশের হতশ্রী মূর্ত্তি দেখে বৃদ্ধের বুঝতে আর কিছু বাকি থাকবে না। তিনি তখনো দুর্ব্বল। প্রথম ধাক্কাই এখনো সামলে উঠতে পারেন নি; এখন সমস্ত সত্য খবর পেলে তাঁকে বাঁচানো ভার হবে। যেমন আছেন তেমনি থাকাই ঠিক হল।

পারী অবরোধের প্রথম দিন, আমি তাদের বাড়ীতে গেলাম—আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে কেবলি মনে হচ্ছিল যে, আমরা পারীর অন্ধি-সন্ধি বন্ধ করে বসে আছি, দেয়ালের তলায় যুদ্ধ চলছে, আমাদের শহরের সীমায় শত্রু এসে থানা গেড়েছে। আমি গিয়ে দেখি ভদ্রলোক তাঁর বিছানার ওপর বসে আছেন, খুব খুসি, গর্ব্বে মশগুল।

তিনি আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—কেমন! অবরোধ ত আরম্ভ হয়ে গেছে!

আমি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কর্ণেল, এ খবর আপনি টের পেয়েছেন?

তাঁর নাতনি আমার দিকে ফিরে বল্লে—হাঁ ডাক্তার। ......বড়ই সুখবর!......বার্লিন অবরোধ আরম্ভ হয়ে গেছে!......

এই কথা সে চমৎকার শান্ত সহজ ভাবে সেলাই করতে করতে বললে।......এমন কথা বৃদ্ধ কেমন করে অবিশ্বাস করতে পারে? কেল্লা থেকে কামানের আওয়াজ, তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না। এই হতভাগ্য পারী ছন্নছাড়া ও বিষাদমলিন হয়ে পড়েছে, তা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর বিছানা থেকে শুধু দেখতে পাচ্ছিলেন বিজয়তোরণের একটা খিলান। এবং তাঁর ঘরের চারিদিকে প্রথম সাম্রাজ্যের গৌরবস্মৃতির টুকিটাকি চিহ্ন তাঁকে মিথ্যা মায়া দিয়ে ঘিরে ভুলিয়ে রেখেছিল।

এই দিন থেকে আমাদের যুদ্ধব্যাপার খুব সহজ হয়ে এসেছিল। বার্লিন দখল ত হয়েই আছে, এখন শুধু কয়েক দিন ধৈর্য্য ধরে' অপেক্ষা করে' থাকতে পারলেই হয়। এই বৃদ্ধ যখন একঘেয়ে খবর শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন মাঝে মাঝে ছেলের কাছ থেকে চিঠি এসেছে বলে' জাল চিঠি তাঁকে শোনানো হত; তখন তাঁর ছেলে জার্ম্মানদের এক কেল্লায় কয়েদ হয়ে বন্ধ আছেন।

সেই তরুণী তার বাপের কোনো খবরই পায় না, সমস্ত জগৎ থেকে বিযুক্ত বন্ধ হয়ে তিনি আছেন, হয়ত তিনি আহত, হয়ত তিনি পীড়িত! কিন্তু তবু তাকে নিত্য নূতন আনন্দসংবাদ উদ্ভাবন করে হাসিমুখে তার ঠাকুরদাদাকে শোনাতে হত!—তা দেখে তরুণীটির বেদনায় আমার সমস্ত প্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে উঠত। মাঝে মাঝে সে আর প্রাণ ধরে এই-সব মিথ্যার খেলা খেলতে পারত না; কাজেই মাঝে মাঝে নূতন জয়ের খবর উদ্ভাবন করা বন্ধ থাকত। এতে সেই বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে

উঠে রাত্রে আর ঘুমোতে পারতেন না। তখন হঠাৎ আবার একদিন জার্ম্মানী থেকে চিঠি এসে পৌঁছত, আর সেই তরুণী উচ্ছ্বসিত অশ্রু সবলে দমন করে হাসিমুখে সেই চিঠি ঠাকুরদাদাকে পড়ে শোনাত। বৃদ্ধ খুব গম্ভীর হয়ে শুনতেন, সৈন্যচালনার সমালোচনা করতেন, পরে কি হবে আন্দাজ করতেন, আবার যে ব্যাপারটা একটু অস্পষ্ট মনে হত সেটা আমাদের বুঝিয়ে দিতেন।

কিন্তু তিনি তাঁর ছেলের জাল চিঠির উত্তরে যা লিখতে বলতেন সেইগুলিই সব চেয়ে চমৎকার—"ভুলে যেয়ো না যে, তুমি ফরাশী। ঐ-সব হতভাগ্য বেচারাদের সঙ্গে খুব সদয় উদার ব্যবহার কোরো। তাদের পরাজয়ের গ্লানি যেন অত্যাচারে ভীষণ দুর্ব্বহ হয়ে না ওঠে। ......" তিনি পুত্রকে বিজিত দেশ ও পরাজিত শত্রুর প্রতি সদয় উদার ব্যবহার করবার এমনি-সব উপদেশ দিতেন। তিনি কোনো রকমে কড়া হতে চাইতেন না।—"শুধু যুদ্ধের কর আদায় করে' ছেড়ে দিয়ো, আর কিছু কোরো না......কোনো দেশ বাজেয়াপ্ত করে' ফল কি?...... জার্ম্মানী দখল করে' ফ্রান্স কি কখনো তাকে ফ্রান্স করতে পারবে?"......তিনি এই-সমস্ত কথা এমন সহজ সরল ভাবে গৌরবের সহিত বলতেন, তাঁর স্বদেশের প্রতি তাঁর এমন অটল বিশ্বাস ফুটে উঠত, যে, সে-সমস্ত কথা অবিচলিত হয়ে শোনা দুঃসাধ্য বলে মনে হত।

এদিকে দিনের পর দিন অবরোধের কাজ এগিয়েই চলেছে, কিন্তু হায়, সে অবরোধ বার্লিনের নয়!...... এখন বিষম শীত, গোলার বৃষ্টি, মড়ক আর দুর্ভিক্ষ যেন ফ্রান্সের বুকের উপর চেপে বসেছে। কিন্তু আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন, সেবা, শুশ্রূষায় বৃদ্ধের মনের শান্তিময় আনন্দ ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুণ্ণ হতে পায়নি। শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি ভালো রুটি আর তাজা মাংস নিয়ে তাঁকে দেখতে যেতে পেরেছিলাম। এ সমস্তই কেবলমাত্র তাঁর জন্যে; সকলের ভাগ্যে এমন খাবার আর জুটছিল না। মিথ্যা জাতীয় জয়ের সংবাদে গর্ব্বিত সেই অজ্ঞান বৃদ্ধ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যখন আহার করতেন তখন সে যে কি রকম করুণ দৃশ্য, তা বলে' বোঝাতে পারব না।—বৃদ্ধ আনন্দে ও গর্ব্বে উৎফুল্ল হয়ে বিছানায় উঠে বসতেন; গলায় রুমাল বাঁধা; তাঁর পাশে তাঁর নাতনি, অল্পাহারে চিন্তায় একটু কৃশ ও বিবর্ণ, বৃদ্ধের হাত ধরে' ধরে' খাবারের ওপর দিয়ে দিচ্ছে, জল খাইয়ে দিচ্ছে, কষ্টে সংগৃহীত সেই সব সুখাদ্য খেতে ঠাকুরদাদাকে সাহায্য করছে!

বাহিরে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ, ভয়ানক শীতের কনকনে হাওয়া, তখন ঘরের ভিতর সুখাদ্য খেয়ে আর আগুনের গরমে বৃদ্ধ বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠছিলেন। একশ বার শোনা হলেও আবার তিনি আমাদের শোনাতেন, এই দারুণ শীতের সময় বরফের মধ্যে দিয়ে তাঁরা কেমন করে' মস্কো থেকে পলায়ন করে ফিরেছিলেন, খাদ্যের অভাবে কেমন করে' তাঁদের শুধু বিস্কুট আর ঘোড়ার মাংস খেয়ে থাকতে হয়েছিল। গল্প বলা শেষ করে তিনি নাতনিকে বলতেন "ওরে, তুই কি বুঝতে পারবি সে কী কষ্ট! শুধু ঘোড়ার মাংস খেয়ে থাকা!" তার নাতনি তা বিলক্ষণই বুঝতে পারছিল, কারণ গত দুমাস তার ভাগ্যে ঐ ঘোড়ার মাংস ছাড়া আর কোনো খাবারই জোটেনি।

দিনের পর দিন রোগী যতই সুস্থ সবল হয়ে উঠতে লাগলেন, আমাদের কাজও ক্রমশ তত কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতকাল আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে থেকে আমাদের কাজে সাহায্য করছিল; এখন সে-সমস্তও প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে লাগল।

দুতিনবার কেল্লার সমস্ত কামানের একসঙ্গে ভীষণ গর্জ্জন বৃদ্ধের কানে এসে পৌঁছতেই তিনি শিকারী কুকুরের মতো কান খাড়া করে' উঠলেন। আমাদের আবার নূতন নূতন জয়ের খবর তৈরি করে' করে' শোনাতে হল—বার্লিনের শহরসীমায় আমাদের জয় হয়েছে, সেই জয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্যে কামান আওয়াজ হচ্ছে। একদিন তিনি বিছানাটা টানিয়ে নিয়ে গিয়ে জানালার কাছে বসেছেন, তিনি দেখতে পেলেন শহর রক্ষার জন্যে শহরের সকল লোক সমবেত হয়ে কাওয়াজ করছে। তাই দেখে বৃদ্ধ বলে উঠলেন—"এসব কি সৈন্য? এসব কি?" তারপর আমরা শুনতে পেলাম বৃদ্ধ দাঁতে দাঁত

রেখে গর্জ্জে উঠলেন—"বে-তরিবৎ! আনাড়ি সব কোথাকার! এই কি কাওয়াজ হচ্ছে!"

সেদিন ভাগ্যে ভাগ্যে ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। তারপর সেই দিন থেকে আমরা অত্যন্ত সাবধানে তাঁকে পাহারা দিয়ে আগলে রাখতে লাগলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা যেমন আমি গেছি, সেই মেয়েটি একেবারে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে আমায় বল্লে—"কি হবে? কাল যে ওরা শহরে আসবে!"

বৃদ্ধের ঘরের দরজা খোলা ছিল। আমি দেখলাম তাঁর মুখে এক রকম কি অসাধারণ ভাব ফুটে উঠেছে। হয়ত তিনি আমাদের কথা বুঝতে পেরেছেন। কেবল তফাত মাত্র এই যে, আমরা ভাবছিলাম জার্ম্মানদের কথা; আর তিনি ভাবছিলেন ফরাশীদের কথা। যে বিজয়যাত্রার জন্যে তিনি এতকাল অপেক্ষা করে' ছিলেন সেই বিজয়-মহোৎসব উপস্থিত—বিজয়ী ফরাশী সেনাপতি কুসুমাকীর্ণ পথ দিয়ে শহরে আসবেন, তুরী ভেরী বাজবে, তাঁর ছেলে বিজয়া সেনাপতির পাশে পাশে চলবে; আর তিনি, বৃদ্ধ রুগ্ন অপটু, তাঁর ঘরের বারান্দা থেকেই পূর্ব্বকালের মতন খুব গৌরবে ও আড়ম্বরে ছিন্ন বিজয়ী পতাকা আর বারুদের দাগে কালো ঈগল-আঁকা বিজিত পতাকাকে নমস্কার করে' অভ্যর্থনা করবেন।

হায় বৃদ্ধ জুভ! তিনি নিশ্চয় মনে করেছিলেন যে, আমরা তাঁকে এই বিজয় মহোৎসব দেখতে দেবো না, কারণ এই মহান্ দৃশ্য দেখে তাঁর মনে উত্তেজনা হতে পারে। এই জন্যে তিনি কারো সঙ্গে সে সম্বন্ধে কোনো কথাবার্ত্তাও কইছিলেন না। কিন্তু পরদিন প্রত্যুষে ঠিক যে সময়ে জার্ম্মান সৈন্য ধীরে ধীরে শহরের বুকের ওপর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন বারান্দার পাশের ঐ দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল, এবং সেই বৃদ্ধ কর্ণেল আপনার পুরাতন জমকাল উর্দ্দি পরে' উষ্ণীষ মাথায় দিয়ে প্রকাণ্ড তরোয়াল ঝুলিয়ে পুরা সৈনিকের বেশে বারান্দায় এসে সগৌরবে সিধা হয়ে দাঁড়ালেন। তা দেখে আমার মনে হল, মনের কতখানি জোর, প্রাণের কতখানি উত্তেজনা, এই-সমস্ত উর্দ্দির ভার সত্ত্বেও তাঁকে পায়ের ওপর খাড়া দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তিনি বারান্দার রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে দেখছিলেন—কি বিরাট জনতা কি দারুণ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে; ঘরে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ; সমস্ত পারী শহর একটা প্রকাণ্ড আতুরাশ্রমের মতন ম্রিয়মাণ বিমর্ষ হয়ে আছে; সর্ব্বত্রই নিশান ঝুলছে বটে, কিন্তু আশ্চর্য্য! সমস্তগুলিতেই শাদা জমির ওপর লাল ঢেরা কাটা; একজন লোকও বিজয়ী সৈন্যকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে তাদের সামনে এগিয়ে যাচ্ছে না!

এক মুহূর্ত্ত তাঁর মনে হল তাঁর বুঝি ভুল হয়েছে।...

কিন্তু না ত! ঐ যে বিজয়-তোরণের পশ্চাতে একটা গোলমাল উঠল, দিনের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল একটা কালো সৈন্যস্রোত ক্রমশ অগ্রসর হয়ে আসছে।......তারপর, অল্পে অল্পে সৈন্যদের উষ্ণীষের চূড়া চকচক করে জ্বলতে লাগল, ভেরীর শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল, আর পারীর বুকের ওপর সৈন্যচলার ধীরছন্দের পদশব্দ ও তরোয়ালের আঘাতশব্দ বিজয়ী জার্ম্মান সেনাপতির বিজয়যাত্রা ঘোষণা করে দিলে!......

সেই গম্ভীর ভীষণ নীরবতার বুক চিরে এক বিকট আর্ত্তনাদ শোনা গেল—"হাতিয়ার নাও!......হাতিয়ার ধর!......জার্ম্মান এল!......জার্ম্মান এল!"

অগ্রসাদী চারজন উহ্লান সৈন্য উপর দিকে চেয়ে দেখলে—বারান্দার উপর একজন দীর্ঘাকার বৃদ্ধ সৈনিক হাত নাড়তে নাড়তে কাঁপতে কাঁপতে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে গেল!......

কর্ণেল জুভকে এবার আর বাঁচানো গেল না।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

যশোহর-খুলনার ইতিহাস

(প্রথম খণ্ড)*

(সমালোচনা)

যশোহর-খুলনার নাম শুনিলেই মনে পড়ে বীর প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের কথা, মনে পড়ে সেই কপোতাক্ষ নদ যাহার তীরে নব্যবঙ্গের প্রথম কবি মধুসূদন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার যাহার

* শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ প্রণীত এবং চক্রবর্ত্তী, চাটার্জি এণ্ড কোং (কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

তীরে বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর মনে পড়ে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক দেশভক্ত শিশিরকুমার ও মতিলালকে। কিন্তু আলোচ্য ইতিহাসখানি পড়িয়া জানিলাম আরও কয়টি পুত্ররত্ন যশোহর মাতার ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়াছেন। অসাধারণ বিদ্বান ও ভক্ত রূপসনাতন যশোহরের, এবং বঙ্গসাহিত্যের চিরপ্রিয় মুসলমান হরিভক্ত হরিদাসও যশোহরের।

এহেন প্রদেশের ইতিহাস বঙ্গীয় পাঠকের নিকট একরূপ অজ্ঞাত ছিল বলিলেই চলে। এতদিন পরে একজন অক্লান্তকর্ম্মা দেশ-সেবকের যত্নে বঙ্গসাহিত্যের এই অমার্জ্জনীয় ত্রুটি দূরীভূত হইল দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি।

আলোচ্য গ্রন্থখানির একটি বিশেষত্ব সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "আমাদের দেশে প্রায় সকলেই দূরে বসিয়া ইতিহাস লিখেন। যিনি প্রতাপাদিত্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণসম্বলিত প্রকাণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও প্রতাপাদিত্যের লীলাক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নভেল নাটকের ত কথাই নাই; উহার সবগুলিই কলিকাতার দ্বারবদ্ধ দ্বিতল গৃহে বসিয়া লেখা হইয়াছে। চাক্ষুষ প্রমাণের মত প্রমাণ নাই; কোন দেশের ইতিহাস রচনার প্রথম স্তরে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইলে, পরে তাহার উপর ভিত্তি রাখিয়া ঐতিহাসিক সমালোচনা চলিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে দেখিতে পাই, গবেষণা মুলতবি রাখিয়া সমালোচনাটাই অগ্রে চলে। আমি এই রীতির অনুসরণ করি নাই। যশোহর-খুলনা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত বিবরণী আছে, তাহা চক্ষুর সম্মুখে উন্মুক্ত রাখিয়া কার্য্য করিয়াছি বটে, কিন্তু কিছু লিখিবার পূর্ব্বে নিজে না দেখিয়া বা কতিপয় স্থল অন্য দ্বারা এই কার্য্যের জন্য না দেখাইয়া, কিছু লিখি নাই।

"নিজে দেখিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে যে কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশ, পথের কষ্ট, প্রাণের ভয়, অর্থের অভাব, কার্য্যের অসুবিধা আমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দুর্গম সুন্দরবনে ভ্রমণ করিয়াছি, যেখানে প্রতিপলকে বা প্রতি-পদবিক্ষেপে ব্যাঘ্রের ভয়, সেখানেও আমি নির্ভয়ে সঙ্গীগণসহ ঐতিহাসিক চিহ্নের সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, নানা স্থানে বনে জঙ্গলে তন্ন তন্ন করিয়াছি, পদব্রজে দূর পথ অতিক্রম করিয়া স্ফূর্ত্তি রক্ষা করিয়াছি, অনাহারে অনিদ্রায় যে কত দিন গিয়াছে, বলিতে পারি না। কিন্তু যতই করি না কেন আমার চেষ্টা বা যত্ন যে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা কখনও বোধ করিতে পারি নাই।"

সাধু! গ্রন্থকার, সাধু! আপনার ন্যায় দুইচারিজন প্রকৃত সত্যান্বেষী, ঐতিহাসিকের আবির্ভাব দেখিয়া আশা হইতেছে অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গদেশের ইতিহাস কল্পনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পুস্তকখানির মধ্যে এতগুলি নূতন ও প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ রহিয়াছে যে তাহা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি গ্রন্থকারের সমুদায় ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

যশোহর খুলনার দক্ষিণ ভাগ কিছুকাল হইতে ভীষণ সুন্দরবনের অন্তর্গত। প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অনেকাংশ এখন জঙ্গলে আবৃত হইয়া সুন্দরবনের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার নিজে সুন্দরবনে ভ্রমণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রাচীনকালে মনুষ্যবসতির অনেক নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদগণও দেখাইয়াছেন যে সুন্দরবনে ২।৩ বার ভীষণ অবনমন (Subsidence) হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট যদি গ্রন্থকারের নির্দ্দেশ অনুসারে কয়েকটি স্থান খনন করেন তাহা হইলে অনেক লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ঘাটিত হয় সন্দেহ নাই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অগ্রজ রায় সাহেব নলিনীকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় একজন বিখ্যাত শিকারী—সুন্দরবন তাঁহার নখদর্পণ-স্বরূপ। ইঁহার সাহায্যেই গ্রন্থকার দুর্গম সুন্দরবনে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এইবার গ্রন্থকারের দুইটি প্রধান আবিষ্কারের কথা বলিব। একটি শিববাড়ীর বুদ্ধমূর্ত্তি, দ্বিতীয়টি দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা। শিববাড়ী নামক গ্রামে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি পাঠান আমল হইতে শিব বলিয়া হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছে। গ্রন্থকার সতীশ বাবুই প্রথম এই মূর্ত্তির প্রতিকৃতি ও বিবরণ প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার লিখিতেছেন—'বাবু গৌরদাস বসাক-লিখিত বাগেরহাটের বিবরণে বা ওয়েষ্টল্যাণ্ড-কৃত যশোহরের ইতিহাসে এ মূর্ত্তির উল্লেখ নাই। সাণ্ডার সাহেব তাঁহার ষাট গুম্বজ সম্বন্ধীয় পুস্তিকায় লিখিয়াছেন "শুনিয়াছি শিববাড়ীতে এক মূর্ত্তি আছে।" "খুলনা গেজেটিয়ার"-প্রণেতা বিখ্যাত ওমালী সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে "শিবমূর্ত্তিটি * শিববাড়ী গ্রামে আছে।" যাঁহারা বাগেরহাটের কীর্ত্তিকলাপের প্রামাণিক বিবরণী প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারা কিরূপে অদূরবর্ত্তী শিববাড়ীর মূর্ত্তিটি পরিদর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা বিস্ময়কর বটে।'

এই বুদ্ধমূর্ত্তি এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রমাণ হইতে গ্রন্থকার অনুমান করেন এক সময় যশোহর খুলনায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন ছিল।

গ্রন্থকারের দ্বিতীয় আবিষ্কার, দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা, অতিশয় বিস্ময়কর। এই মুদ্রার তারিখ ১৩০৯ শকাব্দা অর্থাৎ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ। সেই সময়, (পাঠান আমলে) দনুজমর্দ্দনদেব নামক একজন কায়স্থ এবং 'শ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ' উপাধিভূষিত শাক্ত হিন্দু চন্দ্রদ্বীপ প্রদেশে রাজ্য সংস্থাপন করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। তাহা হইলে ইনি একজন স্বাধীন বাঙ্গালী রাজা ছিলেন বুঝিতে হইবে। এই দনুজমর্দ্দনের বিষয় আরও কিছু জানিবার জন্য বঙ্গবাসী ব্যগ্র রহিলেন। †

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসেরও অনেক প্রয়োজনীয় কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মধুসূদন দত্ত এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ পাঠান আমল হইতে কিরূপ জমিদার বলিয়া সম্মানিত ছিলেন, কিরূপে এই-সকল ক্ষমতাশালী কায়স্থ জমিদারগণ কুলীন কায়স্থ এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করিয়া এ অঞ্চলের বাসিন্দা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া বল্লাল সেন সমস্ত জাতির মধ্যে কৌলিন্যপ্রথার প্রচলন করেন, সেই সকল কথা গ্রন্থকার তাঁহার সুললিত ভাষার সাহায্যে মনোরম করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। গ্রন্থকার মনে করেন যোগী জাতি ও সুবর্ণ-বণিক জাতি পূর্ব্বে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল বলিয়াই, হিন্দুসমাজে তাহাদের

---

* মূর্ত্তিটি কিন্তু একেবারে শিবেরই নহে—বুদ্ধের।

† এ বিষয়ের সবিস্তার বিবরণ "প্রবাসী" ১৩২৯, শ্রাবণ, সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল

স্থান নিয়ে। এ মতটি তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট প্রমাণের অভাব রহিয়াছে। বরং যোগীজাতির সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ আছে, কিন্তু সুবর্ণবণিকগণের সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই বলিলেই চলে। যাহাহউক এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

গ্রন্থকার প্রারম্ভপত্রে শ্রীশ্রীযশোরেশ্বরী দেবীর একটি সুন্দর রঙিন ছবি দিয়াছেন। এই মূর্ত্তি কালীঘাটের কালীমূর্ত্তির অনুরূপ (কেবল হস্তবিহীন)—উভয় দেবীই অতি প্রাচীনকাল হইতে (তন্ত্রের মতে সত্যযুগ হইতে) প্রতিষ্ঠিত আছেন। একবার সুন্দরবন নিমজ্জিত হওয়ার সঙ্গে যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তি ভূপ্রোথিত হইয়া পড়ে। প্রতাপাদিত্যের সময় পুনরায় সে মূর্ত্তির আবির্ভাব ও মন্দির নির্ম্মিত হয়।

"কালীঘাটে মহাকালী ও যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তির পৌরাণিকতা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এই-সকল শ্রীমূর্ত্তির অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য ...... এই-সকল প্রাচীন মূর্ত্তিতে আকারানুকরণ ভাল হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ ভারত-শিল্পীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের শিল্প নিরাকারকে আকার দিতে যাইয়া প্রকৃতভাবে আকারসর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে নাই, পরন্তু কঠিন প্রস্তরফলকে অনাড়ম্বর ভাবে যে দেবভাব ফলাইয়াছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। এ সম্বন্ধে এক কৃতী লেখক (শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়) * অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—"মৃত্যুর মধ্যে অমৃত কি কৌশলে সৃষ্টিপ্রবাদ রক্ষা করিয়া থাকে তাহা অন্য দেশের শিল্পকার অভিব্যক্ত করেন নাই। যাহা বাহ্যদৃষ্টিতে মৃত্যুমূর্ত্তি, তাহাও বিশ্বমাতার শ্রীমূর্ত্তি মাত্র; ইহা ভারতশিল্পেই অভিব্যক্ত।" "মাতা যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তি এইরূপ একটি মৃত্যু-মূর্ত্তি বটে, তাঁহার অতি-বিস্তার-বদনা, জিহ্বাললনভীষণা মূর্ত্তি দর্শকমাত্রেরই প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দেয় বটে, কিন্তু তবুও সেই জ্বালাময়ী মূর্ত্তির বদনমণ্ডলে কি জানি কি এক অপূর্ব্ব দেবভাব কেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। উহা সেই প্রাচীন যুগেরই সম্পত্তি, এ যুগের নহে।" (১৫৮ পৃঃ)

আলোচ্য পুস্তকখানি যশোহর খুলনার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড মাত্র। ইহাতে (ক) প্রাকৃতিক এবং (খ) ঐতিহাসিক বিভাগ (প্রাচীন যুগ হইতে পাঠান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত) প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মোগল ও ইংরেজ আমলের ইতিহাস থাকিবে এবং তৃতীয় খণ্ডে খণ্ডবিবরণী ও আভিধানিক অংশ গ্রহণ করা যাইবে। এই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ পুস্তক শেষ হইবে। দ্বিতীয় খণ্ড সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রস্থ হইতেছে। উহাতে প্রথমেই বারভূঞার আবির্ভাবের কথা দিয়া পরে প্রতাপাদিত্যের দীর্ঘকাহিনী আরব্ধ হইবে। পরে যথাস্থানে সীতারামের ইতিহাস, চাঁচড়া, নলডাঙ্গা প্রভৃতি রাজবংশ এবং নড়াইল, সাতক্ষীর', প্রভৃতি জমিদার-বংশের বিবরণ থাকিবে।

পুস্তকখানির পত্রসংখ্যা ৪০৫। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। ইহাতে ৪১ খানি পরিষ্কার চিত্র এবং ৩ খানি পরিষ্কার মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। এই সুপাঠ্য, সুমুদ্রিত পুস্তকখানির জন্য পাঠককে গ্রন্থকারের সহিত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকেও ধন্যবাদ দিতে হইবে, কেননা গ্রন্থখানি আচার্য্যেরই প্ররোচনায় লিখিত এবং তাঁহারই যত্নে ও অর্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য যে আজকাল বঙ্গদেশে অনেক বাংলা লাইব্রেরী বা পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। সেইসকল পাঠাগার এবং ধনমানী ব্যক্তি যদি প্রত্যেকে একখানি করিয়া এই পুস্তক ক্রয় করেন তাহা হইলে বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারে অথচ দেশসেবক, দরিদ্র, শিক্ষকতা-ব্যবসায়ী গ্রন্থকারকেও তাঁহার সৎকার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয়।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

* বঙ্গদর্শনে "শ্রীক্ষেত্র" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

পরিচয়

(গল্প)

১

সেদিন বিকাল হইতে টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছিল, সন্ধ্যা-কালেই অপরাজিতা ভাবিতেছিল—ভারি রাত হইয়া গিয়াছে!

অসুস্থা মাতা আর সেদিন নীচে নামেন নাই; সন্ধ্যার সময় তিনি অপরাজিতাকে বলিলেন—"পরি, তোর বাবা নীচে একলা রয়েছেন, সেখানে একটু যা।"

অপরাজিতা ঘর হইতে বাহিরে আসার সময় ভাবিল—এখনও কি আর একা আছেন!

সত্যসত্যই তখনও তিনি একলা ছিলেন। অপরা-জিতা পিতার পার্শ্বে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতে-ছিল আর ভাবিতেছিল—অনেক রাত হইয়া গেল!

এমন সময়ে অসীমসুন্দর সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অসীমসুন্দর মোহিতবাবুর বন্ধুপুত্র। কলিকাতায় এম্, এ পড়ে। মোহিতবাবুর বাড়ীতে প্রথমে সে তাহার পিতার সঙ্গে আসে। তখন তাহার পিতা বন্ধুর উপর স্বীয়পুত্রের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া যান। সেই অবধি অসীম মাঝে মাঝে মোহিতবাবুকে দেখা দিয়া যায়; মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিতও হয়। এখন মোহিতবাবুর স্ত্রী অসুস্থা হওয়া অবধি প্রত্যহই আসিয়া সংবাদ লইয়া যাইত।

তিন মাসের এই আলাপ; ইতিমধ্যে কবে যে সে অপরাজিতাকে 'আপনি' ছাড়িয়া 'তুমি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা অসীম নিজেই জানিত না। অপরাজিতা তখনও 'আপনি'ই বলিত।

রুগ্না স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া মোহিতবাবু পরদিনই ওয়ালটেয়ার যাত্রা করিবেন তাহার আয়োজন সকলই

ঠিক হইয়া গিয়াছে। মোহিতবাবুর সহিত এই বিষয়ে দুই চারিটা কথা কহার পর উপরে যাইবার সময় অসীম অপরাজিতার প্রতি চাহিয়া বলিল "এস, তুমি এখন উপরে যাবে না ?"

অপরাজিতা বিস্মিতা হইল, কারণ অন্য কোন দিন ত অসীম উপরে যাওয়ার সময় তাহাকে ডাকে না !

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে অসীম কহিল—"কাল হ'তে দু-মা-স আর দেখা হবে না। পরি, আমায় মাঝে মাঝে চিঠি লিখবে ত ?"

এ কি কথা ! অসীম যেন আজ কেমন হইয়া গিয়াছে ! "পরি" বলিয়া সম্বোধন করা এই তাহার প্রথম ! অপরাজিতা কোন উত্তর দিল না।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অসীম দ্বারদেশের অস্পষ্টালোকে অপরাজিতার প্রতি চাহিয়া দেখিল—তাহার মুখ দেখিয়া বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না ;—অপরাজিতা কি রাগ করিয়াছে ?—ছিঃ—অকস্মাৎ অত পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ সে করিল কেন।

তাহার পর আর কোন কথা হইল না।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে অসীম ষ্টেশনে গিয়াছিল। তখন রাত্রি ;—সেখানকার উজ্জ্বলালোকে অসীম গতরাত্রির কথাটার জন্য লজ্জিত হইয়া পড়িল। মোহিতবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর সহিতই সমস্তক্ষণটা কথাবার্ত্তা কহিল ! অবশেষে গাড়ী ছাড়িলে অসীম যখন অপরাজিতার প্রতি তাকাইয়া নমস্কার জানাইল তখন দেখিল— বালিকা বিদেশ-গমনোৎসাহিতা; তাহার মুখে সহানুভূতির লেশমাত্রও নাই !

ক্ষুণ্ণমনে উদাসভাবে অসীম গৃহে ফিরিয়া গেল।

২

ওয়ালটেয়ারে তখন অনেকেই বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিয়াছে। মোহিতবাবুর পরিচিতের মধ্যে এক গগনবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ সেখানে পূর্ব্বেই গমন করিয়াছিলেন। গগনবাবু মোহিতবাবুর আগমনের দিন ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে যান ও সেদিন তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। গগনবাবুর এক পুত্র ও এক কন্যা। তাঁহার কন্যার সহিত অপরাজিতার এক দিনেই সখীত্ব হইয়া গেল। পুত্র হিরণ্ময় সেবার হাজারিবাগ হইতে বি, এ পাশ করিয়াছে। এম্, এ আর পড়িবে না।

হিরণ্ময় বেশ চতুর যুবক। মোহিতবাবু ও তাঁহার স্ত্রী যখন গল্পপ্রসঙ্গে অসীমসুন্দরের কথা পাড়িলেন তখন অপরাজিতার ঈষৎ সতর্ক মুখভাব দেখিয়াই সে কিছু অনুভব করিয়া লইল। বিশেষতঃ অসীমকে সে ভালরূপে চিনিত ; হাজারিবাগে উভয়ে সহপাঠী ছিল এবং একসঙ্গেই বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সহপাঠী হইলেও উভয়ের মধ্যে সখ্য ছিল না।

হাজারিবাগে হিরণ্ময়ের একটা দল ছিল। ইহারা রীতিমত সাহেবিয়ানা করিয়া কাল কাটাইত। ইহারা চোঙ্গা পায়জামা পরিধান করিত, মস্তকে ঢাকনা দিত, গলদেশে শক্ত বস্ত্রখণ্ড আঁটিয়া উন্মুখ হইত, ও সেই কঠিন বস্ত্রখণ্ডের উপরে রঙ্গিন বস্ত্রখণ্ডের গ্রন্থি বাঁধিত। তাহাদের ক্লাবগৃহ ছিল। সেখানে সাহেবী ক্রীড়া-কৌতুকাদি হইত ও মাঝে মাঝে ভোজও হইত। ভোজের শেষে মাদক পানীয় সেবন একটা বিশেষ সভ্যতার মধ্যে। এটা যখন তাহারা একটু করিয়া আরম্ভ করিল তখন আপনাদিগের উন্নত সংস্কারে তাহাদিগের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই সকল বাবু-সাহেবদিগকে হোষ্টেলের সাহেব তত্ত্বাবধায়ক বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

অসীম যেদিন এই উন্নতির প্রথম পরিচয় পাইয়া হিরণ্ময়কে ও তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সাবধান করিয়া দেয়, সেইদিন তাহার এই রীতি-বিরুদ্ধ অনধিকার-চর্চ্চার জন্য উহারা অসীমের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে ও সেইদিন হইতে শত্রুতা আরম্ভ হয়। পরে ক্রমশঃ পানের মাত্রা চড়িতে আরম্ভ করিল। একদিন নেশার ঝোঁকে উভয়ে আসিয়া সাহেবীধরণে অসীমকে গালি দিয়া পদাঘাত করে। অসীম পুরুষোচিত বলবীর্য্যশালী, শয়ন করিয়া ছিল, ক্রোধে উঠিয়া প্রহারের চোটে উভয়কে ভূমিশায়ী করিয়া দিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের রাগ হইল অসীমের উপর ! কারণ শ্রদ্ধেয় হিরণ্ময় অতি বিনীতভাবে বাছা বাছা ইংরেজীতে অসীমের অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া দিল। ফলে অসীমের অসদাচরণের জন্য তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে হইল !

অসীম যে সাহেবের কাজীর বিচারে জরিমানা দিয়াছিল একথা সে নিজেই মোহিতবাবুর বাড়ীতে সর্ব্বসমক্ষেই ইতিপূর্ব্বে গল্প করিয়াছিল, কিন্তু কেন তাহা প্রকাশ করে নাই!

আজ ভগ্নী ও অপরাজিতার সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া, হিরণ্ময় অসীমের শত্রুতা সাধিল। সে কথায় কথায় অসীমের কথা পাড়িল ও তাহার পর রং ফলাইয়া অসীমের জরিমানার কথাটা এইরূপে গল্প করিল—যে, অসীম চিরকালই একটু একটু মদ খায়; একবার সে মাতাল হইয়া আসিয়া হোষ্টেলের সকলকে গালি দেয় ও প্রহার করিতে উদ্যত হয়। কথাটা এতদিন চাপা ছিল, এইবার সাহেবের কানে উঠিল, তখন অনেক সাধ্যসাধনার পর, হিরণ্ময়েরই একান্ত চেষ্টায় সামান্য অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পায়!

তখন সন্ধ্যা হয় হয়, অপরাজিতা একটা বালুকাস্তূপের উপর বসিয়া পড়িল। সেই উন্মুক্ত সাগরতীরে সান্ধ্যসূর্য্যের যে গোলাপী আভা লাগিয়া তাহার মোহিনী শোভা পরিস্ফুট করিতেছিল তাহা এখন বহুদূরাবস্থিত জলধররাশির পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগের বর্ণবৈচিত্র্য ঘটাইতেছিল। সম্মুখে সমুদ্রজল হইতে সান্ধ্য অন্ধকার অগ্রসর হইতেছিল। অপরাজিতার মুখমণ্ডল বিবর্ণ, চক্ষু বহুদূরে সমুদ্রোপরি যেখানে দুইটি পক্ষী চক্রাকারে ঘুরিতেছিল, সেখানে চাহিয়া আছে। তাহার সখী ভীতা হইল, কহিল, "আজ অনেক বেড়ান হয়েছে, চল ফিরি।"

অপরাজিতা উঠিল, তাহার মুখের বর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে, চক্ষু স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু সে সারা পথটায় কোন কথা কহিল না। গৃহে ফিরিয়া, সকলে মিলিয়া যেখানে চা পান করিতে করিতে আমোদালাপে রত ছিলেন সেদিকে না চাহিয়া, সে একেবারে স্বীয় কক্ষে চলিয়া গেল।

৩

দুইমাস কাটিয়া গিয়াছে। মোহিতবাবুরা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন; সঙ্গে হিরণ্ময়ও আসিয়াছে, কারণ সে এখন আইনবিদ্যার্থী।

অসীম সংবাদ পাইয়া প্রথম যেদিন দেখা করিতে আসে সেদিন অপরাজিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সে তখন হিরণ্ময়ের সহিত বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছিল। অসীম পরদিন আসিল ও পুনরায় ফিরিল। এমনই করিয়া দশ বার দিবস কাটিল—অপরাজিতার সাক্ষাৎ মিলিল না। হিরণ্ময়ের আগমনের বার্ত্তা শুনিয়া অসীম সুখী হইল না।

অবশেষে দেখা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া অসীম সেদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। হিরণ্ময় কি হাসির কথা কহিয়াছিল, উভয়ে হাস্য করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল। অসীম দেখিল—আনন্দ-উপভোগরতা বেশ মনের সুখেই আছে। অপরাজিতা তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

কিন্তু অসীমের মনে যে সন্দেহ হইয়াছে তাহার শেষ মীমাংসা না দেখিয়া সে আজি যাইবে না,—তাই অপরাজিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেও উপরে উঠিয়া গেল। অসীম দেখিল অপরাজিতা একখানা আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িয়াছে। ঝোঁকের মুখে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার বড় লজ্জা বোধ হইল, ভাবিল—এরূপভাবে আসাটা ভাল হয় নাই;—কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় ছিল না! অপরাজিতার মুখের দিকে চাহিয়া, সে আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিচিতভাবে কথা কহিতে পারিল না; বলিল—"আজ দেখা না করে ফিরব না স্থির করেছিলাম।"

অপরাজিতার বদন গম্ভীর ও ঘৃণাব্যঞ্জক; সে কোন উত্তর দিল না।

অসীম আবার কহিল—"আমার সঙ্গে বাক্যালাপ ত্যাগ করা কি অভিপ্রায় করেছেন?"

অপরাজিতার ক্রোধ তখন মস্তকে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। সে তীব্রভাবে কহিল—"কেন আপনি আমায় অপমান করতে এসেছেন?"

অসীম আর দাঁড়াইল না। ক্ষিপ্রগতি একেবারে কোলাহলময় রাস্তায় নামিয়া আসিল। অপরাজিতা গিয়া জানলায় দাঁড়াইল। অসীম তখন ভিড় ঠেলিয়া হনহন করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে।

অসীম নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, অপরাজিতা কিন্তু বহুক্ষণ সেই জানালাতেই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অসীম আপনার ঘরে গিয়া আরামকেদারায় ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার দৃষ্টি শূন্য। সে ভাবিতেছিল—কই, এমন একদিনের কথাও ত মনে পড়ে না, যেদিন অপরাজিতার সামান্য কথায়, ভাবে, ভঙ্গীতে কণামাত্রও অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল; তবে কেন সে তাহাকে আপন হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল?

সম্মুখে অপরাজিতার ফটোগ্রাফখানি। সে উঠিয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি গৃহ হইতে নিক্ষেপ করিবার সময় অসীম ভাবিল—বিসর্জ্জন দিলাম।

কিন্তু এরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া নিয়মিত ভাবে পূর্ব্বের ন্যায় ফিরিয়া বেড়ান অসম্ভব। অসীম কিছুদিনের জন্য দূরদেশে যাওয়ার আয়োজন করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; দ্বারে গাড়ী দাঁড়াইয়া; অসীম তখনই কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় সে মোহিতবাবুর এক পত্র পাইল। তিনি লিখিয়াছেন

'বাবা অসীম,

গগনবাবু তাঁহার পুত্র হিরণ্ময়ের সহিত আমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া কল্য আমায় পত্র পাঠাইয়াছেন। ওয়াল্‌টেয়ারে তাঁহারা সকলেই অপরাজিতার রূপগুণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই উহাকে পুত্রবধূ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যতদূর বুঝিলাম তাহাতে অপরাজিতার এ বিবাহে কোন আপত্তি নাই। শুনিয়াছি হাজারিবাগে তুমি হিরণ্ময়ের সহপাঠী ছিলে। এ বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ করিতে চাহি।

তুমি আজ রাত্রে এখানে আহার করিবে। ইত্যাদি—'

অসীম যখন এই পত্র পাঠ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে অপরাজিতার কক্ষে হিরণ্ময় অপরাজিতাকে বলিতেছিল—"পরি,—sweet পরি,—my sweet angel." এই বলিয়া হিরণ্ময় অপরাজিতার করধারণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিল।—তাহার মুখে বিকৃত গন্ধ, চক্ষু রক্তিমাভ ও বিজয়োৎফুল্ল, কথায় একটা অস্বাভাবিকতা।—অপরাজিতা আশ্চর্য্যান্বিতা;—সে পিছু হাটিয়া গেল।

অসীম তখনই পত্রের উত্তর লিখিল—

'পূজনীয়েষু—

আপনার পত্র এইমাত্র পাইলাম, কিন্তু এই রাত্রেই পিতৃসমীপে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। এই নিমিত্ত আপনার সহিত এখন সাক্ষাৎ করিতে অপারগ হইলাম। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ইত্যাদি'—

হিরণ্ময়ের ভঙ্গী ও ভাবে অপরাজিতার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। সাহেব যে কাজীর বিচার করিয়াছিল সে গল্পের কথা মনে পড়িল। উদ্বেলিত হৃদয়াবেগে তাহার প্রাণটা কেবল হায় হায় করিতে লাগিল—কী করিয়াছি! দেবতার মত তুমি—তোমার চরিত্রে কেন আমি অবিশ্বাস করিলাম! ক্ষমা কি আর পাইব না? যদি তোমার পায়ে ধরিয়া কাঁদি তবু কি তুমি নির্ম্মম হইয়া রহিবে?

৪

হিরণ্ময়ের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে মোহিতবাবুর আতিথ্য ছাড়িয়া ছাত্রাবাসে স্থান লইয়াছে।

বহুদিন গেল; কিন্তু হায় কোথায় তিনি! অপরাজিতা উদ্‌গ্রীব হইয়া সতর্ককর্ণে প্রতিসন্ধ্যায় তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। কোথায় সেই চিরসঙ্গীতময় পদধ্বনি! সময় বড় নিষ্ঠুর; সে প্রতিরাত্রে আপনার জয়ডঙ্কার শব্দ করিয়া অপরাজিতার কর্ণে, নির্ম্মম ভাবে, হতাশার সুর বাজাইয়া দিয়া যায়।

অসীম বিদেশ হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিল; ভাবিল এতদিনে সকলই ভুলিয়াছি। সে কিছুদিন পরে মোহিতবাবুর এক পত্র পাইল। পত্রখানি এইরূপ—

'বাবা অসীম,

এতদিন পরে ফিরে এলে, তা সে সংবাদও তোমার পিতার পত্রে জানিতে হইল! তুমি আর পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা রাখনা কেন? তোমার অভাবে আমরা সকলেই বিমর্ষ আছি।

অদ্য নিশ্চয় দেখা করিবে। এখানে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল। ইত্যাদি।'

অসীম যাইবে কি? প্রথমেই মনে হইল—ছিঃ, বড় অন্যায় করিয়াছি, যাইব।—কিন্তু।—কিন্তু আর কি,

আমি ত এখন নির্ব্বিকার! কিন্তু—মোহিতবাবুর গৃহ যদি শূন্য হয়!—তাতে আমার কি?—যাইব।

বাড়ীটা ফাঁকা-ফাঁকাই ত বটে! মোহিতবাবু বাহিরের ঘরে একাকী বসিয়া ছিলেন। "এস বাবা এস, তোমার অপেক্ষাতেই ব'সে আছি।" অসীম নমস্কার করিল। কিছুক্ষণ গল্প করিয়া মোহিতবাবু বলিলেন—এঁরা বোধ হয় উপরে ছাতে আছেন, উপরে যাও, দেখা ক'রে এস।"

"হাঁরে দুষ্টু ছেলে"—বলিয়া মোহিতবাবুর স্ত্রী অসীমকে আদরের ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অপরাজিতা—লজ্জানম্রা—এ-ত সুন্দরী! কিন্তু তার সীমন্ত—!—আঃ বাঁচা গেল সে আশঙ্কা নাই—বাঁচা গেল।—ছিঃ! এ ভাবনা আবার আমার মনে আসে কেন?

কিছুক্ষণ পরে মোহিতবাবুর স্ত্রী নামিয়া আসিলেন। আসিবার সময় তিনি কপটগাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন—"এখনই আবার আসছি। একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে আজ নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তাঁর জন্যে আয়োজনের ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি।"

তখন অসীমও উঠিল। সে আলিশায় দেহ হেলাইয়া দাঁড়াইয়া নিম্নে পথের উপরকার জনসঙ্ঘ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। হঠাৎ কি কারণে সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল পিছনেই অপরাজিতা অধোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অপরাজিতা কহিল—"আ-মি—আমি যে অপরাধ করেছি তার জন্যে ক্ষমা কর।"

অসীম—"অপরাধ! কিসের অপরাধ? কার কাছে অপরাধ করেছেন? আপনি হয় ত ভুল—

আর বলা হইল না। অপরাজিতার আয়ত ঘনকৃষ্ণতার লোচনযুগল হইতে দুইটি মুক্তার ছড়া গোলাপক্ষেতে পতিত হইল;—অসীমের কাছে সেই সজল ব্যথাব্যঞ্জকদৃষ্টির কৃপাভিক্ষা!—অসীম কি বলিতেছিল ভুলিয়া গেল। অপরাজিতা ভূমিষ্ঠ হইয়া অসীমসুন্দরকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

ঊর্দ্ধে অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় আকাশ—নিস্তব্ধ। নিম্নে নিস্তব্ধ তাহারা;—অসীমসুন্দর আকাশের সেই চিরশান্তিময় পরিপূর্ণতা অনুভব করিতেছিল,—আর অপরাজিতার মনে কি হইতেছিল কে জানে? পদতলে কোলাহলময়ী পৃথিবীর কোন শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। অপরাজিতাকে পদতল হইতে তুলিয়া কণ্ঠস্বরে প্রণয়ের কোমল মধুরিমা ঢালিয়া দিয়া অসীমসুন্দর ডাকিল—"প-রি!"

শ্রীরণজিৎকুমার ভট্টাচার্য্য।

পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান-মধ্যে একটি নির্ঝর।

[পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ্ডার প্রবেশ]

পিলীয়াস

আমি কোথায় তোমায় এনেছি তা তুমি জান? দুপুর বেলা বাগানে যখন খুব গরম বোধ হয়, তখন আমি প্রায়ই এখানে এসে বসে থাকি। আজ ভারি গুমট গরম, গাছের ছায়াতেও।

মেলিস্যাণ্ডা

ওঃ! জলটি বেশ পরিষ্কার...

পিলীয়াস

আর শীতের মত ঠাণ্ডা। এটা একটা পুরাতন পরিত্যক্ত ঝরণা। সকলে বলে যে, আগে এর ভারি অদ্ভুত গুণ ছিল,—এর জলে অন্ধের দৃষ্টি হত—এখনও একে "অন্ধের নির্ঝর" বলে।

মেলিস্যাণ্ডা

আর কি এতে অন্ধের চোখ হয় না?

পিলীয়াস

এখন রাজাই নিজে প্রায় অন্ধ! কেউ আর এখানে আসে না...

মেলিস্যাণ্ডা

এখানটা কি নির্জ্জন নিস্তব্ধ!... একটুও শব্দ শুনতে পাবার জো নেই।

পিলীয়াস

এখানটা সর্ব্বদাই আশ্চর্য্য নিস্তব্ধ...জলের নিস্তব্ধতা যেন কানে শুনতে পাওয়া যায়! মর্ম্মরের জলাধারের ধারে বসবে? একটা লেবু গাছ রয়েছে, সূর্য্যের আলোর স্পর্শ কখনো সে পায়নি...

মেলিস্থাণ্ডা

আমি মর্ম্মরের উপর শুয়ে পড়ছি।—আমি এই জলের তল দেখতে চাই...

পিলীয়াস

কেউ তা এ পর্য্যন্ত দেখতে পায়নি। সমুদ্রের মত বোধ হয় এটা গভীর। এ জল কোথা হতে আসে তা কেউ জানে না। বোধ হয় পৃথিবীর একেবারে সেই বুকের ভিতর থেকে...

মেলিস্থাণ্ডা

যদি তলায় কিছু ঝক্‌ঝক্ করে তা হলে দেখতে পাওয়া যাবে বোধ হয়...

পিলীয়াস

সামনে অত বেশী ঝুঁকো না...

মেলিস্থাণ্ডা

আমি জলটা ছুঁতে চাই...

পিলীয়াস

দেখো যেন পড়ে যেয়ো না...আমি তোমার হাত ধরে থাকছি...

মেলিস্থাণ্ডা

না, না, আমি দুই হাতই ডুবাতে চাই... মনে হচ্ছে যেন আমার হাত দুখানার আজ অসুখ হয়েছিল...

পিলীয়াস

ওঃ! ওঃ! সাবধান! সাবধান! মেলিস্থাণ্ডা!... মেলিস্থাণ্ডা!...—ওঃ! তোমার চুল!...

[মেলিস্থাণ্ডা [উত্থিত হইয়া]

পারলাম না, আমি ছুঁতে পারলাম না...

পিলীয়াস

তোমার চুল জলে ডুবেছিল...

মেলিস্থাণ্ডা

হাঁ, হাঁ; চুল আমার হাতের চেয়ে বড়... আমার চেয়েও বড়...

[নিস্তব্ধভাব।]

পিলীয়াস

ও তোমায় আর-একটি ঝরণারই পাশে পেয়েছিল?

মেলিস্থাণ্ডা

হাঁ...

পিলীয়াস

কি বলে তোমায় কথা বললে?

মেলিস্থাণ্ডা

কিছুই না;—আমার মনে নেই...

পিলীয়াস

ও তোমার খুব কাছে ছিল?

মেলিস্থাণ্ডা

হাঁ; ও আমার চুম্বন চাইলে।

পিলীয়াস

আর তুমি তা দিলে না?

মেলিস্থাণ্ডা

না।

পিলীয়াস

কেন না?

মেলিস্থাণ্ডা

ওঃ! ওঃ! জলের তলে কি যেন গেল দেখলাম...

পিলীয়াস

সাবধান! সাবধান! পড়ে যাবে! কি নিয়ে খেলা করছ?

মেলিস্থাণ্ডা

ওর দেওয়া আংটীটা নিয়ে...

পিলীয়াস

সাবধান! হারিয়ে ফেলবে...

মেলিস্থাণ্ডা

না, না; হাত আমার ঠিক আছে...

পিলীয়াস

এত গভীর জলের উপর ও-রকম করে খেলা কোরো না...

মেলিস্থাণ্ডা

হাত আমার স্থির রয়েছে।

পিলীয়াস

আলোয় কি সুন্দর ওটা ঝক্‌ঝক্ করছে! অত উপর দিকে ওটা ছুড়ে দিও না...

মেলিসাণ্ডা

যাঃ !...

পিলীয়াস

পড়ল না কি ?

মেলিসাণ্ডা

জলে পড়ে গেছে !...

পিলীয়াস

কোথায় ? কোথায় ?...

মেলিসাণ্ডা

জলে ওটার যাওয়া আমি দেখতে পাচ্ছি না...

পিলীয়াস

ঐ ঝক্‌ঝক্ করছে মনে হচ্ছে...

মেলিসাণ্ডা

আংটীটা আমার ?

পিলীয়াস

হাঁ, হাঁ ; ঐ ওখানে...

মেলিসাণ্ডা

ওঃ ! ওঃ ! আমাদের হতে অনেক দূরে ওটা !... না, না, ওটা নয়...সেটা হারালাম...হারালাম...জলের উপর একটা মস্ত ঊর্ম্মিচক্র ছাড়া আর কিছুই নাই...কি করব ? কি করব এখন আমরা ?...

পিলীয়াস

আংটী একটার জন্যে অত ব্যস্ত হয়ো না। যেতে দাও...হয়ত আবার আমরা ওটা খুঁজে পাব। না হয় আর একটা পাওয়া যাবে এখন...

মেলিসাণ্ডা

না, না ; আর ওটা পাওয়া যাবে না, অন্য একটাও আর পাওয়া যাবে না...আমার মনে হল হাতে ওটা আমি ধরেছি যেন...হাতে বন্ধ করে ফেললাম, তবুও ওটা পড়ে গেল...আকাশের দিকে বেশী উঁচুতে ওটা ছুড়ে ফেলেছিলাম...

পিলীয়াস

যাক, যাক, আর-একদিন আসা যাবে এখন...এস, সময় হল। আমাদের সঙ্গে মিলতে ওরা হয়ত আসছে। আংটীটা যখন পড়ল তখন দুপুর বাজছে।

মেলিসাণ্ডা

গোলড যদি জিজ্ঞাসা করে আংটীটা কোথায়, তাহলে কি বলব আমরা ?

পিলীয়াস

সত্য, সত্য, সত্য...

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গপ্রাসাদের একটি কক্ষ।

[বিছানায় গোলড শুইয়া রহিয়াছেন ; বিছানার পার্শ্বে মেলিসাণ্ডা।]

গোলড

আ ! আ ! সব ভালর দিকেই যাচ্ছে, ব্যাপার কিছুই গুরুতর নয়। কি করে যে এটা ঘটল তা আমি বোঝাতে পারি না। ধীরে সুস্থে বনে আমি শিকার করছিলাম। কিছুই কারণ নাই কিন্তু হঠাৎ আমার ঘোড়াটা ক্ষেপে উঠল। অদ্ভুত কিছু দেখেছিল না কি ?...সেই মাত্র ঘড়িতে বারটা বাজল শুণলাম। শেষের ঘণ্টাটা যেই বাজল অমনি ঘোড়াটা হঠাৎ ভয় পেয়ে অন্ধবেগে পাগলের মত ছুটে একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা লাগালে। তারপর যে কি হল কিছুই শুনতে পেলাম না। পরে যে কি ঘটল তাও জানতে পারলাম না। আমি পড়ে গেলাম, আর ঘোড়াটা খুব সম্ভব আমার উপর পড়ল। মনে হল আমার বুকের উপর সমস্ত বনটা চেপে রয়েছে ; ভিতরটা মনে হল আমার একেবারে পিষে গেল। তবে ভিতরটা আমার খুব শক্ত। ব্যাপারটা বোধ হচ্ছে কিছুই গুরুতর নয়...

মেলিসাণ্ডা

একটু জল খাবে কি ?

গোলড

না, না ; আমার তৃষ্ণা পায়নি।

মেলিসাণ্ডা

আর একটা বালিস নেবে ?...এটার উপর একটু রক্তের দাগ লেগেছে।

গোলড

না না ; কিছুই দরকার নেই। মুখ দিয়ে এখনই একটু রক্ত পড়ছিল। আবার বোধ হয় পড়বে...

মেলিসাণ্ডা

ঠিক বুঝতে পারছ ত ?...খুব বেশী কষ্ট হচ্ছে না ?

গোলড

না, না, এর চেয়ে বড় অনেক বিপদ কাটিয়ে উঠেছি। রক্ত আর ইস্পাত দিয়ে আমি তৈরি...এগুলো ছেলে-মানুষের কচি হাড় নয়; কিছু ভাবনা করো না...

মেলিস্যাণ্ডা

চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা কর। আমি এখানে সমস্ত রাত্রি রয়েছি।

গোলড

না, না; এ রকম কষ্ট করতে তোমাকে আমি কিছুতেই দেব না। আমার কিছুরই দরকার নেই; শিশুর মতন ঘুমিয়ে পড়ব.. কি হয়েছে, মেলিস্যাণ্ডা? হঠাৎ কাঁদছ কেন?...

মেলিস্যাণ্ডা [হঠাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া]

আমার...আমারও অসুখ হয়েছে।

গোলড

তোমার অসুখ হয়েছে?...কি অসুখ হয়েছে, কি অসুখ হয়েছে, মেলিস্যাণ্ডা?

মেলিস্যাণ্ডা

তা আমি জানিনা...এখানে আমার অসুখ বোধ হচ্ছে...তোমায় আজই বলে ফেলা ভাল; প্রভু, প্রভু, এখানে থেকে আমি সুখী নই...

গোলড

কেন, কি হল, মেলিস্যাণ্ডা? ব্যাপার কি?...আমার মনেই হয়নি...কি হয়েছে কি?...কেউ অন্যায় ব্যবহার করেছে?...কেউ তোমায় আঘাত করেছে?

মেলিস্যাণ্ডা

না, না; কেউ এতটুকু অন্যায় করেনি...এ তা নয়... কিন্তু এখানে আর আমি বাস করতে পারব না। কেন তা আমি জানি না...আমি চলে যেতে চাই, চলে যেতে চাই!...এখানে পড়ে থাকতে হলে আমি মারা যাব...

গোলড

কিন্তু যা হোক কিছু একটা হয়েছে ত নিশ্চয়? আমার কাছে নিশ্চয় তুমি কিছু লুকোচ্ছ?...সমস্ত সত্যটা আমার কাছে বলে ফেল, মেলিস্যাণ্ডা...রাজা কিছু বলেছেন?...মা কিছু বলেছেন?...পিলীয়াস কিছু বলেছে?...

মেলিস্যাণ্ডা

না, না; পিলীয়াস না। কেউ নয়...ঠিক বুঝতে পারবে না তুমি...

গোলড

কেন বুঝতে পারব না?...যদি আমায় কিছু না বল, তা হলে আমি কি করব?...সমস্ত আমায় বল আমি সব বুঝতে পারব।

মেলিস্যাণ্ডা

আমি নিজেই জানি না কি হয়েছে.. ঠিক বুঝতে পারছি না কি হয়েছে...যদি বলতে পারতাম, তাহলে বলতাম...এ যে আমার আয়ত্তের অতীত...

গোলড

শোন; অবুঝ হয়ো না, মেলিস্যাণ্ডা।—কি করতে বল আমায়?—আর তুমি ছেলেমানুষ নও।—আমাকেই কি তুমি ছেড়ে যেতে চাও?

মেলিস্যাণ্ডা

ওঃ! না, না; তা নয়...আমি তোমার সঙ্গে চলে যেতে চাই...এখানে আর আমি থাকতে পারব না... মনে হচ্ছে যেন আর আমি বেশী দিন বাঁচব না...

গোলড

সে যাই হোক, এ-সকলের কিছু একটা কারণ আছে ত নিশ্চয়। সকলে তোমাকে পাগল মনে করবে। তারা বলবে তোমার ও-সমস্ত ছেলেমানুষী খেয়াল।—শোন, পিলীয়াস কিছু করেছে, কোনও রকমে? বোধ হয় অনেক সময় সে তোমার সঙ্গে কথা বলে না...

মেলিস্যাণ্ডা

হাঁ, হাঁ; সময় সময় কথা বলে। বোধ হয়, আমায় সে দেখতে পারে না; চোখ দেখে তার আমি তা বুঝতে পারি...তা হলেও দেখা হলেই ও আমার সঙ্গে কথা বলে...

গোলড

ও-সবে তাকে ভুল বুঝো না। ও চিরকালই ঐ রকমের। ওর সবই আশ্চর্য্য ধরণের। আর এখন ওর মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে; ওর বন্ধু মার্সেলাস মর-মর হয়েছে, তার কথাই ভাবছে, আর তার কাছে যেতে পারছে না...স্বভাব ওর বদলাবে, স্বভাব বদলাবে, পরে দেখো; বয়স ওর কম...

মেলিস্থাণ্ডা

কিন্তু তার জন্যে কিছু নয়...তার জন্যে কিছু নয়..

গোলড

তবে কিসের জন্যে?—এখানে আমরা যে ভাবে থাকি তুমি তা সইয়ে নিতে পার না? এখানটা কি এতই বিষাদময়?—সত্য বটে প্রাসাদটা পুরাতন আর অন্ধকার ...খুব ঠাণ্ডা আর খুব গভীর। আর এখানে যাঁরা বাস করেন সকলেই বয়স্থ। চারিদিকে অন্ধকার বনগুলো থাকায় দেশটা একটু বিষাদময় বোধ হতেও পারে। তবে ইচ্ছে করলে সকলেই একেও একটু আনন্দময় করে তুলতে পারে। আর তারপর, কেবল আনন্দ, আর আনন্দ, আর আনন্দ ছুঁয়ে প্রত্যেক দিন কেউ চলতে পারে না; সব অবস্থাই সমান ভাবে নেওয়ার দরকার। সে যাক, কি করতে হবে বল; যা তোমার খুসী; যা তোমার ইচ্ছে তাই আমি করব...

মেলিস্থাণ্ডা

বলছি, বলছি; সত্যি...এখানে কেউ আকাশ দেখতে পায় না। আজ সকালে আমি তা প্রথম দেখলাম...

গোলড

তাই জন্যে তোমার এত কান্না, আ বেচারী!—এ ছাড়া আর কিছু নয়?—আকাশ দেখতে পাও না বলে চোখের জল ফেল?—থাম, থাম, এ সব নিয়ে কাঁদবার বয়স আর তোমার নেই... আর তা ছাড়া, গ্রীষ্ম এসেছে না? প্রত্যেক দিন আকাশ দেখতে পাবে এইবার।—আবার ফিরে বছর...এস, তোমার হাত দাও, তোমার ছোট ছোট দুখানি হাতই দাও। [হাত দুইটি ধরিলেন।] আঃ! বাঃ! কি ছোট হাত দুটি! আমি ফুলের মত এদের পিষে ফেলতে পারি...—এ কি! আমার দেওয়া আংটীটা কি হল?

মেলিস্থাণ্ডা

আংটীটা?

গোলড

হাঁ; আমাদের বিয়ের আংটী, কোথায় সেটা?

মেলিস্থাণ্ডা

বোধ হয়...বোধ হয় সেটা পড়ে গেছে...

গোলড

পড়ে গেছে!—কোথায় পড়ে গেছে?—তুমি হারাওনি ত?

মেলিস্থাণ্ডা

না, না; পড়ে গেছে...সেটা নিশ্চয় পড়েছে...কিন্তু কোথায় আছে আমি জানি...

গোলড

কোথায় আছে?

মেলিস্থাণ্ডা

তুমি জান...তুমি জান...সমুদ্রের ধারে ঐ গুহাটা?...

গোলড

হাঁ।

মেলিস্থাণ্ডা

আচ্ছা, সেইখানে...নিশ্চয়ই সেইখানে ঠিক, ঠিক আমার মনে হচ্ছে...ইনিয়লডের জন্যে আজ সকালে সেখানে ঝিনুক কুড়োতে গেছলাম...চমৎকার ঝিনুক সেখানে পাওয়া যায়...আঙুল থেকে আমার সেটা খসে পড়ে গেল...তার পরেই সমুদ্রের জল উঠতে লাগল; খুঁজে পাবার পূর্ব্বেই আমাকে চলে আসতে হল।

গোলড

তুমি নিশ্চয় বলতে পার যে, সেটা সেখানেই আছে?

মেলিস্থাণ্ডা

হাঁ, হাঁ, খুব নিশ্চয় বলতে পারি...খসে পড়ছে সেটা বুঝতে পারলাম...তারপর, একেবারে হঠাৎ, ঢেউয়ের শব্দ...

গোলড

তোমাকে এখুনি যেয়ে সেটা নিয়ে আসতে হবে।

মেলিস্থাণ্ডা

আমাকে এখুনি যেয়ে নিয়ে আসতে হবে?

গোলড

হাঁ।

মেলিস্থাণ্ডা

এখুনি?—এই মুহূর্ত্তে?—অন্ধকারে?

গোলড

এখুনি, এই মুহূর্ত্তে, অন্ধকারে। তোমাকে এখুনি যেয়ে সেটা আনতে হবে। আমার যা আছে সর্ব্বস্ব বরং আমি হারাতে পারি কিন্তু সেটা হারাতে পারি না। সেটা

যে কি তা তোমার ধারণা নেই। কোথা থেকে সেটা এসেছে তা তুমি জাননা। আজ রাত্রে সমুদ্র খুব উঠবে। তোমার যাবার পূর্ব্বে সমুদ্র উঠে সেটা নিয়ে যাবে... শীঘ্র যাও। এখুনি যেয়ে তোমায় সেটা নিয়ে আসতে হবে...

মেলিস্যাণ্ডা

আমার সাহস হয় না...একলা যেতে আমার সাহস হয় না...

গোলড

যাও, যাও, যার সঙ্গে খুসী যাও। কিন্তু এখুনি যাওয়া চাই, শুনছ ?—শীঘ্র যাও; পিলীয়াসকে তোমার সঙ্গে যেতে বল।

মেলিস্যাণ্ডা

পিলীয়াস ?—পিলীয়াসের সঙ্গে ?—কিন্তু পিলীয়াস যেতে চাইবে না...

গোলড

পিলীয়াসকে তুমি যা বলবে তাই করবে। তোমার চেয়ে আমি পিলীয়াসকে ভাল জানি। যাও, যাও, শীঘ্র যাও। আংটী না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার ঘুম হবে না।

মেলিস্যাণ্ডা

ওঃ ! ওঃ ! আমি সুখী নই !...আমি সুখী নই !...

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।]

* *
*

তৃতীয় দৃশ্য

একটি গুহার সম্মুখে।

[পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ্ডার প্রবেশ।]

পিলীয়াস [অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে]

হাঁ, এই সেই জায়গা; আমরা এখন পৌঁছেছি। এত অন্ধকার, যে, বাইরের অন্ধকার থেকে গুহার মুখ আলাদা বোঝবার জো নেই...ওদিকে একটিও তারা নেই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ প্রকাণ্ড মেঘটা ভেদ করে চাঁদটা না বেরোয় ততক্ষণ অপেক্ষা করা যাক; ওতে সমস্ত গুহাটাই আলো করবে, আর তখন গুহার ভিতরে গেলে বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। কতকগুলো ভয়ের জায়গা রয়েছে, দুটো হ্রদ আছে, তার মাঝের পথটা ভারি সরু, হ্রদ দুটো যে কত গভীর এখনও তা ঠিক করতে পারা যায় নি। মশাল কি আলো আনার কথা আমার মনেই ছিল না, তবে আকাশের আলোতেই যথেষ্ট হবে বোধ হয় !—এর পূর্ব্বে এই গুহায় আসতে কখনও তুমি সাহস কর নি ?

মেলিস্যাণ্ডা

না।

পিলীয়াস

ভিতরে এস, এস...যেখানটায় তুমি আংটীটা হারিয়েছিলে সেখানটার বর্ণনা দিতে তোমাকে নিশ্চয় পারতে হবে, যদি তোমায় সে জিজ্ঞাসা করে...এটা মস্ত বড় গুহা আর ভারি সুন্দর। চারা গাছ আর মানুষের মত আকৃতির সব স্ফটিক রয়েছে। নীল ছায়ায় এটা পরিপূর্ণ। এর শেষ পর্য্যন্ত কি আছে তা এখনও কেউ দেখে নি। বোধ হয় সেখানে অনেক ধনরত্ন লুকান আছে। পুরাতন জাহাজের ভগ্নাবশেষ-সমস্ত দেখতে পাবে। পথ দেখাতে লোক না নিয়ে বেশী দূর সাহস করে যাওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ যেয়ে আর ফিরে আসতে পারে নি। নিজেই আমি বেশি ভিতরে যেতে সাহস করি না। ঢেউয়ের আলো কিম্বা আকাশের আলো যেই আর না দেখতে পাব অমনি আমরা থামব। যদি ভিতরে কেউ একটু আলো জ্বালায় অমনি মনে হয় যেন আকাশের মত ছাদে অসংখ্য তারা ছেয়ে পড়ল। পাহাড়ে যে লবণ আর স্ফটিকের টুকরা-সমস্ত রয়েছে তাইতে অমন হয় অনেকে বলে।—দেখ, দেখ, বোধ হয় আকাশ এইবার পরিষ্কার হচ্ছে...আমায় তোমার হাত দাও; কেঁপো না, অত কেঁপো না; বিপদের সম্ভাবনা কিছুই নেই; সাগরের আলো যেই আর না দেখতে পাব অমনি আমরা থামব...গুহার শব্দে কি তুমি ভয় পাচ্ছ ? ও শব্দ রাত্রির, ও শব্দ নিস্তব্ধতার...পেছনে সাগরের ডাক শুনতে পাচ্ছ ?—আজ রাত্রিটা একটুও ভাল লাগছে না...আ ! এই আলো এসেছে !...

[চাঁদ উঠিয়া গুহার প্রবেশপথ এবং গুহার ভিতর খানিকটা সম্যক আলোকিত

করিল ; কিছু নিম্নে শুভ্রকেশ তিনটি বৃদ্ধ ভিক্ষুক পাশাপাশি বসিয়া একখণ্ড প্রস্তর হেলান দিয়া ও পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া ঘুমাইতেছিল।]

মেলিস্থাণ্ডা

আঃ !

পিলীয়াস

কি হয়েছে ?

মেলিস্থাণ্ডা

ঐ ওখানে...

[তিনটি ভিক্ষুককে দেখাইয়া দিলেন।]

পিলীয়াস

হাঁ, হাঁ ; আমিও ওদের দেখেছি...

মেলিস্থাণ্ডা

চল আমরা যাই !...চল আমরা যাই !...

পিলীয়াস

চল...তিনটি বৃদ্ধ ভিক্ষুক, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে...দেশে এখন দুর্ভিক্ষ...এখানে ওরা ঘুমোতে এসেছে কেন ?...

মেলিস্থাণ্ডা

চল আমরা যাই !...এস, এস...চল যাই !...

পিলীয়াস

সাবধান ; অত চেঁচিয়ে কথা বলো না...ওদের যেন জাগিয়ে না ফেলি...এখনও ওরা খুব ঘুমোচ্ছে...এস।

মেলিসাণ্ডা

তুমি যাও, তুমি যাও ; আমি বরং একলাই যাই...

পিলীয়াস

আর একদিন আমরা আবার আসব এখন...

[প্রস্থান।]

* *
*

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গপ্রাসাদের একটি কক্ষ।

[আর্কেল ও পিলীয়াস উপস্থিত।]

আর্কেল

দেখলে, সমস্তই তোমাকে এখানে এখন আটকে রাখবার জন্যে পরামর্শ এঁটেছে, আর সমস্ত তোমার এ নিষ্ফল যাত্রা বারণ করছে। তোমার বাবার অসুখের সঠিক খবর এ পর্য্যন্ত তোমার কাছে লুকান হয়েছে ; কিন্তু তার আর বোধ হয় জীবনের আশা নেই ; তোমাকে আটকাবার পক্ষে এই যথেষ্ট মনে হওয়া উচিত। কিন্তু তা ছাড়া আরও এত কারণ রয়েছে...আর যখন আমাদের শত্রুরা জেগে উঠেছে, যখন চারিদিকে প্রজারা ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাচ্ছে আর অসন্তুষ্ট হয়ে রয়েছে, তখন আমাদের ত্যাগ করে চলে যাবার তোমার কোনই অধিকার নেই। আর কিসের জন্যে যাবে? মার্সেলাস মারা গেছে ; মৃতের কবর-সমস্ত দেখে ঘুরে বেড়ানর চেয়ে জীবনে আরও অনেক বড় বড় কর্ত্তব্য রয়েছে। তুমি বলছ, তোমার কর্ম্মহীন জীবনে এইবার ক্লান্তি এসেছে ; কিন্তু কর্ম্ম আর কর্ত্তব্য পথের ধারে ত কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। দুয়ারের উপর দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, যখনি তারা সামনের পথ দিয়ে যাবে অমনি তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে ; আর তারা প্রতিদিনই যেয়ে থাকে। তুমি তাদের কখনও দেখ নি? আমি নিজেই প্রায় অন্ধ, তবুও কিন্তু আমিই তোমাকে দেখতে শেখাব ; যেদিন তুমি তাদের ঘরে আনতে রাজী হবে, সেইদিনই আমি তোমায় তাদের চিনিয়ে দেব। যা হোক, আমার কথা শোন ; যদি তুমি মনে কর যে, তোমার জীবনের অন্তস্তল হতে এই যাত্রার শাসন আসছে, তা হলে আমি তাতে বারণ করব না ; কারণ, তোমার সত্তার কাছে আর তোমার ভাগ্যদেবতার কাছে ঘটনাবলীর কোন্ অর্ঘ্য সাজিয়ে দেওয়া উচিত তা আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান। যে ব্যাপারটা প্রায় আরম্ভ হয়েছে সেইটে জানা পর্য্যন্ত কেবল আমি তোমায় অপেক্ষা করতে বলি...

পিলীয়াস

কতদিন আমায় অপেক্ষা করতে হবে ?

আর্কেল

এই কয়েক সপ্তাহ ; হতে পারে কয়েক দিন মাত্র...

পিলীয়াস

আমি অপেক্ষা করব...

সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা শব্দ কোষ

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্কলিত; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য পরিষদের সদস্য পক্ষে ১৲, অপরের পক্ষে ১॥০ টাকা। ম শেষ তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমার জানা গুটিকয়েক নূতন শব্দ অর্থ বা ব্যুৎপত্তি নিম্নে দিতে চেষ্টা করিতেছি—

ভাইজ—মালদহে ভাউজ।

ভাটিয়াল—ভাটি সম্বন্ধীয়; মাঝিরা নৌকা ভাটির স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া যে গান গায়; ভাটিয়াল গানের বিশেষ সুর।

ভায়া—বাবু-ভায়া—বাবু গোচের লোক।

ভিটভিট—অর্দ্ধেক নরম অর্দ্ধেক শক্ত; ভাত চেকচেলে হইলে ভিট ভিট করে।

ভিণ্ডি—মালদহে রামপটল, অন্যত্র ঢেঁরস বা ধেঁরস, হুগলি জেলায় ভিণ্ডি, ইং lady's finger। তরকারী বিশেষ।

ভুখ—ক্ষুধা। হিন্দী।

ভেদা—নির্ব্বোধ।

ভেদ্-ভেদে—নরম বিস্বাদ জিনিসের স্পর্শানুভূতি বা স্বাদ।

ভেরেণ্ডা ভাজা—অকাজ লইয়া থাকা; ভেরেণ্ডার বীজ ভাজিয়া কোনো লাভ নাই, অথচ অকারণে তাহাই ভাজা।

ভোগা দেওয়া—ঠকাইয়া লওয়া।

ভোঁড়—খড়ের চালের মটকা মোটা করিবার জন্য খড়ের দীর্ঘ মোটা বালিশ। শব্দকোষে ভুঁড়া। প্রচলিত—ভোঁড় জড়ানো। গায়ে খুব জড়াইয়া কাপড় দিলে তুলনায় ভোঁড় জড়ানো বলে।

ভোমা—নির্ব্বোধ: অক্ষিপক্ষ্ম বা ভ্রূর রোম।

ভড়—বড় নৌকা।

ভড়কালো—জমকালো, যাহা দেখিলে ভড়কাইতে হয়।

ভাঁড়াভাঁড়ি—লুকাচুরি।

ভেস্তা—ফার্সী বেহেস্ত হইতে বিদ্রূপে?

ভোঁ—ভ্রমর-গুঞ্জনের শব্দ। বিহ্বল—নেশায় ভোঁ হয়ে আছে। দ্রুত—ভোঁ দৌড়।

ভুল্‌কি—উঁকি। পূর্ব্ববঙ্গে উঁকি মারাকে ভুলকি দেওয়া বলে।

ভেবা—ধাতু, ভে ভে শব্দ করা ছাগাদির ন্যায়। তাহা হইতে বহুক্ষণ নিষ্ফল তোষামোদ করা। ভেবা গঙ্গারাম কে?

ভলক—থামিয়া থামিয়া উচ্ছ্বাস। লোকটার মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত উঠছে

ভাঙ্—ফার্সী বঙ্ তুলনীয়

ভম্বলদাস বড় দাড়িওয়ালা মোটা ছাগল। উপকথায় সিংহীর মামা ভম্বলদাস। তাহা হইতে জরদ্গব গোচের মোটাসোটা অথর্ব্ব লোমশ লোক।

ভিজেন—বাঁকুড়া বীরভূমে মুড়ি জলে ভিজাইয়া খাওয়াকে বা পান্তা ভাত খাওয়াকে ভিজেন বলে।

ভাঁড়-কুড়—ভাণ্ড ও কুণ্ড, ভাণ্ড ইত্যাদি।

ভিতর-সারা—বাহির-সারার উল্টা।

ভিগনেশ, ভিঙ্‌নেশ—বিন্যাস? লোকের রকম সকম নকল করা, লোকের ব্যবহারের বা চরিত্রের কুব্যাখ্যা করা।

ভাগ-টানা—খড়ো চালের রুয়ো বাতা প্রভৃতির সঙ্গে আড়া সংযুক্ত করিয়া যে এক একটা আলগা বংশখণ্ড থাকে তাহা।

ভেতো—শব্দকোষে ভোতো, কখনো শুনি নাই। মুদ্রণের ভুল নহে ত? ভাতুড়ে, ভাত-মারা—যে বসিয়া বসিয়া নিষ্কর্ম্মা ভাবে ভাত খায়।

ভুচুং—বোকা, জড়ভরত।

ভুটি—নাড়িভুঁড়ি।

ভোগ—দুধের সারভাগ যাহা সর হইয়া জমিবার পূর্ব্বে দুধের উপরে ভাসিয়া উঠিয়া জমিতে থাকে।

ভাঁটই, ভাঁটুই—চোর-কাঁটা; তৃণবীজ যাহা কাপড়ে লাগিয়া বংশ-বিস্তার করে।

ভাগের মা—পৃথক বহু ভ্রাতার মাতা, যিনি কোনো বিশেষ একজনের প্রতিপাল্য নহেন, সকল ছেলেই মনে করে তাঁহার অপর পুত্রেরা রহিয়াছে।

ভোট—vote, সম্বহুলতা, যদৃচ্ছাসিক।

ভোকচানি—ক্ষুধায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হওয়া।

মগ—মোঙ্গোল জাতীয়?

মগের মুলুক—আইনশূন্য অত্যাচারীর রাজ্য।

মঞ্জিল—আঃ, মন্দির। শব্দকোষে বানান মন্‌জিল।

মটকা—ধাতু, হঠাৎ পট করিয়া ভাঙিয়া ফেলা—যথা, ঘাড় মটকাইয়া বাঘে রক্ত খায়।

মধুনাপিত—জাতি বিশেষ।

মর্ম্মর—আরবী, মার্ব্বেল পাথর।

মহান্ত—না, মোহান্ত=মোহ অন্ত হইয়াছে যাহার।

মুহরী—স্ক্রু পেঁচের মুখে যে চক্রাকার চিবরী বা বোলটু থাকে।

মহাদশা—মহাগুরু-নিপাত-জনিত অশৌচের অবস্থা।

মহাপ্রসাদ—প্রায়ই জগন্নাথের প্রসাদ।

মাছি—কুকুর-মাছি—যে মাছি কুকুরের গায়ে লাগে, ডাঁশ। নাক-মাছি—মাছির আকারের নাসিকাভরণ। • • •

মাঙ্গন্‌তা, মাঙ্গনতেড়ে—যে চাহিতে ভালো বাসে।

মাঝামাঝি—মধ্যস্থলে।

মাঞ্জা—ঘুড়ির লক বা সূতায় ধার করিবার জন্য প্রলেপ মর্দ্দন।

মাঠ-বাদাম—চীনের বাদাম।

মাটিঘরা—পল্লীগ্রামে খড়ো ঘরে অগ্নিদাহের ভয়ে এক একটি মাটির সিন্দুকের ন্যায় গড়িয়া তাহার মধ্যে মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখে। বাক্স পেটারা এত সুলভ ছিল না; থাকিলেও অগ্নিদাহে বাক্সের বস্তু রক্ষা পায় না।

মাড়ি—গাঢ় রস, তালের মাড়, কাঁটালের মাড়ি।

মেটে—যকৃৎ, পাঁঠার মেটে। তাহার স্বাদ মাটির মতো বলিয়া।

মাতানি—মন্থনদণ্ড, যাহা দ্বারা বস্তু মাতাইয়া তোলা যায়।

মাথলা—থামের বা খুঁটির মাথার কারুকার্য্যবিশিষ্ট অংশ।

মাথায় টনক নড়া—স্বতঃ কোনো বস্তুর ঘটনার জ্ঞান হওয়া।

মাথা টানা—মগরা, একগুঁয়ে, অবশীভূত। গরু মহিষ জোয়ালে ঘাড় দিতে না চাহিলে মাথা টানে।

মাথা চালা, মাথা টালা—বিকারে বা ভূত প্রেত দেবতার ভর হইলে লোকে মাথা নাড়িতে থাকিলে মাথা চালা বা টালা বলে।

মাথা-পাগলা—বিকৃতমস্তিষ্ক: ঈষৎ পাগল।

মাপ-দড়ি, মাপ-কাঠি—পরিমাণ করিবার নির্দ্দিষ্ট মাপের দড়ি বা কাঠি।

মারা—গা মারা—গা সরাইয়া অপরকে পথ দেওয়া। পথ মারা—পথ রোধ বা বন্ধ করা। ভাত মারা—ভাত ধ্বংস করা।

মারপেঁচ—খলতা ও কুটিলতা।

মারতৌল—ঠিক হাতুড়ি নহে; পেঁচকষ বা screw driverকে মারতৌল বলিতে শুনিয়াছি।

মাড়া—মালদহ জেলায় একরূপ শস্য হয়, তাহার খই আমের সময় মালদহবাসীর দৈনিক ফলার-সহচর। ইহার অপর নাম চিনা বা টিপু। সদৃশ অপর তৃণশস্যের নাম কাউন, খেড়ি, উড়ি (নীবার)। ইহাই শব্দকোষে মারুয়া বোধহয়।

মালামাল—মাল।-অমাল নহে। মাল-আ-মাল—মালের উপরে মাল (ফারসী), মালের রাশি।

মালাই চাকী—হাঁটুর সন্ধিতে যে চাকতি-পানা হাড় থাকে তাহা।

মামার বাড়ী দেখানো—শিশুদের খেলা বিশেষ। শিশুর মাথার পিছনে এক হাত ও দাড়ির নীচে এক হাত দিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া তোলা।

মিছরি—মিসর-দেশ-ভব। মিশরী।

মিচকে—আঃ মিশকিন্, দুর্ব্বল, দরিদ্র, ক্ষুদ্র। ফল মিচকে হয়, অর্থাৎ অপুষ্ট। মিচকে মারা সয়তান যে সয়তান নিরীহের ছদ্মবেশে থাকে। কিংবা মিশ্‌ক্ মৃগনাভির মতো কৃষ্ণবর্ণ; অথবা রূপে এক গুণে আর।

মিনে—খাজনা ছাড় দেওয়া।

মিনমিনে—অপ্রকাশ, অজ্ঞাত। মিনমিনে ডাইন ছেলে খাবার রাক্ষস।

মিলনী—যে লোক লোকের সহিত সহজে মিলিতে মিশিতে আলাপ করিতে পারে। মিশুক।

মিস্ত্রী—ইমারৎ গড়ে যে সে রাজ (ফার্সী); রাজ মিস্ত্রী কি master mason?

মুখ করা—ভর্ৎসনা তিরস্কার করা।

মুখ ধরা—ওল কচু খাইয়া মুখ কুটকুট করা।

মুখ সিঁটকানো—বিরক্তিতে যন্ত্রণায় অথবা বিস্বাদে মুখ বিকৃত করা।

মুখা—মুখস (মালদহে)।

মুগ্‌রো—মুগুর সদৃশ মোটা। প্রবচনে—উগরো ছেলে মুগরো হয়, যে ছেলে বেশী দুধ তোলে সে বেশী মোটা হয়।

মুচী—সেকরার সোনা গালাইবার মৃৎ খুরি। শব্দকোষে মুছী।

মুঠাম, মুঠম—শব্দকোষের মুঠানি অর্থে ব্যবহার, বিশেষ প্রচলিত।

মুড়কী-মুখী—মিষ্টমুখী। দীনবন্ধু—মুড়কী-মুখী ময়রা-দিদি।

মুদা—ঘুনসী প্রভৃতির পুঁঠে। প্রবচন—ঘুনসীতে কি করে, মুদোয় প্রাণ হরে। যেখানে আসিয়া ঘুনসী মুদিয়াছে বা বদ্ধ হইয়াছে।

মূলে—মোটে, একেবারেই, মূলতমে। যথা, আমার হাতে মূলে টাকা নেই। মূলে=আদিতে অর্থ হইতেই হইয়া থাকিবে।

মেকরাজ—ধাতুপত্র কাটিবার বড় কাঁচি।

মেট—মাহুতের সহকারী, mate.

মোটমাটরী, মোটমুটরী—বড় ছোট বোচকা।

মোড়—বক্র, মোচড়। বরের বাপ বেশী টাকার জন্যে মোড় দিচ্ছে; রাস্তার মোড়।

মোতিয়া বিন্দু—চক্ষুরোগ, glaucoma.

মোনামুনি—জিনিষটি কি আমি ঠিক জানি না, বিবাহের সময় জলে ভাসাইয়া ভাবী দম্পতির প্রণয়ের গাঢ়তার পূর্ব্বাভাস জানা হয়।

মোরট—আকের গোড়া।

মৌজুত—মজুত, মজুদ, স্থিত।

মৌৎ—মৃত্যু।

মোচ—খেজুর বা নারিকেলের ফুল।

মুড়লী—খড়ো ঘরের মটকার নীচের খড়ের মুড়ো বা ভোঁড়। শব্দকোষের মুদনীর সহিত অভিন্ন বোধহয়।

মিষ্টর, মিষ্টার—Mr., ইংরেজি নাম উল্লেখের সম্মান-চিহ্ন, শ্রীযুক্ত।

মটরু—ছাগলের আদরের নাম। মটরের তুল্য গোলগাল বলিয়া?

মওয়া, মৌহা—মন্থন-করা। মালদহে মৌহা দই—যে দই মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

মানা—ধাতু, মানসিক করা।

মেজিক, ম্যাজিক—magic.

মাফিক-সই—যথাযথ, যথাযুক্ত।

মরমর—মুমূর্ষু।

মজমুন—আঃ, লিখিত বিষয়ের ভাবার্থ।

মাতব্বর—(অর্থান্তর) প্রধান, important.

মিক্‌শ্চার—mixture; পেয় তরল ঔষধ।

মেচকা—শব বহনের জন্য সদ্যপ্রস্তুত মাচা।

মিকাদো—জাপানের রাজোপাধি।

মাটাল—যে কাঠের মধ্যে ফাটা বা গ্রন্থি থাকে।

মুখে ফুল চন্দন পড়া—বাক্য সফল হোক এই কামনা।

মিটুলি, মেটুলি—পুঁই শাকের বীজ।

মধুকরী—বৈষ্ণবের মুষ্টিভিক্ষা।

মোহানা—নদীর মুখ।

মোহাড়া—মুখ, সম্মুখ। মোহাড়া লওয়া—প্রথম ধাক্কা সামলানো; ভার লওয়া; ঝক্কি সহা।

মন কেমন করা—প্রিয়বিরহে মন অসুস্থ হওয়া।

মেটিং, ম্যাটিং—matting, মাদুর (mat) দিয়া ঘর মোড়া।

মুৎসুদ্দি—ফাঃ, এজেন্ট, দেওয়ান।

মাওড়া—মা ওড় (শেষ) হইয়াছে যাহার; মাতৃহীন শিশু; অনাথ।

মুখ-সাপট—মুখের অর্থাৎ বাক্যের জোর ও চাতুর্য্য। মুখ-জোর।

মাৎ—ফাঃ, আশ্চর্য্য, বিস্মিত।

মাদারী—ভেল্কি বাজিকরেরা মাদারী নামক কাহাকেও স্মরণ করিয়া খেলা দেখায়। এজন্য ভেল্কির বাজিকে মাদারী-কা খেল বলে।

মাসা—ফাঃ, ক্ষুদ্র ওজনের মান। মাষকলায়।

মাকু—ফাঃ শব্দ মাকু।

মাল—ফাঃ শব্দের মানে অভিমুখে। তাহা হইতে হাতীকে অগ্রসর হইবার সঙ্কেতবাক্য। হাতী চালাইবার অন্যান্য শব্দ স্থানে স্থানে পূর্ব্বে দিয়াছি।

মহাপায়া—আঃ মহাফাঃ, ডুলি। কন্যে বহনের দোলা।

মহরম—আসল মানে শোক। শোকপর্ব্ব।

মহক—মালদহে গন্ধ। হিন্দী?

মাকই—ভুট্টা।

মুঅজ্জিন—আঃ, মসজিদে নমাজ পড়িতে আহ্বানকারী।

মুক্কা—কীল।

মিহিন—সূক্ষ্ম।

পুচকি—অতি ক্ষুদ্র। কিঞ্চিৎ স্নেহসম্পৃক্ত শব্দ।

টেঁশে যাওয়া—মরিয়া যাওয়া।

ধরাট—ভারার উপর যে পাটাতন পাতিয়া রাজমিস্ত্রিরা দাঁড়াইয়া কাজ করে।

চিল্‌তে—ফাঃ জিল্‌দ্। টুকরা, খণ্ড। এক চিল্‌তে কাগজ বা পাতা।

পানড়া—পূর্ব্বে ইহার ব্যুৎপত্তি স্থির করিতে পারি নাই। আমার বন্ধু

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম-এ মহাশয় বলিলেন এ শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে খুব প্রচলিত ; পত্র হইতে যেমন পাৎড়া, পর্ণ হইতে পানুড়া হইয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই "শব্দকোষে"র দুইটি শব্দের উৎপত্তি-ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিয়া আমার মনে যাহা উদয় হইয়াছে তদনুরূপই লিখিলাম। নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা গৃহীত হইতে পারে কিনা—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

১। আঙ্গট—অধ্যাপক মহাশয়ের মতে "অখণ্ড" হইতে আঙ্গট শব্দের উৎপত্তি, যেমন আঙ্গট কলার পাত। আমার বোধ হয় "অঙ্গ" শব্দ হইতে "আঙ্গট"-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ পূর্ব্ববাঙ্গালায় ত্রিপুরা ময়মনসিং প্রভৃতি জেলায় কাহারও শরীরের গঠন একটু সুদৃঢ় দেখিলে অনেকেই তাহার "আঙ্গট" খুব ভাল বলিয়া থাকেন।

২। খোকা—অধ্যাপক মহাশয়ের মতে যে খক্‌খক্ করিয়া হাসে সুতরাং খক্‌খক্ হইতে খোকা শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু আমার বোধ হয় খোক্ হইতে খোকা। মূলে হয়ত কক্ষ হইতেই খোক্ শব্দ আসিয়া থাকা বিচিত্র নয়। কারণ পূর্ব্ববঙ্গে খোক্ শব্দের খুবই প্রচলন আছে। এতদঞ্চলের দুইটি গানের পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

> "খোকে" খোকে করে তোরে রে বাছুনি,
> করেছি মানুষ ওরে নীলমণি।

অন্যত্র—

> কোলে "খোকে" কাঁদে চড়িতি রে তুই
> ওরে ভাই কানাই।

কক্ষ বা কাঁকালের ঈষৎ উপরের ভাগটাকেই খোক্ বলে, খোকে থাকে বলিয়াই বোধ হয় কচি শিশুদিগকে "খোকা" বলে, কক্ষ ও খোকে অতি নিকট সম্বন্ধ।

শ্রীশশিভূষণ দত্ত।

পোকা মাকড়

কলিকাতার (Indian Museum) যাদুঘরের উদ্যোগে মধ্যে মধ্যে নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সহজ সরল ভাষায় বক্তৃতা দিবার আয়োজন হইয়াছে। ঐ-সকল বক্তৃতাতে বৈজ্ঞানিক শব্দ একেবারেই ব্যবহৃত হয় না। গত জুলাই—আগষ্ট মাসে (Mr. F. H. Gravely M Sc., Asst. Suptd.) গ্রেভলি সাহেব কয়েকটি বক্তৃতাতে মশা, মাছি, মাকড়সা ও কীটের শব্দ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে পোকার অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—উহাদের জীবনবৃত্তান্ত, দেহের গঠন কতই না আশ্চর্য্যজনক।

মশা, মাছি।

মশার কীড়াতে (Larvae) যে-সকল শুঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়—খাদ্য সংগ্রহের জন্যই উহাদের ব্যবহার; ইহাদের মাথার উপর কাঁটার ন্যায় অনেক শুঁয়ার সাহায্যেই আয়ত্তের মধ্যে খাদ্যসমূহ ইহারা টানিয়া আনে। আমাদের অনেকেরই ধারণা যে, মাছি শরীরে বসিয়া কামড়াইয়া আমাদের দেহ বিদ্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে; মাছি শরীরের উপর বসিয়া শুধু রক্ত শোষণ করিয়া লয়।

মাকড়সা।

সহরের মধ্যে যে-সকল মাকড়সা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়—ইহারা সকলেই স্ত্রীজাতীয়; ইহাদের কালো কালো রেখাযুক্ত বড় বড় পা আছে। এই জাতীয় পুরুষ মাকড়সা এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অন্য একপ্রকার মাকড়সা বাড়ীতে আছে—ইহারা অন্ধকার বেশী ভালবাসে বলিয়া প্রথমোল্লিখিত মাকড়সার ন্যায় এত সাধারণ নহে; এই দুইপ্রকার মাকড়সাই সাধারণতঃ জাল গঠন করে না, কেবল ডিম রক্ষা করিবার সময়ে জাল রচনা করে; আর্শলা ইহাদের খুবই প্রিয়-খাদ্য; সুতরাং গৃহস্থের বাড়ীতে এই জাতীয় মাকড়সার উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয় নহে। অন্য একজাতীয় মাকড়সা আছে—ইংরেজীতে তাহাদিগকে Jumping Spider কহে—মশার উপরই ইহাদের বেশী আক্রোশ এবং উহাদের বিরুদ্ধেই ইহারা যুদ্ধঘোষণা করে। আমেরিকাতে পুরুষ মাকড়সা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; সঙ্গম ঋতুতে (Breeding Season) ইহাদের উজ্জ্বল বর্ণ ও সৌন্দর্য্যদ্বারা লুব্ধ ও মুগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা স্ত্রী মাকড়সার সম্মুখ দিয়া যাওয়া আসা করে।

যত্নসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে কালো ও লাল পিপীলিকাদের মধ্যে মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পিপীলিকাদের সহিত উহাদের অবয়ব ও বর্ণের সাদৃশ্য এত অধিক যে, প্রথমেই উহাদিগকে পিপীলিকা বলিয়া ভ্রম হয়। শত্রুর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই এই মাকড়সা পিপীলিকাদের সহিত একত্রে কিম্বা তাহাদের বাসার সন্নিকটেই থাকে। সাধারণতঃ

গাছের গুঁড়ি কিম্বা বাটীর প্রাচীরেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল শুঁয়ার (Spinarettes) সাহায্যে মাকড়সারা জাল রচনা করে—ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে উহাদের সংখ্যার তারতম্য আছে—সাধারণতঃ চার হইতে আট পর্য্যন্তই দেখা যায়। Flapping মাকড়সার ন্যায় এক জাতীয় মাকড়সার এইরূপ ছয়টি Spinarettes আছে—ইহাদের দুইটি খুবই লম্বা; কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন সুবিধা দেখা যায় না, কারণ এই-সকল মাকড়সার জাল অন্যান্য মাকড়সার জাল অপেক্ষা বিশেষ উৎকৃষ্ট কিম্বা বৃহৎ নহে; এই জাতীয় মাকড়সা গাছের গুঁড়ির উপরই বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে—সুতরাং ইহারা খুব সাধারণ হইলেও গুঁড়ির রংএর সহিত ইহাদের রং মিশিয়া থাকে বলিয়া সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। খাদ্যসংগ্রহ করিবার জন্যই মাকড়সারা প্রধানতঃ জাল রচনা করে। কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে একপ্রকার মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের জাল-রচনা-প্রণালী অতীব অদ্ভুত; এই মাকড়সার রং কালো, হলদে, বাদামীর উপর কালো কালো রেখা আছে; ইহারা খুব সূক্ষ্ম সূতার গোলাকার জাল বয়ন করে—কেবল মধ্যস্থানে ঢেরার আকৃতিতে মোটা মোটা সূতা থাকে; মাকড়সা এই মোটা সূতার উপরই পা রাখিয়া অবস্থান করে এবং খাদ্যকে আয়ত্তের মধ্যে আনাই এই মোটা সূতার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই মাকড়সার মতোই অন্য একপ্রকার মাকড়সা আছে—তাহাদের গঠন আরও সুন্দর; দেহ উজ্জ্বল শুঁয়ার দ্বারা আবৃত থাকাতে রৌপ্যের ন্যায় ঝক্‌ঝক্ করে। সল্ট লেকে একপ্রকার ঝোপের মধ্যেই ইহারা প্রায় বাস করে; ইহাদের পুরুষ, স্ত্রী অপেক্ষা খুবই ছোট; পুরুষ জালের এক কোণে বাসা প্রস্তুত করিয়া অবস্থান করে; কখন কখন একই বাসাতে ৩।৪টি পুরুষ নির্বিরোধে একত্রে বাস করে। আর একপ্রকার মাকড়সার কার্য্য আরও চমৎকার ও আশ্চর্য্যজনক; ইহারা প্রাতঃকালে জাল রচনা করে—জালের মধ্যদেশ ঠিক তাঁবু কিম্বা গম্বুজের ন্যায় দেখায়—এবং ইহার উপরে মাকড়সাটি উল্টাভাবে অবস্থান করে। ইংরেজীতে ইহাকে Tent-making Spider কহে; এই তাঁবু অত্যন্ত কৌশল-সহকারে সূক্ষ্ম ভাবে প্রস্তুত করে। এই জাতীয় মাকড়সা কলিকাতায় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

কীটের শব্দ।

সচরাচর আমরা কীটের অনেক প্রকার শব্দ শুনিতে পাই—উইচিংড়ীই অধিকসংখ্যক শব্দের জন্য দায়ী—বাড়ীতে যে-সকল উইচিংড়ী দেখিতে পাওয়া যায় উহারা ডানার আবরণে আবরণে ঘর্ষণ করিয়া এই কর্কশ শব্দ নির্গত করে; কেবল পুরুষ উইচিংড়ীতেই শব্দ করিবার ইন্দ্রিয় আছে। ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, স্ত্রীকে মুগ্ধ ও আকর্ষণ করিবার জন্যই পুরুষ এই প্রকার শব্দ (গান) করে। গ্রেভলি সাহেব স্বয়ং এই ধারণার সত্যতা দেখিয়াছেন—তিনি বাড়ীর প্রাচীরে এক পুরুষ উইচিংড়ী দেখিতে পান—উহা প্রথমে সম্পূর্ণ মূক ছিল, কিছুই শব্দ করে নাই, কিন্তু তাহার সম্মুখে একটি স্ত্রী উইচিংড়ী রাখিবামাত্রই পুরুষটি "গান" করিতে আরম্ভ করিল; আরও দেখা গিয়াছে যে স্ত্রীলোকদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য পুরুষরা একটি কোমল মধুর স্বর নির্গত করে; সাধারণ কর্কশ স্বর অপেক্ষা ঐ শব্দ একেবারে ভিন্ন। উইচিংড়ীর শ্রবণশক্তি খুবই প্রখর, ইহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় মস্তকে স্থাপিত নহে, সম্মুখের পায়ের উপর অবস্থিত। যদিও কীটের মধ্যে উইচিংড়ীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শব্দ বাহির করে—অন্যান্য কীটেরও শব্দ করিবার ক্ষমতা আছে। Beetles-দের (কঠিন পক্ষবিশিষ্ট পোকা, গুবরে পোকা জাতীয়) শব্দ বাহির করিবার ইন্দ্রিয় আছে; কাহারও কাহারও স্বর খুব তীক্ষ্ণ—কেহ কেহ আবার খুব অস্পষ্ট স্বর নির্গত করে; দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ঘর্ষণই এই শব্দের উৎপত্তির অন্যতম কারণ।

বোলতা, মৌমাছি, মাছি ডানার সাহায্যে শব্দ করে; শব্দের জন্যও ইহাদের বিশেষ ইন্দ্রিয় (Vibratory organ) আছে; মৌমাছির শব্দ সাধারণতঃ ডানার সঞ্চালনেই বাহির হয়। চাকের মধ্যে মৌমাছিদের বিরক্ত করিলে যে ভয়ানক শব্দ উত্থিত হয় ঐ সম্বন্ধে বহু গবেষণার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহাদের গলার ও ডানার দ্রুত সঞ্চালনই ঐরূপ শব্দের উৎপত্তির কারণ।

বারান্তরে অন্য অন্য বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। গ্রেভলি সাহেবের অনুমতি অনুসারে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এল, এ-জি।

প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য

ইউরোপে প্রাচীন সাহিত্য পড়িবার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। শেলি, কীট্‌স্, গ্যয়টের কথা ছাড়িয়া দিই, সেদিনকার কবি টেনিসন্, ভিক্টর হুগো প্রভৃতিই এখন অত্যন্ত সেকেলে বলিয়া গণ্য। এখনকার সাহিত্য-মজলিসে তাঁহাদের ডাক পড়ে না—নিতান্ত ছেলেছোক্‌রার দল কাঁচা বাঁশের বাঁশী লইয়া দিব্য নিঃসঙ্কোচে সেখানে প্রবেশ করে এবং আসন গ্রহণ করে। তাহাদেরি গলায় মাল্য পড়ে—তাহাদেরি অভ্যর্চ্চনায় রসিকচিত্তাকাশে আনন্দের রোস্‌নাই জ্বলিয়া উঠে। পুরাণো কবিদের প্রেতাত্মার ছায়া মজ্‌লিসের প্রাচীরের বাহিরে বাদুড়ের মত পাখা ঝট্‌পট্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সেই ছায়ার মধ্যে সাধ করিয়া ধরা দেয় কে? পিরামিডের শতস্তর পাষাণপঞ্জরের মধ্যে যেমন কত কত সুন্দরী রাণী চিরনিদ্রায় নিমগ্ন, সেইরূপ প্রাচীন কবিদের যত সৌন্দর্য্য থাকুক্ আজকালকার মানুষ তাহাদিগকে শতস্তর বিস্মৃতি-লোকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

ক্রমশই তাহাদের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও মানুষের মনে সংশয় জন্মিতেছে। শেক্স্‌পীয়রের কবিতাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিম্বা র‍্যাফেলের চিত্রের যে তুলনা মিলেনা, একথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে এখনকার-কালের লোকের আপত্তি আছে। এ-সকল পুত্তলিকাকে ফুলের মালা, দীপের আলো এবং ধূপের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া সাহিত্যের দেউলে চিরকালের মত অধিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে।

এই বিদ্রোহকে কোনমতেই নিন্দনীয় বলিতে আমার মন সরে না। কারণ যা-কিছু বাঁধা—বাঁধা মত, বাঁধা সংস্কার—তাহারি বিরুদ্ধে যে এই একালের বিদ্রোহ। বস্তুরাজ্যে একালের বিজ্ঞান বড় বড় সংস্কারের বদ্ধ জলের মধ্যে ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুকে যে অত্যন্ত স্থূল ইন্দ্রিয়গম্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল সে বিশ্বাস একেবারেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ক্রমে কোন্ একদিন জড়ে চেতনে ব্যবধান ঘুচিয়া গেলে—এই বাস্তব স্থূলজগৎ আমাদের চোখের উপর বাষ্পের মত মিলাইয়া যাইবে। মানসরাজ্যেও আধুনিক psychic researchesএর জন্য সংস্কারের আগল খসিতে সুরু হইয়াছে। আমাদের মস্তিষ্কের দ্বারাই যে সকল মননক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা নহে—আমাদের অব্যক্তচেতন লোকের কাজ বড় সামান্য নহে। কিন্তু সে লোকের খবরাখবর কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? সে এক রহস্যময় স্বপ্নরাজ্য!

বাহিরে অন্তরে বাঁধা সংস্কারের পরাভব ঘটিতেছে বলিয়াই একালে সমাজেও চিরন্তন সনাতনী প্রথা ও ব্যবস্থা আর রাজত্ব করিতে পাইতেছে না। সমাজের পাকা বনিয়াদে ঘন ঘন ভূমিকম্প সুরু হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বহুকাল ধরিয়া একরকম স্থির ও নির্ণীত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তো আমরা জানি। কিন্তু এ কালের স্ত্রীলোক সে-সকল সংস্কারকে সত্য বলিতে মোটেই রাজি নয়। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্র অন্তঃপুরে, পুরুষের ক্ষেত্র বহিঃসংসারে—স্ত্রীলোক কেবল গর্ভধারণ করিবে, সন্তান পালন করিবে, পতিসেবা করিবে এবং গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবে—এই সনাতন ব্যবস্থাকে এ কালের স্ত্রীলোক অস্বীকার করিতেছে। বহির্জগৎটাকেও পুরুষের সঙ্গে তাহাদের সমানভাবে ভাগ করিয়া দখল করা চাই। এতকাল সেখানে পুরুষের সৃষ্টিক্রিয়া দেখা গিয়াছে, এখন সেখানে স্ত্রীলোকেরও সৃজনী-প্রতিভা কার্য্য করিবে। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্রে স্ত্রীলোক তাহার দিক্‌টাকে জাগাইয়া তুলিয়া এক নূতন ভাব-জগৎ রচনা করিবে। এ এক আশ্চর্য্য আন্দোলন। আধুনিক যে-কোন সাহিত্যগ্রন্থ খুলিলেই এই বিদ্রোহের বাণী সর্ব্বত্রই উদ্ঘোষিত হইতে দেখিতে বিলম্ব হয় না। ইব্‌সেন্, হাউপ্‌ট্ম্যান্, মেটারলিঙ্ক, বার্নার্ড-শ, এচ্ জি ওয়েল্‌স্—ইহাঁদের নাটকের বা উপন্যাসের ধাক্কায় সমাজের

বহুকালের পাকা ইমারতের বাঁধা ভিতের একএকটি পাথর আলগা হইয়া আসিয়াছে। মানবচিত্তের এত বড় ঝড় বোধ হয় সাহিত্যে আর কখনই উঠে নাই—ফরাশী রাষ্ট্র-বিপ্লবের কালেও নয়।

এই বিদ্রোহ জ্ঞানবিজ্ঞানে, রাষ্ট্রে, সমাজে, সর্ব্বত্রই প্রবল বলিয়াই সাহিত্যে আজকাল আর প্রাচীনের আদর নাই। কারণ প্রাচীন সাহিত্যে যে ব্যক্তি এখন রস পাইতে চায়, তাহাকে এই আধুনিক কালের আব্‌হাওয়া হইতে সরিয়া পড়িতেই হইবে। তার মানে তাহাকে প্রাচীন হইতে হইবে—তাহার মনের মস্তকে পাকাচুল দেখা দিবে, তাহার বুদ্ধিতে ঘুণ ধরিবে, তাহার অন্তরের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিবে। যৌবনের উৎসবের মাঝখানে তাহার স্থান হইতে পারে না।

আমাদের দেশে এই যৌবনের দক্ষিণে হাওয়া যে বহিতে আরম্ভ করে নাই, তাহা নহে। কিন্তু আমরা প্রাচীন, বহু প্রাচীনজাতি—আমাদের সব ক্রিয়া-কর্ম্ম, আচারপদ্ধতি সেই মনুর আমলের—আমাদের সকল ব্যবস্থাই সনাতন ব্যবস্থা। আমাদের যিনি প্রলয়দেবতা, তাঁহাকে আমরা ভাঙ্‌ধুতুরা খাওয়াইয়া দিব্য ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছি,—তাঁর পিণাক বাজানো একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের একটা ঢেউ সমুদ্র পার হইয়া ইংরেজীশিক্ষার নূতন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া যেন আমাদের এদেশের বহুকালের প্রাচীন বাঁধাঘাটে আসিয়া লাগিয়াছিল। একজন কবির কাব্যের ঘট ঘাট ছাড়িয়া ভাসিতেছিল, তাহারি গায়ে সেই ঢেউটুকু একটুখানি আওয়াজ করিয়াছিল মাত্র। সে কবিটি মাইকেল মধুসূদন। তিনি হঠাৎ রাম ও লক্ষ্মণের ইতিহাসবিশ্রুত চিরাগত লোকস্মৃতি ও সমাজরক্ষার আদর্শে মেঘনাদের বজ্র নিক্ষেপ করিয়া বিদ্রোহের দুন্দুভিনিনাদ করিয়াছিলেন। সমাজের চিরপ্রচলিত সতীত্বের আদর্শের মুখের সামনে তুড়ি মারিয়া অসতীদের 'বীরাঙ্গণা' করিয়া সাজাইয়াছিলেন।

কিন্তু বাঁধাঘাটে সেই ক্ষীণ ঢেউয়ের কলধ্বনি কি আর বাজে? মাইকেলের কাব্যের প্রাণ সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চারিত হইল না, শুধু দেহটা সুন্দর একটি প্রতিমার মত পড়িয়া থাকিল। বৈদেশিক সাহিত্য-মন্দিরের প্রতিমার ছাঁচে মাইকেল তাঁহার প্রতিমা গড়িয়াছিলেন। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রলয়-উৎসবের দীপালীর আলো হইতে মাইকেল যে প্রদীপ জ্বালাইলেন, সেই প্রদীপ হইতে কেহ আলো জ্বালাইতে আসিল না—তাঁহার শূন্যমন্দিরে তাঁহার রচিত প্রতিমা একাকী পড়িয়া রহিল।

তারপর একদিকে বঙ্কিম, অন্যদিকে হেম নবীন সেই বাঁধাঘাটে সোনার দেউল তুলিলেন—স্তরে স্তরে দেশের ধর্ম্ম, আচার, ইতিহাস, লোকচরিত্র, সোনার রংয়ে রঞ্জিত হইয়া আকাশে অভ্রভেদী হইয়া উঠিল। সনাতন ভারতবর্ষ তাহার চিরন্তন মূর্ত্তিতে সেই দেউলের মধ্যে বিরাজমান হইলেন।

কিন্তু পশ্চিমের ঢেউ কি একটি আধটি আসিয়া ক্ষান্ত থাকিবার জিনিস? সেখানকার সমুদ্রে যে বান ডাকিয়াছে, সেখানে যে প্রাচীন বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে—তাহার লক্ষ লক্ষ উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ যে নানা দিকে দিকে ছুটিয়াছে। এদেশে আধুনিককালে আবার সেই ঢেউয়ের ধাক্কা পৌঁছিয়াছে। এবার তাহার সাড়া আর ক্ষীণ হয় নাই। কারণ এবার হঠাৎ এদেশেই নানা দিক্‌কার বিরুদ্ধ হাওয়ার সংঘাতে এখানেই ঝড় উঠিয়াছে। সেই ঝড়ে এবং ভাবসমুদ্রের তুফানে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত সাহিত্যে সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গীতে প্রলয়ের বিষাণ বাজিতেছে।

এই নূতন সাহিত্যকে আমরা গ্রহণ করিতে ভয় পাইতেছি। আমরা আমাদের চিরকালের সেই পাথরে-বাঁধানো ঘাটে সাহিত্যের সোনার দেউলের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এবং আমাদের মধ্যে যাঁহারা মনস্বী ব্যক্তি তাঁহারা সেই ঘাটের বাঁধকেই কি করিয়া কঠিন করা যায় সেই বিষয়েই চিন্তা করিতেছেন। আমাদের দেশে সমাজে এখনো ভূমিকম্প আরম্ভ হয় নাই—একটু আধটু যা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে দুএকটা ঘরের চালা উড়িয়াছে মাত্র। সুতরাং সাহিত্যে বিদ্রোহের কোন আইডিয়া প্রকাশ পাইলে আমরা হাসিয়া বলি ওসব কিছু নয়। তাহাকে বিশ্বাস্ত বলিয়াই মনে করি না।

তথাপি আমাদের মনে যে ভয় হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। একটি 'গোরা' এবং একটি 'অচলায়তন'ই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। আমরা একজন লোকের বিদ্রোহের আগুন নিভাইতে অক্ষম—দেখিতে দেখিতে সে 'আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে।' যদি আমাদের ভাগ্যে অনেক ইব্‌সেন, অনেক বার্ণার্ডশ, অনেক মেটারলিঙ্ক জুটিতেন তবে আমাদের বোধ হয় একটি ঘরও অবশিষ্ট থাকিত না। কিন্তু এখন হইতে আমাদের জানা উচিত, যে, এ আগুন ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। কারণ এ প্রাণের আগুন। বৃহৎভাবের তৃতীয়নেত্রের স্ফুলিঙ্গ হইতে ইহার জন্ম।

কথা হইতেছে এই যে, একালের এই বিদ্রোহের পরিণাম কি হইবে তাহাই যে প্রশ্নের বিষয়। ইউরোপেই বা কি হইবে এবং এদেশেও যদি তাহা আমদানি হইয়া থাকে, তবে এখানেই বা কি হইবে? আমরা যে আধ্যাত্মিক হিসাব খতেন করিয়া চলি, কাকক্রান্তির হিসাবও যে আমাদের বাদ যায় না—সেইজন্য পরিণামের কথা চিন্তা না করিয়া হঠাৎ এই বিপ্লবের তরঙ্গে আমরা নৌকা ভাসাই কেমন করিয়া? সমস্ত বাঁধা মত, বাঁধা আচার, বাঁধা ধর্ম্ম, বাঁধা ভাব ও সংস্কার—তিরোহিত হইলে শুধু এই বিপ্লব কি কিছু গড়িতে পারিবে? কৈ, তোমার বার্ণার্ডশ, মেটারলিঙ্ক, ইব্‌সেন্ তো গড়ার কোন কথাই কয় না—তাহারা জগৎটাকে চূর্ণ করিয়া অণুপরমাণুর অনন্ত বিশ্লেষণে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিতে চায়।

এই পৃথিবী যখন সৃষ্ট হইতেছিল তখন কত তুষারবন্যা, কত অগ্ন্যুৎপাত, কত ভূমিকম্প ঘন ঘন ইহাকে আলোড়িত করিতেছিল। সেই সময়ে বড় বড় হিমাচল আল্পিস ককেসাস উত্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে তুহিনবিগলিত জলরাশির খাত গভীর হইতে গভীরতর হইতেছিল—মহাদেশ ও মহাসমুদ্র সকলের সংস্থান তৈরী হইতেছিল। সেই প্রলয়ের মুখে যখন সৃষ্টি চলিতেছিল, তখন যদি কেহ বিধাতাপুরুষ বিশ্বকর্ম্মাকে গিয়া প্রশ্ন করিত—প্রভু, এ পৃথিবীর পরিণাম কি হইবে? তিনি হাসিয়া বলিতেন—তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। তুমি দেখিয়া যাওনা! পরিণাম ভাল বই মন্দ হইবে কেন?

আমরা কেন স্বভাবের চেয়ে কৃত্রিমতাকে বেশি বিশ্বাস করি! মানুষ এক সময়ে যাহা গড়িয়াছে, তাহাই যে চিরকাল মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হইবে একথা যখনি মনে করি তখনি আমরা স্বভাবকে একেবারেই নস্যাৎ করিয়া দিই। এ বিদ্রোহ যে স্বভাবের নিয়মে আপনি চলিতেছে—ইহাকে দমন করিতে গেলে আমরাই প্রতিহত হইব—একথা কিছুতেই মনে আনিতে পারি না। রাগিয়া বলি—এ ঢেউ থামাইতেই হইবে—কারণ ইহা সাবেককে চূর্ণ করিতেছে। যেন সাবেকই আমার সব, আর হাল আমার শত্রুপক্ষ।

আমাদের দেশে প্রতিভার যে সংজ্ঞা দিয়াছে, তাহা আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। প্রতিভাকে বলিয়াছে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি। যে বুদ্ধির নূতন নূতন উন্মেষ হয় তাহারই নাম প্রতিভা। যে বুদ্ধি মনের মাথার চুল পাকাইতে বসে, তাহার গায়ের চামড়া শিথিল করিয়া দেয়, তাহার দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষীণ করে, তাহার কর্ম্মশক্তিকে হ্রাস করে—সে বুদ্ধি প্রতিভা নামের যোগ্য নয়। এইজন্য প্রতিভার পরিচয়ই হইতেছে অক্ষয় যৌবনে।

. . .

যে সাহিত্যে যথার্থ প্রতিভার আবির্ভাব হয় সে সাহিত্যে এই যৌবনের যৌবরাজ্য কায়েম। এই যৌবনই যে নূতন নূতন পরীক্ষাকে উপস্থিত করে, বিপ্লব বাধায়, সংগ্রাম করে এবং জয়ী হয়। জ্ঞানবৃদ্ধেরা ইহার উপর রাগ করে রাগ্ করুক, কিন্তু যৌবনের কাজ যদি কোন সমাজে বাধা পায় তবে সে সমাজে যে পচা ধরিয়া যাইবে, বিনাশের ক্রিয়া সুরু হইবে।

আমাদের দেশে অনেকদিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধেরা একাধিপত্য করিয়াছে। সেইজন্য আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছে—আমরা সকলেই তত্ত্বকথা বলিতে এবং শুনিতে অতিরিক্তমাত্রায় ভাল বাসিয়াছি। শুধু তত্ত্ববুদ্ধির হাতে সমস্ত রাজ্যের ভার সমর্পণ করিলে সে বুদ্ধি সমস্ত রাজ্যটাকে দেখিতে দেখিতে একটা প্রকাণ্ড কয়েদখানা বা পাগলাগারদ বানাইয়া বসে। সকল কালেই দেখা গিয়াছে যে যুক্তির খেলার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যঝোযুঝির পর্ব্ব শেষ হইলেই, শেষকালে

ঢেঁকির কচ্‌কচি আরম্ভ হয়। গ্রীসদেশে সোফিষ্টের দল এম্‌নি করিয়াই দেখা দিয়াছিল, আমাদের দেশে নৈয়ায়িকের দলও এই জন্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তখনি মানুষ সেই ঢেঁকির কচ্‌কচি হইতে আরাম পাইবার জন্য লঘুতার শরণাপন্ন হয়। নৈয়ায়িকের কূটতর্কের পাশাপাশি, পাঁচালী, বিদ্যাসুন্দরের গান ও নানা কুৎসিত আমোদপ্রমোদের সৃষ্টি হয়। গ্রীসদেশে যেমন আরিস্টোফেনিসের প্রহসনগুলি আর-সকল সাহিত্যকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, বাংলাদেশেও একসময় লঘুসাহিত্য তেমনিই প্রবলতা লাভ করিয়াছিল। তাহাতে ফল হইয়াছে এই যে, না তত্ত্ব না সাহিত্য কিছুই আমাদের ভাগ্যে জমে নাই। জমিয়াছে শুধু অপর্য্যাপ্ত ব্যর্থ সঞ্চয়।

অবশ্য আমি বৈষ্ণবসাহিত্যের কথা ভুলি নাই। বৈষ্ণবসাহিত্যই বাংলাদেশে বিদ্রোহের সাহিত্যের একটা বড় নমুনা। তাহাই বাংলার একমাত্র 'রোমান্টিক' সাহিত্য। সেইজন্য দেখিতে দেখিতে একসময়ে দেশের একপ্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বৈষ্ণবপদকর্ত্তার গান ছাইয়া গিয়াছিল। আমাদের সমাজের প্রাচীর চতুর্দ্দিকে অভ্রভেদী হইয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই বাহিরের সর্ব্বনাশী বাঁশীর রব তাহার মধ্যে আনা অত্যন্ত দরকার হইয়াছিল। এবং গোপনে সেই কারাগারের মধ্যে সুরঙ্গ করিয়া বাহিরের বিদ্রোহকে প্রবেশ করানোর কৃত্রিম উত্তেজনাও দেখা দিয়াছিল। সাহিত্য সমাজের ধার ধারে না বলিয়া, সমাজের কৃত্রিম বন্ধনের মধ্যে মানুষের চিত্ত যে পীড়া অনুভব করে, সাহিত্যে তাহা অনায়াসেই প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে রোমান্টিক সাহিত্যের সম্ভাবনা বিরল ছিল বলিয়াই রোমান্টিক ভাব আমাদের সাহিত্যে এমন আকারে প্রকাশ পাইল যাহাকে কোনমতেই সহজ, স্বাভাবিক ও নীতিমূলক বলা যায় না। স্বভাবকে সমাজ চাপ দিয়া পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিলেও, স্বভাব আপনাকে প্রকাশ করিবেই করিবে। যদি তাহা সুস্থভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে বাধা পায়, তবে অসুস্থ ও অস্বাভাবিক ভাবেই তাহার প্রকাশ হইবে।

বৈষ্ণবসাহিত্যের একটা মস্ত মুস্কিল ছিল এই যে তাহাকে বিশেষ একটি রূপক আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছিল। কোন মধ্যস্থকে আশ্রয় করিয়া প্রেমালাপ চালানো যেমন অস্বাভাবিক ও ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, ওরকম আত্মপ্রকাশও বেশিদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যের এলাকার মধ্যে চলিতে পারে না। বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্যের নিগূঢ় যোগের কথাটা মনে রাখিতে হইবে! বৈষ্ণবধর্ম্ম যখন বৈষ্ণবসাহিত্যকে ভগবান্ ও জীবের রসলীলার রূপকরূপে ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছিল, তখন হইতেই বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রাণ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন কৃত্রিম পদাবলী রচনার পালা দেখা দিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদরচনার অনুকরণে ঝুড়ি ঝুড়ি পদাবলী রচিত হইতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু সে কার্য্য কতদিন পর্য্যন্ত চলে? পদাবলীসাহিত্যের স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়া তাহা ডোবার আকার ধারণ করিল—তাহার জীবন বিলুপ্ত হইয়া তাহার তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করিয়া সেই ডোবাটাকে সকল ভক্ত বৈষ্ণবের নিকটে অমৃতকুণ্ড করিয়া রাখিল। অতএব সাহিত্যে আর পদাবলীর নূতন বিকাশ দেখিবার জো নাই—সাহিত্যে তাহার কাজ ফুরাইয়াছে।

তারপর মধ্যে সুদীর্ঘকালের নির্ব্বাসন—পাঁচালী ও কবির লড়াইয়ের পর্ব্ব। কোথায় প্রাণ, কোথায় গান, কোথায় জীবনের যৌবনের অপর্য্যাপ্ত আনন্দোচ্ছ্বাস!

সেই সুদীর্ঘ নির্ব্বাসনের পর আজ যৌবনের শৃঙ্গধ্বনি আমাদের শান্ত পল্লীপ্রাঙ্গণকে মুখরিত করিয়া দিয়াছে। এবার সকল সংস্কারের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে বিশ্বের উন্মুক্ত উদার রাজপথে বাহির হইতে হইবে। এবার ভেরী বাজিয়াছে, কালো তেজস্বী ঘোড়ার মত নব নব ভাবের সারি ছুটিয়াছে। এবার তরুণ সাহিত্যযাত্রীদের মুখের উপর সূর্য্যালোক পড়ুক, তাহাদের জয়োল্লসিত ললাটে জ্যোতি স্ফুরিত হোক্!

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের ব্যঙ্গচিত্র
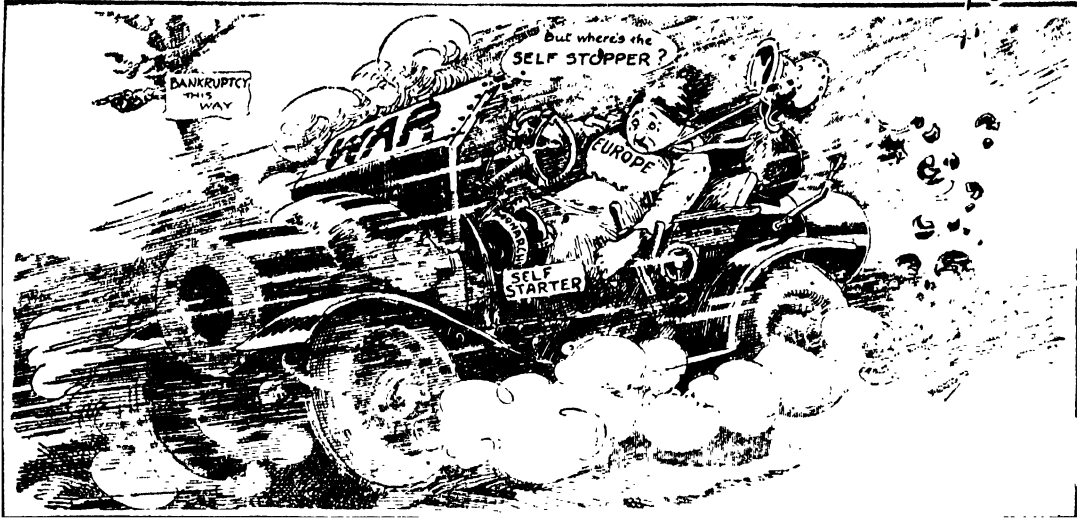
য়ুরোপ।--স্বয়ংক্রিয় চালকযন্ত্র ত তোফা কাজ করিতেছে, কিন্তু স্বয়ংক্রিয় স্থগিতযন্ত্রটার সন্ধান পাইতেছি কৈ?

—শিকাগো ডেলী নিউস

ধর্ম্মপ্রচারকের শিকার-প্রহসন।

ধর্ম্মপ্রচারক উইলিয়ম--হে ভগবান্! যদি আমার দিকে না হও, দোহাই তোমার ঐ ভল্লুকটাকেও সাহায্য করিয়ো না।

--লণ্ডন ওপিনিয়ন।

মার্কিন চাচার কাচ্চাবাচ্চা পরস্পরের নামে নালিশ করিতেছে।

—ক্লীভল্যাণ্ড লীডার।

অষ্ট্রীয়ার নিহত যুবরাজের প্রতি মৃত্যুর সান্ত্বনা—যুবরাজ ! আপনাকে একলা যাইতে হইবে না, আপনার উপযুক্ত সঙ্গী সহচর পাইক আর্দ্দালী আমি সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইতেছি !

—আমষ্টারডাম্যার।
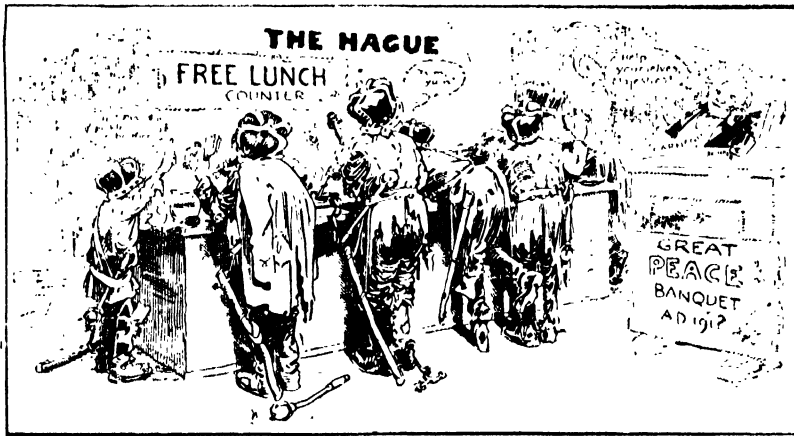
ভবিষ্যতের আভাস—সর্ব্বনেশে যুদ্ধ শেষ হইলে হেগ শহরের শান্তির বৈঠকে আনন্দ ভোজ হইবেই হইবে।
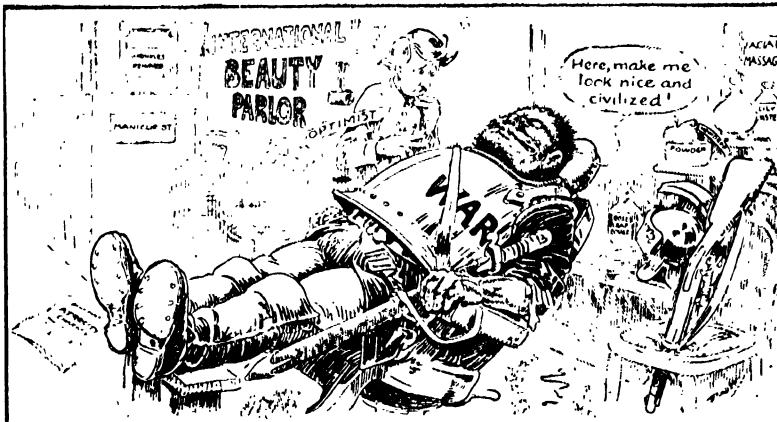
সৌন্দর্য্যশালায় যুদ্ধদানব চিকিৎসাধীন।

যুদ্ধদানব।—ডাক্তার, ডাক্তার, আমায় একটু সুন্দর সুদৃশ্য সভ্য ভব্য করে দিতে পার ?

—শিকাগো ডেলী নিউস।

জন্মান্তর-বাদ

(তৃতীয় প্রস্তাব)

আমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে জন্মান্তর বৈষম্যের কারণ হইতে পারে না ; দ্বিতীয় প্রবন্ধে আত্মার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে আত্মার পুনর্জ্জন্ম সম্ভব নহে। এই প্রবন্ধে জন্মান্তরবিষয়ক অপরাপর বিষয় আলোচিত হইবে।

জন্মান্তর ও ঐতিহাসিক প্রমাণ।

জন্মান্তরবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর অনতিবিলম্বেই পুনর্জ্জন্ম হওয়া আবশ্যক। বিদেহ অবস্থা যদি সম্ভব হয় কিংবা উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর যত শীঘ্র জন্ম হয়, ততই কল্যাণকর। সুতরাং জন্মান্তরবাদীকে বলিতেই হইবে যে কোন আত্মার মৃত্যু হইলে সেই নিমিষেই তাহার আবার জন্ম হইবে। মনে কর ক্যাণ্টের মৃত্যু হইল, মৃত্যুর তারিখ ১৮০৪ সাল, ১২ই ফেব্রুয়ারি। এই দিনই অবশ্য ক্যাণ্টের আবার জন্ম হইয়াছে। দ্বিতীয় ক্যাণ্ট যখন প্রথম ক্যাণ্টই, এবং প্রথম ক্যাণ্টেরই জ্ঞানসম্পত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি যে অসাধারণ মেধাবী হইবেন—এবিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। বামদেব মাতৃগর্ভে থাকিয়াই অধীতশাস্ত্র হইয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে লোকে এতটা বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু পুনর্জ্জন্মবাদ সত্য হইলে বলিতে হইবে যে জন্মগ্রহণ করিবার পরই দ্বিতীয় ক্যাণ্ট Critique of Pure Reason লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন। একথাটাও যদি স্বীকার না-ও করা হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে যৌবনকালে পড়িবা মাত্রই তিনি ঐ গ্রন্থের মর্ম্ম অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু জগতের ইতিহাস ত অন্যকথা বলে। দর্শনজগতে যাঁহারা ধুরন্ধর, তাঁহাদিগকেও অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া ঐ গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। সুতরাং ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না যে একজন বালক বা যুবক ঐ গ্রন্থ একবার পড়িল আর সব তাহার আয়ত্ত হইয়া গেল। সুতরাং বলিতেই হয় দ্বিতীয় ক্যাণ্টকেও অনেক সাধনা করিয়া ঐ গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। বেচারা ক্যাণ্টের কি দুর্দ্দশা ! নিজে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সে গ্রন্থ পড়িতেও এত মাথা ঘামান ! এখন এ ঘটনা বাদ দেওয়া যাউক। তাহার পর বলিতে হইতেছে দ্বিতীয় ক্যাণ্ট প্রথম ক্যাণ্ট অপেক্ষা অবশ্যই বেশী পণ্ডিত হইবেন এবং এক দর্শনশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিবেন। বলা বাহুল্য এই দার্শনিক মত প্রথম ক্যাণ্টের দার্শনিক মত অপেক্ষা উন্নততর হইবে। এখন প্রশ্ন—ক্যাণ্টের মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে এমন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা যাহাকে দ্বিতীয় ক্যাণ্ট বলা যাইতে পারে। জগতের ইতিহাসে কিন্তু দ্বিতীয় ক্যাণ্টের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না এবং উচ্চতর গভীরতর সুসংস্কৃত নূতন Critique of Pure Reasonও প্রকাশিত হইল না।

জগতে যেমন দ্বিতীয় ক্যাণ্ট দেখিতেছি না, সেই প্রকার দ্বিতীয় Fichte (ফিক্‌টে), Schelling (শেলিং) বা Hegel (হেগেল) দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয় বুদ্ধ বা দ্বিতীয় যীশুর আবির্ভাবই বা কোথায় ? বুদ্ধদেব ২৪০০ বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন—মানুষের পরমায়ু গড়ে যদি একশত বৎসরও ধরা যায়, তাহা হইলে অন্ততঃ ২৪ বার তাঁহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। যীশুর মৃত্যু হইয়াছে প্রায় ১৯০০ বৎসর ; তাঁহারও জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল ১৯ বার। সক্রেটিস্, প্লেটো, আরিষ্টটলের মৃত্যু হইয়াছে ২২০০ বৎসরেরও অধিক। ইহাঁদিগেরও ২১।২২ বার জন্মিবার কথা। কিন্তু জগতে এপ্রকার ঘটিয়াছে কি ? কেহ ত ইহাঁদিগের সাড়াশব্দ পাইতেছে না। তবে যদি তিব্বতে বা হিমাচলে ইহাঁদিগের জন্ম হইয়া থাকে তবে স্বতন্ত্র কথা।

মহাপুরুষগণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অপর মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ত হয়ই নাই, বরং ইহাই সত্য মহাপুরুষগণ অনেকেই সমসাময়িক। ডেকার্টের মৃত্যুর পূর্ব্বেই Malebranch (মালেব্রান্‌স্) Spinoza (স্পিনোজা), Locke (লক্) Leibnitz (লাইবনিজ্) প্রভৃতির জন্ম হয়। ক্যাণ্টের মৃত্যুর পূর্ব্বেই ফিক্টে, নোভ্যালিস্ শ্লেগেল, শেলিং, হেগেল, হার্বার্ট, শোপেন-

হাউয়ার ইত্যাদি মনীষীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ক্যাণ্ট, হেগেল, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতির মৃত্যুর পর যে আবার ইঁহাদিগের জন্ম হইয়াছে ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই, বরং ইহার বিপরীত মতই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। যাহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হইলে বুঝা যায়, তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। এস্থলে জন্মান্তরবাদী হয়ত বলিবেন মহাপুরুষদিগের আর জন্ম হয় না—জন্ম হয় সাধারণ লোকের। আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই—যাহাদিগের পুনর্জ্জন্ম ধরা যায়—তাহাদিগেরই পুনর্জ্জন্ম যত্রতত্র হয় না, যেমন মহাপুরুষগণের জন্ম হয় তিব্বতে; আর সাধারণ লোকের জন্মান্তর ধরা যায় না—সুতরাং সর্ব্বত্রই তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয়। দ্বিতীয় বক্তব্য এই—সাধারণ লোক ও অসাধারণ লোক, ইহাদিগের মধ্যে কি আত্যন্তিক পার্থক্য আছে? গুণানুসারে যদি সমুদয় লোককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজান যায় তাহা হইলে কি প্রথম ব্যক্তির সহিত দ্বিতীয় ব্যক্তির, দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত তৃতীয় ব্যক্তির এবং যে-কোন ব্যক্তির সহিত তাহার উভয় পার্শ্বের ব্যক্তির বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়? তাহা যদি দেখা যায় তবে কোথায় মহাপুরুষের আরম্ভ, তাহা কে নির্ণয় করিবে? তৃতীয় বক্তব্য এই—যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে কতকগুলি লোকের পুনর্জ্জন্ম আছে এবং কতকগুলি লোকের পুনর্জ্জন্ম নাই—তাহা হইলে সকলের জীবনই কি অনিশ্চিততার মধ্যে পড়িয়া রহিল না?

এস্থলে আলোচনাতে আমরা বুঝিলাম—কতকগুলি লোকের পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং আর অবশিষ্ট লোকের পুনর্জ্জন্ম অত্যন্ত সন্দেহজনক।

পূর্ব্বজন্মের কি আরম্ভ আছে?

জগতে প্রায় ১৫০ কোটী লোকের বাস। ইহাদিগের সকলেরই কি পূর্ব্বজন্ম ছিল? খাঁটী জন্মান্তরবাদী অবশ্যই বলিবেন—"হাঁ ছিল।" এই পূর্ব্বজন্ম দুই প্রকারের হইতে পারে—

(ক) প্রত্যেকের পূর্ব্বজন্মের সংখ্যা অনন্ত।

(খ) পূর্ব্বজন্মের আরম্ভ আছে।

(ক)

'পূর্ব্বজন্মের সংখ্যা অনন্ত'—এ বিষয়ে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে এই পৃথিবী অনন্তকাল ছিল না, ইহার আরম্ভ আছে; নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহা সৃষ্ট হইয়াছে। যখন পৃথিবী প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল, তখনই যে, ইহা জীবজন্তুর বাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহা নহে; পৃথিবী সৃষ্টির বহুকাল পরে ইহা মানুষের বাসের উপযুক্ত হইয়াছিল। মানবসৃষ্টির এবং অন্যান্য জীবসৃষ্টির যখন আরম্ভ আছে, তখন পূর্ব্বজন্মের সংখ্যা অনন্ত হইতে পারে না।

আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই—আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখিয়াও আমরা বলিতে পারি যে 'আমরা অনন্তকাল হইতে আছি' ইহা সত্য নহে। অনন্তকাল হইতে আছি অথচ আমাদের অবস্থা এত শোচনীয় ইহা কি সম্ভব? আমাদিগের যে উন্নতি হইয়াছে তাহাকে কি অনন্তকালের উন্নতি বলা যায়? অতীত অনন্তকালে এই অবস্থা হইল ভবিষ্যৎ অনন্তকালে আর কত হইবে?—আমাদিগের আশাভরসা কোথায়?

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই—যাঁহারা জন্মান্তরকে বৈষম্যের কারণ বলিয়া মনে করেন,—তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—"সকলেই যখন অনন্তকাল হইতে আছে, সকলেই যখন সমান সুযোগ পাইয়াছে—তখন জগতে বৈষম্য কেন?"

(খ)

সকলেরই প্রথমজন্ম আছে।

যে যুগে মানুষের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, সে যুগে লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। তাহার পর অল্পে অল্পে লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রথমে দুইজন সৃষ্ট হইয়াছিল, না দশজন সৃষ্ট হইয়াছিল, না সহস্রজন সৃষ্ট হইয়াছিল, না ইহা অপেক্ষাও অধিক লোক সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। কেবল এইমাত্র বলা যায় তখন লোকসংখ্যা অল্পই ছিল, পরে ইহার সংখ্যা দিনদিনই বাড়িয়াছে। লোকগণনা দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে; বিজ্ঞানের দিক হইতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া গিয়াছে।

কল্পনা করিয়া লওয়া যাউক প্রথম যুগে ১০০ লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মনে কর ২৫ বৎসর পরে ছেলে

মেয়ে লইয়া ইহাদের সংখ্যা ১৫০ হইল। এখন প্রশ্ন, এই ৫০ জন লোক কোথা হইতে আসিল? স্বীকার করিতেই হইবে, ইহাদের নূতন জন্ম হইয়াছে; ইহাদিগের আর পূর্ব্বজন্ম ছিল না। আরও একটুকু সূক্ষ্মভাবে ইহার আলোচনা করা যাইতে পারে। মনে কর ২৫ বৎসর পরে ১০০ লোকের মধ্যে ১০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং অবশিষ্ট ছিল ৯০ জন লোক। আর এই সময়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ৬০ জন লোক; সুতরং ২৫ বৎসরে মোট হইল ৯০+৬০=১৫০ লোক। এই যে ৬০ জন লোকের জন্ম হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে কেবল ১০ জনের পূর্ব্বজন্ম ছিল স্বীকার করা যাইতে পারে। যে ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল তাহারাই আবার কাহারও পুত্র, কাহারও কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অবশিষ্ট ৫০ জন লোকের আর পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে এই ৫০ জন প্রথমবার জন্মলাভ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ১০০ লোক নূতন জন্মলাভ করিয়াছিল, সুতরাং ১৫০ লোকেরই নূতন জন্ম হইয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে যত লোক আছে সকলেরই প্রথমজন্ম স্বীকার করা হইল। এইরূপে এখন প্রায় ১৫০ কোটী লোক হইয়াছে এবং ইহাদের সকলেরই প্রথম জন্ম আছে। প্রথমযুগে কেবল ১০০ লোক ছিল; ঐ জন্ম উহাদিগের প্রথম জন্ম; তাহার পর যত লোক বাড়িয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যেকেই এক সময়ে না এক সময়ে প্রথমবার জন্মিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানযুগেও এমন অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, যাহাদিগের এইটাই প্রথম জন্ম।

(গ)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রত্যেক যুগেই অনেক লোকের প্রথম জন্ম হইতেছে। এস্থলে প্রশ্ন এই—

যাহারা প্রথম জন্মলাভ করে, তাহাদিগের সকলেরই কি প্রকৃতি একপ্রকার?

সকলের প্রকৃতি একপ্রকার, এপ্রকার স্বীকার করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। প্রত্যেক যুগেই বহু নূতন লোকের প্রথম জন্ম হইতেছে, কিন্তু জগতে দুইটি লোককেও সম্পূর্ণরূপে একপ্রকার দেখিতেছি না। এমন দুইটি লোকও কি আছে যাহাদিগের আকৃতি একপ্রকার, ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি একপ্রকার; যাহাদিগের পারিবারিক অবস্থা ও শিক্ষা একপ্রকার, যাহাদিগের সামাজিক শাসন ও শিক্ষাও একপ্রকার, যাহাদিগের উপর জড়প্রকৃতিও একই প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতেছে, যাহাদিগের রীতি, নীতি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সমুদয়ই একপ্রকার? এপ্রকার দুইটি লোকও যখন মিলিতেছে না, তখন বলিতেই হইতেছে প্রথম জন্মেও লোকদিগের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। ইংরেজসমাজে একজন লোক প্রথম জন্মগ্রহণ করিল, নিগ্রোসমাজেও একজন লোক প্রথম জন্মলাভ করিল—এই দুইজন কখনই একপ্রকার নহে। বর্ত্তমান যুগেই যে কেবল এইপ্রকার পার্থক্য তাহা নহে, প্রত্যেক যুগেই এইপ্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

অতি প্রাচীনকালে, যখন মানব ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছিল, মনে কর, তখন একজন লোকের প্রথমবার জন্ম হইয়াছিল। আর বর্ত্তমানযুগে সুসভ্যসমাজে একজন প্রথমবার জন্মলাভ করিল। এই যে দুইজন লোক, যাহাদিগের উভয়েরই প্রথমজন্ম,—এই দুইজন লোকের প্রকৃতি কি কখন একপ্রকার হইতে পারে? বর্ত্তমানযুগের অতিবর্ব্বরসমাজের নিকৃষ্টতম লোকও আদিমযুগের উৎকৃষ্টতম লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আদিমযুগের মানব প্রায় পশুর ন্যায়ই জীবনধারণ করিত, পশুপালন বা কৃষিবিদ্যা তাহাদিগের কল্পনারও অগোচর ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানযুগের অতিঅসভ্যসমাজেও লোকে এসমুদয় বিষয়ে কিছু-না-কিছু পারদর্শী। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথম জন্মে মানব উন্নতও হইতে পারে, এবং অতিহীনও হইতে পারে। আমরা যদি বলি মানবসৃষ্টির পর প্রথম ১০০০০ বৎসরে মানব যে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমানযুগের অতি অসভ্যসমাজেও তাহা অপেক্ষা অধিক উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে কোন অত্যুক্তি হয় না। ঐ ১০০০০ বৎসরে একজন লোক প্রায় ১০০ বার জন্মলাভ করিতে পারিত। সুতরাং বর্ত্তমানযুগে অসভ্যসমাজে একজন লোক প্রথমবার জন্মলাভ করিয়া যতটুকু উন্নতিলাভ করে, আদিমযুগে ১০০ বার জন্মলাভ করিয়াও

সেপ্রকার উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এ অবস্থায় জন্মান্তরবাদের কি মূল্য আছে? বহুজন্ম যে আমাদিগের উন্নতির সহায় তাহা প্রমাণিত হইতেছে না। মানব প্রথমজন্মে যতটুকু উন্নতিলাভ করিতে পারে, অনেক সময়ে শতজন্মেও তাহা করিতে পারে না। এ অবস্থায় জন্মান্তরবাদের কল্পনা অনাবশ্যক।

সংস্কার ও পূর্ব্বজন্ম।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "আমরা কি এমন সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করি না, যাহা বহুদিনের শিক্ষার ফল বলিয়া মনে হয়? ইহা যখন এ জন্মের শিক্ষার ফল নহে, তখন অবশ্যই ইহা পূর্ব্বজন্মের শিক্ষার ফল।"

আমরা এ প্রকার সিদ্ধান্ত নাও করিতে পারি। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ইহা অপেক্ষাও যুক্তিযুক্ত। বিজ্ঞান বলিতেছে মানব বীজাণু (Germ plasm) হইতে গঠিত। মানবের দুইদিক—জড়াংশ ও অজড়াংশ। বীজাণুরও ঐ দুই দিক্। জীবিতাবস্থায় এই দুই অংশ ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ থাকে। বীজাণুর জড়ীয়ভাগ বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগের দেহ উৎপন্ন করিয়াছে। আমাদিগের অজড়াংশ যাহা, তাহারও আরম্ভ বীজাণুর অজড়াংশে। মাতা পিতা ও তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের জড়াংশ এবং অজড়াংশ বীজাণুর জড়াংশে ও অজড়াংশে নিহিত হইয়া রহিয়াছে; বীজাণুই পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিনিধি। মানুষের অভিজ্ঞতা দ্বারা এই বীজাণুর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়; ইহার অর্থ এই, বীজাণু পূর্ব্বপুরুষদিগের অনেক অভিজ্ঞতা বহন করিয়া আনে। বীজাণু সব সময়েই যে পিতামাতার প্রকৃতি প্রকাশিত করে তাহা নহে; অনেক সময়ে এমনও দেখা যায় যে মাতাপিতার আকৃতি ও প্রকৃতি সন্তানে অবতীর্ণ হইল না, হয়ত দশম বা পঞ্চদশ বা আরও ঊর্দ্ধতর পূর্ব্বপুরুষের আকৃতি ও প্রকৃতি লইয়া সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। আমরা যাহাকে সংস্কার বলি, তাহা বহুদিনের শিক্ষার ফল ইহা অতি সত্য; কিন্তু ইহা যে আমরা আমাদিগের পূর্ব্বজন্মে লাভ করিয়াছিলাম এবং তাহাই সংস্কাররূপে আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে তাহা নহে। ইহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের অভিজ্ঞতা, ইহা মানবজাতির অভিজ্ঞতা। বীজাণু এই অভিজ্ঞতার ভার বহন করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিনিধিরূপে ক্রমাগতই অগ্রসর হইতেছে। আমরা এজন্মে যাহা স্বয়ং উপার্জ্জন করি নাই তাহাও আমরা এইরূপে লাভ করিতেছি। ইহাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। জন্মান্তরবাদীগণের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

পুনর্জ্জন্ম এবং শাস্তি ও পুরস্কার।

আমরা মাতাপিতা ও পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে দেহ ও সংস্কার লাভ করি, ইহা শুনিয়া অনেক জন্মান্তর বাদী বলেন—

"ইহাতে সব মীমাংসা হইল না। তোমরা বলিতেছ—মাতা পিতা ও পূর্ব্বপুরুষদিগের দোষের জন্য সন্তান কুষ্ঠী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সন্তানের কি অপরাধ যে সে অপরের দোষের জন্য শাস্তি পাইবে? সুতরাং বলিতে হইবে সন্তান পূর্ব্বজন্মে নিজে অপরাধ করিয়াছিল, সেইজন্য তাহার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। এদিকে মাতা পিতা ও পূর্ব্বপুরুষদিগের দোষের জন্য সন্তানের কুষ্ঠরোগ হইবার কথা। এই দুইটি কারণ সম্মিলিত হইয়া সন্তানকে কুষ্ঠী করিয়াছে। এইরূপ যদি স্বীকার কর তবেই নীতির প্রাধান্য বজায় থাকে।"

(ক)

এ বিষয়ে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই ঃ—

এই যে বলা হইতেছে "'পূর্ব্বজন্মের আমি', 'পূর্ব্বজন্মের আমি'—এ 'আমি'র সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ তাহা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পিতার সহিত সম্বন্ধ আছে, মাতার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, পুত্রকন্যার সহিত সম্বন্ধ আছে, ভাইভগিনীর সহিত সম্বন্ধ আছে, সমাজের নরনারীর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, হে পাঠক! আমি তোমার অপরিচিত, তুমিও আমার অপরিচিত—তোমার সহিতও আমার সম্বন্ধ আছে; এমন কি শেয়াল, কুকুর, ইঁদুর, বেড়াল—ইহাদিগের সহিতও একটা সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এই যে 'পূর্ব্বজন্মের আমি', এই 'প্রিয়তম আমি'র সহিতই কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই 'অজ্ঞাত আমি'

তত আমার নহে, সংসারের নরনারী যতটা আমার! এই 'আমি'র সঙ্গে আমার যদি একত্ব থাকে, সে একত্ব কাহার সঙ্গে নাই? সেই সাধারণ সম্বন্ধ—যাহাকে একত্ব বলা হইতেছে—সেই সাধারণ সম্বন্ধ ছাড়া সংসারের নরনারীর সঙ্গে একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আর মাতাপিতার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহা এসমুদয় সম্বন্ধ অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ। মাতাপিতার নিকট হইতে কি না প্রাপ্ত হইয়াছি? আংশিকরূপে আধ্যাত্মিকভাবেও তাঁহারাই কি আমাতে অবতীর্ণ হন নাই? এখানে একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইতেছি এবং তাহা অনুভবও করিতেছি। 'আমি' উত্তম পুরুষ, কিন্তু 'পূর্ব্বজন্মের আমি' আমার নিকট উত্তম পুরুষ নহে—ইহা প্রথম পুরুষই এবং মাতাপিতাও প্রথম পুরুষ। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের যে আমি—তাহার বিশেষত্ব কোথায়? প্রথমপুরুষবাচ্য এই 'অজ্ঞাত আমি'র পাপের বোঝা তত আনন্দের সহিত বহন করিতে পারি না, পিতামাতার বোঝা যত আনন্দের সহিত বহন করিতে পারি।

(খ)

আমরা মূলে সকলেই এক; সকলেই ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছি, সকলে ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত এবং সকলের গতি ব্রহ্মেরই দিকে। ব্রহ্মই সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদয় আত্মাকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সত্য যতই অনুভব করিব, জগৎকে ততই আপনার বলিয়া বুঝিতে পারিব। তখন আর প্রশ্নই উঠিবে না—যে, কেন আমরা অপরের বোঝা বহিতেছি। আর ইহা যে বোঝা এই চিন্তাই প্রাণে আসিবে না।

(গ)

এজগতে আমরা যে দুঃখভোগ করিতেছি, তাহার কারণ যদি আমাদিগের পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতিই হয় তবে জগতের সাধু মহাত্মাগণ অপেক্ষা অধিকতর দুষ্কৃতাত্মা আর কে আছে? ইহাঁরা কি পূর্ব্বজন্মে এত পাপই করিয়াছিলেন যে সেজন্য এই জন্মে এত দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে? আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে হইয়াছে, কারাগারে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে, ক্রুশে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে, অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জগতের ধার্ম্মিকগণ এবং যুগপ্রবর্ত্তকগণ যেপ্রকার নির্য্যাতনভোগ করিয়াছিলেন, আমাদিগের মত ক্ষুদ্রমানব তাহার শতাংশের একাংশও ভোগ করে নাই।

পরিবারে দেখিতে পাই, যে পুত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ, সংসারের সমুদয় বোঝা তাহার মস্তকেই পড়ে, এবং সময়ে সময়ে ইহার ভারে তাহাকে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতে হয়; আর যে পুত্র অধার্ম্মিক, সে স্ফূর্ত্তিতে জীবন কাটাইয়া দেয়। ধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্র কি পূর্ব্বজন্মে এত পাপই করিয়াছিল যে তাহাকে সংসারের ভারে নিপীড়িত হইতে হইতেছে। আর এই দুষ্ট সন্তান কি এতই ধার্ম্মিক ছিল যে সে সংসারে নিশ্চিন্তভাবে স্ফূর্ত্তিতে বাস করিতেছে?

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের জন্য যদি এইপ্রকার সুখদুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ত বিচার অতি অদ্ভুত হইল। এ সংসারে যাহারা ধার্ম্মিক তাঁহারাই পাইতেছেন কষ্ট, আর যাহারা দুর্ব্বৃত্ত তাহাদিগের জন্যই সংসারের সুখ। এপ্রকার কেন ঘটে? পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের দ্বারা ইহা মীমাংসিত হইবে না। তবে মীমাংসা কোথায়? 'জগৎ আমার, আমি জগতের' এই তত্ত্বটি বুঝ, তাহা হইলে আর অপরের দুঃখ বহিতেছি বলিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে না। যদি বুঝিতে পার 'এজগৎ আমার অতি আপনার'—তাহা হইলে জগতের পাপতাপের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দ্বিধা হইবে না। লোকে বলে "অপরের জন্য শাস্তি ভোগ! কি অবিচার!" কিন্তু অপরের জন্য শাস্তিভোগই আমাদের জীবনের মহত্ব ও উচ্চ অধিকার। "অপরের জন্য শাস্তি"—এ ভাষা আমাদিগের। ধার্ম্মিক নরনারীর ভাষা স্বতন্ত্র—তাঁহারা জগতে "অপর" খুঁজিয়া পান না।

(ঘ)

আমি সমাজের অঙ্গ, সমাজের উন্নতি অবনতি আমার জীবনে কার্য্য করিতেছে, আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি সমাজে প্রতিফলিত হইতেছে। সমাজ ভিন্ন আমার উন্নতি

অসম্ভব। আমি যদি পরিবারে ও সমাজে প্রতিপালিত না হইয়া কোন অরণ্যে পশু কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতাম তাহা হইলে আমি কি পশুই হইতাম না? আমি যে মানুষ হইয়াছি ইহা পরিবার ও সমাজেরই জন্য। আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা পিতা মাতা ভাই ভগিনী, আত্মীয় স্বজন এবং সমাজের প্রত্যেক নরনারীর জন্য। সমাজের সহিত আমার যদি এতই নিকট সম্বন্ধ হয়, আমি যদি সমাজের হই এবং সমাজ যদি আমার হয়, তবে আমার জন্য সমাজ দুঃখভোগ করিবে এবং সমাজের জন্য আমি দুঃখভোগ করিব ইহা কি অবিচার?

এই যে ইউরোপে ভীষণ যুদ্ধব্যাপার চলিতেছে, ইহার জন্য এই যে সহস্র সহস্র পরিবার অনাথ হইতেছে, অযুত অযুত রমণী বিধবা হইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক বিপদাপন্ন হইয়া জীবন কাটাইতেছে, সুদুর ভারতবর্ষেও যেজন্য কত পরিবারকে হাহাকার করিতে হইতেছে— এসমুদয় নরনারীই, ইহাদিগের প্রত্যেক নরনারীই কি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। ইহা হইলে ত ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত। আর কোন যুগের এত নরনারী এত অপরাধ করিল না, আর হঠাৎ এই যুগের নরনারীই এতটা অপরাধে অপরাধী হইল! আমরা এস্থলে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল দেখিতেছি না, আমরা দেখিতেছি প্রকৃতপক্ষে সমুদয় নরনারী, সমুদয় পরিবার, সমুদয় সমাজ, সমুদয় দেশ একসূত্রে আবদ্ধ। যাহা একের সুখদুঃখ, তাহা অপরেরও সুখদুঃখ, একের কল্যাণ যাহা, অপরের কল্যাণও তাহা। এক অপর ভিন্ন থাকিতে পারে না। হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ উদরাদি যেমন একই দেহের অঙ্গ, তেমনি সকল জাতি ও সকল নরনারী একই দেহের অবয়ব। ইহা বুঝিলেই কল্যাণ, না বুঝিলে চক্ষুকর্ণ উদরাদির কলহের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। সকলেই যখন এক, তখন একের পাপপুণ্যের জন্য অপরের দুঃখসুখ হইবে না কেন? শিশুসন্তান সম্পূর্ণরূপে মাতার উপর নির্ভর করে, মাতার বিপদ হইলে সন্তানকেও ভুগিতে হয়। মানবসমাজ না হইলে আমাদিগের চলে না, সেইজন্য আমাদিগের ব্যাধিতে সমাজের ব্যাধি এবং সমাজের এক অঙ্গে ব্যাধি হইলেও আমাদিগকে সেই ব্যাধির জন্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। একটা অদ্ভুত ও অসম্ভব কল্পনা দ্বারা ইহা আরও একটুকু স্পষ্ট করা যাইতে পারে। আমরা ব্রহ্মের সত্তায় সত্তাবান; ব্রহ্মের ব্যাধি হইলে আমাদিগকেও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হইত; সমাজের এক-অঙ্গের ব্যাধিতে যে অপর এক অঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে তাহার কারণ এই একত্ব। জগতে সর্ব্বত্রই শুল্ক দিতে হয়—আমাদিগকেও যেন এই শুল্কই দিতে হইতেছে। শুল্ক দেওয়া যদি এতই কষ্টকর হয়, আফ্রিকার মরুভূমি কিংবা মধ্যএসিয়ার বিজন প্রদেশে যাইয়া যদি সম্ভব হয় এই একত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার চেষ্টা কর।

(৬)

একত্ব স্বীকার করিয়া লও দেখিবে, একজনের সুখদুঃখ অপরের সুখদুঃখ হইয়া গেল। তেমনি একের সুখদুঃখ অপরের হইতেছে ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে সকলেই এক, সকলেই একসূত্রে বাঁধা। মনে কর একজন লোকের কেবল কর্ণই আছে, আর কোন ইন্দ্রিয় নাই; অপর একজন ব্যক্তি আছে যাহার কেবল চক্ষুই আছে এবং আর কোন ইন্দ্রিয় নাই। এই দুইজন ব্যক্তির মধ্যে কি ভাবের বিনিময় হওয়া সম্ভব? সম্ভব নয় এইজন্য, যে উভয়ের মধ্যে কোন সংযোগ নাই। একজন এক জগতে বাস করে, অপরজন বাস করে অপর এক জগতে; একজনের জগৎ শব্দময়—অপরের জগৎ রূপময়। শব্দ, রূপের ভাষা বুঝে না এবং রূপও শব্দের ভাষা বুঝে না; তাই দুজনে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যদি দুজন মানুষ কল্পনা না করিয়া কল্পনা কর যে একই লোকের ঐ দুই ইন্দ্রিয়, তাহা হইলে রূপও শব্দের ভাষা বুঝিবে, শব্দও রূপের ভাষা বুঝিবে। জগতে এই যে সুখদুঃখ, পাপপুণ্যের আদানপ্রদান হইতেছে, ইহা হইতে এই শিক্ষালাভই করিতেছি যে কেহ কাহারও 'পর' নহে। সাধারণ লোকের ভাষা এই 'এক অপরের জন্য কষ্ট পায়'। কিন্তু জ্ঞানীর নিকটে 'অপর' বলিয়া কিছু নাই, আপন এবং পর একই জিনিষের এপিঠ ওপিঠ।

(চ)

লোকে যাহাকে শাস্তি বলে, সেই শাস্তির উদ্দেশ্য কি? প্রথমতঃ শাস্তি দেওয়া হয় প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য। তুমি আমার দাঁত ভাঙ্গিয়াছ। আচ্ছা আমিও তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিব। কিন্তু 'রাহু' তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া কি তুমি কেতুর দাঁত ভাঙ্গিবে? যতই বলনা কেন, রাহু রাহুই এবং কেতু কেতুই। 'রাহুই মরিয়া কেতু হইয়াছে'—এই বিশ্বাসে যদি রাহুর জন্য কেতুকে শাস্তি দাও তবে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। আমার কুকুর তোমার কুকুরকে কামড়াইয়াছে—এজন্য তুমি আমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে—ইহাও বরং সমর্থন করা যায়—রাহুর জন্য কেতুকে যে দণ্ড দিবে তাহা সমর্থন করা যায় না। কারণ উভয়ের একত্ব কাল্পনিক। পুনর্জ্জন্মবাদীদিগের মীমাংসায় মনে হয় তোমার যখন দাঁত ভাঙ্গিয়াছে, তখন একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতেই হইবে, সে দাঁত কেতুরই হউক বা সূর্য্যেরই হউক।

(ছ)

শাস্তি দেওয়ার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পাপীকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করা। কোন্ অপরাধের জন্য একজনকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে তাহা তাহাকে জানান দরকার। নতুবা সে ব্যক্তি সেই অপরাধ হইতে নিবৃত্ত হইবে কিরূপে? মনে কর আমি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য পূর্ব্বজন্মে কোন্ পাপ করিয়াছিলাম যে-জন্য আমাকে চক্ষুহীন হইতে হইল? যদি জানি এই পাপ করিয়াছিলাম, তবেই এজন্মে আমি সাবধান হইতে পারি। অজ্ঞানতাপ্রসূত অপরাধের জন্যও অনেক সময়ে শাস্তি দেওয়া হয়। এসমুদয়স্থলে কোন্ অপরাধের জন্য এই শাস্তি দেওয়া হইল তাহা না জানাইলে উপায়ই নাই। মনে কর পূর্ব্বজন্মে একজন লোক আমার পিতার চক্ষু নষ্ট করিয়াছিল এবং এইজন্য আমি সেই ব্যক্তির চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম। আর একব্যক্তি আমার মাতার চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। এজন্মে আমাকে চক্ষুহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। আরও মনে কর চক্ষুবিনাশসংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি চক্ষুবিনাশ। এখানে, আমার চক্ষুর বিনাশ কেন হইল? পিতার শত্রুকে চক্ষুহীন করিয়াছিলাম বলিয়া, না মাতার শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছিলাম বলিয়া? কোন কোন সমাজে প্রতিহিংসা করা ধর্ম্ম, কোন কোন সমাজে ক্ষমাই ধর্ম্ম। যদি তুমি প্রতিহিংসাকে ধর্ম্ম মনে কর, তবে বলিবে ক্ষমার জন্যই আমি অন্ধ হইয়াছি; আর যদি ক্ষমাকেই ধর্ম্ম মনে কর, তবে বলিতে হইবে প্রতিহিংসার জন্য আমি অন্ধ হইয়াছি। শিক্ষার জন্য যদি শাস্তি হয়, তবে আমাকে বলিয়া দিতে হইবে কেন শাস্তি হইতেছে। পুনর্জ্জন্মবাদের দোষ এই যে ইহা শাস্তির আবশ্যকতা স্বীকার করে, কিন্তু শাস্তির কারণ জানে না, সুতরাং শাস্তির কারণ বলার আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

(জ)

শাস্তি দিবার তৃতীয় উদ্দেশ্য জনসমাজকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যবিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে এখানেও তাহাই বক্তব্য। কোন এক ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হইল; জগৎবাসী দেখিল, এইপ্রকার কার্য্য করিলে এইপ্রকার শাস্তি হয়, তখন লোকে সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। অনির্দ্দিষ্ট কোন ঘটনার জন্য যে-সে একটা শাস্তি দেওয়া হইলে লোকে নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট কোন পাপ হইতে বিরত হয় না।

শাস্তি সম্বন্ধে যেরূপ, পুরস্কার সম্বন্ধেও তেমনি। পুরস্কারের কোন মূল্যই থাকে না, ইহা দ্বারা জীবনগঠনের কোন সাহায্যই হয় না, যদি না জানা যায় কেন এই পুরস্কার দেওয়া হইল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে জন্মান্তরবাদ দ্বারা শাস্তি ও পুরস্কারের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে এবং 'কেহ কাহারও পর নয়' ইহা স্বীকার করিলে সমুদয়ই মীমাংসিত হইয়া যায়।

এখন জন্মান্তরবাদীদিগের কয়েকটা যুক্তির বিষয় আলোচনা করা যাউক। অধিকাংশ যুক্তিই চিন্তাশীল ও খ্যাতনামা লেখকগণের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

জন্মান্তরের কয়েকটি যুক্তি।

(১)

প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম ও পুনর্জ্জন্ম।

একজন খ্যাতনামা ইংরেজ দার্শনিক পণ্ডিত জন্মান্তর-বাদের পক্ষে এই যুক্তিটি দিয়াছেন :—

দুই জন লোক একত্র হইলেন; আলাপ নাই, পরিচয় নাই, অথচ সাক্ষাৎ হইবামাত্রই পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। এই অনুরাগ এতই প্রবল যেন ইঁহারা চিরপরিচিত বন্ধু। এ প্রকার হইবার ত কোন কারণ পাওয়া যায় না। পূর্ব্বজন্ম স্বীকার কর, স্বীকার করিয়া লও সেইজন্মে ইহারা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। সবই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

এই যুক্তির যে বিশেষ সারবত্তা আছে তাহা ত মনে হয় না। এই পৃথিবীতেই যাঁহারা বন্ধু, তাঁহাদিগের মধ্যেও সব সময়ে এপ্রকার আকর্ষণ দেখা যায় না। মনে কর দুজন বন্ধু, পরস্পর হরিহরাত্মা; ঘটনাচক্রে ২০।২৫ বৎসর ছাড়াছাড়ি, একে জানেনা অপরে কোথায় বা কি অবস্থায়, কি করিতেছে। উভয়েই বিষম বিপদে দিন কাটাইতেছে, এ অবস্থায় স্বাভাবিক যে একে অপরের বিষয় চিন্তা করিবে, পরস্পর পরস্পরের অভাব অনুভব করিবে, অন্তরে অন্তরে একে অপরকে ভাল বাসিবে। কুষ্ঠরোগে একজন আক্রান্ত হইল, তাহার মুখ বিকৃত হইয়া গেল; আর একজন আক্রান্ত হইল বসন্ত রোগে, মুখে বসন্তের দাগ, একটি চক্ষুও নষ্ট হইয়া গেল। কেহ মনে করিতে পারেন যে ইহারা একত্র হইলেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। অনেকস্থলে কি বিপরীত কথাই সত্য হয় না? ১০।১১ বৎসরের প্রিয়তম পুত্র কিংবা কন্যাকে দেশে রাখিয়া তোমাকে বিদেশে যাইতে হইয়াছে। ২০।২৫ বৎসর পরে যদি বিদেশে কোন স্থলে তোমাদের দেখা হয়, কেহ যদি পরিচয় না দেয়, তবে উভয়ের দেখা হইলেই কি একে অপরের দিকে আকৃষ্ট হয়? তোমার প্রিয়তম সন্তান নাট্যশালায় অভিনয় করিতে যাইবে, তাহার বেশভূষা এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে তুমি তাহাকে চিনিতে পারিতেছ না। সে যদি তোমার নিকটেও উপবেশন করে তোমার অপত্যস্নেহ কি জাগিয়া উঠিবে? The Maid of Neidpathএর কথা অনেকেই জানেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি কত অনুরক্ত। রমণী প্রেমাস্পদের আশায় বসিয়া আছেন, যুবকও প্রণয়িনীর নিকট আসিতেছেন; রমণী রোগে জীর্ণ, যুবক তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, তিনি চলিয়া গেলেন। শোকে রমণীর মৃত্যু হইল। যুবকের কি প্রেমের অভাব ছিল? দেহের কিছু পরিবর্ত্তন হইলে এই পৃথিবী-তেই এইপ্রকার ঘটে, আর পূর্ব্বজন্মে ভালবাসা ছিল, এজন্মে সেইজন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি টান হইবে—ইহা কি বিশ্বাস করা যায়? একজনকে তুমি দেখিলে, দেখিয়া আকৃষ্ট হইলে; আমি দেখিলাম, দেখিয়া আমিও আকৃষ্ট হইলাম; যে দেখিল, সেই দেখিয়া আকৃষ্ট হইল। এখানে কি বলিতে হইবে পূর্ব্বজন্মে আমরা সকলেই তাঁহার বন্ধু ছিলাম ও তিনিও আমাদিগের বন্ধু ছিলেন? এসমুদয় আমার কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। আমরা অনেক সময়ে বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হই। এমন অনেক লোক আছেন, যাহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। দুদণ্ড তাহার নিকট বস, হয়ত দেখিবে লোকটার প্রকৃতি কি নিকৃষ্ট,—তখন পালাইবার স্থান পাইবে না।

অনেক সময় মানসিকভাব এমনভাবে মুখে প্রতি-ভাত হইয়া থাকে, যে, অনেকে তাহা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যান। হয়ত আমার মনের এমনই অবস্থা যে অপর লোকের মুখে একটি কথা শুনিবামাত্রই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। অধিকাংশ স্থলেই এইপ্রকার ঘটনা অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে। দার্শনিক যুক্তিতর্ক দ্বারা এপ্রকার অনুরাগ উৎপন্ন হয় না; সেইজন্য আমরা সব সময়ে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি না। অনেক সময়ে পুরুষ ও রমণীর মধ্যে এইপ্রকার আকর্ষণ দেখা যায়; এই আকর্ষণ যে অনেক স্থলেই যৌন আকর্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। একজন এইপ্রকার ভালবাসায় পড়িয়া বলি-বেন 'I courted eighty-one and married one': আর একজন হয়ত বলিবেন—I courted eighty-one and married none, একজন ৮১ স্থলে ভাল-বাসায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ করিয়াছেন একজনকে —আর একজন তাহাও করেন নাই। এমন রাশি রাশি দৃষ্টান্ত আছে, যাহাতে দেখা যায়—প্রথম দৃষ্টি-

তেই দুইজনের অনুরাগ হইল এবং উভয়ের বিবাহও হইয়া গেল। ২।১ বৎসর যাইতে না যাইতে উভয়েই স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল—একত্র বাস করা আর সম্ভব হইল না। যাহারা এক সময়ে একজন অপরকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া সম্বোধন করিত এবং ভাবিত অনন্তকাল হইতেই যেন তাহারা প্রেমশৃঙ্খলে বাঁধা ছিল,—তাহারা আজ কেবল অপরিচিত নহে,—পরস্পর পরস্পরের পরম শত্রু।

এপ্রকার অনুরাগ ও বিরাগের কারণ নির্ণয়ের জন্য পুনর্জ্জন্মে যাওয়া অনাবশ্যক।

(২)

জীবব্রহ্মভেদের জন্য দেহ আবশ্যক।

কোন কোন জন্মান্তরবাদী বলেন—

"কোন-না-কোন আবরণ ব্যতীত জীবব্রহ্মের ভেদ অসম্ভব। সুতরাং জীব যে অবস্থায়ই থাক্, তাহার কোন-না-কোন প্রকার শরীর থাকা আবশ্যক।"

এখানে তিনটি বস্তুর কথা বলা হইয়াছে—(১) ব্রহ্ম, (২) জীব (৩) আবরণ বা দেহ। বলা হইতেছে আবরণ রহিয়াছে বলিয়াই জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। দেহ না থাকিলে ভেদ থাকিত না। 'ভেদ থাকিত না' ইহাতে দুই অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ—উভয়ের মধ্যে জাতিগত ভেদ থাকিত না, উভয়ে একজাতীয় বস্তু হইয়া যাইত। ইহাই যদি প্রকৃত অর্থ হয় তবে সকলেই মৃত্যু কামনা করিবে। কে না ব্রহ্মজাতীয় বস্তু হইতে চায়? দ্বিতীয় অর্থ এই জীব ব্রহ্মে মিলিয়া যাইত। এই যুক্তি জড়বাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্ম যদি পটাকাশ হইত, আর জীব ঘটাকাশ হইত, তাহা হইলে ঘটের অভাবে ঘটাকাশ পটাকাশের সঙ্গে মিশিয়া যাইত। ব্রহ্ম যদি অনন্ত আকাশব্যাপী কোন বায়বীয় পদার্থ হইত, আর জীবাত্মা সসীম স্থানব্যাপী কোনপ্রকার বাষ্পীয় বস্তু হইত, তাহা হইলে অবশ্যই জীবের একটা আবরণ আবশ্যক হইত। কিংবা পরমাত্মা যদি অসীম জলরাশি হইত, আর জীবাত্মা কোন ভাণ্ডস্থ জল হইত, তাহা হইলে ভাণ্ডরূপ আবরণ বিনষ্ট হইলে অবশ্যই সসীম জলের অস্তিত্ব থাকিত না, ইহা অসীম জলের সহিত মিশিয়া যাইত। অনেকেই মনে করেন আত্মা যেন একটা সূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থ, এবং এই পদার্থটি শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বোতলের মধ্যে যেমন গ্যাস থাকে দেহের মধ্যেও যেন তেমনি আত্মা রহিয়াছে। ব্রহ্মও অনুরূপ একটি পদার্থ। পার্থক্য এই জীবাত্মা দেহ ব্যাপিয়া থাকে, আর পরমাত্মা অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। যাঁহাদের মনে এইপ্রকার ধারণা আছে, তাঁহারা সহজেই বলিবেন যে এই দেহ নষ্ট হইয়া গেলে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিশিয়া যায়।

কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে পার্থক্য তাহা 'স্থান-ব্যাপ্তি'-মূলক নহে। মানবের যে ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বেই তাহাকে ব্রহ্ম হইতে এবং অপরাপর বস্তু হইতে পৃথক করিয়াছে! মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যতটুকু পার্থক্য আছে, এক ব্যক্তিত্বই ঐ পার্থক্যের মূল ও নিদর্শন। 'আমি' 'আমিত্ব' 'আমার' ইত্যাদি জ্ঞান ও ভাব দ্বারা মানব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়াছে। যে শক্তি দ্বারা 'আমিত্ব' 'মমত্ব' ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে সেই শক্তিই মানবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়াছে। এই পার্থক্য কাহারও মতে আংশিক, কাহারও মতে পূর্ণ। দার্শনিক ভাবে ইহাকে আংশিকই বল, আর পূর্ণই বল, এই ব্যক্তিত্বজ্ঞানেই মানব আপনাকে পরমাত্মা হইতে এবং অপরাপর বস্তু হইতে পৃথক্ মনে করে। যদি ব্যক্তিত্ব-বোধ না থাকিত, তাহা হইলে এই প্রশ্নই উঠিত না যে 'জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক কি না।' ব্যক্তিত্বকে আমরা আত্মার কেন্দ্র বলিতে পারি। প্রত্যেক আত্মা-রই একটি কেন্দ্র এবং কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি আছে। এই শক্তিবলেই জ্ঞান প্রেমাদি আত্মার কেন্দ্রাভিমুখ হইয়া থাকে। ইহাতেই প্রত্যেক আত্মার বিশেষত্ব। জীবাত্মার বিশেষত্ব ইহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতেই নিহিত, বাহ্য কোন উপায়ে ইহার বিশেষত্ব উৎপন্ন হয় না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এক-একখানা দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মার বিশেষত্বের জন্য দেহের কোন আবশ্যক নাই। আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধ আধার আধেয় সম্বন্ধ নহে, এ সম্বন্ধ ব্যাপ্তিমূলক নহে, এ সম্বন্ধ কার্য্যকারণ সম্বন্ধও নহে। সম্বন্ধ যে কি প্রকার সে

বিষয়ে অত্যন্ত মতভেদ, কিন্তু ইহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। আমরা এখানে একটা প্রশ্ন করিতে পারি—"একটা জড়ীয় আবরণ না থাকিলেই কি দুইটি বস্তুর মধ্যে ভেদ চলিয়া যায়? জড়বস্তুবিষয়েও সব সময়ে ইহা সত্য নহে এবং অধ্যাত্মরাজ্যের বস্তুবিষয়েও ইহা সত্য নহে। বায়বীয়বস্তুবিষয়ে ইহা সত্য হইতে পারে; অম্লজান, জলজান ইত্যাদি বস্তু পরস্পরের সহিত মিশিয়া যায়। কিন্তু জল ও তেল কখন মেশে না, দুগ্ধ ও পারদকে একত্র রাখিলেও ইহাদিগের ভেদ চলিয়া যায় না। কতকগুলি প্রস্তর, কতকগুলি টাকা একসঙ্গে রাখিলেও ইহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। অধ্যাত্মবস্তুবিষয়েও জড়ীয় আবরণ দরকার হয় না। অশ্ববিষয়ে আমার একটি জ্ঞান আছে, লৌহবিষয়েও একটি জ্ঞান আছে; এই উভয় জ্ঞানকে পৃথক করিবার জন্য কি জড়ীয় আবরণ দরকার। আমাদিগের অন্তরে কতপ্রকার জ্ঞান, কত বিষয়ের প্রতি প্রেম;—এক জ্ঞান হইতে অন্য জ্ঞানকে পৃথক্ করিবার জন্য, এক প্রেমকে অন্য প্রেম হইতে পৃথক্ করিবার জন্য, জ্ঞান হইতে প্রেমকে পৃথক করিবার জন্য কি এক-একটা বেষ্টন দরকার হইয়াছে?

(৩)

সসীম জ্ঞানের দেহ আবশ্যক।

জন্মান্তরের আর একটি যুক্তি এই :—অসীম জ্ঞানের পক্ষে কোন প্রকার শরীরের প্রয়োজন নাই কিন্তু সসীম জ্ঞান হইলেই বুঝা যায় ইহা সশরীর—ইহার কোন বেষ্টন আছে।

এযুক্তি পূর্ব্বযুক্তিরই রূপান্তর এবং ইহাও জড়বাদ। যাঁহারা এই যুক্তি দিয়াছেন তাঁহারা জড়বাদী না হইতে পারেন কিন্তু জড়বাদ সূক্ষ্মভাবে তাঁহাদের প্রাণে কার্য্য করিতেছে। তাঁহাদের মনের ভাব বিশ্লেষণ করিলে এইপ্রকার দাঁড়ায়—শরীরের বিস্তৃতি আছে এবং এই বিস্তৃতির সীমা আছে; আর যাহা অসীম—তাহারও বিস্তৃতি আছে কিন্তু ইহা অনন্তপ্রসারিত, সর্ব্বদিকে ইহা বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানব্যাপ্তির ভাব প্রাণে কার্য্য করিতেছে বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত জন্মান্তরবাদীগণ বলিতে পারিয়াছেন—অসীম জ্ঞানের শরীর নাই আর সসীম জ্ঞানের শরীর আছে। জ্ঞানটা যেন দেহে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—দেহটাই যেন জ্ঞানের সীমা। আচ্ছা আপাততঃ ইহাই ধরিয়া লওয়া যাউক। এখানে আমরা জিজ্ঞাসা করি সত্যসত্যই কি জ্ঞানবস্তুটা দেহের মধ্যে আবদ্ধ? দেহের বহিঃস্থ কোন বস্তুকে কি ইহা জানিতে পারিতেছে না? বরং অনেক সময়ে ইহার বিপরীত কথাই সত্য,—শরীরের ভিতরে কি ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা আমরা ততটা জানি না—বাহিরের ঘটনা যতটা জানি। কিন্তু আসল কথাটা এই যে জ্ঞান স্থান ব্যাপিয়া থাকে না। 'অসীম জ্ঞান' ও 'সসীম জ্ঞান'—ইহাদিগের এ অর্থ নয় যে অসীম জ্ঞান অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া থাকে আর সসীম জ্ঞান অল্প স্থান ব্যাপিয়া থাকে। যে জ্ঞানের নিকট সমুদয় বিষয় যথার্থ ভাবে এবং অপরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাই অনন্ত জ্ঞান; আর যে জ্ঞানের নিকট সমুদয় বিষয় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় না তাহাই সসীম জ্ঞান।

আর একটা কথা—জড়বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করা যায়; একখানা কাঠকে যত ইচ্ছা ভাগ করা সম্ভব। কিন্তু জ্ঞানবস্তুকে কি এপ্রকারে ভাগ করা যায়? আমাদিগের যে স্নেহ, ভালবাসা এসমুদয়কে কি খণ্ড খণ্ড করা সম্ভব? 'মানবের জ্ঞান সসীম' ইহার অর্থ ইহা নয় যে দেহরূপ কোন জড়বস্তুর সাহায্যে অনন্তজ্ঞান হইতে অংশবিশেষ পৃথক্ করা হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি হইতে অংশবিশেষকে কোন প্রকার পাত্রের সাহায্যে পৃথক করা সম্ভব, কিন্তু আত্মার বিষয়ে এপ্রকার সম্ভব নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যক্তিত্বই আত্মার পার্থক্যের কারণ।

(৪)

আত্মার স্নায়বীয় যন্ত্র আবশ্যক।

পুনর্জ্জন্মের আর একটি যুক্তি এই :—"আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় দেখিতে পাই, আমাদের অনেক ক্রিয়াই—সম্ভবতঃ সমুদয় ক্রিয়াই—শরীরের সহযোগিতার উপর, স্নায়বিক যন্ত্রের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। স্নায়বিক যন্ত্র অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেই মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে—মানবাত্মার ব্যক্তিগত প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়,—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, মনন, ধ্যান প্রভৃতি সমস্ত মানসিক ক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত জীবনের মূলীভূত অহংবোধ পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে কি ইহাই সপ্রমাণ হয় না যে, মানবাত্মার ব্যক্তিগত প্রকাশের পক্ষে কোন-না-কোন প্রকার শরীর, স্নায়বিক যন্ত্রের ন্যায় কোন-না-কোন জড়ীয় আশ্রয় একান্ত আবশ্যক?"

এখানে যে যুক্তি দ্বারা পুনর্জ্জন্মবাদ সমর্থন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, হার্বার্ট স্পেন্সার সেই যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে 'এই দেহ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ হইয়া থাকে।' তুলনায় যদি সমালোচনা করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে হার্বার্ট স্পেন্সারের যুক্তিই অধিকতর সারবান। কিন্তু আমরা কোন যুক্তিরই সারবত্তা স্বীকার করি না।

শরীরের সঙ্গে আত্মার কি সম্বন্ধ তাহার আলোচনা এস্থলে সম্ভব নহে। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে জড়বাদীগণও প্রমাণ করিতে পারে নাই যে দেহ হইতে আত্মার উৎপত্তি। সুতরাং দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হইবার কোন কারণ নাই।

পুনর্জ্জন্মবাদী বলেন—"সমস্ত জীবনে যাহার একান্ত প্রয়োজন হইল, যাহা না হইলে এক মুহূর্ত্তও চলিল না, একবার তাহার বিনাশ হওয়া মাত্র তদনুরূপ আর কিছুর প্রয়োজন হইল না ইহা যেন প্রাকৃতিক-নিয়মবিরুদ্ধ, সুতরাং অসম্ভব বোধ হয়। সমস্ত জীবন দেহ না হইলে চলিল না, আর কোথাও কিছু নাই মরণান্তে সহসা বিদেহ অবস্থায় আত্মার কার্য্য চলিতে লাগিল, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।"

ইহার মধ্যে অসম্ভব কিছুই নাই। জগতে এপ্রকার ঘটনা অহরহই ঘটিতেছে। এজগৎ এক সময়ে অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল, প্রাণের চিহ্নমাত্রও ছিল না। কোথাও কিছু নাই, জগতে প্রাণ আসিয়া হাজির হইল। জগতে কেবল প্রাণই ছিল, চৈতন্যের চিহ্নমাত্র ছিলনা, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ চৈতন্যের আবির্ভাব হইল। জলে ক্রমাগত উত্তাপ দেওয়া হইতেছে, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ ১৭০০ গুণ বাড়িয়া গেল।

ভ্রূণদেহ জরায়ুশয্যায় শায়িত। কোনপ্রকার খাদ্য পরিপাক করিয়া ইহাকে রক্তমাংসাদি উৎপন্ন করিতে হয় না। মাতার দেহের রক্তেই ইহার দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে; ভ্রূণদেহ মাতার দেহেরই অঙ্গীভূত, একটি নাড়ী উভয় দেহকে সংযুক্ত করিয়া রহিয়াছে। ভ্রূণের যদি বিচার করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে পুনর্জ্জন্মবাদীদিগের যুক্তি অনুসরণ করিয়া অবশ্যই বলিতে পারিত —"২৭০।২৮০ দিন এখানে বাস করিবার পর যখন অন্য জগতে যাইতে হইবে তখন নিশ্চয়ই একটি নাড়ী অন্যত্র হইতে রক্ত আনিয়া আমাদিগের শরীর পোষণ করিবে; কোথায়ও কিছু নাই আর হঠাৎ এই দেহেই রক্ত উৎপন্ন হইবে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; সমস্ত জীবনে যে নাড়ীর প্রয়োজন হইল, যাহা না হইলে এক মুহূর্ত্তও চলিল না, একবার সেই নাড়ীর বিনাশ হওয়া মাত্র তদনুরূপ আর কিছুরই প্রয়োজন হইল না, ইহা যেন প্রাকৃতিকনিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।" জরায়ু-রাজ্যের ব্যাপার দেখিয়া যেমন আমাদিগের এই রাজ্যের ব্যাপারের কোন ধারণা হওয়া সম্ভব নহে, তেমনি এই পৃথিবীর ব্যাপার দেখিয়া পরলোকের বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না।

(৫)

ইন্দ্রিয় ভোগ ও পুনর্জ্জন্ম।

(ক)

কেহ কেহ বলেন—"পরকালে মুখ থাকিবে না, খাইব কি করিয়া; জিহ্বা থাকিবে না, মিষ্ট রস ভোগ হইবে কি প্রকারে? পা থাকিবে না অথচ হাঁটিব, হাত থাকিবে না অথচ গ্রহণ করিব, চক্ষু থাকিবে না অথচ দেখিব, কর্ণ থাকিবে না অথচ শুনিব, মস্তিষ্ক থাকিবে না অথচ চিন্তা করিব—এ কি করিয়া সম্ভব?"

মানবজীবন যেন ইন্দ্রিয়ভোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেক লোক আছে যাহারা ইন্দ্রিয়সুখ ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না, ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা না হইলে আর কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। এই শ্রেণীর লোক ভাবে জীবনও যাহা ইন্দ্রিয়সুখও তাহাই।

(খ)

কেহ কেহ ব্যস্ত হইয়া বলিবেন "এসব না হয় তুচ্ছ ইন্দ্রিয়, কিন্তু চক্ষুকর্ণাদি ত জ্ঞানের দ্বার; এসমুদয় না হইলে ত ধর্ম্মকর্ম্মও হয় না; এসব না থাকিলে চলিবে কেন?"

আমরা জিজ্ঞাসা করি, চক্ষু কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করি ইহাই কি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান? ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জ্ঞান কি হইতে পারে না? এই সংসারেই কি সব সময়ে আমরা চক্ষু কর্ণ লইয়াই থাকি, না থাকিতে ভালবাসি? অনেক সময়ে কি ইহাদিগকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আমরা ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি না? আর এই পৃথিবীতেই ত এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন চক্ষু কর্ণ থাকিয়াও নাই? আমরা কি কেবল চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় লইয়াই থাকিব? ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ কি হওয়া সম্ভব নয়? বিধাতার

রাজ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ কি সর্ব্বস্ব? এ ছাড়া কি আর তাঁহার জগৎ নাই? চিরকাল কি ঐ একই বিষয় ভোগ করিতে হইবে? চিরকাল যদি এইরূপ রসাদি লইয়াই থাকিতে হয় তাহা হইলে জীবনধারণ যে বিষম জিনিষ হইয়া দাঁড়াইবে। এই দেহ লইয়া সুস্থভাবেই কি কেহ ২০০।৩৭০ বৎসর, কি ৫০০ বৎসর, কি হাজার বৎসর জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করে? আমাদিগের মনে হয় বিধাতার রাজ্য অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার। কেবল ইহজীবনের কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা এসমুদয় রত্ন লাভ করা যায় না। এমন উপায় হইতে পারে এবং হইবে, যাহা দ্বারা বিধাতার রাজ্যের অপরদিকও জানিতে পারিব।

বিদেহ আত্মা।

অনেক পুনর্জ্জন্মবাদী আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন—"যদি পুনর্জ্জন্ম না থাকে তবে মৃত্যুর পর আত্মা কি অবস্থায় থাকে?" এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানবের সাধ্যাতীত। যাঁহারা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন মৃত্যুর পর আত্মা থাকে এইমাত্র জানি। কিন্তু কি ভাবে থাকে তাহা বলা অসম্ভব। ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে গেলেই কল্পনার উপর কল্পনা আসিবে।

এই উত্তরে অনেক পুনর্জ্জন্মবাদী সন্তুষ্ট হন না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন "বিদেহ আত্মার কল্পনা করা যায় না। যাহা কল্পনাই করা যায় না, তাহার অস্তিত্ব কি সম্ভব?"

যাহার যেমন শিক্ষা তাহার কল্পনাও তদ্রূপ। একজনের নিকট যে-কল্পনা অসম্ভব, অন্যের নিকট তাহা হয়ত অতি স্বাভাবিক। The speaking chipএর গল্প অনেকেই জানেন। মুখে কথা বলা হইল না, একখণ্ড কাষ্ঠে কয়েকটা দাগ দেওয়া হইল আর কথা বলার কাজ হইয়া গেল—ইহা এখনও অনেককে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। আমরা যাহাকে 'লেখা' বলি তাহা যে 'ভাষা'র স্থান অধিকার করিতে পারে, ইহা এখনও অনেক অসভ্যজাতি কল্পনা করিতে পারে না। টেলিগ্রাফের ব্যাপার ইহাদিগের কল্পনার অতীত। জগতের শতকরা ৯০ জন লোক ফনোগ্রাফের বিষয় কল্পনা করিতে পারে না। পৃথিবীর অপরদিকে উল্টা হইয়া মানুষ রহিয়াছে ইহা কি সকলে কল্পনা করিতে পারে? নক্ষত্র, সূর্য্য পৃথিবী চন্দ্রাদি শূন্যে রহিয়াছে ইহা ক-জন ধারণা করিতে সমর্থ? আমাদিগের আত্মাটা কি, ইহা কি ভাবে রহিয়াছে সভ্যসমাজেরও ক-জন লোক ইহা ধারণা করিতে পারে? যাহাকে বলে "দেহাত্মবুদ্ধি"—অনেকের ধারণাই ঠিক তাহাই। আত্মাবিষয়ে অধিকাংশ লোকের যে ধারণা, তাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে তাহাদিগের আত্মা একটা সূক্ষ্ম জড় বই আর কিছুই নহে। বোতলে যেমন তেল কি গ্যাস থাকে দেহেও তেমনিভাবে আত্মা রহিয়াছে। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে আত্মা স্থান ব্যাপিয়া থাকে না—অথচ ইহার সহিত দেহের একটা সম্বন্ধ আছে—তাহারা এপ্রকার আত্মার ধারণাই করিতে পারিবে না। অনেক পণ্ডিত লোকও এপ্রকার আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারেন না। তাহার পর ঈশ্বরের কথা। অনেকে ত ঈশ্বরকে মানুষের মত দেহশালী বলিয়াই ভাবে। যাহারা জ্ঞানজগতে একটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহারা এমনইভাবে ঈশ্বরের বিষয় কল্পনা করে যাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় ঈশ্বর যেন অতি সূক্ষ্ম বাষ্প, বাতাস অপেক্ষাও সূক্ষ্ম কোন বস্তু; বাতাস যেমন আকাশ পূর্ণ করিয়া থাকে, ঈশ্বরও তেমনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। সময়ে ঈশ্বরের আরম্ভ নাই, সময়ে ঈশ্বরের শেষ নাই—ইহা কি আমরা সকলে ধারণা করিতে পারি? এমন একটা বস্তু কিপ্রকারে থাকিতে পারে?—ইহা অনেকেরই কল্পনার অতীত। অথচ জ্ঞানীগণ এই মতই প্রচার করিতেছেন। মৃত্যুর পর আত্মা কি ভাবে থাকিবে ইহা আমরা জানিনা—তবে বিদেহ অবস্থা কল্পনা করা অসম্ভব নহে। ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর এখন আত্মা কি ভাবে আছে, তাহা হইলে অনেকটা বুঝিবে পরকালে আত্মা কি ভাবে থাকিবে। আত্মা যে দেহ ব্যাপিয়া আছে তাহা নহে; রথে যেমন রথী বসিয়া রথ পরিচালনা করে আত্মা সেই ভাবে দেহে বর্ত্তমান তাহাও নহে—আত্মা দেহের বহির্ভাগে

কোন স্থানে থাকিয়া দেহকে চালনা করিতেছেন তাহাও নহে,—আত্মা আকাশ বা ইথরের মত সূক্ষ্ম কোন বস্তু নহে অথচ আত্মা আছেন। এই জগতে যেমন আত্মা এই ভাবে বর্ত্তমান, পরকালেও আত্মা তেমনি সেই ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। আত্মার অস্তিত্বের জন্য এ দেহের কোন আবশ্যক নাই এইমত যাঁহারা বিশ্বাস করেন ও ধারণা করিতে পারেন, পরলোকে আত্মা বিদেহ হইয়া থাকিবে ইহাও তাঁহাদের নিকট অসম্ভব ব্যাপার নহে।

নূতন ইন্দ্রিয়।

কিন্তু বিদেহ অবস্থা ভিন্ন যে অন্যপ্রকার অবস্থা হইতে পারে না তাহাও বলা যায় না। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে কেবল এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে মৃত্যুর পর মানব আর মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু মানব এই জন্মের স্মৃতি, একত্ববোধ, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি লইয়া অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না। কেবল অসম্ভব নয়, ইহা সম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এখানে আমরা চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় লাভ করিয়া রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাত্মক জগতে বাস করিতেছি। বিধাতার রাজ্যে ইহা ভিন্ন কিছু নাই ইহা কি সম্ভব? তাঁহার মহিমা, তাঁহার শক্তি, তাঁহার সৌন্দর্য্য অসীম—তাঁহার ভাণ্ডার অনন্ত। আমরা এমন লোকে জন্মগ্রহণ করিতে পারি যে-লোকে এই পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যতীত আরও অনেক ইন্দ্রিয় লাভ করিব। সেইসমুদয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিধাতার ঐশ্বর্য্যলীলার অপর অপর দিক দেখিয়া নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিব, নূতন নূতন ভাবে মগ্ন হইব, নূতন নূতন শক্তি লাভ করিয়া নব নব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব। যদি কল্পনার পক্ষেই উড্ডীয়মান হইতে হয় তবে গরুড়ের পক্ষই আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে অগ্রসর হইব। কুক্কুটপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকাতে অবতীর্ণ হইব না। যাহাদের কল্পনা ছিন্নপক্ষ, তাহারাই চিরকাল ভূতলে বাস করিতে চায়। পুনর্জ্জন্মের কথা শুনিলেই মনে হয় জীবন যেন 'থোড়, বড়ি, খাড়া, এবং খাড়া, বড়ি, থোড়।' একটি বালককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল "আজ কি দিয়া ভাত খেয়েছিস্?" সে বলিল 'থোড়, বড়ি, খাড়া।' পরের দিন জিজ্ঞাসা করা গেল—"ওরে, আজ কি দিয়া ভাত খেয়েছিস্?" সে উত্তর করিল—"খাড়া, বড়ি, থোড়।" বিধাতার রাজ্য কি কেবল 'থোড়, বড়ি, খাড়া' এবং 'খাড়া, বড়ি, থোড়?' রূপরসাদির অতীত আর কিছু কি তাঁহাতে নাই, তাঁহার শক্তি কি এই-সমুদয়েই পর্য্যবসিত হইয়াছে? এ জগতে যদি আবার জন্মগ্রহণ করি, বড় জোর, একজন প্লেটো, বা ক্যাণ্ট, বা নিউটন বা কেপ্লার, বা যীশু বা বুদ্ধ হইব। কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট? জগতের শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষগণও যাহা জানিয়াছেন, যাহা পাইয়াছেন, তাহা কিছুই নহে—সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুতরাং মানবজন্ম আর কেন? হয়ত বিধাতা আমাদিগের জন্য এমন লোক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যেস্থলে নূতন নূতন ইন্দ্রিয় লাভ করিয়া বিধাতার নূতন নূতন দিক দেখিতে পাইব। ভাষা নাই তাই বলিলাম 'দেখিতে'। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সেস্থলে যথেষ্ট নহে। সেই লোকে যদি পৃথিবীর স্মৃতি, আত্মার একত্ববোধ ও ইহলোকের সঞ্চিত আধ্যাত্মিকতা লইয়া যাইতে পারে—তবেই মানুষের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। কিন্তু কি কল্যাণকর, তাহা ভগবানই জানেন।

(সমাপ্ত)

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

পঞ্চশস্য

জাপানী শিষ্টাচার—

জাপানী শিষ্টাচার বিশ্ববিশ্রুত। তাহাদের চলাফেরা ওঠাবসা কথাবার্ত্তা অভিবাদন অভ্যর্থনাদি সব-ই কেতাদুরস্ত। প্রাচীনকালে শাসকসম্প্রদায় দেশশাসনের সুবিধা হইবে মনে করিয়া সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের মেলামেশা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নানাপ্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সকলকেই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত; এবং কালে তাহারা এইসব নিয়মে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে আদবকায়দাগুলি তাহাদের স্বভাবে বেশ খাপ খাইয়া গেল—তখন আর তাহা অশোভন বা অস্বাভাবিক বোধ হইত না। পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনুপ্রাণিত আধুনিক জাপানে এখন দিকে দিকে কর্ম্ম-প্রচেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছে—প্রাচ্যের আরাম ও অবসর লোপ পাইয়াছে; জাপানী এখন সময়ের মূল্য বুঝিয়াছে, তাই আর, শোভন সুন্দর হইলেও, প্রতিপদে আদবকায়দা মানিয়া চলে না। তবুও এতটা মানিয়া চলে যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

অতিথির অভ্যর্থনা।

ধর্ম্ম মানুষের ব্যবহারকে অনেকাংশে গড়িয়া তোলে। চীনদেশে ভব্যতাসহকারে পূর্ব্বপুরুষগণের পূজা করিবার বিধি সাধারণ মানুষকেও যেমন সভ্যভব্য করিয়া তুলিয়াছিল, জাপানে ঐ প্রথার প্রচলন হইলে জাপানীদেরও ঐ পরিবর্ত্তন ঘটে। ধর্ম্ম এবং দেশের শাসকসম্প্রদায়ের অনুগ্রহে জাপানীরা দেবতাদের নিকট যেমন নম্র ধীর হইল, পরস্পরের মধ্যেও ব্যবহারে তেমনি বিনয়ী হইয়া উঠিয়াছিল।

মান্য ব্যক্তিকে নমস্কার।

জাপানী প্রাচীন আদব-কায়দার নিয়মানুসারে উচ্চ শ্রেণীর কোনো লোককে নিম্নশ্রেণীর কোনো লোকের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীর কাহাকেও উচ্চশ্রেণীর কাহারো সহিত পরিচিত করিতে হইলে, শেষোক্তের অনুমতি আবশ্যক। সমশ্রেণীর লোকদিগকে পরিচিত করিতে কাহারো অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই। পথের মাঝে পরিচিতের সঙ্গে দেখা হইলে, ডান দিকে কয়েক পদ সরিয়া গিয়া দুই হাঁটুর উপর দুই হাত রাখিয়া নত হইয়া বক্রদেহে ৪৫° ডিগ্রীর একটি কোণ রচনা করিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন করিতে হইবে। আজকাল তোকিওর পথে দেখা যায়, এ কাজটি মাথা ঈষৎ অবনত করিয়া বা টুপি তুলিয়াই সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রাচীন প্রথানুসারে পথের মাঝে সাক্ষাৎ হইলেও গলবস্ত্র খুলিয়া অভিবাদন করিতে হইত। নচেৎ যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ হইত না। বন্ধুর গৃহে প্রবেশ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হস্তদ্বয় মেঝে-ঢাকা মাদুরের উপর রাখিতে হয়; কেবল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী মাদুর স্পর্শ করিয়া থাকে; পৃষ্ঠদেশ বেশী উন্নত না থাকে এমন ভাবে মাথা নত করিয়া অভিবাদন করিতে করিতে পরিবারের কুশলপ্রশ্ন করিতে হয়। বারম্বার অভিবাদন সৎশিক্ষার নিদর্শন। মাতাপিতা বা পূজনীয় কাহারো সহিত কথা কহিবার সময় পূর্ব্বোক্ত ভাবে মাদুরে হাত রাখিয়া বসিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া কথা বলিতে হয়। আগন্তুক ভৃত্যের হস্তে প্রথমে নামের কার্ড পাঠাইয়া দিবে; পরে কক্ষদ্বার অতিক্রম করিবার সময় একবার সেখানে অভিবাদন করিবে, পরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া পুনরায় অভিবাদন করিবে। বিদায় গ্রহণের সময়ও সেইরূপই করিতে হইবে। অতিথি যখন বিদায় লইতেছেন তখন গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়া। কোনো অতিথিকে বিশেষ সম্মান দেখাইতে হইলে গৃহস্বামী অতিথিকে বাড়ীর বাহির হইতে

অভ্যর্থনা করিয়া আনেন এবং তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে বাহিরে গিয়া আগাইয়া দ্যান। অতিথি যখন গৃহাভ্যন্তরে, ভৃত্য তখন বাড়ীর প্রবেশপথে অতিথির কাষ্ঠপাদুকার মুখ ঘুরাইয়া সাজাইয়া রাখে, যাহাতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পাদুকা পরিতে তাঁর কোনো অসুবিধা না হয়। অতিথি যদি মানুষ-টানা গাড়ীতে আসিয়া থাকেন তবে গাড়ী-টানা লোকটির জলযোগের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রাচীনকালে সামুরাই যখন কোনো বাড়ীতে যাইতেন, তখন দীর্ঘতরবারিখানি দ্বারদেশে তরবারি রাখিবার নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া যাইতেন ; ছোট তরবারিখানি সঙ্গে থাকিত, বসিবার সময় বামদিকে রাখিয়া বসিতেন।

বন্ধুর বাড়ী যাইবার সময় কিছু উপহার লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য—সাধারণত কেক বা জাপানী পিষ্টক সুদৃশ্য বাক্সে ভরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। উপহারের ঐরূপ মিষ্টান্ন-ভরা বাক্স দোকানে বিক্রয় হয়। আগন্তুক কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারদেশে বসিয়া পড়িবে, অনেক সাধ্যসাধনার পর একটু একটু করিয়া কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইবে—ইহাই আদবকায়দা। একেবারে সরাসর ঘরের মধ্যে চলিয়া যাওয়া ভদ্রতার পরিচায়ক নহে। এই সংস্কারটি চীন হইতে আমদানী ; সেখানে

অতিথিকে বিদায় দেওয়া।

খাবারের বাটি ও কাটি ধরিবার কায়দা।

যে সকার নীচে স্থানগ্রহণ করে সেই যথার্থ ভদ্র। আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করিয়া ইতিপূর্ব্বে না আসিতে পারার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিবে এবং কিছুদিন পূর্ব্বে রাস্তায় সে গৃহস্বামীকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল তজ্জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। পরিবারের কুশলপ্রশ্নের পর আগন্তুক জামার আস্তিনের মধ্য হইতে উপহারটি বাহির করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিবে উপহারটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, নগণ্য ; গৃহস্বামী সেটি গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিবেন কি ? ইতিমধ্যে গৃহস্বামী অতিথিকে চা, পিষ্টক ও ধূমপানের সরঞ্জাম আগাইয়া দিয়া কিছু দূরে কক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রকাশ্য স্থানে গিয়া বসেন। অতিথির বসিবার জন্য কক্ষের সর্ব্বোত্তম স্থানটি নির্দ্দিষ্ট হয়।

মান্য ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার নিয়ম।

ভৃত্যের সহিত সদয় ও নম্র ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা যেমন কথায় কথায় ভৃত্যকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে কুণ্ঠিত হই না, সে দেশে কেহ সে-কথা ভাবিতেও পারে না। নিজ নিজ ভৃত্যের চেয়েও অন্যের ভৃত্যের প্রতি বেশী সম্মান দেখাইতে হইবে। অন্যের সম্মুখে ভৃত্যকে ভৎর্সনা করা কু-শিক্ষার পরিচায়ক। ভৃত্যেরা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিবে—মূল্যবান পোশাক পরিবে না।

ভদ্রলোক একটি কালো হাওরি বা লম্বা জামা এবং কাঁজিকাটা কাপড়ের হাকামা বা ঢিলা পায়জামা পরিবে। কোমরবন্ধ সকলেই ব্যবহার করিবে। কোনো বৈঠকে ধূমপান করিবার পূর্ব্বে ভদ্রলোকের উচিত গৃহস্বামীর দিকে ফিরিয়া নত হইয়া অভিবাদন করা—তাহাতে বুঝাইবে, "আপনার অনুমতি লইয়া ধূমপান করিতেছি।" নাক ঝাড়া প্রয়োজন হইলে কক্ষ হইতে বাহিরে গিয়া ঝাড়া উচিত। একান্তই যদি ওরূপ করা অসম্ভব হয় তো বৈঠকের নিম্নতম আসনের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঝাড়িতে হয়। ধূমপানও করিতে হইবে সেই-দিকে মুখ ফিরাইয়া।

আহারের নিমন্ত্রণ হইলে নিমন্ত্রিতের উচিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পরে উপস্থিত হওয়া। নিমন্ত্রিত আসিয়া প্রথমে গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিবে, পরে অন্যান্য অভ্যাগতকে অভিবাদন করিবে। প্রত্যেক অভ্যাগতের সম্মুখে ছোট ছোট গালা-করা টেবিলে সুদৃশ্য পাত্রে আহার্য্য দেওয়া হয়। পরিচারিকা টেবিলটি সম্মুখে রাখিলে প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ডান হাতে আহার করিবার কাঠি দুইটি গ্রহণ করে, এবং ভাতের বাটির ঢাকনা খুলিয়া প্রথমে বাম হাতে রাখে তারপর টেবিলের বাঁ দিকে রাখে। ঝোলের বাটির ঢাকনা লইয়াও সেইরূপই করে, ঢাকনাটি ভাতের বাটির ঢাকনার উপর রাখে। তারপর ডান হাতে ভাতের বাটি তুলিয়া বাঁ হাতে রাখিয়া তাহা হইতে কাঠি দিয়া দুই গ্রাস ভাত খাইয়া, বাটি নামাইয়া ঝোলের বাটি তুলিয়া লইয়া এক চুমুক ঝোল এবং ঝোলের মধ্যস্থিত ডিম, মাছ বা শাকসবজি কিঞ্চিৎ আহার করে। প্রত্যেক রকম ব্যঞ্জনই এইরূপে খাইতে হয়, কেবল মধ্যে মধ্যে এক গ্রাস করিয়া ভাত খাওয়া চাই। বড় ভোজের সময়, ভাত যদি একান্তই খাইতে হয় তো সর্ব্বশেষে অল্প পরিমাণ খাইলেই চলে। ঝোলের জলীয় ভাগ প্রথমে নিঃশেষ করিয়া পরে কঠিন ভাগ খাওয়াই উচিত। যদি একটা বড় মাছ পাইয়া থাক তো তার মাত্র উপরার্দ্ধ খাইবে। নিমন্ত্রিত যখন মনে করেন মদ্যপান যথেষ্ট হইয়াছে তখন ডান হাতে মদের পেয়ালা রাখিয়া বাম হাত দিয়া উহা ঢাকা দিবে—এইরূপেই প্রকাশ করিতে হইবে, আর প্রয়োজন নাই। ভোজের সময় একই পানপাত্র সকলকে প্রদান করা হৃদ্যতার পরিচায়ক। গৃহস্বামী যখন পাত্র লইয়া নিমন্ত্রিতের সম্মুখে ধরেন, তখন নিমন্ত্রিত দুইহাতে পেয়ালা গ্রহণ করিয়া পরিচারিকার সম্মুখে আগাইয়া ধরিবে। পরিচারিকা পাত্র পূর্ণ করিয়া দিলে পাত্র নিঃশেষে পান করিয়া, জলপূর্ণ বাটিতে শূন্য পাত্র ডুবাইয়া, বাটি যাঁর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল তাঁকেই ফেরত দিতে হইবে।

লোকজনের সম্মুখে ক্রোধ বা দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়।

সু।

বধিরের সঙ্গীতশিক্ষা—

বধিরের সঙ্গীতশিক্ষা কথাটা শুনিলে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু ব্যাপারটা বেশ সম্ভবপর ও প্রয়োজনীয় বলিয়াই

প্রমাণিত হইয়াছে। নিউইয়র্ক বধির-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ Enoch Henry Currier এই বিষয়টি ভাল করিয়া অনুশীলন করিয়াছেন; তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বধির-বিদ্যালয়সমূহের অধ্যক্ষদের কোন একটি সভায় বলিয়াছেন যে তাঁহার মতে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন বালকবালিকাদের অপেক্ষা বধির বালকবালিকাদের শিক্ষাকার্য্যেই সঙ্গীত শিক্ষার অধিকতর প্রয়োজন। এডওয়ার্ড আলেন কে মহাশয় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের বিবরণীতে এই বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন। তিনি বলেন—

মিঃ কুরিয়ারের বিদ্যালয়ের ছেলেরা দেয়াল কিম্বা অন্য কোন নিরেট জিনিসের উপর লাঠি ঠুকিতে ভালবাসে দেখিয়া, তাঁহার মনে প্রথম বধিরের সঙ্গীতশিক্ষার সম্ভাবনার কথা উদিত হয়। 'এক একটি বালক অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত ইঁটের দেয়ালের উপর আঘাত করিতে থাকিত; এক আধবার নয়, প্রায়ই তাহারা এইরূপ করিত।' তাহাদিগকে এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া জানিলেন যে, আঘাতের ফলে দেহে যে অনুভূতির সঞ্চার হয় তাহা তাহাদের মনে আনন্দ দান করে এবং দেহকে সতেজ করে। মিঃ কুরিয়ার সিদ্ধান্ত করিলেন যে সঙ্গীতবিদ্যাকে উত্তেজকরূপে ব্যবহার করিলে বধিরদিগকে আরও সজীবতা দান করিবার সুবিধা হইবে।

নিউইয়র্ক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বহুকাল অভ্যাসের ফলে সামরিক 'ড্রিলে' সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর এই ড্রিলের সাহায্যার্থ ঢাক ব্যবহার আরম্ভ হইল। তিনি দেখিলেন যে ঢাকের শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে ছাত্রদের নিয়মিত পাদ-ক্ষেপ ও অঙ্গচালনার অনেক উন্নতি হইতেছে। তাহার পর তিনি ক্রমশঃ শিঙ্গা, বাঁশী প্রভৃতি অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও ইহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি বিদ্যালয়ের প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন ছাত্রের সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ বধির বাদকদল গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। এই দলে ষোলটি বাদ্যযন্ত্র আছে। ইহারা ১৮৫টি গৎ অভ্যাস করিয়াছে। এই বাদকদল তাহাদের কার্য্যে এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে, নিউইয়র্ক সহরের অনেক উচ্চশ্রেণীর ঐকতান বাদ্য-সভায় ইহাদিগকে শ্রবণশক্তি সম্পন্ন বাদকদের সহিত বাজাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়।

নিউইয়র্ক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বাদ্য-যন্ত্রের আহ্বানে জাগিয়া উঠে এবং এই বাদকদল কর্ত্তৃক যথাসময়ে ও যথানিয়মে ভোজনগৃহে ও বিদ্যালয়ে নীত হয়। বাদকদল বাজাইতে আরম্ভ করিলে ইহারা ঠিক শ্রবণশক্তিসম্পন্নদেরই মতন তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। তাহারা কান কিম্বা শরীরের অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শুনিতে পায় না। কিন্তু মিঃ কুরিয়ার বলেন যে, তাহাদের সমগ্র দেহই এই তানলয়সমন্বিত শব্দতরঙ্গসমষ্টির আহ্বানে সাড়া দেয়। এই শব্দ-তরঙ্গাঘাতের ফলে তাহাদের মন অধিকতর সজাগ হয়, তাহারা কার্য্যারম্ভে অধিক তৎপর হয় ও শব্দ-তরঙ্গাঘাতে অনভ্যস্ত ব্যক্তির স্বাভাবিক জড়তা হইতে মুক্ত হয়।

কোনও কোনও বধির-বিদ্যালয়ে কথাবার্ত্তা শিখাইবার সুবিধার জন্য পিয়ানো ব্যবহৃত হয়। কোন একটি পরদায় আঘাত করিলেই শিক্ষার্থীরা পিয়ানোর উপর হাত রাখিয়া সেই সুরের স্পন্দনের পরিমাণ, পূর্ণতা ও উচ্চতা প্রভৃতি লক্ষ্য করে। বষ্টনের বধির-শিক্ষকদিগের শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ সারা, এ, জর্ডান্ মনরো বলেন যে, পিয়ানোর সাহায্যে বধির ছাত্রদের চিন্তা, স্পন্দন ও তাহার অর্থের দিকে এতটা আকৃষ্ট করা যায় যে তাহাতে তাহাদের বাক্‌যন্ত্রসকল শ্রবণশক্তিসম্পন্ন বালকবালিকাদিগের ন্যায় স্বাধীন হইয়া উঠে এবং সেইজন্য বেশ স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহৃতও হইতে পারে। মাংসপেশীগুলির জড়তা দূর হওয়াতে, এবং আপনাদের অজ্ঞাতসারেই বাক্‌পটুতা লাভ করাতে, ছাত্রদের কথাবার্ত্তা স্বাভাবিক স্পষ্টতা ও অবাধ গতির সৌন্দর্য্যে ভূষিত হয়।

আমাদের দক্ষিণ হস্ত ব্যবহারের কারণ—

ডাক্তার ফেলিক্স্ রেগোল্ট বলেন যে, কার্য্যক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করে বলিয়াই আমরা সাধারণ কার্য্যে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করিয়া থাকি। দক্ষিণ হস্ত নৈপুণ্য ও কৌশলাদির কর্ত্তা-রূপে এবং বাম হস্ত পাশব শক্তির কর্ত্তারূপে ব্যবহৃত হয়। কার্য্য বিভাগ করিলে সুবিধা হয় বলিয়া আমরা ক্রমবিকাশের পথে ইহার শরণ লইয়াছি। আমাদের স্কন্ধদেশীয় ধমনীদ্বয় মস্তিষ্কের বামদিকে দক্ষিণ দিক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রক্ত সরবরাহ করে। এই বাম মস্তিষ্ক দক্ষিণ হস্তকে চালনা করে বলিয়াই প্রকৃতি ইহাকে এইরূপ নিপুণ করিয়াছেন। বিজ্ঞান এখনও রক্ত সরবরাহ-কার্য্যে ধমনীদ্বয়ের এই বৈষম্যের কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। পশুদের মধ্যে কার্য্যের বিভিন্ন বিভাগ প্রায় নাই; সেই জন্য তাহারা সব্যসাচী। মানুষের কার্য্য সূক্ষ্মতম বিভাগে বিভক্ত বলিয়া মানুষ দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করে।

কার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়া মানুষ সুকুমার ও মনোহর কার্য্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র হস্ত রাখিতে চায়। দক্ষিণ হস্তটাই তাহার পছন্দ-সই, তবে অভাবে পড়িলে বাম হস্তও ব্যবহার করিতে পারে। সকলেই জানেন যে, যাহাদের দক্ষিণ হস্ত কাটা গিয়াছে কিম্বা অবশ হইয়া গিয়াছে তাহারা বাম হস্তকে শিক্ষিত করিয়া সেই নষ্ট হস্তেরই ন্যায় দক্ষ করিয়া তুলিতে পারে। কোনও কোনও পিয়ানোবাদক ও বেহালাবাদক যে অনেক জটিলসুর বামহস্ত চালনা করিয়া বাজাইয়া থাকেন ইহাও অনেকেই জানেন।

সমস্ত কার্য্যই সমভাবে ও নিরপেক্ষ ভাবে দুই হস্তে করিয়া যাইতে পারিলে যদি সব্যসাচী হওয়া যায়, তাহা হইলে আমি কখনও সেরূপ কাহাকেও দেখি নাই বলিতে হইবে। যাঁহারা এই প্রকার লোক দুর্লভ নয় বলেন, তাঁহারা বাস্তবিক বামহস্ত-ব্যবহারীদেরই এই নামে অভিহিত করেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, ইহারা বাল্য-কাল হইতে খাওয়া, শেলাই করা, লেখা প্রভৃতি কয়েকটি শক্ত কাজ দক্ষিণ হস্তে করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য সন্ধান করা প্রভৃতি কোন একটা শক্ত কাজ করিতে হইলে ইহারা আপনাআপনি বামহস্তটা ব্যবহার করিয়া ফেলে।

কোনও লোক যদি অতি কষ্টে একটি মাত্র কার্য্য নিরপেক্ষ ভাবে দুই হস্তে করিতে শিখিয়া থাকে, তাহা হইলেই তাহাকে সব্যসাচী বলাটা ঠিক হয় না। আমি একজন চিত্রকরকে দুই হস্তে চিত্র করিতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু শিল্পী যতই নিপুণ ভাবে বাম হস্ত চালনা করুন না কেন, সূক্ষ্মতম কার্য্যগুলি দক্ষিণ হস্তের জন্যই তুলিয়া রাখা হয়। বাদকেরা বাম হস্তটি যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেন, দক্ষিণ হস্তটিই প্রকৃত কলাবিদের কার্য্য করে।

কোন কোন শরীরতত্ত্ববিদের মতে, শিক্ষকদিগকে দুই হস্ত ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাঁহাদের মতে, দুই হস্ত সমভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে মস্তিষ্কের উপেক্ষিত অংশ সভ্যতার কার্য্য অগ্রসর করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

বাম হস্ত যে নিষ্কর্ম্মা নয় তাহা আমরা জানি, তবে ইহার কার্য্য-ক্ষেত্র বিভিন্ন। শিশুদের জোর করিয়া দুই হস্ত ব্যবহার করিতে শিখাইলে তাহাদের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেওয়া হয়, কারণ

স্বভাবতঃ দুই হস্ত দুই প্রকার কার্য্যের দিকেই যায়; এইপ্রকার বলপ্রয়োগ করিলে বিশ্বজনীন বিধির ব্যতিক্রম করা হয় এবং ইহাতে হস্তদ্বয় কার্য্যে অপটু হইয়া যায়।

বিখ্যাত মিশর-পুরাতত্ত্ববিদ্ ডেযারসী বলেন যে, ছয় হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে মানুষ দক্ষিণ হস্তে খাইত। এই হস্ত-ব্যবহার-সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া অনেক মতের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, জনসাধারণের প্রভাবই ইহার কারণ; বাম হস্ত ব্যবহার করিলে লোকে নিন্দা করে, কুটিল বলে। কিন্তু এই মতানুবর্ত্তীরা কার্য্যটাই কারণ বলিয়া ধরেন।

অনেকে বলেন অনুকরণ ও শিক্ষার ফলে শিশুরা দক্ষিণহস্ত ব্যবহার করিতে শেখে। তাহাদের ব্যবহৃত যন্ত্র ও পাত্রাদির আকারও তাহাদিগকে ঐ হস্ত ব্যবহার করিতে বাধ্য করে। কিন্তু মানুষের দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই এই-সকল কারণের অস্তিত্ব থাকিতে পারিয়াছে। ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির সময় তাহার দক্ষিণাংশ অধিক পুষ্টিলাভ করিবার সুযোগ পায় বলিয়া তাহার সেই দিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল শ্রেষ্ঠতর হয়, এবং এইজন্যই দক্ষিণ হস্ত ব্যবহারের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মায়। কচিৎ কাহারও বামাংশ অধিক পুষ্টি লাভ করিলে, সেই মানুষ বামহস্ত ব্যবহার করে।

কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের দক্ষিণ হস্ত চালনা হৃদ্‌পিণ্ডের উপর প্রায় কোন প্রভাব বিস্তার করে না বলিয়া আমরা দক্ষিণ হস্তটা অধিক চালনা করি।

বাম মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠতাই দক্ষিণ হস্ত ব্যবহারের কারণ; স্নায়ু-সূত্রগুলি আড়াআড়ি ভাবে থাকে বলিয়া বাম মস্তিষ্ক দক্ষিণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে চালনা করে। বাম মস্তিষ্ক দক্ষিণ মস্তিষ্ক অপেক্ষা ভারী। শিশুরা যখন প্রথম মস্তিষ্ক খাটাইয়া কাজ করিতে যায়, তখন দক্ষিণ মস্তিষ্ক অপেক্ষা বাম মস্তিষ্কটাই শক্ত ও কষ্টসাধ্য কার্য্য করাইয়া দিবার অধিক উপযোগী থাকে বলিয়া, তাহারা দক্ষিণ হস্তটাই কাজে লাগায়। রক্ত সরবরাহের কার্য্যে কণ্ঠ-দেশীয় ধমনীদ্বয়ের যে সামান্য বৈষম্য আছে তাহাই বাম মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠতার ও অধিকাংশ মানবের দক্ষিণ হস্ত ব্যবহারের কারণ।

সম্প্রতি আমরা এ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই জানিনা। শ।

মনের উপর কুয়াসার প্রভাব—

লেডি উইণ্ডারমিয়ারস্ ফ্যান্ নামক নাটকের জনৈক পাত্র প্রশ্ন করিলেন—কুয়াসায় মানুষকে গম্ভীর করিয়া তুলে, না গম্ভীর মানুষ কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া থাকে? গাম্ভীর্য্য মন্দ জিনিস নয় যদি ইহা সীমা ছাড়িয়া না উঠে। এক-একটা লোক থাকে, তাদের গাম্ভীর্য্য বাস্তবিকই অসহনীয়। পেঁচার মত মুখ করিয়া বসিয়া থাকে—দেখিলে শতপুত্রশোকের বেদনা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। এসব ব্যক্তি যে বিষাদের কুয়াসা সৃষ্টি করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? কিন্তু সত্যকার কুয়াসাও যে মানুষের মনকে কিয়ৎপরিমাণে অবসন্ন না করে—আর যাহারা রোগক্লিষ্ট তাহাদের অনেকের বেলায় যে বিপদজনক না হয়, এমন নহে। লণ্ডন নগরে একবার ২১ দিন ধরিয়া কুয়াসা লাগিয়া ছিল। তিন সপ্তাহ ধরিয়া লোকে একদিনের জন্যও সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় নাই। সে সময় হাসপাতালে সহসা মৃত্যুসংখ্যা বাড়িতে দেখা গিয়াছিল। যে-সকল রোগীর আরোগ্যবিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না, তাহাদের মধ্যেও অনেককে মরিতে দেখা গিয়াছিল। জীবনীশক্তির উপর কুয়াসার এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব। এই ঘটনার পর হইতে লণ্ডনে কলকারখানার ধোঁয়ার উৎপাত হ্রাস করিবার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৩০ বৎসর আগে লণ্ডনের আকাশ কিরূপ ধূমাকীর্ণ থাকিত, এখনকার অনেকে তাহা ধারণাই করিতে পারেন না। আমেরিকার পিট্‌স্‌বার্গ্ নগরে অনেকগুলি কল-কারখানা অবস্থিত। এইসব কলকারখানার ধোঁয়াতে লোকের কি পরিমাণ অনিষ্ট হইতেছে, সে বিষয়ে সেখানে বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। এর জন্য একটা সমিতিও গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার আই-ই ওয়ালেস্ ওয়ালিন্ এই সমিতির জনৈক সভ্য। ইনি আবার পিট্‌সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব পরীক্ষার অধ্যক্ষও বটে। কলকারখানার ধোঁয়ায় মানুষের মনের অবস্থা কিরূপ হয়, সে সম্বন্ধে ইনি একখানি পুস্তকও লিখিয়াছেন। ওয়ালিন্ বলেন—ধূম ও ধূমাকীর্ণ গগনমণ্ডল গৌণ ও সাক্ষাৎভাবে মানুষের মনের উপর কাজ করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা শরীরের অনিষ্ট ও অবনতি হয়, সেইজন্য গৌণভাবে মনেরও অবনতি হইয়া থাকে। এ-ছাড়া ইহা সাক্ষাৎভাবেও মনের উপর কাজ করিয়া থাকে। ইহার জন্য চিন্তা ও মানসিক ভাবসমূহের পরিবর্ত্তন হয়—স্বভাব, আচরণাদিরও ব্যতিক্রম ঘটে। ডাক্তার ওয়ালিন্ বলেন, কৃষ্ণবর্ণের মেঘ মানুষের মনে বিষাদ আনিয়া দেয়। কালো মেঘে শিশুরা ভয় পায়—মানুষের হাতের কাজ বেশী দূর অগ্রসর হইতে পায় না। চোখের উপর বেশী চাপ পড়ে; মন চঞ্চল ও অস্থির হয়; লোকবিশেষকে পাগল করিয়া ছাড়ে। তখন মদখাওয়াটা অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া উঠে।

পাকা অপরাধীদের মনের দৃঢ়তা—

সম্প্রতি লিভারপুল (Liverpool) সহরে একটি খুনী মোকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারের সময়ে আদালতগৃহে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আসামীদের স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। আসামীদের মধ্যে বল্ নামক এক ব্যক্তি ছিল; তাহার প্রতি মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ হয়। আদেশটি শোনার পর বলকে তাহার কারাগৃহে গান গাইতে দেখা গিয়াছিল। আসামীদের অসাধারণ অবিচলতা ও দৃঢ়তা অনেক সময় খুব সুযোগ্য সুচতুর বিচারককেও প্রতারণা করিয়া থাকে। তাহাতে খুব ঘাগী অপরাধীও নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পায়। অপরাধীদের হৃদয় কতদূর অসাড় ও কঠিন হইতে পারে, সে বিষয়ে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। মিষ্টার টমাস্ হোল্‌ম্‌স্ তাঁহার "Known to the Police" নামক গ্রন্থে বিষয়টির মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হোল্‌ম্‌স্ হাওয়ার্ড এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী। অপরাধীদের সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। আর বাল্যকালেই তিনি বিখ্যাত অপরাধী পামারের সহিত পরিচিত হন। পামার কোন উৎসাহশীল, একটু দেমাকী স্বভাবের লোক ছিল। তাহার স্বভাবের মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যে, তাহাকে যে দেখিত সেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। দরিদ্রদের সে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিত, এইজন্য তাহারা সকলেই পামারের বিশেষ অনুগত ছিল। হত্যাপরাধে বিচারকালে পামার যেরূপ অসাধারণ স্থিরতা ও অবিচলতা দেখাইয়াছিল এবং ফাঁশীর সময় সে যেরূপ নির্ব্বিকার ভাবে ফাঁশীর দড়ি গলায় পরিয়াছিল, তাহাতে হোল্‌ম্‌সের

পামারকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। সে সময় তাঁহার এই ধারণা ছিল, যে যথার্থ পাপী, কৃত পাপের জন্য তাহার মনে একটা অনুশোচনার ভাবের উদয় হওয়া এবং সেইজন্য তাহার আচরণাদির মধ্যে একটা ভয়ের ভাব প্রকাশ পাওয়া একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন আর তাঁহার সে বিশ্বাস নাই। অপরাধীদের সম্বন্ধে এখন তাঁহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে তিনি মনে করেন বিচারকালে আসামীদের নির্ভীক আচরণ ও স্থির অচঞ্চল ভাব তাহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ না হইয়া বরঞ্চ তাহার অপরাধের সমর্থন করিয়া থাকে। নির্দ্দোষ ভাল মানুষ যদি অন্যায় ভাবে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তাহার পক্ষে স্থির থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে—তাহার সমস্তই গোলমাল হইয়া যায়, জবানবন্দীর সময়, সে বার বার নিজের কথার প্রতিবাদ করিতে থাকে, আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যাকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না হোল্‌মস্ বলেন—খুনী আসামীদের কতকগুলি সাধারণ বিশেষত্ব থাকিতে দেখা যায়। খুনের জন্য তাহাদের কাহাকেও লজ্জিত হইতে দেখা যায় না—ভবিষ্যতের চিন্তায় তাহারা ভীত ও চঞ্চল হয় না। যাহারা অপরাধ স্বীকার করে, তাহারাও যে একটা কিছু অন্যায় করিয়াছে, আভাষ ইঙ্গিতে তাহা ঘুণাক্ষরে টের পাইতে দেয় না, বরঞ্চ ঠিক করিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহারা অপরাধ অস্বীকার করে, তাহারা তাহা খুব জোরের সঙ্গেই করিয়া থাকে। তাহাদের ভাবনা না দেখিয়া এই মনে হয় যে অভিযোগ ব্যাপারটাকে তাহারা যেন অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছে। খুনী আসামীদের আচারব্যবহারে কিছুমাত্র মনঃকষ্টের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না। খুন করিয়াও তাহাদের মন বেশ প্রকৃতিস্থ ও সহজ অবস্থায় থাকে। সাক্ষীদের জবানবন্দীর মধ্যে তাহাদের অনুকূল কোন কথা থাকিলে, চট্ করিয়া তাহা ধরিতে পারে। হোল্‌মস্ একবার একটা খুব বড় কারাগারের ধর্ম্মযাজককে জিজ্ঞাসা করেন—মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে তিনি কি কখন কাহাকে অনুতপ্ত, দুঃখিত বা ভীত হইতে দেখিয়াছেন? ধর্ম্মযাজকটি উত্তর দেন—তিনি তাঁহার জীবনে অনেকগুলি খুনী আসামীর বেলাতেই শেষ ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন বটে—কিন্তু কাহাকেও যে দুঃখিত, বিমর্ষ বা অনুতপ্ত হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। হোল্‌মস্ সিদ্ধান্ত করেন অপরাধীদের কোন মতেই sane অর্থাৎ অবিকৃতচিত্ত বলা যায় না। আমরাও তাহা অস্বীকার করি না বটে কিন্তু সে অন্য হিসাবে। পাকা খুনী আসামীদের হৃদয় মানুষের কষ্ট বা দুঃখে কখনই দ্রব হয় না; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহাদের পশুপ্রীতি আবার অনেক সময় অস্বাভাবিক রকমে বেশী। এ বিষয়ে একটা বিখ্যাত গল্প আছে। ফরাসীবিপ্লবের জনৈক নেতার নিকট একদিন একটি মহিলা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত তাঁহার একমাত্র পুত্রের জীবন ভিক্ষার জন্য গমন করেন নেতাটি অমানুষিক নিষ্ঠুর আচরণের সহিত মহিলাটির আবেদন অগ্রাহ্য করেন। ভগ্নমনে, বাষ্পাকুললোচনে ফিরিবার কালে মহিলাটি দৈবক্রমে নেতাটির একটা প্রিয় কুকুরের পা মাড়াইয়া দেন। ইহাতে নেতাটি ভীষণ কুপিত হন এবং রোষকষায়িতলোচনে চীৎকার করিয়া উঠেন—"Madam, have you no humanity" "তোমার হৃদয়ে কি দয়ামায়া নাই"? ডি-কুইন্সীর Murder নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটির নায়ক উইলিয়াম্‌স্‌কে দেখিলে মাটির মানুষ বলিয়া মনে হইত। তাহার মুখে বাইবেলে লিখিত ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া ফুটিয়া থাকিত। এই নিরীহ ভাল মানুষটির নরহত্যাতেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখ একথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত। এ ব্যক্তি কত লোকেরই যে প্রাণনাশ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। এক সময়ে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ইহার ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। দেশ যখন এই গুপ্তঘাতকের ভয়ে ম্রিয়মাণ, সে সময়ে একটি যুবতীর সঙ্গে ইহার পরিচয় হয়। কথাবার্ত্তায় যুবতীটির ইহার প্রতি এতটা শ্রদ্ধা হয় যে, তিনি বলিয়া উঠিলেন—রাত্রে তাহার ঘরে কেহ যদি প্রবেশ করে ভয়ে তাহার আত্মাপুরুষটি উড়িয়া যাইবে "কিন্তু উইলিয়াম্‌স্ তুমি যদি যাও তা হ'লে স্বতন্ত্র কথা: আমি বেশ জানি, তোমার কাছে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ"। মার্কুইস্ দ্য ব্র্যাভিন্‌ভিয়ার এক সময়ে প্যারিসের কোন হোটেলে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সদয় ব্যবহারে হোটেলের সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইঁহাকে লোকে দয়ার অবতার বলিয়া মনে করিত। ইনি কিন্তু হোটেলের রোগীদের শুশ্রূষা করিবার উপলক্ষে তাহাদিগকে বিষাক্ত মিষ্টান্ন প্রদান করিতেন এবং তাহাদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিবার জন্য তাহাদের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। ম্যানিং পরিবারে চাকুরীর জন্য একজন উমেদার জুটিয়াছিল। ম্যানিঙ্‌রা স্বামীস্ত্রীতে তাহাকে বধ করিয়া, রন্ধনাগারে প্রোথিত করিয়াছিল এবং তাহার উপর বসিয়া অবলীলাক্রমে পানভোজনাদি করিত। ডীমিং তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে বধ করিয়া যে ঘরে প্রোথিত করিয়াছিল, সেই ঘরে বন্ধুদের লইয়া নৃত্যগীত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিত না। সঙ্গীরা ডীমিংকে খুব ভাল লোক বলিয়াই মনে করিত। খুনীদের হৃদয় কঠিন ও নিষ্ঠুর হয়—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কঠিন বলিয়াই তো তাহারা অবাধে অবলীলাক্রমে হত্যাকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে। আপনার পত্নীর খাদ্যে স্বহস্তে প্রতিদিন বিষ মিশাইয়া, সহাস্য মুখে দিনের পর দিন, তাহার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে পারে। হ্যাম্‌লেটের মত আমাদের সমাধিস্তম্ভের উপর খোদিত করিবার আবশ্যক না থাকিলেও আমাদের মনে রাখা উচিত—"A man or for that matter, a woman may smile and smile and be a villain." কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহা কোনমতেই বলা যায় না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

রাজপুতানায় বাঙ্গালী উপনিবেশ

(২)

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে শিলাদেবীর শাক্ত পুরোহিতগণ জয়পুরে আসিবার অর্দ্ধশতাব্দী পরে বৃন্দাবন হইতে গোস্বামীগণ আসিয়া জয়পুরে উপনিবিষ্ট হন। পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে চৈতন্যদেবের উপাসক গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্রজমণ্ডলে আগমন করেন এবং বৃন্দাবনধামে উপনিবিষ্ট হইয়া এখানকার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে ব্যাপৃত হন। ব্রজখণ্ডে শ্রীসম্প্রদায়, বল্লভী, নিম্বার্ক, মাধ্বাচার্য্য, রাধাবল্লভী, হরিব্যাসী প্রভৃতি বহু

বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাধান্যই সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর ভক্তিভাব দেখিয়া এতদঞ্চলবাসীগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভক্তমালকার নাভাজী সেই ভক্তিভাব ও ভগবৎপ্রেম সম্যক বর্ণন করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন "যো ভাব ঔর প্রেম উস্ দেশকে রহনেবালোঁ-কা শ্রীবৃন্দাবনমে দেখা, লিখা নহী যা সক্তা।" কথিত আছে ইঁহারা বৃন্দাবনে আসিয়া এখানকার অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবীর মন্দির সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মাণ করেন। সে মন্দির মুসলমান-অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্রজবাসীরা বলেন সে মন্দির বর্ত্তমান রাসমণ্ডলের সন্নিহিত সেবাকুঞ্জের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্রাট আকবরের শান্তিময় শাসনকালে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ এখানে বহু সুন্দর সুন্দর সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

কথিত আছে একবার সম্রাট্ আকবর বৃন্দাবনধাম দেখিতে গিয়া তথায় মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্যে বাঙ্গালীদিগকে উৎসাহ ও সহায়তা দান করেন। মোগলসম্রাটের বৃন্দাবনতীর্থদর্শনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তখন চারিটি মন্দির অতি সত্বর নির্ম্মিত হয়। বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, মদনমোহন ও যুগলকিশোরের মন্দিরই উক্ত চারিটি স্মারক মন্দির। তন্মধ্যে গোবিন্দদেবের মন্দি ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মথুরার পুরাতত্ত্বের প্রসিদ্ধ লেখক গ্রাউস্ সাহেবের মতে ইহা উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দুমন্দির। ফার্গুসন সাহেবের মতে ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দিরের মধ্যে একটিমাত্র মন্দির যাহা দেখিয়া য়ুরোপীয় স্থপতিরা সৌধনির্ম্মাণ সম্বন্ধে নূতন জ্ঞানলাভ করিতে পারে। ১৫৯০ অব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরশীর্ষস্থ আলোকরশ্মি দিল্লীর ময়ূরসিংহাসন হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। ধর্ম্মান্ধ মোগলসম্রাট্ আরঙ্গজেব উহা দেখিতে পাইয়া মন্দিরের চূড়াটি ভগ্ন এমন কি মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপর মস্জিদ্ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন। সম্রাটের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আগ্রার প্রধান প্রধান হিন্দুগণ গুপ্তচর দ্বারা বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের নিকট সংবাদ পাঠান। এই সংবাদে তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া রাজপুতানার প্রবলপ্রতাপ রাজা মহারাজাগণের সহায়তায় প্রধান প্রধান বিগ্রহগুলি অতি গোপনে ও সাবধানে স্থানান্তরিত করিতে থাকেন। অম্বরপতি অতি গোপনে গোবিন্দজীর মূর্ত্তি মন্দির হইতে বাহির করিয়া প্রথমে কাম্যবনে, পরে অম্বর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে বড়-গোবিন্দপুর গ্রামে এবং শেষে অম্বর নগরের উপকণ্ঠে ঘাটি নামক স্থানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাবিনোদ, রাধাদামোদর প্রমুখ অন্যান্য বিগ্রহসহ গোস্বামীগণ ক্রমে ক্রমে জয়পুরে স্থানান্তরিত হন। মথুরা হইতে কেশবদেবের বিগ্রহ আনাইয়া মিবারপতি মহারাণা রাজসিংহ প্রাচীন সিয়াড় আধুনিক নাথদ্বারে নাথজী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোকুল হইতে গোকুলনাথ ও গোকুলচন্দ্রমা মূর্ত্তি এবং মথুরা হইতে মথুরানাথকে কোটায় রক্ষা করা হয়। মহাবন হইতে বালকৃষ্ণমূর্ত্তি আনাইয়া সুরাটে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইরূপে জয়পুর, মিবার, কোটা, কেরৌলী, ভরতপুর এবং রাজপুতানার নানা স্থানে মুসলমান-অত্যাচারের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মন্দিরের অধিকারী সেবাইত, পূজারী ও গোস্বামীগণ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই সময় স্ব স্ব উপাস্য দেবমূর্ত্তি লইয়া পলায়ন করেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা আরঙ্গজেব মন্দিরাদি লুণ্ঠন করিয়া আগ্রার নবাব কুদসিয়া বেগমের মসজিদে উঠিবার সোপানতলে প্রোথিত করেন।

এই ঘটনা ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল। এই সময় হইতে জয়পুরে বাঙ্গালীর দ্বিতীয় উপনিবেশের সূত্রপাত হয়। গোবিন্দজীর পূজারী গোস্বামীদিগের আদিপুরুষ শ্রীরূপ গোস্বামী। জয়পুরে রক্ষিত একখানি পুরাতন তালিকা হইতে জানা যায় শ্রীরূপ গোস্বামীর পর তাঁহার শিষ্য গদাধর পণ্ডিত, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার শিষ্য অনন্তাচার্য্য গোস্বামী এবং তাঁহার পর তৎশিষ্য হরিদাস গোস্বামী ক্রমান্বয়ে গদির অধিকারী হন। কথিত হইয়াছে হরিদাস গোস্বামীর সময় বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং তাঁহার অধস্তন ৫ম গোস্বামী কৃষ্ণচরণের গদি অধিকারের কালে (১৬৫৫—১৬৭৯) গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি বৃন্দাবন হইতে কাম্যবনে অম্বরাধি-

পতি মির্জ্জারাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। মির্জ্জা-রাজার পুত্র মহারাজা রামসিংহ। কৃষ্ণচরণ গোস্বামী তাঁহারও সময় বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার পর শিষ্যানুশিষ্যক্রমে গোবিন্দচরণ, জগন্নাথ এবং হরেকৃষ্ণ গোস্বামী গদির অধিকারী হন। ১৭১৩ হইতে ১৭১৮ অব্দ তাঁহার অধিকারের কাল। এই সময় মহারাজা সওয়াই জয়সিংহ তাঁহার নূতন নগর জয়পুরের প্রাসাদ-মন্দিরে আনিয়া গোবিন্দজীউকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে একটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প প্রচলিত আছে। প্রভাসক্ষেত্রে যদুবংশ ধ্বংস হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র অর্থাৎ অনিরুদ্ধের পুত্র ব্রজই একমাত্র জীবিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুর এবং ব্রজকে ইন্দ্রপ্রস্থ দান করেন। পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের পর ব্রজের জননী ঊষাদেবী যদুকুলপতি কৃষ্ণের একটি পাষাণপ্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবার জন্য পুত্রকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে উৎকৃষ্ট ভাস্করগণ দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে ভাস্করগণ প্রথম যে মূর্ত্তি গঠন করিল ঊষাদেবী তাহা কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন গোবিন্দের চরণকমল ব্যতীত মূর্ত্তির অন্য কোন অঙ্গের সহিত গোবিন্দের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। সুতরাং পুনরায় মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। এবার ব্রজের জননী বলিলেন মাধবের বক্ষস্থল ব্যতীত বিগ্রহের আর কোন অঙ্গের সহিত গোবিন্দের সাদৃশ্য হয় নাই। এবার ভাস্করগণ সাতিশয় যত্নসহকারে গোবিন্দের ধ্যানে তন্ময় হইয়া নূতন মূর্ত্তি গঠন করিল। ঊষাদেবী এই মূর্ত্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া দিলেন, কুলবধূ দাদাশ্বশুরের সম্মুখে মুখ দেখাইতে লজ্জাবোধ করিলেন। সকলেই তখন বুঝিলেন এই মূর্ত্তিই গোবিন্দের অনুরূপ হইয়াছে; সুতরাং ইনিই গোবিন্দদেব নামে অভিহিত হইলেন। এবং প্রথম মূর্ত্তি মদনমোহন এবং দ্বিতীয় মূর্ত্তির নাম হইল গোপীনাথ। এই মূর্ত্তিত্রয় এবং অন্যান্য মূর্ত্তি কালে লুপ্ত হইলে চৈতন্যদেবের প্রেরিত ছয় জন বাঙ্গালী গোস্বামী সেই-সমুদয়ের উদ্ধার সাধন করেন। তন্মধ্যে শ্রীরূপ কর্ত্তৃক গোবিন্দজী, সনাতন কর্ত্তৃক মদনমোহনজী, জীবগোস্বামী কর্ত্তৃক রাধাদামোদরজী, লোকনাথ কর্ত্তৃক রাধাবিনোদজী, মধুমঙ্গল কর্ত্তৃক গোপীনাথজী, রঘুনাথ কর্ত্তৃক শ্যামসুন্দরজী এবং গোপালভট্ট কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত রাধারমণজী সর্ব্বপ্রধান।
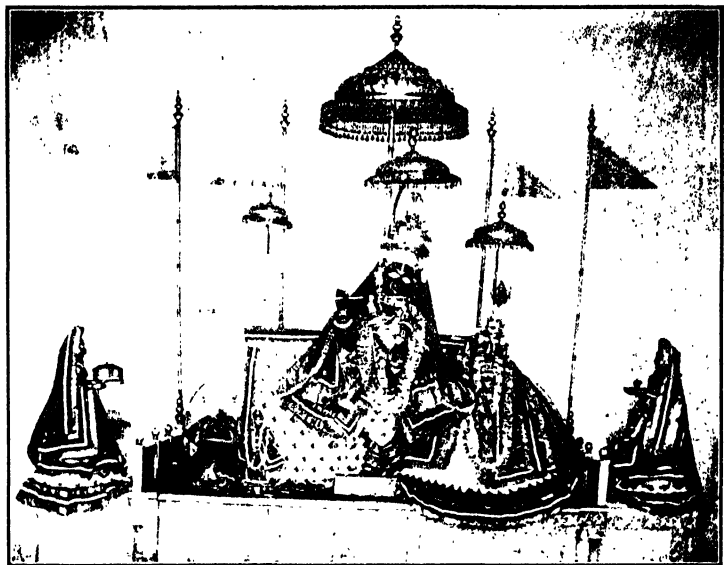
গোবিন্দজী।

গোবিন্দজীর মূর্ত্তি যখন প্রথম অম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বিগ্রহের পার্শ্বে তাঁহার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীর মূর্ত্তি ছিল না, কিন্তু উপরে মুদ্রিত চিত্রে যে রমণীমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে উহা অম্বররাজকুমারীর প্রতিমূর্ত্তি। তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী এবং গোবিন্দজীর অনুরাগিণী ছিলেন। রাজকুমারীকে বয়স্থা হইয়াও বিবাহ করিতে একান্ত অসম্মত দেখিয়া জয়পুরপতি নানা দুর্ভাবনায় কালাতিপাত করিতে থাকেন। এদিকে রাজকুমারী গোবিন্দজীর নিকট নিত্য অবস্থিতি করেন। হঠাৎ একদিন রাজার আদেশ হইল পরদিন হইতে রাজকন্যা গোবিন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবেন না। সেইদিন রজনীযোগে শেষ দেখা দেখিবার ছলে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং গোবিন্দজীর

মূর্ত্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে বিলীন হইলেন। পুরবাসীগণ মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাজকুমারীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তদবধি তাঁহার পাষাণমূর্ত্তি গোবিন্দজীর পার্শ্বে স্থান পাইয়াছে।

জয়পুরে গোবিন্দজী আনীত হইবার পর গোস্বামী হরেকৃষ্ণের শিষ্য রামশরণ গোস্বামী মহারাজের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। তখন হইতে শিষ্যানুশিষ্য-ক্রমে গদি অধিকারের প্রথার পরিবর্ত্তে ইহা বংশানুগত হয় এবং উত্তরাধিকারী পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা অন্য কোন বংশধর শিষ্যরূপে গৃহীত হইতে থাকেন। রামশরণ গোস্বামীর পর নীলাম্বর, বলরাম, কৃষ্ণশরণ, রামনারায়ণ, গোবিন্দনারায়ণ, হরেকৃষ্ণশরণ, রামগোস্বামী, শ্যামসুন্দর, এবং বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী ক্রমান্বয়ে গদির অধিকারী হন।
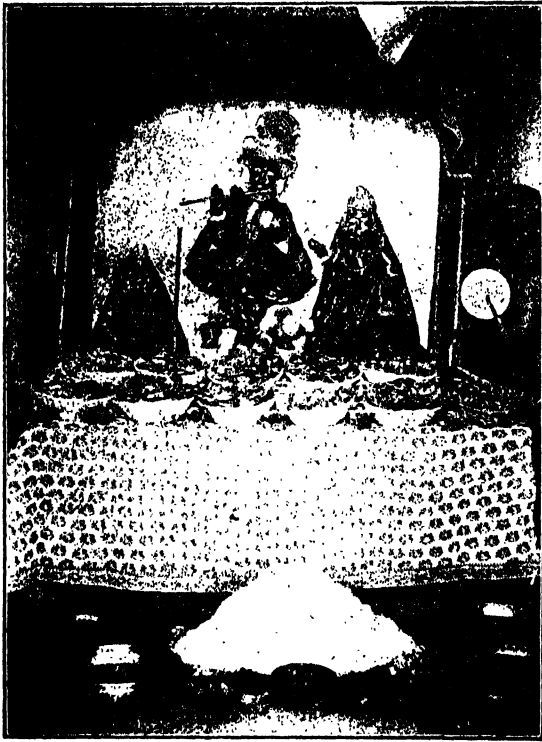
মদনমোহন

বৃন্দাবনে গোপীনাথের মন্দির কুশাবৎ রাজপুতদিগের শেখাবৎ বংশীয় রায়শীল নামক জনৈক ভক্ত রাজপুত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।* রায়শীল প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে রাজা মানসিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কাবুলের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। শেখাবৎ রাজপুতগণের আবাসভূমি শেখাবতী প্রদেশ জয়পুররাজের রাজ্যভুক্ত। উক্ত প্রদেশের অধিকাংশ রাজপুতই গোপীনাথের বাঙ্গালী গোস্বামীদিগের শিষ্য। গোপীনাথের বিগ্রহও গোবিন্দজীর সহিত অম্বরের সন্নিহিত ঘাট নামক স্থানে রক্ষিত হয়। এক্ষণে গোপীনাথের মন্দির জয়পুর সহরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। জয়পুরের মদনমোহনের মূর্ত্তিও বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু আসলমূর্ত্তিটি এখন জয়পুরে নাই। কেরৌলীর মহারাজার সহিত জয়পুরের এক রাজকুমারীর বিবাহ হইলে জয়পুরের মহারাজা জামাতাকে মদনমোহনের পরম ভক্ত জানিয়া বিগ্রহটি যৌতুকস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন। এবং ঐ বিগ্রহের অন্য প্রতিমূর্ত্তি গঠন করাইয়া পুরাতন মন্দিরে স্থাপন করেন। মদনমোহনের সহিত তাঁহার সেবাধিকারী বাঙ্গালী গোস্বামীগণও সেইসূত্রে কেরৌলীতে গিয়া উপনিবিষ্ট হন।†

জয়পুরের মন্দিরে যে মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত তাঁহার পূজারী বাঙ্গালী গোস্বামীগণ। শীলাদেবীর শাক্ত পুরোহিতগণের ন্যায় ইহাঁরাও বাঙ্গালীত্ব হারাইতে

* মুসলমান-অত্যাচারে এই-সকল মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ইংরেজরাজত্বের সূত্রপাতসময়ে, রাজা গোপাল সিংহ মদনমোহনের একটি নূতন মন্দির স্থাপন করেন ও মুর্শিদাবাদ হইতে গোঁসাই রামকিশোর নামক একজন বাঙ্গালীকে আনাইয়া তত্ত্বাবধানের ভার দেন। গোস্বামী বাৎসরিক ২১ সহস্র টাকা আয়ের একখানি জমিদারী প্রাপ্ত হন।

† এরূপও কিম্বদন্তী আছে যে একবার এক যুদ্ধে কেরৌলীর রাজা জয়পুরপতিকে সাহায্যদান করিলে বন্ধুত্বের পুরস্কারস্বরূপ জয়পুরাধিপতি তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট বস্তু দান করিতে চাহিলে তিনি গোবিন্দজীর মূর্ত্তি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দজী জয়পুরের অধিদেবতা। এদিকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাও অসম্ভব। সুতরাং অম্বররাজ কৌশল অবলম্বন করিয়া বলিলেন কেরৌলীরাজের চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া তাঁহার সম্মুখে গোবিন্দজী, মদনমোহনজী ও গোপীনাথজীর মূর্ত্তি রক্ষিত হইবে। প্রথমে তিনি যে মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিবেন তাহাই কেরৌলীরাজের হইবে। কেরৌলীর রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যেমন হস্তপ্রসারণ করিলেন অমনি তাঁহার হস্ত মদনমোহন-মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিল। তখন মদনমোহন বিগ্রহ কেরৌলীতে আনীত হন এবং তৎসঙ্গে পূজারী বাঙ্গালী গোস্বামীগণ কেরৌলীতে উপনিবিষ্ট হন।

বসিয়াছেন। মাড়বারী পোষাক, আহার এবং ভাষা আশ্রয় করিয়া তাঁহারা বিদ্যাধর এবং মুরলীধরের ন্যায় না হইলেও অনেকটা মাড়বারী ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। মদনমোহনের পুরোহিত গোস্বামী চৈতন্যকিশোর, সাধারণের নিকট "চাঁদজী" নামে প্রসিদ্ধ; দুই বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স দ্বাদশ বৎসর, এক্ষণে তিনিই কেরৌলীর মদনমোহনের মন্দিরের গোস্বামী হইয়াছেন এবং কনিষ্ঠ শিশুপুত্র (বয়স ২ বৎসর মাত্র) জয়পুরের মদনমোহনের গোস্বামীপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কি জয়পুর কি কেরৌলী মদনমোহনের গোস্বামী বাঙ্গালী হওয়াই চাই। এই প্রথা মূলবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাতা বৃন্দাবনের সনাতনগোস্বামী হইতে চলিয়া আসিতেছে। কথিত আছে মুলতানবাসী রামদাস নামক জনৈক বণিক যমুনার উপর দিয়া আগ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময় কালীদহের ঘাটে বালুচরে তাঁহার পণ্যভরা নৌকা আটকাইয়া গেল। রামদাস তিনদিন বহু চেষ্টা করিয়াও নৌকা উদ্ধার করিতে না পারিয়া তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সৌম্যমূর্ত্তি সনাতন গোস্বামীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। গোস্বামী বণিককে মদনমোহনকে স্তবে তুষ্ট করিতে উপদেশ দিলেন। মদনমোহনের কৃপায় রামদাসের নৌকা উদ্ধারলাভ করিল। রামদাস পণ্য বিক্রয় করিয়া যথাসময়ে বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ গোস্বামীর করে সমর্পণ করিলেন। সেই অর্থে মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মিত হইল। তখন হইতে মদনমোহনের পূজারী বাঙ্গালী গোস্বামীদিগের নাম মুলতান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সনাতন গোস্বামীর শিষ্যানুশিষ্যবর্গ পঞ্জাব প্রদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। যাহা হউক জয়পুরের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে গোবিন্দজীর একমাত্র সেবাধিকারী দেখিয়া শঙ্কর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ঈর্ষান্বিত হন এবং জয়পুরাধিপতিকে বুঝান যে শঙ্করের শারীরিক ভাষ্য ব্যতীত রামানুজ, মাধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য এই সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের চারিখানি বেদান্তভাষ্য আছে, কিন্তু চৈতন্যসম্প্রদায়ের তাহা নাই। সুতরাং চৈতন্যদেবের মত অসম্প্রদায়ী। অসম্প্রদায়ী

চাঁদজী ও তাঁহার পুত্রকন্যা

বৈষ্ণবগণ গোবিন্দজীর সেবাধিকারী হইতে পারেন না। কথিত আছে রাজা সন্ন্যাসীদিগের উক্তির সত্যাসত্যতা নির্ণয়ার্থ এক মহাসভার অনুষ্ঠান করেন এবং তাহাতে নানাস্থানের সাধু ও পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হন। পশ্চিমের উদাসীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বৃন্দাবনের বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণও সেই সভায় উপস্থিত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈষ্ণবদর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণও বৃন্দাবন হইতে গমন করেন। বিচারে প্রতিপক্ষ বিদ্যাভূষণের নিকট সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত হইলেন। তাঁহারা তখন কৌশলে বাঙ্গালী পণ্ডিতকে পরাজয় স্বীকার করাইবার জন্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভাষ্য দেখিতে চাহিলেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ তাহাতে সম্মত হইলে সভা ভঙ্গ হইল। বিদ্যাভূষণ অসাধারণ প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়-বলে সম্পূর্ণ নূতন ভাষ্য সঙ্কর

প্রণয়ন করিয়া যথাসময়ে প্রকাশ্য সভায় জয়পুরাধিপতি ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। তদবধি এখানে এবং বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আর একটি ঘটনা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয়ের অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে যে জয়পুর ও বৃন্দাবনের বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের সহিত তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের বিচার হয়। তাৎকালীন বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বিচারে অসমর্থ হইলে দ্বিতীয় জয়সিংহ বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণের সহিত বিচার করিবার জন্য স্বীয় সভাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কৃষ্ণদেব ভট্টকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পথিমধ্যে প্রয়াগ কাশী প্রভৃতি স্থানের বৈষ্ণবদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বকীয় মতে দস্তখত করাইয়া লইতে লইতে বঙ্গদেশে গিয়া উপস্থিত হন। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুরের বংশধর পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তদবধি জয়পুর ও বৃন্দাবনে বাঙ্গালা বৈষ্ণবদিগের প্রভাব অপ্রতিহত হয়।

ব্রজমণ্ডলের ন্যায় জয়পুরও বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের পবিত্র তীর্থধাম। তাঁহারা অনেকেই বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিবার কালে অথবা বৃন্দাবনযাত্রার কালে জয়পুরের গোবিন্দজী এবং অন্য বিগ্রহদ্বয় দর্শন করিয়া যান। ১৮৩৭ শকে এইরূপে বাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বাবা আউলমনোহর দাস শেষ জীবনে বৃন্দাবন যাইবার পথে জয়পুরে উপস্থিত হন। এখানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আউলমনোহর দাসের সমাধি জয়পুরে আজিও বিদ্যমান আছে। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

সর্ব্বস্বান্ত

সমিধ পুড়িয়া ছাই বাকী আর কিছু নাই
নিবে গেছে রক্তিম আলোক,
প্রাণহীন সে ধূলায় কিছু না জনমে হায়,
মরা প্রেম, উদাসীন শোক।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

ধর্ম্মপাল

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজ গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া যান। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া ধর্ম্মপাল দেব দুর্গ হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্য অমৃতানন্দকে যুবরাজ ও কল্যাণী দেবীর সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে সংবাদ পৌঁছিল যে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাডুবির পর সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়াছেন। গৌড় হইতে মহারাজকে খুঁজিবার জন্য দুই দল সৈন্য প্রেরিত হইল। পথে ধর্ম্মপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। এবং গোপালদেব ধর্ম্মপাল ও কল্যাণী দেবীকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কল্যাণীর মাতা কল্যাণীকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত পুরুষোত্তম খুল্লতাত-কর্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত কান্যকুব্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

এই সংবাদ জানিয়া কান্যকুব্জরাজ গুর্জ্জররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যাসী দূতকে ঠকাইয়া তাহার পত্র পড়িয়া লইলেন। গুর্জ্জররাজ সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ মনে করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবার উপক্রম করিলেন। এদিকে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধর্ম্মপাল সমস্ত বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।]

অতি প্রত্যূষে রাজপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মা দ্রুতপদে গৌড়নগরের রাজপথ অতিবাহন করিয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছেন, গৌড়বাসীগণের তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, পথে মাত্র দুই একজন লোক দেখা যাইতেছে। সেই সময়ে পূজার উপকরণ মস্তকে বহন করিয়া প্রাসাদের

দিক হইতে একটি রমণী আসিতেছিল, সে পুরুষোত্তমকে দ্রুতপদে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইল এবং পুরোহিত নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল "পুরুষোত্তম ঠাকুর নাকি? এত প্রত্যুষে দ্রুতপদে কোথায় চলিয়াছ?" পুরোহিত তাহার কথা শুনিয়াও শুনিলেন না, ব্রাহ্মণ চলিয়া যায় দেখিয়া রমণী পুনরায় কহিল "ঠাকুর, বলি ও ঠাকুর? এত তাড়তাড়ি যাও কোথায়?" ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না। তখন রমণী পুনরায় কহিল "ঠাকুর কি চিনিতে পারিতেছ না না কি?" ব্রাহ্মণ বিরক্তিব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুই কে?"

রমণী হাসিয়া উত্তর করিল "আমি গো আমি, এমন করিয়া কি মানুষকে ভুলিতে হয়?"

"কে তুই? আমি ত কখনও তোকে দেখি নাই? তুই প্রকাশ্য রাজপথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আমার সহিত অবজ্ঞাসূচক কথা কহিতেছিস কেন? তুই জানিস্ আমি কে?"

"জানি গো জানি, যখন বুড়া শিবের পূজা করিতে তখন তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখ দুইটা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তুমি ত সেই পুরুষোত্তম ঠাকুর? মিন্‌সে রাজবাড়ীতে পুরোহিত হইয়াছে বলিয়া অহঙ্কারে মাটিতে পা দিতেছে না। এখন মহারাজের পুরোহিত হইয়া আমাকে চিনিতে পারিতেছ না বটে? এখন রাজপথে দাঁড়াইয়া আমার সহিত কথা কহিতে তোমার অপমান বোধ হয়? তবে রে বামুন, থাক তুমি, আমি এখনই গৌড় নগরের পথে পথে তোমার বিদ্যা প্রকাশ করিয়া দিতেছি—"

"আগে বলিতে হয়!—দোহাই তোমার—মাধবী—মাধু—বলি ও মাধি—আমার ভুল হইয়া গিয়াছে—বড়ই ভুল হইয়াছে—এই ভোরের বেলা কি না—এখনও ভাল করিয়া চোখের ঘুম ছাড়ে নাই—সেইজন্যই চিনিতে পারি নাই। মাধবী, তুমি রাগ করিলে?"

"যাও—যাও—তোমার আর খোসামোদে কাজ নাই।"

"মাধু—তোমার হাতে ধরি; না না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি,—এমন কাজ আর কখনও করিব না—যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে, তুমি দয়া করিয়া এইবারটি আমাকে ক্ষমা কর।"

মাধবী তাহার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিল, কিন্তু প্রকাশে অতি গম্ভীর ভাবে কহিল "ঠাকুর, সকাল বেলা ছুটিতে ছুটিতে কোথায় চলিয়াছিলে?" ব্রাহ্মণ দশন পঙ্‌ক্তি বিকাশ করিয়া সহাস্যে কহিল তুমি কি নূতন সংবাদ শুন নাই? মহারাজের যে বিবাহ, আমাকে এখনই সশীর্ষ নারিকেল লইয়া গোকর্ণে যাত্রা করিতে হইবে। গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলাম, এখন মহাদেবীর নিকট পত্র আনিতে যাইতেছি, প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যাত্রা করিব।"

মাধবী দাসী কহিল "আবার কবে আসিবে?"

"দশ দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।"

দাসী কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া কহিল "এখন কি প্রাসাদে যাইবে?"

"হাঁ।"

"একা যাইতে পারিবে ত?"

"কেন?"

"পথে যে ভয় আছে, তাহা বুঝি ভুলিয়া গিয়াছ?"

"কোথায়? আমি ত তাহা জানি না?"

"তবে আর তোমার শুনিয়া কাজ নাই?"

"না না—বল বল বল; মাধবী, মাধবী, আমার মাথা খাও, ভয়ের কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে।"

"ভয় এমন আর কি, তবে লোকে বলে যে চণ্ডীর মন্দির-শিখরে যমজবটাশ্বত্থের গাছে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করে।"

রমণীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুরুষোত্তম শর্ম্মা তাহার নিকটে আসিয়া সবলে তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করিল এবং কহিল "মাধবী, ও মাধবী!"

"কেন?"

"আমি যে যাইতে পারিতেছি না।"

"আমি কি করিব?"

"তুমি আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আইস।"

"আমি শিবমন্দিরে যাইব না?"

"তুমি না হয় একটু বিলম্বে যাইও।"

"তাহা কেমন করিয়া হইবে? তোমার পরিবর্ত্তে যে পূজারী হইয়াছে সে বড় কড়া লোক।"

এই সময়ে দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল, পুরুষোত্তম তাহা শুনিয়া "বাবারে" বলিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল, ইহার এক মুহূর্ত্ত পরেই একজন অশ্বারোহী অশ্বখুরোত্থিত-ধূলিতে রাজপথ অন্ধকারময় করিয়া প্রাসাদের দিকে চলিয়া গেল; ইহার পরেই মাধবী পুরুষোত্তমের কণ্ঠ-নিঃসৃত আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে সেইদিকে অগ্রসর হইল এবং কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল যে সে পথের ধূলায় পড়িয়া "গোঁ। গোঁ" করিতেছে। পুরুষোত্তম মাধবীর পদশব্দ শুনিয়া ঈষৎ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইল, তাহার পরে অধিকতর বেগে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। মাধবী তাহা দেখিতে পাইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর কি হইয়াছে?" অনেকক্ষণ পরে পুরুষোত্তম কহিল "ব্রহ্মদৈত্য।" তখন মাধবী কহিল "একটা ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছ, আরও যে দশটা আসিতেছে—" ইহা শুনিয়া পুরুষোত্তম শর্ম্মা দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সেইস্থান হইতে পলায়ন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মিলনে বাধা।

বৃদ্ধ অমাত্য উদ্ধব ঘোষ গোকর্ণদুর্গদ্বারের সম্মুখে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষতলে সুখাসনে বসিয়া ছিলেন, দুই একজন বৃদ্ধ সেনা, দুই একজন প্রাচীন কর্ম্মচারী এবং দুই একজন প্রজা বৃক্ষতলের পরিষ্কৃত ভূমিতে বসিয়া ছিল, তাঁহারা কল্যাণী দেবীর বিবাহের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। একজন গ্রামবৃদ্ধ বলিতেছিলেন যে কুমারী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখা উচিত নহে। তাহা শুনিয়া উদ্ধব ঘোষ কহিলেন "কুমারী বাগ্‌দত্তা হইয়া আছেন, এখন মহারাজাধিরাজের সময় হইলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। আমারও বয়স হইয়া আসিল, কখন আছি কখন নাই, মানুষের জীবনের কথা ত কিছু বলা যায় না। আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে কুমারীর বিবাহ হইলেই ভাল হয়।" একজন বৃদ্ধ সেনানায়ক কহিল "আমার বোধ হয় অন্যত্র কল্যাণীদেবীর বিবাহ দিলে শুভ হইত।" উদ্ধব ঘোষ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

"শুভকার্য্যে দুই তিনবার বাধা পড়িয়া গেল, কুল-মহিলারা বলিতেছেন যে এই বিবাহে শুভ ফল হইবে না।"

"না না—বাধা পড়ে নাই। প্রথমবার স্বর্গীয় মহারাজ যখন গোকর্ণ হইতে রাজধানীতে ফিরিলেন, তখন বিবাহ অসম্ভব বলিয়াই করণক্রিয়া হইয়া গেল। স্বর্গীয় মহারাজ গোপাল দেব গৌড়ে ফিরিলেই দেশের সমস্ত সামন্তরাজগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া বরণ করিলেন। আমাদের গোবর্দ্ধনমঠের বিশ্বানন্দ স্বামীই ত তাহার মূল। সম্রাট হইয়া নূতন রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে করিতে এই কয়বৎসর কাটিয়া গেল, এতদিন সকলেই যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম। ব্যস্ত না থাকিয়া উপায় কি? কি বল হে কেশবদাস? দস্যু তস্কর শাসন না করিলে, আর তস্করের মত দুই একজন রাজাকে সমুচিত শিক্ষা না দিলে ত নিরাপদে দেশে বাস করিবার উপায় নাই!"

গোকর্ণের বৃদ্ধ মণ্ডল কেশব দাস, অমাত্যের সম্মুখে ভূমিতে বসিয়া ছিল সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "প্রভু, সমস্তই মনে আছে, আমি কি কখনও তাহা ভুলিতে পারিব! আমি যে তখন দুই পুত্র ও পাঁচটি পৌত্র হারাইয়াছি প্রভু!"

উদ্ধবঘোষ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "সত্য কেশব, অরাজকতার কথা সর্ব্বাপেক্ষা তোমারই অধিকদিন মনে থাকিবে। তাহার পর দেশে যখন শান্তি স্থাপিত হইল, তখন কল্যাণীদেবীর বিবাহেরও স্থির হইল; কিন্তু দুরদৃষ্ট-বশতঃ বিবাহের পূর্ব্বেই হঠাৎ স্বর্গীয় মহারাজের স্বর্গলাভ হইল। এখন মহারাজের শ্রাদ্ধাদি শেষ হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই কল্যাণীদেবীর বিবাহ হইবে। দেখ বলদেব, আমি প্রত্যহই গৌড় হইতে দূত অথবা ঘটক আসিবে মনে করিতেছি।" পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ সেনানায়ক জিজ্ঞাসা করিল "গৌড় হইতে পূর্ব্বাহ্নে কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?"

উদ্ধব।— না, সংবাদ পাই নাই বটে, তবে কি জানি কেন আমার নিত্যই মনে হয়,—আজি যেন সশীর্ষ নারিকেল লইয়া রাজধানী হইতে ঘটক আসিবে।

কেশব।— প্রভু, নূতন মহারাজ কি এতদিন কোন সংবাদই লয়েন নাই ?

উদ্ধব।— কেশব, নূতন মহারাজের গোকর্ণের সংবাদ লওয়া একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। গৌড় হইতে প্রায়ই সংবাদ লইবার জন্য দূত আসে। মহাদেবীও মধ্যে মধ্যে দুর্গস্বামিনীর নিকট দাসী পাঠাইয়া থাকেন—

বলদেব।— ইহারা কি বিবাহের সংবাদ লইয়া আসে ?

উদ্ধব।— না বলদেব, তুমি বুঝিলে না, আমি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, ইহারা মহারাজের বিবাহের কোন সংবাদই রাখে না।

কেশব।— প্রভু, তবে ইহারা কি করিতে আসে ?

উদ্ধব।— কেশব, তুমি যখন এখনও বুঝিতে পারিলে না, তখন তুমি কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না। ইহারা পূর্ব্বে যুবরাজের নিকট হইতে আসিত, এখন নূতন মহারাজের নিকট হইতে আসে। কখনও বা কিছু উপহার লইয়া আসে, কখন বা মহাদেবীর নিকট হইতে পত্র আনে, আর কখনও কখনও তীর্থযাত্রার ছলে গোকর্ণ দেখিয়া যায়।

বলদেব।— কাহার জন্য পত্র লইয়া আসে ?

উদ্ধব।— মহাদেবীর নিকট হইতে দুর্গস্বামিনীর নামে পত্র আসে।

বলদেব।— ওঃ !

উদ্ধব।— তবে শুনিয়াছি, যাহারা রাঢ়ে তীর্থভ্রমণ করিতে আসে তাহারা নাকি দুই একবার যুবরাজের নিকট হইতে পত্র লইয়া আসিয়াছিল।

কেশব।— যুবরাজ কি দুর্গস্বামিনীকে পত্র লিখিয়াছিলেন ?

উদ্ধব।— কেশব, বয়সদোষে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হইয়া গিয়াছে, যুবরাজের পত্র চন্দন-কুঙ্কুম-সুবাসিত চীনাংশুকের আবরণের মধ্যে আসিয়াছিল।

বলদেব।— বটে ?

কেশব।— প্রভু, আমি ত কিছুই বুঝিলাম না, রাজা-মহারাজার পত্র ত চিরকালই বহুমূল্য আবরণে আসিয়া থাকে, রাজধানী হইতে আর কবে তালপত্রের আবরণে পত্র আসিয়াছে ?

উদ্ধব।— কেশব, তোমার এ-সকল কথা বুঝিয়া কাজ নাই।

এই সময়ে খর্ব্বাকার কৃষকায় একজন বর্শাধারী সেনা আসিয়া উদ্ধবঘোষকে অভিবাদন করিল ও কহিল, "প্রভু, এইমাত্র গৌড় হইতে একখানি নৌকা আসিয়াছে, সেই নৌকায় একজন স্থূলকায় ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, তিনি কোন মতে নৌকা হইতে তীরে নামিতে পারিতেছেন না।" উদ্ধবঘোষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন কেদার ?"

কেদার।— প্রভু, বর্ষার পরে নদীর জল কমিয়া গিয়া কাদা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তিনি কাদায় নামিতে ভরসা পাইতেছেন না। প্রভু, ঠাকুরটির দেহখানি নিতান্ত সূক্ষ্ম নয়, তিনি কাদায় নামিলে বোধ হয় হাতীর মত তাহাতে বসিয়া যাইবেন।

উদ্ধব।— লোকটি কে কেদার ?

কেদার।— পরিচয় ত জিজ্ঞাসা করি নাই প্রভু ! তবে আকার দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি একজন বড়লোক।

উদ্ধব।— কি রকম ?

কেদার।— প্রভু, একখানি গরুরগাড়ী বোঝাই।

উদ্ধব।— চল কেশব, রাজধানী হইতে কে লোকটা আসিল দেখিয়া আসি। মহাদেবী বোধ হয় মহারাজের বিবাহের দিনস্থির করিয়া ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছেন।

সকলে বৃক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং নদীতীরে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন যে পুরুষোত্তম শর্ম্মা কাতরনেত্রে চতুর্দ্দিকে কর্দ্দমাক্তভূমি নিরীক্ষণ করিতেছেন। উদ্ধবঘোষ তীরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে ?"

"পুরুষোত্তম।"

"মহাশয়ের নিবাস ?"

"গৌড় নগরে।"

"কি উপলক্ষে রাঢ়দেশে মহাশয়ের আগমন হইয়াছে ?"

"উদ্দেশ্য অতি বিস্তৃত, ব্যক্ত করিতে অধিক সময়ের আবশ্যক। তীরে নামিয়া সকল কথা নিবেদন করিব। সম্প্রতি তীরে নামিবার পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন কি ?

আগন্তুকের অবস্থা দেখিয়া বলদেব অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়াছিলেন, তিনি উদ্ধবঘোষের কর্ণমূলে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "প্রভু, অত গুরুভার স্কন্ধে বহন করিয়া আনা অসম্ভব, পঙ্কে হস্তী নামাইলে তাহারা আর উঠিতে পারিবে না, অতএব আপনি ঠাকুরটিকে নৌকার উপরেই শুইয়া পড়িতে বলুন, আমরা রজ্জু দিয়া বন্ধন করিয়া তাঁহাকে তীরে টানিয়া আনিব।" বলদেবের কথা শুনিয়া উদ্ধবঘোষ হাসিয়া ফেলিলেন।

নৌকার উপর হইতে পুরুষোত্তম দেখিলেন যে কেহই তাঁহার কথার উত্তর দেয় না, তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমার উপায় কি হইবে?" উদ্ধব ঘোষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে,—তাহা ত বলিলেন না?"

"এই ত বলিলাম,—আমার নাম পুরুষোত্তম শর্ম্মা।"

"তাহা ত শুনিয়াছি।"

"আমি মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের পুরোহিত।"

"তাহা এতক্ষণ বলেন নাই কেন?"

"আমি ত এখনও আমার গোকর্ণ আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি নাই।"

উদ্ধবঘোষ ভাবিলেন যে মহাদেবী নিশ্চয়ই বিবাহের দিনস্থির করিয়া কুলপুরোহিতকে গোকর্ণে পাঠাইয়াছেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলদেবকে কহিলেন "ওহে বলদেব, ইনি মহারাজের কুলপুরোহিত, নিশ্চয়ই কল্যাণীদেবীর বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে এবং ইনি সেই সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন। ইহাঁকে ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ করা উচিত হয় নাই। যাহা হউক ভবিষ্যতে আর কিছু বলিও না। কেদার, দুর্গের নিকটে একটা বড় আমগাছ এই বর্ষার জলে পড়িয়া গিয়াছে, সেইখানে নৌকা লইয়া যাও, তাহা হইলে পুরোহিতঠাকুর সহজে নামিতে পারিবেন।"

নাবিকগণ নৌকা ফিরাইয়া চলিয়া গেল, কিয়ৎক্ষণ পরে বলদেব ও কেদারের সহিত মহাপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মা সুস্থদেহে ও শুষ্কপদে গোকর্ণের দুর্গতোরণে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে উদ্ধবঘোষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। গৌড়ের মহাপুরোহিত দুর্গাভ্যন্তরে একটি কক্ষে আসন গ্রহণ করিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

সংবাদ গুরুতর!—আবার যুদ্ধ উপস্থিত, গৌড়েশ্বর হৃতসর্ব্বস্ব কান্যকুব্জরাজকে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই আক্রোশে তাঁহার খুল্লতাত গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; গৌড়েশ্বর সসৈন্য সামন্তরাজদিগকে আহ্বান করিবার জন্য চারিদিকে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রায়ুধ মণ্ডলাদুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন।

শুষ্ককণ্ঠে উদ্ধবঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে বিবাহ? প্রভুভক্তিপরায়ণ বৃদ্ধ মনে করিয়াছিলেন যে এইবার তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইবে, কল্যাণীদেবীর বিবাহ হইবে। পুরুষোত্তম ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "মহাশয়, মহাদেবী বিবাহের দিনস্থির করিয়া আমাকে গোকর্ণে পাঠাইতেছিলেন। যেদিন আমি যাত্রা করিব, সেই দিনই প্রভাতে একজন অশ্বারোহী আসিয়া সংবাদ দিল যে মণ্ডলাদুর্গ অবরুদ্ধ। অমনই গর্গদেব, আর সেই নেড়া মহারাজকে ধরিয়া পাঠাইয়া দিল। সে বেচারীর বিবাহের পূর্ব্বে যাইবার কোন ইচ্ছাই ছিল না।"

উদ্ধবঘোষ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছিল, দুর্গস্বামিনীর কর্ণে পৌঁছিল, কল্যাণীদেবীর নিকট পৌঁছিল। গ্রন্থকার অবগত আছেন সে সংবাদ শ্রবণে গোকর্ণদুর্গের নিভৃততম কোণে একটি কোমল অন্তস্থল হইতে হতাশার সুদীর্ঘশ্বাস নির্গত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শীতের প্রারম্ভে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারি পাঁচজন মনুষ্য পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে। ভারতের পুরাতন রাজধানী তখন জনমানবশূন্য, ঘনবনে আচ্ছন্ন ও শ্বাপদগণের আবাসভূমি। চারিদিক ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন, পাষাণাচ্ছাদিত রাজপথ শ্যামল তৃণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, পথের উভয় পার্শ্বে ঘন বন, বৃক্ষরাজির মধ্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর, প্রস্তরস্তম্ভ বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে রাজপথের পার্শ্বে শৈবালাচ্ছ

পুষ্করিণী, অথবা কুমুদকহ্লারবনে আবৃত দীর্ঘিকাও দেখা যাইতেছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে মগধের রাজধানী, উত্তরাপথের রাজধানী, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী পাটলিপুত্র-নগরের এই অবস্থা হইয়াছিল। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় রাজগণ কোটি কোটি সুবর্ণব্যয়ে যে পাটলিপুত্রনগর সুশোভিত করিয়াছিলেন, তাহা এই আখ্যায়িকার সময়ে ভীষণ বনে আচ্ছাদিত হইয়া ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শৃগালের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

চারিদিক নিস্তব্ধ, পান্থগণ নীরবে পথ চলিতেছিল, তাহারা বোধ হয় মহানিদ্রামগ্ন প্রাচীন রাজধানীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহস করিতেছিল না। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্য্যন্ত সৌধমালার ধ্বংসাবশেষ এবং মহাকায় মহীরুহগণের স্নিগ্ধশ্যামল পত্রাবলী ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাচীন দিল্লী নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছেন, অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশাল গৌড়নগরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই সম্যকরূপে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে পাটলিপুত্রের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

যাইতে যাইতে পথিকগণের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, আর কতদূর এইরূপ আছে?" দ্বিতীয় পান্থ কহিল, "এখনও পাঁচ ক্রোশ।"

"এই পাঁচক্রোশের মধ্যে কি মানুষের বসতি নাই?"

"না, মহামারীতে দেশ শূন্য হইয়া গিয়াছে।"

"এখন এখানে কেহ বাস করিতে আসে না কেন?"

"এখন আর এখানে মনুষ্যের বসতি অসম্ভব, প্রাচীন মহানগরের ধ্বংসাবশেষ বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রাত্রিকালে বাস করিলে মনুষ্যও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়, সেই জন্য ভয়ে কেহই এখানে রাত্রিবাস করিতে চাহে না।"

"কতদিন এইরূপ হইয়াছে?"

"বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি, মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক পুরাতন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, কর্ণসুবর্ণে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার পরেও প্রাচীন নগরে দুই চারি ঘর মনুষ্যের বসতি ছিল, চন্দেল্ল যশোবর্ম্মা তাহার পরে নগর ধ্বংস করিয়া গিয়াছে। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা মহামারীতে মরিয়া গিয়াছে, অথবা ভয়ে পলায়ন করিয়াছে।"

প্রথম পথিক আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নীরবে চলিতে লাগিল। তাহাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবিতেছিস্?" প্রথম পান্থ কহিল, "ভাবিতেছি, আমাদের গৌড় নগরও হয়ত একদিন এইরূপ হইবে।"

"হয়ত হইবে।"

অষ্টম শতাব্দীর গৌড়বাসীগণ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সহস্র বর্ষ পরে গৌড়নগরের যোজনব্যাপী মহাশ্মশানে মানবের আবাস থাকিবে না; ধর্ম্মপাল, দেবপাল, মহীপাল ও রামপালের রাজধানীতে সাঁওতালজাতি বনমধ্যে নূতন গ্রাম স্থাপন করিবে, তাহাও কালের করালগ্রাস অতিক্রম করিতে পারিবে না।

কিয়ৎক্ষণ পরে অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "অশ্বারোহী সেনার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেছি না, তাহারা কোথায় গেল, সকাল বেলায় অনেক পথ চলিয়া আসিলাম, বেলা বাড়িয়া গেল, কখন মহারাজের জন্য শিবির সংস্থাপন করিব?" প্রথম পান্থ কহিল, "তাহারা হয়ত নগরের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করিয়া আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।"

"নগরের ধ্বংসাবশেষ পার হইতে হইলে এখনও পাঁচক্রোশ পথ চলিতে হইবে? ততক্ষণ মধ্যাহ্ন অতীত হইবে, বস্ত্রাবাস লইয়া যে শকটগুলি আসিতেছে, সেগুলি কখনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারিবে না।"

"তবে কি করিব?"

"দেখ ভাই, বিমলনন্দী শোণের তীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছেন; মহারাজের শরীররক্ষীসেনা নিশ্চয়ই ততদূর অগ্রসর হইয়া যায় নাই। শোণ এখান হইতে কতদূর?"

"শোণের পুরাতন গর্ভ এখান হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূর, কিন্তু তাহাতে এখন জল নাই। শোণ এখন বহুদূরে

সরিয়া গিয়াছে। নূতন শোণ-সঙ্গম এখান হইতে পনর-ষোল ক্রোশ হইবে।"

"এই ষোল ক্রোশের মধ্যে কি জনমানবের বসতি নাই ?"

"আছে, মহানগরের ধ্বংসাবশেষের বাহিরে বহু ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। শরীররক্ষী সেনাদল যদি নিকটে কোথাও রাত্রিবাস করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা গঙ্গাতীরে আছে।"

"তবে চল আমরা গঙ্গাতীর ধরিয়া যাই।"

"কিন্তু শকটগুলি আসিবে কি করিয়া ?"

"এখানে একজনকে রাখিয়া যাই।"

কিন্তু কেহই একাকী সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে সম্মত হইল না, অগত্যা দুইজনকে সেইস্থানে রাখিয়া অবশিষ্ট তিনজন গঙ্গাতীরে গমন করিতে প্রস্তুত হইল। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "গঙ্গাতীরের পথ চিনিব কি করিয়া ?"

"কেন ? এই ডাহিন দিকের পথ ধরিয়া গেলে গঙ্গাতীরে পৌঁছিব ?"

"তুই কেমন করিয়া জানিলি ভাই ?"

"আমরা যে পথ ধরিয়া চলিতেছি, ইহাই বারাণসী ও প্রতিষ্ঠানের পথ। আমরা পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে চলিয়াছি, গঙ্গা উত্তরদিকে, সুতরাং আমাদিগের ডাহিনের পথ ধরিয়া গেলে গঙ্গাতীর পাইব। তুই যদি বনমধ্যে পথ ভুলিয়া যাস, তাহা হইলে তোর কি দশা হইবে ?"

"দেখ ভাই, বনের মধ্যে, কি মাঠের মাঝখানে সূর্য্য দেখিয়া দিক নির্ণয় করিতে পারি; কিন্তু এখানে মনে হইতেছে যে আমি যেন বিস্তীর্ণ মহানগরের শতদিকে প্রসারিত রাজপথসমূহের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি। চাহিয়া দেখ, সত্য সত্যই চারিদিকে শত শত রাজপথ, যেখানে বন নাই, সেই স্থানই পথ, পথের পাষাণাচ্ছাদন ভেদ করিয়া এখনও বড় বড় গাছ জন্মায় নাই। সকল পথের দুইপাশে সারি সারি গৃহ, সুতরাং ভুল হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে।"

পথিকত্রয় উত্তর দিকের পথ অবলম্বন করিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নগরের ধ্বংসাবশেষ পশ্চাতে রাখিয়া তাহারা গঙ্গাবক্ষের প্রশস্ত বালুকাক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে একটি প্রাচীন ঘাটের পার্শ্বে শতাধিক অশ্বারোহী-সেনা বস্ত্রাবাস স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা তাহাদিগকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিল এবং তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে একজন সেনা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কোথায় যাইতেছ ?" পথিকত্রয়ের মধ্যে একজন কহিল, "কে, জয়নাগ নাকি ?" সৈনিক কহিল, "হাঁ। তুমি কে ?"

"চিনিতে পারিতেছ না ? আমি হরিমোহন।"

ইত্যবসরে পান্থত্রয় স্কন্ধাবারের নিকটবর্ত্তী হইল। হরিমোহন জিজ্ঞাসা করিল, "জয়নাগ, পথে শত্রুসেনার দেখা পাইয়াছিলে ?" জয়নাগ কহিল, "উদ্দন্তপুরের দুর্গ ছাড়িয়া আসিয়া একজনও অস্ত্রধারী মানুষ দেখি নাই, শত্রু ত দূরের কথা।"

"কনোজিয়ারা নাকি ভারি বীর ? তাহারা গেল কোথায় ?"

"তাহারা একবার সাহস করিয়া মণ্ডলাদুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু বিমলনন্দীর সেনা দেখিয়া তাহারা যে কোথায় পলাইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। তাহারা বোধ হয় একেবারে দেশে ফিরিয়াছে, কেহই তাহাদিগের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিতেছে না।"

"বিমলনন্দী কোথায় ?"

"তিনি শোণ-সঙ্গমে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া মহারাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাহার সহিত পাঁচসহস্র সেনা আছে, তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলে যে পঞ্চসহস্রসেনা লইয়া স্বর্গীয় মহারাজ গোপালদেব মরুবাসী গুর্জ্জরদিগকে বরেন্দ্রভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং পঞ্চসহস্র সেনা অনায়াসে বারাণসী ও চরণাদ্রি অধিকার করিতে পারিবে। কিন্তু বিমলনন্দী মহারাজের আদেশ ব্যতীত শোণ পার হইতে পারিতেছেন না।"

"মহারাজের সেনা দুই একদিনের মধ্যে শোণ-সঙ্গমে পৌঁছিবে।"

"মহারাজের সঙ্গে আর কে কে আসিলেন ?"

"গৌড়ের সকলেই আসিয়াছেন। মহাকুমার বাক্‌পাল দেব ও মহামাত্য গর্গদেব গৌড়নগরে আছেন। উদ্ধারণ-পুরের কমলসিংহ, দণ্ডভুক্তির রণসিংহ, ঢেক্করীর প্রমথসিংহ, দেবগ্রামের বীরদেব, পদুবন্বার জয়বর্দ্ধন গৌড় হইতে মহারাজের সঙ্গে আসিয়াছেন। উদ্দণ্ডপুর হইতে বুড়া ভীষ্মদেবঁও মহারাজের সঙ্গে আসিয়াছেন। এইবারে বোধ হয় যুদ্ধটা ভাল করিয়া বাধিবে।"

"হরিমোহন, তুমিও যেমন পাগল। শত্রু কোথায় যে যুদ্ধ বাধিবে? শুনিলাম তীরভুক্তির সামন্তগণ দলে দলে বিমলনন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের মহা-রাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। মহারাজ কখন আসিবেন?"

"বোধ হয় মধ্যাহ্নভোজনের সময়ে।"

দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইলে, দুই তিনখানি শকট বস্ত্রাবাস লইয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবিলম্বে গঙ্গাতীরে বট ও অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় বহু বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইল। হরিমোহন ও তাহার সঙ্গীগণ রন্ধনে ব্যাপৃত হইল। তৃতীয় প্রহরে পঞ্চসহস্র অশ্বারোহীর সহিত ধর্ম্মপালদেব ও গৌড়ীয় সামন্তগণ আসিয়া পৌঁছিলেন; তাঁহারা স্নানাহার করিয়া তৎক্ষণাৎ বিমলনন্দীর স্কন্ধাবারে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বদিনের শত শরীররক্ষী সেনা তাঁহাদিগের সহিত চলিয়া গেল, অবশিষ্ট সেনা সেইস্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

(২)

সি ঞ্চ ন -সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক বলিয়াছি। আরো কিছু বলিবার থাকিয়া গিয়াছে, তাহাই বলিতেছি। ধর্ম্মসিন্ধুকারও লিখিয়াছেন—"পঞ্চগব্যৈঃ পঞ্চামৃতৈশ্চ সর্ব্বতঃ সি ঞ্চ ন ম্" (৩৩৯ পৃঃ, জনার্দ্দন-মহাদেব-কৃত দ্বিতীয় সংস্করণ, বোম্বাই, "পালাশ-প্রতিকৃতিদাহ-বিধি)"। ব্রহ্মপুরাণে (১০৮, ১১৯) রহিয়াছে অ সি ঞ্চ য় ৎ =অসেচয়ৎ)। প্রাচীন বাঙ্‌লায় গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন:

"রহি সম্বাদ সুধারস সি ঞ্চ নে
তনু তিরপিত করু মোর।"

বৈষ্ণবপদাবলী (বসু), ২১২ পৃঃ।

বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন: -

"নিরমল গৌর প্রেমরস সি ঞ্চ নে।"
"ইহ সব ভুবনে প্রেমরস সি ঞ্চ নে।"

গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৭, ৮।

হিন্দীতেও সি ঞ্চ ন পদের বহু প্রচলন আছে। তুলনীয়—লি ম্পি ভিঃ (=লেপিভিঃ) সোমদেব-সূরি-কৃত যশস্তিলকচম্পু (নির্ণয়সাগর), পূর্ব্বখণ্ড, ৩ আশ্বাস, ৫৪০ পৃঃ। নি কৃ ন্ত না ৎ (=নিকর্ত্তনাৎ) —খাদিরগৃহ্যসূত্র, ২,২,৩৩। আবার হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব্ব, ৬৩-১২৩) উ ৎ কৃ ন্তি ত (= উৎকৃত্ত)।

এইবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা। তিনি উ ভ চ র উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে দোষ হইয়াছে কি? সংস্কৃতে উ ভ য় এবং উ ভ এই দুই শব্দই আছে। প্রথমে উ ভ য়, এই একটিই ছিল, তাহার পর প্রাকৃতপ্রভাবে তাহাই উ ভ হইয়া পড়িয়াছে; যথা, উ দ ক হইতে (উ দ য় অথবা উ দ অ, এবং ইহা হইতে) উ দ শব্দ সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে, এবং পাণিনি ও তাঁহার অনুচরগণকে উ দ কু ম্ভ, উ দ পা ন, ক্ষী রো দ -প্রভৃতি পদ সাধি-বার জন্য কতকগুলি নিয়ম করিতে হইয়াছে (পাণিনি, ৬,৩,৫৭-৬০)। কি স ল য় শব্দ যেমন প্রাকৃতে কি স ল হয়, হৃ দ য় যেমন প্রাকৃতে হি য় হয় (হেমচন্দ্র, ৮,১,২৬৯), * ঠিক সেইরূপেই উ ভ য় শব্দ উ ভ হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। উ ভ য় শব্দ প্রাকৃতপ্রভাবে উ ভ অ, এবং ইহা হইতে আবার উ ভা হইয়াছে। যেমন হৃ দ য় হইতে হি য় অ, এবং হি য় অ হইতে বাঙ্‌লায় হি য়া। ললিতবাবুর দ ত্তজা, মি ত্রজা প্রভৃতি (১৪ পৃঃ) আলোচনার সময় এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা যাইবে। এই উ ভা শব্দ সংস্কৃতের সহিত বহু স্থানে মিশিয়া গিয়াছে। যথা, উ ভা বা হু, উ ভা পা ণি, ইত্যাদি। আবার এই সাদৃশ্যেই উ ভ য়া বা হু, উ ভ য়া-পা ণি, ইত্যাদিও হয়। দ্রষ্টব্য—পাণিনি, ৫, ৪, ১২০। সংস্কৃতে উ ভা ঙ্গু লি পদও আছে। ইহা উ ভ + অ ঙ্গু লি হইতে হইয়াছে অথবা উ ভা + অ ঙ্গু লি হইতেও পারে। কিন্তু বৈয়াকরণিকগণ উ ভা বা হু প্রভৃতির সঙ্গে ইহাকেও এক সূত্রে গ্রন্থন করিয়াছেন। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উ ভ চ র দেখিয়া আমাদের চঞ্চল হইবার কারণ নাই।

এইবার ম না ন্ত র। এই পদটি যে, খাঁটী সংস্কৃতে ম নো ন্ত র হইবে, তাহা জানিবার শক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে, যথেষ্ট ছিল, ইহা বলা বাহুল্য। তথাপি তিনি ইহা লিখিলেন কেন? ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে; (১) প্রথম, কারণ নির্দ্দেশ না করিলেও তাঁহার মতে বাঙ্‌লায় ঐ শব্দের প্রয়োগ দূষণীয় নহে; (২) দ্বিতীয়, তাঁহার অনিচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে ভাষাপ্রবাহের মধ্যে তাহা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যে-কোন পক্ষই গ্রহণ করা যাউক না, আমাদের এখানে ভাবিবার বিষয় আছে। যদি তাঁহার মতে উহা দূষণীয় নহে, তবে তাহার কারণটি কি আমাদিগকে অন্বে-ষণ করিতে হইবে। আর যদিই বা তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাহা বাহির হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে ইহারই বা কারণ কি? যিনি এত সংস্কৃতময় সাধুভাষা লিখিতেছেন, তাঁহার লেখনীতে এরূপ শব্দ বাহির হইল কেন? তাঁহার হৃদয়ে এরূপ শব্দ প্রেরণ করিল কে? ইহা আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

* কি স ল য়, কি স ল অ; হি য় য়, হি য় অ, হি অ অ; এই-সকল পদও প্রাকৃতে আছে।

আমাদের কথ্য ভাষায় বঙ্গের সমস্ত প্রদেশেই, এমন কি সংস্কৃতজ্ঞেরও মুখে ম না স্ত র শুনিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকসমূহের মধ্যে যাহারা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের সকলেই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা পড়িয়া ইহা লিখিয়াছে, একথা বলিতে পারা যায় না। সম্প্রতি কোনো সাহিত্যের প্রয়োগ উল্লেখ দেখাইতে না পারিলেও, এই ঘটনাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্ব হইতেই বাঙলা ভাষায় ঐ শব্দটি চলিয়া আসিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আর-আর লোকের ন্যায় ইহার সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন, এবং সেই সূত্রে তাঁহার লেখার মধ্যে ইহা আসিয়া পড়িয়াছে। পালিতে মনোজ্ঞ-অর্থে ম না প (মনস্ + আপ ; আপ্ ধাতু) শব্দ অতি প্রসিদ্ধ। উদীচ্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার স্থানে লিখিত হয় ম ন আ প (দিব্যাবদান, ৩৭ পৃ, Cowell and Neil), আবার বহু স্থলে খাঁটী ম না প শব্দই লিখিত হইয়া থাকে; যথা, "প্রিয়ো ম না প শ্চ ;" "যো মে গজেন্দ্রো দয়িতো ম না পঃ ;" (ঐ ৭৪ পৃঃ ইত্যাদি)। গা থা য় ইহার বহু প্রয়োগ আছে।

পালির ম না প যেরূপে হইয়াছে, বাঙলার ম না স্ত র ও সেইরূপে হইয়াছে। কিন্তু এই রূপটি কি? রূপটি এই যে, পালিতে যেমন ম ন স্ শব্দ নাই, তাহার স্থানে ম ন (অকারান্ত) আছে, খাঁটী বাঙ্‌লাতেও সেইরূপ সংস্কৃতজ ম ন শব্দই আছে, ম ন স্ নাই। সেইজন্যই আজিও সভ্য-অসভ্য সকলেই আমরা কথ্য ভাষায় বলিয়া থাকি—ম ন মোহন, ম নো মোহন বলি না, যদিও লেখ্য ভাষায় লিখিয়া থাকি। বিদ্যাপতিও (১০৮ পদ, পরিষৎ) এইরূপ লিখিয়াছেন —"তুহু ম ন মো হ ন কি কহব তোয়।" অধিক কি, আমরা ত সর্ব্বত্র ম ন শব্দই বলিয়া থাকি, অবশ্য ম নঃ পীড়া প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ বাদে। 'তোমার ম নঃ ভাল আছে ত?' এরূপ কেহই বলে না। কি করিয়া বলিবে? খাঁটী বাঙ্‌লাতে যে, তাহার অস্তিত্বই নাই। প্রাচীন বাঙলায় চণ্ডীদাস প্রভৃতির লেখায় কেহ ইহা দেখাইয়া দিলে কৃতজ্ঞ থাকিব। একথাটা যেমন বাঙলার পক্ষে, হিন্দী মৈথিলীরও পক্ষে সেইরূপ। পালিতে যেমন বিসর্গ মোটেই নাই, প্রাকৃতেও যেমন অতিঅল্প কয়েক স্থলে বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতে ব্যাকরণ-অনুসারে থাকিবার কথা থাকিলেও বস্তুত প্রায়ই সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, খাঁটী হিন্দী ও মৈথিলীতেও যেমন ইহা দেখা যায় না, খাঁটী বাঙল্যাতেও সেইরূপ ইহার মোটে স্থান নাই। দুঃখ, আর পুনঃ এই দুইটি শব্দে প্রাচীন বাঙ্‌লায় বিসর্গ থাকিবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পদকর্ত্তাদের পদে বস্তুত তাহা নাই। আমাদের গ্রন্থসংস্কারক মহাশয়গণ নিজ-নিজ প্রকাশিত পুস্তকে দু খ স্থানে দুঃ খ, এবং পু ন কিংবা পু নু স্থানে পু নঃ বসাইয়াছেন। বিদ্যাপতির সাধারণ সংস্করণে যেখানেই এই দুঃখ পুনঃ দেখিয়া সন্দেহ হইয়াছে, পরিষদের সংস্করণে তখনই মিলাইয়া তাহা দূর করিয়া লইয়াছি। বস্তুতও বিচার করিয়া দেখিলে আমাদের কথ্য ভাষায় বিসর্গের উচ্চারণ অস্বাভাবিক বোধ হয়। অস্বাভাবিক বলিয়াই ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার মূলভূত পালি-প্রাকৃতে তাহা অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার স্থান অন্যে অধিকার করিয়া লইয়াছে। সংস্কৃত ভাষা কখনো কথ্য ছিল না। (ইহাই আমার মত, পালিপ্রকাশের ভূমিকায় এসম্বন্ধে আমার যুক্তি দেখাইয়াছি)। এইজন্য তাহাতে বিসর্গের বহুল প্রচার আছে। কিন্তু ভাষা লে খ্য হইলেও তাহা কেবল লিখিতই থাকে না, তাহা পাঠও করিতে হয়। এই পাঠের সময় পাঠক নিজের অভ্যস্ত কথ্য ভাষার প্রভাবকে একেবারে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। এইজন্য তাহার লেখ্য ভাষায় বিসর্গ থাকিলেও কথ্য ভাষার প্রভাবে সে তাহা লোপ করিয়া বা রূপান্তর করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে পাঠ-অনুসারে লেখাও আরম্ভ হয়, এবং তাহার পর লোপ বা রূপান্তরের নিয়ম বা সূত্র ব্যাকরণে গিয়া উঠে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ও সাহিত্যে ইহার প্রচুর উদাহরণ আছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু হউক না কেন ব্যাকরণ, ইহা ভাষার সমস্ত শব্দকে একবারে ধরিতে পারে নাই, আর পারেও না। কথ্য ভাষার প্রভাবে অভিভূত হইয়া লেখক বহু সময়ে আর ঐ ব্যাকরণের নিয়ম মনে রাখিতে পারে না। সংস্কৃত-ব্যাকরণ সৃষ্টির পূর্ব্বের ও পরের ভাষাই আমাদিগকে ইহা বলিয়া দিতেছে। পালিপ্রকাশের ভূমিকায় (৮৪-৮৬ পৃঃ) ইহার অনেক উদাহরণ দিয়াছি, আরও কতকগুলি এখানে দিব। আজকাল বাঙ্‌লায় এই বিসর্গ ব্যবহার অনেক স্থলে অনাবশ্যকভাবে বাড়িয়া উঠায় ভাষার মাধুর্য্যহানি হইতেছে, অনুচিতও হইতেছে, সেইজন্য এই বিষয়টা একটু বিশেষরূপে আলোচনা করা দরকার। বৈদিক সাহিত্যে ইন্ধনবাচী এ ধ স্ আছে (অথ,স, ৭-৮৯-৪ ; ১২-৩-২), আবার স্ লোপ করিয়া এ ধ শব্দও হইয়াছে (ঋ,স, ১০-৮৬-১৮, ইত্যাদি)। ইহা হইতে পরবর্ত্তী সংস্কৃতে ঐ উভয় শব্দই অবাধে চলিতেছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০-১) * অ স্ত স্য (= অন্তসঃ) লিখিত হইয়াছে, অথচ অ ন্ত স্ (ঋ,স, ১০-১২৯-১) সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। মস্তকবাচী শি র স্ হইতে শি র হওয়ার উল্লেখ ও উদাহরণ পালিপ্রকাশে দিয়াছি, আরো কিছু দেওয়া যাউক। আপস্তম্ব ধর্ম্ম-সূত্রে (১-২৪-২১) শ ব শি র ধ্ব জ উক্ত হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র উপনিষদের নামই করা হইয়াছে শি রো প নি ষ ৎ। আবার নারদ-ধর্ম্মশাস্ত্রে শি রো প স্থা যি ন্। মহাভারতে (শান্তি, ৪৬-৭৫— মধ্ববিলাস-যন্ত্রালয়, কুম্ভকোণম্) রহিয়াছে তে জা ত্ম নে (= তেজ আত্মনে)। ভাগবতে (১০-৭২-১২) তে জো প বৃং হি ত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (১০-৪৪) ম নো স্ম না য়, অগ্নিপুরাণের (১৪৭-১৩ ; ৩০৪-২১ ; ৩১৩-৩১) ম নো স্ম নী, এবং প্রাকৃতাভিজ্ঞ মহাকবি রাজশেখরের বাল-ভারতে (১ম অঙ্ক, ৩২ ; কাব্যমালা— নির্ণয়সাগর) ম নো ম্মা দ ভূঃ দ্রষ্টব্য। ভাগবতে (২-৬-৪৪) র ক্ষো র গ (= রক্ষ উরগ) এবং রামায়ণে (৭-৪২-২১) অ প্স-রো র গ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। উ র গ (উরস্ + গ ; গম্ ধাতু), উ র ঙ্গ, উ র ঙ্গ ম, এবং উ র সা রি কা (সুশ্রুত, ২-২৮৭-১৪) শব্দ দ্রষ্টব্য। র জ স্ হইতে র জো প ম, র জো ৎ স ব প্রভৃতি শব্দও সংস্কৃতে ঢুকিয়াছে। †

অ স্ ভাগান্ত শব্দের স-জাত বিসর্গ ছাড়িয়া এখন অপর বিস-র্গের লোপ দেখাইব। চ ক্ষু স্ শব্দ বৈদিক সাহিত্যেও সুপ্রসিদ্ধ (ঋ-স-১-২২-২০, ইত্যাদি), কিন্তু আবার চ ক্ষু শব্দও তাহাতে স্থান পাইয়াছে। চ ক্ষু ষঃ স্থানে উক্ত হইয়াছে চ ক্ষোঃ (ঋ-স-১০-৯০-১৩)। আবার অথর্ব্ব বেদে (৪-২০-৫ ; ১৯-৩৫-২) স হ স্র-চ ক্ষো। এইরূপেই আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে (১১-২৭-১৭) চ ক্ষু-নি রো ধ, এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২-১০) চ ক্ষু পী ড় ন দেখিতে পাওয়া যায় (ললিত বাবুর প্রদর্শিত চ ক্ষু ল জ্জা, চ ক্ষু দা ন শব্দ স্মরণীয়), এবং ভাগবতে (১০-৫৭-২৯) দেখিতে পাওয়া যায় শ ত ধ নু। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১-৮-৪,৫) আবার চ তু র্ শব্দকে

---

* "আনন্দাশ্রম-সংস্করণ, ৭৮৪ পৃঃ ; "অ স্ত স্য পারে ভুবনস্য মধ্যে ......।

† See M. M. Williams: Sanskrit English Dictionary, p. 863, col. 1.

চতু করা হইয়াছে। দিব্যাবদানে (পৃঃ ৩ ইত্যাদি) স র্পি ম ও (=সর্পির্ম্ও) দেখা যায়, এবং বরাহমিহিরের যোগযাত্রাতেও স র্পি প্রবেশলাভ করিয়াছে। শো চি স্ শব্দ বেদেও সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু অথর্ব্বসংহিতায় (১৮-২-৯) এক স্থানে ইহা শো চি (স্ত্রীলিঙ্গ) হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে গাথার উল্লেখ করিলাম না, কেননা তাহাতে এরূপ শব্দ অনেক রহিয়াছে। *

অনুসন্ধান করিলে এই তালিকাকে আরো বৃহত্তর করিতে পারা যায়, কিন্তু এখানে ইহার আর প্রয়োজন নাই। যে শব্দগুলি প্রদর্শিত হইল তাহাদেরই দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, পালি-প্রাকৃত-গাথার প্রভাবে প্রাদেশিক ভাষার কথা দূরে, সংস্কৃতেরও বিসর্গ-গুলি কিরূপ অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে যেখানে বিসর্গের লোপ হইবার কথা, অথচ হয় নাই, তাহাই দেখাইলাম। নিয়মানুসারে যে-যে স্থানে লোপ হইবে, তাহার উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে উচ্চারণের সৌকর্য্যেই ভাষায় ঐরূপ লোপ হইয়াছে, এবং তাহার পর ব্যাকরণে নিয়ম করা হইয়াছে।

বিসর্গকে লোপ করিয়া অনেক স্থলে ওকার উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। পালি-প্রাকৃতে ইহা অতিপ্রসিদ্ধ। ম নঃ পালি-প্রাকৃতে হইবে ম নো, দে বঃ হইবে দেবো, সঃ হইবে সো। সংস্কৃতেও এইরূপ হয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় চতুর্থাদি বর্ণ পরে থাকিলে; কিন্তু পালি-প্রাকৃতের এরূপ বাঁধাবাঁধি নাই, সর্ব্বত্রই হইতে পারে, সকার প্রভৃতি পরে থাকিলেও হইবে, যেমন সো স ক্কো (= সঃ শক্রঃ) ইত্যাদি। † এই নিয়ম অনুসারে ম নঃ শি লা—ম ণো সি লা কিংবা ম ণ সি লা উভয়ই ‡ হইতে পারে। অ য়ো ক ম্ম (= অয়ঃকর্ম্ম) লিখিলে ভুল হয় না। ত পো ক ম্ম (= তপঃকর্ম্ম) লিখিলে ভুল হয় না। আবার ম ণো হ র, ম ণ হ র; স রো রু হ, স র রু হ; এইরূপ উভয়ই হইতে পারে। কর্পূরমঞ্জরীতে (৩-২৯) আছে—

"দিসবহুতংসো
ন ভ-স র-হংসো।"
দিগ্বধূত্তংসো নভঃ সরো হংসঃ।

পালি-প্রাকৃত ব্যাকরণে এইরূপ প্রযোগের সমাধান বা বিধান আছে। দ্রষ্টব্য—হেমচন্দ্র, ৮-১-১৫৬; শুভচন্দ্র (পুঁথী), ১-২-১৫৬; মার্কণ্ডেয়, ৪-৬; শব্দনীতি (সিংহল), সূত্র ৩৭৫, পৃঃ ৫৮৩, "মনোগণ"—পৃঃ ৮১।

এইবার প্রাচীন বাঙ্‌লা হইতে কয়েকটা পদ দেখাইব:

"ঝলকত অঙ্গকিরণ ম ন র ঞ্জ ন।"
নরহরি, গৌরপদতরঙ্গিণী, ২৬৩ পৃঃ।

* "যথা ন ভে" (=নভসি), লঙ্কাবতার, ৯১ পৃঃ, "যথ বিজ্জু নভে," ললিতবিস্তর, ২০৬; ইত্যাদি। ললিতবিস্তর, শিক্ষাসমুচ্চয় প্রভৃতি একটু দেখিলেই বহু শব্দ পাওয়া যাইবে।

† ইহা হইতেই হইয়াছে:-

আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নিরাশ।"
"সো সব অব গুণ ঢাকল একল পিক।"
বিদ্যাপতি (বসু) ১৯ পদ।
"সো ব্রজনন্দন হৃদয় আনন্দন।" ঐ, ২০।

‡ ম ণং সি লা পদও হয়।

"তুহু ম ন মো হ ন।"
বিদ্যাপতি, (পরিষৎ), ৬৯ পৃঃ।

"অলকাবলিত মুখ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ
কামিনী-জনের ম ন ফাঁ দ।"
জ্ঞানদাস (বসুমতী), ১৭৫ পৃঃ।

"তবহি মনহি ম ন পূ র।"
বিদ্যাপতি (বসুঃ), ২৬ পৃঃ।

"মনমথ-মন্ত্র পড়াওল দুহু জনে
পূরল দুহু ম ন কা ম।"
ঐ (পরিঃ) ৩২৭ পৃঃ।

বিদ্যাপতি কহ নটবর-শেখর
সাধি চলল ম ন কা ম।" ঐ।

"পূরল কানু ম ন কা ম। ঐ, ৩২৬ পৃঃ।

"উ র জ (উ রো জ নহে) উপর মব দেওল দীঠ।"
বিদ্যাপতি (পরিঃ) ৩২৬ পৃঃ।

পদকর্ত্তারা অনেকেই উ র জ প্রয়োগ করিয়াছেন। *

এখন ললিতবাবুর প্রদর্শিত ৫৮-৫৯ ও ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠার পদগুলি (যথা, কৃ শ শ কা হি নী, চ ঞ্চ ল জ্জা, শি র শো ভা, ম ন চো রা, ম না-গু ন, ম নো সা ধ, ম নো অ খ, ইত্যাদি) চিন্তনীয়।

পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইল তাহাতে বুঝা যাইবে যে, ভাষার যে ধারা (অর্থাৎ পালি-প্রাকৃত) বহিতে বহিতে বঙ্গভাষারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ম ন এবং ম নো দুইটি শব্দ রহিয়াছে, † ম ন স্ তাহাতে নাই। এইজন্য লেখক ইচ্ছামত ম ণ সি লা, কিংবা ম ণো সি লা লিখিতে পারে, আবার আবশ্যকরূপে সন্ধি করিয়া ম না প (মন+আপ) শব্দও লিখিতে পারে। সে কখনো ম নঃ সি লা লিখিতে পারে না। বঙ্গভাষাতেও এইরূপ প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে। বেশীর উপর ইহাতে আর একটি প্রয়োগ আছে। ইহা খাঁটী সংস্কৃত শব্দ। আলোচ্য শব্দসমূহ-সম্বন্ধে পালি-প্রাকৃতে যেরূপ প্রয়োগ আছে, বঙ্গভাষা তাহা ত প্রয়োগ করিতেই পারে, ‡ আবার সংস্কৃতানুসারে ইহা ম নঃ শি লা ও

* ললিতবাবুর উদ্ধৃত (৫৯ পৃঃ) "পিণ্ডং দদ্যাদ্ প য়া শি রে" (বায়ুপুরাণ, ১১০-২৫) পালিপ্রকাশে ধরিয়াছি। "(পাদ্যং চ পাদয়োর্দদ্যাদ্) অর্ঘ্যং দদ্যাচ্ শি রো প রি", (ইহা কোনো তন্ত্রের বচন, বিশেষ স্থান অনুসন্ধান করিবার অবসর পাই নাই, পিতৃদেবের নিকট ইহা প্রথমে শুনি), এই শি রো প রি শব্দটি পালিতেও (শি রো প রি) প্রচলিত আছে। গোবিন্দদাস (বসু, ৩৪৯ পৃঃ) একস্থানে লিখিয়াছেন "শি র প রি থারী, যতন করি ধরলহি।" জ্ঞানদাসের কবিতায় (বসু, ১৬৬ পৃঃ) ছাপা আছে—"উ রো প র দোলে দোলা তুলসীর দাম।" "উ রো প র দুলিছে বনফুল-মালা" (১৬৫ পৃঃ)। অন্যত্র আবার বহুবার উ র প র আছে। বসুমতীর ছাপা পাঠে কতটা নির্ভর করা যাইতে পারে তাহাই বিবেচ্য। ললিতবাবু স দ্য বি ধ বা ধরিয়াছেন (৫৯ পৃঃ), এখানে জ্ঞানদাসের (বৈষ্ণবপদাবলী, ১৬৮ পৃঃ) "অঙ্গের লাবনী স দ্য চাঁ দ" দ্রষ্টব্য।

† বস্তুত এক ম ন শব্দই প্রথমা-বিভক্তি-প্রভৃতি স্থলে ম নো আকার গ্রহণ করে। সকারান্ত অন্যান্য শব্দ সম্বন্ধেও এইরূপ, বলা বাহুল্য।

‡ কিন্তু মনে রাখিতে হইবে পদটি সাধু হইলেই তাহা সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যায় না। কোন পদ প্রসিদ্ধ হইলেও পূর্ব্বাচার্য্যেরা যদি তাহা আদর না করিয়া থাকেন, তবে তাহার প্রয়োগ শোভন

লিখিতে পারে। যদি কেবল সংস্কৃতের দিকে তাকাইয়া ম ন চো র বা ম নো চো র প্রভৃতি শব্দকে বঙ্গভাষার সীমা হইতে উড়াইয়া দিবার জন্য দণ্ডহস্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা হইলে কেবল ঐ শব্দটিকে তাড়ান হইবে না, বঙ্গভাষার প্রাণটুকুকেও আক্রমণ করা হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। খাঁটী সংস্কৃত শব্দও বাঙলায় প্রয়োগ করা যখন বিহিত আছে, তখন লেখক নিজের ইচ্ছামত রচনার সৌন্দর্য্য অব্যাহত রাখিয়া ম ন শ্চো র ও লিখিতে পারেন, কিন্তু ম ন চো র, কিংবা ম নো চো র-লেখককে কেহ অবজ্ঞা করিতে পারেন না; কেননা অবজ্ঞার কোন কারণ নাই। এবং এইরূপেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ম না ন্ত র দেখিয়াও আমাদের শিহরিয়া উঠিবার কারণ নাই।

এইজন্যই মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন সংস্করণের স্ব প্ন-প্র য়া ণ পাঠ করিয়া আমি রসাস্বাদে কোনো ব্যাঘাত অনুভব করি নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ তৌল করিয়া ওজন করিয়া শব্দ প্রয়োগ করেন, যেখানে যেটি যেরূপ প্রয়োজন, তিনি সেখানে সেইটিকেই সেইরূপেই প্রয়োগ করিবেন। এইজন্য তাঁহার এই কার্য্যে আমরা দেখিতে পাই তিনি প্রয়োজনানুসারে সংস্কৃত-বাঙ্‌লা হিসাবে নানারূপে ম ন স্ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়োগগুলি নির্দ্দেশ করিতেছি:—

১। ম নো হ র (৫৩ ইত্যাদি), ম নো রা জা, (৫) ম নো জ্বা লা (৭১), ম নো বা ঞ্ছা (১৪৬), মনঃ (৭১)।

২। ম নো দুঃ খে (৭২), ম নো মা ঝে (৮৮)।

৩। ম ন উ ন্মা দি নী (৬১)।

৪। ম নো অ শ্ব (১৯), ম নো অ ভি রা ম (১৪৩)। *

৫। ম নো ক র্ণ (৩২)।

৬। ম না গু ন (১৩৫)।

বঙ্গভাষার লেখকের অভাব নাই, কিন্তু খাঁটী বাঙ্‌লা শব্দ প্রয়োগে নিপুণ লোকের সংখ্যা বেশী নাই। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিস্পর্দ্ধী হইতে পারেন এরূপ কাহাকেও জানি না। সংস্কৃতের ঝোঁকটা আজকাল বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। লেখকেরা অধিকাংশই সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগে উন্মুখ, ভয় আছে, পাছে কোন দোষ আসিয়া পড়ে। ইহার ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, অনেক বাঙ্‌লা শব্দ আর স্বচ্ছন্দভাবে প্রযুক্ত হইতেছে না। দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখায় এ অভিযোগ করিবার নাই। পাঠক একবার তাঁহার এই নূতন সংস্করণের স্ব প্ন প্র য়া ণ পড়িয়া দেখিতে পারেন। বঙ্গদেশের অনেক লোক বলিয়া থাকে ব ই শা খ (=বৈশাখ), ভ ই র ব (ভৈরব), গ উ র (=গৌর), "স উ র ভ" (=সৌরভ), "অ উ ষ ধ" (ঔষধ, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কাহারো লেখায় আজকাল এরূপ প্রয়োগ দেখি নাই (৬৫, ৭৫)। প্রাকৃতে এইরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে, ব্যাকরণে ইহার সূত্রই আছে (হেমচন্দ্র, ৮-১-১৫১, ১৬২ : শুভচন্দ্র, ১-২-১০৪, ১১২; ক্রমদীশ্বর, ৮-১-৩৭, ৪১; বররুচি, ১-৩৫,৪১; মার্কণ্ডেয়, ১-৪৩,৪৯ ত্রিবিক্রম, ১-২-১০৩, ১০৬ (২৪।২৫); চণ্ড, (২-৭,৯)। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র খুঁজিয়া তদনুসারে স উ র ভ লিখিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না, তাঁহাকে প্রাকৃত আলোচনা করিতে দেখি নাই। প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষায় যে প্রবাহ আসিয়াছে তিনি তাহাতেই ঐরূপ লিখিয়াছেন, ইহাতে কোনো কৃত্রিমতা নাই। বাঙলার খাঁটী রূপটি তাঁহার নিকট অব্যাহত ছিল বলিয়া তিনি তাহা লিখিতে পারিয়াছেন। কয়েকটি প্রাচীন উদাহরণ দিই—

> "জ উ ব ন (=যৌবন) হাথি করিঅ অবধান।"
> "খেড়হু ক উ তু কে (=কৌতুকে) ননন্দ বোধবি।"
> ধ ই র জ (=ধৈর্য্য) ধএ রহ মিলত মুরারি।"
>
> বিদ্যাপতি, (পরি) ১৩৯, ১৬৬, ১৬৮।

একটা বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। আমি তখন মধ্য ইংরাজীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমার কনিষ্ঠের ব্যারামে একটি হাতুড়ে কবিরাজ হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন 'বা উ (=বায়ু) কুপিত হইয়াছে।' আমি তখন ইস্কুলে পড়িতেছি কথাটা শুনিয়াই হাসিতে লাগিলাম, কবিরাজ বা য়ু বলিতে জানেন না! এইরূপ এখানে (মালদহে) সাধারণে প্রচলিত ম উ র (=ম য়ু র) শুনিয়াও হাসিতাম। তারপর যখন প্রাকৃত ব্যাকরণের সহিত পরিচয় হইল, তখন জানিলাম ঐ দুইটি শব্দ খাঁটী প্রাকৃত। আজকাল বঙ্গসাহিত্যে কেহ এরূপ লিখিলে 'অশুদ্ধ! অদ্ভুত!' বলিয়া অনেকেই হাসিবেন। কিন্তু প্রাচীন বাঙলায় এরূপ ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখায় এই প্রাচীন ভাবটা এখনো কতক রহিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আবার প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাউক। খাঁটী বাঙ্‌লায় বিসর্গের ব্যবহার নাই, ইহা বলিয়াছি। আলোচ্য ম ন শব্দের বাঙ্‌লার সাত বিভক্তির রূপও চিন্তা করিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। এইজন্যই বাঙলাতে ব স্তু তঃ ই, ক্র ম শঃ ই প্রভৃতি পদ লেখকের সংস্কৃতে ঝোঁক প্রকাশ করে মাত্র। ব স্তু ত ই, ক্র ম শ ই লেখাই ঠিক। শেষে ইকার না দিলেও ব স্তু ত, ক্র ম শ, এইরূপ বিসর্গহীন করিয়া লেখা যুক্তিযুক্ত, তাহা হইলেই উচ্চারণানুযায়ী হয়। বিশেষ বিশেষ স্থানের কথা স্বতন্ত্র। যেখানে আমরা খাঁটী সংস্কৃতই উচ্চারণ করিয়া থাকি, সেখানে বিসর্গের প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত, ইহার লোপ ঠিক হইবে না। যথা, শি রঃ-পী ড়া। শি র পী ড়া আমরা সাধারণত বলি না। রচনাবিশেষে যদি এইরূপ কোথাও বলিবার প্রয়োজন হয়, তবে সেখানে ইহাই অনুমোদনীয়। ললিতবাবুর প্রদর্শিত এই-জাতীয় শব্দ-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সম্প্রতি এইখানেই শেষ করা যাউক।

শ্রীবিধুশেখর ভটাচার্য্য।

হয় না। আবার পালি-প্রাকৃতে থাকিলেই যে তাহা বাঙ্‌লাতেও ব্যবহার করিতে পারা যাইবে, ইহা হইতে পারে না। দেখিতে হইবে বাঙ্‌লার প্রকৃতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য আছে কি না। বাঙ্‌লারও যে, একটা স্বাতন্ত্র্য আছে।

* পালি-প্রাকৃতেও এইরূপ হইতে পারে, বৈদিক সাহিত্যেও এতাদৃশ সন্ধি সুপ্রসিদ্ধ আছে। পাণিনিকে এজন্য সূত্রই করিতে হইয়াছে (৬-১-১১৫)। যথা, শি রো অ প শ্য ম্ (শিরোঽপশ্যম্ হইবে না)।

আশ্বাস

ধূসর ঊষর গিরি তারি ধারে ধীরি ধীরি
তনু দুটি বেণুদণ্ড কাঁপে চন্দ্রালোকে,
দোঁহারে পৃথক করে' পাষাণ রয়েছে পড়ে'
বায়ুর আশ্বাসে তবু মিলিছে পুলকে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পঞ্জাবে বাঙ্গালী উপনিবেশ

বহু প্রাচীন কাল হইতেই পঞ্জাবের সহিত বঙ্গের পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল জানা যায়। যুধিষ্ঠিরের সময়ে (১২০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ বা তাহারও বহু পূর্ব্বে) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন দিগ্বিজয়-কালে বাঙ্গালীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই বঙ্গরাজ বহুসৈন্য লইয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দুর্য্যোধনের দল পুষ্ট করিয়াছিলেন। এই সংগ্রামে কুরুক্ষেত্র যখন ভারতশ্মশানে পরিণত হয় তখন ভারতের অন্যান্য রাজার সহিত বঙ্গাধিপতিরও দেহ এখানে ভস্মীভূত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পরে অথবা পূর্ব্বে কিরাত বা বর্ত্তমান ত্রিপুরার রাজা ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের প্রপৌত্র জন্মেজয় যখন সর্পযজ্ঞ করেন তখন সর্পবশীকরণমন্ত্রকুশল বলিয়া প্রসিদ্ধ বহু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যজ্ঞস্থলে আহূত হন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আর বঙ্গদেশে ফিরিয়া যান নাই। এই-সকল বাঙ্গালীই পরে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত হন।* দিল্লী, রোহিলখণ্ড, দোয়াব প্রভৃতি অঞ্চলে "গৌড়তগা" বলিয়া এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। তাঁহারা বলেন যে জন্মেজয়ের সর্পসত্রে গৌড়দেশ হইতে যে-সকল ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন যজ্ঞ সমাধা হইলে রাজা তাঁহাদিগকে পারিতোষিকস্বরূপ রত্ন ও ভূমি দান করিতে ইচ্ছা করেন। কেহ কেহ সে দান অস্বীকার করেন এবং অনেকে গ্রহণ করেন। প্রতিগ্রাহীগণ গৌড়দেশপ্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। গৌড়দেশ অথবা গৌড়াচার ত্যাগ করাতে তাঁহারা গৌড়তগা নামে অভিহিত হন। কুরুক্ষেত্র বৈদিক যুগ হইতে যজ্ঞভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা, উৎকল—এই পঞ্চ গৌড়† হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করেন। এবং ক্রমে ভারতের নানাস্থানে বিস্তার লাভ করেন। সেই-সকল গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে আগতগণ আপনাদিগকে "আদিগৌড়" নামে অভিহিত করেন। কুরুক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ "আদিগৌড়"। তাঁহারা বলেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়রাজ্য হইতে আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পর বৌদ্ধযুগের আরম্ভ হইতে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ পালরাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ভারতের ও তাহার বাহিরে অন্যান্য স্থানের ন্যায় পঞ্জাবেও উপনিবেশ করেন। নবম শতাব্দীতে বঙ্গে পালরাজ্য স্থাপিত হয়। দেবপাল, ধর্ম্মপাল, মহীপাল-প্রমুখ নরপতিগণ হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং জলন্ধর হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। জলন্ধরের ১৬ মাইল দক্ষিণে মহীপালের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল*। মহীপাল দিল্লীতে বহুবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হন।† পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্ডি, কুলু, কাংড়া এই তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্য শিমলা পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত। মণ্ডির নিকটেই শিবকোট আধুনিক সুকেত আর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। বল্লালবংশীয় সেন রাজগণ এই স্থানে পূর্ব্বে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে রাজভ্রাতা বাহুসেন কুলুতে গিয়া উপনিবেশ করেন। এখানে দশপুরুষ অতিবাহিত করিবার পর শেষ বংশধর কবচসেন কুলুরাজ কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার পত্নী শিবকোটে পলায়ন করেন এবং এখানে বাণসেন নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া বাণসেন শিবকোটের রাজা হন। ইঁহার বংশধর তিন শতাব্দী পরে মণ্ডির রাজ্য‡ স্থাপন করেন। রাজ-

* Census of the N. W. P. 1865.

† "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা"—স্কন্দপুরাণ।

* পুরাকালে সূর্য্যবংশীয় মহারাজা মান্ধাতার গৌড় নামে দৌহিত্র বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই নামে বঙ্গের নাম গৌড় হয়। "আমরা সচরাচর যে দেশকে বাঙ্গালা বলিয়া থাকি তাহার প্রকৃত নাম গৌড়"—গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব। সারস্বত ব্রাহ্মণগণ যাঁহাদের আদিপুরুষগণ সরস্বতীনদীতীরে বাস করিতেন তাঁহারাও "আদিগৌড়" বলিয়া পরিচয় দেন। এই সারস্বতগণ এক্ষণে ভারতের সকল প্রদেশেই দৃষ্ট হন। ইহাতে বোধ হয় যাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া "আদিগৌড়" আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়ের (বঙ্গের) সরস্বতীনদীতীর হইতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

† Archaeological Survey of India Reports. Vol. XIV. Punjab (Cunningham).

‡ সেনরাজগণ—(শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত) ছ, ৫০।

ধানী মণ্ডি বিপাশা নদীর তীরে অবস্থিত। মণ্ডিরাজ শ্রীমন্মহারাজ বিজয়সেন দেববাহাদুর বলেন যে তাঁহাদের বংশ গৌড়ের সেনরাজগণ হইতে সমুৎপন্ন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে গৌড়াধিপ বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন দিল্লীতে দশবৎসর রাজত্ব করেন এবং বারাণসী প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। তিনি ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গে মুসলমানের আবির্ভাব হইয়াছে। দিল্লীশ্বর বালবনের পুত্র নসীরউদ্দীন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ হইতে কয়েকঘর গৌড়-কায়স্থ লইয়া গিয়া তথায় এবং এলাহাবাদ সুবার অন্তর্গত নিজামাবাদ, ভাদোইকোলি প্রভৃতি স্থানে কানুনগোর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই-সকল বঙ্গসন্তান আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহারা এক্ষণে নিজামাবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রাজা শিবসিংহ মিথিলারাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। বঙ্গের আদিকবি বসন্তরায় বিদ্যাপতি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। একবার কোন কারণে দিল্লীর বাদসাহ শিবসিংহকে কারারুদ্ধ করেন। বিদ্যাপতি তাঁহার উদ্ধারার্থ দিল্লীযাত্রা করিয়াছিলেন এবং দরবারে তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া দিল্লীশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রাজা শিবসিংহ কারামুক্ত হন এবং বিদ্যাপতি সম্রাটের নিকট হইতে বেহারের অন্তর্গত বিস্পী নামক একখানি বৃহৎ গ্রাম প্রাপ্ত হন। বিদ্যাপতির বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ গ্রামে বাস করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি, আই, ই, মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষ এবং সর্ব্বাধিকারী বংশের স্থাপয়িতা বাবু সুরেশ্বর বসু * ওড়িষ্যার দেওয়ান বা গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় ঈশানেশ্বর সর্ব্বাধিকারী সেই সময় (১৪০৯?) দিল্লীর বাদসাহ্ মহম্মদসাহের উজীর ছিলেন। †

ভারতসাম্রাজ্যশাসনে তাঁহারও প্রভাব বড় সামান্য ছিল না। এই বংশীয় রাজা ভুবনমোহন সম্রাট সাহ আলমের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহামতি আকবর দিল্লীর সম্রাট হন। তিনি ১৫৫৬ অব্দ হইতে ১৬০৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী দিল্লীপ্রবাসী হইয়াছিলেন। বঙ্গের বিখ্যাত পণ্ডিত পুরন্দর আচার্য্যের পুত্র মধুসূদন সরস্বতীর পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাত্মশক্তির খ্যাতি দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। সম্রাট আকবর তাঁহার গৌরববর্দ্ধনার্থ তাঁহাকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্য যৌবনে বড়ই উদ্ধতপ্রকৃতি ছিলেন এবং সর্ব্বদাই মোগলরাজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য তাহাতে ভীত হইয়া মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্য ও সামরিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া সাবধান হইবার জন্য প্রতাপকে দিল্লী পাঠাইয়া দেন। তাঁহার সহিত তাঁহার দুইজন বন্ধুও ছিলেন, তাঁহাদের নাম সূর্য্যকান্ত গুহ এবং প্রতাপসিংহ দত্ত। আকবরের রাজস্ব-সচিব তোড়লমল্লের সহিত তাঁহারা দিল্লী যান। এখানে কিছুদিন বাস করিবার পর যুবরাজ সেলিমের সহিত তাঁহারা পরিচিত হন। একদা একটি সমস্যার পূরণ করিয়া প্রতাপাদিত্য সম্রাট আকবরের অনুগ্রহভাজন হন এবং মোগল রাজদরবারে রাজনীতি শিক্ষা করিতে থাকেন। পাঁচ বৎসর সম্রাট-সভায় অতিবাহিত করিয়া ১৫৮২ অব্দে ১৯ বৎসর বয়সে রাজা উপাধি ও রাজসনন্দ লইয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর মোগল রাজনীতি অধ্যয়ন করিয়া সম্রাটের সামরিক শক্তি ও ত্রুটিসমূহ বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতাপ অধিক সাহসান্বিত হইলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাই আকবর বাদসাহের সেনাপতি মানসিংহকে প্রতাপদমনের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণের মূল কারণ। পরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতাপ তাঁহার পিতৃব্য বসন্তরায়ের প্রতি কোন সময় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন। কচুরায় তখন প্রতাপমহিষীর কৃপায় পলায়ন করিয়া দিল্লীতে

---

* বঙ্গদর্শন ৪র্থ খণ্ড। (২) 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের লিখিত ভুমিকা।

† ডাক্তার মেজর ওয়াল্‌স্ প্রণীত মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস। (২) বঙ্গবাসী ২৪ ডিসেম্বর ১৯০৪।

গিয়া উপস্থিত হন। এবং পিতৃহন্তার দণ্ডবিধানের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করেন ও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর মানসিংহের অধীনে বহু সৈন্যসহ কচুরায়কে প্রতাপদমনে প্রেরণ করেন। কচুরায়ের মন্ত্রণায় এবং কৃষ্ণনগর-রাজ-বংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় এবার মানসিংহ জয়লাভ করেন। কচুরায় যশোহরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন এবং ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সহিত দিল্লী আগমন করিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে ভবানন্দ মজুমদার দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বঙ্গদেশে চতুর্দ্দশ পরগণার দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৬৯২ খৃঃ অব্দ) দিনাজপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ প্রাণনাথ রায় দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে দিল্লীদরবারে অভি-যোগ উপস্থিত হইলে তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমীপে সন্তোষজনকরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া দোষমুক্ত হন। বাদসাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া "রাজা" উপাধি ও বহুমূল্য খেলাৎ দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করেন। দিল্লী-যাত্রাকালে তিনি বৃন্দাবনে যমুনার জলে যে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, দিনাজপুরে ফিরিয়া সেই যুগলমূর্ত্তি রুক্মিণীকান্ত নাম দিয়া নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার বংশধর রাজা রামনাথ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-দরবারে মহারাজা খেতাব ও বহুমূল্য খেলাত পাইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অধিকার সুরক্ষিত করিবার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ, অস্ত্রাগার রক্ষা ও সৈন্যপোষণের অনুমতি পাইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে দিনাজপুর রাজ্যের ভার লইয়াছিলেন। * ঐ বংশের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় দিল্লীর বাদসাহ দ্বিতীয় সাহ আলমের নিকট মহারাজা উপাধি ও রাজ্যপ্রাপ্তির সনন্দ লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। † প্রথম সাহ আলম বা বাহাদুর সাহের রাজত্ব-কালে তাঁহার পুত্র আজীম-উশ্‌শান্ সুবে বাঙ্গালার নাজীম ও দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার অধীনে জৈনুদ্দীন নামে একব্যক্তি হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। কিঙ্করসেন নামে জনৈক বাঙ্গালী জৈনুদ্দীনের পেশকার ছিলেন। তিনি এই জৈনুদ্দীনের সহিত দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। বেহারের নায়েব সুবাদার মহারাজা বাহাদুর জানকীনাথ সোমের পুত্র ওড়িষ্যার সুবাদার দুর্লভরাম সোম যিনি ১৭৬৫ অব্দে মীরজাফরের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া-ছিলেন তিনি যখন লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে সম্রাট ও সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি দৃঢ় করিবার জন্য দিল্লী আগমন করেন তখন তাঁহার কার্য্যকুশলতায় প্রীত হইয়া বাদসাহ তাঁহাকে "মহারাজ মহীন্দ্র" এই উপাধি এবং বেহারের অন্তর্গত ১৮৭৫০০ টাকা আয়ের নীতপুর পরগণা জায়গীর দান করিয়াছিলেন। রাজা দুর্লভরাম কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াও ৬ লক্ষ টাকা আয়ের আর একটি জায়গীর (রঙ্গপুর জেলায়) পাইয়াছিলেন। রাজা পীতাম্বর মিত্র ভারতের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ ছিলেন। তিনি ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর রাজত্ব-কালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরিসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের একজন সেনাপতি ছিলেন। সম্রাট ইঁহাকে রাজা উপাধির সহিত দশসহস্র মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া দেন; এবং এলাহাবাদ সহরের নিকটস্থ "কড়ার" সুদৃঢ় দুর্গ ও নগর জায়গীর স্বরূপ দান করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছি। ১৭৬৫ অব্দে বক্সারের যুদ্ধের পর দিল্লীশ্বর সাহ আলম্ ইংরেজের নিকট পেন্সন্ প্রাপ্ত হন। তাহার ২৭ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯২ অব্দে দিল্লী ওরিএণ্টাল কলেজ (Oriental College, Delhi) স্থাপিত হয়। কলেজের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালী অধ্যাপকের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ইংরেজ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে অধি-কৃত হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (N. W. Provinces, প্রাচীন মধ্যদেশ) অন্তর্ভুক্ত এবং সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে ইহা পঞ্জাব প্রদেশের শাসনকর্ত্তার অধীন করা হয়। দিল্লী সহরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ডিস্‌পেন্সরী খোলা

* "সংক্ষিপ্তো দিনাজপুর-রাজবংশঃ"— একাদশ-সর্গঃ।

† ঐ ষোড়শ-সর্গঃ।

হইলে, বাবু রাজকৃষ্ণ দে তাহার ভার প্রাপ্ত হইয়া দিল্লী আগমন করেন। তিনি ১৮৩৩ অব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৩৭ অব্দে কলেজ ত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে তিনি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যাও শিক্ষা করিতেছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু ১৮৩৮ অব্দে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।* রাজকৃষ্ণবাবুর দিল্লী আসিবার পর বৎসর ১৮৪০ অব্দে মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক এখানে কালীবাড়ী স্থাপিত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত ঐ কালীবাড়ী যমুনার উপকূলে কাগজী মহল্লায় ছিল। বিদ্রোহীরা ইহা ভগ্ন ও দগ্ধ করে। এক্ষণে ঐস্থানে দিল্লীর প্রসিদ্ধ কুঠিয়াল কৃষ্ণদাস গুড়ওয়ালা সি, আই, ঈ মহাশয়ের সদাব্রত ও ধর্ম্মশালা অবস্থিত। বিদ্রোহের কিছুদিন পরে নীলমণি ব্রহ্মচারী নামক জনৈক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দিল্লী আগমন করেন। তাঁহারই উদ্যোগে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ঐ কালীমূর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মূর্ত্তি অষ্টধাতুনির্ম্মিত দক্ষিণাকালীমূর্ত্তি। হাবড়ার অন্তর্গত বসন্তপুরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিগ্রহের প্রাত্যহিক পূজা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের পর যাঁহারা দিল্লীতে প্রবাস স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আসিয়াছিলেন। পঞ্জাবের রাজধানী বা অন্যান্য স্থানে তৎপূর্ব্বে যাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের জীবনী ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে আমরা প্রকাশ করিয়াছি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

* The Eastern Star of 1840, quoted at page 121, Reminiscences and Anecdotes by R. G. Sanyal, Vol. I.

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্ম যত লোকে মানে এত লোকে আর কোন ধর্ম্ম মানে না। চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং সাইবীরিয়ার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিব্বত, ভুটান, সিকিম, রামপুরবুসায়রের সব লোক বৌদ্ধ। নেপাল ও সিংহলের অধিকাংশ বৌদ্ধ। বর্ম্মা সায়াম ও আনাম অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৌদ্ধ।

তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান এককালে বৌদ্ধধ[র্ম্মের] আকর ছিল; সেখান হইতে পারস্যের পশ্চিমে ও তুর্কীস্তানে[র] পশ্চিমে বৌদ্ধধর্ম্ম ছড়াইয়াছিল। রোমান কাথলিক খ্রীষ্টানদিগে[র] অনেক আচার ব্যবহার পূজাপদ্ধতি বৌদ্ধদেরই মত। তাঁহা[দের] দুইজন সেণ্ট বারলাম ও জোসেফট—বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব শ[ব্দের] রূপান্তর মাত্র।

ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের ধর্ম্মে ও আচারব্যবহারে বৌদ্ধ মত ভাব এখনো প্রচ্ছন্ন থাকিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালার ধর্ম্মঠাকু[রের] পূজকেরা বৌদ্ধ। বিঠোবা ও বিল দেবতার ভক্তেরা আপনাদিগ[কে] বৌদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। বাঙ্গালীদের তন্ত্রশাস্ত্রে বৌ[দ্ধ] ধর্ম্মের আভাস সুস্পষ্ট।

সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল কতকগুলি ধর্ম্মনীতির সমষ্টিমা[ত্র]; নেপালের বৌদ্ধধর্ম্ম দর্শনতত্ত্ববহুল এবং বিজ্ঞানমূলক; ব[র্ম্মায়] পূজাপাঠের বেশী ব্যবস্থা আছে; তিব্বতের বৌদ্ধেরা কালীপ[ূজা] করে, মন্ত্রতন্ত্র পড়ে, হোমজপ করে, মানুষপূজা করে। চীনদে[শের] বৌদ্ধেরা সব জন্তু মারে, সব মাংস খায়; জাপানী ও চীনা বৌদ্ধে[রা] নানারূপ দেবদেবীর উপাসনা করে। কোথাও বা বৌদ্ধধর্ম্ম পূ[র্ব্ব]পুরুষের উপাসনার সহিত, কোথাও বা ভূতপ্রেত উপাসনার সহি[ত] কোথাও বা দেহতত্ত্ব উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে; কোথ[াও] খাঁটি বুদ্ধের মত, আবার কোথাও বা খাঁটি নাগার্জ্জুনের [মত] চলিতেছে। বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-উপদেশ যে-দেশে যখন প্রচার হইয়াছি[ল] তখন সেই দেশের ভাষায় লেখা হইয়াছিল; পারস্যভাষায় ও র[োমক] (রোম) ভাষায় পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল—বিমলপ্রভা নামক এ[ক]খানি পুথি হইতে নূতন জানা গিয়াছে। প্রাকৃত ও অপভ্র[ংশ] ভাষায় বৌদ্ধদিগের অনেক সঙ্গীত লেখা হইয়াছিল, এ খবরও নূতন।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে, একথা লইয়া নানা মুনির নানা মত আ[ছে]। যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বিহারে বাস করে কেবল তাহারা বৌ[দ্ধ] হইলে গৃহস্থ-বৌদ্ধ বাদ পড়ে; যাহারা পঞ্চশীল (প্রাণাতিপ[াত] করিব না, মিথ্যাকথা বলিব না, চুরি করিব না, মদ খাইব [না,] ব্যভিচার করিব না) গ্রহণ করে তাহারাই কেবল বৌদ্ধ হই[লে] জেলে মালা কৈবর্ত্ত ব্যাধ প্রভৃতির বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশের অধিকার থা[কে] না। নেপাল তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধদের মতে পৃথিবীসুদ্ধ বৌদ্ধ। লঙ্কাবাসীরা আপনাকে উদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত; নেপা[লী] ও তিব্বতী বৌদ্ধেরা বলেন যিনি বোধিসত্ত্ব হইবেন তাঁহাকে জ[গৎ] উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। এইজন্য নেপালী তিব্ব[তী] বৌদ্ধেরা লঙ্কার বৌদ্ধদিগকে হীনযান ও আপনাদিগকে মহাযান বৌ[দ্ধ] বলেন। যান মানে পন্থ বা মত। জগৎ উদ্ধারের উপায় করুণ[া-] মূর্ত্তির করুণা; তোমার চেষ্টা থাকুক আর নাই থাকুক, তুমি [যে] দেবতাকে বিশ্বাস ভক্তি ও উপাসনা করনা কেন, তোমাকে বোধিস[ত্ত্ব] অবলোকিতেশ্বর নিজগুণে উদ্ধার করিবেনই। বৌদ্ধদের প্রধ[ান] গ্রন্থের নাম প্রজ্ঞাপারমিতা; মহাযান ধর্ম্মের সারের সার ক[থা] "করুণা"। প্রজ্ঞাপারমিতার বিবিধ সংস্করণ; শত সহস্র শ্লো[ক] হইতে তিন পাতার "স্বল্পাক্ষরা প্রজ্ঞাপারমিতা" পর্য্যন্ত আছে। উহার একটি মাত্র কথা সকল জীবে করুণা কর। মহাযানে[র] মর্ম্ম গীতায় নিম্নের শ্লোকে প্রকাশ পাইয়াছে—

> যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
> তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

গীতায় এ কথা ভগবানের মুখে; মহাযানে এ ভাবের কথা প্রত্যে[ক] বোধিসত্ত্বের মুখে। বোধিসত্ত্বেরা নির্ব্বাণের অভিলাষী মানুষ[;] ভগবানের মুখে যে-কথা শোভা পায়, মানুষের মুখে সে-ক[থা]

আরও অধিক শোভা পায় ; ইহাতে বুঝা যায় তাঁহাদের করুণা কত গভীর।

বৌদ্ধেরা জাতি মানে না ; সুতরাং বৌদ্ধের সন্তান বৌদ্ধ হইয়াই জন্মে না। শুভাকর গুপ্তের আদিকর্ম্মরচনা নামক বৌদ্ধ স্মৃতির মতে, যে-কেহ ত্রিশরণ (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি) গমন করিয়াছে, সেই বৌদ্ধ। প্রাচীনকালে ত্রিশরণ গমনের জন্য পুরোহিতের দরকার হইত না, লোকে আপনারাই ত্রিশরণ গ্রহণ করিত। পরে ভিক্ষুর সাহায্য আবশ্যক হইয়াছে।

প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল। যে সন্ন্যাস লইবে তাহাকে একজন সন্ন্যাসীকে মুরুব্বি করিয়া সন্ন্যাসীর আখড়ায় যাইতে হইত। বৌদ্ধসন্ন্যাসীর নাম ভিক্ষু, দলের নাম সঙ্ঘ, সন্ন্যাসীদের বাসগৃহের নাম সঙ্ঘারাম, সঙ্ঘারামের মধ্যেকার মন্দিরের নাম বিহার। তাহা হইতে বৌদ্ধ আখড়া বিহার আখ্যা পাইয়াছে।

শিক্ষানবিশকে সর্ব্বাপেক্ষা বুড়া ভিক্ষু (তাঁহাকে স্থবির বা থেরা বলে) কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; জিজ্ঞাসার সময় আর পাঁচজন ভিক্ষু উপস্থিত থাকিবেন। প্রশ্নের বিষয়—নাম, ধাম, উৎকট রোগ আছে কি না, রাজদণ্ডে দণ্ডিত কি না, রাজকর্ম্মচারী কি না, ভিক্ষাপাত্র আছে কি না, চীবর আছে কি না। তারপর তিনি সঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করিবেন 'আপনারা বলুন এই লোককে সঙ্ঘে লওয়া যাইতে পারে কি না। যদি আপনাদের ইহাতে কোন আপত্তি থাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন, যদি না থাকে তবে চুপ করিয়া থাকুন।' তিনি এইরূপ তিনবার বলিলে যদি কোন আপত্তি না উঠিত, তবে তিনি নবিশকে তাহার উপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিতেন, তাঁহার কাছে সে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য শিখিত। সে-সব শিখিলে তাহাতে উপাধ্যায়ে কোন প্রভেদ থাকিত না, সঙ্ঘে বসিলে দুজনের সমান ভোট হইত। মহাযান বৌদ্ধেরা উপাধ্যায়কে কল্যাণমিত্র বলিত। ইহা হইতে বুঝা যায় তাহাদের সম্পর্ক গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়, পরলোকের কল্যাণকামনায় গুরু শিষ্যের মিত্র মাত্র। মহাযানমতাবলম্বীরা দর্শনশাস্ত্রের খুব চর্চ্চা করিতেন।

ক্রমে যখন প্রকাণ্ড একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইল তখন দর্শন পড়া ও যোগ ধ্যান কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তখন মন্ত্রযানের উৎপত্তি হইল। একটি মন্ত্র জপ করিলেই সকল ধর্ম্মকর্ম্মেরই ফল পাওয়া যাইবে, বৌদ্ধধর্ম্মের যখন এই মত দাঁড়াইল তখন গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা খুব আঁটাআঁটি হইয়া গেল। তখন তিনটি কথা উঠিল—গুরুপ্রসাদ, শিষ্যপ্রসাদ, মন্ত্রপ্রসাদ—গুরুকে ভক্তি করিতে হইবে, শিষ্যকে স্নেহ করিতে হইবে, মন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকিবে। শিষ্য গুরুর দাস, তাহার যথাসর্ব্বস্ব এমন কি স্বয়ং ও স্ত্রীকন্যা পর্য্যন্ত গুরুর, এই যে একটা উৎকট মত ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছে, এ মতের মূল মন্ত্রযান।

বজ্রযানে গুরু আরও বড় হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বজ্রধারী। ইনি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের পুরোহিত পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের উপর বজ্রসত্ত্ব নামে বুদ্ধ আদিবুদ্ধ বা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিলেন। এই মতের গুরুদিগকে বজ্রাচার্য্য বলিত; তাঁহার পাঁচটি অভিষেক - মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক ও পট্টাভিষেক। বজ্রযানে শিষ্যই গুরুপ্রসাদ খুঁজিবে, গুরু শিষ্যপ্রসাদের ধার ধারিবেন না। এই গুরুর দেশীয় নাম গুভাজু।

সহজযানে গুরুর উপদেশই সব। গুরুর উপদেশ লইয়া মহাপাপ-কার্য্য করিলেও মহাপুণ্য হইবে। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর সম্মান বাড়িয়া চলিল।

কালচক্রযানে গুরু অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণকায় বা অবতার। তারপর লামাযানে সকল লামাই কোন-না-কোন বোধিসত্ত্বের অবতার, তিনি সাক্ষাৎ বোধিসত্ত্ব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী। লামাযান ক্রমে দলাইলামাযানে পরিণত হইয়াছে—তিনি অবলোকিতেশ্বরের অবতার, তিনি মরেন না, তাঁহার কায় মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের এই দৃষ্টান্ত হিন্দুর সংসারেও প্রবেশ করিয়াছে। তন্ত্রমতে গুরুই পরমেশ্বর ; গুরুর পাদপূজা করিতে হয়; যাহা ব্রাহ্মণের একেবারে নিষেধ, গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হয় ; গুরু শিষ্যের সর্ব্বস্বের অধিকারী ; যে শিষ্য ধন জন, স্ত্রীপুত্র ও দেহ পর্য্যন্ত গুরুসেবায় নিয়োগ করিতে পারে সেই পরম ভক্ত। বৈষ্ণবের মতেও তাই। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অনেকে এখন কর্ত্তাভজা হইতেছেন। তাঁহারা বলেন "গুরু সত্য, জগন্মিথ্যা, যা করাও তাই করি, যা খাওয়াও তাই খাই, যা বলাও তাই বলি।"

(নারায়ণ, অগ্রহায়ণ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব।

য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনাই যে জগতের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সাধনা নয়, অথবা চীনের বা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা যে বিশ্বমানবের শৈশবলীলা মাত্র ছিল, তার পরিপূর্ণ যৌবনলীলা প্রথম য়ুরোপেই হইতেছে, এ-সকল কথার ভ্রান্তি ক্রমে ধরা পড়িতেছে।

আমাদের স্বদেশাভিমান এবং উদ্ভ্রান্ত স্বজাতি-পক্ষপাতিত্বের প্রভাবে আমরা আমাদের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনাকে জগতের অপর সকল সভ্যতা ও সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম বলিয়া ভাবি। য়ুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসম্বরণ অভ্যুদয় দেখিয়া য়ুরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে বা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না, আমাদের অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশী করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই আমরাও সেইরূপ নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অন্যান্য সভ্যতা ও স্বাধীনতাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি। উভয়ের বিচারই সেইজন্য সত্যভ্রষ্ট।

বিশ্বমানব বিশ্বব্যাপী। সকল দেশের সকল মানবে ও সমাজে ইনি একই সঙ্গে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইয়া আছেন।

মানুষ মাত্রেরই কতকগুলি সামান্য লক্ষণ আছে। এই গুণ-সামান্যই মনুষ্যত্বের সার্ব্বজনীন নিদর্শন। জ্ঞান, ভাব, কর্ম্ম—এই তিনে মানুষের সকল অভিজ্ঞতা পূর্ণ। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই ভাব ; যেখানে ভাব সেখানেই কর্ম্মচেষ্টা অনায়ত্তকে আয়ত্ত, লোভনীয় অলব্ধকে লাভ করিবার উপায়-উদ্দেশ্যের সংযোজন। এই কর্ম্মই সাধন। যে পরম তত্ত্ব ঐ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও ভাবের আশ্রয় তাহাই এই সাধনের নিত্য সাধ্য বস্তু। ভারতের তত্ত্বজ্ঞানই প্রাচ্য আশিয়ার সাধারণ সমাজতন্ত্র, জীবনাদর্শ ও ধর্ম্মকর্ম্মকে অর্থাৎ সভ্যতা ও সাধনাকে আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের যন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। এজন্য সমস্ত আশিয়ার দর্শন, বিজ্ঞান, কলা ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত।

ইহজীবনে আপনার শরীর মনের আশ্রয়ে মানুষ যে-সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম ও চূড়ান্ত অর্থ আবিষ্কার করিতে যাইয়াই দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়। জ্ঞাতা অহং এবং জ্ঞেয় ইদংকে লইয়া মানুষের যাবতীয় অভিজ্ঞতা ; এই

অভিজ্ঞতার উৎপত্তি, স্থিতি, গতি, নিয়তি, প্রকৃতি, প্রণালী, মূল্য, সকলই বিশ্বসমস্যা। হিন্দুর এই সমস্যা মীমাংসার ইঙ্গিত বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই মন্ত্রে পাওয়া যায়—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

বিশ্বের অব্যক্ত বীজ পূর্ণবস্তু: ঐ বীজের ব্যক্ত আকার পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয়। ঐ পূর্ণ যখন ঐ পূর্ণেতে প্রত্যাগত হয় তখন পূর্ণই কেবল অবশিষ্ট থাকে। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি!

ইহা হইতে তিনটি তথ্য পাওয়া যায়—১ম, একটা পূর্ণতত্ত্বের অনুভূতি, আর আত্মাই সেই পূর্ণতত্ত্ব। ২য়, আমরা যাহাকে আমি আমি বলি সেই অস্মদ্-প্রত্যয়ের বস্তুই আত্মবস্তু, আর এই আত্ম-বস্তুই বিশ্বের পরমতত্ত্ব ও পূর্ণতত্ত্ব। ৩য়, এই আত্মার অন্বেষণ ও আত্মাকে জ্ঞানেতে প্রাপ্ত হওয়াই পরমানন্দ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

যাহাতে এই বিশ্বসমস্যার নির্ব্বিরোধ মীমাংসা হয় তাহাকেই তত্ত্ব কহে। বিশ্বের বস্তু বা বিষয় অশেষ; কিন্তু যাহা খণ্ড খণ্ড বলিয়া মনে হয় মূলে তাহা অখণ্ড, অপূর্ণ নহে পূর্ণ। ব্রহ্মই সেই এক, অখণ্ড, পূর্ণ বস্তু বা পূর্ণ তত্ত্ব। চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-সকল সেই পূর্ণ বস্তুরই বিবিধ ও বহুমুখ প্রকাশ। এজন্য ইহারা ব্রহ্মেরই নিদর্শন।

বাহিরের বিবিধ বিষয় ও জীবের ইন্দ্রিয় যে ব্রহ্মের আংশিক জ্ঞানবলক্রিয়াদি প্রকাশ করে, আত্মাই সেই ব্রহ্মের অখণ্ড পরিপূর্ণ প্রকাশ। সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাদের নানাবিধ খণ্ডজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া জ্ঞানের বা অনুভূতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। আত্মাই সকল অভিজ্ঞতার নিত্যসাক্ষী হইয়া একত্ব সংসাধন করিতেছেন।

এই আত্মার অন্বেষণ, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মজ্ঞানই পরিপূর্ণ আনন্দবস্তু। এই একত্বানুসন্ধান ও একত্বানুভূতিই হিন্দুর অন্তঃ-প্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম্ম। হিন্দু সর্ব্বদা বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, বিরোধের মধ্যে মিলন ও সন্ধি, বহুর মধ্যে এক, অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে লক্ষ্য করিয়াছে। বিশাল বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হইয়া হিন্দুর তত্ত্বান্বেষণ ও তত্ত্বপিপাসা চিরদিনই অনন্তের প্রতি একটা গভীর অনুরাগের প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। এই প্রেরণাতেই হিন্দু বলিয়াছে, যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি। এই ভূমাই সমুদায় জ্ঞানের ও সত্তার আধার ও সম্ভাবনা। হিন্দু কেবল ভূমা বা অনন্তকে মানিয়া লইয়া স্থির থাকিতে পারে নাই, অপরোক্ষ অনুভূতিতে এই ভূমাকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে আপনার আত্মার মধ্যে আত্মার নিত্যসিদ্ধ একত্বের মূলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

(নারায়ণ, অগ্রহায়ণ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

হাজারিবাগে কলা ও পেঁপের চাষ।

বাঙ্গালাদেশে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাষের আধিক্যহেতু দেশে অন্যান্য যাবতীয় শাক সব্জী খাদ্যবস্তুর অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। ইহা একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদাসীনতার ফল ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। কারণ এখনও এ দেশীয় অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা, কৃষিকার্য্যকে সম্পূর্ণরূপে সমাজবিরুদ্ধ ঘৃণিত ও অপমানের কাজ মনে করেন, সুতরাং গরিব ও মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোক সম্পূর্ণভাবেই অর্থ ও খাদ্যের অভাবেই মারা যাইতেছেন। অথচ প্রতিকারের চেষ্টায় সম্পূর্ণ নিম্[illegible] অধিকন্তু বাঙ্গালাদেশে এক কাঠা জমিও খরিদ বা জমা করিয়া ল[illegible] পাওয়া যায় না। ভদ্রলোকের একমাত্র বিনা মূলধনের ব্যবসায় চাকরী, তাহাও সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। উল্লিখিত দুইটি অল্প[illegible] সাধ্য ফলের নিম্নলিখিত ভাবে চাষ ও ব্যবসায় করিলে, অনায়া[illegible] সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া দুই পয়সা সঞ্চয় হইতে পারে।

ছোটনাগপুর বিভাগে এখনও চারি দিকে শত শত [illegible] ভূমি অকর্ষিত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। যে-সকল বাঙ্গা[illegible] বাবুরা চাকরীর চেষ্টায় এবং হাওয়া খাইবার জন্য শীতের পু[illegible] এদিকে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত কতকগু[illegible] লোকে দল বাঁধিয়াই হোক্ বা একাকীই এই কাজে হস্তক্ষেপ করি[illegible] বড়ই ভাল হয়।

এ দেশের মাটী লাল কোমল বালি দোয়াঁস। ইহার অনেক [illegible] আটালিয়া মাটির ন্যায় জল ধারণের ক্ষমতা আছে। এই বিভা[illegible] ছোট ছোট পর্ব্বতমালা থাকাতে বর্ষাও বেশ হয়। জমির খাজনা [illegible] বেশী নহে। কুলী মজুরও বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা অনেক সস্তা[illegible] গড়ে প্রত্যেক মজুর দৈনিক ৵১০—হইতে ।১০ আনার বেশী নহে[illegible] একজন সাঁওতাল কুলী, অক্লান্ত ভাবে যে কাজ করে, দুইজন বাঙ্গা[illegible] মজুর তাহার অর্দ্ধেক করিতে পারে কি না সন্দেহ। অধিক[illegible] ইহারা প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী।

২০ কিম্বা ২৫ বিঘা জমী স্থানীয় ঘাটোয়াল্ জমিদারের নিকট হই[illegible] খাজনা করিয়া লইয়া তাহার মধ্যস্থলে প্রথমতঃ একটি ইন্দারা [illegible] কূপ খনন করিয়া লইতে হয়। পরে তাহার চারিদিকে কাঁটাগাছে[illegible] বা লোহার কাঁটার বেড়া দিতে হয়। ঐ নির্দ্দিষ্ট জমিখানিকে, যতদূ[illegible] সম্ভব সমতল করিয়া, চারিদিকে নালা কাটিয়া জলরক্ষা করা[illegible] উপায় করিতে হয়। নতুবা পাথরের নুড়িবিশিষ্ট জমি শীঘ্রই নীর[illegible] হইবার সম্ভব।

জমিখানিকে মহিষের লাঙ্গল দ্বারা আশ্বিন [illegible] কার্ত্তিক মাসে, জ[illegible] সরস থাকিতে থাকিতে ৩।৪ বার ডবল ফেরতা কর্ষণ করিয়া[illegible] বৈদ্যবাটী, চন্দননগর প্রভৃতি স্থান হইতে ছোট ছোট কলার তেউ[illegible] আনিয়া, ৮ হাত অন্তর এবং ১॥ দেড় হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহা[illegible] মধ্যে রোপণ করিতে হইবে। রোপণের পূর্ব্বে উহাদের পাতা[illegible] অগ্রভাগ কতকটা ছাঁটিয়া দিতে হয়। আর রোপণের পূর্ব্বে ঐসক[illegible] গর্ত্ত সহরের (Refusal) সহর-ঝাঁটান আবর্জ্জনা দ্বারা কতক[illegible] পরিমাণে পূরণ করিয়া দিবে। তাহা হইলে ঝাড়গুলি অধিক দি[illegible] স্থায়ী হইয়া বড় বড় কাঁদী ফেলিবে ও কলা মোটা হইবে। কৃ[illegible] কাজের কৌশলে ক্রমে যত কম খরচা করা যাইতে পারিবে, তত[illegible] বেশী লাভ দাঁড়াইবে।

কলার তেউড়গুলি বেশ লাগিয়া দুই একটি পাত্ ফেলিলে [illegible] ঐ গাছগুলি একেবারে মাটী-সমান করিয়া দিয়া, ক্ষেত্খানি বে[illegible] চৌরশ্ করিয়া মই দ্বারা সমতল করিতে হয়। পরে, ঐ ঐ ঝা[illegible] হইতে, অতিতেজস্কর মোটা মোটা তেউড় বাহির হইয়া গাছগু[illegible] বেঁটে আকার ধারণ করিয়া ঝাড়াল হয়। এই গাছের কলা মোটা[illegible] ফলন বেশী এবং কাঁদী লম্বা হয়। ঝাড়গুলিও অধিক দিন স্থায়ী হয়[illegible] সাধারণতঃ কলার ঝাড় ৩ বৎসর পর্য্যন্ত তেজস্কর থাকে এবং কল[illegible] মোটা হয়; এই ভাবে চাষ করিলে, একস্থানে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সমা[illegible] তেজস্কর থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসর বৈশাখ ও আষাঢ় মাসে[illegible] প্রত্যেক ঝাড়ে ২।৩টি করিয়া গাছ রাখিয়া বাকী তেউড়গুলি তুলিয়[illegible] ফেলিয়া, অন্য স্থানে লাইনবন্দী করিয়া রোপণ ও পুরাতন আটির[illegible] তুলিয়া ফেলিয়া ঝাড় পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। কলার আটিয়া[illegible]

জল ধারণের ক্ষমতা অতিশয় প্রবল। ইহাতে জমি বেশ সরস ও কোমল করিয়া দেয়। এইজন্য অন্যান্য চারার তেজ বৃদ্ধি করে।

এদেশে প্রায়ই জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বৃষ্টি আরম্ভ হয় ;—সুতরাং কার্ত্তিক হইতে বৈশাখের শেষ সময়ের মধ্যে যদি দুই চারিবার বৃষ্টি না হয়, তবে ঐ সময়ে উক্ত পাতকুয়া হইতে রৌদ্রের প্রখরতা বুঝিয়া, নালিধারা ঝাড়ের গোড়ায় মধ্যে মধ্যে জল সেচনের আবশ্যক হইবে। আর এদেশীয় পাথরিয়া জমিতে একপ্রকার (Marle) পদার্থ উৎপন্ন হইয়া ঝাড়ের গোড়াগুলি সরস ও তেজস্কর করে। ঐ ঐ কলা-ঝাড়ের ৺৪ হাত ব্যবধানে আষাঢ় মাসে একটি করিয়া বড় জাতীয় গোলাকার বোম্বাই পেঁপের চারা রোপণ করিয়া দিলে, এক কাজে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহাতে কলা এবং পেঁপে উভয় জাতীয় গাছই তেজস্কর হয় এবং অধিক ফল ধরে ও লাভ হয়।

এই ভাবে কাজ করিলে প্রত্যেক ৩ বিঘা ২ কাঠা জমিতে বা এক একারে (Acre) ৩৬৫ ঝাড় কলা ও পেঁপে গাছ জন্মিবে। * এ সম্বন্ধে বাঙ্‌লাদেশে একটা প্রচলিত প্রথা আছে তাহাই এখানে অবলম্বন করা ভাল বলিয়া মনে হয়।

(১)

"ডাক্ দিয়ে কয় রাবণ, কলা পোতে আষাঢ় আর শ্রাবণ,
কলা পুতে না কেটো পাত, তাতেই হবে কাপড় আর ভাত।

(২)

দেড় হাত গভীর, সওয়াহাত গই,
কলা পুতো চাষা ভাই।

অর্থাৎ প্রত্যেক গর্ত্তটী ১॥ হাত গভীর এবং সওয়া হাত পরিসর করিলে কলাগাছ পুতিয়া, যদি তাহার পাতা কাটিয়া তেজ নষ্ট করা না হয়, তবে তাহাতেই গৃহস্থের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইয়া বেশ আয় হইতে থাকে। পূর্ব্বে কৃষি-শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা এই ভাবে কদলীর প্রতি-ঝাড় হইতে খরচা বাদে ১৲ টাকা উৎপন্ন ধরিয়া বার্ষিক ৩৬৫৲ টাকার স্থিতি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান বাজার-দর অনুসারে খরচা বাদে রোজ ২৲ টাকা আয়েরও অধিক অনুমান করা যায়।

কাঁদির হিসাব।	কাঁদিপ্রতি ফলন...	কাঁদিপ্রতি আয়।
১। রংপুরী কাঁচাকলা	গড়ে ৮০টা ...	গড়ে ১৲ টাকা
২। মর্ত্তমান	ঐ ৫০টা ...	ঐ ৸১০ আনা।
৩। ভুতো	ঐ ৬০টা ...	ঐ ।৶১০ আনা।
৪। কাঁঠালি	ঐ ৮০টা ...	ঐ ॥৵০ আনা।
৫। চিনি চাঁপা	ঐ ১৬০টা ...	ঐ ॥৵০ আনা।
৬। চীনের ডইরে ...	ঐ ৮০টা ...	ঐ ॥৵০ আনা।
৭। ডইরে বা বীচেকলা ...	ঐ ১৬০টা ...	ঐ ৸/৫ আনা।
৮। বড় বেহুলা	ঐ ৮০টা ...	ঐ ১৲ টাকা।
		৫৸৶/৫

সুতরাং উল্লিখিত ৮ প্রকার কলার বিবেচনামত আবাদ করিয়া গড়ে প্রত্যহ ঐরূপ ৮ কাঁদি কলা বিক্রয় করিলে, ঐরূপ দৈনিক গড়ে ৬৲ টাকার কম আয় হয় না। সুতরাং খরচা হিসাবে ৪৲ টাকা বাদ দিলে, খাঁটি আয় ২৲ টাকার কোন অংশেই কম পড়ার সম্ভব নহে। কলিকাতায় চালান দিলে আরো বেশী লাভ হওয়ার কথা।

কলা হইতে অন্য প্রকারের উৎপন্ন ও আয়,—

কলাগাছের মোচা ও থোড় উৎকৃষ্ট তরকারি। মর্ত্তমান, চিনি চাঁপা, চীনের ডইরে কলার পাটুয়া হইতে, মণিপুর রাজ্যে কলে রেশমের ন্যায় সুতা প্রস্তুত হইয়া ইউরোপে চালান যায়। কাঁঠালি, বড় বেহুলা, মর্ত্তমান কলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া যাঁতায় পিষিয়া উৎকৃষ্ট ময়দা ও আটা প্রস্তুত হয়। কলার এবং থোড়ের কস্-জল হইতে জুতার কালি প্রস্তুত করা যায়। সকল জাতীয় কলার আঠিয়া পোড়াইয়া কাপড়-কাচা ক্ষার হয়। আর ঐ ক্ষার চোঁয়াইলে সোডা পাওয়া যায়। কলার বাসুনা, পুরাতন নেকড়ার সহিত মিশাইয়া, কাগজের কলে লিখিবার কাগজ প্রস্তুত করে।

এদিকে কাগ্‌জি, পাতি, কলম্বা লেবুও অতিশয় মহার্ঘ—এজন্য এই কলাবাগানের ধারে ধারে বেড়ার আকারে এই লেবুর চারা রোপণ করিলে বার মাসে স্থায়ী আয়ের সংস্থান হয়।* এই গাছের বিশেষ কোন তদ্‌বির করিতে হয় না। কেবল কার্ত্তিক মাসে শুষ্ক ডালপালাগুলি ছাঁটিয়া দিয়া, গোড়াটি বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহা হইতেও ব্যয় বাদে অন্যূন ॥০ আনার কম আয় হয় না। ইহার কলম হইতেও বেশ আয় হয়।

(কৃষক, কার্ত্তিক) শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

এই সময়ে জ্যোতিবাবুর উদ্যোগে একটি "সঞ্জীবনী সভা" স্থাপিত হইয়াছিল। সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। বালক রবীন্দ্রনাথ ও নবগোপাল বাবু সভ্য ছিলেন।

জাতীয় সমস্ত হিতকর ও উন্নতিকর কার্য্য এ সভায় অনুষ্ঠিত হইবে ইহাই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেইদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি।

আদিব্রাহ্মসমাজ-পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ান' বেদ-মন্ত্রের একখানা পুঁথি এ সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসান' ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল-কল্পনা; সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—"সংগচ্ছধ্বম্, সংবদধ্বম্"। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র

---

* প্রত্যেক কলা ঝাড়ের মধ্যে একটি পেঁপে গাছ বসাইলে এক একরে প্রায় ৪০০ কলা ও ৪০০ পেঁপে গাছ বসিবে। এত ঘেঁস গাছ জন্মিলে কোনটিরই ফলন ভাল হইবে না। ১২ ফুট অন্তর গাছের ব্যবধান এবং ১॥০ ফুট অন্তর সারি করিয়া কোণাকোণী গাছ বসাইলে গাছ হইতে গাছের ব্যবধান উভয় দিকেই ১২ ফুট থাকিবে অথচ ১ বিঘায় প্রায় ১২ টা, একরে ৩৬ টা গাছ অধিক বসিবে। অধিকন্তু পগারের ধারে ও রাস্তার ধারে ফাঁক্ বুঝিয়া পেঁপে গাছ বসাইলে এক একর কলাবাগানে ৫৬টা পেঁপে গাছ বসান যাইতে পারে। কিন্তু কলার মাঝে পেঁপে, এরূপ মিশ্রিত আবাদ করা আমরা সুযুক্তি বলিয়া মনে করি না। —কৃষক-সম্পাদক।

* যে গাছই বসাও এবং যত গাছই বসাও আসল আবাদের ক্ষতি না হয় তাহা যেন স্মরণ থাকে। প্রত্যেক গাছেরই খাদ্য আবশ্যক, সকলই এক জমি হইতে সংগ্রহ হইবে।—কৃষক-সম্পাদক।

গান করার পর তবে সভার কার্য্য (অর্থাৎ গল্প-গুজব) আরম্ভ হইত। কার্য্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্‌ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্ত ভাষায় "সঞ্জীবনী সভা"কে "হাঞ্চুপামু হাফ" বলা হইত।

ইহার দীক্ষা-অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ-গাম্ভীর্য্য ছিল। দীক্ষাকালে নবদীক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিত।

একদিন সভায় জ্যোতিবাবু স্থির করিলেন যে ভারতবর্ষে সার্ব্বজাতিক ঐক্য সাধন করিতে গেলে একটা সার্ব্বজনিক পোষাক হওয়া আবশ্যক। নানাবিধ কল্পনার পর শেষে স্থির হইল যে মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিলে যেমন হয় ঐরূপ একটা পোষাক ও মাথায় যাহাতে রৌদ্র বৃষ্টি না লাগে এরূপ একটা শোলার টুপির উপর পাগড়ী বসাইয়া একটা শিরস্ত্রাণ বেশ সার্ব্বজনীন পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইতে পারে। তৎক্ষণাৎ দর্জ্জির দোকানে ফরমাস দিয়া পোষাক হইল, কিন্তু এ অভিনব পোষাক পরিয়া প্রথমে পথে বাহির হইবে কে? মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে জ্যোতিবাবু এই হাস্যকর পোষাক পরিয়া কলিকাতা সহর ঘুরিয়া আসিলেন।

সভ্যগণ যখন দেখিলেন যে আন্তর্জাতিক পোষাক দেশের কেহই গ্রহণ করিল না তখন অগত্যা এ কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া ইঁহারা দেশে শিল্পবাণিজ্যের কল প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইলেন। সর্ব্বপ্রথম দেশালাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক আয়াসে কয়েক বাক্স দেশলাই প্রস্তুত হইল বটে কিন্তু এ পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহারের উপযোগী হইল না। তখন সভ্যগণ দেখিলেন যে এ অসাধ্য ব্যাপার সাধনে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা, দেশের অন্য কোনও মঙ্গলকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

এই সুযুক্তির ফলে, সভায় এক নূতন কাপড়ের কল প্রস্তুত হইল। সভ্যদের উদ্যম আবার দ্বিগুণ হইল। সভ্যেরা চাঁদা দিতেন, তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ। দেখিতে দেখিতে নবপ্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলে একখানি গামছা প্রস্তুত হইল। ব্রজবাবু সেই গামছা মাথায় বাঁধিয়া তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিলেন। সভার সে এক স্মরণীয় দিন! একে একে প্রায় সকল সভ্যই তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। তারপর কল উঠিয়া গেল, আর অন্য কিছুই সে কলে বাহির হয় নাই।

এই সঞ্জীবনী সভার সভ্যগণের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে আহারের একটি বিধি ছিল।

জ্যোতিবাবু বলিলেন "রাজনারায়ণ বাবু আমাদের চেয়ে বয়সেও যেমন অনেক বড়, জ্ঞানেও তেমনি অনেক বড়; কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়, গর্ব্বশূন্য প্রাণ এবং স্বদেশের জন্য ঐকান্তিকতা তাঁহাকে একেবারে শিশুর মত করিয়া রাখিয়াছিল। রাজনারায়ণবাবু আমার পিতৃদেবের নিকট গিয়া যেমন গভীর গবেষণাপূর্ণ তত্ত্বের আলোচনা করিতেন, আমাদের সঙ্গেও তেমনি সর্ব্বদা হাসিমুখে ছেলেমানুষিও করিতে পারিতেন। আমাদের পূজার দালানে, একবার একটি সভা আহূত হয়। আমার পিতা ছিলেন সভাপতি; রাজনারায়ণ বাবু "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে, রেভারেণ্ড কালীচরণ তাহার খুব তীব্র প্রতিবাদ করেন। পিতাঠাকুর মহাশয় তাহাতে এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি আসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন।

"রাজনারায়ণ বাবু যখন 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তক প্রণয়ন করেন তখন আমি ফরাসী গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের পোষক অনেক লেখা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। পরিশিষ্টে যে-সমস্ত ফরাসী লে[খা] উদ্ধৃত আছে, সেগুলি আমারই সঙ্কলিত।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীর সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিবার কিছুদি[ন] পরে রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের জন্য "বালক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। ইহাতে তখন জ্যোতিবাবু physiognom[y] (মুখসামুদ্রিক) ও phrenology (শিরসামুদ্রিক) বিষয়ে অনে[ক] প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "বালকে" স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতির প্রতিকৃতি স[হ] শিরসামুদ্রিক অনুসারে চরিত্র সমালোচনা বাহির হইয়াছিল।

এই সময়ে জ্যোতিবাবু একবার গাজীপুরে গিয়াছিলেন। সেখা[নে] জেলের ডাক্তার Robertson সাহেবের সঙ্গে তাঁর খুব আলা[প] হইয়াছিল। জ্যোতিবাবু তাঁহার মাথা দেখিয়া চরিত্র বর্ণনা করেন ইহাতে তিনি জ্যোতিবাবুর উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এইখা[নে] জ্যোতিবাবু সাহেবের অনুমতি অনুসারে জেলের সব পায়ে-বেড়ী পরা দাগী বদ্‌মাইস্ কয়েদীদের ছবি আঁকিয়া মাথা পরীক্ষ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবুর অনেক বন্ধুবান্ধবও তাঁহাকে মাথা দেখাইতেন ইহাতে মাথা টিপাইবার কাজও অনেকটা হইত।

"বালক" এক বৎসর মাত্র চলিয়াছিল, তাহার পর "ভারতী"র সঙ্গে মিলিয়া যায়।

আবার জ্যোতিবাবু এক সভা স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন এবার আর দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য নহে, এবার বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্য। সভার নাম হইল "কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন।" সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। প্রথম, বঙ্গভাষার অভাব মোচন; দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন ও উৎসাহবর্দ্ধন; এবং তৃতীয়, বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন।

যেমন এই কল্পনা জ্যোতিবাবুর মাথায় উদয় অমনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া তিনি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রথম সভাপতি হইলেন। ভূগোলের ইংরাজী শব্দের পরিভাষা তিনি নিজেই লিখিতে সুরু করিয়া দিলেন। দুই তিন অধিবেশনে বেশ কাজ চলিয়াছিল—কিন্তু তার পরেই নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকই এ সভার সভ্য ছিলেন। বঙ্কিমবাবু এ সভার নাম ইংরাজীতে "Academy of Bengali Literature" রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

(ভারতী, অগ্রহায়ণ) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গে অকালবার্দ্ধক্য।

পঞ্চাশের মধ্যে বা কিছু পরে বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, মাইকেল, নবীনচন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বঙ্গের অনেক মহাপুরুষ স্বর্গলাভ করিয়াছেন—কে বলিতে পারে কেশব বাবু বা বিবেকানন্দ আশি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে ভারতের নরনারীর আরও কত উপকার করিতে পারিতেন। আমাদের শাস্ত্রে লেখে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ", কিন্তু আমাদের দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে যাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে চিন্তা গবেষণা করেন তাঁহারা অনেকে পঞ্চাশ পার হইলেই বনে না গিয়া একেবারে স্বর্গেই যাইয়া থাকেন। বন অপেক্ষা স্বর্গ অবশ্য খুব ভাল জায়গা, কিন্তু আমাদের কাতর প্রার্থনা এই যে তাঁহারা কোথাও না গিয়া "শতং

জীবতু"। দেশের এই-সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে বাঁচাইয়া রাখা একটা জাতীয় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

বিলাতে দেখিতে পাই যে পঞ্চাশ বৎসরে সেখানকার মনীষীগণ যুবক থাকেন, আর আমাদের দেশে হয় তাঁহারা বৃদ্ধ না হয় গতাসু। বিলাতে কত শত লেখক, বীরপুরুষ, অধ্যাপক, রাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্ম-প্রচারক, সমাজসেবক সত্তর, আশি, নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া দেশের নানাবিধ মঙ্গলকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এইরূপ অকাল বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুতে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে; বাস্তবিক পঞ্চাশ বৎসর এক প্রকার শিক্ষার ও সাধনার আয়োজনের কাল মাত্র। পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা, সাধনা, শিক্ষা পরবর্ত্তীকালে বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মে যোজনা করিতে পারিলে তবে দেশে বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে। বিলাতের কর্ম্মীদের অধিকাংশ বৃহৎ কর্ম্মই পঞ্চাশের পরেই সাধিত হইয়া থাকে, পঞ্চাশের পূর্ব্বে তাহার আরম্ভ মাত্র হয়। পঞ্চাশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বড়ই অমূল্য পদার্থ। আমাদের দেশে যাঁহারা মস্তিষ্ক চালনা করিয়া থাকেন, সেই-সকল চিন্তাশীল কর্ম্মীদিগকে পঞ্চাশের উপর সুস্থ রাখিবার কি কোনও উপায় নাই?

দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অকালবার্দ্ধক্য ও ততোধিক ভয়ানক অকালমৃত্যুর দুইটি প্রধান কারণ বিদ্যমান—বাল্যবিবাহ ও অপরিমিত মস্তিষ্ক চালনা।

ইহার মধ্যে বাল্যবিবাহ কেবল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের আয়ুক্ষয় করিতেছে এমন নহে, ইহা একটা জাতীয় অভিসম্পাতরূপে পরিণত হইয়াছে। অপরিণতবয়স্ক পিতামাতার সন্তান কখনও সবল ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। অন্ততঃ শিক্ষিতসমাজে পুত্রকন্যার বিবাহের বয়স কেন আশানুরূপ উন্নত হইতেছে না তাহার কারণ ত দেখা যায় না। সকলেই বাল্যবিবাহের কুফল বোঝেন, সমাজে বাল্যবিবাহ রহিতের বিশেষ কিছু প্রতিবন্ধকও নাই—অথচ মেয়েদের বিবাহ ১১ বৎসরের মধ্যে দেওয়া চাইই। অনেক যুবক পঠদ্দশায় বিবাহ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক, কিন্তু পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে তাহারা নিরুপায়। আমরা সকলে নিজে নিজে যদি স্থির করি যে ভ্রাতা বা পুত্রের বিবাহ বাইশ বৎসরের বা কন্যা ও ভগিনীর বিবাহ ষোল বৎসরের কমে দিব না—তাহা হইলে সমাজ কি বলিবে? বিলাত যাইলে এখনও জাতি যায়, বিধবাবিবাহ দিলে জাতি যায়; কিন্তু ষোল বা সতের বৎসরে কন্যার বিবাহ দিয়া কাহাকেও জাতিচ্যুত হইতে দেখি নাই। একটু মানসিক বল সংগ্রহ করিতে পারিলে অন্ততঃ শিক্ষিতসমাজ হইতে এই কুপ্রথা অচিরেই উঠিয়া যাইতে পারে।

ব্যক্তিগণের জীবনীশক্তি হ্রাসের আর একটি কারণ—অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অভাব। শরীরকে বাঁচাইয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করিলে যে প্রভূত কার্য্য করা যায় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘজীবীও হওয়া যায় তাহা যেন আমরা বিলাতের কর্ম্মবীর চিন্তাশীল মনীষীগণের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা করি। আমাদের দেশে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সেও যে চিন্তাশীল ব্যক্তি দেশের কাজে যোগ দিতে পারেন—তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এইরূপে শরীরকে বাঁচাইয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার আমার নিজের কয়েকটি মুষ্টিযোগ আছে। ইহাতে আমি নিজে বড়ই উপকার লাভ করিয়া থাকি। বলাবাহুল্য বাঁধাবাঁধি বিধির উপর জীবন চালনা করিতে হইলে যৌবন কাল হইতেই নিয়মপালনে অভ্যস্ত হইতে হইবে, বৃদ্ধবয়সে সেরূপ অভ্যাস হওয়া অসম্ভব।

আমার মুষ্টিযোগের সংখ্যা অল্প, চারিটি মাত্র। তাহাদের উদ্দেশ্য শরীর ও মস্তিষ্ককে বাঁচাইয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করা।

(১) সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন মানসিক শ্রম করার পর একদিন সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করা। একদিন লেখাপড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিলে পরবর্ত্তী ছয় দিনে বেশ পুরাদমে কাজ করা যায়।

(২) বৈকালে ৫টা বা ৫॥০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কোনও মস্তিষ্কোপজীবী ব্যক্তি বাটীতে বসিয়া থাকিবেন না। বৈকালে ও সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা শারীরিক পরিশ্রম ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে সকলেই অকালবিজ্ঞ। আমরা ফুটবল প্রভৃতি খেলা ছেলেদেরই উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকি। খেলা আমাদের দ্বারা হইবে না, বেড়ান ত হইবে? আমাদের মধ্যে যাঁহারা বেশী মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের শারীরিক শ্রম একেবারেই নাই—ফলে বহুমূত্র, অজীর্ণ, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগ সহজেই তাঁহাদের জীবনসঙ্গী হইয়া উঠে।

যাঁহারা সারাদিন মানসিক পরিশ্রম করেন, রাত্রে তাঁহাদের লেখাপড়া না করাই ভাল। কারণ এরূপ অনেকস্থলে দেখা যায় যে রাত্রে লেখাপড়া করিলে সমস্ত রাত্রি আর ভাল ঘুম হয় না। তবে যাঁহাদের উদরান্নের জন্য দিনের বেলায় স্কুল, কলেজ, কাছারি বা আফিসে যাইতে হয় না, তাঁহারা সকাল সন্ধ্যায় অনায়াসে পড়াশুনা করিতে পারেন। মোটের উপর দিবসের মধ্যে আট নয় ঘণ্টার বেশী মানসিক শ্রম একেবারেই অনুচিত।

(৩) বড় বড় ছুটিতে স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া এটা একটা ফ্যাশান নহে, এ ব্যবস্থা অনেকটা মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে—ইহাতে মনের অবসাদ ঘুচে, মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হইবার অবকাশ পায়, শরীরের পরিশ্রম খানিকটা বাড়ে, স্বাস্থ্যও ভাল হয়, মানুষ অনেক সময়ে নূতন হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে সমুদ্রযাত্রা করিয়া দেখিয়া আসুন—অন্য দেশগুলা আমাদের দেশের মত মাটির না সোনার। যাঁহার অর্থ কম আছে তিনি ধার করুন। শাস্ত্রে লেখা আছে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"; বিংশ শতাব্দীতে আর বিশুদ্ধ ঘৃত মিলে না, তাই কলিকালে এখন "ঋণং কৃত্বা বায়ুং পিবেৎ" এই মন্ত্র চলিবে। আগে বল সংগৃহীত না হইলে খরচ করিবে কি?

(৪) প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা। বাঙ্গালীর পুষ্টিকর খাদ্য ডাল, মাছ, ঘি, দুধ। মাছ ও দুধের অভাব একটা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার আছে—দ্বিতীয় প্রতিকার নাই। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলেরা যদি মাছের চাষ ও ব্যবসা করেন আর ডেয়ারী ফারম খোলেন তাহা হইলেই দেশে দুধ, ঘির অভাব ঘুচিবে, মাছ মিলিবে। যে দেশের লোকেরা গাভীকে ভগবতী বলিয়া পূজা করে সেই দেশে বিলাতী টিনের দুধ খাইয়া শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক শিশু মানুষ হইতেছে ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে? শিশুকে বাঁচাইতে হইবে, যুবকের মস্তিষ্ক সবল এবং বৃদ্ধের জীবনীশক্তি অটুট রাখিতে হইবে—এহেন সমস্যার সমাধানকল্পে যেন আমরা সকলেই চিন্তা করি।

আমাদের দেশ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া হাহুতাশ করিয়া কোনও লাভ নাই; জীবনসংগ্রামে আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, জয়ী হইতে হইবে। দেশের চিন্তাশীল মস্তিষ্কোপজীবী মানুষগুলিকে বাঁচাইতে হইবে, কারণ তাঁহাদের মধ্য হইতেই দেশনায়ক, সমাজনায়ক, সাহিত্যাচার্য্য মিলিবে।

(ভারতী, অগ্রহায়ণ) শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

আকাশকাহিনী

(সমালোচনা)

গত মাসে জ্যোতিষদর্পণ ও আকাশের গল্প নামক বই দুইখানার সমালোচনায় আকাশকাহিনী নামক আর একখানার উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহার লেখক শ্রীকৃষ্ণলাল-সাধু, এম এ, মহাশয় সমালোচনার্থে একখণ্ড পুস্তক আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে ২৪০ পৃষ্ঠা ও ৫০ খানা চিত্র আছে। অধিকাংশ চিত্র সুন্দর; পুস্তকের কাগজ ছাপা মলাট বাঁধা সব ভাল।

প্রথমে ডাঃ "শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক (সেন গুপ্ত)" এর ভূমিকা আছে। ভূমিকাটি ছোট, এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "আমি পণ্ডিত কৃষ্ণলাল সাধুর এর "আকাশকাহিনী" নামক পুস্তকখানি অতি যত্নের সহিত পড়িয়াছি। আকাশচিত্রের ইহা এক মহান্ চিত্র। গুরুতর বিষয় হইলেও বিষয়টি প্রাঞ্জলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বুঝিতে কিছুই কষ্ট নাই। এমন কি যাহাদের বঙ্গভাষায় কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তাঁহারা ইহার আভ্যন্তরিক চিত্রগুলির সাহায্যে সব বুঝিতে পারিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয় হইতে উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা এখন একটি প্রধান স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তকখানি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য বাঙ্গালা টেক্স্‌ট্‌বুকরূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হইবে আই, এস্‌সি ও আই, এ, পরীক্ষায়। সাধারণের পক্ষে ইহা সহজবোধ বলিয়া মনে হয়। নিম্ন শ্রেণীরও ব্যবহারে আসিতে পারে। আমার মনে হয় চন্দ্রকে প্রথম প্রবন্ধ না করিয়া পৃথিবীকে প্রথম প্রবন্ধ করিলে আরও সঙ্গত হইত। আশা করি গ্রন্থকার তাঁহার দ্বিতীয় সংস্কারে এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন।"

পুস্তকখানি আগ্রহের সহিত পড়িতে বসিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় এই চৌদ্দ ছত্রের ভূমিকায় শুরু হইতে হইয়াছিল। ডাক্তার মহাশয় কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত থাকার সময় এই কয় ছত্র লিখিয়া থাকিবেন। কারণ ব্যাকরণ ভাষা বাক্য ক্রম অলঙ্কার,—এককালে এত দোষ হঠাৎ আসিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। "চিত্রের মহান্ চিত্র" "আভ্যন্তরিক চিত্র" বরং বুঝিতে পারি, "নিম্নশ্রেণীর ব্যবহার" ও "গ্রন্থকারের সংস্কার" বুঝিতে ক্লেশ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ডাক্তার মহাশয়ের মত বুঝিতে পারা যাইতেছে। তিনি আশা করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পুস্তকখানা পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষা ও রচনারীতি শিখিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা "একটি প্রধান স্থান" পাইলেও এই পুস্তক বাঙ্গালা "টেক্স্‌ট্‌বুক" হইতে পারে কি না, তাহা বিচার করা যাউক।

ভূমিকার পরপৃষ্ঠে গ্রন্থকার মহাশয় গ্রন্থের "উপক্রমে" লিখিয়াছেন, "জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন মৌলিক গবেষণা এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য নহে; জ্যোতিষের [জ্যোতির্বিজ্ঞানের] যে-সকল বিষয় বর্ত্তমানকালপর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে, তাহারই যৎসামান্য সংগ্রহ এবং যথাযথ সন্নিবেশ করিয়া আমার স্বদেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি মাত্র। বঙ্গসাহিত্যে অনুরূপ [কিসের?] পুস্তক নিতান্ত বিরল; বঙ্গভাষায় এইরূপ [কি রূপ?] গ্রন্থ যতই অধিক প্রকাশিত হইবে, ততই আমাদের রুচি এদিকে [কোন্ দিকে?] আকৃষ্ট হইবে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনার দ্বার প্রসারিত হইবে।"

দেখা যাইতেছে, গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষা শিখাইবার আশয়ে আকাশকাহিনী লেখেন নাই, পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হইবার আশা করেন নাই। ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান দেশবাসীর নিকট প্রচার- এবং "মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন"-নিমিত্ত তিনি আকাশকাহিনী লিখিয়াছেন। দুই উদ্দেশ্য উত্তম।

কেহ কু-উদ্দেশ্যে পুস্তক লেখেন না। সাধনগুণে কিংবা সাধন-দোষে উদ্দেশ্য সফল কিংবা বিফল হয়। আকাশকাহিনী দ্বারা আমাদের "মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন" হইয়াছে কি না, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। অতএব এই পুস্তকের ভাষা শব্দবিন্যাস পারিভাষিক শব্দ সমালোচনা আবশ্যক হইতেছে।

পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভ এই,—"নিশাকালে নভোমণ্ডলের দৃশ্য অতীব মনোরম ও বিস্ময়কর। রাত্রিকালে আকাশ মেঘাবৃত না হইলে, অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র এবং অনেক সময় উজ্জ্বল চন্দ্র আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। ইহারা দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই বিস্ময়কর। মধ্যে মধ্যে উল্কাপাত পরিদর্শন করিয়া উজ্জলপ্রভ নক্ষত্রপাত বলিয়া আমাদের ভ্রম উৎপন্ন হয়। এই সমুদায় ব্যতীত সময়ে সময়ে বিচিত্রগঠন, সুন্দরকান্তি ও নয়নানন্দকর ধূম-কেতুনিকর অতর্কিতভাবে মানবগণের দৃষ্টিপথের অন্তর্গত হইয়া আমাদিগকে অনুপম আনন্দ ও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করে। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রও একটি বিস্ময়োৎপাদক নৈশ দৃশ্য।" ইত্যাদি। এইটুকু পড়িয়া থামিতে হইয়াছিল। গ্রন্থকার কেন এমন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিতেছেন? ভাষা বাঙ্গালা বটে, নহেও; ব্যাকরণ-ভুল অধিক নাই, তথাপি কেমন-কেমন ঠেকিতেছে; মনে হইতেছে যেন ভাব-প্রকাশের শব্দ জুটিতেছে না, মনে হইতেছে যেন ইংরেজীর কষ্টকৃত অনুবাদ পড়িতেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে আছে,—"ধ্বান্তারি দিনমণি সূর্য্য প্রতিদিন নৈশ তামস বিদূরিত করিয়া উষান্তে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছে এবং প্রাণিগণ ও উদ্ভিদনিবহের প্রভূত মঙ্গল-সাধন করিতেছে।" ইত্যাদি। তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে আছে,—"পৃথিবী আমাদের জন্মভূমি ও বাসস্থান; পৃথিবী আমাদিগের জননী। আমরা ধরাতলে জন্মলাভ করিয়া ধরাপৃষ্ঠের বায়ু, জল খাদ্য দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া জীবিত থাকি ও অবশেষে ধরণীপৃষ্ঠেই লয়প্রাপ্ত হই।' ইত্যাদি।

লেখকমহাশয় সহজ স্বাভাবিক রচনারীতি ছাড়িয়া কৃত্রিম অনভ্যস্ত রীতি অনুসরণ দ্বারা গ্রন্থখানির দুর্দ্দশা করিয়াছেন। স্বর্গীয় অক্ষয়-কুমার দত্তের চারুপাঠ কিংবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস যে রীতিতে রচিত সে রীতি কেবল সংস্কৃতশব্দবাহুল্যে আসে নাই। পাঠশালার পড়ুয়া "দেখা দর্শন" পরিবর্ত্তে হাজার "পরিদর্শন সন্দর্শন" লিখুক; "সমূহ নিবহ নিকর সমুদায় সমবায় গণ বৃন্দ" প্রভৃতি লিখুক; লেখার কাঁচা ছাঁদ পাকা হয় না। "রাহুগ্রস্ত চন্দ্রও একটি বিস্ময়োৎপাদক নৈশ দৃশ্য," "অকৃষ্ট ভূমিসকল উর্ব্বরা হইয়া কৃষকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে ও কালে প্রভূত শস্যসম্ভার প্রদান করে," "ধূমকেতুসকল আয়তনে অতিশয় বৃহৎ," ইত্যাদি পড়িতে পড়িতে বিদ্যালয়ের এক পাঠ্য পুস্তকের ভাষা মনে পড়ে। তাহাতে আছে, বঙ্গদেশ গঙ্গানদীর দান। "পৃথিবী আমাদের বাসস্থান" বলিয়া "পৃথিবী আমাদের জননী" বলিলে অলঙ্কারে দোষ পড়ে। যাঁহারা অলঙ্কার শিখিয়াছেন, বুঝেন, তাঁহারা ভাষায় অলঙ্কার দিতে পারেন। অপরের পক্ষে অলঙ্কারের চেষ্টায় হাস্যরস জমে, কবিত্বরস জমে না। এক সাহিত্যলেখক লিখিয়াছেন, "এই সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান হয় নাই, হইলে বহু-কালের আবদ্ধ ধূসরবর্ণ তুলট কাগজের গোর হইতে আমরা প্রাচীন

কবিগণের আর কতগুলি কঙ্কাল উত্তোলন করিতে পারিব, কে বলিতে পারে ?" ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, গোর হইতে মৃতদেহ উত্তোলনে বিলাতেও না-কি ধর্ম্মলঙ্ঘন হয়, এদেশের শ্মশানভূমি হইতে কঙ্কাল উত্তোলন সম্ভব হইবে না। [পুস্তকখানির চতুর্থ সংস্করণে দেখিতেছি, গোর স্থানে সমাধিক্ষেত্র হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও অলঙ্কারের দোষ যায় নাই।]

দেখিতেছি, ইংরেজী naked eye বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতে লেখকমহাশয় একটু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কোথাও লিখিয়াছেন "মুক্তনেত্রে," কোথাও লিখিয়াছেন "অনাবৃত চক্ষে"। কিন্তু কে চোখ বাঁধিয়া ঢাকিয়া কিছু দেখিতে পায় ? "আকাশমণ্ডলে আমরা নগ্নচক্ষে যে-সকল বস্তু দেখিতে পাই, তন্মধ্যে চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন পদার্থ।" এখানে নগ্ন ছাপার ভুলে লগ্ন হইয়াছে বটে, চক্ষুর প্রতিচক্ষু কিংবা দূরবীক্ষণ কিন্তু নগ্নতা দূর করিতে পারে কি ? চক্ষু নগ্ন হউক, আবৃত হউক, চন্দ্র কি ক্ষুদ্র দেখায় ? একথা ঠিক চন্দ্র বড় দেখাইলেও বাস্তবিক ছোট। উল্কা কিন্তু আরও ছোট। "প্রতীয়মান পথ", "প্রতীয়মান গতি" ইত্যাদির প্রতীয়মান অর্থে জ্ঞায়মান, যাহাতে প্রতীতি হইতেছে। লেখকের উদ্দেশ্য বিপরীত। সংস্কৃত জ্যোতিষে আছে স্ফুট পথ, স্পষ্ট পথ, ইংরেজী apparent path, স্ফুটগ্রহস্থান সংক্ষেপে স্ফুটগ্রহ, apparent place of the planet। ইদানী বাঙ্গালায় গ্রহস্ফুট চলিতেছে, স্থান শব্দটি উহ্য থাকিতেছে। "পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ" অদ্ভুত ! কারণ গ্রাস আর গ্রহণ একই, এবং লোকে চন্দ্রের পূর্ণ-গ্রাস কিংবা পূর্ণ-গ্রহণ বলে। চন্দ্রের পাতের নাম রাহু ও কেতু। "শুক্রের রাহু কেতু" নূতন। পাত শব্দ সামান্য ; গ্রহের পাত (nodes) বলা হয়। বিষুবরেখা না বলিয়া বিষুববৃত্ত, বিষুবমণ্ডল, কিংবা বিষুববলয় বলা ভাল। কিন্তু সেটা ভূপৃষ্ঠে নহে, আকাশে। ভূপৃষ্ঠে নিরক্ষ। বিষুববৃত্তের "পরিধিকে ভচক্র বা আকাশবিষুব বলে।" ভচক্র শব্দের ভ অর্থে নক্ষত্র। সুতরাং ভচক্র বা নক্ষত্রচক্র, আর ক্রান্তিবৃত্ত এক। ক্রান্তি শব্দের মূল অর্থ ক্রমণ বা গমন। যে-পথে রবি গমন করেন, তাহা ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic), এবং বিষুববৃত্ত হইতে উত্তর-দক্ষিণে গমন দ্বারা যে অন্তর হয়, তাহা ক্রান্তি (declination)। সুতরাং "মহাবিষুব ক্রান্তি" ও "জলবিষুব ক্রান্তি" নূতন রচনা। এস্থলে বিষুবপাত বলে। এইরূপ নানা শব্দ অপ্রযুক্ত হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দ থাকিতে নূতন শব্দ রচনা কিংবা পুরাতন প্রচলিত শব্দ ভিন্নার্থে প্রয়োগ আবশ্যক ছিল না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ জ্যোতির্বিদ্যার যাবতীয় পারিভাষিক শব্দ অন্ততঃ দুইবার প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার মহাশয় পরিষৎপত্রিকা অন্বেষণ না করিয়া ভাল করেন নাই।

কিন্তু অন্য শব্দ প্রয়োগেও দুই পাঁচটা ভুল চোখে পড়িতেছে। "চক্রনেমি হইতে যত পরিধির নিকট দিয়া যাওয়া যায়" (৭০ পৃঃ), "চক্রনেমিবৎ এই দুই স্থান নিশ্চল" (১৫৭ পৃঃ)। কিন্তু নেমি যা পরিধি তা ; নেমি অর্থে নাভি কিংবা কেন্দ্র নাই। "পরিধির নিকট দিয়া" নহে "পরিধির নিকটে" হইবে। ইংরেজী article অনুবাদে "অনুবন্ধ" হইতে পারে কি ? দুই এক স্থানে "প্রবন্ধ" শব্দও দেখিতেছি। আমি "প্রক্রম" করিয়াছিলাম। "আবার সূর্য্যের সহিত চন্দ্র একত্র না হইলে অমাবস্যা হইতে পারে না।" (১০ পৃঃ)। এখানে "আবার" শব্দটার অর্থে আর বার ; পুনর্ব্বার বুঝিয়া কথাটা ধরিতে পারি নাই ; ইংরেজী again, on the other hand, moreover, further শব্দের অনুবাদে "আবার" বুঝিবার পর অর্থগ্রহ হইল। "কিন্তু" বলিলে অর্থক্লেশ হইত না। "একত্র" অর্থে একস্থানে জানি ; একদিকে বুঝায় কি ? গ্রন্থকার "একস্থানে" অর্থ ধরিয়া উপরে লিখিয়াছেন, "যখন আমরা চন্দ্র ও সূর্য্যকে একস্থানে অবস্থান করিতে দেখি, সেই দিন অমাবস্যা হয়।" কিন্তু "একস্থানে" বলা যাইতে পারে কি ? "যখন" পরে "তখন", "সেইদিন" আগে "যেদিন" বসে। "চন্দ্র ও সূর্য্যকে" না বলিয়া "চন্দ্র ও সূর্য্য" বলিলে ব্যাকরণে দোষ পড়িত না। "মুক্তনেত্রে চন্দ্রকে আমরা থালার ন্যায় দেখিতে পাই [দেখি ?]" "দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দর্শন করিলে কিন্তু চন্দ্রকে থালার ন্যায় দেখায় না ; বর্ত্তুলাকার দেখায়" (২৪ পৃঃ)। কিন্তু দূরবীক্ষণে চন্দ্র বর্ত্তুলাকার দেখায় কি ? "উদ্ভিদের দেহ প্রধানতঃ অঙ্গারক বায়ু দ্বারাই গঠিত" (২৯ পৃঃ)। "সূর্য্যালোকের সাহায্যে উদ্ভিদ্গণ বায়ুরাশিস্থ দ্বিঅম্ল-অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বায়ু বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ" (৩৬ পৃঃ)। অঙ্গার বায়ু, অঙ্গারক বায়ু কি পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অঙ্গার অঙ্গারক অর্থে ইংরেজী কার্বন বুঝিলে তাহা বায়ু বুঝিতে হইবে কি ? দ্বিঅম্ল-অঙ্গারক বায়ু ইংরেজী অনুবাদ করিলে হইবে, Dioxide Carbonic air। মনে হইতেছে, কেহ কেহ এই রকম একটা দ্বিঅম্ল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। "মেষরাশি ও অশ্বিনী নক্ষত্র একই" (১৬১ পৃঃ)। "অশ্বিনী নক্ষত্রের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও ক্ষোদিত হইয়াছে, অশ্বিনী বা মেষরাশি"। গ্রন্থকার পাঠককে ফাঁপরে ফেলিয়াছেন। কারণ রাশি ও নক্ষত্র এক হইতে পারে না। "প্রত্যেক রাশিতে সওয়া দুইটি নক্ষত্র বিদ্যমান" (১৬২ পৃঃ)। দুইটি—টি যোগ হেতু বস্তু—তারা—বুঝাইতেছে, পাঠক ফাঁপরে পড়িবেন। "বিদ্যমান" শব্দ দ্বারা ধাঁদা একটু হইবে। প্রতিরাশিতে সওয়া দুই নক্ষত্র, কিংবা সওয়া দুই নক্ষত্রে রাশি, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় নাই। "এক এক নক্ষত্রের পরিমাণ সাড়ে তের অংশ" (১৬২ পৃঃ)। "সাড়ে তের অংশ" স্থানে তের অংশ কুড়ি কলা হইবে। "আকৃতি সম্বন্ধে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ ও সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখিতে প্রায় একরূপ, যদিও কৃত্তিকানক্ষত্র অনেক ক্ষুদ্র।" (১৬২ পৃঃ)। ইহার ভাষা যাহাই হউক, একবার "কৃত্তিকানক্ষত্রপুঞ্জ" পরবার "কৃত্তিকানক্ষত্র" বলায় বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণে দোষ পড়িয়াছে। বস্তুতঃ নক্ষত্র শব্দের যে তিন অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বলিয়া না দিলে পাঠক একের সহিত অপর মিশাইয়া ফেলিবেন। "চন্দ্রের দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধিপ্রযুক্ত আমাদের দৃষ্টিতে তাহার আকারেরও কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি হয়" (৫ পৃঃ)। বরং বলা উচিত, আকারের (ঠিক কথায়, বিম্বব্যাসের বা বিম্বকলার) হ্রাসবৃদ্ধি দেখি বলিয়া বুঝি চন্দ্রের কক্ষা বৃত্তাকার নহে। "পৃথিবী ৩৬৫ দিনে ৬ ঘণ্টায় একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া, আমরা দেখি যে, সূর্য্য ঐ সময়ের মধ্যে [সময়ে] একবার আকাশপথে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আইসে" (১০ পৃঃ)। এখানেও প্রত্যক্ষানুমানের বিপর্য্যয় হইয়াছে। যাহা হউক, দেখা গেল আকাশকাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পাঠ্য হইতে পারে না।

কিন্তু ভাষার জঞ্জাল ও শব্দের অযুক্ত প্রয়োগ এড়াইয়া চলিতে পারিলে এই পুস্তক হইতে পাঠক অনেক শিখিতে পারিবেন। ইহার প্রথম গুণ, ইহাতে গ্রহ ও তারা চেনাইবার উপায় আছে। সে উপায় সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু পাঠকের দিগ্দর্শন হইতে পারিবে। দ্বিতীয় গুণ, আমাদের প্রচলিত পাঁজির সাহায্যে পাঁজি ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা বুঝিবার চেষ্টা হইয়াছে। পাঁজি ধরিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যার বড় অংশ পাঠককে শিখাইতে পারা যায়। ভূপৃষ্ঠগতের ব্যাস ৮০ মাইল কি দুই দশ মাইল ন্যূন, জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রথম পুস্তকে ইহার বিচার অনাবশ্যক। আরও কত জ্ঞাতব্য আছে, তাহা দেখাইতে

বুঝাইতে পারিলে গল্পলেখা সফল হয়। আকাশ-কাহিনীতে পাঁজির অত্যল্প আছে; যেটুকু আছে, তাহাও গোড়া ধরিয়া নহে। এখানে ওখানে যেমন প্রসঙ্গ পড়িয়াছে তেমন পাঁজির পাতা উলটানা হইয়াছে। পাঁজি সম্বন্ধে এক অধ্যায় লিখিলে ভাল হইত। পুস্তকখানির তৃতীয় গুণ, অধিকাংশ স্থলে ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল হইয়াছে। যেখানে হয় নাই, সেখানে গ্রন্থকারের চেষ্টার ত্রুটি মনে হয় না: মনে হয় বাঙ্গালা বলা ও লেখার অনভ্যাসে ভাষা কুটিল হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, ৭৩ পৃষ্ঠায়, "পৃথিবীর মেরুরেখা-সকল পরস্পর সমান্তর; কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণভাবে সমান্তর নহে। মেরুরেখাগুলি সামান্য পরিমাণ কোণ উৎপন্ন করে।" ইত্যাদি। যিনি ব্যাপারটা না জানেন, তিনি এই ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিবেন না।

আমি পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পড়িবার অবসর পাই নাই। দুই বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাভাষায় জ্যোতির্ব্বিদ্যার তিনখানা পুস্তক প্রকাশিত হইল, ইহাতে আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গালা বলিয়া কিংবা প্রথম-শিক্ষার্থীর পুস্তক বলিয়া সমালোচনায় আদর্শ হইতে স্খলিত হইতে পারি না। "নাই মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল" কি মন্দ, সে তর্কে প্রয়োজন নাই। ইয়ুরোপের বিজ্ঞান বাঙ্গালায় চাই, ভাল রকম চাই, বিজ্ঞান চাই। গল্পের ভাষা যাহাই হউক, বিজ্ঞানের ভাষা শুদ্ধ ও গুণ-সম্পন্ন, শব্দ একার্থ ও স্পষ্টার্থ না হইলে বিজ্ঞান অ-বিজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই হেতু পুস্তক তিনখানির ভাষা একটু অধিক বিচার করিতে হইয়াছে। *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক মাসে প্রশ্ন মুদ্রিত করিব: প্রবাসীর সকল পাঠকপাঠিকাই অনুগ্রহ করিয়া সেই প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। যে মত বা উত্তরটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক ব্যক্তি পাঠাইবেন আমরা তাহাই প্রকাশ করিব। কোন উত্তর সম্বন্ধে অন্তত দুইটি মত এক না হইলে তাহা প্রকাশ করা যাইবে না। বিশেষজ্ঞের মত বা উত্তর পাইলে তাহা সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইবে। পাঠকপাঠিকাগণও প্রশ্ন পাঠাইতে পারিবেন; উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহা আমরা প্রকাশ করিব এবং যথানিয়মে তাহার উত্তরও প্রকাশিত হইবে। ইহাদ্বারা পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে চিন্তা উদ্বোধিত এবং জিজ্ঞাসা বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আশা করি। যে মাসে প্রশ্ন প্রকাশিত হইবে সেই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌঁছা আবশ্যক, তাহার পর যে-সকল উত্তর আসিবে, তাহা বিবেচিত হইবে না।

—প্রবাসীর সম্পাদক।]

গতবারে আমরা বাংলাভাষার শত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের নাম চাহিয়াছিলাম। তদুত্তরে আমরা খুব বেশী লোকের সাড়া পাই নাই। যাঁহাদের মত পাইয়াছি তাঁহাদের অধিকাংশের মতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। কতকগুলি বই একই সংখ্যক ভোট পাওয়াতে তাহাদিগকে সমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য করিতে হইয়াছে, এবং তাহাতে নির্ব্বাচিত পুস্তকের সংখ্যা হইয়াছে ১০২। কতকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক দুই এক সংখ্যা ভোটের জন্য তালিকাভুক্ত হইতে পারে নাই; তাহাদের নামও পরিশিষ্টরূপে সন্নিবেশিত করিলাম।

কয়েকজন ভদ্রলোক একবার একপ্রকার তালিকায় স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইয়া, পুনরায় অপরবিধ তালিকা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; অথচ দ্বিতীয় তালিকায় প্রথম তালিকা বাতিল ও নাকচ হইল বলিয়া আমাদিগকে জানান নাই। এই দ্বৈধ ধরা না পড়িলে নির্ব্বাচন অন্যবিধ হইয়া যাইত। যাঁহারা জানিয়া বুঝিয়া নিজের হাতে সই করিয়া দুবার ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোনো বারেরই ভোট আমরা গণ্য করি নাই; প্রথম বারের ভোট গণ্য করিলে পরিশিষ্টে প্রদত্ত পুস্তকের কয়েকখানি নির্ব্বাচিত তালিকায় আসিত এবং নির্ব্বাচিত পুস্তকের কয়েকখানি পরিশিষ্টে যাইত। সুতরাং পরিশিষ্টটিরও মূল্য আছে স্বীকার করিতে হইবে।

বাংলা ভাষার হাজার হাজার গ্রন্থের মধ্যে যে অল্প কয়েকখানি পুস্তক অন্তত দুটি লোকের মতেও উল্লেখ-যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে তাহাদের নামোল্লেখ করিতে পারিলে উত্তম হইত; কিন্তু স্থানাভাবে বিরত থাকিতে হইল। যতগুলি লোকে মত পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই মেঘনাদবধ কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়াছে মেঘনাদবধ কাব্য।

কয়েকখানি পুস্তক সম্পূর্ণ মৌলিক বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য না হইলেও লেখকের লোকপ্রিয়তার জন্য বা বিষয়ের গুরুত্বের খাতিরে ভোট পাইয়া তরিয়া গিয়াছে; তাহাদের বেলা ভোটদাতারা রচনার পারিপাট্য ও উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। আমাদের

---

* এখানে একটু অভিযোগ করিতে হইতেছে। "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" গ্রন্থ প্রকাশের পর কেহ কেহ ইহা হইতে কিছু কিছু লইয়া নিজ নিজ পুস্তকে নিবিষ্ট করিয়াছেন। পঞ্জিকাকার হইতে মাসিকপত্রের প্রবন্ধ-কার সুবিধা পাইলে কেহ ছাড়েন নাই। প্রায় সকলেই কিন্তু মূলগ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এদেশে ইংরেজী বহি প্রায় লা-ওয়ারিশ মাল। কিন্তু বাঙ্গালা বহি তৎতুল্য জ্ঞান করা চলে কি?

সাহিত্যের সকল বিভাগেই উৎকৃষ্ট পুস্তক না থাকাতে প্রত্যেক বিভাগের প্রতিনিধিস্বরূপ পুস্তকের নাম করিতে গিয়া অনেক নিতান্ত সাধারণ ও বিশেষত্ববর্জ্জিত পুস্তকও নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বাস্তবিক একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে গেলেই দেখা যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ললিতকলা, নানা দেশের সাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনা, রাষ্ট্রনীতি, জীবনচরিত-প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্গসাহিত্য কিরূপ দরিদ্র। বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী ও সতীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বঙ্গভাষার দুখানি মহার্হ রত্ন; কিন্তু দেখা গেল তাহারা অতি অল্প লোকেরই পরিচিত; সুতরাং উহাদের উল্লেখ এখানে বিশেষ ভাবে করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

কাব্যবিভাগে মোট নির্ব্বাচিত পুস্তক ২৮ খানি। তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮ খানি, নবীনচন্দ্র সেনের ২ খানি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ২ খানি; বাকি এক এক লেখকের একএকখানি।

উপন্যাসবিভাগে মোট ২১খানি নির্ব্বাচিত পুস্তকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ৭ খানি, রবীন্দ্রনাথের ৫ খানি, প্রভাতকুমারের ২ খানি, রমেশচন্দ্র দত্তের ২ খানি; অপরাপর লেখকের একএকখানি।

নাটকবিভাগে ১০ খানি নির্ব্বাচিত পুস্তকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ৫ খানি, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ২ খানি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ২ খানি, দীনবন্ধু মিত্রের ১ খানি।

প্রবন্ধ ও সমালোচনা-বিভাগে ১৬ খানি নির্ব্বাচিত পুস্তকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ৬ খানি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ২ খানি, বঙ্কিমচন্দ্রের ২ খানি; অপরাপর লেখকের একএকখানি।

ধর্ম্মকথা-বিভাগে ৭ খানি পুস্তকের মধ্যে ২ খানি রবীন্দ্রনাথের; অপরাপর লেখকের একএকখানি।

ভ্রমণ, জীবনচরিত, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও কোষ, এবং বিবিধ বিভাগে একই লেখকের একাধিক পুস্তক নাই।

১০২ খানি নির্ব্বাচিত পুস্তকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ২৯ খানি; ইতিহাস এবং ভাষাতত্ত্ব ও কোষ-বিভাগ ছাড়া অপর সকল বিভাগেই রবীন্দ্রনাথের পুস্তক আছে; সাহিত্যের এই দুই বিভাগেও "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা" ও "শব্দতত্ত্ব" সম্পূর্ণ নূতন দিক নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাহার পরই বঙ্কিমচন্দ্রের নির্ব্বাচিত পুস্তকসংখ্যা—১১। তৎপরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নির্ব্বাচিত পুস্তকসংখ্যা—৪। তৎপরে ২ খানি করিয়া পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছে যাঁহাদের তাঁহাদের নাম—নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়কুমার দত্ত, বিবেকানন্দ স্বামী, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং বলিলে বলিতে পারা যায় শ্রীনিখিলনাথ রায়।

নির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকাবলী

কাব্য

১। মেঘনাদবধ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

২। গীতাঞ্জলি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
রামায়ণ—কৃত্তিবাস ওঝা।
মহাভারত—কাশীরাম দাস।

৬। সোনার তরী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭। বৃত্রসংহার—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। অশোকগুচ্ছ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

৯। পদাবলী—চণ্ডীদাস।
পলাশীর যুদ্ধ—নবীনচন্দ্র সেন।

১১। আলো ও ছায়া—শ্রীমতী কামিনী রায়।

১২। মানসী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কুরুক্ষেত্র—নবীনচন্দ্র সেন।

১৪। খেয়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
স্বপ্নপ্রয়াণ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৬। কথা ও কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭। নৈবেদ্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
হাসির গান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
বাণী—রজনীকান্ত সেন।
চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

২১। মন্দ্র—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

২২। চণ্ডী—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।
২৩। গীতিমাল্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৪। চিত্রা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
পদাবলী—রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন।
মহিলা—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।
কুহু ও কেকা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
পদ্মিনী—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গল্প ও উপন্যাস

১। কৃষ্ণকান্তের উইল—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২। গল্পগুচ্ছ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
গোরা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪। চোখেরবালি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বিষবৃক্ষ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
স্বর্ণলতা—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
৭। আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৮। দেশী ও বিলাতী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৯। চন্দ্রশেখর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
দেবী চৌধুরাণী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মাধবীকঙ্কণ—রমেশচন্দ্র দত্ত।
১২। রাজকাহিনী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সংসার—রমেশচন্দ্র দত্ত।
১৪। কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৫। রাজসিংহ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৬। নৌকাডুবি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
যুগান্তর—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।
ষোড়শী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
বিন্দুর ছেলে—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২১। সওগাত—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটক

১। নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র।
২। চিত্রাঙ্গদা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩। প্রফুল্ল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
৪। বিসর্জ্জন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫। রাজা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬। রাজা ও রাণী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
দুর্গাদাস—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
৯। অচলায়তন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিল্বমঙ্গল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

প্রবন্ধ ও সমালোচনা

১। জিজ্ঞাসা—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
২। কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩। প্রাচীন সাহিত্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪। সামাজিক প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
শকুন্তলাতত্ত্ব—চন্দ্রনাথ বসু।
৬। রাজা ও প্রজা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ভারতশিল্প—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮। সাহিত্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সমাজ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
স্বদেশ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১। আধুনিক সাহিত্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—অক্ষয়কুমার দত্ত।
১৩। বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
পারিবারিক প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
১৫। বিধবাবিবাহ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
১৬। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—বিবেকানন্দ স্বামী।

ধর্ম্মকথা

১। শান্তিনিকেতন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত।
৩। ভক্তিযোগ—শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।
৪। গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
৫। ধর্ম্ম—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬। রামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম—।
৭। ধর্ম্মতত্ত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভ্রমণ

১। হিমালয়—শ্রীজলধর সেন।

২। যুরোপযাত্রীর ডায়ারী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
পরিব্রাজক—বিবেকানন্দ স্বামী।

জীবনচরিত

১। বিদ্যাসাগর—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।
৩। জীবনস্মৃতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪। রামমোহন রায়—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।
৬। আত্মজীবনী—রাজনারায়ণ বসু।

ইতিহাস

১। সিরাজউদ্দৌলা—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
২। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস—রজনীকান্ত গুপ্ত।
৩। গৌড়রাজমালা ও লেখমালা—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ্র ও শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
৪। বাঙ্গালার নবাবী আমলের ইতিহাস—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। মুর্শিদাবাদকাহিনী ও মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—শ্রীনিখিলনাথ রায়।

ভাষাতত্ত্ব ও কোষ

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।
২। বাঙ্গালা শব্দকোষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।
৩। বিশ্বকোষ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বিবিধ

১। কমলাকান্তের দপ্তর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২। ছিন্নপত্র—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম—শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট

১০৩। আত্মজীবনী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কল্যাণী—রজনীকান্ত সেন।
উড়িষ্যার চিত্র—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।
জাপান—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রতাপাদিত্য—শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
ভূপ্রদক্ষিণ—শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।
প্রকৃতিবাদ অভিধান—রামকমল বিদ্যালঙ্কার।

১১০। শিশু—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী।
মেবারপতন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
ঝাঁপি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
পুষ্পপাত্র—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১৫। ক্ষণিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শব্দতত্ত্ব—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মালিনী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
অমিয় নিমাইচরিত—শিশিরকুমার ঘোষ।
পদাবলী—বিদ্যাপতি।
আলালের ঘরের দুলাল—টেকচাঁদ ঠাকুর।
সধবার একাদশী—দীনবন্ধু মিত্র।
এষা—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।
ধ্রুবতারা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।
ধর্ম্মমঙ্গল—ঘনরাম।
বিবাহ বিভ্রাট—শ্রীঅমৃতলাল বসু।
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।
ব্যাকরণ-বিভীষিকা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যো।
ভারতভ্রমণ—শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।
সমাজ—রমেশচন্দ্র দত্ত।
অন্নপূর্ণার মন্দির—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

১৩১। কল্পনা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কণিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
লোকসাহিত্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বৈষ্ণব পদাবলী—
বীরাঙ্গনা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
রেখাক্ষর-বর্ণমালা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রৈবতক—নবীনচন্দ্র সেন।
বিরহ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
বলিদান—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
রামায়ণী কথা—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।
জ্ঞানযোগ—বিবেকানন্দ স্বামী।
ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
নব্য রসায়নীবিদ্যা—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।
ফুলের ফসল—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নূতন প্রশ্ন

১। ইংরেজবিজয়ের পরবর্ত্তী কালের বাংলা দেশের এমন বারো জন মৃত ও জীবিত শ্রেষ্ঠ লোকের নাম করুন যাঁহাদিগকে আমরা জগৎসভায় প্রতিনিধি পাঠাইয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি এবং যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিলে যে-কোন দেশ গৌরবান্বিত হইত।

২। বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা কে?

৩। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের মধ্যে উৎকৃষ্টতম দশটির নাম কি?

[তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় সবুজপত্রে প্রকাশিত নূতন গল্প কয়টি, গল্পগুচ্ছ পাঁচ ভাগ ও গল্প চারিটি নামক পুস্তকের গল্পগুলি ধরিয়া বিচার করিতে হইবে।]

দেশের কথা

কথায় বলে—

'দুঃখী যায় সেই পথে।
দুঃখ যায় তার সাথে সাথে॥'

এদেশের অবস্থাও ঠিক তাই। একেতো দুর্ভিক্ষের 'বারমাস!' ঘরে ঘরে, তার উপর আধিব্যাধি খরাবর্ষা যাহাকিছু একবার দেখা দিবে তাহাই চা-বাগানের কুলির চুক্তির মত দেশের রক্ত না চুষিয়া ছাড়িবে না! বিদেশী যুদ্ধের ফুল্‌কি লাগিয়া যখন এদেশের পাটের বাজারে আগুন ধরিল, তখন ধান ফেলিয়া ক্ষেতে পাট বোনার জন্য আমরা অনেকেই চাষাদের চৌদ্দপুরুষের মানরক্ষা করিতে পারি নাই। কিন্তু কৃষকদেরও তো একটা কৈফিয়ৎ আছে। কবি গোবিন্দদাস 'সৌরভে' সে কৈফিয়তের এই আভাস দিয়াছেন—

"ওরে, আমার সাধের পাট!
তুমি, ছেয়ে আছ বাঙ্গ্‌লা মুলুক—
বাঙ্গ্‌লা দেশের মাঠ!
যে দেশে যেখানে যাই,
সেথায় তোমায় দেখ্‌তে পাই,
গ্রামে গ্রামে আফিস তোমার
পাড়ায় পাড়ায় হাট।
ধান ফেলিয়ে তোমায় বোনে,
বাধা নিষেধ নাহি শোনে,
ছালায় ছালায় টাকা গোণে,—
চাষার বাড়্‌ছে ঠাট।
যার ছিল না ছনের কুঁড়ে,
তাহার এখন বাড়ী যুড়ে'
চৌচালা আট-চালা কত,
ঝিল্‌মিলি কপাট!
যার ছিল না ছেঁড়া পাটী,
মাটীর সান্‌কী বদ্‌না বাটী,
প্লেট্‌ পেয়ালা পরিপাটী,
এখন পালং খাট!
নেকড়া-পরা পেঁচী বুঁচী,
পিঁড়িতে আর হয় না রুচি,
এখন সোনার বাউটী পঁচি,
উজল করে ঘাট!"

চাষ বা বাজারের অবস্থা ভাল হইলে, কৈফিয়তের এ অংশ টেকসই হইতে পারে। কিন্তু একটু দূরদৃষ্টি করিতে গেলেই আবার যে গোবিন্দদাসের কথায়ই মনে হয়—

"তোমার হ'লে অল্প ফলন,
কঠিন বড় খাজ্‌না চলন,
রাজা প্রজা সবার দলন,
বিষম বিভ্রাট!
সার্ভিয়া অষ্ট্রীয়ার লড়াই,
আমরা নাহি তারে ডরাই,
তোমার হ'ল খরিদ বন্ধ,
তাইতে "গৌরাঙ্গ্‌ কাঠ।"
মহাজনে দেয় না টাকা,
কিসে যায় আর বেঁচে থাকা,
পঞ্জাবে মান্দ্রাজে অকাল,
বাঙ্গালা গুজ্‌রাট!"

এখন এ সমস্যার উপায় কি? এদিকে কৃষক অর্থবান্ হইলে দেশের ধনবল বৃদ্ধি পাইবে, অন্যদিকে পাটের দ্বারা এই ধনবৃদ্ধির সহায়তা হইতে থাকিলে ধানের চাষ ক্রমশ হ্রাস পাইয়া অন্নসঙ্কট উপস্থিত হইবে; তার উপর 'অল্পফলন' হইলে বা অজন্মা হইলে তো সর্ব্বনাশ! বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের এ বিরোধের মিলন কোথায়? মফঃস্বলের দুই একখানি পত্রিকায় এ বিষয়ের এক আধটুকু আলোচনা দেখা যাইতেছে। আমরা নিম্নে তাহারই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

'ঢাকাগেজেট' বলেন—

"কথা হইতেছে, দেশে এত অধিক পাটের আবাদ হওয়া উচিত কি না? ইহাতে দেশের লাভ, না লোকসান? ব্যবসায় বাণিজ্যে আমরা বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় পারি না, হারিয়া যাই; এই অবস্থায় যদি আমরা এমন কোন দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারি যাহা অন্য দেশে নাই, যাহা অন্য দেশে হয় না, তবে তাহা করিব না কেন? দিন দিন পাটের ব্যবসায় বাড়িয়া যাইতেছে, বাঙ্গলা এ মহাসুযোগ ছাড়িবে কেন? এমন জমি আছে যাহাতে অন্য ফসল ভাল হয় না, অথচ পাট বেশ হয়; এমন জমিও আছে যাহাতে ১৲ টাকার ধান জন্মে, কিন্তু পাট জন্মে ৫০৲ টাকার। তবে পাট বপন করিবে না কেন? অবশ্যই করা উচিত।

কিন্তু বিপদের প্রতিকারার্থে কি করা কর্ত্তব্য? ধান অবশ্যই বুনিতে হইবে। যদি পাঁচ কাণি জমি থাকে, ৩ কাণিতে পাট ও ২ কাণিতে ধান বপন করিলেই সমস্যা মিটিবে। ঘরে ধানও থাকে, অথচ নগদ অর্থাগমও হয়। যেমন অল্প জমিতে ধান বপন করিতে হইবে, তেমন যাহাতে সেই জমিতে ফসল অধিক জন্মে কৃষকদিগকে তাহা বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। দেশে কত অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে, তাহা আবাদ করিতে হইবে। তবেই সমস্যার পূরণ হইবে।"

বাগেরহাটের 'জাগরণ' একথা সমর্থন করেন না। তাই ঐ পত্রিকায় প্রকাশ—

"যাঁহারা অর্থনীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত তাঁহারা পাটের চাষের অভাবে দেশে ধনাগমের পথ-রোধকে দেশের পক্ষে মহা অনিষ্টকর মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমরা তাহা করি না। দশ টাকা আয় করিয়া বার টাকা ব্যয় করা অপেক্ষা পাঁচ টাকা আয় করিয়া চারি টাকা ব্যয় করা কি ভাল নহে? যাঁহারা দেশের অবস্থা জানেন তাঁহারা বুঝিবেন এবং স্বীকার করিবেন যে পাটের চাষে কৃষকেরা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেও তাহাদের সে অর্থ অধিকাংশ অপব্যয়ে নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের কোনও শ্রদ্ধেয় দেশ-হিতৈষী বন্ধু এক সময়ে ফরিদপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থানে সাহায্য প্রদান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি কৃষকেরা বাস করিবার জন্য টীনের ঘর করিয়াছে কিন্তু খাইতে না পাইয়া সে বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে ষ্টীমারে কয়েকজন কৃষক যাইতেছিল তাহারা অন্নভাবে ক্লিষ্ট, কিন্তু ষ্টীমারে বসিয়া চুরুট খাওয়া চলিতেছিল। এক পয়সার তামাক কিনিলে তাহাতে হয়তো দুই দিন চলিতে পারিত, কিন্তু এক পয়সার চুরুটের দ্বারা দুই বারের বেশী খাওয়া চলে না। তিনি যখন তাহাদিগকে এ কথা বুঝাইয়া দিলেন তখন তাহারা লজ্জিত হইল। এটি একটি সামান্য দৃষ্টান্ত।

কৃষককুল যে বিলাসী বাবু সাজিয়াছে তাহার প্রমাণের বা দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শীতকালে বঙ্গদেশের নানা স্থানে মেলা হইয়া থাকে। সে মেলার জিনিষ কাহারা ক্রয় করে? যে-সকল অকিঞ্চিৎকর মনোহারী অসার দ্রব্য বিলাত হইতে আসিয়া এ দেশের অর্থ শুষিয়া লইতেছে তাহার অধিকাংশ ইহারাই ক্রয় করিয়া থাকে। এমন কি, অর্থ দ্বারা তাহারা পাপ এবং স্বাস্থ্যহানির বিষময় বীজও ক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পাট বিক্রয় করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহা এইরূপ ভাবেই অপব্যয়িত হইয়া থাকে, গৃহস্থের ঘরে একটি পয়সাও থাকে না। অভাবে পড়িলে সেই চিরন্তন প্রথা উচ্চহারে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পাট না বুনিয়া ধান বুনিলে অন্ততঃ খাদ্যের অভাব হয় না। এই-সকল কথা মনে করিলে ইহাই সঙ্গত মনে হয় যে পাটের চাষে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম না করিয়া ধানের চাষের জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। যদি বুঝিতাম এই পাটের ব্যবসায়ের অর্থ দ্বারা দেশের লোকে ধনবান হইতেছে তবে ইহার সপক্ষে দুটা কথা বলিতে পারিতাম। পাটের ব্যবসায় দ্বারা এ দেশের লোকে যে লাভ করে তাহা অতি সামান্য। বিদেশী লোকে এই পাট ক্রয় করিয়া বিদেশে প্রেরণ করে, তাহা দ্বারা জিনিষ প্রস্তুত হইয়া এদেশে আসিয়া আমাদের অর্থ শুষিয়া লয়। আমাদের কৃষককুলের পরিশ্রম, আমাদের দেশের দালালেরা সেই পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্য বিদেশীর নিকট বিক্রী করে, তাহারাই লাভ করে। আবার তাহা দ্বারা যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা আমরাই বেশী মূল্যে ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে লাভবান করি।

আমাদের শিল, আমাদের নোড়া, তাহা দ্বারা আমাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গা হয়। যদি পাটের চাষ করিতে হয় তবে দেশের লোকে যাহাতে তাহার ব্যবসায় করিয়া লাভবান হইতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।"

'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশে' শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু রঙ্গপুরের জনসংখ্যা ও উৎপন্ন শস্যাদির বিচারে উপরি-উক্ত কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন—

"১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে রংপুর জেলায় ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার ২ শত ৬৬ একর ১ রুড ১ পোল ভূমিতে ধান্যের চাষ করা হইয়াছিল। যে-সকল জমিতে এক মাত্র হৈমন্তিক ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ একরপ্রতি ২১/০ মণ; যে-সকল জমিতে আশু ও হৈমন্তিক উভয়বিধ ধান্য উৎপন্ন হয় তাহার উৎপত্তির পরিমাণ একরপ্রতি ৩০/০ মণ; এবং যে-সকল জমিতে অন্যান্য খাদ্যশস্যের সহিত ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহার উৎপত্তির পরিমাণ একরপ্রতি ১৫/০ মণ ধরিলে জেলার উৎপন্ন ধান্য হইতে ১৯৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩ শত ৩০ মণ চাউল পাওয়া যাইতে পারে। এখন জন-সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় যে, জনপ্রতি দৈনিক অর্দ্ধসের করিয়া চাউল প্রয়োজন হইলে এই জেলার অধিবাসীবর্গের জন্য ৯৯ লক্ষ মণ চাউলের প্রয়োজন। সুতরাং অবশিষ্ট ৯৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩ শত ৩০ মণ অনায়াসে বিদেশে চালান যাইতে অথবা গৃহে গৃহে সঞ্চিত হইতে পারে।

পাঠক মনে রাখিবেন, আমি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন জেলায় সর্ব্বত্র এত অধিক রেলপথের বিস্তার হয় নাই, তথাপি কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বলিয়াছেন, যে-বৎসর শস্যাদি সুন্দর উৎপন্ন হইত, সে-বৎসর অন্ততঃ অর্দ্ধেক শস্য দেশের বাহির হইয়া যাইত। এখন সর্ব্বত্র রেলপথের বিস্তার ও অবাধ বাণিজ্যের কল্যাণে এই রপ্তানী-স্রোত যে সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, উহা বলাই বাহুল্য।

আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রংপুর জেলার যে পরিমাণ ভূমিতে ধান্যের আবাদ হইত এখন তাহার কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধাংশ ভূমিতে ধান্য উৎপন্ন হইতেছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রংপুরে যে-পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইত, তাহার একার্দ্ধে জেলার প্রয়োজন পূর্ণ হইয়া অপরার্দ্ধ বিদেশে চালান যাইত অথবা গৃহে গৃহে সঞ্চিত হইতে পারিত কিন্তু বর্ত্তমানে যে-পরিমাণ ভূমিতে ধান্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে উৎপত্তি ভাল হইলে কিছুমাত্র রপ্তানী বা সঞ্চয় না করিয়া জেলার অভাব কোন প্রকারে পূর্ণ হইতে পারে। বর্ত্তমানে

যে-পরিমাণ ভূমিতে ধান্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার পরিমাণ ৪০ বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় অর্দ্ধাংশের কিঞ্চিদধিক হইলেও জনসংখ্যা কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্ত জেলার অধিবাসীবর্গের অভাব কোন প্রকারে পূর্ণ করিতে পারে। পশ্চিমা হিন্দুস্থানীগণ দলে দলে এ জেলায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে জনসংখ্যা দৃশ্যতঃ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুর্ব্বৎসরে, এমন কি স্বাভাবিক অবস্থায়ও, অন্য জেলা হইতে ধান্য চাউল আমদানী না করিয়া উপায় থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে বিগত ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রঙ্গপুর জেলার কতিপয় প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানীর বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

আমদানী	রপ্তানী
ধান্য ২,৯৯,৭৫০ মণ।	পাট ৩৪,৬০,৭৫০ মণ।
চাউল ৪,৯০,৫০০ মণ।	তামাক ২,৫০,৭০০ মণ।
চিনি ৯৫,৩৭৫ মণ।	ধান্য ৩৮,৫১৩ মণ।
	তুলা ১৯,০৭৫ মণ।
	সরিষা প্রভৃতি ৪৪,১৮৫ মণ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে সমগ্র রঙ্গপুর জেলা হইতে ৯৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩ শত ৩০ মণ চাউল রপ্তানী অথবা গৃহে গৃহে সঞ্চিতও হইতে পারিত, ৪০ বৎসর পরে অধুনা সেই স্থানে মাত্র ৩৯ হাজার ৫ শত ১৩ মণ রপ্তানী হইতেছে। আর অদৃষ্টের কঠোর পরিহাসের ফলে ন্যূনাধিক ৫ লক্ষ মণ চাউল ও তিন লক্ষ মণ ধান্য আমদানী করিয়া দগ্ধোদর পূর্ণ করিতেছি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরের সর্ব্বত্র রেলপথের বিস্তার হয় নাই। তখন নৌকা ও গোযানের সাহায্যে সাধারণতঃ জেলায় অন্তর্ব্বাণিজ্য পরিচালিত হইত। সুতরাং তদবস্থায় দেশের উৎপন্ন ধান্য ও অন্যান্য খাদ্য শস্যাদি যে সহজে দেশের বাহির হইয়া যাইতে পারিত তাহা কখনই অনুমান করা যাইতে পারে না। প্রত্যুত ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রংপুরের ঘরে ঘরে লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতীরূপে বিরাজিতা ছিলেন। অধুনা চল্লিশ বৎসর মধ্যেই সমস্ত জেলায় অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে—লক্ষ লক্ষ নরনারী কি করিয়া আপনাকে ও স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে বাঁচাইয়া রাখিবে, তাহার চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্দ্দিনে দেশের কৃষকসম্প্রদায় যদি প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিতে পারে, পাট ছাড়িয়া ধান্যের চাষে মনোযোগ দেয়, তবেই সমগ্র জেলা অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে নচেৎ নহে।"

উল্লিখিত মতদ্বৈধের কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়? আমাদের মতে উভয় দলের মতই কোন কোন অংশে সমীচীন। পাটের চাষ সম্বন্ধে 'ঢাকাগেজেট' যে কথা বলিয়াছেন তাহা একেবারে উপেক্ষা করা চলে না; কৃষকেরা পাটের আয় বিলাস-ব্যসনে নষ্ট করে বলিয়া কৃষকদিগকে শিক্ষা ও সদুপদেশ প্রদানের প্রস্তাব না করিয়া 'জাগরণ' যে একেবারে পাট-বয়কটের পাঁতি দিয়াছেন তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু 'জাগরণে'রই শেষ মন্তব্যে সায় দিয়া একথাও বলা আবশ্যক যে "যদি পাটের চাষ করিতে হয় তবে দেশের লোকে যাহাতে তাহার ব্যবসায় করিয়া লাভবান হইতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।" অবশ্য, লাভের এই উপায় নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বেই অন্নরক্ষার উপায় করার প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে 'ঢাকা-গেজেটে'র মতের উপর নির্ভর করিয়া ধান ও পাট আবাদের অনুপাত রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে কি না তাহাও বিচার্য্য। চাউলের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ধানের আর একটা প্রয়োজন আছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাট ছাড়াইয়া নিলে পাটগাছের যে কাঠি থাকে তাহা জ্বালানি, চকমকির কাঠ বা গরীব গৃহস্থের ঘের-বেড়ার কার্য্য ছাড়া অন্য বিশেষ প্রয়োজনে আসে না; কিন্তু ধানের খড় দ্বারা ঘরের চাল-ছাওয়ান তো হয়ই, তাহা ছাড়া আর একটা কাজ হয়—তাহা গরুর খাদ্য। এদেশে গোচারণের মাঠের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে যদি খড়ের পরিমাণও কমিয়া যায় তাহা হইলে মানুষের ন্যায় গরুরও খাদ্যসমস্যা অচিরে উপস্থিত হইবে। তাহাতে যে কি বিপদ, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র।

কিন্তু অনুপাতের ব্যবস্থা যেন আমাদের হাতে,—যেস্থলে ব্যবস্থা চালাইলেও দেবতা বিরোধী হইয়া উঠেন, সেস্থলে উপায় কি? এবৎসরের শস্যের উপর দেবতার কিরূপ রোষ-দৃষ্টি, মফঃস্বলের নানাস্থান হইতে তাহার পরিচয় নিম্নে দিতেছি।

'মালদহ-সমাচার' বলেন—

"বরিন্দ্র অঞ্চলে এবার ধান্যের অবস্থা যারপরনাই খারাপ। জল-অভাবে প্রায়ই মরিয়া গিয়াছে।"

রঙ্গপুরের অবস্থা 'রঙ্গপুরদিকপ্রকাশে' প্রকাশ—

"বৃষ্টি না হওয়ায় ধান্যের ক্ষতি হইতেছে।"

রাজসাহীর কথা 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় ব্যক্ত—

"বৃষ্টির-অভাবে হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়, চৈতালী ফসল হইবার আশা নাই।"

'ত্রিপুরা-হিতৈষী' ঐ কথারই সমর্থন করিয়া বলেন—

"বৃষ্টি অভাবে রোয়া নিঃশেষপ্রায়। বোধ হয় শনিগ্রহ এবার ধানের মাঠে দৃষ্টিপাত করিয়াছে।"

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাখরগঞ্জের অবস্থাও শোচনীয়। 'বরিশাল-হিতৈষী' বলেন—

"মফঃস্বল হইতে ক্রমাগত সংবাদ আসিতেছে, ধান্যগাছগুলি শুকাইতেছে।"

কাঁথীর 'নীহার', পাবনার 'সুরাজ', চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' সকলেরই ঐ একসুর। 'সুরাজ' বলেন—

"পাবনা জেলার শস্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়। উপর জমীর সমুদয় ধান্য বৃষ্টি-অভাবে পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে। নীচু জমিতে যে-সব ধান্য আছে তাহাদের গোড়ায় অতি সামান্য জল আছে; ঐ জল রৌদ্র-তাপে উত্তপ্ত হইয়া শস্যগুলিকে নষ্ট করিতেছে।"

মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমও তুল্যাবস্থ। 'মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী'তে' প্রকাশ—

"অধিকাংশ স্থানের ধান্য শুকাইয়া যাইতেছে।"

'বীরভূমবার্ত্তা' বলেন—

"বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষকগণের একমাত্র ভরসাস্থল ধান্যের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে এরূপ অনেক দিন দেখা যায় নাই।"

'বাঁকুড়াদর্পণে'ও ঐ কথা—

"জলাভাবে বিস্তর ধান্য মরিয়াছে।"

আসানসোলের 'রত্নাকর' উহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

"গত আশ্বিন মাস হইতে এই মহকুমায় একেবারেই বৃষ্টিপাত হয় নাই। ধান্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। কোথাও কোথাও জল-অভাবে একেবারেই শুকাইয়া গিয়াছে।"

এই অনাবৃষ্টির হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?—একমাত্র উপায়—কৃত্রিম জলপ্রবাহ দ্বারা ক্ষেত্রগুলিকে সিক্ত করা। কিন্তু তাহাতেও অনেকস্থলে নানা বাধা-বিঘ্ন আছে। প্রমাণস্বরূপ 'রত্নাকরে'র মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"জলসেচনের উপযোগী পুষ্করিণী আদিও নাই যে, তাহা হইতে জল লইয়া প্রজারা ধান্যাদি শস্য বাঁচাইবে। আবার যেখানে জল-সেচনের উপযোগী পুষ্করিণী আছে সেখানে জমিদার অথবা পুষ্করিণীর মালিকেরা জলসেচন করিতে দিতেছে না। এমন কি, অতিরিক্ত জলকর লইয়াও জলসেচন করিতে না দেওয়ায় কৃষকগণকে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হইতেছে!"

এই দারুণ দুর্দ্দিনে কৃষককুলকে বাঁচাইবার সামান্য শক্তিও যাঁহাদের আছে তাঁহারাও যদি এইভাবে বাঁকিয়া বসেন, তাহা হইলে আর গতি কি আছে? জমিদার ও প্রজা দেশের অভিন্ন অঙ্গ, একথা যতদিন আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি না হইবে, ততদিন আয়ু থাকিলেও, কৃপণের দরিদ্র প্রতিবেশীর মত বা বৈদ্যহীন গ্রামের মত আমাদের বাঁচিবার পন্থা থাকিবে না। জমিদার প্রজা, ধনী নির্ধনী একপ্রাণ হইলে কঠিন কার্য্যও সমবেত চেষ্টায় সহজ হইতে পারে। নদীর বাঁধ, ইন্দারা, দীঘি, ঝিল প্রভৃতির সাহায্যে জলনিকাশের যে বন্দোবস্ত হইতে পারে আমাদের আভিজাত্য বা রক্ষণশীলতা যদি তাহাকে আমল দিতে না চায় তাহা হইলে কাজেই কৃষকগণকে দেবতার দিকে চাহিয়া অনেক সময়ে ব্যর্থ-প্রতীক্ষায়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে কাহারই কল্যাণের আশা নাই; কারণ, কৃষকের অবস্থার সঙ্গে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা একসূত্রে গ্রথিত এবং এই দুই শ্রেণীকে ছাড়িয়া ধনী সম্প্রদায়ের পৃথক সত্তাও বেশি দিন তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু এ সহজ কথাটা কে আর না বুঝে? এ-সকল শুধু বোঝাবুঝির ব্যাপার হইলে, এতদিন কি আর কৃষকগণকে নিরক্ষর থাকিতে হইত, না জলগ্রহণের উপযোগী জলাশয় এতই দুর্লভ থাকিত, না কলিকাতার রাস্তায় জল দেওয়ার জন্য বা ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবহার্য্য নলের ন্যায় একটা লম্বা পাইপ ও পম্প সরবরাহ করিয়া জলসেচনের বন্দোবস্ত করিবার লোক জুটিত না?

দুর্ভিক্ষের আনুসঙ্গিক নানা পীড়াও ইতিমধ্যেই এদেশে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। তন্মধ্যে ম্যালেরিয়াই প্রধান। ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ইলিয়টের তত্ত্বাবধানে গভর্ণমেণ্টের যে "এপিডেমিক্ কমিশন" বসিয়াছিল তাহার সভ্য ডাক্তার লিয়ন, এণ্ডারসন ও কর্ণেল হেগ বলিয়াছেন যে, দরিদ্রতাই এই রোগের একটি বিশেষ কারণ। কৃষকগণকে দরিদ্র রাখিয়া আমরা সমাজের চক্ষে ফাঁকি দিতে পারি, কিন্তু বিধাতা যে বিভিন্ন উপায়ে তাহাদের সঙ্গে আমাদিগকেও যমালয়ের দিকে টানিতেছেন, মফঃস্বলের পত্রিকাগুলি একবাক্যে তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

এবিষয়ে 'গৌড়দূত' অগ্রদূত হইয়া বলিতেছেন—

"সহরে কলেরা ও ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হওয়ায় লোকে বড়ই শঙ্কিত হইয়াছে। একে সমস্ত দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য, তাহার উপর চিকিৎসার ব্যয় জোগান অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।"

'যশোহর' বলেন—

সহরে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। * * * পল্লীর অবস্থা নাকি আরও ভীষণ।

'চারুমিহির' বলেন—

আমরা টাঙ্গাইল ও জামালপুরের নানা স্থান হইতে পুনরায় ম্যালেরিয়ার আক্রমণের সংবাদ পাইতেছি।

'বাঁকুড়াদর্পণে' প্রকাশ—

"মহকুমার প্রায় সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ লক্ষিত হইতেছে।"

'হিন্দুরঞ্জিকা'য় রাজসাহীর অবস্থা ব্যক্ত—

"অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব বেশী।"

পাবনার 'সুরাজ' বিলাপ-স্বরে জানাইতেছেন—

"আমাদের চিরপরিচিত প্রিয় সুহৃদ ম্যালেরিয়াও তাহার খাতা-পত্র সহ ঠিক সময়েই হাজির! ঘরে ঘরে কেবল রোগীর যন্ত্রণা, আর মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ! পেটে ভাত নাই, তৃষ্ণা নিবারণের জল নাই, জীবনরক্ষার সমুদায় উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়া এ হতভাগ্য জাতি তবে কি এইরূপেই ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে?"

'বীরভূমবাসী' বীরভূমের সমাচার বলিতেছেন—

"ভীষণ ম্যালেরিয়ায় এবার বীরভূমের প্রত্যেক পল্লীর প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছে। এমন কখন হয় নাই।"

আসানসোল এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু এখন সকলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া 'রত্নাকর'ও বলিতেছেন—

"এ বৎসর স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। পূর্ব্বে এ-সকল স্থানে ম্যালেরিয়া রোগ ছিল না; কিন্তু এবৎসর ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। কি সহর কি পল্লী, সকল স্থান হইতেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সংক্রামক ব্যাধিও স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হইতেছে।"

ডায়মণ্ডহারবার ও চট্টগ্রামেরও রেহাই নাই। 'জ্যোতিঃ'তে প্রকাশ—

"চট্টগ্রামে কলেরা দেখা দিয়াছে।"

'ডায়মণ্ডহারবার-হিতৈষী' ঘোষণা করিয়াছেন—

"মহকুমায় জ্বর-জ্বালার প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। স্থানে স্থানে কলেরাও দেখা দিতেছে। একে শস্যনাশ, তাহার উপর রোগ-যন্ত্রণা!"

ঠিক কথা।—

'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।'

'শস্যনাশ' ও রোগযন্ত্রণা' দুইটা পৃথক ব্যাপার হইলেও, একের প্রাবল্য অপরেরও শক্তিসঞ্চয়ের যে গৌণ কারণ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। শরীর সুস্থ থাকিলে বিপদের সঙ্গে খানিকটাও যোঝা যায় এবং ঘরে খাবার থাকিলে রোগেরও ঔষধপথ্য জোটে। কৃষিবিদ্যার উৎকর্ষের সহিত কৃষিক্ষেত্রের প্রসার বর্দ্ধিত হইলে কোন কোন অংশে ম্যালেরিয়ার বীজও দূরীভূত হইতে পারে, আবার ম্যালেরিয়া নাশ করিতে প্রয়াসী হইলে তৎসূত্রে সহর-পল্লীর যে সংস্কারসাধনের প্রয়োজন হয় তাহাতে কৃষির সহায়তা হইতে পারে। 'কাজের লোক' ম্যালেরিয়ার নিদানতত্ত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে উপসংহারে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—

"ম্যালেরিয়া-নিদান-সম্বন্ধে মনীষীগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হইলেও যাহাতে প্রতিগ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জল পাওয়া যায়, জলনিকাশের ব্যবস্থা হয়, পুরাতন পয়ঃপ্রবাহগুলি সুসংস্কৃত হয়, অর্দ্ধমৃত নদ-নদীগুলি অপেক্ষাকৃত সুপ্রসর ও স্রোতস্বিনী হয়, ঘন বনজঙ্গল মশকের আবাসভূমি পরিষ্কৃত হয়, তৎপক্ষে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া বিশেষ আবশ্যক।"

'বাঁকুড়াদর্পণে'ও ঐ কথারই পুনরুক্তি—

"আমরা দেখিতে পাই যে কোথাও জল-নির্গমনের পথ রুদ্ধ হওয়ায়, কোথাও বা জল-নির্গমনের পথ একেবারে না থাকায় স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে। অনেক গ্রামে এইরূপ কতকগুলা গাছ-গাছড়া আছে যে তাহার তলভূমি প্রায়ই সেঁতসেঁতে থাকে এবং বহু কীটাণু সেই স্থান আশ্রয় করে। দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে জলনিকাশের পথ এবং আগাছা কর্ত্তনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবেও যে বিবিধ সংক্রামক পীড়া প্রসার লাভ করিতেছে, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই।"

'বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী'ও উপরিউক্ত মতেরই প্রতিপোষক। উহাতে প্রকাশ—

"পল্লী-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা যতই আলোচনা করি না কেন, তন্মধ্যে গোটাকতক কথা প্রয়োজনীয়। সেই কথা কয়েকটির প্রতি কর্ণপাত করিয়া কর্তৃপক্ষ যদি পল্লীস্বাস্থ্যোন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে আশা করা যায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে আমাদের শ্মশানকল্প পল্লীগ্রামগুলি অব্যাহতি লাভে সমর্থ হইতে পারে। কথাগুলি এই:—প্রত্যেক গ্রামে সুপেয় জল-সংস্থান এবং জল-নিকাশের সম্যক ব্যবস্থা করা, ও বন জঙ্গল পরিষ্কার করা ও আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া বায়ু দূষিত ও দুর্গন্ধময় না করে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা। এইগুলি যে পল্লী-স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন এ বিষয়ে মত-দ্বৈধ হইতে পারে না।"

ম্যালেরিয়া-নাশকল্পে উপরিধৃত যুক্তি গ্রাহ্য হইলে, কৃষিক্ষেত্রেও 'জলনিকাশের সম্যক ব্যবস্থা'য় একদিকে যেমন অনাবৃষ্টির হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাওয়া যাইবে, অন্যদিকে বনজঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া চাষের বিস্তৃতি ঘটাইবারও সহায়তা করিবে। ইহার উপর যদি কৃষকগণকে শিক্ষা দিয়া আধুনিক কৃষিবিদ্যায় অভিজ্ঞ করা যায় তো সে সোনায় সোহাগা।

কিন্তু উদ্যম বা চেষ্টা কোথায়? 'রঙ্গপুর-দিকপ্রকাশ' সত্যসত্যই হতাশের আক্ষেপ জানাইয়াছেন—

"কল্লোলিনীগুলি লৌহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে—সে নৃত্য নাই, সে স্বাস্থ্যসুলভ আনন্দ-কল্লোল নাই, আজ দূর-প্রসারিত সিকতারাশি তাহাদিগকে ক্রমশঃ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। আজ তাহাদের আপনাদেরই দেহ ধৌত করিবার সামর্থ্য নাই,

তাহারা বাংলার আবর্জ্জনা ধৌত করিবে কিরূপে? মূল নদীগুলিই শুষ্কপ্রায়, সুতরাং তাহাদের শাখাপ্রশাখা যে বদ্ধজলে পরিণত হইবে, তাহাতে কথা কি? দেশে খাল বিল যাহা ছিল পাটের কল্যাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু শুদ্ধি পাইবার পথ নাই। পাট পচাইয়া পচাইয়া সেগুলিকে বিষের আকরে পরিণত করা হইয়াছে; নদীর প্লাবন আজ ক্ষীণ-শক্তি—সে বিষ যে দেশের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতেছে। "অন্নদান", "জলদান" প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কারগুলি নব্য-বিলাসিতা বা সভ্যতার আলোকে দূরে পলায়ন করিয়াছে, সুতরাং সেকালের লোকে যে-সমুদায় পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সে-সমুদায় বর্ত্তমানে এঁদো পুকুরে পরিণত! সে-সমুদায়ের কতক পাটের কল্যাণে, কতক সমীপবর্ত্তী বৃক্ষ ও বংশপত্রে কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা একবার দর্শন করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই-সমুদায়ের প্রতিকার না হইলে যে আর রক্ষা নাই তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আমরা যুদ্ধ লইয়াই ব্যস্ত; এ-সকল বিষয়ে মনোযোগ দিবার অবসর কোথায়?"

সত্যই আমাদের 'অবসর কোথায়?' দেশের জমিদার-দিগকে আমরা চাহি রামায়ণের বিপ্রের মত "মৃত এক শিশুপুত্র কোলেতে করিয়া" "কান্দিয়া" কহিতে—

'না করেন রাজ্য চর্চ্চা রাম রঘুবর।
*　　*
অধর্ম্মীর রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক।
কর্ম্মদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক॥"

কিন্তু একথা বলিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখি না—'সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই', সে কালও নাই সে সংস্কারও নাই! তবু সুখের কথা, স্থানে স্থানে রাজপুরুষেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টার পন্থা খুলিয়া দিতেছেন। তাঁহারা ইঙ্গিত করিলে দেশের জমিদারেরাও তৎপর হইবেন, তখন তাঁহারা অন্নদান, জলদান কুসংস্কার না ভাবিয়া পুণ্যকর্ম্ম মনে করিবেন, আশা করা যায়। রাজপুরুষেরা যদি জমিদারদিগকে সমঝাইয়া দেন যে প্রজার হিতেই তাঁহাদের হিত, প্রজার অস্তিত্বের উপর তাঁহাদের মরণ বাঁচনের নির্ভর, তবে দেশের অনেক অভাব অভিযোগ অচিরেই তিরোহিত হইয়া যায়। 'বীরভূম-বার্ত্তা'য় প্রকাশ—

"বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে কয়েক বৎসর যাবত জেলার নানা স্থানে কতকগুলি করিয়া ইন্দারা খনন করা হইতেছে। যে-সকল গ্রামে পানীয় জলের উপযুক্ত পুষ্করিণীর একান্ত অভাব তত্রত্য অধিবাসীগণ ইহাতে বেশ উপকৃত হইতেছেন। আবার যেখানে নিকটে পুরাতন বড় বড় দীঘি ও পুষ্করিণী আছে অথচ সে-সকল স্থানে নানা বর্ণের অনেক লোক বাস করেন, সেখানে এই ইন্দারার জল বড় কেহ লইতে চান না, সেই পুরাতন পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিয়াই গ্রামবাসীগণ সন্তুষ্ট থাকেন। আমাদের জেলায় বর্ত্তমান ন্যায়পরায়ণ ও সূক্ষ্মদর্শী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ল্যাম্বোরণ মহোদয় নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া সাধারণের এই অসুবিধার বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি বোর্ড হইতে জেলার পুরাতন পুষ্করিণী খনন করাইবার সুন্দর ব্যবস্থা করিতেছেন।"

যশোহরও এরূপ সৌভাগ্যের অংশ হইতে বঞ্চিত নহে। তাই 'যশোহর'পত্র আনন্দের সহিত জানাইয়াছেন—

আমরা শুনিয়া যারপরনাই আশ্বস্ত ও প্রীত হইলাম যে, নড়াইলের সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্তবাবু হরেচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আন্তরিক সহানুভূতি ও নড়াইল থানার ৪নং ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়ত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মিত্র মহাশয়ের অদম্য উৎসাহে উক্ত ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রায় ২৮ খানি গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার হইতে চলিয়াছে। পল্লীগ্রামের শ্রমজীবীগণ ভূম্যধিকারীকে অর্দ্ধেক কাষ্ঠ প্রদান করিয়া অপর অর্দ্ধেক নিজেদের পারিশ্রমিকস্বরূপ গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে দুই পক্ষেরই লাভ হইতেছে। ভূম্যধিকারীর পতিত জমির আবাদ এবং কয়লার পরিবর্ত্তে বিনাব্যয়ে জ্বালানী কাষ্ঠ, আর শ্রমজীবীদের পক্ষে কাষ্ঠ বা তন্মূল্য লাভ হইতেছে।"

বীরভূম ও যশোহরের এই-সব অনুষ্ঠান একদিকে যেমন সকল জেলার রাজপুরুষগণেরই অনুসরণীয়, অন্যদিকে ইহার আদর্শ আমাদিগেরও কর্ম্মজীবনের সহায়ক-রূপে গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

পুস্তক-পরিচয়

ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা—

স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত; শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৭৭+৪; মূল্য ৷৵১০।

বসু মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন। "তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া দারিদ্র্য ও সন্তাপের কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার যুবজনোচিত উৎসাহ একদিনের জন্যও ম্লান ভাব ধারণ করে নাই।" রামমোহন রায়ের ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ইঁহারই চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল। তাঁহার রচিত অনেকগুলি পুস্তক তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর ঠিক দুই বৎসর পরে তাঁহার রচিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের মূলভাব, অধ্যাত্ম শাস্ত্রালম্বন, শাস্ত্রার্থ গ্রহণ, বেদান্তোদিত ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজের মত, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অপরাপর কয়েকটি প্রবন্ধ ও একটি কবিতাও আছে, যথা - উৎসব, আত্মশোধন, অপরাধভঞ্জন, অকিঞ্চনতা, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থের পারায়ণ, ৬৫ ভাদ্র, রাজা রামমোহন রায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা, ব্রাহ্মধর্ম্মের নৌকা। পরিশিষ্টে 'প্রবাসী' হইতে ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী উদ্ধৃত হইয়াছে।

'হিন্দু ব্রাহ্ম' কিংবা 'ব্রাহ্ম হিন্দু' ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ে কি ভাবেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি চক্ষে দেখেন তাহা পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারিবেন। গ্রন্থকার চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।　　মহেশচন্দ্র ঘোষ।

ঋতুসংহারম্ [বাণীবরপুত্র-মহাকবি-কালিদাস-কৃতম্] শ্রীরামকৃষ্ণ-তপস্বি-বিদ্যাভূষণ-বিরচিতয়া বিমলপ্রভাখ্যয়া ব্যাখ্যয়া সমলঙ্কৃতম্ তথা শ্রীগণপতি সরকার-কৃতার্থান্বয়-বঙ্গপদ্যানুবাদ-সমুদ্ভাসিতম্ প্রকাশিতঞ্চ (কেন ?)। পৃষ্ঠা ১১৩, মূল্য লিখিত নাই।

টীকাটি মন্দ হয় নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কোনো স্থানে স্বীকার না করিলেও বুঝা যাইতেছে তিনি মণিরামকে অনুসরণ করিয়া নিজ টীকা লিখিয়াছেন। কারণ প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় মণিরাম যে ভুলটি করিয়াছেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঠিক সেই ভুলটি করিয়াছেন, তা ছাড়া আরো একটি করিয়াছেন। মণিরাম লিখিতেছেন...কালিদাসনামা কবিঃ......মঙ্গলমাচরন্নাদৌ গ্রীষ্মকাল-বর্ণনরূপাং কথাং প্রিয়ায়ৈ কশ্চিন্নায়কঃ প্রস্তৌতি।" এখানে আ চ র ন্-এর কর্ত্তা একজন (কবিঃ), আর প্র স্তৌ তি'র কর্ত্তা আর-একজন (নায়কঃ), এরূপ হয় না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও লিখিতেছেন—...কালিদাসঃ...আশীরাদ্যন্যতমদ্ বস্তুনির্দ্দেশরূপং মঙ্গলমাচরন্...কথাং প্রস্তোতুং কশ্চিন্নায়কঃ স্বপ্রিয়ামাহ।" অতিরিক্ত ভুলটি হইতেছে অ ন্য ত ম দ্। এ শব্দটি সর্ব্বনামের মধ্যে নহে, এই জন্য অ ন্য ত ম ম্ লেখা উচিত ছিল।

গণপতি বাবু কাব্যখানি সাধারণ পাঠককে বুঝাইবার জন্য স্বকৃত অর্থান্বয়টি কথ্য ভাষায় যথাশক্তি পরিস্ফুট করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনুবাদ যতদূর পারেন আক্ষরিক করিয়াছেন। পদ্যগুলি সর্ব্বত্র পড়িতে বড় ভাল লাগিল না, আর কোনো কোনো স্থানে অনুবাদও ঠিক হয় নাই।

ছাপা, কাগজ ও বাঁধান সুন্দর।

Model Questions and Answers on the Pravi (e) sika for 1915-16 by Pandita Syamacharana Kaviratna and Sarojaranjana Banerji, M.A., Kavyaratna, published by Naliniranjana Banerji, 2, Goyabagan Street, Calcutta, Pp. 108. Price 8 Annas.

নামেই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় জানা যাইতেছে। ইহাও একখানি বাজারের সাধারণ ধরণের বই। মূল পুস্তকের উপাখ্যান-গুলিকে সংস্কৃতে সংক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃতটা মোটেই idiomatic হয় নাই, বাঙ্‌লা গন্ধে পরিপূর্ণ। ছেলেদের হাতে এরূপ সংস্কৃত না দেওয়াই ভাল। "রৌ দ্রে ণ আকুলিতঃ," "পুগবস্ত্রাদি ব্য ব সা য়ে ন" (পৃঃ ৫৭) প্রভৃতি শিখাইলে ছেলেদের অপকারই করা হইবে। গ্রন্থকারদ্বয়ের রচিত ব্যাখ্যাপুস্তক পৃথক্ আছে, স্থানে স্থানে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। অতএব বালককে তাহাও কিনিতে হইবে।

বাজারে যে-সব ব্যাখ্যা ও প্রশ্নোত্তর বাহির হইতেছে, আমরা মোটেই তাহার পক্ষপাতী নহি। ইহাতে গ্রন্থকার অর্থ উপার্জ্জন যথেষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু ছেলেদের মস্তকটি চর্ব্বণ করা হয়। মূল বইখানা তাহারা যদি যথাশক্তি একটু ভাল করিয়া পড়ে, তবে তাহাদের কল্যাণের জন্য হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত তাহা না হইয়া একএকখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের শত শত পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা ও বিবিধ প্রশ্নোত্তরের গাদা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ায় না তাহারা মূল পুস্তক ভাল করিয়া পড়িতে পায়, না ব্যাখ্যা বা প্রশ্নোত্তরগুলিই সম্পূর্ণ বুঝিয়া শুনিয়া আয়ত্ত করিতে পারে। ফলে দাঁড়ায় পরীক্ষার পরেই ছেলেরা সংস্কৃতের নিকট হইতে মুক্তি লাভ করে, বা অগ্রসর হইলেও ঐ গোড়া কাঁচা থাকায় আশানুরূপ ফল হয় না। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ব্যাখ্যাকারগণ অনেক সময় অনাবশ্যক খুঁটিনাটি লইয়া গ্রন্থ বাড়াইয়া ফেলেন, এবং ছেলেকে বুঝান অপেক্ষা নিজের নিজের পাণ্ডিত্য দেখানই বেশী কর্ত্তব্য মনে করিয়া থাকেন। যাঁহারা সত্য-সত্য ছেলেদিগকে কিছু শিখাইতে চাহেন, তাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা বা প্রশ্নোত্তর লেখায় সময় নষ্ট না করিয়া অপর কিছু করুন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

পুষ্পমঞ্জরী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত, প্রকাশক শ্রীনিখিলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, চম্পিও, ব্রহ্মদেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ অংশিত ১১৩ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ উত্তম। আটখানি জাপানী ছবি বইখানির সৌন্দর্য্য বাড়াই-য়াছে। কাপড়ের মলাট, সোনার জলে নাম লেখা। মূল্য এক টাকা।

বইখানিতে রূপক, গল্প, কথা, ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা কিছুই বাদ পড়ে নাই। দুইটি গল্প, একটি কথা ও একটি আখ্যায়িকা জাপান দেশের। রচনাগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রথমে ভাষার উল্লেখ করি। ভাষা মার্জ্জিত, দু' একটি গল্পে কেবল কথিত ও লিখিত ভাষা মিশাইয়া গিয়াছে, সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বালিকার নিষ্কলঙ্ক যৌবন"—সে কি রকম? স্থানে স্থানে সুপ্রতিষ্ঠ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষার ব্যর্থ অনুকরণের চেষ্টা দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। যাহা সহজ ও স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর; সৃষ্টি করাতেই আনন্দ ও কৃতিত্ব; অনুকরণে কি ফল? ভবিষ্যতে নবীন লেখক এই কথাটি মনে রাখিলে ভালো করিবেন।

ভাষার চাকচিক্যের মধ্যে গল্পের প্রাণ বিলুপ্ত হইয়াছে। ছোট গল্পের আর্ট কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই—কোনো গল্পই মনের উপর ছাপ রাখে না। গল্প লিখিবার জন্যই ভাষার প্রয়োজন, ভাষায় ওস্তাদি হাত দেখাইব মনে করিয়া গল্প রচনা করা বিড়ম্বনা—এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

সে যাহা হোক মোটের উপর বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

সু।

জর্ম্মানীর গুম্ফাক্রমণে পৃথিবী বেষ্টনের দুরাশা।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।"

১৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩২১

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মান্দ্রাজে জাতীয় উন্নতি চেষ্টা

ইংরেজী বৎসরের শেষ সপ্তাহে ভারতবর্ষের কোন একটি সহরে প্রতি বৎসর জাতীয় উন্নতি কল্পে নানাবিধ পরামর্শ-সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মুসলমান শিক্ষা-সমিতি এবং অন্যান্য নানা সাম্প্রদায়িক সমিতির অধিবেশনও অন্য অনেক সহরে হয়। এবারে মান্দ্রাজে প্রধান সমিতিগুলির বৈঠক হইয়াছিল।

ধর্ম্ম সকল উন্নতির মূল

জাতীয় উন্নতির অর্থ, যে মানুষগুলিকে লইয়া জাতি গঠিত, তাহাদের প্রত্যেকের উন্নতি। উন্নতির বাহ্য লক্ষণ এই যে উন্নত মানুষ ভাল যাহা তাহাই করে, মন্দ যাহা তাহা করে না। মানুষকে উন্নত হইতে সাহায্য করিবার জন্য মানুষ কতকগুলি বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছে। ঈশ্বরের নিয়মের সহিত মানুষের গড়া কতকগুলি বিধিনিষেধের সামঞ্জস্য আছে; অন্য কতকগুলির সামঞ্জস্য নাই, বরং বিরোধ আছে। কেবল যাহা ঈশ্বরের বিধিনিষেধের অনুরূপ, মানুষের এরূপ ব্যবস্থাই মানিতে হইলে এবং ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধ মানুষের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিতে হইলে আত্মার মুক্ত অবস্থার প্রয়োজন, সাহসের প্রয়োজন, ঈশ্বরের শুভ বিধানে স্থির দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন। ইহা গেল বাহিরের কথা। যে ঈশ্বরের নিয়ম বা তদনুগত মানবীয় বিধিনিষেধ একটা বাহ্য ব্যবস্থার মত মানে, তাহার কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রকৃত উন্নত মানুষ সে যাহাকে বিধিনিষেধ আর বিধিনিষেধ বলিয়া মানিতে হয় না, যাহার প্রকৃতিই এরূপ হইয়া যায় যে সে স্বভাবতই বিশ্ববিধানের অনুরূপ কার্য্য করে। যেমন মাকে বলিতে হয় না যে শিশুসন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ দিতে হয়, সতীকে বলিতে হয় না যে পতির যাহাতে মঙ্গল তাহা করিতে হয়, তেমনি উন্নত মানুষকে বলিতে হয় না যে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে জীবনযাপন কর্ত্তব্য। প্রাণের টানে, শুভ প্রবৃত্তিতে, যেমন মাতাকে সতীকে কর্ত্তব্য পালন করায়, বিধিব্যবস্থায় আইনে নহে, তেমনি উন্নত মানুষকে ভগবৎপ্রেম বিধাতার নিয়মের অনুগত করে। মানুষ লৌকিক দুঃখ সুখ, নিন্দা প্রশংসা, ক্ষতিলাভ গণনা, শাস্তি পুরস্কার, নিষেধ বিধির বন্ধন হইতে যে পরিমাণে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরপ্রেমের বাঁধনে স্বাধীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেই পরিমাণে সে উন্নত হয়।

অতএব, জাতীয় উন্নতির অর্থ এক একটি মানুষের আত্মার উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে মুক্ত অবস্থা লাভ। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মানুষকে সাংসারিক দুঃখ সুখ, নিন্দা প্রশংসা ক্ষতিলাভ গণনা, প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিয়া ভগবৎপ্রেমে আবদ্ধ করা। সকল ধর্ম্মসমাজেই লোকে অল্পাধিক পরিমাণে লোকাচারের অধীন হইয়া পড়ে, এবং ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়া যায়; কিন্তু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলেই

বুঝা যায় যে আত্মার জাগ্রত ও মুক্ত অবস্থা ব্যতীত ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। এরূপ কথা সকল ধর্ম্মেরই উপদেশের মধ্যে পাওয়া যায়। যে সকল দেশাচার বা লোকাচার ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়, তাহাও লোকনিন্দার ভয়ে বা নিয়মের অনুরোধে পালন করিলে আত্মার মঙ্গল হয় না। তাহার শুভ উদ্দেশ্য বুঝিয়া আত্মা যদি তাহাতে সায় দেয়, তবেই প্রকৃত কল্যাণ হয়।

মানুষের সকল উন্নতির গোড়ার কথা আত্মাকে জাগাইয়া তোলা ও মুক্ত করা, এবং তাহার সহিত পরমাত্মার যোগ স্থাপন করা। রোগী যখন নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে, তখন বাহিরে সেঁকতাপ দিয়া ঘর্ষণ করিয়া শরীর গরম করিতে চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু আসল প্রতিকার এরূপ ঔষধ প্রয়োগ যাহাতে শরীরের ভিতরেই যথেষ্ট উত্তাপ জন্মে। একটা জাতি যখন অসাড় হইয়া পড়ে, যখন তাহার সকল শুভানুষ্ঠানেই উৎসাহ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তখন বাহিরের নানা চেষ্টা অনাবশ্যক নহে; কিন্তু প্রকৃত উপায়, মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্র ও উৎস যেখানে সেই আত্মার জাগ্রত ও মুক্ত অবস্থা আনয়ন।

এই জন্য আমরা একেশ্বরবাদীদিগের বার্ষিক পরামর্শ-সমিতিকে, ক্ষুদ্র হইলেও, বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। ইহাঁদের মত, আত্মাকে জাগ্রত ও মুক্ত করা, যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের আলোচনা-ও-পরামর্শ-সমিতিগুলিকেও আমরা শুভানুষ্ঠান বলিয়া মনে করি। এবার একেশ্বরবাদীদিগের পরামর্শ-সমিতির অধিবেশন মান্দ্রাজে হইয়াছিল। কলিকাতার সিটিকলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে অন্যান্য অনেক সুন্দর কথার মধ্যে বলেন যে রাজা রামমোহন রায় জীবনে নানা বাধাবিঘ্ন ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও যে সকল মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে মানুষ ভুলিয়া যায়, যে, অন্যান্য মহৎ লোকদের মত রাজা রামমোহন রায়ও নিজের কার্য্য অপেক্ষা বড় ছিলেন; তাঁহার হৃদয় ভগবদ্ভক্তি ও মানবপ্রীতিতে পূর্ণ ছিল।

কংগ্রেস্

এবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তিনি স্বদেশের হিতকল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। সকলগুলির বর্ণনা অনাবশ্যক। বঙ্গবিভাগ রহিত করিবার জন্য তিনি দেশে ও বিলাতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বাঙ্গালীরা চিরকাল

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে। ১৯১০ সালে যখন নূতন আইন দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বহুপরিমাণে হ্রাস করা হয়, তখন বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় কেবল পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এই আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন এবং ইহার বিরুদ্ধে ভোট দেন। শ্রীযুক্ত গোখলে, মুধোলকার, প্রভৃতি কংগ্রেসের নেতাগণ এই আইনের সপক্ষে ভোট দিয়া-

ছিলেন। ভূপেন্দ্র বাবু দেশের জন্য যদি আর কিছুই না করিতেন, তাহা হইলেও শুধু মুদ্রাযন্ত্রের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার এই চেষ্টার জন্য তাঁহাকে দেশবাসীর সম্মান প্রদর্শন কর্ত্তব্য। এই হেতু তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করায় আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

তাঁহার বক্তৃতাটি বেশ হইয়াছিল। উহার প্রধান ত্রুটি এই যে উহাতে দেশের শোচনীয় স্বাস্থ্যের এবং সুবৎসরেও দেশের লক্ষলক্ষ লোকের যথেষ্ট খাদ্যের অভাবের কোন উল্লেখ বা আলোচনা ছিল না। তিনি যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে প্রধান একটির উল্লেখ করিব। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ ও লক্ষ্য কি তদ্বিষয়ে তিনি বলেনঃ—দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যদি স্বাধীনতা লাভ সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় হইত, তাহা হইলে তিনি আইনের ভয় না করিয়া স্বাধীনতার পক্ষেই মত দিতেন; কিন্তু দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় যোগ্যতা বিচার করিয়া কে ইংলণ্ডের সহিত ছাড়াছাড়ির সমর্থন করিবে বা উহা বাঞ্ছনীয় মনে করিবে?

স্বাধীনতা

আমরা যতটুকু জানি ও বুঝি তাহাতে মনে হয় যে, সব দিক দিয়া বিচার করিলে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের ক্ষমতা নাই; এবং যাহার স্বাধীনতা অর্জ্জনের ক্ষমতা নাই, তাহার উহা রক্ষা করিবারও ক্ষমতা নাই। কতকগুলি বোমা ও কতকগুলি পিস্তল ও রিভলভার দ্বারা দেশকে স্বাধীন করা যায়, এরূপ কয়জন লোকে মনে করে জানি না। কিন্তু যদি কাহারও এরূপ অতি ভ্রান্ত ধারণা থাকে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যয় এবং অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা খবরের কাগজে পড়িলে তাহাদের সেই মহা ভ্রম দুর হইবে। যদি এরূপ মনে করা যায়, যে, কোন কারণে বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলেও রুশিয়া, জাপান, এমন কি চীনের বিরুদ্ধেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার উপায় নাই। আজকাল জলে স্থলে ও আকাশে যুদ্ধ করিতে জানিলে ও পারিলে এবং তাহার মত বড় বড় কামান ও অন্যবিধ অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধ-মোটর আকাশযান প্রভৃতি থাকিলে তবে প্রবল জাতিদের সমকক্ষতা করা যায়। ভারতবর্ষের এ সকল নাই। ভারতবর্ষের নেতারা কংগ্রেসের মত সামান্য ব্যাপারেও নিজেদের দলাদলি মিটাইয়া ফেলিতে পারেন না। দেশ রক্ষার জন্য যেরূপ একজোট হওয়া দরকার, ইংরেজ চলিয়া গেলেই তাঁহারা সেরূপ এক-প্রাণ ও দলবদ্ধ হইতে পারিবেন কি? অথচ দেশের অধিকাংশ লোকের এইরূপ একপ্রাণতা ও দলবদ্ধতাই দেশ রক্ষার গোড়ার কথা।

একই রাজ্যের একজন প্রজা অপর একজন প্রজার কোন সম্পত্তি তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে না লইলে রাজা তাহার দণ্ড দেন। ভাল লোকেরা ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া চুরি করেন না, মন্দ লোকেরা শাস্তির ভয়ে অনেক সময় চুরি করে না। পৃথিবীতে এখনও প্রবল জাতিদের অধিকাংশের মধ্যে বিদেশীর ভূমি ও অন্য প্রকার সম্পত্তি সম্বন্ধে ধর্ম্মবুদ্ধি জন্মে নাই; এবং কোন প্রবল জাতি ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ করিলে তাহাকে শাস্তি দিবারও কোন বন্দোবস্ত নাই। এই কারণে, বর্ত্তমান সময়ে কোন জাতি স্বাধীনতা পাইলেই যে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না। নতুবা, পুরাকালে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, বর্ত্তমান সময়ে সকল জাতিই স্বাধীন থাকিতে পারিত।

অতএব বুঝা যাইতেছে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের ও রক্ষার ক্ষমতা নাই। ভারতবাসীর পক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহের চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়া আধুনিক জগৎসম্বন্ধে জ্ঞান, সুশিক্ষা বা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিক্ষার বিস্তার এই দুই কার্য্যে প্রত্যেক দেশভক্তের মন দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইংরেজ স্ব-ইচ্ছায় চলিয়া গেলে, ভারতবাসীরা এখন স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ নহে বটে; কিন্তু ভবিষ্যতে কখনও এই যোগ্যতা তাহাদের জন্মিবে না, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। বর্ত্তমান যুদ্ধেই দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় সিপাহীদের সাহস ও যুদ্ধনৈপুণ্য যথেষ্ট আছে। ভবিষ্যতে ভারতবাসীরা যে ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে সমর্থ

হইতে পারে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা এবং উহার অঙ্গীভূত ভারতবর্ষ রক্ষার জন্যও ভারতবাসীদিগকে যুদ্ধক্ষম করিতে হইবে, বর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে যে ইংরেজ রাজপুরুষ এই শিক্ষা লাভ করেন নাই, তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

সাহচর্য্য ও সমকক্ষতা

যাহা হউক, এসকল হইতেছে ভবিষ্যতের কথা। ভূপেন্দ্রবাবু এখন আমাদিগকে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের কথা বলিতেছেন, তাহা, "সাহচর্য্য, সমকক্ষতা, সমান অংশীদারিতা।" অর্থাৎ ইংরেজেরা শাসনকর্ত্তা এবং ভারতবাসীরা তাহাদের অধীন প্রজা, ইহা আদর্শ নহে। আদর্শ এই যে ভারতবাসী ও ইংরেজ সমান সমান, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারে ও দেশে ইংরেজের যেমন অধিকার, ভারতবাসীরও তেমনি অধিকার। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ সমকক্ষতা, সাহচর্য্য, সাম্য বা সমান অধিকার নাই। ভবিষ্যতে যে হওয়া অসম্ভব, তাহাও বলা যায় না। কারণ অসম্ভব কেবল তাহাই যাহা অচিন্ত্য। আঁধার আর আলো ভবিষ্যৎ কোন সময়ে এক হইয়া যাইবে, ইহা অসম্ভব; কারণ ইহা অচিন্ত্য। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবাসী ও ইংরেজ সমান হইয়া যাইবে, ইহা ওরূপ অচিন্ত্য নহে, এবং বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন ক্ষুদ্র বিষয়ে ভারতবাসীর ও ইংরেজের অবস্থা ও অধিকার আইনত এবং কার্য্যত এক। অতএব ভূপেন্দ্রবাবুর আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইতে পারে না, এমন কথা কেহই বলিতে পারে না।

পক্ষান্তরে ইহা যে হইবেই, বা সহজে হইতে পারে, তাহাও বলা যায় না। সমকক্ষতা, সাহচর্য্য বা সমান অধিকারের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে।

সাম্যের অর্থ

ভারতবাসী ও ইংরেজের সমান অধিকার হইতে হইলে ভারতবর্ষে দেশী লোকেরও লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর এবং গবর্ণর-জেনেরাল হওয়া চাই। দেশী লোকেরও অধস্তন সৈনিক কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান সেনাপতি বা জঙ্গী লাট হওয়া চাই। ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য বহু রণতরী ও বহু আকাশযানের প্রয়োজন হইবে। তাহাতেও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী হইতে প্রধান নৌসেনাপতি ও আকাশসেনাপতি ভারতবাসীরও হওয়া চাই। ইংরেজ ও ভারতবাসীকে সমান হইতে হইলে, ইংরেজ যেমন নিজের দেশের সব আইন নিজেরা করেন, —ট্যাক্স্ বসান, রদ করা, বাড়ান কমান, সব নিজেরা করেন, আমাদেরও তেমনি অধিকার হওয়া চাই; অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে দেশী লোকের প্রভুত্ব হওয়া চাই।

কিন্তু কেবল তাহা হইলেই ইংরেজ ও ভারতবাসী সমান হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতের পার্লেমেণ্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ত্তা। বিলাতের লোকেরাই ইহার হাউস্ অব্ কমন্স্ নামক অংশের সভ্য নির্ব্বাচন করেন, এবং হাউস্ অব্ লর্ডস্ নামক অংশের সভ্য বিলাতের অভিজাত ও পাদরীরাই হন। অন্য দেশের সহিত বিলাতের যুদ্ধবিগ্রহ ও শান্তি এই বিলাতী পার্লেমেণ্টই কার্য্যত করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলির বা ভারতবর্ষের ইহাতে কোন হাত নাই। অথচ যুদ্ধ ঘটিলে ব্যয় ভারতবর্ষকেও করিতে হয়, ক্ষতি ভারতবর্ষেরও হয়। ভারতবর্ষের রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থারও চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ এই পার্লেমেণ্টেই হয়। ভারতবর্ষের সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট্ এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা বিলাতী মন্ত্রিসভাই নিযুক্ত করেন। এ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের মতামত গণনার মধ্যে আসে না। কিন্তু সাম্য হইতে হইলে, একটি সাম্রাজ্যিক পার্লেমেণ্ট স্থাপিত হওয়া উচিত। তাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশের সভ্য নির্ব্বাচন ক্ষমতা থাকা দরকার। সেই সব নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের মধ্য হইতে সাম্রাজ্যিক মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, রাজস্বমন্ত্রী, পররাষ্ট্রসচিব, প্রভৃতি এখন যেমন কেবল বিলাতের লোকেই হইতে পারে, সর্ব্বত্র সাম্য স্থাপন করিতে হইলে ভারতবাসী বা ঔপনিবেশিকদিগেরও সেইরূপ প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি হইবার সুযোগ হওয়া আবশ্যক। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ও নৌসেনাপতি এখন

কেবল বিলাতের লোকে হইতে পারে। ভূপেন্দ্র বাবুর আদর্শ অনুসারে ভারতবাসীরও ঐরূপ উচ্চ উচ্চ পদ পাইবার সুযোগ থাকা চাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুবরাজ বিবাহ করেন, কোনও ইউরোপীয় রাজকুমারীকে। সাম্য স্থাপিত হইলে ভবিষ্যৎ কোন যুবরাজ হয় ত ভারতীয় কোন রাজনন্দিনীকে বিবাহ করিতে পারেন; যেমন মোগল বাদশাহদের আমলে কোন কোন স্থলে হইয়াছিল। অন্যদিকে, পূর্ব্বে যেমন ইংলণ্ডের কোন কোন রাণী ও রাজকুমারীর স্পেন, হল্যাণ্ড, জার্ম্মেনী বা অন্য দেশের রাজবংশীয় কাহারও কাহারও সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তেমনি ভারতীয় কোন কোন রাজ-পরিবারেও হইতে পারে।

আমাদের "কল্পনার দৌড়" দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত হাসিবেন। কিন্তু এ সব ঘটিবে কি ঘটিবে না, তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা আমাদের নাই, তাহা আমাদের কাজও নয়। আমরা কেবল সাম্যের অর্থ কি তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। কারণ মুখে বলিব সাম্য, অথচ মনের মধ্যে "কিন্তু" রাখিয়া অধিকাংশ বিষয়েই ঘাড়টা নীচু করিয়া থাকিব, তাহাতে তো সাহচর্য্য বা সমান অধিকার হইতে পারে না।

আপাততঃ কি চাই

যাহা হউক, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কিরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আবশ্যক মনে করিবেন, তাহা পক্ককেশ আমরা বলিতে পারি না। ভূপেন্দ্রবাবুর সাম্যের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু ঐ বাস্তবও তো আসিতে অনেক সময় লাগিবে। আপাততঃ আমরা সর্ব্বত্র যথেষ্ট খাদ্য ও বিশুদ্ধ জল, সর্ব্বত্র স্বাস্থ্য রক্ষার বন্দোবস্ত, সকল বালকবালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা, কেবল-মাত্র উকীল ব্যারিষ্টার শ্রেণী হইতে নিযুক্ত বিচারকসমূহ-পূর্ণ স্বাধীন বিচারবিভাগ, সিবিল সার্বিস উঠাইয়া দিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া যোগ্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট্ আদি কর্ম্মচারী নিয়োগ, গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া সকলের অস্ত্র রাখিবার ও ব্যবহার করিবার অধিকার, স্থলযুদ্ধ ও নৌসেনা বিভাগে কর্ম্মচারী (officer) হইবার অধিকার, সকল প্রকার সরকারী কার্য্যে জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নির্বিশেষে যোগ্যতমের নিয়োগ, ব্যবস্থাপক সভাগুলির অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ সভ্যের ভারতবাসীদিগের দ্বারা নির্ব্বাচন, ইত্যাদি ব্যবস্থা হইলেই সন্তুষ্ট হইব।

ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় আদর্শ

নানা জনের রাষ্ট্রীয় আদর্শ নানাবিধ। স্বাধীনতার অর্থও সকলে এক রকম বুঝেন না। আমরা যখন বালক ছিলাম, তখন আমাদের একজন সঙ্গী বলিয়াছিল, "দেশটা স্বাধীন হইলে বেশ হয়; তাহা হইলে আমার যাহা দরকার সবই পাই, কাহাকেও টেক্স দিতে হয় না।" স্বাধীন দেশের লোককে ট্যাক্স দিতে হয় না, এরূপ ধারণা কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের আছে কি না, জানি না; কিন্তু স্বাধীনতার মানে যে অনেকে নিজের ইচ্ছামত ও সুবিধামত আচরণ বুঝে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক যাহারা স্বাধীন তাহাদিগকেও নানা রকমের নিয়মের বাঁধা বাঁধির মধ্যে বাস করিতে হয়। অনেক সময় পরাধীন লোকদের চেয়ে স্বাধীন লোকদের অর্থব্যয়, এবং যুদ্ধে প্রাণসংশয় ও প্রাণহানি বেশী হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারত-বর্ষকে কেবলমাত্র দেড় কোটি টাকা দিতে হইয়াছে। কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞ সুইসের মতে ইংলণ্ডকে প্রত্যহ দেড় কোটি, জার্ম্মেনীও রুশিয়ার প্রত্যেককে প্রত্যহ ৪।৹ কোটি, ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার প্রত্যেককে প্রত্যহ তিন কোটি টাকা করিয়া খরচ করিতে হইতেছে। অষ্ট্রিয়া রুশিয়া জার্ম্মেনী ফ্রান্স প্রভৃতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে যত সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছে, ভারতবর্ষকে তত পাঠাইতে হয় নাই। অবশ্য যাহারা স্বাধীনতার সুখ ও অধিকার ভোগ করে, যুদ্ধের সময় তাহারা উৎসাহের সহিত তাহার মূল্য দিতেও প্রস্তুত থাকে।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় অবস্থা কিরূপ হইবে, উহার মধ্যে স্বাধীনতা কতটুকু থাকিবে, কেহ বলিতে পারে না। স্বদেশী রাজার অধীন হইলেই যে দেশের

লোক বাস্তবিক স্বাধীনতা ভোগ করিবেই, তাহা বলা যায় না। স্বদেশী রাজা খুব প্রজাপীড়ক হইতে পারে। আবার এমনও হয় যে বিদেশী রাজার অধীন কোন কোন দেশের লোকের এরূপ কিছু অধিকার থাকিতে পারে যাহা স্বদেশীরাজার অধীন কোন কোন দেশের লোকদের নাই। অতএব "স্বাধীন" বা "পরাধীন" কথা দুটির দ্বারা বিচার না করিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকারের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। তজ্জন্য আমরা "স্বাধীন" বা "পরাধীন" কোন কথাই ব্যবহার না করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতের আদর্শ-সম্বন্ধে আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা খুব সংক্ষেপে বলিতে চাই।

মানুষের প্রত্যেকের শক্তির বিকাশ, আনন্দ, সুবিধা ও উন্নতির জন্য যেরূপ সুযোগ পাওয়া দরকার এবং যাহা কিছু করা দরকার, তৎসম্বন্ধে কোন কোন দেশের লোকের নিজেদের যতটা হাত আছে, অন্য কোন কোন দেশের লোকদের ততটা নাই। আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই যে, ভারতের ভবিষ্যৎ অধিবাসীরা যে কোন দেশের লোকের সমান সুস্থ এবং দৈহিক ও আত্মিক শক্তিশালী হইবে, তাহাদের জীবন যে কোন দেশের লোকের জীবনের ন্যায় আনন্দপূর্ণ হইবে, তাহাদের নিজের উন্নতির জন্য তাহারা যাহা আবশ্যক মনে করিবে তাহা করিবার অধিকার ও যোগ্যতা তাহাদের থাকিবে, এবং মানুষের পক্ষে নিজের ভাগ্যবিধাতা যতটা হওয়া সম্ভব, তাহা তাহারা হইবে। ভারতের অধিবাসী বলিতে আমরা জাতি, বংশ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতজাত ও ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা সমুদয় নারী ও পুরুষকে বুঝি। ভবিষ্যৎ ভারতে আমরা কোন একটি শ্রেণীর পুরুষ বা নারীর প্রভুত্ব দেখিতে চাই না, কিম্বা নারীর উপর পুরুষের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব দেখিতেও চাই না।

ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ ভারতের আদর্শ। ইহা অপেক্ষা খাট কোন অবস্থাকে আমরা আদর্শ বলিতে পারি না, ইহা অপেক্ষা খাট কোন জিনিষের চিন্তায় আমাদের আত্মা আনন্দ পায় না।

ইহা ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু ভবিষ্যৎ ধীরে ধীরে আসে, এবং আমরা এই যে মুহূর্ত্তে লিখিতেছি, তাহার পর মুহূর্ত্তই ভবিষ্যৎ, এবং অল্পক্ষণ পরেই তাহাই আবার অতীতে মিলাইয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইবে কি না, এবং কখন হইবে, তাহা কেবল ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের উপর নির্ভর করিতেছে না। এখন যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, বিশেষ করিয়া এখনও যাঁহাদের সম্মুখে দীর্ঘ জীবনপথ পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের উপরও ইহা নির্ভর করে, এবং তাঁহারাও ইহার জন্য দায়ী। স্বপ্ন দেখার নিন্দা আমরা করি না। স্বপ্নদেখার আবশ্যক আছে। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবমূর্ত্তি দিতে হইলে প্রজ্ঞা, একাগ্রতা, ত্যাগ ও কঠোর শ্রমের প্রয়োজন। ভাগ্যবান তাহারা যাহারা এই প্রয়োজন স্বীকার করে, এবং তদনুরূপ আচরণ করে।

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি যাহাতে হয়, তাহার আলোচনা করিবার জন্য প্রতিবৎসর যেখানে কংগ্রেস হয় সেই সহরে একটি সমিতির অধিবেশন হয়। এবার মান্দ্রাজে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের মাননীয় মনমোহন দাস রামজী ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় অনেক সারগর্ভ কথা বলেন। তাঁহার মতে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে কারখানার সংখ্যা বাড়িয়াছে, যৌথ কারবারের সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং ব্যাঙ্কগুলির মূলধন বাড়িয়াছে। স্বদেশী প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হইবার কারণ, তিনি বলেন, বিশেষদক্ষ (expert) লোকের অভাব, বাণিজ্যিক বিষয়ে উচ্চতর ধর্ম্মনীতির অভাব, গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য, এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব। শেষোক্ত অভাব, তাঁহার মতে, গবর্ণমেণ্টই প্রধানতঃ দূর করিতে পারেন। শিল্পের উন্নতির জন্য আজ কাল উচ্চ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগাইতে না পারিলে চলে না। এইজন্য জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশে বহু বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কারে নিযুক্ত আছেন। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া যদি বলিয়া দেন যে কোন কোন ব্যবসা কিরূপে এদেশে চলিতে পারে, তাহা হইলে শিল্পের

উন্নতি হইতে পারে। সভ্যজাতিরা নিজেদের দেশের বাণিজ্যের উন্নতির জন্য আর সব দেশে নিজেদের কন্‌সল্‌ বা বাণিজ্যদূত নিযুক্ত করিয়া রাখে। এইরূপ ব্রিটিশ বাণিজ্যদূত নানাদেশে আছে। ব্রিটিশ বাণিজ্য সম্বন্ধেই তাহাদের এত কাজ যে তাহাদের দ্বারা ভারতবর্ষের কাজ হইতে পারে না। এইজন্য হয় প্রত্যেক দেশে ব্রিটিশ দূতের অধীনে ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদের দ্বারা চালিত একএকটি ভারতীয় বিভাগ খুলা আবশ্যক, নতুবা

মাননীয় শ্রীযুক্ত মনমোহনদাস রামজী।

স্বতন্ত্র ভারতীয় বাণিজ্যদূত নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এই ভারতীয় বাণিজ্যদূত বা বাণিজ্যিক বিভাগের কাজ হইবে, বিদেশীদিগকে বলা যে ভারতবর্ষের কি কি কাঁচামাল ও শিল্পদ্রব্য তাহারা কিনিলে তাহাদের সুবিধা হইবে, এবং ভারতবর্ষে ঐ বিদেশীদের কি কি কাঁচামাল ও শিল্পদ্রব্যের কাট্‌তি হইতে পারে, এবং অন্যদিকে ভারতবাসীদিগকে জানান যে তাহারা ঐ বিদেশীদিগকে কি কি কাঁচামাল ও শিল্পদ্রব্য বেচিয়া লাভবান হইতে পারে, ও তাহাদের নিকট হইতে কি কি জিনিষ আমদানী করিলে ব্যবসার সুবিধা হইতে পারে।

শিল্পসমিতির কার্য্যসম্বন্ধে তিনি বলেন যে উহা বৎসরে একবার অধিবেশন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। প্রদেশে প্রদেশে জেলায় জেলায় উহার কমিটি ও আফিস করিয়া তাহা হইতে দেশে, শিল্পসম্বন্ধে কাজে লাগান যায়, এরূপ জ্ঞান বিস্তার করা কর্ত্তব্য, এবং শিল্পসম্বন্ধে সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। এই কাজ সমস্ত বৎসর ধরিয়া হওয়া চাই।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক আদর্শসম্বন্ধে তিনি বলেন, যে, ভারতবর্ষের এ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত: রাজস্ব ও বাণিজ্যিক সমুদয় ব্যাপারে আগে বিলাতবাসীদের সুবিধা করিয়া তাহার পর ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে চলিবে না। ভারতবর্ষকে নিজেই নিজের রাজস্বনীতি, বাণিজ্যনীতি ও অর্থনীতি স্থির করিবার ক্ষমতা দেওয়া চাই।

মহীশূরের যুবরাজ।

সমাজসংস্কার সমিতি

যেমন রীতি আছে, তদনুসারে মান্দ্রাজে সমাজসংস্কার সমিতিরও অধিবেশন হইয়াছিল। মহীশূরের যুবরাজ

প্রারম্ভিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। তিনি বলেন জাতিভেদের জন্য ভারতবাসীরা সমকক্ষভাবে পাশ্চাত্য জাতিসকলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না। শিক্ষায় আমরা পিছাইয়া রহিয়াছি। স্ত্রীলোকেরা সামাজিক ও জাতীয় জীবনে আপনাদের শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেছেন না। জাতিভেদের জন্য শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিতে ব্যাঘাত হইতেছে। এই সমিতির অধিবেশনে অনেকগুলি প্রস্তাব ধার্য্য হয়। তন্মধ্যে একটিতে বালিকা ও নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোককে বিদ্যালয়সকলে শিশুদিগকে পাঠাইতে অনুরোধ করা হয়।

সরযূপারীন ব্রাহ্মণসভা।

গত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর হিন্দুর অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান হিন্দুপ্রধান অযোধ্যা নগরীতে সমগ্র ভারতের সরযূপারীন ব্রাহ্মণদিগের মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গে যেমন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, আগ্রা অযোধ্যাদি প্রদেশে তেমনি কান্যকুব্জ, সরযূপারীন প্রভৃতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বাস করেন। বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী এই মহাসভার সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও জেলা হইতে দুই শতের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। যে সকল প্রস্তাব ধার্য্য হয়, তাহার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য। একটি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে, এবং অপরটি ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিয়া শিক্ষাবিস্তারের সপক্ষে। সভাস্থলেই কুড়িটি বৃত্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

এই সরযূপারীন ব্রাহ্মণ মহাসভা শিক্ষিত সংস্কারক-দিগের সভা নহে; মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীও সেকেলে টোলের পণ্ডিত, তিনি সমুদ্রযাত্রার বিরোধী। সুতরাং সরযূপারীন ব্রাহ্মণ মহাসভায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধার্য্য হওয়ার গুরুত্ব আছে।

জার-গ্রাড্ না জার-গ্রাস?

ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস্ বলেন যে রুশেরা তুর্কের কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলকে ইতিমধ্যেই জার-গ্রাড্ (Czargrad) নাম দিয়া ঐ নাম ব্যবহার করিতেছে। জার রুশিয়ার সম্রাটের উপাধি। জার-গ্রাড্ মানে জারের দুর্গ বা পুরী। রিভিউ অব্ রিভিউজ নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রের সম্পাদক বলিতেছেন যে "তুরস্ক যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় একটা সমস্যার সমাধান হইল, যাহা সে নিরপেক্ষ থাকিলে কঠিন হইত; সেটা হচ্চে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের ভবিষ্যৎ। এখন আর কোন সন্দেহই নাই যে বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে রুশিয়া ঐ সহর এবং বস্পোরাস্ প্রণালী দখল করিবে, এবং এই প্রকারে তাহার বহুআকাঙ্ক্ষিত বরফবিহীন একটি বন্দর পাইবে। যেহেতু তুরস্ক আর উহা দখল করিয়া থাকিতে পারিতেছে না, অতএব তাহার একমাত্র সম্ভব উত্তরাধিকারী রুশিয়া। আসুন আমরা রুশিয়াকে এই ভরসা দি, যে, তাহার বহুবিলম্বিত ভাগ্যলিপি ফলিবার বিরুদ্ধে অন্ততঃ এই (ইংলণ্ড) দেশে কোন চেষ্টা হইবে না।" অবশ্য সম্পাদক মহাশয়ের মতে রুশিয়ার ললাটে বিধাতা লিখিয়া রাখিয়াছেন যে তুমি কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের প্রভু হইবে, এবং সম্পাদক এই লিপি পড়িয়াছেন।

ইহা একজন ইংরেজের মত মাত্র; তাহার বেশী কিছু ঠিক করিয়া বলা যায় না। এখন আর একজন ইংরেজের আর এক বিষয়ে মত কি দেখা যাক্।

লর্ড হল্‌স্‌বেরী পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লর্ড চান্সেলর ছিলেন। ইহা অতি উচ্চ পদ। তিনি গত ডিসেম্বর মাসে একটি বক্তৃতাতে জার্ম্মেনীর সম্রাট্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ—

"The eighth commandment had universal application.................A man who thought himself appointed by God to seize another's property and an Emperor wanting to possess a world empire by seizing countries smaller that his own was a dirty thief and ought to be hanged."

অর্থাৎ "খৃষ্টধর্ম্মের দশ আজ্ঞার মধ্যে অষ্টম আজ্ঞা [চুরি করিও না] সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য। কোন মানুষ যদি মনে করে যে সে ঈশ্বর কর্ত্তৃক অপরের সম্পত্তি দখল করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে, একজন সম্রাট যদি তাহার নিজের দেশের চেয়ে ছোট দেশগুলি অধিকার করিয়া জগৎ-সাম্রাজ্যের অধিকারী হইতে চায়, তাহা হইলে সে একটা জঘন্য চোর এবং তাহার ফাঁসী দেওয়া উচিত।"

রিভিউ অব্ রিভিউজের সম্পাদক এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি বলেন, জানিতে ইচ্ছা করে।

যাহা হউক, রুশিয়া যদি কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল দখল করিতে সমর্থ হয়, ও উহার নাম বদলাইয়া জার-গ্রাড্ রাখে, তাহা হইলে বাংলাভাষায় উহার অনুবাদ জার-গ্রাস্ করা চলিবে।

যুদ্ধের সংবাদ

ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস বলেন, ফ্রান্সে যে ২৫০ মাইল লম্বা ভূখণ্ডে যুদ্ধ হইতেছে, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র ২৫ মাইল যে আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে দখল করিয়া আছি, তাহা উপলব্ধি করা কঠিন। * ফ্রান্স ২২৫ মাইল আগ্‌লাইয়া আছে, এবং হয় জার্ম্মেনীকে হটাইয়া দিতেছে বা অগ্রসর হইতে দিতেছে না। রয়টার তারে ২৫ মাইলের খবর যে পরিমাণে পাঠাইতেছেন, ২২৫ মাইলের সেরূপ পাঠাইতেছেন না। বোধ হয় তাঁহার মত এই যে ভারতবর্ষের লোকদের ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সৈন্যসকলের বীরত্ব-কাহিনী জানা যতটা দরকার, ফ্রান্সের বীরত্বকাহিনী জানা ততটা দরকার নয়।

পশ্চিমে জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও ইংলণ্ডের সহিত লড়িতেছে, পূর্ব্বদিকে রুশিয়ার সহিত লড়িতেছে। এই পূর্ব্বদিকের যুদ্ধক্ষেত্রেই অতীতের বড় বড় যুদ্ধের মত ভীষণ জয়পরাজয় চলিতেছে। পশ্চিমদিকে উভয়পক্ষের অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতি যদি গজ হিসাবে মাপা হইতেছে বলিয়া বলা যায়, তাহা হইলে রুশিয়ার অগ্রগতি বা হটিয়া যাওয়া মাইল হিসাবে হইতেছে বলিতে হইবে। অযুত অযুত সৈন্যের মৃত্যু, অযুত অযুত সৈন্যের বন্দী হওয়া, বড় বড় সহর দুর্গ অধিকার, বড় বড় নদী অতিক্রম, এসকল পূর্ব্বদিকের যুদ্ধক্ষেত্রেই বেশী ঘটিতেছে। অথচ পূর্ব্বদিকে একা রুষিয়া জার্ম্মেনী, তুরস্ক ও অষ্ট্রিয়ার সহিত লড়িতেছে। ইহাতে মনে হয় যে রুশিয়ার যুদ্ধের আয়োজন যেমন বিশাল, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়মের সম্মিলিত আয়োজন তেমন বিরাট এখনও হয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের আয়োজন বাড়িয়া চলিতেছে; শীঘ্রই কয়েক লক্ষ ইংরেজ সৈন্য রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইবে।

* "It is difficult to realise hat we only hold about 25 miles of the line of 250 miles in France against the Germans."

বর্ব্বরতার গল্প সৃষ্টি

রয়টার লণ্ডন হইতে তারে খবর পাঠাইয়াছেন যে কেট্ হিউম্ নামে একজন স্ত্রীলোক এইরূপ চিঠি জাল করিয়া প্রকাশ করিত যে জার্ম্মেনরা, তাহার ভগ্নী নার্স্ (শুশ্রূষাকারিণী) হিউমের অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছে। বিচারে জুরী তাহার উপর দয়া করিয়া এই সুপারিস্ করেন যে তাহাকে পরীক্ষাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। তদনুসারে তাহাকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। সে ইতিমধ্যেই তিনমাস জেল খাটিয়াছে। এমন গুণবতী নারীকে এলাহাবাদ, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি সহরের কোন কোন সম্পাদক সম্পাদিকাকে তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলে মন্দ হয় না।

ইহার পূর্ব্বেও শত্রুপক্ষের বর্ব্বরতার অনেক গল্প মিথ্যা বলিয়া বিলাতে প্রমাণিত হইয়াছে। যুদ্ধটাই তো একে নিষ্ঠুর ব্যাপার, মানুষের অতীত অসভ্য অবস্থার পরিচায়ক লক্ষণ। তাহার উপর আবার পৈশাচিক বর্ব্বরতার কথা সত্য হইলে মানবজাতির কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই মনে করিয়া প্রত্যেক মানুষকেই লজ্জিত হইতে হয়। আমেরিকার বেশীর ভাগ কাগজ যে জার্ম্মেনীর বন্ধু তাহা নয়। অথচ আমেরিকাতেও এখন সম্পাদকগণ তাঁহাদের যুদ্ধক্ষেত্রস্থ সংবাদদাতাদের পত্র হইতে বুঝিতে পারিতেছেন যে উভয়পক্ষে পরস্পরকে যে সব বর্ব্বরতার জন্য অভিযুক্ত করিতেছে, তাহার অধিকাংশই মিথ্যা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সত্যবাদিতা

লর্ড কর্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণ সভায় বক্তৃতা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, যে, সত্যবাদিতা বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্যজাতিদের গুণ, তাহা পাশ্চাত্য দেশসকলেই বিশেষভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে; প্রাচ্য মহাদেশে তাহা তেমন বিকশিত হয় নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধে দেখা যাইতেছে, উভয় পক্ষই পরস্পরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন,

তুমি মিথ্যার কারখানা খুলিয়াছ, কেহ বলিতেছেন, তুমি সত্যের দেবতাকে বন্দী করিয়াছ। বাস্তবিক কোন দেশ কি পরিমাণে সত্য বলিতেছেন বা সত্য গোপন করিতেছেন বা সত্যের অপলাপ করিতেছেন, তাহা আমরা স্থির করিতে অসমর্থ; কারণ এরূপ কার্য্যের জন্য যথেষ্ট উপকরণ নাই। তাহা স্থির করিতে না পারিলেও ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে কেহ না কেহ মিথ্যা বলিতেছে। তাহা না হইলে পরস্পরকে এত গালাগালি চলিত না। সুতরাং, এখন বোধ হয় লর্ড কর্জন বুঝিতে পারিয়াছেন যে মিথ্যার সৃষ্টিতে কেবল প্রাচ্য জাতিরাই পারদর্শী, ইহা বলা চলে না।

ঘুঁসাঘুঁষিতে ও মল্লযুদ্ধে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেবলমাত্র লড়ে, কিন্তু পরস্পরকে গালাগালি দেয় না, যুদ্ধও সেইভাবে চলিলে মন্দ হয় না। এখন যেরূপ চলিতেছে, ইহা কতকটা যেন অঙ্গদ-রায়বারের মত। অথবা ধীবরজাতীয়া কোন কোন অঙ্গনার সংগ্রামের মত।

বঙ্গে শিক্ষার বিবরণ

১৯১৩—১৪ সালের শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টের উপর বাংলা গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ বৎসর সাধারণ সরকারী কলেজ গুলিতে ৩১৭১ জন ছাত্র ছিল। পূর্ব্ব বৎসর ছিল ২৯০৫। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ১৭৭১৬ জন ছাত্র কমিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বালিকার সংখ্যা কমিয়াছে ২৯২০। দেশের লোকসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে না বাড়িলেও প্রতি বৎসরই কিছু বাড়িতেছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা বাড়া দূরে থাক্, কমিয়াই চলিতেছে। ১৯১২—১৩র রিপোর্টে দেখা গিয়াছিল যে সে বৎসর ১৯১১—১২ অপেক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ১১৬৯০ জন ছাত্র কমিয়াছিল। এ বৎসর আবার আরও কমিয়াছে। শিক্ষাবিভাগ অবশ্য বলিতেছেন যে অকর্ম্মণ্য কতকগুলি পাঠশালা উঠিয়া যাউক না, বাকীগুলি খুব ভাল হইবে। কিন্তু ক্রমশ কমিতে কমিতে কটি বাকী থাকিবে, তাহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া, নিশ্চিন্তপুরের রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ছেলেরা যদি ভাল স্কুলে পড়ে, তাহা হইলে গরীবনগরের কৃষ্ণদাস মণ্ডলের ছেলেরা যে যেমন-তেমন একটা পাঠশালাতেও পড়িতে পাইতেছে না, তাহাতে তাহাদের সান্ত্বনা দেওয়া যাইবে কেমন করিয়া? গবর্ণমেণ্ট সকল গ্রাম হইতেই খাজনা পান। সুতরাং সকল স্থানের প্রজারই শিক্ষাবিভাগের সেবা পাইবার অধিকার আছে।

বর্দ্ধমানে বন্যা হওয়ায় কয়েক শত পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া মন্তব্যে লিখিত আছে। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেইগুলি কেন পুনঃস্থাপিত হইল না, তাহা লিখিত হয় নাই। কোন বৎসর পশ্চিমবঙ্গে বন্যা, কোন বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ, এইরূপ কোন না কোন কারণে প্রতিবৎসরই কতকগুলি বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেগুলি বিশেষ চেষ্টা ও বিশেষ অর্থব্যয় করিয়া পুনঃস্থাপন ও রক্ষা করাই শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তব্য। কতকগুলি বিদ্যালয় কি কারণে উঠিয়া গেল, তাহা বলিলেই শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তব্য শেষ হইল না। যদি বন্যায় কতকগুলি পুলিশের থানা ও জেল ভাসিয়া যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অবিলম্বে সেগুলি আবার নির্ম্মিত হইত। প্রজা-বর্গের মঙ্গলের জন্য পুলিশের থানা ও জেল যেরূপ দরকার, শিক্ষালয় তাহার চেয়ে কম দরকারী নহে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যে একটা স্কুল খুলে সে একটা জেল বন্ধ করে। ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও, ইহা ধ্রুব সত্য, যে, দেশে অপরাধীর সংখ্যা কমাইতে হইলে শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজন। যে কোন দিকে উন্নতি চান, তাহার জন্য যে শিক্ষা আবশ্যক, সে কথা না হয় এখন নাই ধরিলাম। আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিধায়ক (educationist) হোরেস্ ম্যান বলিতেন যে, কি আর্থিক অবস্থা উন্নতির জন্য, কি নৈতিক উন্নতির জন্য, কি বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য, শিক্ষা যেমন মানুষের সহায় এমন আর কিছুই নহে। কুসংস্কার, বিচারবর্জ্জিত ভ্রান্ত-ধারণা, এবং মিথ্যা তর্ক অজ্ঞতার নিত্যসহচর বলিয়া ইহা কখনও জাতীয় কল্যাণ উৎপাদন করিতে পারে না; বরঞ্চ ইহা হইতে সমাজের বিপদাশঙ্কাই থাকে, এবং ইহা সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। হোরেস্ ম্যান আইনভঙ্গজনিত অপরাধ এবং অজ্ঞতার

মধ্যে কার্য্যকারণ সম্পর্কের বিষয় বলিতে গিয়া, সমুদয় বালকবালিকাকে যাহার দ্বারা শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য করা যায়, এরূপ আইনের সমর্থন করিয়াছেন; এইরূপ শিক্ষাকে তিনি অপরাধপ্রবৃত্তির ঔষধস্বরূপ মনে করিতেন। এই হেতু তিনি দেশের সমুদয় শিশুর শিক্ষার জন্য যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় চালাইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে দেখা যায় যে স্কুলপরিদর্শকেরা অনেকগুলি ক্ষণভঙ্গুর রকমের বিদ্যালয়কে নিরুৎসাহ করিয়াছেন (many of an ephemeral nature were discouraged by inspectors)। আমরা এরূপ রীতির অনুমোদন করিতে পারি না। একেই তো দেশে বিদ্যালয় কম; তাহাতে আবার দুর্ব্বল বলিয়া কতকগুলিকে কোথায় যথেষ্ট সাহায্য ও উপদেশ ও সুশিক্ষক দিয়া পরিদর্শকেরা উৎসাহিত করিবেন, না তাঁহারা সেগুলিকে নিরুৎসাহ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তার সহিত বলা উচিত যে কোন স্কুলপরিদর্শক কোন বিদ্যালয়কে নিরুৎসাহ করিলে তাহা তাঁহার কর্ত্তব্যের ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা চাই আরও বিদ্যালয় এবং আরও ভাল বিদ্যালয়। সংখ্যা ও উৎকর্ষ উভয়ই চাই। শিক্ষাবিভাগের ছোট বা বড় কোন কর্ম্মচারী যদি ইহা বলিয়া প্রবোধ দিতে চান যে সংখ্যা কমিলে কি হয়, বাকী বিদ্যালয়গুলির ভারী উন্নতি হইয়েছে, কিম্বা যদি তিনি এরূপ ছেলে-ভুলান কথা বলেন, যে, আগে বর্ত্তমান স্কুলগুলির উৎকর্ষ সাধন করিয়া পরে সংখ্যাবৃদ্ধিতে মন দিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা ইহাই বলিব যে তিনি নিতান্ত অপ্রামাণ্য কথা বলিতেছেন। পৃথিবীর যে সকল দেশ জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত, তাহার কোথাও স্কুলের সংখ্যা ও স্কুলের উৎকর্ষ এই উভয়ের মধ্যে এরূপ বিরোধ কল্পনা করা হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হর্ণেল সাহেবকে তাঁহার বিভাগের কাজ ভাল হইয়াছে বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন। কিন্তু যে দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর সে দেশে যখন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়া চলিয়াছে, তখন শিক্ষাবিভাগের কাজ সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের বিশ্বাস দেশের লোকেরও এই মত।

মুসলমান প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধি

মোটের উপর প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭৭১৬ কমিয়াছে, কিন্তু মুসলমান প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬৭৪ বাড়িয়াছে। মুসলমানদের শাস্ত্রে এরূপ কোথাও লেখা নাই যে কোন শ্রেণীর মুসলমানের পক্ষে জ্ঞানলাভ নিষিদ্ধ; বরং সকলের জ্ঞানলাভের আবশ্যকতাই তাহাতে আছে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে অনেকের এই ভ্রান্তসংস্কার আছে যে শাস্ত্রে শূদ্রকে ও নারীকে শিক্ষা দিতে নিষেধ আছে; যদিও হিন্দুর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র যে শ্রুতি তাহাতে এরূপ কথা আছে বলিয়া কখনও শুনি নাই। আবার খুব বেশী শিক্ষিত কোন কোন হিন্দু পরিষ্কার ভাষায় নিম্নশ্রেণীর লোকদের লেখাপড়া শিখান যে উচিত নয়, এরূপ কথা বলিয়াছেন; এবং অনেকেরই অলিখিত মত এইরূপ। সুতরাং মুসলমান ছাত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি ও হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস আকস্মিক ঘটনা নহে।

মানুষের প্রীতি পাইবার ইচ্ছা

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা যেমন নানা যুক্তি দ্বারা জার্ম্মেনীকে যুদ্ধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, তেমনি জার্ম্মেনীর প্রধান মন্ত্রী সে দিন এক বক্তৃতায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জার্ম্মেনী শান্তিরক্ষার জন্যই বরাবর চেষ্টা করিয়াছেন, জার্ম্মেনী বেলজিয়ম্ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই ঐ দেশ নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিয়াছিল, এবং যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডই দায়ী; কারণ ইংলণ্ড চেষ্টা করিলে এরূপ ব্যাপক যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু বাণিজ্যে নিজ প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মেনীকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য, ইংলণ্ড তাহা করেন নাই। ইহার জবাব ইংরেজ সম্পাদকগণ দিয়াছেন। জার্ম্মেনীর প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও লেখকগণ ইতিপূর্ব্বেই স্বদেশের পক্ষে অনেক কথা লিখিয়াছেন। ইংলণ্ডেরও প্রধান প্রধান গ্রন্থকারগণ তাহার জবাব দিয়াছেন। জার্ম্মেন গবর্ণমেণ্ট যেমন নানা নিরপেক্ষ দেশে আত্মপক্ষসমর্থন করিয়া নানাপ্রকার প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ

করাইতেছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও তেমনি সরকারী কাগজ-পত্রের লক্ষ লক্ষ খণ্ড ছাপিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন যে যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ড দায়ী নহেন। সকলেই আপনাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা এই চেষ্টার মধ্যে মানবহৃদয়ের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাইতেছি।

আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র ও ইটালী ছাড়া পৃথিবীর আর সমুদয় প্রবলতম দেশ যুদ্ধে যোগ দিয়াছে। আমেরিকা কোন পক্ষই অবলম্বন করিবে না ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। ইটালীরও নিরপেক্ষ থাকিবারই সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং এই যে উভয়পক্ষ পৃথিবীর লোককে নিজের নিজের নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করিতে বলিতেছে, ইহা কি উদ্দেশ্যে, কিসের জন্য? পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই চেষ্টার দ্বারা যুদ্ধে কোন পক্ষেরই দলবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যদি বলেন যে যুদ্ধের পর যাহাতে দোষী পক্ষকে মধ্যস্থেরা একঘোরে করে, তজ্জন্য এই চেষ্টা হইতেছে, তাহা হইলে, বলি, যাহার দোষ জাজ্জ্বল্যমান এরূপ কোন দেশও শক্তি থাকিতে কখন একঘোরে হয় নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে জার্মেনীতে যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক কার্লাইল ফ্রান্সকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ পচা ও অন্যায় আক্রমণকারী জাতি বলিয়া এবং জার্মেনীর প্রশংসা করিয়া এক পত্র রচনা করেন, ও তাহা টাইমস্ সংবাদপত্রে ছাপা হয়। তাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে এখনও মুদ্রিত হইতেছে। কিন্তু ফ্রান্স বা জার্মেনী কি সঙ্গীবিহীন হইয়াছে? রুশিয়া ও জাপানের যুদ্ধে কোন না কোন পক্ষ দোষী ছিল। কিন্তু তাহাদের বন্ধু বা সহচর কি কেহ নাই? ইতিহাস হইতে আরও নানা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান যাইতে পারে যে জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্বের ভিত্তি নির্দ্দোষিতা নহে; নিজ নিজ স্বার্থ ও সুবিধা এবং শক্তে ভক্তি ইহার ভিত্তি।

তবে উভয়পক্ষের এই যে জগৎব্যাপী স্বীয় স্বীয় সাধুতা প্রমাণের চেষ্টা, ইহার অর্থ কি? আমাদের মনে হয়, মানুষের প্রভুত্ব, শক্তি, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান যতই হউক না, সে অন্য মানুষের ভালবাসা অনুরাগ না পাইলে সুখী হয় না। এইজন্য অতি দুরাচার লোকেরাও, টাকা থাকিলে, মোসায়েব পোষে; নিজের সম্বন্ধে দুটা ভাল কথা না শুনিলে তাহারা বাঁচে কেমন করিয়া? মানুষের হৃদয়ের এই অনুরাগলিপ্সা সমাজের অন্যতম ভিত্তি। অপরের প্রীতি পাইবার এই ইচ্ছা কেহ উন্মূলিত করিতে পারে না। অহঙ্কার করিয়া কেহ কেহ বলে বটে, আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তাহা মিথ্যা কথা।

অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট থাকিলেও উভয়পক্ষই লোকের অনুমোদন ও প্রীতির জন্য লালায়িত। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে যুদ্ধের ফল যাহাই হউক, প্রবলতম যোদ্ধারাও মানবসাধারণের মতকে যুদ্ধে জয় অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দিতেছেন। পৃথিবীতে জ্ঞান ও প্রেম যত বাড়িবে, ততই এই মানবসাধারণের মত প্রবল হইবে, এবং শেষে ইহা জয়যুক্ত হইয়া জাতিতে জাতিতে যুদ্ধকে বিলুপ্তপ্রায় করিবে। তখন কোন দেশের মধ্যে চোর বা অন্য অপরাধী যেমন দণ্ডনীয় ও হেয় বিবেচিত হয়, পৃথিবীর মধ্যেও তেমনি অন্তর্জাতিক দস্যুতা বা অন্য অপরাধ দণ্ডনীয় ও হেয় বিবেচিত হইবে।

শিক্ষালয়ে ছাত্রের সংখ্যা

একএকটি স্কুলকলেজে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রের বেশী যাহাতে না থাকে, আমাদের দেশে এরূপ চেষ্টা কিছুদিন হইতে চলিতেছে। অথচ সংখ্যা এরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে উদ্বৃত্ত ছাত্রেরা কোথায় পড়িবে, তাহার কোন ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায় না। যদি বুঝিতাম, যে, যিনি ছাত্র কমাইতে বলিতেছেন, তিনি স্কুলকলেজ বাড়াইয়া দিতেছেন, তাহা হইলে আপত্তি করিতাম না। আমাদের এই গরীব নিরক্ষরদেশে ছাত্র কমাইবার এরূপ চেষ্টা বড় অনিষ্টকর। ধনী এবং শিক্ষালোকে উজ্জ্বল দেশেও ছাত্রসংখ্যা এরূপ সীমাবদ্ধ নহে। অথচ সেখানে গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়েই নূতন নূতন শিক্ষালয় খুলিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ। আমরা, একএকটা কামরায় যত ইচ্ছা ছেলে, খোঁয়াড়ে গোরু পুরার মত, ভরিয়া দিতে বলি না। আমরা বলি, যত ছেলে বাড়ে, তত কামরা বাড়াও. শ্রেণীর বিভাগ বাড়াও, শিক্ষক বাড়াও। যখন আর ইমারৎ বাড়ান বা কামরা বাড়ান চলিবে না, তখন

নূতন শিক্ষালয় স্থাপন কর। কিন্তু কাহাকেও বিদ্যা হইতে বঞ্চিত করিও না এদেশে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে খোলা জায়গায় গাছতলায় শিক্ষা দেওয়া চলে। বড় বড় ঘরবাড়ী নাই-বা হইল ?

আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে জাপানের ও বিলাতের কোন কোন শিক্ষালয়ের ছাত্রসংখ্যা দিয়া দেখাইয়াছি যে তথায় সে বিষয়ে কোন অলঙ্ঘনীয় সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। আরও কোন কোন শিক্ষালয়ের সংখ্যা দিতেছি। ইংলণ্ডে—ঈটন ১০০০এর উপর,বেড্‌ফোর্ড গ্রামার স্কুল ৭৪০, চার্টার-হাউস স্কুল ৫৮০, চেল্টেনহাম ৫৭৫, ক্লিফ্‌টন ৬০০, ডালউইচ ৬৬০, মার্ল্‌বোর ৬৩০, সেণ্টপলস্‌ ৬০০, বার্মিংহাম্‌ কিং এড্‌ওয়ার্ডস্‌ স্কুল প্রায় ২৮০০, লণ্ডনের কিংস্‌ কলেজ ২৬৬৪। আমেরিকায়—টাস্কেজী ইন্‌স্‌টিটিউট্‌ ১৫২৭, ওয়াশিংটন কলার্ড্‌ হাই স্কুল ১৫০০।

সাহিত্যসম্বন্ধীয় বার্ষিক পুস্তক

বিলাতে ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী দেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে ও কার্য্যে নিযুক্ত লোকদের সুবিধার জন্য প্রতিবৎসর নানাবিধ বার্ষিক পুস্তক বাহির হয়। কোন-টিতে জীবিত প্রধান প্রধান লোকের ঠিকানা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত থাকে, কোনটিতে সমুদয় দেশের লোকসংখ্যা, শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা বৃত্তান্ত, জন্মমৃত্যুর হার, বাণিজ্য, যুদ্ধের আয়োজন, ইত্যাদি থাকে, কোনটিতে গতবৎসরে চিত্রাদি কলার উন্নতি অবনতির বৃত্তান্ত থাকে, কোনটিতে বা সমুদয় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ঠিকানা মূল্য আলোচ্য বিষয় প্রবন্ধাদির দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণার হার গ্রন্থকারদের নাম ও ঠিকানা প্রকাশকদের নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি থাকে। আমাদের দেশে এরূপ বহি প্রায় বাহির হয় না বলিলেও চলে। এলাহাবাদের পাণিনি আফিস নানা-বিধ শাস্ত্র ও অপরাপর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দেশের উপকার করিতেছেন। তাঁহারা এবৎসর একখানি সাহিত্যিক বর্ষ-পুস্তক বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহা ইংরেজীতে ছাপা হইবে। উহাতে ভারতবর্ষের সকলপ্রদেশের যে সকল গ্রন্থকার কোন দেশভাষায় বা ইংরেজীতে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ঠিকানা এবং তাঁহাদের লেখা বহিগুলির তালিকা থাকিবে; ভারত-বর্ষের সমুদয় পুস্তকপ্রকাশকদের নাম ও ঠিকানা থাকিবে, ভারতবর্ষের সমুদয় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের নাম ও ঠিকানা, সম্পাদকের নাম, কোন ভাষায় লেখা ইত্যাদি থাকিবে। বলা বাহুল্য, এরূপ একখানি বহির দরকার আছে। গ্রন্থকার, পুস্তকপ্রকাশক, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র সম্পাদক, এক কথায় যে কোন প্রকারে যিনি সাহিত্যসেবা করেন, তিনি পাণিনি আফিসে অবিলম্বে জ্ঞাতব্যবিষয় লিখিয়া পাঠাইলে বহিখানি প্রকাশ করিতে বিশেষ সাহায্য করা হইবে। ঠিকানা—পাণিনি আফিস, বাহাদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ।

গবর্ণরের কংগ্রেস দর্শন

এবার মান্দ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তথা-কার গবর্ণর একদিন কংগ্রেস-মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ভারতীয় সংবাদপত্রমহলে ভারী উল্লাসের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। আমরা ইহাতে উল্লসিত হইবার কারণ দেখিতেছি না। আজকাল সরকারী কর্ম্মচারীরা যে কংগ্রেসের তেমন প্রতিকূলতা করেন না, তাহার কারণ, এখন কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে খুব রফা করিয়া চলেন এবং কংগ্রেসের নেতারাও তথাকথিত "চরমপন্থী" নেতা-দিগকে বর্জ্জন করিয়াছেন। গবর্ণরের মত উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষের কংগ্রেসে আগমন ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে উদ্যানসম্মিলনে নিমন্ত্রণ তাঁহার পক্ষে সৌজন্য ও রাজ-নীতিজ্ঞতার পরিচায়ক। কিন্তু ইহাতে নেতৃবর্গের কল্যাণ হইবে না বলিয়া আশঙ্কা হয়। নানাপ্রকার কড়া আই-নের ফলে নেতাদের এবং অন্য সমুদয় দেশসেবকদের কার্য্যক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহাদের দোষ নাই। কিন্তু রাজপুরুষদের পিঠ-থাবড়ানর জন্য লোলুপ হওয়াটা দোষের বিষয় এবং বুদ্ধির অল্পতার লক্ষণ। কারণ, এ পর্য্যন্ত আমরা দেশের একজন নেতাও দেখিলাম না যিনি এই পিঠ-থাবড়ান হজম করিতে পারিয়াছেন। ইহা যিনি যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহারই বাক্যে, লেখায় এবং অন্যবিধ আচরণে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অতএব আমাদের মেরুদণ্ড যখন যথেষ্ট দৃঢ় নয়, যখন ইহা সামান্য

সৌজন্য বা অনুগ্রহের ভারেই নুইয়া যায়, যখন আমাদের চরিত্র এখনও যথেষ্ট দৃঢ় হয় নাই, তখন রাজপুরুষদিগের হইতে দূরে দূরে থাকা মন্দ নয়। আমরা কাহাকেও অশিষ্ট বা রূঢ়ভাষী হইতে বলি না। কিন্তু রাজপুরুষদের সৌজন্য বা অনুগ্রহের কাঙাল হওয়া কংগ্রেসের পক্ষে শোভা পায় না।

লঘুরামায়ণ

ভারতের মানুষকে রামায়ণ যেমন করিয়া গড়িয়াছে, আর কোন একখানি বহি বোধ হয় তেমন করিয়া গড়ে নাই। অথচ মূল বাল্মীকির রামায়ণ সমগ্র পড়া অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সংস্কৃত মৃত ভাষা না হইলেও উহা এখন আর চলিত ভাষা নয়। উহার ব্যাকরণ কঠিন বলিয়া অনেকে উহা শিখে না। স্কুলের ছাত্রেরা সংস্কৃত রামায়ণের এক আধ সর্গ মাত্র পড়ে। সমস্ত বহিটিতে পঁচিশ হাজার শ্লোক আছে। তাহা অধ্যয়ন করা সময়সাপেক্ষ। অথচ রামায়ণের মূল কাহিনীটি বলিবার জন্য পঁচিশ হাজার শ্লোকের প্রয়োজন হয় না। বাবু গোবিন্দনাথ গুহ অবান্তর কথা পুনরুক্তি আদি বাদ দিয়া মহর্ষি বাল্মীকিরই রচিত তিনহাজার শ্লোকে গ্রথিত রামায়ণের মূল আখ্যায়িকাটি লঘুরামায়ণ নাম দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি বর্ণও তাঁহার স্বরচিত নহে। এখন মূল রামায়ণের আনন্দ উপভোগও তাহা হইতে উপকারলাভ সুসাধ্য হইল। শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই গ্রন্থ বিশেষ ভাবে আদৃত হওয়া উচিত। গোবিন্দবাবু সংস্কৃতেই একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে বাল্মীকির কাল, অধুনা-প্রচলিত রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত কিছু আছে কি না, রামায়ণের সহিত হোমরের ইলিয়াডের তুলনা, প্রভৃতি বিষয় সাতিশয় পাণ্ডিত্যসহকারে বিন্যস্ত হইয়াছে। কিছু টীকাও আছে। গোবিন্দবাবু এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ভারতবাসীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে।

মিতব্যয়িতা ধর্ম্ম

মিতব্যয়ী লোকের কৃপণ বলিয়া নিন্দা রটে, খরচী লোকের খুসনাম হয়। কিন্তু মিতব্যয়িতা যদি কেবল টাকার নেশা জনিত না হয়, তাহা হইলে উহা একটি সদ্‌গুণ। দেশে যখনই কোন কারণে দুর্ভিক্ষ হয়, যখনই কোন সৎকাজের জন্য বহুঅর্থের প্রয়োজন হয়, তখন যাহাদের সাহায্য করিবার ইচ্ছা আছে, অথচ সঙ্গতি নাই, তাহারা বুঝিতে পারে যে মিতব্যয়ী হইলে এখন সাহায্য না করা রূপ অপরাধে অপরাধী হইতে হইত না। যাহারা এত দরিদ্র যে একটি পয়সাও বিলাসদ্রব্যে বা ব্যসনে খরচ করিবার সাধ্য নাই, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, যে আমরা সকলেই মিতব্যয়ী হইলে সৎকার্য্যের জন্য কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি। এই যে পূর্ব্ববঙ্গে নানাস্থানে ভীষণ অন্নকষ্ট ও বস্ত্রকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, ইহা দূর করিবার জন্য এখন প্রত্যেকেরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য যথাস্থানে পৌঁছিতেছে না এই জন্য যে আমরা নিজে, বাধ্য হইয়া উপবাসী থাকার ও বাধ্য হইয়া অর্দ্ধ নগ্ন থাকার কষ্ট যে কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, চোখের সম্মুখে স্নেহের পুত্তলী ছেলেমেয়েগুলিকে দিন দিন অস্থিচর্ম্মসার হইতে দেখিলে কি নিদারুণ যন্ত্রণা হয়, অন্নাভাবে ও বস্ত্রাভাবে তাহাদের কাতর ক্রন্দন কেমন শুনায়, তাহারা নির্জ্জীব হইয়া যখন আর কাঁদিতেও পারে না, তখন মা-বাপের মনের অবস্থা কিরূপ হয়।

নিম্নশ্রেণীর শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত দীঘিরপাড় গ্রামের গরীবলোকদের অন্ন ও বস্ত্রের ক্লেশ দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার ঠিকানা, উয়ারী, ঢাকা। তাঁহাকে সকলে সাহায্য করুন।

যুদ্ধে ভারতবর্ষের ব্যয়

যুদ্ধে ভারতবর্ষের সরকারী তহবিল হইতে এক কোটি টাকা মাত্র দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ উপহাস করিয়া লিখিয়াছেন, ভারতবাসীরা চান স্বায়ত্তশাসন, কিন্তু দিয়াছেন যুদ্ধের একদিনের ব্যয়ের দুইতৃতীয়াংশ মাত্র। দরিদ্রকে এই বিদ্রূপ না করিলে ভাল হইত। ইংলণ্ড স্কটলণ্ড আয়র্লণ্ডের মোট লোকসংখ্যা সাড়ে চারি কোটির কিছু বেশী, ভারতসাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা সাড়ে একত্রিশ কোটির কিছু বেশী। সাড়ে চারি কোটি

লোক প্রত্যহ দেড় কোটির উপর টাকা যুদ্ধের জন্য ব্যয় করিতেছে, কিন্তু সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের নিকট হইতে এককালীন এক কোটির বেশী টাকা লওয়া অসম্ভব কেন হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কারণ আমরা সংক্ষেপে এইরূপ বুঝিয়াছি।

প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ রীতি চলিয়া আসিতেছে যে যখন কোন রাজা বা সেনাপতি বা সৈন্যদল যুদ্ধে জয়ী হইয়া কোন দুর্গ, নগরাদি দখল করেন, তখন তাঁহারা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বা কিছু পর পর্য্যন্ত পরাজিত রাজা, দুর্গপতি ও অপর ধনী লোকদের ধনসম্পত্তি যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া থাকেন। জেতারা ইহা ন্যায্য পাওনা মনে করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর মোটামুটি অর্দ্ধেক সময়ে এই রীতি অনুসারে ভারতবর্ষের ধনের কতক অংশ বিলাতে গিয়াছিল। তাহার পর এদেশে যখন হইতে সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, তদবধি আর এ ভাবে ভারতবর্ষের অর্থ বিদেশে নীত হয় নাই।

শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা দেশ ধনশালী হয়। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় বাণিজ্য বিদেশীর হাতে ও তাহার অধিকাংশ ইংরেজের হাতে, এবং পণ্যদ্রব্য বিদেশে লইয়া যাইবার জন্য সমুদয় জাহাজ বিদেশীর, প্রধানতঃ ইংরেজের। ভারতবর্ষে কাঁচামাল হইতে নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যত কারখানা আছে, তাহার প্রায় সমস্ত ইংরেজের হাতে। দেশের মধ্যে জিনিষপত্র লইয়া যাইবার জন্য যে সব ষ্টীমার ও রেল গাড়ী চলে, তাহার অধিকাংশ মূলধন ইংরেজের, এবং তজ্জনিত লাভ ইংলণ্ডে যায়। অতএব "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" বলিয়া যে কথা আছে, তদনুসারে লক্ষ্মী ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। আমাদের উদ্যোগিতার অভাবে ও অন্যান্য কারণে আমরা তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতেছি না। বাণিজ্যের নীচে কৃষি; তাহা হইতে দেশের লোকে দু মুঠা খাইতে পায়। কৃষিজাত শস্য প্রভৃতি বিদেশে চালান দিয়া যে অর্থলাভ হয়, তাহার অধিকাংশ ইংরেজরাই পান; কারণ ভারতের বহির্বাণিজ্য উহাঁদের হাতে। তাহার পর কথা আছে, "তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং।" কিন্তু রাজকার্য্যের যেগুলি হইতে খুব বেশী আয় হয়, তাহার একটিও ভারতবাসী পায় না। বাকী যেগুলিতে বেশী আয় হয়, তাহারও অতি অল্পসংখ্যক কাজে ভারতবাসীরা নিযুক্ত হয়। সুতরাং রাজসেবা দ্বারাও ভারতের লোকেরা খুব ধনশালী হইতে পারে না।

শিল্পবাণিজ্যে ভারতবাসীরা যদি খুব উদ্যোগী হন, গবর্ণমেণ্ট যদি সে বিষয়ে খুব উৎসাহের সহিত সাহায্য করেন, উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে যোগ্য ভারতবাসীদিগকে যদি গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যের ব্যয় ভারতবর্ষ সাক্ষাৎভাবে তাহার লোকসংখ্যা অনুসারে দিতে পারে। এখনও ভারতবর্ষ খুব টাকা দিতেছে, কিন্তু তাহা পরোক্ষভাবে। এইজন্য ষ্টেট্স্‌ম্যান্ তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। যে সব ইংরেজ বুদ্ধিমান্ এবং কতকটা ন্যায়পরায়ণ তাঁহারা স্বীকার করেন যে বিলাত দেশটা ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও যে এত ধনশালী হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ ভারতবর্ষ। সত্য, আমরা ইংরেজদিগকে ধনী করিয়া দিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারি না; কারণ ইহাতে আমাদের দানশীলতা বা অন্যবিধ কোন কৃতিত্ব নাই। ইংরেজ নিজের পুরুষকার দ্বারা বহুকাল যাবৎ এদেশ হইতে নানা উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। তাহা হইলেও যাহার ধনে ধনী, তাহাকে উপহাস করা অতি অশোভন।

মধ্য এশিয়ায় হিন্দুসভ্যতা

ভারতবর্ষের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতা এশিয়ার নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। তিব্বত, মধ্য এশিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, আসাম, কাম্বোডিয়া, জাভা, সুমাত্রা, প্রভৃতি দেশে ও দ্বীপে হিন্দু সভ্যতার নানা চিহ্ন বিদ্যমান আছে। মধ্য এশিয়ায় অনেক নগর, গ্রাম, মন্দির, বিহার, মরুভূমির বালির নীচে চাপা পড়িয়াছে। ষ্টাইন প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক পর্য্যটকগণ এই সকল খনন করিয়া তাহার মধ্য হইতে অনেক মূর্ত্তি, চিত্র ও পুথি আবিষ্কার করিতেছেন। সেই সকল আবিষ্ক্রিয়া অবলম্বন পূর্ব্বক ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক সিল্‌ভেন লেভি মধ্য এশিয়ায় হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া প্রাচীন কুচা রাজ্য ও নগরী সম্বন্ধে। মধ্য এশিয়া জগতের নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের মিলন-স্থান ছিল। হিন্দু, পারসীক, তুর্ক, তিব্বতীয়, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টিয়ান, ম্যানীকীয়, সকলেরই এখানে গতিবিধি ও অবস্থিতি ছিল। কুচা রাজ্য ও রাজধানী চীন-তুর্কিস্থানের মধ্যস্থলে কাশগার হইতে চীন দেশে যাইবার পথে তুর্কি ও চীনাদের রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল। কুচা পুরাকালে প্রথমে আর্য্যজাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। অন্ততঃ তাহাদের ভাষা আর্য্য ছিল। উহার অধিবাসীরা পিতাকে পাতর্, মাতাকে মাতর্, অষ্টকে অক্ট বলিত। খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে কুচা বৌদ্ধধর্ম্ম ও সভ্যতা এরূপ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিল যে স্থানীয় সমগ্র সভ্যতা বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃত ইহাদের ধর্ম্মসাহিত্যের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভাষা হইয়া যাওয়ায় সমুদয় মঠ ও বিহারে ইহা শিখান হইত ও ইহার চর্চ্চা হইত।

তৎপরে শীঘ্রই কুচীয় ভাষায় সংস্কৃত হইতে বহুগ্রন্থ অনুবাদিত হইল, এবং কালক্রমে কুচীয় মৌলিক সাহিত্যের-ও সৃষ্টি হইল। ছাত্রেরা প্রথমে বর্ণমালা শিখিত। ঐ বর্ণমালায় সংস্কৃতের মত ব্যঞ্জনবর্ণের বহুসংখ্যক যুক্তঅক্ষর ছিল। নানা লোকের লেখা এরূপ অনেক বর্ণমালা খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য কাতন্ত্র অধীত হইত। তাহার পর ছাত্রেরা সংস্কৃত হইতে অবিকল অনুবাদ পড়িয়া কুচীয় পড়িত। তাহারা উদানবর্গ নামক বুদ্ধদেবের পবিত্র উক্তিসংগ্রহ নকল ও কুচীয়ভাষায় অনুবাদ করিত। অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ অনূদিত হইত তন্মধ্যে নগরোপম সূত্র, বর্ণার্ণববর্ণন, এবং জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় নানাপুস্তক উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তগুলির দুএকটা টুকরা রুশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাড্ এবং জাপানের ক্যোটো সহরে নীত হইয়াছে। ধর্ম্ম, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ এবং শিল্প ও কলা, হিন্দুসভ্যতার এই সকল অঙ্গ প্রাচ্যমহাদেশের সর্ব্বত্র পৌঁছিয়াছিল।

কুচীয়ভাষায় লিখিত মূলগ্রন্থসমূহের অনুপ্রেরণা ও বক্তব্যবিষয় সংস্কৃত হইতে লব্ধ। ইহাদের অধিকাংশ বৌদ্ধ বিনয়পিটক সম্বন্ধীয়। বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে যে সকল নিয়ম মানিতে হইত, এবং যে ভাবে জীবনযাপন করিতে হইত, তাহা বিনয়পিটকে লিখিত আছে। বিনয়পিটক সম্বন্ধে এত গ্রন্থের অস্তিত্ব হইতে বুঝা যায় যে কুচায় বৌদ্ধ বিহারগুলির সংখ্যা ও ঐশ্বর্য্য কিরূপ ছিল। অভিধর্ম্ম নামক বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের কয়েকটি অংশমাত্র কুচায় পাওয়া গিয়াছে। কুচায় শক্রপ্রশ্ন, মহাপরিনির্ব্বাণ ও উদানবর্গ পাওয়া গিয়াছে। উদানালঙ্কার অর্থাৎ প্রত্যেক উদানের উৎপত্তি, তাৎপর্য্য এবং অর্থ, আবিষ্কৃত হইয়াছে। সংস্কৃতে অবদান নামক যে সকল গল্প আছে, কুচীয়ভাষায় তাহারও অনুকরণ হইয়াছিল। এই সমুদয়ের যে যে অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সংস্কৃত অবদানগুলির অনেক নাম মনে পড়াইয়া দেয়; যেমন, ধর্ম্মরুচি, ভদ্রশিলার রাজা চন্দ্রপ্রভ, রাজা মহাপ্রভাস ও তাঁহার মাহুত, এবং রৌরক নামক নগর।

কুচায় প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম হীনযান বা মহাযান সম্প্রদায়ের ছিল তৎসম্বন্ধে লেভি বলেন, করুণাপুণ্ডরীক নামক মহাযান গ্রন্থের মত একখানি পুথির অবশিষ্টাংশ হইতে মনে হয় যে যদিও হীনযানেরই চলন বেশী ছিল, কিন্তু মহাযান মতেরও অস্তিত্ব ছিল। কুমারজীব নামক দক্ষ লেখক সেকালে বহু বহু সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বহুবৎসর কুচায় বাস করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষভাগে মহাযান মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাযানের জয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তান্ত্রিক মতের অভ্যুদয় হয়। তান্ত্রিক মতেরও প্রভাব মধ্য এশিয়ার এই নগরে অনুভূত হইয়াছিল। ব্রহ্মকল্প নামক একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার এক অংশের নাম ব্রহ্মদণ্ড। ইহা একটি খিচুড়ি বিশেষ। ইহাতে অশুদ্ধ সংস্কৃত কবিতায় নানা দেবদেবীর স্তোত্র আছে। মাতঙ্গোর অর্থাৎ চণ্ডালদিগের এবং তাহাদের পত্নী, পুত্র, কন্যা, গুরু, আচার্য্য এবং সিদ্ধদের বন্দনা করা হইয়াছে। এমন কি হরিণ ও উষ্ট্রের বন্দনাও আছে। তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে শত্রু, তস্কর, রাজা, মন্ত্রী, প্রভৃতির বিরুদ্ধে কেমন করিয়া ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ আছে। কুচীয়দিগের চিকিৎসাসম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থও ছিল। বিরোধ সম্বন্ধে, অর্থাৎ কোন্ কোন্ খাদ্যের সঙ্গে কোন্ কোন্ খাদ্যের একত্রভোজন অনিষ্টকর, তৎসম্বন্ধে এইরূপ একখানি গ্রন্থ লণ্ডনের ব্রিটিশ ম্যুজিয়মের ষ্টাইন গ্যালারীতে রক্ষিত আছে।

কিন্তু কুচীয় সাহিত্যের বিশেষত্ব ছিল একবিধ রচনায় যাহার কতক অংশ গল্প বলার মত কতক অংশ নাটকের মত। লেভি এগুলিকে আমাদের দেশের যাত্রাগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। মধ্য এশিয়ায়, বিশেষত কুচায়, এইরূপ রচনার খুব প্রাচুর্য্য ছিল। এইগুলির আখ্যানবস্তু বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা হইতে গৃহীত। লোকের খুব প্রিয় আর একটি নাটকের কথা লেভি বলিয়াছেন। ইহার নায়ক ছিলেন সুপ্রিয় নামক একজন রাজচক্রবর্ত্তী। ইহাঁর অস্তিত্ব এতদিন অজ্ঞাত ছিল। অন্যান্য অনেক নাটকের যে-সব টুকরা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ঋষ্যশৃঙ্গমুনি ও তাঁহার পত্নী শান্তা, ব্যাস ও গৌতম, বিভীষণ ও রাজনন্দিনী মুক্তিকা, এবং রাজা মহেন্দ্রসেন প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। সমস্তগুলিতেই প্রধান ব্যক্তিকে নায়ক বলা হইয়াছে; সবগুলিতেই এক এক জন বিদূষক নায়কের সহচর। যে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সযত্নে সবগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে। নামগুলি সংস্কৃত, যথা মদনভরত; স্ত্রীবিলাপ ইত্যাদি। এসব নাম কিন্তু সংস্কৃত ছন্দবিষয়ক বহিতে পাওয়া যায় না।

সিল্ভেন লেভি বলেন যে ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, কুচীয় সাহিত্য নবাবিষ্কৃত হইলেও, ইহা প্রাচীন ও বহুবিস্তৃত ছিল। সাহিত্য ছাড়া, অনেক কুচীয় সরকারী দলিলপত্র ও ব্যক্তিবিশেষের দলিল, উষ্ট্রারোহী সার্থবাহ ও পথিকের দলের ছাড়পত্র (passes), বৌদ্ধ বিহারসমূহের আয়ব্যয়ের হিসাবের খাতা, প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। এগুলি ঐতিহাসিকের কাজে লাগিবে। এগুলি কোন প্রত্নতাত্ত্বিক যদি সম্পাদনপূর্ব্বক অনুবাদসহ বাহির করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ প্রাচীনজগতে হিন্দুসভ্যতার গতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে আলোচনার দৃঢ়ভূমি আরও একটু পান।

U. RAY & SONS, CALCUTTA

গান
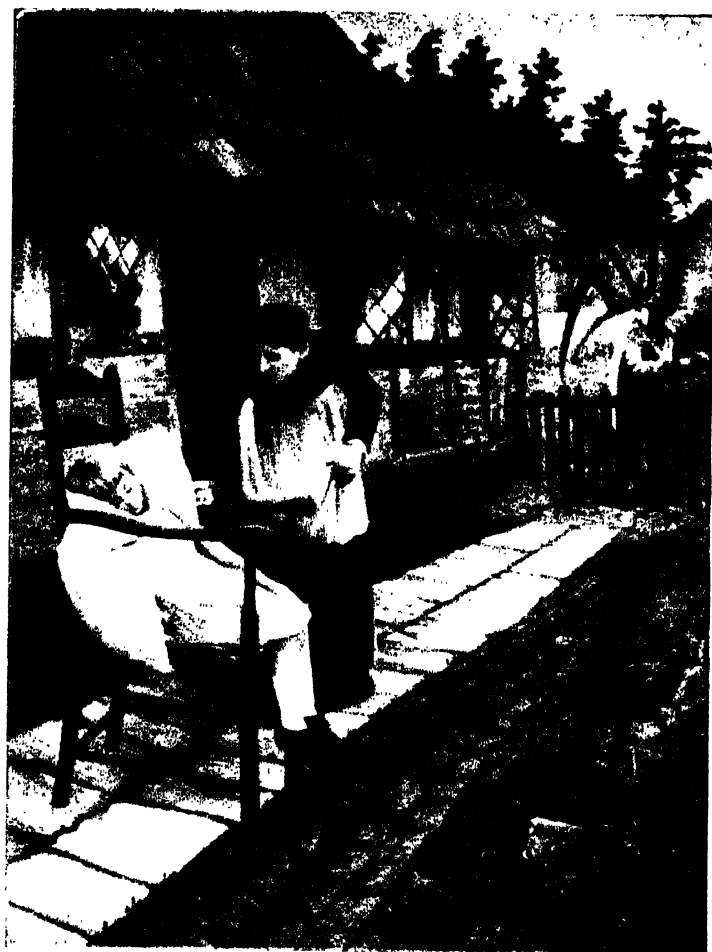
পোহাল পোহাল বিভাবরী
পূর্ব্ব-তোরণে শুনি বাঁশরী।

নাচে তরঙ্গ, তরী অতি চঞ্চল,
কম্পিত অংশুক-কেতন-অঞ্চল,
পল্লবে পল্লবে পাগল জাগল
আলস-লালস পাসরি'।

উদয়-অচল-তল সাজিল নন্দন,
গগনে গগনে বনে জাগিল বন্দন,
কনককিরণঘন শোভন স্যন্দন,
নামিল শারদ সুন্দরী।

দশদিক-অঙ্গনে দিগঙ্গনাদল
ধ্বনিল শূন্য ভরি' শঙ্খ সুমঙ্গল,
চল রে চল চল তরুণ যাত্রীদল
তুলি নব মালতীমঞ্জরী॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বজ্রাহত বনস্পতি

(গল্প)

১

জমিদার কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু নিজের হাতে বাস্তুদেবতা রাধাবিনোদের পূজা করিয়া ভোগ দিয়া ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া কাছারী-বাড়ীতে যাইতেছিলেন। যাইবার পথে দালানে আসিয়াই দেখিলেন তাঁহার গৃহিণী নিত্যকিশোরী একটি সুন্দর ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েকে কোলে করিয়া তাহার প্রফুল্ল শতদলের মতো মুখখানিতে অজস্র চুম্বন করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের মনটিও বাৎসল্যের অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল; তাঁহার মনে পড়িল সে কতদিন তাঁহারা এমনি একটি শিশুর জন্য রাধাবিনোদের কাছে কত মানত কত পূজা করিয়াছিলেন; তারপর প্রভুর দয়ায় তাঁহারই চরণধূলার মতো সুন্দর এমনি একটি মেয়ে তাঁহাদের শূন্য কোল ভরিয়াছিল, ব্যাকুল মনের ক্ষুধা মিটিয়াছিল, মরুভূমির সমান বাড়ীতে শিশুর হাসির ফুল ফুটিয়াছিল, কলধ্বনির অমৃতনির্ঝর ছুটিয়াছিল। সে তাঁহাদের তুলসীমঞ্জরী। তুলসীমঞ্জরী এখন বড় হইয়াছে; অনেক খুঁজিয়া পরম বৈষ্ণব হরেকৃষ্ণ বাবুর সুপুত্র শচীদুলালের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন। তুলসীমঞ্জরী এখন পরের হইয়া গিয়াছে; তবু ত তাঁহারা তাহাকে বেশি দিন চোখের আড়ালে রাখিতে পারেন না; সে যে প্রভুর প্রসাদী নির্ম্মাল্যের মতো, তাঁহাদের নিঃসন্তান নিরানন্দ জীবনের প্রথম আশীর্ব্বাদ। তারপর একটি পুত্র তাঁহাদের ঘর আলো করিয়াছে; তাহার রূপে গুণে বিদ্যায় কুল আলো হইবে; হয়ত দেশও আলো হইবে। সে তাঁহাদের বংশের দুলাল, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী, সে তাঁহাদের অভিলাষ। আজ গৃহিণীর কোলে সুন্দর শিশুটিকে দেখিয়া নিজের সন্তানদের শৈশবের ছবি কৃষ্ণগোবিন্দের মনে পড়িয়া গেল; মনে হইল, আহা! এমনি আর একটি শিশু, প্রভু যদি আমাদের দিতেন!

কৃষ্ণগোবিন্দ অগ্রসর হইয়া গিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বাৎসল্যভরা হাসিমুখে বলিলেন—গিন্নি, এটিকে আবার কোথায় পেলে?

নিত্যকিশোরী সস্নেহে শিশুর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—আহা! এ আমাদের ও-পাড়ার অখিল মিত্তিরের মেয়ে......কাল এর মা মারা গেছে......

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর মুখের স্নেহার্দ্র প্রফুল্লতা নিমেষ-মধ্যে ঘুচিয়া গেল, তাঁহার চক্ষুস্থির, তিনি গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—গিন্নি, ওকে কোল থেকে শীগগির নামাও, তোমার জাত গেল......

নিত্যকিশোরী অকস্মাৎ স্বামীর ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া ভীত হইয়া বলিলেন—কেন গো, কি হয়েছে?

—ওকে তুমি কোলে নিয়ে চুমু খাচ্ছ?

—আহা! কাল এর মা মারা গেছে; অতবড় সংসারটায় একটা বিধবা বৌ ছিল, সেটাও টিকল না, এই মাওড়া মেয়েটিকে দ্যাখে এমন লোক নেই, তাই আমি একে আনিয়ে নিয়েছি......

—কায়স্থের মেয়েকে কোলে করে' চুমু খেয়েছ, তোমার জাত গেছে।

নিত্যকিশোরী একটু অপ্রস্তত হইয়া নিজের কার্য্য সমর্থনের জন্য বলিলেন—আহা! মা-মরা মেয়ে কোলে আসবার জন্যে মা মা করে' কাঁদছিল......

—তা যাই হোক, তুমি ওকে কোলে থেকে নামাও। ওর পা তোমার গায়ে ঠেকছে, ওর অকল্যাণ হচ্ছে! শূদ্দুরের মুখে চুমু খেয়েছ তোমার জাত গেছে!...... নামাও, নামাও ওকে......

নিত্যকিশোরী ভীত ও ব্যথিত হইয়া তাড়াতাড়ি কোল হইতে শিশুটিকে মাটিতে নামাইয়া দিলেন। শিশুটি কোল হইতে বঞ্চিত হইয়া এবং কৃষ্ণগোবিন্দের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হামা দিয়া গিয়া নিত্যকিশোরীর পা ধরিয়া মা মা বলিয়া কেবলি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মিনতি জানাইতে লাগিল। নিত্যকিশোরী একজন ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন—থাকো, একে নিয়ে একটু ভুলো গে।

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন—ওকে পাঠিয়ে দাও...

—কোথায় পাঠাব?

—যেখান থেকে এনেছ।

—সেখানে ওকে কে দেখবে?

—কৃষ্ণের জীব, কৃষ্ণ তার জন্যে ভাবছেন...

—কিন্তু তাঁর ত একজনকে উপলক্ষ্য চাই। তিনি আমাকেই সেই ভার দিয়েছেন মনে কর না...

—না না, শূদ্দুরের মেয়ে তুমি মানুষ করবে কি? না হয় বামনদাসের বৌকে ডেকে বলে দাও সে মানুষ করুক, খরচ যা লাগে আমরা দেবো...ওকে বাড়ীতে রাখা হবে না, শূদ্দুরের ছোট মেয়ে বাড়ীতে রাখলে বাছ-বিচার থাকবে না।

নিত্যকিশোরী ক্ষুণ্ণ মনে চোখের জল নিবারণ করিবার জন্য মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন--তারপর শোন, তোমার জাত গেছে, তুমি ঠাকুরদেবতার, কি রান্নাবান্নার কোনো জিনিস এখন ছুঁয়ো না। তোমাকে অহোরাত্র করতে হবে!—আজ থেকে উপোষী থাকবে; কাল অহোরাত্র উপোষ করে থেকে পঞ্চগব্য খেয়ে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে পঞ্চামৃ খাইয়ে তোমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বুঝলে?.. ভটচায্যি মশায়কে ডেকে একটা ফর্দ্দ করিয়ে প্রায়শ্চিত্তে জোগাড় কর গে।

নিত্যকিশোরী লজ্জায় অপমানে একেবারে আড়ষ্ট সমস্ত বাড়ী স্তব্ধ কেবল কোন্ দূরের ঘর হইতে মাতৃ হীন শিশুর আকুল ক্রন্দন একটুখানি স্নেহ ভিক্ষা করিয় সমস্ত বাড়ীময় মা মা বলিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ নামাবলিখানি ভালো করিয়া গা তুলিয়া দিয়া কাছারী-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। নিত্য কিশোরী জানিতেন তাঁহার স্বামীর কথা মানেই তাঁহা আদেশ, সে আদেশের কথনো নড়চড় হয় না; এজ তিনি স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিলে না।

কৃষ্ণগোবিন্দ কাছারীবাড়ীতে যাইতেই নকুড় ভট্টাচা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—রায় মশায়, ি অপরাধে আমাকে একঘরে করবার হুকুম দিয়েছেন?

কৃষ্ণগোবিন্দ সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—তোমা ছেলেকে তুমি বিলেত পাঠিয়েছ।

নকুড় মিনতি করিয়া বলিল—ছেলে বিলেত গে তার জন্যে আমার জাত যাবে রায় মশায়?

—তুমি ত তার এই অপকর্ম্মের পোষকতা করছ?

—কি করে পোষকতা করলাম রায় মশায়? আ কি ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে সে বিলেত যাবে? হঠা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তারপর একেবারে বিলেত থে খবর দিলে...

—বিলেত যাবার টাকা পেলে কোথায়?

—পাঁচ শ টাকা সে তার মায়ের কাছ থেকে বাই সিকেল আর কি কি বইটই কিনবে বলে নিয়েছিল, আ দু তিন শ টাকা তার ঘড়ীচেন বাঁধা রেখে নিসু মুখুযো কাছ থেকে ধার করে নিয়ে গেছে শুনছি।

—কিন্তু এখন ত তুমি তাকে মাসে মাসে খর পাঠাচ্ছ?

—কি করি রায় মশায়, বিদেশ বিভুঁইয়ে ছেলেটা ি না-খেয়ে মারা যাবে?

—অমন ছেলে মরাই ভালো!

নকুড় ব্যথিত হইয়া বলিল—রায় মশায়, আপনি অক্লেশে যে কথা বলতে পারলেন, আমি বাপ হয়ে তা কি কখনো মনে করতেও পারি?...আপনার অভিলাষ যদি বিলেত যেত...

কৃষ্ণগোবিন্দ হো হো করিয়া এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন যেন এমন অসম্ভব কথা কেহ কখনো বলে নাই বা শুনে নাই। তিনি বলিলেন—অভিলাষ বিলেত যাবে? তেমন বংশে তার জন্ম নয়। ধরে নাও সে যদি যায়ই, তবে সেদিন থেকে সে আর আমার কেউ নয়!

ইহা শুনিয়া নকুড় আহত পিপীলিকার ন্যায় মরীয়া হইয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে দংশন করিবার জন্য বলিল—আচ্ছা দেখা যাবে, ছেলে না যাক, জামাই ত বিলেত গেছে, মেয়ে-জামাইকে কেমন ত্যাগ করতে পারেন!

কৃষ্ণগোবিন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বলিলেন—মিথ্যেবাদী! ম্লেচ্ছ! তুমি কি সবাইকে নিজের ছেলের মতন পেয়েছ? হরেকৃষ্ণ গোস্বামীর ছেলের নামে এমন অপবাদ দিচ্ছ, তোমার জিভ খসে যাবে না?...

নকুড় দুর্ব্বলের বিজয়ের ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল—দুঃখিত হলাম রায় মশায়, জিভ খসবে না, আমি মিথ্যে কথা বলিনি। গাঁয়ের অপর লোকে ম্লেচ্ছ বলতে পারে, আপনার মুখে আর ও কথাটা শোভা পাচ্ছে না। আপনার মেয়ে এখনো আপনার বাড়ীতে রয়েছে! আপনি হলেন গিয়ে সমাজপতি, আপনি এখন নিজেকেও একঘরে করুন; আমি একঘরে হয়েছি, আপনাকে দলে পেলে তবু দুঘরে হয়ে থাকব!

কৃষ্ণগোবিন্দ রাগে লজ্জায় অপমানে থমথম করিতেছিলেন। নকুড় নিজের জয়ে উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—রায় মশায়, এখানে এসেই যখন শুনলাম যে মাওড়া কায়স্থের মেয়ের চুমু খেয়েছেন বলে' আপনি আপনার গিন্নির প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন, তখনই বুঝেছিলাম যে আমার একঘরে হওয়া রদ হবে না। তবু আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম আপনাকে এই সুখবরটা শুনিয়ে যাবার জন্যেই। শচীদুলাল বড় ভালো ছেলে, আমায় গিয়ে বিশেষ সহানুভূতি জানালে, আপনার বেশই একটু নিন্দে করলে, তারপর আমায় বল্লে যে, "খুড়োমশায়, এখন কাউকে বলবেন না, শুধু আপনাকে চুপিচুপি বলছি, আমিও যে বিলেত যাচ্ছি, আমার টিকিট পর্য্যন্ত কেনা হয়ে গেছে।" আমি বল্লাম, "তা বেশ বাবা বেশ। যাও যাও, তুমি গেলে আমার পঞ্চুর তবু একজন চেনাশোনা সঙ্গী হবে।" এতদিনে সে বোধ হয় বিলেত পৌঁছে গেছে। আমি মনে করলাম সুখবরটা আপনার কাছে চেপে রাখা আর ঠিক নয়, তাই আজ শুনিয়ে গেলাম......

কৃষ্ণগোবিন্দ হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—কে আছিস রে? এই ভট্‌চাযটার কান ধরে এখান থেকে বার্ করে দে ত......

নকুড় বক্রদৃষ্টিতে ক্রূর হাসি ভরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে বিদ্ধ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণগোবিন্দও আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। একেবারে হনহন করিয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীর মধ্যে আসিয়াই ডাকিলেন—তুলসী!

বাপের আদরের মেয়ে তুলসী, বাপের ডাক শুনিয়া হাসিমুখে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া—কেন বাবা?—বলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; সে জন্মিয়া অবধি বাপের এমন উগ্র ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কখনো দেখে নাই; তিনি কাহারো উপর খুব ক্রুদ্ধ হইলে নিত্যকিশোরী তাড়াতাড়ি তুলসীকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতেন, তুলসীকে দেখিলে তিনি অতিবড় ক্রোধও ভুলিয়া কন্যাকে হাসিমুখে তুলসা তুসী মঞ্জরী প্রভৃতি কত নামে ডাকিয়া আদর করিতেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—তুলসী! শচী বিলেত গেছে?

তুলসী পিতার ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিল! পরম অপরাধীর মতো মাথা নত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

—এ খবর তুমি যখন জেনেছিলে তখনই আমায় জানাওনি কেন?

তুলসী অতি মৃদুস্বরে মাথা নত করিয়াই বলিল—উনি আমায় বারণ করেছিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—

তুই যদি আগে আমায় জানাতিস তবে আমি ওকে যেতে দিতাম না; কথা না শুনত ঘরে বন্ধ করে রাখতাম। তবু যদি পালিয়ে যেত, জানতাম তুই বিধবা হয়েছিস...

তুলসীর চোখ দিয়া টসটস করিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। যে স্বামী তাহার কত দূর বিদেশে, তাহার অমঙ্গল-আশঙ্কায় তুলসীর নারী-হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে জলভরা চোখ দুটি তুলিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ নিজের ক্ষণিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া বলিলেন—তুই আমার মেয়ে হয়ে জেনে শুনে তোর স্বামীকে বিলেত যেতে সাহায্য করেছিস, আমার উঁচু মাথা তুই হেঁট করে দিয়েছিস, আমার কুলে কালি দিয়েছিস! আমার এ ঠাকুরদেবতার বাড়ী—এ বাড়ীতে আর তোর ঠাঁই হবে না। শীগগির প্রস্তুত হয়ে নে, পাল্কী আসছে এখনি তোকে যেতে হবে।

বাবা!—ডাকের মধ্যে তুলসী হৃদয়ের সমস্তখানি মিনতি ঢালিয়া দিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের পায়ে ধরিতে গেল! তাহার হাত শূন্য মেঝেতে গিয়া পড়িল, কৃষ্ণগোবিন্দ তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

নিত্যকিশোরী আসিয়া নীরবে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে কন্যাকে মাটি হইতে তুলিয়া বুকে করিলেন; তুলসী মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মা, তবে আজ এই শেষ দেখা!

মা কন্যার এই কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। আকৈশোর তিনি কর্ত্তার কড়া হুকুমে এমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে এতবড় ব্যাপারটাও নীরবে মানিয়া লওয়া ছাড়া তাঁহার আর কোনো সাধ্য হইল না।

ক্ষণেক পরেই সমস্ত বাড়ীকে চোখের জলে ভাসাইয়া তুলসীর পাল্কী অন্তঃপুর হইতে চিরদিনের জন্য বাহির হইয়া গেল।

বেহারাদের কোলাহল তখনো অন্দর হইতে শোনা যাইতেছিল। কৃষ্ণগোবিন্দকে আসিতে দেখিয়া নিত্য-কিশোরী তাড়াতাড়ি জানলা হইতে সরিয়া আসিয়া চোখ মুছিয়া দাঁড়াইলেন। উচ্ছ্বসিত বেদনা রুদ্ধ রাখিবার দারুণ শ্রমে কৃষ্ণগোবিন্দকে ভয়ানক দেখাইতেছিল। তিনি ঘরে আসিয়াই জোর দিয়া বলিলেন—গিন্নি, তুলসী বলে আমার কোনো মেয়ে ছিল না। কেউ যেন আমার কাছে তার নাম না করে।

নিত্যকিশোরী ফ্যালফ্যাল করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বুকফাটা অশ্রুনির্ঝর স্বামীর হুকুমের পাথর দিয়া চাপা রহিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ পুত্রের ঘরে গিয়া দেখিলেন অভিলাষ টেবিলের উপর হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। কৃষ্ণগোবিন্দ ফিরিয়া দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর আবার ঘরে ফিরিয়া গিয়া ডাকিলেন—অভিলাষ!

অভিলাষ, পিতার আহ্বানে বেশি করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—দিদির জন্য বেদনার সহিত পিতার প্রতি ক্রোধ ও অভিমান তাহার সমস্ত ভিতর বাহির ক্রন্দনের আবেগে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন—অভিলাষ, তোমার ইংরিজি পড়া আজ থেকে বন্ধ!

অভিলাষ তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মাথা তুলিয়া বলিল—বি-এ এগজামিনের আর দুমাস আছে......

কৃষ্ণগোবিন্দ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—চুলোয় যাক তোমার বি-এ এগজামিন। ইংরিজি আর পড়তে পাবে না।

—তবে কি আমি মূর্খ হয়ে থাকব?

—পড়তে হয় সংস্কৃত পড়বে, ভাগবত পড়বে। তোমার ইংরিজি সব বই আমি পুড়িয়ে ফেলতে হুকুম দিয়েছি......

বিদ্যুৎবিদ্ধ লোকের মতো অভিলাষ চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সে আপনার চারিদিকের ব্যাপারটা ঠিক যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া খিল দিলেন। অভিলাষ ছুটিয়া আপনার বইয়ের ঘরে যাইতে গিয়া দেখিল উঠানে রঘু খানসামা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহাতে তাহার বড় সাধের বইগুলি আহুতি দিতেছে। কর্ত্তার হুকুম!

অভিলাষ নীরবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বই-পোড়া দেখিল। তারপর ধীরে ধীরে আপনার ঘরে গিয়া আড়ষ্ট আকাট হইয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল—যেন পুত্রশোকাতুর পিতা প্রাণাধিক পুত্রকে চিতায় জ্বলিতে দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই কৃষ্ণগোবিন্দ রাধাবিনোদের মন্দিরের সম্মুখে তুলসীমঞ্চের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার হঠাৎ আদেশে রাজমিস্ত্রীরা এই তুলসীমঞ্চটি মার্ব্বেল পাথরে গাঁথিয়া তুলিতেছিল। কৃষ্ণগোবিন্দ বেদনাতুর দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া তুলসীমঞ্চ গাঁথা দেখিতে দেখিতে একএকবার ফিরিয়া ফিরিয়া রাধাবিনোদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। বেলা হইয়া উঠিল, মুখের উপর রৌদ্র আসিয়া পড়িল, কৃষ্ণগোবিন্দ ঠায় দাঁড়াইয়া আছেন।

হঠাৎ রঘু খানসামা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া বলিল—মা ঠাকরুণ একবার আপনাকে ডাকছেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—এখন যেতে পারব না, যা।

—আজ্ঞে, দাদাবাবু কোথায় চলে গেছেন...

কৃষ্ণগোবিন্দ এক মুহূর্ত্ত রঘুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবিচলিত গম্ভীরভাবে বলিলেন—কি করে জানলি চলে গেছে? কোথাও বেড়াতে যায়নি?

—আজ্ঞে না, চিঠি লিখে রেখে গেছেন। মা ঠাকরুণ কাঁদতে লেগেছেন...

কৃষ্ণগোবিন্দ একবার একদৃষ্টে রাধাবিনোদের দিকে আরবার তুলসী-গাছটির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া হঠাৎ সেখান হইতে হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

অন্দরে গিয়াই নিত্যকিশোরীকে বলিলেন—কৈ, অভির চিঠি দেখি।

নিত্যকিশোরী চোখের জলে অভিষিক্ত অভিলাষের চিঠিখানি স্বামীর হাতে নীরবে তুলিয়া দিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ চোখ বুলাইয়া গম্ভীর হইয়া মনে মনে পড়িলেন—

মা,

মূর্খ হয়ে থাকতে আমি পারব না। আমি বিলেত চললাম। তুমি কেঁদো না। চেঁচিয়ে কাঁদবার হুকুম তোমার থাকবে না, মনে মনেও কেঁদো না। শিগগির আবার তোমার কোলে ফিরে আসব।
—তোমার স্নেহের অভিলাষ।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন—রঘু, ঘনশ্যামকে ডাক।

দেওয়ান ঘনশ্যাম আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন—ঘনশ্যাম, আমরা এখনই কলকাতা যাব, তার ব্যবস্থা করে দাও।...আমি অপুত্রক হয়েছি.. সমস্ত বিষয়সম্পত্তি রাধাবিনোদের নামে দেবোত্তর করতে হবে......

ঘনশ্যাম হাত জোড় করিয়া বলিলেন—আজ্ঞে অনেক বেলা হয়েছে, খাওয়া দাওয়া...

কৃষ্ণগোবিন্দ বাধা দিয়া শুধু হুকুম করিলেন—যাও, পাল্কী আনতে বলগে...

ঘনশ্যাম তথাপি হাত কচলাইতে কচলাইতে আবার বলিলেন—বৌঠাকরুণ কাল থেকে উপোষী আছেন...

কৃষ্ণগোবিন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বলিলেন—তা আমি জানি। তোমাকে যা বলছি তাই করগে।... যাও...

আধঘণ্টার মধ্যে দুখানি পাল্কী রাধাবিনোদপুর হইতে বাহির হইয়া গেল। তখনো যোল জন বেহারার হুমহুম শব্দ রুদ্ধ ক্রন্দনের মতো দূর হইতে গ্রামের মধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল। নকুড় ভট্টাচার্য্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া একগাল হাসিয়া সমবেত গ্রামবাসীদের ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—বাবা! বামুনের মাগ্য যাবে কোথা, হাতে হাতে ফলে গেল! একজন ভগবান্ ত মাথার ওপর আছেন, এখনো দিন রাত হচ্ছে!

তাহার কথার কেহ কোনো উত্তর দিল না। সমস্ত গ্রাম যেন আজ বাক্যহারা, অপ্রকাশ বেদনায় স্তব্ধ!

২

প্রায় তিন বৎসর পরে। অভিলাষ সিভিলিয়ান হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া হাবড়া ষ্টেসনে নামিল। দেখিল তাহার ভগ্নীপতি শচীদুলাল তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছে, কিন্তু তাহার নিজের বাড়ীর একটা চাকর পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে এতকাল পরে তাহার নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসে নাই। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শচীদুলালকে জিজ্ঞাসা করিল—গোঁসাইজী, আমাদের বাড়ীর কেউ আসেনি?

শচীদুলাল বুঝিল এই প্রশ্নের মধ্যে কতখানি ব্যথা ও অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। শচীদুলাল এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারিল না; যেন সান্ত্বনা দিয়া একথা ভুলাইয়া দিবার জন্যই বলিল—তুলসী তোমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছে, এস চটপট গাড়ীতে উঠে পড়।

অভিলাষ গাড়ীর খোলা দরজার সামনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাড়ীর মাথায় পোর্টমাণ্টো বিছানা বাক্স ব্যাগ বোঝাই করা দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল তাহার বাড়ীর কথা। তাহার পিতা যে তাহাকে না দেখিয়া দশ দিন থাকিতে পারিতেন না; একবার অভিলাষ বৈদ্যনাথে বেড়াইতে গিয়া তাঁহাকে একদিন চিঠি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার পিতা জবাবী টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন; দশদিন পরে নিজে বৈদ্যনাথে ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন; অভিলাষের একদিন একটু অসুখ হইলে তাঁহার নাওয়া খাওয়া বন্ধ হইয়া যাইত, রাধাবিনোদের পূজা পর্য্যন্ত হইত না। তাঁহার সেই অভিলাষ কত দূরের নির্ব্বান্ধব দেশে একাকী অসহায় নিঃসম্বল চলিয়া গিয়াছিল, তাঁহারই উপর অভিমান করিয়া; কিন্তু তিনি একদিনের তরেও তাহাকে একটি কুশল-প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেন নাই; তাঁহার বিপুল বিত্তের সিকি পয়সাও তাহাকে পাঠান নাই; অভিলাষ যে-সমস্ত চিঠি তাঁহাকে বা তাহার মাকে লিখিত সে-সবগুলিই অমনি না খুলিয়াই ফেরত যাইত। সে আজ এতকাল পরে বাড়ী ফিরিতেছে বলিয়া সংবাদ দিয়া পোষ্টকার্ডে পিতাকে চিঠি লিখিয়াছিল, কিন্তু সে চিঠিও হয়ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এই তিন বৎসর তাহার ভগ্নীপতিই তাহার বিদেশে পড়ার খরচ চালাইয়াছে; আজ সে-ই তাহাকে তাহার দিদির কাছে আদর করিয়া ডাকিয়া লইতে আসিয়াছে—তাহার দিদিও তাহারই মতন মাতাপিতার স্নেহস্বর্গ হইতে বিতাড়িত, সে-ই ত তাহার দুঃখ বুঝিতেছে!

শচীদুলাল অভিলাষের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—অভি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি? উঠে পড়। তুলসী রেঁধেবেড়ে খাবার নিয়ে তোমার জন্যে বসে রয়েছে...

অভিলাষ একবার চারিদিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ীর পাদানে পা দিয়া গাড়ীতে উঠিতে গেল; আবার পা নামাইয়া লইল। শচীদুলালের দিকে ফিরিয়া বলিল—গোঁসাইজী, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। আমি মার কাছেই যাব।

শচীদুলাল বলিল—তুলসী...

—দিদিকে বোলো তার সঙ্গে শিগগিরই দেখা করব...

—কিন্তু মার সঙ্গে দেখা করতে পাবে কি?

—না পাই তখন দিদির কাছেই ফিরব।

শচীদুলাল দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—তবে যাও একবার দরোয়ানের ধাক্কা খেয়ে ঘুরে এস; আমি যাই, গিয়ে তোমার খাবার দাবার ঠিক করিয়ে রাখি গে।

অভিলাষ একখানি ঠিকা গাড়ী ডাকিয়া তাহার মাথায় আপনার জিনিষপত্র চাপাইয়া আবাল্যের স্নেহনিকেতন, পিতামাতার কোলের মতন আপন বাড়ীতে ফিরিয়া চলিল।

প্রকাণ্ড ফটক পার হইয়া বাগানের বাঁকা রাস্তা ঘুরিয়া গাড়ী আসিয়া গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই অভিলাষ কুণ্ঠিত মুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া স্পন্দিত বুকে গাড়ী হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। সম্মুখেই ইনাম সিং জমাদারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—জমাদার, সব ভালো ত? বাবা কোথায়?

জমাদার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভিতর হইতে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু হাঁকিয়া বলিলেন—ইনাম সিং, ভিতরে কেউ যেন না আসে।

অভিলাষ থমকিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ান ঘনশ্যাম তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—বাবা, কর্ত্তার মত ত তুমি জানো; এ বাড়ীতে তোমার থাকা সুবিধে হবে না, বলতে বল্লেন।

অভিলাষ বলিল—ঘনশ্যাম কাকা, আমি বাড়ীর ছেলে, এই বাড়ীতে নইলে কোথায় থাকব? আপনাদের বাড়ীতে মোছলমান কোচমান সহিসও ত আছে, তাতে ত আপনাদের বাধে না; আমি থাকলেই কি বিশেষ অন্যায় হবে?

ঘনশ্যাম ভিতরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয় বলিলেন—কর্ত্তা বললেন, তা তুমি যদি কোচমান সহিসদের মতন থাকতে পার তা হলে আস্তাবলের একটা দুটো ঘর তোমাকে খালি করে দেওয়া যেতে পারে।

এমন উত্তর অভিলাষ আশা করে নাই। সে অপমানে, স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া এক লাফে গাড়িতে উঠিয়া বসিল এবং সশব্দে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া জোরে কোচমানকে বলিল—চলো, গোলতালাও চলো।

অভিলাষের গাড়ী যেমন মোট মাথায় করিয়া আসিয়াছিল আবার তেমনি মোট মাথায় করিয়া বাগানের বাঁকা রাস্তা ঘুরিয়া ফটক পার হইতে চলিল। গাড়ীবারান্দা হইতে বাহির হইতেই উপরকার জানলায় অভিলাষের চোখ পড়িল; অভিলাষ দেখিল তাহার মা তাহাকেই একটিবার দেখিবার আশায় চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে জানলায় আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া লইবার জন্য দুইহাতে তিনি ঘন ঘন অশ্রুজাল সরাইয়া সরাইয়া দিতেছেন, কিন্তু তখনই আবার অশ্রুজাল দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া তুলিতেছে।

অভিলাষ গাড়ীর জানলা দিয়া অর্দ্ধেক শরীর বাহির করিয়া হাঁকিয়া বলিল—কোচমান, গাড়ী ঘুমাও, গাড়ী রোকো!

গাড়ী আবার গাড়ীবারান্দায় আসিয়া লাগিল। অভিলাষ নামিয়া পড়িয়া বলিল—ঘনশ্যাম কাকা, আমি আস্তাবলেই থাকব, আমি এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পারব না।

ঘনশ্যাম আবার বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরেই কোচমান সহিস প্রভৃতি মুসলমান ভৃত্যেরা আসিয়া অভিলাষকে সেলাম করিয়া গাড়ী হইতে জিনিসপত্র নামাইতে লাগিয়া গেল, এবং ঘনশ্যাম ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—বাগানের মধ্যে মালীর ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কর্ত্তা বল্‌লেন যতদিন এ বাড়ীতে থাকবে হিন্দু চাকর তোমাকে নিরামিষ খাবার দিয়ে আসবে, ম্লেচ্ছের ছোঁয়া অখাদ্য খেতে পাবে না।

অভিলাষ বলিল—ঘনশ্যাম কাকা, একবার বাবাকে মাকে প্রণাম করতে পাব না?

—পাবে বৈকি বাবা, পাবে বৈকি! এখন মুখহাত ধুয়ে একটু জিরিয়ে টিরিয়ে কিছু খাও টাও, তারপর সে হবে 'খন।

—না কাকা, প্রণাম না করে আমি কিছু খাব না।

ঘনশ্যাম যেন বিপদে পড়িয়া ইতস্তত আমতা-আমতা করিতে লাগিলেন। অভিলাষ তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া কহিল—যে দরজা দিয়ে মেথরাণী অন্দরের উঠান পরিষ্কার করতে যায়, সহিস দানা আনতে যায়, আমি সেই দরজা দিয়ে উঠানে গিয়ে দাঁড়াব; বাবা মা রকের উপর দাঁড়াবেন, আমি দূর থেকে প্রণাম করে চলে আসব।

অভিলাষ উঠানে গিয়া দাঁড়াইতেই কৃষ্ণগোবিন্দ মুখ ফিরাইলেন; অভিলাষের মাতা অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; অভিলাষ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অভিলাষ বলিল—মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও।

মা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—তুই বাইরে যা, খাবার এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অভিলাষ বলিল—মা, তোমার হাত থেকে প্রসাদ না পেয়ে ত যাব না। এইখানে আমায় একখানা পাতা দাও।

অভিলাষ উঠানে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—তুমি ওপর থেকে আলগোছে খাবার ফেলে ফেলে দিয়ো, আমি খেয়ে গোবর দিয়ে ঠাঁই পরিষ্কার করে দিয়ে যাব।

ঘনশ্যাম বলিলেন—ছি বাবা, পাগলামি করে না। বাইরে চল, তোমার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি...

অভিলাষ নড়িবার নামও করিল না। নীরবে মায়ের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মাতা কর্ত্তার দিকে চাহিলেন। কর্ত্তা মুখ ঘুরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তা বারণ করিলেন না দেখিয়া নিত্যকিশোরী বলিলেন—ওলো ও মাধি, যা যা ঝপ করে' একখানা পীঁড়ি আর একখানা পাতা নিয়ে আয়, আর বামুনদিদিকে বলগে ভাঁড়ারঘরে আমি খাবার সাজিয়ে রেখে এসেছি, চট করে নিয়ে আসবে।

চাকর দাসী দাদাবাবুর খাবারের আয়োজন করিতে চারিদিকে ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল।

পীঁড়ি দেখিয়া অভিলাষ বলিল—আমার পীঁড়ি চাইনে। আমি বেশ বসেছি।

নিত্যকিশোরী বলিলেন—পীঁড়িখানা টেনে নে না, ও ত ধুয়ে গঙ্গাজল দিয়ে নিলেই শুদ্ধ হবে।

—না মা, পীঁড়ি থাক। তুমি চট করে খাবার দাও, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

মা দূর হইতে আলগোছে সন্তর্পণে খাবার দিতে লাগিলেন; অভিলাষ আহার করিল। তারপর মাটির গেলাস ও পাতাখানি তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া বলিল—আমায় একটু গোবর দাও।

নিত্যকিশোরী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—না না, গোবর দিতে হবে না, ও শকড়ি থাকগে, কাল মেথরাণী ধুয়ে দিয়ে যাবে।

অভিলাষ বলিল—এখানটা নোংরা হয়ে থাক্‌লে রাত্রে আবার খাব কোথায়?

ঘনশ্যাম বলিলেন—একবার খেলে, হল; বার বার এই রকম করবে নাকি?

—হ্যাঁ কাকা, জানেন ত মা কাছে বসে না খাওয়ালে আমার খাওয়া হত না। এতকাল পরে আমি মার কাছে ফিরে এসেছি।

অভিলাষের মা আবার অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ঘনশ্যাম বলিলেন—এ রকম করলে লোকে বলবে কি, যে, একজন ম্যাজিষ্ট্রেট রোজ গোবর ঘাঁটছে। আজকে ত সময় নেই, কালই প্রায়শ্চিত্তের জোগাড় করে' দেবো......

অভিলাষ বলিল—আমি ত কোনো পাপ করিনি কাকা যে প্রায়শ্চিত্ত করব? ম্যাজিষ্ট্রেট গোবর ঘাঁটলে লোকে নিন্দে করবে, অথচ ম্যাজিষ্ট্রেট গোবর খেলে লোকে খুব ভালো বলবে, না? গোবর খেতে আমি পারব না কাকা।

তাহার মা বলিলেন—রোজ দুবেলা এই গোবর ঘাঁটার চেয়ে কি একদিন চোককান বুজে গোবর খাওয়া ভালো নয় রে? তুই যে গোবর দেখে সেঁটকাতিস; এখন রোজ গোবর ছুঁবি কেমন করে বল্‌ ত? তার চেয়ে প্রাচিত্তিরটা করে ফ্যাল।

অভিলাষ বলিল—মা, এই ত আমার প্রায়শ্চিত্ত! আমি তোমাদের অমতে কাজ করে' অপরাধ করেছি; তোমাদের কাছে আমি শতেকবার খাটো হব। কিন্তু অপরের জুলুমের কাছে আমার মাথা নুইবে না মা। ...মাধি, আমায় একটু গোবর দে।

মাধি সকলের মুখের দিকে একবার তাকাইল। কেহই কোনো কথা বলে না দেখিয়া অভিলাষের সম্মুখে একটু গোবর ফেলিয়া দিল। অভিলাষ সমস্ত শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রাণপণ ইচ্ছায় গোবর তুলিয়া লইল। সে যেমন তাহা মাটিতে মার্জ্জনা করিতে যাইবে অমনি তাহার মাতা উঠানে নামিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাত ধরিলেন। তারপর পুত্রকে বুকে টানিয়া তুলিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে তাহার মুখে শতচুম্বন দিয়া যেন তাহার সকল অপরাধ, সকল গ্লানি মার্জ্জনা করিয়া দিতে লাগিলেন।

বাড়ীর সকলে অবাক, সমস্ত বাড়ী স্তব্ধ।

কৃষ্ণগোবিন্দের খড়ম খুব কড়া রকমে খটর খটর করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তিনি খড়ম খটখট করিতে করিতে উপস্থিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—গিন্নি! তোমার একি মতিচ্ছন্ন হল! তোমাকেও আমি ত্যাগ করলাম।

নিত্যকিশোরী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—তাই করো গো, তাই করো। আমার বুক এতদিন দুঃখে ফেটে যাচ্ছিল; তুমি ত্যাগ করো আমায়, আমি ছেলে মেয়েকে বুকে করে' জুড়োবো!

কৃষ্ণগোবিন্দ ডাকিলেন—ঘনশ্যাম, শিগগির ব্যবস্থা কর গে, রাধাবিনোদকে নিয়ে এখনই আমি বৃন্দাবন যাব!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।
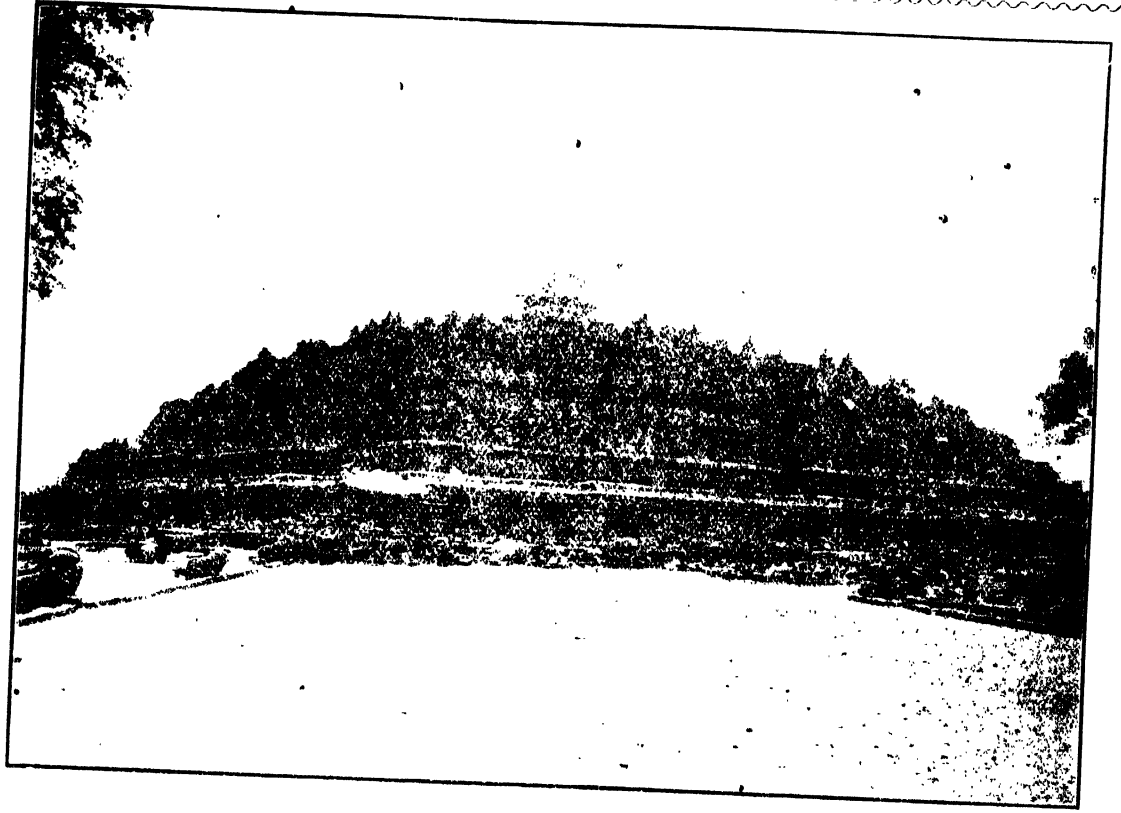
বোরো বুদর মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য।
শ্রীযুক্ত শ্রীকালী ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

বোরো বুদোর

'যাভা' নামের প্রকৃত মূল কি তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহার আসল নাম সম্ভবতঃ যবদ্বীপ ছিল; ইহা হইলে, বোধ হয়, ভারতবর্ষই তদ্দেশীয় সভ্যতার উৎপত্তিস্থল।

হিন্দুজাতির প্রভুত্বকাল যাভার ইতিহাসের প্রথম প্রসিদ্ধ যুগ; ইহাকে আবার বৌদ্ধযুগ, শৈব আক্রমণের যুগ ও আপোষের যুগ এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই দ্বীপে যে-সকল হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মাজাপাহিত রাজ্যই পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। ইহার অধীনে বহু করদরাজ্য ছিল; এমন কি ইহা মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য অংশেও ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল।

যাভার বিশালতম ও শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যশালী হিন্দুমন্দির বোরোবুদোর স্থাপত্যজগতের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গণ্য হইতে পারে। বোরোবুদোর নামের অর্থ বড় বুদ্ধ বা মহান্ বুদ্ধ। এই নাম, ইহার উচ্চারণ ও অর্থ দেখিলে নিশ্চয় বোধ হয়, যাভার এই অংশের উপনিবেশিকগণ বঙ্গদেশের সমুদ্রতট হইতে তথায় গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে জগতে বৌদ্ধ স্থাপত্যরীতির যে পরিচয় পাওয়া যায় এই মন্দির তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বৌদ্ধধর্ম্ম যাভা দ্বীপে খুব শীঘ্রই প্রচারিত হইয়াছিল; যাভার পুরাবৃত্তে, এই মন্দির সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলা হইয়াছে; ইহাতে কোন প্রকার লিপি নাই, কিন্তু খুব সম্ভব ১৪০০ খৃঃ হইতে ১৪৩০ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়া থাকিবে। বোরোবুদোর চারিটি প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরির মধ্যে একটি নীচু পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। এই-সকল আগ্নেয়গিরি হইতে প্রাপ্ত

বোরো বুদর মন্দিরের দুই দেওয়ালের মধ্যে পথ।
শ্রীযুক্ত শ্রীকালী ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

ঈষৎ ধূসরবর্ণ প্রস্তরখণ্ডসমূহ মন্দিরের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরটি প্রোগো নদীর কিছু পশ্চিমে কেডা মহকুমায় অবস্থিত; এই মাঝারি নদীটি দ্বীপের দক্ষিণ দিক দিয়া ভারত-মহাসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। এই মন্দিরে যাইতে হইলে মাগালাঙ্গ কিম্বা জোকজাকাটা হইতে মুণ্টিলান পাশার গ্রাম পর্যন্ত বাষ্পীয় ট্রামে গিয়া সেইস্থান হইতে কোন প্রকার যান ভাড়া করিয়া যাওয়াই এই মন্দিরে যাইবার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায়। ঠিক করিয়া বলিতে গেলে বোরোবুদোরকে মন্দির না বলিয়া পাহাড় বলাই ভাল; ইহা ভূপৃষ্ঠ হইতে দেড়শত ফুট উচ্চ, আগ্নেয়গিরি হইতে প্রাপ্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড হইতে কাটা মনোহর অলিন্দে ইহার চারিদিক ঘেরা এবং তাহা অগণ্য ক্ষোদিত মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান নিম্নতম অলিন্দটি সমচতুষ্কোণ ইহার এ
এক দিক ৪৯৭ ফুট লম্বা। প্রায় ৫০ ফুট উপরে দ্বি
ঐরূপ আকারের আর একটি অলিন্দ আছে। তাহ
পর আর চারিটি অলিন্দ আছে, ইহাদের আকা
পূর্ব্বোক্তগুলির অপেক্ষা অধিক বিশৃঙ্খলা দেখা যা
এই মন্দিরের শিরোভাগে, ৫২ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট এব
গম্বুজ শোভমান; ষোলটি ঘণ্টাকৃতি ছোট গ
আবার তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। মোট
উপর ধরিতে গেলে, মন্দিরের প্রধান অংশটিকে
সিওয়েলের ভাষায় এইরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে
'ইহা একসারি অলিন্দযুক্ত চেপ্টা ধরণের একটি পু
কালীন ভারতবর্ষীয় মন্দির। ইহার উপরিভাগ স্তূপাক
এবং শিরোভাগে একটি বৌদ্ধ গম্বুজ আছে।' ইঞ্জিনি

বোরো বুদর মন্দিরের অভ্যন্তর গৃহ।
শ্রীযুক্ত শ্রীকালী ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

জে, ডব্লিউ আইজারম্যান, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এই মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইহার নিম্নতল মৃত্তিকাদ্বারা আচ্ছাদন করা হইয়াছিল, এবং সমস্ত মন্দিরটিকে খাড়া করিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বনিম্নে যে দেওয়াল দেওয়া হইয়াছিল তাহা সেই মৃৎ-প্রাকারের আড়ালে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। নির্ম্মাতারা নির্ম্মাণ করিতে করিতেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদের নির্ম্মিত এই বিরাট মন্দিরটির বসিয়া যাইবার যথেষ্ট ভয় আছে। মন্দিরের নিম্নতলের সম্মুখভাগ অলঙ্কৃত করিতে করিতেই ভাস্কর-গণকে কাজ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ অসমাপ্ত তোলা কারুকার্য্যগুলি মৃত্তিকা ও প্রস্তরখণ্ডদ্বারা ঠেকা দিয়া সযত্নে রক্ষিত হওয়ায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে হলাণ্ড দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ক্রমশ সুশৃঙ্খলরূপে মৃৎপ্রোথিত মন্দিরভিত্তি বহুযুগের সমাধি হইতে উদ্ধার করিতেছেন এবং উহাতে উৎকীর্ণ তোলা কারুকার্য্যের ফটোগ্রাফ তুলিয়া রাখিতেছেন। ইহাদিগকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত কাজ করিতে হইতেছে; প্রাকারের একদিক খুঁড়িয়া ফটো তুলিয়া তাহা আবার ভরাট করিয়া তবে আর-একদিকে কার্য্যারম্ভ করিতেছেন। এই সর্ব্বনিম্নতলস্থ প্রাচীর-বেষ্টনীতে বিভিন্ন প্রকারের বহু চিত্র আছে; ইহাকে, প্রাকৃতিক চিত্র, গার্হস্থ্য চিত্র, বহির্জগতের চিত্র, এবং পৌরাণিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিত্রের একটি চিত্রশালা বলা যাইতে পারে। দৈনন্দিন ব্যাপারের চিত্র-শ্রেণীতে তীর ধনুক কিম্বা বাঁকনলের সাহায্যে পক্ষী-শিকার, ছিপ অথবা জালহস্তে ধীবর, বংশীবাদক প্রভৃতি অনেক চিত্র আছে। এই-

বোরো বুদর মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ তোলা ছবি। এই-সমস্ত ছবিতে বুদ্ধদেবের জীবনের ও হিন্দু উপনিবেশীদিগের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই ছবিখানিতে হিন্দু উপনিবেশীদিগের সমুদ্রগামী জাহাজের চিত্র বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।
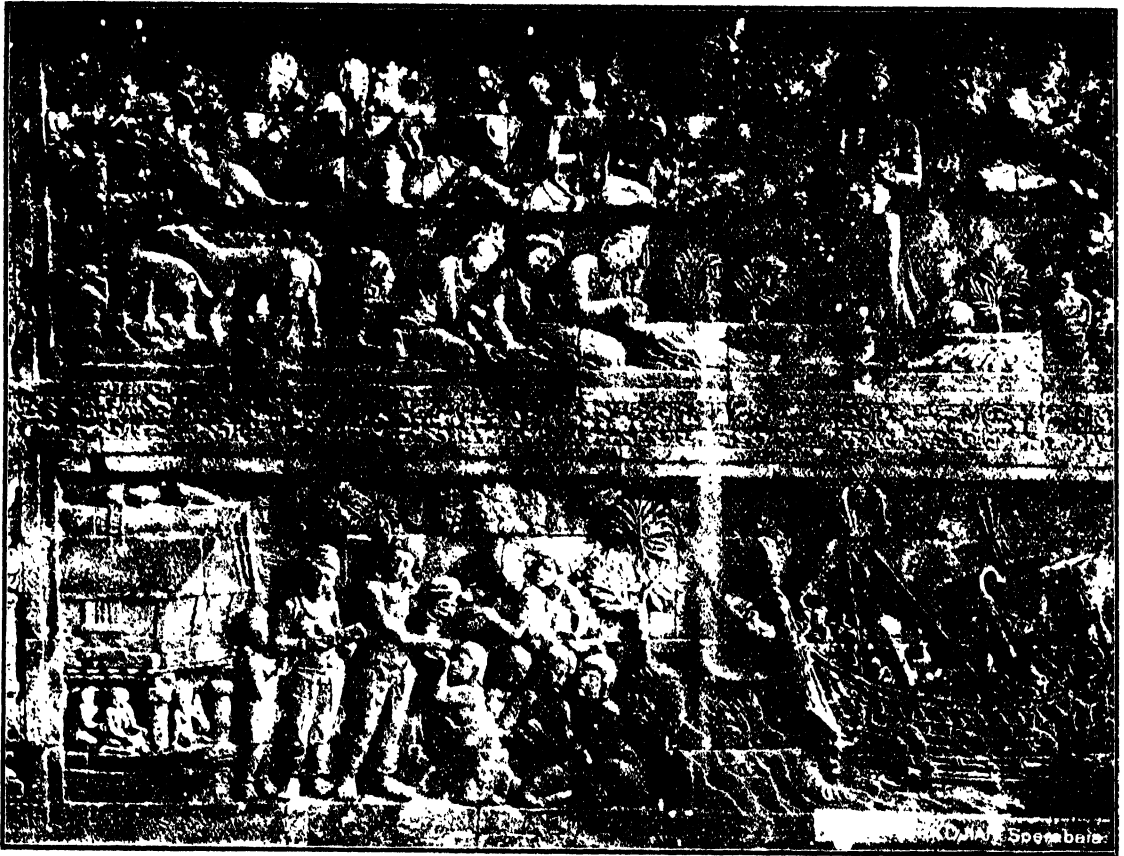
শ্রীযুক্ত শ্রীকালী ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

সকল দেখিয়া মনে হয় যেন ভাস্কর ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সংসারের দ্রব্যে মায়াশূন্য করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এইরূপ কারুকার্য্য করিয়াছিলেন। ভক্তগণ পর্ব্বতস্থ মন্দিরের এক ভাগ হইতে আর এক ভাগে উঠিতে উঠিতে বাহ্যবস্তুর দৃশ্য হইতে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম-জগতের সত্যবস্তুর পরিচয় পাইতে থাকিতেন; সর্ব্বোচ্চ গম্বুজে পৌঁছিবার পথে তাঁহারা এই প্রণালীতে ক্রমোন্নত ভাবের ও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইতেন এবং জ্ঞানোদ্দীপ্ত চক্ষে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বড় বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন; মানব-শিল্পী ভগবানরূপী বুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে ও অঙ্কন করিতে অক্ষম, ইহা জানাইবার জন্যই যেন ঐ মূর্ত্তি অসম্পূর্ণ ভাবে গঠিত। ইহা ভগবান বুদ্ধের ধারণাতীত মহিমা প্রকাশের ইঙ্গিতস্বরূপ। তলদেশ হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র পর্ব্বতটি মহাযান ধর্ম্মমতের একটি মহান্ চিত্র।

আর একটি বিবরণীতে এই মন্দিরটিকে একটি সম-চতুষ্কোণ সূচ্যগ্র-স্তম্ভ বলা হইয়াছে। ইহার তলদেশের এক-একটি দিক ৫২০ ফুট লম্বা; পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির ধাপের মত ইহার সাতটি প্রাচীর আছে। এই প্রাচীর-গুলির মধ্যে কয়েকটি সঙ্কীর্ণ বারাণ্ডা মন্দির বেষ্টন করিয়া আছে; এক বারাণ্ডা হইতে তাহার উপরিস্থিত বারাণ্ডায় যাইবার জন্য প্রত্যেকটিতে একটি খিলানযুক্ত দ্বার আছে। প্রাচীরগাত্রগুলি বহু মনোহর মূর্ত্তিদ্বারা ভূষিত। প্রাচীরের বহির্গাত্রে প্রায় চারিশত তাক আছে, তাহাদের শিরো-

বোরো বুদর মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ তোলা ছবি বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী।
শ্রীযুক্ত শ্রীকালী ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।
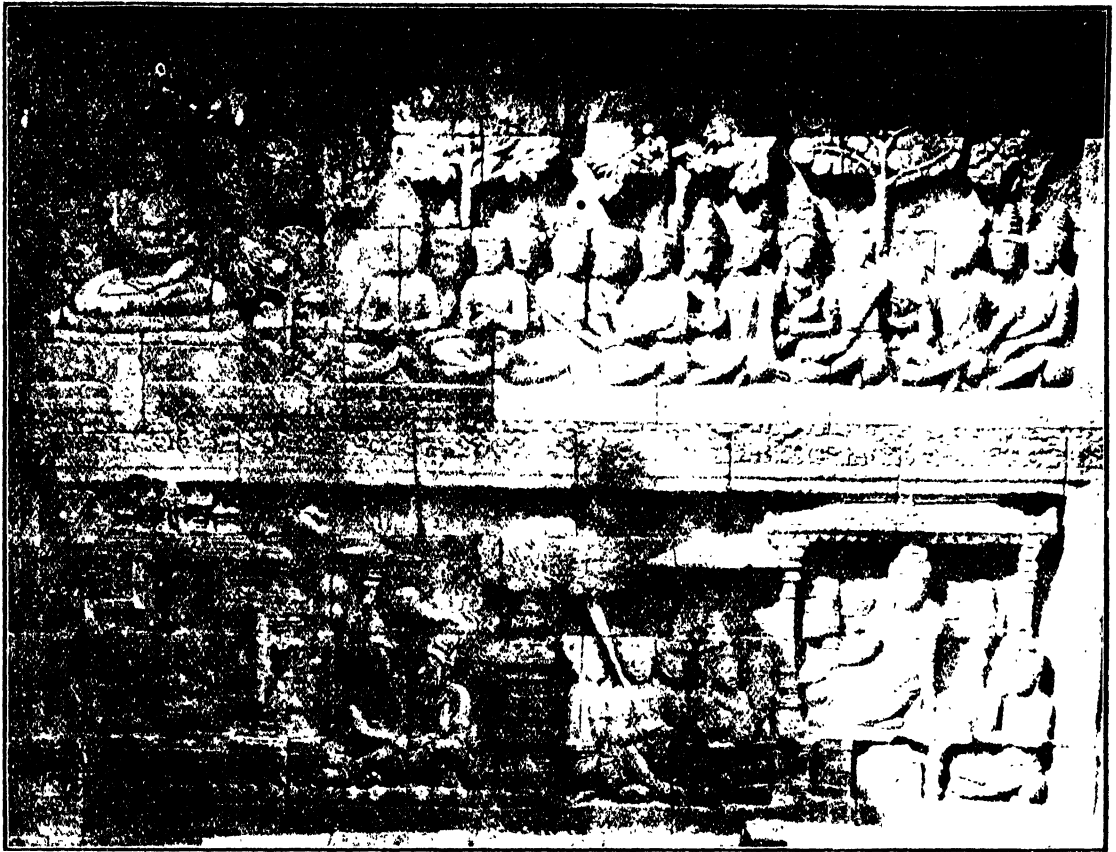
ভাগ অপরূপ গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং অভ্যন্তরে এক-একটি বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এক-একটি কোলঙ্গার মধ্যে একএকটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপনের রীতি বুদ্ধগয়ার মন্দির দেখিলে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। প্রতি দুই কোলঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলিতে উপবিষ্ট-বুদ্ধমূর্ত্তি ও অন্যান্য বহুবিধ গৃহগাত্রশোভন চিত্রাদি উৎকীর্ণ আছে। নিম্ন-তলস্থ প্রতিমাধার কোলঙ্গাগুলির তলদেশে একটি প্রকাণ্ড তোলা-ভাবে-উৎকীর্ণ চিত্রবীথিকা সমগ্র মন্দির বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে বুদ্ধের জীবনের বহু ঘটনা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে। মন্দিরের ভিতর-দিকেও প্রাচীর গাত্রগুলি জলযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ, শোভাযাত্রা, ও রথধাবন প্রভৃতি অসংখ্য চিত্রে ভূষিত। জগতের কোন মন্দির কি সৌধ এবিষয়ে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। কেবলমাত্র বড় চিত্রই দুই হাজারের অধিক আছে। অধিকাংশগুলিরই পরিকল্পনা যেরূপ শক্তির পরিচায়ক ক্ষোদনকার্য্যও সেইরূপ নিপুণতার পরিচায়ক। উপরকার সমচতুষ্কোণ অলিন্দের মধ্যে আবার তিনটি গোলাকৃতি অলিন্দ আছে; বাহিরেরটিতে বত্রিশটি, তাহার পরেরটিতে চব্বিশটি এবং উপরেরটিতে ষোলটি ছোট ছোট ঘণ্টাকৃতি মন্দির আছে। ইহাদের ছাদের উপরকার জালির ভিতর দিয়া অভ্যন্তরস্থিত উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র মন্দিরটির উপরে একটি অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি গম্বুজ, ইহাই মন্দিরের প্রধান এবং বোধ হয় প্রাচীনতম অঙ্গ। ইহা দশ ফুট গভীর একটি শূন্য মগ্নপ্রকোষ্ঠ; যে মূল্যবান্ বৌদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার জন্য এই অপূর্ব্ব শ্রীশালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল

বোরো বুদর মন্দিরের একটি বুদ্ধমূর্ত্তি।
শ্রীযুক্ত শ্রীকালী ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

এই প্রকোষ্ঠ নিশ্চয়ই তাহার আগাররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বোরোবুদোরের মূর্ত্তি ও প্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্র-গুলি পাশাপাশি সাজাইয়া রাখিলে তিন মাইল লম্বা হয়। ইহার চিত্রগুলির ফটোগ্রাফ তুলিতে ওলন্দাজ গভর্মেণ্টের নাকি দুই লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। মিঃ সিওয়েল বলেন, মন্দিরের বর্ত্তমান পাদদেশ হইতে উপর দিকে চাহিলেই অলিন্দরক্ষক প্রাচীরের গাত্র-ভূষণ মনুষ্যপ্রমাণ সারি সারি বুদ্ধমূর্ত্তি ও গোলাকৃতি বারাণ্ডার উপরিস্থিত ক্ষুদ্র আধারের ন্যায় মন্দিরগুলি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ব্ব দিকের সমস্ত বড় মূর্ত্তিগুলি প্রাচ্য ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের প্রতিকৃতি। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা অর্থাৎ তিনি দক্ষিণ জানুর সম্মুখস্থিত ভূমি স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, "পৃথিবী সাক্ষী, আমি বুদ্ধ হইয়াছি।" দক্ষিণ দিকের সমস্ত মূর্ত্তির হস্তে বরদা মুদ্রা,—দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া বুদ্ধ বলিতেছেন, "আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দিলাম।" পশ্চিম দিকের সমস্ত মূর্ত্তি, বাম করতলে উপর দক্ষিণ করতল দিয়া উভয় হস্ত ক্রোড়ে রাখি ধ্যানস্থের ন্যায় ধ্যান কিম্বা পদ্মাসন মুদ্রায় অবস্থিত; এই গুলি অমিতাভ মূর্ত্তি। উত্তর দিকের মূর্ত্তিগুলির হস্তে অভ মুদ্রা, বুদ্ধের এই মূর্ত্তির নাম অমোঘসিদ্ধি, তিনি দক্ষি হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া করতল প্রসারণ করিয়া অভ দিতেছেন ভীত হইও না, সমস্তই মঙ্গল।"

যাভায় বোরোবুদোর ভিন্ন আরও অনেক প্রসি মন্দির আছে; ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ববিদ্, ও ঐতিহাসিক গণের যাভা দর্শন করিতে যাওয়া উচিত।

শ্রীশান্তা চট্টোপাধ্যায়।

কবরের দেশে দিন পনর

সপ্তম দিবস—মিশরের দক্ষিণ-দ্বার।

আজ দক্ষিণ-মিশরের শেষ সীমায় চলিয়াছি। নিউ বিয়া প্রদেশ ও উচ্চতর মিশরের সঙ্গমস্থলে যাইতেছি এই স্থান মিশরের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। এই অঞ্চ রক্ষা করিতে পারিলেই মিশরের উর্ব্বরভূমি দক্ষিণ হইতে রক্ষিত হইত। আবার এইখানেই নাইল নানা শাখা বিভক্ত হইয়া নিউবিয়া ও মিশরদেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষ করিত। মিশরের জল সরবরাহ এবং ভূমির উর্ব্বরতা জন্য এই স্থান মিশরের অধিকারে থাকা নিতান্তই আবশ্যক ছিল। অধিকন্তু, এই পথ দিয়াই সুদান নিউবিয়া ইত্যাদি আফ্রিকার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব জনপদসমূহে বাণিজ্য প্রবাহিত হইত। প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্র, শিল্প, কৃষি, ব্যবসায় সকলই এই স্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। এই কারণে প্রাচীন তম যুগে, গ্রীক ও রোমান আমলে এবং মুসলমানকালেও নরপতিগণ এই স্থান আয়ত্ত করিতে চেষ্টিত হইতেন দক্ষিণে অন্তত এই পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত না হইলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন না। এইজন্য এই প্রদেশে মিশরীয়, গ্রীকরোমান, মুসলমান সকল যুগের পুরাতন কীর্ত্তি কিছু কিছু বর্ত্তমান। আমরা মিশরের সেই দ্বারদেশ পরিদর্শন করিতে আজ অগ্রসর হইয়াছি।

সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ৭০০ মাইল দক্ষিণে নাইল মিশর ও নিউবিয়ার এই সঙ্গমস্থল সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা লুক্‌সর হইতে প্রায় ৭ ঘণ্টায় এই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। উত্তর-মিশরে এবং দক্ষিণ-মিশরের কিয়দংশে কয়দিন আমরা কাটাইয়াছি। এতদিন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমি আমাদের সর্ব্বদা চক্ষুগোচর হইত। আজ কিন্তু গাড়ী হইতে যেদিকে তাকাই সেই দিকেই শুষ্ক পাথর, মরুভূমির ন্যায় অনুর্ব্বর প্রান্তর। রেলপথ নদীর পূর্ব্ব কিনারার উপর দিয়া বিস্তৃত। আরব্য পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশেই গাড়ী চলিতেছে। স্থানে স্থানে নদীর সঙ্গে পর্ব্বত মিশিয়া গিয়াছে—মধ্যবর্ত্তী স্থানের প্রসার অতি অল্প। অপর কূলেও বেশী ক্ষেত্র নাই। পর্ব্বত প্রায় নদীতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। বালু, ধূলা ও তাপে নিতান্ত কষ্ট পাইতে পাইতে কোন উপায়ে যথাস্থানে পৌঁছিলাম।

স্থানের নাম আসোয়ান। চারিদিকে অনুর্ব্বর পর্ব্বত ও প্রান্তর। নদীর উপরেই আমাদের হোটেল। এখান হইতে আসোয়ানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম দেখাইতেছে। নাইলের দুই পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড় এখানে নদীর দুই কিনারায় দণ্ডায়মান। নদী আরব্য মোকাওম এবং আফ্রিকার লীবিয় পর্ব্বতশ্রেণীর চরণতল ধৌত করিয়া খরস্রোতে প্রবাহিত। কেবল তাহাই নহে—দুই পর্ব্বতশ্রেণী নদীর তলদেশে মিশিয়া গিয়াছে। নদীর ভিতরেই মধ্যে মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গ—নদীর দুই ধারে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ডের স্তূপ এবং পর্ব্বতগাত্রের প্রাচীর। এদিকে উত্তরে দক্ষিণে নদী সোজা প্রবাহিত হইয়া খানিকটা বক্র হইয়াছে। ফলতঃ আসোয়ানের কোন এক নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হইবে—স্থানটা চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতবেষ্টিত, মধ্যে একটা ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী শিলাখণ্ডের ভিতর হ্রদের মত বহিয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার সময় নৌকাবক্ষে নদীতে বেড়ান গেল। সম্মুখেই একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহার নাম এলিফ্যাণ্টাইন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা প্রসিদ্ধ। ইহার দক্ষিণ পূর্ব্ব গাত্রে নাইলের জল মাপিবার একটা প্রাচীন কল দেখিতে পাইলাম। গ্রীক ও রোমানেরাও ইহাকে অতি প্রাচীনরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আসোয়ানের পারে নদীর ধারে একটা প্রাচীন স্নানাগারও দেখিতে পাইলাম। দ্বীপটাই এই বৃক্ষহীন পর্ব্বতরাজ্যের মধ্যে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদের আশ্রয়। আমাদের কিনারা হইতে দ্বীপের কিনারা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি অত্যল্প। লুক্‌সরে যত বড় নাইল দেখিয়াছি এখানে তাহার ½ অংশ হইবে। নাইল মাপিবার কলের কাছে প্রাচীনকালে দ্বীপে যাইবার জন্য আসোয়ান হইতে একটা সেতু ছিল। তাহার চিহ্ন মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান। দ্বীপের সেই অংশে প্রস্তরের দ্বারা প্রাচীর নির্ম্মিত রহিয়াছে।

দ্বীপের পূর্ব্বাংশ ঘুরিয়া দক্ষিণ দিকে গেলাম। সেই অংশে প্রাচীন সাইন নগর অবস্থিত ছিল। গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাসে এই নগর প্রসিদ্ধ। এই স্থানে নদীর মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণ প্রস্তরের পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিলাম। বহুযুগের প্রবল তরঙ্গাঘাতে এবং স্রোতোধারায় প্রস্তরের ভিতর বড় বড় গর্ত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ প্রান্ত হইতে দ্বীপের পশ্চিম দিকে যাইয়া উত্তর দিয়া ঘুরিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পথে প্রবল ঝড় উঠিল। উত্তর দিক হইতে বাতাস বহিতে লাগিল। নৌকার পাল স্থির রাখিতে পারা গেল না। মাঝিরা একবার এপার একবার ওপার দিয়া সর্পাকার-গতিতে নৌকা চালাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু আমাদের বন্ধুগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কাজেই পাল নামাইয়া ফেলা হইল—এবং দ্বীপ প্রদক্ষিণ না করিয়া পুরাতন পথে ফিরিয়া আসিলাম।

আমাদের সম্মুখে গলানো কাচের ন্যায় ক্ষুদ্র নদী। তাহার উপর এলিফ্যাণ্টাইন দ্বীপের উদ্যান ও প্রাসাদতুল্য হোটেলগৃহ। তাহার পশ্চিমে সুবর্ণ-বালুকা-মণ্ডিত লীবিয় পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ সমগ্র দিঙ্‌মণ্ডল ও গগনকে অরুণাভায় রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। নদীবক্ষে ত্রিকোণাকার শ্বেতপালবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার শ্রেণী। উদ্ভিদের সবুজ রং, পর্ব্বতগাত্রস্থিত বালুকারাশির নাতিরক্ত নাতিপীত সুবর্ণের কিরণ, উভয় কূলস্থ বালুকার শুভ্র আভা, স্বচ্ছ জলের রজত বর্ণ, নদীগর্ভোত্থিত পর্ব্বতশৃঙ্গের কৃষ্ণ ত্বক্‌ এবং মাথার উপরে নির্ম্মল নভোমণ্ডল—এই নানাবিধ রংএর

সমাবেশে মিশরের দক্ষিণ প্রান্ত অতিশয় নয়নরঞ্জক ও চিত্তবিমোহনকারী রূপে বিরাজ করিতেছে। আর-কোন একখণ্ড অল্পবিস্তৃত স্থানে স্বাভাবিক রংএর খেলা এত সুন্দর দেখিতে পাইব কিনা সন্দেহ। প্রকৃতি দেবী যেন তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিবার জন্যই আসোয়ানের এই রম্য স্থান বাছিয়া লইয়াছেন। আমাদের আবাসের জানালায় দাঁড়াইয়া উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আবেষ্টনের বর্ণ-বৈচিত্র্যে ও গঠন-গরিমায় মুগ্ধ হইতে হয়।

সন্ধ্যাকালে নাইল নদ।

এখানে আমাদের হোটেলের স্বত্বাধিকারী একজন সুইস্। কাইরোর হোটেলের স্বত্বাধিকারী একজন জার্ম্মান। লুক্সরে যে হোটেলে ছিলাম তাহার স্বত্বাধিকারী একটা কোম্পানী—ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণের সমবায়ে ঐ হোটেল পরিচালিত। সুতরাং এ কয়দিনে ইউরোপের নানাজাতির সঙ্গে বসবাস করিয়া লইলাম। কিন্তু সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি—রান্নাঘরের কাজকর্ম্মের জন্য সুইসেরা নিযুক্ত। সুইসেরাই নাকি ইউরোপে শ্রেষ্ঠ রাঁধুনি ইহাদের হাতে কোন জিনিস নষ্ট হয় না।

প্রত্যেক হোটেলে জনপ্রতি দৈনিক খরচ ১২৲ হইতে ১৫৲ লাগিতেছে। গাড়ী ভাড়া করিয়া নগর দর্শন এবং পুরাতনকীর্ত্তিপূর্ণ ধ্বংসরাশির ভিতর গমনাগমন করিতেও রোজ ১০৲ টাকার কম খরচ হয় না। তাহার উপর মিশরের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে রেল-ভাড়া অল্প নয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক উঠাবসায় বকৃশিসের যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। রেলওয়ে-কুলীদের মজুরী আমাদের দেশের মুটে-খরচ অপেক্ষা চারিগুণ। এই-সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে মিশরভ্রমণ ইউরোপীয় ও আমেরিকান ধনীদিগেরই সাজে। মিশর ভারতবর্ষের এত নিকটে বটে, ভারতবর্ষের বহুলোক মিশরের পথ দিয়াই ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিবৎসর যাতায়াত করিতেছেন সত্য, কিন্তু মিশরে পদার্পণ করিয়া কয়েক দিন বাস করা সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব।

এই জন্যই বুঝিতেছি—কেন ভারতবর্ষের লোকেরা ইউরোপীয় ও আমেরিকান্ সুধীগণের ন্যায় নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে অসমর্থ। উঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি বা নৈতিক-বল বা চরিত্রশক্তি ভারতীয় শিক্ষিত লোকগণের অপেক্ষা বেশী এরূপ ত মনে হয় না। তাঁহাদের পয়সা আছে—আমাদের পয়সা নাই। তাঁহাদের নিজ তহবিলে পয়সা না থাকিলে তাঁহাদিগকে অর্থ-সাহায্য করিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের নিজ তহবিলে পয়সা ত নাইই—আর অর্থসাহায্য দ্বারা আমাদিগকে দেশ-বিদেশে পাঠাইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার বা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে ব্রতী করিতে পারে এরূপ প্রতিষ্ঠানও নাই।

পাশ্চাত্যসমাজের দুইশ্রেণীর লোক সাধারণত মিশরাদি দেশভ্রমণে বহির্গত হন। প্রথমত লক্ষপতিরা—যাঁহাদের নিকট টাকাকড়ি খেলার সামগ্রীমাত্র। এরূপ ধনবান্ লোক ভারতবর্ষে দুইচারিজন আছেন কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়ত, প্রধান অধ্যাপকগণ এবং তাঁহাদের সাহায্যকারী নবীন অধ্যাপক বা বিশ্ববিদ্যা-

এলিফ্যাণ্টাইন দ্বীপ।
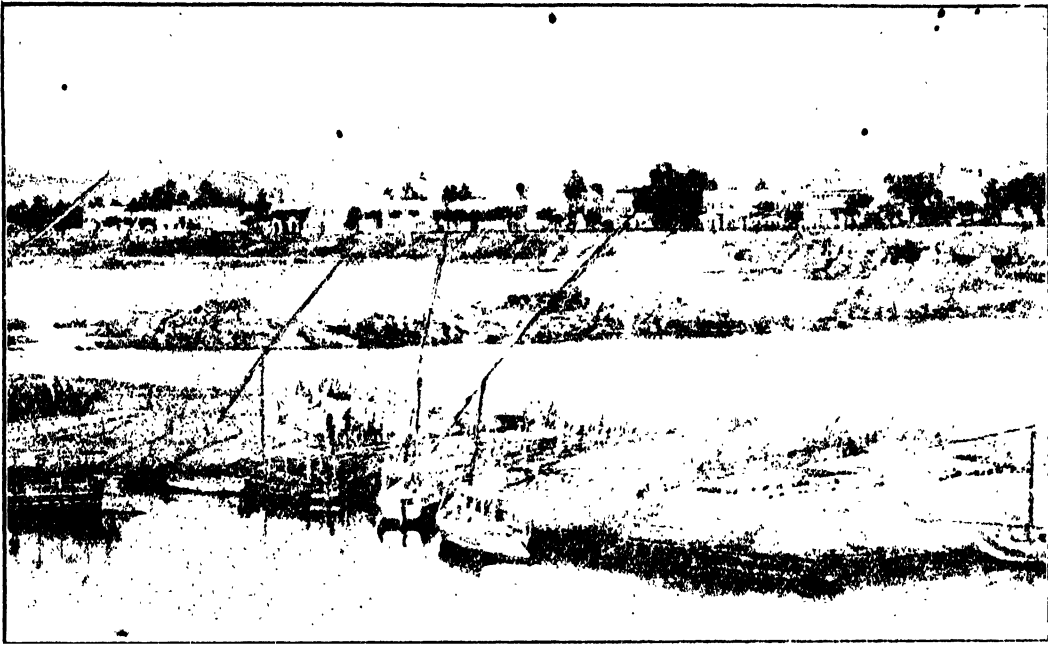
লয়ের গ্রাজুয়েট ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ। ইঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল হইতে অথবা গবর্ণমেণ্টের কোষাগার হইতে অর্থ সাহায্য করা হয়। এই কারণেই ইঁহারা ৫।৭।১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একদেশে বসিয়া নিশ্চিন্তভাবে লেখাপড়ায় মনোযোগী হইতে পারেন। "সংরক্ষণ-নীতি" অবলম্বন পূর্ব্বক পণ্ডিতগণের অন্নচিন্তা দূর না করিলে কি কখনও কোথাও "বিশেষজ্ঞ" বা ধুরন্ধর সৃষ্টি করা যায়? পাশ্চাত্য দেশের সকল সমাজই জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য এইরূপ বিশেষজ্ঞ ও ধুরন্ধরের সংখ্যা বাড়াইতে ব্যগ্র? কিন্তু ভারতবাসীর জাতীয় গৌরব পুষ্ট করিবার জন্য কাহার মাথাব্যথা পড়িয়াছে? এইজন্যই আমাদের দেশে উচ্চ-অঙ্গের-পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট ধুরন্ধর ও বিশেষজ্ঞ বেশী দেখিতে পাই না।

আজকাল ভারতবর্ষের বহু উচ্চশিক্ষিত ছাত্র নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইবার জন্য জার্ম্মানি, জাপান, আমেরিকায় যাইতেছেন। ঘরের কোণে মিশর—ইহাকেও আমাদের বিদ্যালয়রূপে বিবেচনা করিলে মন্দ হয় না। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদির জন্য এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ইতিহাস-চর্চ্চায় ব্রতী হইয়াছেন বা হইবেন তাঁহারা কিছুকাল মিশরে বাস করিলে প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারেন।

মিশরের তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে যশস্বী হইতে পারিব—সম্প্রতি সে উচ্চ আশার বা ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগকে এখন ছাত্র ও শিক্ষার্থীর ন্যায় মিশরে আসিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত মিশরের প্রাচীন শিল্পে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের কোন উপকরণ পাইব কি না সম্প্রতি তাহাও বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। যেমন চোখকান বুজিয়া আমরা জার্ম্মানিতে যাইয়া পি, এইচ্, ডি উপাধি আনিতেছি আমেরিকায় যাইয়া এঞ্জিনীয়ারি বা ডাক্তারি শিখিতেছি, বিলাতে ব্যারিষ্টারী শিখিতেছি, সেইরূপ মিশরেও প্রত্নতত্ত্ব শিখিব মাত্র। মিশর প্রত্নতত্ত্বের খনি। এই খনির চারিদিকে ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরেজ ও আমেরিকান

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নিজ নিজ হাতিয়ার লইয়া খননকার্য্য, লিপিপাঠ, চিত্রসমালোচনা, ও মূর্ত্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিতেছেন। মিশর সমগ্র পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক সমাজের একটা বিরাট ল্যাবরেটরী। আধুনিক মিশর এই কারণে পাশ্চাত্য দেশেরই এক অংশ হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের উত্তরদক্ষিণ পূর্ব্বপশ্চিম প্রান্তে পর্য্যটন করিয়া দেশীয় পুরাতত্ত্বের আকর ও ল্যাবরেটরী-

ফারাও যুগের অর্দ্ধপ্রস্তুত গ্রানাইট মূর্ত্তি—আসোয়ান পর্ব্বত।

সমূহে কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে মিশরের আটঘাট, পর্ব্বত, নদী, মরুভূমি, ধূলিকণা, নূতন নূতন ঐতিহাসিক উপকরণ দান করিবে। এই উপকরণসমূহের আবেষ্টনের ভিতর একবার বসিতে পারিলে স্বতই ইতিহাস-চর্চ্চায় উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে থাকিবে। বিদেশীয় পণ্ডিত ও ধুরন্ধরগণের কার্য্যপ্রণালী, আলোচনাপ্রণালী সকলই জানিতে পারা যাইবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের সঙ্গে যথার্থ ও আন্তরিক বন্ধুত্ব জন্মিবার সুযোগও হইতে পারে। তাহার ফলে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালী অবলম্বিত হইবে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও মিশরীয় পুরাতত্ত্বের সমীকরণ ও সামঞ্জস্য বিধানের কাল সমীপবর্ত্তী হইবে। এইরূপে নব নব উপায়ে ভারতের ঐতিহাসিকগণ জগতের চিন্তাক্ষেত্রে নূতন নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইবেন। বার্লিন অক্সফোর্ড বা হারভার্ডে বসিয়া এত বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ধুরন্ধর ও বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য, উপদেশ বা পরামর্শ পাওয়া যাইবে না। মিশরকেই ভারতবাসীর ইতিহাস-বিদ্যালয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

অষ্টম দিবস—আসোয়ানের গ্রানাইট পাহাড়।

হেলিয়োপোলিসের গ্রানাইট ওবেলিস্ক পূর্ব্বে দেখিয়াছি। কাইরোর নানা মসজিদে গ্রানাইট প্রস্তরের ফলক ও স্তম্ভ দেখিয়াছি। লুক্‌সার এবং কার্ণাকেও গ্রানাইট প্রস্তরের মূর্ত্তি, সার্কোফেগাস এবং ওবেলিস্ক দেখিয়াছি। আজ সেই গ্রানাইট প্রস্তরের জন্মভূমিতে উপস্থিত। এখানকার পাহাড় গ্রানাইটময়। এই অঞ্চল হইতেই গ্রানাইট পাথর নদীবক্ষে ৪০০।৫০০ মাইল উত্তর পর্য্যন্ত নীত হইত। ভারতবর্ষের নানা মসজিদ, প্রাসাদ ও মন্দিরে বৃহদাকার শিলাখণ্ডের উপর বিচিত্র কারুকার্য্য

দেখা গিয়াছে। অথচ তাহার নিকটে সেই পাথরের খনি বা পাহাড় নাই। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের আদিনামসজিদের কৃষ্ণবর্ণ গ্রানাইট প্রাচীর দেখিয়া মনে হইত এতপরিমাণ কাল পাথর কোথা হইতে আসিল? মিশরের উত্তরাঞ্চলেও ঈষৎরক্তবর্ণ গ্রানাইট প্রস্তরের কার্য্য দেখিয়া সেই প্রশ্নই মনে উদিত হয়। ওখানে গ্রানাইট-পর্ব্বত নাই—এই গ্রানাইট কিরূপে আসিল? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর "আসোয়ানের পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং নাইলের পার্ব্বত্য উপত্যকা প্রাচীন মিশরীয় ফ্যারাওদিগের একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল।"

আজ সেই গ্রানাইট-পাহাড় ও গ্রানাইট-খনি দেখিতে চলিলাম। আসোয়ান নগরের বাহির হইয়াই পূর্ব্বদিকের আরব্য শৈলশ্রেণী রক্তিমাভ দেখিতে পাইলাম। তাহার পাদদেশের উপত্যকায় লক্ষ লক্ষ প্রস্তর-ফলক ছড়ান রহিয়াছে—ভূমি পীত-রক্ত স্বর্ণরেণুসদৃশ বালুকাময় মরুদেশ। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর চিহ্নমাত্র নাই। গর্দ্দভ ও উষ্ট্রই এই অঞ্চলের একমাত্র প্রাণী। স্থানে স্থানে আধুনিক মুসলমানদিগের ইষ্টকনির্ম্মিত কবরসমূহ মরুপৃষ্ঠে বিরাজমান।

পাহাড়ের উপর উঠিয়া দেখিলাম ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরীয়েরা পাহাড় কাটিতেছিল, পাথরের টুকরা তৈয়ারী করিতেছিল, এবং ওবেলিস্ক নির্ম্মাণ করিতেছিল। দৈবক্রমে সেই-সমুদয় স্থগিত হইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধসমাপ্ত ওবেলিস্ক বালুকার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। পাথরকাটা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। পর্ব্বতগাত্রে বাটালির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন এইমাত্র কারিগরেরা কাজ সম্পূর্ণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্রামের পর ফিরিয়া আসিয়া আবার কাজে লাগিবে। পাহাড়ের যেদিকে তাকাই সেইদিকেই বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য মরুভূমি। মরুভূমির উপর অসংখ্য শিলাখণ্ড। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। সহস্র সহস্র প্রস্তরশিল্পীর আসনে এক্ষণে রৌদ্র ও বায়ুর অবিরাম অভিনয় চলিতেছে মাত্র।

এখানে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না। এজন্য পাথরের দাগ মুছিয়া নষ্ট হয় নাই। পাহাড়ের গায়ে হাতুড়ির সাহায্যে বাটালি বসাইবার নিয়ম ছিল। রেখার মাপ অনুসারে ফ্যারাওর কারিগরেরা পর্ব্বতগাত্রে আঘাত করিত। সেই রেখার মাপ, সেই বাটালির ছিদ্র, সেই প্রস্তরফলকের রাশি, সেই পাহাড় কাটার দাগ আজও দেখিতে পাইলাম!

গ্রানাইটের খনি ও পর্ব্বত দেখা হইল। এক্ষণে নগরের পূর্ব্বদিকস্থ গ্রানাইট-মরুর প্রান্তর দিয়া বরাবর উত্তরে অগ্রসর হইলাম। অল্পদূর যাইয়াই দেখি একটি প্রাচীন মিশরীয় রীতির পল্লী। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিলেন "এই গ্রামের নাম বিশেরিন। লোকেরা মুসলমান। কিন্তু প্রাচীন ফ্যারাওদিগের ইহারা বংশধর বলিয়া খ্যাত। অবশ্য ইহারা তাহা জানে না। এই জাতির লোকসংখ্যা এক্ষণে অতি অল্প। এইরূপ দুই একটি পল্লীতে ব্যতীত আর কোথায়ও ইহাদিগকে দেখা যায় না।"

ফ্যারাওগণের বংশধর।

কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা আমাদের গাড়ীর নিকট আসিল। দেখিলাম ইহারা অধিকাংশই শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মুখশ্রী মন্দ নয়। প্রশস্ত ললাট, হ্রস্ব ওষ্ঠপ্রান্ত, উজ্জ্বল চক্ষু, সঙ্কীর্ণ চিবুক—সমগ্র বদনমণ্ডল লম্বাকৃতি, গোলাকার নয়। নাসিকা সুন্দর—চক্ষুর ভ্রূযুগল পৃথক সন্নিবিষ্ট। মস্তকের আকৃতিও সুগঠন। নিগ্রো বা

বিশেরিন পল্লী।

সাঁওতাল বা বর্ব্বরজাতীয় লোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে ইহাদের অবয়বের কোন সাদৃশ্য নাই।

কেশবিন্যাসের বৈচিত্র্য আছে। ইহাদের মাথায় দুই গোছা চুল। প্রথমতঃ মস্তকের উপরিভাগ পাটের মত চুলের নরম দড়িতে পরিপূর্ণ। চুল খুব ঘন—মাথার চামড়া দেখা যায় না। ইহারা কখনও মাথা ধুইয়া ফেলে না এজন্য চুলের রং ধূসর। আর এক গোছা চুল তাহাদের মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ঝুলিতেছে। ইহা স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং দুই কানের উপরেও আবরণস্বরূপ লম্বমান।

এই জাতীয় লোক দেখিয়া প্রাচীন মিশরীয় ক্যারাও এবং মিশরবাসী জনসাধারণের আকৃতি বুঝিতে পারা যায় কি না জানি না। মন্দিরগাত্রে এবং কবরাদির চিত্রে যে-সমুদয় মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে ইচ্ছা করিলে এই জাতীয় লোকের মুখমণ্ডল ও কেশবিন্যাসাদি তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু নৃ-তত্ত্ব বড় সহজ নয়। আকৃতি দেখিয়া জাতি নির্ণয় করা এখনও সুসাধ্য নয়। বিশেষত প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও চিত্রে অঙ্কিত নরনারীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের আধুনিক বংশধরগণের সন্ধান পাওয়া আরও কঠিন।

মিশরীয় শিল্পীরা যে তাঁহাদের কারুকার্য্যে স্বজাতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আকৃতির সৌষ্ঠবই প্রধানত অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের প্রত্যেক মূর্ত্তিতে এবং চিত্রে মিশরবাসীর একই রূপ-কল্পনা দেখিতে পাই। মিশরবাসীর পোষাক-পরিচ্ছদ ও নাক, কান, চক্ষু, মস্তক, কেশ, মুখের আয়তন ও বিস্তৃতি সবই এক ছাঁচে তৈয়ারী বোধ হয়। কিন্তু শিল্পীরা যখন পাবস্থ, হোয়াইট, সীরিয়, লীবিয় ইত্যাদি অন্যান্য শত্রু-জাতিসমূহের চিত্র আঁকিয়াছেন তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বেশে সজ্জিত দেখাইয়াছেন, তাহাদের স্বতন্ত্র গঠনাকৃতি এবং মুখের ও মস্তকের ভিন্নপ্রকার পরিমাণ বুঝাইয়াছেন। ইহার দ্বারা মিশরবাসীরা যে পার্শ্ববর্ত্তী নরসমাজ হইতে শারীরিক গঠনে স্বতন্ত্র ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু আধুনিক বিশেরীন গ্রামের আকৃতি-সৌষ্ঠবযুক্ত বিচিত্র কেশবিন্যাসশীল কৃষ্ণাভ নরসমাজ প্রাচীন মিশরবাসীর বংশধর কি না তাহা বিচার করা একপ্রকার অসম্ভব।

বিশেরীন পল্লী ত্যাগ করিয়া আরও উত্তরে অগ্রসর হইলাম। সুবর্ণ মরুপথেই চলিতেছি। পূর্ব্বে গ্রানাইট

পাহাড়, পশ্চিমে খেজুরবনের ভিতর আসোয়ান-নগর, দূরে নাইলের অপরকূলস্থ সুবর্ণরঞ্জিত বালুকাময় শৃঙ্গ। খানিক পরে মর্ম্মরপর্ব্বতে পৌঁছিলাম। এই গ্রানাইটের জন্মনিকেতন, ইহাই একমাত্র মর্ম্মরশৃঙ্গ।

মর্ম্মরশিলার উর্দ্ধদেশে উঠিলাম। দেখিলাম যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল স্বর্ণরেণুসদৃশ বালুকারাশি এবং সুবর্ণ-স্তূপের আভা উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণের প্রভাবে চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে। "স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি রেখো হৃদে এ ধ্রুবজ্ঞান।" মিশরের এই অঞ্চলবাসী জনগণ বঙ্গ-কবিতার এই পদ যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

বিশেরিন পল্লীর অধিবাসী।

শোণ ও ফল্গুনদীর বালুকারাশি দেখিয়া ভারতবাসী এই সুবর্ণভূমির কথঞ্চিৎ আভাস পাইবেন। গ্রীক্ পর্য্যটকেরা বিহারের "হিরণ্যবাহু" নদীর নাম বালুকার বর্ণ দেখিয়াই দিয়াছিলেন। হুয়েন্থসাঙের ভারতবিচরণেও এই সুবর্ণ নদীর সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ২০৩০ মাইল বিস্তৃত আবেষ্টনের সর্ব্বত্র উর্দ্ধে ও নিম্নে, স্বর্ণরেণুর স্তর এই প্রথম দেখিলাম।

মর্ম্মরশৈলের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া সমস্ত নাইল্ উপত্যকার দৃশ্য দেখিয়া লইলাম। লুক্সর ও কার্ণাক পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে ভাবিয়াছিলাম—মিশরের একস্থান দেখিলেই সকল স্থান দেখা হইল—মিশরের প্রাকৃতিক দৃশ্য সর্ব্বত্রই একরূপ। আজ মর্ম্মরশৃঙ্গ হইতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতেছি—মিশরের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে, নিউবিয়ার উত্তরাঞ্চলে, আসোয়ানের এই পার্ব্বত্য মরু-প্রান্তরে সে কথা খাটে না। এখানে অভিনব জগৎ, নূতন দৃশ্য, নূতন ক্ষেত্র, নূতন দিঙ্মণ্ডল, নূতন সৌন্দর্য্যের আকর। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে সর্ব্বত্রই পর্ব্বত-শৃঙ্গসমূহ দাঁড়াইয়া ভিতরকার উপত্যকার উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। এই আবেষ্টনের মধ্যে বাহিরের কোন শক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল উত্তর হইতে বায়ুর প্রবল নিঃশ্বাস এবং উর্দ্ধ হইতে অগ্নিময় রৌদ্রতাপ এই উপত্যকার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

মর্ম্মরশৈলের পশ্চাদ্ভাগেই উচ্চতর গ্রানাইট পর্ব্বত উত্তরে দক্ষিণে লম্বমান। সম্মুখে পশ্চিম দিক্। পাদদেশে সুবর্ণরঞ্জিত মরুপ্রান্তর—প্রান্তরের উপর কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক নাইল-মৃত্তিকার ইষ্টক-নির্ম্মিত চতুষ্কোণ কুটীরের পল্লী উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই স্বর্ণাভ মরুক্ষেত্রের উপর কৃষ্ণ 'গালাবিয়া'-পরিহিত কৃষকগণ চলাফেরা করিতেছে। তাহার পর একসারি খেজুরবৃক্ষ নদীর কিনারায় শীতল ছায়া বিতরণ করিতেছে। সেই ছায়া উপভোগ করিবার জন্য কোন পাখী, জন্তু বা নরনারী দেখিতেছি না। দক্ষিণ দিকে খেজুর কুঞ্জের ভিতর আসোয়ান-নগরের অট্টালিকাসমূহ। উত্তরে বৃক্ষ-শ্রেণীর নিম্নদেশেই স্ফটিক রেখার ন্যায় ক্ষুদ্রকায় নাইলনদ বিরাজিত। এই কাচসদৃশ বক্রগতি সূক্ষ্মসূত্রের পশ্চিম-কূলেই সুবর্ণবালুকাময় উচ্চ গিরিশৃঙ্গ।

বাঙ্গালী কবি মিবার সম্বন্ধে গাহিয়াছেন "এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।" আসোয়ানের পাহাড় ধূম্র নয়—কিন্তু এই পর্ব্বতবেষ্টিত মরুময় উপত্যকায় মিবার, জসলমীর, এবং রাজপুতনার অন্যান্য স্থানের দৃশ্যই চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। উদয়পুরের কৃষ্ণপাহাড়, ও উদ্যান হ্রদ এবং সরোবর,
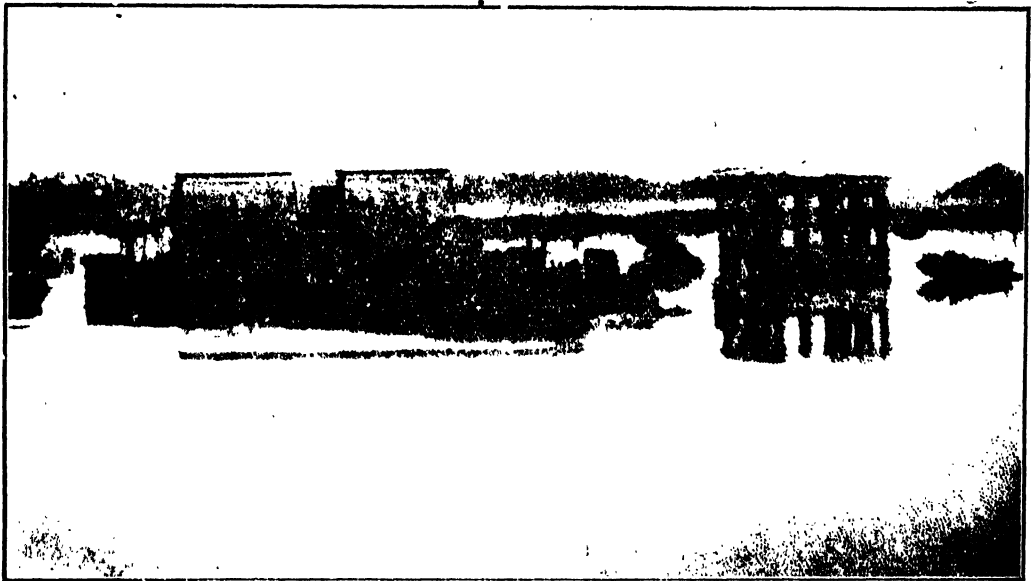
ফাইলি দ্বীপে আইসিস-মন্দির। নাইল নদে বাঁধ দেওয়াতে অনেক স্থলের মরুভূমি বা ডাঙা জমি জলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে; তাহাতে অনেক মন্দিরস্থান দ্বীপের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক মন্দির বা গৃহ একেবারে জলের তলে ডুবিয়া গিয়াছে।

অম্বরের পার্ব্বত্য মরু, এবং জয়পুরের মরুপ্রান্তর এই সমুদয়ের প্রাকৃতিক শোভা আসোয়ান উপত্যকার দৃশ্য হইতে অনেক স্বতন্ত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মিশর-দেশের এই অঞ্চলের সদৃশ ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কথা ভাবিতে হইলে দিল্লী, আগ্রা ও গোয়ালিয়রের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী জলহীন তরুহীন রৌদ্রতপ্ত রাজস্থান এবং সিন্ধুদেশের নামই করিতে হইবে। আসোয়ানের জলবায়ু নদী পর্ব্বত উদ্যান প্রান্তর ক্ষুদ্রভাবে ভারতের এই বিস্তীর্ণ মরুদেশের জনপদগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়।

নবম দিবস—নাইলের বাঁধ।

মিশর প্রকৃত প্রস্তাবে সাহারা মরুভূমির এক অংশ। এখানে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়ে না বলিলেই চলে। তাহার উপর দেশের সর্ব্বত্র মরুভূমির বালুকা অথবা শুষ্ক পর্ব্বতের প্রস্তররাশি। অথচ এই অঞ্চলেই জগতের একটি সর্ব্বপ্রধান উর্ব্বরভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ নাইলের জল ও নাইলের মাটি।

নাইলের প্রভাবেই উত্তর-মিশর ও দক্ষিণ-মিশর ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা হইয়াছে। নাইলই মিশরের জন্মদাতা, মিশরের মৃত্তিকা নাইল নদেরই দান। পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় মিশরই একমাত্র নদী-মাতৃক দেশ।

কিন্তু মিশরের নাইল দেখিয়া নিউবিয়ার নাইল এবং নাইলের আরও দক্ষিণাংশ বুঝা যায় না। মিশরে নাইলের দুইধারে পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কৃষিক্ষেত্র আছে। এই কৃষিক্ষেত্র কোথাও ৫ মাইল, কোথাও ১৫ মাইল বিস্তৃত। এই ভূমিখণ্ডের উপর চাষ আবাদ হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই অংশটুকুই মিশরদেশ। এই অংশেই নাইলের বন্যাজল হইতে মাটি পড়িয়া মিশরীয় কৃষকের শস্যসম্পদ সৃষ্টি করে। কিন্তু আসোয়ানে আসিয়া দেখিতেছি নদীর কূলস্থিত কৃষিভূমি নিতান্তই অল্প—এমন কি একেবারেই নাই। নদী পর্ব্বতদ্বয়ের চরণতল ধৌত করিয়া প্রবাহিত। পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে যতটুকু মাঠ দেখা যায় তাহা মরুভূমি মাত্র। আসোয়ান মিশরের দক্ষিণসীমা। ইহার পরেই নিউবিয়া। এই নিউবিয়ার নাইল আসোয়ানের নাইল অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ, আরও পর্ব্বতবেষ্টিত। নদীর দুই কূলেই পাহাড়। পাহাড় ব্যতীত একইঞ্চি স্থানও নিউবিয়া দেশে নদীর ধারে নাই। অথচ এদেশে বৃষ্টিও হয় না—

মিশর ও নিউবিয়ার সীমাক্ষেত্রে নাইল নদের বাঁধ—ইহার ছিদ্রপথে প্রতি মিনিটে ৩১৮৮০ টন জল নির্গত হইয়া যায়।

অন্য কোন নদীও নাই। কাজেই নিউবিয়ায় ও মিশরে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। নিউবিয়া লোকাবাসের যোগ্য নয়—মিশর স্বর্গভূমি।

হিমালয় পর্ব্বত ভারতবর্ষের জন্য সকল মেঘ, সকল নদী, সকল জলধারা সঞ্চিত রাখিয়াছেন। তাহার ফলে তিব্বত জলহীন, নদীহীন, বৃষ্টিহীন। হিমালয়ের দক্ষিণাংশে উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র—উত্তরাংশে শুষ্ক বরফযুক্ত পর্ব্বতপ্রান্তর। নাইলনদের দক্ষিণে ও নিউবিয়াভাগে ভূমির অভাব, কৃষির অভাব, খাদ্যের অভাব, অথচ উত্তর ভাগের ভূমি এত ঐশ্বর্য্যযুক্ত যে এরূপ জনপদ ভূমণ্ডলে বিরল।

আমরা নিউবিয়ার পার্ব্বত্যদেশ এবং নাইল-ধারা দেখিতে গেলাম। আসোয়ান হইতে কিছু দক্ষিণে একটা রেলপথ বিস্তৃত। ২০।২৫ মাইল পরে ষ্টেসন। গ্রানাইট-প্রস্তর ও গ্রানাইট ধূলিরাশির ভিতর দিয়া গাড়ী চলিল। অল্পক্ষণের ভিতর যথাস্থানে পৌঁছিলাম। নাইলের কূলে ষ্টেসন।

দেখিলাম প্রকৃতি নাইলকে এখানে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। যেন একটা মেজে-বাঁধান পর্ব্বত—প্রাচীরযুক্ত চৌবাচ্চার ভিতর নাইল প্রবাহিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে বড় বড় শিলাখণ্ড ও উচ্চ গিরিশৃঙ্গ। একটিও ধূলিকণা কোথাও দেখা যায় না।

আমরা নৌকায় চড়িয়া এই কূপ বা হ্রদের উপর চলিতে লাগিলাম। মধ্যস্থলে একটা দ্বীপ দেখা গেল। উহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফাইলি দ্বীপ। গ্রীক ও রোমান আমলে এই স্থানে প্রাচীন মিশরীয় রীতিতে মন্দির, প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। টলেমির যুগের মন্দিরাদি এখনও দৃষ্ট হয়। দ্বীপ ক্ষুদ্র—এক্ষণে অর্দ্ধভাগ জলমগ্ন—মন্দির ও অট্টালিকাসমূহের উপরিভাগ মাত্র বাহির হইয়া আছে। এই মন্দিরে প্রাচীন আইসিস দেবীর বিগ্রহ আছে শুনিলাম।

দ্বীপ এবং অট্টালিকাগুলি জলমগ্ন হইবার কারণ জানিতে ইচ্ছা হইল। প্রদর্শক বলিলেন, "দূরে যে নাইলের উপর "ড্যাম" বা প্রস্তরপ্রাচীর দেখিতে পাইতেছেন উহাই ইহার কারণ। এই ড্যামের সাহায্যে নাইলের জল নিউবিয়াতে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। মিশরে অল্পমাত্র জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত নাইলকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে—তখন ড্যাম খোলা থাকে। সেই সময়ে নিউ-

বিয়ার জল সহজে মিশরে প্রবেশ করে। তখন ফাইলি দ্বীপ এবং আইসিস মন্দির হইতে জল সরিয়া যায়। নাইল নিউবিয়ায় এবং মিশরে এক-সমতল ভূমিতে অবস্থিত। এক্ষণে ড্যাম অবরুদ্ধ। দুইএকটি ফটক মাত্র খোলা। এজন্য বেশী জল মিশরে যাইতে পায় না। ফলতঃ নিউবিয়ার দিকে নাইলের জল জমিয়া রহিয়াছে। এখানে নদী খুব গভীর—প্রায় ৫০ ফুট। এই কারণে দ্বীপ ও অট্টালিকাসমূহ জলমগ্ন। কিন্তু মন্দিরাদির কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ সমস্ত দ্বীপটাকে অতিশয় শক্তভাবে বাঁধা হইয়াছে।"

স্থিত। ভারতমহাসাগরের মেঘ আসিয়া আবিসিনিয় পর্ব্বতশৃঙ্গে ঠেকে। তাহার ফলে জুন মাস হইতে আ সিনিয়ায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেইখানেই আবার আমাদে নাইলনদের নীলশাখার উৎপত্তি। কাজেই আবিসিনিয় যে বর্ষা হয় তাহার সুফল মিশরবাসীও ভোগ করে কিন্তু বর্ষার প্রভাব আমাদের অঞ্চলে পৌঁছিতে অনে দিন লাগে। আগষ্ট মাস হইতে আসোয়ানের "ড্যামে বর্ষা দেখিতে পাই। এই বর্ষার প্রবল জলধারা বন্ধ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা মানুষের আছে কিনা সন্দেহ সুতরাং বর্ষাকালে নাইলকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত ক

নাইলের পার্ব্বত্যখাত আসোয়ান।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত নাইলকে মিশরবাসীরা স্বাধীনভাবে প্রবাহিত হইতে দেন কি জন্য? বৎসরের অন্য সাতমাস ইহাকে আবদ্ধ রাখিয়া লাভ কি?"

প্রদর্শক বলিলেন, "ঐ পাঁচ মাস নাইলের বর্ষাকাল—মিশরে জলপ্লাবনের সময় আমাদের জীবনধারণের উপায়। অবশ্য মিশরে বৃষ্টি বিন্দুমাত্রও হয় না। সুদূর দক্ষিণে নিউবিয়া ও সুডানেরও দক্ষিণে আবিসিনিয়াদেশ অব-

হয়। পরে যথাসময়ে ইহার জল ধরিয়া রাখিবার জন্য ড্যাম বন্ধ করা হইয়া থাকে। আজকাল ড্যাম বন্ধ। এজন্য নিউবিয়াভাগে নাইলের জল বেশী।"

নৌকা হইতে আইসিস মন্দির ও ফাইলিদ্বীপ দেখিয়া ড্যামের পূর্ব্বপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। ড্যামের উপর হইতে দক্ষিণে নিউবিয়া এবং উত্তরে মিশরের অবস্থা বুঝিয়া লইলাম। দেখা গেল নিউবিয়ার নাইল একটা প্রকাণ্ড স্থির সরোবরের মত শুইয়া আছে—চারিদিকে

কৃষ্ণ বা ঈষৎরক্ত গ্রানাইট প্রস্তরের পর্ব্বত। মিশরের নাইল শুষ্কপ্রায়—নদীবক্ষ অসংখ্য শিলাখণ্ডে ও গিরিশৃঙ্গে পরিপূর্ণ। পশ্চিম প্রান্ত হইতে প্রবলবেগে তুষারধবল জলরাশি বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিয়াছে। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই পাহাড়। ড্যামের পূর্ব্বপ্রান্তে মিশরের ভাগে একটা সুবিস্তৃত উদ্যান। ইহার সবুজ রঙের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ উপর হইতে মকমলের গালিচার বিভিন্ন অংশের মত দেখাইতেছে। পশ্চিম প্রান্তে 'ড্যাম'-কারখানার কার্য্যালয়।

ভারতবর্ষের নদীজল ধরিয়া রাখিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে অনেক ড্যাম, য়্যানিকাট দেখিয়াছি। কটকের মহানদীর য়্যানিকাট প্রসিদ্ধ। কিন্তু নাইলের এই আসোয়ান-"বারাজে"র (Barrage) তুলনায় উহা খেলানার সামগ্রী মাত্র। ১৮৯৮-১৯০২ সালের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে নীল নাইলের প্লাবন বন্ধ হইয়া যায়। তখন সমস্ত নাইলই শুষ্কপ্রায় হইয়া পড়ে। অথচ বর্ষাকালে নাইলের জল অপর্য্যাপ্ত। জলের সঙ্গে যে মাটি ধুইয়া আসে তাহাও প্রচুর। এই নূতন পলি মিশরের কূলে কূলে সতেজ মৃত্তিকা ও কৃষিভূমির গঠনে যৎপরোনাস্তি সাহায্য করে। কিন্তু বর্ষাঋতু ত চিরকাল থাকে না। তখন মিশরে জলকষ্ট ও মাটি-কষ্ট, সুতরাং কৃষি-কষ্ট আরম্ভ হয়। এজন্য বর্ষাকালের সমস্ত জল প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে নিউবিয়ার এই 'হ্রদে' জল আটকাইয়া রাখিবার কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে এই জল নিয়মিতরূপে কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজনানুসারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সুতরাং বর্ষা চলিয়া গেলেও বর্ষার উপকারিতা মিশরদেশে সর্ব্বদাই থাকে। বারমাস ধরিয়া কৃষকেরা নদীর জল পায়—সহজেই কৃষিকর্ম্ম সুচারুরূপে চলে।

এই ড্যাম জগতের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ জলরক্ষক। প্রায় ১¼ মাইল ইহার দৈর্ঘ্য—উচ্চতা ১৫০ ফুট। ড্যাম নিম্নদেশে প্রায় ১০০ ফুট বিস্তৃত এবং শিরোদেশে প্রায় ৪০ ফুট বিস্তৃত। আগাগোড়া গ্রানাইট পাথরে তৈয়ারী। অতএব বলা যাইতে পারে একটা প্রকাণ্ড গ্রানাইট পর্ব্বত আনিয়া নাইলের উপর ফেলা হইয়াছে। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধে হনুমানের যে এঞ্জিনীয়ারী দেখান হইয়াছে মানব-সাহিত্যে সে অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য এবং অসমসাহসিক কার্য্যের আর পরিচয় নাই। বাস্তবজগতের এই বিরাট নদ-বন্ধনের কৌশল দেখিয়া আদিকবি বাল্মীকির কল্পনা-শক্তির ধারণা করা গেল।

এই পর্ব্বতাকার নাইল-বন্ধনীর তলদেশে ১৮০ টি বৃহৎ ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলির কোন কোনটা যথাসময়ে খুলিয়া দেওয়া হয়। বর্ষাকালে সবই খোলা থাকে। এই ছিদ্রের সঙ্গে গড়ান জলপ্রবাহের পথ সংযুক্ত আছে। জলরাশি নিউবিয়ার উচ্চতর হ্রদ হইতে মিশরের নদীখাতে পড়িবার সময় এই জলপথগুলির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। আজ দেখিলাম দুইটি জলপথের ছিদ্রগুলি খোলা। একটি মধ্যবর্ত্তী অপরটি পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী। এই দুই জলপথের উপর দিয়া জলরাশি গর্জ্জন করিতে করিতে মিশরে নামিতেছে। শুভ্র তুলারাশি-সদৃশ শ্বেত ফেনসমূহ বহুদূরে যাইয়া জলরূপে পরিণত হইতেছে। বর্ষাকালে দার্জ্জিলিঙ্গের হিমালয়ে যাঁহারা পাগলা ঝোরার উন্মাদ নৃত্য দেখিয়াছেন এবং শুভ্র ফেনরাশির উত্তাল গতিভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা নাইলের এই গর্জ্জন ও লম্ফন বুঝিতে পারিবেন।

তাণ্ডবলীলা করিতে করিতে জলরাশি আসিয়া যেখানে পর্ব্বতশিলায় আছড়াইয়া পড়িতেছে সেখানে বাষ্পসদৃশ সূক্ষ্ম জলকণায় শীকর সৃষ্ট হইতেছে। সেই জলবিন্দুর ভিতর প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্যকিরণ রামধনুর বর্ণবৈচিত্র্য উৎপাদন করিতেছে। এইরূপ জল-বিন্দুর ভিতর রামধনু সমুদ্র-তরঙ্গোত্থিত শীকরমালায়ও দেখিয়াছি।

ড্যামের উপর দিয়া পশ্চিমপ্রান্তে পৌঁছিলাম। সেখানে দূর হইতে কারখানা দেখা গেল। পরে নদীর একটা ক্ষুদ্র খালের উপর নৌকায় চড়িয়া উত্তরাভিমুখে চলিলাম। খানিকদূর যাইয়া আর একটা জলবন্ধনী পাওয়া গেল। এই জলবন্ধনীর দুইটা ফটক, ফটকদ্বয়ের ভিতর একটা খাল। সুতরাং নিউবিয়ার হ্রদের পর মিশরেও একটা হ্রদ। আমাদের নৌকা মিশরের এই হ্রদ পার হইয়া নদীতে পড়িল। খালের ভিতর দিয়া হ্রদ পার হইবার সময়ে দেখিলাম—আমরা উচ্চতর জলস্থান হইতে

নিম্নতর জলভাগে যাইতেছি। দুই সমতলে প্রায় ১৫ ফুট ব্যবধান; উচ্চ হইতে নিম্নে আমাদের নৌকা নামিল। অবশ্য উচ্চস্থান হইতে লাফাইয়া পড়িল না। যাহাতে নৌকা হ্রদ হইতে সহজেই খালের ভিতর দিয়া নদীতে যাইতে পারে তাহার জন্যই দুইটা ফটক সৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম ফটক খুলিবামাত্র হ্রদের জল প্রথম খালে ঢুকিল—তাহার ফলে দুই জলভাগ এক সমতল হইয়া গেল। আমাদের নৌকা নির্বিঘ্নে খালে ঢুকিল। খালে ঢুকিবামাত্র পশ্চাদ্বর্ত্তী ফটক বন্ধ করা হইল। এক্ষণে আমরা নদী হইতে বহু-উচ্চে রহিয়াছি। কাজেই দ্বিতীয় ফটক খুলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে খালের জল কমান হইল। যখন প্রায় দুই মানুষের সমান গভীর জল বাহির হইয়া গেল তখন নদীর সঙ্গে খাল একসমতল হইল। এক্ষণে ফটক পূরাপূরি খোলা হইল আমরা নদীতে নামিলাম।

এতক্ষণ মানুষের তৈয়ারী বাঁধাবাঁধি, জলবন্ধনী, ব্যারজ, খাল, হ্রদ, ড্যাম ইত্যাদির ভিতর ছিলাম। মিশরের নাইলে পড়িয়াও দেখিতেছি আবার হ্রদ, ও পর্ব্বত ও বেষ্টনী। এ হ্রদ মানুষের প্রস্তুত নয়। মিশরের প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই এরূপ গঠিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকেই পাহাড় দেখিতে পাই। যে দিকেই তাকাই কেবল পর্ব্বতশৃঙ্গ—আমরা যেন পুষ্করিণীতে ভাসিতেছি। নদী এতই বক্রগতি যে প্রায় ১০০০ গজ পরিধির মধ্যে যতদূর দেখা যায় নদীপ্রবাহ দেখিতে পাই না—কেবল সরোবর মাত্র চক্ষুগোচর হয়।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদসদৃশ, সরোবরসদৃশ নাইল বাহিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে আসোয়ানে পৌঁছিলাম। এই দিকে যেসকল শিলাখণ্ড দেখা গেল সবই কৃষ্ণবর্ণ গ্রানাইট প্রস্তর। পূর্ব্বে রক্ত-পীত গ্রানাইট দেখা গিয়াছে। কিন্তু সেই বৃহৎ জলবন্ধনী হইতে আমাদের আবাস পর্য্যন্ত নদীর ধারে এবং নদীর ভিতর যে-সকল পর্ব্বতগাত্র, পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং উপলখণ্ড দেখিলাম সবই মসৃণ কৃষ্ণ গ্রানাইট।

নিউবিয়ান মাঝিদিগের গীত শুনিতে শুনিতে নাইল-বক্ষে প্রায় ১৩।১৪ মাইল ভ্রমণ করা হইল। সন্ধ্যাকালে আফ্রিকার লীবিয়া পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে সূর্য্য অস্ত যাই-তেছে দেখিতে পাইলাম। সাহারা মরুভূমিতে সূর্য্যাস্ত-গমনের উজ্জ্বল রক্তবর্ণ আমাদের পশ্চিমাকাশকে এক অনির্ব্বচনীয় গরিমায় রঞ্জিত করিল। বহুক্ষণ ধরিয়া সূর্য্যাস্তগমনের চিত্র গগনমণ্ডলে লক্ষ্য করিলাম। পরে ধীরে ধীরে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। যখন হোটেলে ফিরিলাম, তখন অমাবস্যার ঘোর নিশায় নদী পর্ব্বত আচ্ছন্ন হইয়াছে। (ক্রমশ)

শ্রীপর্য্যটক।

পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দুর্গপ্রাসাদের একটি কক্ষ।

[পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা উপস্থিত। কক্ষের দূরপ্রান্তে চরকা লইয়া মেলিস্যাণ্ডা সূতা কাটিতেছেন।]

পিলীয়াস

ইনিয়লড ফিরে আসেনি ; কোথায় গেল সে ?

মেলিস্যাণ্ডা

ঘরের পথে ও কিসের একটা শব্দ শুনতে পেলে, কি তাই দেখতে গেছে।

পিলীয়াস

মেলিস্যাণ্ডা...

মেলিস্যাণ্ডা

কি বলছ ?

পিলীয়াস

...এখনও তুমি সুতা কাটতে দেখতে পাচ্ছ ?...

মেলিস্যাণ্ডা

আমি অন্ধকারেও সমান কাজ করতে পারি...

পিলীয়াস

বোধ হয় প্রাসাদে সবাই এর মধ্যে খুব ঘুমিয়ে পড়েছে। শিকার করে গোলড এখনও ফিরে আসেনি। খুব দেরী হয়েছে, কিন্তু...সেই পড়ে যাওয়ার আঘাতটায় এখনও কি সে ভুগছে ?

মেলিস্যাণ্ডা

না, আর ভুগছে না, তাই ত বলেছে।

পিলীয়াস

আরও ওর সাবধান হওয়া উচিত ; বিশ বছর বয়সের মত আর ওর হাড় নরম নেই...জানালা দিয়ে আমি বাইরে তারা দেখতে পাচ্ছি, গাছের উপর চাঁদের আলো দেখতে পাচ্ছি। রাত্রি হয়েছে ; সে আর এখন ফিরবে না। [দ্বারে আঘাতের শব্দ।] কে ওখানে ?...ভিতরে এস !...[দ্বার খুলিয়া ইনিয়লড কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল।] ও রকম করে আঘাত করছিলে তুমি ?... ও রকম করে দরজায় ঘা দিতে হয় না। ওতে মনে হয় ঠিক যেন কোনও বিপদ হয়েছে ; দেখ, তোমার ছোট্ট মা-টিকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছ।

ইনিয়লড

আমি ত খুব আস্তেই ঘা দিচ্ছিলাম।

পিলীয়াস

রাত্রি হয়েছে ; তোমার বাবা আজ রাত্রে আর ঘরে ফিরবেন না ; এখন শুতে যাবার সময় হয়েছে।

ইনিয়লড

আমি তোমার আগে শুতে যাব না।

পিলীয়াস

কি ?...কি বলছ ও তুমি ?

ইনিয়লড

আমি বলছিলাম...তোমার আগে না...তোমার আগে না......

[ইনিয়লড কাঁদিতে লাগিল এবং মেলিস্যাণ্ডার পার্শ্বে আশ্রয় লইল।]

মেলিস্যাণ্ডা

কি হয়েছে, ইনিয়লড ?...কি হয়েছে ?...হঠাৎ তুমি কাঁদছ কেন ?

ইনিয়লড [কাঁদিতে কাঁদিতে]

এই...ওঃ ! ওঃ ! এই...

মেলিস্যাণ্ডা

কেন ?...কেন ?...বল আমাকে...

ইনিয়লড

মা···মা...তুমি চলে যাবে...

মেলিস্যাণ্ডা

সে কি, কি হয়েছে তোমার, ইনিয়লড ?··· আমি চলে যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি···

ইনিয়লড

হাঁ, হাঁ ; বাবা চলে গেছে...বাবা ফিরে আসেনি, আর এইবার তুমিও যাচ্ছ...আমি তা দেখতে পেয়েছি... আমি তা দেখতে পেয়েছি...

মেলিস্যাণ্ডা

কিন্তু এ রকম কোনও কথাই ওঠেনি, ইনিয়লড... তুমি কিসে দেখতে পেলে আমি চলে যাচ্ছি ?···

ইনিয়লড

আমি দেখতে পেয়েছিলাম...আমি দেখতে পেয়েছিলাম...আমার কাকাকে তুমি সব বলছিলে, তা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না...

পিলীয়াস

ওর ঘুম পেয়েছে...ও স্বপ্ন দেখছিল...এখানে এস, ইনিয়লড ; এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে ? এস এই জানালা থেকে দেখ ; কুকুরগুলোর সঙ্গে রাজহাঁসগুলোর লড়াই হচ্ছে...

ইনিয়লড [জানালায়]

ওঃ ! ওঃ ! ওরা ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঐ কুকুরগুলো !...ওরা ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে !...ওঃ ! ওঃ ! ঐ জল !...উড়েছে !...উড়েছে ! ওরা ভয় পেয়েছে...

পিলীয়াস [মেলিস্যাণ্ডার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া।]

ওর ঘুম পেয়েছে ; জেগে থাকতে ও খুব চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর চোখ বুজে আসছে ..

[মেলিস্যাণ্ডা চরকা কাটিতে কাটিতে আপন মনে গান করিতে লাগিলেন।]

ইনিয়লড

ওঃ ! ওঃ। মা !...

মেলিস্যাণ্ডা [তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া]

কি হয়েছে, ইনিয়লড ?...কি হয়েছে ?...

ইনিয়লড

জানালার বাইরে আমি কি একটা দেখলাম !···

[পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা ছুটিয়া জানালায় গেলেন।]

পিলীয়াস

কি আছে জানলায় ? তুমি কি দেখেছিলে ?...

ইনিয়লড

ওঃ ! ওঃ ! আমি কিছু একটা দেখেছিলাম !...

পিলীয়াস

কিন্তু ওখানে ত কিছুই নাই। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না...

মেলিস্থাণ্ডা

আমিও না...

পিলীয়াস

কোথায় তুমি কিছু—একটা দেখেছিলে? কোন্ দিকে?...

ইনিয়লড

ঐ ওখানে, ঐ ওখানে! সেটা এখন আর নেই।

পিলীয়াস

ও যে কি বলছে তা ও-ই এখন আর জানে না। বোধ হয় বনের উপর চাঁদের আলো দেখে থাকবে। অনেক সময় ওখানে আশ্চর্য্য সব ছায়া পড়ে...কিম্বা রাস্তা দিয়ে কিছু হয়ত গিয়ে থাকবে...আর না-হয় ঘুমের ঘোরে ও কিছু স্বপ্ন দেখে থাকবে। এই দেখনা, দেখনা, বোধ হয় এইবার ও একেবারে ঘুমিয়ে পড়ল...

ইনিয়লড

ঐ বাবা এসেছে। বাবা এসেছে!

পিলীয়াস [জানালায় যাইয়া]

ও ঠিকই বলেছে; গোলড এইমাত্র উঠানে ঢুকল।

ইনিয়লড

বাবা!...বাবা!...আমি যাই বাবার কাছে!...

[দৌড়াইয়া প্রস্থান।—নিস্তব্ধ ভাব।]

পিলীয়াস

ওরা উপরে আসছে...

[গোলড ও আলোক-হস্তে ইনিয়লডের প্রবেশ।]

গোলড

তোমরা এখনও অন্ধকারে অপেক্ষা করছ?

ইনিয়লড

আমি একটা আলো এনেছি, মা, মস্ত বড় আলো! [আলোকটি তুলিয়া ধরিল ও মেলিস্থাণ্ডাকে দেখিতে লাগিল।] তুমি কি কাঁদছিলে মা?...তুমি কি কাঁদছিলে?...[পিলীয়াসের দিকে আলোকটি তুলিয়া ধরিল ও তাঁহাকেও দেখিতে লাগিল।] তুমিও, তুমিও, কাঁদছিলে তুমি?...বাবা, দেখ বাবা; ওরা কাঁদছিল, ওরা দুজনেই...

গোলড

এ রকম চোখের সামনে ওদের আলো ধরো না...

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গপ্রাসাদের একটি বুরুজ। তাহার একটি জানালার নীচে একটি শাস্ত্রি-পথ।

মেলিস্থাণ্ডা [জানালার ধারে চুল আঁচড়াইতেছেন]

সখিরে!

জনম অবধি খুঁজিনু তাহারে,
কোথায় লুকাল কেমনে জানি,
জনম অবধি ফিরিনু আমি যে,
সন্ধান কেহ দিল না আনি...
জনম অবধি ফিরিনু আমি যে,
শ্রান্ত আমার চরণ, সই,
চারিদিকে তারে দেখিবারে পাই,
বঁধুর পরশ পাই না কই...
দুখের জীবন বহিয়া চলেছি,
আর না চলিব পথেতে হায়,
দিন অবসান হয়ে গেছে সই,
পরাণ আমার টুটিয়া যায়...
কোমল তোদের বয়ষ এখন,
বাহির হ না লো পথের পর,
আছে সে কোথায় বঁধুয়া আমার
তার সন্ধান খুঁজিয়া কর...

[শাস্ত্রিপথ দিয়া পিলীয়াসের প্রবেশ।]

পিলীয়াস

ও! হো হৈ!...

মেলিস্থাণ্ডা

কে ওখানে?

পিলীয়াস

আমি, আমি, আর আমি!...জানালার ওখানে তুমি কি করছ, অচিন দেশের পাখীর মত গান করছ?

মেলিস্থাণ্ডা

রাত্রের মত চুল বেঁধে নিচ্ছি...

পিলীয়াস

তাই কি আমি দেওয়ালের গায়ে দেখতে পাচ্ছি?... আমার মনে হচ্ছিল তোমার পাশে একটা আলো ছিল...

মেলিস্থাণ্ডা

আমি জানালাটা খুলে দিয়েছিলাম; এখানটায় ভয়ানক গরম...আজ রাত্রিটা চমৎকার...

পিলীয়াস

অসংখ্য তারা উঠেছে; আজ রাত্রের মত এত আর কোনও দিন দেখিনি ..কিন্তু চাঁদ এখনও সাগরের উপরে ...অন্ধকারে থেকোনা, মেলিস্থাণ্ডা, একটু ঝুঁকে পড়, আমি যেন তোমার সমস্ত খোলা চুল দেখতে পাই..

মেলিস্থাণ্ডা

আমায় তাতে বিশ্রী দেখায়...

[জানালার বাহিরে ঝুঁকিলেন]

পিলীয়াস

ওঃ! ওঃ! মেলিস্থাণ্ডা!...ওঃ! তুমি সুন্দরী! এতে তোমায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে! · আরও ঝোঁক!...আরও আমি তোমার কাছে যাই...

মেলিস্থাণ্ডা

তোমার আর বেশী কাছে আমি যেতে পারছি না... যতদূর পারি আমি ঝুঁকে পড়েছি...

পিলীয়াস

আমিও আর বেশী উঁচুতে উঠতে পারছি না...আজ সন্ধ্যায় অন্তত হাতটি তোমার আমায় দাও...আমি চলে যাবার পূর্ব্বে...আমি কাল চলে যাচ্ছি...

মেলিস্থাণ্ডা

না, না, না...

পিলীয়াস

হাঁ, হাঁ, হাঁ; আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি কাল...তোমার হাত দাও, তোমার হাত, তোমার ছোট্ট হাত আমার অধরে...

মেলিস্থাণ্ডা

তোমায় কিছুতেই হাত দেব না যদি তুমি চলে যাও...

পিলীয়াস

দাও, দাও, দাও...

মেলিস্থাণ্ডা

তাহলে তুমি যাবে না বল?

পিলীয়াস

অপেক্ষা করব, অপেক্ষা করব...

মেলিস্থাণ্ডা

অন্ধকারে আমি একটি গোলাপ দেখতে পাচ্ছি...

পিলীয়াস

কোথায়? আমি কেবল ঐ দেওয়ালের উপর মাথা তুলেছে 'উইলোর' ডালগুলো দেখতে পাচ্ছি..

মেলিস্থাণ্ডা

আরও নীচে, আরও নীচে বাগানের ভিতর; ঐ ওখানে, ঠিক ঐ আঁধার ঘাসগুলোর মাঝে...

পিলীয়াস

ও ত গোলাপ নয় ..আমি এখুনি যেয়ে দেখছি, কিন্তু তার আগে তোমার হাত দাও; আগে তোমার হাত ..

মেলিস্থাণ্ডা

এই নাও, এই নাও;...আর আমি বেশী ঝুঁকতে পারছি না...

পিলীয়াস

তোমার হাত পর্য্যন্ত আমার মুখ উঠছে না...

মেলিস্থাণ্ডা

আর আমি বেশী ঝুঁকতে পারছি না ..আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছি...ওঃ! ওঃ! আমার চুল সমস্ত খুলে গড়িয়ে পড়ছে!...

[মেলিস্থাণ্ডা যেমন নত হইলেন অমনি তাঁহার চুল ঘুরিয়া পড়িয়া পিলীয়াসকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল।]

পিলীয়াস

ওঃ! ওঃ! এ কি?...তোমার চুল, তোমার চুল আমার কাছে নেমে আসছে!...তোমার সমস্ত চুল, মেলিস্থাণ্ডা, তোমার সমস্ত চুল দেওয়ালের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে! আমি তা দুহাতে ধরেছি, আমি তা আমার মুখের ওপর ধরেছি...আমি আমার বাহু দিয়ে বুকে করে ধরেছি, আমি আমার গলার চারিদিকে জড়িয়ে ধরেছি... আর আজ রাত্রে আমি আমার হাত খুলব না...

মেলিস্থাণ্ডা

চলে যাও! চলে যাও!...আমায় তুমি ফেলে দেবে!

পিলীয়াস

না, না, না...আমি তোমার মত চুল কখনও দেখিনি, মেলিস্থাণ্ডা!...দেখ, দেখ, দেখ; এ এত উপর

হতে এসেছে, তবু এর ধারা আমার হৃদয়ে এসে লেগেছে...এ আমার জানু পর্য্যন্ত এসেছে!...আর তোমার চুল এত নরম, এত নরম যেন স্বর্গ হতে নেমেছে! তোমার চুলে আমার সুমুখের আকাশ ঢেকে দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ?...আমার দু হাতে করে তোমার চুল ধরে রাখতে পারছি না; 'উইলোর' শাখায় পর্য্যন্ত কতকগুলো চুলের গুছি উড়ে গিয়ে পড়েছে...চুলগুলো আমার হাতে পাখীর মত সজীব হয়ে উঠেছে·· তারা আমায় ভালবাসে, আমায় ভালবাসে তোমার চেয়ে!...

মেলিস্থাণ্ডা

চলে যাও, চলে যাও...কেউ এখান দিয়ে যেতে পারে...

পিলীয়াস

না, না, না; তোমায় আজ রাত্রে মুক্তি দেব না... আজ রাত্রির মত তুমি আমার বন্দী; সমস্ত রাত্রি, সমস্ত রাত্রি...

মেলিস্থাণ্ডা

পিলীয়াস! পিলীয়াস!...

পিলীয়াস

আমি তাদের বাঁধছি, 'উইলোর' শাখায় বাঁধছি... আর তুমি এখান হতে যেতে পারবে না···আর তুমি এখান হতে যেতে পারবে না...দেখ, দেখ, আমি তোমার চুল চুম্বন করছি...তোমার চুলের মাঝে থেকে, আমার সমস্ত বেদনা দুর হয়ে গেছে...আমার চুম্বনগুলি ধীরে ধীরে তোমার চুল বেয়ে উঠে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছ?... তোমার সমস্ত চুল বেয়ে উঠছে তারা...প্রত্যেক চুলটি একটি করে তোমার কাছে নিয়ে যাক...দেখছ, দেখছ, আমি হাতের মুঠো খুলে নিতে পারি·· হাত আমার খালি, আর তবুও তুমি আমার কাছ থেকে যেতে পার না...

মেলিস্থাণ্ডা

ওঃ! ওঃ! তুমি আমায় লাগিয়ে দিয়েছ.. [উপর হইতে একদল ঘুঘু উড়িয়া গেল এবং অন্ধকারে তাঁহাদের চারিদিকে উড়িতে লাগিল।] ও কি হল, পিলীয়াস?— আমার চারিদিকে এ কি উড়ে বেড়াচ্ছে?

পিলীয়াস

ঘুঘুগুলো বাসা ছেড়ে যাচ্ছে...আমি ওগুলোকে ভয় পাইয়েছি; ওরা উড়ে পালাচ্ছে...

মেলিস্থাণ্ডা

ও সব আমার ঘুঘু, পিলীয়াস।—এখন যাওয়া যা এইবার যাও; ওরা হয়ত আর ফিরে আসবে না···

পিলীয়াস

কেন ওরা ফিরে আসবে না...

মেলিস্থাণ্ডা

অন্ধকারে ওরা হারিয়ে যাবে...এইবার যাও, আমা মাথা তুলতে দাও...আমি পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি.. এইবার যাও!···গোলড আসছে! নিশ্চয় গোলড·· ও সমস্তই শুনেছে...

পিলীয়াস

থাম! থাম!...তোমার চুলের গুছি শাখার চারিদিবে জড়িয়ে গেছে···অন্ধকারে ওখানে লেগে গেছে...থাম থাম!...রাত্রিটা আজ ভয়ানক অন্ধকার...

[শাস্ত্রিপথ দিয়া গোলডের প্রবেশ।]

গোলড

কি করছ তোমরা এখানে?

পিলীয়াস

কি করছি আমি এখানে?...আমি...

গোলড

তোমরা ছেলেমানুষ...মেলিস্থাণ্ডা, জানালা দিয়ে অতখানি ঝুঁকো না; পড়ে যাবে···রাত্রি অনেক হয়েছে জাননা?—প্রায় মাঝরাত্রি এখন।—এ রকম করে অন্ধকারে খেলা কোরো না। তোমরা ছেলেমানুষ··· [ত্রস্তভাবে হাসিয়া।] কি ছেলেমানুষ!.. কি ছেলেমানুষ!

* *
*

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গপ্রাসাদের নিম্নস্থিত খিলান-ঘর।

[গোলড ও পিলীয়াসের প্রবেশ]

গোলড

সাবধান; এইদিকে, এইদিকে।—এখানে সাহস করে কখনও তুমি কি নাম নি?

পিলীয়াস

হাঁ, একবার; কিন্তু সে অনেকদিন আগে...

গোলড

এ খিলানগুলো খুব বড় বড়; মস্ত মস্ত গুহার শ্রেণী কোথায় যে চলেছে, কোথায় তা ভগবানই জানেন।

সমস্ত প্রাসাদটাই এই গুহাগুলোর উপর তৈয়ারী করা হয়েছে। কি সাঙ্ঘাতিক গন্ধ এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা টের পাচ্ছ?—তাই আমি তোমাকে দেখাতে এনেছি। এই যে এখুনি তোমাকে এখানের একটা ছোট হ্রদ দেখাব, আমার বিশ্বাস গন্ধটা সেখান থেকেই ওঠে। সাবধান; সামনে চল আমার, আমার লণ্ঠনের আলোতে। যখন সেখানে পৌঁছব তখন তোমায় বলব। [নিঃশব্দে তাঁহারা চলিতে লাগিলেন।] হে! হেঃ! পিলীয়াস! থাম! থাম! [পিলীয়াসের বাহু ধরিলেন।] সর্ব্বনাশ. দেখতে পাচ্ছ না?—আর এক পা এগুলেই অতল খাদে পড়ে যেতে!...

পিলীয়াস

আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না!...আমার দিকে লণ্ঠনটা কিছুই আলো দিচ্ছিল না...

গোলড

আমার পা ফস্কে গেছল...কিন্তু তোমায় যদি আমি না ধরতাম...বেশ, এই দেখ পচা জল, যার কথা তোমাকে বলছিলাম...এখান থেকে নরকের দুর্গন্ধ উঠছে টের পাচ্ছ?—ঐ পাথরটা ঝুলে রয়েছে, ঐটের ধারে এসে একটু ঝুঁকে দেখ। গন্ধটা উঠে তোমার মুখে ধাক্কা মারবে।

পিলীয়াস

আমি এখনই টের পাচ্ছি...বলতে গেলে যেন এ মৃতের কবরের গন্ধ।

গোলড

আরও আগে, আরও আগে...কোনও কোনও দিন এই গন্ধ উঠে প্রাসাদের চারিদিক ভরে যায়। রাজা বিশ্বাস করেন না যে এটা এখান থেকে ওঠে।—এই পচা বদ্ধ জলের গর্ত্তটা দেওয়াল দিয়ে গেঁথে দিলে ভাল হয়। আর, তার উপর, খিলেনগুলো একবার ভাল করে দেখার দরকার। খিলানগুলোর গায়ে আর থামে সব ফাট ধরেছে লক্ষ্য করেছ? আমাদের চোখের আড়ালে এখানে কি একটা হচ্ছে আমাদের হুঁসই নেই; আর যদি কোন যত্ন নেওয়া না হয় তা হলে একদিন হঠাৎ সমস্ত প্রাসাদটাই এ গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু করা যায় কি? কেউ এখানে নামতে চায় না...অনেক দেওয়ালে আশ্চর্য্য সব ফাটল আছে...ওঃ।. এখানে... নরকের গন্ধ উঠছে টের পাচ্ছ?

পিলীয়াস

হাঁ; আমাদের চারিদিকে মৃত্যুর গন্ধ ধীরে ধীরে উঠছে...

গোলড

ঝুঁকে দেখ; কিছু ভয় নেই...আমি তোমায় ধরছি... আমায় তোমার...না, না, তোমার হাত না...ও ছেড়ে যেতে পারে...তোমার বাহু ধরতে দাও, তোমার বাহু দাও...খাদটা দেখতে পাচ্ছ? [ব্যাকুলভাবে।]—পিলীয়াস? পিলীয়াস?...

পিলীয়াস

হাঁ; মনে হচ্ছে আমি খাদের একেবারে শেষ পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি...ও রকম করে কাঁপছে কেন আলোটা?... তুমি...

[সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া গোলডকে দেখিতে লাগিলেন।]

গোলড [কম্পিত কণ্ঠে]

হাঁ; লণ্ঠনের আলোই বটে...এই দেখ, পাশগুলোতে আলো দেবার জন্যে আমি এটাকে দোলাচ্ছিলাম...

পিলীয়াস

আমার দম আট্‌কে যাচ্ছে এখানে ..চল আমরা যাই...

গোলড

হাঁ; চল যাই...

[নিস্তব্ধভাবে প্রস্থান।]

* * *

চতুর্থ দৃশ্য

খিলান-ঘরের প্রবেশ-পথে চত্বর।

[গোলড ও পিলীয়াসের প্রবেশ।]

পিলীয়াস

আঃ! এতক্ষণে আমি দম নিতে পারছি! ঐ মস্ত মস্ত গুহাগুলোর মধ্যে এক এক সময় মনে হচ্ছিল যেন মূর্চ্ছা যাচ্ছি। আমি প্রায় পুড়ে যাচ্ছিলাম...ওখানকার ভিজে বাতাসটা সীসার শিশিরের মত ভারি, আর অন্ধকারটা হচ্ছে বিষ-ফলের শাঁসের মত ঘন...আর এই এখানে, সমস্ত সমুদ্রের সমস্ত বাতাস! দেখ, স্নিগ্ধ বাতাস

বইতে আরম্ভ হয়েছে ; ছোট ছোট সবুজ ঢেউগুলির উপর দিয়ে, যেন নবোন্মুক্ত পাতার মত স্নিগ্ধ...বাঃ ! চাতালের গোড়ায় ফুলগাছগুলোয় এখন নিশ্চয় ওরা জল দিচ্ছে, পাতার গন্ধ আর ভিজে গোলাপের গন্ধ আমাদের এখান পর্য্যন্ত উঠছে...এখন নিশ্চয় বেলা দুপুর প্রায়, ফুলগাছ-গুলোর উপর প্রাসাদের ছায়া এসে পড়েছে...দুপুরই বটে ; ঘণ্টা বাজছে শুনছি, আর ছেলেরা সমুদ্রে নাইতে নামছে...আমরা অতক্ষণ গুহাগুলোর ভিতরে ছিলাম আমি জানতেই পারিনি...

গোলড

আমরা প্রায় এগারটার সময় ওখানে নেমেছিলাম...

পিলীয়াস

আরও আগে ; নিশ্চয় আরও আগে ; আমি সাড়ে দশটা বাজতে শুনেছিলাম তখন।

গোলড

সাড়ে দশটা না পৌনে এগারটা...

পিলীয়াস

ওরা প্রাসাদের সমস্ত জানালা খুলে দিয়েছে। আজ বিকালটা ভয়ানক গরম হবে...ঐ যে, ঐ উপরে একটা জানালায় আমাদের মা আর মেলিস্যাণ্ডা দাঁড়িয়ে রয়েছে...

গোলড

হাঁ, ছায়ার দিকটায় ওরা আশ্রয় নিয়েছে।—মেলিস্যাণ্ডার কথা বলতে কি, তোমাদের কথাবার্ত্তা আমি সমস্ত শুনেছি, আর কাল সন্ধ্যার সময় যা কথা হয়েছে তাও শুনেছি। আমি খুব ভালই বুঝি যে এ সমস্তই তোমাদের ছেলেখেলা, কিন্তু আর ওরকম কোরো না। মেলিস্যাণ্ডা এখনও ছেলেমানুষ আর তার মনটা ভারি নরম ; শীঘ্রই তার ছেলে হবে, সেই জন্যে আরো তার সঙ্গে বুঝে সুঝে চলতে হবে...ও অত্যন্ত দুর্ব্বল, এখন পর্য্যন্ত ঠিক গৃহিণী বলতে পারা যায় না ; মনের মধ্যে এখন সামান্য একটু উত্তেজনা হলেই কিছু বিপদ ঘটতে পারে। তোমাদের মধ্যে যে কিছু একটা থাকতে পারে তা ভাবার কারণ আমার এই প্রথম নয় তুমি তার চেয়ে বয়সে বড় ; তোমাকে বলে দিলেই যথেষ্ট.. যত পার ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে ; তাহলেও কোনও ক্রমে ও সেটা যেন লক্ষ্য করতে না পারে, লক্ষ্য করতে না পারে ...—ঐ ওখানে রাস্তায় যাচ্ছে কি, বনের দিকে ?

পিলীয়াস

ও ভেড়ার পাল সহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে...

গোলড

হারিয়ে-যাওয়া ছেলের মত ওরা চীৎকার করছে দেখে মনে হয় যেন ওরা আগে থাকতেই কসাইয়ের গন্ধ টের পেয়েছে। এখন খেতে যাওয়ার সময় হল।—দিনটা আজ কি সুন্দর ! ফসল সংগ্রহ করবার পক্ষে আজ কি চমৎকার দিন !...

[প্রস্থান]

* *
*

পঞ্চম দৃশ্য

দুর্গপ্রাসাদের সম্মুখে

[গোলড ও ইনিয়লডের প্রবেশ।]

গোলড

এস, আমরা এইখানে বসি, ইনিয়লড ; আমার কোলে এসে বস ; বনে যা যা হচ্ছে সব এখান থেকে আমরা দেখতে পাব। আজকাল আর তোমায় একটিবারও আমি দেখতে পাই না। তুমিও আমায় ত্যাগ করলে ; তুমি সব সময়েই তোমার মায়ের কাছে থাক...বাঃ আমরা ঠিক তোমার মায়ের জানালার নীচে বসে আছি।—বোধ হয় তোমার মা এতক্ষণ সন্ধ্যা-উপাসনা করছে...আচ্ছা বল দেখি, ইনিয়লড, সে আর তোমার কাকা পিলীয়াস প্রায়ই এক সঙ্গে থাকে, তাই না ?

ইনিয়লড

হাঁ, হাঁ ; সমস্তক্ষণ, বাবা ; তুমি যখন ওখানে থাকনা, বাবা...

গোলড

আ ! দেখ, লণ্ঠন নিয়ে কে একজন বাগান দিয়ে যাচ্ছে।—কিন্তু লোকে বলে যে ওরা কেউ কারুকে দেখতে পারে না...ওরা প্রায়ই ঝগড়া করে মনে হয়... অ্যাঁঃ ? তাই কি সত্যি ?

ইনিয়লড

হাঁ, হাঁ ; তাই সত্যি

গোলড

হাঁ?—আঃ! আঃ! কিন্তু ওরা কি নিয়ে ঝগড়া করে?

ইনিয়লড

দরজা নিয়ে।

গোলড

কি? দরজা নিয়ে?—কি বলছ তুমি এ?—এখন শোন, ভেঙ্গে বল কি বলছ? দরজা নিয়ে কেন ওরা ঝগড়া করবে?

ইনিয়লড

এই খুলে রাখতে পারা যায় না বলে।

গোলড

কে খুলে রাখতে চায় না?—শোন, ঝগড়া করে কেন ওরা?

ইনিয়লড

আলোর কথা আমি কিছু জানি না, বাবা।

গোলড

আলোর কথা ত আমি বলছি না; সে কথা এখুনি হবে এখন। আমি দরজার কথা বলছি। যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও; কথা বলতে শেখ; বড় হয়েছ... মুখে হাত দিও না...শোন...

ইনিয়লড

বাবা! বাবা! আর করব না কখন...

[ক্রন্দন।]

গোলড

শোন এখন; কাঁদছ কিসের জন্যে? কি হল কি?

ইনিয়লড

ওঃ! ওঃ! বাবা, তুমি আমায় লাগিয়ে দিয়েছ...

গোলড

লাগিয়ে দিয়েছি?—কোনখানে লাগিয়ে দিয়েছি? আমি ইচ্ছে করে লাগাইনি...

ইনিয়লড

এইখানে, এইখানে; আমার হাতে...

গোলড

আমি ইচ্ছে করে কখন করিনি; শোন, আর কেঁদনা, কাল একটা জিনিষ দেব এখন...

ইনিয়লড

কি, বাবা?

গোলড

একটা তুণ আর অনেক তীর। কিন্তু এইবার আমাকে বল দরজার কথা কি জান।

ইনিয়লড

মস্ত মস্ত তীর?

গোলড

হাঁ, হাঁ; খুব খুব মস্ত তীর।—কিন্তু কেন ওরা দরজা খুলে রাখতে চায় না?—বল, উত্তর দাও!—না, না; কাঁদতে মুখ হাঁ করোনা। আমি ত রাগ করিনি। আমরা খুব আস্তে আস্তে কথা বলব এখন, এই যেমন পিলীয়াস আর তোমার মা একত্রে থাকলে বলে। দুজনায় একত্রে থাকলে ওরা কি কথা বলে?

ইনিয়লড

পিলীয়াস আর মা?

গোলড

হাঁ; ওরা কি কথা বলে?

ইনিয়লড

আমার কথা; কেবলই আমার কথা।

গোলড

আর তোমার কথা কি বলে?

ইনিয়লড

ওরা বলে আমি মস্ত লম্বা হব।

গোলড

হায়! কপাল!...অন্ধ মানুষের যেমন তার হারানো বস্তু সাগরের অতল জলে খোঁজা, আমারও অবস্থা তাই হয়েছে! একটা বনে হারানো সদ্যপ্রসূত শিশুর অবস্থা হয়েছে আমার, আর তুমি...তা যাক, ইনিয়লড, আমি একমনে ভাবছিলাম এখন; এইবার বেশ ভেবেচিন্তে কথা বল। পিলীয়াস আর তোমার মা, আমি যখন থাকিনা তখন আমার কথা কিছু বলাবলি করে না?...

ইনিয়লড

হাঁ, হাঁ, বাবা; ওরা সব সময়েই তোমার কথা বলে।

গোলড

আ!...আর আমার কথা কি বলে ওরা?

ইনিয়লড

ওরা বলে যে বড় হলে আমি তোমারই মত লম্বা হব।

গোলড

তুমি কি সব সময়েই ওদের কাছে থাক ?

ইনিয়লড

হাঁ, হাঁ ; সব সময়েই, সব সময়েই, বাবা।

গোলড

ওরা কখনও তোমাকে অন্য যায়গায় যেয়ে খেলা করতে বলে না ?

ইনিয়লড

না, বাবা ; আমি ওখানে না থাকলে ওরা ভয় পায়।

গোলড

ওরা ভয় পায় ?...কিসে বুঝলে ওরা ভয় পায় ?

ইনিয়লড

মা কেবলই বলে ; যেয়োনা, যেয়োনা...ওরা অসুখী, আর তবুও ওরা হাসে...

গোলড

কিন্তু তাতে প্রমাণ হয়না যে ওরা ভয় পায়...

ইনিয়লড

হাঁ, হাঁ, বাবা ; মা ভয় পায়...

গোলড

কিসে বলছ তুমি যে সে ভয় পায় ?

ইনিয়লড

ওরা অন্ধকারে কেবলই কাঁদে।

গোলড

আ ! আ !...

ইনিয়লড

তাতে আমারও কান্না পায়...

গোলড

হাঁ, হাঁ...

ইনিয়লড

মা খুব ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে, বাবা।

গোলড

আ ! আ !···ধৈর্য্য দাও, ভগবান, ধৈর্য্য দাও ··

ইনিয়লড

কি বলছ, বাবা ?

গোলড

কিছু না, কিছু না।—বনে একটা নেকড়ে বাঘ যেতে দেখলাম।—তা হলে ওদের মধ্যে খুব ভাব হয়েছে ?—ওদের মধ্যে খুব মিল হয়েছে শুনে খুসী হলাম।—সময় সময় ওরা চুমু খায় ?—না...

ইনিয়লড

ওরা চুমু খায় কিনা, বাবা ?—না, না,—আ ! হাঁ, বাবা, হাঁ, হাঁ, একবার...একবার যখন বৃষ্টি হচ্ছিল...

গোলড

চুমু খেয়েছিল ওরা—কিন্তু কেমন করে চুমু খেয়েছিল ?—

ইনিয়লড

এই রকম করে, বাবা, এই রকম করে !...[গোলডকে চুম্বন করিল, হাসিতে হাসিতে] আ ! আ ! কি দাড়ি তোমার, বাবা !···এতে খোঁচা লাগে ! খোঁচা লাগে ! খোঁচা লাগে ! এগুলোয় বেশ পাক ধরেছে, বাবা, আর তোমার চুলেতেও ; বেশ পাক ধরেছে, সব পাক ধরেছে ...[যে জানালার নীচে তাহারা বসিয়া রহিয়াছে তাহা এই সময় আলোকিত হইল, আর উহা হইতে আলো তাহাদের উপর পড়িল।] আ ! আ ! মা তার প্রদীপ জ্বেলেছে ! এখন আলো হয়েছে, বাবা, আলো হয়েছে !...

গোলড

হাঁ ; আলো আরম্ভ হয়েছে...

ইনিয়লড

চল আমরাও ওখানে যাই, বাবা ; চল আমরাও ওখানে যাই...

গোলড

কোথায় যেতে চাও তুমি ?

ইনিয়লড

যেখানে আলো রয়েছে, বাবা।

গোলড

না, না ; ইনিয়লড, এই আলো-আঁধারে আমরা আরও কিছুক্ষণ থাকি এস...কেউ বলতে পারে না, কেউ বলতে পারে না এখনও · ঐ দূরে বনের ভিতর ঐ গরীব বেচারারা একটু আগুন করবার চেষ্টা করছে দেখতে

পাচ্ছ ?—খানিক আগে বৃষ্টি পড়ছিল। আর ঐ ওধারে, সমস্ত পথটা জুড়ে ঝড়ে-ফেলা গাছটা মাঝপথে পড়ে রয়েছে, আর ঐ বুড়ো মালিটা সেটা তোলবার চেষ্টা করছে, দেখতে পাচ্ছ ?—ও তা পারবেই না; গাছটা মস্ত বড়; গাছটা ভয়ানক ভারী, যেখানে পড়েছে সেইখানেই ওটা নিশ্চয়ই থাকবে। তার আর কোনই প্রতিকার নেই...আমার মনে হয় পিলীয়াস পাগল হয়েছে...

ইনিয়লড

না, বাবা, পাগল নয়, বরং মনটা ওর খুব ভাল।

গোলড

তোমার মাকে দেখতে চাও ?

ইনিয়লড

হাঁ, হাঁ; দেখতে চাই আমি !

গোলড

গোল কোরো না; জানালার কাছে আমি তোমাকে তুলে ধরব। আমি নিজে ওটার লাগাল পাই না, যদিও আমি এত বড়...[ইনিয়লডকে তুলিয়া লইলেন।] একটুও গোল কোরো না; তোমার মা তা হলে ভয়ানক ভয় পাবে...তাকে দেখতে পাচ্ছ ?—ঘরে রয়েছে সে ?

ইনিয়লড

হাঁ...ওঃ! খুব আলো !

গোলড

একা রয়েছে ও ?

ইনিয়লড

হাঁ...না, না; আমার কাকা পিলীয়াসও ওখানে রয়েছে।

গোলড

পিলীয়াস !...

ইনিয়লড

আঃ! আঃ! বাবা! আমায় তুমি লাগিয়ে দিচ্ছ !...

গোলড

তা হোক; চুপ কর। আর করব না; দেখ, দেখ, ইনিয়লড !...আমি হোঁচট খেয়েছিলাম; আরও আস্তে কথা বল। কি করছে ওরা ?—

ইনিয়লড

ওরা কিছু করছে না, বাবা; ওরা কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

গোলড

ওরা কি কাছাকাছি বসে আছে ?

ইনিয়লড

না বাবা।

গোলড

আর...আর বিছানাটা ? বিছানার কাছে কি রয়েছে ওরা ?

ইনিয়লড

বিছানা, বাবা ?—বিছানা ত আমি দেখছি না।

গোলড

আরও আস্তে, আরও আস্তে; তোমার কথা ওরা শুনতে পাবে। কিছু কথা বলছে কি ওরা ?

ইনিয়লড

না, বাবা; ওরা কিছু কথা বলছে না।

গোলড

কিন্তু করছে কি ওরা ?—কিছু একটা করছে ত নিশ্চয়...

ইনিয়লড

ওরা আলোটা দেখছে।

গোলড

দুই জনেই ?

ইনিয়লড

হাঁ, বাবা।

গোলড

আর কথা বলছে না ?

ইনিয়লড

না, বাবা; ওরা একবারও চোখ বন্ধ করে নি।

গোলড

ওরা এ ওর কাছে যাচ্ছে না ?

ইনিয়লড

না, বাবা; ওরা নড়েনি একটুও।

গোলড

বসে রয়েছে ?

ইনিয়লড

না, বাবা; দেওয়ালের সুমুখে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গোলড

ওরা একটুও নড়ছে চরছে না ?—ওরা এ ওর দিকে তাকিয়ে নেই ?—কিছু ইসারা করছে না ?...

ইনিয়লড

না, বাবা :—ওঃ ! ওঃ ! বাবা, ওরা একবারও চোখ বন্ধ করে না...আমার ভয়ানক ভয় পাচ্ছে...

গোলড

চুপ করে থাক। এখনও নড়েনি ওরা ?

ইনিয়লড

না, বাবা—আমার ভয় পাচ্ছে ; বাবা, আমায় নামিয়ে দাও !...

গোলড

ভয় কিসের ?—দেখ ! দেখ !...

ইনিয়লড

আর দেখতে আমার সাহস হচ্ছে না, বাবা !...আমায় নামিয়ে দাও !...

গোলড

দেখ ! দেখ !...

ইনিয়লড

ওঃ ! ওঃ। আমি চেঁচাব এইবার, বাবা !.. আমায় নামিয়ে দাও ! আমায় নামিয়ে দাও !...

গোলড

এস ; আমরা যেয়ে দেখি কি হয়েছে।

[প্রস্থান]

(ক্রমশ)

সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

দেওয়ানার কবর

(গল্প)

সে আজ অনেক দিনের কথা। প্রয়াগে সূর্য্যকুণ্ডের কাছে এখন যেখানে "ইঙ্গবঙ্গ বিদ্যালয়" স্থাপিত হয়েছে তারি কাছে খুব বড় একটা মাঠ ছিল। সেই মাঠের পাশ দিয়ে একটা সরু নির্জ্জন রাস্তা অনেকদূর পর্য্যন্ত চলে গেছে, সেই রাস্তার ওপরে একটি শিবমন্দির। যে যা কামনা করে' তার কাছে যায় প্রায় তা বিফল হয় না, এই ধারণায় সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে "কামনেশ্বর মহাদেব" বলে। ছোটবেলার যে দাই আমাকে ও আমার ছোট ভাইবোনদের মানুষ করেছিল, তাকে আমরা, "মোতিয়ার মা" বলে ডাকতাম ; এই স্থানটির ওপরে তার বিশেষ ভক্তি থাকায় সে প্রায়ই বিকালে বেড়াতে যাবার সময় আমাদের এইখানে নিয়ে আসত। তখন একটি সুন্দর কবর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সেখানে আর কোন বিশেষ দর্শনীয় বস্তু না থাকায় এই কবরটির ওপর আমাদের বড় স্নেহ হয়েছিল। সন্ধ্যার পর মন্দিরে দেবতার আরতি হয়ে গেলে আমরা বাড়ী ফিরতাম, তখন দেখতাম কে সেই সমাধিটি ফুলে ও মালায় সাজিয়ে একটি আলো জ্বালিয়ে রেখে গেছে। সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় জনমানবহীন প্রান্তরে সেই একমাত্র আলোকটি দেখে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে কি এক কৌতূহলমিশ্রিত ভয়ের ভাব জেগে উঠত। কার এ সমাধি ? কে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই সমাধিতে আলো জ্বালিয়ে কার স্মৃতি জাগিয়ে রাখে ?

তার পরে কতদিন কেটে গেছে। ছোটবেলার সব খেলাধূলা সাঙ্গ করে নূতন সংসারে প্রবেশ করেছি। নূতনের আনন্দে নূতন উত্তেজনায় ছেলেবেলাকার সব ছোটখাট স্মৃতি কোথায় ডুবে গেছে। বহুদিন পরে আর-একবার এলাহাবাদে গিয়েছিলাম। সেই সময় একদিন হঠাৎ সেই বাল্যের চির-পরিচিত প্রিয়স্থানগুলি দেখবার জন্যে মনে আকুল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। বুড়ী দাই "মোতিয়ার মা" তখনও আমাদের বাড়ী আসত। তার সঙ্গে অনেক জায়গায় বেড়িয়ে যেদিন "কামনেশ্বর মহাদেব" দেখতে গেলাম, তখন পথে বহুদিনের পর আবার সেই সমাধিটি দেখে মনে অনেক কথা জেগে উঠল। দাইকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম সেটি কোনো দেওয়ানার কবর। সে দিন রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে মোতিয়ার মার কাছে সেই দেওয়ানার কাহিনী সবিস্তারে শুনলাম।

(২)

নাম ছিল তার আমীর। সঙ্গতিপন্ন ঘরেই তার জন্ম হয়েছিল, কিন্তু সে-বংশের খ্যাতি রাখবার মত প্রকৃতি

তার মোটেই ছিল না। জ্ঞানের উদয় অবধি সে কোনও বিশেষ নিয়ম বা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারত না। যে সময় তার অন্য অন্য ভাইরা লেখা পড়া করত, সে তখন মুক্ত আকাশের নীচে মাঠে মাঠে নদীর ধারে খোলা প্রাণে গান গেয়ে বেড়াতে ভালবাসত। যে তাকে দেখত সেই তাকে ভালবাসত। এই সুন্দর আত্মভোলা ছেলেটিকে দেখে পল্লীনারীরা তাকে কত আদর যত্ন করত, তাদের ঘরে সামান্য যা খাবার থাকত তাকে খাইয়ে তারা কত আনন্দ পেত; সেও খুব আনন্দে তাদের আতিথ্য স্বীকার করে তাদের সঙ্গে কত গল্প করত, গান শোনাত। ক্রমে যত তার বয়স বাড়তে লাগল ততই এইরূপ খেয়াল বাড়তে লাগল। মা বাপে বিস্তর চেষ্টা করেও তাকে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেওয়াতে বা কোনও কাজকর্ম্মে নিযুক্ত করতে পারলেন না।

একদিন বিকালে আমীর একলা যমুনাতীরে বসে ছিল। অস্তগামী সূর্য্যের লাল আভা আকাশে প্রতিফলিত হয়ে বিবিধ বিচিত্র বর্ণের মেঘের সৃষ্টি করেছে। সান্ধ্যসমীরণ সেবন করতে কত লোক নদীতীরে বেড়াতে এসেছে ও পরস্পর গল্প করতে করতে হেসে উঠছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা চারিদিকে ছুটোছুটি করে খেলা করে বেড়াচ্ছে। আমীর নিস্তব্ধ হয়ে বসে এইসব দেখছিল। হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে তার দুচোখ টিপে ধরলে। আমীর বল্লে "আর কে, নিশ্চয়ই জামীর! ছাড়, চোখ খোল।" জামীর তখন উচ্চহাস্য করে' তাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, আমীরও দ্রুত উঠে তার গলা টিপে দু-চারিটি ঘুঁসি উপহার দিলে। পরে দুজনেই হাসতে হাসতে এক জায়গায় বসে পড়ল। জামীর বল্লে "তোমায় যে এতক্ষণ কত খুঁজেছি তা বলতে পারি নে, কোন দিকে না পেয়ে শেষ এদিকে এলাম।" আমীর এর উত্তরে কিছু না বলে হাসতে লাগল।

তখন তার বন্ধু রাগ করে বল্লে "হাসলে যে বড়? কি দরকার সেটা একবার জিজ্ঞাসা করা হ'ল না?"

আমীর বল্লে "ওর আর কি জিজ্ঞাসা করব, তোমাকে ত আমার জানা আছে।"

জামীর বল্লে "না না তা নয়। সত্য সত্য আজ তোমার বাবা আমায় সকালে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বল্লেন তোমার বয়স হল, লেখাপড়াও ভাল করে শিখলে না, কাজকর্ম্মেও মন দেবে না, খালি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে আর যত অনাসৃষ্টি রকম পাগলামি করবে। তা এরকম আর কতদিন চলবে?"

আমীর বল্লে "আমি কি পাগল? আর পাগলামি বা আমি কি করে থাকি? ওসব কথা ত পুরোনো হয়ে গেছে, ওর আর কি উত্তর আছে? আমি ত কতদিন বলেছি যে ওসবে আমার মন বসে না তাই আমি কিছু করতে পাল্লুম না। বাবাকে বোলো দাদারা ত সব মানুষ হয়েছে, তা হলেই হল। আমার দ্বারা যা হবে না তার জন্যে কেন তিনি কষ্ট পান?"

জামীর বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে "তুমি ত জলের মত এ কথা বলে দিলে, তাঁর প্রাণ কি তা বোঝে? তুমি যখন শিশু, তোমার মা মারা গেলেন, তখন থেকে কত যত্নে কত স্নেহে তিনি তোমায় মানুষ করেছেন তা ত জান? তুমি এমন করে সংসারে উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াও এতে তাঁর কষ্ট হয়। আজ তিনি আমায় ডেকে বল্লেন 'দেখ জামীর, আমার এই মাথা-পাগলা ছেলেটিকে তুমি বুঝিয়ে সংসারী করবার চেষ্টা কর, ও ত তোমার কথা শোনে, তোমাকে খুব ভালবাসে, হয়ত তোমার কথা রাখতে পারে। তাকে বোলো যে তাকে ত খেটে খেতে হবে না; কাজকর্ম্ম না করে, না করবে। তবে বিবাহ করুক সংসারী হোক এইটেই আমার শেষ জীবনের একমাত্র কামনা!' আর আমিও বলি বয়েস ত তোমার কম হল না, এমন করে আর কতদিন কাটাবে? বিবাহ করে সংসারী হও, বাপকে সুখী কর। আমরা সকলেই তা হলে খুসী হব।"

আমীর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে গম্ভীরভাবে বল্লে "বিয়ে করতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে এখন নয়, যখন সে ইচ্ছা হবে আর যাকে আমার প্রাণ চায় তাকে যখন পাব তখন বিয়ের কথা বিবেচনা করা যাবে।"

জামীর তখন বিস্মিত হয়ে বল্লে "প্রাণ আবার তোমার কাকে চায়? একথা কই এতদিন ত শুনিনি।"

আমীর তখন গুনগুন করে গাইলে—

"মন ভায়ো রে সামালিয়া, মন ভায়োরে বাঁকেয়া,
সাঁওলি সূরত মোহিনী মুরত
হৃদো বীচো-মে সামায়া
হৃদো বীচো-মে সামায়া রে বাঁকেয়া।"

তখন আমীর হাসিয়া বলিল, "প্রেমিকবর! এ মোহিনী-মুরতখানি কার?

আমীর স্বর উচ্চে তুলিয়া গাহিল—

"জল-মে স্থল-মে তন্-মে মন্-মে
আপয় রে সামায়া রে বাঁকেয়া।"

তখন তার উচ্চমধুর কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে এসে তাকে ঘিরে ফেললে। প্রয়াগের ইতর ভদ্র সব শ্রেণীর লোকেরই সে বিশেষ পরিচিত ছিল। সকলের সঙ্গে সে নির্ব্বিবাদে মিশতে পারত, আর তার সদানন্দ প্রকৃতির গুণে সে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার স্নেহের পাত্র ছিল, সবাই এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল! একজন বল্লে "আজ এই যমুনাতীরেই আমাদের সান্ধ্যসমিতি বসুক। এই-খানেই আজ আমরা আমীরের গান শুনব।"

তখন আমীরের সব চেষ্টা বিফল হল। সে তার বক্তব্যবিষয় বলবার আর সময় পেলে না, বন্ধুরা এক-একজনে আমীরকে এক-এক রকম গান গাইতে অনুরোধ করতে লাগল। সঙ্গীতপ্রিয় আমীর বন্ধুদের এরূপ অনুরোধ ও আব্দারে অভ্যস্ত ছিল, সে সকলের কথা মেনে নিয়ে করুণ-প্রণয়ের গান গাইতে লাগল। গানের ছত্রে ছত্রে কি আকুলতা কি নিরাশা কি অতৃপ্তি বাজ্‌তে লাগল, সকলের অন্তর যেন কোন অজ্ঞাত দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল, যেন সে স্থানের আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সর্ব্বত্র সেই নিরাশ প্রণয়ের করুণ বিলাপ ভাসতে লাগল! গান শেষ হয়ে গেলেও কতক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরবে বসে রইল। আমীরের মধুর কণ্ঠে সেই-সব মধুরতর প্রেমের গান তার সহচরবৃন্দের তরুণ হৃদয়ে নানা ভাবের তরঙ্গ তুলে শত আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করছিল। কিন্তু তারা তাকে আর বেশিক্ষণ থামবার অবসর দিচ্ছিল না। একটার পর একটা গান হতে হতে ক্রমশ যে রাত্রি গভীর হয়ে যাচ্ছিল তা তাদের চৈতন্য ছিল না। অবশেষে যখন গীর্জ্জার ঘড়ীতে বার-টার ঘণ্টা বেজে উঠল তখন সেদিনকার মত তাদের নৈশসভা ভঙ্গ হল।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। আমীরের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সহরের প্রত্যেক পল্লীতেই সে পরিচিত ছিল। দিনের অধিকাংশ সময়ই সে প্রায় বন্ধুবান্ধবদের গৃহেই কাটিয়ে দিত। সন্ধ্যার পর কখন যমুনাতটে, কখন বা লক্ষ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে তার প্রিয় গানগুলি উচ্চকণ্ঠে গেয়ে বেড়াত। দ্বিপ্রহর রাতে যখন প্রত্যেক পল্লীর নরনারী ঘুমিয়ে পড়েছে, নিস্তব্ধ পথ জ্যোৎস্নার সুধাধারায় প্লাবিত, পথে ঘাটে জনমানবের চিহ্নমাত্রও নেই, তখন হয়ত সেই নিঝুম রাতে সে একা পথে পথে মনের আনন্দে গেয়ে বেড়াচ্ছে "মন ভায়োরে বাঁকেয়া।" কতদিন তার কত বন্ধু-বান্ধবেরা অর্দ্ধেক রাতে তন্দ্রাঘোরে তার গান শুনতে পেত

"জলমে স্থলমে তনমে মনমে আপয় রে সামায়া।"

কাকে সে খুঁজে বেড়ায়? কার মোহিনী প্রতিমা তাকে পাগল করে তুলেছিল, যার সুন্দররূপ সে অনুক্ষণ জলে, স্থলে, শূন্যে, নিজের অন্তরে চারিদিকে বিরাজিত দেখতে পেত? কে সে তার মানসী সুন্দরী?

আবার কতদিন হয়ত বর্ষার সময় যখন ভয়ানক বৃষ্টি পড়ছে, আকাশে গভীর কালো মেঘের স্তর চারি-দিক অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে, থেকে থেকে সেই অন্ধ-কারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর কড়কড় করে মেঘ ডাকছে, সেই মেঘ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে এক-একবার তার স্বর বাতাসে ভেসে আসত—

"বর্ষণ লাগি বুঁদনওয়া।"

কেউ যদি তার কণ্ঠস্বর শুনে জানালা খুলে দেখত তা হলে হয়ত দেখতে পেত সে পথের পাশে কোন গাছতলায় বা কারও বাড়ীর নীচে একটু স্থান করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর মনের আনন্দে গান করছে। হয়ত তখন তার মাথা বেয়ে গা বেয়ে জল পড়ছে, কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলগুলি কালো কালো সাপের ছানার মত থেকে থেকে ফণা তুলে নেচে নেচে উঠছে, তার

চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, তার সেসবদিকে দৃকপাত নেই। প্রকৃতির এই রুদ্রমূর্ত্তি দেখে তার প্রাণ তখন অপার আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠেছে। তার কোন বন্ধুবান্ধব তাকে সে অবস্থায় দেখতে পেলে টেনে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার গা মাথা মুছিয়ে দিত। প্রকৃতি-দেবীর এই প্রিয় সন্তানটিকে সকলেই পাগল বলে স্নেহ যত্ন করত। সে যেন একটি শিশু, সকলের আদর যেন তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যেই উৎসুক হয়ে থাকে!

(৩)

কার্ত্তিক মাস, এ মাসটিতে যমুনাতীরে বড় জাঁক-জমক। মাসভোর যমুনার ঘাটে মেলা বসে। এ মাসে প্রত্যহ যমুনায় স্নান করা মহা পুণ্যের কাজ, তাই স্নানার্থী নরনারীর ভিড় হয় খুবই। স্নাতদের কপালে, বুকে, বাহুতে, সর্ব্বাঙ্গে নানা চিত্রবিচিত্র চন্দনের ছাপ এঁকে দেবার জন্যে ঘাটিয়াল ঠাকুররা মহা আড়ম্বরে স্নানের ঘাটে জেঁকে বসেছেন। এ মাসটি তাঁদের বেশ লাভজনক।

স্নানার্থীদের মধ্যে নর অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। সুন্দরীরা স্নানে নেবে নানারঙ্গে কিছুক্ষণ জলে ডুবে থেকে সিক্ত বস্ত্রে ঘাটে উঠছে, তার পর গা মাথা মুছে শুষ্ক বস্ত্র পরে ঘাটিয়াল ঠাকুরদের কাছে সিঁদুর ও চন্দনে সুশোভিতা হয়ে তাঁদের দক্ষিণাদানে সন্তুষ্ট করে ঘাট থেকে ফিরে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি গল্পেরও বিশ্রাম নেই। একদল যাচ্ছে, আর-একদল আসছে। জনতার বিরাম নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি, রমণীদের হাস্যকৌতুক, ফেরীওয়ালাদের হাঁকাহাঁকি, আর অসংখ্য ভিক্ষার্থীদের অবিশ্রান্ত কলরবে মেলাস্থল সর্ব্বক্ষণ সরগরম হয়ে আছে।

একদিন যমুনাতীরে মেলা দেখবার জন্যে আমীর ও জামীর দুই বন্ধুতে গিয়েছিল। তারা উভয়ে নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে অনেক দৃশ্য দেখে বেড়াচ্ছিল আর আপনারা হাস্য-পরিহাস করছিল। ক্রমশ যখন বেলা বেশী হল তখন তারা স্নানের ঘাট থেকে অনেক দূরে যেয়ে তীর থেকে সশব্দে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর দুজনে মিলে সাঁতার দিয়ে জলের ভিতর লাফালাফি করে জল তোলপাড় করে তুললে। কখনও যদি তাদের গায়ের জল পার্শ্বস্থিত কোন স্ত্রীলোকের গায়ে লাগছিল তখন সে বিরক্ত হয়ে তাদের গালাগালি দিলে তাদের উচ্চহাস্য আরও উচ্চতর হয়ে উঠছিল। প্রায় দুঘণ্টাকাল এই রকমে কাটিয়ে অবশেষে তারা তীরে উঠল। আমীর গলা ছেড়ে গান ধরে' মুগ্ধ মেলার জনতা ঠেলে বাড়ী ফিরছিল, হঠাৎ আমীরের উচ্চকণ্ঠের মধুরসঙ্গীত থেমে গেল। সে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল আর নিস্পন্দভাবে ঘাটের দিকে চেয়ে রইল। জামীর তার এই ভাবান্তরের কারণ না বুঝতে পেরে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলে যেখানে ঘাটিয়াল ঠাকুররা রমণীদের ললাটে নানাছাঁদে চন্দন-রেখা অঙ্কিত করছেন সেখানে অপূর্ব্ব দৃশ্য! একটি চম্পকবর্ণা গৌরী ষোড়শী স্নান শেষ করে দাঁড়িয়ে আছে আর তার বয়ীয়সী সঙ্গিনী দুজন তখন পাণ্ডা-ঠাকুরদের সাহায্যে অলকা তিলকা কাটছে। কিশোরীর নিরুপম সৌন্দর্য্য আমীরের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে তুলেছিল। তার সেই এলোচুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, একখানি আশমানী রংএর শাড়ী সেই সুগৌর কোমল তনুখানি বেষ্টন করে তার স্বাভাবিক শোভা যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সে অন্যমনস্কভাবে যমুনার কালো জলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমীর সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আর দৃষ্টি ফেরাতে পারলে না। তার মনে তখন কি ভাবের উদয় হচ্ছিল, কি সে দেখছিল তার কিছুই জ্ঞানচৈতন্য ছিল না। শুধু সে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার দিকে চেয়ে ছিল, আর তখন তার মনের ভিতর থেকে কে যেন ডেকে ডেকে বলছিল "তুমি যাকে খুঁজে বেড়াতে সে এই! সে এই! সে এই!" যুগযুগান্তর পূর্ব্ব হতে তার প্রাণ যাকে চাচ্ছিল আজ এই কিশোরীকে দেখবামাত্রই যেন তার মনে হল এই সেই মানসী সুন্দরী! আজ তার অজ্ঞাতে তার যৌবন জেগে উঠেছে! হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেম এতদিন সুপ্তভাবে ছিল আজ কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে তা সহসা জেগে উঠেছে! হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব নবভাবের পুলকে স্পন্দনে উত্তেজনায় আমীর তখন বিভোর। জামীর তার বন্ধুর এই নিস্পন্দভাব

দেখে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে পথের উপর এল। ইতিমধ্যে কিশোরীর সঙ্গিনীদের প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন হল; তখন তারাও তিনজনে এগিয়ে এল। পথের উপর একখানি সুসজ্জিত গাড়ী অপেক্ষা করছিল, আর দুইজন দ্বারবান গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। স্ত্রীলোকেরা নিকটে আসায় দ্বারবান সসম্ভ্রমে গাড়ীর দ্বার খুলে দিলে। তারা আরোহণ করলে গাড়ী বিদ্যুৎগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। জামীর ও আমীর পথের উপর দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখলে। যখন গাড়ী আর দেখা গেল না তখন গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমীর জামীরের হাত ছাড়িয়ে সেইখানে বসে পড়ল।

জামীর তখন বল্লে "তোমার কি হয়েছে? এমন করছ কেন?" আমীর কিছুই বলতে পারলে না। জামীর তখন ভীত হয়ে তাকে বার বার জিজ্ঞাসা করাতে অবশেষে আমীর গেয়ে উঠল—

"জলমে স্থলমে তনমে মনমে
আপয় রে সামায়া রে বাঁকেয়া।
সাওলী সূরত মোহিনী মূরত,
হৃদো বীচো-মে সমায়া
হৃদো বীচো-মে সমায়া রে বাঁকেয়া,
মন ভয়ো রে সামলিয়া, মন ভয়োরে বাঁকেয়া!

জামীর বল্লে "সর্ব্বনাশ! ও যে এখানকার বিখ্যাত কুঠিয়াল মাধোপ্রসাদ শেঠের মেয়ে!" জামীর তার অবস্থা দেখে প্রমাদ গণলে। তার বন্ধুর প্রকৃতি সে বেশ ভাল রকমেই জানত। তার সেই সবল সুগঠিত দীর্ঘ দেহটির ভিতর যে একখানি অতি কোমল প্রেমপ্রবণ হৃদয় ছিল তা সে বিশেষ ভাবে জানত বলেই আজ বন্ধুর এই ভাবান্তর তাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছিল।

তার পরে আর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এ কয়দিনে আমীরের ঘোর পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে আর তার বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে পারে না, গল্প করতে পারে না, কিছুই তার ভাল লাগে না। কথায় কথায় তার প্রাণখোলা উচ্চহাসি আর সেই প্রাণমাতান গান সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মুখ শুষ্ক, দৃষ্টি উদাস লক্ষ্যহীন, কি সে চায় কি তার অভাব কেউ জিজ্ঞাসা করে কিছু উত্তর পায় না। তার দৃষ্টি সদাই চঞ্চল হয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, কি যেন তার পরম প্রিয়ধন হারিয়েছে! তার মুখ দেখলে তার বন্ধুদের বুক ফেটে কান্না আসে। তারা ভাবে নিশ্চয় ওর কি রোগ হয়েছে। তারা তাকে হাকিমের কাছে নিয়ে যেতে চায়, ওঝা গুণী দেখাতে চায়, ঝাড় ফুঁক করাতে চায়, কিন্তু সে কথা সে কানেও তোলে না! শুধু জামীর সব বোঝে, আর এর পরিণাম যে কি শোচনীয় হবে তা ভেবে ভেবে গুমরে গুমরে বুকফাটা কান্না কাঁদে যখন অবসর পায় তখন সে আমীরকে কত বোঝায়, যে, এ দুরাশা মনে স্থান দিও না, কারণ এ আশা কখন সফল হবে না। সে হিন্দুকন্যা, বিবাহিতা, মুসলমান যুবকের এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন? আমীর তার কোন উত্তর দেয় না, কিন্তু তার মুখ দেখলে সে বুঝতে পারে যে তার কোন কথা আমীরের অন্তরে প্রবেশ করে নি। কি করলে তার বন্ধুর এ মনের বিকার কাটবে তা সে ভেবে পায় না! একদিন সকালে আমীর তাদের বাড়ীতে একলা বসে আছে। মনে আর অন্য কোনও চিন্তা নেই, কেবল সেই তরুণীর মুখখানি হৃদয়ে জাগছে। এ একসপ্তাহ সে অনেক ভেবেছে, অনেক উপায় স্থির করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার কোনটাই ফলবতী হয় নি। যাকে সে ভাল বেসেছে তাকে যে পাবার কোন আশাই নেই তা সে বুঝেছে, কিন্তু তার নিজের মনও আর তার বশে নেই, অনিশ্চিত আশা ছেড়ে আবার আগের মত সদানন্দভাব ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তাও সে বেশ বুঝেছে। তবে এখন তার উপায় কি হবে? কি করে তার সারা জীবন কাটবে? গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমীর একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে কি সুন্দর এই পৃথিবী! এই পত্রপুষ্পে শোভিতা হাস্যময়ী বসুন্ধরা, মাথার উপরে এই সুনীল আকাশমণ্ডল, চারিদিকের এই আনন্দস্রোত, সবই কি সুন্দর! কিন্তু হায়! তার প্রাণ কেঁদে কেঁদে বলে উঠল—এসব সুন্দর নয় সুন্দর নয়! সুন্দর যে তাকে একটিবার দেখতে পাবারও কোনো সম্ভাবনা নেই, কোনো উপায় নেই! ঝর ঝর করে তার চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সে শান্ত হয়ে ভাবলে আমি যদি

তাকে দুর থেকে এক একবার দেখতে পাই তাহলে আর কিছু চাই না। নাই বা তাকে কাছে পেলাম। আমি নিজের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে ভালবাসব আর যদি দুর থেকে দিনান্তে এক একবার দেখতে পাই তবেই আমার সব দুঃখের উপশম হবে। এই কথা মনে হবামাত্র আর সে স্থির থাকতে পারলে না! একবার সেই তরুণীর মুখখানি দেখবার জন্যে তার হৃদয় আকুল হয়ে উঠল। সে শেঠজীর বাড়ীর দিকে চলল।

আমীর শেঠজীর বাড়ীর চার পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে কোথাও কারও দেখা পেলে না। তখন তার মন আরও ভেঙ্গে পড়্‌ল। বাড়ীর সামনে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। শ্রান্ত অবসন্ন দেহে সেই গাছতলায় বসে পড়ল, তার অন্তরের আকুল বেদনা তার আর্ত্ত কাতরকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল—

—"তেরে আশক মে প্যারে! মেরা বালপন টুটা।"

সে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে এই গানটি গাইছিল। তার হৃদয়ের দারুণ বিষাদ ও নিরাশা তার গানের ভিতর হতে ব্যক্ত হচ্ছিল। পথিক দু-চার জন পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে তার গান শুনে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ শেঠের বাড়ীর দোতলার একটি জানলা খুলে গেল। পথে কে এমন মধুর কণ্ঠে গান গায় দেখবার জন্যে শেঠজীর কন্যা ললিতা জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। আমীরের আশা পূর্ণ হল। তার পিপাসিত নেত্রের সম্মুখে উপাসকের আরাধ্যা দেবীপ্রতিমার মত যখন ললিতা এসে দাঁড়াল তখন আনন্দে তার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্নানের ঘাটে বিদ্যুচ্চমকের মত একবার যাকে দেখে সে হৃদয় হারিয়েছিল, আজ এক সপ্তাহ শয়নে স্বপনে জাগরণে যার চিন্তায় সে তন্ময় হয়ে ছিল, হঠাৎ তাকে সামনে দেখে অপূর্ব্ব আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে গেল। তার কণ্ঠের গান থেমে গেল, সে শুধু নিষ্পলক নেত্রে সেই জানলার দিকে চেয়ে রইল। ললিতাও অবাক হয়ে গাছতলায় এই অপূর্ব্বদর্শন যুবককে দেখছিল। তার সেই নিরুপম সুন্দররূপ ও পরিষ্কার বেশভূষায় তাকে সাধারণ ভিখারী মনে করতে পারা যায় না, আবার ভদ্রলোক কে এমন করে ধুলায় বসে গান করে? সে কিছুই বুঝতে পারেনি, আর বোঝবার চেষ্টাও করেনি; তার মধুর গানে তাকে একেবারে নিস্পন্দ করে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ তারা দুজনেই দুজনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। পরে অপরিচিত পুরুষ একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে দেখে ললিতা জানলা বন্ধ করে চলে গেল। আমীরের অন্তর এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভরে গেল। শুধু এই উপায়ে সে তার প্রিয়তমাকে দেখতে পাবে তা সে বেশ বুঝতে পারলে।

সেই দিন থেকে সে তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ ছাড়লে। বাড়ীতে কিংবা যে-সব প্রিয়স্থানে তার গতিবিধি ছিল সে-সব জায়গায় আর তাকে দেখা যেত না। দিনের অধিকাংশ সময় তাকে সেই গাছতলায় দেখতে পাওয়া যেত। কখন বা সে সেই জানলার দিকে চেয়ে গাছতলায় পড়ে থাকত, কখনও বা সেখানে বসে আপনার মনে গান করত—

শাহাজাদে আলম তেরে লিয়ে
জঙ্গল সাহারা বিয়াবান ফিরে।
তন্ খাক মলে পহিনে কপনি,
সব যোগনকা সামাল কিয়ে।

দিন দিন তার চিত্তবিকার বাড়তে লাগল। কারো সঙ্গে কথা কওয়া মেশা সব সে ছেড়ে দিয়েছিল। স্নান আহারেরও তার কোন নিয়ম ছিল না। কত দিন হয়ত বাড়ীতে মোটে যেতই না। তার বাপের মৃত্যু হয়েছিল। ভাইরা তাকে ভালভাবে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলে, কিছুতেই তাকে বশে আনতে পারলে না। দেখতে দেখতে চারিদিকে রটে গেল বিখ্যাত ধনী লতিফখাঁর ছোট ছেলে উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে। এ সংবাদে প্রয়াগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে আঘাত লাগল। সেই যে প্রিয়দর্শন যুবকটি সর্ব্বদা আমোদে আহ্লাদে নাচে গানে সমস্ত সহর গুলজার করে রাখত, সহসা কেন যে সে এমন পাগল হয়ে গেল কেউ তা বুঝতে পারলে না। ললিতাও এ খবর শুনেছিল। যখনি গাছতলায় দেওয়ানার গানের সুর বেজে উঠত, অমনি সে যন্ত্রচালিতের মত জানলায় গিয়ে দাঁড়াত। দেওয়ানার অনিন্দ্য সুন্দর রূপ আর তার এমন উন্মত্ততা দেখে তার মনের মধ্যে কেমন করে উঠত, জানালায় দাঁড়িয়ে সে নিশ্বাস ফেলে ভাবত এমন

ধনীর সন্তান এর ত কোন দুঃখ কোন অভাব ছিল না, কেন এর এতকষ্ট কিসের, কিসের জন্যে এ এমন পাগল? আর যখন সে তার গান শুনত তখন সেই করুণ স্বরে তার মনে কি দুঃখের ভাব জেগে উঠত, কি এক বুক-ফাটা কান্নায় তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠত, তা সে নিজেই বুঝতে পারত না। পাগলকে দেখে আর তার লজ্জা হত না। গভীর দুঃখে ও সহানুভূতিতে তার হৃদয় কাতর হত, কখনও মনে হত ডেকে জিজ্ঞাসা করি কি ওর দুঃখ? আমীরের প্রাণে আর কোনো বেদনা ছিল না। যাকে তার প্রাণ চায় তাকে সে প্রতিদিনই দেখতে পায়, আর তার অন্তরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা গানের ভিতর দিয়ে তার চরণে নিবেদন করতে পায়, সেই তার পক্ষে যথেষ্ট। আর শুধু দেখতে পাওয়া নয়, সে প্রায়ই দেখত জানলায় দাঁড়িয়ে গভীর স্নেহময় দৃষ্টিতে ললিতা তার দিকে চেয়ে আছে—সে দৃষ্টিতে কি কোমলতা! কি মধুর প্রাণস্পর্শী করুণা! সেই স্নিগ্ধ-করুণ দৃষ্টিতে আমীরের তাপিত অন্তরের সব জ্বালা যে জুড়িয়ে যায়! কত সময় সে দেখত তার দুঃখময় গান শুনে ললিতার আয়ত নয়নদুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠত। তখন তার মনে কি আনন্দ! তার এই অনন্তদুঃখ ললিতার কোমল হৃদয় স্পর্শ করেছে এই তার আনন্দের কারণ! সে ভাবে আমার এই ভালো—ওগো আমার এইটুকুই ভালো! তোমাকে আমি প্রাণভরে দেখতে পেয়েছি, তুমি আমার দুঃখে কাতর হয়েছ, এইই আমার যথেষ্ট হয়েছে, আমি আর কিছু চাই না, আমি এমনি দূর থেকে তোমায় পূজা করব, তুমি এ দীনের পূজা এই ভাবেই গ্রহণ কোরো, তা হলেই আমি কৃতার্থ হব। ললিতার স্বাভাবিক কোমল স্নেহপ্রবণ মনটি এই অবোধ পাগলের দুঃখে একান্ত কাতর হয়েছিল, যেদিন আমীর তাকে কোনমতেই খাওয়াবার জন্যে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারত না সেদিন সে তাকে অনাহারে পড়ে থাকতে দেখে দাসীকে দিয়ে কত ভালো ভালো খাবার পাঠিয়ে দিত। আমীর তখন অসীম আগ্রহে ও আনন্দে দুহাত মেলে সেগুলি গ্রহণ করত।

এমনি করে কতদিন কেটে গেল। অবশেষে ললিতার "গৌণা" অর্থাৎ দ্বিরাগমনের দিন এল। যেদিন সে বাপের বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গাড়ীতে উঠল, তখন গাছতলার দিকে চেয়ে সে অসহায় পাগলের জন্যেও তার হৃদয়ের একাংশ হাহাকার করে উঠল—আহা বেচারা অসহায় পাগল! সে কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, তাকে যত্ন করবার কেউ নেই। সে তবু তাকে কতকটা স্নেহ যত্ন করত। পাগল তখন গাছতলায় ছিল না। সেই শূন্য গাছতলার দিকে চেয়ে চেয়ে ললিতা অশ্রুপাত করে চলে গেল। পাগল এ খবর জানতেও পারলে না। সে তখন আর কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সমস্ত দিন পরে বিকালে যখন সে তার স্থানটিতে এসে বসল তখন প্রতিদিনের মত জানলাটি খোলা দেখতে পেলে না। কতক্ষণ সেইদিকে চেয়ে চেয়ে সে বসে রইল, ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল, তবু সে জানলাটি কেউ খুললে না। রাত্রি হল, একটি একটি করে তারা ফুটে উঠল, চাঁদের আলোয় চারিদিক হাসতে লাগল, কিন্তু আজ কেউ সে জানলাটি খুললে না। সে তখন অধৈর্য্য হয়ে উঠতে লাগল—কি হল? কি হয়েছে আজ, ললিতা কেন এদিকে আসছে না? এমন ত কোন দিন হয় না? সে জানত তার গান শুনলে ললিতা যেখানে থাক জানলায় এসে দাঁড়াবে, আর সে স্থির থাকতে না পেরে উচ্চস্বরে গান ধরলে—

> তেরে নয়নওয়া যাদু ভরে,
> হম চিতওরত তুমে ভুলত নাহি,
> তড়পত হুঁ জইসে জলকি মছরিয়া—যাদু ভরে
> ময় তড়পত হুঁ দিন রয়ন সঁইয়া,
> অব তো গলেমে লগালে
> তড়প তড়প জিয়া যায়, বিন পিয়া কছু না সোহায়
> অব তো গলেমে লগালে সঁইয়া
> আপন পাশ বোলা লে!

কিন্তু আজ সবই বিফল হল। বার বার সে কত গান গাইলে, যে-সব গান ললিতার প্রিয় ছিল ফিরিয়ে ফিরিয়ে কতবার সেই গানগুলি গাইলে, কিন্তু আজ আর কেউ জানলায় তার গান শুনতে দাঁড়াল না। পাগলের মন আকুল হয়ে উঠল—তবে কি তার কোন অমঙ্গল ঘটেছে? কিছু অসুখ করেছে কি তার?—তাই সম্ভব,

সে কোথায় জ্বরের ঘোরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে, তার গানের সুর হয়ত তার কানেও যাচ্ছে না। পাগল অস্থির হয়ে শেঠের বাড়ীর চারদিক প্রদক্ষিণ করে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতে লাগল। কই! কোথাও কিছু শব্দ শোনা যায় না ত? বিষম উৎকণ্ঠায় কাতর হয়ে সে গাছতলায় পড়ে রাত কাটালে। ভাবতে লাগল সকালে নিশ্চয় কোন খবর পাওয়া যাবে। সকাল হল, প্রতিদিনের মত যে যার নিয়মিত কাজ আরম্ভ করলে, সে সতৃষ্ণ নয়নে বাড়ীটির দিকে চেয়ে বসে রইল। বেলা হল, শেঠজীর বাড়ীতে প্রতিদিনের মত কাজকর্ম্ম চলতে লাগল। কিন্তু পাগল যে আর মন শান্ত রাখতে পারে না! সে রাস্তার চারধারে বাড়ীর চারধারে ছুটে বেড়াতে লাগল, কোথায় ললিতার দেখা পাবে। কার কাছে তার খবর পাবে? সমস্ত রাত্রি জাগরণ, উপবাস ও মনের বিষম উদ্বেগে তাকে কাতর করে তুললে। এই ভাবে সেদিনও কেটে গেল। আবার সন্ধ্যা এল, শেঠজী গদি থেকে বাড়ী ফিরলেন, তাঁর বৈঠকে বন্ধুরা সব প্রতিদিনের মত এক এক করে জুটতে লাগলেন, তাঁদের উচ্চহাসি ও গল্প প্রতিদিনের মতই সমভাবে চলতে লাগল। নিরানন্দ পাগল কেবল নিস্তব্ধ হয়ে বসে। সংসার যেমন চলছিল তেমনই চলছে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি, কেবল তার কাছেই আজ সব শূন্যময়! আজ দু-দিন হয়ে গেল সেই জানলাটি কেউ খোলেনি, আজ দুদিন সে ললিতাকে একবারও দেখতে পায়নি, কি হল তার সে খবরটি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে আর সে কি আশায় মন বাঁধবে? মন কতকটা স্থির করবার জন্যে সে গান গাইতে চেষ্টা করলে, কিন্তু আজ আর তার কণ্ঠ থেকে কোন সুর বেরোতে চাইল না। বহুচেষ্টার পর যদিও সে গান ধরলে—

"মেরা দিল তো দেওয়ানা জান তেরে লিয়ে"—

কিন্তু সে গান তার যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের আর্ত্তনাদের মত শোনাতে লাগল। সে তখন ঘোর অবসন্ন হয়ে গাছতলায় পড়ে রইল। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল "কোথায়? আমার জীবনের আরাধনার ধন! আজ তুমি কোথায়? আজ দুদিন তোমার দেখা না পেয়ে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে। আমি ত কিছুই চাই না, কেবল দিনান্তে দূর থেকে তোমায় দেখেই আমি পরম আনন্দে ছিলাম, আমায় সেটুকু-থেকেও বঞ্চিত করলে?" এই ভাবে সে-রাতও তার সেই গাছতলায় কেটে গেল।

এদিকে দুদিন ধরে তাকে বাড়ীতে দেখতে না পেয়ে জামীর ভোরের বেলায় তাকে খুঁজতে এল। গাছতলায় ধূলার উপরে আমীরকে নিস্পন্দভাবে পড়ে থাকতে দেখে জামীরের চোখ ফেটে জল এল, সে গভীর স্নেহভরে তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে লাগল "আমীর! আমীর! ভাই আমীর!" কিন্তু আমীরের আর কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না। আমীরের সকল গানের অবসান হয়েছে!

দেখতে দেখতে এই হৃদয়বিদারক সংবাদ সহরময় ছড়িয়ে পড়ল। যে একথা শুনলে সেই তাকে মনে করে অশ্রুপাত করতে লাগল। জামীর আর আত্মীয়েরা এসে শবদেহ তুলে নিয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রান্তরে কবর দিলে। জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছিল, এখন এই নির্জ্জন শান্তিময় স্থানে সে মনের শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। প্রতিসন্ধ্যায় বন্ধুগতপ্রাণ জামীর সেই সমাধিটি ফুলের মালায় সাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে বন্ধুর উদ্দেশে অশ্রুবর্ষণ করত। দেওয়ানার এই শোকপূর্ণকাহিনী এলাহাবাদের অধিবাসীদের মনে বহুদিন জাগরূক ছিল।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

আলোচনা

[আলোচনা প্রবাসীর এক পৃষ্ঠা অর্থাৎ ৫০০ শব্দের বেশী হইলে প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। মূল প্রবন্ধকার শেষ জবাব দিলে তাহার পর সে আলোচনা বন্ধ হইল মনে করিতে হইবে।]

মহীপালপ্রসঙ্গ।

গত অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় কার্ত্তিকের প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার মহীপালপ্রসঙ্গ নামক প্রবন্ধটির বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশিত করিয়া আমাকে বিচার করিয়া দেখিতে এবং প্রবাসীর পাঠকগণকে জানাইতে লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের, বিশেষত ইতিহাসমূলক প্রবন্ধের যত বেশী আলোচনা হইয়া সত্য নির্দ্ধারিত হয় ততই মঙ্গল। আলোচনার সূত্রপাত যাহার প্রবন্ধ অবলম্বনে আরব্ধ হইয়াছিল তাহার এই বিষয়ে গুরুতর কর্ত্তব্য এই যে বিচার বিতর্কে যে সত্য নির্দ্ধারিত হয় তাহা মানিয়া লওয়া এবং ভুল হইয়া থাকিলে সর্ব্বসমক্ষে নিজের ভুল স্বীকার

করা। বহুদিন হয় আমাদের একজন ইতিহাসের অধ্যাপক ইতিহাসের উত্তরপত্রে ভুল উত্তর দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"জান? মিথ্যা প্রচার করা পাপ—এবং বহুকাল মৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মিথ্যা তথ্য লিপিবদ্ধ করা মহাপাপ?" মনের ভুলে ইতিহাসের উত্তরপত্রে ভুল লিখা গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করি না, এবং জ্ঞান ও বিচারশক্তির অভাব-হেতু ইতিহাস উদ্ধার করিতে যাইয়া ভুলপথে চলা এবং ভুল তথ্য প্রচার করা অসহ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য নাও হইতে পারে—কিন্তু নিজের ভুল বুঝিয়াও আত্মমত সমর্থন করিতে উদ্যত হওয়া অথবা পূর্ব্ব মত প্রত্যাহার না করা হেয় বলিয়া মনে করি।

বিনোদবাবু যে কয়েকটি বিষয়ে সংশয় উত্থাপন করিয়াছেন সেগুলির বিষয়ে যথাজ্ঞান নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

(১)

মহীপালের বাঘাউড়া লিপি কুমিল্লার ব্রাহ্মণবেড়িয়া সবডিভিসনের অন্তর্গত বাঘাউড়া গ্রাম হইতে ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের পুরাতত্ত্ব-সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বিএ, বি, টি, মহাশয় গত বৈশাখ মাসে আবিষ্কৃত করিয়াছেন। তাহার কিছু পরেই উপেন্দ্রবাবু 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে সেই লিপিবিষয়ক এক প্রবন্ধ ইংরেজীতে প্রকাশিত করেন। প্রবন্ধ-মধ্যে লিপিটির শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত এক পাঠ ছিল।

রাধাগোবিন্দ বাবু সময়ের অল্পতা- ও ব্যস্ততা-প্রযুক্ত লিপিটির বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করিতে না পারায়, এবং উপেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে লিপিটির প্রকৃত গুরুত্ব দেখান না হওয়ায় পরের মাসের Dacca Reviewতে আমি লিপিটির একটি শুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করিতে চেষ্টা করি এবং লিপিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝাইয়া দিই। বাঘাউড়া লিপির বিষয়ে আমার এক প্রবন্ধ শীঘ্রই এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। লিপিটি এই :—

(১ম) ও সম্বত্ ৩ মাঘদিনে ২৭ শ্রীমহীপাল দেব রাজ্যে
(২য়) কীর্ত্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারকাখ্যা সমতটে বিলকিন্দ
(৩য়) কীয় পরম বৈষ্ণবস্য বণিকলোকদত্তস্য বসুদত্তসুত
(৪র্থ) স্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য যশো অভিবৃদ্ধয়ে॥

লিপিখানি সমতট রাজ্যের অবস্থিতি-নির্ণয়ে যে সাহায্য করিয়াছে, তাহা এই আলোচনার বিচার্য্য নহে। এইখানে কেবল দ্রষ্টব্য এই যে এক মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে সমতট নামক পূর্ব্বপ্রান্তাবস্থিত প্রদেশ তাঁহার অধীন ছিল। এই মহীপাল কে? ইনি দ্বিতীয় মহীপাল হওয়া সম্ভব নহে, কারণ—

(১) রামচরিতের মতে দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্ব স্বল্পকালস্থায়ী এবং অরাজকতাপূর্ণ ছিল—তাঁহার মত রাজার সমতটে রাজ্য-বিস্তার অসম্ভব।

(২) আর রামচরিত যদি না মানেন তবে রায় মহাশয়ের মতে দ্বিতীয় মহীপাল পিতা বর্ত্তমানেই পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, কাজেই যাঁহার রাজ্যপদ লাভ কখনই হয় নাই, তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসর কি করিয়া উল্লিখিত হইতে পারে? কাজেই এই মহীপাল প্রথম মহীপাল ভিন্ন আর কেহই নহেন। ইহার অনুকূলে প্রমাণের অভাব নাই।—

(১) দিনাজপুর রাজবাটীর স্তম্ভলিপিতে জানিতে পারি যে একজন আগন্তুক কাম্বোজবংশজ গৌড়পতি আসিয়া ৮৮৮ শকাব্দে বাণগড়ে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ বাবু প্রমাণ করিয়াছেন ইনি ১ম মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল দেব।

(২) বাণগড়-শাসন হইতে জানা যায় যে বিগ্রহপাল সৈন্য সামন্তসহ জনপ্রচুর পূর্ব্বদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

(৩) বাণগড়-লিপিতেই জানা যায় যে ১ম মহীপাল অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া সমস্ত ভূপালগণকে চরণাগত করিয়াছিলেন।

(৪) অধুনা বাঘাউড়া-লিপি সপ্রমাণ করিতেছে যে যে-পূর্ব্বদেশে রাজ্য হারাইয়া দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন মহীপাল নামক একজন রাজার রাজত্বের প্রারম্ভের দিকে তাহা সেই মহীপালের অধীনে ছিল।

(৫) ১ম মহীপালের রাজত্বের প্রথম দিকের কোন লিপি এই পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ উত্তর-বঙ্গ বা অন্য কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। এইরকম লিপি বাঙ্গালাদেশের পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত কুমিল্লায়ই প্রথম আবিষ্কৃত হইল।

এই প্রমাণপরম্পরা এই তথ্য ফুটাইয়া তোলে যে :—বাঘাউড়া-লিপি ১ম মহীপাল দেবের; দ্বিতীয় বিগ্রহপাল কাম্বোজবংশজ গৌড়পতির হস্তে রাজ্য হারাইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে সমতট প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র ১ম মহীপালের রাজত্ব সেই প্রদেশেই আরব্ধ হয়—পরে তিনি সমতট হইতে সৈন্য পরিচালন করিয়া বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার করেন এবং বঙ্গের সার্ব্বভৌমত্ব লাভে প্রয়াসী হন।

সমতট হইতে অগ্রসর হইয়া উত্তর বরেন্দ্র জয়ের প্রধান আপত্তি রায় মহাশয় এই দেখিয়াছেন যে—"ঐ সময় দক্ষিণ বরেন্দ্র দেওপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্নশূর রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে মহীপাল জয় করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। সমতট হইতে উত্তর বরেন্দ্রে গেলে দক্ষিণ বরেন্দ্র জয় না করিয়া যাওয়া যায় না।

প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া কোন কথা না বলিয়া যদি জোর করিয়া (dogmatically) তথ্য প্রচার করিতে আরম্ভ করা যায় তবে কিছু বিপদের কথা। বিনোদবাবুর মত ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা তাহা প্রত্যাশা করি না। তাঁহার উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ জোরের কথা দেখিতেছি।

(১) প্রদ্যুম্নশূর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন, (২) তিনি দেওপাড়াতে রাজত্ব করিতেন, (৩) তিনি মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন, (৪) তিনি মহীপালের বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন।

এই-সকল কথার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে বলিয়া অবগত নহি।

(২)

বিনোদবাবু জানাইয়াছেন যে মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘি ১ম মহীপালের খনিত নহে, কারণ "ঐ স্থানে একখানি প্রস্তরলিপি আছে তাহাতে জানা যায় যে ৭১০ বা ৭৪০ শকে ঐ দীঘি খনিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম মহীপাল দশম শতাব্দীর শেষে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন।"

এইখানে প্রমাণ সংগ্রহে বিনোদবাবু যে অসাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ইতিহাস-আলোচকের সযত্নে পরিহর্ত্তব্য। অসাবধানতাগুলি নিম্নরূপ :—

(১) যে প্রস্তরলিপিখানির কথা বিনোদবাবু উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বোধহয় প্রথম "সাহিত্যে" তাঁহার 'উত্তর রাঢ়ে মহীপাল' নামক প্রবন্ধে এবং পরে তাঁহার মুর্শিদাবাদকাহিনী ও মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে সাধারণ্যে প্রচার করেন। সেইগুলিই বোধ হয় রায় মহাশয়ের উদ্ধৃত উক্তির মূল। কিন্তু সেগুলি আর

একবার পড়িলে বিনোদবাবু দেখিতে পাইবেন যে নিখিলবাবু স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে—

(১) মহীপাল-দীঘিতে কোন প্রস্তর-লিপি নাই একখানা বহুদিন পূর্ব্বে ঘাটলায় আটকান ছিল বলিয়া প্রবাদ মাত্র আছে।

(২) প্রস্তর-লিপিতে যে শ্লোকটি ছিল বলিয়া প্রবাদ তাহা অত্যন্ত অশুদ্ধ সংস্কৃতে লোকমুখে প্রচলিত ছিল। নিখিলবাবু তাহা লিখিয়া লইয়া, তাহাকে শুদ্ধ করিয়া তাহা হইতে যে তারিখ পাইয়াছেন তাহাই প্রচারিত করিয়াছেন। তাহাও আবার একটা অক্ষর না শব্দের গোলমালে দুইটা তারিখ হইয়া পড়িয়াছে। যথা—১১০ ও ৭৪০।

এরূপে লব্ধ তারিখের ও প্রস্তরলিপির মূল্য কি তাহা কি রায় মহাশয় বুঝেন না?

তবে কথা হইতে পারে যে মহীপাল দীঘি এবং অসংখ্য মহী নাম-যুক্ত স্থান ও কীর্ত্তির কর্ত্তা যে ১ম মহীপাল তাহার প্রমাণ কি? প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশেষ কিছু নাই—পরোক্ষ প্রমাণ পরবর্ত্তী বিচারে দ্রষ্টব্য।

(৩)

যোগীপাল-মহীপাল-গোপীপাল-গীত।
ইহা শুনিতে যত লোক আনন্দিত॥

চৈতন্য-ভাগবতের এই পদোক্ত মহীপালকে বিনোদবাবু প্রথম মহীপাল বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহার মতে এই মহীপাল দ্বিতীয় মহীপাল। এই বিষয়ে বিনোদবাবুর বক্তব্য এই যে—

(১) দ্বিতীয় মহীপাল অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। রামচরিত্রে তাঁহার চরিত্র অতি জঘন্য ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

(২) রামচরিতে যে লিখিত আছে যে ২য় মহীপালের অত্যাচারে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার রাজত্ব-সময়ে কৈবর্ত্তগণ পালরাজ্য উল্টাইয়া দিয়াছিল এই কথাটা একেবারে ভুল।

(৩) মদনপালের তাম্রশাসনে যে দ্বিতীয় মহীপালের প্রশংসা-সূচক একটিমাত্র শ্লোক আছে তাহাই অকাট্য সত্য।

(৪) পিতার জীবনকালেই ২য় মহীপাল পরলোক গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিপ্রভা এত উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছিল যে পরবর্ত্তী পালরাজগণ নিজেদের বংশতালিকায় সগৌরবে এই অপ্রাপ্ত-রাজপদ পুণ্যবান মহাত্মার নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

(৫) রামচরিত কাব্যগ্রন্থ। কবির উদ্দেশ্য মদনপালের অনুগ্রহ লাভ করা। কিন্তু রামচরিত ইতিহাস নহে—ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। রামচরিত কাব্য ইতিহাস-মধ্যে স্থান পাইতে পারে না; ইহার একটি কথাও ঠিক নহে।

এই বিষয়ে আমার বক্তব্য অনেক আছে; আলোচনার সঙ্কীর্ণ পরিসরে তাহা বলা হয় না। তবে সংক্ষেপে মোট কথা কয়টা বলিয়া যাই।

রায় মহাশয়ের 'গৃহস্থে' প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিলাম—মনে হইল যেন সন্ধ্যাকর নন্দী ও তস্য কাব্য রামচরিতের উপর রায় মহাশয় হঠাৎ চটিয়া প্রমাণপ্রয়োগ না শুনিয়া মদনপালের আত্ম-পূর্ব্বপুরুষের প্রশংসা-সূচক গুটি দুই শ্লোকের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করিয়া সরাসরি বিচারে কবি ও কাব্যকে একেবারে আণ্ডামানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারের উপকরণ অত্যন্ত অল্প—এই অবস্থায় ইতিহাস-আলোচকগণ যদি কেবল অসংযত ও জোরদার ভাষা ও বাক্যের বলে লুপ্ত ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে চাহেন তবে তাহা পণ্ডিতসমাজে শ্রদ্ধা পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

পালরাজদের আমলে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ স্বপ্নও নহে, মায়াও নহে, তাহা প্রকৃতই ঘটিয়াছিল। ব্যাপারটা হইয়াছিল প্রজার কাছে রাজার পরাজয়। সেই ব্যাপারের তিন রকম বিবরণ থাকিতে পারে—যথা—

(১) যুযুধান রাজার পক্ষের লিখিত বিবরণ।

(২) যুযুধান প্রজার পক্ষের লিখিত বিবরণ।

(৩) তৃতীয় পক্ষের লিখিত বিবরণ।

ইহার মধ্যে দুই রকম বিবরণ আমরা পাইয়াছি। মদনপাল ও বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে লিখিত বিবরণ ১ম কোঠায় পড়ে। ২য় কোঠার বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ৩য় কোঠার বিবরণ সন্ধ্যাকর নন্দীর লিখিত রামচরিত।

১ম কোঠার বিবরণ এইরূপ:—

(ক) বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন

(১) সূর্য্যদেবের বংশে গুণবান বিগ্রহপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (২য় শ্লোক)।

(২) তাঁহার রামপাল নামে পালকুলসমুদ্রোত্থিত-চন্দ্ররূপ পুত্র যুদ্ধার্ণব লঙ্ঘন করিয়া ভীমকে বধ করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধারসাধন করিয়া সাম্রাজ্যলাভে খ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন।

(খ) মদনপালদেবের তাম্রশাসন।

(১) বিগ্রহপালদেবের চন্দনবারি-মনোহর-কীর্ত্তিপ্রভা-পুলকিত বিশ্বনিবাসি-কীর্ত্তিত শ্রীমান মহীপাল নামক নন্দন মহাদেবের ন্যায় দ্বিতীয় দ্বিজেশমৌলি হইয়াছিলেন। (১৩শ শ্লোক)

(২) তাঁহার প্রতাপশালী "সাহসসারথী" শূরপাল নামে এক অনুজ ছিল। (১৪শ শ্লোক)

(৩) তিনি সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রাগল্ভ্যে শত্রুবর্গের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক বিভ্রমাতিশয্যধারী মনে শীঘ্রই বিস্ময় ভয় বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন। (১৫শ শ্লোক)

(৪) এই নরপতির সহোদর রামপাল দিব্য প্রজার পক্ষভুক্ত প্রজাবর্গের অতিশয় আক্রমণে আহূত এবং আন্দোলিতচিত্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। (১৬শ শ্লোক)

তৃতীয় কোঠার অর্থাৎ রামচরিতের লিখিত বিবরণ এইরূপ:—তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র, মহীপাল, শূরপাল এবং রামপাল। তাঁহার মৃত্যুর পরে মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং রামপাল ও শূরপালকে কারারুদ্ধ করিয়া দুষ্কার্য্যরত হন। কৈবর্ত্ত-জাতীয় দিব্য বিদ্রোহী হইয়া মহীপালকে যুদ্ধে নিহত করেন এবং বরেন্দ্র অধিকার করেন। দিব্যের পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রের অধীশ্বর হন। ইত্যবসরে রামপাল নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া বিপুলবাহিনী সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে ভীমকে বন্দী করেন। ভীম পরাজিত হইলে তাঁহার বন্ধু হরি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার রামপালকে আক্রমণ করেন কিন্তু ভীষণ যুদ্ধে ধৃত ও নিহত হন। রামপাল বিদ্রোহ দমন করিয়া রমাবতী নগর, জগদ্দল মহাবিহার, অপুনর্ভবা তীর্থ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করিতে মনোযোগী হন।

এখন রায় মহাশয় সন্ধ্যাকর নন্দীকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাইয়াছেন কি হিসাবে, তাহার বিচার করিয়া দেখা যাউক। রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে রামচরিত রচনা করিয়া মদনপালের প্রসাদ লাভ করা নন্দীপুত্রের উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব্বপুরুষের (রায় মহাশয়ের মতে) কুৎসাপূর্ণ মিথ্যা চরিত্র চিত্রণে কলঙ্কিত পুস্তক রচনা করিয়া অধঃস্তন পুরুষের প্রসাদ লাভ করার চেষ্টা একটু অসঙ্গত মনে হয় না কি? রায় মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

রায় মহাশয় বলেন—মদনপালের তাম্রশাসনের ১৩শ শ্লোকে

দেখা যায় যে মহীপালকে বিগ্রহপালের নন্দন বলা হইয়াছে। "ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে রাজা হইবার পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।" কাযেই তাঁহার অত্যাচার, রামপাল ও শূরপালকে কারারুদ্ধ করা, কৈবর্ত্তপতি কর্ত্তৃক পরাজয় ও মৃত্যু একেবারে মিথ্যা। এক নন্দন শব্দের মধ্যে এতখানি অর্থ আবিষ্কার ও তাহার বলে সন্ধ্যাকর নন্দীর বিস্তৃত বিবরণ উড়াইয়া দেওয়া স্থিরবুদ্ধি ঐতিহাসিকের লক্ষণ নহে। নন্দন শব্দের অতখানি অর্থ আবিষ্কার করিয়া রায় মহাশয় বিপদে পড়িয়াছিলেন—কারণ পাল-রাজগণের তালিকার মধ্যে আবার দ্বিতীয় মহীপালের নাম আছে যে। কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মহীপাল এত কীর্ত্তিমান হইয়াছিলেন যে রাজা না হইলেও পালরাজগণের তালিকায় তাঁহাকে বাদ দেওয়া চলে নাই। এরকম গোঁড়ামিপূর্ণ ও যুক্তিশূন্য মতবাদের আলোচনা নিরর্থক। রায় মহাশয়ের বক্তব্য এই যে যদি সন্ধ্যাকর-বর্ণিত ঘটনা সত্যই হয় তবে মদনপালের তাম্রশাসনে এই-সব কথা নাই কেন? অধঃস্তন পুরুষ নিজের তাম্রশাসনে পূর্ব্বপুরুষের অপযশ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এমন ব্যাপার ইতিহাসে এই-পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। পূর্ব্বপুরুষের অপযশ তাম্রপট্টে লিখিয়া চিরস্থায়ী করিয়া গেলে মদনপালকে নিঃসঙ্কোচে কুলাঙ্গার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত। পালরাজগণ ত পূর্ব্বেও আর-একবার কাম্বোজান্বয় গৌড়পতির হাতে রাজ্য হারাইয়াছিলেন। ২য় বিগ্রহপাল যে রাজ্য হারাইয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বাঞ্চলে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন তাম্রশাসনে তাহার কোনও উল্লেখ নাই, বরং বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় তিনি বুঝি সসৈন্যে পূর্ব্বদেশ বিজয় করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র যে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, সগৌরবে তাহার উল্লেখ আছে। এস্থলেও মদনপাল, মহীপালের পতনকাহিনী উল্লেখ না করিয়া তাঁহার যথাসম্ভব প্রশংসাই করিয়াছেন—কারণ পূর্ব্বপুরুষের অপযশ ঘোষণা করা অন্যায় হইত। কিন্তু রামপাল যখন রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন তখন বৈদ্যদেবের শাসনে এবং মদনপালের শাসনে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার প্রশংসা করা হইয়াছে—সেই দেশব্যাপী প্রশংসার জেরই সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্য।* রামচরিতেও মহীপালের অত্যাচারকাহিনীর যেন অনিচ্ছাক্রমে নেহাৎই সত্যের গৌরব রাখিবার জন্য অপরিস্ফুট ভাষায় অল্প আভাস দেওয়া হইয়াছে।

মদনপালের তাম্রশাসনের ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকে শূরপালকে রাজা বলিয়া উল্লিখিত দেখিয়া এবং তাঁহার সাহসের প্রশংসা দেখিয়া রায় মহাশয় বলিতে চাহেন যে শূরপাল যখন রাজা ছিলেন তখন দিব্যের বরেন্দ্র জয় মিথ্যা কথা। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে শূরপাল ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহীপাল যে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত হন নাই ইহা বিশেষ সন্দেহজনক। মদনপালের তাম্রশাসনের ১৫শ শ্লোকে শূরপালের শত্রুবর্গের মনের যে "স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক বিভ্রমাতিশয্যের" উল্লেখ পাওয়া যায় তখন সন্দেহ বর্দ্ধিত হয়। পরে যখন দেখা যায় যে শূরপালের রাজত্বকালের কোন নিদর্শন বরেন্দ্র, বঙ্গ অথবা রাঢ় হইতে বাহির হয় নাই, কিন্তু বিহার অঞ্চল হইতে তাঁহার রাজত্বকালের লিপি পাওয়া গিয়াছে তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া আসে। ইংলণ্ডে প্রথম চার্লস্‌এর হত্যার পরে যে ব্যাপার হইয়াছিল, বর্ত্তমানে বেলজিয়মে যে ব্যাপার হইয়াছে, কৈবর্ত্তবিদ্রোহে পাল-রাজ্যেও সেই ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। বরেন্দ্র যখন কৈবর্ত্তগণ দখল করিয়া লইলেন, তখন পালরাজগণ তাঁহাদের নামমাত্র রাজশ্রী লইয়া বিহার অঞ্চলে সরিয়া গিয়াছিলেন। ২য় চার্লস্‌ যেমন ইংলণ্ডে ক্রমোয়েলের সাধারণতন্ত্র সত্ত্বেও ফ্রান্সে বসিয়াই ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন—এবং তাঁহার প্রকৃত রাজত্বকালের কাগজ-পত্রে তাঁহার রাজ্যশাসনমধ্যবর্ত্তী সাধারণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রথম চার্লস্‌এর হত্যার দিন হইতেই আরব্ধ বলিয়া ধরিয়াছিলেন,—বেলজিয়মের অনেকাংশ জার্ম্মেনীর হস্তগত হইলেও বেলজিয়মের রাজা যেমন এখনও বেলজিয়মের রাজাই আছেন—পাল-রাজগণও তেমনি বরেন্দ্র হারাইয়া রাজ্যের পশ্চিমাংশে আশ্রয় লইয়াও তাঁহাদের রাজত্বের দাবী ও রাজোপাধি ছাড়েন নাই। রামপালের বরেন্দ্রী উদ্ধার সম্বন্ধে মদনপালের তাম্রশাসনের ১৬শ শ্লোকের কতকগুলি মনগড়া অর্থ করিয়া রায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রামপাল দিব্য কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহত হইয়া রাজ্য হারাইয়া আবার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। রায় মহাশয়ের যুক্তির অসঙ্গতিগুলি বিস্তৃতভাবে দেখাইতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। তাঁহাকে কেবল নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

(১) রামপালের দিব্যের সঙ্গে যুদ্ধ হয় নাই, কারণ মদনপালের শাসনের ১৬শ শ্লোকে পরিষ্কার লেখা আছে যে দিব্য প্রজার পক্ষভুক্ত লোকসমূহ আসিয়া রামপালকে আক্রমণ করিয়াছিল।

(২) দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের সঙ্গে রামপালের যুদ্ধ হইয়াছিল—কারণ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের ৪র্থ শ্লোকে পরিষ্কার লেখা আছে যে রামপাল ভীমকে বধ করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন।

(৩) ভোজবর্ম্মার বেলাব-শাসনে জাতবর্ম্মার গৌরব-বর্ণনায় লিখিত আছে যে তিনি কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া এবং দিব্যের ভুজকে নিন্দা করিয়া সার্ব্বভৌম শ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন। কর্ণের আর এক কন্যা যৌবনশ্রীকে মহীপাল-শূরপাল-রামপালের পিতা তৃতীয় বিগ্রহপাল বিবাহ করিয়াছিলেন। কাজেই জাতবর্ম্মা ও তৃতীয় বিগ্রহপাল সমসাময়িক ব্যক্তি এবং জাতবর্ম্মাকে যখন দিব্যের ভুজ নিন্দা করিয়া সার্ব্বভৌম শ্রী বিস্তৃত করিতে হইয়াছিল, জাতবর্ম্মার সময়েই দিব্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তখন তৃতীয় বিগ্রহপাল পরলোক গমন করিয়াছেন। কাজেই দিব্য বিগ্রহপালের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অর্থাৎ মহীপালের সময়ের। এদিকে ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনেই আর একটি শ্লোকার্দ্ধ আছে যথা—

হা ধিক্কষ্টমবীরমদ্য ভুবনং ভূয়োঽপি কিং রক্ষসা
মুৎপাতোয়মু(প)স্থিতোঽস্তু কুশলী শঙ্কাবলঙ্কাধিপঃ।

ঢাকা রিভিউতে যখন প্রথম বেলাবশাসনের পাঠ প্রকাশিত করি তখন এই শ্লোকার্দ্ধটির আমি ভালরূপ পাঠ উদ্ধার করিতে পারি নাই। পরে সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় এই শ্লোকটির উক্তরূপ উদ্ধার করেন। অধুনা শ্রীযুক্ত রাখালবাবু এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় বেলাবশাসনের পাঠ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাকর্ত্তৃক উদ্ধৃত "শঙ্কাবলজাধিয়ঃ" পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় রাধাগোবিন্দ বাবুর পাঠই এবং রাধাগোবিন্দ বাবুর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই ঠিক। এই শ্লোকার্দ্ধটির ব্যাখ্যা এইরূপ—"হা ধিক্‌, কষ্টের বিষয়, ভুবন অদ্য বীরশূন্য হইয়াছে, আবার কি রাক্ষসদের এই উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে? এই শঙ্কার সময়ে অলঙ্কাধিপ (রাম) জয়যুক্ত হউন।" রামচরিতের একটি শ্লোকে প্রাগ্দেশীয় এক বর্ম্মরাজা যে রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর নানা উপঢৌকন দিয়া রামপালকে আসিয়া আরাধনা করিয়াছিল,

* ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন, বৈদ্যদেবের শাসন ও রামচরিত কাব্য পাঠে বুঝা যায় যে রামপালকে সীতাপতি রামের সঙ্গে উপমিত করা তখনকার ফ্যাসান হইয়া পড়িয়াছিল।

সেই বিষয় অবগত হওয়া যায়। ভোজবর্ম্মার বেলাব-শাসনে রাক্ষসদের উপস্থিত উৎপাতে রামপালের কুশলের জন্য প্রার্থনায় মনে হয় ভোজবর্ম্মই রামচরিতে উল্লিখিত বর্ম্মরাজা। এই উৎপাত যখন পুনর্ব্বার সমুপস্থিত উৎপাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তখন অনুমান করি ভীমের মৃত্যুর পর তদীয় সুহৃৎ হরি যে পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রামপালকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন,—ইহা সেই প্রসঙ্গ। এখন নিম্নস্থ সমীকরণের (Synchronism) দিকে দৃষ্টি করিলেই রামপাল যে দিব্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই এবং সন্ধ্যাকর নন্দী যে যুদ্ধের ঠিক বিবরণই দিয়াছেন তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।
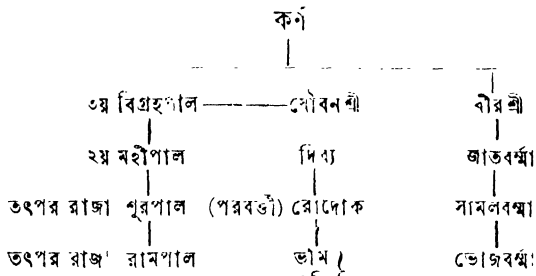
আমাদের যুক্তিপরম্পরায় যদি কিছু ঐতিহাসিক সত্য ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়া থাকি তবে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন এবং আশা করি বিনোদবাবুও বুঝিবেন যে তিনি অকারণে অতটা জোরদার ভাষা ব্যবহার করিয়া এবং বহুদিনমৃত নন্দীপুত্রকে পুনঃ পুনঃ মিথ্যাবাদী বলিয়া ভাল করেন নাই।

আর একটি কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। মহী উপসর্গযুক্ত স্থান ও কীর্ত্তিগুলি কাহার স্মৃতিচিহ্ন? প্রথম মহীপালের না দ্বিতীয় মহীপালের? সন্ধ্যাকরের কথা বিশ্বাস করিলে, ২য় মহীপালের অল্পকালস্থায়ী রাজত্বে সমস্ত বঙ্গে এতখানি প্রভুত্ব বিস্তার করা সম্ভব হয় নাই যাহাতে সারা দেশ ভরিয়া তাঁহার এত কীর্ত্তি থাকিতে পারে। আর রায় মহাশয়ের মতে যদি পিতা বর্ত্তমানেই ২য় মহীপাল পরলোকগমন করিয়া থাকেন তবে অপ্রাপ্তরাজপদ একজন কুমারের সাধ্য হয় নাই—এবং সময় হয় নাই যে তিনি সারা দেশময় কীর্ত্তি রাখিয়া যান—তা সে কুমার যত বড় ধার্ম্মিক ও যশস্বীই হউন না কেন!

এদিকে ১ম মহীপাল কি রকম ছিলেন? কাম্বোজান্বয় গৌড়পতির হাত হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। কাশীতে মন্দিরাদি সংস্কার করাইয়াছিলেন। নালন্দা মহাবিহারে তাঁহার হাত পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান বঙ্গদেশের সমস্ত অংশ হইতে তাঁহার শিলালিপি তাম্রলিপি ইত্যাদি বাহির হইয়াছে—এবং সর্ব্বোপরি তিনি দীর্ঘ ৫২ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সম্ভাবনাটা কাহার দিকে বেশী সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

(৪)

দিনাজপুরের অন্তর্গত মহীসন্তোষকে আমি মহীপালের তাম্রশাসনোক্ত বিলাসপুর বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম—হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কিন্তু রায় মহাশয় যে প্রমাণে "তাহা হইতেই পারে না" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহা খুব মূল্যবান নহে। তিনি লিখিয়াছেন যে তাম্রশাসনখানাতে লিখিত আছে যে—"সখলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান...বিলাসপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ।" কাজেই বিলাসপুর ভাগীরথীতীরে ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে রায় মহাশয় এটুকু লক্ষ্য করেন নাই যে পালবংশের প্রকৃত আদিরাজা ধর্ম্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত শেষ রাজা মদনপাল পর্য্যন্ত যত রাজার তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে সমস্ত শাসনেই রাজধানীর নামের পূর্ব্বে ঐ বাঁধি গৎটি আছে, পরিশেষে বক্তব্য এই যে কোন গুরুতর ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান যুযুধান দুই পক্ষ দ্বারা কখনই হয় না, কারণ স্বমত সমর্থনের চেষ্টা উভয় পক্ষেরই ন্যায়বুদ্ধিকে অনেকটা বিপরীতাভিমুখী ও মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই অবস্থায় যে মাসিক পত্রিকায় এইরূপ বিতণ্ডার সূত্রপাত হয় তাহার সম্পাদক যদি দেশের অন্যান্য ইতিহাস-আলোচকগণকে নিজ নিজ মত জ্ঞাপনার্থ আমন্ত্রণ করেন---এবং আলোচকগণ সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তবে অনেক অনর্থক বাগবিতণ্ডা দূরীকৃত হইয়া ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারের একটি নূতন পথ খুলিয়া যাইতে পারে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

রামায়ণের উত্তর কাণ্ড।

পৌষ মাসের প্রবাসীর ২৬৮ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "রামায়ণের উত্তর কাণ্ড যে পরে সংযোজিত তাহা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।" এই বিষয়ে একটু বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজনীয় বোধ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত (ইনিই কি পরে ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন?) ১২৮৫ সালে ভারতীয় গ্রন্থাবলী নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। উহার ১৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন, "উত্তর কাণ্ড বাল্মীকি-প্রণীত নহে। কেননা ইহার রচনা-প্রণালী দেখিলে বোধ হয় ইহা যেন বাল্মীকির লেখনী-প্রসূত নহে।" একথার প্রমাণস্বরূপ পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—'এতদ্বিষয়ে সবিস্তারে Griffith's *Ramayan*, vol. I. Intro. p. XXIII to XXV দেখ—"There is every reason to believe that the seventh book is a later addition" * * * গোরেসিও উত্তরকাণ্ড পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, "This is a mere later addition, and distantly connected with the other six books."'

গ্রিফিথ্‌-কৃত রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদ ১৮৭০ হইতে ১৮৮০ মধ্যে প্রকাশিত হয়। গোরেসিও ১৮৫০ সনের পূর্ব্বে সম্পাদিত মূল রামায়ণের ভূমিকা লিখেন। সমগ্র কাব্যখানি ১৮৪০-৬০ সনে মুদ্রিত হয়।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ গুহ-প্রোক্ত "লঘু রামায়ণম্" প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সংস্কৃত ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

রামায়ণোৎপত্তির পরে অপর কোনও কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। 'বৃত্তং প্রথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্' ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে বাল্মীকির রামায়ণ প্রথমে অযোধ্যাকাণ্ড হইতে যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত ছিল। মহাবিভাষাতে কেবল সীতাহরণ, তাঁহার উদ্ধার ও রামের প্রত্যাগমন রামায়ণের বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, আদি ও উত্তর কাণ্ড উল্লিখিত হয় নাই। অপিচ, যেস্থলে রাম ভরদ্বাজকে আত্মনিবেদন করিতেছেন, সীতা রাবণের নিকটে স্বচরিত বর্ণনা করিতেছেন, লক্ষ্মণ হনুমানকে রামচরিত বলিতেছেন, হনুমান সীতাকে রাম-বিবরণ শুনাইতেছেন, তথায় সিদ্ধাশ্রম-গমন ধনুর্ভঙ্গ বিবাহাদি প্রকরণ পরিত্যক্ত এবং

অযোধ্যাকাণ্ড হইতে কথা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা হইতেও দেখা যাইতেছে, অযোধ্যাকাণ্ডই রামায়ণের আদি ছিল। যুদ্ধকাণ্ডের অন্তিম সর্গে আছে

আদি কাব্যং মহত্ত্বেতৎ পুরা বাল্মীকিনা কৃতম।

এই শ্লোকার্দ্ধ হইতেও প্রমাণিত হইতেছে, যুদ্ধকাণ্ডেই রামায়ণ সমাপ্ত হইয়াছে।

দুইটি কাণ্ড ও প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাববশতঃ রামায়ণ স্বল্পায়তন ছিল। মহাবিভাষাকালে উহাতে বার হাজার শ্লোক ছিল। এক্ষণে উহার শ্লোকসংখ্যা পঁচিশ হাজারেরও অধিক।

কালক্রমে কোনও ব্যক্তি উত্তরকাণ্ড রচনা করিয়া রামায়ণে যোজিত করিয়া দিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, তাহাও অতি প্রাচীন।

রামোঽপি কৃত্বা সৌবর্ণীং সীতাং পত্নীং যশস্বিনীম্,
ঈজে যজ্ঞৈর্ বহুবিধৈঃ সহ বৈ ভ্রাতৃভির্ যুতঃ।

সাম-গৃহ্য-পরিশিষ্টের এই বচনটির মূল উত্তরকাণ্ড, ইহাই এ কথার প্রমাণ। এই কাণ্ডে সীতার নিষ্পাপত্ব প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রভবনে রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন,

প্রত্যক্ষং তব, সৌমিত্রে, দেবানাং চ হুতাশনঃ
অপাপাং মৈথিলীং প্রাহ, বায়ুশ্চাকাশগোচরঃ।

পুনশ্চ, শপথসভায় বাল্মীকির প্রতি,

প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তো বৈদেহ্যা সুর-সন্নিধৌ,
শপথশ্চ কৃতস্তত্র, তেন বেশ্ম প্রবেশিতা।

এই দুই শ্লোকে সীতার অগ্নিপ্রবেশের উল্লেখ নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে, উত্তরকাণ্ড রচনার পরে যুদ্ধকাণ্ডে অগ্নিপ্রবেশ-বিবরণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত হইলেও তাহা সুপ্রাচীন বলিয়া জ্ঞেয়। খ্রীষ্টোত্তর সপ্তমশতাব্দীসম্ভূত বাণবিরচিত হর্ষচরিতে 'জানকীমিব জাতবেদসং পত্যুঃ পুরঃ প্রবেক্ষ্যন্তীং * * মাতরং দদর্শ" ইতি বাক্য ইহার প্রমাণ। ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে সতীত্ব পরীক্ষার অভিপ্রায়ে নারীদিগের অগ্নি-প্রবেশের বিধান নাই, বৌদ্ধজাতকে তাহা দৃষ্ট হয়। ইহা হইতেও অনুমিত হইতেছে, সীতার অগ্নিপরীক্ষার মূল পর-সমাজোৎপন্ন উপাখ্যান।

দেবর্ষে যে ত্বয়া প্রোক্তা গুণাঃ পুরুষ-দুর্লভাঃ,
তেষামেব সমবায়ঃ সাম্প্রতং রামমাশ্রিতঃ।

নারদের এই উক্তি হইতে স্থিরীকৃত হইতেছে, রামের জীবন-কালেই রামায়ণ বিরচিত হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের সহিত উত্তর কাণ্ডের সঙ্গতি আছে।

অযোধ্যা নাম তত্রাসীন্নগরী লোক-বিশ্রুতা।

এই শ্লোক প্রদর্শন করিতেছে, আদিকাণ্ড বিরচনকালে অযোধ্যার নামমাত্র অবশিষ্ট ছিল। অতএব বলিতে হইবে, উত্তরকাণ্ডের পরে আদিকাণ্ড রচিত হইয়াছে। তাহাও প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে হইবে, কেননা বাণ-রচিত কাদম্বরীতে এই বাক্য দৃষ্ট হইতেছে, 'দশরথশ্চ রাজা পরিণত-বয়া বিভাণ্ডক-মহামুনি-সুতস্য ঋষ্যশৃঙ্গস্য প্রসাদাদ্ * * * অবাপ চতুরঃ পুত্রান্।" রামায়ণের বিসংবাদী রচনামালা হইতে উপলব্ধি হইতেছে, ইহাতে বহুকবির কৃতিত্ব আছে।

ইক্ষ্বাকূণামিদং তেষাং বংশে, কীর্ত্তি-বিবর্দ্ধনম্,
নিবদ্ধং পুণ্যমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্।

প্রস্তাবনার এই উক্তি ঘোষণা করিতেছে, ইক্ষ্বাকুকুলেই রামায়ণের উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু উত্তরকাণ্ড ও অনুক্রমণিকা বলিতেছে, উহার উৎপত্তিস্থল তপোবন।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

৩

ললিত বাবু বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ভা ব্যাকরণের ব্যতিক্রমের বহু উদাহরণ একটা প্রণালী অবলম্বনে শ্রে বিভাগ করিয়া সাজাইয়াছি, এবং আমার সাধ্যমত নিয়ম বা ক আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে যাহা অপপ্রয়োগ ব বিবেচনা করিয়াছি, তাহার উচ্ছেদ প্রার্থনা করিয়াছি" (৮ পৃঃ আমরা এখন ইঁহার সহিত এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, কি সংক্ষেপে, কেননা বাহুল্য করিলে এই আলোচনা শেষ করিতে দিন লাগিবে।

ললিত বাবুর শ্রেণীবিভাগের প্রথম বিভাগ হইতেছে বর্ণচো শব্দ। যে-সকল শব্দকে হঠাৎ দেখিলে সংস্কৃত বোধ হয়, বি বস্তুত সংস্কৃত নহে, তাহাদিগকেই ইনি এই বিভাগে ধরিয়াছেন বিচার করিয়াছেন। যথা—

আলুয়িত বা এলায়িত। ললিত বাবু বলেন ইহা সংস্কৃ আলুলায়িত'র সংক্ষেপ। এ শব্দ ত সংস্কৃতে দেখি না, বলিয়াও মনে করি না; বরং আলোলায়িত বলিলে হইত তুলঃ—"লোলিত কবরীযুত"—বিদ্যাপতি (পরি) ৬১০। কিন্তু বস্তু আমার মনে হয় আকুলায়িত হইতে বাঙ্লায় ঐ আলোচ্য শ দুইটি হইয়াছে। সংস্কৃতে চুল এলো-মেলো হইলে তাহাকে আকু বলা হয়। যথা "অসংযতা কুলালকান্"—কাদম্বরী (বোম্বাই) ৬ ২৪৩; দ্রষ্টব্য—রত্নাবলী, ১-১৭; কিরাতার্জ্জুনীয়, ৮-১৮। আবা "পর্য্যাকুলা মূর্দ্ধজাঃ"—শকুন্তলা, ১-২৬। গোবিন্দদাসও (ব ২৫৭, ২৭০) লিখিয়াছেন "আকুল চিকুরা" এই আকুল প্রাকৃতে আউল হয়। আউল বাঙ্লায় খুব চলিত আছে। চুলগুলি খু এলো-মেলো হইয়া থাকিলে মালদহে বলে আউল-বাউ (ব্যাকুল)। মালদহে আরো বলে চুল আউলান। প্রাচী সাহিত্যে আছে—

"স্নান না করিব জল না ছুঁইব
আলাইব মাথার কেশ।"
চণ্ডীদাস (রমণীবাবু), ২৫৫ পৃঃ

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বের পদে আবার এলাইয়া আছে।

চন্দ্রিমা। এই শব্দটি খাঁটী প্রাকৃত (হেমচন্দ্র, ৮.১.১৮৫), তবে অর্থের ভেদ ঘটিয়াছে। প্রাকৃতে ইহার অর্থ চন্দ্রিকা। প্রাকৃত ব্যাকরণ মতে চন্দ্রিকা শব্দের ক-স্থানে ম হয়। পালিতে কিন্তু চন্দ্রমাঃ শব্দই চন্দ্রিমা হইয়া থাকে, প্রয়োগও অনেক আছে। "বিসুদ্ধো সুদ্ধ চন্দিমা।"—শব্দনীতি, ৯৫। অতএব বাঙ্লায় ইহার প্রয়োগ দোষাবহ হইতে পারে না।

ঝটিকা। ললিতবাবু লিখিয়াছেন ঝঞ্ঝা হইতে ঝড়। কিরূপে? প্রমাণ কি? সংস্কৃত ঝটিতি'র মূল যেমন ঝট ৎ (পাণিনি-কাশিকা ৬-১ ৯৮) অথবা ঝট্, ঝটিকার ও সেইরূপ উহাই মূল। ঝড় ও ইহা হইতেই হইয়াছে। (হঠাৎ) দ্রুত আসে বলিয়াই—ঝট্ করিয়া আসে বলিয়াই ঝড়। বিদ্যাপতি (পরি ৩৪৯) লিখিয়াছেন—

"ঝটক ঝাটল ছোড়ল ঠাম।
কএল মহাতরু-তর বিসরাম॥"

এই ঝটক হইতেই ঝটিকা। এই ঝটিকা শব্দ নূতন উদ্ভাবিত মনে করিতে পারি না। কেন-না মালদহের পশ্চিম অঞ্চলে তাহা হইতে প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন ঝটিআ শব্দ এখনো প্রচলিত আছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারা যায় ঝ ল ক (যথা, মুখ দিয়া ঝ ল কে ঝ ল কে রক্ত উঠিতেছে) শব্দ ঝ ট ক হইতেই হইয়াছে। আকাশ তারায় ঝ ল কি ত, ইত্যাদি স্থলে জ্বল-জ্বল হইতে ঝ ল-ঝ ল, এবং ইহা হইতে ঝ ল ক (অর্থাৎ দীপ্তি) পদ হয়, এবং তাহা হইতে ঝ ল কি ত।

পু ঙ্খা নু পু ঙ্খ সংস্কৃতই শব্দ। কোন আভিধানিক গ্রহণ না করিলেও তিন স্থলে ইহার প্রয়োগ পাইয়াছি। (১) শ্রীমদ্ভাগবতে (৬ ১০৷২৪)—

"ন তেঽদৃশ্যন্ত সংছিন্নাঃ শরজালৈঃ সমন্ততঃ।
পু ঙ্খা নু পু ঙ্খং পতিতৈর্জ্যোতীংষীব নভোঘনৈঃ॥"

শ্রীধরস্বামী এই শব্দটির এখানে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—"পুঙ্খো মূলদেশঃ, একস্য মূলদেশমনু তৎসংলগ্নোঽপরস্য পুঙ্খো যথা ভবতি তথা।" মোটামুটি বাঙ্‌লায় ইহার অর্থ দাঁড়ায় একটা বাণের গোড়ায় আর একটি, তাহার পর আর একটি, এইরূপ। (২) অভিজ্ঞান শকুন্তলের দাক্ষিণাত্য টীকাকার অভিরাম "অভিজনবতো ভর্তুঃ..." ইত্যাদি (৪-১৯) শ্লোকের "বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা" এই স্থলের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"কৃত্যৈঃ সহ ক্রিয়মাণেঃ, প্রতিক্ষণং পু ঙ্খা নু পু ঙ্খ ত য়া কর্ম্মণঃ।" এখানেও ঐ একই অর্থ —কার্য্যসমূহ একটার পর আর একটা পড়ায়। (৩) অভিজ্ঞান শকুন্তলেরই অভিনব টীকাকার (অভিরামের আদর্শে) কোচিনের ত্রয়োদশ রাজকুমার রামবর্ম্মা ও অধ্যাপক রামপিষারক (Mangalodayam Co. Ltd, Trichur) ঐ স্থানেরই ব্যাখ্যায় ঐ কথাটিই বলিয়াছেন—"পু ঙ্খা নু পু ঙ্খ ত্বা ৎ কর্ম্মণঃ।" অতএব আশা করি আলোচ্য শব্দটির বাঙ্‌লায় অর্থের মূল সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকিবে না।

পু ত্ত ল। সংস্কৃত অভিধানে দেখিলেও আমি এখনো ইহার প্রয়োগ দিতে অক্ষম। স্মৃতিগ্রন্থের পর্ণনরদাহ প্রকরণে ইহা পাওয়া যাইতে পারে। কু শ পু ত্ত ল দা হ শব্দ বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু পু ত্ত ল শব্দটি মোটেই সংস্কৃত নহে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে মনে করেন, "ইহা পু ত্রি কা র প্রাকৃত রূপ" (১০-১১ পৃঃ), তাহাও নহে। পু ত্রি কা হইতে পু ত্ত ল হইতে পারে না ; ভাষাতত্ত্বে এরূপ নিয়ম নাই। ইহা পু ত্র হইতেই হইয়াছে। বিশ্লেষণের নিয়মে যেমন ম ন্ত্র হয় ম ন্ত র, গা ত্র হয় গ ত্ত র (মালদহে এখনো বলে), সেইরূপ পু ত্র হয় পু ত্ত র। র=ল, এবং এইরূপে পু ত্ত র=পু ত্ত ল, এবং ইহা হইতে পু ত ল। সূ ত্র হইতে সু ত্ত র, ইহা হইতে সূ ত ল (যথা গাত্র—গত্তর—গতর)। এই সূ ত ল শব্দ মালদহে প্রসিদ্ধ আছে। এখানে পুরন্ধ্রীগণ বিবাহে বরকে বরণ করিবার সময় একখানি রক্তবর্ণ কণ্ঠসূত্র দিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।* এই সূত্রকে তাঁহারা সূ ত ল বলিয়া থাকেন।

ম তি বা মো তি। মুক্তা-অর্থে মো তি শব্দই লেখ্য ম তি নহে। ললিতবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইহা "মুক্তার বা মৌক্তিকের অপভ্রংশ, না যাবনিক শব্দ ?" আমাদের উত্তর—ইহা যাবনিক নহে, এবং ইহা মু ক্তা র ই অপভ্রংশ। মার্কণ্ডেয়ের প্রাকৃতসর্ব্বস্বে (১.২৪, ৯.৬) মু ক্তা হইতে আমরা মো ত্তা* এবং মো ত্তী দুই পদই দেখিতে পাই। মু ত্তা পদও বিকল্পে হয়। মৌ ক্তি ক হইতে মু ত্তি অ পদ হয়।

মূ র্চ্ছা ভ ঙ্গ এই প্রকরণে কেন ধৃত হইল বুঝিলাম না।

রা ণী। জ্ঞ পালি-প্রাকৃতে অনেক স্থলে ণ হইয়া যায়। এই অনুসারে রা জ্ঞী হইতে ইহা হইয়াছে। ললিতবাবু ইহা বলিয়াছেন। আমি এখানে অধিক এইটুকু বলিতে চাই যে, দেবা-দেবী, মা মা-মা মী, ইত্যাদির অনুকরণে রা ণা-রা ণী হইয়াছে। প্রথমে রা ণী শব্দই হইয়াছিল, তাহার পর রা ণা (রাজা-অর্থে) হইয়াছে। এইরূপেই রাজপুতানার ম হা রা জা রা† সাধারণত ম হা রা ণা কথিত হইয়া থাকেন।

বা লি। ললিতবাবু বলিতে চাহেন ইহা বা লু র অ শু দ্ধ উচ্চারণ। আমরা অ শু দ্ধ বলিতে পারি না। এ সম্বন্ধে পরে সবিশেষ আলোচনা করিব।‡

বা লি শ ("উপাধান")। উ প ধা ন হইবে, উ পা ধা ন নহে।

হা হু তা শ। যেমন হ তা শ হয়, হু তা শ ও তেমনি হইতে পারে—হু ত+আ শা হইতে, কিছু কষ্টকল্পনা হয়। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে ইহা অনেক আছে মনে হইতেছে।

গ ঠি ত। যোগেশ বাবু ঠিকই বলিয়াছেন ঘটিত হইতে হইয়াছে। প্রাকৃত সূত্র আছে "ঘটের্গঢ়ঃ" (হেমচন্দ্র, ৮.৪.১১২)। ইহা হইতেই গ ড়া, গ ড় ন প্রভৃতি।

বা ভা র। আবার বে ভা র :—

"জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়।
রসের বে ভা র লুকা না যায়॥
বৈষ্ণবপদাবলী (বসু.) ১৭৪ পৃঃ।

প্রসঙ্গক্রমে আমরাও এখানে কয়টি "লম্বশাটপটাবৃত" ব র্ণ চো রা শব্দ দেখাইব, ইহারা সাধারণ দৃষ্টিতে সংস্কৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয় :—

গ ঞ্জ ন। ইহার আসল রূপটি হইতেছে গ র্জ্জ ন। পালি ও প্রাকৃতে ব্যাকরণের সূত্রই আছে যে, কোন কোন স্থলে রকারের লোপ ও অনুস্বারের আগম হয় (পালিপ্রকাশ, ১.৯৫ ; প্রাকৃতপ্রকাশ, ৪.১৫ ; হেমচন্দ্র, ৮.১.২৬ ; ইত্যাদি)। তদনুসারে দ র্শ ন হয় দং স ন ; এইরূপ শ র্ব্ব রী=সং ব রী ; হ র্ষ ণ=হং স ন ; অ শ্রু=অং সু ; ইত্যাদি। ঠিক এই নিয়মেই গ র্জ্জ ন হইয়াছে গ ঞ্জ ন, এবং চুপি-চুপি অনতিপ্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের কাব্যে দেখা দিয়াছে। মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর কবি জয়দেব গাহিয়াছেন—"স্থলকমল-গ ঞ্জ নং, মম হৃদয়-রঞ্জনং ;" আবার "অলিকুল-গ ঞ্জ ন মঞ্জনকং ;" গীতগোবিন্দ, ১০, ১২। সাহিত্যদর্পণে (৩.১০০) বিশ্বনাথও লিখিয়াছেন—"নেত্রে খঞ্জন গ ঞ্জ নে।" বৈয়াকরণিককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তখনই গ ঞ্জ্‌ ধাতু উল্লেখ করিবেন, যদিও বস্তুত ইহা নাই। এস্থলে বামনের কথা মনে রাখিতে হইবে, "বর্দ্ধিত এব ধাতুগণঃ"—ধাতুর গণ বাড়িয়াই যাইতেছে। বিদ্যাপতির একটা প্রয়োগ দিই—

"বেশর-খচিত　　　শতেশ্বরী পহিরল
চুরি কনক করকঞ্জে।
চরণ-কমল-পাশে　　　যাবক রঞ্জন
তাপর মঞ্জীর গ ঞ্জে॥ ৫৩৬ (পরি.)।

---

* বিবাহে ক ণ্ঠ সূ ত্র দ্বারা অর্চ্চনা বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রসিদ্ধ আছে। বিবাহের দিন গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণকে ইহা প্রদান করা সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০. ৫৩.৪৮) রুক্মিণীর বিবাহে অম্বিকাকেও ইহা দেওয়া হইয়াছিল—"বিপ্রস্ত্রিয়ঃ বিপ্রমতীস্তথা তৈঃ সমপূজয়ৎ। লবণাপূপতাম্বুল-ক ণ্ঠ সূ ত্র-ফলেক্ষুভিঃ॥"

* "মো ত্তা হলিল্লাহর্ণচ্ছআও"—কর্পূরমঞ্জরী, ৪ ৯।

† বাঙ্‌লায় ম হা রা জ, ম হা রা জা (পালি-প্রাকৃত) উভয়ই শুদ্ধ।

‡ "গুরু দিঠে দিনু বা লি।"—চণ্ডীদাস, (রমণী) ১৪৮ পৃঃ।

এখানে গ-প্লে অর্থ শব্দ (গর্জ্জন) করে, গ প্প না করে নহে।

মণ্ডন। ইহা সংস্কৃত নহে। ইহা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মার্জন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়দের দন্তমঞ্জন চূর্ণ খুব চলিতেছে। ধাতুপাঠ এখনি মার্জ্জনার্থক মঞ্জ ধাতু উল্লেখ করিবে। এইরূপেই কর্কট=(কক্কট=) কাঁকড়। কর্কর=(কঙ্কর=) কাঁকর। পর্পট=(পপ্পট=) পাঁপড়। চচর (অমরকোষ-ক্ষীরস্বামী)=চঞ্চর=চাঁচর (যথা চাঁচরকেশ)।

বঙ্ক। ইহা আসল প্রাকৃত শব্দ, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বক্র হইতে উৎপন্ন (হেমচন্দ্র, ৮.১.২৬)। ইহা হইতে উৎপন্ন বঙ্কিম শব্দও প্রাকৃত। আমরা বাঙলায় বঙ্ক বিহারী বলি। কিন্তু প্রসিদ্ধ অর্থেই এই বঙ্কু শব্দটি ঋগ্বেদে অনেক স্থলে (১.৫১.১২ ; ১১৪.৪ ; ৫.৫৪.৬ ; ৮.১.১১) আছে। সায়ণ এসকল স্থলে বকি বা বঙ্ক ধাতুর উত্তর উণাদি উ প্রত্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মিষ্ট। ইহা মোটেই সংস্কৃত নহে। পালি-প্রাকৃতের অনুশাসনে ঋ স্থানে ইকার হওয়ায় বৃষ্টি হইতে যেমন বাঙলায় বিষ্টি, সেইরূপ মৃষ্ট হইতে মিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃতে মধুর অর্থে মৃষ্ট শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪.৩০.৩৫)—"যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাঃ।" (দ্রষ্টব্য—ঐ, ১.২৫.২৩ ; ১০.২২-৩৭ ; ৪০.৩৯)। * আপ্তে নিজের অভিধানে ভুলিয়াছেন—"কিং মিষ্টমন্নং খরসূকরাণাম্ ;" কিন্তু এই চরণটি কোথাকার তাহা কিছু নির্দ্দেশ করেন নাই। পদ্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড ১৯৯, ৪৯) আছে—মিষ্টং তে বচনামৃতম্।

শুঙ্গ। শুঁয়া অর্থাৎ যব প্রভৃতির সূক্ষ্ম-দীর্ঘ অগ্রভাগ বুঝাইতে সংস্কৃতে শুঙ্গ অথবা শুঙ্গা শব্দ সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ আছে (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৬.৮.৩-৪ ; পারস্কর গৃহ্যসূত্র, ১.১৪.৩)। কিন্তু ইহা মোটেই সংস্কৃত নহে। বৃদ্ধ শব্দের ঋকার যেমন প্রাকৃতপ্রভাবে উকার হইয়া (হেম.১.৮.১৩১ ; শুভ. ১.২.৮৬) বুড্‌ঢ পদ হয়, শৃঙ্গ শব্দও ঠিক সেইরূপেই শুঙ্গ হইয়াছে, (এবং শৃঙ্গক হইয়াছে শুঙ্গা)। ঋকার আবার প্রাকৃতে ইকারও (হেম-১-৮-১২৮ ; শুভ ১.২.৮১) হয়, এই নিয়মে শৃঙ্গ সিঙ্গ হয়, এবং ইহা হইতেই বাঙলায় আমরা শিং পাইয়াছি।

গেহ। গৃহ-অর্থে এই শব্দটি সংস্কৃতে খুবই প্রসিদ্ধ, কিন্তু বস্তুত ইহাও সংস্কৃত নহে, ইহার মূল শব্দটি হইতেছে গৃহ। বাঙলায় উচ্চারণ প্রবন্ধে (প্রবাসী, ১৩১৮, বৈশাখ) শিক্ষা গ্রন্থ হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন-শাখীয়েরা ঋকারকে রে করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণোঽসি (বা. স. ২.১) স্থলে তাঁহারা বলিবেন ক্রেষ্ণোঽসি, ইত্যাদি। বাঙলায় কেষ্ট প্রভৃতি এইরূপেই হইয়াছে (প্রবাসী দ্রষ্টব্য)। গেহ শব্দটিও এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে।

শিপ্রা। উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদী খুবই প্রসিদ্ধ, সংস্কৃত কবিগণ ইহার কত বর্ণনা করিয়াছেন। "শিপ্রা বাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা চাটুকারঃ।"—কালিদাস (মেঘদূত, ৮১)। আমি যখন দেখিলাম মারাঠীতে ক্ষকার শকার হয় (যথা, ক্ষেত্র=শেত), তখনই মনে জাগিয়া উঠিল শিপ্রা শব্দের আসল রূপ হইতেছে ক্ষিপ্রা, ইহাতে সন্দেহ নাই। তার পর আনন্দাশ্রমের প্রকাশিত ব্রহ্মপুরাণের (২৭.২৯)—

"সিপ্রা হ্যবন্তী চ তথা পারিযাত্রাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ"

এই শ্লোকের সিপ্রা শব্দের পাঠান্তর দেখিয়া আমার ঐ সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ঐ পাঠান্তর হইতেছে—ক্ষিপ্রা, এবং শীপ্রা এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, দ্বিতীয় পাঠটি প্রথম পাঠের অর্থানুসরণে হইয়াছে।*

মেদুর। "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" ইত্যাদি কত আনন্দের সহিত আমরা পড়িয়া থাকি, কিন্তু মেদুর শব্দটি সংস্কৃত নহে। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে (১.১৭.৩৯) মৃদুর (=মৃদুল) পড়িয়াই বুঝিতে পারিয়াছি ইহা হইতেই গেহ শব্দের ন্যায় মেদুর শব্দও উৎপন্ন হইয়াছে।

মল্ল। ইহাও আসল সংস্কৃত নহে। প্রাকৃতে যেমন আর্দ্র হইতে অল্ল, ভদ্র হইতে ভল্ল হয়, সেইরূপ মর্দ্দ (মৃদ্ ধাতু) হইতে মল্ল হইয়াছে,—যদিও ধাতুপাঠকার একটি মল্ল ধাতু আবিষ্কার করিয়াছেন।

এ বিষয় এই পর্য্যন্ত। অতঃপর আমরা অন্যান্য কথা আলোচনা করিয়া দেখিব।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

ধর্ম্মপাল

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজ গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া যান। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন ; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া ধর্ম্মপাল দেব দুর্গ হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্য অমৃতানন্দকে যুবরাজ ও

---

* এক স্থলে (১০.৬৯.১৬) "অমৃত মিষ্টয়া" পাঠ আছে। ইহা বঙ্গদেশীয় পুস্তকের পাঠ, অন্য প্রদেশের পাঠ দেখিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এস্থলে "অমৃত জুষ্টয়া" ধরিয়াছেন।

* যক্ষ অর্থে গুহ্যক শব্দ সংস্কৃতে প্রচলিত আছে। আবার এই অর্থেই অগ্নিপুরাণে (২৯৯.৫২) গৃহ্যক দেখিতে পাই। প্রাকৃত নিয়মে গৃহ্যক হইতেও গুহ্যক হইতে পারে। অগ্নিপুরাণের একই শ্লোকে (১৪৫.৩২) উক্ত শাকিনী, ডাকিনী (বাঙলায় ডাইনী), লাকিনী, রাকিনী শব্দ মূলত এক শাকিনী হইতে হইয়াছে। শ=ড (পালিতে শাক=ডাক হয়, কিন্তু কিরূপে হইল বলিতে পারি না) ; ড=ল ; ড=ড় ; ড়=র। এই শ্লোকেই যাকিনী হইয়াছে যক্ষিণী হইতে। (যক্ষিণী কিরূপে হয় তাহা স্ত্রীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয় আলোচনার সময় বিশেষরূপে বলিব)। আবার নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মকসমূহ দ্রষ্টব্য। ইহারা মূলত একই শব্দ, কালক্রমে উচ্চারণভেদে আর-একটি রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বৃষভ—ঋষভ ; বৃদ্ধি—ঋদ্ধি ; গুরু=উরু ; অনবদ্য—অনেদ্য (ইহা বৈদিক শব্দ, দ্রষ্টব্য নিঘণ্টু, ৩.৮) ; তৃপু (=চোর, বৈদিক শব্দ)—রিপু (নিঘণ্টু, ৩-২৪) গত অথবা গৃহ—গয় (বৈদিক, গৃহার্থক ; নিঘণ্ট, ৩. ৪)।

কল্যাণী দেবীর সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে সংবাদ পৌঁছিল যে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাডুবির পর সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়াছেন। গৌড় হইতে মহারাজকে খুঁজিবার জন্য দুই দল সৈন্য প্রেরিত হইল। পথে ধর্ম্মপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। এবং গোপালদেব ধর্ম্মপাল ও কল্যাণী দেবীকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কল্যাণীর মাতা কল্যাণীকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত পুরুষোত্তম খুল্লতাত-কর্ত্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত কান্যকুব্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

এই সংবাদ জানিয়া কান্যকুব্জরাজ গুর্জ্জররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যাসী দূতকে ঠকাইয়া তাহার পত্র পড়িয়া লইলেন। গুর্জ্জররাজ সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ মনে করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবার উপক্রম করিলেন। এদিকে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধর্ম্মপাল সমস্ত বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সম্রাট ধর্ম্মপাল সামন্তরাজদিগকে সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিয়াছেন।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মগধে গৌড়েশ্বর

পরদিবস অতি প্রত্যুষে গৌড়ীয় সামন্তগণ একে একে ধর্ম্মপালদেবের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে সমবেত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে স্বয়ং বিমলনন্দী উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে মহারাজের পটবাসের দ্বারে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার পাদদেশে ধর্ম্মপালদেবের পরিচারক কৈবর্ত্ত গোবিন্দ দাস তখনও নিদ্রিত রহিয়াছে। বৃদ্ধ ভীষ্মদেব শিশিরসিক্ত তৃণক্ষেত্রে তরবারি রাখিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন, তাহা দেখিয়া সকলে আর্দ্রভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। কমলসিংহ কহিলেন, “মহারাজের বোধ হয় নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই ?” বৃদ্ধ উদ্ধবঘোষ কহিলেন, “না। তাহা হইলে বিমলনন্দী এতক্ষণ বস্ত্রাবাসের দ্বার পরিত্যাগ করিতেন।”

ভীষ্ম।— দেখ কমল, এখানে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। শত্রু-সেনার যখন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তখন যত শীঘ্র সম্ভব বারাণসী আক্রমণ করা উচিত।

উদ্ধব।— প্রভু, কান্যকুব্জের রাজ্য আক্রমণ করা কি উচিত হইবে ?

ভীষ্ম।— দেখ উদ্ধব, কান্যকুব্জরাজ সংবাদ না দিয়া মণ্ডলা আক্রমণ করিয়াছেন, সুতরাং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। যখন যুদ্ধ বাধিয়াছে, তখন সামনীতি অবলম্বন করা মূর্খতামাত্র। কান্যকুব্জের সেনা বোধ হয় করুষদেশে, না হয় বারাণসীতে অপেক্ষা করিতেছে। ইন্দ্রায়ুধের দ্বিতীয় সেনাদল আসিয়া পৌঁছিলে, তাহারা পুনরায় অগ্রসর হইবে।

কমল।— প্রভু, সত্য কহিয়াছেন। উদ্ধবঘোষ, অদ্যই শোণ পার হইয়া করুষদেশে প্রবেশ করা উচিত।

রণসিংহ।— আমারও সেই মত ; কিন্তু মহারাজের আদেশ না পাইলে কিছুই করিতে পারিব না।

জয়বর্দ্ধন।— দেখুন ভীষ্মদেব, বেলা বাড়িয়া চলিল, মহারাজের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। তিনি বাহিরে আসিলেই পরামর্শ করিয়া যাত্রার আদেশ প্রচার করিতে করিতে প্রথম প্রহর অতীত হইয়া যাইবে। আমরা ততক্ষণ নিজ নিজ দলের অশ্বারোহীসেনা অগ্রে প্রেরণ করি। যে পঞ্চ সহস্র সেনা পাটলিপুত্রে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহারা অদ্য এখানে আসিয়া পৌঁছিবে; তাহারাই শোণ-সঙ্গম রক্ষা করিবে। ঢেক্করীয়রাজ কি বলেন ?

প্রমথ।— দেখুন ভীষ্মদেব, আমরা রাঢ়ের লোক, আমরা যুদ্ধ করিতে জানি ; কিন্তু বারেন্দ্রগণ রাষ্ট্রনীতিতে ও বুদ্ধিমত্তায় চিরকাল আমাদিগকে পরাজিত করিয়া আসিয়াছে। দেখুন এই সামান্য কথাটা আমাদিগের কাহারও মনে হয় নাই।

ভীষ্ম।— প্রমথ, পদ্মবর্ম্মারাজের কথা সত্য, দেখ গোপালদেবকে সামান্য লোকে হয়ত ভীরু বলিয়া মনে করিত ; কিন্তু তাঁহার ন্যায় ধীর, চিন্তাশীল ও ভবিষ্যদ্দর্শী পুরুষ বোধ হয় বরেন্দ্রভূমিতেও বিরল। তিনি অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না। তুমি বিমলনন্দীকে উঠাও। কমল, তুমি আমাদের দণ্ডধরগণকে ডাকিয়া আন।

প্রমথসিংহের আহ্বানে বিমলনন্দী চক্ষু মার্জ্জনা

করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন এবং বস্ত্রাবাসের সম্মুখে ভূমিতে উপবিষ্ট সামন্তরাজগণকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কমলসিংহের আহ্বানে কয়েকজন দণ্ডধর বস্ত্রাবাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, রাজগণ তাহাদিগকে স্ব স্ব সেনাযাত্রার জন্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। বিমলনন্দী বিস্মিত হইয়া ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, ব্যাপার কি?" ভীষ্মদেব হাসিয়া কহিলেন, "আমরা এখনই শোণ পার হইবার আয়োজন করিতেছি। তুমি তোমার সেনাদলকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া পাঠাও। মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইলেই যাত্রার আদেশ প্রচারিত হইবে।" বিমলনন্দী বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহা দেখিয়া প্রমথসিংহ কহিলেন, "ওহে নন্দীপুত্র! আমরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে এখানে বসিয়া আছি এবং যাত্রার বিষয়ে আমরা সকলেই একমত, সুতরাং মহারাজ কখনই আমাদিগকে বারণ করিবেন না।"

বিমলনন্দী একজন অশ্বারোহীকে স্বীয় সেনাদলে পাঠাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে গোবিন্দদাস সামন্তরাজগণের জন্য আসন লইয়া আসিল, তাহা দেখিয়া প্রমথসিংহ কহিলেন, "আর আসনে প্রয়োজন নাই, যুদ্ধ যাত্রার পক্ষে দুর্ব্বাদলই সুখাসন।" এই সময়ে যুদ্ধযাত্রার সংবাদ শুনিয়া স্কন্ধাবারে সেনাদল উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল; কেহ কেহ গৌড়েশ্বরের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল, কোলাহলে ধর্ম্মপালদেবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বস্ত্রাবাসের বাহিরে আসিবামাত্র সামন্তরাজগণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সেই সময়ে প্রমথসিংহ দেখিতে পাইলেন যে, বৃদ্ধ উদ্ধবঘোষ কাহাকে প্রণাম করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনি পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, বিশ্বানন্দ ও মহরাজ চক্রায়ুধের সহিত জনৈক শীর্ণকায় মুণ্ডিতমস্তক বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ধর্ম্মপালদেব ও সামন্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চক্রায়ুধকে অভিবাদন করিলেন। ধর্ম্মপালদেব কহিলেন, "প্রভু কখন আসিলেন? আমি কল্য রাত্রিতে দ্বিতীয় প্রহরাবধি জাগিয়া ছিলাম, কিন্তু আপনাদের আগমনসংবাদ ত পাই নাই?"

বিশ্বা।— মহারাজ, আমরা এইমাত্র আসিলাম আমাদিগের সঙ্গে একজন নূতন লোক আসিয়াছেন।

ধর্ম্ম।— কে?

বিশ্বা।— চিনিতে পারেন কি?

সন্ন্যাসী সরিয়া দাঁড়াইলেন, ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে. গৌড়ের মণিদত্তের জীর্ণ গৃহে যে বৃদ্ধ ভিক্ষু তাঁহাকে ত্রিরত্ন স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইয়াছিলেন,— তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মহাস্থবির বুদ্ধভদ্র ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, মগধদেশে প্রকাশ্য রাজ সভায় শত শত বর্ষ পরে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু স্বেচ্ছায় আগমন করিয়াছে।"

ধর্ম্মপালদেব সহাস্যে কহিলেন, "মহাস্থবির! স্বাগত।"

এই সময়ে অবসর বুঝিয়া বৃদ্ধ উদ্দন্তপুররাজ কহিলেন, "মহারাজ! আমরা বহুক্ষণ রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতেছি।"

ধর্ম্ম।— তাত, অপরাধ মার্জ্জনা করুন—

ভীষ্ম।— যদি অদ্যই শোণ পার হইবার অনুমতি দেন, তাহা হইলে চেষ্টা করিতে পারি।

ধর্ম্ম।— অদ্যই?

প্রমথ।— এখনই। আমরা সমস্ত অশ্বারোহীসেনা প্রস্তুত রাখিয়াছি।

ধর্ম্ম।— ব্যবস্থা করিয়া তবে ত যাত্রা করিতে হইবে? ঢেক্করীরাজ! আপনি রণনীতিতে সুপণ্ডিত, পৃষ্ঠ রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া কেমন করিয়া শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিব?

জয়বর্দ্ধন।— মহারাজ! অধীনের নিবেদন এই যে, ভীষ্মদেবের সমস্ত কথা শুনিয়া আদেশ করিবেন।

ভীষ্ম।— মহারাজ! কান্যকুব্জরাজের সেনা মণ্ডলাদুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা মণ্ডলা ছাড়িয়া পলায়ন করিবার পরে আর তাহাদিগের দেখা পাওয়া যায় নাই; মণ্ডলার পরে মুদ্গগিরিতে অথবা হিরণ্যপর্ব্বতে, মণ্ডলাদুর্গে অথবা শোণ-সঙ্গমে তাহারা কোন স্থানেই মহারাজের সেনাকে বাধা দিতে ভরসা করে নাই। বিমলনন্দী পক্ষাধিককাল পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া শোণ-সঙ্গমে অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও শত্রুসেনার সাক্ষাৎ পায় নাই। কান্যকুব্জরাজের সেনা

সংখ্যায় অধিক নহে বলিয়া তাহারা দ্বিতীয় সেনাদলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই অবসরে তাহাদিগকে নির্ম্মূল করা কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় সেনাদল আসিয়া পড়িলে, শত্রুসৈন্য দুর্জ্জয় হইয়া উঠিবে।

ধর্ম্ম।— তাত! এই মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া কিরূপে শত্রুরাজ্য প্রবেশ করিব?

ভীষ্ম।— শত্রুরাজ্য কোথায়? করুষদেশ কখনও কান্যকুব্জরাজের অধীনতা স্বীকার করে নাই।

জয়বর্দ্ধন।— মহারাজের সহিত পঞ্চ সহস্র সেনা আসিয়াছে, বিমলনন্দী পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া শোণ-সঙ্গমে অপেক্ষা করিতেছে, এই দশ সহস্র সাম্রাজ্যের সেনা, এতদ্ব্যতীত আমাদিগের শরীররক্ষী অশ্বারোহী-সেনার সংখ্যাও দুই সহস্রের অধিক হইবে। এই দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী কি বারাণসী অধিকার করিতে পারে না?

বিমল।— নিশ্চয় পারে। দ্বাদশ সহস্র কেন, আমি অনুমতি পাইলে আমার পঞ্চ সহস্র লইয়া বারাণসী ছাড়াইয়া কান্যকুব্জে উপস্থিত হইতে পারিতাম।

প্রমথ।— আমাদিগের পদাতিক সেনা এখনও কত দূরে আছে?

বিশ্বা।— তাহারা চেষ্টা করিলে তিন চারি দিনে এই স্থানে আসিতে পারিবে।

ভীষ্ম।— পদাতিক সেনা আসিয়া পড়িলে চরণাদ্রি অথবা বারাণসী অবরোধ করা যাইবে; কিন্তু এখন শোণ-সঙ্গম হইতে চরণাদ্রি পর্য্যন্ত প্রদেশ অশ্বারোহী সেনার সাহায্যে করায়ত্ত হইতে পারে।

কমলসিংহ।— মহারাজ, যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত; আপনি আদেশ করিলেই নাসীরগণ অগ্রসর হয়।

ধর্ম্ম।— শোণ-সঙ্গম রক্ষা করিবে কে?

বিমল।— মহারাজ, আমি পারিব না; আমাকে রাখিয়া গেলে আমি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব।

ধর্ম্ম।— তবে কে থাকিবে? ভীষ্মদেব, আপনি?

ভীষ্ম।— মহারাজ! অসম্ভব; বৃদ্ধ ভীষ্ম আজীবন অশ্বারোহী সেনা পরিচালনা করিয়াছে, দুর্গ রক্ষা অথবা তীর্থ রক্ষা তাহার কার্য্য নহে।

প্রমথ।— মহারাজ! এই যুদ্ধে কেহই শোণতীরে পড়িয়া থাকিতে প্রস্তুত নহে। সকলেই ভরসা করিয়া আসিয়াছে যে, বারাণসী, চরণাদ্রি, প্রতিষ্ঠান অথবা কান্যকুব্জের যুদ্ধে জয়লাভ করিবে।'

ধর্ম্ম।— কিন্তু পৃষ্ঠরক্ষা ত আবশ্যক?

উদ্ধব।— মহারাজ, আপনারা সকলেই যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত, সুতরাং আপনারা সকলেই অগ্রসর হউন, আমি পৃষ্ঠরক্ষার জন্য শোণ-সঙ্গমে অপেক্ষা করিব। কিন্তু মহা-রাজের চরণে নিবেদন করিয়া রাখিতেছি যে, পদাতিক সেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেই আমি তাহাদিগের সহিত যাত্রা করিব।

ভীষ্ম।— উদ্ধব! তখন আর শোণ-সঙ্গম রক্ষার জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না।

ধর্ম্ম।— উত্তম।

ভীষ্ম।— মহারাজ! যাত্রার আদেশ করুন।

ধর্ম্ম।— উদ্ধবঘোষের সহিত কত সৈন্য থাকিবে?

জয়বর্দ্ধন।— দুই সহস্র থাকিলেই যথেষ্ট।

রণসিংহ।— তাহা হইলে অবশিষ্ট পাঁচসহস্র এখন নদ পার হইতে পারে?

ধর্ম্ম।—হাঁ।

ভীষ্ম।— যে পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী পাটলিপুত্রে আছে, তাহারা অদ্য সন্ধ্যায় এখানে আসিয়া পৌঁছিবে; উদ্ধব! তুমি অদ্যই তাহাদিগকে নদী পার হইতে আদেশ করিও।

ভীষ্মদেবের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রমথসিংহ ও রণসিংহ শঙ্খধ্বনি করিলেন। শঙ্খধ্বনি শ্রবণমাত্র সেনা-দলে শত শত শঙ্খ ও শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল; তুরী ও ভেরী বাদকগণ তীরভূমি পরিত্যাগ করিয়া শোণের বালুকাময় গর্ভে অবতীর্ণ হইল। পরক্ষণেই সহস্র সহস্র অশ্বখুরোত্থিত ধূলি শোণ-গর্ভ অন্ধকার করিয়া তুলিল, গৌড়ীয় নাসীরগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে সার্দ্ধক্রোশব্যাপী বালুকাক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া শোণের পরপারে পৌঁছিল! ধর্ম্মপাল ও সামন্তরাজগণ তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বারাণসীর যুদ্ধ।

গৌড়ীয় অশ্বারোহী সেনা শোণ পার হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইল। সহস্র সেনা লইয়া ধর্ম্মপালদেব, ভীষ্মদেব, বীরদেব ও প্রমথসিংহ নদের অনতিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। রণসিংহ, কমলসিংহ, জয়বর্দ্ধন ও বিমলনন্দী প্রত্যেকে পঞ্চশত সেনা লইয়া শত্রুসৈন্যের সন্ধানে ধাবিত হইলেন। সহস্র অশ্বারোহী লইয়া চক্রায়ুধ ধীরে ধীরে বারাণসীর পথে অগ্রসর হইলেন। অপর সহস্র লইয়া বিশ্বানন্দ পরদিন তাঁহার অনুগমন করিবেন স্থির হইল। ভীষ্মদেবের পরামর্শে ধর্ম্মপালদেব আদেশ করিলেন যে, কোন সেনাপতি দুই দিনের অধিককাল স্কন্ধাবার হইতে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। বিমলনন্দী আদেশ শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে শিবির হইতে নির্গত হইলেন।

গৌড়ীয়সেনা দুইদিবসের মধ্যে করূষদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অবশিষ্ট পঞ্চসহস্র সেনা আসিয়া পৌঁছিলে ধর্ম্মপালদেব স্কন্ধাবার লইয়া অগ্রসর হইলেন। দ্বিতীয় দিবসে দ্বিসহস্র সেনা লইয়া ভীষ্মদেব ও ধর্ম্মপাল স্কন্ধাবারে রহিলেন; অবশিষ্ট চারিসহস্র প্রমথসিংহ ও বীরদেবের সহিত বারাণসীর পথে অগ্রসর হইল। তৃতীয় দিবসে বিমলনন্দী স্কন্ধাবারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না দেখিয়া ভীষ্মদেব পঞ্চশত সেনা লইয়া চতুর্থ দিবস প্রভাতে তাঁহার সন্ধানে যাত্রা করিলেন। পঞ্চমদিবসে বারাণসীর নিকটে আসিয়া ধর্ম্মপালদেব দেখিতে পাইলেন, যে, ভাগীরথীর পরপারে গৌড়ীয় সেনার বিস্তৃত স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছে এবং নৌকাযোগে সহস্র সহস্র সেনা নদী পার হইয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। ধর্ম্মপালদেব বিস্মিত হইয়া দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন। পথে প্রমথসিংহ, বিশ্বানন্দ ও বীরদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সম্রাট সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, ব্যাপার কি? কাহার সেনা পার হইতেছে?"

বিশ্বানন্দ।— মহারাজ! ব্যাপার অতি গুরুতর। গৌড়ীয়সেনা নদী পার হইতেছে।

প্রমথ।— বিমলনন্দী তিনদিনে সপ্ততি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, চতুর্থ দিবসে গঙ্গা পার হইয়া বারাণসী আক্রমণ করিয়াছে। নগরে কান্যকুব্জরাজের দশসহস্রের অধিক সৈন্য আছে, কিন্তু বিমলনন্দী পঞ্চশত সেনা লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। মহারাজ চক্রায়ুধ সেই দিন সন্ধ্যাকালে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া বিমলনন্দীর সংবাদ পাইয়া নদী পার হইয়াছেন। তাঁহার সেনা উপস্থিত না হইলে পঞ্চশত গৌড়ীয় বীরের একজনও জীবিত থাকিত কি না সন্দেহ। কান্যকুব্জরাজের আদেশে বারাণসীভুক্তির অধিকাংশ নৌকা দগ্ধ হইয়াছে। যে কয়খানি নৌকা আছে, তাহাতে একদিনে পঞ্চশতের অধিক সেনা পার হইতে পারে না।

ধর্ম্ম।— উপায়?

বিশ্বা।— ভীষ্মদেব নদীতীরে উপস্থিত আছেন। তাঁহার আদেশে রণসিংহ তাঁহার সেনা লইয়া নৌকার সন্ধানে চরণাদ্রি অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। জয়বর্দ্ধনের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

ধর্ম্ম।— আমাদিগের কত সৈন্য পার হইয়াছে?

বীর।— বিমলনন্দীর সেনা লইয়া সার্দ্ধ দ্বিসহস্র।

ধর্ম্ম।— নদীতীরে কত সৈন্য আছে?

বীর।— প্রায় সপ্তসহস্র।

সকলে অগ্রসর হইয়া জাহ্নবীতীরে স্কন্ধাবারে পৌঁছিলেন। গৌড়ীয়সেনা সম্রাটের আগমনসংবাদ শুনিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সপ্তসহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে বিশ্বনাথের পাষাণনির্ম্মিত মন্দিরচূড়া কম্পিত হইল। জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বরণাসঙ্গমে গৌড়ীয়-সেনা সিংহনাদ করিয়া উঠিল। সম্রাট আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বিমলনন্দী ও চক্রায়ুধ দ্বিগুণ উৎসাহে নগরপ্রাকার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দশসহস্রের সহিত দ্বিসহস্রের যুদ্ধ অধিকক্ষণ সম্ভব নহে; বরণানদী ও আদি-কেশবের ঘাট গৌড়ীয়সেনার রক্তে রঞ্জিত হইল, দুর্গপ্রাকার অধিকৃত হইল না।

সন্ধ্যাকালে নৌকাগুলি বারাণসী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সম্রাট ভীষ্মদেব ও বিশ্বানন্দকে স্কন্ধাবারে রাখিয়া দ্বিশত সেনা সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিলেন। প্রমথ-সিংহ, বীরদেব ও কমলসিংহ সম্রাটের সহিত বারাণসী

যাত্রা করিলেন। রজনীর প্রথম প্রহরে ধর্ম্মপাল বরণা-সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। রুধিরাপ্লুতদেহে বিমলনন্দী ও চক্রায়ুধ নদীতীরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। বিমলনন্দীর অবস্থা দেখিয়া সম্রাটের ক্রোধ দূর হইল, তিনি বিমলনন্দীকে আলিঙ্গন করিয়া যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিমলনন্দী কহিলেন, "মহারাজ, যে পঞ্চশত শোণতীর হইতে আমার সহিত যাত্রা করিয়াছিল, তাহাদিগের একজনও জীবিত নাই, তাহারা সকলেই মহারাজের কার্য্যে পুণ্য বারাণসীধামে শিবত্ব পাইয়াছে। মহারাজ! পঞ্চশত গৌড়ীয় বীরের মধ্যে একজনও বরণার পরপারে দেহত্যাগ করে নাই, তাহারা বারাণসী অধিকার করিতে পারে নাই বটে কিন্তু সকলেই বারাণসীর দুর্গপ্রাকারে অথবা আদি কেশবের ঘাটের পাষাণনির্ম্মিত সোপানে দেহত্যাগ করিয়াছে।" বলিতে বলিতে বিমলনন্দীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! ইন্দ্রায়ুধের আদেশে সমস্ত নৌকা দগ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি? যে কয়খানি নৌকা আছে তাহাও যদি দগ্ধ হইত তাহা হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না, আপনার সম্মুখে অদ্য রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই বারাণসী অধিকার করিব, নতুবা"—

ধর্ম্মপালদেব বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নতুবা কি বিমল?"

"নতুবা কল্য প্রভাতে সূর্য্যদেব জাহ্নবীর উত্তরতটে একজনও গৌড়ীয় সেনা জীবিত দেখিতে পাইবেন না।"

"তাহাই হউক বিমল; যদি বারাণসী অধিকৃত হয়, তাহা হইলে অদ্য রাত্রিতেই হইবে, নতুবা নহে।"

প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া চক্রায়ুধ শিহরিয়া উঠিলেন; "মহারাজাধিরাজ! একি ভীষণ প্রতিজ্ঞা? আমার জন্য কি অদ্য গৌড়ের সিংহাসন শূন্য হইবে?"

"মহারাজ! অদ্য রজনীতে গৌড়সিংহাসন শূন্য করা যদি বিধাতার ঈপ্সিত হয়, তাহা হইলে কে তাহা নিবারণ করিতে পারিবে? নন্দীপুত্রের কথা সত্য হইবে। অদ্য রাত্রিতে ঐ ধূসরবর্ণ পাষাণপ্রাকারে বিশ্রাম করিব, নতুবা"—

"কল্য প্রভাতে জাহ্নবীর উত্তরতীরে অস্ত্রধারণক্ষম একজন গৌড়বাসীও জীবিত থাকিবে না।"

"তাহাই হউক। বিমল, চক্রধ্বজ-হস্তে আমি নাসীরগণের অগ্রগামী হইব। তুমি সমস্ত সেনাকে তরবারি ও জাহ্নবীজল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে বল, অদ্যরাত্রিতে বারাণসী অধিকৃত না হইলে যেন কোন অস্ত্রধারণক্ষম গৌড়বাসী শিবিরে প্রত্যাগমন না করে।"

খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর শেষভাগে যে-সকল গৌড়বাসী ধর্ম্মপালদেবের সহিত চক্রায়ুধের সাহায্যার্থ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বে কখনও গৌড় বা মগধ হইতে বিদেশে যায় নাই। গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের অধঃপতনের পর হইতে শতবর্ষব্যাপী অরাজকতার সময়ে বারম্বার বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এতদিন তাহারা হয়ত কেবল আত্মরক্ষা করিয়াছে, নতুবা আক্রমণকারীকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি গৌড়ীয়সেনা শত্রুরাজ্য আক্রমণ করে নাই। এই কারণে ভীষ্মদেব, প্রমথসিংহ প্রভৃতি বিজ্ঞ সেনানায়কগণ বিমলনন্দীর কার্য্যে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট স্বয়ং ও অল্পবয়স্ক নায়কগণ কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। গৌড়ীয় সেনা বিদেশে যুদ্ধাভিযানের আস্বাদন পাইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত পুরাতনসেনা যে স্থানে যাইতে বা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ভীত অথবা চিন্তিত হইত, নূতন গৌড়ীয় সেনা তাহা অবিচলিতভাবে সম্পন্ন করিতেছিল; এই জন্যই বিমলনন্দী ও চক্রায়ুধের সেনাদল অসাধ্যসাধন করিতেছিল। সমগ্র অশ্বারোহীসেনা নদী পার করিবার জন্য ভীষ্মদেব, প্রমথসিংহ ও বিশ্বানন্দ যখন আকুল হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধ ও বিমলনন্দী দ্বিসহস্র সেনা লইয়া অন্ধকার রজনীর দ্বিতীয় যামে, বারাণসীর পাষাণপ্রাকার অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

নবীন সম্রাটের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া প্রমথসিংহ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিয়া বাধা দিতে ভরসা করিলেন না। তিনি কয়েকজন

উল্কাধারী লইয়া শিবির রক্ষার জন্য বরণানদীর পূর্ব্বকূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, বারাণসীর শত শত মন্দিরে আরত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদ যখন থামিয়া গেল, তখন চক্রধ্বজ-হস্তে ধর্ম্মপাল বরুণার জলে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে কমলসিংহ, বীরদেব, চক্রায়ুধ ও বিমলনন্দী, তাঁহাদিগের পশ্চাতে দ্বিসহস্র গৌড়ীয়সেনা। কান্যকুব্জের সেনা রাত্রিকালে বিপক্ষপক্ষের আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রাচীরে শত শত উল্কা জ্বলিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র অস্ত্রধারী পুরুষে ধূসরবর্ণ নগরপ্রাকার আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সম্রাট নিরাপদে নদী পার হইয়া প্রাকার-তলে উপস্থিত হইলেন, মুষলধারে শিলা ও অস্ত্র বৃষ্টি হইতেছিল, কটাহ কটাহ উত্তপ্ত তৈল ও গলিত সীসক দুর্গপ্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি প্রাচীরে শত শত অবরোহনী লগ্ন হইল। নক্ষত্রবেগে গৌড়ীয় সেনা বারাণসীর প্রাচীরে আরোহণ করিল, অপরিমিত লোকসংখ্যা সত্ত্বেও কান্যকুব্জের সেনা হটিতে লাগিল। তাহাদিগের অগ্রভাগে একজন বর্ষীয়ান যোদ্ধা যুদ্ধ করিতেছিল, সে বিমলনন্দী কর্তৃক নিরস্ত্র হইল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করিল না; তাহা দেখিয়া বিমলনন্দী তাহাকে সংহার করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিলেন। কিন্তু উত্তোলিত অসি শূন্যমার্গে রহিয়া গেল, এক লম্ফে চক্রায়ুধ তাহাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "বিমল, জয়সিংহ আমার বন্দী, ইহাকে রক্ষা কর।"

ধর্ম্মপাল ও কমলসিংহ, চক্রায়ুধের আচরণে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নগরের অন্যস্থানে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং গৌড়ীয় সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া কান্যকুব্জের সেনা প্রাকার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সম্রাট প্রাকার হইতে অবতরণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে রক্তাক্তকলেবর জনৈক যোদ্ধা তাঁহাকে অভিবাদন করিল; তাহার হস্তে গৌড়ীয় চক্রধ্বজ দেখিয়া ধর্ম্মপাল বুঝিতে পারিলেন, যে, সে ব্যক্তি স্বপক্ষীয়। সম্রাট বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" সৈনিক হাসিয়া উত্তর করিল, "মহারাজ! ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন, আমি জয়-বর্দ্ধন।" তখন সম্রাট, কমলসিংহ, বীরদেব ও বিমলনন্দী তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন।

জয়বর্দ্ধন নৌকার অনুসন্ধানে চরণাদ্রি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু পথে কতকগুলি নৌকা পাইয়া নদী পার হইয়াছিলেন। তিনি অসিসঙ্গমে আসিয়া শুনিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয়সেনা বরণাসঙ্গম আক্রমণ করিয়াছে। নগরপ্রাকারের অন্য কোন স্থান আক্রান্ত হয় নাই দেখিয়া অধিকাংশ নগররক্ষীসেনা বরণাসঙ্গমে আসিয়াছিল; তিনি সেই অবসরে অসিসঙ্গমের নিকটে মুষ্টিমেয় শত্রুসৈন্য পরাজিত করিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। পরাজিত, ভীত, নেতৃহীন কান্যকুব্জের সেনা অনতিবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিল, তখন প্রমথসিংহ নগরে প্রবেশ করিয়া প্রাকার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে ধর্ম্মপাল ও প্রমথসিংহ বিস্মিত হইয়া দেখি-লেন, যে, সহস্র সহস্র অশ্ব সন্তরণে নদী পার হইতেছে; তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অশ্বগুলি নিকটবর্ত্তী হইলে প্রমথসিংহ কহিলেন, "মহারাজ! ইহারা গৌড়ীয়সেনা, দেখুন বহু অশ্বপৃষ্ঠে চক্রধ্বজ স্থাপিত আছে।" অর্দ্ধদণ্ডপরে দেখা গেল অশ্বের বল্গা দন্তে লইয়া বৃদ্ধ ভীষ্মদেব মণিকর্ণিকার পাষাণ-নির্ম্মিত সোপানে আরোহণ করিতেছেন; সম্রাট সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভীষ্মদেব কি হইয়াছে?"

ভীষ্ম।— মহারাজ দ্বিসহস্র সেনা লইয়া চক্রধ্বজ-হস্তে বারাণসী আক্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া সমগ্র গৌড়ীয়-বাহিনী সন্তরণে নদীপার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অসাধ্যসাধনের উদাহরণ জগতে দুর্লভ, আপনার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, আপনার সেনাদল রণোন্মত্ত হইয়াছে। ক্লান্ত, শীতার্ত্ত, সিক্ত, অনশনক্লিষ্ট গৌড়ীয়সেনা এখনই প্রতিষ্ঠান যাত্রা করিতে প্রস্তুত।

ভীষ্মদেবের কথা শুনিয়া প্রমথসিংহ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ! আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। গৌড়ীয়-সেনা দীর্ঘাভিযানে অনভ্যস্ত হইলেও দুর্জ্জেয়। কান্যকুব্জযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। বারাণসীর যুদ্ধের ফল শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রায়ুধের সেনা আমাদিগের সম্মুখীন হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভিল্লমালে ইন্দ্রায়ুধ

রজনীর শেষভাগে ভিল্লমাল নগরের পূর্ব্বতোরণে বাদকগণ মঙ্গলবাদ্য আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে; তোরণে তখনও প্রদীপ জ্বলিতেছে, চতুর্থযামের প্রতীহারগণ অবসর প্রাপ্তির ভরসায় আনন্দিত হইয়াছে। দূরে নগরের পশ্চাদ্ভাগে গিরিশীর্ষ উষার শুভ্র আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, দুইএকজন নগরবাসী পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু নগরের তোরণ-চতুষ্টয় তখনও রুদ্ধ। মঙ্গলবাদ্যের বংশীবাদক বংশীধ্বনি আরম্ভ করিবামাত্র বহির্দেশ হইতে পূর্ব্বতোরণের কবাটে কে করাঘাত করিলেন। একজন প্রতীহার জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"শীঘ্র তোরণ মুক্ত কর।"

"এখনও সময় হয় নাই।"

"তাহা হউক, শীঘ্র কবাট মুক্ত কর।"

প্রতীহার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

"কেন?"

"তুমি কি বিদেশী?"

"কেন বল দেখি?"

"তুমি বোধ হয় গুর্জ্জর রাজ্যের রীতি নীতি জান না? রাত্রি শেষ না হইলে স্বয়ং মহারাজ গুর্জ্জরেশ্বর আসিলেও রাত্রিকালে ভিল্লমাল নগরের তোরণ মুক্ত হয় না।"

"রাত্রি ত শেষ হইয়া গিয়াছে?"

"এখনও অর্দ্ধদণ্ড বিলম্ব আছে।"

"তবে তুমি গিয়া রাজসমীপে নিবেদন কর যে, মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক পরম সৌগত অশেষ-ভূপাল-মৌলি-মুকুটমণি"—

"কি বলিলে?"

"—কান্যকুব্জেশ্বর আসিয়াছেন।"

"ভাল, আর একটু অপেক্ষা করিতে বল।"

"সে কি?"

"ঐখানে একটু বসিতে বল।"

"তুমি কি ভাল শুনিতে পাও নাই? স্বয়ং কান্যকুব্জেশ্বর নগরদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।"

"উত্তম; আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে।"

"অসম্ভব। তুমি শীঘ্র তোরণ মুক্ত করিয়া মহারাজ নাগভট্টকে সংবাদ দাও, বলিয়া আইস যে, স্বয়ং মহারাজাধিরাজ ভিল্লমাল-নরপতির অতিথি।"

"ভাল; কিঞ্চিৎ বিলম্বে অতিথিশালায় যাইতে বলিও।"

তোরণের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া যে ব্যক্তি প্রতীহারের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল, সে হতাশ হইয়া ফিরিল। পাষাণনির্ম্মিত বিশাল তোরণের অনতিদূরে একখানি চতুরশ্ববাহিত বিচিত্রকারুকার্য্যখচিত রথ অপেক্ষা করিতেছিল, আগন্তুক রথের নিকটে আসিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজাধিরাজ কি জাগিয়া আছেন?"

রথের ঘন যবনিকার অন্তরাল হইতে এক ব্যক্তি কহিলেন, "হাঁ, আমি জাগিয়া আছি। ভানুগুপ্ত! তুমি নিকটে আইস।"

আগন্তুক নিকটে সরিয়া গিয়া কহিল, "মহারাজ!"

রথারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় আসিয়াছি?"

"ভিল্লমাল নগরে।"

"তবে যবনিকা উঠাও, আমি নামিব।"

"মহারাজ! রথ নগর-তোরণের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।"

"কেন?"

"তোরণদ্বার রুদ্ধ।"

"আমার আগমনসংবাদ জানাইয়াছ?"

"হাঁ; কিন্তু প্রভাত হয় নাই বলিয়া তোরণ এখনও রুদ্ধ রহিয়াছে।"

"গুর্জ্জররাজকে কি সংবাদ পাঠাইয়াছ?"

"পাঠাইয়াছি; কিন্তু তাঁহার বোধ হয় এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।"

এই সময়ে দিবসের প্রথম প্রহরের আরম্ভসূচক মঙ্গলবাদ্য শেষ হইল, সশব্দে অসংখ্য লৌহকীলকবদ্ধ গুরুভার কবাটদ্বয় মুক্ত হইল। সারথি ইন্দ্রায়ুধের আদেশ লইয়া রথ চালনা করিল, প্রতীহারগণ তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না; ভানুগুপ্ত অশ্বারোহণে রথের পশ্চাতে পুরপ্রবেশ করিল।

ভিল্লমাল নগরের পথে বহু অশ্ব, রথ ও শকট দেখিয়া রথারোহী সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরুণ, গুর্জ্জর-রাজ আমার অভ্যর্থনার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?"

সারথি সবিস্ময়ে কহিল, "কিছুই না।"

"বহু রথচক্র ও অশ্বখুরের শব্দ পাইতেছি?"

"মহারাজাধিরাজ, ইহারা স্বার্থবাহ, নগরদ্বার মুক্ত হইয়াছে বলিয়া বাহিরে যাইতেছে।"

অবিলম্বে রথ গুর্জ্জররাজপ্রাসাদের তোরণে আসিয়া দাঁড়াইল; রথের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দুই একজন দণ্ডধর অগ্রসর হইয়া আসিল ও ভানুগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁহার রথ?"

"মহারাজাধিরাজ কান্যকুব্জমহোদয় কুশস্থলেশ্বর ইন্দ্রায়ুধদেবের।"

ইন্দ্রায়ুধের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একজন দণ্ডধর দ্রুতপদে প্রাসাদে প্রবেশ করিল, দ্বিতীয় দণ্ডধরের আদেশে দৌবারিকগণ তোরণ হইতে প্রাসাদের সোপান পর্য্যন্ত বহুমূল্য বস্ত্র বিছাইয়া দিল। তাহার পরে ইন্দ্রায়ুধ রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি যেমন সোপান-শ্রেণীতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময়ে প্রাসাদের প্রথম কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল, একজন শুভ্রবসনপরিহিত পুরুষ দ্রুতপদে সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে দশজন রাজপুরুষ ছত্র, চামর, সুবর্ণনির্ম্মিত রাজদণ্ড প্রভৃতি রাজচিহ্ন হস্তে লইয়া নামিয়া আসিল। ইন্দ্রায়ুধ তাহা-দিগকে দেখিয়া নিম্নের সোপানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুভ্রবসনপরিহিত পুরুষ সহাস্যে কহিলেন, "মহারাজ স্বাগত। পথে কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই ত?"

"না। তবে নগরতোরণে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, কারণ যখন আমার রথ আসিয়া পৌঁছিল তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই।"

শুভ্রবসনপরিহিত পুরুষ কান্যকুব্জরাজের কথার উত্তর না দিয়া কহিলেন, "মহারাজ! প্রাসাদে প্রবেশ করুন।" ইন্দ্রায়ুধ গুর্জ্জররাজের হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধপথে নাগভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের ছত্রধর ও দণ্ডধর কি সঙ্গে আসে নাই?" ইন্দ্রায়ুধ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "না।"

"চক্রায়ুধ কি কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছে?"

"না।"

উত্তর শুনিয়া নাগভট্ট বিস্মিত হইয়া ইন্দ্রায়ুধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; ইন্দ্রায়ুধ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। গুর্জ্জররাজের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ দশজন পরিচারক ছত্র, দণ্ড, চামর প্রভৃতি রাজচিহ্ন লইয়া কান্যকুব্জরাজকে বেষ্টন করিল। উভয়ে পুনরায় সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিঞ্চিৎদূর অগ্রসর হইয়া নাগভট্ট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, চক্রায়ুধ এখন কোথায়?" ইন্দ্রায়ুধ কহিলেন, "বোধ হয় প্রতিষ্ঠানে।" গুর্জ্জররাজ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনি নগর ত্যাগ করিলেন কেন?" খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উত্তরপথে নগর বলিতে কান্যকুব্জ বা মহোদয় বুঝাইত। ইন্দ্রায়ুধ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "চক্রায়ুধকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, আমি মহারাজের সৈন্য লইয়া যাইবার জন্য ভিল্লমালে আসিয়াছি। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নগর পরিত্যাগ করিয়াছিলাম বলিয়া ভৃত্যবর্গ সঙ্গে আসিতে পারে নাই।"

"মহারাজের সেনা কি কোন স্থানে চক্রায়ুধের গতিরোধ করিয়াছিল?"

"হাঁ; বারাণসীতে দশ সহস্র সেনা ছিল, কিন্তু ধর্ম্মপাল দুই তিন সহস্র সেনা লইয়া অনায়াসে বারাণসী অধিকার করিয়াছে।"

"চরণাদ্রি বা প্রতিষ্ঠানে কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কি?"

"হাঁ, চরণাদ্রি অধিকৃত হইয়াছে।"

"প্রতিষ্ঠান?"

"বোধ হয় এখনও শত্রুহস্তগত হয় নাই।"

নাগভট্ট বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। ইন্দ্রায়ুধ অতি দীনভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কবে যুদ্ধযাত্রা করিবেন?" গুর্জ্জররাজ ধীরভাবে কহিলেন, "মহারাজ এখন পরিশ্রান্ত। অগ্রে বিশ্রাম করুন, পরে যুদ্ধাভিযানের মন্ত্রণা করিব।"

প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া নাগভট্ট কান্যকুব্জরাজকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া গেলেন ও তাঁহার সেবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিয়া স্বয়ং বাহিরে আসিলেন। ইন্দ্রায়ুধের কক্ষের দ্বারে জনৈক প্রৌঢ়যোদ্ধা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া নাগভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহুক, কতক্ষণ আসিয়াছ?" যোদ্ধা কহিলেন, "এই মাত্র। ইন্দ্রায়ুধ আসিয়া পৌঁছিয়াছে?"

"হাঁ; তোমার কথাই সত্য, চক্রায়ুধ বারাণসী ও চরণাদ্রি অধিকার করিয়াছে শুনিয়া এই কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয়াধম রাজা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বাহুক, এখন কান্যকুব্জ অধিকার করাই শ্রেয়। ইন্দ্রায়ুধ পুরুষ নহে, রমণী; তাঁহাকে কান্যকুব্জে রাখিয়া কোনও ফল নাই।"

"পিতৃপিতামহের রাজধানী কি ত্যাগ করিতে আছে? গুর্জ্জরের বাহুতে যদি বল থাকে, তাহা হইলে ভিল্লমালই কালে কান্যকুব্জ হইয়া উঠিবে।"

"কিন্তু ইন্দ্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করা বৃথা। ইহাকে শতবার কান্যকুব্জের অধিকার প্রদান করিলেও কোন ফল হইবে না। চক্রায়ুধ যতবার কান্যকুব্জ আক্রমণ করিবে, এই ব্যক্তি ততবারই আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া পলায়ন করিবে।"

"তবে ইহাকে বন্দী করিয়া চক্রায়ুধের পক্ষ অবলম্বন করা যাউক।"

"এখন আর চক্রায়ুধকে কোথায় পাইবে? সে এখন বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া কান্যকুব্জে ফিরিতেছে, গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল তাহার সহায়। আমরা চিরদিন তাহার পিতার ও তাহার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া আসিয়াছি। এখন কি আর চক্রায়ুধ গুর্জ্জরের কথায় বিশ্বাস করিবে?"

"সত্য বটে। চক্রায়ুধ এখন কোথায়?"

"শুনিয়াছি প্রতিষ্ঠানে। বারাণসী ও চরণাদ্রি ধর্ম্মপালের হস্তগত হইয়াছে। আর ইন্দ্রায়ুধ যখন পলাইয়া আসিয়াছে তখন এতদিন সমস্ত কান্যকুব্জরাজ্যই বোধ হয় ধর্ম্মপালের অধীন হইয়াছে।"

"ইন্দ্রায়ুধ কি বলিল?"

"জিজ্ঞাসা করিল আমরা কবে যুদ্ধে যাইব।"

"কি বলিলে?"

"কিছুই না।"

"উত্তম; উহাকে কিছুদিন ভিল্লমালে বন্দী করিয়া রাখ।"

"কিন্তু যুদ্ধে ত যাইতে হইবে?"

"তুমি পাগল হইয়াছ? এই রমণীর অধম রাজার জন্য কেন বৃথা পরিশ্রম করিব?"

"সত্য ভঙ্গ হইবে না?"

"নাহড়, তোমার বুদ্ধিটি অতি স্থূল। রাষ্ট্রনীতিতে কি সত্যাসত্য আছে?"

"তবে কি করিব?"

"নিশ্চিন্ত মনে অতিথিসৎকার।"

"দেখ বাহুক, তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদী, ক্রূরস্বভাব নিষ্ঠুর মনুষ্য আমি আর কখনও দেখি নাই।"

"দেখ নাহড়, এই বাহুকধবল না থাকিলে বৎসরাজের দিগ্বিজয় সম্পন্ন হইত কি না জানি না এবং তাঁহার পুত্রের রাজ্যও বোধ হয় চলিত না।"

"সত্য। তবে চল সভায় যাই।"

"চল।"

"ইন্দ্রায়ুধকে সঙ্গে লইব?"

"না।"

"দেখ বাহুক, গৌড়গণ নিতান্ত সামান্য নহে, ধর্ম্মপাল দ্বিসহস্র সেনা লইয়া দশ সহস্র কর্ত্তৃক রক্ষিত বারাণসীদুর্গ অধিকার করিয়াছে।"

"সত্য নাকি? কিন্তু বৎসরাজের সময়ে গৌড়বাসী অশ্বারোহী দেখিলে ভয়ে পলায়ন করিত।"

"বাহুক, নাগসেন কোথায়?"

"কারাগারে; অদ্য তাহার বিচার হইবে। নাহড়, বৃদ্ধ পুরোহিতের প্ররোচনায় অধর্ম্মাচরণ করিও না।"

"তুমি যে বলিলে রাষ্ট্রনীতিতে সত্যাসত্য নাই?"

"ইহা রাষ্ট্রনীতি নহে; রাজনীতি।"

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নির্ব্বাণ।

মোটামুটি ধরিতে গেলে নির্ব্বাণ শব্দে প্রদীপের ন্যায় নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি প্রদীপের ন্যায় একেবারে শেষ হইয়া যায়? আমি তপ, জপ, ধ্যান ধারণা করিব, আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবে শুদ্ধ আমার অস্তিত্বটি বিলোপ করিবার জন্য?

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ নিজে কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নির্ব্বাণের পাঁচ শত বৎসর পরে লোকে তাঁহার বক্তৃতার যেরূপ রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। তাহাও, আবার তিনি ঠিক যে ভাষায় বলিয়াছিলেন, সে ভাষার ত কিছুই পাওয়া যায় না। পালি ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট তৈয়ারি হইয়াছিল, সেই রিপোর্টমাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও ঐরূপ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার সহিতই নির্ব্বাণের তুলনা করে। কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে নির্ব্বাণের পর কি থাকে। সুতরাং নির্ব্বাণে যে একেবারে সব শেষ হইয়া যায়, তাঁহার শিষ্যেরা সেটা ভাবিতেও যেন ভয় পাইত।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অন্তত পাঁচ ছয় শত বৎসরের পর, কনিষ্ক রাজার গুরু অশ্বঘোষ সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য একখানি কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যেমন তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কবিরাজেরা মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়ায়, সেইরূপ আমি এই কঠিন বৌদ্ধধর্ম্মের মতগুলি কাব্যের আকারে লিখিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করিতেছি। তিনি নির্ব্বাণ সম্বন্ধে যাহা বলেন, সেটা বুদ্ধের কথার রিপোর্ট নহে, তাঁহার নিজেরই কথা। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের একজন প্রধান প্রচারক, প্রধান গুরু এবং প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার কথা আমাদের মন দিয়া শুনা উচিত। তিনি বলিয়াছেন:—

"প্রদীপ যেমন নির্ব্বাণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাশেও যায় না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যায় না; তৈলেরও শেষ, প্রদীপটিরও শেষ; সাধকও তেমনই ভাবে, নির্ব্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান না, আকাশেও যান না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যান না। তাঁহার সকল ক্লেশ ফুরাইয়া গেল। তাঁহারও সব ফুরাইয়া গেল, সব শান্ত হইল।"

এখানে কথা হইতেছে '—সব শেষ হইয়া গেল'—ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ?

অশ্বঘোষ স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও তাঁহার কাব্য হইতে বুঝিয়া লওয়া কঠিন নয় যে তিনি নির্ব্বাণশব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে, নির্ব্বাণের পর আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বেরও লোপ হইবে না।

পালি ভাষার পুস্তকে বুদ্ধদেবকে "নির্ব্বাণের পর কিছু থাকিবে কি?" জিজ্ঞাসা করায়, বুদ্ধদেব বলিলেন "না"। "থাকিবে না কি?" উত্তর হইল "না"। "থাকা না-থাকার মাঝামাঝি কোন অবস্থা হইবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন "না"। "কিছু থাকা না-থাকা এদুয়েরই বাহিরে কোন বিশেষ অবস্থা হইবে কি?" আবার উত্তর হইল "না"।

ইহাতে এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল, যে অবস্থায় "অস্তি"ও বলিতে পারিনা, "নাস্তি"ও বলিতে পারিনা। এদুয়ে জড়াইয় কোন অবস্থা নয়, এদুয়ের অতিরিক্ত কোন অবস্থাও নয়। অর্থা কোন অনির্ব্বচনীয় অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, মানুষে জ্ঞানের বাহিরে।

এই অবস্থাকেই মহাযানে "শূন্য" বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে "শূন্য" বলিতে কিছুই নয় বুঝায়, অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথা বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বলেন "আমরা করি কি? আমর যে ভাষায় শব্দ পাই না। নির্ব্বাণের পর যে অবস্থা হয়, তাহা বাক্যের অতীত। ঠিক্ কথাটি পাইনা বলিয়াই আমরা উহাকে "শূন্য" বলি। কিন্তু শূন্যশব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এম অবস্থা বুঝাইতে চাই যাহা অস্তিনাস্তি প্রভৃতি চারি প্রকার অবস্থার অতীত। 'অস্তিনাস্তিতদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্'।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার তর্কপাদে শূন্যবাদীদের নানারকমে ঠাট্ট করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যাহাদের মতে সবই শূন্য তাহাদের সঙ্গে আর বিচার কি করিব?" তিনি বৌদ্ধদের "বিনাশবাদী" বলেন। তাঁহার মতে নৈয়ায়িকেরা "অর্দ্ধবিনশন' অর্থাৎ আধখানা বিনাশবাদী। কেননা, নৈয়ায়িকেরাও বলেন "অত্যন্ত সুখদুঃখ-নিবৃত্তি"র নামই "অপবর্গ"। সুখদুঃখ যদি একেবারেই না রহিল, তবে আত্মা ত পাথর হইয়া গেল।

সাধারণ লোকে বলিবে পাথর হওয়াও বরং ভাল। কেননা, কিছু আছে দেখিতে পাইব। শূন্য হইলে ত কিছুই থাকিবে না।

যাহাহোক অশ্বঘোষ যে নির্ব্বাণের অর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষার পুস্তকে উহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে নির্ব্বাণ একটি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। সুধু বাক্যের অতীত নয়, মানুষের ধারণারও অতীত। এইরূপ অবস্থাকেই কি কান্ট ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল বলিয়া গিয়াছেন? কেননা, ইহা মানুষের বুদ্ধি ছাড়াইয়া যায়, মানুষে ইহা ধারণা করিতে পারে না।

এরূপ অনির্ব্বচনীয় না বলিয়া, অশ্বঘোষের মতে যে চরম ও অচ্যুতপদ আছে, তাহাকে অস্তি বলিয়া স্বীকার করনা কেন? কিন্তু আস্ত বলিলে, একটা বিষম দোষ হয়। যতক্ষণ আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ "অহং" এই বুদ্ধিটি থাকিবে। অহংজ্ঞান থাকিলেই অহঙ্কার হইল। অহঙ্কার থাকিলেই সকল অনর্থের যা মূল, তাই রহিয়া গেল। সুতরাং সে যে আবার জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। আরও কথা, আত্মা যখন রহিলই তখন তাহার ত গুণগুলাও রহিল। অগ্নি কিছু রূপ ও উষ্ণতা ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আত্মা থাকিলে তাহার একত্ব-সংখ্যা থাকিবে। একত্ব-সংখ্যাও ত একটি গুণ। সে আত্মার জ্ঞান থাকিবে? না, থাকিবেনা? যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থও থাকিবে, জ্ঞেয় পদার্থ থাকিলেও আত্মার মুক্তি হইল না। আর, আত্মার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে সে আত্মা আত্মাই নয়। সেইজন্যই অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিতে বুদ্ধদেব বলিতেছেন, "আত্মার যতক্ষণ অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মুক্তি হইবে না।" তাঁহার প্রথম গুরু অরাড় কালামের সহিত বিচার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে ইহারা বলে আত্মা দেহনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ লিঙ্গ-দেহ-নির্ম্মুক্ত হইলেই, মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আত্মাকে "চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত" করিয়া, তবে তৃপ্ত হইলেন।

তাঁহার শিষ্যেরা, আত্মাকে শূন্যরূপ, অনির্ব্বচনীয়রূপ, চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্তরূপ, মনে করিলেও ক্রমে তাঁহাদের শিষ্যেরা আবার নির্ব্বাণকে অভাব বলিয়া মনে করিত। তাহাদের মতে সংসার

হইল ভাব পদার্থ এবং নির্ব্বাণ অভাব। ভাবাভাব বলিতে তাহারা ভব ও নির্ব্বাণ বুঝিত। তাহারও পরে আবার যখন তাহারা দেখিল, যে প্রকৃত পক্ষে ভব বা সংসার সেও বাস্তবিক নাই, আমরা ব্যবহারত তাহাদিগকে "অস্তি" বলিয়া মনে করিলেও বাস্তবিক সেটি অভাব পদার্থ, তখন তাহাদের ধর্ম্ম অতি সহজ হইয়া আসিল। তখন তাহারা বলিল—

অপণে রচিরচি ভব নির্ব্বাণা।
মিছা লোক বন্ধাব এ অপণা॥

অর্থাৎ ভবও শূন্যরূপ, নির্ব্বাণও শূন্যরূপ। ভব ও নির্ব্বাণে কিছুই ভেদ নাই। মানুষে আপন মনে ভব রচনা করে, নির্ব্বাণও রচনা করে। এইরূপে তাহারা আপনাদের বন্ধ করে। কিন্তু পরমার্থত দেখিতে গেলে কিছুই কিছু নয়। সবই শূন্যময়।

তাহা হইলে ত বেশ হইল। ভবও শূন্য, ভাবও শূন্য, আত্মাও শূন্য, সুতরাং আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত, স্বভাবতঃই মুক্ত, "শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ"। তবে আর ধর্ম্মে, যোগে, কঠোরে, ধ্যানে, সমাধিতে ধর্ম্ম-অধর্ম্মেই বা কাজ কি? যার যা খুসি কর। তোমরা স্বভাবতই মুক্ত, কিছুতেই তোমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। পরম যোগীও যেমন মুক্ত, অতিপাপিষ্ঠও তেমনই মুক্ত।

এই জায়গায় সহজিয়া বৌদ্ধ বলিল যে, মূঢ় লোক ও পণ্ডিত লোকের মধ্যে একটি ভেদ আছে। সকলেই স্বভাবত মুক্ত বটে, কিন্তু মূঢ় লোকে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা আপনাদের বদ্ধ করিয়া ফেলে, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহার পর পঞ্চকামোপ-ভোগ করিলে, কিছুতেই বদ্ধ হয় না।

আর এক উপায়ে নির্ব্বাণ ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের চিত্ত যখন বোধিলাভের জন্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে বোধিচিত্ত বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে সৎপথে বা ধর্ম্মপথে বা সদ্ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে যেমন তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে লাগিল, তেমনই সে উচ্চ হইতে অধিক উচ্চ উচ্চ লোকে উঠিতে লাগিল। যদি তাহার উদ্যম অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তবে সে এই জন্মেই অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে সে এই জন্মেই বোধি লাভ করিতে পারে।

বৌদ্ধদের বিহারে যে-সকল স্তূপ দেখা যায়, সেই স্তূপগুলিতে এই উন্নতির পথ মানুষের চোখের উপর ধরিয়া দিয়াছে। স্তূপগুলি প্রথমে একটি গোল নলের উপর খানিক দূর উঠিয়াছে। তাহার উপর একটি গোলের অর্দ্ধেক। তাহার উপর একটি নিরেট চার-কোণা জিনিস। তাহার উপর একটি ছাতা। তাহার উপর আর একটি ছাতা, এটি প্রথম ছাতা হইতে একটু বড়। তাহার উপর আর একটি ছাতা, দ্বিতীয় ছাতার চেয়ে আর একটু বড়। চতুর্থটি তৃতীয় ছাতার অপেক্ষা একটু ছোট, পঞ্চমটি আরও ছোট। এইখানে এক সেট ছাতা শেষ হইয়া গেল। তাহারও উপর ছাতার খানিকটা বাঁট মাত্র। এই বাঁটের পর আবার আর এক সেট ছাতা, কোন মতে ১৩টি, কোন মতে ১৬টি, কোন মতে ২১টি, কোন মতে ২৩টিও দেখা যায়। ছাতাগুলি ক্রমে ছোট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার খানিকটা ছাতার বাঁট। ইহার উপর আবার মোচার আগার মত আর একটা জিনিস। মোচার আগাটি বেড়িয়া উপরি উপরি চার পাঁচটি বৃত্ত আছে। মোচার আগাটি একেবারে ছুঁচের মত।

বোধিচিত্ত প্রণিধিবলে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি এই স্তূপে উঠিতে লাগিলেন। স্তূপের নীচের দিকটা ভূত-প্রেত-পিশাচ-লোক ও নরক। তাহার উপর যে গোলের অর্দ্ধখানা আছে, সেটি মনুষ্যলোক। বোধিচিত্ত মানুষেরই হয়। সুতরাং সে চিত্ত এইখান হইতেই উঠিতে থাকে। প্রথমে দান, শীল, সমাধি ইত্যাদি দ্বারা সে ঐ নীরেট চারিকোণায় উঠিল। এটি চারিজন মহারাজার স্থান, তাঁহারা চারিদিকের অধিপতি। তাঁহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বৈশ্রবণ ও বিরূপাক্ষ। তাহার উপর ত্রয়স্ত্রিংশ ভুবন। এখানকার রাজা ইন্দ্র এবং ৩৩ জন দেবতা এখানে বসবাস করেন। ইহার উপর তুষিত ভুবন। বোধিসত্ত্বেরা এইখান হইতে একবার-মাত্র পৃথিবীতে গমন করেন এবং সেখানে গিয়া সম্যক্ সংবোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হন। ইহার পর যামলোক। ইহার পর নির্ম্মাণ-রতিলোক, অর্থাৎ, ইহারা ইচ্ছামত নানারূপে নানা ভোগবস্তু নির্ম্মাণ করিয়া উপভোগ করিতে পারেন। ইহাদের পরে যে লোক, তাহার নাম পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী, অর্থাৎ, তাঁহারা নিজে কিছুই নির্ম্মাণ করেন না, পরে নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত আসিয়া কামধাতু শেষ হইয়া গেল, অর্থাৎ, এইখানে আসিয়া বোধিচিত্তের আর কোন ভোগের আকাঙ্ক্ষা রহিল না।

এইখান হইতে রূপলোকের আরম্ভ। কাম নাই, রূপ আছে, আর আছে উৎসাহ। সে উৎসাহে ধ্যান, প্রণিধি ও সমাধিবলে বোধিচিত্ত ক্রমশই উঠিতে লাগিলেন। রূপধাতুতে, প্রধানত, চারিটি লোক; অবশিষ্ট লোকগুলি এই চারিটিরই অধীন। এই চারিটি লোক লাভ করিতে হইলে, বৌদ্ধদের চারিটি ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম ধ্যানে বিতর্ক ও বিবেক থাকে। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্কের লোপ হইয়া যায়, প্রীতি ও সুখে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি লোপ হইয়া যায়, কেবল মাত্র সুখ থাকে। চতুর্থ ধ্যানে সুখও লোপ হইয়া যায়, তখন বোধিচিত্ত রূপ অর্থাৎ শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চান।

রূপ ও শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বোধিচিত্ত আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। এবার তিনি রূপলোক ছাড়াইয়া অরূপলোকে উঠিয়াছেন। তখন তিনি আপনাকে, সমস্ত বস্তুকে, এমন কি নীরেট জিনিসটি পর্য্যন্ত তিনি আকাশ মাত্র দেখেন, অর্থাৎ সকলই তাঁহার নিকট অনন্ত ও উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর আত্মচিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় যে কিছুই কিছু নয়। এই যে অনন্ত দেখিতেছি, ইহা কিছুই নয়। ইহারও উপর বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলে তখন তাঁহার চিন্তা হইল, এই যে কিছুই নয়, ইহার কোন সংজ্ঞা আছে কিনা। যদি সংজ্ঞা থাকে তবে সংজ্ঞাও আছে। কিন্তু সংজ্ঞা ত নাই, সে ত অকিঞ্চন। সুতরাং সংজ্ঞাও নাই, সংজ্ঞাও নাই। ইহার পর বোধিচিত্ত সেই মোচার আগায় উঠিলেন। এই যে স্তূপ ইহাই "ত্রৈধাতুক লোক" তিনি এখন ইহার মাথার উপর। তাঁহার চারিদিকে অনন্ত শূন্য, আর তাঁহার উঠিবার জায়গা নাই। তিনি সেইখান হইতে অনন্ত শূন্যে ঝাঁপ দিলেন। যেমন নুনের কণা জলে মিশিয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে না, সেইরূপ বোধিচিত্তও আপনাকে হারাইয়া অনন্তশূন্যে মিশিয়া গেলেন। যেমন সমুদ্রের জলে একটু লোনা আস্বাদ রহিয়া গেল, তেমনি অনন্তশূন্যে বুদ্ধের একটু প্রভাব রহিয়া গেল। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম ও বিনয় অনন্ত-কালের জন্য ত্রৈধাতুক-লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

নির্ব্বাণ বলিতে 'নাই' 'নাই'ই বুঝায়। প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা এই 'নাই' 'নাই' লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। নির্ব্বাণ হইয়া গেল, একটা অনির্ব্বচনীয় অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই প্রথম প্রথম বৌদ্ধরা সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু পরে তাঁহারা কেবল শূন্য হওয়াই

চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উহার সঙ্গে আর একটা জিনিস আনিয়া ফেলিলেন ; উহার নাম 'করুণা'। ইহা যেমন-তেমন করুণা নয়, সর্ব্বজীবে করুণা, সর্ব্বভূতে করুণা। রূপ-ধাতু ত্যাগ করিয়া অরূপধাতুতে আসিয়া যেমন সকল পদার্থকেই আকাশের ন্যায় অনন্ত দেখিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ করুণাকেও অনন্ত দেখিতে লাগিলেন। শুদ্ধ 'শূন্যতা' লইয়া যে নির্ব্বাণ, প্রাণশূন্য, নিশ্চল, নিস্পন্দ, কতকটা পাথরের মত, কতকটা শুকনা কাঠের মত হইয়াছিল ; করুণার স্পর্শে, তাহাতে যেন জীবন সঞ্চার হইল : যাঁহারা অহৎ হওয়াই, অর্থাৎ কোনরূপে আপনাদের মুক্ত করাই, জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, সমস্ত জগৎ যাঁহাদের চক্ষে থাকিলেও হইত, না থাকিলেও হইত, জগতের পক্ষে যাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সেই বৌদ্ধরা এখন হইতে আপনার উদ্ধারটা আর তত বড় বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না, জগৎ উদ্ধার তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। আমার আমিত্বটুকু লোপ করিব, আমি মুক্ত হইব, আর আমার চারিদিকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব বদ্ধ থাকিবে, একি আমার সহ্য হয়? বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর সংসারের সকল গণ্ডী পার হইয়া ধ্যান-ধারণাদি বোধিসত্ত্বের যা কিছু কাজ, সব সাঙ্গ করিয়া, এমন কি ধর্ম্মস্তূপের আগায় উঠিয়া শূন্যতা ও করুণাসাগরে ঝাঁপ দিতে যান, এমন সময় তিনি চারিদিকে কোলাহল শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার আমিত্ব চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার আয়তন আকাশের মত অনন্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণাও আকাশের মত অনন্ত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব দুঃখে আর্ত্তনাদ করিতেছে ; জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিসের কোলাহল?' তাহারা উত্তর করিল 'আপনি করুণার অবতার আপনি যদি নির্ব্বাণ লাভ করেন, তবে আমাদের কে উদ্ধার করিবে?' তখন অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন 'যতক্ষণ জগতের একটিমাত্র প্রাণী বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণ লইব না।'

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতে বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষে এই মত লইয়াই চলিত। ইহাকেই তখনকার লোকে মহাযান বলিত। তাহারা মনে করিত এত বড় মত আর হইতে পারে না। যখন বোধিসত্ত্বেরা করুণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহারা জীবের উদ্ধারের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বুদ্ধদেব যে পঞ্চশীল দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আর্য্যদেব 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণে' বলিয়া গিয়াছেন 'যে জগৎ উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, তাহার যদি কোন দোষ হয়, সে দোষ একেবারে ধর্ত্তব্যই নয়।'

এই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম উন্নতি। মহাযানের দর্শন যেমন গভীর, ধর্ম্মমত যেমন বিশুদ্ধ, করুণা যেমন প্রবল, এমন আর কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে অনেক তপস্যা ও সাধনা করিয়া এইমতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তখন বড় বড় রাজ্য ছিল, নানারূপ ধনাগমের পথ ছিল, কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতেছিল, বিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল, ধর্ম্মেরও যথেষ্ট আদর ছিল। তাই এত লোকে এতশত বৎসর ধরিয়া একই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

জ্ঞান উপার্জ্জন সহজ, কিন্তু জ্ঞানটি রক্ষা করা বড় কঠিন। মহাযানেরও এই জ্ঞান বেশীদিন রক্ষা হয় নাই। দেশ ক্রমে ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য লোপ হইয়া আসিল, লোকেও দেখিল যে বহুকাল চিন্তা করিয়া বহুকাল যোগসাধনা করিয়া মহাযান হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব, সুতরাং একটা সহজ মত বাহির করিতে হইবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজার দত্ত বৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া যজমানদিগের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের আর চিন্তা করিবার সময়ও রহিল না, সে স্বাধীনতাও রহিল না।

মহাযানের নির্ব্বাণ 'শূন্যতা' ও 'করুণায়' মিশামিশি। এ নির্ব্বাণের একদিকে 'করুণা', আর একদিকে 'শূন্যতা', করুণা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু যে-সকল যজমানের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেশী নির্ভর করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে শূন্যতা বুঝান বড়ই কঠিন। তাঁহারা শূন্যতার বদলে আর একটি শব্দ ব্যবহার করিতেন—সেটি "নিরাত্মা"। নিরাত্মা শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠিক সাধা যায় না, কিন্তু এসময় বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহারা যজমানদিগকে বুঝাইলেন যে, বোধিসত্ত্ব যখন স্তূপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাঁহারা চারিদিকে অনন্ত শূন্য দেখিতেছেন। এই শূন্যকে তাঁহারা বলিলেন 'নিরাত্মা', শুধু নিরাত্মা বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন "নিরাত্মাদেবী" অর্থাৎ নিরাত্মা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। বোধিসত্ত্ব নিরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। ইহা হইতে যজমানেরা বেশ বুঝিল, মানুষের মন কত নরম হয়, কত করুণায় অভিভূত হয়। সুতরাং নির্ব্বাণ যে শূন্যতা ও করুণার মিশামিশি, তাহাই রহিয়া গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হইল। এ নির্ব্বাণেও সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব ও সেই অনন্ত ভাব, দিকেও অনন্ত, দেশেও অনন্ত, কালেও অনন্ত।

(নারায়ণ, পৌষ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের পূর্ব্ব-কথা

জগতের প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় নাট্যের স্থান অতি উচ্চ। গ্রীসে যেরূপ দায়োনিসাস্ দেবের উৎসব উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ দেব-দেবীর পূজা ও উৎসবাদিতেই প্রথম নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয়। বৈদিক সাহিত্যের সংবাদগুলি কথোপকথনাকারে গ্রথিত ; তাহাতে অনেকে অনুমান করিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে ঐ কথোপকথনগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইত। ইহাই ভারতীয় নাট্যের অতি প্রাচীন রূপ। ভারতীয় নাটকের এই সূচনা হইতে কালক্রমে যে নাট্য সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা জগতের অন্য সমস্ত নাট্যসাহিত্য হইতে বিশিষ্ট। প্রাচীনকালে রাজসভায় বা দেবোৎসবাদিতে অভিনীত নাটকগুলি রচনানৈপুণ্যে মনোহর হইলেও সাধারণ দর্শক তাহাদের সম্যক রসগ্রহণ করিতে পারিত না। প্রাকৃতভাষাবহুল নাটকগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইত বটে, কিন্তু কথিত ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের ভাষার পরিবর্ত্তন হইল না। কারণ আলঙ্কারিকগণ নাট্য-সাহিত্যকে কঠিন নিয়ম-পাশে বাঁধিয়া দিলেন।

সংস্কৃত ভাণ, প্রহসন প্রভৃতি নাট্যে সাধারণের মনোরঞ্জনের প্রয়াস লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এ প্রয়াস সফল হয় নাই। কাজেই সংস্কৃত নাট্যাভিনয় কেবল বিশেষ বিশেষ উৎসবের অঙ্গরূপেই বহু-কাল জীবিত ছিল। ভারতে মুসলমান-প্রভাব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুর নাট্যকলা একরূপ নষ্ট হইয়া গেল। কারণ মুসলমান শাসকগণ তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে নাট্যাভিনয় নিষিদ্ধ বলিয়া নাট্যচর্চ্চায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ দান করিতেন না।

বঙ্গদেশে যে-সকল প্রাচীন নাট্যকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ, জয়দেব, রূপগোস্বামী ও কর্ণপূরের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদিশূরের সমসাময়িক ভট্টনারায়ণ

বীররস-প্রধান "বেণীসংহার", জয়দেব "প্রসন্নরাঘব", রূপগোস্বামী "বিদগ্ধমাধব", "ললিতমাধব" এবং কর্ণপুর "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত "জগন্নাথবল্লভ" প্রভৃতি নাটকও বাঙ্গালার বৈষ্ণবযুগে (১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে) রচিত হয়। ভট্টনারায়ণ ব্যতীত আর সকল নাট্যকারই বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজ পার্ষদসঙ্গে সাধারণের সমক্ষে কৃষ্ণলীলার ভাবাভিনয় প্রদর্শন করিতেন। তাহাতেই বৈষ্ণবধর্ম্মে সংস্কৃত নাটকের রচনা আদৃত হইয়াছিল।

কিন্তু এ নাটকগুলি সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত রীতিতে রচিত। কাজেই এগুলিও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয় নাই। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই-একজন সংস্কৃত-রীতি অবলম্বন করিবারই খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই রীতি সর্ব্বসাধারণের প্রিয় না হওয়ায় সেই অবধি বাঙ্গালা নাটকে ইহা চিরপরিত্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা নাটক সংস্কৃত নাটকের বিশিষ্ট রীতি ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে।

ইংরাজেরা কলিকাতায় নিজেদের চিত্তবিনোদনের জন্য The Play House নামক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ভরতপ্রণীত প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে আমরা "নাট্যমণ্ডপ", রঙ্গপীঠ (stage), প্রেক্ষক-পরিষৎ (Auditorium), যবনিকা প্রভৃতির উল্লেখ ও বর্ণনা পাই, এবং প্রাচীন ভারতে যে নাট্যাভিনয়ের জন্য রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজের আমলের প্রথমে বাঙ্গালী সে-সকল কিছুই জানিত না। অন্যান্য কলাবিদ্যার ন্যায় নাট্যকলাও দেশে লোপ পাইয়াছিল। তাই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে 'Calcutta Theatre'এ যখন Comedy of Beaux Stratagem, Comedy of Foundling, School for Scandal, Mahomet, প্রভৃত নাটক ও Like Master like man, Citizen প্রভৃতি প্রহসন অভিনীত হইতে লাগিল, তখন বাঙ্গালী এক নূতন জিনিষ দেখিল। বাঙ্গালীর তখন থাকিবার মধ্যে ছিল এক যাত্রা। ১৮২১ সালে "কলি রাজার যাত্রা" অভিনীত হইয়াছিল, এই বার্ত্তা "সংবাদ-কৌমুদী", নামক পত্রিকাতে পাওয়া যায়। সে কালের যাত্রাতে কথোপকথন অপেক্ষা গীতের সংখ্যাই অধিক থাকিত। কৃষ্ণকমল গোস্বামী নবদ্বীপে "নিমাইসন্ন্যাস" ও ঢাকায় "স্বপ্নবিলাস", "রাইউন্মাদিনী," "বিচিত্রবিলাস", "ভরতমিলন", "সুবল-সংবাদ" প্রভৃতি যাত্রার পালা রচনা করিয়া ও তাহাদের অভিনয় করাইয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু যাত্রা অধিকদিন ধরিয়া বাঙ্গালীকে তৃপ্ত করিতে পারিল না। ইংরাজদের রঙ্গালয়ে ইংরাজী অভিনয় দর্শনে ও ইংরাজী নাটক পাঠে ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী নূতন ধরণের নাট্যরস আস্বাদন করিতে লালায়িত হইলেন। কিন্তু তখন ইংরাজী নাটকের ন্যায় কোন গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ছিল না। তাই সর্ব্বপ্রথমে যখন বাঙ্গালীর মনে নাট্যানুরাগ সমুদিত হইল তখন তাঁহারা ইংরাজী নাটকই অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে হোরেস হেম্যান উইলসন্ সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত "উত্তর-রাম-চরিতের" অভিনয় হয়। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের অভিনয়ে দর্শকগণ তৃপ্ত হইবেন না ভাবিয়া, ইঁহারা "উত্তর-রাম-চরিতের" অভিনয়ের পরেই সেক্সপীয়রের "জুলিয়াস্ সীজার" নাটকের শেষাঙ্ক অভিনয় করেন। পরে এই অভিনেতাগণ জাফর-গুল্নেয়ারসম্পর্কিত কোনও দৃশ্যকাব্য অভিনয় করেন, এই কথাও শুনা যায়।

এই সময় কলিকাতায় সাঁস্ সি (Sans Soci) নামক ইংরাজী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেম্যান্ উইল্সন্ (Wilson), ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক ষ্টকুলার (Stocquler), বোর্ডের সেক্রেটারি টরেন্স (Torrens) এবং কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট হিউম (Hume) প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত সুভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই নাট্যশালায় অভিনয় করিতেন।

তাৎকালীন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি, এল্ রিচার্ডসন সাহেব অতিশয় নাট্যানুরাগী ছিলেন ও তিনি ছাত্রদিগকে এই নাট্যশালার অভিনয় দেখিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। এই প্রকারে অধ্যাপকের উৎসাহে ও ইংরাজী নাট্যশালার অভিনয় দেখিয়া ছাত্রগণ বিশেষভাবে নাট্যানুরাগী হইয়া পড়ে ও White Houseএ নাট্য অভিনয় করিয়া যশস্বী হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের অভিনয় দেখিয়া Oriental Seminaryর ছাত্রগণও উৎসাহিত হইয়া উঠে ও Julius Ceserএর মহলা দিতে থাকে। কিন্তু নানা কারণে ইহারা উক্ত নাটকের অভিনয় করিতে পারে নাই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মেট্রপলিটান একাডেমির ছাত্রগণ জুলিয়াস্ সীজার অভিনয় করে। ইহার কিছুকাল পরে Oriental Seminaryর কতিপয় ভূতপূর্ব্ব ছাত্র সেক্ষপীয়রের কয়েকখানি নাটক অভিনয় করে।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা নাটকে বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে "চণ্ডী" নামক যে নাটকখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দী, পারসী ও সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলা ভাষাও ব্যবহার করিয়াছিলেন। "চণ্ডী" নাটক সংস্কৃত-রীতিতে রচিত। সংস্কৃত নাটকে পাত্র-পাত্রী-বিশেষ প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। এই প্রমাণেই বোধ হয় ভারতচন্দ্র চণ্ডীনাটকে বাঙ্গলা, হিন্দী ও পারসী ভাষা প্রয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত যে অংশটুকুমাত্র ভারতচন্দ্র লিখিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাহা হইতে বোধ হয় যে, নাটকখানি সম্পূর্ণ হইলে এক অদ্ভুত জিনিষ হইত। বহুবিধ ভাষার এরূপ একত্রসমাবেশের উদাহরণ অত্যন্ত বিরল।

চণ্ডী নাটক।

[সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ।]

সংগায়ন্ যদশেষ-কৌতুককথাঃ পঞ্চাননো পঞ্চভি-
র্বক্ত্রৈ-র্বাদ্যবিশালকৈর্ড্ডমরুকোত্থানৈশ্চ সংনৃত্যতি।
যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভুজা তালং বিধাতুং গতা
সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে॥

[নটীর উক্তি]

শুন শুন ঠাকুর	নৃত্যবিশারদ	সভাসদ সারি চতুরী।
নূতন নাটক	নূতন কবিকৃত	হাম তোঁহি নূতন নারী॥
ক্যায়সে বাতায়ব	ভাব ভবানীকো	ভীতি ভৈ মুঝে ভারি।
দানব-দলনে	ধরণী-মণ্ডলে	তারিণী লে অবতারি॥
গুরুসম ধীর	বীরসম শুনহ	সম সগুণ মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ	রাজ-শিরোমণি	ভারতচন্দ্র বিচারি॥

[সূত্রধারের উক্তি]

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতি রুদ্রোঽভবদ্রাঘব—
স্তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশো মহান্।
তৎপুত্রো রঘুরামরায়নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণী—
স্তৎপুত্রোঽয়মশেষবীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নৃপঃ॥

ভূপগ্রাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণো।
ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দরসমো যত্তাত আসীন্নৃপঃ।
রাজ্যাদ্ ভ্রষ্ট ইহাগতঃ স নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ
মূলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে ॥
তস্মৈ ভারতচন্দ্ররায়কবয়ে কাব্যাপুরাশীন্দবে।
ভাষাশ্লোককবিত্বগীতমিলিতং যত্নেন সম্বর্ণিতম্ ॥

['চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন]

খটমট্ খটমট্ খুরোত্থ-ধ্বনিকৃত-জগতী-কর্ণপুরাবরোধঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁতি নাদানিলচলদচলাত্যন্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্ত্যো
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ ॥
ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড় গড় চৌঘড়ী ঘোরগর্জ্জৈঃ
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ শব্দৈর্ঘন ঘন ঘঘ বাজে চ মন্দারনাদৈঃ।
ভেরী তূরী দামামাদগড়দড়মশা স্তব্ধ নিস্তব্ধ দেবৈঃ
দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমো বভূব ॥

[মহিষাসুরের উক্তি]

ভাগেগা দেবদেবী   পাথর পাথর   ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋতকো রীত দেনা   যমঘর যমকো   আগকো আগ লাগে ॥
বায়ুকো রোধ করকে   করত বরণকো   সব তুসো অব মাগে
ব্রহ্মা সোঁ বাসুকি সোঁ   কতি নেহি ঝগড়ো জোঁঠ কুবেরা না ভাগে ॥

[প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি]

শোন্ রে গোঁয়ার লোগ্, ছোড় দে উপাস্ যোগ্, মানহু আনন্দ ভোগ,
ভৈঁসরাজ যোগমে।
আগমে লাগাও ঘিউ, কাহেকো জ্বলাও জিউ, এক রোজ প্যার পিউ,
ভোগ এহি লোগমে ॥
আপকো লাগাও ভোগ, কামকো জাগাও লোগ, ছোড় দেও যাগ যোগ,
মোক্ষ এহি লোগমে।
ক্যা এগান্ ক্যা বেগান, অর্থ নাহ আব জ্ঞান, এহি ধ্যান এহি জ্ঞান,
আর সর্ব্ব রোগমে ॥

[এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ, প্রথমে হাস্য করিলেন]

কমঠ করটট   ফণিফণা ফলটট   দিগ্‌গজ উলটট ঝগটট ভায়রে
বসুমতী কম্পিত   গিরিগণ নম্রত   জলনিধি ঝম্পত বাড়বময় রে ॥
ত্রিভুবন ঘুঁটত   রবিরথ টুটত   ঘন ঘন ছুটত   যেও পরলয়রে।
বিজলী চট চট   ঘর ঘর ঘট ঘট   অটঅটঅটঅট আঃক্যায়া হায়রে ॥

সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা নাটক প্রণীত হইলেই যে তাহার অভিনয় হইয়াছিল, তাহা নহে। "প্রেম নাটক" ও "রমণী নাটক" নামে দুইখানি গ্রন্থ খুব পুরাতন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালীর আদি-নাটকের নাম প্রেম নাটক। কলিকাতা শ্যামপুকুর-নিবাসী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রণেতা।" কিন্তু নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইহার একখানিও তাহা নয়। উভয় গ্রন্থের নামের সহিত 'নাটক' শব্দ আছে, বটে, কিন্তু বস্তুতঃ গ্রন্থ দুইখানি কাব্য,—পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। দীনেশবাবু ইহাদের নামমাত্র শুনিয়া সম্ভবতঃ এই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন।

(নারায়ণ, পৌষ)   শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

জ্যোতিবাবু মধ্যে মধ্যে পাবনা কুষ্টিয়া অঞ্চলের জমিদারি পরিদর্শনের জন্য যাইতেন। সেখানে শিলাইদহের কুঠীতে গিয়া বাস করিতেন। বিষয়কর্ম্মের অবসরসময়ে শিকার করিয়া আত্মবিনোদন করিতেন।

জ্যোতিবাবু হাটখোলায় এক পাটের আড়ৎ খুলিয়াছিলেন। ইহার অংশীদার ছিলেন জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়। পাটের বাজার খারাপ হইয়া যাওয়ায় একার্য্য বন্দ হয়। অল্পদিনেই এ ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইয়াছিল। এই টাকা লইয়া এর পর জ্যোতিবাবু শিলাইদহে নীলের চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। জার্ম্মানরা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এক রকম কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করায় নীলের বাজার অনেক খারাপ হইয়া গেল। কায উঠাইয়া দিতে হইল। নীলে বেশ লাভ হইয়াছিল। হঠাৎ এমন সময় Exchange Gazetteএ জ্যোতিবাবু দেখিলেন, একটা জাহাজের খোল নীলামে বিক্রয় হইবে। এই খোলটা কিনিয়া একখানা জাহাজ তৈরি করাইয়া খুলনা পর্য্যন্ত জাহাজ চালান যাইবে স্থির করিলেন। সেই খোলে যে বাঙ্গালীর প্রথম জাহাজ প্রস্তুত হইল তাহার নাম হইল "সরোজিনী"। জাহাজ হইল বটে কিন্তু তেমন মজবুত হইল না। সে যেন এক আজন্মরুগ্ন সন্তানের মতই জন্মিল। আজ এঞ্জিন খারাপ, কাল চাকা খারাপ, পরশু বয়লার খারাপ, এই রকম একটা না একটা গোলমাল প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। আর সেই-সব মেরামত করাইতে অজস্র অর্থ ব্যয় হয়, কাযও বন্ধ রহিয়া যায়। কিন্তু প্রথম জাহাজ "সরোজিনী" নির্ম্মিত হইতে তাঁহার এত বিলম্ব হইয়া গেল যে তিনি আসিবার পূর্ব্বেই ফ্লোটিলা কোম্পানি কায ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। উভয়দলে খুব প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। একখানি মাত্র ষ্টীমার লইয়া ইংরাজ কোম্পানির সঙ্গে ঠিক প্রতিযোগিতা হইয়া উঠিতেছিল না বলিয়া তিনি আরও চারখানি জাহাজ ক্রমে ক্রমে ক্রয় করিলেন। এ জাহাজগুলির নাম ছিল "বঙ্গলক্ষ্মী" "স্বদেশী" "ভারত" এবং "লর্ড রিপন"। তখন এই পাঁচখানি জাহাজ খুলনা হইতে বরিশাল যাত্রী লইয়া গমনাগমন করিত। সময় সময় মাল লইয়া কলিকাতাতেও আসিত। এই সময় জ্যোতিবাবু জাহাজেই থাকিতেন। বাঙ্গালীর জাহাজ চালনায় তখন বরিশালের ছাত্রসমাজে এবং নব্যদলের মধ্যে একটা খুব আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরাজের ব্যবসায়ে ব্যাঘাত লাগিয়াছে, আর কি তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ব্যবসায়ী সাহেবেরা যৎপরোনাস্তি জ্যোতিবাবুর বিপক্ষাচরণ করিতে লাগিল। তাহারা যখন দেখিল যে যাত্রী আর হয় না, তখন তাহারা ভাড়া কমাইতে আরম্ভ করিল, জ্যোতিবাবুও কমাইলেন। এই ক্ষতি স্বীকার করিয়াও জ্যোতিবাবু প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। লাভ আগে যেমন হইতেছিল, এখন তেমন আর হয় না—তবুও তিনি দমিলেন না। এই সময়ে খুলনা হইতে মাল বোঝাই লইয়া "স্বদেশী" কলিকাতা আসিতেছিল। সারা পথ বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল—আলোকমালা-সমুদ্ভাসিত কলিকাতা বন্দরেও প্রবেশ করিল। কিন্তু শেষে হাওড়াপুলের নীচে দিয়া যাইবার সময় পুলে ধাক্কা লাগিয়া ষ্টিমারখানি গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইল। একজাহাজ মালের এক কণাও উঠিল না। এতদিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একবারে নিরুদ্যম ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। কায বন্ধ করিবেন, মনে মনে এই মৎলব ছিল কিন্তু এ ব্যাপার তিনি ঘুণাক্ষরেও কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই। কায যেমন চলিতেছিল, পূর্ব্বের মত তেমনিই চলিতে লাগিল। এমন সময় ফ্লোটিলা কোম্পানির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (এখন "রাজা") জ্যোতিবাবুর নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসেন, যে, ফ্লোটিলা কোম্পানি জ্যোতিবাবুর সমস্ত কারবার কিনিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। জ্যোতিবাবু মগ্নাবশিষ্ট

চারিখানি জাহাজ ফ্লোটিলা কোম্পানিকেই বিক্রয় করিয়া দিলেন। ফ্লোটিলা কোম্পানীর নিকট হইতে অনেক টাকা পাওয়া গেলেও, তাঁহার সমস্ত দেনা পরিশোধ হইল না। তিনি খুব বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পালিত মহাশয় (স্যার টি পালিত) সমস্ত পাওনাদারদের ডাকাইয়া এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যাহাতে তিনি একবারেই ঋণমুক্ত হইয়া গেলেন। এমনি কত লোককে তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার "তারক" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

(ভারতী, পৌষ) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের জাতীয় শিল্প ও সাহিত্য-সাধনা কোন্ পথে যাইবে?

কি প্রাচীন, কি আধুনিক জাতিমাত্রেরই ভাবসাধনা সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে আকার লাভ করিয়াছে। ভাবের পথে কোন্ জাতি কতদূর এবং কি আদর্শে উন্নতি করিয়াছে তাহা তাহাদের শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম ও দর্শনও উন্নতির একটা লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ধর্ম্ম ও দর্শন সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

কি প্রাচীন কি আধুনিক সমস্ত জাতির সাহিত্য ও শিল্প প্রধানতঃ দুইটি ভিন্ন আদর্শে গঠিত। প্রথম আদর্শ ভাবাত্মক (idealistic)। দ্বিতীয় আদর্শ বাস্তবাত্মক (realistic)। প্রত্যেক যুগে দুইটি ধারাই পাশাপাশি প্রবাহিত হইত ও এখনও হইতেছে, তবে উভয়ের কোন-না-কোন ধারাটি প্রবলতর থাকে এবং উহাই সেই যুগের প্রধান লক্ষণ।

ভাবাত্মক কলাকে (art) রূপকও বলা যায়। উহার প্রধান লক্ষ্য নূতন কিছু সৃষ্টি করা। একটা উচ্চ বা মনোহর ভাবকে ভাষা বা রেখা ও বর্ণে আকার দান করা, ভাবাত্মক কলার কাজ। উহার ভাষা Symbolical বা চিহ্নাত্মক। এবং উহার উদ্দেশ্য Development of a Type আদর্শ সৃজন। Type বলিতে আমরা এমনই একটা বুঝি যাহা সমস্ত গুণ ও লক্ষণের সমাহার-স্থান। চিরকালই ভাবুকের মন অরূপের মধ্যে একটা রূপ, অনিত্যতার মধ্যে একটি শাশ্বতের সন্ধান করিয়া আসিয়াছে, এই রূপ ও এই শাশ্বতকে সে কল্পনাবলে একটি মূর্ত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টাই Idealismএর প্রাণ। তার সফলতাই তার আকাঙ্ক্ষার বিরাম-স্থল। প্রকৃতিপ্রদত্ত মাল মসলার ভিতর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজের কল্পনা দিয়া ভাবাত্মক কবি একটা মানসী মূর্ত্তি গড়িয়া তুলে।

বাস্তবাত্মক কলা অনুকরণাত্মক (imitative) প্রকৃতিবাদপূর্ণ (naturalistic)। উহার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়রঞ্জন। উহার ভাষা প্রাকৃতিক। ইতস্ততঃ যাহা দেখা যায় তাহারই অনুকরণ, বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার রূপ প্রকাশে চেষ্টা। এ জাতীয় কলায় শিখিবার কিছু নাই, দেখিবার অনেক আছে। এই বিদ্যায় পর্য্যবেক্ষণ ও স্মৃতিশক্তির সহায়তা দরকার করে।

মোটামুটি প্রাচীন জাতিদিগের সাহিত্য ও শিল্প (idealistic) ভাবাত্মক ছিল। আর বর্ত্তমান জাতিদিগের সাহিত্য ও শিল্প বাস্তবাত্মক (realistic)।

আধুনিক ইয়ুরোপীয় অনেক নামজাদা শিল্পী এই realismএর ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া idealismএর পুনরুদ্ধারে যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন।

ভাবাত্মক ও বাস্তবাত্মক শিল্প ও সাহিত্যের সাধন-ফল আলোচনা করিলে দেখা যায় ভাবাত্মক শিল্পীরা সাধনার ফলস্বরূপ একএকটা Type আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। যত দিন তৎ তৎ জাতি উন্নতির পথে ধাবমান ছিল ততদিন সেই-সকল মহান আদর্শ তাহাদের সভ্যতার মজ্জাগত হইয়া ছিল। ততদিন সেই-সকল আদর্শ তাহাদের জাতীয় জীবনের নানামুখী কার্য্যকারিতাকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছিল। বহু সহস্র বৎসর পরে আমরা সেই-সকল আদর্শ সৃষ্টি দেখিয়া বুঝিতে পারি এই এই জাতি কিরূপ ভাবসাধনা করিয়াছিল। Realistic art এইরূপ একটা দেশকালবিজয়ী সনাতন দৃষ্টান্ত কিছুই রাখে নাই ও রাখিতে পারে না।

যে জাতি চিরন্তন ভাবসাধনার পথ ছাড়িয়া অর্ব্বাচীন রূপসাধনার পথে চলিয়াছে তাহার খুব দুর্ভাগ্য। বর্ত্তমান ভারত এই দুর্ভাগ্যের শ্রেণীভুক্ত।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্য ভাবাত্মক। উহার ভাষা চিহ্নাত্মক বা Symbolic এবং উহার লক্ষ্য Creation of Type বা আদর্শসৃজন, এবং তৎসাহায্যে মানবমনে মহাভাবের ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন।

এই-সকল Symbolএর একটি শাস্ত্র আছে। সাহিত্যিক বা শিল্পী কোন একটা রূপকমূর্ত্তির কল্পনা করিতে গেলে তাহাকে এই চিরপ্রচলিত Symbol-শাস্ত্রের বিধি মানিতে হইবে। এই Symbolic artএর সৃষ্ট পদার্থ অস্বাভাবিক হয়। পাশ্চাত্যগণ এইজন্য এই-সকল মূর্ত্তিকে unnatural, monstrous ও grotesque বলিয়া দোষ দেন। তাঁহারা রূপের উপাসক, ভাবের নহেন; ভাবের উপাসক হইলে, প্রাচীন হিন্দুর কল্পিত মূর্ত্তির নিকট নতশির হইতেন।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিল্প সাহিত্য প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণে নিযুক্ত। উহা individualistic বা ঘটনা- বা ব্যক্তিত্ব-বোধক। এবং সাধনার উৎকর্ষের মাপকাঠি সৃষ্টবস্তুর বাস্তবতা (realism)। সনাতন ভাবের বা বিশ্বমানবত্বের Type সৃজনে চেষ্টা কুত্রাপি দেখা যায় না। উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃজন বটে। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য বস্তুগত; ভাবগত নহে। Sensuous; idealistic নহে। এই বস্তুগত সৌন্দর্য্য প্রকাশের চেষ্টায় anatomical accuracy সংগ্রহের এত চেষ্টা ও এত তর্ক বিতর্ক।

প্রাচীন ভারত, মিশর বা জাপানেরও সাহিত্য শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃজন নহে, এ কথা বলা ভুল। তবে তাঁহারা ভাব-গত সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ভাবগত সৌন্দর্য্যের চেষ্টাতেই তাঁহারা anatomyকে অগ্রাহ্য করিতেন, না করিলেও উপায় নাই। Anatomyকে মানিতে হইলে ভাব-গত সৌন্দর্য্য রক্ষা হওয়া অসম্ভব হইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভারতীয় চিত্র বা সাহিত্যের সৃষ্ট মূর্ত্তিগুলি মনুষ্যমূর্ত্তির অনুকরণে গঠিত, কিন্তু মনুষ্য-ভাব-বর্জ্জিত। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ এই কথাটা মনে রাখিলে উহাদিগকে grotesque or unnatural দোষে দোষী করিতেন না।

ভাবাত্মক শিল্পের বিশেষত্ব বলে উহার সৃষ্ট পদার্থগুলির একটা চিরন্তন প্রীতি-প্রদানের শক্তি আছে। Typeএর বিনাশ নাই, individualএর বিনাশ আছে। ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি না থাকায় Typeএর শাশ্বত মূল্য দেশ-কাল-নিবদ্ধ নহে। এই জন্যই দেখা যায় রুচি কাল ও শিক্ষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে realistic শিল্প বা সাহিত্যের আদর কমিয়া যায়। অর্থাৎ জাতীয় জীবন গঠনে উহাদের আর তত সহায়তা বোধ হয় না।

বাঙ্গালা শিল্প ও সাহিত্য পাশ্চাত্য শিল্প ও সাহিত্যের সংঘর্ষে আসিয়া প্রাচীন আদর্শবাদ ত্যাগ করিয়া বাস্তববাদে দুষিত হইয়

পড়িয়াছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ চিত্র-শিল্পীগণ বৈদেশিক প্রভাব ত্যাগ করিয়া স্বদেশী পথে শিল্পের গতি ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেরূপ কোন চেষ্টা নাই।

কিন্তু বাঙ্গালী শিল্পীদিগের মনে রাখিতে হইবে যে শিল্পে অস্বাভাবিকতা এক আর অশুদ্ধতা অন্য জিনিস। ভাবমূলক চিত্রে বা সাহিত্যে অস্বাভাবিকতা অনিবার্য্য। অরূপ ভাবকে রূপে পরিণত করিতে হইলে কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা আসিবেই। তাহা অর্থদ্যোতক বলিয়া প্রশংস্য, নিন্দনীয় নহে; কিন্তু অকারণ অশুদ্ধতার মাপ্ নাই। অর্থহীন অশুদ্ধতা বা শিল্পাচার-ব্যতিক্রমে বরং আর্টের বিকটত্ব ও ব্যভিচার আসিয়া পড়ে। ইহা বর্জ্জন করাই উচিত। অশুদ্ধতা বর্জ্জন করিয়াও অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভাবশিল্পীগণ তাহাও দেখাইয়াছেন। নব্য শিল্পীগণের মুখে realismএর নিন্দা শুনা যায়। বাস্তবিকই কি realism নিন্দনীয়? শিল্পে উহার কোন মূল্য নাই? নিসর্গনিষ্ঠা কি ভাবসাধনার পথে অনতিক্রমণীয় বাধা? বোধ হয় না। আমাদের দেশীয় প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে বরং এই নিসর্গ-নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা দেখি। মানুষ যতদিন নিজ পরিচিত বাস্তব জগতের রূপের ভিতর দিয়া অরূপের সাধনা করিবে ততদিনই তাহাকে realismএর অধীন থাকিতে হইবে। শিল্পের যত বড় মহৎ উদ্দেশ্য থাক্‌না কেন, চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তিকে চরিতার্থ করা তার একটা অন্যতম উদ্দেশ্য থাকিবেই। হউক তাহা গৌণ। চিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মাইবার জন্য realismএর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবোধকেও উদ্বুদ্ধ রাখা আরো প্রয়োজনীয়। তবে মুখ্য উদ্দেশ্য না গৌণের অধীন হইয়া পড়ে। আদর্শ শিল্প এই idealism ও realismকে সংযুক্ত করিয়া উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবে। কি সাহিত্যে কি ভাস্কর বা চিত্রশিল্পে আদর্শ শিল্পী বাস্তবের অচল শিখরে দাঁড়াইয়া ভাবের আকাশপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন; His foot must be in the vera vita, his eye on the beatific vision. যাহা হউক চিত্রশিল্প যেন কতকটা প্রাচীন সাধনার পথে ফিরিয়াছে; আমাদের সাহিত্য কিন্তু এখনো realism-এর ঘোর পঙ্কে নিমজ্জিত।

Realistic হইলেই যে নৈতিক হিসাবে হীন হইবেই এমন কথা বলি না। অতি সুন্দর নিখুঁৎ উপভোগ্য realistic গল্প বা উপন্যাস সৃষ্ট হইয়াছে এবং কেহ কেহ সৃষ্টি করিতেছেন। তবে উচ্চ ভাব লইয়া মহান আদর্শ গঠন কমই হইতেছে। বর্ত্তমান সাহিত্যে রবি-বাবুর নৌকাডুবি ও গোরা এইরূপ দুটি মহান আদর্শ গঠনের চেষ্টার ফল।

প্রাচীন ideal পথই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু জাতীয় জীবন-স্রোত চিরকাল একই খাতে প্রবাহিত হয় না। যুগে যুগে উহার ধারা নূতন নূতন পথে প্রবাহিত হয়। নূতন নূতন অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়া যাইতে হইলে নূতন নূতন ভাবের সাধনা করিতে হয়, নূতন আদর্শ সৃষ্টির দরকার হয়। আমরাও এখন জাগরণের মুখে; নূতন অবস্থা ও নূতন প্রয়োজনের মধ্যে এ জাগরণ, কাজেই জাতীয় জীবনকে নূতন পথে চালাইতে হইবে। Type হইবে সেই নূতন ধরণের। সামাজিক, নৈতিক, অর্থতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি কত নূতন সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। সুকুমার সাহিত্য যদি এই-সকল সমস্যা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন, কল্পনা-বলে স্বজাতির মানস-চক্ষের নিকট ভবিষ্য জাতীয় জীবনের বর্ণোজ্জ্বল পট ধারণ করেন তবেই সাহিত্যের সার্থকতা। চিরকালই ত ভারত-সাহিত্য তাহাই করিয়াছে। পুরাণ রচিয়া, কাব্য মহাকাব্য গড়ি প্রাচীনগণ ত স্বজাতির গুরুগিরিই করিয়াছেন! তাঁহারা চিত্তরঞ্জন শিক্ষাদান উভয়ই করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিও চিত্তরঞ্জন শি একটা প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যক্তি যেমন সাধনা করে এবং সেই সাধন প্রভাব তার কাজে কর্ম্মে দেখা দেয়, জাতিও তেমনি সাধনা ক এবং সেই সাধনার মন্ত্র ও সাধনার প্রভাব তার কাজে কর্ম্মে প্রকা হয়। সমস্ত প্রাচীন বড় জাতি একটা-না-একটা ইষ্টমন্ত্র সাধ করিত এবং সেই সাধনা তার কাজকর্ম্মে ফুটিয়া বাহির হইত আমরা বলি আমরা জাগিতেছি, কোন্ মন্ত্রবলে কোন্ সাধন ফলে? সে মন্ত্রসাধন আমাদের কোন্ কাজে দেখা দিতেছে আমাদের সাহিত্যে কি ভরপুর ভাবটা আছে?

শিল্পকেও এইরূপ রেখা ও বর্ণপাতে নূতন ভাবের নূতন Ty সৃজন করিতে হইবে। পুরাতন Symbol-ভাষায় নূতন তত্ত্ব নূ সত্য প্রচার করিতে হইবে। উন্নতির পথে প্রাচীনের হাত ধরি চলিতে হইবে, বিভোর হইয়া প্রাচীনের পা ধরিয়া এক জায়গ বসিয়া থাকিতে হইবে না। অবনীন্দ্রপ্রমুখ নব্যশিল্পীগণ এই নূ ধরণের Type তৈয়ারী করিলে ভারত-শিল্পের পুনর্জীবন লাভে সার্থকতা হইবে। পুরাতনের কাছে inspiration লইয়া নূতন গড়িয়া তুলিবার যে লক্ষ্য তাহা সাহিত্যিক ও শিল্পী উভয়েরই ম জাগিয়া উঠুক। কেননা Idealism আমাদের জাতীয় জীবনে সনাতন goal—উহাই ভারতীয়ের স্বভাব-ধর্ম্ম। উহাতেই চলি হইবে। Realism or Naturalism কোন যুগে আমাদের সাহিত বা শিল্প-সাধনার 'স্বধর্ম্ম' ছিল না। এখনও হইবে না। আর সে কথা এই Idealismএর ভিতর দিয়া শিল্প- ও সাহিত্য-সাধ করিয়াই আমরা বিশ্ব-মানবের পাদপীঠতলে আমাদের নিজস্ব কি দিয়া যাইতে পারিব—যেমন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দিয়াছিলেন।

(উপাসনা, কার্ত্তিক) শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, বি, এ।

পল্লীসভ্যতার পুনরুত্থান।

দেশের অস্বাস্থ্যই যে দেশের প্রধান শত্রু, এবং পল্লীগ্রামে স্বা ফিরিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেই যে পল্লীরক্ষা হইবে, তাহা ি নহে। দেশের প্রতি-পল্লীগ্রামই যে এক্ষণে অস্বাস্থ্যকর হইয়াে তাহার কারণ প্রাকৃতিক নহে, একএকটা ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামেও আ নহে। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া একটা সামাজিক বিপ্লব চলিতেছে যাহার চালে আমাদের পল্লীগ্রামের স্বাতন্ত্র্য যে শুধু লুপ্ত হইতে তাহা নহে, পল্লীজীবন নাগরিক জীবনের পুষ্টিবিধানের জন্য একেবা বিসর্জ্জিত হইতেছে। সমাজের একটা অঙ্গ আর-একটা অঙ্গের শোষণ করিতেছে,—পল্লীর অস্বাস্থ্য সে ত মৃত্যুরোগের এক উপসর্গ মাত্র। উপসর্গ নিবারণের জন্য চিকিৎসা না করিয়া আ রোগকে দূর করিতে হইবে।

আমাদের আধুনিক সভ্যতার ফলে পল্লীকৃষি ও শিল্পকর্ম্ম নাগরি জীবনকে পুষ্ট করিতেছে, দেশবাসীগণের অভাব সম্পূর্ণ মোচন না করিয়া অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সাহায্যে বিদেশের অভাব মো করিতেছে অপিচ বিলাসিতার উপকরণ জোগাইতেছে, পল্লীর শি পল্লীজীবন সংগঠনের উপায় না হইয়া নাগরিক জীবন গঠনের উপাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছে, দেশের সমস্ত ধীবুদ্ধিশক্তিকে এক ভা নিয়োজিত করিয়া নাগরিক ব্যক্তিত্বকে গঠন করিতেছে, এমন আমাদের সাহিত্যের আধুনিক ভাব ও আদর্শ নাগরিক শিক্ষা ও দী

দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সমগ্র জনসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন জীবনবিকাশের অন্তরায় হইতে চলিয়াছে। ইহার ফলে পল্লীর জীবনীশক্তি যে হ্রাস পাইবে তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু নাগরিক জীবন যে পুষ্টিলাভ করিতেছে তাহাও নহে,—বিদেশীয় সভ্যতানুমোদিত কৃত্রিমতা ও বিলাসিতার অত্যাচারে ব্যয়-সাপেক্ষ মিউনিসিপালিটি-সমূদয়ের কর-স্থাপনের গুরুভারে অন্নসংস্থানে পরাধীনতায় দেশীয় শিল্পীব্যবসায়ীদিগের দৌর্ব্বল্যে বিদেশীয় বণিকদিগের প্রাবল্যে নাগরিক জীবনও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। পল্লী রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান সমাজের গোড়া-পত্তন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, আধুনিক সমাজের ভাব ও আদর্শ কাজ ও কর্ম্মের বিপ্লবসাধন করিতে হইবে।

পল্লীপরিষৎ গঠিত হউক, সেবাশ্রম স্থাপিত হউক, স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা হউক, কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হইবে—যতক্ষণ আমরা সমাজের আধুনিক ব্যবস্থা চিন্তা ও কর্ম্মের গতির পরিবর্ত্তন করিতে না পারি।

নগরের চিন্তা ও কর্ম্মকে এখন গ্রাম্য জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে দেওয়া হইবে না। গ্রাম্য সাহিত্য, গ্রাম্য আচার ব্যবহার, গ্রাম্য শিল্প বাণিজ্যের এখন উন্নতি সাধনের চেষ্টা দেখিতে হইবে। প্রধানতঃ গ্রামে অন্নসংস্থানের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে সমগ্র সমাজ নাগরিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য আর লালায়িত হইবে না—মধ্যবিত্ত সমাজ এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সে স্বাধীন অন্নসংস্থানের উপায় হারাইয়াছে। নগরে চাকুরীর উপর নির্ভর করিয়া তাহার অর্থ গিয়াছে, বল গিয়াছে, সাহস গিয়াছে, স্বাধীন চিন্তা গিয়াছে।

যে বিজ্ঞানের দ্বারা পল্লীবাসীগণ স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়া আপনাদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা ও তাহার পুষ্টিবিধান করিতে পারে তাহার নাম সমবায়। পল্লীবাসীগণ সমবায়পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, এবং মধ্যবিত্ত সমাজ পল্লীগ্রামে বাস করিয়া তাহাদিগকে এ বিষয়ে পরিচালিত করিলে—শুধু জলপ্রবাহ বায়ুপ্রবাহ পরিষ্কার, পুষ্করিণী খনন, বনজঙ্গল পরিষ্কার কেন, উপযোগী শিক্ষা ও স্বাধীন অন্নসংস্থানেরও ব্যবস্থা হইবে।

(উপাসনা, কার্ত্তিক)　　　　শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

মোটর গাড়ীর জন্য লঘু মিশ্রিত-ধাতু।

আজকাল মোটরগাড়ীগুলিকে অপেক্ষাকৃত লঘু করিবার জন্য মোটরব্যবসায়ীগণ নানাপ্রকার ধাতুর সহিত এলুমিনিয়ম্ ধাতুকে মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত ধাতুর যাবতীয় ধর্ম্মগুলি সম্যক প্রকারে অবলোকন করতঃ তাহাদিগকে যাহাতে কার্য্যে লাগান যাইতে পারা যায় তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

প্রতি বৎসরে অধুনা যত এলুমিনিয়ম ধাতু খনি হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহার শতকরা ১৫ অংশ তড়িত সংক্রান্ত ব্যাপারে, ৬৫ অংশ মোটর গাড়ীর ব্যবসায়ে, এবং ২০ অংশ অন্যান্য নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দস্তার সহিত এলুমিনিয়মকে মিশ্রিত করিলে যে মিশ্রিত ধাতু হয় তাহা এলুমিনিয়মের অপরাপর মিশ্রিত ধাতু অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। কিন্তু আজকাল কেবল দুইটি ধাতু মিশাইয়া যে মিশ্রিত ধাতু তাহার আর আদর হইতেছে না।

বহু পরীক্ষার পর ইদানীং মিরালাইট (Miralite) নামক একটি মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে শতকরা ৯৫ ভাগ এলুমিনিয়ম ৪ ভাগ নিকেল এবং ১ ভাগ অন্যান্য কতকগুলি ধাতু থাকে। এই মিরালাইটকে ছাঁচে ফেলা, পাকানো, ইহা হইতে তার টানা প্রভৃতি সমস্তই হইতে পারে, উপরন্তু জলে বা কোন ক্ষার পদার্থে রাখিলে ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। হাইড্রোক্লোরিক অম্ল ব্যতিরেকে অপর কোন অম্ল ইহাকে নষ্ট করিতে পারে না। এলুমিনিয়মের যত মিশ্রিত ধাতু আছে সমস্তই হাইড্রোক্লোরিক অম্লে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা ঘর্ষণাদি ক্ষয়সম্পাদক ব্যাপারে তাদৃশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। এই মিশ্রিত ধাতু যখন সমুচিতরূপে ব্যবহারোপযোগী হইবে তখন ক্ষয় নিবারণার্থ যে তৈলের আজকাল এতই প্রয়োজন হয় তাহা আর তত হইবে না।

মিরালাইট আবিষ্কার করিয়াই আবিষ্কারকগণ ক্ষান্ত হয়েন নাই। ইহা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট মিশ্রিত ধাতু আবিষ্কার করিবার জন্য তাঁহারা সচেষ্ট রহিয়াছেন। দেখা যাউক ইহা অপেক্ষা আর কিরূপ উৎকৃষ্ট মিশ্রিত ধাতু তাঁহাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। চুপ করিয়া বসিয়া দেখা এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইলে বদন ব্যাদান করা ব্যতীত আমাদের আর কি ক্ষমতা আছে? সুতরাং সকল দেশবাসী বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া নিয়ত নব নব আবিষ্কারে রত থাকুন, আর এই চির-অলস বঙ্গবাসী বসিয়া তাহাই দেখুন আর পরস্পরে বলাবলি করুন "এমন জাত বড় হবে না ত আমরা হব?"

(বিজ্ঞান, আগষ্ট)　　　　শ্রীমন্মথনাথ সরকার, বি এ।

অভিনেতা

(১)

আমি যখনকার কথা বলিতে যাইতেছি তাহার প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যাঙ্ক ওলি-স্পাসে চুরি হয়। চুরিটা অবশ্য কোষাধ্যক্ষ হরেন্দ্র-নাথ এবং তাহার সহকারী ভুবনচন্দ্রের দ্বারাই হইয়াছিল। চুরি হইবার পর হইতেই তাহারা দুইজনে সরিয়া পড়িয়াছিল। পুলিস্-অনুসন্ধান চলিলেও এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ফল হয় নাই।

আমি 'ইউনিয়ন' থিয়েটারের অধ্যক্ষ। তখন আমাদিগের পৃষ্ঠপোষক হেমেন বাবু 'কাশ্মীর-গৌরব' নামে একখানা নাটক লিখিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার প্রথম রচনা হইলেও আমি অভিনয় করিতে সম্মত হইয়াছিলাম,—কেন যে সম্মত হইয়াছিলাম বুদ্ধিমান পাঠক তাহা বুঝিয়া লইবেন। কি উপায় করিলে এই অভিনব নাটক 'কাশ্মীর-গৌরবে'র প্রথম অভিনয়-রজনীতে লোকাধিক্য হইবে এই চিন্তাই তখন আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

কয়েকদিন একাগ্রমনে চিন্তা করিয়া আমি একটি উপায় স্থির করিলাম; সেটি কার্য্যে পরিণত করিবার

জন্য আমি একবার নাট্যকার হেমেন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

তখন বেলা প্রায় সাতটা। হেমেন বাবু সেই মাত্র নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চা-পান করিতে বসিয়াছিলেন। আমায় দেখিয়া তিনি একেবারে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রূঢ়স্বরে বলিলেন,—"আবার কি? কোন খান্‌টা বদলাতে হবে বুঝি? তা যদি হয় ত আপনি সোজা পথ দেখতে পারেন;—আমি আর একটা কথা, এমন কি একটা কমা পূর্ণচ্ছেদও বদলাব না।—তা আমার নাটক অভিনয় করুন আর নাই করুন। আপনাদের কাছে নাটকটা দিয়ে যে কি ঝকমারি কাজ করেছি তা বলতে পারি না। দেখুন মশায়! সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে। রোজ রোজ এটা বদলান, ওখানটা এই রকম হ'লে ভাল হয়, সেখানটা বাদ দিন, এ আর বরদাস্ত হয় না। তার চেয়ে বরং বইখানা ফেরৎ দিন, আমার নাটকের আর অভিনয় হয়ে কাজ নেই। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে, সবই আমার বরাত! আর দেখুন......"

আমি অতিকষ্টে হাস্য দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম কিন্তু পারিলাম না। তিনি আমায় হাস্য করিতে দেখিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তা হাসবেন বইকি! হাসতে ত আর কষ্ট হয় না! যদি জানতেন, যদি বুঝতেন যে এতে লেখকের মনে কতটা আঘাত লাগে—কত কষ্ট......"

এবার হাস্য দমন করিয়া তাঁহার কথায় বাধা দিয়া আমি বলিলাম,—"থামুন মশায়, থামুন, আমি সে জন্যে আসিনি, এসেছি অন্য কাজে।"

আমার কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি তর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"অন্য কাজে যদি এসেছেন ত এতক্ষণ বলেন নি কেন?" তারপর কিয়ৎক্ষণ নীরবে চা পান করিয়া বলিলেন,—"তবে?—আবার কি কাজ?"

"কাজ আছে, বলি শুনুন,—আপনার নাটকখানি যাতে খুব জাঁকাল রকমে অভিনয় হয় তারই একটি ব্যবস্থা করতে হবে।"

আমার কথায় নাট্যকার একেবারে আশাতী প্রীতি লাভ করিলেন। স্মিত হাস্যে বলিলেন,—"দেখ দেবেন বাবু, কাল রাত্রে ছারপোকার কামড়ে একবারে জন্যে চোখ বুজতে পাইনি! শরীরটা ভারি অসুস্থ রাগের মাথায় যদি আপনার কোন অসম্মান করে থা ত মাফ করবেন। তারপর কি বলছিলুম?—হাঁ, আপনি কি করতে বলেন?"

"আমি যা মৎলব করেছি তা একেবারে চমৎকার আপনাতে আমাতে কাশ্মীর গিয়ে......"

হেমেন বাবু আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,-"কাশ্মীরে গিয়ে? অ্যাঁ, দেবেন বাবু, বলেন কি আপনি ভারতের সেই উত্তর সীমা কাশ্মীরে আমরা যাব? ন না, তা হতেই পাবে না; অন্য কোন যুক্তি থাকে বলুন।"

তাঁহার বপুখানি যেমন স্থূল, স্বভাবও তেম অলস। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে তাঁহা মস্তকে যেন অশনিসম্পাত হয়। আলস্য ব্যতী তাঁহার আর এক বাধা ছিল, সেটি দ্বিতীয় পক্ষের প মনীষা! বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা হইলে সর্ব্ব স্থানে যা হইয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার এ প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি ষোড়শী পত্নী মনীষা বলিতে অজ্ঞা হইতেন। সর্ব্বদা তাহার অঞ্চলপ্রান্তে আপনাকে বাঁধি রাখিতে চাহিতেন। কাজেই তিনি যে কাশ্মীর গম একান্ত অসম্মত হইবেন তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দে ছিল না। সেই জন্য আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হই আসিয়াছিলাম।

সহাস্যে তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলাম,—"আ না না। সত্যি-ই কি আমি কাশ্মীরে যেতে বলছি তা নয়, মাস তিনেক আপনাতে আমাতে একটা পাড় গাঁয় গিয়ে লুকিয়ে থাকব। এদিকে আমার কর্ম্মচা নিত্য সংবাদপত্রে খবর পাঠাবে—"ইউনিয়ন থিয়েটারে অধ্যক্ষ 'কাশ্মীর-গৌরব' নাট্যকারের সহিত কাশ্মীরে ঐতিহাসিক ছবি সংগ্রহার্থ ও তথাকার রীতিনীতি পর্য বেক্ষণের জন্য কাশ্মীরে গমন করিয়াছেন! এবার বিরা ব্যয়ে অভিনব ভাবে কাশ্মীর-গৌরবের অভিনয় হইবে

এ পর্য্যন্ত আর কোন নাটক এ ভাবে অভিনয় হয় নাই, হইবেও না! ইত্যাদি, ইত্যাদি।" তারপর লিখবে 'আজ তাঁহারা অমুক স্থানের অমুক অমর দৃশ্যের ছায়াচিত্র লইয়াছেন।' 'আজ অমুক অমুক বিষয়ে বিশেষ বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ইত্যাদি।' তা হলেই বুঝুন, তিন মাস পরে আমরা যখন ফিরব তখন সারা কলকেতাটাময় একটা সাড়া পড়ে যাবে, আর অভিনয়ের দিন কত লোক জায়গা না পেয়ে ফিরে যাবে।"

আমি যখন অঙ্গভঙ্গি সহকারে আমার কল্পনার তুলিতে ভবিষ্যতের চিত্র ফুটাইয়া তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ধরিতেছিলাম, তিনি তখন বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। আর বোধ হয় কল্পনানেত্রে দেখিতেছিলেন প্রথম অভিনয়-রজনীর অর্জ্জিত অসংখ্য রৌপ্যমুদ্রা ও নোটের তাড়া তিনি গণিয়া লইতেছেন! আমার এরূপ অনুমানের কারণ, যে-সময় আমি আমার কল্পনার কথা বলিতেছিলাম তখন তাঁহার স্থূল ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য দিয়া চপলার চকিত বিকাশের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে হাসির হল্কা বহিয়া যাইতেছিল। চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা চাপিতে পারেন নাই।

আমার কথা শেষ হইলে তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"বাঃ! বাঃ! দেবেন বাবু আপনার কি চমৎকার বুদ্ধি! তবে তাই করুন, তাই করুন। সাবাস বুদ্ধি, বাঃ! এমন সুন্দর মৎলব আর কখনও শুনিনি।"

"তবে আপনি যেতে রাজি?"

"আমি! কি সর্ব্বনাশ, আমি! আমি কোথা যাব? দেখুন আমার একটা বড় বিতিকিচ্ছি ব্যায়রাম আছে, মাঝে মাঝে সেটা বড় বেড়ে ওঠে; এই-এই-ই হচ্ছে তার বাড়তির মুখ। তা আপনি একাই যান না?"

"উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ, তা হলেই সব মাটি। দুজনের এক সঙ্গে যাওয়া চাই।"

হেমেন বাবু বহুক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"কিন্তু কাজটায় বিপদের আশঙ্কা বড় বেশী রয়েছে না? মনে করুন যদি কেউ দেখে ফেলে? আচ্ছা কোথায় গিয়ে থাকবেন বলুন দেখি?"

"তা এখনও ঠিক করিনি। রাত্রে মৎলবটা মাথায় এল তাই সকালেই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি এটা কাজে করলে কেমন হয়। তবে এমন একটা জায়গায় যেতে হবে যেখানে কলকাতার লোক খুব কম থাকে। লুকিয়ে থাকবার মত জায়গার অভাব কি! আর তার জন্যে বেশী দূরই বা যেতে হবে কেন! এই যে সেদিন ভুবন আর হরেন ব্যাঙ্ক ভাঙলে, আমার বিশ্বাস তারা কাছেই কোন পাড়াগাঁয়ে লুকিয়ে বসে আছে আর এদিকে পুলিশ সারা সহরটি তোলপাড় করছে। আচ্ছা রামনগরের নাম কখনও শুনেছেন?"

"না। কেন? সেখানে কি?"

"সে জায়গাটা শীতের শেষে অর্থাৎ ঠিক এই সময় এমন নির্জ্জন হয়ে যায় যে মরুভূমি বল্লেও চলে। সেখানে গিয়ে যদি আমরা অন্য নাম ধরে বাস করি তা হলে কেউ আমাদের ধরতে পারবে না। আর রামনগরের পাশ দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে গেছে, সকাল সন্ধ্যায় সেই নদীর ধারে বেড়ালে আপনার শরীরও বেশ সুস্থ হবে।"

"আমি একটুও অসুস্থ নই, সেই অজ পাড়াগাঁয়ে আমার শরীর সারতে যাবার একটুও দরকার নেই। আর তাই কি দু'একদিন—তিন তিন মাস, বাবা!

বহু তর্কবিতর্কের পর হেমেন বাবু বললেন কথাটা তিনি একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন অর্থাৎ কিনা দ্বিতীয় পক্ষের সহিত পরামর্শ করিবেন এবং পরদিন সে চিন্তার ফলাফল জানাইবেন।

(২)

বহু তর্ক করিয়া, বর্ণনার তুলিতে ভবিষ্যতের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করিয়া, অবশেষে হেমেন বাবুর সম্মতি পাইলাম।

তাহার পর সপ্তাহকালের মধ্যেই আমরা শকট আরোহণে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দুইখানি টিকিট কিনিয়া যখন আমরা গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম তখন হেমেন বাবুর মুখের যে ভাব দেখিয়াছিলাম তাহা জন্মে কখনও ভুলিতে পারিব না।—এমন শোক তাঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতেও দেখা যায় নাই! কি করুণ সে

মুখচ্ছবি! আমি ষ্টেসন হইতে দুইখানি কাগজ কিনিয়া লইয়াছিলাম—সে দুইখানিতেই আমাদের কাশ্মীর যাইবার কথা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছিল। সেগুলি পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল সত্যই যেন আমরা কাশ্মীর যাত্রা করিয়াছি!

যথাসময়ে আমরা রামনগরে আসিয়া পৌঁছিলাম। গ্রামখানি অতিক্ষুদ্র। অধিবাসী প্রায় নাই বলিলেই হয়। কাজেই খালি বাড়ী আমরা বিনাক্লেশেই ভাড়া পাইলাম। বাটীর অধিকারীকে বলিলাম আমার বন্ধুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় আমরা কয়েক মাসের জন্য বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য রামনগরে থাকিব। লোকটা ঝটিতি বলিয়া ফেলিল—"হাওয়া বদলাবার এমন জায়গা আর পাবেন না মশায়; লোকের হাওয়া বদলাবার দরকার হলে ডাক্তারেরা এইখানে আসতেই পরামর্শ দেন।"

আমরা রামনগরে পৌঁছিবার কয়েক দিন পরেই বসন্তের প্রথম বাতাস দেখা দিল। একদিন হেমেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"জায়গাটা লাগছে কেমন?"

গম্ভীর মুখে তিনি বলিলেন,—"আরে ছ্যা ছ্যা, এমন জায়গাতেও মানুষ আসে! না আছে একটা গান-বাজনার আড্ডা, না আছে কিছু! গ্রামটার যেন প্রাণ নেই। বসে বসে যে কি করি, তার ঠিক নেই। দৈনিক ইংরেজী কাগজগুলো বিকেলে এসে পৌঁছয়, কিন্তু সারা দিনটা কাটে কিসে?"

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় হেমেনবাবু শতাধিক পুস্তক সঙ্গে আনিয়াছিলেন, কিন্তু এই কয় দিনেই সেগুলি সব শেষ করিয়াছেন; কাজেই এখন আর তাঁহার পড়িবার মত কিছুই ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"কদিন হল মশায়? আর যে পারি না; এই অপরিষ্কার গুম্‌টো ঘরের মধ্যে বসে বসে যে পাগল হয়ে উঠলুম। একটু যে বেড়িয়ে আসব তারও যো নেই, এমনি বিশ্রী মোটা আমি যে রাস্তায় বেরুলেই ছোঁড়াগুলো হাততালি দিতে দিতে পেছনে ছুটতে থাকে। তবু ভাল যে গ্রামে বেশী ছেলে নেই,—তা না হলে এতদিন সত্যিই পাগল হয়ে যেতুম।"

একথা আমার নিকট আজ নূতন নহে, প্রায় প্রত্যহই তিনি সারাদিন ধরিয়া এইরূপ নানা অভিযোগ করিতেন। কাজেই আমি হাস্য দমন করিয়া কেবলমাত্র বলিলাম,—"দিন কুড়ি হল আমরা এখানে আছি,—আর মাত্র সোত্তর দিন থাকতে হবে। তার পর ভেবে দেখুন কি সৌভাগ্য-সূর্য্য আপনার ভাগ্য-আকাশে উঠবে!"

"হাঁ, ততদিন বাঁচলে ত সৌভাগ্য, এদিকে যে মরতে বসেছি! মরেই যদি যাই ত সৌভাগ্য ভোগ করবে কে? এখনও সো-ত্ত-র দিন। বাবা, সে যে একযুগ মশাই! না ম্যানেজার মশাই, তার চেয়ে চলুন ফিরে যাই; সত্যি বলছি, এখানকার হাওয়া আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। শরীরটাও বড় খারাপ হয়েছে। আর বাড়ীতে সেই যে একটা লোক হা পিত্তেশ করে পড়ে রয়েছে তার কথাও ত আমায় ভাবতে হয়!"

হেমেন বাবু যে এই কুড়িদিনেই পত্নীর বিরহে যক্ষের মত কাতর হইয়া হা-হুতাশ করিবেন তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলাম, "কিন্তু এখন ত ফেরবার কোন উপায় নেই!"

গম্ভীরমুখে হেমেন বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরব রহিলেন।

(৩)

সেদিন হেমেনবাবুকে বাসায় রাখিয়া একাকী আমি একটা দোকানে কাগজ কিনিতে গিয়াছিলাম।

দোকানের ভিতর একখানা তক্তাপোষে বসিয়া এক-জন লোক সেই দিনের একখানা কাগজ উচ্চৈঃস্বরে পড়িতেছিল আর কয়েকজন নিষ্কর্ম্মা বসিয়া বসিয়া তাহাই শুনিতেছিল। লোকটা পড়িতেছিল আমাদের কাল্পনিক ভ্রমণের ইতিহাস।

আমি এক দিস্তা কাগজ কিনিয়া একটা টাকা দিয়াছিলাম; বাকি পয়সার জন্য কাজেই অপেক্ষা করিতে হইতেছিল। এই সময় একজন আসিয়া একটা পয়সা ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"এক পয়সার চা!" লোকটার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, পরিচ্ছদ মলিন ও অর্দ্ধছিন্ন; তাহার মত লোকেও চায়ের নেশা করে!

সেই লোকটা আমারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। আমার মনে যে বেশ একটু ভয় হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। লোকটির চাহনি দেখিয়াই বেশ বুঝিয়াছিলাম যে আমি তাহাকে না চিনিলেও সে আমায় চেনে। আমার ভয়ের কারণ, সে যদি কাগজে পড়িয়া থাকে যে আমরা কাশ্মীরে গিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করিতেছি অথচ আমায় এখানে সশরীরে উপস্থিত দেখিতে পায় তবেই সমূহ বিপদ! আমাদের প্রতারণা দু' এক দিনের মধ্যেই সারা বঙ্গে প্রচারিত হইবে! আমি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলাম। মনে মনে আপনার উপর যারপরনাই বিরক্ত হইতেছিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি সেই দিনের কাগজে আমরা কাশ্মীরে গিয়া কয়েকটি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাহা হউক টাকার বাকী পয়সা পাইবামাত্র আমি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রপদে বাসা-অভিমুখে অগ্রসর হইলাম; কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই পশ্চাৎ হইতে ডাক পড়িল,—"ও মশাই! ও দেবেন বাবু!"

আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিলাম,—"আপনার ভুল হয়েছে মশাই! আমার নাম ত দেবেন বাবু নয়।"

"কেন মিথ্যে বলছেন মশাই! আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি; কিন্তু সে কথা থাক, একবার দয়া করে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে আমার কথাটা শুনে যান! থিয়েটারে গেলে ত আর দেখা হবে না।

লোকটা আমার পরিচয় সম্বন্ধে এমনি নিশ্চিন্ত ভাব দেখাইল যে আমি আর না বলিতে পারিলাম না। তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া দাঁড়াইলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমার কাছে কি চান মশায়?"

লোকটা বলিতে লাগিল,—"আমি একজন অভিনেতা। ছেলেবেলা থেকে অভিনয়ই আমার সখ; এ বয়সে প্রহসন থেকে বিয়োগান্ত নাটক অবধি সবই অভিনয় করেছি। আমার অভিনয় করবার শক্তি আছে, কিন্তু কেউ জামিন নেই; এই অপরাধে কলকাতার কোন থিয়েটারে আমি চাকরি পাইনি। আমার যে অভিনয় করবার ক্ষমতা আছে, তার প্রমাণ না দিলে কেউ বিশ্বাস করতেই চায় না। আপনাকে অনেকক্ষণ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলুম কিছু মনে করবেন না। আমার প্রার্থনা, একবার আমায় কাজ দিয়ে দেখুন, সত্যিই আমার ক্ষমতা আছে কিনা!"

লোকটার কথার ভাবে বুঝিলাম আমরা যে কাশ্মীরে গিয়াছি এ সংবাদ সে তখনও জানিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাতে কি? আর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে যে সে সে-কথা জানিবে না তাহা কে বলিতে পারে? তখন যে কি করিব স্থির করিতে পারিলাম না। লোকটাকে যদি চাকুরী না দিয়া বিদায় দিই তবে সে আমার সহিত তাহার যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল একথা নিশ্চয়ই প্রকাশ করিয়া দিবে; তাহা হইলে আমার আর লোকের নিকট মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। তবে?

অবশেষে আমি গম্ভীর মুখে বলিলাম,—"ওঃ বটে! তা আচ্ছা কিসের অংশ আপনি ভাল অভিনয় করতে পারেন?"

লোকটা বোধ হয় আনন্দাধিক্যে আমার কথা শুনিতে পায় নাই, সে বলিল,—"আজ্ঞে খুব কম মাইনেতেই আমি রাজী।"

কষ্টে হাস্য দমন করিয়া আমি বলিলাম,—"আমার সঙ্গে একটু চলুন না, রাস্তায় চলতে চলতে কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে'খন! আচ্ছা, আমি বলি কি, আপনাকে কাজ দেবার আগে একবার পরীক্ষা করা দরকার—তার কারণ আপনার যে বাস্তবিকই অভিনয় করবার ক্ষমতা আছে সে আমার বোঝা চাই ত। জানেনই ত ইউনিয়ন থিয়েটারের চাকর দাসীরা অবধি দরকার হলে অভিনয় করতে পারে! তা আপনাদের গ্রামে কোন এমেচার থিয়েটারও নেই?—কোন ঠিকে কাজও মেলেনি?"

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"না মশাই, কোন ঠিকে কাজও পাইনি তাই ঘরে বসে আছি।"

"কিন্তু আপনি যে নাট্য-জগত থেকে অনেক দূরে পড়ে আছেন!"

"হাঁ। তার কারণ আমি ত একা নই, একটি ছোট মেয়ে আছে।"

"কলকাতাতেও ত অনেক অভিনেতা ছেলে মেয়ে নিয়ে রয়েছে!"

"তা আছে বটে, তেমন তারা রোজগারও করছে। আর আমার মত বেকার লোক মেয়ে নিয়ে কোন্ সাহসে কলকাতায় গিয়ে থাকবে? গরীবের মেয়েকে সবাই দূর ছাই করবে, বাছা আমার তাদের হতচ্ছেদ্দায় দিন দিন শুকিয়ে উঠবে, তাই সাহস করে কলকাতায় থাকিনে। আর সারা জীবন যদি এই পাড়াগাঁয় পড়ে থাকতে হয় সেও ভাল, তবু আমি আমার বাছাকে যমের মুখে তুলে দিতে পারব না। সেই যে আমার সংসারের সর্ব্বস্ব!"

"ঐ, ঐখানেই আপনার আর্ট!"

"আমার আর্ট! বলেন কি দেবেন বাবু? অ্যাঁ—" লোকটা লাফাইয়া উঠিল।—"আমি ত বলেছি একজন অভিনেতা, আর শিক্ষা পেলে চাইকি কালে আরও উন্নতি করতে পারব! কিন্তু সে চুলোয় যাক! আপনি যদি আমায় থিয়েটারের ষ্টেজ ঝাঁট দিতে বলেন আর মাসে মাসে ন্যায্য মাইনে দেন তাই আমার যথেষ্ট। মেয়েটা দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে সেই আমার ঢের। চুলোয় যাক্ আর্ট ফার্ট! চাই শুধু টাকা, টাকা দেবেন বাবু! টাকা! অন্য লোকের ছেলে মেয়ে যেমন দুবেলা খেয়ে প'রে হেসে খেলে বেড়ায় আমিও আমার মেয়েকে তেমনি ভাবে রাখতে চাই—শুধু এইটুকু দেবেন বাবু,—এর বেশী আর আমি কিছু চাই না।"

"তা আপনি যা বলছেন এ আর বেশী কথা কি? একদিন আপনার মাইনে থেকেই যে এসব হয়ে অনেক উদ্বৃত্ত থাকবে।"

"তা হবে কি দেবেন বাবু?—তা কি হবে?"

"একবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই চট্ চট্ আপনার মাইনে বেড়ে যাবে—হবে না কেন?"

"কিন্তু মশাই, তা আর হচ্ছে কই? বছর বছর আমি থিয়েটারের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য আমার যে একটা কাজও জুটছে না। তা হলে মশাই, আপনি কি বলেন?"

"হ্যাঁ, আপনার নামটি কি?"

"আজ্ঞে আমার নাম প্রাণপদ পান।"

"তা প্রাণপদ বাবু, আপনার অভিনয় না দেখে ত আপনাকে কাজ দিতে পারছি না। আমি কিছু অন্যায় কথা বলিনি তা আপনি বেশ বুঝতে পারছেন?"

"না, অন্যায় আর কি? তবে আপনার কাছ থেকে কবে খবর পাব?"

"তা হ্যাঁ কি বলছিলুম? আমার কাছ থেকে খবর পেতে আপনার একটু বিলম্ব হবে। 'কাশ্মীর-গৌরব' নাটকখানার অভিনয় আরম্ভ হলে আপনি একখানা চিঠি লিখে কথাটা আমায় মনে করিয়ে দেবেন। সম্প্রতি কিছু দিন আমি এখানে থাকছি না,—কালই ভোরের ট্রেনে কাশ্মীর যাব। কাগজে বেরিয়েছে আজ আমরা কাশ্মীর পৌঁছে গেছি। কাজেই আজ যে আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল এ কথাটা যেন কারো কাছে বলবেন না। তা হ্যাঁ—আপনার কথা আমার মনে থাকবে।"

লোকটা আমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছিল। ভগবান জানেন ইহা অপেক্ষা অধিক আশা দিবার শক্তি আমার ছিল না।

"আপনি আজ আমার সঙ্গে যে ভদ্রতা করলেন তা আমার চিরদিন মনে থাকবে! কিন্তু দেবেন বাবু, আপনি আমার কি উপকার করলেন? আমি ত সেই যে-বেকার সেই-বেকারই রইলুম!"

"না না আপনি নিরাশ হবেন না; শীগ্‌গিরই আমি আপনাকে চিঠি দেব।"

কিন্তু তখন জানিতাম না যে দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া সেই দিনই তাহাকে ডাকিতে হইবে!

(৪)

আমি বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম হেমেনবাবু বিছানায় পড়িয়া নাসিকা গর্জ্জন করিতেছেন।

তাঁহাকে তুলিয়া বলিলাম,—"নিন জিনিষগুলো গুছিয়ে —আজই এখান থেকে চলে যাব।"

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"ব্যাপার কি মশায়?"

"ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু! এখানে একটা পট্‌কা ছোঁড়া আছে সে আমায় চেনে। আমি তাকে বলে এসেছি আজই আমরা কাশ্মীর যাব। তাই বলছি জিনষগুলো গুছিয়ে নিন, সরে পড়া যাক, কাল যেন আর সে আমাদের দেখতে না পায়!"

হেমেন বাবু শুইয়া ছিলেন এইবার উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"তা হলে আমরা কলকেতায় যাব ত?"

"আরে না না, তা কি করে হবে? অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।"

"কেন? আমরা কি পলাতক নাকি? আচ্ছা দেবেন বাবু, এভাবে হেথা সেথা ছুটোছুটি করে না বেড়িয়ে আমি কেন কলকেতায় ফিরে যাই না? সেখানে খুব সাবধানে ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকব, তা হলেই কেউ টের পাবে না। সে ত বেশ হবে!"

আমি তাঁহার কথায় কোন উত্তর দিলাম না।

* * *

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। আমরা ভৃত্যের আলোক আনয়নের অপেক্ষায় ছিলাম। কয়েক মিনিট পরে আলো লইয়া একজন অপরিচিত ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে দেখিয়া যত না বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহার কথা শুনিয়া ততোধিক বিস্মিত হইলাম। লোকটা বলে কি!—আমরাই ব্যাঙ্ক ভাঙ্গা আসামী এবং সে পুলিশের ইন্সপেক্‌টর, আমাদেরই গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে!

আমরা পরস্পরের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলাম। অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে অতঃপর আমাদের প্রকৃত নাম গোপন করিয়া আর ছদ্ম নাম ব্যবহার করিলে চলিবে না।

আমি প্রথম সাহসে ভর করিয়া আগন্তুক পুলিস কর্ম্মচারীকে বলিলাম,—"আপনার ভুল হয়েছে মশায়! আমার নাম হলগে দেবেন্দ্রনাথ পাত্র—ইউনিয়ন থিয়েটারের অধ্যক্ষ আমি। আর এ ভদ্রলোকের নাম শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পোড়েল; এঁর বাড়ী হলগে কলকেতায়। অনর্থক আমাদের ভোগাবেন না।"

লোকটা আমার কথায় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না।

আমার পকেটেই আমার নামের কার্ড ছিল একখানা বাহির করিয়া বলিলাম,—"এই দেখুন আমার নামের কার্ড।"

লোকটা তেমনি অবিচলিত ভাবে বলিল,—"তাতে কি? এতে এমন বিশেষ কিছু নেই যাতে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হতে পারে। আর আপনি যে দেবেন বাবুর নামের কার্ড চুরি করেন নি তাইবা কি করে জানব? ওসব কথা আমি শুনতে চাই না, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, রাস্তায় আমার লোক আছে। আপনাদের যা বলবার থানায় গিয়ে বলবেন। চলে আসুন এখন!"—এই বলিয়া লোকটা আমার দিকে অগ্রসর হইল।

"সাবধান মূর্খ! গায়ে হাত দিলে তোমার সর্ব্বনাশ না করে ছাড়ব না। মনে রেখো 'ইউনিয়ন থিয়েটারের' অধ্যক্ষ আমি, আমার ক্ষমতা বড় কম নয়। পরে কিন্তু এর জন্যে পায়ে ধরে মাপ চাইলেও আমি মার্জ্জনা করব না,—তোমার সর্ব্বনাশ না করে ছাড়ব না।"

ইন্সপেক্‌টর তথাপি অবিচলিত। আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"ঢ্যাঙা, গাল-তোবড়া কটা গোঁফ আছে হরেনের,—আপনার সঙ্গে বর্ণনা ঠিক মিলছে; আর আর ভুবনের মাথার সামনে টাক, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, অসম্ভব মোটা—এটাও আপনার ঐ সঙ্গীটির সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে। আর গোল করবেন না, চলে আসুন।"

মহাক্রুদ্ধ হেমেনবাবু বলিলেন,—"একেবারে আস্ত গাধা! হ্যাঁরে আহাম্মক! সারা কলকেতায় এক ভুবন ছাড়া কি আর কেউ মোটা নেই?"

"সে কথা অন্য জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তা জানি না, শুনতেও চাই না।"

হেমেনবাবু ক্রোধে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"তা যদি করতে হয় ত জেনো তোমাকেও সহজে ছাড়ব না। একএকখানি হাড় তোমার আলাদা করে গুঁড়ো করব এখনও সময় আছে, ভাল চাও ত পথ দেখ। ভুবনই যে সারা পৃথিবীর মধ্যে এক মাত্র মোটা ছিল এমন কোন

কথা আছে?—তবে হ্যাঁ সে লোকটা মোটা ছিল বটে, আর বোধ হয় আমিও একটু মোটা মানুষ কিন্তু তাই বলে আমিই যে ভুবন এমন কি প্রমাণ পেলে তুমি?"

লোকটা একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল,—"আর আপনিই যে সেই লোক নন তারই বা প্রমাণ কি? আপনাদের প্রমাণের মধ্যে ত এক ঐ দেবেনবাবুর নামের কার্ডখানি। কিন্তু তাই ব'লে যে এর মধ্যে একজন দেবেনবাবু এ কথা কে বলবে? যাক্ সব কথা ত এখন এক রকম চুকে গেল, তবে আমার সঙ্গে চলুন; এ রকম অনর্থক নষ্ট করবার আমার সময় নেই।"

আমি আর নীরব থাকিতে পারিলাম না; সক্রোধে বলিলাম,—"চুপ কর, একটু থাম! আচ্ছা শোন, আমরা যদি এইখানের কোন লোক দিয়ে প্রমাণ করাতে পারি যে আমি সে লোক নই তা হ'লে হবে ত?"

হেমেনবাবু অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়া তাড়াতাড়ি আমায় প্রশ্ন করিলেন—"যে লোকটার সঙ্গে আজ আপনার পথে দেখা হয়েছিল সেই তারই কথা বলছেন বুঝি?"

ইন্সপেক্টার বলিল,—"কই এমন লোক ত এ গ্রামে কেউ আছে বলে মনে হয় না; আমরা ত কাউকেই জিজ্ঞেস করতে বাকি রাখিনি।"

"হ্যাঁ এইখানেই এমন একজন লোক আছেন যিনি আমায় বিলক্ষণ চেনেন;—আর তিনিও এখানকার নতুন বাসিন্দে নন, বহুকালের বাস তাঁর।"

"বেশ, তাঁর নাম বলুন।"

আমি বলিলাম,—"তাঁর নাম—তাঁর নাম—" কি সর্ব্বনাশ! নামটাও যে আমার মনে পড়িতেছে না! সত্য কথা বলিতে কি তাঁর নাম আমার মনে রাখিবার কিছু-মাত্র আবশ্যকও মনে হয় নাই! তখন কেবল লোকটার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই বলিয়াছিলাম,—"আপনার কথা আমার মনে থাকবে।" বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও আমি তাঁহার নামটি স্মরণ করিতে পারিলাম না; স্থির দৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কতক্ষণ পরে বলিলাম,—"তাঁর নাম—নাঃ নামটা আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না।"

"যথেষ্ট হয়েছে! বেশ বুঝতে পারছি এ একটা বাজে ওজর।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"না, না, তাঁর সঙ্গে আজ এই প্রথম দেখা—তাই নামটি ঠিক মনে পড়ছে না। অনেকটা মনে এসেছে—আর একটু অপেক্ষা কর আমি বল্‌ছি।"

নিরাশব্যথিত হৃদয়ে হেমেন বাবু বসিয়া পড়িলেন পুলিশ কর্ম্মচারী বলিল,—"অনেক অপেক্ষা করেছি আর পারি না; চলে আসুন আপনারা!"

বিপদ বুঝিয়া আমি যথাসাধ্য তৎপরতার সহিত বলিয়া ফেলিলাম,—"তাঁর নাম—তাঁর নাম—হ্যাঁ, প্রাণপদ পান।"

লোকটা একখানা খাতায় নামটা লিখিয়া লইল তাহার পর বলিল,—"কোথা তাঁর দেখা পাব?"

"তা আমি কি করে বলব? গ্রামের কাউকে জিজ্ঞেস করগে। আর শোন, এখন আমি এই গাঁয়ের একজনের নাম বলেছি যে আমায় চেনে। এখনও ভাল চাও ত তাঁকে ডেকে এনে তোমার এ ভুল সুধরে নাও;—আত্মরক্ষার এই তোমার শেষ সুযোগ।"

"বেশ। আর আমিও আপনাদের বলছি যদি সে লোককে না খুঁজে পাই তা হলে আপনারাই তার জন্যে ভুগবেন।"

লোকটা জানালার নিকট গিয়া একটা ক্ষুদ্র বাঁশীতে ফুৎকার দিল, তাহার পর চাপা গলায় কাহাকে বলিল,—"প্রাণপদ পান বলে এখানে কে আছেন তাঁকে একবার ডেকে আনত, আর তাঁকে জিজ্ঞেস করবে ইউনিয়ন থিয়েটারের ম্যানেজার দেবেন বাবুর সঙ্গে আজ তাঁর দেখা হয়েছিল কি না?"

লোকটা ফিরিয়া আসিয়া আমাদের নিকট বসিল। যে লোকটা প্রাণপদকে ডাকিতে গিয়াছিল উৎসুকভাবে আমরা তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। উঃ কি কষ্টেই সে সময়টা কাটিয়াছিল! কতক্ষণ আমরা উৎসুক ভাবে কাটাইয়াছিলাম। পুলিশের লোকটা আর স্থির থাকিতে পারিল না, উঠিয়া গৃহের বাহিরে গেল।

হঠাৎ হেমেন বাবু বলিলেন,—"শুনতে পাচ্ছেন কিছু?

লোকটা বোধ হয় ফিরে এসেছে ঐ—ঐ শুনুন তারা কথা কচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। লোকটা একাকী গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"আমার লোক প্রাণপদ বাবুর দেখা পেয়েছে; আর তিনিও বলেছেন যে আজ সকালে দেবেন বাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কি? আপনাদের মধ্যে কে একজন দেবেন বাবু তা আমি কি করে বুঝব? প্রাণপদ বাবু তাঁর মেয়েকে গল্প বলছেন—এখন আসতে পারবেন না। কি হবে আর এখানে দেরী করে মিছে—থানায় চলুন।"

নিরাশ-ব্যথিত প্রাণে আমি বলিয়া উঠিলাম—"হা ভগবান!" সত্য কথা বলিতে কি তখন নিরাশায় আমার সারা প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের শেষ আশা নিষ্ফল হইল!

অস্থির ভাবে আমি গৃহমধ্যে পদ-চারণা করিতে লাগিলাম;—"প্রাণপদ কি বল্লে, বদমায়েসটা বল্লে কি শুনি?"

"আমার লোকের মুখে শুনলুম তিনি বলেছেন—দেবেন বাবু বোধ হয় আমার নামই মনে রাখতে পারেন নি। আর তিনি যখন আমার প্রাণ রক্ষার কোন উপায় করলেন না, তখন আমিই বা কেন তাঁর ব্যাগার খাটতে যাই?"

আমি বসিয়া পড়িলাম। বিশ্বসংসার আমার চক্ষে ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। শরীর ঝিমঝিম করিতেছিল। লোকটা আমার অবস্থা দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া উঠিল। বলিল—"বোধ হয় একখানা চিঠি লিখে দিলে উপকার হতে পারে। আপনি চিঠি লিখতে চান ত আমি অপেক্ষা করতে পারি।"

আমি টেবিল হইতে কাগজ কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিলাম। লোকটা বাধা দিয়া বলিল—উঁহু তা হবে না, আপনি হয় ত কোন কথা শিখিয়ে দেবেন, তা হলে আর কি হল? তার চেয়ে আমি বলে যাই আর আপনি লিখুন।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলাম,—"বেশ, কি লিখতে হবে বলুন।"

সে বলিল,—"শ্রীযুক্ত প্রাণপদ পান মহাশয় সমীপেষু,—মহাশয়,—"

"হাঁ লিখেছি—তারপর?—তারপর?"

সে বলিতে লাগিল,—"আমি এতক্ষণে বেশ বুঝিয়াছি যে আপনার অভিনয় করিবার ক্ষমতা অদ্বিতীয়। তাহা জানিয়া অদ্য হইতে আপনাকে মাসিক একশত টাকা বেতনে আমার থিয়েটারে অভিনেতার পদে নিযুক্ত করিলাম। আমি যতদিন থিয়েটারে থাকিব ততদিন আপনাকে পদচ্যুত করিব না!"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে বাকশক্তি ফিরিয়া আসিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে মশায় আপনি?"

লোকটা স্মিতমুখে বলিল,—"কেন, আপনার তাঁবেদার প্রাণপদ পান—এইমাত্র যাকে একশ' টাকা মাইনের কাজে নিযুক্ত করেছেন! এখন সই করুন।"

প্রাণপদর অভিনব অভিনয়-দক্ষতায় আমার আর কিছুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। কাজেই আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে পত্রখানিতে সহি করিয়া দিলাম।

স্মিতমুখে প্রাণপদ বলিল,—"নমস্কার মশায়! আসি তবে!—" †

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্‌ভ্রান্ত

পথচিহ্নহীন কোন্ শূন্য বায়ুপথে
স্বপন আমারে লয়ে আপনার মতে
অনাদি অজানা দেশে চলে বার বার?
ভ্রান্ত নহে চিত্ত তবু, শ্রান্তি নাহি তার!
কিন্তু হায় সীমাময়ী ধরিত্রীর পরে
যেথা গৃহ গ্রাম পথ নাম গোত্র ধরে,
সীমান্তে সঙ্কীর্ণ দেশ, নিয়ত সেথায়
অক্ষম অন্ধের মত চলেছি দ্বিধায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

---

† একটি ইংরেজী গল্পের অনুসরণে—লেখক।

ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের ব্যাঙ্গচিত্র

ঈজিপ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিতে পারিবে এই ভ্রান্ত আশায় জর্ম্মানী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।
- ক্লাডেরাডাট্‌শ্‌ (বার্লিন)।

বেলজিয়ম।
—ঈগল্‌ (আমেরিকা)

আকাশযানের সন্ধান।
—ইভনিং সান (আমেরিকা)।
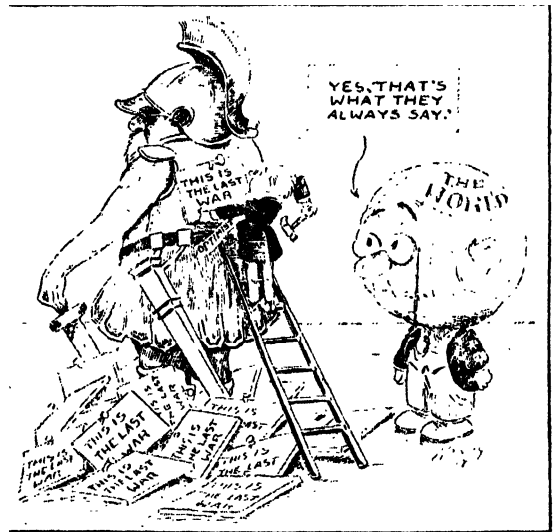
"এই যুদ্ধ জগতের শেষ যুদ্ধ"
এই বিজ্ঞাপন যুদ্ধদানবের গায়ে কিছুতেই আঁটা যাইতেছে না।—
নিউস্‌ প্রেস্‌ (আমেরিকা)।
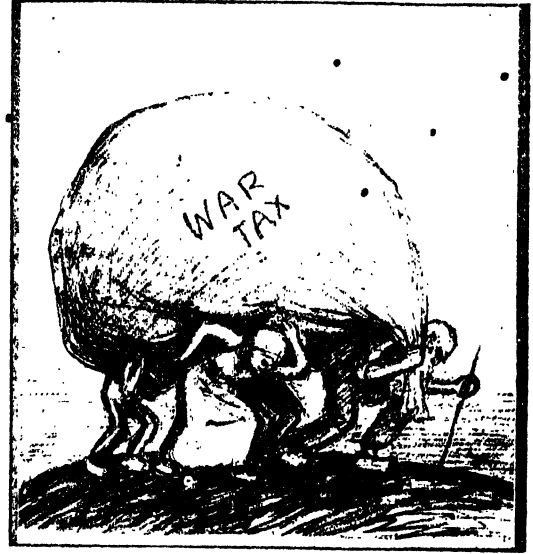
যুদ্ধের আগুনে পূর্ণাহুতি—সাহিত্য, কলা, শিল্প, বিজ্ঞান সমস্ত, ভস্মসাৎ করিয়া ধর্ম্ম আহুতি দেওয়া হইতেছে।

—পেন ডিলার (আমেরিকা)।

যুদ্ধাবশেষ লোকেদের ভবিষ্যৎ দশা—যুদ্ধের ট্যাক্সের ভারে প্রপীড়িত।

—আউটলুক।
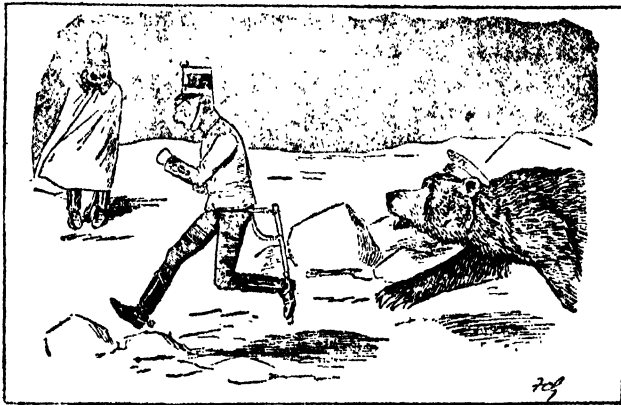
অষ্ট্রীয়া জর্ম্মানীকে বলিতেছে—ভায়া উইলহেলম, শিকারে গিয়ে ভালুকটাকে জ্যান্তই ডেকে এনেছি।

—ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার গেজেট।

!! ভূগোল পড়া এখন অনর্থক, এর আগাগোড়াই ত বদলে যাবে দেখছি।

—পাঞ্চ।

পঞ্চশস্য

দু'তলা চাষ—

ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনদেশীয় কৃষকেরা কিরূপে একই ক্ষেত্রে এককালীন দুইটি ফসল উৎপন্ন করে, মিঃ জে, রসেল, স্মিথ Century Magazineএ সেই সম্বন্ধে উপরোক্ত নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই দুইতলা ক্ষেত্রের একতলা গাছের ডালে ও আর একতলা মাটিতে থাকে। অর্থাৎ কিনা একই ক্ষেত্রে ফলবৃক্ষ ও শাকসব্জি কিম্বা শস্যাদির চাষ। অবশ্য সকল দেশের অবস্থা একরূপ নয় বলিয়া শস্যাদির সম্বন্ধেও ইয়ুরোপীয় কৃষকদের হেয় অনুকরণ করা চলে না। যদিও আমেরিকারও অনেক ফলের বাগানে গাছের ডালের তলায় শস্য জন্মাইতে দেখা গিয়াছে, তথাপি কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ অনেকেই এই পদ্ধতিটিকে অবহেলা করেন। মিঃ স্মিথ বলেন যে যদি ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে বৃক্ষগুলি মাঝে অনেকখানি ব্যবধান রাখিয়া রোপণ করা হয়, তাহা হইলে উপর ও নীচের ফসল পরস্পরের কোন ক্ষতি করে না। তিনি বলেন,

"গত বসন্তকালে বাদামের ফুল ফুটিবার সময় মধ্যধরণীতে ভীষণ তুষারপাত হইয়াছিল। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রের ফসলের সম্ভাবনা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি চাষীদের বেশ প্রফুল্ল দেখিলাম। এই দ্বীপের চাষারা, দুইতলা চাষ করে; তুষার পাতে একটি ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহারা আর একটির শরণ লইল। তাহাদের ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশেষ কোন বিপত্তি হয় নাই। তাহাদের লাভের অংশ মারা গেলেও অন্ন মারা গেল না। কালিফর্ণিয়ার যে প্রদেশে, কমলা লেবুর চাষ হয়, সেই প্রদেশে একবার পূর্ব্ববৎ তুষারপাত হওয়ায় সমগ্র দেশবাসী দুঃখে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কৃষকদের একতলা চাষই এই দুঃখের কারণ। এক আঘাতেই তাহাদের সমস্ত ফসলের আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল, এবং ফলে অনেককে দেউলিয়া পর্য্যন্ত হইতে হইল।"

মধ্যধরণী সাগরস্থ স্পেনের অধীন মেজরকা দ্বীপের কর্ষণ-যোগ্য ভূমির প্রায় নয়-দশমাংশে ফলবৃক্ষ রোপণ করা হয়; ইহা হইল একতলা চাষ। এই-সকল বৃক্ষের নীচে আবার শস্য উৎপাদন করা হয়, ইহাই হইল দ্বিতীয় তলা।

গড়ের উপর ধরিতে গেলে শস্যের ফসলেই চাষের খরচ উঠিয়া যায়, এবং ফলের ফসলটি লাভাংশ রূপে থাকে। এইজন্য সে দেশে বাদাম না জন্মাইলে, কিম্বা ফলের দুর্ব্বৎসর পড়িলেও কোন অভাব হয় না; অধিকন্তু বৃক্ষ-ফসলের সুবৎসর হইলে লাভ পাওয়া যায়। যদি কোন বৎসর শস্যের ফসল কিছু কম হয়, তাহা হইলে ফলের ফসল দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

বৃক্ষের শিকড়গুলি জমির নীচের মাটি পর্য্যন্ত যায় এবং উপরাংশ শূন্যে থাকে। শস্যগুল্মগুলি জমির উপরিভাগের অপেক্ষায়ই থাকে এবং শীতকালে যখন বৃক্ষগুলি পত্রশূন্য হইয়া নিদ্রিত থাকে এবং বৃষ্টি পড়ে সেই সময়ই যত দূর সম্ভব বাড়িয়া লয়। এইরূপে দু'তলা চাষের দুইটি মিলিয়া একতলা চাষের একটি ফসল অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জনের কারণ হয়।

ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা প্রতিবৎসর হাজার হাজার মণ পারস্যদেশীয় উৎকৃষ্ট আখরোট আমেরিকায় প্রেরণ করে, কিন্তু সমস্ত প্রদেশের মধ্যে দশটিও ফলের বাগান নাই।

যদি তাহারা খুব কাছাকাছি করিয়া সারি সারি বৃক্ষ রোপণ করিত, তাহা হইলে তাহার ঘন ছায়ার নীচে আর কিছুরই চাষ করিতে পারিত না। কিন্তু দূরে দূরে ছড়াইয়া রোপণ করি[illegible] যথেষ্ট আলোক আসে, এবং ফলবৃক্ষের সহিত গম প্রভৃতি শ[illegible] চাষও করা যায়।

ইটালীর কৃষকেরা বহুদিন হইতেই দুইতলা চাষ করে। তাহ[illegible] গমের ক্ষেতের মধ্যে সারি সারি তুঁত গাছ রোপণ করে এবং তা[illegible] উপর দ্রাক্ষালতা তুলিয়া দেয়। এইরূপে একই ক্ষেত্র হইতে রুটি, ও তুঁতবৃক্ষ-পালিত রেশমকীট পাওয়া যায়।

মিঃ স্মিথ সকল দেশেই দুইতলা চাষের পরামর্শ দিয়াছে[illegible] আমাদের দেশের কৃষকেরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

শ।

কার্পাসবীজের খাদ্য—

সাধারণত লোকে মনে করে কার্পাসবীজ খাইলে মানুষে[illegible] অনিষ্ট হয়, সেই জন্য কেহ কেহ কয়েক বার এই বীজের ময়[illegible] মানুষের খাদ্য-তালিকা-ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াও অবশে[illegible] ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। টেক্সাস কৃষি-আগারে অনে[illegible] সুসিদ্ধ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, আলু ও শিম বিষাক্ত বলিলে যাহা বুঝায় কার্পাসবীজ বিষাক্ত বলিলেও তাহাই বুঝায়। অর্থ[illegible] এইগুলি প্রভূত পরিমাণে আহার করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। এ[illegible] কৃষি-আগারের সহকারী রসায়নবিৎ মিঃ জে, বি, রাদার, গমের ময়[illegible] কিম্বা অন্য কোন শস্যচূর্ণের সহিত কার্পাসবীজচূর্ণ মিশাইয়া ব্যবহা[illegible] করিতে বলেন; তাঁহার মতে ইহা একটি মূল্যবান খাদ্যসামগ্রী তিনি লিখিয়াছেন, :—

"খাঁটি কার্পাসবীজ-চূর্ণ দিয়া রুটি তৈরী করা ঠিক নয়। অন্য কো[illegible] প্রকার শস্যচূর্ণ না মিশাইয়া লইলে খাদ্য সুস্বাদু হয় না এবং গুরুপা[illegible] হইবার ভয়ও থাকে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে দুইভা[illegible] শস্যচূর্ণ ও এক ভাগ কার্পাশবীজচূর্ণ মিশাইয়া যে রুটি হয় তাহা চারি[illegible] ভাগ শস্য-চূর্ণ ও একভাগ কার্পাসবীজচূর্ণ মিশান রুটির ন্যায় সুস্বা[illegible] হয় না।

কার্পাসবীজচূর্ণ ও ময়দাতে ডিমের তিন গুণ এবং ভেড়া[illegible] মাংসের চারিগুণ 'পাচ্য অন্নসার' থাকে। এই চূর্ণে শ্বেতসার নাই

চর্ব্বির দাহ্য উত্তাপ দিবার শক্তি অন্নসারের প্রায় দ্বিগুণ। কার্পাসবীজের ময়দার উত্তাপ দিবার শক্তি ডিমের দ্বিগুণ এবং মাংসের দে[illegible] গুণ। কার্পাসবীজচূর্ণ যে কেবল মাংসের বদলে ব্যবহৃত হওয়[illegible] উচিত এবং ময়দার পরিবর্ত্তে হওয়া উচিত নয় ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখ[illegible] দরকার।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শুধু কার্পাসবীজ গুরুপাক ও বিস্বাদ, সেই জন্য ইহার সহিত প্রচুর পরিমাণে অন্য শস্যচূর্ণ মিশান আবশ্যক। চারিভাগ গমের সহিত একভাগের অধিক কার্পাসবীজ দেওয়া উচিত নয়। এই ময়দার দুইটি সুবিধা, সস্তাও হয় আবার মাংসেরও কাজ করে। ইহাতে যে 'পাচ্য অন্নসার' পাওয়া যায়, মাংস খাইয়া তাহা পাইতে হইলে ইহার ১৪।১৫ গুণ অধিক মূল্য দিতে হয়।

অনেক লোকেই আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য মাংসের বদলি খুঁজিতে বাধ্য হন। এই অবস্থায় কার্পাসবীজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়; প্রতি বৎসরই ইহার সরবরাহ বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা অনেক খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষা সস্তা, মাংসের অপেক্ষা ত খুবই সস্তা। ইহা যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্য, তাহার তুলনায় ইহা সর্ব্বপ্রকার খাদ্যসামগ্রী অপেক্ষা সস্তা। কিন্তু খাদ্য

দ্রব্যের সহিত প্রচুর পরিমাণে কার্পাসবীজ আহার করিলে তাহা বিষের কার্য্য করে। সম্পূর্ণরূপে মাংসের স্থান অধিকার করিতে হইলে প্রত্যহ প্রায় আড়াই ছটাক কার্পাসবীজচূর্ণ খাওয়া দরকার। প্রত্যহ এই পরিমাণ নিরাপদে ব্যবহার করা যায় কি না ইহা কেবল অভিজ্ঞতা দ্বারাই বোঝা সম্ভব। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে প্রত্যহ এক ছটাকের কিছু কম কার্পাসবীজ দ্বারাই একজনের আবশ্যকীয় অন্নসারের কার্য্য হয়।

কার্পাসবীজের ময়দার রং উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ। ইহাতে কোন প্রকার তীব্র গন্ধের লেশ মাত্র থাকে না, বরং বেশ একটি সুমিষ্ট গন্ধ থাকে। কার্পাসবীজচূর্ণ যদি একেবারে তুষবর্জ্জিত করিয়া খুব মিহি করিয়া পেষা হয়, তাহা হইলে ইহা গমের ময়দার মতই হয়। পুরাতন দুর্গন্ধ নষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রত্যেক লোকেরই এই খাদ্য সহ্য হইবে কি না, দেখাইবার জন্য, সাধারণ খাদ্য সম্বন্ধে ডাক্তার আটওয়াটারের (Atwater) মত উল্লেখযোগ্য—একইখাদ্য বিভিন্ন লোকের শরীরাভ্যন্তরে যাইয়া বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত এবং তাহার ফলও বিভিন্ন প্রকার হয়; সেইজন্য একজনের পক্ষে যাহা উপকারী আর-একজনের পক্ষে তাহা বিষ হইতে পারে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই দুধ সুপাচ্য উপাকারী ও পুষ্টিকর; কিন্তু এমন লোকও আছে, যে দুগ্ধ পান করিলেই পীড়িত হইয়া পড়ে, তাহার পক্ষে ইহা পান না করাই ভাল। কাহারও বা ডিম সহ্য হয় না; কেক প্রস্তুত করিতে যে সামান্য ডিমের আবশ্যক হয়, তাহাতেই তাহার কঠিন পীড়া উপস্থিত হয়; ডিম যে তাহার খাদ্যের অনুপযুক্ত এই পীড়ার দ্বারাই প্রকৃতি দেবী তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। খুব উপকারী খাদ্যও যাহাদের পীড়া উৎপাদন করে এমন লোক খুবই সুলভ। কাহার কোন খাদ্য সহ্য হয় ও কোন খাদ্য সহ্য হয় না, তাহা প্রত্যেক লোক নিজ নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারাই স্থির করিতে বাধ্য।"

শ।

কৃত্রিম-ডিম্ব (British Association—Agricultural Section).

খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মিশরের লোকেরা কৃত্রিম উপায়ে ডিম্ব প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের বহুপূর্ব্বে প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে প্রথম বিকাশ পাইয়াছিল। কতকগুলি বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে প্রস্তুতপ্রণালী সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাহাও এরূপ গোপনভাবে প্রস্তুত হইত যে, সেই পরিবারের কয়েকজন ব্যতীত অপর কেহ জানিতে পারিত না—ইহা দ্বারাই তাহারা জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হইতে নিজেদের উদ্ভাবিত শিল্পকে রক্ষা করিয়া লাভবান হইত। কিন্তু পৃথিবী ইহাতে কিছু দিনের জন্য লাভবান হইত বটে কিন্তু বিশিষ্ট কর্ম্মঠ লোকগুলির মৃত্যুর পরই আয়াসলব্ধ এই শিল্পটি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। ডিম্ব প্রস্তুতের চুল্লী এত বড় হইত যে একসঙ্গে এক সহস্র ডিম্ব প্রস্তুত করা যাইতে পারিত। এই যে হাজার হাজার বর্ষ ধরিয়া তাহারা ডিম্ব প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছে তাহাতে বৈদ্যুতিক চুল্লীও দরকার করে নাই বা তাপমান যন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় নাই। তাহাদের তাপমান যন্ত্র ছিল বিধাতাপ্রদত্ত চক্ষু দুইটি—চক্ষুর নিকট উত্তপ্ত ডিম্ব ধরিয়াই তাহারা বুঝিত ডিম্ব প্রস্তুত হইয়াছে কি না। আমাদের দেশের সকল কাজের সঙ্গে যেমন একটা ধর্ম্মের যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তদ্রূপ মিশরেও এই ডিম্ব-প্রস্তুত-প্রণালীর সহিত ধর্ম্মের একটা যোগসূত্র আছে এবং এইহেতুও তাহারা চায় না যে, বিশ্বের লোক এই গূঢ় প্রস্তুত-করণ-রহস্যটি জানিয়া লয়। চুল্লীগুলি নাকি ডিম্ব প্রস্তুত করিবার পক্ষে অতি সুন্দর ইহাই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মত।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

রঙ্গমঞ্চে স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষা (B. M. J.)—

থিয়েটারের জন্ম কোথায়, সে সম্বন্ধে যাঁহারা একটুকুও অনুসন্ধান রাখেন, তাঁহারা জানেন মধ্য যুগের (Middle Ages) খ্রীষ্টলীলা অভিনয় হইতেই বর্ত্তমান থিয়েটারের উৎপত্তি হইয়াছে। মধ্যযুগে ধর্ম্মযাজক মহাশয়েরা অশিক্ষিত লোকদের খৃষ্টধর্ম্মে আকৃষ্ট করিবার জন্য যিশুখৃষ্টের লীলাগুলি নাটকাকারে গ্রথিত করিয়া সাধারণের সম্মুখে অভিনয় করিতেন। বর্ত্তমান কালের নাটককারেরা আপনাদের মনের ভাব ও বিশ্বাস প্রভৃতি সাধারণকে জ্ঞাত করাইবার উদ্দেশে সে কালের ধর্ম্মযাজকদের মত রঙ্গমঞ্চেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—তবে ইহাঁদের উদ্দেশ্যে ও পাদরী মহাশয়দের উদ্দেশ্যে একস্থানে একটু তফাৎ আছে। মধ্যযুগের পাদরী নাটককারদের উদ্দেশ্য ছিল—শ্রোতাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি; আর এ কালের নাটক-রচয়িতাদের প্রধান উদ্দেশ্য কোন ধর্ম্মমত প্রচার নয়—সমাজে যে-সব কূট প্রশ্ন উঠে তাহারই মীমাংসার চেষ্টা। সম্প্রতি আবার চিকিৎসা-বিষয়েও শ্রোতা ও নাটককার উভয়েরই দৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে সাধারণকে স্বাস্থ্য-পালন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। চেষ্টাটা সব সময় যে সফল হইয়াছে আমাদের তাহা মনে হয় না। ইব্‌সেন্ তাঁহার গোষ্ট নামক নাটকে প্রকৃতির নির্দ্দয় নির্ম্মম নিয়মের খুব নির্ভীক ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; নাটকখানি কিন্তু রঙ্গমঞ্চে আদর পায় নাই। ইয়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চ হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইয়াছে। এ হইল ত্রিশ বৎসরের আগের কথা। তারপর আমাদের সময়ে (M. Brieux) ব্রিয়র রচিত লেজ্ আভারিয়্ (Les Avaries) নামক ভীষণ নাটকখানিকেও ইবসেনের গোষ্টের দশাই প্রাপ্ত হইতে দেখিয়াছি। সম্প্রতি আবার তাহার পুনরভিনয়ের চেষ্টা হইতেছে। কতকগুলি জঘন্য রোগের নিদান ফল ও প্রতিকার নির্ণয়ের জন্য একটা Royal Commission বসিয়াছে। কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্যই নাটকখানির পুনরভিনয়ের উদ্যোগ। Damaged Goods নাম দিয়া John Pollock ইহার একটি সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। Little Theatreএর রঙ্গমঞ্চে Authors' Producing Sociey কর্ত্তৃক ঐ নাটকখানি অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয়ের উদ্যোগকর্ত্তাদের অভিপ্রায় যে সাধু, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু অভিনয়ের বিষয়টি যে খুব সমীচীন ও সঙ্গত হইয়াছিল, সে বিষয়ে খুবই সন্দেহ রহিয়াছে। মানুষ মিথ্যা লজ্জা ও অজ্ঞানতা-বশতঃ শারীরিক দুঃখ পায়, এ কথাটা বুঝাইবার জন্য Damaged Goodsএর মত নাটকের অভিনয় আমাদের কাছে খুব সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। Damaged goods শ্রোতাকে কল্পনার সাহায্যে কিছু বুঝিয়া লইবার অবসর দেয় নাই। ইহাতে সবই খোলাখুলি ব্যাপার। গোষ্ট নাটকে ইবসেন কিন্তু এ নীতি অবলম্বন করেন নাই। তিনি দর্শক ও শ্রোতাদের কল্পনার উপরই অধিক নির্ভর করিয়াছেন। Damaged Goodsএর কবির যে-সব স্থলে মৌন থাকা উচিত ছিল তিনি তাহা [illegible]

বাক্ সংযমের অভাবে কবির ভালো উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হইয়াছে কি না সে বিষয়ে খুবই সন্দেহ রহিয়াছে। কবির অকপট সরলতাকে কিন্তু আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করি। ইবসেন বর্ণিত Chamberlain Alvingএর একমাত্র পুত্রের বিষাদ-কাহিনী পাঠে আমাদের হৃদয় যতটা বেদনা-কাতর হয়, Damaged Goodsএর Georges Dahontএর বিবাহ এবং তাহার বিষময় ফলের ব্যাপার পাঠ করিয়াও আমাদের হৃদয় কম দ্রবীভূত হয় না।

চীনেম্যানও ডাক্তারদের ঠাট্টা করিতে ছাড়ে না—

(B. M. J.)

পৃথিবীর সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে চিকিৎসকদের উদ্দেশে নানা প্রকার বিদ্রূপ ও শ্লেষ বাক্য প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে চীনেম্যানও বাদ যান না। চীনেম্যান্ বলে ডাক্তারের ঔষধ খাইয়া যে-সব লোক ভবসমুদ্রের ওপারে গিয়াছে, তাহাদের প্রেতাত্মা আসিয়া ডাক্তারের দরজায় হানা দিয়া বসিয়া থাকে। ডাক্তারকে চটাইবার জন্য চীনেম্যান নিম্নের গল্পটা প্রায়ই করিয়া থাকে। একবার একটা যোদ্ধার শরীরে একটা তীর প্রবেশ করে। বেচারা একটি অস্ত্র-চিকিৎসক (সার্জ্জন) ডাক্তারের শরণ লয়। তীরের যে অংশটা বাহিরে দেখা যাইতেছিল, সার্জ্জনটি সেইটুকু কাটিয়া ফেলিয়া দর্শনী চায়। রোগী বলে "তীরের যে অংশটুকু ভিতরে আছে, তাহার কি হইবে?" ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলে "ওর জন্য physician ফিজিসিয়ানের কাছে যাও, ওর চিকিৎসা তাঁহারই কাজ—সার্জ্জনের (অস্ত্রচিকিৎসকের) নয়। শরীরের বাহিরের চিকিৎসাতেই সার্জ্জনের অধিকার।" আর একটি ডাক্তারের বিষয়ে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। এ ডাক্তারটি বিজ্ঞাপন দিতেন, কুঁজ চিকিৎসায় তিনি বিশেষ-পারদর্শী। ধনুকের মত বাঁকা কুঁজও তিনি অবলীলাক্রমে সোজা করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার কথায় প্রলুব্ধ হইয়া একবার একটা কুঁজো তার নিকট চিকিৎসা করিতে যায়। ডাক্তার একজোড়া তক্তা আনিয়া, একখানা মাটিতে পাতিল এবং রোগীকে তাহার উপর শোয়াইল। অপর তক্তাখানা তাহার উপর রাখিয়া দড়ি দিয়া কষিতে লাগিল। যন্ত্রণায় রোগী ত্রাহি ত্রাহি ডাক হাঁকিতে লাগিল; ডাক্তারের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। কুঁজ তো সোজা হইল কিন্তু তার আগেই রোগীর প্রাণপাখীটিও উড়িয়া গিয়াছিল। রোগীর আত্মীয় স্বজনরা ইহার জন্য অনুযোগ করিতে থাকায় ডাক্তার স্থির অবিচলিত ভাবে উত্তর করিল—"আমাকে অন্যায় তিরস্কার করছ কেন? কুঁজ সোজা করাতেই আমি পারদর্শী, রোগী বাঁচুক কি মরুক সে দেখা তো আমার কাজ নয়।" মোটের উপর বলিতে গেলে ডাক্তারের operationটি (অস্ত্রোপচার) যে successful (সফল) হয়েছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। রোগী মরিয়াছিল সে কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু সেটা তো একটা accident (দৈব ঘটনা) বইতো নয়? অমন accident সকল দেশেই খুব সুযোগ্য ডাক্তারের হাতে কতবার হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল-এম-এস।

পুস্তক-পরিচয়

রোসেনা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু প্রণীত। প্রকাশক—গ্রন্থকার নিজেই। ৭৭ গড়পার রোড কলিকাতা ১৩২১। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৫৪ পৃষ্ঠা চটি বই। মূল্য আট আনা। বইটির অনুবাদের স্বত্ব গ্রন্থকার কড়া রকমে বজায় রাখিয়াছেন ও তাঁহার সহি ছাড়া কোনো বই আসল নয় বলিয়াছেন। এখানি নাটক। গ্রন্থকারের ধারণা বই অমূল্য ও অতুল্য। এক হিসাবে তাহা ঠিক। পড়িলে কেহ হাসি সম্বরণ করিতে পারিবে না।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

মায়ার শৃঙ্খল—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত এবং ৬ ধর্ম্মতলা লেন, শিবপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৯৯ পৃঃ। মূল্য আট আনা।

স্নেহলতার মৃত্যুর পর বাংলা দেশে দিন কতক হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। সভা সমিতির অন্ত ছিল না—শিক্ষিত যুবকদল প্রতিজ্ঞা করিতেছিলেন বিনাপণে বিবাহ করিবেন। কিন্তু এ দেশের সকল আন্দোলনের যেমন করিয়া অবসান হয়, পণপ্রথা উচ্ছেদ করিবার আন্দোলনও সেইরূপেই নিভিয়া গেল—কোলাহল হইল যথেষ্ট, কাজ কিছুই হইল না,—স্নেহলতার মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন, এখনো তেমনি পুত্রের পিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পুত্রের সাফল্যের মূল্যস্বরূপ বৈবাহিকের নিকট হইতে কত টাকা ঘরে আনিবেন তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছেন, এবং পিতৃভক্ত শিক্ষিত পুত্র শ্বশুরের ভিটা মাটি উচ্ছন্ন দিয়া তাহার কন্যাকে শ্রীচরণের দাসী করিয়া বিপুল আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন।

সমালোচ্য উপন্যাসখানি উপরোক্ত আন্দোলনের ফল। দরিদ্রের কন্যা মায়ার জন্য যুবক মহিমারঞ্জন বিনাপণে পাত্র স্থির করিয়া দিতে কন্যার মাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিল। সে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু বিনাপণে সুরূপা মায়াকেও কেহই গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। অগত্যা সত্যনিষ্ঠ মহিম পত্নী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও দরিদ্রার জাতি রক্ষা করিবার জন্য বাধ্য হইয়া মায়াকে বিবাহ করিল। বিবাহের পর মায়া স্বামীগৃহে পদার্পণ করিবামাত্র মহিমের প্রথমা পত্নী প্রিয়বালা অভিমানভরে পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। মায়াও স্বামীর কাছে ধরা দিল না— সে কেবলি ভাবিত যে তাহার আগমনে মহিম ও প্রিয়বালার মধ্যে এই বিচ্ছেদ ঘটিল। ওদিকে প্রিয়বালা পিতৃগৃহে গিয়া পূজার্চ্চনার মধ্যে মনকে ডুবাইয়া দিয়া স্বামীকে ভুলিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রসবান্তে সূতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মায়া যখন মরিতে বসিয়াছে তখন সংবাদ পাইয়া প্রিয়বালা আসিয়া উপস্থিত হইল। দুঃখিনী মায়া প্রিয়বালার হাতে স্বামী ও পুত্রকে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিল।

এই কাহিনী লইয়াই উপন্যাসখানি রচিত। আজকালকার অধিকাংশ উপন্যাসে আয়তন, ছাপা ও মলাটের বাহার ছাড়া অন্য কোনো বিশেষত্ব নাই, "মায়ার শৃঙ্খল" বাহ্যচাকচিক্যবর্জ্জিত একখানি ছোট উপন্যাস, কিন্তু সুলিখিত। প্রাঞ্জল মার্জ্জিত ভাষায় রচিত এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি। গ্রন্থকার হৃদয় দিয়া বইখানি লিখিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার বক্তব্যগুলি পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে গ্রন্থকারের শক্তির পরিচয় পুস্তকের অনেক স্থলেই পাওয়া যায় এবং তাঁহার উদার স্বাধীন মতগুলি গ্রন্থমধ্যে সুপরিস্ফুট।

এইবার দু একটি সামান্য ত্রুটির উল্লেখ করি। পুস্তকান্তর্গত কোনো চরিত্র ফুটিয়া ওঠে নাই, সেজন্য আশা করি নবীন লেখক নিরুৎসাহ হইবেন না। তিনি সাধনা করিলে যে উপন্যাস রচনায় সফলকাম হইবেন সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

"কাহিনীটা শুনিয়া," "কথাটা শুনিতে শুনিতে," "সুখটী হইতেও বঞ্চিত"—এইরূপ যেখানে সেখানে "টা"র ব্যবহার আমাদের ভাল লাগিল না, ইহাতে ভাষার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। গদ্য রচনায় "প্রবেশ করিয়া" লেখা উচিত, 'প্রবেশিয়া' কবিতায় ব্যবহৃত হইতে পারে, গদ্যে চলে না। বইখানির প্রায় প্রতি-পৃষ্ঠাতেই ছাপার ভুল দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইয়া যাইবে। সু।

মালা—শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ৭৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা, এখানি কবিতা-পুস্তক; অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি।

সদ্ভাবকুসুম—শ্রীগঙ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, প্রকাশক এস সি, আঢ্য কোম্পানি। ১০০ পৃষ্ঠা। মূল্য অনুল্লিখিত। উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক। ইহাতে ৪টি সন্দর্ভ আছে—লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, চিন্তা, ধ্রুব, ভীষ্ম। ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলের, অত্যন্ত সংস্কৃতবহুলশব্দপূর্ণ।

পরিণয়—শ্রীললিতকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। কে, ভি, সেন ব্রাদার্সের ছাপা। সচিত্র কবিতা-পুস্তক। বিবাহ-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি কবিতা আছে; পণপ্রথার বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক কবিতা ও চিত্রগুলি এই পুস্তকের উপাদেয়তা সম্পাদন করিয়াছে।

মানব-চরিত্র—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রকাশক এস, কে, ব্যানার্জি এণ্ড সন্স্, ৫৫ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ, বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক। ১৩৫ পৃষ্ঠা। এই পুস্তকে ছয় অধ্যায়ে ২৭টি বিবিধ বিষয়ের সন্দর্ভ আছে। পুস্তকখানি সেণ্ট্রাল টেক্স্ট বুক কমিটি কর্ত্তৃক বিদ্যালয়পাঠ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন-পাঠ্য রূপে অনুমোদিত ও নির্ব্বাচিত হইয়াছে। সন্দর্ভগুলি নীতিবিষয়ক, চরিত্র গঠনের ও চারিত্রোৎকর্ষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল হইলেও উৎকট দুর্বোধ্য নহে।

সমাজ-সঙ্গীত—শ্রীহরকালী সেন প্রণীত। ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। গ্রন্থকার এই সঙ্গীত রচনার উদ্দেশ্য এইরূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন—

"আমি কবিও নই, সুলেখকও নই, সঙ্গীত-শাস্ত্রেও অনভিজ্ঞ। আমার মত লোকের দ্বারা সঙ্গীত রচনা বিড়ম্বনা মাত্র। যে-সকল সামাজিক নিয়ম দ্বারা নারীগণ ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকগণ নিষ্পেষিত ও ঈশ্বর-দত্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, যে-সকল সামাজিক কুপ্রথা দ্বারা সমাজের পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে, যে-সকল দূষিত দেশাচার দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের মহা দুর্গতি হইতেছে, সেই-সকল কুপ্রথার ও দেশাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা ব্রাহ্মসমাজের একটি প্রধান কার্য্য। সঙ্গীত দ্বারা এই কার্য্যের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। অথচ সেইপ্রকার সঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীতে স্থান পায় নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্যই আমি এই "সমাজ সঙ্গীত" রচনা করিলাম। আমার উদ্দেশ্য যে আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি এইরূপ সঙ্গীত রচনা করিয়া সামাজিক কুপ্রথা-সকল দূর করিতে চেষ্টা করেন।"

নিমীলন—শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত। চট্টগ্রাম ইম্পিরিয়ল প্রেসে মুদ্রিত, মূল্যের উল্লেখ নাই। পত্নীবিয়োগে ব্যথিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস পয়ারছন্দে ৫০ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত হইয়াছে।

উদ্ধার-চন্দ্রিকা—শ্রীকাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। কুমারটুলী বর্ত্মস্থ ৩ সংখ্যক ভবনাৎ কবিরাজ শ্রীকালীভূষণ সেন কবিরত্নেন প্রকাশিতা। ডিমাই ১২ অং ৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। "ম্লেচ্ছদেশ" হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শাস্ত্র ও সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা হয়—গ্রন্থকার তাহারই পাঁতি দিয়াছেন। তিনি হিন্দুসমাজের হিতৈষী সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হই যে এত শিক্ষার পরও এখনো প্রশ্ন উঠিতে পারে সমুদ্রযাত্রা করা উচিত কি না; স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যতীত অন্য কারণে, কোন্‌টা খাদ্য কোন্‌টা অখাদ্য; কে স্পৃশ্য কে অস্পৃশ্য; কোন্‌টা শুদ্ধ দেশ কোন্‌টা ম্লেচ্ছদেশ। আমরা বুঝি ধরণীর একাংশে জন্মিয়াছি, তাহার সকল দেশ ও সকল লোককে দেখিয়া লইব; সমুদ্র সহস্র বাহু তুলিয়া অহরহ ডাকিতেছে, সুযোগ পাইলেই তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িব; যাহা স্বাস্থ্যতত্ত্ব রুচি ও ধর্ম্মবুদ্ধির অনুমোদিত তাহাই আমার খাদ্য; জন্মাধিকারেই মানুষ শুচি বা অশুচি, স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য হয় না—চরিত্র, ব্যবহার, রীতিনীতি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা মলিনতা তাহাকে স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য করে। আমরা যতই লোককে ম্লেচ্ছ বলিয়া নাক সিঁটকাইতেছি ততই আমরা জগতের সকল জাতির নিকট হইতে পদে পদে অপমান ও লাঞ্ছনা পাইতেছি—আমরা সমগ্র জাতিটা সমস্ত জগতের কাছে অপাংক্তেয় অস্পৃশ্য হইয়া আছি। আমাদের নিজের দেশেও আমরা অন্ত্যজ, সর্ব্ব বিষয়ে অনধিকারী; ট্রাম ও রেলগাড়ীতে শ্রেষ্ঠ বর্ণের লোকেদের সহিত এক কামরায় বসিতে পর্য্যন্ত অনধিকারী। তবু কি আমাদের স্পর্দ্ধা করা সাজে যে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, অপর সকলে ম্লেচ্ছ। আমরা কি নিজের চিন্তা বুদ্ধি বিদ্যা শিক্ষা কোনো কাজেই লাগাইব না? আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাপ্রণালী কি নিজের জোরে উচ্চ কণ্ঠে বলিবে না স্বাধীন চিন্তা ও অবাধ বুদ্ধি এই কার্য্য অনুমোদন করিতেছে, অতএব ইহা আমরা অবশ্যই করিব? চিন্তা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রেও আপনার সমাজেও আমরা যদি এমনি পরাধীন থাকি তবে আর আমাদের কোনো দিকে কখনো উন্নতি লাভের কিছুমাত্র আশা থাকিবে না। যাহাই হোক গ্রন্থকার যে বিনা-পাপে "প্রায়শ্চিত্ত" করিয়াও "ম্লেচ্ছদেশ"-প্রত্যাগত লোকদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিবার পাঁতি দিয়াছেন ইহার জন্য আমরা তাঁহাকে সাধুবাদ করিতেছি।

কমলার গান—শ্রীরসিকলাল দত্ত প্রণীত। প্রকাশক বসু বিশ্বাস কোম্পানি, ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা। ছেলেদের খেলার ছলে পড়ার সচিত্র বই। বহিখানিতে "স্বভাবের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শিক্ষা প্রভৃতি, উপেক্ষিত অথচ জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়-সকল এবং সমাজের ও দেশের কথা" কমলার জীবনের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

"গ্রন্থকার তাহাকে স্বভাব-গ্রাহী মন এবং স্থির লক্ষ্য ও উপায়দর্শী উপদেষ্টা দিয়াছেন। তাহার মন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যোপভোগে মগ্ন। পুস্তকার্জ্জিত বিদ্যা হইতেও সে বঞ্চিত নহে। কর্ম্মবীরের আলৌকিক পটুত্ব এবং অসাধারণ ক্ষমতাও তাহার অপরিচিত নহে। দৃষ্টান্ত শিক্ষা দানের প্রধান উপায়। ইংরেজ নাবিকের দৃষ্টান্তে সে পরাধীনতার ক্লেশ বুঝিতে পারিল। কারামুক্ত পারাবত কমলাকে ছাড়িয়া উড়িয়া যায় না কেন?—এ বড় বিষম সমস্যা। চীন দেশীয় বন্দীর

দৃষ্টান্তে এ সমস্যা দূর করিল। শিক্ষার অন্যতম উপায় আদর্শ। নিজ সমাজের কুপ্রথাসমূহ কিরূপে উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা শিখাইতে 'জাপ রমণী'গণের আদর্শ সংস্থাপিত হইল—তাহাদের শিল্প, বিজ্ঞান, উদ্যমশীলতা, রীতি, নীতি এবং কার্য্যকলাপ 'কমলার গানে' কথঞ্চিৎ বর্ণিত আছে।"

বইখানি গদ্যে পদ্যে রচিত। সাধারণত শিশুপাঠ্য পুস্তকে যেরূপ রচনা দেখা যায় তাহা অপেক্ষা ইহার রচনা অনেক সরস। পদ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে ছন্দপতন আছে।

অরণ্যবাস—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস প্রণীত। প্রকাশক সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৪২৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ১৷০ মাত্র। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"জীবনসংগ্রামে জয়লাভের একটি ধারাবাহিক বৃত্তান্তকে যদি উপন্যাস বলা যায়, তাহা হইলে, "অরণ্যবাস" উপন্যাসের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু পাঠকবর্গকে প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, তাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাস পাঠে যেরূপ রসাস্বাদ করিয়া থাকেন, এই গ্রন্থপাঠে তাঁহাদের সেরূপ রসাস্বাদ করিবার আশা বা সম্ভাবনা অল্প। পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে অন্নক্লেশ-পীড়িত একজন শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনসংগ্রামের আড়ম্বরশূন্য বৃত্তান্ত পাঠ করিতে যদি কাহারও কৌতূহল হয়, তাহা হইলে, তাঁহাকে আমি এই উপন্যাসটি পাঠ করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। এই উপন্যাসোল্লিখিত ব্যক্তিগণ প্রধানতঃ কাল্পনিক হইলেও উপন্যাসের বিষয়টি কাল্পনিক বা অবাস্তব নহে। ছোটনাগপুরের বহুস্থান স্বচক্ষে দেখিয়া এবং খনিজ- ও উদ্ভিজ্জ-সম্পদে সেই স্থান-সমূহের লোকপালিকা শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত, আমি এই উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হই।"

এই উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব প্রবাসীর পাঠকপাঠিকাদের নিকট ইহার দোষ গুণের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

হরপার্ব্বতী—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২৫৫ পৃষ্ঠা, উত্তম এন্টিক কাগজে রঙিন কালিতে পাইকা হরপে পরিষ্কার ছাপা; রেশমে বাঁধা মলাটের উপর সোনার জলে নাম লেখা; সচিত্র; মূল্য দেড় টাকা। এই পুস্তকে হিমালয়ে পার্ব্বতীর জন্ম হইতে তপস্যান্তে ভগ্নধ্যান প্রসন্ন মহাদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ-ব্যাপার পর্য্যন্ত পৌরাণিক কাহিনী সালঙ্কারে বর্ণিত হইয়াছে। অল্প-শিক্ষিতা স্ত্রীদিগের পাঠ্য বা বিবাহের উপহার হইতে পারে; তবে ভাষা কিছু দুরূহ, সংস্কৃতঘেঁষা এবং দুই চারিটি বর্ণাশুদ্ধিও আছে।

ভাষা ও সুর—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত, ১ নং তাঁতিবাগান রোড কলিকাতা। ১৬৪ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকার নিজেই নিজের বইয়ের পরিচয় দিয়াছেন এইরূপে—

"ভাষা ও সুর" একখানি গীতিকাব্য—কতিপয় খণ্ড-কবিতার সমষ্টিমাত্র। কবিতাগুলির মধ্যে একটা আন্তরিকতা—একটা আবেগ ও একটা প্রবাহ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস—তবে হৃদয় যখন কাঁদিয়া উঠে, প্রাণ যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তাহা প্রকাশ করিবার সময় আমরা ভাষার দিকে তত্টা লক্ষ্য রাখিতে পারি না—আমাদের বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়, এবং সেই হিসাবে এই কাব্যের দুই একটি কবিতার স্থানে স্থানে একটু আধটু—ভাষার, ছন্দের ও মিলের দোষ পরিদৃষ্ট হইবে। আর পাঠক ও সমালোচকগণ অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন—

"Faults are like straws that float on the surface."

অপিচ, এই পুস্তকে,—যাহা অপরিহার্য্য, যাহা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ দু'একটি মুদ্রাঙ্কনপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে।"

এবং গ্রন্থকার সমালোচকের উদ্দেশ্যে একটি মহাজন-বচন উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকার পৃষ্ঠে সংযোজন করিয়াছেন—

"Poetry, dearly as I have loved it, has always been to me but a divine plaything. I have never attached any great value to poetical fame; and I trouble myself very little whether people praise my verses or love them."

অর্থাৎ "কবিতা আমার প্রিয়, কবিতা আমার স্বর্গীয় খেলনা, কিন্তু কবিখ্যাতিকে আমি বিশেষ মূল্যবান মনে করি না; এ লোকে আমার কবিতা ভালো বলুক বা ভালো বাসুক কিংবা না ভালো বলুক বা ভালো বাসুক তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না।"

তথাপি গ্রন্থকার সমালোচনা করিবার জন্য আমাদের বই বে পাঠাইয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থকার যখন নিজেই নিজে সমালোচনা সারিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি যখন নিন্দা প্রশংসার অতীত তখন আমরা নীরবই থাকিলাম।

দেবীপূজায় জীববলি—শ্রীমহীন্দ্রনারায়ণ কবিরত্ন সঙ্কলিত। কাওয়াকোলা, গৌর-গদাধর সমিতি হইতে শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মুদ্রণ-সাহায্য চার আনা এই পুস্তিকায় দেবতার নামে জীবহত্যা করা যে অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বহু আলোচনা করিয়াছিলেন এবং ভারতের বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই-সমস্ত লেখাও এই পুস্তিকার পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে আশা করি সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই সহজ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেবতার দোহাই দিয়া পশুহনন করিতে বিরত হইবেন।

বাঙ্গালা-পদপরিচয়—শ্রীনগেন্দ্রকুমার চন্দ প্রণীত। প্রকাশক সিটি লাইব্রেরী ঢাকা; মূল্য চার আনা। বিদ্যালয়পাঠ্য ব্যাকরণপুস্তক; কিন্তু ইহা ছোট ছেলেমেয়েদের হৃদয়গ্রাহী করিয়া সরস ভাবে লেখা। এই পুস্তকে বাংলা ভাষার বহু বিশেষত্ব আলোচিত হওয়াতে পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে; এবং এইজন্য ইহা শুধু ছাত্রদের নহে, বয়স্ক ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে আলোচিত হওয়াতে পুস্তকখানি সকলের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য হইয়াছে।

রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়—শ্রীহরিচরণ বসু সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, বর্দ্ধমান। মূল্যের উল্লেখ নাই। উগ্রক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি, আচার, ব্যবহার, সংস্কার, কুলপ্রথা ও সামাজিক মর্য্যাদা নানা শাস্ত্র এবং প্রাদেশিক সাহিত্য ও ইতিহাস হইতে এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বৈদিক অগ্নিকুল রাজপুত সুগ্রব শীরাই মুসলমান বিজেতাদের সৈনিকরূপে বঙ্গে আসিয়া বর্দ্ধমান জেলায় উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তাঁহারাই উগ্রক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হন; তৎপরে আকবরের রাজত্বকালে রাজা মানসিংহের ক্ষত্রিয়

সৈন্যও বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তার সাহায্যের জন্য সেই অংশে বাস করিতে থাকে ; এই দুই উপনিবেশী ক্ষত্রিয়ের মিলনোৎপন্ন বংশই বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণের মতে "উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং (বৈশ্যায়াং) ক্ষত্রাৎ বভূবতুঃ।" সুতরাং ইঁহারা ক্ষত্রিয়ই। এই গ্রন্থখানি বিশেষ এক-জাতির বিবরণ হইলেও জাতিতত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট সুখ-পাঠ্য বলিয়া বোধ হইবে। এই গ্রন্থের ভূমিকাটি ইংরেজিতে কেন লেখা হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না।

জাতিভেদ-রহস্য—প্রথম খণ্ড। প্রকাশক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়। মূল্য এক টাকা। এই পুস্তকখানির অপর নাম "নাপিত-কুল-দর্পণ" প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় জানাইয়া দ্যায়। ইহাতে নাপিতের উৎপত্তিরহস্য ; ব্যাসদেব ও চন্দ্রগুপ্তের সহিত নাপিতের সম্বন্ধ ; নাপিত সম্বন্ধে বল্লালসেনের মত ; চৈতন্যদেব ও মধুনাপিত ; নাপিতের সাঙ্কর্য্যখণ্ডন ; নাপিতের বর্ত্তমান অবস্থা, বিবিধ নাম ও তাহার ব্যাখ্যা, সংখ্যা ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় পাঁচ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ জাতিবিশেষের উৎকর্ষ-প্রতিপাদক হইলেও জাতিতত্ত্বের অনেক তথ্য ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

মর্ম্মগাথা—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ৮৮ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীউপেন্দ্রলাল বাগচি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা। কবিতা-পুস্তক। অনেকগুলি খণ্ড কবিতা আছে। গ্রন্থশেষের উপহাসার্থ নকল (Parody) কবিতাগুলি অনেক সভায় গীত হইয়াছে,—নস্যের গান, আমার চাকরি প্রভৃতি অনেকের পরিচিত। এগুলি নেহাৎ মন্দ নহে। গ্রন্থকারের হাত এখনো কাচা ; কবিতার উপযুক্ত ভাষা আয়ত্ত হয় নাই ; কোমল শব্দ চয়নের ক্ষমতা পরিস্ফুট হয় নাই ; ছন্দের উপর দখল পাকা হয় নাই ; তথাপি এই অপরিণত রচনার মধ্যে চিন্তাশক্তির ও কবিত্বের আভাস পাওয়া যায়। মুদ্রারাক্ষস।

স্বাভাবিক যোগ—শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস প্রণীত। ২১০।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট নব্যভারত প্রেসে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃঃ ২+২+১৮২। মূল্য ১৲।

গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন :—"আমি শৈশবে পিতৃহীন। আমার এমন কোন সংস্থান ছিল না যে তদ্দ্বারা পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোকে একটু দাঁড়াইতে পারি। প্রৌঢ়কালেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-বিভাগ-নিবন্ধন শিক্ষা-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়নের কোন সুযোগ ছিল না। সুতরাং গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় "গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, গঙ্গার বন্দনা" পর্য্যন্ত আমার সাহিত্যসম্বল। সর্ব্বদা ভাবিতে লাগিলাম প্রাচ্য প্রতীচ্য, উভয় শিক্ষার সজ্ঘর্ষণে জ্ঞানের উন্নতিকল্পে কি করিলাম—বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িল! মস্তিষ্কের স্নায়ু-সকল দুর্ব্বল, শরীর জরা-জড়িত, শোক দুঃখ রোগ-যন্ত্রণায় সর্ব্বদাই আক্রান্ত। এমন অবস্থায় হঠাৎ একদিন কয়েকটি কথা মনে পড়িল।

জগতে উন্নতি অবনতি অনন্তকালই আছে। দিবা, রাত্রি, দুঃখ, সুখ, স্বাস্থ্য, জরা চক্রবৎ ঘুরিতেছে। অন্ধকার আলো ইহাও চিরকাল রহিয়াছে। পঙ্ক ভেদ করিয়াই পঙ্কজের উৎপত্তি হয়। মাতৃগর্ভস্থিত শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রও মা-শব্দে কাঁদিয়া উঠে—কাহার শক্তিতে? উহাই যে চিৎশক্তি বা স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিস্ফুরণ! হৃদয়-মধ্যে এইরূপ নানা কথার আন্দোলন হইতে লাগিল এবং শুভাশুভ চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে ঐ সময় আমাকে এমন একটি চিন্তা আসিয়া উন্মত্ত করিল যে আমি যেদিকেই দেখি, সেইদিকেই যেন শ্মশান! আমাকে আমার বলে এমন ব্যক্তি কেহ নাই। হৃদয় নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেই তিমির-তরঙ্গ-মধ্যে আশ্রয়-শূন্যতা কি ভয়ঙ্কর!

বহু চিন্তার পর বুঝিলাম, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আপনার বলিতে আর কেহ নাই। এই শুভ চিন্তার সহিত বিকৃতচিন্তা ভীষণ সংগ্রামে পরাস্ত হইলে, সহসা আশার আশ্বাস পাইলাম। আর বাহ্য শিক্ষার প্রতি যত্ন ও ততটা আকাঙ্ক্ষা রহিল না। বস্তুতঃ লোক-চক্ষুর অতীত পূর্ণচৈতন্যময়ের অনন্ত সত্তায় ডুবিতে পারিলে বুঝিতে পারা যায় যে যতই ভগবানে নির্ভর স্থায়ী হইবে, মলিন হৃদয়ও ব্রহ্ম-মন্দিরে পরিণত হইয়া ততই আলোকিত হইতে থাকিবে। এবং অন্তরাকাশপটে অনন্ত অক্ষরে নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ পাঠ করিতে শক্তি জন্মিবে। ভাবিতে লাগিলাম—কিছুকাল পর, নির্ম্মলা চিন্তার আনুগত্যে মন পিঞ্জরমুক্ত পাখীর ন্যায় অনন্ত আকাশে ছুটিল ; প্রীতি-সম্ভাষণে বলিল স্বাভাবিক জ্ঞান বড় মিষ্ট, মধুর হইতেও মধুর। তাই স্বাভাবিক যোগ লিখিতে প্রবৃত্ত হই।"

ব্রহ্মদাস মহাশয় নিজ চেষ্টায় যাহা লাভ করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় প্রাণী ও প্রাণ ; সাধন ; সাধনে প্রাণ ও প্রেম ; জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি ; সংযম-চিন্তা ; ত্যাগ বা সন্ন্যাস ; আত্মার স্বরূপতত্ত্ব ; ধ্যান ; সমাধি ; ব্রহ্ম-সূত্র। পরিশিষ্টে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ ইত্যাদি বিষয়ে নিজমন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবেকবাণী—শ্রীরাধারমণ সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। পৃঃ ৭৭, মূল্য ৵০। স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি উক্তি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তিকা মুদ্রিত করা হইয়াছে।

সন্তান—শ্রীরামকানাই দত্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশিবেন্দ্র-লাল দত্ত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা। পৃঃ ১২৬ ; মূল্য ৷৷০ আনা।

ঋষভদেব, বুদ্ধদেব এবং খ্রীষ্ট—এই তিনজন সন্তানের জীবন, মত ও বিশ্বাস এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

ম্যাডাম গেঁয়ো—শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ প্রণীত। মূল্য কাপড়ের মলাট একটাকা, কাগজের মলাট বারো আনা।

বাংলা ভাষায় খৃষ্টান কোন সাধু বা সাধ্বীর বিস্তৃত জীবনচরিত এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। সেণ্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি, ব্রাদার লরেন্স, সেণ্ট টেরেসা, প্রভৃতি পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় সাধু ও সাধ্বীদিগের সুলিখিত জীবনী যদি বাংলা ভাষায় বাহির হইত, তাহা হইলে একটা মস্ত উপকার হইত এই যে আমাদের দেশের সাধকদিগের অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতাকে অন্য দেশের সাধকদিগের অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করিয়া মিলাইয়া দেখিবার একটা সুযোগ আমরা লাভ করিতাম। সাহিত্যই বলি, শিল্পই বলি, দর্শনই বলি—সংকীর্ণ স্থান ও কালের মধ্যে তাহাদিগকে দেখিলে তাহাদের ঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা শক্ত হয়। নানা স্থান ও নানা কালের ভাণ্ডারের মধ্যে তাহাদিগকে ফেলিয়া দেখিলে তবেই বুঝা যায় যে তাহাদের মূল্য কতটুকু এবং স্থায়িত্ব কি পরিমাণ।

রামমোহন রায়ের পর হইতে আমাদের দেশে ধর্ম্মতত্ত্বের তুলনা-মূলক আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মজীবনের সেরূপ আলোচনা আজও পর্য্যাপ্ত হয় নাই। অথচ ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাকে পূরণ করিবার জন্য ধর্ম্মসাধনার আলোচনাই দরকার। খৃষ্টধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ঐক্যই বা কোথায়, আর পার্থক্যই বা কোথায়, তাহা কখনই সম্যক্ বুঝা যাইবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন

সাধক ও হিন্দুসাধকের জীবন ও সাধনার অভিজ্ঞতাকে পাশাপাশি রাখিয়া মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা না করিব। তেমন করিয়া মিলাইয়া দেখিতে গেলেই একটি কথা আমাদের মনে সুস্পষ্ট জাগ্রত হইবে যে ধর্ম্মতত্ত্বের অমিলের জন্য ধর্ম্ম-অভিজ্ঞতার অনৈক্য সব সময়ে হয় না। "Where the philosopher guesses and argues, the mystic lives and looks" যেখানে তাত্ত্বিক (সত্য সম্বন্ধে) কেবল অনুমান ও প্রমাণ লইয়া ব্যস্ত, সেখানে সাধক (সত্যকে) প্রত্যক্ষ দেখেন এবং (সত্যের মধ্যে) বাস করেন। "Hence whilst the Absolute of the metaphysicians remains a diagram—impersonal and unattainable—the Absolute of the mystics is lovable, attainable, and alive," সুতরাং তাত্ত্বিকের 'অদ্বৈততত্ত্ব' একটা নক্সার মত—তাহা অব্যক্ত ও অলভ্য—কিন্তু সাধকের 'অদ্বৈত' তত্ত্বমাত্র নহে—তাহা সম্ভজনীয় প্রাপণীয় ও জীবন্ত। "নৈষা মতিঃ তর্কেণ প্রাপণীয়া"—এ অধ্যাত্ম-মতি তর্কের দ্বারা প্রাপণীয় নহে। ঈশ্বরের বিমল প্রসাদ যে-সকল ভক্তদের জীবনে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারাই তাঁহার প্রমাণ—কারণ তাহারাই তাঁহার দীপ্যমান প্রকাশ।

শ্রীমতী নির্ঝরিণী, ম্যাডাম গেঁয়োর জীবনচরিতখানি বঙ্গীয় পাঠকসমাজের নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন। বইটি সুলিখিত এবং ইংরাজীর অনুবাদ নহে বলিয়া সুপাঠ্য হইয়াছে। পড়িতে কোথাও বাধে না—ভাষার বেশ একটি সহজ প্রবাহ আছে। Thomas Upham প্রণীত ম্যাডাম গেঁয়োর জীবনচরিত গ্রন্থরচয়িত্রীর অবলম্বন। ম্যাডাম গেঁয়োর (Autobiography) আত্মকাহিনী ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে; সেই গ্রন্থখানি অবলম্বন করিলে লেখিকা এই সাধ্বী নারীর জীবনচরিত্র আরও সুন্দর করিয়া অঙ্কিত করিতে পারিতেন।

ম্যাডাম গেঁয়ো ১৬৪৮—১৭১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। মধ্যযুগের অনেক পরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বগামিনী সেণ্ট ক্যাথেরিন অব্ জেনোয়ার সঙ্গে ম্যাডাম গেঁয়োর জীবনের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত সেণ্ট ক্যাথেরিনের প্রভাব ম্যাডাম গেঁয়োর জীবনে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কাজ করিয়াছে, ম্যাডাম গেঁয়োর চরিত-লেখকেরা এ বিষয়ে সকলেই একমত। সেণ্ট ক্যাথেরিনের মননশক্তির সঙ্গে ম্যাডাম গেঁয়োর মননশক্তির তুলনাই হয় না। ম্যাডাম গেঁয়োর প্রকৃতির মধ্যে একটা অদৃঢ় ও দুর্ব্বল ভাবুকতা ছিল বলিয়া তাঁহাকে বরাবর অত্যন্ত অন্তর্মুখীন করিয়া রাখিয়াছিল। Contemplative mystic অর্থাৎ মননশীল অধ্যাত্ম-সাধকদিগের মধ্যে সেইজন্য তাঁহার কোন স্থান হয় নাই;—যেমন পাসক্যাল, যেমন জেকব্ বইমে, যেমন স্ত্রীসাধিকাদিগের মধ্যে সেণ্ট ক্যাথেরিন। তাঁহাকে এইজন্য অনেকে 'Quietist' অর্থাৎ অন্তর্মুখীন শান্তিনিষ্ঠ সাধনশীলা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। গ্রন্থলেখিকা ভূমিকায় যে তাঁহাকে মীরাবাঈয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু জীবনচরিতের মধ্যে যদি এই তুলনাটিকে ব্যঞ্জনার মত জীবনচিত্রের পটান্তরালে তিনি রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জীবনচরিত পাঠের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে ও সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে অধ্যাত্ম-সাধনার নিবিড় ঐক্য রূপটির পরিচয়লাভ ঘটিত।

কিন্তু ইহাকে গ্রন্থের দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। এ বজ করিতে গেলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসে যে-পরিমাণ প্রবেশ থাকা চাই তাহা সকলের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। অথচ এ রকমের গ্রন্থ হাতে করিলেই এই কথাই অনিবার্য্যরূপে মনে জাগে—এই সাধনার সঙ্গে আমাদের দেশে কোন্ সাধনার মিল আছে? বাহিক তত্ত্ব-ব্যাপারে মিল নাই—কি ভিতরের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে, উপলব্ধির ব্যাপারেও কি কে মিল নাই?

আমাদের প্রাচ্য দেশের সাধকদিগের জীবনের মূল সুরটি যদি এক কথায় ব্যক্ত করিতে হয় তবে বলা যাইতে পারে—'অনন্তে রসবোধ'। উপনিষদ বলিয়াছেন, যে, মনের সঙ্গে বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু আনন্দে তাঁহাকে জানা যায়। সমস্ত প্রকাশ তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। ভূর্ভুবস্বর্লোকে অনন্তের সেই আনন্দময় জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশকে সহজে দেখিতে পাওয়া যেমন উপনিষদের ঋষিদের সাধনা ছিল, পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবভক্তদিগের তেমনি মানুষের মধ্যে সেই অনন্তকে দেখিবার ও মানুষের স্নেহপ্রেমে সেই অনন্তের রসসম্ভোগ করিবার সাধনা ছিল। অবশ্য কোথাও কোথাও ইহার বিকার লক্ষ্য করা যায়—সান্তের মধ্যে অনন্তকে ভাবনা করিতে গিয়া কোন কোন ভক্ত অনন্তকে মূর্ত্তিতে ও বিগ্রহে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সকল বিকারের দ্বারা সত্যের বিচার হয় না। একথা সত্য যে বৈষ্ণব তত্ত্বে এবং বৈষ্ণব সাধনায় "এই মানুষে আছে সত্য, নিত্য, চিদানন্দময়" এই কথাটিই ফুটিয়াছে।

খৃষ্টান ধর্ম্মের সাধনায় এই অনন্তের রসবোধটি কোথায় এবং কি ভাবে প্রকাশ পাইতেছে ইহাই আমাদের প্রশ্ন হয়। কি খ্রীষ্টান ধর্ম্মে খৃষ্টমানুষটিকে ভগবানের স্থান দেওয়ায়, এই অনন্তের র একেবারেই নষ্ট হয়। সেইজন্য আমাদের হিন্দুমন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া আসে। মনে হয় যেন খ্রীষ্টানধর্ম্মে ঈশ্বরতত্ত্ব একেবারে মনুষ্যভাবপূর্ণ (anthropomorphic)। কিন্তু খ্রীষ্টান-সাধকের জীবনের মধ্য দিয়া যখন খৃষ্টানধর্ম্মকে বিচার করি, তখন দেখি যে অনন্তের ক্ষুধা সেখানেও ঠিক এমনি করিয়াই দেখা দিয়াছে খৃষ্ট তো ভক্তের কাছে জেরুজালেমের খৃষ্ট হন; তিনি সেই আমাদের অন্তরের অন্তরতম মানুষটি বাউলেরা যাঁকে 'মনের মানুষ' বলিয়াছেন তাঁর সঙ্গে আমাদের নিত্যযোগ। আমাদের পাপে তিনি নিত্য ক্রুশে বিদ্ধ হইতেছেন; তিনি নিত্য পীড়িত, নিত্য প্রত্যাখ্যাত নিত্য লাঞ্ছিত। আমাদের পুণ্যে ও আত্মত্যাগে তিনি আনন্দিত তাঁর প্রেম চরিতার্থ। "When we see Him we shall be like Him for we shall see Him as He is. And everyone that hath this hope purifieth himself even as He is pure." এই খৃষ্টধর্ম্মের সার কথা। দান্তের সমস্ত "ডিভাইনিয় কমেডিয়া" কাব্যের এই তো মূল কথা। এই অনন্ত পবিত্রতার তত্ত্ব এবং তার চেয়েও বড় তত্ত্ব অনন্ত প্রেমের তত্ত্বখৃষ্টানধর্ম্মের সারতত্ত্ব খৃষ্টান সকল ভক্তসাধককে এইজন্য একবার আত্মশুদ্ধির সাধনমার্গের ভিতর দিয়া যাইতে হয়—কঠিন দুঃখ স্বীকার ও কৃচ্ছ্র তপস্যার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই অবস্থাকে তাঁহারা বলেন Purgative stage ইহার পরে তাঁহাদের মনের মধ্যে যখন ভগবানের বিমল প্রসাদ অবতীর্ণ হয়, সে অবস্থাকে তাঁহারা বলেন Illuminative stage কিন্তু ইহার সঙ্গে আমাদের দেশীয় অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার পার্থক্য এইখানে যে, শুচিতার চেয়ে প্রেমের আদর্শ আনন্দের আদর্শকে আমরা সম্পূর্ণতর বলি। প্রেমের আদর্শ হইতে বিচ্যুত কেবলমাত্র শুচিতার আদর্শ মানুষকে অত্যন্ত নিরানন্দ ও অসুস্থ (morbid) করিয়া তোলে। ম্যাডাম গেঁয়ো, সেণ্ট টেরেসা প্রভৃতির জীবনে এই অবস্থার চিত্র বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পিউরিট্যান্ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শুচিতার সাধনা এক সময়ে অতিমাত্রায়

অগ্রসর হইয়া কি যে নীরসতায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহা ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন।

কিন্তু এই দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়া সতীত্বের শুচিতাকে সপ্রমাণ করিবার ইতিহাসই ম্যাডাম গেঁয়োর সমস্ত জীবনের ইতিহাস। পারিবারিক জীবনে তিনি অসুখী ছিলেন—তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁহার প্রণয়সম্বন্ধ গভীর ছিল না, শ্বাশুড়ীর অসহ্য নিগ্রহ তাঁহাকে বহন করিতে হইয়াছিল। সামাজিক জীবনে তাঁহার দুঃখ সামান্য ছিল না—ধর্ম্মের জন্য কত নিগ্রহ, কত অত্যাচার তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল—প্রবল রাজশক্তিও তাঁহাকে দলিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সেই-সকল দুঃখের অভিঘাতে তাঁহার ভগবদ্ভক্তি উদ্বেলিত হইয়াই উঠিয়াছে; তিতিক্ষা ও ক্ষমা সকল অত্যাচারের প্রজ্বলিত বহ্নিকে শীতল করিয়া দিয়াছে। নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতা যে কোন্ পথে অমৃত-চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে ম্যাডাম গেঁয়োর জীবনের এই দিক্‌টি তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে। আশা করি আমাদের দেশের ধর্ম্মশীলা নারীগণের নিকটে এই গ্রন্থ বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক মাসে প্রশ্ন মুদ্রিত করিব; প্রবাসীর সকল পাঠকপাঠিকাই অনুগ্রহ করিয়া সেই প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। যে মত বা উত্তরটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক ব্যক্তি পাঠাইবেন আমরা তাহাই প্রকাশ করিব; সে উত্তরের সহিত সম্পাদকের মতামতের কোনো সম্পর্কই থাকিবে না। কোনো উত্তর সম্বন্ধে অন্তত দুইটি মত এক না হইলে তাহা প্রকাশ করা যাইবে না। বিশেষজ্ঞের মত বা উত্তর পাইলে তাহা সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইবে। ইহাদ্বারা পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে চিন্তা উদ্বোধিত এবং জিজ্ঞাসা বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আশা করি। যে মাসে প্রশ্ন প্রকাশিত হইবে সেই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌঁছা আবশ্যক, তাহার পর যে-সকল উত্তর আসিবে, তাহা বিবেচিত হইবে না।

—প্রবাসীর সম্পাদক।]

এবারে আমরা গতবার অপেক্ষা অনেক অধিক-সংখ্যক লোকের অভিমত পাইয়াছি; তথাপি প্রবাসীর পাঠকপাঠিকার সংখ্যার তুলনায় ইহাও যৎসামান্য; আমরা আশা করি ক্রমশ অধিকসংখ্যক লোকে আমাদের প্রকাশিত প্রশ্নের উত্তর পাঠাইবেন। এবারে ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত যাঁহাদের অভিমত পাইয়াছিলাম তাঁহাদের অধিকাংশের মতে যাহা নির্ণীত হইয়াছে তাহার ফল নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বঙ্গের প্রতিনিধি

ইহার জন্য ৮৪ জন বিভিন্ন লোকের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অধিকাংশ ভোটদাতাদের মতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

১। রাজা রামমোহন রায়।
২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩। { ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। / শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু। }
৫। বিবেকানন্দ স্বামী।
৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৭। কেশবচন্দ্র সেন।
৮। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।
৯। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০। রমেশচন্দ্র দত্ত।
১১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১২। { শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। / শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল। }

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখিকা

এই প্রশ্নের উত্তরে ৮ জন বিভিন্ন লেখিকার নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও সমান ভোট পাইয়াছেন—

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী
ও
শ্রীমতী কামিনী রায়।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পদশক

৬০টি বিভিন্ন গল্পের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অধিকাংশ লোকের মতে নির্ব্বাচিত হইয়াছে—

১। কাবুলিওয়ালা।
২। ক্ষুধিত পাষাণ।
৩। { মেঘ ও রৌদ্র। / রাসমণির ছেলে। }
৫। শেষের রাত্রি।
৬। { জয়পরাজয়। / কঙ্কাল। }
৮। পোষ্টমাষ্টার।
৯। ছুটি।
১০। একরাত্রি।

নূতন প্রশ্ন

১। বিভিন্ন ভাষার এমন ১০০ একশত খানি বইএর নাম করুন যাহা বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হওয়া উচিত।

—প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

২। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে কোন্ নায়িকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

—প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়।

স্বরলিপি

। [সা সা । সা সা সা । সা সা । সা সা সা । সা সা । সা সা পা ।
শু ধু তো মা র বা ণী ন য় গো হে ব ন্ ০ ধু

। ন্া -সর্া । রা রা -া । জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা ।
হে ০ ০ পি য় ০ মা ঝে মা ঝে ০ প্রা ণে তো মা র

। মা পা । র্সণা ধা পা । মপা মা । -জ্ঞা -া -া ।।
প র শ্ ০ খা নি দি ও ০ ০ ০

[। না না । না না র্সা । র্সা র্সা । র্সা না র্রর্সা । পা না । না না সা ।
সা রা প থে র ক্লা ন্ তি আ মার সা রা দি নে র

। না র্না । -া -া -া । র্সা র্রা । ণা ধা ণা । ধা র্সণা । ধা পা -া ।
তৃ ষা ০ ০ ০ কে ম ন্ ক রে মে টা ব যে ০

। মা পা । ণা -ধা পা । মপা মা । -জ্ঞা -া -া । সা র্সা । র্রা র্রা র্রা ।
খুঁ জে না ০ পাই দি শা ০ ০ ০ এ আঁ ধা র যে

। র্মর্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্মা র্রা র্সা । র্সা না । র্রা র্সা র্রা । নর্সা -র্রর্সা । -নসা ণা -া ।
পূ র্ ণ তো মার সে ই ক থা ব লি ০ ০ ও ০

। ধা ণা । ধা ণা -া । ধা পা । পা পা ধা । মা পা । র্সণা ধা পা ।
মা ঝে মা ঝে ০ প্রা ণে তো মা র প র শ খা নি

। মপা মা । -জ্ঞা -া -া [[
দি ও ০ ০ ০

।। সা সা । রা রা জ্ঞা । রজ্ঞা মজ্ঞা । জ্ঞা রা সা । ন্া সা । সা রা ধা ।
হৃ দয় আ মা র চা০ য়০ যে দি তে কে ব ল্ নি তে

। পা পা । -া -া -া । পা পা । পা পা -া । পা পা । পা পা পমা ।
ন য় ০ ০ ০ ব য়ে ব য়ে ০ বে ড়া য় সে তার

। পধা -ণর্সা । ণধা পা -া । মপা ধপা । মা জ্ঞা -া ।।
যা০ ০০ কি০ ছু ০ স০ ন্০ চ য় ০

[I না না। না না নর্সা। র্সা র্সা। র্সা র্সনা র্র্সা। পা না। না না র্সা।
হা ত খা নি ঐ॰ বা ড়ি য়ে আ॰ নো দা ও গো আ মার

। র্সনা র্র্সা। -া -া -া। র্সা না। র্রা র্সা র্রা। ধা র্সা। পা ধা পা।
হা॰ তে ॰ ॰ ॰ ধ র্ ব তা রে ভ র্ ব তা রে

। মপা ধণা। ণা ধা পা। মপা -া। জ্ঞা -া -া। জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা।
রা॰ খ্॰ ব তা রে সা॰ ॰ থে ॰ ॰ এ ক্ লা প থের

। জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। মা মা। পা না র্সা। নর্সা র্রসা। -র্সা ণা -া।
চ লা আ মা র ক র্ ব র ম ণী॰ ॰॰ ॰ য় ॰

। ধা ণা। ধা ণা -া। ধা পা। পা পা ধা। মা পা। সণা ধা পা।
মা ঝে মা ঝে ॰ প্রা ণে তো মা র প র শ খা নি

। মপা মজ্ঞা। -া -া -া II II
দি ও ॰ ॰ ॰

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, পৌষ)　　　　শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

সা II {সা ঋা পা গা। গগা ঋা ঋা সন্া। সা ঋা া গঋা। সা া
শো হা ॰ ল পো হা ॰ লো বি ভা ॰ ॰ ব রী ॰

া া }। সা সা দা দা। পা পা দা পা। মা পা মদা পা
॰ ॰ পূ র্ ব তো র ণে শু নি বাঁ ॰ ॰ শ

মা গা পা গা I
রী ॰ "পো ॰"

II দা া দা দা। না র্সা র্সা র্সা। ঋা া ঋা র্সা। র্সনা না র্সা র্সা।
না ॰ চে ত র ঙ্ গ ত রী ॰ অ তি চ ন্ চ ল

দা দা দা দা। না না র্সা। ন ঋা ঋা র্সা। নর্সা পা।
ক ম্ পি ত অ ং শু ক কে ॰ ত ন অ — — —

পা দা র্সা র্সা। না র্সা র্ঋা র্সা। ঋা র্সা না দা। নদা া পা পা।
প ল্ ল বে প ল্ ল বে পা ০ গ ল জা ০ গ ল

পা দা না দা। পা া দা পা। মা পা মপদা পা। মা গা পা গা। ||
লা ০ ল স আ ০ ল স পা ০ ০ শ রি ০ "পো ০"

||সা ঋা গা মা। মা মা মা পা। গমা গা মা পা। ণদা দা দা পা।
উ দ য় অ চ ল ত ল সা ০ জি ল ন ন্ দ ন

পদা দা দা দা। না না র্সা র্সা। না র্ঋা র্সা র্ঋর্সা। নর্সা না দপ।
গ গ নে গ গ নে ব নে জা ০ গি ল ন ন্ দ ন

পা দা না দা। পা পা দা পা। মা পা দা পা। মপা গা গা গা।
ক ন ক কি র ণ ঘ ন শো ০ ভ ন স্য ন্ দ ন

মা ণা দা দা। পা া দপা মা। গা ঋা সা ঋা। গা মা া া||
না ০ মি ছে শা ০ র দ সু ন্ ০ দ রী ০ ০ ০

||দা দা দা পা। ণদা দা দা পা। মা ণদা দা দা। না র্সা র্সা র্সা।
দ শ দি ক অ ঙ্ গ নে দি গ ঙ্ গ না ০ দ ল

দা দা দা দা। না না র্সা র্সা। না র্ঋ র্সা র্ঋর্সা। নর্সা না দা পা।
ধ্ব নি ল শূ ০ ন্য ভ রি শ ঙ্ খ সু ম ঙ্ গ ল

পা দা দা র্ঋা। র্সা র্সা র্ঋা র্সা। না র্সা র্সা না। দা দা পা পা।
চ ল রে ০ চ ল চ ল ত রু ণ যা ০ ত্রী দ ল

পা দা না দা। পা া দা পা। মা পা মপদা দপা। মা গা পা গা।
তু লি ন ব মা ০ ল তী ম ০ ন্ জ রী ০ পো ০

সা ঋা পা গা। ঋগা ঋা ঋা সন্‌া। সা ঋা া গঋা। সা া া া||
হা ০ ল পো হা ০ ল বি ভা ০ ০ ব রী ০ ০ ০

(প্রবাসীর জন্য লিখিত)

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশের কথা

দেশের কথার আলোচনায় যাহা আমাদের প্রধান অবলম্বন, দেশের সেই সংবাদপত্রসমূহ আজকাল যুদ্ধবিগ্রহের 'প্রেস-বুরো' নিয়াই ব্যতিব্যস্ত। কাজেই দেশের অঙ্গের যেস্থলে যুদ্ধের আঘাত প্রত্যক্ষভাবে লাগিতেছে, প্রসঙ্গতঃ সেইস্থলেরই 'বুলেটিন'টি ঘোষণা করিয়া দেশের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতে অনেক পত্রিকাই প্রয়াসী। তৎসূত্রে দেশের অন্যান্য যে দুইএকটি বার্ত্তা ধ্বনিত হইয়া উঠে, তাহা বিজ্ঞাপন-বহুল সাপ্তাহিকের ক্রোড়পত্রের প্রয়োজনবর্দ্ধিত একআধটি চুরি বা জখমের সংবাদেরই ন্যায় নিতান্ত অসার। ফলে, দেশের কথা 'থোড় বড়ি খাড়া' বা 'খাড় বড়ি থোড়'র আলোচনায়ই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বাবধি বলিয়া আসিতেছি যে, সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকগণ যদি স্থানীয় কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, স্বাস্থ্য, আমদানী, রপ্তানি, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজহিতকর কার্য্য প্রভৃতির আলোচনায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে একদিকে যেমন তদ্দ্বারা জাতীয় ইতিহাসের প্রকৃষ্ট উপাদান প্রস্তুত হইতে পারে, অন্যদিকে তাহা দেশের মর্ম্মকথা-স্বরূপ বিশ্বের কথার সুরে সম্মিলিত হইয়া সার্থকতা-লাভে সমর্থ হয়। পত্রিকা-প্রকাশের প্রকৃত দায়িত্ব বুঝিয়া যে-সকল পত্রিকা এবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও যত্নের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন তাঁহারা যথার্থই দেশ-হিতৈষণার অগ্রদূতরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, এরূপ পত্রিকার সংখ্যা নিতান্তই অল্প এবং এই অল্পসংখ্যক পত্রিকায়ও দেশের প্রয়োজনানুরূপ সংবাদের পরিমাণ তেমন বেশি দেখা যায় না। তবু ইহাদিগকেই সঙ্গে করিয়া আমাদের আলোচনাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন।

ইতিপূর্ব্বে অনাবৃষ্টির জন্য দেশব্যাপী একটা হাহাকার উঠায় সংপ্রতি পর্জ্জন্যদেব তর্জ্জনীদ্বারা দুই এক ফোঁটা শান্তিজল দেশের অঙ্গে ছিটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে শান্তি তো হয়ই নাই, বরং অনেকস্থলে উল্টা ফলেরই আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। বৃদ্ধ 'কাশীপুরনিবাসী' বলিতেছেন—

"গত ৪ঠা পৌষ হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ৬ই পর্য্যন্ত বর্ষা চলিয়াছে ; ইহাতে ক্ষেত্রের ও গৃহস্থের বাড়ির কাটা পালা-দেওয়া ধানগুলির ক্ষতি করিয়াছে।"

'পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী'তে প্রকাশ—

"গত ২২শে তারিখ রবিবার রাত্রিতে ৩।৪ ফোঁটা বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার হয় নাই।"

কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম-অঞ্চলে ইন্দ্রদেব একটু মুক্তহস্ত হইয়া সর্ব্বনাশের পন্থা আরো বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। কুমিল্লার 'ত্রিপুরা-হিতৈষী' বলিতেছেন—

"অনেক দিনের পর গত শনিবার রাত্রি হইতে পর্জ্জন্যদেব অবিরল ধারায় বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন। এইপ্রকার অবিরত বারিপাত-নিবন্ধন ধান্য-ফসলের ও খড়-বিচালির অত্যধিক ক্ষতি হইয়াছে। অনেক গৃহস্থের কাটা ধান্য বাড়ী আনিয়া ও অনেকের মাঠে থাকিয়া প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সরিসা প্রভৃতি নানারূপ রবিশস্যও অতিবৃষ্টিপাত-দরুণ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ'তে প্রকাশ—

"সমস্ত দিন মুষলধারে বর্ষণ হইয়াছে। কৃষকের বার আনা কর্ত্তিত শস্য বাড়ীতে স্তূপাকারে ভিজিয়াছে, আর চারি আনা পাকা ধান মাঠে ভাসিতেছে। গরু ছাগলের জন্য ঘাস মিলিবে না। * * * পাউণ্ডী কৃষিরও কতেক অনিষ্ট হইয়া গেল।"

সাধারণতঃ ডাকের বচনেও শোনা যায়—

'যদি বর্ষে পৌষে।
কড়ি হয় তুষে॥'

বস্তুত, 'তুষে' 'কড়ি' হইবার সূচনা ইতিমধ্যেই স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে। মৈমনসিংহের 'চারুমিহির' সংবাদ দিয়াছেন—

"লবণ ব্যতীত প্রায় জিনিসের মূল্য টাকা-প্রতি এক আনা হইতে দুই আনা পরিমাণে বাড়িয়াছে।"

'হিন্দুরঞ্জিকা' রাজসাহীর কথা বলিতেছেন—

'খাদ্য-দ্রব্য ক্রমেই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল।'

টাঙ্গাইলের 'ইসলাম-রবি' স্থানীয় বাজারদর-প্রসঙ্গে বলেন—

"চাল, ডাল, তেল, লবণ, মরিচ, চিনী, মিশ্রী, ময়দা, দেশলাই প্রভৃতি সমস্ত জিনিষেরই মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।"

'জ্যোতিঃ' চট্টগ্রামের অবস্থা জানাইতেছেন—

"চট্টগ্রামে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

'মানভূমে' প্রকাশ—

"দেশী বিদেশী প্রায় সমগ্র জিনিষেরই দাম চড়িয়াছে।"

কাঁথির 'নীহার' সংবাদ দিতেছেন—

"পুরাতন মোটা চাউল টাকায় ৮ সের। নূতন চাউল টাকায়

নয় সের। নূতন ধান্যের মণ ইতিমধ্যেই আড়াই টাকা হইয়াছে। ডাল কলাই, চিনি, ময়দা ও তৈলাদি নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষগুলি অত্যন্ত চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে। * * তরীতরকারীরও দাম চড়িয়াছে। দুগ্ধ-ঘৃত একরূপ পাওয়াই যায় না।"

বর্ত্তমানেই অবস্থা এইরূপ, অপরস্থা কিং ভবিষ্যতি! তবে ভবিষ্যতের প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে আশার একটি ক্ষীণ আলোরেখা এই যে, পাটের দর একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে। মালদহের 'গৌড়দূত' বলেন—

"বর্ত্তমান সপ্তাহের প্রথমে পাটের গাঁটের দর ৩১৲ টাকা ছিল, গত মঙ্গলবার ৩৩৷৷৹ টাকা হইয়াছে। পাটের মূল্য ক্রমে বাড়িতেছে। গত মঙ্গলবার বেপারিগণ ৩৭৫০০ মণ ও মিলওয়ালারা ৯৫০০ মণ পাট ৩৲ টাকা হইতে ৭৷৷৵৹ আনা দরে কিনিয়াছে।"

'রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ' রঙ্গপুর অঞ্চলেও এবিষয়ে সুবিধার আভাস পাইয়া বলিতেছেন—

"পাটের বাজার কিছু চড়িয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। এখন প্রতিমণ ৪৲ টাকা হইতে ৪৷৹ সওয়া চার টাকা দরে বিক্রীত হইতেছে।"

ইহার উপর বাঁকুড়া-অঞ্চলে কোন কোন শস্যের অবস্থাও কিঞ্চিৎ ভাল বলিয়া শুনা যাইতেছে। 'বাঁকুড়া-দর্পণে' প্রকাশ—

"গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বাঁকুড়া জেলায় ১৬ হাজার একার ভূমিতে তিসি, সর্ষপ এবং গুজ্ঞ ইত্যাদি বিবিধ তৈলশস্য বপন করা হয়। আগামী বসন্ত ঋতুতে সেই-সকল শস্য গৃহজাত হইবে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, সেগুলির অবস্থা ভাল।"

"১৯১৩—১৪ সালে বাঁকুড়া জেলার ৩৭০০ একার ভূমিতে গোধূম চাষ করা হয়। বর্ত্তমান বর্ষে ৪১০০ একার ভূমিতে গোধূমের চাষ হইয়াছে। * * * শস্যের অবস্থা ভাল।"

কিন্তু এ তো অকূলসাগরে ক্ষুদ্র ভেলার সাহায্য মাত্র!

স্বাস্থ্যসম্পর্কেও দেশের অবস্থা কিছুমাত্র উন্নতিলাভ করে নাই। গতমাসে আমরা দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার সংবাদ দিয়াছিলাম; বর্ত্তমানে তাহার উপর আরো দুই-একটি উপগ্রহ আসিয়া জুটিয়াছে। এবৎসর কলিকাতায় বসন্তের প্রাদুর্ভাবের কথা সর্ব্বজনবিদিত; মফঃস্বলেও শীতলাঠাকরুণের কৃপাকার্পণ্য নাই। 'নীহার' সংবাদ দিয়াছেন—

"মফঃস্বলের অনেক স্থলে বসন্ত-রোগ ক্রমেই সংক্রামিত হইতেছে। অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে।"

'বাঁকুড়া-দর্পণে' প্রকাশ—

"ওন্দা থানার অধীন মাকড়কোলে; রাইপুর থানার অধীন ছাতারগড়ে ও ভাওলি গ্রামে বসন্ত দেখা দিয়াছে। ইন্দাস থানার অধীন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইতেও এই পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে।"

বাঁকুড়ায় ইহার উপর আবার বিসূচিকাও দে দিয়াছে। ঐ পত্রিকায়ই প্রকাশ—

"বাঁকুড়া থানার অধীন ছাতারকানালী; সোনামুখী থানার অ মাজিরডাঙ্গ; এবং বড়যোড়া থানার বেলেতোড় গ্রামে লোক বিসূচিকা হইতেছে।"

পুরুলিয়া স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু 'পুরুলিয়া-দর্পণ' স্থানীয় স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে তাহার বিপরীত ব বলিতেছেন। ঐ পত্রিকায় উক্ত—

"পুরুলিয়া সহরের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতে শীতের প্রারম্ভেই স্থানীয় সহরে আমাসা ও উদরাময় রোগ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে শিশুদিগের প্রতি এই দুই রোগ দৃষ্টি কিছু বেশী। পূর্ব্বে এই সহর বাঙ্গালার মধ্যে স্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিগণিত হইত এবং দেশ-বিদেশ হইতে লোকে অ হাওয়া পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত এখানে আগমন করিতেন। কিন্তু এ সহরটির আর সে খ্যাতি নাই।"

কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে কলেরার সংবাদ পাও যাইতেছে। 'নোয়াখালী-সম্মিলনী' বলেন—

"সহরের চতুর্দ্দিকে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।"

'ত্রিপুরা-হিতৈষীতে' প্রকাশ—

"কুমিল্লা সহরে কলেরা দেখা দিয়াছে।"

যশোহর ম্যালেরিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে স্থানে জনসংখ্যাহ্রাসের কারণ একমাত্র ম্যালেরিয়াই নহে, উহা পার্শ্বচর আরও দুইএকটি ব্যাধিও ইহার হেতু। 'যশোহ জানাইতেছেন—

"সহরে মৃত্যু-সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে,—জ্বর, নিমোন রক্তামাসা প্রভৃতি রোগেই অধিক লোক মরিয়াছে, ও মরিতেছে।"

এই দুর্দ্দিনে দেশবাসীর অসংখ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ও একটি কর্ত্তব্য পালনেও যদি প্রত্যেকে সচেষ্ট হন, তা হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারের সম্ভাব হইতে পারে। রোগে-দারিদ্রে দেশ উৎসন্ন হইতে চলি য়াছে, আর দেশবাসী আমরা যুদ্ধের টেলিগ্রাম লই মাতামাতি করিতেছি। কিন্তু এই যুদ্ধে কাহাদের ক্ষতিতে যে আমাদের বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত, তা আমরা নিজেরা বুঝি বা না বুঝি, বোলপুরপ্রবাসী বিদে পিয়ার্সন সাহেব চিন্তা করিয়া তাহা স্পষ্ট বলি দিয়াছেন—

"যুদ্ধে যাহাদিগকে বিপন্ন করিয়াছে, এরূপ লোক ফ্রান্স কিম্ব বেল্‌জিয়াম্ অপেক্ষা আমাদের ঘরের নিকটতর স্থানেই রহিয়াছে।"

আজ আমরা এরূপ বিপন্ন কেন? কারণ, আমরা দেশসংস্কারে উদাসীন, পল্লীগ্রামের প্রতি বীতরাগ

ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিশ্চেষ্ট, কৃষি ও কৃষিজীবীর প্রতি হতশ্রদ্ধ। পল্লীসমস্যার আলোচনা-প্রসঙ্গে 'স্বরাজ' সত্যই বলিয়াছেন—

"এককালে দেশের অবস্থাপন্ন- ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ই যেমন পল্লী-সমূহের প্রধান রক্ষক ছিলেন, আজ তাঁহারাই তাহাদের ধ্বংসের প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। 'সহর-রোগে'-আক্রান্ত প্রত্যেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই পল্লীর বাস্তভিটা ত্যাগ করিতেছেন। অবস্থাপন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় এইরূপে পল্লীর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে কে আর তাহাকে রক্ষা করিবে? প্রত্যেক গ্রামেই ২১টি অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বসতি আছে। পূর্ব্বে ইঁহারাই পুষ্করিণীখনন রাস্তাঘাটনির্ম্মাণ করাইয়া পল্লীর শোভা সম্পাদন করিতেন। পূর্ব্বে ইঁহারাই পল্লীর মা-বাপ ছিলেন। আজ তাঁহারা সহরে আশ্রয় লওয়ায় পরিত্যক্ত পল্লীসমূহ বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় নীত হইতেছে।

আমরা যখনই যে-কোন পল্লীর অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখনই দেখিতে পাই, শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ভদ্র সম্প্রদায় কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে থাকিলেও গ্রামবাসীর সহিত তাঁহাদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আত্মীয়স্বজন বাটীতেই থাকিত, বার মাসে তের পার্ব্বণ বাটীতে নিয়মিতই সম্পন্ন হইত, পূজা বা বৃহৎ ব্যাপার উপলক্ষে তাঁহারা কর্ম্মস্থল হইতে বৎসর বৎসরই বাটীতে আসিতেন। বিদেশ হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাঁহারা গ্রামে আসিয়া ব্যয় করিতেন, কত নিরন্নকে অন্ন দিতেন, কত গরীব-দুঃখীকে বস্ত্র দিতেন, কতপ্রকারে কত লোকের উপকার করিতেন। গ্রামের রাস্তাঘাট প্রস্তুত করাইতেন, আবশ্যকমত তাহাদের সংস্কার করাইতেন, পুকুর-পুষ্করিণী খনন করাইতেন, গ্রামের দশজনে মিলিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেন, মহাসমারোহে পৈতৃক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু আজ তাহার ঠিক বিপরীত। যিনি অদৃষ্টক্রমে দু-পয়সার মুখ দেখিলেন অমনি পল্লী ত্যাগ করিলেন; যাঁহাদের বিষয়সম্পত্তি আছে তাঁহারা ইষ্টকস্তূপের উপর আমলাদের জন্য একখানি কুঁড়েঘর রাখিয়া সহরে সহরে হাওয়া খাইতে লাগিলেন;—ঘরের অর্থ বিলাসব্যসনে ব্যয় করিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে লাগিলেন।"

কিন্তু এইরূপে পল্লীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াও যদি ধনীসম্প্রদায় ব্যাবসায়-বাণিজ্যের প্রতি একটু মনোযোগী হইতেন! 'মোসলেম-হিতৈষী' মিথ্যা বলেন নাই—

"ভারত দরিদ্রাবস্থায় উপস্থিত হইলেও কোম্পানীর কাগজে, ব্যাঙ্কের খাতায় ভারতবাসীর কম টাকা দেওয়া নাই। যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহারা সুদ হিসাব করিয়া জড়পদার্থের ন্যায় আরাম-সুখে দিন কাটাইতেছেন। ভারতে জর্ম্মনী ও অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশের অর্থ ব্যবসারে নিয়োজিত হইয়া যদি তাহাদের লাভ হইতে পারে, তবে ভারতবাসী কেন সে দিকে যাইতেছে না? আজকাল যাঁহাদের অর্থ নাই, তাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের যক্ষেরা সমস্ত আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছেন, সুতরাং যাঁহারা কার্য্যে অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইতেছে না।"

কৃষিজাত শস্যাদি আমাদের জীবনরক্ষার প্রধান সম্বল হইলেও, কৃষিকার্য্যের প্রতি যে দেশের শিক্ষিত- বা ধনী-সম্প্রদায় তত শ্রদ্ধাবান নহেন, কৃষিজীবীর প্রতি তাঁহাদের ব্যবহারই তাহার পরিচায়ক। শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা কৃষককুলকে উন্নত করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে মর্য্যাদা ও সম্মানের দাবী উত্থাপন করিতে দিতেও আমরা রাজী নহি। 'পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী' এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—

"কৃষকের কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করাই স্বাভাবিক, এবং সেই বিদ্যা শুধু কতকগুলি সংস্কার সম্ভূত হইলে চলে না। যে বিদ্যাই শিক্ষা-সাপেক্ষ, তাহা কিঞ্চিৎ লেখা-পড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত না হইলে অনেক সময় সংস্কার-জনিত জ্ঞানলাভে সুফল না হইয়া কুফলই ঘটিয়া থাকে। এইজন্য কৃষককুলের কৃষিজ্ঞান-লাভার্থ কিছু কিছু লেখা-পড়ার চর্চ্চা নিতান্ত আবশ্যক। ডাক্তারী, ওকলাতী হাকিমি প্রভৃতি নানা ব্যবসা করার জন্য লেখা-পড়ার দরকার নাই, ইহা শিক্ষাভিমানী নিশ্চয়ই অস্বীকার করিবেন! পাশ্চাত্য দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই শিক্ষিত লোক পাওয়া যায়; শুধু পাওয়া যায় না আমাদের দেশের কৃষককুলের মধ্যে।

এক সময় এদেশে নববর্ষের প্রথমদিন হিন্দুরাজগণ হল-চালনা করিয়া কৃষকগণকে উৎসাহিত ও সম্মানিত করিতেন। সেই দিন মাঠে ১০১ খানা হল নামাইতে হইত, সকলের আগে রাজা একখানা সোনার হল চালনা করিতেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতবৃন্দ কৃষক-কুলকে বড় সম্মানের চক্ষে দেখেন না। তাঁহারা একজন পরিষ্কার-বেশধারী লোককে বসিতে একখানা চেয়ার দিবেন, আর যাহার আপদমস্তক-ঘর্ম্মনিঃসৃত পরিশ্রমলব্ধ চাউল খাইয়া শিক্ষিত বাবু এত বড় হইয়াছেন সেই কৃষক-বেচারাকে দণ্ডায়মান রাখিয়াই তাহার স্কন্ধোপরি চাউলের দাম করেন। চাকুরীগত বিদ্যার শিক্ষা এইরূপই হইয়া থাকে। তা-যাহাই হউক, বঙ্গীয় কৃষককুলের কিঞ্চিৎ লেখা-পড়া শিক্ষার নিতান্তই দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি যে, তাহারা মান্ধাতার আমল হইতে জমিতে যে চাষ দিয়া আসিতেছে, তাহার কি কোন পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন নাই?—২০।২৫ বৎসরের কথা বলি, তখন জমির যে অবস্থা ছিল এখনও কি সেই অবস্থাই আছে? তখন রৌদ্র, বৃষ্টি ও ঋতুর যে ভাব ছিল, এখন কি সেইমত রৌদ্র, বৃষ্টি ও ঋতুর কার্য্য হইয়া থাকে?—শুধু সংস্কারের অধীন থাকিয়া আবহমান কাল এক ভাবে কোন কার্য্য চলে না। পরিবর্ত্তনশীল জগতের যখন নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন কৃষির পরিবর্ত্তন হইবে না, এ কথা কি সমীচীন? লেখা-পড়ার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক থাকিলে অপর দশ দেশের অবস্থা জানিয়া অবাধে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষির উন্নতি করিতে পারা যায়। এ জ্ঞানের অভাব কৃষির অবনতির কারণ। তৎপর আর একটি কথা এই যে অহরহ এক দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইবে, এ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অন্য আবাদ বাদ দিয়া একঘেয়ে সেই জিনিষের আবাদ করা কি একটা মূল নীতি হইতে পারে? বিদেশে এদেশজাত কোন কোন দ্রব্যের সকল সময় তেমন দরকার না হইতে পারে; সুতরাং এদেশে সকল জিনিষের আকাল লাগাইয়া বিদেশে রপ্তানীর জন্য এক জিনিষ অপর্য্যাপ্ত আবাদ করিয়া ঘরে পচাইতে থাকা, অজ্ঞতার ফল বই আর কি বলা যাইতে পারে? একটু লেখা-পড়ার সঙ্গে যোগ থাকিলে আর কৃষকের এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। কৃষক অজ্ঞ হইলে হাতে যথেষ্ট পয়সা হইলেও রাখিতে জানে না। পাটে

তো কৃষক পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর বেশ পয়সাই পাইয়াছিল, তবে কেন আজ তাহারা 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করিতেছে? আর বঙ্গের কৃষককুলের দীনতাই বা ঘুচে না কেন? এই-সকল কারণে বঙ্গীয় কৃষককুলের লেখা-পড়া শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাতে তাহাদের সম্মানও বৃদ্ধি হইবে, হাতে কিছু পয়সা রাখিতেও তাহারা সমর্থ হইবে, এবং দেশেও সহজে আকাল ঘটিতে পারিবে না।"

যে পর্য্যন্ত শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য ও কৃষিজীবীদের সম্মানের চক্ষে দেখিতে না শিখিবেন, তাবত কৃষকেরাও তাহাদের মর্য্যাদা বুঝিয়া কৃষিশিক্ষায় মনোযোগী হইতে পারিবে না; সুখের বিষয় ময়মনসিংহের উকীল শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ, অভয়চরণ দত্ত-প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট কায়স্থ-নেতা এ বিষয়ের সংস্কার সাধনার্থ নিজেদের স্বাক্ষরে 'চারুমিহিরে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত করিয়াছেন—

"আমরা পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী কায়স্থগণ-পক্ষে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি যে, হলযোগে ক্ষেত্র-কর্ষণ ও শস্য অর্জ্জন করা আমরা হেয় কি নিন্দনীয় কার্য্য মনে করি না; প্রত্যুত কৃষিকর্ম্মকে সাধু ব্যবসায় জ্ঞান করি। আমরা আজীবন অন্যবিধ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় কৃষিকার্য্যে আমাদের অসামর্থ্যপ্রযুক্ত আমরা নিজেরা যদিও এই কৃষি-কর্ম্ম ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করিতে পারিব না, তথাপি আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ সাময়িক হলচালন করিয়া স্বজাতি কায়স্থগণকে কৃষিকর্ম্মে উৎসাহিত করিতে প্রস্তুত আছি; আমাদের সন্তানগণ কেহ কৃষিকর্ম্মে রুচিসম্পন্ন হইলে আমরা সুখী হইব।"

অনাথবাবু প্রভৃতির নাম এ বিজ্ঞাপন কার্য্যে পরিণত হইলে এবং দেশের অপরাপর ভদ্রসমাজ তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে কৃষিক্ষেত্রে এক শুভ পরিবর্ত্তনের যুগ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। এবং এইরূপ পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির সঙ্গে দেশের দারিদ্র্য-মোচনেও যে অনেকাংশে সহায় হইবে তাহা নিশ্চিত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, শুধু সন্তানগণের 'কেহ'কে 'কৃষিকর্ম্মে রুচিসম্পন্ন' হইতে দেখিয়া 'সুখী' হইলে চলিবে না; অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে কৃষিশিক্ষাও সন্তানগণের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত কৃষক করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই মঙ্গল।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

চিত্র-পরিচয়

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজা শ্রীঅভয়সিংহ জী মাড়ওয়ারের রাজা ছিলেন। তিনি মহারাজা অজিত সিংহের উত্তরাধিকারী। মোগল সম্রাট মহম্মদ শা নিজের হাতে টীকা পরাইয়া, তরবারি ও খেলাত উপহার দিয়া তাঁহাকে মহারাজরাজেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। এই সময়ে শির-বুলন্দ নামক একজন প্রদেশশাসক কর্ম্মচারী রাজবিদ্রোহী হন; তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য সমরাভিযানের সেনাপতি নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে সম্রাট দেওয়ান-ই-আম দরবারে সমবেত সমস্ত ওমরাহ্ ও রাজাদের সম্মুখে পানের বীরা পাঠাইয়া সকলকে আমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া বীরা গ্রহণ করিল না। যখন বীরাবাহক সকলের সম্মুখ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, তখন বীর অভয়সিংহ বীরা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন—"সম্রাট, শিরবুলন্দের বুলন্দ (উচ্চ) শির (মস্তক) আমি আপনার চরণে নত করিয়া দিব।" তখন সম্রাট বলিলেন—"মহারাজরাজেশ্বর, আপনার অভয় সিংহ নাম সার্থক হইল।" ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া বিজয়ী হইয়া ফিরেন। সেই অবধি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যাপারে যোধপুরে রাজাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

"মৃত্যুর দূত" ছবিখানিতে দূরে বেড়ার বাহিরে কাস্তে কাঁধে লইয়া যে লোকটি দাঁড়াইয়া আছে সেই মৃত্যুর দূত। য়ুরোপীয় চিত্রে কালরূপী মৃত্যুকে কৃষকরূপেই চিত্র করা হয়, সে যেন জীবনের ফসল কাটিয়া কাটিয়া মর্ত্যধামে বিচরণ করে। তাহার কঠোর অস্ত্রের মুখে কত অপক্ব অপরিণত ফসলও নষ্ট হইয়া যায়।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।"

গীতাঞ্জলি।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত।

U. RAY & SONS

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩২১

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মানুষ হওয়া

আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা না জন্মিলে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। দু-চারজন লোকের চেষ্টায় বা দু-এক-শ্রেণীর লোকের চেষ্টায় দেশ উন্নত হইতে পারে না। অথচ সকল শ্রেণীর লোকের সচেষ্ট না হইবার কারণ অনেক রহিয়াছে। একেই ত অধিকাংশ লোকের ধারণাই নাই যে আমাদের দুরবস্থা কিরূপ শোচনীয়; তাহার উপর আবার দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ যে মানুষের, সুতরাং আমাদেরও, সাধ্যায়ত্ত সে দৃঢ় বিশ্বাস অল্প লোকেরই আছে। এতদ্ভিন্ন আরও একটি কারণ জুটিয়াছে। মানুষ দেখিতেছে, আমাদের দেশে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইংরেজেরা যাহা করিতে চায়, তাহা হয়; আমরা যাহা চাই, তাহা হয় না। ইহা হইতে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে ইংরেজেরা যদি আমাদের উন্নতি করিয়া দেয়, তবেই উন্নতি হইবে, নতুবা হইবে না। এইজন্য দেশবাসীর মন হইতে এই ভাব দূর করিয়া দিয়া আত্মনির্ভরের ভাব জন্মাইবার নিমিত্ত কখন কখন ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হয় যে ভারতবাসীদিগকে মানুষ করিয়া দেওয়া ইংরেজদের স্বার্থের বিরোধী, অন্যান্য জাতির মত ইংরেজরাও স্বার্থপর, অতএব তাহারা আমাদিগকে মানুষ করিয়া দিবে না। প্রমাণস্বরূপ ইহাও দেখাইবার চেষ্টা করা হয় যে ব্রিটিশ-রাজত্বকালে এ পর্য্যন্ত ইংরেজেরা ভারতবাসীর জন্য বড় এরূপ কোন কাজ করে নাই যাহাতে ভারতবাসীদের চেয়ে তাহাদের নিজেদেরই বেশী লাভ হয় নাই, এবং ভারতপ্রবাসী অধিকাংশ ইংরেজ ভারতবাসীদের ক্ষমতাবৃদ্ধি, পদবৃদ্ধি, শিক্ষালাভের সুবিধাবৃদ্ধি, প্রভৃতির প্রতিকূলতা করিয়া ভারতবাসীদিগকে চিরকাল শক্তিহীন ও নিজকরায়ত্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে।

কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে আত্মনির্ভরের ভাব জাগাইবার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে উক্তরূপ কিছু প্রমাণ করিবার চেষ্টা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

ভারতবাসীদের মধ্যে দেশবিদেশে যাঁহারা ধর্ম্মোপদেষ্টা, কবি, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, ঐতিহাসিক বা যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাজগুলি তাঁহাদিগকেই করিতে হইয়াছে। তাঁহারা ইংরেজের, ফরাসীর, জার্ম্মেনের বা আমেরিকানের কাজগুলি ধার করিয়া বা ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করিয়া নিজের নামে বেনামী করিয়া চালাইতেছেন না। তাঁহাদের নিজের শক্তি, নিজের প্রতিভা, নিজের চিন্তা, নিজের চেষ্টা, নিজের অধ্যবসায়, নিজের সাহস, নিজের তপস্যায় তাঁহারা কৃতী ও কীর্ত্তিমান্ হইয়াছেন।

একএকজন মানুষের মানুষ হইবার যে পথ, এক-একটা জাতিরও মানুষ হইবার সেই পথ।

খুব ভাল কাগজ কলম কালী দিয়া, সর্ব্বদেশের ভাল ভাল কাব্যে পরিপূর্ণ একটি সুন্দর সুসজ্জিত নির্জ্জন গৃহে কাহাকেও বসাইয়া দিলেই সে কবি হয় না; তাহার

নিজের প্রতিভা ও তপস্যা ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে বাহিরের সর্ব্বপ্রকার অবস্থার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, হয়ত অনেক স্থলে সেইজন্যই, কত লোক কবি হইয়াছেন। নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ও রাসায়নিক দ্রব্যে পূর্ণ গৃহে একটি মানুষকে বসাইয়া দিলেই সে আবিষ্কারক হয় না। মানুষটির নিজের শক্তি ও তাহার সুপ্রয়োগ ব্যতিরেকে কিছুই হয় না। অন্যদিকে সামান্য দুএকটা শিশি, একটু কাচের টুকরা বা নল, বা লৌহখণ্ড বা একটু তার বা সূতার সাহায্যে কত অতি দরিদ্র ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। নিজের মাথা না ঘামাইয়া কেবল গৃহশিক্ষকের বা অঙ্কসমাধান-পুস্তকের সাহায্যে কে কবে গণিতজ্ঞ হইয়াছে? আবার এরূপ সাহায্য খুব অল্প পাইয়া কিম্বা একটুও না পাইয়া কত লোক গণিতে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

তুমি যদি ঘোড়ায় চড়া শিখিতে চাও, তাহা হইলে একজন তোমাকে একটা ঘোড়া দিতে পারে, জিন লাগাম দিতে পারে, চাই কি ধরাধরি করিয়া বা সিঁড়ি লাগাইয়া ঘোড়ার পিঠেও উঠাইয়া দিতে পারে; কিন্তু নিজে ঘোড়ার পিঠে চড়িবার ক্ষমতা এবং ঘোড়ার পিঠে বসিয়া থাকিবার সাহস ও শক্তি তোমারই চাই, ঘোড়া দৌড়িলে পড়িয়া না যাইবার শক্তি, পড়িয়া যাইবার বিপদ-সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করিবার মত সাহস ও শক্তি, দুর্দ্দান্ত ঘোড়াকে বশে আনিয়া বাগ মানাইবার সামর্থ্য, এসব তোমারই চাই। নতুবা ঘোড়া পাওয়াটা বা তাহার পিঠে নিজেকে আসীন দেখাটা সৌভাগ্য না হইয়া তোমার দুরদৃষ্ট বলিয়াই গণিত হইবে। তা ছাড়া, অনুগ্রহপ্রাপ্ত, ধার-করা বা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার চেয়ে নিজের অর্জ্জিত একটা ঘোড়া যে খুব ভাল, তাহা সকলেই বুঝে।

ইংরেজকে খুব মহানুভব, খুব সদাশয়, খুব ন্যায়পরায়ণ, খুব নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর, খুব ভারতহিতৈষী বলিয়া বিশ্বাস করিলেও মানুষ হইবার আসল চেষ্টা যা, তা আমাদিগকেই করিতে হইবে। কেহ কাহাকেও মানুষ করিয়া দিতে পারে না। আর একজন আমার জন্য কিছু করিয়া দিবে, এইরূপ অভিলাষ ও আশাই যে মানুষকে অমানুষ করিয়া রাখে। মনের ভাব যাহার এমন, সে, এরূপ ভাব থাকিতে কখন মানুষ হইবে না। তোমার ভিতর হইতে যাহা না হইতেছে, তাহা তোমার নয়; তাহা দ্বারা তুমি বড় বা শক্তিমান্ কখনই হইতে পার না। যে কৃশ তাহার গায়ে তুলা ও কাপড় জড়াইয়া বা সর্ব্বাঙ্গে পুরু করিয়া ছাগমাংসের প্রলেপ দিয়া তাহাকে স্থূলকায় করা যায় না। যে দুর্ব্বল তাহার হাতে পায়ে মজবুত ইস্পাতের শিক বাঁধিয়া এবং বুকে পিঠে শক্ত ইস্পাতের পাত লাগাইয়া তাহাকে বলবান করা যায় না। মানুষটা খাদ্য সংগ্রহ ও গ্রহণ করিয়া নিজের পরিপাকশক্তির দ্বারা তাহা নিজের অঙ্গীভূত করিলে এবং আনন্দের সহিত অঙ্গচালনা করিলে তবে পূর্ণমাত্রায় বল পাইতে পারে। নিজের চেষ্টায় যাহা হয়, তাহাই খাঁটি লাভ, স্থায়ী লাভ, খাঁটি প্রাপ্তি স্থায়ী প্রাপ্তি।

অতএব, আর-কেহ আমাদের জন্য কিছু করিয়া দিবে এ বাসনা, এ আশা আমরা যেন পরিত্যাগ করি। মানুষ মানুষকে টাকা দিতে পারে, জমী দিতে পারে, পদ দিতে পারে, উপাধি দিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্ব দিতে পারে না। মনুষ্যত্ব ত দূরের কথা,—বিদ্যা দিতে পারে না, প্রতিভা দিতে পারে না, কোন প্রকার শক্তিই দিতে পারে না।

জাতীয় উন্নতির সোপানের অনেকগুলি ধাপ। প্রথমে বুঝি আমাদের কতদূর দুর্গতি হইয়াছে; তাহার পর বুঝি যে আমাদেরও অন্তর্নিহিত শক্তি আছে; তাহার পর বুঝি যে এই অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা আমাদেরও মানুষ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর; তাহার পর বুঝি যে কেহ কাহাকেও মানুষ করিয়া দিতে পারে না, মানুষ নিজেই নিজের প্রদীপ, নিজেই নিজের যষ্টি, নিজেই নিজের অবলম্বন, অতএব অপরের অনুগ্রহকামনা মনুষ্যত্বলাভের প্রধান অন্তরায়; তাহার পর আত্মোন্নতিচেষ্টারূপ দৃঢ় ও কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হই। যিনি এই মুক্তিমার্গ দেখাইয়াছেন, তিনিই লক্ষ্যস্থলেও ঠিক্ পৌঁছাইয়া দিবেন।

পরস্পরের সাহায্য।

মানুষ হইবার জন্য যে আয়োজন ও চেষ্টা একান্ত আবশ্যক, তাহা, মানুষ হইতে যে চায়, তাহাকেই করিতে

হয়। কিন্তু অপর মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা পাইলে সুবিধা হয়। এরূপ সাহায্য লওয়া ও পাওয়ায় কোন ক্ষতি হয় না, যদি ইহা ভিক্ষার মত অনুগ্রহলব্ধ কিছু বলিয়া গৃহীত না হয়।* ভিক্ষা বলিয়া যে ভিক্ষা দেয়, সে আত্মীয়তাবোধ হইতে প্রদত্ত সাহায্যদানের মহাফল হইতে বঞ্চিত হয়; এবং যাহাকে এইভাবে সাহায্য করা হয়, তাহার মনুষ্যত্বে আঘাত করে। যে ভিক্ষা গ্রহণ করে তাহার মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত ও খাট হইয়া যায়। মানুষকে আত্মীয় ভাবিয়া যিনি সাহায্য করেন, তিনি বিশ্বব্যাপী প্রীতির পথে অগ্রসর হন, এবং যাঁহাকে সাহায্য করা হয় তাঁহার মনুষ্যত্বে আঘাত করা হয় না; বরং অপরের হৃদয়ের সাহায্য পাইয়া তাঁহার মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায় এবং আনন্দ ও প্রেমে হৃদয় উৎফুল্ল ও বিকশিত হয়। যিনি যত মানুষের সুখ দুঃখ আশা ও সংগ্রামকে নিজের করিতে পারেন, তিনি নিজে তত উদার ও শক্তিশালী হন। কিন্তু অন্যের সঙ্গে প্রাণের টান ও আত্মীয়তাবোধ ব্যতিরেকে এই সৌভাগ্য হয় না।

ধনীরা দরিদ্রের যে সাহায্য করেন, দরিদ্ররা তাহা অপেক্ষা ধনীদের অনেক বেশী সহায়তা করেন।

মা রোগে সন্তানের সেবা শুশ্রূষা করিয়া ভাবেন না যে সন্তানের ভারী একটা উপকার করিলাম, সন্তানও ভাবে না যে একটা উপকার পাইলাম। এইরূপ আত্মীয়স্বজনের যে প্রেমের সেবা, তাহাতে অনাত্মীয় উপকারী ও উপকৃতের মধ্যে সচরাচর যে উঁচু নীচুর সম্বন্ধ, মুরুব্বি ও আশ্রিত অনুগৃহীতের সম্বন্ধ, দেখা যায়, তাহা থাকে না। এই আত্মীয়তার ভাব সর্ব্ববিধ লোকহিতকর কার্য্যকে যে-পরিমাণে অনুপ্রাণিত করিবে, সেই-পরিমাণে এইসব কাজ মানুষের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিবে। একদিকে উপকারী মুরুব্বি এবং অপরদিকে ভিখারী অনুগৃহীতের দল বাড়িলে জগতের মঙ্গল কোথায়? মানুষগুলাই যদি ছোট হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্য ফলাফল গণনায় লাভ কি?

* এখানে আমরা শিক্ষা বা অপর কোন কার্য্যের জন্য গবর্ণমেন্টের টাকা লওয়ার বিষয় আলোচনা করিতেছি না। তবে এইটুকু সকলকে মনে রাখিতে অনুরোধ করি যে সরকারী খাজনাখানার টাকা আমাদেরই দেওয়া টাকা। উহা চাওয়া ভিক্ষা নয়। উহাতে আমাদের দাবী আছে।

মানুষের আত্মীয়ত্ব।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে মনুষ্যেরা সকলেই পরস্পরের আত্মীয়। ইহুদী, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান বিশ্বাস করেন যে সব মানুষ এক আদিম দম্পতি হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাস ও আচরণে সঙ্গতি রাখিতে হইলে তাঁহারা সকল মানুষের সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিতে বাধ্য। হিন্দু পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে সব মানুষ ব্রহ্মার দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে উদ্ভূত। দেহের সমুদয় অংশ পরস্পর সংপৃক্ত। পায়ের সঙ্গে কি মাথার সম্পর্ক নাই? অতএব হিন্দুমতেও সব মানুষের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। বৈদান্তিক যিনি বা কোন দেশীয় অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ যিনি মানেন, তিনি ত সব মানুষকে একই আত্মার প্রকাশ বলিয়া আত্মীয় জ্ঞান করিবেনই। বৈজ্ঞানিক জানেন এক আদিম জৈব পদার্থ হইতে, শুধু সব মানুষ কেন, সমুদায় চেতন পদার্থ উৎপন্ন। সুতরাং মানবের আত্মীয়ত্ব বৈজ্ঞানিকের মানিতে কোন বাধা নাই। আত্মীয়জ্ঞানে সকলের হিতসাধনের চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। দেহ ও মন উভয়ের কল্যাণ সাধিত হইলে মানুষের প্রকৃত মঙ্গল হয়। এইরূপ কল্যাণসাধনার্থ নানা বিষয়ে মন দেওয়া আবশ্যক।

আর্থিক অবস্থা।

যাঁহারা অতি দরিদ্র, যাহারা অন্নবস্ত্রের অভাবে ক্লেশ পায়, যাহারা শীত গ্রীষ্ম বর্ষার অসুবিধা ভোগ করে, তাহাদের পক্ষে সুস্থ সবল থাকা ও জ্ঞানলাভ করা দুঃসাধ্য।

আমাদের দেশে বহুসংখ্যক লোক এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ডে কোন প্রকারে লজ্জা রক্ষা করে, এবং গৃহহীন বা প্রায় গৃহহীন অবস্থায় কালযাপন করে। অতএব দরিদ্রের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। এইজন্য কৃষি শিল্প বাণিজ্য শিখান, শ্রমশীল মিতব্যয়ী ও সচ্চরিত্র হইতে শিখান, সর্ব্বপ্রকার শ্রমসাধ্য বৈধ কার্য্যে গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষাদান, প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

অনাথাশ্রম

যে-সকল বালকবালিকা পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয়

তাহাদের জন্য অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়া ও তথায় তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইবার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

গরীব ছাত্র

গরীব ছাত্রদিগকে তাহাদের অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের সুবিধা করিয়া দিলে, বা পাঠ্য পুস্তক ধার দিলে তাহাদের বিস্তর সাহায্য হয়; আমেরিকায় অনেক গরীব ছাত্র নানাপ্রকার কাজ করিয়া আপনাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করে। আমাদের দেশে এখন গৃহশিক্ষকের কাজ ছাড়া তাহারা আর কোন কাজ পায় না। আরও নূতন নূতন রকমের কাজের ব্যবস্থা করিতে পারিলে বড় ভাল হয়।

বিধবাশ্রম

সহায়হীনা বা গরীব বিধবাদের জন্য আশ্রম ও শিক্ষালয় স্থাপনপূর্ব্বক তথায় তাঁহাদের জন্য সাধারণ শিক্ষা এবং শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবার সুবিধা দিতে পারিলে ভাল হয়। কেহ বা তথায় আত্মীয়ের বাড়ী হইতে গিয়া শিখিবেন, কেহ বা তথায় থাকিয়া শিখিবেন।

আমাদের দেশের দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের বিধবারা কখন কখন রাঁধুনীর কখন বা দাসীর কাজ করেন। তাহা দোষের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় না, এবং দোষের নহেও। যদি এই বিধবারা লেখাপড়া শিখিয়া শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন বা কোন প্রকার শিল্প শিখিয়া শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে আয় বেশী হয়, এবং শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতির অভাবও দূর হয়। বিধবাদের দ্বারা এইরূপ আরও অনেক কাজ হইতে পারে।

বাঙ্গালা দেশে কেবল হিন্দুসমাজে ৫ বৎসর ও তন্নিম্নবয়স্ক ৯৬২, ৫ হইতে ১০ বয়সের ৮৬৮১, ১০ হইতে ১৫ বয়সের ৩২০৭৫, ১৫ হইতে ২০ বয়সের ৯৫৩৬৩, ২০ হইতে ২৫ বয়সের ১৪৪৩২৯ এবং ২৫ হইতে ৩০ বয়সের ২১৫৬৭৪ জন বিধবা আছে। বঙ্গে ৩০ ও তন্নিম্ন বয়সের হিন্দু বিধবার মোট সংখ্যা ৪৯৭০৮৪ অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ।

স্বাস্থ্য

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে হাজারকরা ২৯.৩৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ভারতবর্ষেরই মান্দ্রাজ প্রদেশে ঐ বৎসর মৃত্যুর হার হাজারকরা ২১.৪১ ছিল। বোম্বাই য়ের হার ২৬.৬৩, বিহার ও উড়িষ্যার ২৯.১৪, আসামে ২৭.৬৬, এবং ব্রহ্মের ২৪.৬৫ ছিল। এই-সকল প্রদেশে তুলনায় বুঝা যাইতেছে যে বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যের অনে উন্নতি হইতে পারে। বঙ্গের স্বাস্থ্য মান্দ্রাজের সমান হইে হাজারে ৮ জন লোক অর্থাৎ মোট ৩,৬২,৬৩২ জন লোক বৎসরে কম মরে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়া বৎসরে সা তিন লক্ষেরও অধিক লোকের প্রাণরক্ষা করা সামা কার্য্য নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বার্ষিক মৃত্যুর হা অষ্ট্রেলেশিয়ায় হাজারকরা দশ এবং কানাডাতেও ১ নিউজীল্যাণ্ডে ৯.২। অষ্ট্রেলেশিয়ার বহু স্থানের শীতাত ও বৃষ্টি ভারতের মত, বঙ্গের মত। সুতরাং বঙ্গের মৃত্যু হার কমাইয়া ১০ করা মানুষের সাধ্যাতীত নহে। তা হইলে বঙ্গে বৎসরে হাজারে ১৯ জন অর্থাৎ মোট ৮,৬ ২৫১, অর্থাৎ প্রায় নয় লক্ষ জনের প্রাণরক্ষা হয়। ইংলণ্ডে বার্ষিক মৃত্যুর হার হাজারে ১৩। বঙ্গের স্বাস্থ্য উহা মত বহুজনাকীর্ণ দেশের সমান হইলেও বৎসরে ৭,২৫,২৬ জনের প্রাণরক্ষা হয়।

আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিয়া অন্নবস্ত্র বাসস্থানের উন্নতি করিতে পারিলে, এবং সাধারণ শিক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম শিক্ষা, রোগের সময় শুশ্রূষা চিকিৎসার বন্দোবস্ত, পানীয় জল ও নর্দ্দমার বন্দোবস্ত গ্রাম নগর পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা, প্রভৃতির ব্যবস্থা হইলে উল্লিখিতরূপ সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে ১৩,৩১,৮৬৮ জনের মৃত্যু হয়;—তন্মধ্যে জ্বরে ৯৬৫৫৪৬, প্লেগে ৯৮৪, বসন্তে ৯০৬২, ওলাউঠায় ৭৮৮৯৮, উদরাময় ও রক্তামাশয়ে ৩৩১৯৫, শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ১২০৬৩, আঘাতে ১৭,৪২১ এবং অন্যান্য কারণে ২১৪ ৬৯৯ জন মানুষ মারা পড়ে। এই সমুদ মৃত্যু অনিবার্য্য নহে; অধিকাংশই নিবার্য্য। পাশ্চাত নানা দেশেও পূর্ব্বে প্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে লক্ষ লক্ষ লোক মরিত। এখন প্লেগের মড়ক তো তথায় হয়ই ন

* চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনও জন্মমৃত্যু রেজিষ্টরীর প্র প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় উহা বাদ দিয়া গণনা করা হইয়াছে।

ম্যালেরিয়াও প্রায় বিদূরিত হইয়াছে। অন্যত্র যাহা হইয়াছে, বঙ্গেও তাহা হইতে পারে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে শিশুদের মৃত্যুর হার হাজারে ২০৯·৫ হইয়াছিল। অর্থাৎ যতগুলি শিশু জন্মে, তাহার প্রত্যেক ৫টির মধ্যে একটিরও বেশী মারা পড়ে। অষ্ট্রেলেশিয়ায় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শিশুমৃত্যুর হার হাজারকরা ৭০ ছিল। এখন সম্ভবত আরও কম হইয়াছে। সুতরাং আমাদের দেশে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশুর মৃত্যু নিবার্য্য। বাল্যমাতৃত্ব নিবারণ, অন্তঃসত্বা অবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় শিক্ষাদান, সন্তানপালনবিধি শিক্ষাদান, সুতিকাগৃহের উন্নতিসাধন, ধাত্রীদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিখান, ভাল দুধ যোগান, দেশের আর্থিক অবস্থার ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন, প্রভৃতি উপায়ে সহস্র সহস্র শিশুর প্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সস্ অনুসারে বঙ্গে ১৯৯৭৮ পাগল বা উন্মাদগ্রস্ত, ৩২১২৫ কালা-বোবা, ৩২২৪৭ অন্ধ এবং ১৭৪৮২ কুষ্ঠরোগী আছে। এতদ্ভিন্ন দুশ্চিকিৎস্য-রোগগ্রস্ত চিররুগ্ন অনেক আছে। ইহাদের কষ্টের অনেক লাঘব করা যাইতে পারে, এবং অনেককে জীবিকাউপার্জ্জনক্ষম করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে পাগলদিগকে ভূতগ্রস্ত মনে করা হইত, কোথাও কোথাও এখনও হয়। কিন্তু এখন বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকেরা মনে করেন যে সপ্রেম ব্যবহার ও সুচিকিৎসায় অনেকে আরোগ্যলাভ করিতে পারে। তদ্রূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কালা-বোবা ও অন্ধেরা যে লেখা পড়া এবং অর্থকর শিল্প শিখিতে পারে, তাহা এই কলিকাতাতেই প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাদের জন্য আরও শিক্ষালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। আরও কুষ্ঠাশ্রম এবং চিররুগ্ন আতুরদের জন্য আশ্রমের প্রয়োজন আছে।

শিক্ষা

বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যে ব্রহ্মদেশে হাজারে ২২২ জন লিখিতে পড়িতে পারে। খাস ভারতবর্ষে কোচিনরাজ্যে হাজারকরা ১৫১ জন লিখিতে পড়িতে পারে। বঙ্গে লিখনপঠনক্ষম লোক হাজারে মাত্র ৭৭ জন। অতএব কেবল ভারত-সাম্রাজ্যেরই তুলনায় দেখা যাইতেছে যে বঙ্গে এখনও শিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট স্থান আছে। পাশ্চাত্য অনেক দেশে, যে-সকল শিশুর এখনও লেখা পড়া শিখিবার বয়স হয় নাই, তাহাদিগকে বাদ দিলে, প্রত্যেক পুরুষ ও নারী লিখিতে পড়িতে পারে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপানও প্রায় এইরূপ উন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে বঙ্গে ১১, বোম্বাইয়ে ১৪, ব্রহ্মে ৬১, মান্দ্রাজে ১৩, বড়োদায় ২১, কোচিনে ৬১, মহীশূরে ১৩ এবং ত্রিবাঙ্কুড়ে ৫০ জন লিখিতে পড়িতে পারে। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষায় বঙ্গ খুব পশ্চাদ্বর্ত্তী। এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। সন্তানেরা মায়ের কাছেই মানুষ হয়। সুতরাং সন্তানদের শিক্ষার জন্য পুরুষদের শিক্ষার চেয়েও যে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা বেশী দরকার, ইহা বেশী চিন্তা না করিয়াও বুঝা যায়।

প্রত্যেক হাজারে বঙ্গের সাঁওতাল ৪, বাউরী ১০, মুচি ১২, হাড়ি ১৪, বাগদী ১৯, মালো ২৮, জালিয়া কৈবর্ত্ত ৪৪, জোলা ৪৪, নমঃশূদ্র ৪৯, রাজবংশী ৫১, ধোবা ৫৫, গোয়ালা ৭৭, সূত্রধর ৮৬ এবং চাষী কৈবর্ত্ত ১০৮ জন লিখিতে পড়িতে পারে। এই সকল জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। ইহাদের মোট লোকসংখ্যা ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মোট লোকসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। বঙ্গে কায়স্থ বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের মোট সংখ্যা ২৪,১৩,১৫৪। কিন্তু কেবল নমঃশূদ্রের সংখ্যাই ১৯,০৮,৭২৮ এবং রাজবংশীর সংখ্যা ১৮,০৮,৭৯০। বঙ্গের ৪,৬১,০৫,৬৪২ অধিবাসীর মধ্যে ২,৪২,৩৭,২২৮ জন মুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে হাজারকরা ৪১ জন লিখনপঠনক্ষম। অতএব মুসলমানদের শিক্ষার জন্যও বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করিবার জন্য সহজ ভাষায় লিখিত সুলভ নানা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে বক্তৃতা, পর্য্যটক শিক্ষক, বিনাব্যয়ে পড়িবার সুবিধার জন্য একস্থানে স্থায়ী ও জঙ্গম (Stationary and travelling) লাইব্রেরী, ভাল গান, কথকতা, প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

চরিত্র সংশোধন

পতিতা নারী, দুশ্চরিত্র নেশাখোর মানুষ, কয়েদী ও কয়েদখালাসী লোক, প্রভৃতির সুশিক্ষাদি দ্বারা চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক কল্যাণ

এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল, যাঁহারা সুস্থ ও শিক্ষিত, এমন কি যাঁহারা সচ্চরিত্র, অথচ যাঁহাদের আধ্যাত্মিকজীবনের গভীরতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই। তাঁহারা আত্মার ক্ষুধা ও তৃপ্তি, অশান্তি ও শান্তি, বিষাদ ও আনন্দ, ক্ষীণতা ও সবলতা ভাল করিয়া অনুভব করেন না। এরূপ যাঁহাদের অবস্থা তাঁহারা মানবজীবনের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন বলা যায় না। মানুষের পূর্ণ কল্যাণের জন্য তাঁহার আত্মা উদ্বুদ্ধ এবং জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের দ্বারা পরমাত্মার সহিত যোগসাধনপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। লোকহিতসাধকের এবিষয়েও দৃষ্টি থাকিবে।

সেবার ক্ষেত্র

যে-সকল হিতসাধক বঙ্গীয় জনসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ করিতে চান, তাঁহাদের স্মারকস্বরূপ এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তটি লিখিত হইল। তাঁহারা প্রথম হইতেই সমুদয় বা বহু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃতি লাভ করিবে। সেবার ক্ষেত্র যে সুবিস্তৃত, তজ্জন্য যে সহস্র সহস্র প্রেমিক, সহস্র সহস্র দাতা, সহস্র সহস্র সেবাব্রত কর্ম্মীর প্রয়োজন, তাহা দেশবাসী উপলব্ধি করিতে পারিলে পরম মঙ্গলের কারণ হইবে।

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার হ্রাস

গতমাসের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি যে ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের পাঠশালাসকলে ১৭৭১৬ জন ছাত্র কমিয়াছিল; পাঠশালাও কয়েকশত কমিয়াছিল। ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে ১১৬৯০ জন ছাত্র এবং ৫১৩ টি পাঠশালা কমিয়াছিল। সুতরাং বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক্‌, কমিয়াই চলিতেছে। যে-সকল প্রদেশ শিক্ষায় পশ্চাৎপদ বলিয়া পরিগণিত, তথায় কি হইতেছে দেখ যাক্‌। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের কথাই বলিব।

পঞ্জাবে বালকদের জন্য পাঠশালা ৪৯১ টি এব বালিকাদের জন্য পাঠশালা ৪৮ টি বাড়িয়াছে। পাঠশালা সকলে মোট বিদ্যার্থী বাড়িয়াছে ২৭,৬৪৭; তাহার মধ্যে বালক ২২৮৯২ এবং বালিকা ৪৭৫৫। পঞ্জাবে শুধু ছাত্রছাত্রী ও পাঠশালা বাড়িয়াছে তাহা নয়; তথাকা ছোটলাট বলিতেছেন, "With this large and steadily growing numerical expansion it is mos satisfactory to notice a continued striving towards greater efficiency," "সাতিশয় সন্তোষে বিষয় এই যে সংখ্যায় এইরূপ ক্রমাগত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার উৎকর্ষসাধনের চেষ্টাও অবিরা চলিতেছে।" সুতরাং বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং শিক্ষার উৎকর্ষসাধনের মধ্যে পাশ্চাত্যদেশে যেম কোন বিরোধ নাই, ভারতবর্ষেও তেমনি কোন বিরো নাই।

আগ্রা-অযোধ্যা সম্মিলিত প্রদেশে বালকদের পাঠশালা পূর্ব্ব বৎসরের ১০,১৫১ হইতে বাড়িয়া ১০,৪৩ হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের ৫৪১৩২৪ হইতে বাড়িয়া ৫৬৬০৩১ হইয়াছে। শিক্ষার উৎকর্ষসাধন, পাঠশালার গৃহগুলির উৎকর্ষসাধন, প্রভৃতি বিষয়েও মন দেওয়া হইয়াছে। বালিকাদের পাঠশালা পূর্ব্ব বৎসরের ১০০ হইতে বাড়িয়া ১০৬২ হইয়াছে। ছাত্রীসংখ্যাও ২১৬ বাড়িয়াছে। শিক্ষা ও শিক্ষা-গৃহের উন্নতিসাধনের চেষ্টা হইয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শিক্ষায় অনুন্নত সেখানেও পাঠশালার সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের ৩৩২ হইতে বাড়িয়া ৪৪০ হইয়াছে এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ১৬৮৯ হইতে বাড়িয়া ২২০৩১ হইয়াছে। পাঠশালাগুলিতে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তৎসম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে লেখা হইয়াছে, "The character of the work done i the school shows marked improvement." "বিদ্যালয়গুলিতে যেপ্রকারের কাজ হয়, তাহাতে বিশে উন্নতি দেখা যাইতেছে।" অতএব এই প্রদেশেও পাঠশাল

ও ছাত্রাছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার উৎকর্ষসাধন উভয়ই হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশসমূহ ও বেরারে বালকদের পাঠশালা-সকলে ২৬৪·৫ জন ছাত্র বাড়িয়াছে। ২৫৯টি নূতন পাঠশালা খোলা হইয়াছে। বালিকাদের পাঠশালাতেও ৮৫৬ জন ছাত্রী বাড়িয়াছে।

প্রত্যেক হাজারজন মানুষের মধ্যে বঙ্গে ৭৭, মধ্যপ্রদেশসমূহ ও বেরারে ৩৩, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে ৩০, পঞ্জাবে ৩৭, এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে ৩৪ জন লিখিতে পড়িতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাংলা দেশের লোক উল্লিখিত চারিটি প্রদেশের লোকদের চেয়ে লেখাপড়া কম ভালবাসে না, বরং অনেক বেশীই ভালবাসে। অতএব বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার হ্রাসের কারণ লেখাপড়ার অনাদর নহে। কিন্তু সরকারী পক্ষের কেহ এই তর্কও করিতে পারেন যে ঐসব প্রদেশে লেখাপড়ার প্রচলন কম থাকা হেতু, তথাকার প্রজাবর্গ ও গবর্ণমেণ্ট শিক্ষায় অধিক মন দেওয়ায় পাঠশালা এবং ছাত্রছাত্রী বাড়িতেছে। বেশ কথা। কিন্তু তাহাতে ঐসব প্রদেশে বঙ্গ অপেক্ষা দ্রুতবেগে পাঠশালা ও ছাত্রছাত্রী বাড়িতে পারে; সে কারণে বাংলাদেশের পাঠশালা ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়া যাইতে ত পারে না।

আরও একটা তথ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। ব্রহ্মদেশে হাজারে ২২২ জন লিখিতে পড়িতে পারে; বাংলা দেশে পারে ৭৭ জন, অর্থাৎ লিখনপঠনক্ষম লোকের হার ব্রহ্মে বাংলার তিন গুণ। অতএব বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার আগে বেশী হইয়া থাকাতেই যদি এখন পাঠশালা ও ছাত্র-ছাত্রী কমিয়া যাওয়া স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মে পাঠশালা ও ছাত্রছাত্রীর হ্রাস বঙ্গের তিন গুণ বেগে হওয়া চাই। কিন্তু বাস্তবিক কি ঘটিয়াছে? তথায় পাঠশালা বাড়িয়াছে ৩২৪টি, এবং ছাত্রছাত্রী বাড়িয়াছে ২৯৩৮০ জন।

বাংলা দেশটাও সৃষ্টিছাড়া নয়, বাংলাদেশের লোকও সৃষ্টিছাড়া নয়। অন্য নানা রকমের নানা প্রদেশে শিক্ষা বাড়িতেছে; এখানে বাড়া দূরে থাক্, কমিতেছে কেন?

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারী ভারতগবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসম্বন্ধীয় যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে লেখা আছে:—

"It is the desire and hope of the Government of India to see in the not distant future some 91,000 primary public schools added to the 100,000 which already exist for boys and to double the 4.25 millions of pupils who now receive instruction in them."

"এখন ভারতবর্ষে এক লক্ষ পাঠশালায় সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ ছাত্র পড়ে। ভারতগবর্ণমেণ্ট অদূর ভবিষ্যতে আরও ৯১,০০০ পাঠশালা খুলিয়া ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ করিবার ইচ্ছা ও আশা করেন।"

বাংলাদেশ ভারতবর্ষেরই মধ্যে। এখানে বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস হইতেছে কেন?

ভারতগবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের অষ্টম প্যারাগ্রাফে আছে:—

"The steady raising of the standard of existing institutions should not be postponed to increasing their number when the new institutions cannot be efficient without a better-trained and better-paid teaching staff."

অর্থাৎ, বর্তমান শিক্ষালয়গুলির সংখ্যা বাড়াইবার জন্য, অধিকতর শিক্ষিত ও অধিকতর বেতনভোগী শিক্ষক নিয়োগদ্বারা তাহাদের উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা স্থগিত থাকিবে না।

কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্ট কোথাও একথা বলেন নাই যে পাঠশালার সংখ্যা কমাইয়া দিতে হইবে। বরং এই মন্তব্যের ১১ প্যারাগ্রাফে বলিতেছেন যে অষ্টম প্যারাগ্রাফ অগ্রাহ্য না করিয়া নিম্নপ্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা খুব বাড়াইতে হইবে।* আমরা দেখিতেছি আর অনেক প্রদেশে উৎকর্ষসাধন ও সংখ্যাবৃদ্ধি দুইই চলিতেছে। বাংলাদেশে উৎকর্ষসাধন কি হইতেছে তাহা ত জানি না। কিন্তু সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়া চলিতেছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কলিকাতা

* 11 (*i*) Subject to the principle stated in paragraph 8 (1) *supra*, there should be a large expansion of lower primary schools......

(*ii*) Simultaneously upper primary schools should be established at suitable centres and lower primary schools should where necessary be developed into upper primary schools.

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে ১৯১২ সালের ৬ই জানুয়ারী বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা এই যে জ্ঞান-বিস্তার দ্বারা যেন আমার ভারতীয় প্রজাদের গৃহ উজ্জ্বল এবং পরিশ্রম আনন্দপূর্ণ হয়।" কিন্তু বাঙ্গালীরা তাঁহার প্রজা হইলেও তাহাদের অনেকের গৃহ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং পরিশ্রম বিষাদপূর্ণ হইতেছে। ইহার প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের উচ্চতমপদস্থ কর্ম্মচারীদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া হর্ণেল সাহেবকে ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হয়। ওজুহাত এই ছিল যে তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা আছে, এবং বঙ্গের শিক্ষাসমস্যা এত কঠিন যে তজ্জন্য বিশেষ অভিজ্ঞ লোক দরকার। প্রাথমিক শিক্ষার হ্রাস দ্বারা কি হর্ণেল সাহেবের এই যোগ্যতা সপ্রমাণ হইতেছে?

বর্দ্ধমানবিভাগে শিক্ষাবিষয়ক গুজব

এইরূপ একটি গুজব শুনিতেছি যে বর্দ্ধমানবিভাগের বিদ্যালয়সমূহের ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে তাঁহারা যেন আর নূতন বিদ্যালয় স্থাপনে সম্মতি বা অনুমতি না দেন। ইহাও শুনিতেছি যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন হইত এখনও তেমনি অনেক বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতেছে; কিন্তু আগে যেমন নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইত, এখন এই আদেশের ফলে তাহা হইতে না পাওয়ায় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়াই যাইতেছে। এই গুজবটির কোন ভিত্তি আছে কি না, বলিতে পারি না। কারণ, এরূপ কোন খবর কোন সরকারী বা অপর কাগজ-পত্রে দেখি নাই, কিম্বা শিক্ষাবিভাগের ছোট বা বড় কোন কর্ম্মচারীর নিকটও শুনি নাই। তথাপি সমগ্র বঙ্গদেশে প্রাথমিক পাঠশালা ও ছাত্র কমিয়া যাওয়ায়, খবরটা সন্দেহজনক মনে হইতেছে। এ বিষয়ে অনু-সন্ধান হওয়া দরকার। সম্রাট পঞ্চম জর্জের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও ভারতগবর্ণমেণ্টের মন্তব্যের প্রতিকূলে কোন কর্ম্মচারী এরূপ আদেশ দিয়াছেন কি না, তাহা সর্ব্ব-সাধারণের জানিবার অধিকার আছে।

বিলাতে রঙের কারখানায় সরকারী সাহায্য

জার্ম্মেনী পৃথিবীর মধ্যে সবদেশের চেয়ে বেশী রং প্রস্তুত করিত। যুদ্ধে সেখান হইতে রঙের আমদানী বন্ধ হওয়ায় বিলাতে একটা খুব বড় রঙের কারখানা খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। রয়টার সম্প্রতি তারে খবর পাঠাইয়াছেন যে ইহার মূলধন তিন কোটি টাকা হইবে। গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে দেড় কোটি টাকা ধার দিবেন। কারখানা তজ্জন্য শতকরা বার্ষিক চারি টাকা হারে সুদ দিবেন, মূলধন পঁচিশ বৎসরে শোধ দিতে হইবে। ইহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট এই কারখানাসংসৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহা দান, ঋণ নহে। এ পরীক্ষাগারে রং প্রস্তুত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার চেষ্টা হইতে থাকিবে।

বিলাত অপেক্ষা ভারতবর্ষ খুব দরিদ্র এবং শিল্পে খুব পশ্চাদ্বর্ত্তী। এখানকার গবর্ণমেণ্ট শিল্পের উন্নতির জন্য কত কোটি বা কত লক্ষ টাকা দিবেন?

পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ

পূর্ব্ববঙ্গে বহুসংখ্যক গ্রামে ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। লোকের মন প্রধানতঃ যুদ্ধের সংবাদের জন্যই উৎসুক থাকায় এবং তদনুসারে সংবাদপত্রে বেশীর ভাগ যুদ্ধের সংবাদ থাকায়, গরীবের ক্রন্দন সহৃদয় দেশবাসী শুনিতে পাইতেছেন না। লোকদের কিরূপ কষ্ট হইয়াছে, তাহার, নমুনাস্বরূপ চাঁদপুর সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে মহাশয় যে-সকল চিঠি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশ ছাপিতেছি। হানারচর হইতে শ্রীযুক্ত আবদুর রহমান মিঞা লিখিয়াছেন,—

"আপনার চিঠি পাইয়া আমি স্বয়ং আমাদের নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে গিয়া লোকের অবস্থা সম্বন্ধে যতদূর বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে আপনাকে লিখিতেছি।

"চাউলের দর বর্ত্তমান সময় ৫।৷০—৬।৷০ টাকা।

বিগত বৎসর এই সময় ৪৲—৫৲ টাকা ছিল। পাটের দর পূর্ব্ববৎসর এই সময় ৭৲—১২৲ পর্য্যন্ত ছিল; বর্ত্তমান সময় ৫৲ টাকার বেশী দর নাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ১৷৷৹ কি ২৲ টাকা ছিল। কৃষকগণ পেটের দায়ে এই সস্তা দামেই পাট বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছে। সম্প্রতি দর সাম্যস্বরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে; কিন্তু গরীবের ঘরে এখন আর পাট নাই। কাজেই তাহাদের এখন দুর্দ্দশার একশেষ উপস্থিত হইয়াছে।

"গ্রামের ধনীলোক ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকলেই অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। কেহ কেহ দুই দিনেও এক বেলা খাইতে পাইতেছে না। বাজাপ্তী গ্রামের কোনও এক কায়স্থ পরিবার মহাজনী ব্যবসার দ্বারা প্রতিপালিত হইত। কিন্তু এবার সুদ অথবা মূলধন কিছুই আদায় না হওয়ায় সেই পরিবার দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

"পেটের অসুখ, আমাশয়, জ্বর, কলেরা প্রভৃতি রোগ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর খুব বেশী দেখা যায়। অর্থাভাবে রীতিমত ঔষধ পথ্য না পাইয়া অনেকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে।

"বস্ত্রাভাবে অনেক দরিদ্রলোক শীতে কষ্ট পাই-তেছে। আজ ৪।৫ দিন হইল আমি হানারচর গ্রামের শ্রীজাফর আলি নামীয় আমাদের এক প্রজার বাড়ীতে খাজানা আদায় করিতে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা বড়ই মর্ম্মন্তুদ। সে তাহার পুত্রকন্যাগণসহ আগুন পোহাইতেছে,—সকলেরই পরিধানে জীর্ণবস্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুক্‌রা। আমাকে দেখিবামাত্র তাহারা ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিল। আমি জাফরকে ডাকিলে সে বলিল—"পরনে কাপড় নাই, আপনার সম্মুখে আসিতে লজ্জা বোধ হইতেছে।" তৎপর খাজানার টাকা চাহিলে সে কাঁদিয়া বলিল,—"টাকার অভাবে কাপড় কিনিতে না পারিয়া শীতে কষ্ট পাইতেছি, আজ দুই দিন অনাহারে আছি; মারিয়া ফেলিলেও এখন খাজনা দিতে পারিব না।" আমি টাকার জন্য আর পীড়াপীড়ি করা দূরে থাকুক, বরং কিছু সাহায্য করিব বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

"এই প্রকার অনেক লোক আছে। শ্রীপাঁচকড়ি গাজি নামীয় আর একজন দরিদ্র লোকের বাড়ীতে গত কল্য গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া সে তাহার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েগণকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমার নিকট কাঁদিয়া বলিল,—"শীতে ও ক্ষুধায় আর জীবন বাঁচে না। খোদাতাল্লা যদি জীবনটা লইয়া যাইতেন, তবুও ভাল হইত।"

"বাজাপ্তী সূত্রধরের বাড়ীতে প্রায় লোকই অনাহারে থাকিতেছে।

"স্কুলের বেতন দিতে না পারিয়া অনেক ছাত্র স্কুল পরিত্যাগ করিয়াছে। আমাদের গ্রামের স্কুলটি ছাত্র-বেতনের উপরই নির্ভর করিতেছে। সুতরাং রীতিমত ছাত্রবেতন আদায় না হওয়ায় শিক্ষকদেরও বড় অসুবিধা হইতেছে। হানারচর মধ্য-ইংরেজীস্কুলের ছাত্র অনাথ ধর, ললিত দত্ত, শশী দাস, জাফর আলি, আলিমদ্দিন, উপেন্দ্র মজুমদার, শরৎ সেন, ইমামদ্দিন, রোশন আলি প্রভৃতি অনেকে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ও বেতন দিতে অক্ষম হইয়া পড়িতে পারিতেছে না।

"অন্নক্লিষ্ট লোকদিগকে গ্রামের লোকের সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই। যে দুই একজনের আছে, তাহারাও ভবিষ্যতের চিন্তায় আকুল। গবর্ণমেণ্টও এসম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই।

"গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরি খুব হইতেছে। সাদুল্লাপুর-নিবাসী জনৈক মুসলমান বাগানে সুপারি চুরি করিয়া-ছিল। বাগানের মালিক তাহাকে ধরিয়া জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া গেলে, সে চুরি করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এবং বলিয়াছে, "আমার কাচ্চা বাচ্চারা আজ দুইদিন যাবৎ না খাইয়া আছে; শরীর খাটাইয়াও দু'টা পয়সা পাইতেছি না; তাহাদের কান্না আমার আর সহ্য হয় না; পেটের জ্বালায় চুরি করিয়াছি; জীবনে আর কখনও একাজ করি নাই; হুজুরের যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" ম্যাজিষ্ট্রেট দয়া করিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন।"

গজরা হইতে শ্রীযুক্ত নন্দকুমার সাহা মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"আপনার চিঠি অনুযায়ী আমাদের এদিকের অবস্থা

নিয়ে বিরক্ত করিতেছি। স্বদেশবাসীর উপকারার্থ আপনি যে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনি গরীব কাঙ্গালের একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে পারিলে আমরা আপনার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ থাকিব।

"আমাদের গজরা গ্রামটি মৎলবগঞ্জ থানার অন্তর্গত। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী আমুয়াকান্দি, ডুবগী, সদরদিয়া,' টরকীকান্দা ও রায়েরদিয়া এই কয়খানি গ্রামের অবস্থা লিখিতেছি। পাটের বাজারে যাহা হইবার তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। এখানে ক্বচিৎ লোকে ধান বোনে। পাটই ইহাদের প্রধান ফসল। সুতরাং এখন গ্রামের চৌদ্দআনা লোকেরই অন্নবস্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অনেক লোক অনাহারে থাকিতেছে। চুরির সংখ্যাও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ভিতর একটা রহস্য আছে। যত চুরি হইতেছে, তাহার সকলগুলির এজাহার পড়ে না। ইহার কারণ কতকটা অর্থাভাব, কতকটা অপহারকদের ভবিষ্যৎনির্য্যাতনভয়, এবং কতকটা পুলিশের ভয়। মাছ, তরকারী ও দুধ অন্যান্য বৎসরের তুলনায় সস্তা। কারণ লোকের যাহা আছে, তাহার সমস্তই নিজে না খাইয়াও বিক্রী করিয়া ফেলে। মজুরীর দরও সস্তা। কারণ যাহারা কোনও দিন মজুরী করে নাই, এমন মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থগণও এবার পেটের দায়ে মজুরী করিতেছে। কিন্তু মজুর খাটাইবার মত অর্থ অনেকেরই নাই। ধান, চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্য।

"অন্নক্লিষ্ট লোকদের সংবাদ আমি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিলাম। [স্থানাভাবে নামগুলি ছাপাইলাম না। —প্রবাসী-সম্পাদক]

"আর কত নাম করিব? যাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছি, কেবল তাহাদের নামই এস্থলে উল্লেখ করিলাম। অনেকে ২।৩ দিনে দু'এক বেলা খাইতে পায়; তাহাও অনিয়মিত ও বিরুদ্ধ আহার বলিয়া অনেকে উদরাময়, জ্বর, আমাশয় ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। পয়সার অভাবে না চলে পথ্য, না চলে চিকিৎসা।

"গজরা মধ্যইংরাজিস্কুলের ছাত্র দেবেন্দ্র পোদ্দার, সুরেন্দ্র দে, হেরম্ব বীর, গোবিন্দ ভাওয়াল, সেরাজুল ..., রাইচরণ নাথ, আবদুল রহিম, হাচন আলি; রজ্জব অ..., শশী দে, এবং অমুয়াকান্দীনিবাসী চাঁদপুর হাইস্কু... ছাত্র বক্স আলি ও ছৈয়দ হোসেন অর্থাভাবে ... পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

"অন্নক্লিষ্ট লোকদিগকে গ্রামের লোকগণ সাহ... করিতেছে না। ক্বচিৎ দুই একজনের সাহায্য করি... ক্ষমতা আছে; কিন্তু তাহারা কি করিবে? গবর্ণমে... কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই।

"গ্রামে চুরির সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। টরকীকা... নিবাসী শ্রীসহর আলির নগদ ১০০৲ টাকা, গজরানিব... শ্রীকমল সাহার ১০৲ টাকা ও গজরার পোষ্টম... শ্রীপূর্ণচন্দ্র মালীর ৪ খানা বারানসী শাড়ী, একখ... সোনার বাজু ও নগদ ১০৲ টাকা চুরি যায়। পু... তদন্তে কোনই ফল হয় নাই। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ... অনেক হইতেছে। এখানে বিষপ্রয়োগে গো-হ... চলিতেছে। শত্রুতা করিয়া নয়, গোহত্যা করতঃ উ... চামড়া বিক্রী করিয়া কিছু পাইবার আশায়। যেস্থ... বিষ প্রয়োগের সুবিধা হয় না, সেস্থলে গরু চুরি করি... নিয়া কাটিয়া ফেলে, এবং চামড়া লইয়া যায়।

"মোটামোটিভাবে আপনার সবকথারই উত্তর দিলা... আপনি একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জানি... চাহেন নাই, উহা এদেশের টাকার সুদের কথা। এ... মহাজনদের ঘরে টাকা নাই। থাকিলেও কেহ দরিদ্র... ধার দেয় না, সম্পত্তিশালী লোকদিগকেই দেয়। এ... শস্য বপন করিবার সময় আসিয়াছে। এসময় গৃহ... টাকার খুব দরকার। তাহারা সোনারূপার অলঙ্কারা... বন্ধক রাখিয়া ঋণ করিতেছে; কিন্তু সুদের দর শতক... মাসিক ৬।০—১২।৷০ টাকা। এইরূপ কড়া সুদেও য... যথেষ্ট টাকা মিলিত, তবুও লোকের একটা পথ থাকিত... কিন্তু ভগবান এবার দুঃস্থের প্রতি বিরূপ।"

বাজাপ্তী হইতে শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহা... লিখিয়াছেন:—

"আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যে-সমস্ত বিষ...

জানিতে চাহিয়াছেন, আমি নিজে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ৮ নম্বর বাজাপ্তী ইউনিয়ান হইতে সেই-সমস্ত বিষয়ের যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই অতি সংক্ষেপে আপনাকে জানাইতেছি।

"চাউলের দর বর্ত্তমান সময় ৫॥০ টাকা হইতে ৬।০ টাকা, বিগত বৎসর এই সময়ে ৪ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। ডাল, তরকারী ইত্যাদির দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে; পাটের দর গত বৎসর ৬৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু এ বৎসর ॥০ আনা হইতে ৩॥০ টাকা; তাহারও আবার খরিদ্দার বেশী নাই। লোকে পেটের দায়ে সস্তা দামেই পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। এখন ত ভয়ানক অর্থাভাব এবং তজ্জনিত অন্নাভাব উপস্থিত। এই ইউনিয়নের শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোকের দু'বেলা অন্নের সংস্থান হইতেছে না। জ্বর, কলেরা, আমাশয়, পেটের অসুখ ইত্যাদি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর প্রচুরপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পরিমাণ প্রায় দেড়গুণ বাড়িয়াছে। বস্ত্রাভাবে অনেক লোকে শীতে কষ্ট পাইতেছে।

"এই ইউনিয়ানের বহু ছাত্র অর্থাভাবে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছে ও গ্রাম্য পাঠশালাতে অর্দ্ধেকের বেশী ছাত্রের বেতন আদায় করিতে পারা যাইতেছে না। বাজাপ্তী মধ্যইংরাজীস্কুলের প্রায় ৬০ জন ছাত্র বেতন দিতে অক্ষম হওয়ায় স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। (এই সমস্ত ছাত্রের নামের লিষ্ট কালীমোহন বাবু আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে ঐ লিষ্ট দেওয়া গেল না।) কাটাখালি উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালায় প্রায় ১০০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত, এখন ঐ পাঠশালায় ১৫।১৬ জনের বেশী ছাত্র নাই।

"অন্নক্লিষ্ট লোকদিগকে সাহায্য করিবার শক্তি এদিকের অতি অল্প লোকেরই আছে। কারণ, কৃষকগণ জমীদারের খাজনা এবং মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায় জমীদার, তালুকদার, মহাজন, সকলেরই অর্থাভাব উপস্থিত। গবর্ণমেণ্ট এযাবৎ কোনপ্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করেন নাই।

"হানারচর গ্রামের ছৈয়দ আলীর চৌদ্দবৎসরবয়স্কা কন্যা জায়েলা খাতুন তিন দিন অনাহারে থাকিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

"চুরি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকের ক্ষেত্র হইতে পাকা ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, এবং বাগান হইতে সুপারী চুরি করিয়া লইতেছে। হানারচরনিবাসী ডাক্তার শ্রীকালীচরণ মজুমদারের ক্ষেত্র হইতে ৮।১০ মণ, শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তীর ক্ষেত্র হইতে ১০।১২ মণ এবং শ্রীরমণীমোহন মজুমদারের ক্ষেত্র হইতে ৪৫ মণ পরিমাণ ধান্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। সাদুল্লাপুর গ্রামের শ্রীহরিশচন্দ্র নাথের বাগান হইতে সুপারি চুরি হইয়াছে। মুকুন্দি গ্রামের একটি হিন্দুপরিবারের রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ভাত লইয়া গিয়াছে; ঘরের দাওয়াতে লিখিয়া গিয়াছে—"আমি হিন্দু, তোমাদের জাতি যাওয়ার আশঙ্কা নাই।" এইপ্রকার আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।"

বাংলাসাহিত্য ও সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা।

বাংলাসাহিত্য যাঁহাদের চেষ্টা ও মানসিক শক্তির ফল, তাঁহারা বিশেষ কোন একটি গ্রামের সহরের বা জেলার লোক নহেন। তাঁহারা বঙ্গের নানা জেলা, নানা সহর ও গ্রামের অধিবাসী। তাঁহারা কেবল পুরুষ কিম্বা কেবল নারী নহেন; গ্রন্থকারদের অধিকাংশ পুরুষ হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে অনেক নারীও আছেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি ও গভীরতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখিকার সংখ্যাও বাড়িতেছে। কেবল পুরুষেরা লিখিলে যাহা হইত, নারীরা লেখনী ধারণ করায় তাহা হইতে স্বতন্ত্র নূতন জিনিষ কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস যেমন বাড়িতে থাকিবে, তাঁহারা তেমনি কেবল পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে না লিখিয়া স্বাধীন ভাবে লিখিতে থাকিবেন; এবং তাহা হইলে বাংলাসাহিত্যে নূতন সম্পদ সঞ্চিত ও নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইবে। বাঙালী গ্রন্থকারেরা কেবল হিন্দু বা মুসলমান নহেন; কেবল শূদ্র নহেন, বা দ্বিজ নহেন; কেবল ব্রাহ্মণ, বা বৈদ্য বা কায়স্থ নহেন। অন্যান্য জাতির লোকও ভাল বহি লিখিয়াছেন। যাঁহারা যে পরিমাণে

শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা সেই পরিমাণে সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

মানুষ হৃদয়ে যে রস আস্বাদন করে, মনে যে তত্ত্ব আবিষ্কার ও উপলব্ধি করে, যেসব তথ্য সংগ্রহ করে, তৎসমুদয় সাহিত্যভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া পাঠক ও শ্রোতাদের আনন্দ ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। খুব বেশী প্রতিভাশালীও হইলে একজন মানুষ বা একশ্রেণীর মানুষ নিখিল বিশ্ব, মানবপ্রকৃতি বা মানবজীবন হইতে সাহিত্যের সমুদয় উপাদান আকর্ষণ বা সংগ্রহ করিতে পারে না। যত বেশী শ্রেণীর লোক সাহিত্যের সেবা করিবে, সাহিত্য ততই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইবে। যাহারা প্রকৃতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকে, জীবনসংগ্রামের কঠোরতা সাক্ষাৎ ভাবে অনুভব করে, তাহারা যদি আপনাদের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে ঢালিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সাহিত্যে যে বাস্তবতা, যে প্রাণের সঞ্চার হয়, নাগরিকের আরামপূর্ণ জীবন হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। সত্য বটে, অবিরাম হাড়ভাঙ্গা খাটুনি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে অনেক সময় অসাড় করিয়া দেয়; কিন্তু কি মাত্রায় শ্রম করিলে এরূপ কুফল ফলে তাহা বলা যায় না। দারিদ্র্য ও শারীরিক শ্রমের সহিত সাহিত্যিক প্রতিভার একান্ত বিরোধ নাই; উভয়ের একত্র অস্তিত্ব পৃথিবীতে বিরল নহে। আমাদের বনের কাঠুরিয়া, সুন্দরবনের ও নদীর চরের চাষী, আমাদের পদ্মা মেঘনার মাঝি মাল্লা, আমাদের সমুদ্রগামী লস্কর, ইহাদের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে এখনও স্থান পায় নাই। ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত কয়েকটি শ্রেণীর লোক ছাড়া অপরাপর শ্রেণীর লোকে এখনও সাহিত্যসেবায় বিরত আছেন। নারীর নিজের কথা সাহিত্যে খুব অল্পই ব্যক্ত হইয়াছে। মুসলমানের একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা, উৎসাহ ও শক্তি এখনও বাঙ্গলা সাহিত্যকে বলিষ্ঠ ও তেজোদীপ্ত করে নাই।

বাংলা সাহিত্য এখন যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে কিয়ৎপরিমাণে আত্মপ্রসাদের কারণ হইলেও, উহা রসের বা কাব্যের দিক্ দিয়া যেরূপ পুষ্ট হইয়াছে, তত্ত্ব ও তথ্যের দিক্ দিয়া সেরূপ হয় নাই। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, প্রভৃতি, বিদ্যার নানা শাখায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বড় কম, অনেক শাখায় একবারেই নাই। সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সমুদয় শ্রেণীর লোকদের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত আমাদের সাহিত্য কখনও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, বৈচিত্র্যপূর্ণ, সুপুষ্ট ও শক্তিশালী হইবে না। সাহিত্যের সেবায় সকল রকমের লোককে লাগাইতে হইলে সকলকেই সাহিত্যরস আস্বাদনে অধিকারী করিতে হইবে। তজ্জন্য সকলকে লিখিতে ও পড়িতে শিখান দরকার। উচ্চতর শিক্ষায় যাঁহার আগ্রহ হইবে, তিনি তাহার জন্য চেষ্টিত হইবেন, এবং ক্রমশ তাহার ব্যবস্থাও হইবে। আপাতত ভিত্তি স্থাপিত হউক। পুরুষ নারী ছেলে বুড়ো সকলকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইবার চেষ্টা দেশের সর্ব্বত্র হউক। অক্ষর চিনাইবার বহির জন্য কয়েকটি পয়সা এবং অক্ষর চিনাইবার ও চিনিবার জন্য প্রত্যহ কয়েক মিনিট সময় দিলেই কয়েক মাসের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক লিখন পঠনে সমর্থ হইয়া উঠিবে।

একজন নূতন চিত্রকর।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সোম বোম্বাইয়ের সার জামষেদজী জীজীভাই শিল্পবিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর চিত্রবিদ্যা

একটি রাস্তার দৃশ্য।

শিক্ষা করেন। তিনি কৃতিত্বের জন্য তথায় অনেকগুলি পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করেন। তথাকার শিক্ষা শে

করিয়া ১৯১২ সালের মেয়ো পদক প্রাপ্ত হন। তিনি কালী কলমের সাহায্যে রেখা দ্বারা ছবি আঁকা বিশেষরূপে অভ্যাস করিয়াছেন। এইরূপ ছবির বিলাতেও পূর্ব্বে আদর ছিল না, ভারতবর্ষে এখনও লোকে বুঝিতে পারে না যে এরূপ ছবি আঁকিতে হইলে কিরূপ দক্ষতার প্রয়োজন। সচিত্র সংবাদপত্রের প্রচলন এবং নানাবিধ পুস্তক চিত্রিত করার প্রয়োজন হওয়ায় পাশ্চাত্য নানাদেশে এরূপ ছবির আদর হইয়াছে। এই প্রকারের অনেক চিত্রকর, তৈলচিত্র বা জলচিত্র যাঁহারা আঁকেন, তাঁহাদের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। মানুষকে বা প্রাকৃতিক দৃশ্যকে এমন করিয়া দেখা খুব সোজা নয়, যে দেখার ফল কেবল রেখার দ্বারা অপরের দৃষ্টিগোচর করা যায়। এরূপ ছবি আঁকার দিকে ভারতবর্ষীয় চিত্রকরেরা অল্পই মন দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সোমের আঁকা কতকগুলি ছবি বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা আদৃত হইয়াছে। আমরা তন্মধ্যে দুখানির প্রতিলিপি এখানে মুদ্রিত করিলাম।

তরমুজ-বিক্রেতা।

লাহোরে চিত্রপ্রদর্শনী।

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একজন ছাত্র। তিনি কিছুকাল হইতে লাহোরের মেয়ো স্কুল অব্ আর্টের সহকারী প্রিন্সিপ্যালের কাজ করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার উদ্যোগে লাহোরে একটি চিত্রপ্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। উহাতে কলিকাতার নবীন চিত্রকর সম্প্রদায়ের অনেক ছবি, পঞ্জাবের পুরাতন অনেক ছবি, সমরেন্দ্র বাবুর নিজের কয়েকটি ছবি এবং তাঁহার ছাত্রদের কতকগুলি ছবি প্রদর্শিত হয়। মেয়ো স্কুল অব্ আর্টের প্রিন্সিপ্যাল হীথ সাহেব কলিকাতার নূতন সম্প্রদায়ের ছবির প্রশংসা করেন এবং বলেন যে ইহাঁদের প্রবর্ত্তিত নূতন প্রথা চিরজীবী হইবে। সমরেন্দ্রবাবুর ছাত্রেরা যে তাঁহার নিকট অল্পকাল শিক্ষা পাইয়াই শক্তির পরিচয় দিতেছে, ইহাও তিনি বলেন। পঞ্জাবের ছোটলাটও উক্ত প্রকার প্রশংসা করেন। তিনি সমরেন্দ্রবাবুর ছাত্রদিগকে কলিকাতার সম্প্রদায়ের নকল না করিয়া তাহা হইতে অনুপ্রাণনা লাভ করিতে উপদেশ দেন। ইহা সদুপদেশ। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে দেশী চিত্রকলার স্বাধীন বিকাশ আনন্দের বিষয়।

রোগের প্রাদুর্ভাব ও দাতব্য চিকিৎসালয়

সমস্ত বাংলাদেশকে ম্যালেরিয়া জ্বর ও অন্যান্য রোগে যেরূপ ছাইয়া ফেলিয়াছে, এবং দেশ যেরূপ দরিদ্র ও চিকিৎসকের সংখ্যা দেশে যেরূপ অল্প, তাহাতে সর্ব্বত্র দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অভাব এত বেশী যে মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের উপর এই কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে

না। বড় বড় জমীদারেরা এবং অন্যান্য ধনী লোকেরা এই ভাবে জনসেবা করিলে তাঁহারাও ধন্য হন এবং দেশবাসীও উপকৃত হয়। সম্প্রতি দশঘরানিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ রায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দশঘরা ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকদের উপকার করিয়াছেন। তিনি নিজের ব্যয়ে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাতে দিয়াছেন, এবং যাহার সুদ হইতে চিকিৎসালয় চালাইবার আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে, এরূপ টাকাও বোর্ডের হাতে দিয়াছেন। এসব ডিস্পেন্সারীতে সচরাচর সব্-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনরা কাজ করেন। বিপিন বাবু এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাখাইবার জন্য তাঁহার বেতনের নিমিত্ত অতিরিক্ত টাকাও মাসে মাসে দিবেন। তা ছাড়া তিনি চিকিৎসালয়ে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য কয়েকটি "শয্যার" ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি ধনী লোক। যদি এরূপ টাকা দান করেন, যে তাহার সুদ হইতে সমস্ত ব্যয় চিরকাল নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার এই সুকীর্ত্তিটি স্থায়ী হয়, এবং বংশানুক্রমে লোকে উপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নাম করে। তিনি একটি ঝিল কাটাইয়া তাহার জল শোধন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে ব্যবহার করিতে দেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত সমুদয় ধনী ব্যক্তির অনুকরণীয়।

পেটেণ্ট ঔষধ

দেশের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে, শিক্ষিত চিকিৎসকের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে না বাড়া পর্য্যন্ত, ভাল পেটেণ্ট ঔষধেরও প্রয়োজন রহিয়াছে।এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে কোন প্রকার চিকিৎসক বা চিকিৎসালয় নিকটে নাই। তথায় অনেক রোগী ভাল পেটেণ্ট ঔষধ পাইলে বাঁচিয়া যাইতে পারে। কিন্তু একটি এরূপ আইন হওয়া উচিত যাহাতে প্রত্যেক পেটেণ্ট-ঔষধ-ব্যবসায়ী ঔষধের শিশির বা কৌটার গায়ে উহার সমুদয় উপাদানগুলির নাম ছাপিয়া দিতে বাধ্য হইবে। গবর্ণমেণ্টনিযুক্ত রাসায়নিক পরীক্ষক সকল ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে উল্লিখিত উপাদান ছাড়া আর কিছু জিনিষ উহাতে আছে কি না, কিম্বা কোন বিষ বা অপ হানিকর পদার্থ উহাতে আছে কি না। ব্যবসায়ী বর্ণনা মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রমাণ হইলে তাহার ে ঔষধ বিক্রয় করিবার অধিকার লুপ্ত হইবে। এরূ আইনে কোন কোন লোকের টাকা রোজগারের পথ ব বা সংকীর্ণ হইবে বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপকা হইবে। এখন যা তা ঔষধ খাইয়া অনেকের অর্থনাশ ও স্বাস্থ্যনাশ হয়।

স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বাস করিতেছেন। যখন দূরপ্রদেশে যাওয় এখনকার মত অল্পব্যয়-ও-সময়সাধ্য বা নিরাপদ ছিল না, তখন ভিন্ন প্রদেশে কোথাও বাঙালীরা স্থায়ী বসবাস করিলে অনেক সময় পুরা বাঙালীও থাকিতেন না, কিম্বা প্রতিবেশীদের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যাইতেও পারিতেন না। সে অবস্থায় বাঙালীর ছেলেমেয়েকে বাঙ্গলা সাহিত্য এবং বাঙালী চালচলন ও চিরাগত সংস্কারের সহিত পরিচিত রাখার খুব প্রয়োজন ছিল। এখনও এরূপ প্রয়োজন আছে। সে কালে যাঁহারা এরূপ প্রয়োজন বুঝিয়া বঙ্গের বাহিরে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙালীর বিশেষ উপকার করিয়াছেন। যাঁহারা এখনও এইরূপ বন্দোবস্ত কায়েম রাখিয়াছেন তাঁহারা কৃতজ্ঞতার পাত্র। ত্রিশ বৎসরেরও পূর্ব্বে প্রয়াগে বাঙালীর ছেলেদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উহাতে অল্পস্বল্প ইংরেজী এবং তাহার সঙ্গে বাংলা শিখান হইত। উহা এখন এংলো-বেঙ্গলী স্কুল নামে পরিচিত। উহা যখন স্থাপিত হয়, তখন হইতে বহুবৎসর পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উহা এণ্ট্রেন্স্ স্কুলে পরিণত হইবার পরও অনেক বৎসর মহেশবাবু উহাতে কাজ করিয়াছিলেন। সুশিক্ষক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তির আলোক-চিত্র এংলো-বেঙ্গলী স্কুলের হলে রক্ষিত আছে। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি প্রয়াগেই বাস করিতেছিলেন।

সম্প্রতি তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃব্য ছিলেন। এংলোবেঙ্গলী স্কুলের তত্ত্বাবধান ও উৎকর্ষসাধন-কার্য্য একটি কমিটির দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় স্কুল-গৃহ, স্কুলের ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রভৃতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন।

স্বর্গীয় ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

হায়দারাবাদের নিজামের শিক্ষাবিভাগে বহুবৎসর উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিয়া ও তৎপরে অবসর গ্রহণ করিয়া গত কয়েকবৎসর শ্রীযুক্ত ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি হঠাৎ হৃদ্‌-রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথমে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস্‌সী, অর্থাৎ বিজ্ঞানাচার্য্য উপাধি লাভ করেন। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইংরাজী ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া এবং বাগ্মিতার জন্য যশস্বিনী হইয়াছেন।

ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষদের বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলার পাটুলীগ্রামে, তাহার পর তাঁহারা বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁয়ে গিয়া বসবাস করেন। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে সুপণ্ডিত ছিলেন। অঘোরনাথ চারি ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন। সকলেই শিক্ষাদান কার্য্যে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় ভ্রাতা ঢাকায় গণিতের অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেকটর হইয়াছিলেন। অঘোরনাথ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে খ্যাতির সহিত এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, ৺ রজনীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত, প্রভৃতির সহপাঠী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই কৃতী ছাত্র ছিলেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী হইতে অঘোরনাথ ও শ্রীনাথ গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। অঘোরনাথ সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষা এবং কুপার্স্ হিলের এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষা দেন। কিন্তু প্রস্তুত হইতে কয়েকমাস মাত্র সময় পাইয়াছিলেন বলিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। তথাপি সিবিল সার্বিসে সংস্কৃতে প্রথম স্থান এবং কুপার্স হিলের পরীক্ষায় গণিতে প্রথমস্থান অধিকার করেন। ইহার পর তিনি রসায়ন পড়িবার জন্য এডিনবরা যান। তাঁহার অন্যতম অধ্যাপক ক্রাম্ ব্রাউন এখনও বাঁচিয়া আছেন, এবং প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া ভারতীয়দের নিকট এখনও তাঁহার গল্প করেন। অঘোরনাথের দ্বিতীয়া কন্যা মৃণালিনী এখন বি, এস্‌সী, পরীক্ষার জন্য কেম্ব্রিজে পড়িতেছেন। তিনি যখন পিতৃ-শিক্ষাক্ষেত্র ও পিতৃগুরুদর্শনার্থ এডিনবরায় তীর্থযাত্রা করেন, তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন তাঁহার সহিত অতিশয় সস্নেহ ব্যবহার করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এডিনবরার বি, এস্‌সী পরীক্ষায় গুণানুসারে প্রথমস্থান অধিকার করেন, এবং পদার্থবিজ্ঞানে ব্যাক্‌সটার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাহার পর তিনি কিছু গবেষণা করেন, এবং রসায়নের এক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া হোপ পুরস্কার (Hope Prize) প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় তাঁহার প্রতিযোগীদের মধ্যে এডিনবরা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। অতঃপর তিনি জার্ম্মেনীতে নানা বিজ্ঞান শিক্ষা করেন এবং বেঞ্জিন যৌগিক পদার্থসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। জার্ম্মেনীতে আঠার মাস থাকিয়া এডিনবরা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তথাকার ডি এস্‌সী উপাধি লাভ করেন।

ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার পরই তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের শিক্ষার উন্নতির জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহার উদ্যোগে নিজাম কলেজ এবং বালক ও বালিকাদিগের নিমিত্ত অনেকগুলি স্কুল স্থাপিত হয়। তিনি পেশী দপ্তরেও (Peshi office) কিছু দিন কাজ করিয়াছিলেন। হায়দরাবাদে কয়েক বৎসর যাপিত হইবার পর কতকগুলি লোক তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তথা হইতে তাঁহার নির্ব্বাসন ঘটায়। কিন্তু তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে সমর্থ হন। ষড়যন্ত্রকারীরা হায়দরাবাদ হইতে তাড়িত হয়, এবং তিনি সাদরে নিজামের রাজধানীতে

পুনরাহুত হন। তাঁহার পুনরাগমনে তথায় একটা উৎসবের মত ব্যাপার হয়।

কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে ডাক্তার অঘোরনাথ হায়দরাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া যখন কলিকাতা আগমন করেন, তখন এখানে গ্রেষ্ট্রীটে ইউনিভার্সিটী স্কুল স্থাপন করেন। উহা পরে ইউনিভার্সিটী কলেজে পরিণত হয়। অঘোরনাথ নিজাম কর্ত্তৃক পুনরাহুত হওয়ায় ইউনিভার্সিটী কলেজটি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিক্রয় করিয়া যান, এবং তাহা মেট্রপলিটান কলেজের সহিত একীভূত হয়।

হায়দরাবাদ হইতে পেন্সান লইয়া আসিয়া তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। এখানে তিনি কিছুকাল সিটিকলেজে অবৈতনিক বিজ্ঞানাধ্যাপকের কাজ করেন।

ইউরোপে সেকালে কোন কোন অনুসন্ধিৎসু লোক নিকৃষ্ট ধাতু সকলকে, কিরূপে স্বর্ণে পরিণত করা যায়, তাহার উপায় আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের শ্রম ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, উহা হইতে অনেক রাসায়নিক আবিষ্কার হইয়াছিল। নব্য রসায়নী বিদ্যার পূর্ব্বগামিনী এই বিদ্যা ইংরেজীতে আল্‌কেমী নামে পরিচিত। যাঁহারা এই বিদ্যার অনুশীলন করিতেন তাঁহাদিগকে আল্‌কেমিষ্ট বলা হইত। ডাক্তার অঘোরনাথ আধুনিক রসায়নী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াও আল্‌কেমীর চর্চ্চা করিতেন। অন্যান্য ধাতুকে সোনা করিবার নূতন কোন একটা প্রক্রিয়ার কথা যে কেহ বলিত, সেই তাঁহার নিকট আদৃত হইত। এই সব প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বরাবর তাঁহার গৃহে হইত। এই জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক তাঁহাকে পরিহাস করিতেন, এবং তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়াছে মনে করিতেন; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস অটল ছিল। আমাদের দেশের অনেক সাধু সন্ন্যাসীর এইরূপ বিশ্বাস আছে, এবং কোন কোন শিক্ষিত লোক এরূপ গল্প করেন যে তাঁহারা স্বচক্ষে সন্ন্যাসীবিশেষকে সোনা প্রস্তত করিতে দেখিয়াছেন। আমরা বৈজ্ঞানিক নহি। আমাদের নিকট ব্যাপারটি অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এখনও উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই, এই যা।

ডাক্তার অঘোর নাথ যৌবনে কেশবচন্দ্র সেনের চরিত্র ও উপদেশের প্রভাবে তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত সহপাঠীদিগে[র] সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি স্বাধীনচে[তা] মনখোলা সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন[।] ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা ভিখারীকেও তিনি নিজের সঙ্গে এ[ক] টেবিলে খাওয়াইতেন। হায়দরাবাদে তাঁহার গৃহে নি[ত্য] এক দরবারের মত হইত। তাহাতে হিন্দু মুসলমা[ন] রাজা ও ভিখারী, সাধু ও দুর্বৃত্ত সকলের সঙ্গে সমানভা[বে] বৈঠক চলিত। জীবনের বহু বৎসর মুসলমান রা[জ্যে] যাপিত হওয়ায় তাঁহার পোষাক ও আদবকায়দা মুসলমা[নী] ধরণের হইয়া গিয়াছিল। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলে[ন] এবং দাক্ষিণাত্যের শিবগঙ্গা সমাস্থান হইতে বিদ্যার[ত্ন] উপাধি পাইয়াছিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের বৃত্তান্ত কটকের ষ্টা[র] অব্ উৎকল নামক ইংরেজী সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলি[ত] হইল।

আগেকার কালে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে যো[গ্য] বাঙ্গালীদের এমন কার্য্যক্ষেত্র জুটিত, যেখানে তাঁহা[রা] দেশের কল্যাণ করিতে পারিতেন এবং আপনাদে[র] শক্তিরও পরিচয় দিতে পারিতেন। এখন দুটি কারণে ব[ঙ্গের] বাহিরে বাঙ্গালীর কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে[।] প্রথমতঃ, অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা পাশ্চা[ত্য] বিদ্যায় উন্নতি করিতেছেন। ইহাতে কাহারও অসন্ত[ুষ্ট] হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় কারণটি অন্য প্রকারের[।] বাঙালী মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে গিয়া মানুষের যা[হা] পাওনা, তাহা দাবী করিয়াছে এবং বুঝিয়া পড়িয়া লই[তে] চাহিতেছে। ইহাতে ভারতে যাহাদের প্রভুত্ব তাহার[া] বিরক্ত হইয়াছে; তাহারা অর্থাৎ ভারতপ্রবাসী ইংরেজে[রা] বাঙ্গালীকে দেখিতে পারে না। তাহাদের সাক্ষা[ৎ] ও পরোক্ষ চেষ্টায় বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কাজ কর[া] পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে দুঃখিত [বা] ভগ্নোৎসাহ হইলে চলিবে না। দামী জিনিষ বিনামূ[ল্যে] পাওয়া যায় না। যে মানুষ হইতে চায়, তাহাকে কো[ন] না কোন আকারে তাহার মূল্য দিতে হয়। বাঙ্গালীর যদি কখন মনুষ্যত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে দেখি[তে] পাইবেন, বিধাতা তাহার পূর্ণ মূল্য কড়ায় ক্রান্তি[তে] আদায় করিয়া লইয়াছেন।

শিক্ষার আদর্শ

এক সময় একজন অতি উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান সময়ে যে ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া সমস্ত শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি আমাদের নিকট প্রচারিত হইতেছে ইহা দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইতেছে কি না ?

বহু বর্ষের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও যে ভাষাটি আমাদের এমন আয়ত্ত হয় না যে তাহা আমরা স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে প্রয়োগ করিতে পারি, সেই ভাষা দ্বারাই আমাদের সমস্ত শিক্ষার উৎপত্তি স্থিতি ও বিস্তারের ব্যবস্থা করাতে আমাদের শক্তির কতকখানি অযথা অপচয় হইতেছে কি না ইহা বাস্তবিকই বর্ত্তমান শিক্ষা-সমস্যার একটি দুরূহ প্রশ্ন। এই ভাষা-সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষা-প্রবাহের গতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও কতকগুলি প্রশ্ন সহজেই মনে উঠিয়া থাকে। যদি অল্প সময়ের মধ্যে কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারিত তাহা হইলে যে-ভাষায় সহজে শিক্ষা করা যায় সেই ভাষায় তাড়াতাড়ি সংবাদগুলিকে আয়ত্ত করাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইলেই শিক্ষা-সমস্যার কার্য্যকর উত্তর দেওয়া হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত। কিন্তু শিক্ষা বলিতে যদি মানুষকে মানুষ করিয়া তোলা বুঝায় তবে ভাষা-সমস্যাটির সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে বিষয়গুলি ছাত্রকে শিখান হইতেছে সেগুলি তাহার জ্ঞানবৃত্তি ও রসবৃত্তির সম্যক্ উন্মেষ-সাধন করিতে পারিতেছে কি না ? মানুষের অন্তরতম নিবিড় স্থানে এমন একটি কেন্দ্র আছে, যেখানে তার শক্তিকে সংহত করিতে পারিলে, তাহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া তাহার মানবতার পরিধি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সমষ্টিটিকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু শক্তি এই কেন্দ্রে সংহত না হইয়া যতই তাহা হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ দূরে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, ততই তাহা মানুষের সমষ্টির বিকাশসাধন না করিয়া তাহার শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া কেবলমাত্র তাহার অঙ্গ-বিশেষেরই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এরূপ শিক্ষা মানুষকে উন্নত করা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ তাহাকে পীড়িত করিয়া তাহার জীবনীশক্তির হ্রাস করিয়া ফেলে। শরীরের স্বাস্থ্য যেমন শরীরের আনন্দে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি মানুষের শিক্ষাও তার আনন্দের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে যখন শিষ্যবর্গ গুরু-গৃহে অধ্যয়ন করিতে যাইত, তখন তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ, তাহাদের শিক্ষার বিষয়, তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে তাহার মর্ম্মকেন্দ্রে এমন একটি আনন্দের আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল যাহা ছাত্রদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে একটি আনন্দময় গ্রন্থিতে পরস্পর আবদ্ধ করিয়া শতদলের ন্যায় রূপে ও গন্ধে প্রচুর করিয়া ফুটাইয়া তুলিত। তখন সমাজ-পাদপটির স্বাভাবিকতা সজীবতা ও সরসতা এমনই সুরক্ষিত ছিল যে তাহার ভিতরকার মানুষগুলি যখন ফুটিয়া উঠিত তখন তাহারা মানুষের যথার্থতা ও স্বার্থকতা লইয়াই ফুটিয়া উঠিত। আপন স্বাভাবিক মনুষ্যত্বকেই তাঁহারা আপনাদের চরম-সাধনার ধন বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা প্রেমকে জয় করিয়া প্রেমের উপরে আপনাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং সুখের উচ্ছৃঙ্খলতা অবহেলা করিয়া মুক্তির পরমানন্দের মধ্যে আপনাদের লীলাকুঞ্জ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

কালে যে পরিবর্ত্তন আমাদের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে তাহা সংগ্রহ করিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে গোড়া হইতেই শিক্ষার যথার্থ আদর্শকে বিকৃত করিয়া দেখার মধ্যেই তাহার সমস্তটাই প্রতিফলিত হইতেছে। মানুষকে যথার্থ ভাবে মানুষ হইতে হইবে, এই শিক্ষাটা আর এখন চরম উপায় বলিয়া গ্রহণ করা হয় না, বরং সমস্ত শিক্ষা-ব্যাপারটাকেই কেবলমাত্র ধনাগমের ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য সুযোগবিশেষের উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়। ছেলেবেলা হইতেই বালকদিগকে একটি কলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেখানে সমস্ত প্রকারের স্বতন্ত্রতা ও স্বাভাবিকতা বর্জ্জন করিয়া সেই কলের যান্ত্রিক আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া তাহারা ক্রমশঃ পিষ্ট হইতে থাকে ও পরিশেষে ছাঁকনী-যন্ত্রে ফেলিয়া কোন্‌গুলি কিরূপ গুঁড়া হইয়াছে তাহারই পরীক্ষা লওয়া হয় এবং সেই অনু-

সারে প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বরের মার্ক দিয়া লেবেল করা হইয়া থাকে। এই যান্ত্রিক প্রাণহীন ব্যাপারের প্রথম আরম্ভেই তাহাদিগকে মাতৃভাষার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া আনিয়া, যাহার সহিত তাহাদের সহজ আনন্দের কোনও বন্ধনই নাই এমন এক অপরিচিতার হাতে সঁপিয়া দেওয়া হয় এবং আপনার মার কথা একটুও মনে না করিয়া যাহাতে এই অপরিচিতার দুগ্ধকেই চিরদিনের জন্য জীবনের সম্বল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য ভ্রুকুটি ও প্রহারের উদার ব্যবহারের কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। কাঁদিয়া কাটিয়া যতটা সে ফেলিয়া দিতে পারে ফেলিয়া দেয়, আর বাকী যতটা তাহার হাত পা চাপিয়া ধরিয়া ঝিনুকের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ কণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া কোনও মতে গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য করা যায়, তাহা কোনওক্রমে গিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। তাহার কতটা হজম হয় জানি না, তবে অনেকটাই যে উদরাময়ের তীব্র বেদনায় পরিণত হয়, সে পক্ষে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ পাওয়া যায় না। এই রকমে বালকের মাথা ও পেট যতই উত্তরোত্তর স্ফীত হইতে থাকে, তাহার পা ও হাত ক্রমশই অগ্রভাগের দিকে ততই সরু হইতে থাকে। ইহার চরমসীমায় কোনও রকমে আনীত হইলে ছাত্রের পাশ-লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্যে তাহার মুখশ্রী একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া যায়, এবং তাহার চক্ষুও বাহিরের জগত হইতে আপনাকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আপনার চারিদিকে একটা প্রস্তরের আড়াল সৃষ্টি করিয়া লয়। ছেলে জন্মিতে-জন্মিতেই একটা ভবিষ্যৎ হাকিমের চিত্র আসিয়া পিতার মনকে আনন্দে নাচাইয়া তোলে, এবং কি করিয়া ২৫ বৎসরের মধ্যে হাকিমোপযোগী সর্ব্ববিধ বিদ্যা তাহার আয়ত্তে আসিতে পারে, তাহা ভাবিয়া পিতারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পাঁচবৎসর গত হইতে-না-হইতেই বি এল এ = ব্লে আরম্ভ হইয়া যায়, এবং তাড়াতাড়ি 'কী'-গুলি মুখস্থ করিয়া কোনও রকমে ফার্ষ্ট বুক সেকেণ্ডবুক-গুলির উপর দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পড়ি-কি-মরি-গোছের এমন একটা দৌড় ছাড়িতে হয় যে দার্জ্জিলিং মেল ধরিবার তাড়াতাড়ি তাহার কাছে কোথায় লাগে।

অন্য দেশের ছেলেরা যে সময়ে আপনাদের খেলাধূলা উজ্জ্বল আনন্দে বিভোর থাকিয়া বাপ মা ভাই বোনে[র] সঙ্গে মিলিয়া চারিদিকের ছোট ছোট জিনিষগুলি[র] সঙ্গে আপনাদের একটা রসের সম্বন্ধ সহজেই ঘনাই[য়া] তোলে, আমাদের দেশের ছেলেরা হয়ত তখন [...] পা আড়াই হাত আন্দাজ ফাঁক করিয়া দাঁড়াই[য়া] দাঁড়াইয়া সমস্ত জীবনীশক্তিকে সংহত করিয়া 'ভে[...] টুডিলেরিয়ান' শব্দের বানান ও অর্থ মুখস্থ করিতে[ছে]। অন্যদেশের ছেলেরা স্কুলে যায় না বা পড়ে না ত[াহা] নয়, তবে তাহাদের পড়াই অনেকটা খেলা এবং তাহা[দের] খেলাই অনেকটা পড়া। তাহাদের ঘরে বাহি[রে] খেলার মাঠে, গোলাবাড়ীতে, বরফের উপর, চেরিগা[ছ] তলায়, ঝরণার পাশে তাহারা সকল সময়ে যে-স[মস্ত] জিনিষ দেখে, সেইগুলির বিষয় যখন তাহারা তাহাদে[র] নিজের ভাষায় লিখিত ছোট ছোট বইতে প[ড়ে] তখন তাহাতে তাহাদের সেই-সমস্ত পরিচিত জি[নিষ]-গুলির সঙ্গেই যেন তাহাদের ঘনিষ্ঠতাকে আরও বাড়া[ইয়া] তোলে, সেগুলি শিখিতে তাহাদের কোনও কষ্ট হয় [না] সেও যেন তাদের এক রকম খেলারই মতন হয়; পড়ি[বার] ঘরেও তাহাদের সেই খেলাঘরের চিত্রগুলিকেই আরও উজ্জ্বল করিয়া দেওয়া হয়, তাই আমাদের দে[শের] ছেলেদের মতন তাহাদের পড়া ও খেলায় এতটা আক[াশ] পাতাল প্রভেদ ঘটিতে পারে না। আমাদের ছে[লেরা] ইংরেজী যাহা-কিছু পড়ে তাহা তোতাপাখীর মতন [মুখস্থ] করিয়াই যাইতে হয়, তাহার কোনও ছবি তাহারা [চোখের] সামনে আঁকিয়া ধরিতে পারে না; কোনও র[কমে] মুখস্থ করিয়া ফেলিতে পারিলে ছুটি পাইব, আর [না] পারিলে বেত খাইতে হইবে, এই দুই আশা ও ভয় [ছাড়া] উহা নির্ব্বাহ করিবার জন্য আর কোনই প্ররোচ[ক বা] প্রয়োজক নাই। প্রথমতঃ বইর মধ্যে যে-সমস্ত লেখা আছে, কটমট শব্দের কঠিন ব্যূহ ভেদ ক[রিয়া] তাহার কাছ পর্য্যন্ত যাওয়াই ছেলেদের পক্ষে [...] দুরূহ ব্যাপার, তারপর সেই অর্থগুলিকে একসঙ্গে [...] সাজাইয়া একটা বাক্য বা সেণ্টেন্সের অর্থ বোধ [...] ও বাক্যগুলি পরস্পর সাজাইয়া সম্বদ্ধভাবে [...]

ইংরেজী গল্পের গোটা ছবিটা চোখের সামনে আনা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ যে-বয়সে ইংরেজী শিক্ষা ছেলেদের ধরান হয়, সে-বয়সে পদ, পদার্থ বা বাক্য সম্বন্ধে তাহাদের কোনও ছায়ালোকের অস্পষ্ট ধারণাও হয় না। প্রথম মাতৃভাষার সহজ বাক্যগুলির মধ্যে যদি পদগুলিকে পরস্পর সাজাইবার ক্রমের দিকে ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া সেগুলির সহিত ছেলেদের একটা পরিচয় ঘনাইয়া না তোলা যায়, তবে বিদেশীয় ভাষার মধ্য হইতে সেগুলি চিনিয়া লওয়া বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন ও নীরস হয়। যে ইংরেজী শব্দের বাংলাটি সে মুখস্থ করিতেছে, সেই বাংলা শব্দটির ছবিটি তার মনের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে ইংরেজী শব্দটিও তাহার পক্ষে যেরূপ বাঙ্গালা শব্দটিও প্রায় তদ্রূপ হইয়া দাঁড়ায়, কাজেই একরকম কলের মতন ইংরেজী শব্দ ও তাহার অর্থটি মুখস্থ করিয়া যায়। শব্দার্থের চিত্রটিই যদি চোখের সামনে না আসিল তবে বাক্যের চিত্র আসিবে কেমন করিয়া, আর বাক্যের চিত্রটি না আসিলে সম্বদ্ধবাক্যাবলি বা গল্পটির চিত্র কোথা হইতে আসিবে। ইহা ছাড়া দ্বিতীয়তঃ আরও একটি অসুবিধার দিক্ আছে, সেটি হচ্চে এই, যে, বিলাতী চিত্রগুলি আমাদের ছেলেদের পক্ষে বিশেষভাবে অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত, কাজেই শব্দার্থের যোজনা করিতে পারিলেও গল্পের বর্ণনাগুলির তাৎপর্য্য আমাদের মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, এবং আমাদের কল্পনাকেও কখনও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। বরফের উপরে স্কেটিং করার একটা গল্প একটি ইংরেজের ছেলের কাছে অত্যন্ত পরিচিত ও সহজ, কিন্তু আমাদের ছেলেদের কাছে কেন, পরিণতবয়স্কদের পক্ষেও তাহার একটা সুপরিস্ফুট ছবি মনের সামনে আঁকিয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

কোনও একজন পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, আপনার ছেলেকে এত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছেন কেন? তিনি উত্তর করিবেন, বড় চাকরী করিবে বলিয়া। কোনও শিক্ষককে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি নিয়মে ছাত্রদের পড়ান? তিনি বলিবেন, যাহাতে বেশীসংখ্যক ছেলে পাশ হয় সেই অনুসারে। কোনও একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা কর, সে কেন লেখাপড়া শিখিতেছে? সে উত্তর করিবে, পাশ করিবার জন্য। পাশ হইলে কি হইবে? চাকরী হইবে। যে-সমাজে চাকরী করিবার জন্যই সমস্ত শিক্ষাপ্রবাহ ছুটিয়াছে, সেখানে শিক্ষাটাও যে সেই রকমেরই হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ভৃত্যজীবনের মহৎ আদর্শে যাহাকে উত্তরকালে জীবন গঠন করিয়া তুলিতে হইবে তাহাকে বাল্যকাল হইতেই মানুষ হইবার স্পৃহা একান্তভাবে বর্জন করিয়া ভৃত্যোচিত আত্মবলিদান কায়মনোবাক্যে অভ্যাস করিয়া লইতেই হইবে। তাই জীবনের প্রথম হইতেই নির্দ্দোষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে জোর করিয়া এমন করিয়া খর্ব্ব করিয়া দেওয়া হয় যে ক্রমশঃই বালকের সে প্রবৃত্তিগুলি শুকাইয়া আসিতে থাকে। কারণ কেবল যে জোর করিয়া কটমট শব্দের অর্থ মুখস্থ করান বা জোর করিয়া সহজ ও স্বাভাবিক বিষয়গুলি হইতে মনকে টানিয়া লইয়া গিয়া কতকগুলি অপরিচিত ও অস্বাভাবিক বৈদেশিক রীতিনীতি দৃশ্য প্রভৃতির কল্পনা করিবার নিষ্ফল চেষ্টায় মনকে ক্লান্ত ও পীড়িত করিয়া ফেলিতে হয়, তাহা নয়; সর্ব্বপ্রকারের আমোদ, বাজে বই পড়িয়া রস উপভোগ করা, নানা বিষয়ে কৌতূহল নিবৃত্তির শিশুসুলভ চেষ্টা, এ-সমস্তই যাহাতে যথাসম্ভব বর্জ্জিত হয় সে বিষয়ে শ্রেয়স্কামী অভিভাবকবর্গের তীক্ষ্নদৃষ্টির কখনই অভাব হয় না। কারণ ছেলের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে তার আপনার জীবনের চারিদিকে সুন্দর করিয়া ফোটাইয়া তোলা ত আর শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য কিসে তাহার সমস্ত জীবনের গতিটা চারিদিক হইতে গুটাইয়া আনিয়া একমাত্র পাশকেন্দ্রের দিকে তাহাকে প্রেরিত বা ধাবিত করা যায়। আমোদ আহ্লাদ কিছুর দিকে মন যাইতে চাহিবে না, কোনও প্রকারের রস আস্বাদের জন্য জিহ্বা লালায়িত হইবে না, কোনওরূপ সঙ্গীতবাদ্যের দিকে শ্রোত্রবৃত্তি উন্মুখ হইবে না, কোনও সুন্দরদৃশ্য দেখিবার জন্য চক্ষু ও মন নাচিয়া উঠিবে না। এইরূপে সব সময় সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে সমস্ত জীবনীশক্তিকে প্রত্যাহার করিয়া পাশানুকূল চিন্তায় কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের দিকে চক্ষুতারকা স্থির করিয়া রাখিয়া

তন্ময় হইয়া যাওয়ার নামই শিক্ষা। ইহা করিতে করিতে ছেলেরা এত অভ্যস্ত হইয়া যায় যে যখন তাহারা একটু উপরের ক্লাসে পড়িতে আরম্ভ করে, তখন পূর্ব্বোক্ত যোগাভ্যাসের ফলে তাহাদের আর একটা দৈবীশক্তি জন্মে। অনাবশ্যক কথা শুনিয়া তাহা মনে রাখিতে গিয়া স্মৃতিশক্তিকে তাহারা আর ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে না, মাষ্টার বা প্রোফেসর যাহাই বলুন না কেন, তাহারা জানে ও-সমস্ত বাজে; খালি ডিগ্রীপ্রাপ্তির জন্য যতটুকু দরকার সেইটুকু রাখিয়া বারম্বার তাহারই নিদিধ্যাসন করে ও বাকী আর-সমস্তই চিত্তবিক্ষেপের কারণ বলিয়া যথাসম্ভব পরিহার করিয়া মনকে তাহা হইতে সংযত রাখিতে চেষ্টা করে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে এইরূপে পৃথিবীর আর-সমস্ত বিষয়ের রসই এই হংসজাতীয় জীবের পক্ষে জলের মত স্বাদবিহীন হয়। সমস্ত একেবারে মায়িক হইয়া দাঁড়ায়, কেবল পাশই একমাত্র ব্রহ্মের মত মহাসত্য ও অমৃতের মত রসপ্রচুর হইয়া উঠে। গোড়া হইতেই তাহাদের ধারণা জন্মিয়া যায় যে তাহারা মানুষ হইবার জন্য জন্মে নাই, ২৫শ বৎসরের পূর্ব্বে ভাল ভাল পাশ করিয়া চাকরীর উপযোগী হইবার জন্যই জন্মিয়াছে, স্বয়ং ব্রহ্মা পাশের জন্যই মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষের জন্য পাশ হয় নাই। যে নীচ, স্বার্থানুসন্ধিৎসু শিক্ষার আদর্শ মানুষকে এমন দাস-ভাবাপন্ন করিয়া তোলে, যে, মানুষ হইবার উচ্চাভিলাষটাও তাহার মনে জাগ্রত হইবার অবসর পায় না, সেই আদর্শে উদগ্রীবভাবে আমাদিগকে দীক্ষিত করিতে আমরা যে একটুও কুণ্ঠিত হই না ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের নিজেদের মন হইতে শিক্ষার এই হীন আদর্শটা দূরীভূত না হইবে ততদিন কোনওরূপ শিক্ষাপ্রণালীই আমাদের দেশে সুফল ফলাইতে পারিবে না।

পরিণামবাদের মূল তথ্যটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শরীরের একবিন্দু রক্তের জন্যও সে বাহ্য প্রকৃতির নিকট ঋণী, এক মুহূর্ত্তের নিশ্বাসের জন্যও সে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। প্রাণশক্তির যে বৃত্তিগুলি উদ্বুদ্ধ হইয়া মানুষকে মানুষ করিয়াছে, সেই প্রাণশক্তিও বা[...] প্রকৃতির দ্বার দিয়া তাহার ভিতরে সঞ্চারিত হইয়া[...] গাছ যেমন তার শিকড়ের দ্বারা ক্রমশঃ রস আ[...] করিয়া আপনার সমস্ত শক্তিকে সংহত করিয়া ফুল ক[...] ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় শিরার পর শিরা শাখার [...] শাখা বর্দ্ধিত ও পরিস্ফুট করিতে থাকে, সমস্ত প্রকৃ[...] যেন ঠিক তেমনি করিয়া তার সমস্ত শক্তির চরম বি[...] ও চরম সফলতা করিয়া মানুষকে বহুযুগের চেষ্টা[...] যত্নে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। গাছপালা লতাপাতা ফুল[...] নানাবিধ জীবজন্তু লইয়া এই বিশ্ব জুড়িয়া এমনই এ[...] আত্মগোষ্ঠী আত্মপরিবার রচিত হইয়াছে, যে, ইহা[...] প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের যেন একটা নাড়ীর যে[...] রহিয়া গিয়াছে; গাছ মাটি হইতে রস সংগ্রহ ক[...] লইয়া নিজের দেহকে পুষ্ট করিতেছে, আবার তাহা[...] দেহ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া মানুষ আপনাকে বাঁচা[...] রাখিতেছে। জগন্মাতা বসুমতীর অমৃতনিষ্যন্দ বি[...] প্রবাহ উদ্ভিদ ও জীবজগতের নাড়ীপ্রবাহের মধ্য [...] আমাদের মুখে নিত্যক্ষরিত হইয়া তাহাদের [...] আমাদের সম্পর্ক এত নিবিড়তর করিয়া তুলিয়া[...] বিশ্বপরিবারের মধ্যে নিজের এই যথার্থ স্থানটি ম[...] যাহাতে বুঝিতে পারে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহা[...] নাম শিক্ষা। বিশ্বপরিবারের এই গোপন মিলন-বন্ধ[...] জাগ্রত ও চেতনাময় করিবার জন্যই মানুষ সৃষ্ট হইয়া[...] নিজের গোপন কথাটি বুঝিতে সজাগ হইবে, আ[...] অন্ধতাকে দূর করিয়া দিবে, ইহার জন্য প্রকৃতি উ[...] হইয়া লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া সাধনা করিয়া মানু[...] পাইয়াছে; জড় অবস্থায় মূঢ়তা, উদ্ভিদ অবস্থায় ত[...] মূঢ়তা, প্রাণিজগতের কিঞ্চিন্মূঢ়তা অতিক্রম ক[...] মানুষের মধ্যে সে আপন বোধিকে লাভ করিয়া স[...] হইয়াছে। আপনার অনন্তবিস্তারী সাধনার ক্ষে[...] মধ্যে আপন সিদ্ধিকে রত্নপীঠের উপর বসাইয়া সে [...] আপ্তকামা হইয়াছে। বিশ্বপরিবারের এই বিপুল সংস্থা[...] মধ্যে মানুষ যখন আপনার যথার্থ স্থানটি বাছিয়া লই[...] পারে, এবং তাহার চারিদিকের সমস্ত বস্তুর সঙ্গে আপ[...] মমতার বন্ধনটিকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে পারে, তখ[...]

তাহার শিক্ষা বাস্তবিক সফল হইল। তখন এতটুকু ছোট তৃণও তাহার কাছে আর তুচ্ছ জিনিষ থাকে না, সেটি তখন উদ্ভিদ্ জাতির ক্রমবিকাশের দীর্ঘপরম্পরায় একটি শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া তাহাকে সমস্ত উদ্ভিদজগতের একটা বিচিত্র কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। অজ্ঞের কাছে যাহা ক্ষুদ্র মূক ও অন্ধ, বিজ্ঞের কাছে তাহাই বৃহৎ মুখর ও জ্যোতিষ্মান্ হইয়া দেখা দেয়। অজ্ঞের কাছে যাহা শুষ্ক কুৎসিত ও নির্মম, বিজ্ঞের নিকট তাহাই সরস সুন্দর ও প্রেমপূর্ণ। বিশ্বের সহিত মানুষের সহানুভূতি যত সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারা যাইবে, ততই তাহার শিক্ষা পূর্ণতর হইয়া উঠিবে। যতই মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারিবে যে এই বিশ্বের মঙ্গলকেন্দ্রের চারিদিকেই তাহার আপনার জীবনের মঙ্গল নিয়ত ভ্রাম্যমান হইতেছে, ততই সে বিশ্বকে ক্রমশঃ আপনার বলিয়া মনে করিতে শিখিবে, বিশ্বের জন্য খাটিতে শিখিবে, এবং বিশ্বের সমস্ত গোপন কথা ও নিভৃততত্ত্বের অধিকারী হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, এবং বিশ্বও ততই তাহার আরও আরও নিকটতর হইয়া তাহার নিকট আপনার সমস্ত গুপ্তনিধি উন্মুক্ত করিয়া দিবে, ও তাহারই গানে আপনার সমস্ত স্তুতিবাদকে মুখর দেখিয়া আরও আরও স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখবর্ণের প্রসন্নছবিতে মুগ্ধ ভক্তমণ্ডলীর নয়নরাজিকে আনন্দনিষিক্ত করিয়া তুলিবে।

কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে এই প্রেমের বন্ধনটিকে দৃঢ়ভাবে অবিযুক্ত রাখিতে হইলে বিশ্বের সম্বন্ধে কিছু জানা চাই। একটি একটি করিয়া তাহার নূতন তথ্য যতই আমরা জানিতে পারিব ততই তাহার সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইতে পারিব। সেইজন্যই শিক্ষার প্রথম স্তর হইতেই আমরা জ্ঞান সঞ্চয়ের উপযোগিতা দেখিতে পাই। তাহা না হইলে শুধু কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহকে কখনও শিক্ষা বলা যায় না। বিভিন্ন দেশীয় বিচ্ছিন্ন কতকগুলি খবরের স্তূপে যে মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ তাহা প্রাত্যহিক খবরের কাগজের মতনই নিঃসার, তাহা ক্ষণপরিচিত পথিকের মুহূর্তের তৃষ্ণা মিটাইতেই শুকাইয়া পড়ে, তাহা প্রতিদিনের নিত্য পান ভোজন যোগাইয়া ওজস্বী, বলিষ্ঠ ও অমৃত করিয়া উঠাইতে পারে না। যে শিক্ষার আদর্শ এমন করিয়া ধরা হয় যে তাহাতে পৃথিবীর বস্তুগুলির সম্বন্ধে কতকগুলি শুষ্ক কথা শিখাইয়া দেওয়া ছাড়া গভীর রসভিত্তির মধ্যে প্রবেশের কোন উপায় রাখা হয় না, তাহা মানুষকে বাস্তবিকই পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য করিয়া গড়িয়া তোলে। যে শিক্ষা সরসভাবে মানুষের সমস্ত বৃত্তিকে রসে প্রচুর করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে না পারিবে তাহা নিশ্চয়ই তাহার বৃন্তকে শিথিল করিয়া দিয়া বিশ্বের সঙ্গের ঘনবন্ধনকে শিথিলতর করিয়া দিবে। মানুষের সকল সময়েই এ কথা মনে করিয়া রাখা উচিত যে খরবলদ মানুষের ভার বহন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু মানুষ আর কিছুরই ভার বহনের জন্য জন্মে নাই, তা সে-ভার যে-রকমেরই হউক। সে নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, নিজেই নিজের চরম, সে আর কিছুরই উপায় হইবার জন্য আসে নাই। তাহার নিজের মধ্যেই নিজের আদর্শের অনন্ত সূত্র এমন সুন্দরভাবে গুটাইয়া রহিয়াছে যে, সে তাহাই অবলম্বন করিয়া অনন্ত আকাশে অনন্ত কালের জন্য উড্ডীন হইতে পারিবে, আর কাহারও অপেক্ষা করিতে হইবে না। তাহার জীবনের মধ্যে বিশ্বের সমস্ত সার সত্যটি এমনই একটি রূপকের রসনর্ত্তিত ছন্দে বাঁধা পড়িয়া গেছে, যে, জীবনের পর জীবন বসিয়া তাহাকে কেবল নিজেকেই ব্যাখ্যা করিয়া চলিতে হইবে। জগতের সমস্ত বাঁধনের গ্রন্থি তাহার মধ্যে আসিয়া এমন করিয়া জটিল হইয়াছে যে, তাহার নিজের সেই গ্রন্থি উন্মুক্ত করিলেই বিশ্বের সমস্ত গ্রন্থি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইয়া যাইবে। তাহার অন্তরের মধ্যে এমন একটি চিরজ্যোতি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যে "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।" সে যদি তাহার সেই আলোক তাহার নিজের দিকে ফিরাইয়া নিজেকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে, তবেই সূর্য্যের অন্ধজ্যোতি আলোকোন্মেষিত হইয়া জাগিয়া উঠিতে পারিবে। বিশ্ব তাহাকে আপনার মনীষী কবি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই তাহার অন্তরের প্রত্যেক তন্ত্রীটি সহজভাবে বিশ্বের প্রত্যেক রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে; তাহার জন্য কোনও চেষ্টা বা যত্নের অপেক্ষা নাই। সেইজন্যই সে বিশ্বের সঙ্গে এমন

দৃঢ়সম্মিলিত ও সম্বদ্ধ হইয়াও এত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। মানুষ যখন আপনার নিজের ছন্দে আপনি চলিতে থাকে, তখনই বিশ্বের সমস্ত ছন্দ সার্থক হয়। বিশ্বের দেহের মধ্যে সে যেন তাহার প্রাণশক্তিরূপে বিদ্যমান, কাজেই তাহার নিজের প্রাণনাতেই বিশ্ব অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে, অথচ তাহার প্রাণনাও বিশ্বযাত্রার প্রতিকূল হয় না। উভয়ের যোগ এত অন্তরঙ্গ যে তাহাদের কাহাকেও কাহারও অধীন বলা যায় না, উভয়ের মধ্যে যেন একটা মহাপ্রাণের মহাপ্রাণনা নিত্য স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। তাই মানুষের শিক্ষা একদিকে যেমন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, অপরদিকে তেমনই বিশ্বের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত। তাই মানুষকে যখন ছেলেবেলা হইতে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা যায় তখন হইতেই একদিকে যেমন তাহার প্রবৃত্তিগুলিকে স্বতন্ত্র ও সহজভাবে প্রস্ফুটিত হইবার অবসর দিতে হইবে, আর-একদিকে তেমনি বিশ্বের সঙ্গে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে সম্বদ্ধ ও সংযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের প্রতি বিশ্বেরও যেমন একটি দাবী আছে, তার মানুষভাবের বিশেষ সত্তারও একটা দাবী তেমনি ভাবেই অক্ষুণ্ণ আছে।

আপাততঃ মনে হইতে পারে যে এই দুই দিকের দুইটা দাবী একত্র মিটাইয়া মীমাংসা করিয়া দেওয়া একরূপ অসম্ভব। কিন্তু উভয়ের যথার্থ সম্বন্ধ বিচার করিলে সহজেই বোঝা যাইবে যে ইহা বাস্তবিক তেমন অসম্ভব নয়। উভয়ের মধ্যে এমন একটা রসের সম্বন্ধ আছে যে যথার্থ ভাবে একের দাবী মিটাইতে গেলেই অন্যের দাবীও সেই সঙ্গে-সঙ্গেই আপনা-আপনিই মিটিয়া যায়। কোনও বালককে যদি তাহার চারিদিকের বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে এমন করিয়া মিশিতে দিই, যে, তাহাতে সেইগুলির উপর তাহার একটা প্রীতি জন্মিয়া যায়, তাহা হইলে পরে সে আপনা হইতেই সেইগুলির সঙ্গে মিশিবে, ও মিশিতে মিশিতে ক্রমশঃই সেগুলির সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে আরম্ভ করিবে, ও ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসিবে, ততই সেগুলির সম্বন্ধে সমস্ত গোপন কথাগুলি তাহার নিকট সহজেই পরিচিত হইয়া উঠিবে। একবার এই বিশ্বকে ভালবাসিতে পারিলে ইহার ভিতরকার নিরাবরণ সত্যটি স্ব[illegible] নিরাভরণ হইয়া অতি সহজে আপনাকে তাহারই নি[illegible] খুলিয়া দিবে। বাহিরের বিচিত্র বর্ণের নানা সমব[illegible] তাহাকে আর উদ্ভ্রান্ত করিতে পরিবে না, এই সমস্[illegible] মধ্য দিয়া সে অনায়াসেই তাহাদের ভিতরকার অ[illegible] কথাটুকু ধরিয়া লইতে পারিবে। বাহিরের নানা মিথ[illegible] আর তাহাকে ঠকাইতে পারে না, তাহার স্নিগ্ধ [illegible] এমনই ঔজ্জ্বল্য লাভ করিয়াছে, যে, সহজেই ভিতরের [illegible] সত্যটুকুই তাহার চোখে পড়ে। ব্যার্গস ইহা[illegible] intellectual sympathy বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে[illegible] পৃথিবীতে যত বড় বড় আবিষ্কার এপর্য্যন্ত হইয়া[illegible] তাহার অধিকাংশেরই প্রথমোন্মেষ এইরূপ সহজ প[illegible] স্ফূর্ত্তিতেই হইয়াছে। সত্যদ্রষ্টার হৃদয়ের কাছে প্রকৃ[illegible] মর্ম্মকথা এমনই সুস্পষ্ট হইয়াছে যে তাহারা ত[illegible] অনায়াসেই বিশ্বাস করিয়া লইতে পারিয়াছে. তাহা[illegible] তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করিবার কারণ ঘটে না[illegible] পরকে বুঝাইবার জন্য যখন যুক্তির অনুসন্ধান করিয়া[illegible] তখন তাহাতে অনায়াসেই মিলিয়া গিয়াছে। কা[illegible] একবার যখন সত্য স্বচ্ছ ভাবে প্রতিভাত হইল ত[illegible] তাহার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে [illegible] বিশ্বের আর-সমস্ত সত্যের সহিতই তাহা একান্তভাবে যু[illegible] হইয়া রহিয়াছে, কোনও খানেই তাহার কোনও বিে[illegible] নাই। যুক্তিপ্রণালীও বিশ্বের সমস্ত সত্যশৃঙ্খলের স[illegible] এইরূপ একটি যোগনির্দ্ধারণ করা ছাড়া আর কিছুই ন[illegible] কাজেই যেটা যুক্ত হইয়া রহিয়াছে সেটাকেই যদি বো[illegible] গেল তবে কোন্ কোন্ খানে কি ভাবে যুক্ত হইল তা[illegible] নির্দ্ধারণ করা আর তত কঠিন হয় না।

বিশ্বের সঙ্গে যোগ, বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, এ কথা[illegible] যতবারই উচ্চারণ করিয়াছি, ততবারই স্বভাবতঃ [illegible] প্রশ্নটি অনেকেরই মনে হয়ত উঠিয়া থাকিবে যে এখা[illegible] বিশ্ব বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি? একটা ইতর পশু পক্ষ[illegible] বিশ্ব হয়ত তাহার ক্ষুৎপিপাসার উপশমের জন্য যে বা[illegible] রের জিনিষগুলির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ঘটে তাহার বে[illegible] দূরে যায় না; কিন্তু মানুষের বিশ্ব যে কত উদার তাহ[illegible] আর ঠিকানা নাই। এক দিকে যেমন জড়জগৎ, উদ্ভি[illegible]

জগৎ, জীবজগৎ, অপর দিকে আবার তেমনই অতি বিশাল মনোজগৎ পড়িয়া রহিয়াছে। মানুষ মানুষের সঙ্গে মিশিয়া মানুষের মতন হইয়া চিরন্তন মনুষ্যসমাজের সমস্ত সংস্কার-গুলি প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার চিত্তের প্রতি-তরঙ্গের উপুর জগতের সমস্ত চিন্তাতরঙ্গ আসিয়া মুহুর্মুহু আঘাত করিতেছে, এবং সেই তরঙ্গাঘাতেই অদৃশ্যপরিণামে অনন্ত সাগরের মধ্যে তাহার জীবনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। মানুষ যেমন মানুষকে চারিদিকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে, এমন আর কিছুই নহে। কাজেই একদিকে যেমন গ্রহনক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের ছায়াতলে কানন-কুন্তলা শস্যশ্যামলা ফলপুষ্পপেশলা পৃথিবী আপনাকে অনবরত প্রাণিসংঘে মুখরিত করিয়া অনন্তকাল একই রঙ্গমঞ্চে ক্রীড়া করিতেছে, অপর দিকে ঠিক তেমনই বিবিধ চিন্তা ও ভাবছটার বিচিত্র মণিরঞ্জিত অগণ্য পণ্য-বীথিকায় ক্ষিপ্র হাস্যের সচ্ছল সম্পদে দীপ্ত ভাষার প্রভাসিত গৌরবে চিন্তাকুটিল ললাটের কান্তকোমল মুখচ্ছবিতে দীপ্ত ও পুলকিত হইয়া চিত্তভূমির সুদীর্ঘ তটকে আরও দীর্ঘতর করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতেছে। এই দুই তটের মধ্য দিয়াই মানুষের জীবনলহরী পুণ্যপুত আনন্দের আলোকচ্ছটায় নাচিয়া চলিতেছে। এই দুইয়ের কাহাকেও তাহার উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা নাই। কাজেই মানুষের বিশ্ব বলিলে একদিকে যেমন বহিঃপ্রকৃতি বুঝি, অপরদিকে তেমনি অগণ্য মনুষ্যের চিত্তসাগরের বিরামহীন অনন্ত লীলাবৈচিত্র্য বুঝি। কাজেই বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইতে হইলে একদিকে যেমন মহিমময়ী প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণে ও গন্ধে আপনাকে অনুরঞ্জিত ও আঘাত করিয়া তুলিতে হইবে, অপর দিকে তেমনি সমস্ত মনুষ্যজগতের সঙ্গে মিশিবার মতন করিয়া আপনাকে কোমল করিয়া গঠন করিয়া তুলিতে হইবে।

বিশ্বের এই উভয়দিকের সঙ্গে একটা সরস সম্বন্ধ সংস্থাপন করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। এই উভয় দিকের সম্মিলনে যে একটি অতি বৃহৎ ব্রহ্মস্বরূপ ভূমা পদার্থ পরিনিষ্পন্ন অবস্থায় বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ হইয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত আপনার যথার্থ পরিচয় লাভ করিয়া সহজসুলভ মাধুর্য্যে তাহারই বিধানের মধ্যে একান্তভাবে আপনাকে সমাহিত করিয়া তুলিয়া তাহার সহিত আপন অন্তর্নাড়ীকে যুক্ত করিয়া হৃদয়কে রসপ্রবণ রসপ্রচুর করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের আনন্দের মধ্যে তাহার চরম শিক্ষা, চরম সফলতা, চরম মুক্তি সংসাধিত হইল। পিতামাতার আনন্দ হইতেই মানুষের সৃষ্টি, তাহার নিজের আনন্দের মধ্যেই তাহার জীবন এবং বিশ্বের আনন্দের মধ্যেই তাহার ভূমানন্দবিশ্রাম—"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, তেন জাতানি জীবন্তি, তৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

কিন্তু এই আনন্দ বা রসের চরম স্থানটি মানুষের জীবনের বাস্তবিক আদর্শ হইলেও তাহা কোনও অবস্থা-তেই জ্ঞানের আবরণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারে না। যেমন একটি ছোট ফল যখন পরিপাকের সফলতা লাভের জন্য ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তখন তাহার উপরের ছাল বা খোসাটিও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে থাকে, কিন্তু আগে বাহিরের ছাল বাড়িল, না আগে ভিতরের ফল বাড়িল তাহার নির্ণয় করা যায় না, উভয়েই যেন আপন আপন সীমা ও সামঞ্জস্যের অখণ্ড গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া বাড়িয়া চলিতে থাকে; একটা স্বাভাবিক ও নির্দোষ আদর্শ-জীবনের শিক্ষার মধ্যেও ঠিক তেমনি করিয়াই জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গেই অন্তরস্থ ধাতু পরিস্ফুট হইতে থাকে। যে শিক্ষায় জ্ঞানই বাড়িয়া যায় কিন্তু রসধাতু তাহার সঙ্গে অনুবর্ত্তন করিতে পারে না, সে শিক্ষা যেমন শুষ্ক ও সারবিহীন, যাহাতে রসই বাড়িয়া চলে কিন্তু জ্ঞান তাহার সঙ্গে বাড়ে না, সে শিক্ষাও তেমনি শিথিল। উভয়ের সঙ্গে এমন একটি সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে উভয়ে একযোগে একইভাবে বাড়িয়া চলিতে পারে। কোনও একটির অকালপরিপাক, অথবা অসমঞ্জ পরিপাকে সমস্ত ফলটিই অযোগ্য কটু ও তিক্ত হইয়া পড়ে।

বিশ্বের উভয়ায়তনকতা হিসাবে, শিক্ষাকেও যদি বহির্জাগতিক ও মনোজাগতিক হিসাবে দুইভাগ করা যায়, তাহা হইলে বহির্জাগতিক শিক্ষার প্রথমেই যেমন বালককে বাহিরের জগতের সম্বন্ধে কিছু কিছু করিয়া

জানিবার অবসর দিতে হইবে, তেমনি এটাও দেখিতে হইবে যেগুলি তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে সেগুলি তাহার মধ্যে রস উদ্বুদ্ধ করিতে পারিতেছে কি না। এমন সকল বাহিরের জিনিষের কথা যদি তাহাদের কানের কাছে শত সহস্রবার আনিয়া দেওয়া যায়, যাহার সহিত তাহার মোটে পরিচয় নাই, তবে তাহার ভারে তাহার পিঠ কাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে রসোদ্বোধের কোনও সম্ভাবনাই নাই। অপরিচিত সকল সময়েই তাহার নিকট ভয়ই আনয়ন করিবে, কখনই তাহাকে আনন্দে অভিষিক্ত করিতে পারিবে না। সেইজন্য শিক্ষার মূলমন্ত্রই এই যে ছাত্রকে অতি ঘনিষ্ঠ ও সহজ পরিচিতদিগের ক্ষুদ্রমণ্ডলীর মধ্য দিয়া ক্রমশঃ তাহাদের সহিত পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া উত্তরোত্তর বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে আনয়ন করিতে হইবে। যাহা তাহারা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকে ও যাহাতে তাহারা স্বভাবত আমোদ পাইয়া থাকে এমন-সকল ছোট ছোট জিনিষের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া তারপর সেগুলির সহিত যেগুলি সহজভাবে যুক্ত হইয়া আছে এরূপ অন্য অন্য আরও পাঁচটা ছোটর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে হয়, এবং এইক্রমে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাহাদের পরিচয়ের প্রসার বাড়াইয়া দিতে হয়। এমন কোনও নূতন ভাব বা নূতন চিত্র যদি তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় যাহা তাহারা কখনও কোথাও দেখে নাই, বা যাহার সহিত তাহারা পরিচিত নহে, তবে তাহা তাহার মনের অন্য সহজ ভাবগুলির মধ্যে কখনই ঠিক মিশিয়া যাইতে পারে না, পরন্তু আলগা হইয়া থাকিয়া অন্য অন্য ভাবগুলির মিশিবার ও ফুটিবার পথে বাধা জন্মায়। বালকের মনে ভাবগ্রন্থন করিতে যাইয়া যদি কোনওরূপে তাহার পরিচয়ানুসন্ধিৎসু রসপ্রবাহের পথে বাধা উৎপাদন করা যায় তবে তাহা কখনও তাহার স্বাধীন শিক্ষার উপযোগী হইতে পারে না; ইহাই পেষ্টালজির Anschauung ও ফ্রেবেল ও হারবার্টের Apperception.

হৃদয় যেমন আপনার পরিচিতের পথে প্রবর্ত্তিত হইয়া আপন রসানুকূল ভাব বা চিত্রকে গ্রহণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিবার জন্য আমাদের মনকে তাহা আকর্ষ করিতে প্ররোচিত করে, যথার্থভাবে কোনও শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে গেলেও রসানুকূল তেমন জিনিষগুলিকে হৃদয়ের চারিদিকে ধরিয়া দিতে হইবে যাহাতে সে মনকে আকৃষ্ট করিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ক্ষুৎ যদি অনবরত আহাদের অন্বেষণ করে, আর আহার যদি ক্ষুধার হাত হইতে এড়াইবার জন্য ঠিক তাহার বিপরীত দিকে পলায়ন করে, তাহা হইলে যে কি দুর্ভাগ্যটা উপস্থিত হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই অনুমান করিতে পারিবেন। হৃদয় যদি সুস্বাদু বা পুষ্টিকর খাদ্যের জন্যই সর্ব্বদা ব্যাকুল হয়, আর সে খাদ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া যদি কতক নীরস খড় কুটা মাটি পাথর তাহার সাম্‌নে ধরিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও অবস্থা যে কিছু কম শোচনীয় হয় তাহা নয়। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বের বিকাশটি বীজীভূত হইয়া সততই বিশ্বের রসানুপ্রাণনায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে, ইহার ফুটিবার পথে কোনও প্রতিকূল বাধা আসিয়া না উপস্থিত হয়, ইহা দেখাই শিক্ষার প্রথম কাজ; কিন্তু শুধু ইহা করিলেই যে শিক্ষার কাজ শেষ হইল তাহা বলা যায় না। খাদ্য সংগ্রহের পথে যাহাতে কোনও বাধা উপস্থিত না হয় তাহা দেখিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য যোগাইয়া দেওয়া চাই। একটি গাছকে সুন্দর পরিপুষ্ট ও পরিণত ফলভারে নম্রমনোরম দেখিতে হইলে তাহার তলার মাটি খুঁড়িয়া আগাছা বাছিয়া দিয়া বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিলেই কৃষকের কাজ শেষ হইল না, সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের জীবনরসোপযোগী সারও দেওয়া চাই। মানুষকে খালি দেখিতে দিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দেখাইয়াও দিতে হইবে। অথচ দেখাইয়া দেওয়াকে কখনই এত অধিক মাত্রায় বাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে, যাহাতে তাহার নিজে দেখার কাজটা উহার উপরে ভর করিয়া অলস ও পরতন্ত্র হইয়া পড়িতে পারে। দেখাইয়া দেওয়ার জিনিষগুলি মনুষ্যের কুলক্রমাগত পৈত্রিক সম্পত্তি; এতকাল বসিয়া যাহা লাভ করিয়াছে, মানুষ সাধনা দ্বারা আপনার করিয়াছে তাহা অবিচ্ছিন্ন দিককালের কোনও গণ্ডীর মধ্যে শেষ হইয়া যায় নাই, তাহা অনন্ত কালের জন্য

মানুষের অনায়াস-উপভোগের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। মানুষের সাধনা এত অনন্ত যে তাহা কোনও একজন মানুষে, বা কোনও একটি যুগে সফল হইতে পারে না; মানুষের পর মানুষ, যুগের পর যুগ, অনন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; যাহারা চলিয়া গিয়াছে, তাহারাও চলিয়া যায় নাই, তাহারা তাহাদের সাধনার শরীরের মধ্যে সজীব হইয়া রহিয়াছে; যাহারা পরে আসিতেছে তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তীদের সেই সাধনার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারই উপরে সাধন করিতেছে; সমস্ত অতীত সমস্ত বর্ত্তমান ও সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন কোন এক অনিয়ম্য নিয়মে মানুষের আদর্শের অবয়ব ও তাহার সংস্থান রচনা করিয়া তাহার বিরাট প্রকৃতিকে বপুষ্মান করিয়া তুলিতেছে। অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগতের সমস্ত উদ্বোধ সমস্ত উন্মেষ সমস্ত আলোক যেন সেই পরিনিষ্পন্ন নিত্যব্যোমে চিরপ্রতিষ্ঠিত বিরাট আদর্শ-বপুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বিচিত্র সন্নিবেশ, একটি একটি করিয়া সাজাইয়া অনন্ত মুহূর্ত্তের ক্রমে ক্রমে আমাদের সমক্ষে অভিব্যক্ত করিতেছে। তাই মানুষ এই পৃথিবীতে যেদিন আসিয়া প্রথম উপস্থিত হয় সেইদিন হইতেই সেই বিরাট আদর্শের অনাদি অতীত সাধনা বিশ্বপ্রাণের অগণ্য মুখ হইতে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া মুখর হইয়া উঠে। এই বিশ্বের আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া মানুষ স্বতন্ত্র ভাবে তাহার নিজের আদর্শ রচনা করিতে পারে না; এই বিশ্বের দানকে সে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারিলে তাহারই সাহায্যে আপন শক্তি ও বীর্য্যের যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিলে ভবিষ্যতের আবরণ আর একটু উন্মোচন করিয়া যাইতে পারিবে। অতীতের আলোক যে পথের দিকে জ্যোতিঃসঙ্কেত করিতেছে, বর্ত্তমান কখনও তাহাকে একেবারে ছাড়াইয়া নিজের পথ করিয়া লইতে পারে না; অথচ কেবল অতীত লইয়া পড়িয়া থাকিলে বর্ত্তমানের সাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়। মানুষের যেমন শুনিবার আছে, তেমনি শেখাইবারও আছে; যেমন পরের কাছ হইতে দেখিয়া লইবার আছে, তেমনি নিজেরও দেখাইবার আছে; যে শিক্ষার মধ্যে উভয়েই পরস্পরের যথার্থ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলে, কেহ কাহারও গণ্ডীর মধ্যে গিয়া পড়িয়া তাহার অধিকার হইতে তাহাকে বিচ্যুত করে না, তাহাই বাস্তবিক যথার্থ শিক্ষা। এই উভয়ের পুণ্য পবিত্র শুভ সম্মিলন ঘটিলে বিশ্বের অনন্ত মঙ্গল সন্তান অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া অনন্তের মহাবংশকে অজরামর ভাবে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তোলে।

একটা গাছকে আর দশটা গাছ হইতে আলাদা করিয়া বাড়াইয়া তোলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একটা মানুষকে আর সমস্ত মানুষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে গেলে তাহাকে মানুষ করিয়া তোলা যায় না। মানুষ মানুষের মধ্যেই জন্মিয়াছে; অতীতের সমস্ত মানুষের সহিত, বর্ত্তমানের সমস্ত মানুষের সহিত এবং ভবিষ্যতের সমস্ত মানুষের সহিত সে একযোগে একত্র বাস করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার দৃশ্যমান শরীরটি পৃথিবীর এক কোণে পড়িয়া থাকিলেও তাহার মন অনন্তকালের সমস্ত বিশ্বের মধ্যে আপনার বিহারক্ষেত্র রচনা করিয়া থাকে, এবং ইহাতেই তাহার মনুষ্যজীবনের চরমসফলতা ও পরমানন্দকে সার্থক করিয়া থাকে। বিশ্বজগতের এই চিরন্তন অক্ষয় জ্ঞানসম্পদের মধ্যে মানুষ যখন একবার জন্মগ্রহণ করিল, তখন হইতে এই অক্ষয় আদর্শটি তাহার সামনে তাহার মতন করিয়া ধরিয়া দাও, যতটুকু ছোট করিয়া ধরিলে সে বুঝিতে পারে, ততটুকু করিয়াই তাহার সামনে উপস্থিত কর, তাহার চারিদিকের গাছপালা লতাপাতার সঙ্গে তার একটা সখ্য ঘটাইয়া দাও, তার খেলার জিনিষগুলির দিকে তার একটা আকর্ষণ উৎপন্ন হইতে দাও, তার খেলার সাথীদের সঙ্গে তার একটা বন্ধুত্ব ঘটিতে দাও, পিতামাতা ভাইভগ্নীদিগকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে দাও, তাহাদের জন্য ত্যাগস্বীকার করাটা তাহার পক্ষে সহজ করিয়া আনিতে দাও। সে আপনাকে আপন পরিবারের বলিয়া মনে করুক, আপনাকে আপন বন্ধুদের বলিয়া মনে করুক, আপনাকে দেশের দশের বলিয়া মনে করুক, সে একদিন নিশ্চয়ই আপনাকে সমস্ত মনুষ্যসমাজের বলিয়া মনে করিবে। তাহার মনের ভিতর হইতে কখনও উচ্চ আদর্শটি সরাইয়া লইয়ো না। কখনও তাহার নিজকে টাকাকড়ি, বংশ-

মর্য্যাদা, পদগৌরব প্রভৃতি কোনওটিরই উপায় বলিয়া মনে করিতে দিয়ো না। সকল সময়ই তাহাকে বুঝিতে দিয়ো সে তাহার নিজেরই উদ্দেশ্য, সে মানুষের হইয়া জগতের হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সে কিছুই অর্থ উপার্জ্জন না করুক, কোনও খ্যাতির শূন্যদম্ভে সে আপনাকে স্ফীত না করুক, সে খালি আপনাকে মানুষ করুক। সে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে শিখুক, পিতা মাতা ভাই বন্ধু, নিজের গ্রাম নিজের দেশের প্রতি সে মমতাবান্ হউক, মানুষের বিষয় মানুষের মতন সহানুভূতির চক্ষে সে গ্রহণ করুক, মানুষের শোকে দুঃখে তাহার মুখকান্তি ম্লান হউক, আবার মানুষের আনন্দে আহ্লাদে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, মানুষের তেজে তাহাকে তেজস্বী করুক, মানুষের কীর্ত্তি মানুষের বীর্য্য মানুষের গৌরব তাহাকে পরমোন্নত করুক। এমনি করিয়া বিশ্বের মানুষের চিত্তের সঙ্গে যখন সে তার নিজের জীবনকে একই সুরে একই তালে একই ছন্দে গ্রথিত দেখিতে পারিবে তখনই সে বাস্তবিক মানুষের মতন শিক্ষালাভ করিল। যে শিক্ষা মানুষকে বিশ্বের একটি ব্যাপক মানুষের মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত করিয়া না তুলিয়া তাহাকে তাহার ব্যক্তির হিসাবের ক্ষুদ্রস্বার্থে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিবে তাহাকে শিক্ষা বলিতে যাওয়া মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে এই প্রেমের সম্বন্ধটিকে ঘনাইয়া তোলাই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য।

শুধু জ্ঞানের মধ্যে মানুষের জীবনের বিকাশে যে দিকটি আমরা দেখিতে পাই, তাহা যদি মানুষের গোপন আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই প্রেমের দিকটির সহিত গাঢ়ভাবে সম্বদ্ধ না হইত, তাহা হইলে তাহা নিতান্তই বিরস ও তিক্তস্বাদ হইয়া উঠিত। মানুষের কাজে লাগিব, বিশ্বের সমস্ত সযত্ন-রক্ষিত গোপনতম মন্ত্রগুলি আবিষ্কার করিয়া মানুষের সহিত বিশ্বের মিলনকে সুলভ করিয়া দিব, প্রেমের এই মূল তথ্যটি যদি সমস্ত বিজ্ঞানালোচনার মধ্যে ভরপুর হইয়া না থাকিত তবে কি বিজ্ঞানের চর্চ্চা মানুষের কাছে এমন রসপ্রচুর হইয়া উঠিতে পারিত। দর্শনালোচনা যদি যুক্তিপথে মানুষ ও বিশ্বের মধ্যের একটা শুভসম্মিলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের বাস্তবিক ঐক্যের স্থির নিশ্চল বিন্দুটিকে বাহির করিতে যত্নবান না হইত তবে কি তাহার তর্কজাল নিতান্তই নিষ্ফল বাহাড়ম্বর হইয়া উঠিত না। মানুষের জ্ঞানের অনন্ত সূত্রটি যদি এইরূপ প্রেমের গ্রন্থির মধ্যে আপনার চরমকে লাভ করিতে না পারিত তবে মানুষের সঙ্গে বিশ্বের এই বিরাট উদ্বাহ-ব্যাপারে সে কোন কাজেই আসিতে পারিত না। আবার জ্ঞানের এ সূত্রটি না থাকিলে, প্রেমও কখন আপনার মধ্যে আপনি জড়িত হইয়া বিশ্বের সঙ্গের মহামিলনের বেষ্টনীটিকে এমন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিত না। কাজেই মানুষের শিক্ষার মূলেই এই দিকে লক্ষ রাখিতে হইবে, যাহাতে জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যের এ সম্বন্ধই সুরক্ষিত হইতে পারে, এবং এই উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারে যাহাতে মানুষের বিরামহীন কর্ম্মস্রোতের মধ্যে উভয়ের এই সামঞ্জস্যই সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে; বিশ্বের জ্ঞানসম্ভার এই মানুষের কাছে এমন ধীরে ধীরে অনাবৃত করিয়া দিতে হইবে যাহাতে তাহার অন্তবস্থ রসনাড়ী কোনওরূপে ক্ষুণ্ণ না হয়; যাহাতে পিতামাতা আত্মীয় বন্ধুর জন্য, দশের জন্য, দেশের জন্য, মানুষের জন্য তাহার স্বভাব-প্রবাহিত রসস্রোত কোনওরূপ হীন বা ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুরোধে বাধা পাইয়া ক্ষীণ ও কর্দ্দমাক্ত না হইয়া যায়; তাহার আপন রসপ্রবাহই যেন তাহাকে সমস্ত জ্ঞানের দিকে উন্মুক্ত করিয়া তোলে। জ্ঞানের ক্ষেত্রটি তাহার সামনে উদার করিয়া রাখিয়া দাও, দেখিবে রস আপনি তাহাতে বর্ষিত হইয়া তাহাকে শস্যোপযোগী ও ফলোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। যে হিরণ্ময়পাত্রের দ্বারা সত্যের সুন্দর মুখ আবৃত হইয়া রহিয়াছে, রসের উচ্ছ্বাসই তাহা উন্মুক্ত করিয়া দিবে; রসের মধুর আনন্দে প্রাণের প্রত্যেক তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে, শরীরের প্রত্যেক শিরা আহ্লাদে মাতাল হইয়া উঠিবে, আর সমস্ত বিশ্বের রসকেন্দ্র হইতে একটি ধ্বনি "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" বলিয়া উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে, এবং এই বিশ্বব্যাপী জাগরণ-প্রার্থনার মধ্যে মানুষের চিরজাগরণের চিরমঙ্গলময় শিক্ষার মন্ত্রটি সার্থক হইয়া উঠিবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

কবরের দেশে দিন পনর

দশম দিবস—বিচারব্যবস্থা

আসোয়ান হইতে কাইরোতে ফিরিয়া আসিলাম। রেলে প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগিল। দিবাভাগে লুক্সার পর্য্যন্ত গাড়ী আসে। এই পথে কৃষিক্ষেত্র বিরল—চারিদিকে পর্ব্বত ও মরুভূমি। কাজেই ধূলা ও বালুকার রাজ্য। তাহার উপর গ্রীষ্মকালের গরম। বাঙ্গালীর গরম সহ্য করা অভ্যাস। তথাপি এই অঞ্চলের তাপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

রক্তিমবর্ণে সুরঞ্জিত—পশ্চিমগগনের অর্দ্ধভাগ যেন অগ্নিশিখায় আলোকিত—অথচ পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগ এবং মিশরের উপত্যকা ঘোরতর অন্ধকারে নিমগ্ন। আকাশে দুইএকটি তারা মাত্র বিরাজ করিতেছে—এবং মিশরের পশ্চিম-আকাশে প্রতিপদ বা দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা দেখা যাইতেছে। এই আবেষ্টনের মধ্যে গাড়ী দার্জ্জিলিঙ্গ মেলের বেগে চলিতে লাগিল।

রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রকোপ বাড়িয়া চলিল। বাঙ্গালাদেশে মাঘমাসেও এত শীত পড়ে না। দিনে যেরূপ গরম, রাত্রে তেমনই শীত। ইহাই মরুস্থলীর

দ্বিতীয় পীরামিডের সমীপস্থ স্ফিংক্‌স্‌।

লুক্সারে সন্ধ্যা হইল। তখন হইতে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র-সমূহ আমাদের দুই ধারে দেখা দিল। এ অঞ্চলে বিহার ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশের ন্যায় শক্ত কৃষ্ণমৃত্তিকা আমাদের চারিদিকে চাষের জমিতে রহিয়াছে দেখিলাম। কাজেই বালুকার হাত এড়াইয়াছি। এদিকে পশ্চিম-আকাশকে গোলাপীরঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া মিশর-তপন সাহিরিয়া পর্ব্বতের অপর পারে অস্ত যাইতেছে। মনে হইল সাহারায় আগুন লাগিয়াছে। পর্ব্বতমালার শিরোদেশ

প্রকৃতি। অবশ্য মিশরীয়েরাও বলাবলি করিতে লাগিল—গ্রীষ্মকালে এত শীত মিশরে সাধারণতঃ দেখা যায় না। আমরা সৌভাগ্যক্রমে লোহিতসাগর হইতেই ঠাণ্ডা পাইতে পাইতে আসিয়াছি।

মিশরের দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত যে কয়টা পল্লী ও নগর দেখিলাম সর্ব্বত্রই পাশ্চাত্যের প্রভাব ও আধিপত্য লক্ষ্য করিয়াছি। "নিজবাসভূমে পরবাসী"—এ কথা আধুনিক মিশরে যতটা খাটে দেখিতেছি, যথার্থ পরাধীন

দেশেও ততটা খাটে কি না সন্দেহ। গ্রীক, ইতালীয়, জার্ম্মান ও ফরাসী দোকানদার, বণিক, হোটেলস্বামী এবং অধ্যাপকগণ মিশরের গলিতে গলিতে প্রবিষ্ট। স্বদেশী বাজারে হাটে যাইয়া দেখি মিশরের খাঁটি স্বদেশীদ্রব্য কোথাও পাওয়া যায় না—সবই বিদেশী মাল। কাফির দোকানে শত শত মিশরীয় যুবক ও প্রবীণব্যক্তি মদ মাংস তামাক চা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত। ইহারা ফরাসী, জার্ম্মান, গ্রীক, ইংরেজী ইত্যাদি নানা বিদেশীয় ভাষায় কথা বলিতেছে,—অথচ পেটে বিদ্যা কিছুই নাই—কেবল কথা বলিতেই শিখিয়াছে। নিজ মাতৃভাষার এত অনাদর আর কোন সমাজ করে কি না জানি না। কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতবাসীও স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যকে অশ্রদ্ধা করিতেন। সুখের কথা, ভারতবাসীর নিদ্রা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু মিশরবাসীর এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। মিশর দেখিয়া অশ্রু ফেলিলাম। মিশরবাসীর জাতীয় চরিত্রে মেরুদণ্ড দেখিতে পাইলাম না। আধুনিক মিশর বিলাসসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে—ভবিষ্যতের জাতীয় স্বার্থ ইহাদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে?

কাইরোতে ফিরিয়া আসিলাম। নগরের ভিতর টার্কিশ স্নানাগারে যাইয়া স্নান করা গেল। ব্যাপার কি বুঝিবার উদ্দেশ্য ছিল। দেখিলাম—স্নানের বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নয়। গৃহগুলি বাষ্পপূর্ণ থাকে। তাহার ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র খুব ঘাম হয়। তাহার উপর গরম জলের চৌবাচ্চায় বসিতে হয়। ফলতঃ শরীরের লোমকূপ-গুলির মুখ খুলিয়া যায়। তাহাতে সাবান লাগাইয়া ধুঁধুলের ছোবড়া দিয়া ঘসিলে ভিতরকার ময়লা উঠিয়া আসে। আমরা সাধারণতঃ অল্পকালমাত্র স্নানে খরচ করি। এখানে প্রায় একঘণ্টা লাগিল। এতক্ষণ স্নানে কাটাইলে সাধারণ রীতির অবগাহনেও গায়ের ময়লা নষ্ট হয়। স্নানের পর গা কাপড়চোপড়ে ঢাকিয়া খানিকক্ষণ শুইয়া থাকা আবশ্যক। স্নানের ফলে শরীর বেশ হাল্কা বোধ হইতে থাকে।

আজ একজন প্রসিদ্ধ মিশরবাসী মুসলমানের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি পূর্ব্বে মিশর-সরকারে বিচার-পতির কর্ম্ম করিয়াছেন—এক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত, পেন্সন ভোগ করিতেছেন। ইঁহার লেখাপড়ার চর্চ্চা মন্দ নাই। স্বয়ং ফরাসী, ইংরেজী, জার্ম্মান, ইতালিয়ান এবং আর[বী] ভাষায় কথাবার্ত্তা এবং লেখাপড়া চালাইতে পারে[ন]। ইনি বৎসরের প্রায় অর্দ্ধাংশ জার্ম্মানি, ফ্রান্স, সুইজল[ণ্ড]... ইতালী প্রভৃতি দেশে কাটাইয়া থাকেন। সুতরাং [ঐ] সকল দেশের অনেক তথ্যই ইঁহার জানা আছে। তা[হা] ছাড়া ইনি নবপ্রকাশিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধেও সর্ব্বদা অভি[জ্ঞ] হইতে সচেষ্ট। ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরেজী ও অন্য ভাষায় যে-সকল নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহ[ার] সংবাদ ইনি রাখিয়া থাকেন। ইঁহার টেবিল, শেল্[ফ] আলমারি ইত্যাদিতে কতকগুলি বেশ প্রয়োজনীয় গ্[রন্থ] ও পত্রিকা দেখিতে পাইলাম। ঐতিহাসিক আলোচনা[য়] ইনি বিশেষ অনুরক্ত।

জগতের সর্ব্বপুরাতন জাতিসমূহের সম্বন্ধে প্রথম ক[থা]বার্ত্তা হইল। মিশর, ব্যাবিলন, আরব, ভারতব[র্ষ] ই[ত্যা]দি দেশের প্রাচীন সভ্যতা-বিষয়ক গ্রন্থ ইঁহার নি[কট] দেখিলাম। কোনটা ফরাসীতে লিখিত, কোনটা জার্ম্মা[নে,] কোনটা ইংরেজীতে। ইনি আমাদের সঙ্গে ইংরেজীতে ক[থা] বলিলেন। সুতরাং দোভাষীর সাহায্য আবশ্যক হ[ইল] না। ইনি একজন সুইস অধ্যাপক-প্রণীত গ্রন্থের প্র[তি] আমার দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিলেন। গ্রন্থ জা[র্ম্মান] ভাষায় লিখিত—নামের ইংরেজী অনুবাদ The Impo[r]tance of Arabia to World's History—Maha[m]med। লেখক সুইজর্ল্যাণ্ডের ফ্রেবর্গ বিশ্ববিদ্যাল[য়ে]র অধ্যাপক হিউবার্ট গ্রাম। এই গ্রন্থে মিশরের সভ্য[তা] অপেক্ষা আরবের সভ্যতা প্রাচীনতর এই তত্ত্ব প্রচারি[ত] হইয়াছে।

আধুনিক মিশরের আইন ও বিচার-প্রণালী সম্ব[ন্ধে] ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ভূতপূর্ব্ব বিচারপ[তি] বলিলেন—"এখানকার বিচার-প্রণালী বড় বিচিত্র। ই[উ]রোপের প্রায় সকল জাতিই এই দেশে বাস ক[রে।] তাহাদের নিজ নিজ আইন অনুসারেই তাহাদের বিচ[ার] হয়। সুতরাং গোটা ইউরোপের জটিলতা আমা[দের] ক্ষুদ্র মিশরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আমা[দের] স্বদেশবাসীর কোন বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে সুবিচ[ার]

কাইরোর নিকটবর্ত্তী পীরামিড্‌ কবর।

পাওয়া বড় কঠিন। প্রথমতঃ আইনটাই যে কি তাহা জানা নাই। তাহার উপর সময় এত বেশী লাগে এবং টাকা খরচ এত অধিক হয় যে মিশরবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তবে কি এই দেশের উকীলদিগকে ইউরোপের সকল দেশীয় আইনই শিখিতে হয়?” ইনি বলিলেন, “যে উকীল বিদেশীয় লোক-ঘটিত মাম্‌লা মোকদ্দমায় সাহায্য করিতে চাহেন তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিদেশীয় আইন শিক্ষা করিতে হইবে। মনে করুন, আপনি একজন ভারতবাসী। আপনার সঙ্গে মিশরবাসীর ব্যবসা-ঘটিত, টাকা-পয়সা-সম্পর্কিত অথবা বাড়ী-ঘর জায়গা জমি সম্বন্ধীয় গোলযোগ উপস্থিত হইল। ইহার বিচারের জন্য ব্রিটিশ-ভারতের আইনে অভিজ্ঞ বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। আপনার মোকদ্দমায় সাহায্য করিবার জন্য ঐরূপ উকীলও আবশ্যক হইবে। অথচ যদি কোন খুনজখম-ঘটিত মামলা উপস্থিত হয় তাহা হইলে আমাদের সাধারণ স্বদেশীয় বিচারালয়েই বিচার হইবে। আমাদের স্বদেশী বিচার ফরাসী “কোড নেপোলিয়নের” আরবি অনুবাদ অনুসারে হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ নিয়ম অন্যান্য বিদেশীয় লোক সম্বন্ধেও খাটিবে। কাজেই আমাদের দুইপ্রকার বিচারালয়, দুইপ্রকার বিচারক, দুইপ্রকার আইন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেবল দুইপ্রকার বলিলে বোধ হয় ঠিক বুঝান হইল না। কারণ প্রথমপ্রকারের মধ্যে অসংখ্য বিভাগ আছে। পৃথিবীর যত জাতি মিশরে বাস করে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বিচার-প্রণালী আবশ্যক।” ইনি বলিলেন “নিশ্চয়ই। এ জন্য আমাদের বিচারপদ্ধতি বড়ই জটিল, গোলমেলে এবং ব্যয়-সাপেক্ষ। এত দেশের আইনে অভিজ্ঞ হওয়া কি কোন উকীলের পক্ষে সম্ভব? জনসাধারণের এজন্য দুর্দ্দশা ও অর্থব্যয়ের সীমা নাই।”

একাদশ দিবস—পীরামিডের সারি।

মিশরের নাম করিবামাত্র পীরামিডের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে হয়। পীরামিড একপ্রকার কবর-বিশেষ। প্রাচীন মিশরের সর্ব্বপ্রথম রাজবংশীয়গণ পীরামিড নির্ম্মাণ করিয়া

স্বকীয় 'মাম্মি' তাহার ভিতর লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি তাঁহাদের ভৌতিক শরীরের সন্ধান না পায় এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিশেষ যত্ন লইতেন। সুতরাং কবর-নির্ম্মাণ প্রাচীন মিশরের ধর্ম্মজীবনে এবং রাষ্ট্রজীবনে একটা বিশেষ কর্ম্ম ছিল। প্রাচীন মিশরীয় শিল্পের অনুষ্ঠানে কবর-নির্ম্মাণই প্রধান স্থান অধিকার করিত। আমরা ইতিপূর্ব্বে লুক্সারের অপর পারে ভূগর্ভস্থিত রাজকবরসমূহ দেখিয়াছি। বস্তুতঃ হয় পীরামিড, না হয় পর্ব্বতগুহায় কবর মিশরের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর মুসলমানী কালেও মিশরে নানা কবর নির্ম্মিত হইয়াছে। মুসলমানেরা অবশ্য কবর লুকাইয়া রাখিতে ব্যগ্র হইতেন না। তাঁহারা কবরের সঙ্গে মসজিদ, বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা, হাঁসপাতাল ইত্যাদি লোকহিতবিধায়ক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন। ফলতঃ, মুসলমানী কবরসমূহ জনগণের কর্ম্মকেন্দ্র- ও চিন্তাকেন্দ্র-স্বরূপ হইয়া থাকিত।

মিশরের যে দিকেই তাকাই এই দুই জাতীয় কবর-সমূহ দেখিতে পাই। এজন্যই মিশরকে "কবরের দেশ" বলিয়াছি।

আজ পীরামিড দেখিতে গেলাম। ইলেক্ট্রিক্ ট্রামে যাত্রা করা গেল। কাইরোর নিকটেই নাইল পার হইতে হয়। নাইলের উপর কাইরো নগরে সর্ব্বসমেত ৪১৫টি সেতু আছে। এগুলি প্রায়ই ফরাসী এঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদিগের নির্ম্মিত। ট্রামওয়ে কোম্পানী বেল্‌জিয়াম দেশীয়। ট্রামের প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন-ফলকে দেখিলাম ফরাসী ভাষায় লেখা আছে "গাঁটকাটা আছে, সাবধান!" কাইরো নগরের ভিতর অসংখ্য চোর জুয়াচোর ভদ্রবেশে চলাফেরা করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ঋণগ্রস্ত দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত মিশরীয় ধনী-সন্তান। আবার অনেকেই গ্রীক, ইতালীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসাদার বা হোটেলরক্ষকগণের লোকজন! মিশরে যাতায়াত করা বড় কঠিন। বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হয়। এই জন্যই দেখিয়াছি রেলওয়ে লাইনে দিবারাত্রি টিকেট ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া আরোহীদিগকে জ্বালাতন করে। যেখানে-সেখানে যখন-তখন পরিদর্শকেরা টিকেট দেখিতে চায়। মিশরীয় জনগণের সাধুতা ও চরিত্র এই নিয়ম হইতেই বেশ বুঝা যায়।

যে দেশে দুনিয়ার ইতর ভদ্র লোক আসিয়া জমিয়াছে সেখানে জাতীয় চরিত্র সহজে বুঝা বড় কঠিন। সেখানে আইন জটিল ত হইবেই। মিশরের জাতীয় উন্নতিসাধন এই কারণে বড় কষ্টসাপেক্ষ। মিশর দুনিয়ার একটা বাজার মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দেশ ইউরোপের যৌথসম্পত্তি-স্বরূপ বা বারোয়ারীতলা। মিশর সম্বন্ধে মিশরবাসীর হাত কোন কাজেই দেখিতে পাই না। মিশরের ভবিষ্যৎ গঠন করিবার উপায় মিশরবাসীরা স্বচেষ্টায় উদ্ভাবন করিতে সুযোগ পান না। মিশরের এই দুর্দ্দশা জগতের অন্য কোন সমাজকে বোধ হয় কখনও আক্রমণ করে নাই। আধুনিক মিশরের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি।

নদীর অপর পারে ট্রামে যাইতে যাইতে কলিকাতার খিদিরপুর ও বেহালার রাস্তা মনে পড়িল। একদিকে প্রকাণ্ড প্রান্তর নানা শস্যপূর্ণ। কোন স্থানে গোলাপের বাগান, কোথাও আমের ক্ষেত। অপর দিকে নদী ও প্রাসাদসমূহ। বড় বড় কয়েকটা প্রাচীন উদ্যানও দেখিতে পাইলাম। মিশরের জমিদারদিগের কতকগুলি নব্যফ্যাশানের অট্টালিকা পথে পড়িল। এতদ্ব্যতীত আধুনিক নিয়মে "জুলজিক্যালগার্ডেন" বা চিড়িয়াখানাও দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বে ইহা ইস্‌মাইল পাশার ভবন ও উদ্যান ছিল। কোটি কোটি টাকায় এইসকল হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে।

পরে রেলপথের উপর দিয়া আমাদের ট্রাম চলিল। দূর হইতে দোলপূজার জন্য নির্ম্মিত মৃত্তিকা-স্তূপের ন্যায় বিশাল ত্রিভুজাকার প্রস্তরস্তূপ দেখিতে পাইলাম। এই স্তূপই পীরামিড।

ট্রাম হইতে নামিয়া গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করা গেল। উত্তর দিক হইতে একটা অনুচ্চ পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। খানিকটা উঠিতেই পীরামিডের এক প্রাচীর-গাত্র চক্ষুগোচর হইল। পীরামিড এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত। উচ্চতায় প্রায় ৬০০ ফুট—প্রত্যেক প্রাচীর দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০০ ফুট। এইরূপ চারিটা প্রাচীর উর্দ্ধে

যাইয়া এক কেন্দ্রে মিলিয়াছে। সমস্ত স্তূপটা সাধারণ বালুকাময় প্রস্তরে নির্ম্মিত।

এই স্তম্ভকে কবর বলিয়া বিবেচনা করা যাইতেই পারে না। পরে দেখিলাম উত্তর প্রাচীরের কিছু ঊর্দ্ধ-অংশ হইতে কতিপয় লোক নামিতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য পীরামিডের উপর প্রায় ৫০ ফুট উঠিলাম। দেখা গেল একটা দরজা দ্বারা গড়ান ভাবে পীরামিডের অভ্যন্তরে যাওয়া যায়। শুনিলাম তাহার অভ্যন্তরেই প্রস্তর-সিন্দুকে রাজশরীরের মাম্মি রক্ষিত হইত। সময়াভাব, সুতরাং সময় ব্যয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার ধৈর্য্য ছিল না। যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা বলিলেন "দিল্লী কা লাড্ডু।"

তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভূমির উপরে পীরামিডের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম কোণ ভূমণ্ডলের দিক্‌নিরূপণ অনুসারে কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়া যায়। ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ৪৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এই পীরামিড দর্শন করিয়া ইহার রচনাকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে লিখিয়া যান। তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ ১০০,০০০ লোক বৎসরে ৩ মাস করিয়া ২০ বৎসর খাটিয়াছিল।

আমরা যে পীরামিড দেখিলাম সেটা চতুর্থরাজবংশের অন্যতম নৃপতিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রায় ৩০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ ইহার নির্ম্মাণ-কাল।
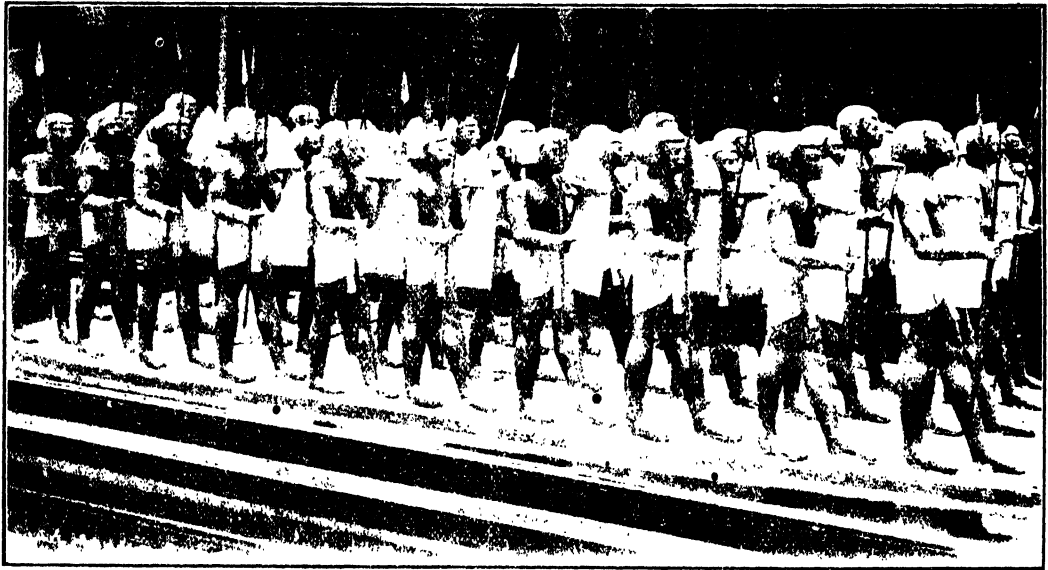
কাইরোর মিশরীয় সংগ্রহালয়ের একটি দৃশ্য— ফ্যারাওদিগের সেনা।

সত্যই পীরামিড একপ্রকার দিল্লীকা লাড্ডু; বিশাল স্তূপ—প্রকাণ্ড প্রস্তরফলকে নির্ম্মিত অট্টালিকা। ইহাই এখানকার বিশেষত্ব। এখানে আসিলে কেবল একমাত্র মনে হয় "এত পাথর আনিতে কত লোক লাগিয়াছিল? এইসকল পাথর বহন করিবার জন্য কোন কল আবশ্যক হইয়াছিল কি? কত দিন ধরিয়া কত লোক খাটিলে এইরূপ একটা স্তূপ নির্ম্মিত হইতে পারে?" এখানে শিল্প ও কারুকার্য্য-হিসাবে আর কিছু লক্ষ্য করিবার নাই।

এই স্থানে আরও দুইটি পীরামিড্ আছে—এগুলিও প্রায় সেই যুগেই নির্ম্মিত। নির্ম্মাণ-রীতি একরূপ। কোন বৈচিত্র্য নাই। ঠিক উত্তরদক্ষিণ পূর্ব্বপশ্চিম কোণ মাপিয়া প্রথম পীরামিডের সমান্তরালে পরে পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পীরামিড গঠিত। তবে দ্বিতীয় পীরামিডের প্রাচীর-চতুষ্টয়ের উপর আবরণ আছে, এই কারণে ইহা মসৃণ। অন্য দুইটির উপর কোন্ আবরণ নাই। এজন্য দ্বিতীয় পীরামিডের উপর উঠা যায় না। কিন্তু অন্য দুইটির

প্রাচীরগুলি প্রায় সিঁড়ির মত ধাপধাপ। সকল পীরামিডেরই প্রবেশদ্বার উত্তরপ্রাচীরে।

পীরামিড কবরের পার্শ্বেই দেবালয় ও মন্দির ছিল। এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষমাত্র বর্ত্তমান।

পীরামিড পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সমস্ত নাইল-উপত্যকার উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্র এবং মিশরের শস্যসম্পদ ও কাইরো-নগর দেখিতে পাওয়া যায়।

একটিমাত্র পীরামিড দেখিয়া পাহাড়ের দক্ষিণদিকে গেলাম। পাহাড়ের পাদদেশে প্রসিদ্ধ স্ফিঙ্কস্ (Sphinx) পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া অবস্থিত। এই স্ফিঙ্ক্সের মুখ অন্যান্যগুলির ন্যায় মেষের মুখ নয়। ইহার শরীর সিংহের, মুখ নরপতির। আমাদের নরসিংহ অবতারের কথা স্মরণ করিলাম। ইহার লম্বা লম্বা কানদুটি হাতীর কানের মত সুবিস্তৃত। স্ফিঙ্কসের দক্ষিণে একটা মন্দির—সম্প্রতি বালুকাপ্রোথিত।

এই স্ফিঙ্ক্সের যথার্থ তত্ত্ব এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। বোধ হয় পীরামিডের কারিগরেরা সম্মুখে একটা সিংহ সদৃশ পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিয়া ইহার শিরোদেশে রাজমুখ তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে, অবশ্য পরবর্ত্তী কালে জনগণ ইহার মধ্যে নানা তত্ত্ব বাহির করিয়াছে! সূর্য্যদেবরূপে এই মূর্ত্তি পূজাও পাইয়াছে।

প্রাচীন মিশরীয়েরা স্বকীয় ভৌতিক শরীর নানা কৌশলে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া আবৃত রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন। প্রস্তর-সিন্দুকের ভিতরে মামি রাখিয়া তাহার ভিতর মণিমাণিক্য ইত্যাদি সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি তাঁহারা পুঁতিয়া রাখিতেন। এই প্রস্তরসিন্দুকগুলিকে দস্যুতস্কর এবং শত্রু নরপতিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বিচিত্র কবর-নির্ম্মাণ-রীতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন কালেই কবরগুলির উপর দস্যুবৃত্তি অনেকবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, প্রায় কোন কবরই রক্ষা পায় নাই। নানা সময়ে নানা লোকেরা পীরামিডের গাত্র ভেদ করিয়া, কবরের দ্বার বাহির করিয়া, পর্ব্বত-প্রাচীর খুঁড়িয়া ফ্যারাওদিগের লুকায়িত ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছে। দৈবক্রমে যেগুলি আজকাল আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে দস্যুবৃত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়; কোন কোন কবর ঠিক প্রাচীন অবস্থায়ই রহিয়াছে।

প্রাচীন মিশরের জনপদ, নরপতি, অট্টালিকা, দেবদেবী, মন্দির, মস্তাবা ও কবর ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রত্যেক জিনিষেরই প্রায় তিনটা করিয়া নাম। একটা মিশরীয়, একটা গ্রীক এবং একটা আরবী। আমরা আজকাল গ্রীক নামেই এইগুলির পরিচয় পাইয়া আসিতেছি। গ্রীকেরা মিশরে রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রায় সকল বিষয়েই মিশরীয় আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন মিশরের ধর্ম্ম, কলা, শিল্প, সমাজ ও বিদ্যা, কোন বস্তুই গ্রীকেরা বর্জ্জন করেন নাই। সকলই তাঁহারা গ্রীকসভ্যতার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। এই কারণে আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তী গ্রীকেরা মিশরীয় সভ্যতার সকলপ্রকার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের নিকট বিশেষরূপেই ঋণী। কেবল তাহাই নহে—প্রাচীনতর গ্রীকেরাও মিশরের প্রভাব অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। মিশরে ভ্রমণ করিবার জন্য প্রাচীন গ্রীসের কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সকল শ্রেণীর লোকই আসিতেন। হেরোডোটাস হইতে প্লেটো পর্য্যন্ত সকলেই মিশরীয় বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন ও অন্যান্য গুহ্যতত্ত্ব শিখিয়া গিয়াছিলেন। ফলতঃ অনেকদিক হইতে প্রাচীন গ্রীসকে প্রাচীন মিশরের সন্তানরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

এইজন্য দেখিতে পাই—আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মিশরের প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় এত উৎসাহী। প্রাচীন মিশরকে ইহারা "প্রাচ্য" বা 'এসিয়াটিক' বলেন না। বরং প্রাচীন ইউরোপীয়সভ্যতার পথপ্রদর্শকরূপে ইহারা মিশরকে সম্মান করিতেছেন। তাহা ছাড়া মেরী ও যীশুর লীলাভূমিরূপেও মিশর আধুনিক খৃষ্টানদিগের তীর্থক্ষেত্র।

স্ফিঙ্কস্ হইতে বরাবর দক্ষিণদিকে গর্দ্দভপৃষ্ঠে অগ্রসর হইলাম। লীবিয়পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। খাঁটি মরুভূমি। ঈষৎ সুবর্ণ-রঞ্জিত বালুকার উপর দিয়া গর্দ্দভ চলিতে লাগিল। বালুর মধ্যে ইহাদের খুর বসিয়া যায়। অথচ গর্দ্দভ-চালকেরা আমাদের
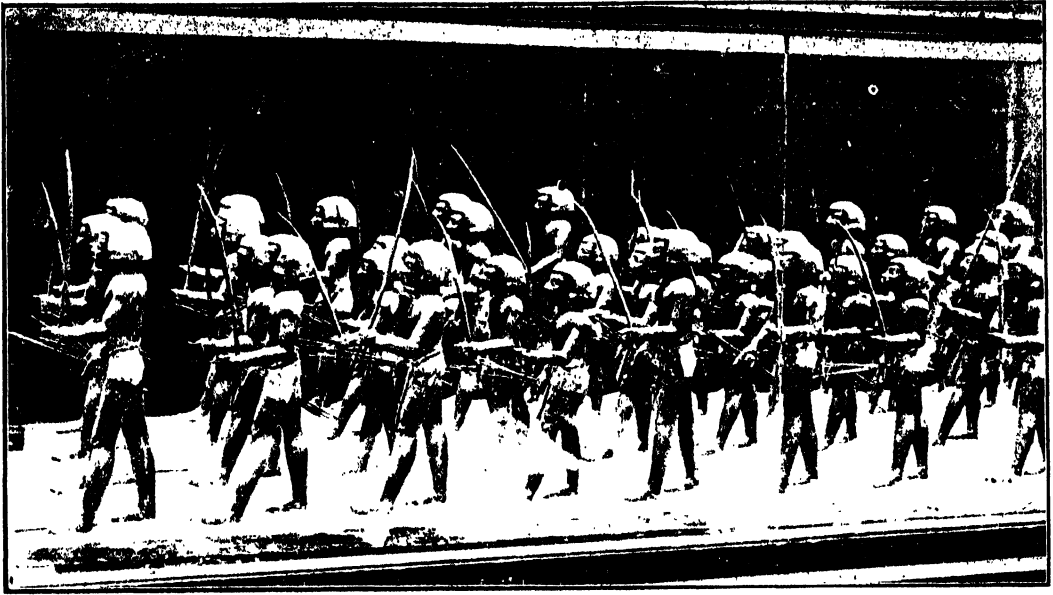
মিশর দেশের ২০০০ খৃঃ পূঃ সময়ের সৈন্যের নমুনা।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিক্রমপদে দৌড়াইয়া যাইতেছিল। এই পথ পূর্ব্বে নাইলনদের খাত ছিল। পরে নাইল পশ্চিম-পাহাড়ের চরণতল হইতে পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় দেখিলাম পারস্যসম্রাটেরা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে একটা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া নদীর গতি পূর্ব্বদিকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই বাঁধের ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু বর্ত্তমান।

দুইঘণ্টা গর্দ্দভপৃষ্ঠে চলিয়া সাক্কারা জনপদে উপস্থিত হইলাম। পথে বালুকাময় পর্ব্বতশৃঙ্গে আবুসিরের পীরামিড্ সমূহ দেখা গেল। পুরাতন ভগ্ন পীরামিড্ গুলি ভারতীয় বৌদ্ধস্তূপের মত দেখায়। এইগুলি পঞ্চম রাজবংশীয়গণের আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল (২৭০০ খ্রীঃ পূঃ)।

সাক্কারা দেখিতে পারিব আশা ছিল না। অল্পকাল মাত্র মিশরে কাটাইব স্থির করিয়া পূর্ব্বে সাক্কারা বাদ দিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম নিউবিয়া হইয়া সুডান পর্য্যন্ত যাওয়া যাইবে। কিন্তু আসোয়ানে পৌঁছিয়া বুঝা গেল তাহার জন্য আর এক সপ্তাহ বেশী আবশ্যক। কাজেই শীঘ্র কাইরোতে ফিরিয়া আসিয়া মিশরের প্রাচীনতম নগর মেম্ফিসে পদার্পণ করিতে পারিলাম। বর্ত্তমানে পল্লীর নাম সাক্কারা।

প্রথমে পবিত্র বৃষগণের সমাধিক্ষেত্র দেখা গেল। এই পশুদিগের কবরের নাম "সিরাপিয়াম্।" মানুষের কবরের জন্য যে ব্যবস্থা, বৃষের কবরের জন্যও সেই ব্যবস্থা। পাহাড়ের ভিতর ঘর তৈয়ারী করা, সার্কোফেগাস প্রস্তুত করা, বৃষের মাম্মি প্রস্তুত করা—সবই এক নিয়মে সাধিত হইত।

যে সিরাপিয়াম দেখিলাম তাহাতে এক্ষণে বড় বড় রাস্তাযুক্ত ২৫টা কামরা আছে। প্রত্যেক কামরায় ১০।১২ ফুট উচ্চ সার্কোফেগাস অবস্থিত। প্রায়ই গ্রানাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। লুক্সারের অপর পারে পর্ব্বতকন্দরে বিবান-উল্-মুলুকে যেরূপ রাজকবর দেখা গিয়াছে, এখানেও সেইরূপ বৃষকবর দেখা গেল। এই সিরাপিয়াম কোন একযুগে নির্ম্মিত হয় নাই। মেম্ফিসের দেবতা "তা"-দেবের বাহন বৃষ নগরের প্রধান মন্দিরে পূজিত হইত। তাহার মৃত্যুর পর ইহাকে ঐরূপে কবর দেওয়া হয়। কবে কাহার আমলে বৃষের সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে অষ্টাদশ রাজবংশীয় ফ্যারাওগণের

সময়েই ওখানে বৃষের সমাধিক্ষেত্র বর্ত্তমান ছিল (১৫০০ খৃঃ পূঃ)। পরে আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তী টলেমীদিগের কাল পর্য্যন্ত নানাসময়ে নানা কবর উহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

এই সকল বৃষ-কবরের উপর বৃষবাহনের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা এক্ষণে দেখা যায় না। কবরের মধ্যে গ্রীকযুগের কতকগুলি চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। গ্রীকেরা দেবদেবীগণের আশীর্ব্বাদ ও কৃপা ভিক্ষা করিবার জন্য এই কবরের গাত্রে নানা প্রার্থনা লিখিয়া যাইত। এইসমুদয় লিপি এখনও বর্ত্তমান। সিরাপিয়ামের মধ্যে প্রশস্ত রাস্তার ভিন্ন ভিন্ন ভাগে কতকগুলি খিলান-করা দরজা দেখিতে পাইলাম। সার্কোফেগাসের উপর যথারীতি চিত্রাঙ্কন এবং হায়েরোগ্লিফিক লিপিও খোদিত রহিয়াছে।

বৃষ-সমাধি দর্শন করিয়া বালুকাময় পথে মরুভূমির উপর আসিলাম। নিকটেই একটা বিশ্রামস্থান। আমেরিকান, জার্ম্মান, ফরাসী, ইত্যাদি নানাজাতীয় লোকের সঙ্গে এখানে দেখা হইল। পূর্ব্বদিকে কাইরো-নগর দেখা যাইতেছে, শ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া শীতলবায়ু আমাদের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। মরুভূমির ভিতরে এরূপ ঠাণ্ডা বাতাস প্রাকৃতিক নিয়মে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

বিশ্রামস্থানে আহারাদি করিয়া আর-একটা কবর দেখিতে বাহির হইলাম। এটা মানুষের কবর—পশুর নয়। তবে অন্যান্য কবর হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহা কোন ফ্যারাওর সমাধিক্ষেত্র নয়। প্রাচীনমিশরের একজন প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী ও ধনীব্যক্তি এই কবরের মধ্যে শয়ান। এইরূপ কবরকে 'মস্তাবা' বলে। সেই বিবান-উল্-মুলুকের রীতিতেই বালুকা-প্রোথিত পর্ব্বত-কন্দরে এই কবর নির্ম্মিত। কবরের নির্ম্মাণ-প্রণালী, প্রাচীরগাত্রে চিত্রাঙ্কন, কবরের অভ্যন্তরস্থ গৃহ-সমাবেশ ইত্যাদি সমুদয়েই সেই লুক্সারের কায়দা অনুসৃত দেখিলাম। তবে প্রদর্শক মহাশয় বলিলেন, "এই মস্তাবাগুলি বিবান্-উল্-মুলুকের রাজকবর অপেক্ষা বহুপ্রাচীন।"

এই স্থানে দুইটি বড় বড় মস্তাবা আছে। একটিতে 'তি'র, অপরটিতে 'মেরা'র মামি লুক্কায়িত ছিল। আমরা মেরার মস্তাবায় প্রবেশ করিলাম। প্রাচীনমিশরের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, সবই আমরা প্রাচীরগাত্রে চিত্রিত বা খোদিত দেখিতে পাইলাম। ভারতের জল-বাহকেরা যেরূপ স্কন্ধে বাঁক রাখিয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে জলের কলসী বহিয়া থাকে, প্রাচীন মিশরেও সেই নিয়মে ভারবহনের চিত্র দেখিলাম। একস্থানে দেখা গেল পশু-চিকিৎসালয়ের চিত্র, আর একস্থানে নর্ত্তকীদিগের অঙ্গ-ভঙ্গী। কোথাও মেরা পদ্মফুল শুঁকিতেছেন, কোথাও বা নরনারীগণ পূজার উপহার মাথায় লইয়া আসিতেছে।

মস্তাবা দেখিয়া পুনরায় গর্দ্দভপৃষ্ঠে যাত্রা করিলাম। প্রায় দুইঘণ্টা চলিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। পথে দুইতিনটা পল্লী দেখিতে পাওয়া গেল। শান্তিপূর্ণ লোকাবাস, মুদীখানা, দোকান ইত্যাদি সবতাতেই ভারতীয় পল্লীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। ফেল্লা ও ফেল্লাপত্নীরা মাঠে চাষ করিতেছে। শসা, কুমড়া, কড়াইশুটি, গম, তুলা, ইক্ষু ইত্যাদি নানাবিধ শস্যের আবাদ দেখিতে পাইলাম। পারশ্যচক্রের সাহায্যে ক্ষেতে জলসেচন করা হইতেছে। ছোট ছোট কোদাল ও উষ্ট্র-বাহিত লাঙ্গলের সাহায্যে মাটি কাটা হইতেছে। প্রায় সকল পথেই নাইলখালের নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত। জলের অভাব কোথাও লক্ষ্য করিলাম না। সর্ব্বত্রই কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখিতে পাইলাম।

এইপথে আসিতে প্রাচীন মেম্ফিসনগরের পুরাতন স্থান অতিক্রম করিলাম। এক জায়গায় রাম্সেস সম্রাটের বিশাল প্রতিমূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। এই প্রতিমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে তাঁহার পত্নীর চিত্র খোদিত। এইরূপ যুগলমূর্ত্তি লুক্সারের য়্যামন-মন্দিরে পূর্ব্বে কয়েকটা দেখিয়াছি।

রামসেসের মূর্ত্তি মেম্ফিসের দেবতা বৃষবাহন "তা"-দেবের মন্দির-সম্মুখে অবস্থিত ছিল। সেই মন্দিরের কোন অংশই বর্ত্তমান নাই। মাটি খুঁড়িয়া পাথর বাহির করা হইতেছে দেখিলাম।

মিশরের স্থাপত্য, অট্টালিকা এবং চিত্রাঙ্কণ দেখিয়া ভারতবর্ষের বিবিধ শিল্পকলার সঙ্গে তুলনা করিতে এখনও কোন সুধী প্রবৃত্ত হন নাই। ইংরেজ অধ্যাপক পেট্রি এবং ফরাসী অধ্যাপক ম্যাস্পেরো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ

কাইরোর মিশরীয় মিউজিয়মে রক্ষিত 'মামি'।

ভারতবর্ষের সঙ্গে মিশরের শিল্পকলার তুলনা করিতে যত্নবান্ হন নাই। প্রধানতঃ গ্রীক এবং গৌণতঃ ব্যাবিলনীয় শিল্পকলার সঙ্গে মিশরীয় শিল্পকলার তারতম্য নির্ণীত হইতেছে মাত্র। ভারতবাসীর এদিকে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ মিশরের সঙ্গে ভারতের সংযোগ ছিল কি না তাহার বিচার করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ মিশরের শিল্পকলাই জগতের আদি শিল্পকলা কিনা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখন আর তাহা সন্দেহ করিতেছেন না। ভারতীয় শিল্পকলা যে মিশরীয় শিল্পকলারই পৌত্র বা প্রপৌত্র মাত্র পাশ্চাত্য সুধীবর্গ তাহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতেছেন। এই সিদ্ধান্তেরও পুনরায় আলোচনা হওয়া আবশ্যক, সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে মিশরীয় ও ভারতীয় শিল্পের তুলনা-সাধন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। ভারতের স্বদেশী প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এ দিকে দৃষ্টি না দিলে বিষয়টা যথোচিত আলোচিত হইবে না।

এতদ্ব্যতীত, শিল্প এবং কারুকার্য্য হিসাবেও মিশরীয় ও ভারতীয় গৃহনির্ম্মাণ, মূর্ত্তিগঠন এবং চিত্রাঙ্কণের তুলনা সাধিত হওয়া আবশ্যক। উভয়শিল্পের অন্তর্নিহিত "প্রেরণা" নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। সৌন্দর্য্য ও সুকুমার কলার দিক্ হইতে উভয় জাতির উৎকর্ষ নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

যতটা লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে মনে হয়, বিশালতা, বিপুলতা, উচ্চতা ইত্যাদি পরিমাপের গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব মিশরীয় বাস্তু, মূর্ত্তি ও চিত্রের প্রধান লক্ষণ। ভারতীয় শিল্পেও দৃঢ়তা, বিপুলতা এবং গাম্ভীর্য্য যথেষ্ট আছে। তবে মিশরীয় শিল্পে এগুলি যে-পরিমাণে দেখিতে পাই, ভারতীয় শিল্পে বোধ হয় সে পরিমাণে পাই না।

দ্বিতীয়তঃ, মন্দিরের গৃহসন্নিবেশ এবং বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ অনেকটা হিন্দুদেবালয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। "পাইলেন" আমাদের তোরণদ্বার বা গোপুরমের অনুরূপ। তারপর স্তম্ভবিশিষ্ট জগমোহন, ভোগমন্দির, দেবতার স্থান, পুরোহিত-গৃহ ইত্যাদির অনুরূপ সকল অঙ্গই মিশরীয় মন্দিরে লক্ষ্য করিয়াছি। অবশ্য গঠনকৌশল এবং গঠনের উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে একরূপ নয়।

তৃতীয়তঃ, পর্ব্বতকন্দরে মন্দির বা কবর নির্ম্মাণ করিবার রীতি মিশরের ন্যায় ভারতবর্ষেও যথেষ্ট দেখিতে পাই। মিশরের এই-সমুদয় দেখিয়া যতদুর আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া যায়, ভারতের কার্লী, অজন্তা, গোয়ালিয়র দেখিয়া তাহা অপেক্ষা কম বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কারু-

কার্য্যের সৌন্দর্য্য, গৃহ-সজ্জার শৃঙ্খলা, প্রকোষ্ঠের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি ইত্যাদি কোন বিষয়েই মিশরীয় পর্ব্বতকন্দরস্থ বাস্তুশিল্প ভারতীয় পর্ব্বতগহ্বরস্থ বাস্তুশিল্প হইতে স্বতন্ত্র নয়।

চতুর্থতঃ, পীরামিড ও স্তূপ দুইই একশ্রেণীর অন্তর্গত। দুইই সমাধির উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত—দুইএরই নির্ম্মাণপ্রণালী অনেকটা একপ্রকার।

পঞ্চমতঃ, চিত্রাঙ্কণে মিশরীয় শিল্পীদিগের ক্ষমতা বেশী কি হিন্দুস্থানের শিল্পীদিগের ক্ষমতা বেশী তাহা মাপিয়া উঠা কঠিন। মনোভাব ফলাইবার ক্ষমতা উভয়েই বিদ্যমান। ধর্ম্মের কাহিনী, ইতিহাসের কথা, সমাজের অবস্থা, জনগণের চরিত্র ইত্যাদি সবই ভারতবর্ষের ও মিশরের স্তূপগাত্রে, সমানভাবেই বিবৃত হইয়াছে। মিশরী ও ভারতীয় শিল্পের তারতম্য করা কঠিন। অবশ্য এখানকার ধর্ম্মতত্ত্ব ও ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব স্বতন্ত্র। এই যা প্রভেদের জন্য মূর্ত্তিনির্ম্মাণে ও কাহিনী-প্রচারে শিল্পীদিগের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইবে।

ষষ্ঠতঃ, মূর্ত্তিগঠন সম্বন্ধে ও কারিগরি হিসাবেও এই কথাই বলা যাইতে পারে।

আর একটা কথা মিশরসম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। এখানকার জলবায়ুর গুণে বাড়ীঘর সবই পাহাড়ের মত বহুকাল দৃঢ় ও সবল থাকে। ভারত-বর্ষের বর্ষা ও ঝড় মিশরে থাকিলে এতদিন পর্য্যন্ত মিশরীয় কারুকার্য্য বাঁচিয়া থাকিত কি না সন্দেহ। ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে মিশরীয় শিল্পের তুলনার কালে একথা ভুলিলে চলিবে না।

দ্বাদশ দিবস—মিশর-তত্ত্ব

প্রাচীন মিশরের নানা কেন্দ্র দেখা হইয়া গেল। এইবার পুরাতন বস্তুসমূহের সংগ্রহালয় বা মিউজিয়াম দেখিতে গেলাম। মিউজিয়াম দেখিবার পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থান স্বচক্ষে দেখা থাকিলে প্রাচীন সমাজ বুঝিতে যথেষ্ট সাহায্য হয়। মিউজিয়াম-গৃহে বসিয়া, প্রত্যেক বস্তুর স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনা করা চলিতে পারে। কিন্তু যথাস্থানে ধ্বংসরাশির মধ্যে ভগ্নস্তূপ বা ভগ্নমন্দির এবং মূর্ত্তির বিচ্ছিন্ন অংশ অথবা প্রাচীরগাত্র এবং নষ্টপ্রায় চিত্র না দেখিলে পুরাতন জীবনযাপনপ্রণালী, পুরাতন ধর্ম্মপ্রথা, পুরাতন সমাজের মূর্ত্তি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। প্রথমেই এইগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়া রাখিলে প্রাচীন জনগণের আদর্শ ও চিন্তাপদ্ধতি খানিকটা আয়ত্ত করিয়া ফেলা যায়। তাহার পর মিউজিয়ামে আসিলে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য, পরে কার্য্য এবং যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য হয়।

কাইরোনগরে দুইটি মিউজিয়াম। একটি প্রাচীন মিশরতত্ত্ব-বিষয়ক। অপরটি মধ্যযুগের মিশরতত্ত্ব-বিষয়ক। প্রথমটিতে মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিশরের সকল বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মুসলমানী শিল্প ও কলার নানা নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। দুইটি মিউজিয়াম ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রাচীনমিশরতত্ত্ব-বিষয়ক মিউজিয়মে একজন মুসলমান প্রত্নতত্ত্ববিদের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি এখানকার অন্যতম কিউরেটর বা পরিচালক। ইনি ১৬ বৎসর বয়স হইতে প্রাচীন মিশরীয় লিপি শিক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে ইহার বয়স প্রায় ৬০ হইবে। প্রাচীনমিশরতত্ত্ব সম্বন্ধে ইনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইনি আরবী ও ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি এই মিউজিয়মের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-বিষয়ক নানা রিপোর্ট ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ফরাসীভাষায় গ্রন্থগুলি লিখিত। সম্প্রতি ইনি এক বিরাটগ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আরবী ও মিশরীয় নৃতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া প্রাচীনমিশরীয় জাতিতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ইনি দেখাইতে চাহেন যে হায়েরোগ্লিফিকের চিত্রসমূহের নাম আরবী অক্ষরমালার নামান্তরমাত্র। আরবী জানি না। সুতরাং ইহার সকল কথা ভাল বুঝিলাম না।

অন্যান্য বিষয়েও কথাবার্ত্তা হইল। তাহাতে বুঝা গেল যে, প্রাচীনভারতের বেশী কথা মিশরের ভাষা সাহিত্যে বা শিল্পে জানা যায় না। মিশরের বাণিজ্যপ

বোধ হয় ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর—এই দুইটি সাগরের সমীপবর্ত্তী জনপদ-সমূহই প্রাচীন মিশরবাসীর কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প, ধর্ম্ম, সংগ্রাম, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি কোন বিষয়েই মিশরীয়েরা বেশী দূর অগ্রসর হন নাই।

মিশরের পর্ব্বতমধ্যেই যে-সমুদয় ধাতু জন্মিত সেই-গুলি হইতেই নানাপ্রকার রং প্রস্তুত হইত। নীল রং অথবা গোধুম ভারতবর্ষ হইতে মিশরে আসিত কি না তাহার কোন সাক্ষ্য নাই। নীল রং উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত করা হইত না। ধাতু ও প্রস্তর হইতে তৈয়ারী করা হইত। কিউরেটর মহাশয় এসিয়ুতের নিকটবর্ত্তী একস্থানে কোন কবর খনন করিতে করিতে কতকগুলি শস্যশালা পাইয়াছেন। সেগুলি ষষ্ঠরাজবংশীয় যুগের (২৬০০ খৃঃ পূঃ)। সেই শস্যশালার মধ্যে গোধুম পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং গোধুমের চাষ মিশরে অতি প্রাচীন।

ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম "পান্তদেশ কোথায়?" ইনি বলিলেন "পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগের মত ছিল যে আরবের উত্তর দিকে পান্তদেশ। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে সোমালিদেশই প্রাচীন পান্ত জনপদ। এই স্থানে নানা সুগন্ধিদ্রব্য উৎপন্ন হইত। ধূপ, ধাতু, প্রস্তর ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থ আনিবার জন্য রাণী হাৎসেপ্‌সুট বাণিজ্যতরী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার লোকজন আসোয়ানের নিকট হইতে পূর্ব্বদিকে মরুপথে অগ্রসর হইয়াছিল। পরে লোহিতসাগরের কোন বন্দরে নৌকা করিয়া দক্ষিণে যাত্রা করে। অবশেষে এডেনের অপর পারে আফ্রিকার কূলে পান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

কিউরেটর মহাশয় এক্ষণে মিশরের দুই তিন স্থানে মৃত্তিকা খনন করিয়া লুপ্তবস্তুর উদ্ধারসাধনে নিযুক্ত আছেন। এই-সকল স্থানে নূতন নূতন মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হইবে। একজন ফরাসী পণ্ডিত মিউজিয়ামের এক কোণে বসিয়া পুরাতন লিপি পাঠ করিতেছেন। অন্যত্র এক গৃহে একজন জার্ম্মান দর্শক কয়েকটি মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ লইতেছেন। দুএকস্থানে দেখা গেল একজন জার্ম্মান প্রদর্শক ৫০।৬০ জন নরনারীকে উচ্চগলায় বক্তৃতা করিয়া মিউজিয়মের দর্শনীয় জিনিষগুলি বুঝাইয়া দিতেছেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বেচারারা এই মাষ্টারমহাশয়ের বক্তৃতা গম্ভীর-ভাবে শুনিতেছে!

কিউরেটর মহাশয়ের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক আলাপ করা গেল। আসিবার সময়ে তাঁহাকে হোটেলে চা পানের নিমন্ত্রণ করিলাম। যথাসময়ে তিনি আসিলেন।

পীরামিডের গাত্রস্থিত প্রবেশদ্বার।
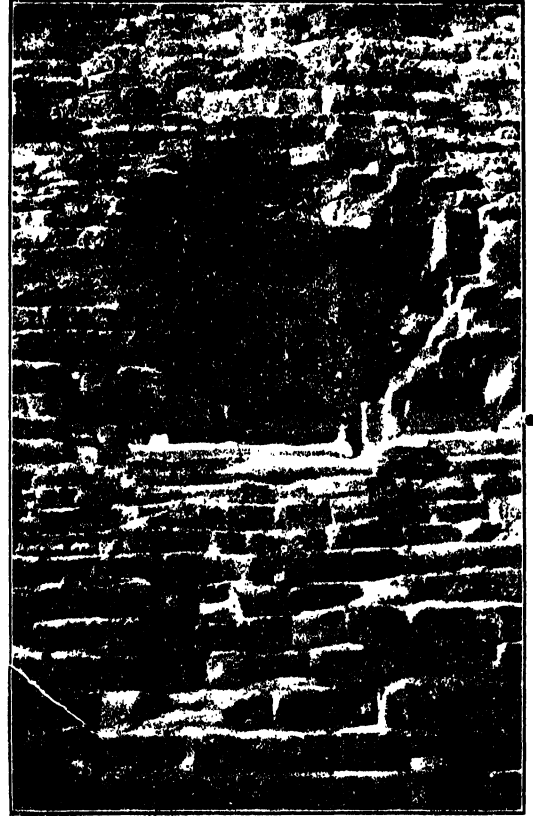
পীরামিড্-রচনার মাপ ও কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তিনি একজন শিক্ষকও বটে। প্রায় ৬।৭ জন মুসলমান ছাত্র তাঁহার নিকট মিশর-তত্ত্ব নিয়মিতরূপ শিক্ষা করিয়া থাকে। ইনি তাহাদিগকে আরবীভাষায় শিখাইয়া থাকেন। ইহাঁর দুই পুত্র ফরাসী শিক্ষা পাইয়া সীরিয়াদেশে হাকিমী শিক্ষা করিতেছে। আর এক পুত্র ইংরেজী শিখিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশর-তত্ত্ব শিখিতেছে।

কাষ্ঠমূর্ত্তি
৪০০০ বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত।

প্রাচীন মিশরতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়াম হইতে মুসলমানী মিশরতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়ামে গেলাম। খাঁটি মুসলমানী দ্রব্যের সংগ্রহালয় কাইরোর এই মিউজিয়াম ব্যতীত আর কোথাও আছে কি না জানি না। বাস্তুশিল্পের বিভিন্ন অঙ্গই এই মিউজিয়মে প্রধানতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর, মিউজিয়াম-গৃহ এখনও ক্ষুদ্র—অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ। এই মিউজিয়ামের দর্শনীয় বস্তুর তালিকা ম্যাক্স হার্জ বে কর্ত্তৃক জার্ম্মান ভাষায় প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহার এক ইংরেজী অনুবাদও আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মুসলমানী শিল্পের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থ বেশ সুলিখিত। যাঁহারা ভারতে মুসলমান মসজিদ ও কবর ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজে অনেক কথা শিখিতে পারিবেন।

এই আরবী মিউজিয়ামের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার আছে। তাহার মধ্যে প্রায় একলক্ষ গ্রন্থ রক্ষিত হইতেছে। প্রধানতঃ মুসলমানী সাহিত্যই এই গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

এই মিউজিয়ামে বেড়াইতে বেড়াইতে মনে হইতে লাগিল—মধ্যযুগে মুসলমানেরা এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা—সর্ব্বত্রই প্রতাপশালী ছিলেন। হয় সাম্রাজ্য, না হয় খণ্ডরাজ্য, প্রদেশ-রাজ্য বা অধীনরাজ্য ইত্যাদি প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক মুসলমানসমাজ চীন হইতে স্পেন পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। স্পেনের সঙ্গে মিশরের, মিশরের সঙ্গে ভারতের, পারস্যের সঙ্গে তুরস্কের, এবং পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কিরূপ ধর্ম্মসংযোগ ও ব্যবসায়-সম্পর্ক ছিল তাহা জানা আবশ্যক। এদিকে অনুসন্ধান চালিত করিলে ভারতবর্ষের চিন্তা কোনপথে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল জানিতে পারা যাইবে। আবার অন্য কোন্ কোন্ দেশের প্রভাবে ভারতের মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের শিল্প, সমাজ, ধর্ম্ম ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহাও জানিতে পাইব। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের পক্ষে এই একটা নূতন আলোচ্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিশরের ব্যবসায়সম্বন্ধ বেশ ঘনিষ্ঠই ছিল। মিশরে যাঁহাকে প্রদর্শকস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ষোড়শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদপ্রদেশ হইতে এইখানে আসেন। তাঁহাদের নীলের ব্যবসায় ছিল। মিশরের লোক-সাহিত্যেও ভারতবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাই। মিশরীরা ভারতবর্ষকে 'হিন্দি' বলে। ভারতের হিন্দুই হউক, মুসলমানই হউক, তাহারা 'হিন্দি' নামে পরিচিত। 'হিন্দির শাল আলোয়ান', 'কাশ্মীরের শাল' ইত্যাদি শব্দ

কৃষকগণের সরলগীতের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের হিন্দু মুসলমান নিউবিয়া সুডান ও মিশরের নানাস্থানে প্রতাপশালী ব্যবসায়ী জাতিরূপে বিবেচিত হইতেন। ইহাঁদের ব্যবসায় এক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় বণিকগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। আজকালও মিশরে বোম্বাই, গুজরাত, সিন্ধু প্রভৃতি দেশের হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীরা বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। আমাদের এখানকার গুজরাতী বন্ধুগণের কারবার মিশরের নানা কেন্দ্রে বেশ চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত ইহাঁরা জিব্রল্টর, মল্টা, জাপান, যবদ্বীপ প্রভৃতি জগতের নানাস্থানে একসঙ্গে ব্যবসায় চালাইতেছেন।

ফরাসীভাষা জানা থাকিলে মিশরে চলাফেরায় বিশেষ সুবিধা হয়। মিশরবাসীর মাতৃভাষা আরবী। জনসাধারণ আরবীতে কথা বলে। কিন্তু শিক্ষিত ও ভদ্রব্যক্তিরা সকলেই ফরাসী জানেন। প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী জানেন না দেখিতেছি। ইহাঁদের সঙ্গে আলাপ করিতে যাইয়া সর্ব্বদা দোভাষীর সাহায্য লইতে হইয়াছে।

ইহাঁরা উচ্চশিক্ষা ও নব্যসভ্যতার দ্বারস্বরূপ ফরাসীভাষা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহাঁরা ইউরোপকে ফরাসী জাতির ভিতর দিয়া চিনিয়াছেন। আমরা যেমন ইংলণ্ডের সাহায্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার পরিচয় পাইয়াছি; ইহাঁরা সেইরূপ ফরাসীজাতির সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিয়া আধুনিক জগতের হাবভাব, আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী আয়ত্ত করিয়াছেন। আমরা "বিলাতফেরৃতা" বলিলে যাহা বুঝিয়া থাকি মিশরবাসীরা "আলা ফ্রাঙ্কা" শব্দ ব্যবহার করিয়া সেইরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। যেসকল মিশরী পাশ্চাত্যভাষায় কথা বেশী বলে, বিদেশীয় কায়দায় জীবনযাপন করে এবং ইউরোপীয় চালে বেশভূষা করিতে ভালবাসে, সেইসকল অনুকরণপ্রিয়, চরিত্রহীন, ব্যক্তিত্বহীন লোককে এখানে "আলা ফ্রাঙ্কা" বলা হয়।

অবশ্য আলা-ফ্রাঙ্কা অল্পদিন মাত্র এইরূপ তিরস্কারে পরিণত হইয়াছে। পরানুকরণ ও পরানুবাদ মিশরবাসীর মধ্যে সম্প্রতিমাত্র দুর্ব্বলতার আকার ধারণ করিয়াছে। একশত বৎসর পূর্ব্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মিশরের খেদিভ ছিলেন কর্ম্মবীর মহম্মদ আলি। তিনি স্বচেষ্টায় ইউরোপের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান মিশরে প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টিত হন। তখনও ফ্রান্সই ইউরোপের অনেকটা হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। দিগ্বিজয়ী শক্তিশালী নেপোলিয়ান তখন জগৎকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন মূর্ত্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত। মহম্মদ আলি নেপোলিয়ানের আদর্শে জীবন গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। তুরস্কের সুলতানকে মিশর হইতে বহিষ্কৃত করা তাঁহার সাধ ছিল। এমন কি স্বয়ং তুরস্কের সুলতানপদে অধিষ্ঠিত হওয়াও তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তুরস্ক তখনও সুবিস্তৃত রাজ্য। এই রাজ্যকে ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্রধান খণ্ডে বিভক্ত করা ইউরোপীয়েরা পছন্দই করিতেন। বিশেষতঃ নেপোলিয়ান ও ফরাসীরা মিশরকে প্রবল করিয়া তুরস্কের খর্ব্বতাসাধনে উৎসাহী ছিলেন। এইজন্য মহম্মদ আলির সঙ্কল্পে ফরাসীরা সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

মহম্মদ আলি ফরাসী পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, শিল্পী, কারিগর ইত্যাদি সকলপ্রকার লোক স্বদেশে আমদানী করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই "আলা-ফ্রাঙ্কা" আন্দোলনে বিন্দুমাত্র পরাধীনতা, দুর্ব্বলতা এবং দাস্যের চিহ্ন ছিল না। জাতীয় স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্যই তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে ফরাসীজাতির পাণ্ডিত্য স্ব-সমাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের গৌরববিস্তার, আরবীভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এবং মিশরবাসীর রাষ্ট্রীয় ও সর্ব্ববিধ দক্ষতা বর্দ্ধনই তাঁহার সকল কর্ম্মের চরম লক্ষ্য ছিল। এই স্বদেশী আন্দোলনের সহায়স্বরূপই মহম্মদ আলি আলাফ্রাঙ্কা আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। রুশিয়ার গৌরবপ্রতিষ্ঠাতা পিটারও রুশ জাতীয়-জীবনের উৎকর্ষবিধানের জন্য এইরূপ বিদেশীয় জ্ঞানীদিগের সাহায্য লইয়াছিলেন। প্রুশিয়ার ফ্রেড্রিকও এই পথ ধরিয়াছিলেন। স্বীয় সমাজকে অবনত ও ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে উন্নত ও গৌরবশালী করিয়া তুলিবার জন্য সকল কর্ম্মবীরই জগতের শক্তিপুঞ্জ এইরূপে নিজস্বার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহারা

নানা গুণীব্যক্তিকে অর্থসাহায্য, সম্পত্তিদান ইত্যাদি দ্বারা স্বদেশে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টিত হন। মহম্মদ আলি জগতের এইরূপ সংরক্ষণশীল সভ্যতাপ্রবর্ত্তক বীরপুরুষগণের অন্যতম।

সুতরাং মহম্মদআলির আমলে আশাক্রাঙ্কা আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনেরই উপায় ও সহায়মাত্র ছিল। পরবর্ত্তী কালে নানা কারণে মিশরে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে। মিশরবাসীরা স্বচেষ্টায় স্বাধীনভাবে এবং নিজ ভবিষ্যৎ স্বার্থ অনুসারে বিদেশীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। পরানুকরণ ও পরানুবাদের দোষ এই সময়ে মিশর-সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে। আজকাল দেখিতেছি ইউরোপের চরিত্রহীনতা, বিলাসপ্রিয়তা, এবং বাহ্যনিষ্ঠাই মিশরীয় আশাক্রাঙ্কার প্রধান লক্ষণ।

যাহা হউক, শক্তিমানের ন্যায়ই হউক বা দুর্ব্বলের ন্যায়ই হউক, মিশরবাসীরা ফরাশী ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প একশতাব্দীকাল আদর করিয়া আসিতেছে। এজন্য এখনও ফরাসীবিদ্যায় পণ্ডিত লোক মিশরে অনেক দেখিতে পাইতেছি। বিদ্বান্‌লোক বলিলেই মিশরবাসীরা ফরাসীশিক্ষিত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া থাকে।

আজকাল মিশররাষ্ট্রের রাজকর্ম্ম দুই-ভাষায় চলিয়া থাকে—আরবী ও ফরাসী। বিদ্যালয়েও ফরাসী শিক্ষারই প্রাধান্য। সংবাদপত্র ফরাসীভাষায় বেশী। মিশরবাসীদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষালাভের পর গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাহারা ফরাসীভাষাতেই লেখক। বিচারালয়ে উকীলেরা ফরাসীভাষায় অথবা আরবীভাষায় বক্তৃতা করেন। ব্যবসায়মহলেও ফরাসীভাষার প্রভাব দেখিতে পাইতেছি। হাটে বাজারে, দোকানে, হোটেলে, থিয়েটারে, কাফি-গৃহে, ট্রামে, রাস্তার নামে, বিজ্ঞাপনে সর্ব্বত্রই ফরাসী ভাষা দেখিতে পাই। আমাদের দেশের কুলীমজুর গাড়োয়ানেরা যেমন দুইচারিটা ইংরেজী কথা বলিতে পারে, এখানকার সেই শ্রেণীর লোকেরা সেইরূপ ফরাসীতে বুক্‌নি দেয়। এইজন্যই ফরাসী জানা থাকিলে মিশরের সকল মহলে সহজে প্রবেশ করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ ভাষা জানা ছিল না। এজন্য যথার্থভাবে মিশরের হৃদয় অধিকার করিতে পারিলাম না বলিতে বাধ্য।

অবশ্য ইতালীয় ও গ্রীক এই দুইটা ভাষাও এখানকার অনেক লোকই জানেন। তাহার কারণ আর কিছুই নয়। বহুকাল হইতেই মিশরে অনেক ইতালীয় ও গ্রীক বাস করিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে। কাজেই তাহাদের সংস্পর্শে আসা জনসাধারণের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলকেই গ্রীক ও ইতালীয় লোকজনের সঙ্গে কারবার করিতে হয়। ইংরেজীভাষা শিক্ষা করা মিশরবাসীরা কোনদিনই প্রয়োজন বোধ করে নাই। মহম্মদ আলির সময়ে ইংরেজ জগতে তত প্রবল ছিল না। আরবী মিউজিয়মে একখানা হস্তলিখিত দলিল দেখিলাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের প্রায় ১০০ জন বণিক্ ও ব্যবসায়ী বোম্বাইনগর হইতে মহম্মদ আলিকে কাকুতি মিনতি করিয়া পত্র লিখিয়াছে। মিশরের পথ দিয়া মহম্মদ আলি যাহাতে ইংরেজদিগকে ভারতে আসিতে দেন এই আবেদনের তাহাই মর্ম্ম। তাহা ছাড়া তিনি ইংরেজ বণিকদিগকে দুইএকক্ষেত্রে এই উপায়ে সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে ইহারা যৎপরোনাস্তি ধন্যবাদ দিয়াছে।

ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পরে সুয়েজখাল খোলা হয়। খেদিভ সৈয়দপাশার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ফরাসী এঞ্জিনীয়ার লেসেপ্স এই কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ফরাসীর স্বার্থ ইহার দ্বারা বিশেষ পুষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় ইংরেজেরা সুয়েজখাল বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহাদের প্রভাব মিশরে বেশী ছিল না।

আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল ঘটনাচক্রে ইংরেজ মিশরে বসিয়াছে। তাহার ৪৪০০ সৈন্যও মিশরদুর্গে অবস্থিতি করিতেছে। তাহার লোকজন, বণিক, কর্ম্মচারী, এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ একে একে মিশরে স্থান পাইতেছে। মিশরের মন্ত্রণাসভা এক্ষণে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইতেছে। তাহার উপর সুয়েজখালের প্রধান অংশাদারই এক্ষণে ইংরেজ। অধিকন্তু মিশরের দক্ষিণ দেশ সুডান অনেকটা ইংরেজাধিকৃত। সুডান হইতে লোহিতসাগর পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইতেছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ-

তর হইবে বলিয়া লোহিতসাগরের মধ্যভাগে একটা ব্রিটিশবন্দর গড়িয়া তুলিবার আয়োজন চলিতেছে।

এইসকল কারণে ইংরেজীভাষা সম্প্রতি মিশরে প্রসারলাভ করিতেছে। প্রধানতঃ কেরাণী ও নিম্নপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরাই এইভাষা শিখিতে বাধ্য। যুবকেরা বিদ্যালয়ে ও কলেজে ইংরেজীভাষাতেই শিক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এখনও প্রধান বা প্রসিদ্ধ লোকের মধ্যে ইংরেজী-শিক্ষিত লোক বিরল। নব্যমিশর ইংরেজীপ্রভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু এখনও রাষ্ট্রকর্ম্মে ইংরেজীভাষা ফরাসীভাষার স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। এখনও ইংরেজীভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মিশরবাসীর আদর সত্যসত্যই বাড়ে নাই। ফরাসীশিক্ষাই এখনও এদেশ-বাসীরা আদর করিতেছে।

ফরাসীজাতি কোন কাজই দক্ষতার সহিত করিতে পারে না দেখিতেছি। তাহারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিবার পথ ইংরেজকে দেখাইয়া দিল। অথচ এক্ষণে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শুনা যায় না! আবার মিশর-বাসীর স্বাধীনচেষ্টায় ফ্রান্সের লোকজন, শিল্পবিজ্ঞান, ভাষাসাহিত্য মিশরে প্রবেশ করিতেছিল। তাহাও ফরা-সীরা রক্ষা করিতে পারিল না। মিশরের বড় বড় কার-বার, সবই ফ্রান্সের হাত হইতে পরহস্তে চলিয়া যাইতেছে। *

শ্রীপর্য্যটক।

লাক্ষা

কতকগুলি গাছের রস হইতে লাক্ষার উৎপত্তি; এক-প্রকার পোকা ঐসকল গাছের রস শুষিয়া লইয়া পরে উহা দেহের চারিদিকে কঠিন আবরণে পরিবর্ত্তিত করে; এই আবরণই আমাদের লাক্ষা।

অতি প্রাচীনকালের লোকেরাও লাক্ষার চাষ করিত; তাহার প্রমাণ, লাক্ষাতরু শব্দ প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে দৃষ্ট হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক "আইন আকবরীতে"ও
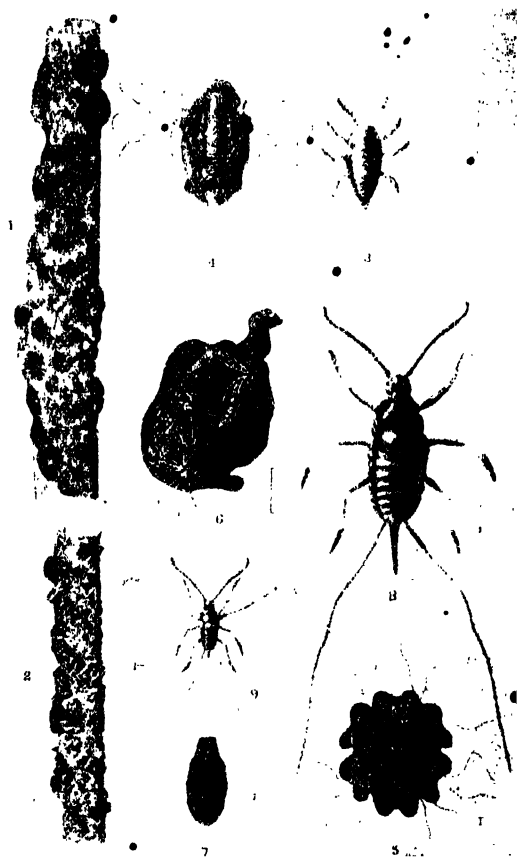
১। ডাঁটার উপর পুষ্ট পোকা, ২। অপুষ্ট পোকা, ৩। ছোট পোকা (বর্দ্ধিতাকার), ৪। একমাসবয়স্ক স্ত্রীপোকা (বর্দ্ধিতাকার) ৫। তিনমাসবয়স্ক স্ত্রীপোকা (বর্দ্ধিতাকার), ৬। স্ত্রীকোষ হইতে ক্ষুদ্র লাক্ষার পোকা বাহির হইতেছে (বর্দ্ধিতাকার), ৭। তিনমাসের পুং কোষ (বর্দ্ধিতাকার), ৮। ডানাবিহীন পুং পোকা (বর্দ্ধিতাকার)। ৯। ডানাযুক্ত পুং পোকা (বর্দ্ধিতাকার)।

দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজপ্রাসাদ বার্নিশ করিবার জন্য লাক্ষা সংগ্রহ করা হইত।

এযাবৎকাল স্থানে স্থানে অল্পসংখ্যক লোকেই লাক্ষার চাষ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে এই কার্য্যের বিস্তৃত আয়োজন দ্বারা প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা উৎপাদন করা অল্প-আয়াস-সাধ্য, বিশেষ সময়োপযোগী ও লাভজনক ব্যবসা। উক্ত পোকারা অনেকপ্রকার গাছের উপর জন্মাইতে পারে, তবে কুল, পলাশ (লাক্ষাতরু), কুসুম, অশ্বত্থ, শিরীষ গাছেই ইহাদের জন্ম ও বিস্তৃতি খুব অধিক।

---

* বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে মিশরে ইংরেজপ্রভাব ও প্রভুত্ব বদ্ধমূল হইয়া গেল।—প্রবাসী সম্পাদক।

মন্দভাবে কুলগাছ ছাঁটা হইয়াছে।

এই গাছগুলির আবাদ বেশী ব্যয়সাধ্য নহে। নিম্নে ইহাদের চাষ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা যাইতেছে :—

কুল :—কুলগাছের আবাদের জন্য খুব উর্ব্বরা জমির প্রয়োজন নয়। পুকুর, মাঠ, নদী ও নালার ধারে কিম্বা পতিত জমিতে কুলগাছ জন্মাইয়া তাহার উপর লাক্ষার চাষ হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে ইহার ডাল ছাঁটিয়া দিলে গাছের খুব উপকার হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে কচি কচি ডাল পুনরায় বাহির হইলে উহার উপর লাক্ষার পোকা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়। হিসাব করিয়া গাছ ছাঁটিলে বৎসরে একবার করিয়া লাক্ষার ফসল পাওয়া যাইতে পারে। পুসাতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এক কুলগাছ হইতে ক্রমান্বয়ে ছয়বৎসর লাক্ষার ফসল হইয়াছে। আশা করা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও এইরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারিবে।

পলাশ :—আমাদের দেশে জঙ্গলে পলাশগাছ খুবই হয়। ইহার আবাদের জন্য বেশী উর্ব্বর জমি ও যত্নের প্রয়োজন হয় না। পলাশগাছ ছাঁটিলে অনেক কচি কচি ডাল বাহির হয়। এই গাছ হইতে যে লাক্ষা প্রস্তুত হ তাহার রঙ খুব গাঢ় হয় এবং ইহাকে রজন্ কহে।

কুসুম :—কুসুমগাছ যদিও বেশী দেখা যায় না, কি ইহা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও উৎকৃষ্ট লাক্ষা পাও যায়। কুসুমগাছ একটু স্যাঁৎসেঁতে জমিতে ভাল হয় নদী কিম্বা নালার ধারই ইহার পক্ষে উপযুক্ত। কুসুমগা হইতে লাক্ষা বীজ (Brood Lac) লইয়া কুল কিং পলাশ গাছের উপর জন্মাইলে অত্যধিক পরিমাণে লাগ উৎপন্ন হয়। কুসুমগাছ হইতেই লাক্ষাবীজ লই অন্যগাছে বিস্তার করা উচিত। কিন্তু ইহাতে অসুবি এই যে এই গাছ হইতে প্রতি-বৎসর ফসল পাওয়া যা না। প্রত্যেক দুই তিন বৎসরে একবার করিয়া ফস পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রত্যেক দু তিন বৎসর অন্তর এই গাছ হইতে যে লাক্ষা পাওয়া যা তাহা পরিমাণে ও গুণে খুবই অধিক ও উৎকৃষ্ট।

পিঁপলগাছ :—আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই এই গা জন্মায়। ইহা হইতে ফিকে হলদে রঙএর লাক্ষা পাওয় যায়। এবং নিম্নশ্রেণীর চাঁদ গালা বা চাঁচ গালা প্রস্তুতে জন্য ইহা খুব ব্যবহার করা হয়। দুইবৎসর অন্ত পিঁপলগাছ হইতে ফসল পাওয়া যাইতে পারে।

শিরীষ :—সাধারণতঃ রাস্তার ধারেই শিরীষগাছ রোপণ করা হয়। ইহা হইতে যে লাক্ষা উৎপন্ন হয় তাহার রঙ ও দানা ঠিক পিঁপলগাছের লাক্ষার ন্যায়। অধিক পরিমাণে ফসলের জন্য শিরীষগাছের লাক্ষাবীজ শিরীষগাছেই লাগান উচিত। শিরীষগাছ একবার ছাঁটিবার পর প্রত্যেক দুইবৎসরে উক্ত গাছ হইতে এক-বার করিয়া লাক্ষা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ইহা ব্যতীত সিন্ধুদেশে বাবুলগাছেও লাক্ষার চাষ হইয়া থাকে। সিন্ধুদেশে বাবুল হইতে লাক্ষাবীজ লইয়া বেহারের বাবুলে জন্মাইবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। আসামের কোনও কোনও স্থানে অড়হর ও তুরগাছের লাক্ষা পাওয়া যায়। কামরূপ জেলাতে মাঠের ধারে অড়হরের বীজ রোপণ করা হয় এবং গাছ যখন ২।৩ বৎসরের হয় তখন তাহাতে লাক্ষাবীজ সংযোজন করা হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও অড়হর

গাছ হইতে লাক্ষার ফসল পাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে কিন্তু উক্ত গাছ অধিক উত্তাপহেতু একবৎসরের বেশী মাঠে থাকিতে পারে না বলিয়া, উহা হইতে কিছু ফল পাওয়া যায় নাই। এক আসামেই অড়হরগাছ ৩ বৎসর ধরিয়া মাঠে থাকিতে পারে এবং সেই হেতু ঐ স্থানে উহা হইতে অধিক ফসল পাওয়া যায়।

আম, আতা, নীচুগাছ হইতেও লাক্ষা সংগ্রহ করা যায় কিন্তু ইহারা আমাদের প্রধান প্রধান ফলের গাছ বলিয়া ইহাতে লাক্ষা জন্মান যুক্তিসঙ্গত নহে।

মধ্যপ্রদেশ হইতেই অধিক পরিমাণে লাক্ষা উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালাদেশে কোনও কোনও জেলাতে খুবই লাক্ষার ফসল পাওয়া যায়। প্যালামো, হাজারীবাগ, বীরভূম, সিংহভূম, মানভূম, ময়ুরভঞ্জ জেলাতে অনেকে পলাশ ও কুসুমগাছের উপর লাক্ষার চাষ করিয়া থাকে। মুর্শীদাবাদ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলাতেও লাক্ষার চাষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃপলাশ, কুসুম ও কুলগাছ হইতেই লাক্ষার ফসল পাওয়া যায়। ছোটনাগপুর জেলাতে পলাশ ও কুসুম, এবং মুর্শীদাবাদ ও বীরভূম জেলাতে কুলগাছই লাক্ষার চাষের জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

লাক্ষার পোকা ঃ—গাছের উপর কোষের (cell) ভিতর স্ত্রীপোকা যে ডিম পাড়িয়া যায় তাহা হইতে ছোট ছোট কীড়া বাহির হয়—ইহারা খুবই ছোট, $\frac{1}{২৫}$ ইঞ্চি লম্বা, ইহাদের গাঢ় লাল রঙ, তিনজোড়া পা, দুইটি কাল চোখ, একজোড়া শুঁড় ও শুঁড়ের উপর হইতে দুইটি বড় বড় শুঁয়া (hair) থাকে; চুষিয়া খাইবার উপযোগী মুখও আছে। কীড়া ডিম হইতে প্রথমে বাহির হইয়া কচি ডাঁটার অন্বেষণে ২।১ দিন ধরিয়া খুব অলসভাবে নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায়, তাহার পর ডাঁটার ভিতর ছোট শুঁড় বসাইয়া রস শুষিয়া খায়—পরে সেই রস দেহের ভিতরে পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরের ছিদ্রের (Pores) মধ্য দিয়া ধুনার আকারে বাহির হয় ও পোকার চারিদিক আবৃত করিয়া ফেলে। এই অবস্থায় আকৃতিতে পুংপোকা ও স্ত্রীপোকার কোনও পার্থক্য থাকে না। কিন্তু একপক্ষকাল পরে উভয়ের কোষের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়—পুংপোকার কোষ একটু

উপযুক্ত ভাবে কুলগাছ কাটা হইয়াছে।

কুলগাছ লাক্ষা সংযোজনের পক্ষে উপযুক্ত।

লম্বা ও উহার সম্মুখে দুইটি সুতা বাহির হয়, স্ত্রীপোকার কোষ গোলাকার ও ইহাদের সম্মুখের তিনটি ছিদ্র হইতে লম্বা, সরু, সাদা সুতা বাহির হয়—এই সুতার সাহায্যে কোষের ভিতর বায়ুর চলাচল হয়। অল্পদিন পরে পুং পোকা কোষ হইতে বাহির হইয়া পড়ে ও বাহির হইয়াই স্ত্রীপোকার সঙ্গ লয়। পুংপোকার কাহারও ডানা থাকে, কাহারও বা থাকে না। স্ত্রীপোকা কখনও নিজের কোষ হইতে বাহির হয় না। গর্ভধারণের পর ইহারা

সুস্থ লাক্ষাবীজ।
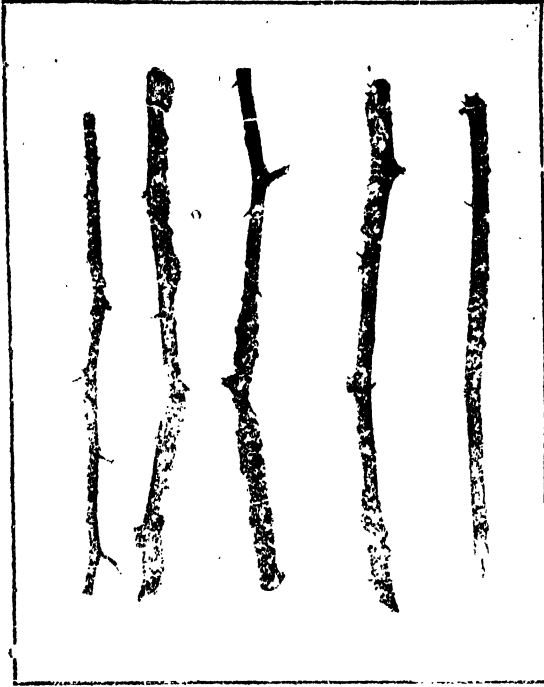
অসুস্থ লাক্ষাবীজ।

খুব দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে ও অধিক পরিমা রস শুষিয়া খাইয়া অধিকমাত্রায় ধুনা উৎপাদন করে এ অত্যধিক ফুলিয়া উঠে; এই সময়ে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের না (tube) খুব লম্বা হয় এবং গাছের ডাল লাক্ষার পোক পরিপূর্ণ হইয়া সাদা হইয়া যায়। পরিণতবয়সে কোষে ভিতরেই স্ত্রীপোকা ডিম পাড়ে এবং এই সময়ে তাহা তাহাদের দেহ খুব সঙ্কুচিত করিয়া কোষের ভিতে ডিমের স্থান করিয়া দেয়। একপক্ষকালের ভিতরে আবা ডিম হইতে ছানা বাহির হয়।

যেসকল স্থানে উত্তাপ ও শীত অধিক নহে এ বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩০ ইঞ্চি, সেইসকল স্থানই লাক্ষা চাষের পক্ষে উপযুক্ত; অল্প ভিজা (moist) স্থা গালার পোকারা খুব বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু অধিক স্যাঁতসেঁ স্থানে ইহাদের বিশেষ অনিষ্ট হয়; শুষ্ক গরম দে গালার চাষ আরম্ভ করা উচিত নহে। শীত ও গ্রীষ্মে আতিশয্যে পোকার বিশেষ ক্ষতি হয়। অধিক গ্রীষ্মে ধুনা গলিয়া যায় এবং যেসকল বায়ুপথের সাহায্যে পোকাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহ বন্ধ হইয়া যায় এবং পোকারা আর বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। গালার চাষের উপযোগী স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইলে প্রথমে একস্থানে দুইএকটি গাছের উপর পোক সংযোজন (Inoculation) করিয়া দেখা উচিত—যদি উহারা আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইয়া যথেষ্ট পরিমাণে ধুনা উৎপাদন করিতে পারে তাহা হইলে ঐস্থান লাক্ষাচাষের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। স্থানীয় জলবায়ুর উপর ইহা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কচি ডাঁটার উপরেই পোকারা থাকিয়া উহা হইতে রস টানিয়া লয়; সুতরাং বীজলাক্ষা (Brood Lac) লাগাইবার পূর্ব্বে গাছে অনেকগুলি কচি ডাঁটা থাকা দরকার, সেই হেতু পূর্ব্ব হইতে গাছ ছাঁটিয়া রাখা উচিত। কুলগাছ ছাঁটিয়া দিলে অধিক-সংখ্যক কচি ডাল বাহির হয় এবং ইহা হইতে গাছেরও বিশেষ উপকার হয়। সাধারণতঃ পলাশ ও কুসুমগাছ ছাঁটিবার প্রয়োজন হয় না। গাছ ছাঁটিবার ছুরি খুব ভারি ও ধারালো হওয়া দরকার, শুকনা ডাল গাছে থাকা

উচিত নহে। গাছ ছাঁটিবার পর কাটাডালের মুখে আলকাতরা কিম্বা গোবর ও কাদার প্রলেপ দেওয়া উচিত। ভাল্ করিয়া গাছ ছাঁটিলে অনেক কচিডাল পাওয়া যাইতে পারে।

কচিডাল বাহির হইবার পর গাছের ডালের সহিত লাক্ষাবীজ এরূপভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে যেন উহার দুই প্রান্ত দুইটি ডাল স্পর্শ করে। পোকা বাহির হইবার ১০।১২ দিন পূর্ব্বে কিম্বা যখন ছোট ছোট পোকা বাহির হয় সাধারণতঃ সেই সময় লাক্ষাবীজ সংযোজন করা বিধেয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাক্ষাপোকা বাহির হয়, সুতরাং লাক্ষার চাষ করিতে হইলে পোকা বাহির হইবার স্থানীয় দিন জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন। স্থানে স্থানে দিনের তারতম্য হয় বটে কিন্তু একই স্থানে উহা প্রায়ই ঠিক থাকে। পোকা বাহির হইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে লাক্ষাবীজযুক্ত ডাল গাছ হইতে কাটিয়া উহাকে ছোট ছোট করিয়া টুকরা করা হয় এবং শীতল-স্থানে শিকার উপর বায়ুর চলাচলের পথে ঝুলাইয়া রাখা হয়। ১০।১২ দিন পরে ছোট ছোট পোকারা বাহির হইয়া উহার উপর নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় এবং তখন কচি-ডাঁটাবিশিষ্ট গাছের ডালের সহিত কলার ছাল, পাট কিম্বা শন্ দিয়া সেই সব ডালের টুকরা বাঁধিয়া দিতে হয়।

বৎসরে লাক্ষার দুইটি ফসল পাওয়া যায়। "বৈশাখী" ও "কাতকী"; জুলাই মাসে যে ফসল সংগ্রহ করা হয় তাহাকে "বৈশাখী" ও অক্টোবর মাসে যে ফসল সংগ্রহ করা হয় তাহাকে "কাতকী" কহে। "বৈশাখী" ফসলের জন্য কার্ত্তিক (অক্টোবর) ও "কাতকী" ফসলের জন্য জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় (জুন) মাসে লাক্ষাবীজ লাগানো দরকার। বৈশাখীফসলে উৎকৃষ্ট ও অধিক পরিমাণে লাক্ষা পাওয়া যায়; কারণ পোকারা ইহাতে অধিকদিন বাড়িতে পায় এবং শীতকালে অধিকসংখ্যক পোকা নিদ্রিত অবস্থায় (hybernation) থাকে বলিয়া বৈশাখী ফসলে লাক্ষা পোকার বিনাশ কম হয়। একগাছ হইতে বৎসরে একবার ফসল পাওয়া যাইতে পারে।

সব পোকা যখন বাহির হইয়া পড়িয়াছে তখন একটি ভোঁতা ছুরি দিয়া গাছ হইতে ডাল কাটিয়া লাক্ষা চাঁচিয়া

লাক্ষা চাঁচা হইতেছে।

কুলগাছ লাক্ষা।

বাম পার্শ্বের খণ্ড শাখায় লাক্ষা সংযোজনের পরে লাক্ষা কীড়ার অবস্থান দেখানো হইয়াছে। মধ্য স্থলে উত্তম লাক্ষার শ্বেত স্ফীত প্রলেপ দেখানো হইয়াছে। ডাহিন পাশে পুষ্ট লাক্ষা, উহার মধ্য হইতে লাক্ষা কীড়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

লইতে হয়—লাক্ষার এই অবস্থার নাম Stick Lac। ছায়াতে এই লাক্ষাকে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইয়া জাঁতায় গুঁড়া করিয়া ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় ও কিছুকাল অন্তর নাসিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত রঙ উঠিতে থাকে ততক্ষণ জলে বার বার ধুইতে হয়। ধোয়া

গালাতে কিছু সোডা (মণকরা ৪ ছটাক হিসাবে) দিয়া পুনরায় ভাল করিয়া ঘসিয়া জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে শেষ যাহা কিছু রঙ থাকে ধুইয়া যায়। ধুইবার পর গালার রঙ ফিকে (Pale) কমলালেবুর রংএর মত হয় ইহাতে লাক্ষাসার ও গালাধোয়ানো রঙিন্‌জলকে (Lac Dye) অলক্তক কহে। গালা রঙ করিবার জন্য গুঁড়া গুঁড়া Seed Lacএ শতকরা ২।৩ ভাগ আর্সেনিক ও গলনশক্তি (melting point) কমাইবার জন্য শতকরা ৪।৫ ভাগ (Resin) ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। পরে অগ্নিকুণ্ডের উপরে সরু নলের সাহায্যে ইহা হইতে Shellac বা গালার বাতি প্রস্তুত হয়।

বৎসরে দুইবার লাক্ষার পোকা বাহির হয়। পোকা বাহির হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে গাছ ছাঁটিয়া ফেলিয়া সংযোজনের সুবিধা করিয়া রাখা উচিত। জুনমাসে একসপ্তাহে ও অক্টোবর মাসে এক সপ্তাহে ২১ জন লোকে ২০টি কুল ও ৫০।৬০টি পলাশগাছে ঠিক সময়ে গালা লাগাইতে পারে।

যদি অধিকসংখ্যক গাছে লাক্ষা লাগানো হয় তাহা হইলে মজুরের সংখ্যাও অধিক হইবে। দেখা গিয়াছে যে ৪ জন মজুর দৈনিক ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ৭০—১০০ পলাশগাছে লাক্ষাবীজ লাগাইতে পারে। সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে লাক্ষাবীজ কাটা, শুকানো ও গাছে লাগানো ঠিক সময়েই হওয়া দরকার, কারণ একসপ্তাহের দেরীতে অনেক ক্ষতি করিয়া ফেলে ও ফসল মোটেই ভাল পাওয়া যায় না।

লাক্ষাচাষের আয়ব্যয় সঠিকরূপে দেওয়া যায় না। কারণ মজুরী ও লাক্ষাবীজের দাম সকলস্থানে সমান নহে—প্রথম বৎসরে লাক্ষা কিনিতে হইবে, তাহার পর নিজের গাছ হইতে বীজ পাওয়া যাইবে। ইহার চাষ অত্যন্ত সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য এবং ইহার প্রধান সুবিধা এই যে এই চাষ করিলে অন্য কোনও চাষের ক্ষতি হয় না। ২০টি কুলগাছে লাক্ষা লাগাইতে একসপ্তাহের বেশী লাগে না বলিয়া গালার দর অত্যন্ত কম হইলেও প্রত্যেক গাছ হইতে গড়ে ॥০ লাভ থাকে।

কালপিঁপড়ে মধুর লোভে আসিয়া গাছের উপর চলিবার সময়ে লাক্ষার বায়ুপথ ভাঙ্গিয়া ফেলে, সুতরাং তাহাতে তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। কাপড়ে ভাল করিয়া আল্‌কাতরা চুবাইয়া গাছের গুঁড়িতে বাঁধিয়া দিলে পিঁপড়ে গাছে উঠিতে পারে না। কতকগুলি পোকা লাক্ষার পোকা খাইয়া জীবনধারণ করে। এইসকল পোকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে গাছ হইতে গালা উঠাইয়া লইবার ঠিক পরেই গাছে ধোঁয়া (Fumigation) লাগাইতে হয়।

অলঙ্কার, খেলানা, মাকু, গ্রামোফন রেকর্ড, বার্নিস, পালিস প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। গালাধোয়ান রঙিন্‌জল প্রথমে রঙ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত কিন্তু আজকাল Aniline রাসায়ণিক রঙ উহার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। এই জল সারস্বরূপে ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়, কারণ ইহাতে শতকরা. ০১৪ ভাগ নাইট্রোজেন আছে।

পুসা হইতে প্রকাশিত "The Cultivation of Lac in the plains of India" ২৮নং Bulletinএ লাক্ষা-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। উক্ত পত্রিকা আট আনা মূল্যে থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

পল্লীভ্রমণ

রেলওয়ে ষ্টেশনটির নাম পাঁঠাখাওয়া। এইখানে নামিয়া যে জমিদার বাবুদের বাড়ী যাওয়ার আমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম, তাঁহারা বৈষ্ণবমতাবলম্বী। সুতরাং ষ্টেশনের নামকরণে ধর্ম্মতত্ত্বে সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ট্রেনে আমার সহযাত্রীদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক লুচি ভাজাইয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি আহারের সময় বোধকরি সঙ্গীদের অভুক্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেশের বর্ত্তমান বাণিজ্যনীতির যথেষ্ট দোষোল্লেখ করিলেন। অত্যধিক রপ্তানির জন্য খাদ্যদ্রব্যমাত্রেই মহার্ঘ, বিশেষতঃ লুচির উপকরণ আটা ও ময়দা প্রভৃতি; কারণ পৃথিবীর সকল দেশেই এগুলির ব্যবহার আছে। ক্ষুধার

অনুপাতে লোকের লব্ধখাদ্যের পরিমাণ যৎসামান্য, তদ্ধেতু তাঁহার টিফিনবাক্সে লুচির সংখ্যাও আশানুরূপ নহে। অতএব বাবুটির সঞ্চিত খাবারে অন্যে বঞ্চিত হইবে, বিচিত্র কি! তিনি লুচিগুলি নিঃশেষ করিয়া সঙ্গীদের জন্য সমবেদনার একটি নিশ্বাস ফেলিলেন এবং রুমালে মুখ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। আমি তাঁহাকে একটি পান দিলাম। তিনি তাম্বূলচর্ব্বণ করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, পান জিনিসটা আমাদের দেশে অদ্যাপি দুর্লভ হয় নাই, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। মূলে কিন্তু সেই আমদানি রপ্তানির কথা। অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যদি পান খাওয়ার চলন থাকিত তবে আজ এই খিলিটি তাঁর মিলিত না!

সন্ধ্যার সময় গন্তব্য ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রেলবাবুদের ছোট ছোট ইটের কুঠরী এবং আপাদমস্তক লৌহমণ্ডিত গুদামঘর ছাড়াইয়া আমার পাল্‌কী গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল। গোরুর গাড়ীর চাকা বর্ষাসিক্ত মাঠের পথে গভীর রেখা টানিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন রাস্তা শুকাইয়াছে, কিন্তু সে দাগ মুছে নাই;—ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের শোকস্মৃতির মত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আটটার ট্রেন ধরিবার জন্য ব্যস্ত রেলের যাত্রীরা এস্তভাবে ষ্টেশনের দিকে চলিয়াছে। বাঁশঝাড়ের আড়ালে গৃহস্থকুটীরে সতর্ক কুকুর বেহারাদের হুঙ্কার শুনিয়া অতর্কিতে ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে।

প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থগাছের অন্ধকার ছায়ার মধ্যে আমার পাল্কী নামিল। সম্মুখে বাঁশের চাটাইঘেরা মুদির দোকানঘরে অনেকখানি ধুমোদ্গার করিয়া কেরোসিনের কুপি জ্বলিতেছে, আর—দীপশিখার সৌন্দর্য্যে প্রলুব্ধ পতঙ্গেরা দলে দলে সেখানে ভিড় করিয়া ঘুরিতেছে। বাঁশের খুঁটিতে তারের কাঁটায় আটকানো পঞ্জিকারঞ্জিত হাওয়া-গাড়ীর মলিন পট। চিত্রলিখিত কলের গাড়ী একেবারে বিকল; শুধু মাঝে মাঝে হাওয়ায় দোল খাইয়া নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। আলো ও ছায়ার সন্ধিস্থলে খরিদ্দারের প্রতীক্ষায় বেড়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া মুদি যুগ্মকরপুটে কলিকা ধরিয়া টানিতেছে। "আমি চিরদিন হেথা বসে' আছি, তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো!" আমার বাহকেরা জলপানের পর গাছের তলায় ধূমপানে বসিয়া গেল। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী মাধ্যাকর্ষণ এবং গভীর নিদ্রাভিমুখী তন্দ্রাকর্ষণ—এতদুভয়ের আক্রমণে তাহারা অবিলম্বেই ধরাশায়ী হইল। কৌরবসমরে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত দুঃসহ গ্রীষ্মের মধ্যে আমি জাগিয়া রহিলাম।

উপর্য্যুপরি কয়েকবার তাড়া দেওয়ার পর বেহারাদের সাড়া পাওয়া গেল। তাহারা জাগিয়া উঠিয়া আমাকে কাঁধে না তুলিয়া পুনরায় তামাকের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিল। বেহারাদের এইরূপ অসঙ্গত আচরণে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইতেছিল, কিন্তু নেশাখোর লোকের সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া বিবাদ বাধানো উচিত নয় ভাবিয়া মনেমনেই ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। হাতে হাতে ঘুরিয়া ছিলিমটি যখন পুড়িয়া ছাই হইল তখন আমার পাল্কী আবার উঠিল।

মাঠের মেরুদণ্ডের মত সুপরিসর পথটি হীরকোজ্জ্বল তারকামণ্ডিত আকাশের কিরণচ্ছটায় তরলীভূত অন্ধকারে বহুদূরে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। দুইদিকে বিটপিশ্রেণীর শাখাপল্লবে ক্ষণে ক্ষণে সমীরসঞ্চারের শব্দ;—যেন রঙ্গচ্ছলে বাতাস স্তম্ভিত নিশাচরের কর্ণকুহরে ফুৎকার করিয়া ফিরিতেছে। দূরে শান্ত ধরণী ও অনন্তগগনের মিলনক্ষেত্রে ক্ষীণালোকে ছায়া-লোকের সৃষ্টি হইয়াছে। স্তব্ধ রাত্রির বিনিদ্র যাত্রীকে বহন করিয়া বেহারারা অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাদের অনুনাসিক কণ্ঠধ্বনি পাল্কীর গতিচ্ছন্দে যতিবিন্যাস করিয়া চলিল।

যখন খেয়াঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তখন পূর্ব্বাকাশে উষার ধূসর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। নদীর কূলে একখানি খড়ের ঘরে ঘাটের ইজারাদার বেজায় নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা দিতেছিল; বেহারাদের হাঁক-ডাকে বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি চাই?' চাই আর কি! —'তুমি পারের কর্ত্তা, জেনে বার্ত্তা, ডাকি হে তোমারে!' ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় উচ্চরবে আক্ষেপ করিয়া ঘাটোয়াল কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া তক্তার উপর শুইয়া রহিল।

কিন্তু একদল লোক ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া উপদ্রব করিলে কুম্ভকর্ণ ভিন্ন অন্যের স্বস্তিতে নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব। অবশেষে পাটনী উঠিল, কিন্তু শয্যাত্যাগ করিয়াই তাম্রকূট সজ্জায় মন দিল। আবার সেই টিকা—কলিকা—হুঁকা! নিদ্রাভঙ্গের পর তাহাকে এমন উৎকৃষ্ট সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে আমাদের আরও কিছু সময় লাগিল।

এ অঞ্চলের আবহাওয়ার কিঞ্চিৎ নমুনা পাওয়া গেল। একটি স্ত্রীলোক আমাদের সঙ্গে পার হইল। তাহার হাতে গলায়-সুতা-বাঁধা একটা প্রকাণ্ড শিশি। ভাইপো অনেক দিন হইতে ভুগিতেছে, তাই সে ওপারের ডিস্‌পেন্সারি হইতে দাতব্য দাওয়াই আনিতে চলিয়াছে। শুনিলাম এই পিসিটি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ভ্রাতৃষ্পুত্রের শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছে। পাড়াগাঁয়ে গরীবের চিকিৎসা বড় কঠিন ব্যাপার। রীতিমত দর্শনীর জোগাড় করিতে না পারিলে নদীর অপর পারে ক্রোশ-খানেক দূর হইতে চিকিৎসকের দর্শন পাওয়া অসম্ভব। ডাক্তারকে প্রত্যহ অবস্থা বলিয়া ব্যবস্থা লওয়াও সহজ নহে। আর—ব্যবস্থাই বা কি! ফাইলের পর ফাইল কুইনিন্ কাবার হয়, রোগীও এদিকে সাবাড় হইয়া আসে!

যথাসময়ে আমার গম্যস্থানে উপস্থিত হইলাম। সহরে লোকের পক্ষে কয়েকদিনের গ্রাম্য জীবন কাম্য বলিয়াই বোধ হইবে বিচিত্র নয়। চারিদিকে শ্যামল বনের বেড়ায় ঘেরা সুদূরবিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত, আর সেই হরিৎসমুদ্রে দ্বীপের মত কোলাহলশূন্য লোকালয়-গুলি। ভোরে উঠিলে প্রভাতের স্নিগ্ধতা একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। মাঠের দিক্ হইতে হাওয়া আসিয়া ঝুর-ঝুর করিয়া গাছের পাতা কাঁপাইতে থাকে এবং অরুণ-কিরণে হাস্যময় আকাশের নীচে পাখীগুলি উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়। দুপুর বেলা শুব্ধ-তার সমুদ্রে স্বরতরঙ্গ তুলিয়া ঘুঘুর উদাস কণ্ঠ দিক্‌দিগন্ত প্লাবিত করে, আর বনান্তের শ্যামলকান্তি দিনান্তে আঁধার হইয়া ক্রমে গ্রামের পথঘাটমাঠ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

আদর আপ্যায়নে জমিদার বাবুরা আমাকে একে-বারে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। সকালবেলা একজনের বাড়ীতে চা-পান করিলাম, অপরাহ্নে অপরের গৃহে চায়ের সঙ্গে কচুরির আবির্ভাব হইল। আ রামবাবুর অভ্যর্থনায় জলপানের উদ্‌যোগ, কাল শ্যা বাবুর নিমন্ত্রণে ফলাহারের সহিত পোলাও কালিয়া ব্যবস্থা। এইরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূত্রে ভোজনের আয়োজ চক্রবৃদ্ধির নিয়মে বর্দ্ধিত হইয়া চলিল।

"উত্তর তরফে" রাধাশ্যাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন বাবুরা তাঁহাকে লুকাইয়া একদিন ঠাকুরদালানের পিছনে একটি ছাগবংশধরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। অন্দর মহলের রন্ধন বৈষ্ণব মতে হয় বলিয়া তন্ত্রমতের যন্ত্রপাতি বাহির-বাড়ীতে থাকে। সেইখানে বৈষ্ণবসংস্পর্শশূন্য প্রণালীতে মাংস পাক করা হইল। শক্তিউপাসক না হইলেও বাবুরা আমার সহিত ভক্তিপূর্ব্বক আহারে বসিলেন এবং সেই উপভোগ্য মাংস ভক্ষণের সময় স্বীকার করিলেন যে শাক্তমত প্রকাশ্যরূপেই গ্রহণযোগ্য তবে কি না স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, অর্থাৎ ভোজনের জন্য পশুপক্ষীর সংহার নিজের বৈষ্ণবধর্ম্ম বজায় রাখিয়াই করা ভাল, এইজন্য তাঁহারা ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই!

দেখিলাম গ্রামে দুইটা বাজার, দুইটা দাতব্য ঔষধালয় এবং দুইটা বারোয়ারিতলা। দুঃখের বিষয় সরকারবাহাদুর পোষ্টাপিস একটার বেশি মঞ্জুর করেন নাই, সুতরাং স্থানীয় দুই দলকেই একবাক্সে চিঠি ফেলিতে হয়।

একদিন মধুবাবুর মাছধরা দেখিবার জন্য আহূত হইলাম। পাড়াগাঁয়ে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর পাশেই একটা করিয়া ডোবা থাকে। এ পুকুরটা সে রকম নয়, বেশ বড়। গোটাতিনেক বাঁধাঘাট আছে। দেখিলাম, ইহারই এক-একটায় সপারিষদ মধুবাবু বসিয়া আছেন। 'চার' প্রভৃতি উপচারের ত্রুটি নাই। ডাবের জল এবং ঘোলের সরবৎ ও মাঝে মাঝে আসিতেছে, তবে এগুলি অবশ্য মৎস্যকুলের জন্য নহে। মধুবাবু একেবারে ধ্যানময়; তিনি অনিমেষ নয়নে জলের দিকে চাহিয়া আছেন। হঠাৎ 'ফাৎনা' নড়িল, অমনি মধুবাবু অধীরভাবে 'খ্যাঁচ' মারিলেন। কিন্তু হায় মাছ কোথায়!—শূন্য বড়শী উঠিয়া আসিল।

এইরূপে নৃত্যপর নলখণ্ডের অলীক সঙ্কেতে দণ্ডে দণ্ডে ছিপের সুতা উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। স্পষ্টই দেখা গেল, আমিষ ভক্ষণে মধুবাবুর এতই আগ্রহ যে মৎস্যদিগকে আহারের অবসর দিতে তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি নাই! দান প্রতিদানই পৃথিবীর ধর্ম্ম, সুতরাং সমস্ত দিনের চেষ্টাতেও মৎস্যদেশের কোন অনিষ্ট করিতে না পারায় সন্ধ্যার সময় শূন্য পাত্র লইয়া মধুবাবুকে ক্ষুণ্ণমনে ঘরে ফিরিতে হইল।

কয়েকদিন শ্যামাঙ্গী পল্লীভূমির অতিথিসৎকারে প্রীতিলাভ করিয়া কর্ম্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

নটরাজ

অধুনা নটরাজ-মূর্ত্তি সম্বন্ধে "ভারতী" "সম্মিলন" এবং "প্রবাসী" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বিগত ১৩১৮ সনের "ভারতী" পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "লঙ্কায় নটরাজ শিব" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই এই আলোচনার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে নটেশের একটি ধ্যান প্রকাশ করেন, তাহা এই :—

লোকানাহূয় সর্ব্বান্ ডমরুকনিনাদৈর্ঘোরসংসারমগ্নান্।
দত্বাভীতিং দয়ালুঃ প্রণতভয়হরং কুঞ্চিতম্‌পাদপদ্মম্॥
উদ্ধৃত্যেদং বিমুক্তে র্বয়নমিতি করদর্শয়ন্ প্রত্যয়ার্থং।
বিভ্রদ্ বহ্নিং সভায়াং কলয়তি নটনং যঃ স পায়ান্ নটেশঃ॥

শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে লঙ্কায় এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অন্তর্গত চিদ্ম্বরম্ নামক স্থানদ্বয় ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্তে কোন স্থানে নটরাজমূর্ত্তির অস্তিত্ব নাই বলিয়া তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং তিনি নটরাজমূর্ত্তি অতি দুর্ল্লভ বলিয়া তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই মূর্ত্তি বিশেষ দুর্ল্লভ বলিয়া মনে করি না। আর্য্যাবর্ত্তে নটরাজমূর্ত্তি আর কোথায়ও আছে কি না জানি না; তবে ইহা সুনিশ্চিত, পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষতঃ বিক্রমপুর অঞ্চলে, স্থানে স্থানে

নটরাজ।

নটরাজমূর্ত্তি দেখা যায়। নটরাজমূর্ত্তি সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্তও বিশেষভাবে কোন অনুসন্ধান আরব্ধ হয় নাই। সেই জন্যই ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিক্রমপুর অঞ্চলে স্থানে স্থানে যে নটরাজমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে তৎবিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ হইতে আমরা অনেক সারগর্ভ তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

সম্ভবতঃ মহাদেবের নটরাজমূর্ত্তির প্রচলন দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই প্রথম আরব্ধ হয়। সেনবংশীয় রাজাগণ অধিকাংশই শৈবমতাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটপ্রদেশ হইতে বঙ্গে আগমন করেন। তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা নটরাজমূর্ত্তি প্রভৃতি শৈবমূর্ত্তি-সকলও তাঁহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে

বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। তাহাতেই বিক্রমপুর অঞ্চলে আমরা এইসকল মূর্ত্তি দেখিতে পাই।

জনশ্রুতি এবং তাম্রলিপি প্রভৃতি দ্বারাও বিক্রমপুরে সেনরাজগণের প্রধান রাজধানী থাকা সমর্থিত হইয়াছে। তত্রাপি আমাদের দেশের অনেক কৃতবিদ্য ঐতিহাসিক উক্ত সুযুক্তিপূর্ণ প্রমাণ-সকল একেবারেই গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত হন না। মাঝে মাঝে তাঁহাদের গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধাদিতে বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজধানী থাকা সম্বন্ধে কৈফিয়ত তলব করিয়া থাকেন। তৎবিষয়ে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাই না, তবে এইমাত্র বলি যে তাম্রলিপি প্রভৃতি প্রামাণিক বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিক্রমপুরে সেনরাজগণের প্রধান রাজধানী না থাকা সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ পাঠকগণের নিকট তাঁহারা উপস্থিত করেন নাই। অন্যত্র প্রধান রাজধানী থাকাও তাঁহাদেরই প্রমাণ করা আবশ্যক।

অন্যান্য প্রমাণ বাদ দিলেও বিক্রমপুর অঞ্চলে শৈব-প্রভাবের নিদর্শন প্রাচীন মূর্ত্তিসকলের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সেনরাজাগণের বিক্রমপুরে প্রধান রাজধানী থাকা সপ্রমাণ হয়। এতদ্ব্যতীত "নাটেশ্বর" দেউলে যে মহাদেবের নৃত্যবেশের মূর্ত্তি ছিল, তাহা এই দেউলের নাম দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। ইহা ব্যতীতও "শঙ্করবন্দ" দেউল প্রভৃতি অন্যান্য দেউলের শৈবমূর্ত্তি বিক্রমপুরে শৈবপ্রভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উক্ত দেউল-সকল সেনরাজগণের রাজধানী রামপালের নিকটবর্ত্তী দুই তিন মাইলের মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "লঙ্কায় নটরাজ শিব" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর বিগত ১৩১৯ সনের "সম্মিলন" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় একখানি ভগ্ন নটরাজমূর্ত্তির ছায়ালিপি-সম্বলিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বিক্রমপুরে নটরাজ-মূর্ত্তির অস্তিত্ব থাকা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। মূর্ত্তিখানি ভগ্ন থাকায়, যোগেন্দ্রবাবু তাহা সাধারণের নিকট সম্পূর্ণরূপে নটরাজমূর্ত্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। যোগেন্দ্র বাবু সম্মিলন পত্রিকায় মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতামতের উপর যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহা সমর্থন করি না। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটি তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ সম্মিলন পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাহার কারণ যোগেন্দ্রবাবুর নটরাজমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া নৃত্য না করাতেই রাজেন্দ্রবাবু সুখী হন নাই।

তৎপর শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত মহাশয় দ্বাদশহস্ত বিশিষ্ট একখানি পূর্ণাবয়ব নটরাজমূর্ত্তির ছায়াচিত্র সহ বিগত ১৩২১ সনের জ্যৈষ্ঠমাসে প্রবাসী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আশা করি উক্ত নটরাজমূর্ত্তি দেখিয়া রাজেন্দ্রবাবু অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া থাকিবেন। পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিক সংগ্রাম দেখিয়া, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত মহাশয় ভয়ে ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক নটরাজ, নাটেশ, নৰ্ত্তেশ, নাটেশ্বর প্রভৃতি একার্থবাচক নাম হইতে তাঁহার ঐ মূর্ত্তিখানিকে নাটেশ্বর নামে অভি-হিত করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশত তাঁহার প্রবন্ধের কোন প্রতিবাদ হয় নাই।

বিক্রমপুরের আর একখানি নটরাজমূর্ত্তি কলিকালগ্রাম হইতে সংগৃহীত হইয়া বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ঐ মূর্ত্তিখানি আমরা বিগত ১৩২ সনের শ্রাবণ মাসে রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিতে দেখিয়াছি। মূর্ত্তিখানির আকৃতি আমাদের ভালরূপ স্মরণ হইতেছে না। উক্ত মূর্ত্তিখানির নিম্নে, সমিতি কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক মূর্ত্তির পরিচয়স্থলে

No 75
"শিব তাণ্ডব নৃত্য"
Dancing
Vill. Kalikar
Dist. Dacca

লেখা আছে। উপরোক্ত আলোচিত মূর্ত্তিগুলি সম্পূর্ণ অবিকল একরূপ মূর্ত্তি না হইলেও বোধ হয় এইসকল মূর্ত্তি নটরাজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুঃখের বিষয় বহু অনুসন্ধানেও নটরাজমূর্ত্তির কোন ধ্যান বা প্রণাম আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। রুদ্রমূর্ত্তিনির্ম্মাণপ্রসঙ্গে মৎস্যপুরাণের অন্তর্গত প্রতিমালক্ষণ নামক অধ্যায়ে এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রুদ্রাদ্যাকারমুত্তমম্।
আপীনোরুভুজস্কন্ধ তপ্তকাঞ্চনসংপ্রভঃ॥
শুক্লার্করশ্মিসংঘাত চন্দ্রাঙ্কিতজটো বিভুঃ।
জটামুকুটধারী চ দ্বিরষ্টবৎসরাকৃতিঃ॥
বাহুবারণহস্তাভো বৃত্তজঙ্ঘোরুমণ্ডলঃ।
উর্দ্ধকেশস্তু কর্ত্তব্যো দীর্ঘায়তবিলোচনঃ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধানঃ কটিসূত্রত্রয়ান্বিতঃ।
হার-কেয়ূর-সম্পন্নো ভুজঙ্গাভরণস্তথা॥
বাহবশ্চাপি কর্ত্তব্যা নানাভরণভূষিতাঃ।
পীনোরু গণ্ডফলকঃ কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতঃ॥
আজানুলম্ববাহুশ্চ সৌম্যমূর্ত্তিঃ সুশোভনঃ।
খেটকং বামহস্তে তু খড়্গঞ্চৈব তু দক্ষিণে॥
শক্তিং দণ্ডং ত্রিশূলঞ্চ দক্ষিণে তু নিবেশয়েৎ।
কপালং বামপার্শ্বে তু নাগং খট্টাঙ্গমেবচ॥
একশ্চ বরদো হস্ত স্তথাক্ষবলয়োঽপরঃ।
বৈশাখং স্থানকং কৃত্বা নৃত্যাভিনয়সংস্থিতঃ॥
নৃত্যে দশভুজঃ কার্য্যো গজাসুরবধে তথা। ইত্যাদি

আলোচ্যমূর্ত্তিতে উল্লিখিত মৎস্যপুরাণান্তর্গত বর্ণনানুযায়ী বেশভূষা আভরণ এবং হস্তস্থিত আয়ুধ প্রভৃতির সমাবেশ অধিকাংশ স্থানেই ভাস্কর যথাযথভাবে তক্ষণ করিয়াছেন। তবে এই মূর্ত্তির দুইটি বিষয়ে বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ ইহার হস্তের সংখ্যা "নৃত্যে দশভুজ"—অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত দশহস্ত। বিক্রমপুরে এবং দাক্ষিণাত্যে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি নটরাজমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে শাস্ত্রানুযায়ী হস্তসংখ্যার সামঞ্জস্য নাই। দ্বিতীয়তঃ দাক্ষিণাত্যের নটরাজ একটি হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার প্রণতভয়হর চরণ দেখাইয়া দিতেছেন; বিক্রমপুরের অন্যান্য মূর্ত্তিতে এই ভাবটি পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু আলোচ্যমূর্ত্তিতে ঐ ভাবের সমাবেশ রহিয়াছে। যদিও সেই হস্তটির উপরিভাগের কতকাংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি পাঠকগণ ঐ হস্তের অবশিষ্টাংশের প্রতি দৃষ্টি করিলেই এতৎসম্বন্ধে যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শিল্পসৌন্দর্য্যের বিষয় মূল মূর্ত্তি না দেখিয়া তাহার প্রতিলিপি দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। এই মূর্ত্তিখানিকে তাৎকালিক তক্ষণশিল্পের উচ্চ আদর্শের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। অন্যান্য মূর্ত্তির সহিত তুলনায় বর্ত্তমানমূর্ত্তিতে অনুষঙ্গীমূর্ত্তির সংখ্যা অনেক অধিক। তন্মধ্যে মহাদেবের তিনটি কটিসূত্র, বাহন বৃষ, দক্ষিণদিকে মকরবাহিনী জাহ্নবী, এবং বামদিকে সিংহবাহিনী আদ্যাশক্তি ভগবতী, এবং মূলমূর্ত্তির তাণ্ডবনৃত্য সম্যক পরিস্ফুট। অপর অনুষঙ্গী মূর্ত্তিগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই। কিন্তু অধিকাংশ অনুষঙ্গী মূর্ত্তি যন্ত্রাদি সহযোগে নটেশের নৃত্যব্যাপারের সহায়তা করিতেছে। বাহুল্যভয়ে যথাযথভাবে মূর্ত্তিখানির যাবতীয় বর্ণনা করিলাম না; কারণ, উপরোক্ত পুরাণের বর্ণনা ও মূর্ত্তির প্রতিলিপির প্রতি লক্ষ্য করিলে পাঠকগণ সমস্তই পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। আলোচ্য মূর্ত্তিখানি রামপালের নিকটবর্ত্তী বজ্রযোগিনী গ্রামে আছে।

দশানন (রাবণ)-বিরচিত বলিয়া যে শিবস্তোত্র আছে সেই স্তোত্রে শিবতাণ্ডব নৃত্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বারাণসীধামে বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির সময় ভক্তগণ বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে এই স্তোত্র পাঠ করেন। তখন তাঁহাদের নৃত্যভঙ্গিমা উপলব্ধি করা যায়। যাঁহারা স্বয়ং উহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই উহা অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। ইহার ছন্দ ভাষা এবং ভাব তদ্বিষয়ে সম্যক পরিচয় প্রদান করিবে। পাঠকবর্গের উপলব্ধির জন্য ঐ স্তোত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। স্তোত্রটি প্রমাণিকাচ্ছন্দে রচিত।

জটাটবী-গলজ্জল-প্রবাহ-প্লাবিত-স্থলে
গলেঽবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গতুঙ্গমালিকাং।
ডমড্ডমড্ডমড্ডমন্নিনাদবড্ডমর্ব্বয়ং
চকার চণ্ড তাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবং শিবঃ॥১
জটাকটাহসম্ভ্রম ভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী
বিলোলবীচিবল্লরী বিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে
কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম॥২
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনী বিলাসবন্ধুবন্ধুর
স্ফুরদ্দিগন্তসন্ততিঃ প্রমোদমানমানসে।
কৃপাকটাক্ষধারিণী নিরুদ্ধদুর্দ্ধরাপদি
ক্বচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি॥৩
জটাভুজঙ্গপিঙ্গলস্ফুরৎফণামণিপ্রভা
কদম্বকুঙ্কুমদ্রবপ্রলিপ্তদিগ্বধূমুখে।
মদান্ধসিন্ধুরস্ফুরত্ত্বগুত্তরীয়মেদুরে
মনো বিনোদমদ্ভুতং বিভর্ত্তু ভূতভর্ত্তরি॥৪

বিক্রমপুরে যে কয়েকখানি নটরাজমূর্ত্তি আজপর্য্যন্ত আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তন্মধ্যে একখানির সহিত আর একখানির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখি নাই।

নটরাজ ব্যতীত অন্যান্য প্রকারের শৈবমূর্ত্তির প্রকারভেদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের

আলোচ্যবিষয় তাহা নহে বলিয়া আমরা সেই বিষয় উল্লেখ করিলাম না। "চতুর্মুখ" মহাদেব আমাদের অনুসন্ধানে আছে, তবে এখন পর্য্যন্তও আমরা উক্তমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি নাই। "পঞ্চমুখ" শিবমূর্ত্তি ধীপুর নামক গ্রামে আছে। স্থানে স্থানে গৌরীশঙ্করমূর্ত্তি দেখা যায়। একখানি "অর্দ্ধনারীশ্বর" মূর্ত্তি পুরাপাড়া গ্রামের দেউলের শোভা বর্দ্ধন করিত। এক্ষণে ঐ মূর্ত্তিখানি বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া, তাঁহাদের মিউজিয়ামের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক মূর্ত্তি স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়, কে তাহার অনুসন্ধান করে। বিক্রমপুরে শৈবপ্রভাবের এইসকল নিদর্শন বটে।

ধরণীমোহন সেন।

গুণী

গোকুল যখন বার বার তিনবার চেষ্টা করিয়াও এফ-এ পাশ করিতে পারিল না, তখন তাহার বাবা বলিলেন—তোর লেখাপড়া কিছু হবে না, তুই একটা চাকরী কর। কিন্তু গোকুল তাহার পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছিল বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ! সে ঠিক করিল দাসত্ব করা কিছু নয়; বাণিজ্য করিয়া লক্ষ্মীঠাকরুণকে রাতারাতি লোহার সিন্ধুকে বন্দী করিতে হইবে। তাহাদের গ্রামের বিধু-বাগচী কয়লার কারবার করিয়া বড়লোক হইয়া উঠিয়াছে—গাঁয়ের লোকের ভাষায় বলিতে গেলে আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে। সুতরাং সেই বাঁধা রাস্তা দিয়া লক্ষ্মীঠাকরুণের বাহনটির আসিতে কোনো ক্লেশ ও আপত্তি না হইবারই কথা মনে করিয়া গোকুল কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল।

বছর তিনেক ধরিয়া হাজার পনর কুড়ি টাকা লক্ষ্মীর বাহনটিকে ঘুষ খাওয়াইল, কিন্তু কিছুতেই লক্ষ্মীর দর্শন মিলিল না। তখন দেনার দায়ে সর্ব্বস্ব বরাকরের কয়লার খাদে বিসর্জ্জন দিয়া একখানি মাত্র দা কোনমতে বাঁচাইয়া গোকুল গজভুক্ত কপিথের মতো বাড়ী ফিরিয়া আসিল। গোকুল মনে মনে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল যে তাহার বাবা তাহাকে লোকসানের জন্য যদি অতিরিক্ত রকম তিরস্কার করেন তবে সে ঐ দাখানি গলায় বসাইয়া ব্যবসার শেষ দিয়া জীবনেরও শেষে একটি রক্তবর্ণ দাঁড়ি টানিয়া দিবে।

কিন্তু গোকুল আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল তাহার বাবা তাহাকে ব্যবসায়ে লোকসানের সম্বন্ধে না রাম না গঙ্গা কিছুই বলিলেন না, সহজ সাধারণভাবেই তাহাকে কুশল প্রশ্ন করিয়া বাড়ীতে আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন। গোকুল হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—যাক্! বাবা তা হলে রাগ করেন নাই।

গোকুল নিশ্চিন্ত হইয়া পুকুরের মাছের মুড়ো ও বাড়ীর গাইয়ের ঘন-আওটানো দুধ খাইতে লাগিল।

একদিন তাহার বুড়া বাবা কোঁচার টেরটি গায়ে দিয়া গোয়ালঘরের আগড় মেরামত করিতেছিলেন। গোকুল সামনে-খাটো পশ্চাতে-লম্বা ছিটের শার্ট গায়ে দিয়া বার্নিশকরা চকচকে পাতলা হাল্কা চটিজোড়াকে পায়ে করিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। বুড়া একবার ছেলের পাশ-পিছন-চাঁছা চুলছাঁটার বাহার ও লম্বাঝুলের ফ্যাসান-দুরুস্ত শার্টের দুই পকেটে হাত ভরিয়া দাঁড়াইবার কায়দা, দেখিয়া লইয়া বলিলেন—বাবা গোকুল, তোমার সেই বিশহাজার টাকা দামের দা-খানা একবার এনে দাও ত, আগড়খানা বেঁধে ফেলি।

গোকুল চোখমুখ লাল করিয়া বিশহাজার টাকার দাখানি বাবার সামনে রাখিয়া দিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ বলিলেন—যাও বাবা, বিধুবাগচীর বৈঠকখানায় গিয়ে বোসোগে; এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, লোকে দেখলে ভাববে বাবু জন খাটাচ্ছে!

গোকুলের সামনে সেই দাখানা চকচকে দাঁত মেলিয়া পড়িয়া পড়িয়া হাসিতেছিল। গোকুল অল্পক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

গোকুল যেমন ছিল তেমনি একছুটে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বরাবর ষ্টেসনে গেল এবং একখানি বরাকরের টিকিট করিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। গোকুল

পণ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়াছে যেমন করিয়া হোক টাকা উপার্জ্জন করিতে হইবে। কেমন করিয়া? তাহা সে জানে না।

গাড়ীর ঝাঁকানি খাইয়া মগজের মধ্যে ভাবনা-চিন্তাগুলা একটু থিতাইয়া গেলে গোকুল ঠিক করিল বিনা-মূলধনের ব্যবসা করিতে হইবে। এমন কোন্ ব্যবসা হইতে পারে? গোকুল ঠিক করিল ডাক্তারী করিবে। কয়লার ব্যবসা সম্বন্ধে তাহার যেমন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ছিল, ডাক্তারী সম্বন্ধেও তেমনি; সুতরাং তাহার কাছে কয়লার ব্যবসা করা আর ডাক্তারী করা দুইই সমান। বরাকরে ব্যবসার সূত্রে অনেকে চেনাশোনা হইয়াছে, রাতারাতি পশারটা জমিয়া যাইতেও পারে চাই কি।

গোকুল আপনার সেই পুরাতন পোড়ো ঘরে কেরোসিনের বাক্সে আলমারী গড়াইয়া দুটা চারটা শিশি বোতলে রং-করা চিরেতার জল ও কুইনিন লইয়া ডাক্তার হইয়া জাঁকিয়া বসিল। কয়লার আড়তদার গোকুলবাবুকে রাতারাতি ডাক্তারবাবুতে পরিণত হইতে দেখিয়া বরাকরের লোকেরা একটু আশ্চর্য্য হইল, শঙ্কিতও হইল।

অল্পদিনেই গোকুল বুঝিল বরাকরের লোকদের সে যতটা বোকা ভাবিয়াছিল, তাহারা ততটা বোকা নয়। বরাকরের লোকের রোগ হয়, নিশ্চয়, কিন্তু গোকুল ডাক্তার একটা রোগীরও দেখা পায় না। একে রোগীর সন্ধান নাই, তাহার উপর মুদি গোয়ালা কেহই আর ধারে উঠানা জোগাইতে চাহে না, তাহারা বাকি টাকার তাগাদা আরম্ভ করিল। তাহারা এই গোকুলের কত টাকা খাইয়াছে, কিন্তু এমনি নিমকহারাম তাহারা, একটুও যদি চক্ষুলজ্জা থাকে! একটুও যদি খাতিরে রেয়াৎ করিয়া চলে! গোকুল বরাকরের লোকগুলার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিতে লাগিল।

আগে গোকুল মনে করিয়াছিল চেনাশোনা জায়গায় তাহার পশার জমিবে ভালো; এখন ঠেকিয়া বুঝিল ঠকাইতে হইলে অচেনা জায়গাতেই সুবিধা অধিক। গোকুল চাটিবাটি তুলিয়া মুস্কিল আসানের আশা করিয়া আসানসোলে গেল।

বরাকরে লোকের সঙ্গে চেনা শোনা হইয়া গিয়াছিল, সেখানে মুদি ধারে উঠানা দিত, গোয়ালা ধারে দুধ জোগাইত। আসানসোল একেবারে নির্ব্বান্ধব দেশ; পকেট শূন্য। গোকুল স্থির করিল আগে একখানি ভালো দেখিয়া বাড়ী ঠিক করিতে হইবে; সেই বাড়ীতে জাঁকাইয়া বসিয়া সকলের কাছে পশার করিয়া লইবে।

গোকুল বাজার ছাড়াইয়া আসিয়া দেখিল একখানি ছোট দোতলা বাড়ী, তাহার চারিদিকে পাঁচিল-ঘেরা হাতা এবং সেই হাতায় একটু বাগানের মতো রহিয়াছে। দেখিয়া তাহার লোভ হইল। বাড়ীখানি খালিই আছে, ভাড়া পাওয়া গেলেও পাওয়া যাইতে পারে। গোকুল অগ্রসর হইয়া দেখিল একজন হিন্দুস্থানী চাকর চারপাইয়ের উপর বসিয়া পরম উল্লাসে গান করিতেছে—

"ভালো বাস্‌তে এসে্ কান্‌ব কেনে স্ই!"

গোকুল তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বাঃ জমাদার সাহেব! তুমি ত তোফা বাংলা গান করতে পার? এমন বাংলা তুমি শিখলে কেমন করে?

হিন্দুস্থানীটা প্রথমেই জমাদার সম্বোধনে খুসি হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার উপর তাহার ভাষাশিক্ষার কৃতিত্বের প্রশংসা শুনিয়া একেবারে গদগদ হইয়া পড়িল। একমুখ দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হাঁ বাবু, অনেক দিন বাংলা মুলুকমে থাকা করিয়েসে্ কিনা, উস্ লিয়ে বাংলা সি্খিয়েসে্। হিয়াঁকার আদমি-সব বোলে কি পরমেশ্বর তুমি তো বাঙালী হোয়ে গেলো, তুমি তো বাঙালী হোয়ে গেলো!

গোকুল বলিল—হাঁ জমাদার সাহেব, তুমি ত বহুত আচ্ছা বাংলা শিখেছ, গানও ত খুব সুন্দর করতে পার। তুমি গান কর, শুনি।

পরমেশ্বর একমুখ হাসিয়া চারপাইয়ের এক প্রান্তে সরিয়া বসিয়া বলিল—গান সুন্‌বেন্ ত বোসেন বাবু!

গোকুল বসিল। পরমেশ্বর দুই হাতে দুই কান চাপিয়া ধরিয়া গাহিতে লাগিল—

'ভালো বাস্‌তে এসে্ কান্‌ব কেনে স্ই!
তোম্‌রা যেমন্ প্রেমের্ পাগল্ হাম্‌রা তেমন্ নই!'

গান শেষ হইলে গোকুল বলিল—বাঃ কা্য তোফা গল্লা তোমার! আর কী সুন্দর গান!

পরমেশ্বর গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—হঁা বাবু, গানঠো বহুত আচ্ছা আসে! ইয়ে হামি বহুৎ কোষ্টো কোরে শিখিয়েসে!

গোকুল বলিল—আচ্ছা জমাদার সাহেব, এ গানের মানে কি বলতে পার? আমি ত ঠিক বুঝতে পারছি না।

পরমেশ্বর বলিল—মানে ত খুব সহল্ আসে—একটা মাইয়া লোক বোল্‌ছে কি সৃই, হাম্‌রা-লোক্ ভালোবাসা কোর্‌তে আসিয়েসে, বাকি কানা কোর্‌তে ত আসে নাই...হামরা হিন্দুস্থানী-লোক মাইয়া লোকের আদমিকে বোলে সইয়াঁ, আউর বাঙালী লোক বোলে স্‌ই, সোয়ামী; মাইয়া লোকটা তার আদমিকে বোল্‌ছে কি হামরা-লোগ্ তুম্‌হার্ সঙ্গ-ভালোবাসা করতে আসিয়েসে, বাকি কানা কোরতে ত আসে নাই......

গোকুল জিজ্ঞাসা করিল—মেয়ে লোকটা কি ওর সোয়ামীর চোখ কানা করে দেবে না, তাই বলছে?

পরমেশ্বর বলিল—না না, উ সে কানা নেই আসে্। কানা দু রকম আসে্—এক, চোখ থাকবে না সেই কানা, আউর, এক চোখ থাকবে জল গির্‌বে সেই কানা। এ যো কানার কথা বোলছে, ইয়ে দুসরা রকমের কানা—চোখ ভি রহবে জল ভি গিরবে। তারপর বোলছে কি তোমরা যেমন প্রেমসে পাগল হোয়ে যাও, হামরা উস্ রকম নেই আসে্।

গোকুল বলিল—বাঃ বাঃ বেশ গান!...আচ্ছা জমাদার সাহেব, তুমি বুঝি এই বাড়ার বাবুর জমাদার?

পরমেশ্বর বলিল—হাঁ ইয়ে বাড়ী ত লখীকান্ত্ বাবুকে আসে্; হামি ইখানকার বাগানের তদারক করি!

গোকুল বুঝিল যে পরমেশ্বর জমাদার আসলে বাগানের মালী। গোকুল বলিল—লক্ষ্মীকান্ত বাবু এই বাড়ীতেই থাকেন? কৈ বাড়ীতে ত কোনো লোক দেখছি না?

—না, বাবু ই বাড়ীতে থাকে না; ঐ চৌরাহার পর্ যো বড় মোকাম আসে্ ঐ বাড়ীতে বাবু থাকে!

—তুমি একলা তবে এই বাড়ীতে থাক?

—নেহি বাবু, হামরা-লোগ ই বাড়ীতে কোই থাকে না—ই বাড়ীমে বহুত ভূতের ডর আসে্; সোন্‌ঝা হোয় আউর হামরা সব ভাগি।

গোকুল আনন্দিত হইয়া বলিল—বল কি জমাদার সাহেব! তবে ত আমাকে এই বাড়ীতে থাকৃতে হ'ল। আমি ভূতের ওঝা! বাবুকে বলে' তুমি যদি ঠিক করে' দিতে পার তা হলে আমি ভূত ভাগিয়ে বাড়ী ভালো করে দিতে পারি।

পরমেশ্বর তটস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আপনি গুণী আসে্!...আলবৎ বাবুসে হামি বাড়ী দিলিয়ে দিব। এ বাড়ী ত এইসেই বন্ পড়ে থাকে।

গোকুলচন্দ্র পরমেশ্বরের সুপারিসে লক্ষ্মীকান্তবাবুর কাছ হইতে বাড়ীখানি দখল করিবার অনুমতি অতি সহজেই পাইল। বাড়ীতে ভয়ানক ভূতের ভয়, কেহ এ বাড়ী ভাড়া লইতে চায় না; গোকুলবাবুর ঝাড়ফুঁকে বাড়ীটার দুর্নাম যদি ঘোচে তবে গোকুলবাবুকে বেশি কিছু ভাড়া দিতে হইবে না। প্রথম মাস বিনাভাড়ায়, তারপরও টিকিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে এক বৎসর পাঁচ টাকা ভাড়ায় থাকিবেন; তারপর যাবৎ থাকিবেন সাতটাকা ভাড়া কায়েমি রহিল।

গোকুল সানন্দে সেই বাড়ী দখল করিয়া বসিল। অমনি শহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে একজন খুব গুণী ডাক্তার লক্ষ্মীকান্তবাবুর ভূতুড়ে বাড়ী ভাড়া লইয়াছে। সে যখন ভূত ভাগাইতে পারে তখন রোগ ভাগাইবে যে তাহা এমন আর বেশি আশ্চর্য্য কি!

গোকুল পরমেশ্বরকে তাহার কাছে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল; পরমেশ্বর ডাগ্‌দের বাবুর ভূত ভাগাইবার মন্ত্রতন্ত্র শিখিতে পাইবার প্রলোভনেও সেই বাড়ীতে রাত্রিবাস করিতে কিছুতেই রাজি হইল না! অগত্যা গোকুলকে একাই থাকিতে হইল। প্রথম রাত্রিতে ভয়ে ভয়ে গোকুলের ঘুম হইল না। প্রভাতে উঠিয়াই গোকুল দেখিল, সে বাঁচিয়া আছে কি না ইহাই দেখিবার জন্য লক্ষ্মীকান্তবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ইতর ভদ্র বহুলোক বাড়ীর বাহিরে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গোকুলের জাগরণক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল—কি ডাক্তারবাবু, খবর কি?

গোকুল বলিল—উঃ মশায়! সে ভয়ানক! ভাগ্যিস আমি বাড়ীর চৌহদ্দীবন্দী করে ধুলোপড়া দিয়ে রেখেছিলাম তাই আমি বেঁচে আছি।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল—তা হলেও আপনি খুব বড় গুণী বলতে হবে। আমি অনেক টাকা খরচ করেছি মশায়, কিন্তু কোনো গুণী এ বাড়ীতে এক রাত্তির বাস করতে পারেনি—কেবল এক মহেশপুরের কালীগুণী তেরাত্তির ছিল · ...

তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, ডাক্তার বাবুকেও তেরাত্তিরের বেশি থাকিতে হইবে না।

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—আচ্ছা, দেখা যাক!

একজন বলিল—শনি মঙ্গলবার কেটে যাবে, তবে জানব যে হাঁ গুণী বটে!

গোকুল শুধু বলিল—কাল ত মঙ্গলবার। আচ্ছা, কাল একবার কালিকাতন্ত্রের পিশাচদাপন মন্ত্রটা দিয়ে ঘাটবন্দী করে নেওয়া যাবে।

দ্বিতীয় রাত্রি কাটাইয়া গোকুল দেখিল সে বাড়ীতে এক ইঁদুরের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুরই উপদ্রব নাই। বাড়ীর ভিতর গরম ও ইঁদুরের হুটোপাটি হয় বলিয়া সে রাত্রে খাটিয়া টানিয়া আনিয়া খোলা বাগানের মধ্যে তোফা নিদ্রা দেল।

বুধবার সকাল হইতে-না-হইতে গোকুলের বাড়ীর ফটকের সামনে লোকে লোকারণ্য। সকলে দেখিয়া স্থির করিল ভূতে খাটিয়া-শুদ্ধ ডাক্তারবাবুকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ঘাড় মটকাইয়া চলিয়া গিয়াছে। সকলেই পরস্পরকে নিকটে গিয়া গোকুলের অবস্থাটা দেখিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ আর সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। এক পা আগাইয়া তিন পা পিছাইয়া যখন জনতা গোকুলের ফটকের কাছে কলরব করিতেছিল, তখন গোকুলের ঘুম ভাঙিল—গোকুল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। অমনি সকলে "বাবারে" বলিয়া ছুটিয়া পিছাইয়া গেল। যাহারা অসমসাহসী তাহারা আবার অগ্রসর হইয়া গিয়া ডাকিল—ডাক্তার বাবু!

গোকুল অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আরে মশায়! এ সর্ব্বনেশে বাড়ী! বাবা!

সকলে অমনি জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—কেন? কি হয়েছিল? খাটিয়া-সুদ্ধ টেনে......

গোকুল তাহাদের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—উঃ! একেবারে বাইরে এনে এক আছাড়!

—তারপর গলা......

—হাঁ, গলা টেপে আর কি। এমন সময় গুরুর আশীর্ব্বাদে কণ্ঠকণ্ডূয়ন মন্ত্র মনে পড়ে গেল, যেমন হুং হুং কঠ কঠ কণ্ঠকণ্ডূয়ন বলা, আর অমনি সব দুড়দাড় করে দিলে দৌড়—যেন সমস্ত পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে! আমি অমনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম, সমস্ত মন্ত্রটা আর আওড়ানো হল না।

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে বাঁচলেন কেমন করে'? ভূত ফিরে এল না?

গোকুল বলিল—ফিরবে কি! মন্ত্র যে মনে পড়েছিল, মনের মধ্যে ত সবটা জেগে উঠেছিল! আর, ধারালো মন্তরের গোড়ার খোঁচাটা খেয়েই বাছাধনেরা মজা টের পেয়ে গেছেন; বুঝে গেছেন যে আমার সঙ্গে বড় চালাকি নয়!

ডাক্তার বাবুর খ্যাতি ও পশার হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিল। একে ডাক্তার, তায় গুণী, তায় ব্রাহ্মণ—রোগ হইলে কুইনিন-গোলা চিরেতার জল, মন্ত্রতন্ত্রের ঝাড়ফুঁক, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, সমস্তের জন্যই ডাক পড়ে গোকুল ডাক্তারকে। গোকুলের এখন রাজার হাল। কিন্তু এখনো সামনে শনিবার। শনিবার আবার অমাবস্যা। সেদিনটা ভালোয় ভালোয় উৎরিয়া গেলে তবে বোঝা যাইবে যে হাঁ!

লক্ষ্মীকান্ত শনিবার প্রাতে জিজ্ঞাসা করিল—ডাক্তার বাবু, কেমন বুঝছেন?

গোকুল বলিল—বুঝছি ত বড় সুবিধের নয়। তাতে আবার কপালকুণ্ডলিনী তন্ত্রখানা বাড়ীতে ফেলে এসেছি......

—তবে! কাল যে শনিবার!......

—তাইত ভাবছি!...

—তাতে অমাবস্যা!

—তাইত! তবু দেখা যাক কতদূর কি হয়......

—না না, ডাক্তার বাবু, অতটা সাহস করবেন না! ঠিক করে ভেবে দেখুন, তাল সামলাতে পারবেন ত?

গোকুল দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—আজ্ঞে গুরুর আশীর্ব্বাদে আর মা কালীর খাঁড়ার কৃপায় পারব ত মনে হচ্ছে। আজকে সন্ধ্যেবেলা থেকেই কুলার্ণব তন্ত্রের মতে পুরশ্চারণ করে ভূতশুদ্ধি আর ভূতাপসারণ করতে হবে।

লক্ষ্মীকান্ত বাবু বলিলেন—হাঁ হাঁ ঐ ভূতশুদ্ধির কথা যা বললেন ওতে মহেশপুরের কালীগুণী খুব ওস্তাদ! তাকেও আনিয়ে নেওয়া যাক, কি বলেন? আপনারা দুজনে হলে তবু একটা জোর বাঁধবে ত?

গোকুল প্রমাদ গণিল। গুণী আসিয়া তাহার গুণ সমস্ত ফাঁস করিয়া না দেয়! তথাপি মুখে বলিল—তা বেশ ত! আপনার আনতে ইচ্ছে হয় আনুন; কিন্তু কিছু দরকার ছিল না।

লক্ষ্মীকান্ত বাবু বলিলেন—তা হোক ডাক্তার বাবু, কথায় বলে সাবধানের বিনাশ নেই। আজকে যে বড় ভয়ানক দিন!

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—তা বটে! কিন্তু কালীগুণী কি খুব জবর গুণী?

লক্ষ্মীকান্ত বাবু বলিলেন—উঃ বলেন কি! তাঁর টিকিতে জট! তিনি বাঁ হাতের তিন আঙুলে ধরে মড়ার মাথার খুলিতে করে মদ খান!

গোকুল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—ওঃ! তবে ত মস্ত গুণী!

বিকেল নাগাদ কালীগুণী আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মীকান্তবাবুর বৈঠকখানায় গোকুলেরও ডাক পড়িল। গোকুল গিয়া দেখিল এক-বৈঠকখানা লোকের মধ্যে একজন লোক বসিয়া আছে, সে গুণী না হইয়া যায় না—তাহার দুই হাতে দুই তামার তাগায় আঠারো গণ্ডা মাদুলি; তাহার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হিংলাজের মালা, হাড়ের মালা, স্ফটিকের মালা, মুসলমান ফকিরের তসবী-মালা; তাহার প্রত্যেকটাতে একএকটা মাদুলি, একটা তামা-বাঁধানো আমড়ার আঁঠি, একটা আংটি, সুতায় জড়ানো নানাবিধ জড়ি-বটি; তাহার কোমরের ঘুনসিতে একটা ঘসা পয়সা, তিনকড়া কাণাকড়ি, একটা নাভিশঙ্খ, একটা কুমীরের দাঁত, একটা বাঘের নখ, আর তার সঙ্গে গোটাকতক মাদুলি ঝুলিতেছে; তাহার মাথার টিকিটি একটি জট, তাহার শেষ প্রান্তে একটি মাদুলি জটের পাকে কায়েমি হইয়া আটকাইয়া রহিয়াছে; তাহার পরণে লাল চেলী, কাঁধে লাল চেলীর উত্তরীয়, কপালে রক্তচন্দন ও সিঁদুরের ফোঁটা।

গোকুল দেখিল কালীগুণী লক্ষ্মীকান্তের হাত দেখিতেছে। লক্ষ্মীকান্ত বলিল—আসুন ডাক্তারবাবু, গুণীকে আপনার হাতটা একবার দেখান।

গোকুল উহাকে গুণী বলিয়া স্বীকার না করিবার জন্য তাহাকে গুণী না বলিয়া বলিল—কালীপদবাবু কি মতে হাত দেখেন?

কালী একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—কি মতে দেখি তা আপনি কি বুঝবেন? আপনি কি এ শাস্ত্র কিছু আলোচনা করেছেন?

গোকুল বলিল—তা একটু আধটু করেছি বৈ কি।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল—আপনি গুণতে পারেন, তা ত আমাদের এতদিন বলেন নি?

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—নিজের বিদ্যের কথা কি নিজের মুখে বলতে আছে?

লক্ষ্মীকান্ত তাড়াতাড়ি আপনার হাত কালীর হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া গোকুলের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিয়া বলিল—ডাক্তারবাবু, আমার হাতটা একবার দেখুন।

কালী গোকুলের উপর মনে মনে চটিল। গোকুল লক্ষ্মীকান্তকে বলিল—হাত দেখতে হবে না, আমি এমনিই বলে যাচ্ছি।

লক্ষ্মীকান্তের শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

কালী বলিল—ও! আপনি হনুমানচরিত্র কাকচরিত্র-মতে গোণেন দেখছি।

গোকুল বলিল—আপনি জানেন?

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল—হাঁ, জানি বটে, কিন্তু ততটা অভ্যাস নেই।

গোকুল লোকপরম্পরায় লক্ষ্মীকান্ত বাবুর সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনিয়াছিল তাহাই আবছায়া আবছায়া অস্পষ্ট করিয়া বলিয়া ভবিষ্যতের সুখ দুঃখ সম্পত্তি বিপত্তির খুব একটা লম্বা ফর্দ্দ নির্ভয়েই দিয়া গেল।

গোকুলের বিদ্যা দেখিয়া লক্ষ্মীকান্ত ত অবাক! কালীরও কৌতূহল হইল, অনুরোধ করিল যে তাহারও অদৃষ্ট গণিয়া বলিতে হইবে।

গোকুল প্রমাদ গণিল। এখনি বা সকল বিদ্যা ফাঁস হইয়া যায়?

গোকুল বলিল—গুণীলোকের অদৃষ্ট বলা বড় শক্ত! তাঁরা নিজের বিদ্যার প্রভাবে হয়কে নয়, আর নয়কে হয় করে তোলেন কিনা! বিশেষ এঁকে দেখছি জবর গুণী!

কালী খুসী হইয়া গেল। তথাপি লক্ষ্মীকান্ত ও সে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল—তবু দেখুন, সব না মিলুক কিছু ত মিলবে।

গোকুল আবার ওজর করিল—জানেন ত গণনা প্রভাতে জল ছোঁবার আগে যেমন হয়, ভরাপেটে তেমন হয় না।

কালী বলিল—হাঁ, তা বটে। তবু...

তবুর পর গোকুলের আর এড়াইবার উপায় রহিল না। গোকুল চোখ পাকাইয়া কালীর দিকে কটমট করিয়া চাহিল। কালীর দৃষ্টি অমনি নত হইয়া পড়িল। গোকুল বুঝিল সে ভীরু দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক—উহাকে ধমকাইয়া অনেক কাজ হাসিল করা যাইবে। গোকুল ধমকাইয়া বলিল—আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন।

কালীর চোখ মিটমিট করিতে লাগিল। গোকুল শুনিয়াছিল যে কালীগুণী গয়লার বামুন, গয়লা-পাড়াতেই তাহার বাস। তাই আন্দাজী গোকুল বলিল—একবার ছেলেবেলা আপনার একটা খুব ফাঁড়া গেছে, ভাগ্যে ভাগ্যে বেঁচে গিছলেন; একটা গরু আপনাকে গুঁতোতে এসেছিল—

—হাঁ ঠিক, মা কোলে তুলে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন।

গোকুল বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ। আপনি বলছেন কেন, ও ত আমি বলতাম।

সকলের মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

গোকুল আবার খানিকক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া বলিল—একবার উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে খুব আঘাত পেয়েছিলেন......

—আজ্ঞে হাঁ গাছথেকে......

গোকুল আবার ধমক দিয়া বলিল—আঃ! আবার বলছেন, ও ত পরে আমিই বলব!

কালী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আচ্ছা, বলুন দেখি কি গাছ?

গোকুল মুস্কিলে পড়িয়া গেল। একটু চোখ পাকাইয়া ভাবিয়া বলিল—সে গাছে ব্রহ্মদত্যি ছিল, গাছে পা ঠেকাতে......

কালী উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—হাঁ, ঠিক বটে সেটা বেলগাছ।

গোকুল আবার ধমক দিয়া বলিল—আঃ! আমাকে বলতে দিচ্ছেন কই? গাছের নাম ত আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম?...আচ্ছা, অতীতের গণনা দেখে বিশ্বাস হল ত? এখন বর্ত্তমান বলি।......আপনার বর্ত্তমান সময়টা তেমন ভালো যাচ্ছে না......

মানুষ প্রায়ই বর্ত্তমানে সুখী থাকে না; সে অতীতের ও ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কেবলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে থাকে। ইহা ভাবিয়াই গোকুল বলিল—আপনার বর্ত্তমান সময়টা তেমন ভালো যাচ্ছে না......

কালী অমনি বলিয়া উঠিল—হাঁ ঠিক বলেছেন, আমি ভারি ঝঞ্ঝাটের মধ্যে মনের অসুখে আছি।

এক-বৈঠকখানা লোক সকলেই ডাক্তারবাবুর অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। সকলে মনে মনে আঁচিয়া রাখিতেছিল এই ত্রিকালদর্শী ডাক্তার বাবুটি ছাড়া আর কাহাকেও দিয়া চিকিৎসা করানো নয়!

কালী বলিল—তারপর?

গোকুল মুখ ঘুবাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তারপর? আজকে...; থাক, সে আর শুনে কাজ নেই।

সকলের কৌতূহল একেবারে উৎসুক হইয়া উঠিল। সকলেই ব্যাপার কি জানিবার জন্য অনুরোধ করিতে

লাগিল। গোকুল অনেক ইতস্তত করিয়া যেন অগত্যা বলিল—আজকে একটা বিশেষ রকম ফাঁড়া আছে দেখছি। আপনি পূর্ব্বজন্মে যে জানোয়ার ছিলেন সেই ভূতে আজকে আপনাকে তাড়া করবে?

কালীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। তবু সে ক্ষীণস্বরে বলিল—পূর্ব্বজন্মের কথা আপনি কোন্ শাস্ত্রের নির্দ্দেশে বলছেন? সে রকম কি কোনো শাস্ত্র আছে?

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—আপনি গুণীমানুষ, আপনিই বলুন সে কোন শাস্ত্র!

কালী বলিল—হাঁ, গুরুদেব বলতেন বটে এই রকম শাস্ত্র আছে, যাতে করে' পূর্ব্বজন্মে কে কি ছিল আর পরজন্মে কে কি হবে তা বলা যায়। আপনি কি সে শাস্ত্র দেখেছেন?

গোকুল বলিল—দেখেছি বৈ কি! আমার গুরু তিব্বত থেকে সে শাস্ত্র এনেছিলেন। তার নাম ঘটোদ্ঘাটিনী অদৃষ্টোৎসারিণী তন্ত্র!

কালী বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ গুরুদেব ঐ রকম একটা প্রকাণ্ড কটমট নাম করতেন বটে!

তখন সকলে জেদ করিতে লাগিল বলিতে হইবে কালীগুণী পূর্ব্বজন্মে কি ছিলেন এবং পরজন্মে কি হইবেন।

কালীর মুখ চুন হইয়া গিয়াছে। সে আর কোনো কথা বলে না। তাহা দেখিয়া গোকুলের একটু দয়া হইল, সে বলিতে ইতস্তত করিতে লাগিল। আবার সকলে জেদ করায় গোকুল বলিল—এত লোকের সামনে......

লক্ষ্মীকান্ত বলিল—লোকের সামনে বলতে কি শাস্ত্রে নিষেধ আছে?

—না, শাস্ত্রে ঠিক নিষেধ নেই; তবে......

তখন সকলে কলরব করিয়া উঠিল—তবে আর কি? আপনি বলুন।

গোকুল যথাসাধ্য চেষ্টায় খুব গম্ভীর হইয়া বলিল—গুণী পূর্ব্বজন্মে গোরু ছিলেন; আর-একটা গোরুকে গুঁতিয়ে মেরে ফেলেছিলেন; সেইজন্যে ইনি গয়লার বামুন হয়ে জন্মেছেন; আর সে ভূত হয়ে শনিবারে অমাবস্যার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে!

লক্ষ্মীকান্ত বলিল—আজই ত শনিবার অমাবস্যা!

কালী বলিল—গোভূত! সে যে ভয়ানক! সে আবার মন্তর মানে না!

গোকুল তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল—ভয় কি; আমি আছি!

তখন সকলে আশ্বস্ত হইয়া কালীগুণীর পরজন্ম শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—আপনি কোনো ধোপাকে মেরেছেন বা মারবেন......

কালী ভীত হইয়া বলিল—হাঁ মেরেছি বটে! এই পরশু। কেন, কি হবে বলুন দেখি?

গোকুল বলিল—আপনি আসছে জন্মে গাধা হয়ে জন্মাবেন।

সভা একেবারে অবাক, নিস্তব্ধ!

গোকুল হাসিয়া মনে মনে বলিল—আর এ জন্মে এখানকার সব লোক কয়টিই গাধা হয়েই জন্মেছেন দেখতে পাচ্ছি!

গোকুলের এই বিদ্যা জাহির হইবার পর আর কেহ গোকুলকে নিজেদের অদৃষ্টগণনা করিতে অনুরোধ করিতে সাহস করিল না, কে যে বানর ছিল এবং কে যে হনুমান হইবে তাহা জানিতে বড় কাহারো উৎসাহ দেখা গেল না।

সভার কেহ কথা কহে না দেখিয়া গোকুল কথা পাড়িল; চিন্তা করিয়া কাহাকেও তাহার গণনা-শক্তির গূঢ় উপায়টি ধরিতে দিতে সে চায় না। সে বলিল—তারপর গুণীমশায়, আজকের কি ব্যবস্থা করেছেন?

কালী বলিল—মনে করছি কুলাকুল চক্রের উপর ভূতাপসারিণী হোমটা করব। কি বলেন আপনি?

গোকুল বলিল—হাঁ, সেটা ত করতেই হবে, ঠিক আমিও ঐ কথাটি আপনাকে বলব ভাবছিলাম। আপনি ত তা হলে মস্ত গুণী। এতক্ষণে আমি আপনার পরিচয় পেলাম। ও হোম ত যে-সে লোকে করতে জানে না, পারেও না, করতেও নেই.....

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল—হাঁ, তন্ত্রে নিষেধ আছে!

গোকুল বলিল—হাঁ, আছেই ত।......আচ্ছা আমি

বলি কি ঐ সঙ্গে অকড়ম চক্রে বসে পিশাচ-বিদ্রাবণ মন্ত্রটা জপ করলে হয় না?

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল—হাঁ হাঁ অতি উত্তম! আমি হোম করব, আপনিই মন্ত্রটা জপ করবেন।

গোকুল বলিল—আচ্ছা তাই হবে। আমাকে ত আবার গোভূতবিতাড়িনী মন্ত্রটাও জপ করতে হবে। একটা গোভূতবিঘট্টিনী কবচ লিখে আপনার টিকিতে বেঁধে দেবো।

কালীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া গোকুল তাড়াতাড়ি বলিল—একটা আমাকেও ধারণ করতে হবে।

কালী বলিল—আপনার ত শিখা নেই দেখছি।

গোকুল বলিল—আমার গুরুসম্প্রদায় নিঃশিখ।

কালী বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—ও! আপনারা তা হলে তিব্বতীয় আশ্রমের!

গোকুল হাসিয়া বলিল—আপনার দেখছি সমস্ত খবরই জানা আছে।

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল—শ্রীগুরুর প্রসাদে!

গোকুল ভুত তাড়াইবার অনুষ্ঠানের একটা খুব লম্বা-চৌড়া ফর্দ্দ করিয়া দিল। এবং সেই ফর্দ্দ কালীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—গুণীমশায়, দেখুন, কিছু ছাড় টাড় হল কি না।

কালী ফর্দ্দে একবার চোখ বুলাইয়াই বলিয়া উঠিল—করেছেন কি? আসল জিনিসই ভুল!

গোকুল বলিল—কি মশায়?

কালী বলিয়া উঠিল—কারণ!

গোকুল হাসিয়া বলিল—ও! ও জিনিসটা আমাদের গুরুসম্প্রদায়ে চলে না কি না......

কালী বলিয়া উঠিল—ঠিক ঠিক, আপনারা যে তিব্বতী সম্প্রদায়। আপনারা ঘৃতাভ্যঙ্গ চায়ের ক্বাথ পান করেন বটে। কিন্তু চাও ত ফর্দ্দে ধরেন নি।

গোকুল বলিল—চা আমার বাসায় আছে, ও নেশাটা আমাকে নিয়মিত দুবেলাই করতে হয়, নইলে মন্ত্র জাগ্রত থাকবে কেন?

কালী বলিল—হাঁ, চা খেলে ঘুম আসে না বটে। কিন্তু......আমার জন্যে এক বোতল কারণ ফর্দ্দে ধরে দিন। আমরা শব-সাধনা করি কিনা, কারণটা আমাদের নইলে নয়......

গোকুল—তা অবশ্য—বলিয়া ফর্দ্দে এক বোতল কারণ লিখিয়া দিল। এবং বলিল—লক্ষ্মীকান্ত বাবু, কারণটা আমি নিজে কিনব; যে-সে জিনিস ত পূজো আচ্ছায় চলে না!

গোকুল নিজে গিয়া খুব কড়া রকমের এক বোতল মদ কিনিয়া আনিয়াছিল। এবং হোম করিতে করিতে কালীগুণীকে ঢালিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল। কালী বাঁ হাতের মাঝের দুটি আঙুল মুড়িয়া, কনিষ্ঠা তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলিতে একটি তেপায়া বৈঠক করিয়া তাহার উপরে মদের ছোট বাটিটি বসাইয়া পান করিতেছিল। তাহা দেখিয়া গোকুলের ভারি কৌতুক বোধ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—গুণী মশায়, ওরকম করে খাচ্ছেন যে?

কালী একটু অবজ্ঞার স্বরে বলিল—আপনাদের গুরুসম্প্রদায়ে ত এসব নেই, জানবেন কোত্থেকে? ডান হাতে করে খেলে, কিম্বা সোজা আঙুলে ধরে খেলে যে মদ খাওয়া হয়। মদ ত আমরা খাই না। বাঁ হাতের তিন আঙুলের ডগায় বসিয়ে খেলে হয় কারণ, আমরা কারণই করে থাকি!

গোকুল বলিল—বেশ! একটা নতুন তত্ত্ব শেখা গেল। বড় ভাগ্যে আপনা-হেন গুণীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমাকে দয়া করে কিছু গুণটুন শিখিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

কালী উৎফুল্ল হইয়া বলিল—তা বেশ! কিন্তু জানেন ত শিবের গুরু রাম, আর রামের গুরু শিব!

গোকুল হাসিয়া বলিল—তা অবশ্য! তা অবশ্য! আমার একটু আধটু যা জানা আছে তা আপনাকে শিখিয়ে দেবো বৈ কি! কিন্তু ভালোয় ভালোয় আজকের রাতটা ত কাটিয়ে উঠি।

কালী আড়চোখে একবার চারিদিকে দেখিয়া লইল। ইহা গোকুলের চোখ এড়াইল না।

গোকুল আবার পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল। কালী বলিল—অত ঘন ঘন না হে!

গোকুল বলিল—বলেন কি? প্রত্যেক কুশীর ঘিয়ের আহুতি যেমন হোমানলে পড়বে অমনি এক এক পাত্র জঠরানলে পড়বে, এই ত নিয়ম। দেখুন না আমার জপের সুমেরু হবে এক বাটি চা!

কালী খেলো হইয়া যাইবার ভয়ে আর কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু সে বুঝিতেছিল যে মদের নেশাটা মাথার মধ্যে চনচন করিয়া চড়িয়া উঠিতেছে।

খুব আড়ম্বরে জপ হোম শেষ হইল। তখন গোকুল বলিল—এইবার শর্ষেপড়া দিয়ে বাড়ীটার ঘাটবন্দী করে দিয়ে আসি।

কালীর গা তখন ছমছম করিতেছিল। সে একলা থাকিতে হইবার ভয়ে বলিল—হাঁ চল, আমিও ধুলোপড়া দিয়ে রেখে আসি।

ঘাটবন্দী করিবার জন্য বাড়ীর চারিদিকে ধূলা ছড়াইতে ছড়াইতে কালী খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্র আওড়াইতে লাগিল—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তার স্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥
ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥

ঘাটবন্দী করিয়া আসিয়া দুজনে খাটে মশারী খাটাইয়া শয়ন করিল। গোকুল দেখিল অত মদ খাওয়া সত্ত্বেও কালী ভয়ে ঘুমাইতে পারিতেছে না। গোকুল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া থাকিয়া কালী ঘুমাইয়াছে কি না দেখিবার জন্য আস্তে ডাকিল—গুণীমশায়।

কালী একেবারে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—অ্যাঁঃ! কেন? কি হয়েছে?

গোকুল বলিল—আজ আর ওঁরা কেউ এলেন না দেখছি!

কালী চাপা গলায় বলিল—চুপ, এখনো বলা যায় না, তৃতীয় পহরেই ওঁদের বেশি উৎপাত!

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গোকুল ডাকিল—গুণীমশায়!

কালী আবার লাফাইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—কেন? কি হল?

গোকুল কোনো মতে হাসি চাপিয়া বলিল—আজ্ঞে আমি একবার বাইরে যাব।

কালীর তখন নেশায় শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে। সে শুইয়া পড়িয়া বলিল—অ্যাঃ! তোমার এত ভয়! যাও, কিছু ভয় নেই, আমি শরীর-সংরক্ষিণী মন্ত্র পড়ছি। কিন্তু খবরদার দশরথের বেটার নাম কেরো না যেন, তা হলে ওঁরা ভারি রাগ করেন, তখন একটু অসাবধান হলেই ঘাড় মটকান!

গোকুল মহাভয়ের ভান করিয়া বলিল—অ্যাঁঃ! বলেন কি? আমি যে মন্তর তন্তর সব ভুলে যাচ্ছি......

কালী জড়িতস্বরে বলিল—ভয় নেই। হুং হুং হ্রাং বৌং শ্রুং ক্রুং কটকট ফটফট তারয় তারয়—বল্‌তে বল্‌তে চলে যাও।

গোকুল রুদ্ধহাসির বেগে কম্পিতস্বরে মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে বাহিরে চলিয়া গিয়া আর হাসি রাখিতে পারিল না, হো হো করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি শুনিয়া কালী একেবারে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল।

গোকুল ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—গুণীমশায়, ব্যাপার কি?

কালী কম্পিতকণ্ঠে বলিল—বিকট হাসি শুন্‌তে পেলে না?

গোকুল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—কৈ না ত!

কালী বলিল—এইবার আসছেন তাঁরা! খুব সাবধান! বৌং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হো হং সঃ কটকট ফটফট তারয় তারয়......

গোকুলের হাস্যরোধ করা কষ্টকর হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে গোকুল দেখিল কালীর নাক ডাকিতেছে, কালী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গোকুল বাহিরে গিয়া গোটাকত ঢিল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সেই ঢিলগুলি একসঙ্গে মুঠা করিয়া জোরে ছুড়িয়া ফেলিল। একটা ঢিল দরজার শিকলে লাগিয়া শব্দ হইল—টুং!

কালী একেবারে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিল—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

গোকুল ঘুমের ভান করিয়া জবাব দিল না। কালী বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!

গোকুলও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—অ্যাঁ কি ?

কালী বলিল—শিয়রে শমন করে ভালো ঘুম আপনার যা হোক ! ওঁরা যে এসেছেন !

গোকুল বিস্ময়ের ভাবে বলিল—এসেছেন কি ?

—হ্যাঁ, দরজার শিকল খুলেছেন......

—না, ও ইঁদুরে মাটি ফেলেছে, বোধ হয়।

—ইঁদুর নয় হে ইঁদুর নয়, শিকল খোলার শব্দ পষ্ট শুনলাম !

—নাঃ ! ও কিছু নয়, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকুন। আর ত কিছু শোনা যাচ্ছে না।

—তা হোক, মন্তরটা আওড়াও হে। ওঁ ভূতশৃঙ্গাট-চ্ছিরঃ সঙ্কোচশরীরমুল্লস জ্বল জ্বল......

গোকুল বলিল—আপনার টিকিতে সে কবচটা ঝুলছে ত !

—তা ত ঝুলছে ! জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল......

—তবে আর কোনো ভয় নেই।

কালী বলিল—তুমি ত বল্‌লে ভয় নেই। কিন্তু ওঁরা ত এসে ঘুরঘুর করছেন।......দহ দহ শোষয় শোষয়···

কালীর ঘুম আর আসে না। গোকুলও ভুত নামাই-বার সুবিধা আর পায় না। অপেক্ষা করিতে করিতে কখন গোকুল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙিল, তখন দেখিল একেবারে ভোর হইয়া আসি-য়াছে। কালীর তখনো খুব নাক ডাকিতেছে। গোকুল আস্তে আস্তে মশারী তুলিয়া খাট হইতে নামিয়া হুড়্‌ড়ড়্ বাঁ করিয়া বিকট চীৎকার করিয়া লাফাইয়া গিয়া কালীর মাথাটা জোরে চাপিয়া ধরিল। কালী মুখে একটা বুঁ উঁউঁউঁ......শব্দ করিয়া সমস্ত মশারী ছিঁড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া লইয়া একলাফে সিঁড়ির উপরে গিয়া পড়িল, এবং সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে গিয়া একেবারে নীচে খোয়ার উপরে আছাড় খাইল ; তাহার জটওয়ালা টিকিটি গোকুলের হাতের মুঠার মধ্যেই ছিঁড়িয়া রহিয়া গিয়াছিল !

ভোর হইতে-না-হইতেই লক্ষ্মীকান্ত লোকজন লইয়া বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতেছিল। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ভূতের অধিকারে পা দেওয়া ত অমনি নয় !

কালীগুণীকে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে দেখিয়া দু-একজন অসমসাহসিক লোক ইতস্তত করিতে করিতে ধীরে ধীরে দু পা আগাইয়া এক-পা পিছাইয়া গিয়া তাহাকে উঠাইয়া হাতার বাহিরে আনিল। বেচারার টিকি ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেছে, মুখের একপাশ খোয়ায় আছাড় খাইয়া থেঁৎলাইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত।

সকলে তাহার মুখে চোখে জল দিয়া বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—গুণী, ব্যাপার কি ?

কালী বলিল—উঃ রে বাবা ! কী ভয়ানক ! একটু ঘুমিয়ে পড়েছি ; যেই মন্তর পড়া বন্ধ হয়েছে, সেই তক্কে একটা আস্ত গোভূত একদম তেড়ে এসে চেপে ধরলে আমার টিকিটা ! ঐ হতভাগা ডাক্তারটাই ত যত নষ্টের গোড়া, টিকিতে বেঁধে দিয়েছিল কি না গোভূত-খেদানো কবচ ! যত আক্রোশ পড়ল এসে টিকিটার ওপর ! আচমকা ঘুম ভেঙে যেতেই অমনি আওড়ে দিলাম হুং হুং বৌং ক্রৌং ! তখন আর আমার কিছু করতে না পেরে মশারিসুদ্ধ আমায় জড়িয়ে সড়িয়ে তাল পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলে ওপর থেকে একেবারে নীচে......

সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—আর ডাক্তার ?

—হ্যাঃ ! ডা ক্তা র ! তাকে কি আর রেখেছে ! আমি যাই, তাই কোনো গতিকে প্রাণে প্রাণে বেঁচে এসেছি !

—তা হলে ত তাকে একবার দেখা উচিত। বিদেশী লোকটা গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে বেঘোরে মারা গেল গা !

তখন সকলে লম্বা লম্বা বাঁশের লাঠির ডগায় লণ্ঠন বাঁধিয়া লইয়া সন্তর্পণে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা সকলের পশ্চাতে থাকিবে। কালীর ভয় করা শোভা পায় না, তাই তাহাকে প্রাণ হাতে করিয়া সকলের আগে আগেই যাইতে হুইতেছিল ; সে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জোরে জোরে মন্ত্র পড়িতেছিল —হন হন দম দম পচ পচ মর্দ্দয় মর্দ্দয়......

সকলে ঠেলাঠেলি করিতে করিতে সিঁড়িতে উঠিতেছে

টের পাইয়া গোকুল তাড়াতাড়ি কালীর টিকিটি সিঁড়ির দরজার মাথার চৌকাঠে শিকলের শুর্ষোতে ঝুলাইয়া দিল। এবং আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া রুদ্ধহাসির চোটে অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল।

এতক্ষণে গোলমাল শুনিয়া পাড়া-পড়শী সকলে আসিয়া জুটিয়াছে। তাহারা সকলে একবাক্যে সাক্ষ্য দিল কাল রাত্রে তাহারা ভূতের বিকট হাসি, উৎকট চীৎকার, হুটোপুটি শুনিয়াছে; এমন উপদ্রব এ বাড়ীতে আর কখনো হইতে দেখা যায় নাই।

সকলে উপরে উঠিয়া সিঁড়ির দরজার ওপার হইতেই লম্বা লাঠি বাড়াইয়া বাড়াইয়া গোকুলের মশারির চারিদিকে লণ্ঠন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহার অবস্থা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কেহই সাহস করিয়া সে ঘরে পা দিতে পারিতেছিল না; তখনো ঘরের মেঝেতে হোমের পূজার চিহ্ন ছড়াইয়া পড়িয়া থাকিয়া সকলের মনে ভয় জমাইয়া তুলিতেছিল।

কালী বলিল—দেখছ কি? এই দেখ আমার টিকিটা এখানে ঝুলছে! আর ডাক্তার? ও হয়ে গেছে! দেখছ না ও কি রকম কাঁপছে! ভূত প্রেত পিশাচ কি রোগী রে বাপু, যে ওষুধ গিলিয়ে তাকে মারবে! এ যে একেবারে মরা জিনিস!...ওঁ হর হর কালি ধম ধম বিন্দে আলে মালে তালে গন্ধে বন্ধে পচ পচ মথ মথ......

একজন চৌকাঠের এপার হইতেই ঘরের মধ্যে একটু ঝুঁকিয়া ভয়ে ভয়ে ডাকিল—ডাক্তারবাবু!

গোকুল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল—অ্যাঁ!

অমনি "ওরে বাবারে!" বলিয়া চীৎকার করিয়া সকলে দুদ্দাড় শব্দে একছুটে পলাইয়া একেবারে রাস্তায়!

নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে গোকুলের পেটে ব্যথা ধরিয়া গিয়াছিল। অনেক কষ্টে একটু দম লইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সে নীচে নামিয়া চলিল।

নামিতে নামিতে দেখিল ডগায়-লণ্ঠন-বাঁধা লাঠিগুলি বাড়াইয়া ধরিয়া সকলে গুটিগুটি আবার অগ্রসর হইতেছে।

গোকুল ডাকিল—গুণী!

কালী হাতজোড় করিয়া বলিয়া উঠিল—থাক বাবা! থাক! তোমায় ত আমরা কিছু বলিনি, তোমার ভা[ল] জন্যেই আমরা তন্ত্রমন্ত্র করছিলাম! থাক বাবা! থাক!.....দ্রবিড়ি দ্রাবিড়ি জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল..

গোকুল হাসিয়া বলিল—আমি মরে ভূত হইনি মশায়! আমি জ্যান্তই আছি।

কালী মাথা নাড়িয়া বলিল—জ্যান্ত! জ্যান্ত থাকতেই পার না! আমার সঙ্গে ত চালাকি খাটে[না] বাবা! থাক থাক! তোমায় আমি কিছু বলিনি! চলে যাচ্ছি বাবা! থাক! থাক!......জাজ্বলি যম[...] তারয় তারয়......

গোকুল হাসিয়া বলিল—ঐ দেখুন, সূর্য্য উঠ[েছে।] সূর্য্য উঠলেও কি ভূত দেখা দেয় নাকি!

তাও ত বটে! তখন সকলের প্রত্যয় হইল গোকুল ভূত হয় নাই, জ্যান্তই আছে।

গোকুল বলিল—এ বাড়ীকে একবৎসর শোধন করলে দোষ কাটবে না। ফি শনিবারে আর অমাব[স্যায়] শোধন করতে হবে।

লক্ষ্মীকান্ত হাতজোড় করিয়া বলিল—তাই ক[রুন] ডাক্তার বাবু! আপনার খাইখরচের আর পুজো আচ্চা[র] সমস্ত ভার আমার। আপনি এক বছর ধরে শোধন ক[রে] আমার বাড়ীটার দোষ কাটিয়ে দিন।

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—তা হলে গুণীম[শায়] আসছে শনিবার আসছেন ত?

কালী মুখ ঘুরাইয়া দুই হাত তুলিয়া ঘন ঘন নাড়ি[য়া] বলিল—আমি? আমি আর এঁদের ঘাঁটাতে আসছি [না] ডাক্তার বাবু!

গোকুল গম্ভীর হইয়া বলিল—তা না আসুন, এ ক[াজ] আমি একলাই আরো ভালো পারব!

এ কথায় কাহারোই অবিশ্বাস হইল না। যে ভূ[ত] কালীগুণীকে দোতলা হইতে তুলিয়া আছাড় দেয় তাহ[ার] হাতেও যখন গোকুল নিস্তার পাইয়াছে তখন সে গুণীই বটে!

গোকুলের পসার কায়েমি হইয়া গেল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালাশব্দ-কোষ

শ্রীচারুচন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোষের পূর্ণতাসাধনের সহায় হইয়া আমায় অনুগ্রহবদ্ধ করিতেছেন। তিনি যে-সকল শব্দ দিতেছেন তাহা অল্পসময়ে সংগৃহীত হইতে পারে নাই, যে অর্থ ও যে ব্যুৎপত্তি উপন্যাস করিতেছেন তাহা অল্পচিন্তায় আসে নাই।

বোধ হয় আর এক মাসে কোষের হ পর্য্যন্ত ছাপা হইবে। তার পর, কোষ-সংশোধন, নূতন শব্দ-যোজন চলিবে। কেহ কেহ জানিতে চাহিয়াছেন, কোষ কবে সম্পূর্ণ হইবে। বলা বাহুল্য, এক অর্থে কোষ সম্পূর্ণ হইবার নহে; অন্য অর্থে মোটা কাঠাম ও একমেট্যে হইয়া এই বৎসরে শেষ হইতে পারিবে। আমি দুই সংকল্প করিয়া অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। (১) বাঙ্গালাশব্দ-কোষ একটা চাই: (২) ইহার বিচারণার আদর্শ একটা চাই। একটা সম্পূর্ণ কোষ সঙ্কলন করিব, এরূপ উদ্‌যোগ ও সাহস করি নাই, সে উদ্‌যোগের অবসরও পাই নাই। তথাপি অল্পে অল্পে কোষ বাড়িয়া উঠিয়াছে, সময়ও অল্প লাগে নাই। যাঁহারা প্রথম অংশের সহিত পরের অংশ মিলাইয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন, শেষের দিকে কোষ বাড়িয়া উঠিয়াছে। চারুবাবু প্রথম প্রথম যত শব্দ ছাড় পাইয়াছেন, পরে তত পান নাই।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা শব্দের অভাব নাই। *সাহিত্য-পরিষৎ* বহু বহু শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন। সে-সকল শব্দ এখন দেখিবার সময় আসিতেছে। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, অদ্যাবধি বাঙ্গালা অভিধান একখানাও দেখা হয় নাই। একবার *প্রকৃতিবাদ* খুলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার উদ্দেশ্যের কিছুমাত্র সাধন না পাইয়া আর খোলা হয় নাই। শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র-কৃত *সরল বাঙ্গালা অভিধান* মানুষের ইতিবৃত্ত ও পুস্তকের বর্ণিত বিষয় ব্যতীত সামান্য শব্দবিষয়ে প্রকৃতিবাদের তুল্য। কিছুদিন হইল, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত *বঙ্গীয়শব্দ-সিন্ধু* পাইয়াছি। সে খানি আমার উদ্দেশ্য-অনুযায়ী কতক বটে, কতক নহে। ইহাতে বাঙ্গালা (অর্থাৎ সংস্কৃত নহে) শব্দ আছে, বহুস্থলে প্রাচীন প্রয়োগও আছে, কিন্তু ব্যুৎপত্তি প্রায় নাই। আর্বী ফার্সী হইতে আগত বাঙ্গালা শব্দের আছে। কিন্তু সংস্কৃত-ভব শব্দের প্রায় নাই। তা ছাড়া যে অসংখ্য দ্বিরুক্ত ধাতু-শব্দ দ্বারা বাঙ্গালাভাষা সমৃদ্ধ হইয়াছে, সে-সকল শব্দ নাই। কোষখানির প্রধান দোষ, কোষকার ভাখা এড়াইয়া চলেন নাই। স্থানভেদে শব্দের বিকারভেদ হইয়াছে; ভাখা-অংশ বর্জ্জন না করিলে বাঙ্গালা বলিতে পারা যায় না। প্রত্যেক লোকের স্বভাবতঃ বাসনা হয়, যে শব্দ যে আকারে যে অর্থে তাহার পরিচিত ঠিক সে আকারে সে অর্থে সে শব্দ সকলের পরিচিত হউক। কিন্তু এ বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। আমরা সমাজবন্ধনে বাঁধা আছি। কি করিলে সমাজের হিত হইবে তাহা চিন্তা করিতেই হইবে। এই কারণে কথ্য ভাষা আর লেখ্য ভাষা এক হইতে পারে না। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু-প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের বৃহৎ *বিশ্বকোষে* সাধারণ শব্দও আছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তিপক্ষে প্রাচ্যবিদ্যার্ণব-মহাশয় তাদৃশ মনোযোগী হন নাই। আর একখানি চমৎকার অভিধান পাইয়াছি। এখানি লণ্ডনে খ্রীঃ ১৮৩৩ সালে ছাপা হইয়াছিল। কোষকার ইংরেজ, স্যর গ্রেভস্ *হটন*। বিলাতের পণ্ডিতদিগের কৃতির সহিত আমাদের দেশের কৃতি তুলনাও হইতে পারে না। কি অসাধারণ পরিশ্রম কি অন্বেষণ কি বিচারণা কি সম্পাদন, সকল বিষয়েই বিলাতী কৃতির শ্রেষ্ঠতা প্রত্যহ উপলব্ধ হইতেছে। *হটন* সাহেবের অভিধানের পাশে আর এক বৃহৎ অভিধান আছে। এখানি *জনসন* সাহেব-কৃত পারস্য ও আরব্য ভাষার অভিধান। এখানিও লণ্ডনে ছাপা; খ্রীঃ ১৮৫২ সালে ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদেশে ছাপা হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত আমার ক্ষুদ্র সংকল্পের নিমিত্ত *ফালোন*-সাহেব কৃত হিন্দুস্তানী অভিধান দেখিয়া আসিতেছিলাম। এখন ইহাতে কুলাইবে না। বড় সংস্কৃত অভিধানের মধ্যে *শব্দকল্পদ্রুম* দেখিয়াছি, কিন্তু সম্যক্ দেখিতে পারি নাই। অন্য অন্য বড় বড় সংস্কৃত অভিধান পড়িয়া আছে। পালিভাষার অভিধান এখনও দেখি নাই। এসব ছাড়া, বঙ্গদেশের পাশের ভাষার অভিধান আছে। প্রত্যেক অভিধান

হইতে বাঙ্গালা-শব্দ-কোষের কিছু-না-কিছু উপকরণ পাওয়া যাইবে। অতএব ঘরে বসিয়াই পুস্তক হইতে কত শব্দ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা ভাবিতে গেলে বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয়। এসব ছাড়া অদ্যাপি কত শব্দ লোকের মুখে মুখে প্রচলিত রহিয়াছে, বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে, সেসব শব্দ অন্বেষণ সংগ্রহ করিতে হইলে কোষসমাপ্তির আশা থাকে না।

কেবল শব্দ পাইলে কোষ হয় না। প্রয়োগ না পাইলে অর্থ-নির্ণয় হয় না, ব্যুৎপত্তি না পাইলে অর্থপরিচ্ছেদ হয় না, এবং অর্থ না পাইলে ব্যুৎপত্তিনির্ণয় হয় না। আমার কোষে অনেক ভুল এখন আমারই চোখে পড়িতেছে। ছাপার ভুলও ঘটিয়াছে। ভুক্তভোগী জানেন লেখক নিজে ছাপার ভুল সব ধরিতে পারেন না। তাঁহার দৃষ্টি বিষয়ের প্রতি থাকে, অক্ষরযোজনার এমন কি বানানের দিকেও প্রায় থাকে না। নানাপ্রকার ভুলের আশঙ্কায় আমি প্রথমাবধি এক এক বিজ্ঞের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি। কোষের এক এক অংশ, কেহ সংস্কৃতব্যুৎপত্তি, কেহ পালি ও প্রাকৃত ব্যুৎপত্তি, কেহ অর্থ, কেহ বানান, এইরূপ এক এক অংশ সে সে বিষয়ে বিজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষিত করাইবার বহু আশা ছিল। বন্ধুবর শ্রীবিজয়চন্দ্র-মজুমদার মহাশয় পালি ও প্রাকৃত পরীক্ষার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুর দোষের সংবাদে ব্যথিত হইতেছি। পূজনীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ-ঠাকুর মহাশয়ের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিলাম। তাঁহার অস্বাস্থ্যহেতু অকৃতার্থ হইয়াছি। সুধী শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর-ত্রিবেদী মহাশয়েরও নিকট ভগ্নাশ হইতে হইয়াছে। তিনি রুগ্ন হইয়াও কোষের কিয়দংশ দেখিয়াছিলেন কিন্তু যাহা টুকিয়াছিলেন তাহা দৈববিড়ম্বনায় গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। সুস্থ থাকিলেও কষ্টকর সমালোচনার অবসর সকলের হয় না। আনন্দ হইতেছে, পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর-শাস্ত্রী মহাশয় কোষের কিয়দংশ দেখিবার ভার লইয়াছেন। আর্বী ফার্সী শব্দ বিচারের নিমিত্ত ইতিহাসরসিক অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ-সরকার মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরম আহ্লাদের বিষয় যোগ্যজন কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি প্রাচীন ফার্সী ও পরবর্ত্তীকালের অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ফার্সী, অর্থাৎ ফার্সীভাষার ইতি[illegible] জানেন, এবং যিনি বাঙ্গালাভাষা ও ইহার জননীর জী[illegible] চরিত সম্যক্ অবগত আছেন, তিনিই আর্বীফার্সী বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি বর্ণনা করিতে পারেন ; [illegible] পারেন না। সংস্কৃত ও ফার্সীভাষা সহোদরা ; উই[illegible] বর্দ্ধিত হইবার পর কালচক্রে উভয়ে কিছুকাল একত্র যাপন করিয়াছে। কত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত শাস্ত্র ফার্সী[illegible] প্রবেশ করিয়াছিল তাহা ইসলামের ইতিহাসে লি[illegible] আছে। অন্য পক্ষে, কত ফার্সী শব্দ এবং তৎসহ আর্বী শব্দ কেবল বাঙ্গালা নহে এদেশের প্রাকৃতভা[illegible] অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমাদের অবিদিত ন[illegible] কেবল প্রাকৃতভাষা কেন, সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রবিষ্ট ও হইয়াছিল।

অতএব শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ে বিড়ম্বিত হইবার আ[illegible] আছে। অধিকাংশস্থলে ধ্বনিসাম্য প্রলুব্ধ করে। [illegible] বাবু কতকগুলি ব্যুৎপত্তির ভুল ধরিয়াছেন, কতকগুলি[illegible] সন্দেহ জন্মাইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটা উ[illegible] করিতেছি। তিনি মনে করেন ইংরেজী pinnace হই[illegible] পানসী, puss হইতে পুষি, পর্তুগীজ varanda হই[illegible] বারাণ্ডা। কিন্তু মেদিনীকোষে বারণ্ডী দ্বারপি[illegible] আছে, ওড়িশার প্রাচীন প্রস্তরমন্দিরের অঙ্গবিশে[illegible] নাম অদ্যাপি বারাণ্ডী আছে। গ্রামেও লো[illegible] বিড়ালকে পুষ্পুষ্ করিয়া ডাকে, pinnace [illegible] পানসী নহে। ধ্বনিসাম্য এবং অর্থসাম্য হইতে ব্যুৎপত্তি এক না হইতে পারে। সং পর্য্যাণ পল[illegible] এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত পল্লাণ থাকিতে ফার্সী পালান [illegible] করিব কেন ? গ্রামে কেহ বলে পয়-পয়, কেহ বলে প[illegible] পদে, পণ্ডিতে বলেন ভূয়োভূয়। অতএব ফার্সী পয়-[illegible] পয় (পদে পদে) মনে করা কঠিন। ফু ফার্সীতে [illegible] অর্থ হইতে পারে, কিন্তু সং ফুৎকার অজ্ঞাত কি[illegible] অপ্রচলিত নহে। ফার্সী বাতাশা বুদ্‌বুদ বুঝাক ; বাত[illegible] মিশাইলে বাতাসা হয়। মাষা যে সং মাষক হই[illegible] আসিয়াছে তাহা ফার্সীতে মাষা থাকিলেও বলিব মাষক। অমরসিংহ হইতে যাবতীয় সংস্কৃতকে[illegible] কার মাষ (মাস) মাষক (মাসক) লিখিতে ভু[illegible]

নাই। সংস্কৃত বৈদ্যশাস্ত্র ও রসশাস্ত্রের ত কথাই নাই, লীলাবতী পাটীগণিতেও আছে। মাষক ও অর্দ্ধমাষক দুইপ্রকার মাষক ছিল। অমরকোষে মাষপর্ণী (যাহা হইতে বাঙ্গালা মাষাণি হইয়াছে) আছে।

ধ্বনিসাম্যে বিড়ম্বিত হইবার একটা দৃষ্টান্ত সম্প্রতি পাইয়াছি। অনেকে আমাসা (রোগ) শুদ্ধ করিয়া লেখেন ও বলেন, আমাশয়। কিন্তু আম+আশয়=আমাশয়; এবং চরক বলেন. নাভি ও স্তনদ্বয়ের মধ্যের অন্তরে আমাশয় (অবয়ব) অবস্থিত। চরক সুশ্রুত মাধবকর ভাবপ্রকাশে আমাশয় নামে কোনো রোগ নাই। আমরা যাহা আমাসা বলি, বৈদ্য শাস্ত্রে তাহার নাম প্রবাহিকা। এই শাস্ত্রে অতিসার রোগঅধিকারে আমাতিসার ও অন্যান্য অতিসারের সহিত প্রবাহিকা বর্ণিত হইয়া থাকে। চরকে শ্লেষ্মাতিসারের মধ্যে প্রবাহিকা নিবিষ্ট আছে। আমি মনে করি সং আমাতিসার শব্দ হইতে বাং আমাসা। শব্দের মাঝের ত ই এবং শেষের র লুপ্ত বা গ্রস্ত হইতে পারে। যেমন, সুতিক্ত—সুইক্ত—সুক্ত। যদি আ-মা-সা ঠিক এই একরূপ শুনিতাম, তাহা হইলে বরং আম-সার মনে হইত। কিন্তু কেহ কেহ বলে আমেসা। অর্থাৎ আমাতিসার—আমাইসা—আমেসা। সাধারণ লোকে আমাতিসার ও প্রবাহিকার প্রভেদ জানে না। অতিসার—অধিক পরিমাণে—নিঃসরণ হইলে অতিসার, আমাসা রোগ আমাশয়ের নহে, অন্ত্রের; সুতরাং আমাশয়-গত রোগও বলিতে পারি না। সে দিন "কবিরাজ হরলাল গুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত" নাড়ীজ্ঞানশিক্ষা নামক পুস্তকে (৯ম সংস্করণ ৩১ পৃঃ) দেখি লিখিত আছে "আমাশয়-রোগে নাড়ীর গতি।" পরে একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে, "আমাশয়ে পুষ্টিবিবর্জনেন ভবন্তি নাড্যো ভুজগাদিবৃত্তাঃ।" ইত্যাদি। কবিরাজমহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন, "আমাশয় হইলে নাড়ী স্থূল এবং সর্পের আকৃতির ন্যায় বা বর্ত্তুলাকৃতিবিশিষ্ট হয়।" কবিরাজের পুস্তকে, সংস্কৃত শ্লোকে আমাশয়রোগ নাম পাইয়া সন্দেহ জন্মিল। নাড়ীজ্ঞানশিক্ষার মূলপুস্তক কি, ইহার রচয়িতা কে, তিনি কবেকার লোক, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিবরণের বিন্দুবিসর্গ মুদ্রিতপুস্তকে নাই। কবিরাজমহাশয়কে পত্র লিখিলাম। তিনি মূল প্রশ্নের দিক দিয়া না গিয়া "আমাশয়" (প্রবাহিকা) রোগের স্থূললক্ষণ দিলেন এবং লিখিলেন, "বৈদ্যশাস্ত্রগুলি ভালরূপ অনুসন্ধান করিলেই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।" তিনি ভুলিয়া গেলেন বৈদ্যশাস্ত্র আমার জানা থাকিলে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতাম না।

আর একটা দৃষ্টান্ত দি-ই। কথাটা, ভেরেণ্ডা ভাজা। রাঢ়ে ইহা অজ্ঞাত; আমারও অজ্ঞাত ছিল। নদীয়াবাসী এক বন্ধুর মুখে শোনা। পরে নদীয়া ও কলিকাতাবাসী দুইতিন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু গ্রামে প্রয়োগ শুনি নাই, মূলভাব ধরিতে পারি নাই। কিন্তু বোধ হইতেছে ব্যুৎপত্তি প্রায় ধরিয়াছিলাম। চারুবাবু ব্যাখ্যা করেন, "ভেরেণ্ডার বীজ ভাজিয়া কোনো লাভ নাই; অথচ অকারণে তাহাই ভাজা।" ইহা হইতে, "অকাজ লইয়া থাকা।" কিন্তু শব্দটা বাস্তবিক ভেরেণ্ডা, ভাজা, না আর কিছু? যদি ভেরেণ্ডা হয়, তাহা হইলে ভেরেণ্ডা অর্থে ভেরেণ্ডার বীজ বুঝিব কেন? নদীয়া-শান্তিপুরের এক শিক্ষিত বন্ধু বলিলেন, ভাজা নহে, ভজা। ভেরেণ্ডা ভজিতেছে—সময় বৃথা নষ্ট করিতেছে। যদি ভজা হয়, ভেরেণ্ডার বীজ থাকে না; যদি ভাজা হয় ভেরেণ্ডার বীজ ভাজা অকাজ হয় না। এরণ্ড বীজ কাঁচা কিংবা ঈষৎ ভাজিয়া তেল বাহির করা হয়। ভাজিলে তেল শীঘ্র বাহির হয়। বঙ্গদেশে এরণ্ড ছাড়া অন্য দুই ভেরেণ্ডা আছে। একটার নাম বাগভেরেণ্ডা বা গাবভেরেণ্ডা, নদীয়ায় বলে কচা। ইহারও বীজে তেল আছে (মণকরা ১২ সের)। বঙ্গদেশে ইহার তেল হয় না, মাদ্রাজে ও অন্যস্থানে হয়। অন্য ভেরেণ্ডা লালভেরেণ্ডা তত প্রসিদ্ধ নহে। সে যাহা হউক, ভেরেণ্ডা উপমান হইল কেন? অন্য পক্ষে দেখা যায়, ভেরেণ্ডা ভাজা অশিষ্টপ্রয়োগ। অশিষ্টপ্রয়োগের একটা সামান্য লক্ষণ এই যে তাহা বিকৃত হয়। অতএব বোধ হয় কোন শব্দ বিকৃত হইয়া ভেরেণ্ডা আকার ধরিয়াছে। পশ্চিমে সাধুসন্ন্যাসীর ভোজনকে বলে ভণ্ডারা। ভণ্ডারা—ভরাণ্ডা—ভেরেণ্ডা হওয়া আশ্চর্য্য নহে। লোকে ভেরেণ্ডা ভজা মিশাইয়া

কিছু অর্থ পাইল না। ভজাকে ভাজা করিয়া যাবৎতাবৎ একটা জানা কথায় দাঁড় করাইল। যদি তাই হয়, ভেরেণ্ডা ভজা—ভণ্ডারা ভাজা—প্রাপ্তিআশায় উপাসনা। ইহা হইতে কাহারও অসিদ্ধি হইলে লোকে বলে, সে ভেরেণ্ডা ভাজিতেছে। সং-তে ভরণ্ড শব্দ আছে; অর্থ ভরণকর্ত্তা প্রভু স্বামী। ভরণ্ড ভজা—স্বামীর উপাসনা করা। ইহা হইতে ভেরেণ্ডা ভাজা আসিতে পারে। কে জানে, সং ভরণ্ড শব্দ হইতে হিন্দী ভণ্ডারা কি না।

শ্রীশশিভূষণ-দত্ত মহাশয় আঙ্গট ও থোকা শব্দের ব্যুৎপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। একটু সবিস্তরে আলোচনা করা যাউক। প্রথমে আঙ্গট শব্দ ধরা যাউক। দুইদিক দিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি অন্বেষণ করা যাইতে পারে। (১) অর্থ ধরিয়া। কোন্ সং শব্দের অর্থের সহিত আঙ্গট শব্দের অর্থের সঙ্গতি আছে? অবশ্য এস্থলে শব্দটা (ধ্বনি) অগ্রাহ্য হইবে না। (২) সংস্কৃত হইতে আগত বাঙ্গালা শব্দের অপভ্রংশের সূত্র ধরিয়া। এস্থলে শব্দের অর্থ অগ্রাহ্য হইবে না। প্রথম পক্ষে দেখা যায়, আঙ্গট শব্দ বিশেষণ, কেবল কলাপাতের বিশেষণ হয়। অর্থ অখণ্ড, যাহা চেরা ছেঁড়া নহে। অখণ্ড অপেক্ষা অখণ্ডিত মনে করিলে অর্থ স্পষ্ট হয়: কলাপাত কর্ত্তন করিতেই হইবে, নচেৎ কর্ম্ম হইবে না। পুরাতন পাতা খণ্ডিত হয়; নূতন কোমল পাতা অখণ্ডিত থাকে। অগ্রসহিত আখণ্ডিত কলাপাতা—আঙ্গটপাতা। অগ্র ত্যাগ করিয়া মধ্য কিংবা আদ্য অংশ লইলে আঙ্গট পাতা হয় না। অখণ্ড, অখণ্ডিত শব্দ হইতে আঙ্গট আসিতে পারে না, বলা কঠিন। ধ্বনিসাম্য আছে। কোষে দুই প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক প্রয়োগে (মাণিক-গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল) "আখণ্ড কলার পাতা" পাইয়াছি। বস্তুতঃ এই আখণ্ড শব্দ দেখিয়া ব্যুৎপত্তি অখণ্ড মনে হইয়াছিল। কিন্তু অখণ্ড অখণ্ডিত শব্দ একটু দূরবর্ত্তী হয়। নিকটবর্ত্তী শব্দ পাওয়া যাইতে পারে না কি? এখন শব্দশিক্ষার সূত্র ধরি। (১) সংস্কৃত শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর সংযুক্ত ব্যঞ্জন হইলে বাঙ্গালা অপভ্রংশে শব্দের প্রথম অ স্থানে আ হয়। অতএব অঙ্গ হইতে আঙ্গ আসিতে পারে। (২) সংস্কৃত শব্দের শেষের অক্ষর র ল ত দ ড প্রভৃতি কয়েকটা বর্ণ স্থানে বাঙ্গালাতে ট হইতে পারে। (৩) তিন অক্ষরের শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরের স্বরবর্ণ লুপ্ত কিংবা গ্রস্ত হইতে পারে। অতএব মূল সং শব্দ অঙ্গিত, অঙ্গুরী, অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি হইতে পারে। অঙ্গিত শব্দের প্রয়োগ থাকিলে অঙ্গিত মনে হইত। কিন্তু অঙ্গযুক্ত অঙ্গমৎ শব্দ আছে। এই দুইএর মধ্যে অঙ্গমৎ (বাং-তে থাকিলে অঙ্গমন্ত) শব্দ মূল মনে হইতে পারে। কিন্তু কোষে উদ্ধৃত দ্বিতীয় প্রয়োগে (চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে) "আঙ্গটিয়া পাত" আছে। সুতরাং অঙ্গিত অঙ্গমৎ প্রভৃতি শব্দ ত্যাগ করিতে হইতেছে। আঙ্গট+ইয়া—আঙ্গট-তুল্য—আঙ্গটিয়া। সং অঙ্গুলীয় অঙ্গুরীয় হইতে বাং আঙ্গটী, আঙ্গটা (বলয়)। অতএব মূল শব্দ অঙ্গুরীয় অঙ্গুরীয়—অঙ্গুরী—আঙ্গট হইতে পারে। অঙ্গুরীয়তুল্য মণ্ডলাকার যাহা, তাহা আঙ্গুটিয়া, আঙ্গটিয়া। অর্থ দেখা যাউক। কলাগাছের অগ্রের যে ব্যাবৃত্ত পত্র তাহা নিশ্চয় অখণ্ড। অতএব বোধ হয় মূল অর্থ ব্যাবৃত্ত, ইহা হইতে কলাপাতায় অখণ্ড। বাঙ্গালা ভাষায় এই পর্য্যন্ত যাইতে পারি। পাশের ওড়িয়া ভাষা দেখি। শ্রাদ্ধকর্ম্মে ও হবিষ্যান্ন ভোজনে আঙ্গটপাতা লাগে ওড়িয়াতে বলে অগিপত্র কিংবা মঞ্জপত্র। অর্থাৎ অগ্রপত্র, মধ্যপত্র। অতএব দেখা যাইতেছে এখানেও মধ্যের পত্র যাহা ব্যাবৃত্ত ও অখণ্ডিত থাকে, তাহাই মূল ভাব। পাতার মধ্যশিরায় দুই পাশের অংশের নাম অঙ্গ, অঙ্গিকা। এই কারণে কলাপাতা মাঝে চিরিয়া দুইখান করিলে যাহা হয়, তাহা ওড়িয়াতে বলে অঙ্গাপত্র কিংবা অঙ্গাকিয়া পত্র। প্রথমে মনে হইতে পারে আঙ্গটিয়া আর অঙ্গাকিয়া তবে এক। কিন্তু অঙ্গিকা+ইয়া=অঙ্গাকিয়া, অঙ্গ+আ=অঙ্গা। অর্থে আঙ্গটিয়া বা আঙ্গটপাতা আর অঙ্গা বা অঙ্গাকিয়া পত্র এক হইতেছে না। অতএব বোধ হইতেছে অঙ্গুরীয় হইতে আঙ্গুটিয়া এবং সংক্ষেপে আঙ্গট হইয়াছে। শশীবাবু আঙ্গট শব্দের যে প্রয়োগ দিয়াছেন, তাহাতে সে শব্দ বিশেষ্য। "লোকটির আঙ্গট ভাল" বলিলে বুঝি যেন অঙ্গসৌষ্ঠব, অঙ্গসংস্থা। এই অর্থে আসামীতে বলে অঙ্গন্ত, হিন্দীতে অঙ্গেট।

দ্বিতীয় শব্দ খোকা। ইহার কূল পাইবার আশা ছিল না। শব্দটি পুরাতন, কবিকঙ্কণে আছে। মেদিনীপুরে বলে থকা; রাঢ়ে কেহ বলে খোকা, কেহ খোঁকা; পূর্ব্ববঙ্গে কোকা, খোকন, কোকন। হিন্দীতে খোখা আছে। পূর্ব্ববঙ্গে এক অনুরূপ শব্দ কোদা আছে, ইদানী গ্রাম্য হইয়া পড়িতেছে। শব্দকোষে দেখিয়াছি, এরূপ অনেক শব্দের মূল সংস্কৃত। এই সাদৃশ্যে ভর করিয়া সংস্কৃত শিশু-বাচক শব্দ অন্বেষণ করিতে গিয়া খোকা শব্দের মূল সং অর্ভক পাইলাম! এই অনুমাণের প্রমাণ দিতেছি। প্রথমে অর্থ দেখি। অর্ভক শব্দের অর্থ শিশু, নির্ব্বোধ, কৃশ (অর্ভকঃ কথিতো বালে মূর্খেঽপি চ কৃশেঽপি চ—মেদিনী)। ক্ষুদ্র, কৃশ হইতে শিশু ও নির্ব্বোধ অর্থ আসিয়া থাকিবে। প্রাকৃত নারীর মুখে মুখে অর্ভক শব্দ বহু বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। অর্ লুপ্ত হইবে; থাকিবে ভক। বাঙ্গালা রীতি অনুসারে হইবে ভকা। ভকা হইতে থকা স্ত্রীলিঙ্গে থকী। স্থানভেদে খোকা, খোকী বা খুকী। অপভ্রংশে কোকা কুকী। ভ স্থানে ফ ব হ ধ ঝ হইবার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। থ হইবার অন্য দৃষ্টান্ত সম্প্রতি মনে হইতেছে না। কিন্তু সং ভঙ্গা বাং গঞ্জা (গাঁজা); ইহার সংস্কৃত রূপ দিতে গিয়া গঞ্জিকা; এবং বোধ হয় সং ভঙ্গ হইতে খাঁজা, সং ভর্জন হইতে সং খর্জিকা বাং খাজা, হইয়াছে। বোধ হয়, অর্ভক হইতে ত্রিপুরায় আবু, আসামীতে আপা, যেমন খোকা। ওড়িয়াতে বাই স্ত্রীং বুই'। ভক—ভয়—বাই। অর্ভক শব্দের অর্থ নির্ব্বোধ (idiot)। এই অর্থে বাং-তে বোকা (মেদিনীপুরে বকা), ওড়িয়াতে বায়া, হিন্দীতে ভকুআ, ভারতচন্দ্রে ভেকো। (আমার কোষে এই মূল ধরিতে পারি নাই। আর একটা শব্দ বায়া ডিম; বায়া-নির্ব্বোধ ডিম)। খোকা হইতে কোকা (ঢাকায় অর্থ শিশু, বাঁকুড়ায় মূক)। অতএব অর্ভক অনুমান অসিদ্ধ হইতেছে না। আরও দেখি, অমরকোষে ছা (শাবক) অর্থে সাতটি শব্দ আছে। যথা, (১) পোত—ইহা হইতে বাং পো (যেমন তার কি পো হয়েছে); রাঢ়ে পোঁটা পুঁটী; পূর্ব্ব-বঙ্গে পোলা পুলী; আসামীতে পোৱালী (ছানা); ওড়িয়া পিলা, পিলী (ছেলেপিলে—ছেলা-পিলা শব্দের পিলা ইহা নহে), বাং পোনা (মাছের ছানা) আসামী পোনা (পো ও মাছের ছা)। (বঙ্গের কোথাও কোথাও নাকি পোকা বলে। পুত্রিকা হইতে পোকা)। (২) পাক—ইহা হইতে ছেলের নাম পাকা আছে। (৩) অর্ভক—খোকা। (৪) ডিম্ভ—ইহার অপভ্রংশে কোনো শব্দ শুনি না। ডিম্ভ ডিম্ব—ডিম। (৫) পৃথুক, পৃথু পৃথুক শব্দের মূলার্থ বিস্তৃত, স্থূল। রাঢ়ে থুবড়ী মেয়ে বলে, যে মেয়ে কিছু বয়স্থা ও মোটা। ওড়িয়াতে কোদা অর্থে স্থূল। (৬) শাব, শাবক—ইহা হইতে ছা (ছ ছা শব্দও সং-তে শাবক অর্থে আছে), ওড়িয়া ছুআ। (শাব্ + বাল—ছাওয়াল, ছাবাল। ইহা হইতে ছালিয়া—ছেলে)। (৭) শিশু—এই শব্দ সংস্কৃত রহিয়া গিয়াছে। খোকা-ধন—খোকন। হয়ত ইহার রূপান্তরে কেহ কেহ বলে খোদন (কিংবা ক্ষুদ্র-ধন)। পূর্ব্ববঙ্গের কোদা ফার্সী কূদক—বালক, সং ক্ষুদ্রক। কিংবা সং কুধী—অর্ভক। শিশুবাচক আর কতকগুলি শব্দ আছে, যেমন পচা ধ্বসা, ইত্যাদি। খোসে আক্রান্ত হইলে পচা ধ্বসা। যাদু, যাদুমণি, নীলমণি, মণি, ইত্যাদি নাম সাধারণ। ফরিদপুরে নসু। ইহা হইতে নসীরাম, বোধ হয় সং অনস্ শিশু হইতে নসু। এইরূপ, ওড়িয়া কুনুমুণি,—সং কৃণক—ছা + মণি। হিন্দী লড়কা, আসামী লরা, মৈথিলী নোনকু, হিন্দী—ণকা, মারোয়াড়ী গিগলা, মরাঠী মুলগা শব্দ এইরূপ।

প্রবাসীর অনেক স্থান লইলাম। অধিক প্রার্থনা করিলে দাতার কার্পণ্য আসিবে। প্রবাসীর পাঠক অনেক। তাঁহারা কোষে প্রদত্ত ব্যুৎপত্তিতে সন্দেহ জন্মাইয়াও উপকার করিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহা-দের জানা রূপান্তর বলিয়া দিলে বাঙ্গালা শব্দ শিক্ষার উন্নতি হইতে পারিবে। এখানে কয়েকটা শব্দ উল্লেখ করিতেছি। ব্যুৎপত্তি ধরিতে পারি নাই। (তাসখেলার) ইস্‌কাপন চিড়িতন রুইতন হরতন; ঢেউ; নাছ (বহু প্রাচীন) বহির্দ্বার। পূর্ব্বকালে বহির্দ্বারের সম্মুখে নৃত্যস্থান নাটমন্দির থাকিত কি? প্রজাপতি (পতঙ্গ); ভরসা (হিং ভরোসা); মালঞ্চ (বহুপ্রাচীন); লেটা (যার বামহাত বলবান্); সুবিধা; সাব্যস্ত; হিমসিম খাওয়া।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বন্ধু-ঋণ

(গল্প)

(১)

"মনু !"

"যাই ভাই", বলিয়া একটি একাদশ বর্ষীয় বালক তাহার সমস্ত খেলিবার দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া বাড়ার বাহিরে গেল ; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সমবয়স্ক বন্ধু চারু পকেট হইতে একমুঠা আবির বাহির করিয়া মনুর চোখেমুখে বেশ করিয়া মাখাইয়া দিল।

নবদ্বীপের স্বনামধন্য জমীদার, রামশশীবাবুর একমাত্র পুত্র মনুজকুমার, তত্রত্য স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। চারচারার পাড়ার কুমোরদের ছেলে চারু, তাহার বন্ধু ও একক্লাসেই দুজনে পড়ে। চারু মনুকে ভালবাসে। শুধু ভালবাসে বলিলে ভাবটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়,—সে মনুকে নিজ প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে। মনুও চারুকে ভালবাসে—যেমন সমপাঠী দুটি বন্ধুতে একটু বেশীরকম মেশামিশি হইলে হয় ; কিন্তু চারুর ভালবাসা অমূল্য,—স্বর্গীয় ; সে মনুর জন্য তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটুকুও আবশ্যক হইলে উৎসর্গ করিতে পারে।

আজ দোলপূর্ণিমা, তাই সে একমুঠা আবির হাতে করিয়া বহুদূর হইতে আসিয়া, পাছে দারোয়ান বা চাকরদের চোখে পড়ে, এবং আবির গায়ে লাগিবে ভাবিয়া তাহারা মনুবাবুকে ছাড়িয়া না দেয়, এই মনে করিয়া তাহার আবির-ভরা হাতখানি পকেটের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া ডাকিয়াছিল,—"মনু !"

আবির মাখিয়া দুজনে হাসিমুখে মনুর বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

মনুর মাতা পুত্রকে তদবস্থায় দেখিয়া ও সুন্দর এবং মূল্যবান পোষাকটিতে আবিরমাখান দেখিয়া এ যে চেরোরই কাণ্ড তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং ভবিষ্যতে আর ওরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন ছোটলোকের ছেলের সহিত বাক্যালাপ করিতেও নিষেধ করিয়া দিলেন। এবং ছোটলোকের ছেলের অতিবড় স্পর্দ্ধা দেখিয়া চারুকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন।

বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইতেছে দেখিয়া চারুর মাত চিন্তিত হইয়া কি কর্ত্তব্য স্থির করিতেছেন, এমন সমে চারু আসিয়া উপস্থিত হইল।

পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি চারু ! এতরাত্রি পর্য্যন্ত ছিলি কোথায়, আমি যে ব ভাবছিলাম বাবা !"

চারু তখন ভাবিতেছিল মনুর মায়ের তিরস্কারে কথা ; সে মায়ের কথার কোনোই উত্তর দিতে পারি না।

(২)

চারিবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে ; চারু ম্যালেরিয় ও তাহার সহিত নানাপ্রকার সাংসারিক অভাব অনাটনে পীড়িত হইয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই কাজেই অকৃতকার্য্য হইল এবং পুনরায় চেষ্টাও আর হইয় উঠিল না।

মনু প্রথমবিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কলিকাতা চলিয়া গেল পরে যথাক্রমে, এফ এ, বি-এ পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিল।

এদিকে চারু কিছুদিন সংসারপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয় একদিন এক সংবাদপত্রে দেখিল যে বড়নদীর উপর বিরাট সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এই কারণে তাহার উত্তরপারস্থিত রূপসী গ্রামে আপিসাদি হই য়াছে এবং আরও খবর পাইল যে অনেক বাঙ্গালীবা সেখানে কর্ম্ম করিতেছেন।

সংবাদ জ্ঞাত হইয়া সে ভাবিল এই সুযোগে সেখানে চেষ্টা করিলে হয়ত সুবিধা হইতে পারে, এবং তাহাই স্থির করিয়া সে একদিন মাতৃচরণে বিদায় লইয়া রূপসী আসিয়া উপস্থিত হইল। সেতুসংক্রান্ত সমস্ত আপিসাদি রূপসীতে। রূপসী বড়নদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম দু-চার ঘর গরীব গৃহস্থের বাস যাহা তথায় ছিল তাহাই স্থানান্তরিত করিয়া এই-সব আপিসাদি নির্ম্মিত হইয়াছে

একজন বিশিষ্ট সহৃদয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় এখানে আসিয়াই চারু একটি চাকরী পাইল, মাহিনা হইল ত্রিশ টাকা।

৩

এখানে দুইবৎসর গত হইবার পর চৈত্রমাসের এক সন্ধ্যায় ভীষণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া চারু বাসায় প্রবেশ করিবে,—দেখিল দরজায় একখানি পত্র আটকান রহিয়াছে। অপ্রত্যাশিত হস্তলিখিত শিরোনামা বহুকাল পরে দেখিয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

বাসায় প্রবেশ করিয়াই আগে সে পত্রখানি খুলিল এবং পড়িয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল এবং পরে একটু বিমর্ষও হইল। বহুকাল পরে মনু তাহাকে পত্র লিখিয়াছে—

কলিকাতা
৩০ মার্চ্চ, সোমবার

প্রিয় চারু

মেডিক্যাল কলেজ হইতে বিশেষ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া এবং পিতামাতার ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী আমি লণ্ডন মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার জন্য বিলাত যাইতেছি। আগামী বুধবার রাত্রের গাড়ীতে হাওড়া হইতে বম্বে মেলে রওনা হইব। আশা করি তুমি অন্ততপক্ষে ট্রেনের সময়ও ষ্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করিবে। বহুদুর বিদেশে যাত্রা, কবে আর দেখা হইবে জানি না, এইজন্য ইচ্ছা—দেশ ছাড়িবার সময় অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে তোমাকেও একবার দেখি। ইতি

তোমারই মনু।

মাতা এবং স্ত্রী তখন চারুর কাছে রূপসীতেই থাকিতেন। চারু যখন নিবিষ্টচিত্তে পত্রখানি পাঠ করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল তখন মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা চারু! ও কার চিঠি বাবা?"

হাসিয়া চারু উত্তর করিল "মা, এ মনুর চিঠি!" এবং পত্র-বিবরণ মাতাকে জানাইয়া বলিল "মা, খুবই আনন্দের বিষয়, কিন্তু আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হল—অনেক দুরদেশে যাচ্ছে সে।"

মাতাপুত্রে নানা কথাবার্ত্তার পর, আগামী কল্য মনুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াই যে অবশ্যকর্ত্তব্য মাতা চারুকে তাহা জানাইলেন। চারু বহুপূর্ব্বেই মনে মনে তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

মাতা জানিতেন না সংসারপীড়নে বাধ্য হইয়া কি আপিসে তাঁহার স্নেহের চারু চাকরী করে। মাতা বা পত্নীর নিকট সে কখনও প্রকাশ করে নাই—কত কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া তাহাকে সাংসারিক অভাব পূরণের জন্য চাকরী করিতে হয়। যাহা হউক মাতাকে সে বলিয়া রাখিল কাল বারটার গাড়ীতে সে নিশ্চয়ই রওনা হইয়া যাইবে।

সমস্ত রাত্রিই সে ভাবিয়া কাটাইল। মনুকে সে যে বড় ভালবাসে! ফল্গুনদীর মত সে ভালবাসা অন্তঃপ্রবাহিনী। তাহার অন্তর ভিন্ন জগতে আর কেহই জানিত না কী সে ভালবাসা—মনু তাহার প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়। সে যাইবেই! যদিও ছুটি পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, কারণ বুধবার—বড় কাজের ভীড়, সেদিন বিলাতীডাকের দিন; তবু সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল, যাইবেই সে—যাইবেই! আবশ্যক হইলে চাকরীও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

* * * *

শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ করিয়া, মাতৃচরণে বিদায় লইয়া দশটার সময় চারু বাসা হইতে রওনা হইল। মাতাকে বলিয়া আসিল, আপিস হইতে বরাবর সে আজ বারটার গাড়ীতে যাইবে এবং কালই প্রাতে ফিরিয়া আসিবে। গিয়া একবার সাক্ষাৎ করা বই ত নয়!

আপিসে আসিয়াই বড়বাবুকে তাহার বিশেষ আবশ্যকতা জানাইয়া, মাত্র সেই দিনটার ছুটি প্রার্থনা করিল। রুক্ষভাবে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন,—করিবেনই ত, সে দিন যে 'মেল ডে', কাজ বড় বেশী। চারুর আগ্রহ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বড়বাবু বলিলেন—যদি জরুরী কাজ থাকে তবে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে যাও; আজকে ছুটি কিছুতেই পাবে না।

চারু বিনীতভাবে বলিল—তবে আমার ইস্তফাই নিন, আমার আজ কলকাতা না গেলেই নয়।

আপিস পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় চারু শিয়ালদহে পৌঁছিল। বম্বে মেলেরও সময় সন্নিকট, কাজেই একটু বিশ্রামেরও সে সময় পাইল না। যখন হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিল তখন নয়টা বাজিতে বার মিনিট

বাকী। একখানি প্লাটফর্‌ম্‌-টিকিট লইয়া সে ভিতরে গেল, তখন প্লাটফর্‌মের দুইধারে বম্বে ও পঞ্জাব মেল অবস্থিত, জনতাও খুব বেশী।

নয়টা বাজিয়া গেল। গাড়ীর এ প্রান্ত হইতে অপর-প্রান্ত, দুইবার তিনবার সে যাতায়াত করিল, মনুকে কোথাও দেখিতে পাইল না। বড়লোকের ছেলে মনু—নিশ্চয়ই 'বার্থ' রিজার্ভ করিয়াছে। প্রতি রিজার্ভ টিকিটই সে সুবিধামত পড়িয়া দেখিতে লাগিল। মনুর নাম ত নাই-ই উপরন্তু কোন বাঙ্গালীরই নাম নাই। সে একটু আশ্চর্য্য হইল।

যথাসময়ে পঞ্জাবমেল ছাড়িয়া গেল—আর কুড়ি-মিনিট বাকী। ঘোর অশান্তিতে সে ছটফট করিতেছে; ক্রমে বম্বে মেলেরও সময় হইল। গার্ডসাহেব গম্ভীরভাবে তাঁহার হস্তস্থিত লণ্ঠন উত্তোলন করিয়া সবুজ আলো ধরিলেন; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চারু দাঁড়াইয়া রহিল। একটি রেলের মুটে তাহাকে ডাকিয়া বলিল "বাবু কাঁহা যায়েঙ্গে আপ্, টায়েন্ তো ছোড়তা।" সে নির্ব্বাক। ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে বম্বেমেল বাহির হইয়া গেল।

* * *

হতাশ প্রাণে চারু পরদিন বাসায় ফিরিয়া আসিল। মাতা উভয়ের সাক্ষাৎবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ কোন উত্তর পাইলেন না; চারু পথশ্রমে ক্লান্ত আছে মনে করিয়া আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

চারু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না—মনুর কোন বিপদাপদ ঘটিল বা আগের দিন সে কোন বিশেষ কারণে রওনা হইয়া গিয়াছে। পরে ভগবানের নিকট তাহার কুশল কামনা করিয়া স্নানাদি সমাপন করিল।

পিয়ন তাহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল—শিরোনামা লেখা মনুরই।

সে সর্ব্বাগ্রে পত্রখানি পাঠ করিল। পত্র এইরূপ—

ভাই চারু,

আমাদের রাজার জাতিদের মধ্যে এইরূপ একটা প্রথা আছে যে পয়লা এপ্রিল কোন প্রকারে নিজ বন্ধুকে বিশেষরূপে অপ্রস্তুত করা একটা খুব হাস্যকর ব্যাপার; আর যিনি বুঝিতে না পারিয়া ঠকিয়া যান তাঁহার তাঁহাকেই "এপ্রিলফুল" বলেন।

কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, আমি কৃতকার্য্য হইলাম কি না জানিতে পারি নাই, আশা করি তুমি পত্রপাঠ জানাইবে। ইতি

তোমারই মনু।

পুঃ তুমি চিরদিন সত্যপ্রিয়, সত্যের অপলাপ করিবে না।—

মনু।

তখনই চারুর মনে হইল বুধবার পয়লা এপ্রিলই বটে; তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখিয়া দিল—

ভাই মনু,

তুমি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছ। ষ্টেশনে তোমায় একবার দেখিতে পাইলেই আমিও কৃতকার্য্য হইতাম ও সকল কষ্ট দূর হইত। বহুকাল পরে তোমার এত নিকটে গিয়াও যে সাক্ষাৎ হইল না এই যা দুঃখ। ইতি

তোমারই চারু।

৪

চাকরী হারাইয়া চারু বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। সেখানে দারিদ্র্যের ও রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে চারুর শরীর মন ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

মনু তখন এম-বি পাস করিয়া মাত্র কিছুদিন বাড়ী আসিয়া বসিয়াছে এবং বাহিরের একটি ঘরে আবশ্যক-মত একটি ছোটখাট ডিস্পেন্সারীও খুলিয়াছে, উদ্দেশ্য গরীবদুঃখীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা এবং ঔষধ-প্রদান। মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিতে মনুর পিতার অবস্থা খুবই ভাল; অন্ধের নয়ন একমাত্র পুত্র অন্যত্র চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য যায় স্নেহপ্রবণ মাতাপিতা তাহার ঘোর বিরোধী।

* * *

আজও দোলপূর্ণিমা; চারু আজও ঠিক সেই সময়ে চারচারার পাড়া হইতে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া ডিস্পেন্সারীর নীচে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"মনু!"

চারু তখন ভয়ানক হাঁপাইতেছে। কিন্তু আজ আর

সে মুঠা করিয়া আবির লইয়া আসে নাই; আজ তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

সে কাঁদিতে কাঁদিতে মনুকে বলিল "ভাই! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। মাতা ও স্ত্রী উভয়েই বিসূচিকা রোগগ্রস্ত; তুমি দয়া করিয়া একবার শীঘ্র এসো।"

মনুর মা সেখানে ছিলেন। আবার এতদিন পরে সেই ছোটলোকের ছেলেটা আসিয়া মনুর সঙ্গে সমানী হইয়া কথা কহিতেছে দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইল। তিনি দরোয়ান ডাকিয়া ছোটলোকের ছেলের স্পর্দ্ধার সমুচিত শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু দয়া করিয়া কোমল স্বরেই, মনু চারুর কথার উত্তর দেবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, চারুকে পরামর্শ দিলেন, এ-সমস্ত ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতেই উপকার পাওয়া যায়; মনু নূতন কলেজ হইতে বাহির হইয়াছে আর এলোপ্যাথিকে বিশেষ কোন ফলই হইবে না, অতএব মনুর যাওয়া বৃথা। কালীডাক্তার এরোগে সুচিকিৎসক ও বহুদর্শী, তাঁহাকে লইয়া যাওয়াই সদ্‌যুক্তি।

আসল কথা তাঁহার ইচ্ছা নহে এ-সমস্ত ছোঁয়াচে রোগে মনু চিকিৎসা করিতে যায়।

চারু তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল, এবং একবার মাত্র মনুর দিকে চাহিয়াই ঘরের বাহির হইয়া পড়িল—কী বিপদব্যঞ্জক কাতরতামাখা তাহার সে দৃষ্টি! মনু কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন হইয়া নির্ব্বাক বসিয়া রহিল।

মনুর মাতা তাহাকে ওরূপ বিপজ্জনক স্থানে কদাচ যাইতে নিষেধ করিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

* * *

দৌড়িতে দৌড়িতে কালীডাক্তারের বাড়ী পৌঁছিয়া চারু শুনিল ডাক্তারবাবু গৃহে নাই, নিকটেই একটি কলেরা-রোগী দেখিতে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন। সে অনন্যোপায় হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে ডাক্তার বাবু ফিরিয়া আসিবামাত্র চারু তাঁহাকে নিজ বিপদবার্ত্তা জানাইল। ডাক্তার বাবু প্রবীণ লোক এবং খুবই দয়াবান; তিনি চারুকে বলিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি পাঁচমিনিটের মধ্যে বাড়ীর ভিতর হইতে আসিতেছি।"

খুব অল্পসময়ের মধ্যেই ডাক্তার বাবু বাহিরে আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চারুর সহিত তাহার গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন।

বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র চারুর গৃহের মধ্য হইতে কে ডাকিয়া বলিল—"চারু! ডাক্তার বাবু কি আসিয়াছেন? মা ত আর নাই,—এখন সকলে চেষ্টা করিয়া দেখি, বৌটা যদি রক্ষা পায়।"

ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া চারু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মাতা তাহার চিরনিদ্রাগত; স্ত্রীও মৃত্যুশয্যায়; হিমাঙ্গ হইয়া গিয়াছে—আর, মনু খুব বড় একপাত্র আগুন লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার হাতে ও পায়ে সেঁক দিতেছে।

শ্রীজীবনগোপাল বসু সর্ব্বাধিকারী।

পঞ্চশস্য

জাপানের উল্কি।

কোনো কোনো শ্রেণীর জাপানীর মধ্যে বহু প্রাচীন কাল হইতে উল্কি পরার প্রচলন ছিল। নিম্নশ্রেণীর জাপানীর পোশাকে যে-সব চিত্র অঙ্কিত থাকে তাহা যে এককালে উহার দেহচর্ম্মের সৌন্দর্য্য বাড়াইত এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

জাপানে তিন প্রকার উল্কির প্রচলন ছিল—ইরেজুমি, ইরেবোকুরো, ও হোরিমোনো। প্রথমপ্রকার উল্কি শাস্তিস্বরূপেই অঙ্কিত করা হইত। একখানি প্রাচীন পুঁথিতে লিখিত আছে যে ৪০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট রিচুর রাজত্বসময়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কতকগুলি অপরাধীকে ক্ষমা করা হয় এবং ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের গায়ে ইরেজুমি উল্কি অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা যে অপরাধী সেই কথাই জানাইয়া সাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়াই এইরূপ উল্কি অঙ্কনের উদ্দেশ্য ছিল। কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপে অপরাধীকে নজরে রাখিতেন। যাহারা দুইবার অপরাধ করিত তাহাদিগের গায়ে কাছাকাছি দুইটি চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত। সাধারণত অপরাধীর বাম হাতে, কখনো কখনো কেবল ডান হাতে বা হাতের পশ্চাতে উল্কি চিহ্নিত হইত। উল্কি নানা আকারের হইত, সাধারণত কতকগুলি পরস্পর-কর্ত্তিত সরলরেখা দ্বারা রচিত জ্যামিতির চিত্রই অঙ্কিত হইত।

হাতের উপর চিহ্নিত একটি নাম বা একটি চীনা হরপ অঙ্কিত হইলে তাহার নাম ইরেবোকুরো উল্কি। এরূপ উল্কী পরা প্রণয়ীদের

মধ্যেই প্রচলিত। পুরুষটির হাতে তাহার প্রিয়তমার নাম এবং নারীর হাতে তাহার প্রেমাস্পদের নাম অঙ্কিত থাকে। ইহা তাহাদের নিকট অপরিবর্ত্তনীয় প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ। কারণ মৃত্যুর পরও দেহের উপর হইতে এ চিহ্ন মুছিয়া যায় না।

দেহের শোভাবর্দ্ধনের জন্যই লোকে হোরিমোনো উল্কি পরিয়া থাকে। উত্তর জাপানের আইনুদের মধ্যে এখনো এপ্রথা প্রচলিত, তবে কমিয়া আসিতেছে এবং কালে একেবারে লোপ পাইবে আশা করা যায়।

উল্কীপরা জাপানী।

পিঠে বা হাতে পায়ে ছবি আঁকিয়া তাহার উপরে স্থচ ফুটাইয়া ফুটাইয়া হোরিমোনো উল্কি দেহে স্থায়ী করিয়া দেওয়া হয়। নীল এবং লাল এই দুই প্রকার কালি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত বাঘ, ড্রাগন, ফুল, পাখী এবং প্রাচীন যোদ্ধাদের ছবি-ই আঁকা হয়। অপেক্ষাকৃত অমার্জ্জিতরুচি লোকেরা গাছ এবং কোনো কোনো প্রকার নৃত্যে ব্যবহৃত মুখসের ছবির উল্কি পরে। হোরিমোনো-উল্কি-চিত্রকর বাম দিক হইতে কাজ আরম্ভ করে। কনুইএর দুই ইঞ্চি উপর পর্য্যন্ত হাত, এবং হাঁটুর দুই ইঞ্চি উপর পর্য্যন্ত পা চিত্রিত করা হয়। চিত্রকর বাম হাতের আঙুলে কালির তুলি ধরে। এবং ডান হাতে স্থচ লইয়া তুলির উপর দিয়া গাত্রচর্ম্ম বিঁধিতে থাকে। এইরূপে কালি চর্ম্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কোনো কোনো উল্কি পরাইতে এক গোছা স্থচের প্রয়োজন। উল্কি প[রা] ব্যাপারটি মোটেই সুখদায়ক নয়; শোনা যায় খুব সাহসী ও সহি[ষ্ণু] ব্যক্তিও এক দিনে সাতশো খোঁচার অধিক সহ্য করিতে পারে না। কখনো কখনো উল্কির রং অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল করিবার জ[ন্য] প্রথমবারকার উল্কির উপর রং দিয়া দ্বিতীয়বার স্থচ ফুটা[নো] দরকার হয়। ইহাতে বেশী কষ্ট হয়।

ছুতার, রাজমিস্ত্রী ও দমকলের লোকেরা বিশেষ করিয়া উ[ল্কি] পরিত। ডুলিবাহকেরাও উল্কিদ্বারা দেহ অলঙ্কৃত করিত। কো[নো] কোনো ডুলি-আরোহী উল্কিপরা বাহক খুব পছন্দ করিতে[ন] —আজকাল যেমন কেহ কেহ রঙীন-চর্ম্ম-বিশিষ্ট ঘোড়া বা সুসজ্জি[ত] মোটর গাড়ী পছন্দ করেন।

হোরিমোনো-উল্কির যখন খুব প্রচলন তখন তাৎকালীন কয়েকজ[ন] বিখ্যাত চিত্রকর উল্কির জন্য চিত্র রচনা করিতেন। তোকুগাও[য়া] যুগে উল্কি পরা নিষিদ্ধ না হইলেও উল্কির জন্য ছবি আঁকা নিষি[দ্ধ] ছিল। সেইজন্য চিত্রকরেরা গোপনে এরূপ চিত্র রচনা করিতেন।

স্থচ ফুটাইয়া কাহারো গায়ে একখানি বড় চিত্র রচনা করি[তে] প্রায় একশত দিন সময় লাগিত। যে উল্কি পরাইত তাহার দৈনি[ক] মজুরি ছিল ২৫ সেন বা ।৶৫ সওয়া ছয় আনা।

তোকুগাওয়া যুগের অবসান-সময়ে তোকিও শহরে একটি উল্কি প্রদর্শনী হইত। উল্কি-পরা বহু ব্যক্তি সমবেত হইত। যাহার গা[য়ে] সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত থাকিত সে-ই প্রথম স্থান অধিকার করি[য়া] পুরস্কৃত হইত।

শোনা যায় য়োকোহামা-বাসী হোরিচিয়ো নামক এক ব্যক্তি ইংরেজ, জার্ম্মান এবং রুশ রাজকুমারগণকে উল্কি পরাইয়াছিল।

সু।

* *
*

শিশুদিগের উপর শব্দের প্রভাব।

পাশ্চাত্য মনীষীদিগের মধ্যে অনেকের মত যে, শিশুদিগকে চুম্ব[ন] করিয়া আদর করা বা অশান্ত শিশুকে দোলাইয়া নাড়িয়া চাড়ি[য়া] গান গাহিয়া শান্ত করিবার যে চিরকেলে রীতি আছে তাহা শিশুদে[র] স্নায়ুমণ্ডলীর গঠনের পথে একান্ত অন্তরায়। কিন্তু সুবিখ্যা[ত] বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সিলভিও ক্যানেস্ত্রিনি এই মত ভ্রান্ত বলি[য়া] ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম ও অভ্রা[ন্ত] পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে চুম্বন প্রভৃতিতে শিশুদের স্নায়ুমণ্ডলীর কোনই অপকার হয় না। পুরানো প্রথাগু[লি] মোটের উপর ভালোই।

ডাক্তার ক্যানেস্ত্রিনি শিশুদের মস্তিষ্কের স্পন্দন পরিমাপ করিবা[র] জন্য একটি অতি সূক্ষ্ম স্বয়ংলেখ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন এব[ং] সেই যন্ত্রের সাহায্যে ৬ ঘণ্টা হইতে চোদ্দ দিন বয়সের প্রায় ৭০ জ[ন] শিশু লইয়া তাহাদের নিদ্রিত ও জাগ্রত উভয় অবস্থায়ই তাহাদে[র] জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় পরীক্ষা করিয়াছেন। মস্তিষ্কস্পন্দনের সঙ্গে স[ঙ্গে] শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহাও নির্দ্ধারণ করিবা[র] জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসপ্রক্রিয়াটিও পরীক্ষাকালে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষ[ণ] করেন। এই স্বয়ংলেখ যন্ত্রটি একটি রবারের ফিতা দিয়া শিশুর মাথার ব্রহ্মতালুর নরম জায়গাটিতে বাঁধিয়া দিয়া মস্তিষ্কস্পন্দন পরীক্ষা করা হয়। এই যন্ত্রের দ্বারা চিহ্নিত পরীক্ষার ফলাফলে[র] কয়েকটি নক্সা নীচে দেওয়া গেল। সমস্ত নক্সারই উপরে[র] তরঙ্গায়িত রেখা শ্বাসপ্রশ্বাসের রেখাতরঙ্গ; দ্বিতীয়টি মস্তিষ্কস্পন্দনের

রেখাতরঙ্গ; এবং সব নীচের রেখার প্রত্যেক ঘরটি আধ সেকেণ্ড সময় সূচিত করিতেছে।

এই পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে শিশুদিগের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত নাড়ীর স্পন্দনের সম্বন্ধ ১:৩ অনুপাতে। এবং নক্সা হইতে আমরা জানিতে পারি যে নবজাত শিশুর প্রত্যেক মিনিটে ৪০-৫০ বার শ্বাস ও ১২০-১৪০ বার নাড়ীর স্পন্দন হয়। শিশুরা আরাম অনুভব করিলে এই যন্ত্রচিহ্নিত রেখাতরঙ্গ অবিক্ষুব্ধ দেখা যায়। অপ্রীতিকর অনুভূতিতে শ্বাস ও মস্তিষ্কস্পন্দন উভয়ই রেখাতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলে বা অন্য কোনো কারণে মস্তিষ্কের সহসা আকুঞ্চন বা প্রসারণ ঘটিলে মস্তিষ্কস্পন্দনের রেখাতরঙ্গের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি মিশিয়া গিয়া একটি বড় তরঙ্গ গড়িয়া তুলে। ইহা কষ্টসাধিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের লক্ষণ। বাহিরের কোনো অপ্রীতিকর উত্তেজনায় এই রেখাতরঙ্গ ফুলিয়া উঠে, এবং আরামদায়ক অনুভূতিতে ইহা ক্রমশঃ নামিয়া যায়।
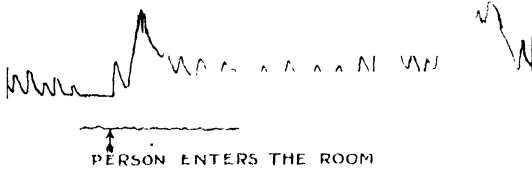
আঃ কী উৎপাত!
পোকার ঘরে লোক ঢুকিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

পিস্তল আওয়াজ!
তীরচিহ্নিত সময়ে পিস্তল আওয়াজ শুনিয়া শিশু ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিয়াছে।

এ বিষয়ে বিভিন্ন নক্সা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে—

১। মৃদু শিশের শব্দে একটি তিন দিনের শিশুর নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ও মস্তিষ্কস্পন্দনের ভাব শান্ত হইয়া আসে। এইরূপ মোলায়েম অনুভূতিই বয়স্কদিগের নিদ্রাবেশকালে স্বপ্নের সৃষ্টি করে।

২। একজন লোক শিশুর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে শিশুর শ্বাস ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় উভয় তরঙ্গই চঞ্চল হইয়া উঠে। নক্সায় দেখা যায় উভয় তরঙ্গই উঠ্‌তির মুখে। শিশু এতটুকুও বিক্ষোভেই চঞ্চল হইয়া উঠে।

৩। যদি একটি খেলার বন্দুকের আওয়াজ করা হয়—তাহাতে শ্বাস ও মস্তিষ্কের উভয় তরঙ্গই অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে ও বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ উঁচু দিকে উঠিয়া যায়।

৪। একটি শিশুর মাথায় মস্তিষ্কস্পন্দ-পরিমাপের যন্ত্রটি বসানোর দরুন সে ভয়ানক রাগিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে: আবার এক সময়ে একটি ঘণ্টার শব্দ করিতেই উভয় তরঙ্গই শান্ত হইয়া নিম্নগতি পাইয়া শিশু শান্তভাব ধারণ করিয়াছে বুঝাইয়া দেয়।

৫। ক্রুদ্ধ শিশুকে কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র ঘণ্টা নাড়িয়া সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করা হইল কিন্তু দেখা গেল শিশু এ সামান্য চেষ্টায় সহজে ঠাণ্ডা হইবার পাত্র নয়। সেইজন্য দেখা যাইতেছে যে ক্ষুদ্র ঘণ্টার শব্দে একটা বড় ঘণ্টার শব্দের মত ফল হইতেছে না।

এই পরীক্ষাগুলির দ্বারা ডাক্তার ক্যানেস্ট্রিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে শব্দের উত্তেজনা সম্বন্ধে শিশুরা কোনো মতেই একেবারে বধির নহে। অপ্রীতিকর উত্তেজনায় তাহাদের শ্বাসক্রিয়া ও মস্তিষ্কস্পন্দন দ্রুততর হয় এবং আরামদায়ক অনুভূতিতে উভয় ক্রিয়াই শান্তভাব ধারণ করে। মোটের উপর রূঢ় বা মধুর যে-কোনো শব্দেই শিশুদিগকে হয় রাগিয়া উঠিতে বা ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িতে দেখা যায়—শব্দের কোনোরূপ প্রভাব হইল না, এমনটি মোটেই দেখা যায় নাই।

* * *

অনুভূতির অনুভব।

বয়স্ক মানুষের কথা কহিবার ভাষা বিভিন্ন প্রকারের থাকিলেও, ভ্রূভঙ্গী, মৃদুহাসি, অশ্রুরাশি প্রভৃতি দ্বারা হৃদয়ের যেকথা প্রকাশ হয় তাহা বিশ্বজনীন ভাষা। সকলেই জানেন যে মুখের বিকৃতি এবং শরীরের ভঙ্গী দ্বারা মনের ভাব অনেক সময় গোপন করা যায় না। সম্প্রতি কয়েকজন পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিৎ ও শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধের এই অদ্ভুত সত্য প্রমাণ করিয়াছেন। আলফ্রেড লেহ্‌মান একজন দিনেমার মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। তিনি দেখাইয়াছেন যে মনে খুব আনন্দ হইলে রক্তের বেগ হ্রাস হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর হয়, বক্ষস্পন্দন মন্থর হয় ইত্যাদি। আবার মন যখন নিরানন্দ থাকে তখন বিপরীত পরিবর্ত্তনগুলি সাধিত হয়। এইসকল বাহ্য লক্ষণ দ্বারা মনের ভাব স্পষ্ট ধরিতে পারা যায়।
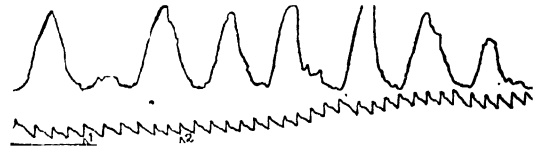
আঃ! চকোলেট কি মধুর!
১ ও ২ চিহ্নিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষাধীন লোকটির মুখে একখণ্ড চকোলেট দেওয়াতে তাহার অনুভূতিতরঙ্গ উচ্ছ্রিত হইয়া, উঠিয়াছে।

শিশুদিগের অনুভূতি পরিমাপের স্বয়ংলেখ যন্ত্রের ন্যায় যন্ত্রের লিখিত নক্সা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে চকোলেটের স্বাদ যাহার নিকট উপাদেয় তাহার উপর উহার ফলাফল কিরূপ। উপরের রেখায় শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ও নীচের রেখায় বাহুর রক্তস্পন্দন প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রেখায় বাহুর রক্তপ্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি উত্তমরূপে অঙ্কিত হয় এবং

সাধারণ স্পন্দনরেখা অপেক্ষা অনেক বেশী কথা ইহাতে জানিতে পারা যায়। প্রত্যেক বক্ষস্পন্দনে এই আয়তনরেখা একটু একটু বর্দ্ধিত হয়, এবং বক্ষস্পন্দনের দ্রুততা ও বিস্তার কতখানি হইতেছে তাহাও জানাইয়া দেয়।

কুইনিন কী খারাপ!
১ ও ২ চিহ্নিত সময়ে তাহার মুখে কুইনিন দেওয়াতে তাহার অনুভূতি-তরঙ্গ বিরক্তিতে অবনত হইয়া পড়িয়াছে।
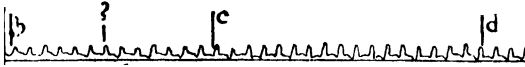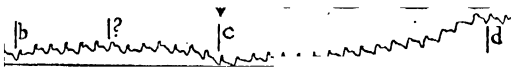
অভাবের স্বভাব!
b ও c চিহ্নিত স্থানের মধ্যে ? চিহ্নিত সময়ে একজন গরিব লোকের সামনে একটি মোহর ধরা হয়; সে তখন কিরূপে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া সেই মোহরটি পাইবার প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং তাহার রক্তসঞ্চালন কিরূপ দ্রুতবেগে হইতেছিল তাহা উপরের দুটি তরঙ্গরেখায় ধরা পড়িয়াছে; কিন্তু সে সময় তাহার মস্তিষ্কের ভাবের খুব কিছুই ব্যত্যয় ঘটে নাই, তাহা সব নীচের রেখাতরঙ্গের সমতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

২নং চিত্রে ঠিক ইহার বিপরীত ফলাফল বর্ণিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে কুইনাইন খাইতে দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য সকলের নিকটই কুইনাইনের স্বাদ তিক্ত এবং অপ্রীতিকর। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, যাহাদের মাথার খুলির কোনো দোষ থাকে না তাহাদের মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চালন মনের প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর অবস্থার সহিত স্পষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়।

ভয় পাইলে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করে, তাহাও এইরূপ নক্সা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। অদূরদর্শী মাতাপিতা ও অজ্ঞ ধাত্রীরা ছেলেদিগকে 'জুজুর' ভয় দেখাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করে তাহা যে কতখানি নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

মাংসপেশীর উপরও মানসিক উত্তেজনার যথেষ্ট প্রভাব আছে। কুইনাইনের তিক্ততা মাংসপেশীর শক্তি হ্রাস করে—আবার প্রীতিকর সুগন্ধ উহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। লেহ্‌মান তাঁহার পরীক্ষাকালে এক স্ত্রীলোককে সম্মোহিত (hypnotise) করেন। তাহাকে একটা কাগজের তৈরী ফুলের তোড়া দিয়া বলিয়াছেন (Suggested) যে উহা সুগন্ধি গোলাপের একটা স্তবক। স্ত্রীলোকটি তোড়াটি শুঁকিয়া দেখিল যে সত্য সত্যই উহা হইতে সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপের গন্ধ বাহির হইতেছে। সত্যকার প্রীতিকর অনুভূতি দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় এক্ষেত্রে কল্পিত মনোভাব যে ঠিক একই কাজ করিল তাহা যন্ত্রাঙ্কিত বক্র রেখার পরিবর্ত্তন দ্বারা স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যতবার সে তাহার কল্পিত গোলাপ-স্তবক শুঁকিয়াছে ততবারই পুনঃ পুনঃ এই-সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।
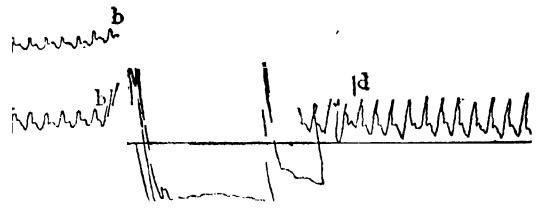
চমকের ধমক!
b চিহ্নিত সময়ে হঠাৎ পিস্তল আওয়াজ করাতে লোকটা কিরূপে চমকিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার নিশ্বাস ও রক্তসঞ্চালনে কিরূপ চঞ্চলতা জাগিয়াছিল তাহা রেখাতরঙ্গে স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।
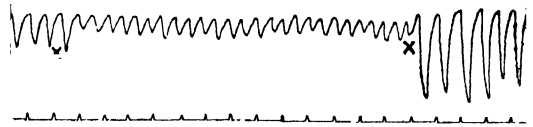
অঙ্ক কষিতে দম আটকায়!
×—× চিহ্নিত রেখাতরঙ্গ লোকে অঙ্ক কষিবার সময় কেমন দম বন্ধ করিয়া থাকে তাহাই প্রকাশ করিয়াছে। অঙ্ক কষা হইয়া গেলে লোকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে দেখা যায়। নীচের লাইনে মুহূর্ত্ত পরিমাণ সময় ঊর্দ্ধরেখা দ্বারা ক্রমাগত চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে।

একটা কথা আছে যে 'মনের সবকথা চোখে ধরাপড়ে'—ইহা বড় মিথ্যা নহে। মানসিক পরিশ্রমের সময় সচরাচর চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইতে দেখা যায়। যখন কেহ অঙ্ক কসে তখন এইরূপ হয়; যখন আমরা খুব মনোযোগের সহিত একটা জিনিষ দেখি তখন অজ্ঞাতসারে আমরা চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করি ও আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলি। যন্ত্রাঙ্কিত নক্সায় ইহা বিশেষরূপে ধরা পড়িয়াছে। পরীক্ষিত ব্যক্তি যে সময়টুকুর মধ্যে একটি অঙ্ক কষিতেছে, সেই সময়ে তাহার নিঃশ্বাস খুব পাৎলা হয়। আবার অঙ্ক যখন শেষ হয় তখন নিঃশ্বাস অপেক্ষাকৃত গভীর হইয়া উঠে।

গুণের অঙ্ক কষিতে আমরা কতখানি বিরক্ত হই, তাহাও যন্ত্রাঙ্কিত নক্সা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। একটা জটিল প্রশ্নের সমাধানকালে

ধমনীর গতি ক্ষীণ ও বাহুর আয়তন হ্রাস হয়। কঠিন প্রশ্নের সমাধানকালে মাথার রক্ত কমিয়া যায় এবং দেহচর্ম্মের রক্তবাহী নাড়ীগুলির সঙ্কোচের জন্য উদরে বেশী রক্ত জমিয়া থাকে। জটিল প্রশ্নের সমাধানকালে মস্তিষ্কের ধমনীসমূহ স্ফীত হয়।
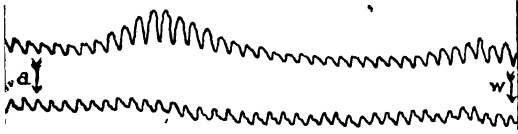
গুণ করা মানে ঝকমারি!
গুণ করার সময় কিরূপে মস্তিষ্কস্পন্দন গুরুতর হয় ও ধমনীতে রক্তসঞ্চালন দ্রুততর হয় উপর নীচের রেখাতরঙ্গে তাহাই ধরা পড়িয়াছে।

যখন দৈহিক পরিশ্রমের সহিত মানসিক পরিশ্রম করা হয় তখন ফলোৎপাদনবিষয়ে দৈহিক পরিশ্রমের ন্যূনতা লক্ষিত হয়। যন্ত্রাঙ্কিত চিত্রে ইহা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সোজা দাঁড়ির মত রেখাগুলি একটি অঙ্গুলি উত্তোলনের উচ্চতা কতটুকু তাহাই দেখাইতেছে। ক হইতে খ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এক ব্যক্তি ৬৫৭কে ৩৪ দিয়া গুণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। এ সময়ে দৈহিক ক্ষমতার কিরূপ হ্রাস হইতেছে তাহা চিত্রে দ্রষ্টব্য। অঙ্ক শেষ হইয়া গেলে পর রেখাগুলি ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইতেছে। আবার আর একটা অঙ্ক কষিবার সময় নিম্নগামী হইতেছে।
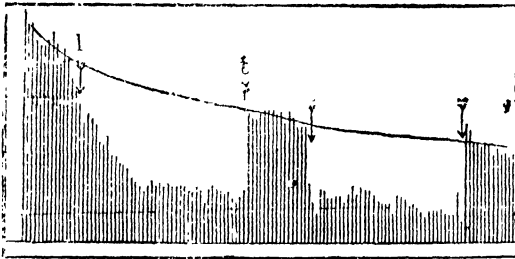
মস্তিষ্ক যখন খাটে শরীর তখন ঝিমায়!
৬৫৭কে ৩৪ দিয়া গুণ করিবার সময় শরীরস্পন্দন কি রকমে কমিয়া আসে রেখাগুলির উচ্চ নীচ অবস্থায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে স্নায়ুকোষগুলি ৩।৪ সেকেণ্ডের মধ্যে ক্লান্তির লক্ষণ প্রকাশ করে; আত্মপর্য্যালোচনার দ্বারা জানা যায় যে যখন আমরা স্বেচ্ছায় মন হইতে একটা কিছু স্মরণ করিতে চেষ্টা করি তখন সে মানসচিত্রটা একবার স্পষ্ট একবার অস্পষ্ট হইয়া কেমন যেন খাপছাড়া ভাবে মনে আসে।

আরো দেখান যায় যে বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া কাজ করিতে করিতে সেই বিষয়ে ভুল হইলে ভুলটি সেই মস্তিষ্ক-তরঙ্গের কোলেই থাকিয়া যায়।

মানুষের নানাবিধ ও বিচিত্র প্রকারের কার্য্য-কলাপের মধ্যে আমরা সব চেয়ে ছন্দতালের পক্ষপাতী। তাহার মূলেও যে স্নায়ুমণ্ডলীর রক্তসঞ্চালনের এই তরঙ্গ, তাহা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারা যায়। শ্রীহরিদাস সরকার।

জগতের প্রাচীনতম চিত্র।

অতি অল্প দিন হইল ফ্রান্সে গভীর মৃত্তিকাস্তরের মধ্য হইতে একখানি হাড় পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর একজন পুরুষ ও একজন রমণীর প্রতিকৃতি খোদাই করিয়া চিত্রিত করা আছে। মৃত্তিকার যে স্তরে সেই অস্থিখণ্ড পাওয়া গিয়াছে তাহা ভূবিদ্যার মতে অতি প্রাচীন; সেই প্রাচীনতম যুগের অজ্ঞাত অসভ্য শিল্পীর হাতের চিত্রের এই নমুনা সকলেরই নিকট অত্যন্ত মূল্যবান ও কৌতুকাবহ বলিয়া বোধ হইতেছে। প্যারীর রেভিয়্যু সিয়েন্তিফিক্ পত্রিকায় ইহার যে বর্ণনা বাহির হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই—

অস্থিখানি ম্যামথের অর্থাৎ অধুনা-বিলুপ্ত অতিকায় হস্তীর; তাহার উপর সেই যুগের নরনারীর প্রতিকৃতি খোদাই করা থাকাতে সেই প্রাচীনতম যুগের নৃতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বের একটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। চিত্রটিতে একটি পুরুষ চিত হইয়া শুইয়া আছে এবং তাহার উপর একটি রমণী খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেমন আমাদের কালীপ্রতিমায় শিবের বুকে কালী দাঁড়াইয়া থাকেন; পুরুষটি দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া রমণীকে স্পর্শ করিয়া আছে। পুরুষটির মুখপার্শ্ব (Profile) অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে তাহার মস্তককরোটি অতি বৃহৎ; তাহার কপাল উঁচু গড়ানো, মুখমণ্ডল উন্নত, চিবুক খুব চোখালো, তাহাতে যৎসামান্য দাড়ি গজাইয়াছে—ছোট ছোট খাঁজ কাটিয়া দাড়ি চিত্রিত হইয়াছে; নাসিকা দীর্ঘ ও বৃহৎ; দুই বক্র রেখায় চক্ষু অঙ্কিত, তাহাতে একটি অব্যক্ত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; তাহার দেহ অত্যন্ত লোমশ করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। আর রমণীমূর্ত্তিটি অন্যান্য প্রাচীন রমণী-প্রতিকৃতির ন্যায় বিপুলনিতম্বা পৃথুস্তনী নহে; তাহার দেহের উপরার্দ্ধ তন্বী সুন্দরীর মতো শোভন, কিন্তু নিম্নার্দ্ধ কিছু মোটামুটি ধরণের; তথাপি তাহার আকৃতিতে যৌবনের কমনীয় লালিত্য সুপরিস্ফুট।

এই আবিষ্কার শিল্প হিসাবে যেমন, ভূতত্ত্ব নৃতত্ত্ব প্রভৃতি হিসাবেও তেমনি অতিশয় মূল্যবান।

* *
*

শিলাময় জঙ্গল।

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের আরিজোনা, কালিফর্ণিয়া, ওয়াইয়োমিং পরগনায় এবং মিশর দেশে কতকগুলি শিলাভূত জঙ্গল আছে। এগুলি ভূতত্ত্বের অতি কৌতুকাবহ ঘটনা। ওয়াইয়োমিং পরগনার লামার নদের উপত্যকায় বিশ মাইল ব্যাপিয়া এইরূপ শিলাভূত বৃক্ষ আজও খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এবং দূর হইতে দেখিলে সেগুলিকে দারুময় বৃক্ষের সজীব জঙ্গল বলিয়াই বোধ হয়। এই-সমস্ত জঙ্গল এককালে ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান ছিল; হঠাৎ ভূমিকম্পে মাটি বসিয়া যাওয়াতে সমস্ত জঙ্গলকে-জঙ্গল ভূগর্ভে নামিয়া যায় এবং সেখানে থাকিয়া শিলায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখানে ভূপৃষ্ঠ হইতে ভূগর্ভে দুহাজার ফুট পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে এইরূপ বহু শিলাময় জঙ্গল দেখা যায়; ইহার কারণ—একবারকার ভূমিকম্পে একটা জঙ্গল বসিয়া গিয়া মাটিচাপা পড়িলে তাহার উপর কিছুকাল ধরিয়া নিরুপদ্রবে আর একটা জঙ্গল গজাইয়াছিল; অকস্মাৎ ভূমিকম্পে বা আগ্নেয় পর্ব্বতের মৃত্তিকা বমনে দ্বিতীয় জঙ্গলও মাটিচাপা পড়িলে তাহার উপর তৃতীয় জঙ্গল হইয়াছিল; এবং সেই তৃতীয় জঙ্গলও একদিন ভূজঠরে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে মাটি ক্রমান্বয়ে জঙ্গলের পর জঙ্গল গ্রাস করিয়া করিয়া সেগুলিকে থাকে থাকে শিলায়

শিলাভূত বৃক্ষকাণ্ড।

পরিণত করিয়াছে। এই দীর্ঘ সময় (আন্দাজি প্রায় দশ লক্ষ বৎসর) ধরিয়া আজ পর্য্যন্ত এইসব গাছের মৃত্তিকাস্তর ভাঙিয়া বাঁকিয়া যায় নাই, সমান ভাবেই আছে : তাহার ফলে শিলাভূত বৃক্ষগুলিও আজ পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছে, এবং এখন ক্রমশ সেগুলিকে মাটির আবরণ খুঁড়িয়া বাহির করা হইলেও সেগুলি দাঁড়াইয়াই থাকিতেছে।

এই-সমস্ত জঙ্গলের গাছগুলির আকার কত বড় ছিল এখন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই ; কারণ কঠিন বৃক্ষকাণ্ডটিই আবহাওয়ার আক্রমণ বাঁচাইয়া কঠিন শিলায় পরিণত হইতে পারিয়াছিল, দুর্ব্বল শাখা পত্র প্রভৃতি গলিয়া ঝরিয়া মৃত্তিকায় মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে বৃক্ষকাণ্ডগুলি খাড়া হইয়া আছে তাহার উচ্চতা ৩০—৪০ ফুট : যদি ধরা যায় স্কন্ধ পর্য্যন্ত শিলা হইয়াছে, এবং যেখান হইতে ডালপালা বাহির হইয়াছিল সেখান হইতে ডগা পর্য্যন্ত গলিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বৃক্ষগুলি ১০০ ফুট বা ততোধিক উচ্চ ছিল আন্দাজ করিতে পারা যায়। বৃক্ষকাণ্ডগুলি আশ্চর্য্য রকম অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকিয়া গিয়াছে : তাহারি গায়ের বাকল পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় নাই, শিলা হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বৃক্ষকাণ্ডের স্থূলতা ঠিক জানা যায়—বৃক্ষকাণ্ডের এফোঁড় ওফোঁড় বেধ ৪ ফুট।

ভগ্ন বৃক্ষাংশগুলি অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার আঁশ ও বাকল প্রভৃতির প্রকৃতি দেখিয়া স্থির করা হইয়াছে এইসব জঙ্গলে কি গাছ ছিল। তাহার মধ্যে পাইন, লরেল, ওক, সিকামোর প্রভৃতি কয়েকটি নাম আমাদের পরিচিত।

এমেরিকান ফরেষ্ট্রী নামক পত্রিকায় ইউনাইটেড ষ্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের ডাক্তার নৌলটন এইরূপ অনেকগুলি শিলাময় জঙ্গলের পরিচয় দিয়াছেন ; আমরা তাহা হইতে সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

হাইনের স্বাদেশিকতা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী।

জর্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবি হাইনের তীব্র স্বাদেশিকতা ও ভবিষ্যদ্‌বাণীর একটি বৃত্তান্ত পারীর "জুর্নাল্ দে দেবা" ও "রেভিয়ু দ্য দুমন্দ্" নামক দুখানি পত্রিকায় দুটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। হাইন তাঁহার "ডয়ট্‌শ্‌লাণ্ড" শীর্ষক কবিতার ভূমিকায় ও একটি প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার অনুবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে হাইনের স্বাদেশিকতা অতি তীব্র বিশ্বগ্রাসী হইলেও তাহা নীচ চৌর্য্যবৃত্তির পরিপোষক ছিল না। ইহা যেন সেকালের ডাকাতি চিঠি লিখিয়া গৃহস্থকে সাবধান করিয়া দিয়া বীরের মত লুটিয়া লওয়ার চেষ্টা, যাহার সাহস ও সামর্থ্য আছে সে পারে ত আপন স্বত্ব সামলাক, পারে ত বাধা দিক। হাইন লিখিয়াছেন—"আমি রাইন নদীর অধিকার ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিব না, তাহার কারণ এই, যে, তাহা আমার খুব ভালো লাগে ; আমি স্বাধীন রাইনের স্বাধীন সন্তান, রাইনে আমার জন্মস্বত্ব জন্মিয়াছে। জর্ম্মানী আলসাস ও লোরেন ফ্রান্সের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেও আত্মসাৎ করিতে পারিতেছে না ; তাহার কারণ ফ্রান্স মহাবিপ্লবের পর যে সাম্যবাদ আপামর জনসাধারণের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে তাহা ঐ দুই প্রদেশের লোকেরা ভুলিতে পারিতেছে না। আমরা মতে ও চিন্তায় ফ্রান্সকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছি ; এক্ষণে সেই মত কাজে খাটাইয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিলেই কোনো দেশকেই হজম করিয়া ফেলিবার পক্ষে কোনো বাধা হইবে না। তখন শুধু আলসাস লোরেন কেন, সমস্ত ফ্রান্স, গোটা য়ুরোপ, সারা পৃথিবী আমাদের অধীন হইয়া যাইবে—সমগ্র জগৎ জর্ম্মান হইবে। আমি যখন ওকের ছায়ায় ছায়ায় বিচরণ করি তখন আমার মনের মধ্যে এই স্বপ্নই ঘনাইয়া উঠে। আমার স্বাদেশিকতা এই রকমেরই।"

একস্থলে হাইন লিখিয়াছেন—"জর্ম্মান দার্শনিকেরা ভয়ঙ্কর হইবে ; কারণ তাহারা নবীন জর্ম্মানদের মধ্যে প্রাচীন সমরপ্রিয় জর্ম্মান জাতির ভাব উস্কাইয়া তুলিবে। তাহাদের কানে ধর্ম্মকথা ঠাঁই পাইবে না ; তাহারা কুঠার ও অসির আঘাতে সমস্ত য়ুরোপের অতীতের শিকড় য়ুরোপীয় জীবনক্ষেত্র হইতে নির্ম্মূল করিয়া দিবে খৃষ্টের ধর্ম্ম জর্ম্মানদের যুদ্ধোৎসাহ কতক পরিমাণে নরম করিয়া রাখিয়াছে। যবে তাহাদের এই ধর্ম্মে বিশ্বাস শিথিল হইবে তবে তাহাদের মধ্যে সেই প্রাচীন কালের মহাকাব্যের যোদ্ধাদের মতো যুদ্ধস্পৃহা অদম্য হইয়া উঠিবে। তখন যুদ্ধ-দানব দুহাতি বাড়ি মারিয়া গথিক গির্জ্জা পর্য্যন্ত চুরমার করিয়া ফেলিবে।"

এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতে দেখা যাইতেছে। নিচে, ট্রাইটশ্‌কে, ফন্ ব্যার্নহার্ডি প্রভৃতি যে সমর-মন্ত্র জর্ম্মান জাতির কানে ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাহাই জপিয়া জর্ম্মান জাতি যুদ্ধোন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে : রীমসের প্রসিদ্ধ গথিক গির্জ্জা চুরমার হইয়াছে।

হাইন ফ্রান্সকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—"আমার মতন

একজন স্বপ্নবিলাসীর উপদেশ শুনিয়া তোমরা হাসিয়ো না। আপনার ঘাটিতে সর্ব্বদা সজাগ সশস্ত্র থাকিয়া ধীর ভাবে মোহড়া আগলাও। তোমাদের মন্ত্রীরা সম্প্রতি ফ্রান্সকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিয়াছে শুনিয়া আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি। আমাকে তোমাদের শুভার্থী বলিয়াই জানিয়ো।"

হাইনের এই পরামর্শ ফ্রান্স গ্রাহ্য করে নাই; জর্ম্মানদের কপট বন্ধুত্ব হাইনের কথা একেবারে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। এখন ফ্রান্সের চোখ ফুটিয়াছে।

* *
*

য়ুরোপের যুদ্ধের কুফল।

এডমণ্ড গস্ ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত সমঝদার সমালোচক ও সাহিত্যিক। তিনি এডিনবরা রিভিয়ু পত্রিকায় যুদ্ধব্যাপারের নিন্দাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে যুদ্ধ দেশ ধ্বংস করে, নরহত্যা করে, অবলা ও শিশুর প্রতি অত্যাচার করে; ততোধিক অন্যায় করে বহু যুগের শিল্প সাধনা উচ্ছেদ ও নষ্ট করিয়া; কিন্তু এসবের জন্য যুদ্ধ যতদূর নিন্দনীয় না হোক, তাহাতে যে দেশের সৃজনী শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও আড়ষ্ট করিয়া তোলে তাহার জন্যই যুদ্ধব্যাপার সমধিক নিন্দার্হ। বেলজিয়ম একটুখানি ছোট্ট দেশ; তার দুধারে দুটি প্রকাণ্ড শক্তিশালী সাম্রাজ্য; একদিকে সমুদ্র; এই সমস্তের চাপে সে-দেশের লোকেরা আপনাদের গা মেলিতে পারে না; বেলজিয়মের নিজস্ব একটা ভাষা নাই—ফরাসী এবং ডাচ-ভাষা-ভাঙা ফ্লেমিশ ও ওয়ালুন ভাষা তাহাদের সম্বল; যার যাহাতে ইচ্ছা সে তাহাতে দেশের সাহিত্য রচনা করে। তথাপি এই দেশ হইতে মেটারলিঙ্ক উদ্ভূত হইয়া ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ প্রতিভায় জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন; আর একজন কবিও নিজে ফ্লেমিশ হইয়া ফরাসী ভাষায় রচনা করেন এবং তাঁহার রচনা দেখিয়া সমস্ত য়ুরোপের সুধীবৃন্দ অনিচ্ছাতেও তাঁহাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম মুখের অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার নাম—এমিল ভেয়ারহেয়রেন (Emile Verhaeren)। ইনি বেলজিয়মের জাতীয় কবি; ইঁহার কবিতায় দেশের প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। ইঁহারা ভিন্ন বেলজিয়মের ফ্লেমিশ ও ওয়ালুন ভাষার উত্তম লেখক অনেক আছেন। এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এবং এত অল্প সময়ে এমন অধিক পরিমাণে সমগ্র দেশের লোকের বুদ্ধির জড়তামোচন ও সাহিত্যসৃষ্টি করিতে আর কোনো দেশ পারে নাই। জার্ম্মানী সেই দেশকে উৎসন্ন করিয়া বিশ্বসমাজের ও মনুষ্যত্বের ক্ষতি করিতেছে। জার্ম্মানীর আক্রমণে কত সাহিত্যিককে দেশ রক্ষার জন্য প্রাণপাত করিতে হইয়াছে; কত কবির বীণা নীরব হইয়া গিয়াছে; সরস্বতীর কমলবনে মরাল রাজহংসের কলধ্বনি কামানের আওয়াজে ডুবিয়া গিয়াছে। লুভ্যাঁর চমৎকার কবি আলবার্ট জিরো (Albert Giraud)-প্রমুখ নবীন কবির দল (La Jeune Belgique) দেশের যে কবিপ্রতিভাকে উদ্বোধিত করিয়া সাহিত্যের নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, অন্য দেশে তাহার তুলনা মিলে না; তাহা রুবেন্সের চিত্রকলা, মধ্যযুগের স্থাপত্য প্রভৃতির ন্যায় বেলজিয়মের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচায়ক। লুভ্যাঁ পুড়িয়াছে; তাহার কবি জিরো জীবিত থাকিলেও তাঁহার বীণা নীরব হইয়াছে নিশ্চিত। লুভ্যাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরী, এবং রীম্‌সের গির্জ্জা ধ্বংস করাতে জার্ম্মানীর যতখানি বর্ব্বরতা প্রকাশ না পাইয়াছে, এই-সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকদিগের লেখনী বন্ধ করাতে ততোধিক বর্ব্বরতার পরিচয়। বেলজিয়মকে য়ুরোপের যুদ্ধক্ষেত্র এবং ঠাট্টা করিয়া মোরগের লড়াইয়ের আখড়া বলা হয়; ইহাকে এখন বীণাপাণির গোরস্থান বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

* *
*

ক্ষুদ্র জাতির বড় কবি।

কবি ভেয়ারহেয়্‌রেন বেলজিয়মের একজন বড় কবি; এডমণ্ড গস্ ও অধ্যাপক গিলবার্ট মারের মতে বর্ত্তমানকালে য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ফ্লেমিশ জীবনের বহু বাস্তব চিত্র হইতে বহু ভাবাত্মক ও বর্ত্তমান সভ্যতার রূপক কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বুকম্যান নামক পত্রে সম্প্রতি তাঁহার সম্বন্ধে একটি অত্যধিক প্রশংসাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানেও তাঁহাকে অতীত ও বর্ত্তমান সমস্ত ফরাসী কবির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। মরিস মেটারলিঙ্ক তাঁহার স্বদেশী ও সহপাঠী। তাঁহার কবিতার মধ্যে তাঁহার জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট সুরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাঁহার কবিতা পুরুষালি তেজ ও অসঙ্কোচ প্রকাশের জন্য বিখ্যাত।—এজন্য তাঁহার অল্প বয়সের কবিতা বাস্তব, উগ্র, ভোগাসক্তি-সম্পর্কিত এবং ছবির ন্যায় সুস্পষ্ট, প্রেমের কবিতা। পরিণত বয়সে তাঁহার যৌবনের প্রাণশক্তি উন্মাদনামুক্ত হইয়া প্রাণ দিয়া প্রাণের আনন্দের আধ্যাত্মিক রস অনুভব করিয়া কবিতায় ঢালিয়া দিতেছে; তাঁহার প্রাণ দুঃখের আনন্দে মশগুল হইয়া অতীন্দ্রিয় অনির্ব্বচনীয় কিছুর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।—এজন্য তাঁহার কবিতা ক্রমেই আগ্রহ ও আকুলতায় পরম বেগশীলা হইয়া উঠিতেছে। তিনি সম্পূর্ণভাবে গণপন্থী, অর্থাৎ একজন বা কয়েকজন লোক রাষ্ট্রীয় কর্ত্তা না হইয়া সমস্ত লোকই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাহায্য করিবার অধিকারী এই তাঁহার মত। জগতের তারতম্য ও বৈষম্য লুপ্ত করিয়া তিনি সকল লোককেই সমান অধিকার দিবার পক্ষে। কারণ তাঁহার মতে সকল প্রাণই এক—বিভিন্ন বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে প্রাণের একত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আমার চারিদিকে যা কিছু তাহার মধ্যে-আমিই আছি, আমার মধ্যে সমস্তই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে; বিশ্বজগৎ মানুষের মধ্যে চেতনাবান হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন—

এই যে দুঃখ,　　এই যে আবেগ,
এই যে ভ্রান্তি ভুল,
এই লালসা,　　পাপড়ি এরাই
গড়ছে প্রাণের ফুল।

তাঁহার এই সর্ব্বসমন্বয়বাদ আশ্চর্য্য কবিত্বে প্রকাশ পাইয়াছে। এজন্য তাঁহার কবিতা দেশে কালে আবদ্ধ নহে, তিনি মানবজাতির কবি বলিয়া সমাদরের যোগ্য। তাঁহার একটি মূল ফরাসী কবিতা বুকম্যানে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার ভাব এইরূপ—

প্রাণ দিয়ে মোর স্বদেশবাসীরে বেসেছি ভালো।
তারা যে আমার কর্ম্মে দোসর প্রাণের আলো।
থাক তার পাপ থাক অন্যায়,
ধুয়ে মুছে নিব প্রেম-বন্যায়,
যত কিছু ত্রুটি যত কিছু দোষ যা-কিছু কালো।
সারা জীবনের ধ্যান যে আমার দিবস-নিশি
সব চিন্তায় এই যে ভাবনা রয়েছে মিশি—

আমি যে তাদের একদেশবাসী,
তাদের দুঃখ তাদের যে হাসি
আমারি তাহারা, বাহিরে ব্যাপিয়া রয়েছে দিশি।
মোর মুখপানে অনিমেষ আঁখি রয়েছে তুলে!
সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া ধরিছে প্রাণের মূলে।
স্বদেশ আমার প্রাণের পাতায়
পড়িতে বলিছে গরব-গাথায়;
গত অনাগত গৌরব তার না যাই ভুলে।
তাই ত আমার সকল বাক্য সকল গান
চরণে তাহার ভক্তির ভরে করেছি দান।
গৌরবে তার তার অপমানে
উঠে আর নামে তরঙ্গ প্রাণে,
সোনার ধূলায় মালিকা দুলায় চির-অম্লান।

এই মহাকবি ভেয়ারহেয়েরেন সম্প্রতি লণ্ডন ডেলি নিউস পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম্ম এই

বেলজিয়ামবাসীর দুর্দ্দশা যতই ভয়ানক ও শোচনীয় হোক না কেন, তাহারা এখন কেবল হাহাকার করিলে, বিনাইয়া বিনাইয়া শোক করিলে, বা পরের নামে নালিশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; তাহাদের প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহারা প্রত্যেকেই বীরপুরুষ, বীরনারী—ইহাই তাহাদের দেশের দুর্দ্দিনে মহৎ ও প্রধান কর্ত্তব্য।

গৃহহারা, অনশনক্লিষ্ট, শোকার্ত্ত নরনারীর দুঃখ অত্যন্ত তীব্র, প্রায় অসহ্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু শোক করা ঢের হইয়াছে, আর নয়।

যুদ্ধের পূর্ব্বে বেলজিয়মকে মহত্তর বৃহত্তর দেখিবার কল্পনা যাঁহাদের মনে উদয় হইত তাহার মধ্যে পরের দেশ জয় করিবার বা জগতে উপনিবেশ বিস্তার করিবার দুরভিসন্ধির ছায়া ছিল না। সে কল্পনার মানে ছিল পুনর্জ্জন্ম, পুনর্জ্জাগরণ—মনন ও প্রাণন-শক্তির উদ্বোধন। শিল্প বাণিজ্যের বিস্তারের আশার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করিয়া এই আশা ছিল যে আমাদের চিন্তা বুদ্ধি মার্জ্জিত সজীব তাজা হইয়া উঠিয়া সকল কুসংস্কারের জাল হইতে মুক্ত হইয়া একেবারে নবীন প্রবহমান হইয়া উঠিবে—জগতের সকল চিন্তাধারার সহিত যোগ রাখিয়া অগ্র-সর হইতে পারিবে। আমাদের স্বদেশ সকল দেশকে চিন্তায় ভাবে প্রভাবান্বিত করিবে ইহাই আমরা চাহিয়াছিলাম—পরকে অধীন করিতে চাহি নাই।

এই দারুণ দুর্বিপাকে আমাদের প্রাণশক্তি মুহ্যমান না হইয়া বরং উদ্বুদ্ধ উগ্র নবীন হইয়া উঠিবে। আমরা বিলাসী ধনীর মতো জীবন যাপন করিতেছিলাম; অভাব কাহাকে বলে জানিতাম না; মনে করিতাম যুদ্ধ করা সে আমাদের ব্যবসা নহে। তাই যুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া পিষিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। আমাদের না ছিল সৈন্যবল, না ছিল অস্ত্রশস্ত্র, না ছিল নায়ক, না ছিল সাহস, না ছিল কৌশল বুদ্ধি। কিন্তু কাজ পড়িল যেমনি অমনি কিছুরই অভাব রহিল না। এক মুহূর্ত্তে আমরা সমস্ত জগৎবাসীর বিস্ময় প্রশংসা আদায় করিয়া ছাড়িলাম। বিপদে পড়িয়া আমাদের স্বদেশ গৌরবমণ্ডিত হইয়া গেল; দুঃখের রক্তটীকা পরিয়া মস্তক উ[ন্নত] করিয়া জগতে সে ধন্য বলিয়া স্বীকৃত হইল। আমাদের ক্ষুদ্র দে[শের] মুষ্টিমেয় লোকে আত্মবলি দিয়া দুরন্ত আক্রোশের আক্রমণ হ[ইতে] অপর দুইটি বৃহৎ দেশের বহুকালের পুঞ্জীভূত সভ্যতার প্রাণ [রক্ষা] করিতে পারিয়াছে ইহাই আমাদের গৌরব।

অতএব কান্নাকাটি করা আর নয়। অশ্রু ফেলা—সে ত আমা[দের] অপমান ও লজ্জা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এত দেশ থাকিতে আমা[দের] দেশকেই তিনি এমন মহৎ দুঃখ সহিবার ভার দিয়াছেন। আমা[দের] দেশের প্রাণশক্তি উদ্বোধিত হইয়া আমাদের এতদিনের সম[স্ত] ভবিষ্যতের কাছে ম্লান করিয়া তুলিল। আমাদের দেশের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিল। এই দারুণ অগ্নিপরীক্ষার পূর্ব্বে আ[মরা] তুচ্ছ বিষয়ে মত্ত থাকিতাম; আমরা কথার মারপ্যাঁচ লইয়া বি[বাদ] করিতে ব্যস্ত হইয়া তথ্যকে অগ্রাহ্য করিতাম; আমরা পরস্পর পরস্পরকে ওয়ালুন বা ফ্লেমিশ বা আর কিছু বলিয়া জাত তুলিয়া [তা]চ্ছিল্য নিন্দা গালাগালি করিতাম; আমরা ওকালতী, ব্য[বসা] আপিসের কেরানীগিরি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতাম, ব্যস্ত থাকিত[াম] এক অখণ্ড রাজ্যের স্বাধীন মুক্ত বাসিন্দা হইবার পক্ষে চেষ্টা [করিতাম না,] তাহাতে গর্ব্ব বোধ করিতাম না। শান্তির জড়তা হইতে দুঃখ বি[পদ] আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া দিয়াছে। আমরা আমাদিগকে আবিষ্[কার] করিতে পারিয়াছি। আজ দুর্দ্দিনের সমতায়, দুঃখের দৃঢ় বন্ধ[নে,] বিপদের মুখে, একতায় সমস্ত জাতি দৃঢ়গ্রথিত সংহত হইয়া উঠিয়াছে এ যেন তাহার পুনর্জ্জন্ম! এমন করিয়া সে আপনাকে আপনি আগে কখনো অনুভব করিতে পারে নাই।

বেলজিয়মের মহাকবি এমিল ভেয়ারহেয়রেন।

* *
*

কামানের মুখে কাব্য রচনা।

পারীর ফিগারো নামক পত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিখার মধ্যে র[চিত] কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সবগুলিই প্রে[মের] কবিতা—আক্রান্ত স্বদেশের প্রতি প্রেম, উত্তেজিত দেশবাসীর প্র[তি] প্রেম, স্বদেশের স্মৃতিমণ্ডিত বস্তু বা বাস্তুর প্রতি প্রেম, স্বদেশে[র]

কল্যাণের জন্ম স্বাধীনতার জন্ম মৃত্যুবরণকারীদের প্রতি প্রেম হইতে এই-সমস্ত কবিতার জন্ম ; তাহার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর প্রতি যে ঘৃণা হিংসা দ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও ঐ প্রেম-সঞ্জাত। মানুষের মনের মধ্যে একটা খুব উচ্চ মহৎ ধরণের বিলাসিতা আছে। সে আপনার গভীর ও তীব্র সুখদুঃখকে ছন্দের সজ্জায় শব্দের অলঙ্কারে ভাষার জাঁকজমকে সাজাইয়া প্রকাশ করিতে না পারিলে যেন তৃপ্তি পায় না ; তাই সে মরণের কোলে বসিয়াও বিনাইয়া বিনাইয়া কবিতা লিখিতে পারে। আমরা নিম্নে কয়েকটি কবিতাংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম।—

একজন লেফ্‌টেনাণ্ট সৈন্যযাত্রার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আগ্‌ বাড়িবার হুকুম হ'ল—ছুটল উধাও সৈন্য যত,
দুষমনে সব খুঁজতে রত ;
অভয়, তবু খুব হুঁসিয়ার,—যমের ডাক যে কানের কাছে
ফিসফিসিয়ে মরণ যাচে।

একজন সার্জে'ণ্ট যুদ্ধের প্রাকালে নিম্নলিখিত পদ্যটি রচনা করিয়াছিলেন—

শত্রুর সেনা গিয়েছে কি ওগো এ পথ দিয়া ?
দেশের সকল শুভ সুন্দর মুছিয়া নিয়া।
শক হুন তারা ছিল বর্ব্বর শোণিতপ্রিয়,
হার মানে তারা এদের নিকটে—কি দুষ্ক্রিয়।
দুহাতি দুধারে কামানের শেল হানিয়া ছুটে,
খুন করে তারে যাহার ইহারা সকল লুটে।
রক্তের ছোপে পাকা রং করে আত্মা নিজের ;
নরকে এদের গাড়ে আস্তানা, ভাবনা কিসের।

প্রিন্স চার্ল'স অফ বুর্ব'ন একজন সামান্য পদাতিক সৈনিকের বীরত্ব দেখিয়া এই কয় ছত্র রচনা করিয়াছিলেন—

নদীর সলিল হয়েছে লোহিত, হবে সে লোহিততর,
একা সৈনিক আধটি ডজন শত্রু বধিল হের।
পুরুষসিংহ যুঝিছে শত্রু, জয়-উল্লাসে ভরা—
অদৃষ্ট নিভালো শেল মারি আলো, এই ত বীরের মরা।

বীর বেলাজিয়মকে বহু সৈনিক কবি তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রীতি নিবেদন করিয়াছে। ফিগারোতে প্রকাশিত এরূপ বহু কবিতার মধ্যে একটির ভাব এইরূপ—

"কে জানে তোমার ন্যায্য স্বত্ব,
কে মানে তোমার সন্ধি-সত্ত ?
হটিয়া আমায় পথ ছেড়ে দাও, নতুবা বিঘোরে মর।"
গর্জ্জন করি জর্ম্মন অরি সোরগোল করে বড়।

"কে জানে তোমার কি বীর-প্রতাপ,
কে মানে তোমার প্রস্তাব পাপ ?
সম্মান মোর রহুক অটুট, যায় যদি প্রাণ যাক।"
ধীরে গম্ভীরে বেলজিয়ম কহে, কি তেজগর্ভ বাক্।

বীর সে সহিল অশেষ দুঃখ অশেষ নির্য্যাতন,
অটুট রহিল সম্মান তার, অটুট রহিল পণ।

আর একজন সৈনিক কবি বেলজিয়মের রাজার নিম্নলিখিত ভাবে শ্রদ্ধার্পণ করিয়াছে—

অভয়ব্রতী হে বীর তোমার অপলক আঁখি দুটি
রাক্ষস যবে ভরিল পাত্র শোণিতে ছিঁড়িয়া টুঁটি।
বীর তুমি ওগো কামানের আগে, বীর তুমি ওগো স্বার্থের ত্যাগে,
পরাজয়ে তব হল মহাজয় ওগো বীর অকলুষ।
রক্তের টীকা পরিলে ললাটে অবহেলা করি দুষ।
মোদের বংশধরেরা তোমার গাবে যশ আর জয়জয়কার—
"তুমি হে প্রধান, তুমি হে মহান, তুমি হে মহামানুষ।"

একজন ফরাশী সৈনিক স্বদেশের বন্দনা রচনা করিয়াছে এই ভাবের—

হে মোর জননী ফ্রান্স, হে মোর স্বদেশ সুমহান,
তুমি হে আকর বিশ্বে যাহা কিছু সুন্দর কল্যাণ ;
মা ভৈঃ মা ভৈঃ মাগো, শত্রু হতে তোর নাহি ভয়—
লক্ষ লক্ষ বীর পুত্র রক্তবীজ-সমান দুর্জ্জয়।
শস্যশ্যামলা তোর অঞ্চল সে ছিন্ন রিক্ত আজি ?—
কাল পুন হাস্যে লাস্যে মঞ্জরীতে উঠিবে মা সাজি।
যেথা যেথা শত্রুশির লুটিছে তোমার পদতলে
সেথা সেথা লক্ষ্মীদেবী হাসিবেন বসি শতদলে।

চারু।

ধর্ম্মপাল

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজ গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া যান। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন ; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া ধর্ম্মপাল দেব দুর্গ হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণ-পুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্য অমৃতানন্দকে যুবরাজ ও কল্যাণী দেবীর সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে সংবাদ পৌঁছিল যে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাডুবির পর সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়াছেন। গৌড় হইতে মহারাজকে খুঁজিবার জন্য দুই দল সৈন্য প্রেরিত হইল। পথে ধর্ম্মপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। এবং গোপালদেব ধর্ম্মপাল ও কল্যাণী দেবীকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কল্যাণীর মাতা কল্যাণীকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত পুরুষোত্তম খুল্লতাত-কর্ত্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত

কান্যকুব্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সংবাদ জানিয়া কান্যকুব্জরাজ গুর্জ্জররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যাসী দূতকে ঠকাইয়া তাহার পত্র পড়িয়া লইলেন। গুর্জ্জররাজ সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ মনে করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবার উপক্রম করিলেন। এদিকে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধর্ম্মপাল সমস্ত বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। সম্রাট ধর্ম্মপাল সামন্তরাজদিগকে সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মপাল বারাণসী জয় করিয়াছেন শুনিয়া কান্যকুব্জ ছাড়িয়া ইন্দ্রায়ুধ গুর্জ্জরে পলায়ন করিলেন এবং গুর্জ্জর-রাজকে ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গুর্জ্জর-রণনীতি

বারাণসী অধিকৃত হইবার দুইদিন পরে চরণাদ্রি হইতে সংবাদ আসিল যে, জয়বর্দ্ধন পঞ্চশতসেনা লইয়া দুর্গ অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সহিত পঞ্চশতের অধিক অশ্বারোহী ছিল না, তিনি দুর্গরক্ষার জন্য সম্রাটের নিকট সেনা ভিক্ষা করিয়াছেন এবং দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা হইলে প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। বারাণসীর যুদ্ধের ফল দেখিয়া চরণাদ্রি দুর্গের পতনে ভীষ্মদেব বা প্রমথসিংহ বিস্মিত হন নাই। তাঁহারা দূতমুখে জয়বর্দ্ধনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, পদাতিক সেনা ভিন্ন দুর্গরক্ষা সুকর নহে, অতএব পদাতিকগণের আগমন-প্রতীক্ষায় সপ্তাহকাল অপেক্ষা করাই সুব্যবস্থা।

পদাতিক সেনা যখন বারাণসীতে আসিয়া পৌঁছিল তখন কান্যকুব্জ-যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। চরণাদ্রি শত্রুহস্তগত হইয়াছে শুনিয়া সম্রাট-উপাধিধারী কুলাঙ্গার ইন্দ্রায়ুধ প্রতিষ্ঠান রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়াই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন; তিনি যে অবস্থায় গুর্জ্জর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট রাজ্যত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া কান্যকুব্জের সামন্তরাজগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া চক্রায়ুধকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। বিনাযুদ্ধে প্রতিষ্ঠান ও কান্যকুব্জ গৌড়ীয় সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ বারাণসী, চরণাদ্রি ও প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য সামান্য সেনা রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ যাত্রা করিলেন।

ইন্দ্রায়ুধ গুর্জ্জররাজ নাগভট্টের অতিথিরূপে ভিল্লমাল-নগরে বাস করিতে লাগিলেন ও প্রতিদিন গুর্জ্জররাজকে গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একমাস অতিবাহিত হইল কিন্তু গুর্জ্জররাজ্যে যুদ্ধাভিযানের কোনই উদ্যোগ দেখা গেল না। নাগভট্ট ও বাহুকধবল শীঘ্রই যাত্রা করিব বলিয়া কান্যকুব্জরাজকে আশ্বাস দিতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন গৌড়েশ্বরের সহিত বিবাদ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদিগের ছিল না। নির্ব্বিবাদে যমুনাতীর পর্য্যন্ত গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল, যমুনার পশ্চিমতীরে গুর্জ্জররাজ্যের প্রান্তরক্ষকগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা রাজধানী হইতে নদী পার হইবার আদেশ না পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কান্যকুব্জরাজ্যের সামন্তগণ বজ্রায়ুধের পুত্রকে যথাবিধি অভিষিক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন কিন্তু সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ ও ভীষ্মদেবের পরামর্শে ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ তাহাতে সম্মত হইলেন না। বজ্রায়ুধের মৃত্যুর পরে গুর্জ্জররাজের সাহায্যে ইন্দ্রায়ুধ কান্যকুব্জ-সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নাগভট্টের পিতা বৎসরাজ দিগ্বিজয়-যাত্রায় নির্গত হইয়া যখন সমস্ত উত্তরাপথ অধিকার করিয়াছিলেন তখন বজ্রায়ুধ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বৎসরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও তিনি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। বহুকাল পরে দাক্ষিণাত্যরাজ রাষ্ট্রকূটবংশীয় ধ্রুব যখন বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া মরুভূমিতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন তখন বজ্রায়ুধ স্বীয় অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বজ্রায়ুধের সহিত যুদ্ধে তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা ইন্দ্রায়ুধ গোপনে বহুবার গুর্জ্জর-রাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের পুরস্কার-স্বরূপ ইন্দ্রায়ুধ বজ্রায়ুধের মৃত্যুর পরে কান্যকুব্জের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জবাসীগণ বলিত যে, গুর্জ্জররাজের সাহায্যে ইন্দ্রায়ুধ ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের সামন্তগণ বজ্রায়ুধের অতিশয়

অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা ক্ষীণচেতা, অত্যাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ইন্দ্রায়ুধকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। প্রজাবৃন্দ গুর্জ্জররাজের ভয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রোহাচরণ করিত না, কিন্তু তাহারা গোপনে গোপনে উদারচেতা সদয়-হৃদয় বজ্রায়ুধের জন্য শোকপ্রকাশ করিত। কান্যকুব্জ-রাজ্যের সামন্তগণ হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত বজ্রায়ুধের পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছিল। গৌড়ীয়সেনা সঙ্গে লইয়া চক্রায়ুধ যখন পিতৃরাজ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন দেশে ইন্দ্রায়ুধের পক্ষপাতী একব্যক্তিও ছিল না। ইন্দ্রায়ুধ পলায়ন করিলে রাজ্যের প্রধান প্রধান দুর্গের নায়কগণ সৈনিকগণের হস্তে নিহত হইল, প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া কর্ম্মচারীগণকে হত্যা করিল, একদিনে কান্যকুব্জে ইন্দ্রায়ুধের অধিকার লোপ পাইল, বজ্রায়ুধের সময়ের কর্ম্মচারী ও সেনানায়কগণ বহুকাল পরে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, ইন্দ্রায়ুধ গুর্জ্জররাজের সহিত ফিরিয়া আসিলেও বিনা-অয়াসে রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন না,কিন্তু তথাপি তাঁহারা রাজধানীতে অভিষেকোৎসব আরম্ভ করিতে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্মপাল ও ভীষ্মদেবকে বিশ্বানন্দ কহিয়াছিলেন যে, যতদিন কান্যকুব্জরাজ্যের চতুর্দ্দিকের রাজগণ চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জরাজ বলিয়া স্বীকার না করিবেন ততদিন যুদ্ধ শেষ হইবে না। ধর্ম্মপালদেব তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়া কান্যকুব্জরাজ্যের সামন্তগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ ভীষ্মদেব বুঝিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই ভীষণযুদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে। তিনি যমুনার উত্তরতীরে প্রতি ঘাটে ঘাটে গৌড়ীয়সেনা সমাবেশ করিয়া বিমলনন্দী ও প্রমথসিংহের সাহায্যে নূতন সেনা সংগ্রহ করিতেছিলেন। প্রতিষ্ঠানে রণসিংহ, কৌশাম্বীতে বীরদেব, মথুরায় কমলসিংহ ও স্থাণ্বীশ্বরে জয়বর্দ্ধন চক্রায়ুধের রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করিতেছিলেন। প্রতিষ্ঠান হইতে স্থাণ্বীশ্বর পর্য্যন্ত শত শত ক্রোশব্যাপী সীমান্তের পরপারে গুর্জ্জররাজ্যের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। গৌড়ীয় সামন্তরাজগণ দেখিতে পাইলেন যে, সর্ব্বত্র গুর্জ্জরসৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে; ঘাটে ঘাটে অশ্বারোহী ও পদাতিকসেনা সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। পথিক ও স্বার্থবাহগণ সীমান্ত অতিক্রম করিবার অনুমতি পাইতেছে না, সীমান্তের প্রতি-দুর্গে প্রতিদিন নূতন সেনা আসিতেছে, যমুনাতীরে শত শত স্থানে সেতু নির্ম্মাণের জন্য নৌকা সংগৃহীত হইয়া আছে, কিন্তু কোন স্থানেই গুর্জ্জররাজের সেনা গৌড়ীয়সৈন্যকে আক্রমণ করিতেছে না।

সীমান্ত হইতে এই-সকল সংবাদ পাইয়া ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ বুঝিলেন যে, বিশ্বানন্দের কথা সত্য, যুদ্ধ তখনও শেষ হয় নাই। ধর্ম্মপাল ভাবিলেন যে, গুর্জ্জররাজ বোধ হয় আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তিনি হয়ত ভাবিয়াছেন যে, ইন্দ্রায়ুধকে সাহায্যপ্রদানের জন্য চক্রায়ুধ পিতৃবৈরীকে আক্রমণ করিবেন। গৌড়েশ্বর একদিন মন্ত্রণাসভায় মনোভাব প্রকাশ করিয়া ভিল্লমালে দূত প্রেরণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। বিশ্বানন্দ, ভীষ্মদেব, চক্রায়ুধ ও বিমলনন্দী একবাক্যে কহিলেন যে দূতপ্রেরণ বৃথা। চক্রায়ুধ জানাইলেন যে, বিশ্বাসঘাতক গুর্জ্জর-রাজগণ যখন যুদ্ধের আয়োজন করে তখন দীর্ঘকাল এইরূপভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সুযোগ বুঝিয়া যুদ্ধঘোষণা না করিয়া সহসা পররাজ্য আক্রমণ করিয়া বসে। ধর্ম্মপাল নিরস্ত না হইয়া ভিল্লমালে দূত প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভীষ্মদেবের অনুরোধে সেইদিনই জনৈক অশ্বারোহী গৌড়ে মহাকুমার বাক্‌পালের নিকট প্রেরিত হইল, সম্রাট বাক্‌পালকে নূতন সেনা সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রেরণ করিলেন।

তখন বর্ত্তমান পঞ্জাব ও রাজপুতানা গুর্জ্জরজাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া ছিল। ভোজ, মৎস্য, অবন্তী, গান্ধার, মদ্র, কুরু, যদু ও কীর প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য গুর্জ্জর সামন্তগণের হস্তগত হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই ভিল্লমালের গুর্জ্জর-রাজের অধীনতা স্বীকার করিতেন কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাঁহারা স্বাধীন রাজা ছিলেন। গৌড়েশ্বর গুর্জ্জর-রাজচক্রের সমস্ত রাজার নিকট দূত প্রেরণ করা স্থির করিলেন। যথাসময়ে দূতগণ বজ্রায়ুধের পুত্র চক্রায়ুধের সিংহাসনারোহণ-বার্ত্তা বহন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গুর্জ্জর-রাজধানীতে যাত্রা করিল।

সর্ব্বপ্রথমে দূত ভিল্লমাল হইতে ফিরিয়া আসিল। ভিল্লমালরাজ গৌড়েশ্বরকে গুর্জ্জররাজধানী হইতে অভিবাদন করিয়াছেন, বজ্রায়ুধের পুত্র পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। শীঘ্রই গুর্জ্জরদূত নবীন কান্যকুব্জেশ্বরকে অভিবাদন করিতে আসিবে। শরণাগত রক্ষা রাজধর্ম্ম, সেইজন্য গুর্জ্জররাজ ইন্দ্রায়ুধকে রক্ষা করিবেন, তবে তিনি ইন্দ্রায়ুধের পক্ষাবলম্বন করিয়া কান্যকুব্জরাজ্য আক্রমণ করিবেন না; কিন্তু ইন্দ্রায়ুধ যদি রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন গুর্জ্জরেশ্বর তাহাতেও বাধা দিবেন না। গৌড়েশ্বর শীঘ্র স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গুর্জ্জররাজের সহিত তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন ছিন্ন হইবে না।

গুর্জ্জর-রাজচক্রের অন্য কোন রাজধানী হইতে দূত ফিরিল না। নাগভট্টের উত্তর শুনিয়া ধর্ম্মপাল গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু গৌড়ীয় সামন্তগণ সকলেই প্রত্যাবর্ত্তনের বিরোধী হইলেন। ইন্দ্রায়ুধ বন্দীভাবে ভিল্লমাল নগরেই বাস করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সর্ব্বানন্দের গৃহত্যাগ

ধর্ম্মপালদেব যখন চক্রায়ুধের রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন তখন গৌড়দেশে শান্তি বিরাজিত। বৈশাখ মাস, বরেন্দ্রভূমিতে অসহ্য গ্রীষ্ম, ফলভারে অসংখ্য সহকার বৃক্ষ অবনত হইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক নিস্তব্ধ, রাজপথ জনশূন্য, পক্ষীগুলি পর্য্যন্ত নীরব। এই সময়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী পালিতক গ্রামে জনৈক যুবক বংশদণ্ডনির্ম্মিত অঙ্কুশ হস্তে গৃহ হইতে নির্গত হইতেছিল। যুবক গৌরবর্ণ, তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিক নহে, তাহার কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র দেখিয়া বোধ হয় সে জাতিতে ব্রাহ্মণ। গৃহখানি তৃণাচ্ছাদিত, চারিদিকে মৃণ্ময় প্রাচীর, তাহা গোময় লেপনে চিক্কণ। গৃহের চারিদিকে পুষ্পোদ্যান ও বংশনির্ম্মিত বেষ্টনী; বেষ্টনীর পার্শ্বে এক পঙ্‌ক্তি তাল ও নারিকেল বৃক্ষ।

যুবক গৃহদ্বারের বাহির হইয়া অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই সময়ে গৃহমধ্য হইতে তাহাকে কে ডাকিল, "বলি দ্বিপ্রহর বেলায় যাও কোথায়?" যুবক বিরক্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিলে কেন?" এই সময়ে তাহার পশ্চাতে পদশব্দ হইল, যুবক ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিংশতি-বর্ষ বয়স্কা একটি তরুণী কক্ষান্তর হইতে যুবকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার অধরে ঈষৎ হাস্যরেখা, নয়ন-কোণে ক্রূর কটাক্ষ এবং চম্পকদামসদৃশ ক্ষুদ্র অঙ্গুলিগুলিতে বস্ত্রাঞ্চল জড়িত। তাহাকে দেখিয়া যুবকের ভ্রূভঙ্গী দূর হইল। বদন প্রসন্ন হইয়া উঠিল, বিরক্তির পরিবর্ত্তে সহাস্যে যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিলে কেন?" তরুণী হাস্যে হাস্যের উত্তর প্রদান করিয়া কহিল, "এই দ্বিপ্রহরের ভীষণ রৌদ্রে অঙ্কুশ লইয়া কোথায় চলিলে?"

তোমার জন্য।

আমার জন্য?

হাঁগো, তোমারই জন্য।

আমি কি গাছের পাকা ফলটি যে তুমি অঙ্কুশ লইয়া আমার উদ্দেশে চলিয়াছ?

অমল, তুমি সত্য সত্যই—

রসিকতা রাখ; অঙ্কুশ লইয়া কোথায় যাইতেছিলে? আম পাড়িতে?

কথাটা শেষ করিতেই দাও। সত্য সত্যই তুমি পূর্ণ যৌবনের ভারে নুইয়া পড়িয়াছ।

আবার বাজে কথা! তুমি কি পাগল হলে নাকি? এই রৌদ্রে আম পাড়িতে চলিয়াছ?

দেখ, পুষ্করিণীর ধারে বড় গাছটাতে দুইটা আম পাকিয়া উঠিয়াছে। ভূমিতে পড়িলে নষ্ট হইয়া যাইবে।

তা যাক, তুমি এখন যাইতে পারিবে না।

যুবতী এই বলিয়া যুবকের হাত ধরিয়া বসাইল। যুবক অঙ্কুশ রাখিয়া উপবেশন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবতীর কর্ণমূল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তরুণী লজ্জায় অধোবদন হইয়া কহিল, "অমন করিয়া কি দেখিতেছ?"

তোমাকে।

যাও।

আমি ত যাইতেছিলাম, তুমিই ত ধরিয়া বসাইলে।

এখন যাইতে পারিবে না, আমার কাছে বসিয়া থাকিতে হইবে।

তবে চক্ষু মুদিয়া থাকি ?

এত দেখিয়াও কি তোমার সাধ মিটিল না ?

সাধ আর মিটিল কই ?

"তবে দেখ, প্রাণ ভরিয়া দেখ, যতক্ষণ তোমার প্রাণ চায় দেখ," যুবতী এই বলিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল, যুবক তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এমন ভাবে অধিক-ক্ষণ কাটিল না, তরুণীর অধরপ্রান্তে হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রথমে কর্ণমূল, তাহার পরে গণ্ডস্থল ও তাহার পরে সমস্ত মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় ঈষৎ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। তরুণী পুনরায় কহিল, "যাও।" যুবক তখন তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, "অনুমতি পাইয়াছি, এইবার তবে যাইতে পারি ?" যুবতী তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া কহিল, "না।" যুবক তখন জিজ্ঞাসা করিল, "অমল, ব্যাপার কি ?"

দাদার বাড়ী গিয়াছিলাম।

কি দেখিয়া আসিলে ?

দাদা বাড়ী আসিয়াছেন।

ভাল। তাহার পর সমস্ত কুশল ত ?

হাঁ।

তবে আমার ছুটি ? অমল, আমাকে এখন অর্দ্ধ-দণ্ডের জন্য ছাড়িয়া দাও, বাতাস উঠিয়াছে, আম দুইটি মাটিতে পড়িয়া যাইবে।

তুমি তবে তোমার আমের কাছে যাও।

রাগ করিলে ?

আমি রাগ করিলাম বা না করিলাম তাহাতে কি তোমার কিছু আসে যায় ?

তবে যাইব না।

না, তুমি যাও; তোমার মন ত পুষ্করিণীর ধারে পড়িয়া আছে, দেহখানা ধরিয়া রাখিয়া আর আমার লাভ কি বল ?

অমল, ব্যাপার কি খুলিয়াই বল না ?

একটা কথা আছে ?

তাহা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি, কি কথা ?

বল রাগ করিবে না ?

আমার কি তোমার উপর রাগ করিবার শক্তি আছে ?

যাও। বল কথাটা রাখিবে ?

কি কথা ?

বল রাখিবে ? তবে বলিব।

আমার সাধ্যায়ত্ত হইলেই রাখিব।

তুমি পুষ্করিণীর ধারে যাও, আমার বলা হইল না।

ভাল, রাখিব।

বল, রাখিবে ?

এইমাত্র ত বলিলাম ?

তিনবার বল ?

রাখিব, রাখিব, রাখিব।

আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর।

শপথ করিতেছি, কিন্তু ছুঁইয়া শপথ করিতে পারিব না।

রাখিবে ত ?

নিশ্চয়।

দাদা গৌড় হইতে আসিয়াছেন।

তার পর ?

বউয়ের জন্য দুইখানি নূতন সুবর্ণ বলয় আনিয়াছেন।

তার পর ?

আর আমি বলিব না।

যুবক একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—অমল আমি যে দরিদ্র। তোমার দাদা দেশবিখ্যাত পণ্ডিত—

আর আমার স্বামী কি মূর্খ ?

মূর্খ নহি অমল! কিন্তু—

কিন্তু কি ? পিতা বলিতেন ন্যায়শাস্ত্রে তোমার ন্যায় পণ্ডিত দেশে বিরল।

কিন্তু— কি জান অমল—, তোমাকে দেখিয়া আমি অধীত বিদ্যা বিস্মৃত হইয়াছি। গোতম, কণাদ ভুলিয়া গিয়াছি। অমল, আমি ইচ্ছা করিলে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু—

আবার কিন্তু ?

অমল, তুমি আমার সুবর্ণ শৃঙ্খল, আমি শৃঙ্খল ছাড়িতে পারিব না, সুতরাং আমার বন্ধনদশা ঘুচিবে না।

তুমি এই মাত্র শপথ করিয়াছ আমাকে সুবর্ণ বলয় আনিয়া দিবে?

শপথ করিয়াছি সত্য, কিন্তু—

আবার কিন্তু?

অমল, তুমি অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই আসিব।

যুবক অঙ্কুশ হস্তে গৃহ হইতে বাহির হইল, যুবতী হৃষ্টচিত্তে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তিনি পালিতক গ্রামে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিলেন। সদ্বংশ-জাত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুপণ্ডিত সর্ব্বানন্দকে আচার্য্য কন্যাদান করিয়া স্বগ্রামে বাস করাইয়াছেন। পদুবম্বারাজ জয়বর্দ্ধন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সর্ব্বানন্দের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত। তিনি অন্য উপায়ে অর্থার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন না। অমলাদেবীর প্রার্থিত সুবর্ণবলয় তখন সর্ব্বানন্দের সাধ্যাতীত। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ হইতে আম্র দুইটি সংগ্রহ করিলেন এবং পুনরায় ধীরপদে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শপথভঙ্গের আশঙ্কা ও অসহ্য বিরহব্যথার ভয় পত্নীবৎসল ব্রাহ্মণকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি গৃহের পথ অবলম্বন না করিয়া গ্রামসীমায় অবস্থিত ভাণ্ডারের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সেই দিন পালিতক গ্রামের সীমায় একটি ক্ষুদ্র স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছিল, গঙ্গাতীরে আম্র পনসের ছায়ায় বস্ত্রাবাসগুলির নিকটে কয়েকজন সৈনিক বসিয়া ছিল। তাহাদিগের কথোপকথন ও উচ্চহাস্য শুনিয়া সর্ব্বানন্দের জ্ঞান হইল, চমক ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণ দেখিল যে, সে বিপরীতপথে আসিয়াছে। বস্ত্রাবাস ও সৈনিকগণকে দেখিয়া সর্ব্বানন্দের বড়ই কৌতুহল হইল, একজন সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কোথায় যাইবে?" সৈনিকগণ সমস্বরে উত্তর দিল, "কান্যকুব্জে।" তখন সর্ব্বানন্দের মনে পড়িয়া গেল যে, গৌড়েশ্বর সত্যরক্ষার জন্য কান্যকুব্জে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন; তিনি ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন।

অপরাহ্নে অমলাদেবী রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সর্ব্বানন্দ গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "অমল, তুমি কোথায়?" অমলাদেবী সহাস্যবদনে কহিল, "এই যে আমি রন্ধনশালায়।"

"একবার উঠিয়া আইস?"

পত্নী উঠিয়া আসিয়া পতির সম্মুখে দাঁড়াইলে, সর্ব্বানন্দ কহিল, "অমল, আজ তোমাকে একটা কথা রাখিতে হইবে।"

"বলনা কি কথা?"

"অমল, তুমি অলঙ্কারের কথা ভুলিয়া যাও, আমি দরিদ্র, তোমাকে অলঙ্কার দিতে হইলে, আমাকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে—অমল, সে বড় কষ্ট—আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। তোমাকে শঙ্খের বলয়ে যেমন সুন্দর দেখায়, হীরকমণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারেও তেমনটি দেখাইবে না। অমল, তুমি আমাকে শপথমুক্ত কর, এই দেখ তোমার জন্য সর্ব্বমঙ্গলার গাছের দুইটি আম আনিয়াছি।"

সর্ব্বানন্দের কথা শুনিয়া অমলাদেবীর সহাস্যবদন সহসা অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে আম্র দুইটি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা গৃহকোণে নিক্ষেপ করিল এবং সর্ব্বানন্দের কথার উত্তর না দিয়াই রন্ধনশালায় পুনঃ প্রবেশ করিল। সর্ব্বানন্দ কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পরে আবার ডাকিল, "অমল?"

উত্তর নাই।

সর্ব্বানন্দ তখন ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে স্কন্ধাবারাভিমুখে যাত্রা করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

গুর্জ্জর যুদ্ধ।

গুর্জ্জররাজের নিকট হইতে দূত ফিরিয়া আসিলে ধর্ম্মপাল গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভীষ্মদেব ও বিশ্বানন্দ অনিচ্ছাসত্বে তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। চক্রায়ুধ ধর্ম্মপালকে বিদায় দিয়া গুর্জ্জরসীমান্তে যাত্রা করিলেন। গৌড়েশ্বর সেনা সমভিব্যাহারে প্রতিষ্ঠানে আসিতে

লাগিলেন। মধ্যপথে একদিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে শিবির স্থাপিত হইয়াছে; চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রাবাস, তাহার মধ্যস্থলে বহুসুবর্ণকলসশোভিত বিচিত্র পট্টাবাস, ইহাই গৌড়েশ্বরের বস্ত্রাবাস। সন্ধ্যাকালে গ্রীষ্মাতিশয্য-প্রযুক্ত ধর্ম্মপাল সামন্তগণের সহিত শিবিরের বহির্দ্দেশে বসিয়া আছেন, চারিদিকে গৌড়ীয় সেনাগণ রন্ধন করিতেছে। গঙ্গাতীরে ক্রোশব্যাপী বিস্তৃত স্কন্ধাবার ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে স্কন্ধাবারের পশ্চিম প্রান্তে রক্ষীগণ অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইল, পরক্ষণেই একজন অশ্বারোহী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইল। আরোহী অবরোহণ করিবামাত্র অশ্বটি পড়িয়া গেল। রুদ্ধশ্বাস আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ কোথায়?"

জনৈক রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছ?

আগন্তুক ব্যগ্র হইয়া কহিল "আমি কান্যকুব্জরাজের দূত, বিষম বিপদ উপস্থিত, আমাকে শীঘ্র সম্রাট-সকাশে লইয়া চল।" তখন রক্ষীগণের মধ্যে একজন আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া সম্রাটের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিল। পথে সে জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ কি?" আগন্তুক কহিল, "সংবাদ গুরুতর। গুর্জ্জরগণ তিন দিক হইতে সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছে, আমাদিগের সেনা ক্রমাগত পাছু হটিতেছে। মহারাজ সেইজন্য গৌড়েশ্বরকে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন।"

সম্রাটের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে বসিয়া ভীষ্মদেব ও প্রমথ সিংহ ভবিষ্যৎ গুর্জ্জরযুদ্ধের কল্পনা করিতেছিলেন। ভীষ্মদেব বলিতেছিলেন, "শীঘ্রই আবার আসিতে হইবে, আবার এই সমস্ত সেনা গৌড় হইতে যমুনাতীর পর্যান্ত শত শত ক্রোশ চলিয়া মরিবে।"

সত্য সত্যই কি আবার যুদ্ধ বাধিবে?

নিশ্চয়ই। যুদ্ধ বাধিল বলিয়া। হয়ত আমরা গৌড়ে ফিরিবার পূর্ব্বেই গুর্জ্জরগণ কান্যকুব্জ অধিকার করিতে অগ্রসর হইবে।

তবে আপনি মহারাজকে দেশে ফিরিতে দিতেছেন কেন?

আমি ত দেশে ফিরিতে চাহি নাই; সন্ন্যাসীঠাকুর ও আমি ভীষণ আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহা মানিলে কই? আমি অধিক আপত্তি করিলে হয়ত গৌড়ীয় সেনা বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। আরও একটা কথা আমার মনে হইয়াছিল, তাহা তোমাকে পরে বলিব।

জয়বর্দ্ধন এতক্ষণ রণসিংহ ও ধর্ম্মপালদেবের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ভীষ্মদেব, এখন যদি গুর্জ্জর সেনা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেও সম্রাটকে গৌড়ে ফিরিতে হইবে। আপনারা কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সম্রাট বিবাহ না করিয়া আর যুদ্ধ করিতে পারিবেন না?

ধর্ম্মপাল লজ্জায় অধোবদন হইলেন; ভীষ্মদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "দেখ প্রমথ, এই বারেন্দ্রগণ বড়ই দুষ্ট।"

জয়বর্দ্ধন কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, "প্রমথদেব, আমার কথা মিথ্যা নহে, সম্রাট কান্যকুব্জে প্রবেশ করিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন যে, ফিরিবার সময়ে রাঢ়ে কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়া ফিরিতে হইবে। আমি বলিলাম, মহারাজ গোকর্ণ দর্শন করিলেই সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল হইবে ত? তাহাতে মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে গৌড়েশ্বরের অন্তঃপুরে শীঘ্রই মহাদেবীর আবির্ভাব হইবে।"

ধর্ম্মপালদেব লজ্জায় বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরে পলায়ন করিলেন। এই সময়ে স্কন্ধাবারের পশ্চিম প্রান্ত হইতে রাজদূত ও প্রতীহার সম্রাটের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীষ্মদেব দূতকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" দূত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আমি কান্যকুব্জরাজ মহারাজাধিরাজ চক্রায়ুধের নিকট হইতে গৌড়েশ্বরের সমীপে আসিয়াছি। বিষম বিপদ উপস্থিত; ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীরদেশের গুর্জ্জররাজগণ নাগভট্টের আদেশে যুদ্ধঘোষণা না করিয়াই কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছে। একই সময়ে শত শত

স্থানে গুর্জ্জরগণ যমুনাতীর আক্রমণ করায় আমাদিগের সেনা পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছে। মহারাজাধিরাজ পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তের সেনা সংগ্রহ করিয়া কান্যকুব্জে আসিতেছেন। তিনি গৌড়েশ্বরের সমীপে আমাকে নিবেদন করিতে আদেশ করিয়াছেন যে, শীঘ্রই তিনি সসৈন্যে রাজধানীতে অবরুদ্ধ হইবেন এবং ভরসা করেন যে, গৌড়েশ্বর শীঘ্রই তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন।"

ভীষ্মদেব দূতের কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া সামন্তরাজগণ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমথ সিংহ বস্ত্রাবাসের দ্বারে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "মহারাজ, শীঘ্র বাহিরে আসুন।" ধর্ম্মপাল তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাবাসের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভীষ্মদেব ও প্রমথসিংহ কহিলেন, "মহারাজ, চক্রায়ুধ দূত প্রেরণ করিয়াছেন; পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; গুর্জ্জরগণ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই কান্যকুব্জরাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। যমুনাতীরে চক্রায়ুধের সেনা পরাজিত হইয়াছে, গুর্জ্জরগণ নদী পার হইয়াছে। সমস্ত গুর্জ্জররাজচক্র মিলিত হইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছে। চক্রায়ুধ হটিতে হটিতে কান্যকুব্জে আসিতেছেন।"

তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া ধর্ম্মপালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "উত্তম। তাত ভীষ্মদেব, আপনার কথাই সত্য। গৌড়ীয় সামন্তগণ, গৌড়ীয় সেনার গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের এখনও বিলম্ব আছে। আপনারা প্রস্তুত হউন; কল্য প্রাতে কান্যকুব্জের পথ ধরিব।

ভীষ্ম।— মহারাজ, কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন উদ্ধব ঘোষ প্রতিষ্ঠান দুর্গে আছে, তাহাকে নূতন যুদ্ধের কথা জানাইতে হইবে ও গৌড়ে মহাকুমার বাক্‌পালদেবকে সত্বর নূতন সেনা পাঠাইবার জন্য দূত প্রেরণ করিতে হইবে!

প্রমথ।— কৌশাম্বী হইতে স্থাণ্বীশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সীমান্তের সকল স্থানেই যুদ্ধ হইবে। গৌড়ীয় সেনা ভাগ করিয়া লইলে হইত না?

ভীষ্ম।— প্রমথ, তুমি এখনও বালক, তুমি গুর্জ্জরদিগের রণনীতি অবগত নহ। গুর্জ্জরযুদ্ধ সীমান্তে হইবে না, অন্তর্ব্বেদীর মধ্যে পঙ্গপালের ন্যায় গুর্জ্জর সেনা আমাদিগকে বেষ্টন করিবার চেষ্টা করিবে। আমরা যদি তাহাদিগের ব্যূহ ভেদ করিতে পারি তাহা হইলেই দেশে ফিরিব, নতুবা সহস্র সহস্র গৌড়ীয় সেনার একজনও গৌড়ে ফিরিবে না।

ধর্ম্ম।— তাত, কান্যকুব্জ-দূতকে ফিরিয়া যাইতে বলিব কি?

ভীষ্ম।— মহারাজ, দূত ফিরিবার আবশ্যক নাই, তাহা হইলে গুর্জ্জরগণ গুপ্তচরমুখে আমাদিগের আগমন-সংবাদ পাইবে।

ধর্ম্ম।— উত্তম। দূত তুমি বিশ্রাম কর। কল্য প্রাতে আমরা সকলে কান্যকুব্জে ফিরিব।

সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরের বিস্তৃত স্কন্ধাবার প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ গৌড়ীয়গণের সঙ্গীতধ্বনি ও আনন্দকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, শিবির সহসা নিস্তব্ধ হইল। বিদ্যুদ্বেগে নূতন যুদ্ধের সংবাদ স্কন্ধাবার-মধ্যে প্রচারিত হইল, প্রবাসী গৌড়ীয়সেনা বিষণ্ণবদনে নূতন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সমস্তরাত্রি সামন্ত ও নায়কগণ যুদ্ধাভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আহত ও অকর্ম্মণ্য সৈনিকগণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হইল; সেনাগণের ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য অস্ত্রশস্ত্র পরিবর্ত্তিত হইল। লৌহিকগণ ভগ্ন ও অসম্পূর্ণ বর্ম্মসংস্কার করিতে লাগিল, সেনাগণ যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

রজনীর প্রথম প্রহরে সম্রাটের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জয়বর্দ্ধন, কমলসিংহকে কহিলেন, "কমল, তোমার ভগ্নীর বিবাহের এখনও বিলম্ব আছে দেখিতেছি, ধর্ম্মপাল ব্যস্ত হইলে কি হইবে, বিধাতা এখন কল্যাণীর বিবাহের জন্য মোটেই ব্যস্ত নহেন।"

বিষণ্ণবদনে কমলসিংহ কহিলেন, "জয়, কল্যাণী বড়ই অভাগিনী; মহারাজ কল্যাণীকে বড়ই প্রীতির চক্ষে দেখেন। আমি উদ্ধবের মুখে শুনিয়াছি কল্যাণী নাকি মহারাজকেই বরণ করিয়াছে।"

মহারাজ যে গোকর্ণে মনটি হারাইয়া আসিয়াছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আমি যখন গোকর্ণে তীর্থদর্শনের কথা বলিলাম তখন মহারাজের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। দেখিয়াছিলে?

"দেখিয়াছিলাম।"

"প্রেমের আর একটা লক্ষণ দেখিয়াছিলে ?"

"আবার কি ?"

"তুমি কি অন্ধ নাকি ? কান্যকুব্জের দূত যখন আসিল তখন মহারাজ বস্ত্রাবাসের মধ্যে। তিনি বাহির হইয়া আসিলে প্রমথসিংহ ও ভীষ্মদেব যখন গুর্জ্জরযুদ্ধের কথা জানাইলেন, তখন ধর্ম্মপালের মুখ দেখিয়াছিলে ?"

"না।"

"তখন মিলনে বাধা দেখিয়া নবীন বিরহীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।"

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীতাপাঠের উপসংহার

গীতার শাস্ত্রকার মহর্ষিদেব সুমধুর কবিতার ভাষায় তত্ত্বজ্ঞানের সার সত্য, অধ্যাত্মযোগের সহজ পদ্ধতি, এবং ভগবৎপ্রেমের অমৃত উপদেশ সুখারোহ সোপান-পরম্পরা-ক্রমে অল্প পরিসরের মধ্যে একত্র সন্নিবেশিত করিয়া ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়গণের কী-যে উপকার করিয়াছেন তাহা বলিবার নহে। ভগবদ্গীতার ভাষা দেবভাষা! তাহার কোনো স্থানে কোনোপ্রকার জটিলতার পাকচক্র নাই—কোনোপ্রকার কৃত্রিমতার নামগন্ধ নাই; সকলই উদার—সকলই সরল—সকলই সুধাময়! কল্যাণের যেন প্রমুক্ত স্বর্গগঙ্গা—এমনি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার যে, তাহার কোনো একটি স্থানে দর্শকের চক্ষু পড়িলে তাহার সুগভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচরে ভাসমান হইয়া ওঠে! গীতার ক্ষুদ্রায়তন পুঁথিখানির মূলের শ্লোকগুলি যখনই আদ্যো-পান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করা যায়, তখন, শ্রীকৃষ্ণ শুধুই যে কেবল পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ নহেন—অর্জ্জুন শুধুই যে কেবল ইতিহাসের অর্জ্জুন নহেন—যজ্ঞানুষ্ঠান শুধুই যে কেবল অগ্নিতে আহুতি-প্রদান নহে—তাহা বেস্ বুঝিতে পারা যায়। বেশ্ বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ শব্দের ভিতরের অর্থ জীবাত্মার প্রিয়তম পরমাত্মা, অর্জ্জুন-শব্দের ভিতরের অর্থ পরমাত্মার প্রিয়তম জীবাত্মা; যজ্ঞানুষ্ঠান-শব্দের ভিতরের অর্থ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণকে যদি মূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করা যায়, আর সেই সঙ্গে অর্জ্জুনকে যদি মূর্ত্ত অর্জ্জুন বলিয়া ভাবা যায়, তবে আমরা বলিতে পারি শুধু এই পর্য্যন্ত যে ভগবদ্-গীতা মহাভারতের অন্তর্গত একটি মনোহর খণ্ড-মহাকাব্য। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি জীবাত্মার পরম সহায় এবং পরম সুহৃৎ পরমাত্মার আর এক নাম বলিয়া গ্রহণ করা যায়, আর সেই সঙ্গে যদি অর্জ্জুনকে পরমাত্মার পরম ভক্ত জীবাত্মার আর এক নাম বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, ভগবদ্-গীতা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের, অথবা, যাহা একই কথা—বেদান্ত উপনিষদের, মথিত সারাংশ।

প্রশ্ন ॥ তা তো বুঝিলাম! কিন্তু তাহা পদার্থটা কি ? "ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মথিত সারাংশ" বলিতেছ তুমি কাহাকে ?

উত্তর ॥ ভোজনের সময় তিক্ত রস দিয়া অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যের গোড়াপত্তন করা আমার বিবেচনায় কাজটা খুব ভাল, আর সেইজন্য বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রের পুঁথির পাতা কচলাইয়া তিক্তরসের পরিবেশন যতদূর করিবার তাহা আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে সাধ্য-মতে করিয়া চুকিয়াছি—এতএব আজ আর না। দর্শন-শাস্ত্র ছাড়া আরো শাস্ত্র আছে—আস্বাদনশাস্ত্রও শাস্ত্র। শেষোক্ত শাস্ত্রের "মধুরেণ সমাপয়েৎ" বচনটির সম্মানরক্ষা আমাকর্ত্তৃক যতদূর সম্ভবে তাহার কোনো প্রকার ক্রটি না হয় সেই চিন্তা এক্ষণে আমার মনোমধ্যে বলবতী; তাই গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রের সাঁশালো এবং রসালো প্রদেশগুলি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া আমি যাহা সার বুঝিয়াছি তাহাই আজ আশ্রমবাসী সুধীজনের সেবায় সঁপিয়া দিয়া গীতাপাঠের উপসংহার-কার্য্যটি মধুরেণ সমাপন করিব মনে করিয়াছি; আর তাহাতে যদি আমি কৃতকার্য্য হই, তবে তোমার প্রশ্নের মীমাংসা আমার বিদ্যাবুদ্ধির উপরে যতদূর নির্ভর করে তাহা আপনা হইতেই সহজে নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে, তা বই—তাহার জন্য আমাকে উপরন্তু কোনো প্রকার প্রয়াস পাইতে হইবে না। অতএব প্রণিধান কর :—

আমি যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলাম, তখন, আমিই বা কিরূপ, তুমিই বা কিরূপ, জগৎই বা কিরূপ—কিছুই তাহা জানি না; ভাবি-ও না যে, আমি বলিয়া বা তুমি বলিয়া বা জগৎ বলিয়া একটা কোনো পদার্থ কোনো স্থানে আছে বা কোনো কালে ছিল। যখন জাগিয়া উঠিয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম—দেখিলাম এক অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত ব্যাপার। দেখিলাম সত্য আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে! দেখিলাম সত্য আমার বাহির হইতে বাহিরে প্রসারিত রহিয়াছে—আমার অন্তর হইতে অন্তরে প্রবিষ্ট রহিয়াছে! সত্যকে ছাড়িয়া আমি এক-তিলও কোথাও নড়িয়া বসিতে পারি না—এক মুহূর্ত্তও কেনো কিছু ভাবিতে চিন্তিতে পারি না। এক অদ্বিতীয় সত্য বিশুদ্ধ এবং উদয়াস্তবিহীন অটল জ্ঞানের আলোকে নিরন্তর স্বপ্রকাশ! আমাতেও স্বপ্রকাশ—তোমাতেও স্বপ্রকাশ! ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্র বালুকণাতেও স্বপ্রকাশ—সূর্য্যাতি-সূর্য্যেও স্বপ্রকাশ! আজিও স্বপ্রকাশ—কালিও স্বপ্রকাশ! দেশ-নির্বিশেষে, কাল-নির্বিশেষে, পাত্র-নির্ব্বিশেষে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে স্বপ্রকাশ! সত্য যদি আপনার বলে আপনি বর্ত্তমান না হইতেন—আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশ না পাইতেন—তবে তোমার আমার অপেক্ষা শতসহস্র গুণে বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন শতসহস্র মহা মহা পণ্ডিত একযোট হইয়া শতসহস্রবৎসর বংশপরম্পরাক্রমে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনো স্থানে সত্যের যৎস্বল্প আভাস-মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুখী হইতে পারিতেন না। এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী স্বয়ম্ভূ স্বপ্রকাশ একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যকে আমরা যখন আমাদের বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে ধরিয়া পাইতে চেষ্টা করি, তখন আমাদের স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধির আপাত-সুলভ ধারণার উপযোগী নানাপ্রকার খণ্ড-সত্যকে অখণ্ড সত্যের স্থলাভিষিক্ত করিয়া ভ্রান্তি-চক্রে ঘূর্ণায়মান হই। অল্পদর্শী বুদ্ধিবিদ্যার যুক্তিপ্রণালীর সিঁড়ির ধাপ প্রধানতঃ দুইটি :—

প্রথম ধাপ।

যুক্তি-সোপানের সবে-মাত্র প্রথম ধাপে পদার্পণ করিয়াই আমরা একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলি :—ইন্দ্রিয়াতীত এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলি; আর ঐ দুই ভাগের একভাগ মাত্রকে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমষ্টিকে—পরিপূর্ণ সত্যের স্থলাভিষিক্ত করি। বিপথ-গমনের এই আরম্ভ-স্থানটির যুক্তিপ্রণালী এইরূপ :—

আমি আমার জন্মাবধি এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার অধিকারস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলিকে আমার জ্ঞানের বিষয়-ক্ষেত্রে আসা যাওয়া করিতে দেখিতেছি প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দণ্ডে দণ্ডে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, পলকে পলকে। ও-গুলি আমার চির-কেলে বন্ধু;—কাজেই ও-গুলিকে আমি কোনো হিসাবেই সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিতে পারি না। আমার জ্ঞানটিকে কিন্তু আমার জন্মাবধি এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহার নিজের বিষয়ক্ষেত্রে ভুলক্রমেও পদার্পণ করিতে দেখিলাম না! দৃশ্য বস্তু সাদা বা কালো বা পাণ্ডুর বা রঙ্গীন—জ্ঞান সাদাও না কালোও না পাণ্ডুরও না রঙ্গীনও না! দৃশ্য দেহ স্থূল বা কৃশ বা দুয়ের মাঝামাঝি—জ্ঞান স্থূলও না, কৃশও না, দুয়ের মাঝামাঝিও না! স্পৃশ্য বস্তু কঠিন বা কোমল বা দুয়ের মাঝামাঝি—জ্ঞান কঠিনও না, কোমলও না, দুয়ের মাঝামাঝিও না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-সকল জ্ঞানের **বিষয়**; **জ্ঞান** জ্ঞানের **অবি-ষয়**। জ্ঞানের সুবিজ্ঞাত বিষয়সমূহকে আমরা সত্য বলি বলিয়া—যাহাকে আমরা চক্ষে দেখি না, কর্ণে শুনি না, ধরিতে ছুঁতে পাই না, তাহাকেও যে সত্য বলিতে হইবে—জ্ঞানের মতো একটা ফাঁকা অবস্তুকেও যে সত্য বলিতে হইবে—তাহার কোনো অর্থ নাই। এই প্রকার প্রথম ধাপের যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ফরাসীস-দেশীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলকেই সত্যের সার সর্ব্বস্ব বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ধাপ।

যুক্তির প্রথম ধাপ হইতে দ্বিতীয় ধাপে উত্থান করিয়া আমরা যখন সত্যের মধ্যে আর একটু তলাইয়া দেখি তখন দেখিতে পাই যে, আলোককে চক্ষুর সম্মুখ হইতে

সরাইয়া দিলে সেই সঙ্গে যেমন দৃশ্যবস্তু-সকলও চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া পলায়, তেমনি জ্ঞাতাপুরুষের সম্মুখ হইতে জ্ঞানকে সরাইয়া দিলে জ্ঞেয় বস্তুসকলও জ্ঞাতা-পুরুষের সম্মুখ হইতে সরিয়া পলায়। অতএব, এই কাগজটার এ পৃষ্ঠা হইতে ও পৃষ্ঠা ছাঁটিয়া ফ্যালা যেমন অসম্ভব, জ্ঞেয়-বস্তুসকলের গাত্র হইতে জ্ঞানকে ছাঁটিয়া ফ্যালা তেমনি অসম্ভব। ফল কথা এই যে, সূর্য্যালোকে-আলোকিত দৃশ্যমান বস্তুসকলের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যালোক নিজেও যেমন আমাদের নেত্রগোচরে প্রকাশ পায়—দৃশ্যমান লাল বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে লাল আলো প্রকাশ পায়—নীল বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে নীল আলো প্রকাশ পায়—পীত বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে পীত আলো প্রকাশ পায়, তেমনি জ্ঞানালোকিত জ্ঞেয়-বস্তুসকলের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোক নিজেও আমাদের জ্ঞান-গোচরে প্রকাশ পায়; আমাদের জ্ঞান-গোচরে—বিস্তৃত বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-জ্ঞান প্রকাশ পায়, দৃশ্য বস্তুর স্থানপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাল-জ্ঞান প্রকাশ পায়, পরিমিত বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণ-জ্ঞান প্রকাশ পায়, সম্বদ্ধ বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান প্রকাশ পায়। এইরূপ যখন আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, জ্ঞেয় বস্তু-সকল আমার সম্মুখে প্রকাশ পাইতে থাকিলে সেই সঙ্গে আমার জ্ঞানালোকও আমার সম্মুখে প্রকাশ পাইতে ক্ষান্ত থাকে না, তখন, জ্ঞেয়-বস্তু-সকলকে আমি যে-হিসাবে সত্য বলিয়া অবধারণ করি, জ্ঞানকেও আমি সেই হিসাবে সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে কাজে-কাজেই বাধ্য। অতএব এ কথা আমি খুবই মানি যে, জ্ঞেয়-বস্তুসকল যে-হিসাবে সত্য—জ্ঞানও সেই হিসাবে সত্য। কিন্তু তা' বলিয়া এ কথায় মাথা নোয়াইতে আমি প্রস্তুত নহি যে, একজন কেহ আমার মস্তিষ্কের আড়ালে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর জ্ঞানালোকিত রঙ্গশালায় জ্ঞেয়-বস্তুসকলের নাট্যলীলা দর্শন করিতেছে। জ্ঞানের পশ্চাতে যদি সত্য সত্যই কোনো জ্ঞাতাপুরুষ দণ্ডায়মান থাকে তবে তাহাকে জ্ঞানের আশয় (Subject) মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত থাকাই আমাদের উচিত; তাহার উর্দ্ধে তাহাকে জ্ঞানের বিষয় Object বলা উচিত হয় না এইজন্য—যেহেতু আমার মস্তক যেমন আমার হস্তপদের ন্যায় আমার চক্ষু-গোচরে প্রকাশ পাইতে পারে না, জ্ঞানের আশয় (subject) তেমনি জ্ঞানের বিষয়ের (objectএর) ন্যায় জ্ঞানগোচরে প্রকাশ পাইতে পারে না, আর, প্রকাশ পাইতে যখন পারে না, তখন, কাজেই বলিতে হয় যে, জ্ঞাতা পুরুষকে সত্য বলিয়া অবধারণ করা মনুষ্যবুদ্ধির অধিকার-বহির্ভূত। এই দ্বিতীয় ধাপের যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া বিগত শতাব্দীর জর্ম্মান দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের অগ্রণী মহাত্মা কাণ্ট জ্ঞেয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়োপরক্ত জ্ঞানকেই (সংক্ষেপে বিষয়-জ্ঞানকেই) সত্যের সারসর্ব্বস্ব বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, তা বই—আত্মজ্ঞানকে সত্যের কোটায় আমল দ্যা'ন নাই। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধজ্ঞান-রূপী শিবচরিত্রের সমালোচক জর্ম্মানদেশীয় দক্ষ-বিদ্যাধিপতি কাণ্ট তাঁহার দার্শনিক মহাযজ্ঞে রাজ্যসুদ্ধ দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—আকাশের দেবতা দেবরাজ, কালের দেবতা যমরাজ, বুদ্ধির দেবতা বৃহস্পতি, মনের দেবতা চন্দ্র, এই-সকল যজ্ঞ-মধুলিহ দেবতাগণের একজনও-কাহকে নিমন্ত্রণ করিতে বাকি রাখেন নাই—অ্যাকা কেবল মঙ্গল যিনি মূর্ত্তিমান্ সেই আত্মার অধিদেবতা শিবকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরেন নাই! কিয়ৎপরে বীরভদ্র-ষোপেন্‌হাউআর (Schopenhauer) উগ্রচণ্ডী ইচ্ছা যোগিনী এবং তাহার অমঙ্গলের দলবল লেলাইয়া দিয়া যজ্ঞ ভঙ্গ করিলেন প্রচণ্ড হুহুঙ্কার রবে।

আদিম ব্রহ্মবাদিগণের
প্রদর্শিত
শ্রেয়ের পথ।

আমাদের দেশের কিন্তু পুরাকালের ব্রহ্মবাদী আচার্য্য-গণ সকল সত্যের শীর্ষস্থানে—ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার কৈলাস-শিখরে—আত্মজ্ঞানের আসন প্রতিষ্ঠা করিতে সাধ্য-সাধনার ত্রুটি করেন নাই। ইঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য শ্রেণীর কোনো মহাত্মা তাঁহার পরিপক্ক চিন্তার ফল সুন্দর একটি শ্লোকের স্বর্ণপাত্রে যত্নপূর্ব্বক গুছাইয়া রাখিয়াছেন এইরূপ:—

ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টি র্ঘনাচ্ছন্নমর্কং যথা নিস্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্‌ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধি-
স্বরূপোঽহমাত্মা ॥

ইহার অর্থ ঃ—

মেঘাচ্ছন্ন-দৃষ্টি মূঢ় ব্যক্তি যেমন মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যকে প্রভাহীন মনে করে, সেইরূপ মূঢ়জনের দৃষ্টিতে যে-আমি মোহাচ্ছন্নের ন্যায় প্রতিভাত হই, সে-আমি নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ আত্মা।

আমাদের দেশের আদিম ঋষিরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুইটি মুখ্যস্থানে পরম সত্য পরমাত্মার মঙ্গলময় মুখজ্যোতি দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন—ভয়াবহ সংসারে অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—মৃত্যুময় সংসারে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন—দুঃখশোকময় সংসারে পরমানন্দের খনি পাইয়াছিলেন; সেই ধন পাইয়াছিলেন—যাহা পাইলে যাহা অপেক্ষা অধিক আর-যে-কিছু পাইবার আছে তাহা মনে হয় না, আর, যাহাতে ভর করিয়া দাঁড়াইলে গুরু বিপদেও মন বিচলিত হয় না—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি বিচাল্যতে ॥"

ভগবদ্‌গীতা। অধ্যায় ৬। শ্লোক ২২ ॥

এই দুইটি মুখ্যস্থানের একটি হ'চ্চে বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময়-কোষ—যাহাকে বলা যাইতে পারে প্রকৃতি-পুরুষের অভেদস্থান, এবং আর-একটি হ'চ্চে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময়-কোষ—যাহাকে বলা যাইতে পারে জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদ-স্থান।

প্রশ্ন। কাহাকেই বা তুমি বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ বলিতেছ—কাহাকেই বা তুমি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ বলিতেছ, আর, সে দুইটি কোষের কাহাকেই বা কী-অর্থে মুখ্যস্থান বলিতেছ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না; অতএব তোমার বক্তব্য কথাটা তুমি আমাকে আর-একটু স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলো।

উত্তর ॥ মুখ-শব্দের শেষাক্ষরে য-ফলা দিলেই তাহা মুখ্য-শব্দে পরিণত হয়। তোমার মুখমণ্ডলটাই তোমার শরীরের মুখ্য স্থান; আর, তোমার শরীরের সেই মুখ্য-স্থানটিতে তোমার আত্মার ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। আর সেইজন্য—তুমি যখন আমার নিকটে আগমন কর, তখন আমি তোমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলি যে, "ইনি আমার পরম বন্ধু দেবদত্ত", তা বই—এ কথা বলি না যে "এটা দেবদত্তের মুখমণ্ডল।" তুমি আমার সমীপস্থ হইলেই তোমাকে আমি আমার প্রত্যক্ষের আয়ত্তের মধ্যে ধরিয়া পাই বলিয়া তোমার মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আমার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না; পক্ষান্তরে যিনি যত বড়ই জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত হউন্ না কেন—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আয়ত্তের মধ্যে ধরিয়া পাইতে তাঁহার মহা দুর্বীণেরও সাধ্যে কুলায় না—মহা বিজ্ঞানেরও সাধ্যে কুলায় না; আর যিনিই যত বড় কবি হউন্ না কেন—তাঁহার স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল-ভেদী মহা কল্পনারও সাধ্যে কুলায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও—নব্যযুগের নব্যতম জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা বহুতর অনুসন্ধানের দুর্বীণ কসিয়া এবং বহুবিধ পরীক্ষার ফাঁদ পাতিয়া এইরূপ একটা জগৎজোড়া সিদ্ধান্ত তাঁহাদের নবীন বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীনে বাগাইয়া আনিতে পিছ্‌পাও হ'ন নাই যে, অমুক নক্ষত্র-রাশির অমুক স্থানে সূর্য্যের সূর্য্য অধিষ্ঠান করিতেছে, আবার সে সূর্য্যেরও সূর্য্য—দ্বিতীয় সূর্য্যেরও সূর্য্য—আকাশের সুদূরতম আর এক স্থানে অধিষ্ঠান করিতেছে! অতএব যদি বলা যায় যে, মনুষ্যের মুখমণ্ডল যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের (অর্থাৎ মানবদেহের) মুখ্যতম স্থান—সর্ব্বজগতের কেন্দ্রস্থিত অন্তরতম সূর্য্য তেমনি বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্যতম স্থান, তবে তাহা নিতান্তই একটা ছেলেভুলানিয়া আরব্য উপন্যাস বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন উপনিষদাদি শাস্ত্রকে সহায় করিয়া আমি তাই বলিতে সাহসী হইতেছি যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্যস্থান 'কিনা ভগবৎপ্রেমী সাধু-পুরুষের প্রসন্ন মুখমণ্ডল' যেমন তাঁহার আত্ম-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্য স্থান 'কিনা বিশাল বিশ্বভুবনের অন্তরতম সূর্য্যের সূর্য্য' তেমনি পরমাত্মার অপ্রতিম দিব্য জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্! আরো আমি বলি এই যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সেই অন্তরতম সূর্য্যের বরণীয় ভর্গের প্রতি—পরমাত্মার মঙ্গলময় মুখজ্যোতির প্রতি—ধ্যান-চক্ষু নিবিষ্ট করিবার পক্ষে গায়ত্রীমন্ত্র বিশিষ্টরূপে

ফলদায়ক বলিয়া আমাদের দেশের সাধকগণের নিকটে গায়ত্রী-মন্ত্রের এতাধিক মর্য্যাদা-মাহাত্ম্য। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরতম সূর্য্য—যাহা ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষগণের স্বর্গীয় মুখজ্যোতির মূল আকর—তাহাকে আমাদের দেশের সাধক-মণ্ডলী সহস্ররশ্মির সহিত উপমা দিয়া গুরূপদিষ্ট তান্ত্রিকী ভাষায় সহস্রদলপদ্ম বলিয়া রূপকচ্ছলে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; আর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত এই যে সহস্র-রশ্মি—ইহা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরতম সূর্য্যের সংক্ষিপ্ত প্রতিকৃতি (miniature)। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্য স্থানের অন্তর্নিগূঢ় আধ্যাত্মিক জ্যোতিক্কেন্দ্রকে যে নামেই যিনি নির্দ্দেশ করুন না কেন—নামে কিছুই আইসে যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষে, অথবা—যাহা একই কথা—সর্ব্ব জগতের অন্তরতম সূর্য্য-মণ্ডলে, পরমপুরুষ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে সেই জগৎপ্রসবিত্রী প্রকৃতি, সেই সাবিত্রীশক্তি, বিরাজমানা—গায়ত্রীতে যাহাকে বলা হইয়াছে "বরণীয় ভর্গ"; আর, তেমনিধারা অভিন্নভাবে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা নিগূঢ়তম প্রেমানন্দে ভাসমান। উপনিষদে স্পষ্ট লিখিত আছে "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"

ইহার অর্থঃ—

"হিরণ্ময় পরম কোষে নিষ্কলঙ্ক এবং নিষ্কল ব্রহ্ম প্রকাশ পা'ন;—সেই শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি প্রকাশ পা'ন—যাঁহাকে আত্মজ্ঞানীরা জানেন।" আমাদের দেশের আদিম ঋষিতপস্বীরা অধ্যাত্ম যোগের সাধনদ্বারা মনকে নির্ম্মল এবং পবিত্র করিয়া—শান্ত দান্ত সমাহিত হইয়া—ঐ দুই হিরণ্ময় কোষে পরম সত্য পরমাত্মার মঙ্গলময় মুখজ্যোতি দর্শন করিয়া পরমকৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বতন কালের সাধু মহাত্মারা একদিকে যেমন ধ্যান-যোগে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আর কোনো লাভকেই তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ মনে করিতেন না, আর একদিকে তেমনি তাঁহারা পরমাত্মাকে স্মরণ-পূর্ব্বক তাঁহাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। তার সাক্ষী—ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট লেখা আছে

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণা স্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥"

গীতার এই বচন-গুলির তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এই ঃ—

ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অনুষ্ঠাতা ওঁতৎসৎ উচ্চারণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'ন। তৎ শব্দের উচ্চারণ দ্বারা ব্রহ্মে লক্ষ্য স্থির করিয়া ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হ'ন। সৎশব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক সৎস্বরূপ পরমাত্মাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া সদ্ভাবে এবং সাধুভাবে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

কিয়ৎমাস পূর্ব্বে ওঁতৎসৎ মন্ত্রের অর্থ আমি যাহা বুঝি তাহা সাহিত্য-সম্মিলনীসভার কোনো একটি বিশেষ অধিবেশনে সংক্ষেপে বলিয়া চুকিয়াছিলাম এইরূপ ঃ—

"পারমার্থিক সত্যের মূলতত্ত্ব ওঁতৎসৎ। তৎশব্দের সামান্য অর্থ—ঘটি বাটি চেয়ার টেবিল্ প্রভৃতি যা-তা জ্ঞেয়বস্তু; আর তাহার বিশেষ অর্থ—পরম জ্ঞেয় বস্তু অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিবার বস্তু; তার সাক্ষী—উপ-নিষদে আছে "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" "সেই বস্তুকে জানিতে ইচ্ছা কর—সে বস্তু ব্রহ্ম।" তৎশব্দের সামান্য অর্থ যেমন যা-তা বস্তু এবং বিশেষ অর্থ যেমন পরম বস্তু—সৎশব্দের সামান্য অর্থ তেমনি তুমি আমি তিনি প্রভৃতি যে-সে সজ্জন বা সৎপুরুষ, আর, তাহার বিশেষ অর্থ পরম পুরুষ পরমাত্মা। বেদান্তাদি-শাস্ত্রের মতে পরমাত্মা শুধুই কেবল পরম লক্ষ্য বস্তু নহেন—শুধুই কেবল তৎ নহেন; একদিকে যেমন তিনি জ্ঞানের পরম **বিষয়** "তৎ", আর এক দিকে তেমনি তিনি জ্ঞানের পরম

আশয় (subject)—স বা সৎ কিনা পরম আত্মা। "তৎ" কিনা সত্যস্বরূপ পরম বস্তু, "সৎ" কিনা মঙ্গল-স্বরূপ পরম আত্মা। "ওঁতৎসৎ" কিনা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা পরমেশ্বর সত্য এবং মঙ্গল একাধারে; তিনি জানিবার বস্তু এবং জানিবার কর্ত্তা একাধারে; তিনি উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ একাধারে; তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষ একাধারে; তিনি মাতা এবং পিতা একাধারে; এক কথায়—তিনি মোট জ্ঞানের মোট সত্য—তিনি পরিপূর্ণ সত্য পরমাত্ম। ভগবদ্গীতার শাস্ত্রকার মহর্ষি-দেব তাই বলিতেছেন

"শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-কালে অনুষ্ঠাতা "ওঁ তৎসৎ" উচ্চারণপূর্ব্বক অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। তৎশব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক ফলাভিষন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লক্ষ্যস্থির করিবেন, এবং সৎশব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক মঙ্গল-স্বরূপ পরমাত্মাতে মনঃসমাধান করিয়া সদ্‌ভাবে এবং সাধুভাবে অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।"

গীতা-শাস্ত্রের মুখ্যতম সার উপদেশ শেষ অধ্যায়ে এইরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে :—

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতং॥
মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং তে সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ইহার অর্থ :—

সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ়তম একটি বাক্য এবার তোমাকে আমি বলিতেছি—আমার সেই পরম বাক্যটি শোনো। তোমাকে আমি বড্ড ভালবাসি তাই তোমার হিতের জন্য বলিতেছি। তুমি আমাগত-চিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠাতা হও, আমাকে নমস্কার কর; তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি আমি তোমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিব। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তুমি আমার শরণাপন্ন হও—আমি তোমাকে সমস্ত পাপতাপ হইতে মুক্ত করিব—কাঁদিও না।"

কিয়ৎ পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥"

অর্থাৎ

'মনঃস্থির করিয়া শুনিলে পার্থ যাহা আমি বলিলাম? তোমার অজ্ঞান-জনিত মনের ধন্দ ঘুচিল ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন বলিলেন

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

অর্থাৎ

"মোহ বিনষ্ট হইল? তোমার প্রসাদে অচ্যুত আমি চৈতন্যলাভ করিলাম! আমার সন্দেহ গিয়াছে, আমি স্থির হইয়াছি! করিব আমি যাহা তুমি বলিলে।"

অর্জ্জুন ব্যতীত অর্থাৎ পরমাত্মার পরম ভক্ত ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের (অর্থাৎ প্রেমময় পরমাত্মার) মধুর উপদেশ-বাণী কে বা শোনে—কে বা গ্রাহ্য করে? আর, আজি-কের কালের এই মহা ভয়ানক কুরুক্ষেত্রের প্রবর্ত্তয়িতা প্রতাপান্বিত জাতিগণের মধ্যে তাহা না শুনিবার এবং গ্রাহ্য না করিবার ফল ফলিতেছে হাতে-হাতে।

আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যেরা যাহাকে বলিয়াছেন "নকল সত্য" তাহার নকলত্ব ঢাকা দিবার জন্য পাশ্চাত্য জাতিদিগের জ্ঞানোপদেষ্টারা তাহার নাম দিয়াছেন "আপেক্ষিক সত্য" (relative truth)। পক্ষান্তরে, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যেরা যাহাকে বলেন "আসল সত্য"—সেই একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্য শেষোক্ত জ্ঞানোপদেষ্টাগণের মতে ছাই সত্য! ইঁহারা বলেন পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্য অজ্ঞেয় সুতরাং তাহা কাহারো কোনো উপকারে আসিতে পারে না। আপেক্ষিক সত্যকে যে-কাজে লাগাও সেই কাজেই লাগে—আপে-ক্ষিক সত্যই কাজের সত্য! তেমনি আবার, ব্রহ্মবাদী আচার্য্যেরা যাহাকে বলেন পরমার্থ অর্থাৎ পরম অর্থ—অজ্ঞেয়বাদী জ্ঞানোপদেষ্টাগণের মতে তাহা ছাই অর্থ। ইহাদের মতে সোণারূপার অর্থই কাজের অর্থ! পাশ্চাত্য

মহাজাতিগণের শিরস্থানীয় মহাত্মারা একমাত্র অদ্বিতীয় মহাসত্য এবং মহামঙ্গলকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক দ্বারা উড়াইয়া দিতে গিয়া তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি দেশসুদ্ধ লোক দলে দলে তোপে উড়িয়া যাইতেছে—ইহাতেও কি তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে না? অবশ্যই ফুটিবে! আজ্ না হো'ক্ কাল্—কাল্ না হো'ক্ পরশ্ব—একদিন-না-একদিন ফুটিবে তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই! আবার, আমাদের দেশের ব্রহ্মবাদী আচার্য্যেরা যাহাকে বলেন "অবিদ্যা" সেই, শিবের—কিনা মঙ্গলের—বক্ষের উপরে নৃত্যকারিণী খ্যাপা-চণ্ডী দেবীর নাম ইঁহারা দিয়াছেন will কিনা স্বেচ্ছা? আর সেই স্বেচ্ছা-দেবীকে সর্ব্বজগতের হর্ত্রীকর্ত্রী বেশে সাজাইয়া দাঁড়করাইয়া তাঁহার নামের দোহাই দিয়া—**প্রবর্ত্তন করিতেছেন** কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই কর্ণে শোনে নাই স্বপ্নে ভাবে নাই এইরূপ একটা নিদারুণ হত্যাকাণ্ড, অথচ, রাস্তার মাঝখানে "হায়-রে হায়-রে" বলিয়া পুনঃ পুনঃ মস্তকে করাঘাত করিয়া এইরূপ একটা কাঁদুনী-গীতের ধূয়া ধরিতে একটুও লজ্জাবোধ করিতেছেন না যে, বিজ্ঞান এবং শিল্প বাণিজ্যের "স্বাধীন চিন্তা" "স্বাধীন বাণিজ্য" "স্বাধীন বাক্‌স্ফূর্ত্তি" প্রভৃতি বড় বড় নামের অভয়বাণীতে অঙ্কিত-ললাট উন্নতির জয়-পতাকা নগর-গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে হাটে বাজারে উড্ডীয়মান হইতেছে এত যে দম্ভ সহকারে, তথাপি জন-সাধারণের দুঃখ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না!" দুঃখ বাড়িবে না তো আর কী হইবে? তোমাদেরই মালথস্ (Malthus) লোকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে ক্রটি করেন নাই যে, পৃথিবীতে অন্নের উৎপাদন হইতেছে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এইরূপ **একাদিক্রমে**—অন্নাদের (অর্থাৎ অন্ন খাদকের) উৎপাদন হইতেছে ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১২৮ এইরূপ **দ্বিগুণান্তি ক্রমে**। পৃথিবীর পাকশালায় অন্ন প্রস্তুত হয় যখন ৮ জনের খাইবার মতো—নিমন্ত্রিত ব্যক্তি তখন জমা হয় ১২৮ জন! **ব্যাপার** যখন এইরূপ, তখন, একখণ্ড ভূমির জন্য জাতিতে জাতিতে জাতিতে জাতিতে ভীষণ হইতে ভীষণতর কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড দয়া-ধর্ম্মের বাঁধ ভাঙিয়া উচ্ছৃঙ্খল বেগে চলিতে থাকিবে না তো আর কী হইবে।

সর্ব্বত্রই প্রজাবর্গের দুঃখের প্রধান কারণ **অন্ন-কষ্ট**; অন্নকষ্টের প্রধান কারণ **লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি**; লোক-সংখ্যার অতিবৃদ্ধির প্রধান কারণ **অব্রহ্মচর্য্য**; অব্রহ্মচর্য্যের প্রধান কারণ **গীতাদিশাস্ত্রোক্ত অধ্যাত্ম-যোগের সাধনে হতশ্রদ্ধা**। ভগবদ্গীতা কি বলিতেছেন শ্রবণ কর :—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥"

ইহার অর্থ :—

"যাঁহার আহার-বিহার কর্ম্মচেষ্টা নিদ্রা-জাগরণ **যুক্তভাবে** (অর্থাৎ ঠিক্ পথে ঠিক্ নিয়মে) চলিতে থাকে, তাঁহার সেই যে যোগ তাহা সর্ব্বদুঃখের বিনাশক।" তুমি বলিতেছ "মনুষ্যজাতির দুঃখ কিছুতেই ঘুচিতেছে না!" শাস্ত্রে বলিতেছে "**অর্জ্জুন** বিশ্ব-বিজয়ী পাশুপত অস্ত্র পাইয়াছেন শিবের (**আধ্যাত্মিক মঙ্গলের**) প্রসাদাৎ—দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধ শিখিয়াছেন **বলদেবের** (অর্থাৎ পার্থিব বলের) নিকটে।" শ্রীকৃষ্ণ (কিনা পরমাত্মা) যখন অর্জ্জুনের (কিনা ভ জীবাত্মার) সহায়—তখন অর্জ্জুনের কী ভয়—কী মোহ—কী শোক! অতএব বলদেবের (অর্থাৎ পার্থিব বলের) চক্ষু-রাঙানিতে ভয় পাইও না—"**যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ**" ইহা জানিও নির্ঘাত বেদবাক্য! পৃথিবীস্থ প্রতাপান্বিত জাতিগণের শিরো-ভূষণেরা যখন পরস্পরের অহিত সাধনের পরিবর্ত্তে গীতাদিশাস্ত্রোক্ত অধ্যাত্মযোগ-সাধনে যত্নবান্ হইবেন, তখন পৃথিবীস্থ মনুষ্যজাতির দুঃখ ঘুচিবেই ঘুচিবেই ঘুচিবেই!" তোমার কথাও সত্য—শাস্ত্রের কথাও সত্য! হইয়াছে যাহা তাহাও সত্য—হইবে যাহা তাহাও সত্য!

(১) হইয়াছে যাহা তাহা এই :—

পঞ্চকোষের সোপান-পদ্ধতি অনুসারে পৃথিবীর মস্তক-স্থানীয় মনুষ্যজাতির শরীরের উন্নতি হইয়াছে, মনের

উন্নতি হইতেছে, বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার দুঃখ ঘুচিতেছে না।

(২) হইবে যাহা তাহা এই:—মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার মঙ্গল রাজ্যের নিম্নভূমিতে বিজ্ঞানের চাসকার্য্য সমাপ্ত করিয়া মনুষ্যজাতি যখন অধ্যাত্মযোগের ব্রহ্মডাঙায় আরোহণ করিবে, তখন তাহার অন্তর্নিগূঢ় আনন্দময় কোষের কপাট খুলিয়া যাইবে। অধ্যাত্মযোগের একটি প্রধান অঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য। মনুষ্যজাতি ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইলে পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক দ্রঢ়িষ্ট বলিষ্ঠ এবং আশিষ্ট পুত্রকন্যা জন্মিবে; অন্ন এবং অন্নাদের উৎপত্তি-সাম্য হইবে; অন্ন এবং বাসাচ্ছাদন সকলেরই সুপ্রাপ্য হইবে; অসদ্ভাব এবং অসদাচরণের মূলোচ্ছেদ হইবে; আর তাহা হইলেই পৃথিবীর আদিম স্তরের বিকটাকার জন্তুদিগের ন্যায় দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোক অকালবার্দ্ধক্য প্রভৃতি অমঙ্গলের দলবল পৃথিবী হইতে জন্মের মতো বিদায় গ্রহণ করিবে।

এ কথা যদিচ সত্য যে, অধ্যাত্মযোগের নিরাপদকূলে পৌঁছিতে মনুষ্য-যাত্রীর এখনো অনেক পথ বাকি, কিন্তু তা বলিয়া—পঞ্চকোষের নিম্নভূমিতে বিজ্ঞানের মন্ত্রপূত চাবিতে করিয়া আপেক্ষিক সত্যের জ্ঞানোন্নতির কপাট, আর সেই সঙ্গে আর্থিক মঙ্গলের সাধনোন্নতির কপাট, দুই ধারের দুই কপাট, যেরূপ পরমাশ্চর্য্য প্রশস্তভাবে খুলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি আমরা অন্ধ থাকিতে পারি না। ইহার উপরে আবার যখন পঞ্চকোষের ব্রহ্মডাঙায় ওঁতৎসৎ-মন্ত্রের চাবিতে করিয়া অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনের কপাট এবং অধ্যাত্মযোগের অনুষ্ঠানের কপাট—এই দুই স্বর্ণকপাট ঐ রকম প্রশস্তভাবে যুগপৎ উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে, তখন অধুনাতন-কালের বৈজ্ঞানিক ইন্দ্র-জালকে ছাপাইয়া উঠিয়া পৃথিবীতলে আরো কত-যে-কী পরমাশ্চর্য্য মাঙ্গলিক ব্যাপারসকলের নিগূঢ় কপাট-সকল খুলিয়া যাইবে তাহা এক্ষণে বিদ্যা-বৃহস্পতিদিগেরও ধ্যানের অগোচর।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

দুর্গপ্রাসাদে কক্ষান্তর-গমনের পথ।
[পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ্ডার
প্রবেশ ও সাক্ষাৎ।]

পিলীয়াস

কোথায় যাচ্ছ তুমি? আজ সন্ধ্যার সময় তোমার সঙ্গে কথা আছে। তোমার দেখা পাব?

মেলিস্যাণ্ডা

হাঁ।

পিলীয়াস

এইমাত্র বাবার ঘর হতে আসছি। তিনি একটু ভাল আছেন। ডাক্তার বলছেন আর বিপদের আশঙ্কা নেই। তবু আজই সকালে আমার মনে হচ্ছিল আজ দিনটা ভাল যাবে না। কদিন হতে অমঙ্গল আমার কানের গোড়ায় গুনগুন করছে...তারপরেই, হঠাৎ একটা খুব পরিবর্ত্তন এল; এখন এটা স্থায়ী হওয়া কেবল সময় সাপেক্ষ। ওরা তাঁর ঘরের সমস্ত জানালা খুলে দিয়েছে। তিনি এখন কথাবার্ত্তা বলছেন; বোধ হয় বেশ একটু আনন্দ অনুভব করছেন। কথাগুলো এখনও ঠিক তাঁর সাধারণ মানুষের মত হয়নি; তবু তাঁর কথার ভাবগুলো আর দূর জগৎ থেকে আসছে মনে হয় না...তিনি আমায় চিনতে পেরেছেন। আর অসুখের সময় হতে তাঁর সেই যে অদ্ভুত চাহনি হয়েছে সেই রকম চেয়ে আমার হাত ধরে বললেন "একি তুমি, পিলীয়াস? সে কি, এটা আমি আগে লক্ষ্য করিনি, কিন্তু যাদের আর বেশী দিন বাঁচবার নেই তাদের মত তোমার মুখ শোক আর করুণায় পূর্ণ.. দেশ বেড়ান তোমার দরকার; দেশ বেড়ান তোমার দরকার..." আশ্চর্য্য; তাঁর কথাই আমি শুনব...মা শুনছিলেন, আর আনন্দে কেঁদে ফেললেন।—তুমি লক্ষ্য করনি? বাড়ীটা এর মধ্যেই যেন আবার সজীব হয়ে উঠেছে, চারিদিকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, কথাবার্ত্তার শব্দ, আর যাতায়াতের শব্দ...ঐ শোন; ঐ দরজার পেছনে আমি গলার আওয়াজ

শুনতে পাচ্ছি। শীঘ্র বল, উত্তর দাও, কোথায় তোমার দেখা পাব?

মেলিস্থাণ্ডা

কোথায় তুমি ইচ্ছে কর?

পিলীয়াস

বাগানে; 'অন্ধের নির্ঝরের' কাছে?—তোমার মত আছে?—আসবে তুমি?

মেলিস্থাণ্ডা

হাঁ।

পীলিয়াস

এখানে এই আমার শেষ সন্ধ্যা;—বাবা যা বলেছেন, আমি দেশ বেড়াতে যাচ্ছি। আর তুমি আমায় কখনও দেখতে পাবে না…

মেলিস্থাণ্ডা

ও কথা বোলো না, পিলীয়াস…আমি তোমায় সব সময়ে দেখব; আমি তোমার দিকে সব সময়ে চেয়ে থাকব…

পিলীয়াস

চেয়ে থাকলে কি হবে বল…আমি এত দূরে থাকব যে তুমি আমায় কিছুতেই দেখতে পাবে না…অনেক দূরে যেতে আমি চেষ্টা করব…আজ আমার এত আনন্দ হচ্ছে, আর মনে হচ্ছে যেন সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীর ভার আমার এই দেহের উপর রয়েছে, আজ…

মেলিস্থাণ্ডা

কি, হয়েছে কি তোমার, পিলীয়াস?—তুমি কি বলছ আর বুঝতেই পারছি না…

পিলীয়াস

এস, এস, আমরা তফাতে যাই। ঐ দরজার পেছনে গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি…যে-সব বাইরের লোক আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছেছে তারা বাইরে যাচ্ছে। চলে এস; ওখানে বাইরের লোকেরা রয়েছে…

[পৃথকভাবে প্রস্থান।]

* *
*

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গপ্রাসাদের একটি কক্ষ।

[আর্কেল ও মেলিস্থাণ্ডা উপস্থিত]

আর্কেল

পিলীয়াসের পিতার আর যখন প্রাণের আশঙ্কা নেই, আর যখন মৃত্যুর প্রাচীন পরিচারিকার সেই সেই পীড়া প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে, তখন এইবার আমাদের বাড়ীতে একটু আনন্দ, একটু আহ্লাদ, একটু সূর্য্যকিরণ আবার আসবে…ঠিক সময়ও তার হয়েছে! কারণ, তোমার আসার সময় হতেই আমরা যেন একটা বদ্ধ ঘরের চারিদিকে চুপিচুপি কথা বলেই কাটিয়েছি… আর বাস্তবিক, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হত, মেলিস্থাণ্ডা…যখন তুমি এখানে প্রথম এলে তখন তুমি আনন্দময়ী, যেন একটি শিশু আমোদ আহ্লাদের খোঁজেই এসেছ; আর যেমন খুব অন্ধকার আর খুব ঠাণ্ডা একটা গুহায় দুপুর বেলা ঢুকলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলেরই মুখের ভাব বদলে যায়, দরদালানে তেমনি পা দেওয়া মাত্র তোমার মুখের ভাব বদলে গেল আমি দেখলাম, হয়ত অন্তরেরও তাই…আর সেই হতেই, সেই হতেই, এই সমস্তর জন্যে, অনেক সময়, আমি আর তোমার ভাবগতিক বুঝ্‌তে পারতাম না…আমি চেয়ে চেয়ে তোমায় দেখতাম, ঐখানে তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে, আনমনা হয়ে বোধ হয়, ঐ বাইরে সূর্য্যকিরণের মাঝখানে, সুন্দর একটি বাগানের ভিতর, কিন্তু তোমার সেই আশ্চর্য্য ব্যাকুল চাহনি দেখে বোধ হত যেন কেবলই তুমি এক মহান দুঃখের অপেক্ষা করে রয়েছ…আমি ঠিক বুঝিয়ে বলে উঠতে পারছি না…কিন্তু তোমায় দেখলেই আমার দুঃখ হত; কেননা এখন হতেই মৃত্যুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা, তোমার মত তরুণী, তোমার মত সুন্দরীর জন্যে নয়…কিন্তু এখন সমস্তই বদলে যাবে। আমার এই বয়সে,—আর এই বোধ হয় আমার সমস্ত অতীত জীবনের সুনিশ্চিত পরিণাম, আমার এই বয়সে ঘটনাবলীর নিত্যতা সম্বন্ধে কতদূর বিশ্বাস আমি অর্জ্জন করেছি তা জানা যায় না, আর আমি এটা সব সময়ে মনোযোগ করে দেখেছি যে প্রত্যেক তরুণ আর সুন্দর জীব তার চারিদিকে তরুণ, সুন্দর আর আনন্দময় ঘটনাবলীর সৃষ্টি করে থাকে…আর অস্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই নূতন যুগের দ্বার তুমিই এখন মুক্ত করতে যাচ্ছ…এখানে এস; কথার উত্তর না দিয়ে, এমন কি চোখ পর্য্যন্ত না তুলে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?—আজ পর্য্যন্ত একবার মাত্র তোমায়

চুম্বন করেছি; যা হোক, জীবনের নবীনত্বে আবার বিশ্বাস রাখবার জন্যে, এক মুহূর্ত্তের তরে মৃত্যুর শাসন দূর করবার জন্যে, স্ত্রীলোকদের কপাল আর শিশুদের গণ্ডস্থল চুম্বন করা কখনও কখনও বৃদ্ধদের দরকার... আমার চুম্বনে তুমি ভয় পাও? এই ক মাস ধরে তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়েছে!...

মেলিস্থাণ্ডা

দাদা মহাশয়, আমি অসুখী ছিলাম না...

আর্কেল

যারা অসুখী অথচ নিজেরা জানে না, বোধ হয় তুমি তাদেরই মধ্যে একজন···আর তারাই বেশী অসুখী... এই রকম করে তোমায় দেখি এস, খুব কাছে, আরও একটু খানি...যখন মৃত্যু পাশ ঘেঁসে দাঁড়ায় তখন সুন্দরকে পাবার খুব আবশ্যক হয়ে পড়ে...

[গোলডের প্রবেশ।]

গোলড

পিলীয়াস আজ সন্ধ্যায় রওনা হচ্ছে।

আর্কেল

তোমার কপালে রক্ত রয়েছে।—কি করছিলে তুমি?

গোলড

কিছু না, কিছু না...আমি কাঁটা বেড়ার মাঝ দিয়ে গিয়েছিলাম।

মেলিস্থাণ্ডা

একটু মাথা নত কর, প্রভু···আমি তোমার কপাল মুছিয়ে দি···

গোলড [ঘৃণাপূর্ব্বক সরাইয়া দিয়া]

তোমায় আমি আমাকে স্পর্শ করতে দেব না, শুনতে পাচ্ছ? সরে যাও, সরে যাও!—তোমাকে আমি কোন কথা বলছি না। আমার তরবারিটা কোথায়?—আমি আমার তরবারিটা নিতে এসেছিলাম...

মেলিস্থাণ্ডা

এখানে; উপাসনা-বেদির উপরে।

গোলড

নিয়ে এস। [আর্কেলের প্রতি] আর একটা গরিব অভাগা না খেতে পেয়ে মরেছে, সমুদ্রের ধারে এইমাত্র পাওয়া গেছে। মনে হয় যেন তারা সবাই আমাদের চোখের সামনে মরতে বদ্ধপরিকর হয়েছে—[মেলিস্থাণ্ডার প্রতি] বেশ, আমার তরবারি?—তুমি কাঁপছ কেন?—তোমায় আমি হত্যা করতে যাচ্ছি না। আমি কেবল ধারটা দেখতে চাই। এ সব কাজে আমি তরবারি ব্যবহার করি না। ও রকম করে দেখছ কেন আমাকে, যেন আমি একটা ভিক্ষুক? আমি তোমার কাছে ভিক্ষা নিতে আসিনি। চোখ দেখে আমার মন বুঝতে চাও, আর তোমার চোখ দেখে আমি কিছু না বুঝতে পারি এই তুমি আশা কর?—তুমি কি মনে কর আমি কিছু জানিনা?—[আর্কেলের প্রতি] ঐ বড় বড় বিস্ফারিত চোখ দুটো দেখছেন? মনে হয় যেন ওরা আপনাদের সৌন্দর্য্যসম্পদে গর্ব্ব অনুভব করে···

আর্কেল

আমি ত ওখানে খুব সরলতা ভিন্ন আর কিছু দেখতে পাই না···

গোলড

ভয়ানক সরলতা!...সরলতার চেয়ে ওরা বেশী!·· মেষশিশুর চোখের চেয়ে আরও নির্ম্মল ওরা...সরলতা সম্বন্ধে ওরা ভগবানকে শিক্ষা দিতে পারে! ভয়ানক সরলতা! শুনুন; আমি ওদের এত কাছে থাকি যে যখনি ওরা মিটমিট করে তখনি ওদের পাতার স্নিগ্ধতা অনুভব করতে পারি; আর বরং আমি পরলোকের সমস্ত মহান রহস্যের কিছু জানি, তবু ঐ চোখের সামান্য রহস্যটুকুও জানিনা!...ভয়ানক সরলতা!...সরলতার চেয়ে আরও বেশী কিছু!...প্রায় মনে হতে পারে যেন ওখানে স্বর্গের দেবদূতেরা চিরকাল ধরে আনন্দোৎসব করছে...আমি ওদের জানি, ঐ চোখদের! আমি ওদের কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি! বন্ধ কর ওদের! বন্ধ কর ওদের! নইলে আমি ওদের চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দেব...ডান হাত তোমার গলার উপর নিয়ে যেও না; আমি খুব সাদা কথাই বলছি...কথার মধ্যে আমার চাতুরী নেই কিছু...তা যদি থাকত তা হলে সেটা প্রকাশ করে বলব না কেন? আ! আ!—ছুটে পালাবার চেষ্টা কোরো না!—এখানে!—তোমার ঐ হাত দাও আমাকে! —আ! তোমার হাত দুটো খুব গরম...বেরিয়ে যাও!

ও মাংসপিণ্ড তোমার, আমার মনে ঘৃণা আনে... এখানে!—এখন আর ছুটে পালাবার জো নেই!—[চুলের মুঠি ধরিল]—আমার সামনে এইবার জানু নত করতে হবে!—নত হও!—নত হও আমার সামনে! —আ! আ! লম্বা লম্বা চুল তোমার এইবার কিছু কাজে লাগছে!...ডাইনে প্রথম, আর এইবারে বাঁয়ে!—এবসোলাম! এবসোলাম!—সামনে যাও! পেছনে যাও! মাটিতে নত হও! মাটিতে নত হও!...দেখছ, দেখছ; আমি এরমধ্যেই বুড়োদের মত হাসতে আরম্ভ করেছি...

আর্কেল [ছুটিয়া আসিয়া]

গোলড!...

গোলড [হঠাৎ শান্তভাবের ভান করিয়া]

তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার, বুঝলে।—আমার তাতে কিছুই যাবে আসবে না।—আমি বেশ বৃদ্ধ হয়েছি; আর তারপর, আমি গুপ্তচর নই। ঘটনাস্রোতে কি নিয়ে আসে তাই দেখবার জন্যে আমি অপেক্ষা করব, আর তারপর...ওঃ! তারপর!...সেটা কেবল দেশাচার বলে; সেটা কেবল দেশাচার বলে...

[প্রস্থান।]

আর্কেল

ওর হল কি?—মাতাল হয়েছে না কি?

মেলিস্থাণ্ডা [অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে]

না, না; তবে ও আমায় আর ভাল বাসে না... আমি সুখী নই!...আমি সুখী নই...

আর্কেল

আমি যদি ভগবান হতাম তা হলে আমার মানুষের জন্যে দুঃখ হত...

* *
*

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গপ্রাসাদের সম্মুখে একটি চত্বর।

[ইনিয়লড একখণ্ড প্রস্তর তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।]

ইনিয়লড

ওঃ! এই পাথরটা খুব ভারী!...এটা আমার চেয়ে ভারী...এটা সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে ভারী...এটা ঘটাঘটির চেয়ে ভারী...পাহাড়টা আর এই দুষ্টু পাথরটার মাঝখানে আমার সোনার গোলাটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু অতদূর হাত যাচ্ছে না...আমার ছোট্ট হাতটা অত বড় নয়... আর কিছুতেই এ পাথরটা তুলতে পারা যাবে না...আমি এটা তুলতে পারি না...আর, এমন কেউ নেই যে এটা তুলতে পারে...এটা সমস্ত বাড়ীটার চেয়ে ভারী...মনে হতে পারে যেন মাটিতে এর শিকড় আছে...[দূরে মেষপালের ডাক শুনিতে পাওয়া গেল] ওঃ! ওঃ! আমি কতকগুলো ভেড়ার ডাক শুনতে পাচ্ছি...[দেখিবার জন্য চত্বরের ধারে গেল।] বাঃ! সূর্য্য ডুবে গেছে...ওরা আসছে, ছোট ছোট ভেড়াগুলো; ওরা আসছে...কতগুলো রয়েছে!...কতগুলো রয়েছে!...ওরা অন্ধকারকে ভয় করে। ওরা একজায়গায় ভিড় করছে! ওরা একজায়গায় ভিড় করছে!...ওরা আর এক পাও এগুতে পারছে না... ওরা চীৎকার করছে! ওরা চীৎকার করছে! আর ওরা খুব দৌড়ে যাচ্ছে...খুব দৌড়ে যাচ্ছে!...ওরা এর মধ্যেই বড় চৌরাস্তায় যেয়ে পৌঁছেছে। আ! আ! কোন পথে যেতে হবে ওরা জানে না...এখন আর ওরা চীৎকার করছে না...ওরা অপেক্ষা করছে...কতকগুলো ডাইনে যেতে চায়...সবগুলোই ডাইনে যেতে চায়...যেতে দিচ্ছে না! ওদের রাখাল ওদের দিকে মাটি ছুড়ছে...আ! আ! ওরা এই পথ দিয়েই যাবে, ওরা কথা মানছে! ওরা কথা মানছে! ওরা চাতালের সমুখ দিয়ে যাবে...ওরা পাহাড়ের সামনে দিয়ে যাবে...কাছ থেকে ওদের আমি দেখতে পাব...ওঃ! ওঃ! কতগুলো রয়েছে! কতগুলো রয়েছে... সমস্ত পথটা ওদের নিয়ে ভরে গেছে...ওরা সব এখন চুপ করেছে...রাখাল! রাখাল! আর ওরা কথা বলছে না কেন?

রাখাল [অদৃশ্য ভাবে]

এ পথ আর মেষশালার দিকে নয় তাই জন্যে...

ইনিয়লড

কোথায় যাচ্ছে ওরা? রাখাল! রাখাল!—কোথায় যাচ্ছে ওরা? আমার কথা আর ও শুনতে পাচ্ছে না। ওরা এর মধ্যেই অনেক দূর চলে গেছে...খুব ছুটেছে ওরা...এখন আর ওরা কিছু গোলমাল করছে না...ও

পথ আর মেষশালার দিকে নয়... কোথায় ঘুমুবে ওরা আজ রাত্রে, তাই আশ্চর্য্য? ওঃ! ওঃ! ভয়ানক অন্ধকার এখানে! এখন যেয়ে কাকেও কিছু বলতে হয়েছে···

[প্রস্থান।]

* *
*

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যানের একটি নির্ঝর।

[পিলীয়াসের প্রবেশ।]

পিলীয়াস

এই আমার শেষ সন্ধ্যা...শেষ সন্ধ্যা...এইখানেই সমস্ত শেষ হবে··· কখনও যা সন্দেহ করি নি তারই চারিধারে আমি খেলা করেছি... স্বপ্নময় হয়ে আমি নিয়তির ফাঁদের চারিদিকে খেলা করেছি... কে আমায় হঠাৎ জাগালে? আনন্দে আর কষ্টে চীৎকার করতে করতে আমি পালিয়ে যাব, যেমন অন্ধ মানুষ তার ঘর পুড়ে যাবার সময় পালায়...আমি তাকে বলব যে আমি পালিয়ে যাচ্ছি...বাবার আর বিপদের আশঙ্কা নেই, আর নিজেকে আমার মিথ্যা বোঝাবার উপায় রইল না...রাত্রি হয়েছে; সে আসবে না, তার সঙ্গে আর না দেখা করে যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল...তাকে এইবার আমি বেশ ভাল করে দেখব...অনেক জিনিস আছে আমার মনে থাকে না... সময় সময় মনে হয় তাকে আমি একশ বছর দেখি নি... আজ এখন পর্য্যন্ত আমি তার চাহনি চেয়ে দেখি নি... এই রকম করে যদি আমি চলে যাই তা হলে আমার আর কিছুই থাকবে না। আর এই-সমস্ত স্মৃতি...এ যেন একটা মসলিনের থলিতে জল নিয়ে যাওয়ার মত হবে... শুধু একবার তাকে শেষ দেখতে হবে আমায়, দেখতে হবে তার অন্তরের অন্তরতম স্থান পর্য্যন্ত... যা বলা হয়নি সে সমস্ত বলতে হবে...

[মেলিস্যাণ্ডার প্রবেশ]

মেলিস্যাণ্ডা

পিলীয়াস!

পিলীয়াস

মেলিস্যাণ্ডা! তুমি, মেলিস্যাণ্ডা!

মেলিস্যাণ্ডা

হাঁ।

পিলীয়াস

এখানে এস! চাঁদের আলোর ধারে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকনা। এখানে এস। আমাদের দুজনার এত কথা বলবার আছে... এখানে এস এই লেবু গাছের ছায়ার মাঝে।

মেলিস্যাণ্ডা

আলোতে আমায় থাকতে দাও।

পিলীয়াস

ঐ গম্বুজের জানালা থেকে ওরা আমাদের দেখতে পেতে পারে। এখানে এস; এখানে আমাদের কোনও ভয়ের কারণ নেই। সাবধান; ওরা আমাদের দেখতে পেতে পারে...

মেলিস্যাণ্ডা

আমি চাই যে ওরা আমাকে দেখতে পাক...

পিলীয়াস

সে কি, তোমার হয়েছে কি? আসবার সময় কেউ দেখতে পায়নি ত?

মেলিস্যাণ্ডা

না; তোমার ভাই ঘুমুচ্ছিল...

পিলীয়াস

রাত্রি হচ্ছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে দেবে। আমাদের সাবধান হওয়ার দরকার? এত দেরী করে এলে কেন তুমি?

মেলিস্যাণ্ডা

তোমার ভাই একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছিল। আর তারপর আমার পোষাকটা দরজার পেরেকগুলোয় আটকে গিয়েছিল। দেখ, এই ছিঁড়ে গেছে। তাই সমস্ত সময়টা আমার নষ্ট হয়েছে, আর আমি দৌড়ে···

পিলীয়াস

আ বেচারী!...তোমাকে ছুঁতে আমার প্রায় ভয় হচ্ছে... শিকারী-তাড়ান পাখীর মত তুমি এখনও খুব হাঁপাচ্ছ... একি তুমি আমার জন্যে, আমার জন্যে এত সমস্ত করছ?... আমি তোমার হৃদয়স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি, যেন সে আমারই হৃদয়ের... এখানে এস... আরও কাছে, আরও কাছে আমার...

মেলিস্যাণ্ডা

তুমি হাসছ কেন?

পিলীয়াস

আমি হাসছি না ত;—কিম্বা হয় ত আমি অজানৃতে আনন্দে হাসছি...বরং কাঁদবারই কারণ রয়েছে···

মেলিস্যাণ্ডা

আমরা এখানে আগে এসেছি...আমার মনে হচ্ছে...

পিলীয়াস

...অনেক মাস আগে...তখন, আমি জানতাম না... আজ সন্ধ্যার সময় তোমায় কেন এখানে আসতে বলেছি তা তুমি জান ?

মেলিস্যাণ্ডা

না।

পিলীয়াস

তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা, বোধ হয়... চিরকালের জন্যে আমায় চলে যেতে হবে...

মেলিস্যাণ্ডা

সব সময়েই কেন বল যে তুমি চলে যাচ্ছ ?...

পিলীয়াস

তুমি যা আগেই জান সে কথা কি আবার বলব তোমাকে ? কি কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি তা কি তুমি জান না ?

মেলিস্যাণ্ডা

সত্যি না, সত্যি না ; আমি কিছুই জানি না...

পিলীয়াস

জাননা কি আমায় কেন চলে যেতে হচ্ছে ?... জাননা কি এর কারণ হচ্ছে ... [হঠাৎ মেলিস্যাণ্ডাকে চুম্বন করিল]... আমি তোমায় ভালবাসি...

মেলিস্যাণ্ডা [নিম্নস্বরে]

আমিও তোমায় ভালবাসি ..

পিলীয়াস

ওঃ! ওঃ! ও কি বললে তুমি, মেলিস্যাণ্ডা ?... কি বললে আমি শুনলামই না প্রায় ..আমাদের মধ্যে যা কিছু অন্তরায় ছিল তা আজ চুরমার হয়ে গেল··· তোমার ও-কথার সুর পৃথিবীর প্রান্তদেশ হতে আসছে ! ...আমি তোমার কথা শুনলামই না প্রায়...তুমিও আমায় ভালবাস ?...কখন হতে আমায় তুমি ভালবাস ?

মেলিস্যাণ্ডা

সেই...চিরকাল...যেদিন প্রথম তোমায় দেখলাম সেইদিন হতে।

পিলীয়াস

ওঃ! কি সুন্দর তোমার কথাগুলি !...মনে হয় যেন তারা বসন্তে সাগরের উপর দিয়ে এসেছে !...এর আগে আমি তা কখনও শুনি নি...বোধ হচ্ছে যেন আমার হৃদয়ে বারিবর্ষণ হয়ে গেছে...এত সহজভাবে তুমি তা বললে !...প্রশ্ন করলে দেবদূতেরা যেমন বলতে পারে... আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না, মেলিস্যাণ্ডা... আমায় তুমি ভালবাসবে কেন ? কিন্তু আমায় তুমি ভালবাস কেন ? তুমি যা বলছ তা কি সত্যি ? তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছ না ? তুমি একটু সামান্য মিথ্যা কথা বলছ না, আমাকে একটু সুখী করবার জন্যে ?...

মেলিস্যাণ্ডা

না, আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না ; আমি কেবল তোমার ভাইয়ের কাছেই মিথ্যা বলি।

পিলীয়াস

ওঃ! কি সুন্দর তোমার কথাগুলি !...তোমার সুর ! তোমার সুর !...জলের চেয়ে তা নির্ম্মল আর স্থির ! আমার মুখের উপর তা নির্ম্মল জলের মত বোধ হচ্ছে !...আমার হাতের উপর তা নির্ম্মল জলের মত বোধ হচ্ছে...দাও, দাও তোমার হাত... ওঃ! তোমার হাত দুটি ছোট...আমি জানিতাম না তুমি এত সুন্দরী ! ...তোমায় দেখার পূর্ব্বে আমি এত সুন্দর আর কিছু দেখিনি··· আমি ছটফট করছিলাম, বাড়ীটা সমস্ত আমি খুঁজলাম, সমস্ত দেশময় আমি খুঁজলাম...আর কোথাও আমি সৌন্দর্য্য খুঁজে পেলাম না...আর এখন আমি তোমায় পেয়েছি !...আমি তোমায় পেয়েছি !... আমার বিশ্বাস হয় না যে পৃথিবীর কোলে আর তোমার চেয়ে সুন্দরী কেউ আছে !...কোথায় তুমি ? আর আমি তোমায় নিশ্বাস ফেলতে শুনছি না ...

মেলিস্যাণ্ডা

তার কারণ আমি তোমায় দেখছি...

পিলীয়াস

এত গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন?

আমরা এর মধ্যেই ছায়ার মাঝে এসেছি। এই গাছটার তলায় ভয়ানক অন্ধকার। আলোর মাঝে এস। অমরা দেখতে পাচ্ছি না আমরা কত সুখী। এস, এস; আমাদের এত কম সময় রয়েছে...

মেলিস্তাণ্ডা

না, না; এইখানেই আমরা থাকি অন্ধকারে আমায় তুমি আরও কাছে পাও...

পিলীয়াস

তোমার চোখ দুটি কোথায়? আমার কাছ থেকে তুমি পালিয়ে যাবে না ত? এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার কথা ভাবছ না।

মেলিস্তাণ্ডা

ভাবছি বৈ কি, ভাবছি; আমি কেবলই তোমার কথা ভাবি...

পিলীয়াস

তুমি অন্যদিকে তাকাচ্ছিলে...

মেলিস্তাণ্ডা

আমি তোমাকেই অন্যদিকে দেখছিলাম...

পিলীয়াস

তুমি আত্মহারা হয়েছ...কি হল তোমার? তোমায় সুখী বোধ হচ্ছে না...

মেলিস্তাণ্ডা

হাঁ, হাঁ; আমি সুখী, কিন্তু আমি বিষণ্ণ...

পিলীয়াস

ভালবাসতে গেলে অনেক সময়েই বিষণ্ণ হতে হয়...

মেলিস্তাণ্ডা

তোমার কথা যখনই ভাবব তখনই আমায় কাঁদতে হবে...

পিলীয়াস

আমিও...আমিও, মেলিস্তাণ্ডা...আমি তোমার খুব কাছে রয়েছি; আমি আনন্দে কাঁদছি, আর তবুও... [পুনর্ব্বার মেলিস্তাণ্ডাকে চুম্বন করিল]...তোমার যখন আমি এই রকম চুমো খাই তখন তুমি অপরূপ...তুমি এত সুন্দরী যে মনে হয় তুমি মরণ-পথের যাত্রী...

মেলিস্তাণ্ডা

তুমিও...

পিলীয়াস

এই দেখ, এই দেখ...আমাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারি না.. তোমাকে যেদিন প্রথম দেখলাম সেই দিনই আমি তোমাকে ভালবাসলাম না ..

মেলিস্তাণ্ডা

আমিও না...আমিও না...আমার ভয় করছিল...

পিলীয়াস

আমি তোমার চাহনি সহ্য করতে পারছিলাম না... আমি তখনই চলে যেতে চাচ্ছিলাম...আর তারপর...

মেলিস্তাণ্ডা

আমি আসতে একেবারেই চাইনি...আমি এখন পর্য্যন্ত জানিনা কেন, আসতে আমার ভয় করছিল...

পিলীয়াস

এত জিনিস জগতে আছে যার কথা কেউ কখনও জানবে না...আমরা সর্ব্বদাই অপেক্ষা করছি; আর তারপর ...ও কিসের শব্দ? ওরা দরজাগুলো বন্ধ করছে!

মেলিস্তাণ্ডা

হাঁ, ওরা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে...

পিলীয়াস

ফিরে যেতে আর পারব না আমরা! অর্গলের শব্দ শুনতে পাচ্ছ; শোন! শোন!...বড় শিকলগুলো ঐ! বড় শিকলগুলো ঐ!...আর উপায় নাই, আর উপায় নাই!...

মেলিস্তাণ্ডা

তাই খুব ভাল! তাই খুব ভাল! তাই খুব ভাল!...

পিলীয়াস

তুমি?...দেখ, দেখ...আর আমাদের ইচ্ছায় কিছু হচ্ছে না!...সমস্তই গেছে, সমস্তই রক্ষা পেয়েছে! সন্ধ্যায় আজ সমস্তই রক্ষা পেয়েছে! এস! এস...পাগলের মত আমার হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে, এই আমার কণ্ঠের একেবারে নিকটে...[মেলিস্তাণ্ডাকে বাহুপাশে বন্ধন করিল] শোন! শোন! আমার হৃদয় প্রায় আমার শ্বাসরোধ করছে...এস! এস!...আ! অন্ধকার এখানটা কি সুন্দর!...

মেলিস্তাণ্ডা

আমাদের পেছনে কেউ রয়েছে!...

পিলীয়াস

আমি কাকেও দেখছি না...

মেলিস্যাণ্ডা

আমি একটা শব্দ শুনতে পেলাম...

পিলীয়াস

আমি অন্ধকারে কেবল আমার হৃদয়স্পন্দনের শব্দ শুনছি...

মেলিস্যাণ্ডা

আমি শুকনো পাতার মড়মড়ানি শুনতে পেলাম...

পিলীয়াস

ও বাতাস, হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল...ও থেমে গেল, আমরা যখন চুমো খাচ্ছিলাম...

মেলিস্যাণ্ডা

আজ সন্ধ্যায় আমাদের ছায়াগুলো কত লম্বা !...

পিলীয়াস

তারা একেবারে বাগানের শেষ পর্য্যন্ত জড়িয়ে জড়িয়ে গেছে...ওঃ। আমাদের থেকে কতদূরে ওরা চুম খাচ্ছে !... দেখ ! দেখ !...

মেলিস্যাণ্ডা [চাপা গলায়]

আ—আ—ঃ ! ও একটা গাছের পেছনে রয়েছে !

পিলীয়াস

কে ?

মেলিস্যাণ্ডা

গোলড !

পিলীয়াস

গোলড ?—কোথায় তা হলে ?—আমি কিছুই দেখছি না...

মেলিস্যাণ্ডা

ঐখানে...আমাদের ছায়ার ডগায়...

পিলীয়াস

হাঁ, হাঁ ; আমি ওকে দেখতে পেয়েছি...আমাদের খুব হঠাৎ ঘুরে কাজ নেই···

মেলিস্যাণ্ডা

ওর কাছে ওর তরবারি রয়েছে—

পিলীয়াস

আমার কিছুই নেই...

মেলিস্যাণ্ডা

ও দেখেছে আমরা চুমো খাচ্ছিলাম...

পিলীয়াস

ও জানে না যে আমরা ওকে দেখেছি...নোড়ো না ; মাথা ফিরিও না...ওখান থেকে বেরিয়ে ও বেগে আমাদের উপর এসে পড়বে...যতক্ষণ মনে করবে আমরা কিছু জানি না ততক্ষণ ওখানেই থাকবে...ও আমাদের লক্ষ্য করে দেখছে...এখনও নড়েনি... যাও, যাও এখনি, এই দিকে...আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করব, আমি ওকে আটকে রাখব...

মেলিস্যাণ্ডা

না, না, না !...

পিলীয়াস

যাও ! যাও ! ও সমস্তই দেখেছে !...ও আমাদের হত্যা করবে !...

মেলিস্যাণ্ডা

সেই সব চেয়ে ভাল ! সেই সব চেয়ে ভাল ! সেই সব চেয়ে ভাল ! ..

পিলীয়াস

ও আসছে ! ও আসছে ! তোমার মুখ আন !··· তোমার মুখ আন !...

মেলিস্যাণ্ডা

হাঁ !...হাঁ ! হাঁ !...

[উন্মত্তের ন্যায় তাহারা চুম্বন করিতে লাগিল।]

পিলীয়াস

ওঃ ! ওঃ ! সমস্ত তারা আজ বর্ষণ হচ্ছে !...

মেলিস্যাণ্ডা

আমার উপরেও ! আমার উপরেও !

পিলীয়াস

আবার ! আবার !...দাও ! দাও !...

মেলিস্যাণ্ডা

সমস্ত ! সমস্ত ! সমস্ত !

[তরবারি হস্তে গোলড বেগে তাহাদের উপর পড়িল, এবং পিলীয়াসকে আঘাত করিল : নির্ঝরের পার্শ্বে পিলীয়াস পতিত হইল। শঙ্কিত মেলিস্যাণ্ডা পলাইতে লাগিল।]

মেলিস্যাণ্ডা

ওঃ ! ওঃ ! আমার সাহস নেই...আমার সাহস নেই !···

[নিঃশব্দে গোলড বনের ভিতর দিয়া মেলিস্যাণ্ডার অনুসরণ করিতে লাগিল।]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

য়ুরোপীয় যুদ্ধের ব্যঙ্গচিত্র

যুদ্ধ-দানব শীতকে বলিতেছে—আমি পুরুষগুলাকে সাবাড় করিতেছি, তুমি রোগ ও দুর্ভিক্ষ দিয়া স্ত্রীলোক ও শিশুগুলাকে শেষ কর।
—টেনেসিয়ান, ন্যাশভিল, আমেরিকা।

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ য়ুরোপকে বলিতেছে—তোমার দুঃখের দিনে তোমায় যে ভিক্ষা দিতে পারছি তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ।

পৃথিবীগ্রাসী অষ্টবাহু অক্টোপাস।
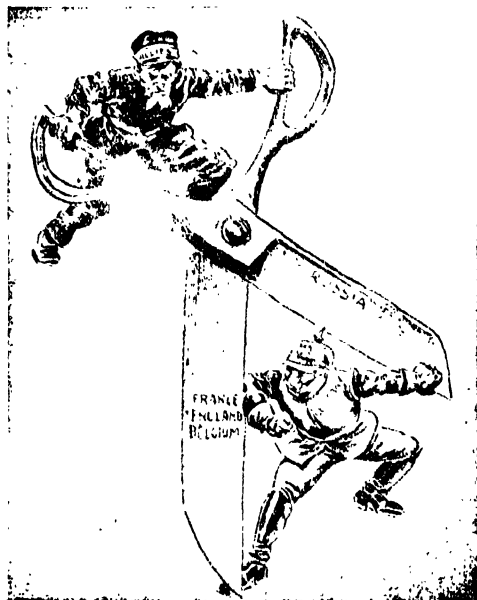
জার্মানীর শক্তি পরীক্ষা।
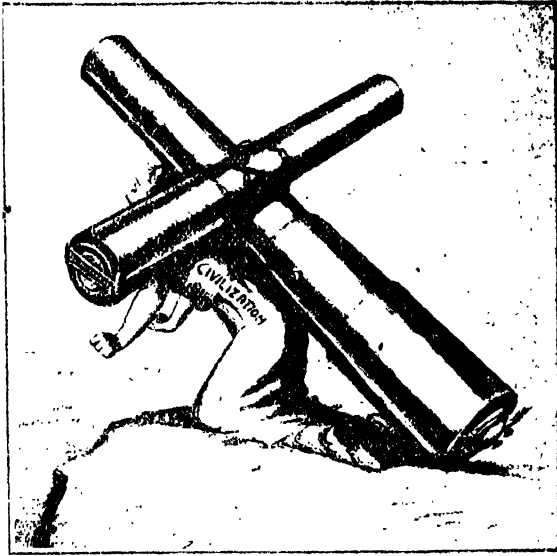
য়ুরোপীয় সভ্যতাকে জার্ম্মানীর লৌহ ক্রুশ পুরস্কার। যীশু-খ্রীষ্টের ন্যায় সভ্যতা যে ক্রুশভার নিজে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতেই তাহাকে বিদ্ধ করা হইবে। যাহার শিল নোড়া, তাহাতে তাহারই দাঁত ভাঙ্গা হইবে।

—ডেলী ঈগল, আমেরিকা।

তুর্কী— বন্ধু, জয়ে বা মরণে আমি তোমারই দোসর।
জার্ম্মানী— বন্ধু, কাজটা ভাগাভাগি করে নেওয়া যাক এস— জয়টা আমার, মরণ তোমারই।

জার্ম্মানী কল্পনা-বুদ্বুদ।—লণ্ডন ওপিনিয়ন।

কী! মানুষ নাকি বানরের বংশধর? কখ্‌খনো না— আমি এই অপবাদের তীব্র প্রতিবাদ করি।

জার্ম্মানীর উক্তি।—ইংলণ্ডের তরফে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সবাই লড়ছে এমন কি কালা সিপাহী পর্য্যন্ত। কেবল তোমরাই বাদ পড়ে আছ—লজ্জা করে না?
জার্ম্মানীর একখানি কাগজে এইরূপ বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

মিথ্যা প্রচার।

জার্ম্মানীর এক কাগজে বিদ্রূপ করে লেখা হয়েছে—জার্ম্মানীতে যে সব জাপানী এখন বন্দী আছে তাদের চিড়িয়াখানায় বানরদের সঙ্গে রাখার প্রস্তাব হচ্ছে—বানরদের আপত্তি হতে পারে জাপানীর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে; কিন্তু সে আপত্তি শোনা হবে না।

টেলিগ্রাফের তারে বন্দিনী সত্য-দেবী।

মুক্তি

যখন আমায় হাতে ধরে'
সমাদরে
ডাক্‌লে কাছে,
ভয়ে ভয়ে ছিলেম, পাছে
অসাবধানে একটু আদর হারাই ;
আপন মতে
চল্‌তে আপন পথে
ভেবেই মরি এক পা যদি বাড়াই
পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা মাড়াই !

মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠ্‌ল বাজি
অনাদরের ঘায়ে
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, হ'ল ছুটি, হ'ল আমার ছুটি,
ভাঙ্‌ল মানের খুঁটি,
খস্‌ল বেড়ি হাতে পায়ে ;
এই যে এবার
দেবার নেবার
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।
লাঞ্ছিতেরে কেরে থামায় ?
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তিমদে করল মাতাল !
খসে'-পড়া তারার সাথে
নিশীথ রাতে
ঝাঁপ দিয়েছি অতলপানে
মরণ-টানে।

আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধন-ছাড়া,
ঝড় তাহারে দিল তাড়া ;
সন্ধ্যা-রবির স্বর্ণ-কিরীট ফেলে দিল অস্তপারে,
বজ্র-মাণিক দুলিয়ে নিল গলার হারে ;
একলা আপন তেজে
ছুট্‌ল সে যে
অনাদরের মুক্তি-পথের পরে
তোমার চরণ-ধূলায় রঙীন্ চরম সমাদরে।

গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি'
তোমারি আচ্ছাদন হ'তে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি',
দেখি বদনখানি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিলাইদা ১৯ মাঘ ১৩২১।

কষ্টিপাথর

বুদ্ধির প্রাখর্য্য।

সাধারণের একটি ভুল ধারণা এই যে লোকে যত বুড়া হয় ততই তাহার বুদ্ধি প্রখর হইতে থাকে। কথাটা আপাত-দৃষ্টিতে সত্য মনে হইলেও ঠিক সত্য নহে। সচরাচর যৌবনেই বুদ্ধির প্রাখর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে। বয়স যখন অল্প থাকে তখন অধ্যবসায় বলিয়া জিনিসটা থাকে। হৃদয়ের বল, কর্ম্মে আসক্তি, জীবনের ইচ্ছা, স্বার্থত্যাগ ও অন্যান্য প্রকারের কত গুণ সেই সময় হৃদয়ে যত স্থান পায় অন্য সময়ে তত পায় না। যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে কৃতিত্ব দেখাইয়া জগতে নাম রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই যৌবনে বা বাল্যে অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইত। কেহই একেবারে বৃদ্ধ বয়সে মহৎ হইতে পারেন নাই। বুদ্ধির প্রাখর্য্য আপনা হইতে আসে না। প্রথমে অধ্যবসায়বলে কর্ম্ম করিতে হয়, খাটিতে হয়, তবেই বুদ্ধি আসিয়া জুটে। অদৃষ্ট-বাদীদের বুদ্ধি একটু অল্প—বৈজ্ঞানিকরা এরূপ বলিয়া থাকেন। আমরা ভারতবাসী আমরা অদৃষ্টবাদী, সেই কারণেই আমাদের বুদ্ধি অল্প নয় ত ? আমরা পড়িবার সময় ধরিয়া লই যে যাহা লেখা আছে তাহা সত্য। কিন্তু যাঁহারা জগতে উদ্ভাবক বলিয়া খ্যাতি লইয়াছেন তাঁহারা যে জিনিস লইয়া পড়িয়াছেন তাহার একটা হেস্ত নেস্ত নিজে না বুঝিয়া না করিয়া ছাড়েন নাই।

শুনা যায় মোজার্ট ৫ বৎসর বয়সে পদ্য লিখিয়াছিলেন; হাণ্ডেল ১১ বৎসর বয়সে পল্লী রচনা করেন; বীথোবেন ১৬ বৎসর বয়সে সভা-কবি (court musician) হন; পাস্কাল ১৬ বৎসর বয়সে conics section লেখেন; লাগ্রাঞ্জ ১৯ বৎসর বয়সে অঙ্কশাস্ত্রের একটি বিশেষগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন; ২১ বৎসর বয়সে জগদ্বিখ্যাত হেনরী ম্যাক্স্ওয়েল গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া জনরব শুনা যায় এবং ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ৩ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই bell wiring সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। জেম্স্ ওয়াট ৬ বৎসর বয়সে সর্ব্বপ্রথম Steam বা বাষ্পের প্রভাব লক্ষ্য করেন; তাহার পর তিনি ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া শেষে ২৯ বৎসর বয়সে ষ্টীম এঞ্জিন বাহির করেন। পার্কিন ১৯ বৎসর বয়সে রাসায়নিক রং বাহির করিয়া আলকাৎরার ব্যবসায়ের পথ মুক্ত করেন; এক্ষণে আলকাৎরা হইতে প্রস্তুত অসংখ্য প্রকারের রং করিয়া বেচিয়া জার্ম্মেনি ও আমেরিকা ক্রোরপতি হইতেছেন। ষ্টীম এঞ্জিনের নীচের Reaperএর উদ্ভাবক ম্যাক করমিক ২২ বৎসরে এই যন্ত্র বাহির করেন। ওয়েষ্টিংহাউস ও মার্কনি সাবালক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবে air-brake ও তারহীন টেলিগ্রাফ বাহির করেন; হল ও হেরুল্ট ২৩ বৎসর বয়সে aluminium reduction বাহির করেন; তাম্রের নীচেই এই ধাতু আজকাল অধিক মাত্রায় ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহার ঠিক দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ২৫ বৎসর বয়সে হেরুল্ট জগদ্বিখ্যাত বৈদ্যুতিক চুল্লী প্রস্তুত করেন।

এক্ষণে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের শ্রেষ্ঠ ২০টি উদ্ভাবনের তালিকা করিলে দেখিতে পাই যে ৩২ বৎসরই উদ্ভাবনের গড় বয়স: শতকরা ৮০ ভাগেরই উদ্ভাবক ৩০ বৎসরের পূর্ব্বেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছেন।

নাম	উদ্ভাবকের বয়স।
বাষ্পীয় কল	২৯
তুলা ধুনা কল	২৭
আলোক-চিত্র	৪০
শস্য-কাটা কল	২২
টেলিগ্রাফ	৪৬
Vulcanization	৩৯
সেলাই কল	২৬
Bessemer Process	৪২
First coal tar Product	১৮
Regenerative Furnace ...	৩০—৩৪
ডাইনামো	২২
Air brake	২২
টেলিফোন	২৯
ইনক্যানডেসাণ্ট ল্যাম্প	৩২
গ্যাসোলিন	৫০
ষ্টীম টারবাইন	২৮
এলুমিনিয়াম	২৩
ইনডাক্সান মোটার	৩১
তারহীন তড়িৎবার্ত্তা	২২
এরোপ্লেন	৩৫—৩৮

এই তালিকার সহিত যদি Spinning-jenny (২৫), ether as anæsthetic (২৭), first synthetic product (২৮), ফনোগ্রাফ (৩০), কারবন জিঙ্ক ইলেট্রিক সেল (৩০), লিনোটাইপ (৩০), ষ্টীম হ্যামার (৩০), অণুবীক্ষণ (৩০), বৈদ্যুতিক ঝালাই (৩৩), first locomotive (৩৩), ডিনামাইট (৩৪), ইলেক্ট্রিক ষ্টীল (৩৫) ইত্যাদি যোগ দিই তাহা হইলে উদ্ভাবনকারী শক্তি প্রায় ৩৩.৫ হয়। আবার ইহার সহিত যদিও আর অপেক্ষাকৃত অল্প আবশ্যকীয় উদ্ভাবনের তালিকা যোগ দিই তাহা হইলে বয়স ৩৫.৩ দাঁড়ায়। জগতের সর্ব্ববিখ্যাত উদ্ভাবনগুলি প্রায় ৩৩বৎসরের পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে ২৭ হইতে ৩৬ বৎসর বয়সই উদ্ভাবনের সময়। কিন্তু ৩০ বৎসরের নিম্নেই অধিকাংশ আবশ্যকীয় উদ্ভবশক্তির বিকাশ দেখা যায়। এডিসন, ক্রুশ, টমসন ৩০ বৎসর বয়সে বৈদ্যুতিক আবিষ্কার করিয়া জগতের নানা-প্রকার উপকার করেন। উক্ত বয়সে তাঁহারা generation, transmission, ও light প্রভৃতি বিষয় কার্য্যে প্রযুক্ত করেন। প্রায় ঐ বয়সেই স্পার্গ্, রিচমণ্ড নগরে ট্রলি চালান প্রথা প্রচলন করেন। ৩০ বৎসর বয়সের বহু পূর্ব্বেই ষ্ট্যানলি সাহেব alternating current সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তেস্লা ৩১ বৎসর বয়সে Polyphase currentএর শক্তি প্রচার করিয়া জগতের মহাহিত সাধন করিলেন।

এরূপও দেখা যায় যে বৃদ্ধবয়সে অনেকেও অনেক অভিনব ব্যাপার উদ্ভাবন করিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ—Bessemer's Process, টেলিগ্রাফ, গ্যাসোলিন ইঞ্জিন, কিনামিটোস্কোপ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, voltaic pile, সাইফন রেকর্ডার, ড্যানিয়াল সেল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে ৫০ বৎসরের পর যে বুদ্ধিশক্তির বিলোপ ঘটে সেটা বেশ বুঝা যায়, কেননা ঐ সময়ে প্রায় কোনও বিশেষ উপকারী দ্রব্যের উদ্ভাবন শুনা যায় না। তবে ৭৬ বৎসর বয়সে বুনসেন vapour calorimeter বাহির করেন এবং আজ এডিসন এত বয়সেও যেমন কর্ম্মপটু, M. G. Earmerও ৬০ বৎসরের পর সেইরূপ কর্ম্মপটু ছিলেন। ৬০ বৎসরের পর নূতন আবিষ্কারের মধ্যে হার্ভির বিখ্যাত Harveyized steelই উল্লেখযোগ্য। ৫০ বৎসরেই প্রায় বুদ্ধির প্রাখর্য্য নির্ব্বাপিত হয়। এ বয়সের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনের মধ্যে গ্যাসোলিন ইঞ্জিন, X-ray, Jacquard loom ও দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। লর্ড কেলভিন ৮০ বৎসর বয়সে বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ আবিষ্কারের তালিকা।

উদ্ভাবকের নাম	বয়স	উদ্ভূত দ্রব্য	সাল
পার্কিন	১৮	এনিলিন রং	১৮৫৬
উইলিয়াম সিমেনস্	২০	ষ্টীম এঞ্জিন গভর্ণর	১৮৪৩
বিসিমার	২১	সীসার উপর তাম্রের ইলেক্ট্রোপ্লেটিং	১৮১৩
কোল্ট	২০	রিভলবার	১৮৩৫
মারকনি	২১	তারহীন তড়িৎবার্ত্তা (প্রথম)	১৮৯১
ওয়েষ্টিংহাউস	২২	Air brake	১৮৬৮
ম্যাক্কর্ম্মিক	২২	শস্য কাটা কল	১৮৩১
হল্	২৩	এলুমিনিয়াম বহিষ্করণ	১৮৮৬
হিরাউল্ট	২৪	ঐ	১৮৮৬
এডিসন্	২৪	Stock Ticker	১৮৭১
এলিস্	২৪	Non-caustic varnish remover	১৯০২
ক্রম্পটন্	২৫	তাঁত	১৭৭৮
ম্যাক্কর্ম্মিক	২৫	শস্য কাটা কল (কার্য্যকারী)	১৮৩৪
মারকনি	২৫	তারহীন বার্ত্তাবহ (সফল)	১৯০০
হোই	২৬	সেলাই কল	১৮৪৫
হুটনি	২৭	তুলা ধুনা কল	১৭৯২
ডেভি	২৭	Voltaic arc	১৮০৫
ইরক্সন্	২৭	Steam fire engine	১৮৩০

উদ্ভাবকের নাম	বয়স	উদ্ভূত দ্রব্য	সাল
ডাঃ মর্টন	২১	সংজ্ঞাহীনকারী ঔষধ	১৮৪৬
এডিসন্	২১	Quadruplex telegraph	১৮৭৪
ব্রাস	২১	ডাইনামো ও আর্ক ল্যাম্প	১৮৭৬
ওয়েল্সব্যাক্	২১	গ্যাস বারনার	১৮৮৫
উলার	২৮	Synthetic organic compound	১৮২৮
ওয়াট	২৯	ষ্টীম ইঞ্জিন	১৭৬৫
হুইট্‌ওয়ার্থ	২৯	Planer	১৮৩২
ফারমার	২৯	বৈদ্যুতিক রান্নাঘর	১৮৪৯
বেল্	২৯	টেলিফোন	১৮৭৬
পারসন্স্	২৯	Steam Turbine (first)	১৮৮৪
বেকলাণ্ড	২৯	Velox paper	১৮৯২
ফ্যারাডে	৩০	বৈদ্যুতিক মোটর	১৮২১
ন্যাসমাইথ্	৩০	ষ্টীম হ্যামার	১৮৩৮
বুনসেন্	৩০	Carbon Zinc cell	১৮৪১
সিমেনস্ (Fred)	৩০	Regenerative furnace	১৮৫৬
এডিসন্	৩০	ফনোগ্রাফ	১৮৭৭
হেল্মহোলজ	৩০	Opthalmoscope	...
মারগেন্থালার	৩০	লীনোটাইপ্ (প্রথম)	১৮৮৪
ফারমার	৩১	Electric fire-alarm telegraph	১৮৫১
তেস্‌লা	৩১	Polyphase Current Motor	১৮৮৮
এডিসন্	৩২	কারবন ফিলামেন্ট্	১৮৭৯
ষ্টীফেন্সন্	৩৩	Locomotive	১৮১৪
টম্সন্	৩৩	Electric Welding	১৮৮৬
হো	৩৪	রোটারী প্রেস	১৮৪৬
সিমেনস	৩৪	Regenerative furnace	১৮৫৭
অটো	৩৪	গ্যাসইঞ্জিন	১৮৬৬
নোবেল	৩৪	ডিনামাইট	১৮৬৭
ইষ্টম্যান	৩৪	কোডাক্ ক্যামেরা	১৮৮৮
রাইট	৩৪	এরোপ্লেন	১৯০৫
এডিসন	৩৫	Central Station distribution	১৮৮২
হিরাউল্ট	৩৫	ইলেকট্রিক ষ্টীল	১৮৯৮
এচিসন্	৩৫	Carborundum	১৮৯১
আর্করাইট	৩৬	কাপড় বুনিবার কল	১৭৬৮
ফুলটন্	৩৬	অন্তর্জলী জাহাজ	১৮০১
নীলসন্	৩৬	Hot air blast	১৮২৮
মারগেন্থারাল	৩৬	লীনোটাইপ (কার্য্যকারী)	১৮৯০
ডেভি	৩৭	সেফটিল্যাম্প	১৮১৫
রাইট	৩৮	এরোপ্লেন	১৯০৫
ওয়াট	৩৮	কার্য্যকারী ষ্টীমএঞ্জিন	১৭৭৪
সিমেন্স্	৩৮	Regenerative furnace (perfected)	১৮৬১
ম্যাকে	৩৯	জুতাসিলাই কল	১৮৬০
গুডইয়ার	৩৯	রবার-প্রস্তুত-প্রণালী	১৮৩৯
গেলী	৩৯	Hot air dry blast	১৮৯৪
ডীসেল	৩৯	Internal combustion motor	১৮৯৭
ডাগেয়ার	৪০	আলোকচিত্রণ	১৮২৯
ওয়েষ্টিংহাউস্	৪০	Quick acting brake	১৮৮৬
এচিসন্	৪০	গ্রাফাইটের অনুকরণ	১৮৯৬
বীসীমার	৪২	Convertor	১৮৫৫
ফুলটন্	৪২	ষ্টীম-চালিত নৌকা	১৮০৭
কেলভিন্	৪৩	সাইফন রেকর্ডার	১৮৬৭
কর্ট	৪৪	Reverberatory Puddling Furnace	১৭৮৪
বার্গনেটেলি	৪৪	ইলেক্ট্রো-প্লেটিং	১৮০৫
বুনসেন	৪৪	বারনার	১৮৫৫
সিমেনস্	৪৪	Open hearth Process	১৮৬৭
ঐ	৪৪	ডাইনামো	১৮৬৭
অটো	৪৪	গ্যাস এঞ্জিন (কার্য্যোপযোগী)	১৮৭৬
টেলর	৪৪	High speed Steel	১৯০০
ষ্টীভেনসন্	৪৫	কার্য্যকরী রেলগাড়ী	১৮২৬
ডেনিয়াল	৪৬	Battery cell	১৮৩৬
মর্স	৪৬	টেলিগ্রাফ	১৮৩৭
এডিসন	৪৬	কিনামিটোস্কোপ	১৮৯৩
ভল্টা	৪৭	Voltaic pile	১৭৯২
কেলভিন	৫০	আধুনিক সমুদ্র কম্পাস	১৮৭৪
ডীমলার	৫০	গ্যাসোলিন ইঞ্জিন	১৮৮৪
রন্‌জেণ্ট	৫০	X Ray	১৮৯৫
ওয়ারনার সীমেন	৫১	ডাইনামো	১৮৬৭
জ্যাকার্ড	৫১	তাঁত	১৮০১
ইরিকসন্	৫২	Hot air engine	১৮৫৫
ডামলিয়ার	৫২	গ্যাসোলীন গাড়ী	১৮৮৬
মর্স	৫৩	সর্ব্বসাধারণের জন্য টেলিগ্রাফ	১৮৪৪
ইরিকসন্	৬০	Monitor	১৮৬৩
হার্ভে	৬১	Harveyized Steel	১৮৯১

জোনাথন এডওয়ার্ডস্ ১০ বৎসর বয়সে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। গ্যয়টে নাকি ৮ বৎসর বয়সেই নিজ মাতৃভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া তাঁহার ল্যাটিন, ইটালিয়ান, গ্রীক ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় কিছু কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। মিলটন ১৫ বৎসর বয়সে লাটিন ভাষায় উচ্চ দরের কবিতা লিখিয়া জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ১৩ বৎসর বয়সে হ্যামিলটন যে ভাবে পত্রাদি লিখিতেন তাহা অনেকের অদৃষ্টে উপযুক্ত বয়সেও ঘটিয়া উঠে না। র‍্যাফেল ১৭ বৎসরের পূর্ব্বেই যে ছবি আঁকিয়াছিলেন তাহার আজ পর্য্যন্ত তুলনা নাই। ২৫ বৎসর বয়সে আলেকজাণ্ডর পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। হ্যানিবল ২৬ বৎসর বয়সে কার্থিজিয়ান সেনাদলের সেনাপতি বা Commander-in-chief হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ান ২৭ বৎসরের পূর্ব্বেই আধুনিক সমরনীতির সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। আমাদের দেশের বালক পুত্তের কথা অমর হইয়া রহিয়াছে। পৃথ্বীরাজের বীরত্বগাথা কাহার অজ্ঞাত? তবে ৪০ বৎসর বয়সে সীজার প্রথম বীরত্বের পরিচয় দেন। আবার গত Franco-Prussian যুদ্ধের সেনাপতি ফন্ মল্টকে ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বীরত্বের ও বুদ্ধিমত্তার প্রথম পরিচয় দেন। এক্ষেত্রে ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে কাহাকেও উন্নতি করিতে বড় দেখা যায় না; কারণ, প্রথমে অতি নিম্নস্তর হইতে ধীরে ধীরে উন্নতির মার্গে উঠিতে হয় বলিয়া ইহা সময়-সাপেক্ষ। অধিকাংশ বীরের কীর্ত্তি ৪০ বৎসরের পরই শ্রুত হইয়া থাকে। সেইরূপ রাজনীতিজ্ঞ অর্থনীতিজ্ঞ ও বাণিজ্যবিশারদ হওয়া অল্প বয়সে ঘটিয়া উঠে না। তবে অল্প বয়সে রাজনীতিজ্ঞ হয় না বলা চলে না। উইলিয়াম পিট ও আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন তাহার উদাহরণ।

(বিজ্ঞান, আগষ্ট) প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

জ্যোতিবাবুর সঙ্গীতপ্রিয়তা, Phrenology ও ছবি আঁকাকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

"বেয়ালা কি মিঠে, অমৃতের ছিটে
ঐ হাতটিতে শুনায়,
পিয়ানো ঢং ঢং ঢ ঢং ঢং,
সেতার গুনগুনায়।
মাথার তত্ত্ব খুঁজি, পুঁথি করেন পুজি,
মাথা পেলে আর কিছু চান না।
ল'ন্ যবে ছবি মনে ভাবে কবি
"হইয়াছে, থামো—আরো,
চক্ষে আসিয়াছে মোর কান্না।"

জ্যোতিবাবু বলেন, অতিলৌকিক রহস্যব্যাপার জানিবার জন্য তাঁহার বড়ই কৌতূহল হইত। একবার তাঁহার গুরুদাদা এবং তাঁর ভগিনীপতি যদুনাথ কর্ত্তৃক প্লানচেটকাঠফলকে কৈলাস মুখুয্যের প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইল। কৈলাস মুখুয্যে বাড়ীর একজন পুরাতন কর্ম্মচারী। লোকটি খুব মজলিসী ও সুরসিক ছিল। তাহার প্রেতাত্মাকে পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিল:—"আমি কত কষ্ট করিয়া, মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা না মরিয়াই তা জানিতে চান! আপনারা ত বড় মজার লোক দেখছি।" তার পর অনেক পীড়াপীড়ি করায় সে পরলোক সম্বন্ধে বলিল—"এখানে মশায়, আর যাই হোক, পেটের জ্বালা নাই।"

ইহার পর জ্যোতিবাবু পুনরায় সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন। সহজ ও সরল প্রণালীতে কিরূপে গানের স্বরলিপি হইতে পারে এই দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য প্রথম প্রথম ভারতীতে জ্যোতিবাবু সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রকাশ করিতেন। পরে তাহা অপেক্ষা আরও সহজ করিবার নিমিত্ত আকার-মাত্রিক স্বরলিপি উদ্ভাবন করিয়া "সাধনা"য় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত পদ্ধতিই এক্ষণে সমধিক প্রচলিত।

এই সময় জ্যোতিবাবু সত্যেন্দ্রনাথের নিকট সেতারায় গমন করেন। সেখানে গিয়া তিনি মারাঠী ভাষা শিখেন। এবং মরাঠী গ্রন্থ অবলম্বনে "ঝাঁশির রাণী" লেখেন। "চল্‌রে চল্ সবে ভারত-সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান" এগানটি এই সময় রচিত হয়।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, 'একদিন মেজ বৌ ঠাকুরাণী আমায় বলিলেন অনেক দিন তুমি নাটক রচনা কর নাই—একখানা নাটক এইখানে "লিখে ফেল।" আমি বলিলাম—"এখন আমার মাথায় কোন প্লট্ নাই, লেখা হইবে না।" তিনি শুনিলেন না; জবরদস্তি আমাকে একটা ঘরে পুরিয়া, তারকদাদার (সার পালিত) কন্যা লীলুকে আমার পাহারায় নিযুক্ত করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। যতক্ষণ নাটক না লেখা হইবে, ততক্ষণ আর আমার মুক্তি নাই। দায়ে পড়িয়া এইরূপে "হিতে বিপরীত" রচিত হইল। এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানি পরে আমাদের বাড়ীতে ও সঙ্গীতসমাজে অভিনীত হয়।'

পুনায় সত্যেন্দ্রনাথের নিকট অবস্থানকালে তথাকার "গায়ন সমাজ" দেখিয়া কলিকাতায় তদনুরূপ একটি সভা স্থাপন করিতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা হয়। সভা স্থাপিত হইল, নাম হইল—"ভারত-সঙ্গীত-সমাজ।

এই সময়ে দোয়ার্কিনদিগের (Dwarkin and Sons) ব্যয়ে "বীণাবাদিনী" নামে সঙ্গীত-বিষয়ক একখানি মাসিকপত্র তিনি সম্পাদন করেন। এখানি বৎসর-দুই চলিয়া শেষে বন্ধ হইয়া যায়।

তাহার পর ত্রিপুরার স্বর্গীয় নৃপতির অনুরোধে জ্যোতিবাবু "ভারত-সঙ্গীত-সমাজ" হইতে "সঙ্গীত-প্রকাশিকা" নামে সঙ্গীত-বিষয়ক মাসিকপত্র বাহির করেন। মহারাজা বাহাদুর ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৫০ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিতেন। কাগজখানি দশ বৎসর চলিয়াছিল। তারপর মহারাজা বাহাদুরের আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যুর পর বর্ত্তমান মহারাজার সাহায্যে কিছুদিন চলিয়াছিল। পরে তিনি এই অর্থসাহায্য রহিত করায় কাগজখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

জ্যোতিবাবু "সঙ্গীত-সমাজের" সংস্রবে থাকিতে থাকিতেই সংস্কৃত নাটকগুলিকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন।

(ভারতী, মাঘ) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ভাষার কথা

বাংলা ভাষার স্বরূপ নিয়ে কিছুদিন যাবৎ একটা মহা তর্ক উঠেছে। একদল বল্‌ছেন যে বাংলা সংস্কৃত ভাষারই রূপান্তর এবং বাংলা ভাষার উন্নতি মূল সংস্কৃত অনুযায়ী হওয়া উচিত। চল্‌তি কথার আমদানীটা নেহাতই গ্রাম্যতার পরিচয় দেয়, ভাষাটাকেও ক্রমশঃ শ্রীহীন ও আবিল করে ফেলে এবং লেখকদের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করে। কাজের জন্য যতই দরকার হোক না কেন, তারা সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে এক পংক্তিতে আসন পাবার যোগ্য নয়।

আর একদল বলেন যে সংস্কৃত ভাষাটা যদিও মাতৃভাষা বটে, তবুও বাংলা ভাষার একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। মেয়ে হলেও সে এখন অন্য-গোত্র-ভুক্ত হয়েছে। তার উন্নতির নিয়ম সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে হবে না। পার্শী, ইংরেজী ও নানাবিধ দেশজ অনার্য্য ভাষার মিশ্রণে বাংলা তৈরী। তাকে জোর করে সংস্কৃত নিয়মে বদ্ধ করলে রীতি-মত শৃঙ্খলিত করা হবে—তার উন্নতি হওয়া দূরে থাক, বাঁচা দায় হবে। জীবন্ত ভাষার ছাঁচ—জাতীয় জীবন; যেখানে নানাবিধ উপকরণে জাতীয় জীবন গঠিত সেখানে জাতীয় ভাষাতেও জীবনের ছায়া দেখা যাবে। জীবন-সংগ্রামে জাতিই বল বা ভাষাই বল—যে যত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মিল করে নিতে পারবে সে ততই জীবনীশক্তি লাভ করবে। সংস্কৃতের নিয়মগুলা বাংলার উপর সিন্ধু-বাদ নাবিকের স্কন্ধে দ্বীপবাসী বৃদ্ধের মত চড়ে বসলে বেচারার প্রাণসংশয় হবে।

সংস্কৃত থেকে যে আমরা বাংলার উৎপত্তি ধরে নিচ্ছি সেটাই গোড়ায় গলদ। প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা জন্মেছে, আর সে প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃত-ভাঙ্গা নয়, এটা সকলেই এখন জানেন। আজকাল আবার এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনেকেই সন্দেহ করেন যে সংস্কৃত ভাষাটার আদৌ মৌখিক ব্যবহার ছিল কি না। যে ভাষা কখনও চল্‌তি ছিল কিনা তারই সন্দেহ, যদি তার নিয়মে একটা জীবন্ত ভাষাকে চালাবার চেষ্টা করা যায়, তা হ'লে আমাদের ইতিহাসের শিক্ষার বিরুদ্ধে চল্‌তে হবে এবং শেষে পস্‌তাতে হবে।

সকল ভাষাকেই এক সময় না এক সময় এই সমস্যার উত্তর ঠিক করে নিতে হয়েছে।

Philologyতেই বলুন বা সাহিত্যেই—Literatureএতেই বলুন, কোনখানেই এক বাঁধা নিয়ম চিরকাল খাটবে না। যখন যেটার সাহায্যে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হবে, প্রতিভাশালী লেখক তখনই তার সাহায্যে অগ্রসর হবেন। যেখানে একটা চল্‌তি কথায় ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়, সেখানে ঘুরিয়ে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে কেহই রাজী হবেন না। এটা মানসিক শৈথিল্যের জন্য নয়, ভাবের

স্ফূর্ত্তির জন্য। ভাষার গঙ্গা দেশ-দেশান্তর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে; অনেক নূতন শাখানদী অনেক নূতন সম্পদ্ এনে যোগ দিচ্ছে।

কোন্ প্রাদেশিক ভাষা শেষে বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হবে তা বলা সুকঠিন। যদি কোনও ভাষা আদর্শ হয়, তা হ'লেও এই আদর্শ ভাষা যে চিরকালের জন্য বাঙ্গালা ভাষাটাকে একটা বিশেষ ছাঁচে বদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে, এরূপ ভাববারও কোন কারণ দেখি না। আলালী ভাষা, বিদ্যাসাগরী ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা, সব ভাষাগুলিরই বিশেষত্ব আছে; এইসব লেখকদের হাতে তাঁদের ভাষার ভঙ্গী বেশ পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ভবিষ্যতে যদি শ্রীহট্ট কিম্বা কুচবিহার হতে প্রতিভাশালী লেখকের উদ্ভব হয় এবং তিনি তাঁর প্রাদেশিক ভাষাতে লেখেন ত' সকলেই আহ্লাদের সহিত পড়্‌বে এবং তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কিম্বা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নাই বলে কেউ তাঁর দোষ ধরবে না। যে রকম ভাষাতেই প্রতিভাশালী কবি লিখুন না কেন, জন-সমাজকে তা গ্রাহ্য কর্‌তে হবে। ভাষাতে লোকে প্রাণ খোঁজে, পোষাক নয়। যৌবনের উদ্দামশক্তির যে বিকাশ হয়, তা জীবনীশক্তির পরিচায়ক এবং ভাষাতেও সেই শক্তির বিকাশ আমরা জীবনীশক্তির প্রমাণ বলে আদর করব।

(নারায়ণ, মাঘ) শ্রীমন্মথনাথ বসু।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নির্ব্বাণ কয় রকম ?

থেরাবাদী বুদ্ধেরা ও প্রত্যেক বুদ্ধেরা মনে করিতেন, মানুষ যদি সদুপদেশ পাইয়া, অথবা, নিজে মনে মনে গড়িয়া লইয়া চারিটি আর্য্যসত্যে বিশ্বাস করে, আট রকম নিয়ম মানিয়া চলে, তাহা হইলে বহুকাল অভ্যাসের পর, তাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়। এইরূপ যাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়, তাহাদের সোতাপন্ন বলে। স্রোতে পড়িলে যেমন সে আর উজান যাইতে পারে না, ভাটিয়াই যায়, সেইরূপ সোতাপন্ন নির্ব্বাণের দিকেই যাইতে থাকেন, সংসারের দিকে তিনি আর কখন ফিরিয়া আসেন না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলেও তিনি আর উজান বহেন না।

সোতাপন্ন আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি "সকৃদ্-আগামী" হয়েন অর্থাৎ তিনি আর একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব এই 'সকৃদাগামী' অবস্থাতেই তুষিতভবনে বাস করিতেছিলেন। তিনি আর একবার মাত্র পৃথিবীতে আসিলেন ও নির্ব্বাণ পাইয়া গেলেন।

সকৃদাগামী আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ান, তাহাকে "অনাগামী" অবস্থা বলে। এ অবস্থায় আসিলে আর ফিরিতে হয় না।

ইহার পরের অবস্থার নাম অর্হৎ। অর্হৎ যদিও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকেন, তবুও তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি যে নির্ব্বাণ পাইয়া থাকেন, তাহার নাম "স উপাদি সেস নিব্বান" বা স উপাধি শেষ নির্ব্বাণ। ইহা নির্ব্বাণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে পুনর্জ্জন্মের কিছু কিছু "উপাদান" এখনও শেষ আছে; অথবা সকল কর্ম্ম এখনও ক্ষয় হয় নাই। আরও সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে—কর্ম্ম হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার কিছু কিছু এখনও রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থায় অর্হৎ কিছুদিন থাকিলে, তাঁহার কর্ম্মের ক্ষয়ই হয়, সঞ্চয় আর হয় না। ক্রমে সব কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলেই তিনি "নিরুপাদি সেস নিব্বান ধাতু"তে প্রবেশ করেন—অর্থাৎ তখন তাঁহার কর্ম্মও থাকে না, কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন সংস্কারও থাকে না। তিনি নির্ব্বাণে প্রবেশ করেন, সব ফুরাইয়া যায়।

মহাযানীরা বলেন 'এই যে হীন-যানীদের নির্ব্বাণ, ইহা নীরস, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, এবং ইহাতে অতি সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দেয়। হীনযানীরা ও প্রত্যেকযানীরা জগতের জন্য একেবারে 'কেয়ার' করেন না। তাঁহাদের কাছে জগৎ থাকা না-থাকা দুইই সমান। নির্ব্বাণ পাইয়াও তাঁহারা কাঠের বা পাথরের মত হইয়া যান। ও নির্ব্বাণ, যাহারা বুদ্ধিমান, যাহাদের শরীরে দয়ামায়া আছে, যাহাদের হৃদয় আছে, যাহারা শুধু আপনার সুখের জন্য ব্যস্ত করে না, যাহারা পরের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। তাহারা নির্ব্বাণের অন্যরূপ অর্থ করিয়া লইবে।

মহাযানীরা মনে করেন যে, নির্ব্বাণকে নিষেধমুখে অর্থাৎ 'না' 'না' করিয়া দেখিলে চলিবে না। উহাকে বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক্ হইতেই দেখিতে হইবে। আত্মার নাশের নাম নির্ব্বাণ, জ্ঞানের নাশের নাম নির্ব্বাণ, বুদ্ধির নাশের নাম নির্ব্বাণ,—এই যে হীনযানীরা 'না'র দিক্ হইতে উহাকে দেখিয়া থাকেন, উহা বুদ্ধের মনের কথা হইতে পারে না। তিনি 'চতুরার্য্যসত্য' ও আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ বা আটটি সুপথ ধরিয়া চলার নামই নির্ব্বাণ। তাঁহার মতে মনুষ্য-হৃদয়ের যত আশা আকাঙ্ক্ষা, সব শান্তি করিয়া দেওয়ার নাম নির্ব্বাণ নহে; সেই-সকল আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে দেওয়ার নামই নির্ব্বাণ।' কিন্তু সে আশা বা আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত থাকিলে চলিবে না, তাহার ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিতে হইবে।

অতএব মহাযান-নির্ব্বাণ 'না'র দিক্ হইতে নয়, 'হাঁ'র দিক্ হইতে বুঝিতে হইবে। নিরালম্ব-নির্ব্বাণে বোধিচিত্ত যে কেবল ক্লেশ-পরম্পরা হইতে মুক্ত হন, এরূপ নয়, কুদৃষ্টি হইতেও মুক্ত হন। তখন বোধিচিত্ত ধর্ম্মকায়ের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। দুটি জিনিস তখন তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে—(১) সর্ব্বভূতে করুণা, (২) ও সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান। যিনি এইরূপে 'সম্যক্ সম্বোধি' লাভ করিয়াছেন, তিনি সংসারের উপরে উঠিয়াছেন, নির্ব্বাণেও তখন তাঁহার একান্ত আস্থা নাই। তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়াছে সর্ব্বজীবের পরিত্রাণ ও তাহার জন্য তিনি আপনাকে বারংবার বদ্ধ করিতেও কাতর হন না। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী-প্রজ্ঞাবলে তিনি পদার্থের সত্যাসত্য দেখিতে পান। তাঁহার জীবন তখন উৎসাহে পরিপূর্ণ, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মময় হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে বলিতেছে, 'সমস্ত প্রাণীকে মুক্ত কর ও চরমানন্দে ভাসাইয়া দাও।' তিনি নির্ব্বাণেও তৃপ্তি লাভ করেন না, নির্ব্বাণেও তিনি বসতি করিতে পারেন না, তাঁহার কি ভব, কি নির্ব্বাণ কোনই অবলম্বন নাই, এইজন্য তাঁহার নির্ব্বাণের নাম নিরালম্ব নির্ব্বাণ।

মহাযানীদের আর একরকম মুক্তি আছে। এ মুক্তি ভব ও নির্ব্বাণের অতীত। ইহা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মকায়ের সহিত এক। আমরা যাহাকে তত্ত্ব বলি, সাধারণ লোকে যাহাকে তথ্য বলে, মহাযানীরা তাহাকে তথতা বলে। ধর্ম্মের যে তথতা তাহার নাম ধর্ম্মকায়। যিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি তথাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমসত্যে আগত হইয়াছেন।

সে পরম সত্যটি কি? জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহার তলায় যে নিগূঢ় সত্যটুকু রহিয়াছে, তাহারই নাম ধর্ম্মকায়। ধর্ম্মকায় হইতেই নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ইহা হইতেই সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়। ধর্ম্মকায় মহাযানীদের নিজস্ব, কারণ হীনযানীরা

জগতের আদিকারণ নির্ণয় করিতেই যান নাই। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মকায় বলিতে বুদ্ধের ধর্ম্ম ও তাঁহার শরীর বুঝাইত। অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মকায় বলিতে বেদান্তের পরমাত্মা বুঝায়, কিন্তু সে কথা সত্য নয়। নির্গুণ পরমাত্মা অস্তিত্ব মাত্র। ধর্ম্মকায়ের ইচ্ছা আছে, বিবেকশক্তি আছে, অর্থাৎ, ইহার করুণা আছে ও বোধি আছে। সকল সজীব পদার্থই এই ধর্ম্মকায়ের প্রকাশমাত্র।

নির্ব্বাণ বলিতে চৈতন্যের নাশ বুঝায় না, চিন্তার নিরোধও বুঝায় না। নির্ব্বাণে নিরোধ করে কি? কেবল অহংভাবেরই ইহাতে নিরোধ করে। ইহাতে বলিয়া দেয় যে অহং বলিয়া যে, একটা পদার্থ কল্পনা করা হয়, তাহা অলীক ও এই অলীক কল্পনা হইতে আরও যত ভাব উঠে, সে সবও অলীক। এতটুকু ত গেল কেবল 'নিষেধমুখে' অর্থাৎ 'না'র দিক্ হইতে। বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক্ হইতেও ইহার একটা অর্থ আছে। সেটি করুণা—সর্ব্বভূতে দয়া। এই দুইটা জিনিষ লইয়াই নির্ব্বাণ সম্পূর্ণ হয়। হৃদয় যখন অহংভাব হইতে মুক্ত হইল, অমনি, যে হৃদয় এতক্ষণ সঙ্কীর্ণ ও অলস ছিল, তাহা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, নূতন জীবনের ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন কারাগার ছাড়িয়া বন্দী বাহির হইয়া পড়িল। এখন সমস্ত জগৎই তাহার, এবং সেও সমস্ত জগতেরই। সুতরাং একটি প্রাণীও যতক্ষণ নির্ব্বাণ পাইতে বাকি থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহার নির্ব্বাণ পাইয়া লাভ কি? নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

একজন বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন, "অবিদ্যা হইতে বাসনার উৎপত্তি এবং সেই বাসনা হইতে আমার পীড়ার উৎপত্তি। সমস্ত সজীব পদার্থ পীড়িত, সুতরাং আমিও পীড়িত। যখন সমস্ত সজীব পদার্থ আরোগ্য লাভ করিবে, তখন আমিও আরোগ্যলাভ করিব। কিসের জন্য বোধিসত্ত্ব জন্ম ও মৃত্যুযন্ত্রণা স্বীকার করেন? কেবল জীবের জন্য জন্ম ও মৃত্যু থাকিলেই পীড়া থাকে। যখন জীবের পীড়ার উপশম হয়, বোধিসত্ত্ব রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। যখন পিতামাতার একমাত্র সন্তান পীড়িত হয়, তখন পিতামাতারও পীড়া উপস্থিত হয়। সে সন্তান নীরোগ হইলে পিতামাতাও নীরোগ হন। বোধিসত্ত্বেরও ঠিক সেইরূপ। তিনি সমস্ত জীবগণকে সন্তানের মত ভালবাসেন। তাহারা পীড়িত হইলেই তিনি পীড়িত হন, তাঁহারা নীরোগ হইলেই তিনি নীরোগ হন। তুমি কি শুনিতে চাও কেন বোধিসত্ত্ব এরূপ পীড়িত হন? তিনি মহাকরুণায় আচ্ছন্ন, তাই তিনি পীড়িত হন।"

(নারায়ণ, মাঘ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক

'বিল্বমঙ্গল' নামক একখানি নাটকের উল্লেখ কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না, ও ইহা যাত্রার পালা বা নাটক তাহাও নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। অতএব "ভদ্রার্জ্জুন অর্থাৎ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ" বাঙ্গালা ভাষায় আদিম নাটক। ইহার রচয়িতা তারাচরণ শীকদার।

গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ শকাব্দ ১৭৭৪ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা অধুনা-আদি-বাঙ্গালা-নাটক-বলিয়া-সাধারণতঃ-বিবেচিত 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্বের' এক বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। তারাচরণ এই নাটকখানি পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে গঠিত করিয়াছেন।

কুরুচিপূর্ণ যাত্রার পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ রুচির নাটক অভিনয়ে শিক্ষিত দর্শক সন্তুষ্ট হইবেন, এই আশায় তারাচরণ শীকদার 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি সেকালের যাত্রা ও এই নাটকের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। তারাচরণ সিন বুঝাইতে সংযোগস্থল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরেজী নাটকের Prologueএর ন্যায় 'ভদ্রার্জ্জুনে একটি 'আভাস' সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে তারাচরণ নাটক ও নাট্যকলার নিম্নলিখিত প্রশংসা করিয়াছেন:—

"সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান।
সর্ব্বস্থলে নাটকের আদর সমান॥
সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবী-নিবাসী।
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাষী॥
দর্শকমণ্ডল-মাঝে করিয়া বিস্তার।
করিতেছি সুধাসম-নাটক প্রচার॥
শ্রুতিযুগে দৃষ্টিযুগে প্রবেশি এ সুধা।
তৃপ্তি করে সকলের নিরানন্দ-ক্ষুধা॥"

এইরূপে নাট্যকলার প্রশংসা করিয়া নাট্যকার সমগ্র নাটকের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানটি 'আভাসে' পয়ারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'আভাসে'র পরই প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক আরম্ভ হইয়াছে।

(নারায়ণ, মাঘ) শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশীয় ঔষধের ব্যবহার

কালমেঘ:—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম বিশেষ। কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটকামড়ান, যকৃতের দোষ, যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধি সহ জ্বররোগ প্রভৃতিতে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। বিশেষতঃ বালকদিগের ইন্‌ফেণ্টাইল্ লিভারে (Infantile Liver) ইহার ন্যায় মহোপকারী মহৌষধ প্রায় দৃষ্ট হয় না।

গুলঞ্চ:—ইহা এক প্রকার লতাবিশেষ। জ্বর-নাশক। মূত্রযন্ত্র-সংক্রান্ত রোগে গুলঞ্চের চিনি বা সারাংশ ব্যবহার করা হয়। গুলঞ্চ জ্বররোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

পেঁপে:—আয়ুর্ব্বেদমতে কাঁচা ও পাকা উভয় পেঁপেই শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, সারক, পুষ্টিকর ও বায়ুনাশক এবং অর্শ, রক্তপিত্ত, অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা, প্রভৃতি রোগে উপকারক। পেঁপের আঠা প্লীহা ও গুল্ম রোগে উপকারক এবং আঁচিল, ব্রণ ও জিহ্বা-ক্ষত প্রভৃতির উপশমকারক। পেঁপের গুণ এই পেঁপের আঠার উপরই নির্ভর করে, সুতরাং কাঁচা পেঁপেই অধিক উপকারী। কাহারও মতে পেঁপের আঠার উপরোক্ত গুণ ব্যতীত ইহা স্নায়ু-শৈথিল্যকারক, পাচক, অম্ল দাহক, পিত্তনিঃসারক এবং বমন-নিবারক। এতদ্ভিন্ন দাদ, বিখাউজ, কাউর (Eczema) প্রভৃতি চর্ম্মরোগ পেঁপের আঠা হরিদ্রার গুঁড়ার সহিত ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

চিতা:—চিতা এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্মবিশেষ। সাধারণতঃ অম্ল অজীর্ণ, কুষ্ঠ এবং যকৃৎ ও প্লীহা রোগে চিতামূল ব্যবহার্য্য। পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

নিম্ব:—আমাদের দেশে প্রবাদ আছে 'নিম নিসিন্দা যেথা, মানুষ মরে কি সেথা?' রক্তদোষে বা পিত্তবিকারে নিম্বের ক্বাথ বিশেষ উপকারী। জ্বররোগে নিম্বের বঙ্কলের জ্বর নাশের শক্তি অমোঘ।

এই সমস্তগুলি মিশাইয়া চমৎকার জ্বরঘ্ন ঔষধ হয়—

কালমেঘ চূর্ণ	১ ভরি
গুলঞ্চের চিনি	১ ভরি
পেঁপের আঠা	১ ভরি
চিতামূল চূর্ণ (রক্ত)	॥০ ভরি

প্রথমে কালমেঘ চূর্ণ ও চিতামূল চূর্ণ এই দুইটি দ্রব্যকে তিন দিন নিমের কাথে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পেঁপের আঠা ও গুলঞ্চের চিনি মিশ্রিত করিবে, পরে উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। জ্বরকালীন প্রতিদিন ইহার দুইটি করিয়া বটিকা ৩ বার সেবন করিবে। ইহাই পূর্ণ মাত্রা। বালকগণকে সেবন করাইতে হইলে বয়সের তারতম্যানুসারে মাত্রা স্থির করিয়া লইতে হইবে। রাশি রাশি কুইনাইন সেবন করিয়া যাহাদের জ্বর বন্ধ হয় নাই, আমি এরূপ রোগীকে ১০ হইতে ২০টি বটিকায় আরোগ্য করিয়াছি।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, মাঘ) শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

অবরোধ প্রথার কুফল

কলিকাতায় গড়ে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখ্যা অধিক। দেড়গুণেরও উপর। হেলথ অফিসার ডাক্তার ক্রার্ক বলেন, সম্ভবতঃ নারীগণের অবরোধপ্রথাই মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ।

(স্বাস্থ্যসমাচার, মাঘ)

যুদ্ধ ও ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়ায় যেরূপ লোকক্ষয় হয়, যুদ্ধে লোকক্ষয় তাহার তুলনায় অতি সামান্য। ম্যালেরিয়ায় এক বঙ্গ-দেশেই বৎসরে ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে। এ পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধেই মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হয় নাই।

(স্বাস্থ্যসমাচার, মাঘ)

লোক হত্যায় অর্থব্যয়

যুদ্ধে শত্রুহত্যার জন্য, এবং তৎসঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য নিত্য নব উৎকৃষ্টতর উপায়সমূহ উদ্ভাবিত হইতেছে। ইহাতে যুদ্ধে লোকহত্যার ব্যয় ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ১৮৭৭-১৮৭৮ অব্দের রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে জনপ্রতি ৪৫,০০০ হাজার টাকা এবং রুষ-জাপান যুদ্ধে জনপ্রতি ৬১,২০০ টাকা খরচ হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের ব্যয় আরও অধিক, জনপ্রতি ৬৩,০০০ হাজার টাকা।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, মাঘ)

আলোচনা

বাঙ্গালা শব্দকোষ

যোগেশ বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে আলোচনা লিখিতেছেন, তাহারই কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাহাই নীচে লিখিতেছি।

ছিপ। মাছ ধরিবার। ইহা ক্ষিপ হইতে হইয়াছে। যেহেতু বেণুযষ্টিখানি মাছকে জল হইতে (উপরে) ক্ষেপণ করে, এই জন্য উহা ক্ষিপ। ক্ষ=চ, ইহা অতি প্রসিদ্ধ, (হেম-৮-২-১৭) যেমন ক্ষার=ছার। এইরূপে ক্ষিপ=ছিপ। খৈ-মুড়ি ভাজিবার জন্য খুঁচী (তৃণমুষ্টি) ব্যবহৃত হয়, মালদহে তাহাকে সাধারণ লোকে ছিপনী (=ক্ষেপণী) বলে।

বাড়ন্ত। ইহা পালি ও প্রাকৃত (বৃধ্ ধাতুর শতৃ-প্রত্যয়ান্ত) বড্ঢন্ত শব্দ হইতে হইয়াছে। বাড়ীর চাউল প্রভৃতি শেষ হইয়া যাওয়া অশুভ, তাই শেষ হওয়া না বলিয়া বঙ্গদেশে, বাড়িয়াছে বলে। যেমন বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া বিদেশে যাইবার সময় গুরুজনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাঁহারা এস বলেন, যাও বলেন না; এবং যিনি যাইতেছেন তিনিও আসি বলেন—এই আশয় যেন বাড়ী হইতে এই যাওয়াই শেষ যাওয়া না হয়, আবার যেন ফিরিয়া আসি।

উদ্বাস্তু করা। বাস্তু হইতে উচ্ছেদ করা, ঠিকই হইয়াছে। ইহার সহিত উদ্ ব্যস্ত শব্দের কোন যোগ নাই। উদ্বাস্তু খাঁটী সংস্কৃত। বাস্তু=বাসস্থান।

বাঁও। এই শব্দটি সংস্কৃত ব্যাম শব্দ হইতে হইয়াছে। দুই দিকে দুই হাত একবারে প্রসারিত করিলে এক হাতের মধ্যম-অঙ্গুলির প্রান্ত হইতে অপর হাতের মধ্যমাঙ্গুলির প্রান্ত পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম ব্যাম। "ব্যামো বাহ্বোঃ সকরয়োস্ততয়োস্তির্য্যগন্তরম্"—অমরকোষ ৬.৮৭। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে একজন পুরুষের পরিমাণ (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য) এক ব্যাম (=প্রায় ৩॥০ হাত)। জাহাজের খালাসিদের বাঁও কি পরিমাণ জানি না।

বিতী। ইহা ব্যতীত হইতে হইয়াছে।

বোল। মুকুল প্রাকৃতে মউল (হেম.৮.১.১০৭)। ইহা হইতে মোল। এইরূপ বকুল=বউল=বোল। মোল অর্থেও বোল বাঙলায় প্রসিদ্ধ আছে। শব্দের অর্থপরিবর্ত্তন নানা কারণে হয়। এ বিষয়ে কিছু বলিবার আবশ্যকতা মনে করি না। প্রাকৃতে কখন কখন ম=ব, যথা মন্মথ=বম্মহ (হেম ৮.১.২৪২)। এই-রূপেও মোল বোল হইতে পারে।

বিদায়। শব্দটা সংস্কৃতে হইতে পারে, কিন্তু প্রচলিত অর্থে আমিও কোথাও দেখি নাই। ব্যাকরণ-বিভীষিকাকার টিপ্পনীতে বলিতেছেন, দুই এক স্থলে প্রয়োগ আছে। মহানাটকের পঞ্চম অঙ্ক হইতে তিনি তুলিয়াছেন "লঙ্কা দগ্ধা ময়া দেবি বিদায়ো দীয়তামিতি।" বেঙ্কটেশ্বর যন্ত্রালয়ে (বোম্বাই) ছাপা পুস্তকে ষষ্ঠ অঙ্কে লঙ্কাদাহ আছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ উভয় অঙ্ক দেখিলাম, বচনটি পাইলাম না।

বাতি। বাখারী অর্থে মালদহে বত্তি শব্দও আছে, বাতা শব্দও আছে। সমস্তই বর্ত্তি (অথবা বর্ত্তি) হইতে হইয়াছে। আলোর বাতি ও ইহা হইতে।

বাচ্চা। ইহা বৎস শব্দের প্রাকৃত বচ্ছ হইতে হইয়াছে। শেষের আকার হইয়াছে অপভ্রংশ প্রাকৃতের নিয়মে, যেমন অলকা, তিলকা, ইত্যাদি। ব্যাকরণ-বিভীষিকার সমালোচনায় একথা বিশেষরূপে বলিয়াছি।

বাঁহিচা। মালদহে ধানের বৃদ্ধি দেওয়া নহে; কুটীদিগকে (যে স্ত্রীলোকেরা ধান লইয়া চাউল কুটিয়া দেয়) চাউল করিয়া দিবার জন্য যে ধান দেওয়া তাহাকেই এখানে (মালদহ) বাঁহিচা দেওয়া বলে। এই ধান এরূপ পরিমাণে দেওয়া হয়, যাহাতে কুটীরা তাহাদের পারিশ্রমিক তাহা দ্বারাই পাইতে পারে।

ভাউজ। মালদহের শব্দ, ভ্রাতৃজায়া হইতে। প্রাকৃতে পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ সাধারণত পিউ, মাউ, ভাউ; জায়া সংক্ষিপ্ত হইয়া জা (ব্যাকরণবিভীষিকা-সমালোচনায় এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে বলিয়াছি), তাহার পর অপভ্রংশ-প্রাকৃত-প্রভাবে আ=অ, যথা গঙ্গা=গাঙ্গ, বীণা=বীণ, ইত্যাদি।

মটকা। মালদহে ও মুর্শিদাবাদে ইহার অর্থ [illegible]

আছে, এখানে প্রস্তুত ও সুপ্রচলিত একপ্রকার মোটা রেশমী কাপড়কে মটকা বলে।

মহাস্ত। বস্তুত ইহা মহন্ত, মহাস্ত উচ্চারণও আছে। মোহ + অন্ত—এর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, তাই মোহাস্ত মূলত নহে, যদিও উচ্চারণে হইতে পারে—বাঙ্‌লার ধর্ম্মে। মহৎ শব্দের প্রথমার একবচনে প্রাকৃতে মহন্ত পদ হয়। মন্দিরাদির প্রভুত্ববিষয় মহন্ (শ্রেষ্ঠ) বলিয়া তাহাদের প্রভুকে মহন্ত বলা হয়।

মাঞ্জা। ইহা মার্জ্জন হইতে হইয়াছে। মার্জ্জন=মঞ্জন=মাঞ্জা। এইরূপ ক্রমপরিবর্ত্তনের কথা সবিস্তর ভাবে ব্যাকরণ-বিভীষিকা-সমালোচনায় বলিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আবার মার্জ্জন=মজ্জন=মাজন=মাজা পদও হয়।

মোতিয়াবিন্দু। মোতিয়া শব্দ সংস্কৃত মৌক্তিক প্রাকৃত মোত্তিঅ হইতে হইয়াছে।

মোচ। গোঁফ অর্থেও ত ইহা ব্যবহৃত হয়।

মধুকরী। ইহার অর্থ ভ্রমরী। বৈষ্ণবগণের মধুকরী নহে, মাধুকরী (বৃত্তি, জীবিকা)।

মানা। ফার্সী কেন? সংস্কৃত মাষক হইতে হইবার পক্ষে ত কোনো বাধা দেখিতেছি না।

মহক। মালদহে গন্ধ—অর্থে। হেমচন্দ্র প্রাকৃত ব্যাকরণে (৮. ৪. ৭৮) লিখিয়াছেন "প্রসরতের্গন্ধ-বিষয়ে মহমহ ইত্যাদেশো বা ভবতি।" অর্থাৎ গন্ধবিষয়ে প্র-পূর্ব্বক স্থ ধাতুর স্থানে বিকল্পে মহমহ-আদেশ হয়। যথা, মহমহই মালঈ। ইহার অর্থ মালতীগন্ধঃ প্রসরতি। এই গন্ধের প্রসারই মহক, ক্রমে কেবল গন্ধ অর্থে ইহা চলিয়াছে।

খোকা

খোকা শব্দ-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে কয়টি আলোচনা বাহির হইয়াছে, আমার নিকট তাহা কষ্টকল্পিত বোধ হয়। বৈদিক সাহিত্য হইতেই সংস্কৃতে শিশু বা নবপ্রসূত শিশু বুঝাইতে তোক শব্দ সুপ্রসিদ্ধ আছে (M. M. William's Sanskrit-English Dictionary)। সংস্কৃতের তকার বা থকার স্থানে পালি-প্রাকৃতে কোন-কোন স্থলে খকার দেখা যায়। স্তম্ভ=খম্ভ (সাধারণ নিয়মে পূর্ব্বে স-লোপ, তাহার পর ত=খ), স্থান=খান, স্থাণু=খাণু। এইরূপেই তোক=খোক, তাহার পর অপভ্রংশ-প্রাকৃত অথবা বাঙ্‌লার নিয়মে অ=আ হওয়ায় খোকা পদ হইয়াছে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

পুস্তক-পরিচয়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত—

শ্রীভবসিন্ধু দত্ত প্রণীত। মূল্য ১৸০ আনা। ২১০, ২১১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সুন্দর বাঁধানো সচিত্র গ্রন্থখানি হঠাৎ হাতে পড়ায়, হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া ইহাই পড়িতে লাগিলাম। ৪১২ পৃষ্ঠার বৃহৎ পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে একবারও থামিতে হয় নাই, পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত মনোযোগ গ্রন্থের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

এই গ্রন্থের মধ্যে যে অসাধারণ পুরুষের জীবনচরিত বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি যে এ যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার কঠোর তপস্যা, আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, বেদাদিশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান ও আশ্চর্য্য মানসিক শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। এক বিষয়ে বাঙ্গলা দেশে তাঁহার জীবনে যে বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়, এমন আর কাহারো জীবনে নহে। ভক্ত শাক্তগণ এবং প্রেমিক শ্রীচৈতন্য ভক্তির প্লাবনে বাঙ্গলা দেশকে এমন উর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছেন যে, এ দেশে বিস্তর কালীভক্ত ও কৃষ্ণভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর জীবনকে ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে-সকল ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া ওঙ্কারধ্বনিতে ভারতের আকাশ পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং "যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" এই মহাবাণী উচ্চারণ করিয়া পৃথিবীর নিকট অনন্তের উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন—তাঁহাদের উপযুক্ত প্রতিনিধি এক দেবেন্দ্রনাথ ব্যতীত বাঙ্গলা দেশে আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে উপনিষদের ঋষিদিগের সাধন ও বাণীর সঙ্গে তাঁহার সাধন ও বাণীর অতি আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভারতের আর্য্যগণ অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের সন্ধান পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন উপনিষদের ঋষি সাধনায় নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিলেন এবং বিশ্বাস ও ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

> "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
> আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
> তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
> নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায় ॥"

অর্থ—আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তির আর অন্য কোন উপায় নাই।

এই বাণী উচ্চারিত হইবার তিন সহস্র বৎসর পরে ভারতবর্ষের লোক প্রশ্ন করিতেছিলেন—নিরাকার ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়? অনন্তের ধ্যান কি সম্ভব? এই সময় বাঙ্গলা দেশের ধনকুবের প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র বিপুল সম্পদ ও সংসার পশ্চাতে রাখিয়া শুধু ব্রহ্মদর্শনের জন্যই ব্যাকুল হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেখানে দুই বৎসর তপস্যায় অতিবাহিত হইল। তাহার পর তিনি ঋষিত্ব লাভ করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগের মতই বিশ্বাসোজ্জ্বল হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন—

"নিদিধ্যাসন করিয়া এই ব্রহ্মযজ্ঞভূমি হিমালয় পর্ব্বত হইতে আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম। চর্ম্মচক্ষুতে নয়, কিন্তু জ্ঞানচক্ষুতে। বেদাহং এতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আমি এই তিমিরাতীত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।"

আমরা দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিতের ১৬৪ পৃষ্ঠা হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন, এইখানেই দেবেন্দ্রনাথের ঋষিত্ব এবং এইখানেই তাঁহাকে আমরা প্রাচীন ঋষির প্রতিনিধিরূপে প্রাপ্ত হইলাম।

দেবেন্দ্রনাথ ঋষিত্ব লাভ করিয়া আর যে দেশে ফিরিয়া আসিবেন, এ সংকল্প তাঁহার ছিল না। কিন্তু দুই বৎসরের তপস্যা দ্বারা যে সত্য লাভ করিলেন তাহা প্রচারের জন্য ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়াই তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হইল। ফিরিয়া আসিলেও তিনি বৎসরের পর বৎসর গিরিশৃঙ্গে, সিন্ধুতটে ও নদীবক্ষে বাস করিয়া ঈশ্বরের আনন্দময় স্বরূপের মধ্যেই ডুবিয়া থাকিতে লাগিলেন। হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায়, সাধকেরা সমাধিকেই সাধনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহর্ষি এই সময় সমাধিতে

নিমগ্ন হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকেই সম্ভোগ করিতেন। গ্রন্থকার বর্ত্তমান যুগের এই ঋষির জীবনচরিত প্রকাশিত করিয়া নিজেও ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদিগকেও কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের বিষয়টি অতীব চিত্তাকর্ষক ও বর্ণনা প্রাঞ্জল বলিয়া ভাষার প্রতি আর দৃষ্টি রাখিবার সুবিধা হয় না। অল্প কয়েকটি স্থান ব্যতীত আর কোথাও ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া ভাষা জটিল বা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই। তবে কয়েকটি জায়গায় একই বিষয় দুইবার বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই বর্ণিত বিষয়গুলি দুরূহ না হইয়া অত্যন্ত সহজ হওয়ায়, সকল শ্রেণীর পুরুষ ও রমণী ইহা পাঠ করিতে পারিবেন এবং পড়িয়া উপকার পাইবেন। সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই এই পুস্তকের সমাদর হওয়া উচিত।

এই জীবনচরিতখানি পড়া শেষ হইয়া গেলে, কোন কোন বিষয়ে ইহা একটুকু অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। লেখক মহর্ষির জীবনের কতকগুলি বিষয় ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি বিস্তর পরিশ্রম করিয়া মহর্ষির জীবনের অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন; গ্রন্থের মধ্যে সেই-সকল ঘটনার সমাবেশ হওয়ায় উহা আমাদের মনকে মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু লেখক সূক্ষ্ম চিন্তার দ্বারা ঐ-সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া সাহিত্য-শিল্পীর ন্যায় মহর্ষির জীবনের একএকটি দিকের একএকখানি ছবি আঁকিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতে পারিলে গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি হইত। এই জীবনচরিতের মধ্যে মহর্ষির শেষজীবনের সাধনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিগূঢ় কথা জানিবার জন্য পাঠকের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। কিন্তু লেখক সে বিষয়ে যতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হইবে না। এ সম্বন্ধে ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নানা কাগজে যাহা লিখিয়াছেন এবং তিনি যেসকল গল্প করেন, ঐসমস্ত অবলম্বন করিয়া লেখক একটি উৎকৃষ্ট অধ্যায় রচনা করিতে ও মহর্ষির শেষজীবনের প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু গ্রন্থের এইসকল ত্রুটি উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে লেখক মাঘোৎসবের মধ্যে বইখানি ছাপাইবার জন্য তাড়াতাড়ি সকল কার্য্য শেষ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া নানা কারণে গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। এজন্য লেখক পুস্তকের একটি পরিশিষ্ট লিখিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমাদিগকে আশা দিয়াছেন। আমরা অনুরোধ করি লেখক যেন ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মহর্ষির শেষজীবনের গভীর আধ্যাত্মিক ভাব খুব ভাল করিয়া ফুটাইতে চেষ্টা করেন।

নব্য ব্রাহ্মগণ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন ব্রাহ্মদিগকে ত্যাগ করিয়া আসার পর, কোন কোন লেখক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে অন্যায় রকমে আক্রমণ করিয়াছেন। ভবসিন্ধু বাবু তাহার পাল্টা জবাব গাহিবার জন্য ঐসকল লেখকদিগকে যে আক্রমণ করেন নাই, ইহাতে গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। তবে তিনি যে নব্য ব্রাহ্মদিগের প্রতি সর্ব্বত্র সুবিচার করিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়" শীর্ষক একটি আত্মচরিত মুদ্রিত করিয়াছিলেন। উহা এখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিক্রী করা হয়। লেখক কি সেই সুন্দর বইটুকু পড়িয়া দেখিয়াছেন? যদি গোস্বামী মহাশয়ের কথা সত্য বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, লেখক উপবীতধারী ও উপবীতত্যাগী উপাচার্য্য সম্বন্ধীয় বিষয়টি লিখিতে গিয়া কিছু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লেখক গোস্বামী মহাশয়ের রচিত আত্মকাহিনীটি পড়িলেই আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

লেখক "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ" শীর্ষক অধ্যায়ের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"এইপ্রকার শ্রুত হওয়া যায় যে কেহ কেহ এমন অধীর হইয়াছিলেন যে শীঘ্র শীঘ্র মন্দির হইতে তিনি চলিয়া না গেলে তাঁহারা প্রহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।" "এই প্রকার শ্রুত হওয়া যায়" এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়া নব্য ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে ঐরকম অপবাদ প্রচার করা উচিত কি না, তাহা লেখকই একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

আমরা আশা করি, অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের বইগুলি বিক্রী হইবে এবং গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণের সময় দোষ ত্রুটি সংশোধন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া পুস্তকখানি পাঠকের হস্তে অর্পণ করিতে পারিবেন।

পুস্তকখানির মূল্য, বাঁধান ১৷৷০, কাগজের মলাট ১।০।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

সম্পাদকীয় মন্তব্য—ভবসিন্ধুবাবু মহর্ষিদেবের যে জীবনী লিখিয়াছেন, তার মধ্যে একটি গল্প আছে যে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো ঘর ভাঙচুর করাতে মহর্ষিদেব প্রথমে রবি বাবুকে ভর্ৎসনা করেন এবং পরে তাঁহার কৃতকর্ম্ম পুনরায় পূর্ব্ববৎ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বাস করিবার জন্য একটি নূতন বাড়ী দেন। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে রবিবাবুর নূতন বাড়ীর ভিত্তি এই ঘটনার ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তাহার প্রধান কারণ রবিবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো কিছুই ভাঙেন নাই; যা-কিছু ক্ষণভঙ্গুর তা তিনি নিজেই একরকম ভাঙিয়া শেষ করিয়া গিয়াছিলেন, উত্তরবংশীয়ের জন্য অপেক্ষা করেন নাই। অতএব গল্পটির মধ্যে এইটুকুই সত্য যে মহর্ষিদেব রবিবাবুকে বাসের জন্য একটা নূতন বাড়ী দিয়াছিলেন।

মধুকূপা বা জীবনযজ্ঞ—৺কুঞ্জলাল গুপ্ত রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক ও রাজসাহী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং ১৫ কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা। ড: ক্র: ২৬৩ পৃষ্ঠা বাঁধানো—মূল্য দেড় টাকা। সকল সত্ব সংরক্ষিত। ১৩১৯।

বইটি উপাদেয়। স্বর্গীয় সাধক কুঞ্জলাল গুপ্ত সরল প্রাণে তাঁহার সাধনার ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। তাঁহার সাধনপথের প্রবর্ত্তক মধু ইতর জাতীয় লোক। তাহার বাটী কুঞ্জলালদের গ্রামেই ছিল। লোকে তাহাকে পাগল বলিয়াই জানিত। সে যেখানে সেখানে থাকিত—যার-তার ঘরে খাইত। সে অত্যন্ত মিতভাষী ছিল, যে দু চারিটি কথা সে বলিত তাহাও হেঁয়ালীর মত বোধ হইত, সকলে সহজে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিত না। মধু সম্বন্ধে কুঞ্জলাল বলিয়াছেন—"মধু কেন পাগল তাহা কেহ জানে না। ভারতে যে এমন কত পাগল বনের ফুলের মত আপনি ফুটিয়া আপনি ঝরিয়া যায় তা কে বলিতে পারে?" বইটির গোড়ায় কুঞ্জলাল তাঁহার পিতামহের এবং পিতার পরিচয় ও তাঁহার বাল্যকালে তাঁহার জন্মস্থানের সেই-সময়কার একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। পুস্তকখানি সুন্দর হইলেও সম্পাদনের দোষে যায়গায়-যায়গায় কতকগুলি ভাষাগত ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

কেদার রায়—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। নবাবপুর আলবার্ট লাইব্রেরী হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩২১। মূল্য দেড় টাকা। বইটিতে চিত্র ও মানচিত্র আছে।

গ্রন্থকার কেদার রায় সম্বন্ধে কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং উপক্রমণিকায় বারভুঞাদের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থকার দেখাইতে চান যে মনুসংহিতাতে যে বারো জন মণ্ডলের উল্লেখ আছে তাহাদের সহিত বাংলার বারো ভুঞার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু মনুসংহিতার দ্বাদশ মণ্ডলের সহিত বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের যে কোনো সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা মনে হয় না। (Father Horten) ফাদার হার্টেন বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে বারো ভুঞাদের সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভৌমিকদের দ্বাদশ সংখ্যা কখনো নির্দ্দিষ্ট ছিল কি না সন্দেহ আছে। গ্রন্থকার প্রতাপাদিত্যের সহিত কেদার রায়ের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন ও কেদার রায়কে প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা উচ্চে স্থান দিয়াছেন। এই সমালোচনা-কালে গ্রন্থকার ইতিহাস লিখিতে গিয়া যেরূপ বিচার-বিবেচনা-শূন্য হইয়া নিজের মত প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে যে-কোনো প্রচলিত বা অপ্রচলিত কিংবদন্তী বা কুৎসার অবাধ-ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নিতান্তই অনৈতিহাসিকের মত হইয়াছে। ইতিহাস লিখিতে গেলে বোধ হয় আরো কিছু পরিমাণে সংযত ও বিচার এবং যুক্তির অধীন থাকা আবশ্যক।

বল্লাল সেন—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত ৯১ বেনেপুকুর রোড হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ১৩২১। মূল্য একটাকা।

বইখানি নাটক। ছাপা কাগজ ভালো নয়। গ্রন্থকার কৈফিয়তে বলিয়াছেন—"আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিত আমার নাটকের ভিত্তিস্বরূপ। তিনি তাঁহার গ্রন্থে বল্লালচরিত্র যেরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন আমি তৎ-সমস্তই যথাযথ ভাবে আমার নাটকে নিবিষ্ট করিয়াছি।" নাট্যকার কি উদ্দেশ্যে বইটি লিখিয়াছেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিত্রের চিত্রই যদি তিনি বাঙালী পাঠকদিগকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহার একখানি বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য ভালোরূপে সিদ্ধ হইত—এবং নিরপরাধ পাঠকগণও তাঁহার নীরস নাটকের আড়ষ্টতা, অস্বাভাবিকতা এবং পাত্র-পাত্রীদের রসিকতার পাকামির ভিতর হইতে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করিবার শাস্তির হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতেন।

মহাভারতীয় নীতিকথা—২য় খণ্ড। শ্রীরাজেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল প্রণীত। ৯১-২ মেছুয়াবাজারে নববিভাকর প্রেস হইতে, জি, সি, নিয়োগীর দ্বারা প্রকাশিত। ১৩২১। মূল্য বারো আনা।

পুস্তকখানি আগাগোড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত Styleএ সযত্নে লেখা, সুতরাং ধৈর্য্য ধরিয়া পড়া কঠিন। বিশেষত্ব কিছুই নাই। অধিকাংশ স্থলেই মহাভারতের ঘটনাগুলি অবিকল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই যায়গায় গ্রন্থকার কবিতা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সেটা না করিলে কিছুমাত্র ক্ষতি ছিল না।

শ্রীনী।

স্বর্গ

স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই ?
তার ঠিক ঠিকানা নাই !
আরম্ভ নাই, নাইরে তাহার শেষ,
নাইরে তাহার দেশ,
নাইরে তাহার দিশা,
নাইরে দিবস, নাইরে তাহার নিশা।

ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুষ।
কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলা-মাটির মানুষ !
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
ভয়ে-কাঁপা আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে ;
আমার জন্ম-মৃত্যুরি তরঙ্গে
নিত্য নবীন রঙের ছটায় খেলায় সে যে রঙ্গে ;
আমার গানে স্বর্গ আজি
ওঠে বাজি,
আমার প্রাণে ঠিকানা তার পায়,
আকাশভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়।
দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ বাজ্‌ল যে তাই শঙ্খ,
সপ্ত সাগর বাজায় বিজয়-ডঙ্ক ;
তাই ফুটেছে ফুল,
বনের পাতায় ঝরনা-ধারায় তাইরে হুলুস্থূল !
স্বর্গ আমায় জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২০ মাঘ শিলাইদা।

দেশের কথা

'মানসী'-পত্রিকার অভিযোগের উত্তরে পাবনার 'সুরাজ' মফঃস্বলস্থ "সংবাদপত্রের দুর্দ্দশা"র একটি করুণ চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। দেশের কথার আলোচনা-

প্রসঙ্গে গতবারে আমরা সংবাদপত্রের প্রধান কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তাহার সহিত 'সুরাজে'র এই আক্ষেপোক্তির কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে। দেশের কথার আলোচনায় অধিকতর শক্তি নিয়োগ করিলে মফঃস্বলস্থ সংবাদপত্রের কি দুর্দ্দশা ঘটে, স্বীয় জীবনের বাস্তবদৃষ্টান্তে 'সুরাজ' তাহা প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে—

"পত্রিকার যাবতীয় স্তম্ভ জেলার সংবাদে, জেলার অভাব-অভিযোগে, মুক পল্লীবাসীর করুণ আবেদনে ও স্থানীয় আবশ্যকীয় সংবাদে পূর্ণ করিলে ইহা চলিতে পারে কিনা তাহাতে আমরা গুরুতর সন্দেহ করিতেছি। প্রমাণস্বরূপ আমাদের হাতে গ্রাহকবর্গের লিখিত যে-সমুদয় পত্র আছে তাহাদের মধ্যে ২।১ খানি এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

প্রথম পত্র।

ম্যানেজার সুরাজ।

মহাশয়! একবৎসর আপনাদের পত্রিকা লইলাম। ইহাতে কেবল পাবনা জেলারই কথা থাকে। বিলাতের জার্ম্মানীর কোন কথাই থাকে না। দুই টাকা মূল্য দিলে কলিকাতার ...পত্রে কত সংবাদ, কত গল্প জানা যায়। সুতরাং আমি আর গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করি না।

দ্বিতীয় পত্র।

মহাশয়! গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র ও 'সুরাজ' পাঠাইয়াছেন। ইহাতে যুদ্ধের সংবাদ জানা যায় না; কেবল পাবনা জেলার রাস্তাঘাটেরই কথা, আর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কথা। আমার নাম গ্রাহক-লিষ্টে লিখিবেন না।

পল্লীগ্রামের কোন এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক স্বর্গীয় কিশোরীমোহন রায়ের সহিত গল্প-প্রসঙ্গে যে একটি কথা বলিয়াছিলেন, কিশোরী বাবু কৌতুহল-বশে তাহা এক টুকরা কাগজে লিখিয়া ম্যানেজারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কথাটি বড়ই সুন্দর।

"কিশোরী বাবু! আপনার কাগজখানা কি রকম করলেন? কেবল ওখানে জল নাই, ওখানে রাস্তা নাই—এই কথাই ঘ্যানর ঘ্যানর করেন। আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, বিলাতের ভাল ভাল গল্পগুলি ছাপাইলেও আমরা গ্রাহক হইতে পারি।"

এই তিনখানি পত্র হইতে দেশের রুচি ও মতিগতি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা অতি সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

*　　*　　*　　*

অন্য দেশে সংবাদপত্রসমূহ জনমত গঠন করিয়া থাকে, আমাদের দেশে জনসাধারণ সংবাদপত্রের মত গঠন করেন। কারণ 'তা না হ'লে কাগজ বিকায় না।'

*　　*　　*　　*

স্থূলকথা এই যে, দেশের কথা শুনিতে ও শুনাইতে হৃদয়ে যে-পরিমাণ স্বদেশপ্রীতির আবশ্যক, আমরা এখনও তাহা হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি। দেশীয় সংবাদপত্রে দুই দশটা কথা লিখিয়া বা পড়িয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, তাস, দাবা, পাশা ইত্যাদির ক্রীড়ায় সময়-ক্ষেপণ যাঁহারা শ্রেয়ঃ মনে করেন, বাঙ্গালা দেশে এরূপ নায়েব, গোমস্তা, উকীল, মোক্তার প্রভৃতির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।"

কথাটা সত্য, সন্দেহ নাই; এবং এই সত্যের মধ্যে আমরা আমাদের জাতীয়দুর্দ্দশার যে অংশ দেখিতে পাই, শস্যহানি, স্বাস্থ্যনাশ প্রভৃতি আধিদৈবিক সর্ব্বনাশের সহিত তাহা তুল্যপ্রতিষ্ঠিত। জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত চিন্তাস্রোত বিশ্বমানবের চিন্তা-সাগরে মিলিত হইতে চায় বটে; কিন্তু যেস্থলে তাহা ফল্গুর মত আত্মগুপ্ত, সেস্থলে তাহাকে প্রকটিত করিয়া স্নান-তর্পণোপযোগী তীর্থসলিল করিয়া দেওয়া পাণ্ডারই কার্য্য। সে পাণ্ডা—দেশীয় সংবাদপত্র। তীর্থযাত্রীদের সম্পর্কে তীর্থপাণ্ডাদের পরস্পরের মধ্যে যে ভাব ও যে রীতি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের মধ্যেও সেইরূপ নিয়মপদ্ধতির প্রচলন তাহাদের গতি-বিধি নির্দ্ধারণের সহায় হইতে পারে। এক্ষেত্রেও আমরা 'সুরাজে'রই প্রস্তাবে সায় দিয়া বলিতেছি—

"বাঙ্গালা দেশের সকল সহর হইতেই এক বা ততোধিক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের স্কন্ধে যে গুরুতর কর্ত্তব্যপালনের ভার আছে, অনেকেই তাহা ব্যক্তিগতভাবে অতি সুন্দররূপে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইসমস্ত সম্পাদকগণের মধ্যে আলাপ-পরিচয় ও উদ্দেশ্যের একতা না থাকাতে তাঁহাদের সমবেত শক্তি দেশের উপকার-কল্পে নিয়োজিত হইতেছে না। সম্পাদকগণ যেন স্ব স্ব সংবাদপত্রকে নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে ব্যবহার না করেন। আজকাল দেশের এমন এক অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দেশের উন্নতিকল্পে সম্পাদক-মণ্ডলীর সমবেত সমগ্র-শক্তি নিয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

সম্পাদক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত প্রভাব কেন্দ্রীভূত করিয়া তদ্দ্বারা দেশের উপকারসাধন করিতে হইলে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বৎসর বৎসর সমস্ত সম্পাদকের একত্র সমাবেশ ও পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও যুক্তি-পরামর্শের নিতান্ত প্রয়োজন।"

কিন্তু এইরূপ একটি সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠিত হইলে, সংবাদপত্র-সমূহ যাহাতে নির্ভয়ে দেশের কথা আলোচনায় অধিকতর মনোনিবেশ করিতে পারেন সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

বস্তুতঃ দেশ চায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর সহরে বসিয়া দেওয়া শক্ত। দেশের আত্মা, উপকথার ডালিমকুমারের প্রাণেরই ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। সে স্থান—পল্লীগ্রাম। আমরা দেশ-সংস্কার করিতে চাই, কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া দেশ, সেই পল্লীবাসীদের খবর কয়জনে রাখি? 'বঙ্গীয় অবনতজাতির উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি'র

সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পল্লীবাসীদের বর্ত্তমান অবস্থার একটি চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা 'ঢাকাপ্রকাশ' হইতে উহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া সহরবাসীগণকে পল্লীজীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

"ময়মনসিংহ-জেলার অন্তর্গত দীঘিরপাড় গ্রামে বহুসংখ্যক মুচীর বাস। দীঘিরপাড়ে অন্নকষ্টের সংবাদ পাইয়া আমাদের সমিতির প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত শিশুরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়কে সেখানে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি যাহা জানাইয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

* * * *

'শুনিলাম এই মুচী-পল্লীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মুচীর বাস। ইহাদের সকলেরই ব্যবসায় মৃত জন্তুর চামড়া সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করা। এই সাড়ে তিন হাজার লোকের মধ্যে মাত্র সাত আট ঘর গৃহস্থের সামান্য কিছু (দুই তিন বিঘা) চাষের জমি আছে। এতদ্ভিন্ন আর কাহারও বাসগৃহ-পরিমাণ জমি ছাড়া আর কোন জমি নাই। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধহেতু কাচা চামড়ার রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় ইহাদের সংগৃহীত চামড়া বিক্রয় না হওয়াতে ইহাদের মধ্যে ভীষণ অন্নকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগ হইতেই ইহাদের মধ্যে প্রবল অন্নকষ্ট দেখা গিয়াছে। এখানে আমাদের সমিতির প্রতিষ্ঠিত একটি অবৈতনিক প্রাইমারী পাঠশালা আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশের উপর ছিল। অন্নাভাবে ছাত্রসংখ্যা একেবারে কমিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে কিরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহা গত ২২শে অক্টোবর তারিখের স্কুল-সবইনস্পেক্টর মহাশয়ের পরিদর্শন-মন্তব্য পাঠে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি লিখিয়াছেন:—

"অদ্য সাহাপুর ঋষিপাড়া স্কুল পরিদর্শন করিলাম। বর্ত্তমান সময়ে ৩৪টি বালক এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতেছে, ইহাদের মধ্যে ২৩ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল। অধিকাংশ বালক উপবাসী, ইহাদিগকে পরীক্ষা করা গেল না।

(স্বাক্ষর) আবদুল হাকিম্,
স্কুল-সব্-ইনস্পেক্টর, বাজিতপুর।"

শুনিলাম সব্-ইনস্পেক্টর সাহেব ইহাদের অবস্থা দেখিয়া এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তখনই নিজ হইতে একটি টাকা দিয়া চাউল-দাউল খরিদ ও পাক করাইয়া তদ্দারা উপবাসী ছাত্রদিগকে আহার করাইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ জমির ধান কাটিয়া নেওয়ার পর যে ধান জমিতে পড়িয়া থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া কোনরূপে জীবনরক্ষা করিতেছে। কয়েকটি লোক অপরের ক্ষেতের ধান কাটিয়া দিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। বলা বাহুল্য, অতি অল্প লোকেরই এই কর্ম্ম জুটিতেছে। যেসমস্ত পরিবারে অন্নকষ্ট অত্যন্ত অধিক, সেইসকল পরিবারের সমস্ত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা ভোরবেলায় একখানা ডালাসহ বাহির হইয়া সমস্ত দিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া যাহা পায় তাহা লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিয়া আসে। এই প্রকারে এক এক পরিবার রোজ /৩ সের হইতে /৮ সের পর্য্যন্ত ধান সংগ্রহ করিতে পারে।

এই উপায়ে এই লোকগুলি আরও ১০।১৫ দিন কোনরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকিতে পারিবে; ঐ সময়ের মধ্যে সমস্ত জমির ধানকাটা শেষ হইয়া যাইবে। তারপর উহারা সম্পূর্ণ নিরুপায়। আর ১৫।২০ দিন পরে ইহাদের মধ্যে সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিতে হইবে, নচেৎ অন্নাভাবে ইহাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা যাহা হইবে, তাহা ভাবিতেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। দেখিলাম, ইহাদের মধ্যে এখনই এমন স্ত্রীপুরুষ অনেক আছে, যাহারা বহু-শেলাই-ও-গ্রন্থিযুক্ত ছিন্নবসন পরিয়া কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। এই দারুণ শীতে ইহাদের যে কি অবস্থা হইতেছে ও হইবে তাহা ভাবিবার বিষয় —ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। ইহাদিগকে কিছু পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

আমার বিশ্বাস, ইহাদের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় নয়শত লোককে দীর্ঘকাল সাহায্য করিতে হইবে। প্রত্যেককে দৈনিক একবেলার আহারোপযোগী দেড়পোয়া হিসাবে চাউল দিলে প্রত্যহ আট মণ চাউল (৪০৲) টাকার দরকার।"

হেমেন্দ্রবাবুর চিঠিতে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের রিপোর্ট হইতে যে অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সেবাশ্রমের রিপোর্টার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ নাগ, বি এল্, মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমাদের দীঘিরপাড় পৌঁছিবার পূর্ব্বে ২৭টি কলেরা রোগীর মধ্যে ২৩টি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমরা যাইয়া ৩৪টিকে শয্যাগত পাই। আমাদের যাইবার পর ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আরো ২২টি লোক রোগাক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে ৮টি মারা গিয়াছে, সুতরাং ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৩১টি মুচি কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে যে ৫৬টি রোগীর চিকিৎসা করিতে হইয়াছে তন্মধ্যে ১টি এখন পর্য্যন্ত চিকিৎসাধীন, ৮টি মৃত এবং ৪৭টি আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ফল সন্তোষজনক। কিন্তু এখনও অনেক কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে। মুচিদিগের কঠোর দরিদ্রতা দূর করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ফল স্থায়ী হইবে না। আমার মতে দরিদ্রতাই মুচিপল্লীতে কলেরার আক্রমণের কারণ। যাহারা নিয়মিতরূপে ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে পারে নাই ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য আহার করিয়াছে, প্রধানতঃ তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

* * * *

প্রায় ৮ শত বালকবালিকা ও স্ত্রীপুরুষের জীবিকানির্ব্বাহের কোনই উপায় নাই।"

পল্লীবাসী মুচিদের দুর্দ্দশার এই চিত্র উপস্থিত করিয়া হেমেন্দ্রবাবু উপসংহারে বলিয়াছেন—

"কিন্তু শুধু ওলাউঠার হাত হইতে মুচিদিগকে রক্ষা করিলে কি হইবে? অন্নাভাব দূর না করিলে মৃত্যু অন্য আকারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। আমরা প্রতিদিন কাহাকেও কিছু পয়সা, কাহাকেও কিছু চাউল দিয়া কোনরূপে উপবাস হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু অন্ততঃ আটশত লোককে দৈনিক একবেলা আহারোপযোগী দেড়পোয়া হিসাবে চাউল দিলেও প্রতিদিন এজন্য ৪০৲ টাকার আবশ্যক। দারুণ কলেরার আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করিবার পর রোগীর জঠরানল যখন তীব্রভাবে

জ্বলিয়া উঠে, তখন ডাক্তার তাহার অন্নপথ্য ব্যবস্থা করিলে রোগী যখন বলিয়া উঠে, 'ভাত ! বাবু, ভাত কোথায় পাইব ? ঘরে যে কাচ্চাবাচ্চা উপবাসী !'—তখন অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। দেশের দানশীল নরনারীর নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা, ভগবানের এই দুঃখী সন্তানদের প্রতি সকলে কৃপা করুন।"

পল্লীবাসী দরিদ্রের এই অবস্থা শুধু দীঘিরপাড় গ্রামেই আবদ্ধ নহে। বঙ্গপল্লীর যেস্থলে যাও সেই স্থলেই এইরূপ দুর্দ্দশার কঙ্কাল-চিত্র দেখিতে পাইবে। মৈমনসিংহের 'ইস্‌লাম-রবি', পাবনার 'সুরাজ' প্রভৃতি পত্রিকা এই চিত্রেরই দৃষ্টান্তর দেখাইয়া বলিতেছেন—

"ধান-চাউলের বাজার ক্রমশঃ আগুন হইতেছে। তরিতরকারীও দুর্ম্মূল্য। বৈদেশিক দ্রব্যগুলিতে হাত দেয় কাহার সাধ্য। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেশবাসী উৎকণ্ঠিত ও আকুল। অনেক স্থলে অনাহারে পল্লীবাসী কঙ্কাল-দেহ। ম্যালেরিয়ার তেজবল আজও হীন হয় নাই। তারপর আবার অনেক স্থান হইতে কলেরার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আর এই বর্ত্তমান বৎসরের ধাক্কা। বারিপাতাভাবে রবিশস্যের দফা রফা। কল্পনাপ্রিয় কবি ! একবার মাঠের দিকে দৃষ্টিপাত কর, পূর্ব্বের ন্যায় হরিদ্বর্ণের শস্যক্ষেত্রে প্রকৃতি দেবীকে সজ্জিতা দেখিবে না। দেখিবে, সূর্য্যের প্রচণ্ডতাপে চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে। ভগবান জানেন দেশের অবস্থা কি হইবে।"

এই সময়ে যাঁহার যেটুকু শক্তি তাঁহার তাহাই লইয়া পল্লীবাসীদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া উচিত। দীঘিরপাড় মুচিদের সাহায্যার্থ ইতিমধ্যে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ ৫০৲ ও কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৫৲ প্রেরণ করিয়াছেন এবং ক্ষুদ্রদান প্রায় ২০৲ সংগৃহীত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, এম-এ, এম-বি, মহাশয় ১০০৲ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং প্রতি সপ্তাহে একশত টাকা করিয়া সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। হিন্দুস্থান জীবনবীমা কোম্পানী ৫০৲ সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। একজন মহিলা তাঁহার হাতের চুড়ি ও অপর এক মহিলা আংটি দিয়াছেন। মিঃ আর দাস ২০০৲ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ১০০৲ ইতিমধ্যেই প্রদান করিয়াছেন ! পল্লীবাসীর দুর্দ্দশামোচনের পক্ষে এইরূপ দান যৎসামান্য হইলেও, ইহার আদর্শ সকলেরই অনুসরণীয় এবং এই আদর্শ লইয়া সকলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এই যৎসামান্য দানেরই সমবায় আশানুরূপ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবে। 'ইসলাম-রবি'র মতে এ সময়ে—

"উদার গবর্ণমেণ্ট মোটাহাতে কৃষি-লোনের ব্যবস্থা করুন। গ্রামে গ্রামে কো-অপারেটীভ ক্রেডিট্ সোসাইটীর গ্রাম্য-ভাণ্ডার খোলা হউক।"

এ মত অনেকাংশে সমীচীন, বটে; কিন্তু শুধু কৃষি-লোন বা ক্রেডিট্ সোসাইটীর উপর নির্ভর না করিয়া দেশের ধনীসম্প্রদায়কেও কার্য্যক্ষেত্রে নামাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে দেশনায়কগণ একটু যত্নপর হইলে সহজে কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স ও ফেট লইয়াই ব্যস্ত ! 'যশোহর' সত্যই বলিয়াছেন—

"ভারতবর্ষ এখন রাজনৈতিক আন্দোলনপ্রয়াসী, কংগ্রেস-কনফারেন্সের অভিলাষী, কিন্তু একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, রাজনৈতিক অধিকার লাভের আন্দোলন যাহার উপর নির্ভর করিবে সেই উদরান্নেরই অভাব।

* * * *

এস হে দেশনায়কগণ, তোমরা এস, যেখানে পল্লীভবনে দরিদ্রের হাহাকার উঠিয়াছে, যেখানে রোগে ঔষধ মিলেনা, যেখানে শত অত্যাচার অবিচার চলিতেছে, যেখানে প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল নিপীড়িত হইতেছে, সেখানে এস, তোমাদের শত বর্ষের কংগ্রেসের শক্তি পাইবে; দু-বৎসরে দেশে নূতন প্রাণ জাগিয়া উঠিবে।"

যাঁহাদের শক্তি আছে, জীবনে-মরণে, শোকে-উৎসবে এই সময়ে তাঁহারা কি ভাবে দেশের কাজ করিতে পারেন নিম্নোদ্ধৃত ঘটনাবলীই তাহার প্রমাণ। 'বরিশাল-হিতৈষী'তে প্রকাশ—

"ডাক্তার সতীশচন্দ্র দাস, এল্-এম্-এস্ মহাশয়ের পিতৃদেব ৺কালীপ্রসন্ন দাস মহাশয়ের মৃত্যু-তিথিতে প্রায় ৫০০ শত কাঙ্গালীকে দান করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভিক্ষুককে একসের চাউল, কমলা ও তিলুয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্ধ-আতুরদিগকে কম্বল ও কাপড় প্রদত্ত হইয়াছে।"

'ঢাকাগেজেট' লিখিয়াছেন—

"পরলোকগত বাবু হরিমোহন দাস মহাশয়ের উইলের বিধান অনুসারে, উইলের এক্সিকিউটার (অছি) দিগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় প্রতিবৎসরই শীতকালে দরিদ্রদিগের মধ্যে ২৫০ কম্বল বিতরণ করিয়া থাকেন। এ বৎসর, গত ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী, সেই কম্বল-বিতরণ-কার্য্য সমাধা হইয়াছে।"

ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারাও এক্ষেত্রে কিরূপ কার্য্য হইতে পারে, ঢাকা ও ত্রিপুরার ছাত্রসম্প্রদায় তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 'ঢাকাপ্রকাশ' স্থানীয় সরস্বতীপূজার আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"আমরা রাজচন্দ্র হিন্দু-হোষ্টেলের ছাত্রবর্গের একটা সদৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সংবাদ-পত্রে দিঘীরপাড় মুচীপল্লীর অন্নকষ্টের কথা শুনিয়া, পূজার দিনে তাহাদের শিশুহৃদয়েও একটু চাঞ্চল্য জন্মে। তাহারা জলযোগের খরচ কমাইয়া, পূজা-তহবিলের ২৫টি টাকা দিঘীরপাড় মুচীপল্লীর সাহায্যে পাঠাইয়া দিয়াছে—পূজার পবিত্র দিনে তাহারা 'দরিদ্র নারায়ণ' সেবার মহাব্রতে দীক্ষালাভ করিয়াছে। আমরা ভরসা করি, ইহাদের সদৃষ্টান্ত ক্রমে ক্রমে অন্যত্রও অনুসৃত হইবে।"

'ত্রিপুরা-হিতৈষী'তে প্রকাশ—

"শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে স্থানীয় প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ৮ বাক্‌দেবীর অর্চনা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সংগৃহীত অর্থে কোনরূপ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা না করিয়া দীন-দুঃখীকে কাপড়, চাউল ও পয়সা বিতরণ করিয়াছে। ছাত্রদের এই মহানুভবতা ব্যক্তিমাত্রের ও সম্প্রদায়-বিশেষেরই অনুকরণযোগ্য।"

প্রত্যুতঃ দেশের প্রতি মায়া থাকিলে পূজাঅর্চনা, ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেই দেশের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেও, অন্নসংস্থানই এদেশের একমাত্র প্রয়োজন নহে। জাতীয় দুর্দ্দশার যে-সকল কারণ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে দেশের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে তাহার যে-কোনটি যে-কোন প্রকারে উৎপাটিত করিতে যিনি শক্তিদান করিবেন তিনিই দেশহিতৈষীরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। সুখের বিষয়, দেশহিতৈষণার বিভিন্ন অংশে দিন দিন এরূপ কতিপয় কর্ম্মীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। 'কাশীপুরনিবাসী', 'সুরাজ', 'নীহার' ও 'প্রতিকার' ইঁহাদের বর্ত্তমান কার্য্যের পরিচয়প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত বাগবাটী গ্রামে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তত্রত্য একদল যুবক গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।"—(কাশীপুরনিবাসী)

"করমজা গ্রামে কয়েকজন উৎসাহী যুবক আছেন। তাঁহারা মুষ্টিভিক্ষাবিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা গ্রামের মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ রাস্তা বাঁধিয়াছেন।"—(সুরাজ)

বিদ্যালয়সমূহের ইন্‌স্পেক্টার শ্রীহট্টের সুসন্তান মৌলবী আবদুল করিম, বি,-এ, তাঁহার সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন ৫০ সহস্র মুদ্রা তাঁহার জাতি ও সমাজের শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে প্রদান করিয়াছেন।"

—(সুরাজ)

"ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের ঠাকুর প্রতাপনারায়ণ দেব বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের যেসকল ছাত্র সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় পাণিনিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদের প্রথম ছাত্রকে ২০০৲ টাকা মূল্যের সুবর্ণ কেয়ূর ও ১০০৲ টাকা মূল্যের সুবর্ণ পদক দিবার জন্য ৯৫০০ টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ প্রদান করিয়াছেন।"—(নীহার)

"মালদহ-চাঁচলের রাজা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় বাহাদুর বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের উন্নতির জন্য দুই হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এই অর্থের দ্বারা উক্ত আশ্রমের কুষ্ঠ-রোগ-গ্রস্ত পিতা-মাতার কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত বালক বালিকাগণকে পৃথক রাখিবার জন্য একটি পৃথক আশ্রম নির্ম্মিত হইবে।"—(প্রতিকার)

উল্লিখিত সৎকার্য্যসমূহের সঙ্গে 'চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ' পঞ্চনদের যে বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাও জনসাধারণের সম্মুখে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যোগ্য। ঐ পত্রিকায় প্রকাশ—

"লাহোরে দয়ানন্দ কলেজের স্কুল বিভাগ এই নিয়ম করিয়াছেন যে, বিবাহিত বালককে ভর্ত্তি করা হইবে না। যদি কোন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়া বিবাহ করে, তবে তাহারও নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে।"

শ্রীহট্টের লোক্যালবোর্ড কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গো-প্রদর্শনী, মহীশূর কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী, ফেণীর পাগলা মিঞার মেলার অন্তর্গত কৃষিশিল্প ও পশুপ্রদর্শনী প্রভৃতি সাময়িক অনুষ্ঠানাবলীও বিভিন্নক্ষেত্রে এইরূপ জাতীয় উন্নতির পরিপোষক।

জাতীয় মঙ্গল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে বুদ্ধি, ইচ্ছা, শক্তি ও অর্থ খাটাইবার ক্ষেত্র দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আকারে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের মতভেদ, সমাজ বা ধর্ম্মসাধনার গণ্ডী দেশের হিতাভিলাষী শক্তিপুঞ্জকে যাহাতে বিচ্ছিন্ন করিয়া না দিতে পারে তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। মানুষের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইলে সংস্কার, মত, আচার, আচরণ প্রভৃতি ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি, সমুদ্রবক্ষে নদীর ন্যায়, জাতীয় উন্নতির মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া এক উদার অসীম মহাভারতের সূচনা আনয়ন করিবে। আমরা 'ত্রিপুরা-হিতৈষী'র কথায়ই তাই বলি—

"কর্ম্মের আহ্বানে মানুষ যখন আকুল হইয়া তদুদ্দেশ্যে ধাবিত হয় তখন কে কাহাকে স্পর্শ করিল, কে কোন অনাচার করিল তাহা ভাবিবার সময় থাকে না। কিন্তু যখন অলস বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দিন যাপন করিতে হয় তখনই এইসকল ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর অধিক মূল্য স্থাপন করিয়া সেইসকল ব্যাপারকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মানুষ মনে করে।

* * * *

এখন আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন কেবল মতামত নিয়াই দলাদলির সৃষ্টি হয় কোন স্বাধীন দেশে তেমন হয় না। কারণ তাহাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য-ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। যদি মতামত

নিয়াই তাহারা ব্যস্ত থাকে তবে কর্ম্ম করিবার অবসর কোথায়? তাই কর্ম্মের আহ্বানে তাহাদের মতভেদ সত্ত্বেও একযোগে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন সাধারণ স্বার্থের নিকট মতভেদ পরাস্ত হইয়া যায়। আমাদের নিমিত্ত যদি সাধারণ ধর্ম্মক্ষেত্র বা কর্ম্মক্ষেত্র তৈয়ারী হয় তখন দেখিতে পাইব জাতিগত, সম্প্রদায়গত ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রীয় সকল ভেদাভেদ দূরীভূত হইয়া যাইবে।"

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক মাসে প্রশ্ন মুদ্রিত করিব; প্রবাসীর সকল পাঠকপাঠিকাই অনুগ্রহ করিয়া সেই প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। যে মত বা উত্তরটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক ব্যক্তি পাঠাইবেন আমরা তাহাই প্রকাশ করিব; সে উত্তরের সহিত সম্পাদকের মতামতের কোনো সম্পর্কই থাকিবে না। কোনো উত্তর সম্বন্ধে অন্তত দুইটি মত এক না হইলে তাহা প্রকাশ করা যাইবে না। বিশেষজ্ঞের মত বা উত্তর পাইলে তাহা সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইবে। ইহাদ্বারা পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে চিন্তা উদ্বোধিত এবং জিজ্ঞাসা বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আশা করি। যে মাসে প্রশ্ন প্রকাশিত হইবে সেই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌঁছা আবশ্যক, তাহার পর যে-সকল উত্তর আসিবে, তাহা বিবেচিত হইবে না।]

বিদেশীয় ভাষা হইতে অনুবাদযোগ্য পুস্তকের যে-সকল নাম আমরা পাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে যেগুলি ইহার পূর্ব্বেই বাংলায় অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা ছিল সেগুলির নাম বাদ দিয়া অপর নামগুলি নিম্নে দেওয়া গেল—

1. Hamlet— Shakspeare
2. Othello— „
3. King Lear— „
4. Antony-Cleopatra „
5. As you like it „
6. Merchant of Venice „
7. Faust— Goethe
8. Iphigenia in Tauris— „
9. Maid of Orleans— Schiller
10. Wallenstein— „
11. Ninety-three Victor Hugo
12. Chatiments „
13. Notre Dame „
14. Les Orientale „
15. Laughing Man „
16. Contemplations „
17. Quest of the Absolute— Balzac
18. Mademoiselle du Maupin— Theophile Gautier
19. Song of the Open Road etc.—Whitman
20. Poems— Alfred de Musset
21. Land of Heart's Desire—W. B. Yeats.
22. Shadowy Waters— „
23. Colonel Newscome— Thackeray
24. Evan Harrington— George Meredith
25. Scarlet Letter— Nathaniel Hawthorne
26. Poems— Heine
27. Tartuffe— Moliere
28. Doctor inspite of himself— „
29. Misanthrope— „
30. Prometheus Desmotis— Aeschylus
31. Antigone— Sophocles
32. On Death— Euripides
33. Drama— Aristophanes
34. Phoedo— Plato
35. Dialogues— lato
36. Poems— Sappho
37. Samson Agonistis— Milton
38. Tenure of Kings and Magistrates—Burke
39. Liberty— Mill
40. Essays— Bacon
41. Essays— Mazzini
42. Thoughts— Pascal
43. Representative Government— Mill
44. Dr. Jekyll and Mr. Hyde— R. L. Stevenson
45. Kidnapped— „
46. Manfred – Byron
47. Prometheus unbound— Shelley
48. Epipsychidion— „
49. Pippa Passes— Browning
50. Odes— Keats
51. St Agnes' Eve— „
52. Poems— Wordsworth
53. Idylls— Tennyson
54. Fantasie— Matilde Serao
55. Dreams— Olive Schriener
56. Quo Vadis— Sienkiewicz
57. Drink— Zola
58. A Love Episode— „
59. Mill on the Floss— George Eliot
60. Silas Marner— „
61. Pride of Lammermoor—Scott
62. Crime of Sylvester Bonar— Anatole France
63. Kismet— Knoblauch
64. Representative Men— Emerson
65. Heroes and Hero Worship— Carlyle

66. Renaissance— Walter Pater
67. Book of Tea — Okakura
68. Ideals of the East— „
69. Resurrection— Tolstoy
70. Comrades— Gorkie
71. Man who was afraid— „
72. Spring Flood— Turgenieff
73. Fathers and Children— Turgenieff
74. Virgin Soil— „
75. Brand— Ibsen
76. Pillars of society— „
77. Peer Gynt „
78. Vikings— „
79. Mary Magdalene— Maeterlinck
80. Blue Bird— „
1. Wisdom and Destiny— „
82. Eyes like the sea— Morris Jokai
83. Marie Clair— Marguerette Audoux
84. Paradiso— Dante
85. Vita Nuova „
86. Cicero— Demosthenes
87. Satires— Juvenal
88. Imitation of Christ— Thomas a Kempis
89. Nature of Man— Metchnikoff
90. World of Life— Wallace
91. Descent of Man— Darwin
92. Human Understanding, Locke
93. Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde
94 Lady Windermere's Fan „
95. Decline and Fall of the Roman Empire— Gibbon
96. History of Greece— Grote
97. Dutch Republic— Motley
98. History— Herodotus
99 „ Thucydides
100. Peloponnisian War— „
101. History Mommsen
102. Middle Ages— Hallam
103. History of France— Michellet
104. History of Civilisation— Guizot
105. History of England— Green
106. History of Rationalism in Europe—Lecky
107. Italian Renaissance—Symons
108. Madame Chrysantheme—Pierre Loti
109. Rights of Man—Thomas Payne
110. Conquest of Bread—Prince Kropotkin
111. Sorrows of Satan—Marie Corelli
112. Indian Painting and Sculpture—E. B. Havell
113. In Tune with the Infinite—Ralph Waldo Trine
114. Story of Creation—Clodd
115. Story of the stars—Robert Blatchford
116. Expanse of Heaven—Proctor
117. Linguistic Survey of India—Grierson
118. Modern Painters—Ruskin
119. Masnabi—Jellaluddin Rumi
120. Diwan—Hafiz
121. Yusuf Julekha—Jami
122. Rubaiyat—Omar Khayyam
123. Ram Charit Manas—Tulsidas
124. Drama—Racine.
125. Cid—Corneille,
126. Tale of two Cities—Dickens.

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকার মধ্যে ৯ জনের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অধিক ও সমানসংখ্যক ভোট পাইয়াছে দুটি নাম—

দেবী চৌধুরাণী বা প্রফুল্ল

ও

সূর্য্যমুখী।

নূতন প্রশ্ন

১। ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে বিখ্যাত শ্রেষ্ঠতম ১২জন ভারতবাসীর নাম করুন।

২। ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে বিখ্যাত সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবমণ্ডিত ভারতবর্ষের ১২টি স্থানের নাম করুন।

৩। ইতিহাসে উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে বিখ্যাত শ্রেষ্ঠতম ১২জন ভারতমহিলার নাম করুন।

আনন্দ ও সুখ

আনন্দের নাহি জাতি, নাহি বিদ্যা, সজ্জা শোভা বেশ।
পাগল, ধূলায় লুটে, নহে জ্ঞাত তার গোত্র দেশ।
ভিক্ষা-কার্য্যে নাহি লজ্জা, লাঞ্ছনায় নাহিক ভ্রূক্ষেপ,
বিত্তে তার নাহি শ্রদ্ধা, নৃত্য করি চরণ বিক্ষেপ।

সুখ সে রাজার পুত্র, আভিজাত্যে গর্ব্বস্ফীত মন,
ফুলশয্যা-পরে যাপে কর্ম্মহীন ব্যসনী জীবন।
শত্রুভয়ে চিত্ত কাঁপে, ম্লান মুখে চাহে ভৃত্যপানে,
সমগ্র নিখিলে কৃপা করিবার স্পর্দ্ধা তবু প্রাণে।

শ্রীকালিদাস রায়।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত ও চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩২১

৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রেমের বিকাশ

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও,
খুসি হয়ে পথের পানে চাও।
খুসি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে
অরুণ আভাসে।
খুসি তোমার ফাগুনবনে আকুল হয়ে পড়ে
ফুলের ঝড়ে ঝড়ে।
আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে চিনে,
তোমার সাগর অধিক করে নাচে
দিনের পরে দিনে।

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানসসরোবরে—
সূর্য্য তারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি করে পাপ্ড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

২৭ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ত্তমানযুগের সেবা-আদর্শ সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা *

সেবাদর্শ নূতন নহে। ভিন্ন ভিন্ন আকারে এই ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়। প্রেমের প্রকাশ যেমন কখনো ভক্তিতে, কখনো সৌহৃদ্যে, কখনো বা করুণায়, প্রেমানুগা সেবারও প্রকাশ তেমনি তিনটি ক্ষেত্রে। পিতা মাতা গুরু প্রভু প্রভৃতির সেবায় ভক্তির, মণ্ডলীর বা জনসমাজের সেবায় সৌহৃদ্যের, আর আর্ত্ত অনাথ অপোগণ্ডের সেবায় করুণার চরিতার্থতা। মানুষ যেমন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের, তেমনই সমাজ-প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াও এই চরিতার্থতা খুঁজিয়াছে। যেমন জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব, তেমনই জরুস্ত্রীয় ইহুদী খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দেখিতে পাই দরিদ্রের ভরণপোষণ, রোগীর শুশ্রূষা, অনাথ ও বিধবার পরিরক্ষণ, অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান, পতিত পাপীতাপীর উদ্ধার, এ সকলই ধর্ম্মের সাধন বা মুক্তিপথের সোপান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলীতে এই সেবাব্রত লইয়া বিবিধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজকালকার লিট্‌ল্ সিষ্টার্স্ অব্ দি পূঅর্, সিষ্টার্স্ অব চ্যারিটি, মুক্তিফৌজ (Little Sisters of the Poor, Sisters of Charity, Salvation Army), প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সেই সেবাব্রতী ভিক্ষুসম্প্রদায়ের আদর্শে গঠিত। আবার কেবল সমাজ-প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়া দেখিলেও দেখা যায় লোক-হিতার্থে মানবের সমবেত চেষ্টাও সুপ্রাচীন। পরস্পরের সাহায্যকল্পে মানুষই সর্ব্বপ্রথমে সমবেত হইয়াছে এমনও নয়; ইতর-প্রাণী-গোষ্ঠীতে এই সেবার্থ (mutual aidএর জন্য) সমবায়ের স্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয়। মানব-সমাজে গণ শ্রেণী পংক্তি গ্রাম্য সমিতি (tribal and communal institutions, guilds, classes), প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই জনহিতের সমবেত চেষ্টা কি প্রাচীন যুগে কি মধ্যযুগে চিরকাল সাধিত হইয়া আসিয়াছে। এমন কি অনেকস্থলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের (political institutions) দ্বারাও দুঃখদারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা হইয়াছে। বৌদ্ধসমাজে হাঁসপাতাল, জৈনসমাজে পিঁজরা-পোল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদীসমাজে অনাথ ও বিধবাগণের পরিরক্ষণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কর্ত্তব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হিব্রু ধর্ম্মপ্রবক্তা হোসীয়া ও আমশ একপ্রকার socialism বা সমাজতন্ত্রের সূচনা করিয়াছিলেন। প্লেতোর "রিপাব্লিক" গ্রন্থেও সেই আদর্শই ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে জারমেনী এবং ইংলণ্ডাদি দেশে সরকারী বীমা (State Insurance), পেন্সান (Pensions) সাহায্য, ভাতা (Aid) ইত্যাদি দ্বারা বৃদ্ধ, অনাথ, প্রসূতি, শিশু, অশিক্ষিত, বেকারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্য্যা রাজধর্ম্মরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতেও State Socialismএর অর্থাৎ সামাজিক হিতসাধনের সরকারী চেষ্টার সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। ইহাতে রাষ্ট্রও একটা সম্ভূয়সমুত্থান সমিতিতে (Co-operative institution), একটা বিরাট হিতসাধন সমিতিতে (Social Service Leagueএ) পরিণত হইতে চলিল।

কি ধর্ম্মসাধনের কি সামাজিক জীবনের দিক দিয়াই দেখি না কেন এই লোকহিতচেষ্টা বিনা কোন সমাজই টিকিতে পারে নাই। সামাজিক জীবনধারা ও তাহার অভিব্যক্তিতে (social evolutionএ) এই পরার্থপ্রাণতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল গঠনীশক্তি। এই শক্তির হ্রাস যেখানে হইয়াছে সেইখানেই সমাজ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। বুদ্ধি তাহা ঠেকাইতে পারে নাই।

কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই পরার্থ-প্রাণতার একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। জীবতত্ত্বে জীবনসংগ্রামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যায়, বিশেষতঃ অবাধপ্রজনন-প্রতিকূল মালথাস-বাদের প্রাদুর্ভাবে ক্রমশঃ প্রতীচ্য সমাজে বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মধ্যে এই ধারণা জন্মাইল, যে, জীবনসংগ্রামে অপটু অক্ষম ও বিধ্বস্ত লোক-দিগের রক্ষণ ও পোষণ একটা লোকসমাজক্ষয়কর কার্য্য, লোকসমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর বা পুষ্টিকর নহে। একদিকে নিট্‌শে (Nietzsche)র শিক্ষা, superman বা অতিমানব সৃষ্টি করিতে গিয়া will to powerএর সাধন অর্থাৎ শক্তিসাধন করিতে হইবে; সুতরাং অক্ষম ব্যক্তিদের

* হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্বোধনসভায় পঠিত।

সমাজ হইতে সমূলে উৎপাটনই সমাজধর্ম্ম আর দয়া-দাক্ষিণ্যাদি মানুষকে দুর্ব্বল ও কাপুরুষ করে বলিয়া তাহা ক্রীতদাসের ধর্ম্ম,—মানুষের ধর্ম্ম শক্তিসাধন। অপরদিকে সুপ্রজননবিদ্যার (Eugenicsএর) দোহাই দিয়া বংশের অবনতি নিবারণ করিতে গিয়া পাপীতাপীর ত্রাণ, বিকলাঙ্গ বা বীজদুষ্ট ব্যক্তির সমাজে পোষণ ও অবাধ সংমিশ্রণাদি হেয় ও বর্জ্জনীয় বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে। এই শ্রেণীর মতে কঠোর জীবনসংগ্রাম বংশোন্নতিসাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা। আমরা এই জীবন-সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রিত করিব, আরো অধিক কার্য্যকর করিব। কিন্তু দয়া করুণাদির প্রেরণায় তাহার প্রতিকূলাচরণ করিব না, করিলে ধ্বংসাভিমুখে পতিত হইব। অন্তর্জাতীয় জীবনে (International Lifeএ) সেই একই কথা। হীন, দুর্ব্বল, দুর্ব্বৃত্ত ও দুষ্টবীজোদ্ভব জাতিসকলের ক্রমিক উচ্ছেদই বিশ্বমানবের পক্ষে একান্ত মঙ্গলকর। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কুসংস্কার প্রভৃতিতে যে অক্ষমজাতির ক্ষয় হয় তাহা কৃত্রিম উপায় ও বাহ্যশক্তির অবলম্বনে রোধ করিতে যাওয়া কেবল বিশ্বমানবের অহিতাচরণ করা। সামাজিক জীবনে যেমন জীবনসংগ্রাম বিনা কে সক্ষম কে অক্ষম জানিবার উপায় নাই, তেমনই অন্তর্জাতীয় জীবনে যুদ্ধবিনা শক্ত অশক্তের নির্দ্ধারণ সম্ভব নয়। সুতরাং যুদ্ধেরই জয় !

এই শিক্ষার বিপক্ষে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার ফলেই বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্র, আর সেই ক্ষেত্রে অমানুষিক বা অতিমানুষিক বর্ব্বরতা। মনুষ্যের কুলক্ষয়ের এমন পন্থা ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। আর যদি এই শিক্ষাবিষ সভ্যসমাজদেহ হইতে বিদূরিত না হয় তাহা হইলে একটি কুরুক্ষেত্র নহে, কুরুক্ষেত্রের পর কুরুক্ষেত্র আসিতেছে,—সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য্য।

কিন্তু এই মালথাস-বাদ, অতিমানববাদ ও সুপ্রজনন-বাদের শিক্ষায় যে সারসত্য নিহিত আছে তাহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। প্রচলিত লোকসেবাধর্ম্মে যে অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, যেজন্য তাহা তেমন সার্থক বা কার্য্যকর হয় নাই তাহা বুঝিবার পক্ষে এই শিক্ষা সহায়তা করিবে। জীবনীশক্তি একটা সৃজনী-শক্তি,—আত্মশক্তির উদ্বোধন না হইলে জীবন পাওয়া যায় না। সুতরাং সেবার উদ্দেশ্য এমন নয় যে বাহির হইতে অভাব পূরণ করিয়া দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতা বাড়াইয়া তোলা। কিন্তু প্রত্যেক মানবে—আর্ত্ত পতিত রুগ্ন সকলের মধ্যেই—জীবনীশক্তি ইচ্ছাশক্তি জাগানই সেবার একমাত্র লক্ষ্য। জীবনে অধিকার (right to live), সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অধিকার (right to happiness), নিজের শক্তিনিচয়ের স্ফূর্ত্তিতে ও ব্যবহারে নিজের ভাগ্যবিধান করিবার অধিকার,—সমাজের কাছে, বিধাতার রাজ্যে, আমার কেবল দেনা নয়, আমার পাওনাও আছে এইরূপ ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্রত্ববোধ—এগুলি না জাগিলে কাহারো কল্যাণ হয় না। লোকসেবাকে শক্তিসাধনের অনুকূল করিতে হইবে। সুতরাং অক্ষমকে সক্ষম করিয়া তোলা, নাবালক যাহাতে সাবালক হইয়া উঠে ও আত্মসংরক্ষণের উপযোগী শক্তি আহরণ করে সেইরূপ বিধান করাই আমাদের এ যুগের সেবার লক্ষ্য হইবে। বিশেষতঃ ইহা বুঝিতে হইবে যে যতদূর সম্ভব দুঃখদারিদ্র্যের বীজ উন্মূলিত করাই দুঃখদারিদ্র্য লাঘব করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। কেবল জীবনসংগ্রামে আহত ব্যক্তির সেবা করা, সমাজের সংগ্রামক্ষেত্রে লাল ক্রুশ (Red Cross) বা আর্ত্তসেবার চিহ্ন বহন করা ও হত আহত ব্যক্তিদের গতি করাই প্রকৃষ্ট সেবাধর্ম্ম নহে। এ কথা বলিলে চলিবে না যে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিতে থাকুক, তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, এস আমরা কেবল আহত ব্যক্তিদের সেবা করি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। এই যে কতকাল ধরিয়া মানবসমাজে কুরুক্ষেত্র চলিতেছে ইহার উপশম চাই। শত্রুসেনা অসংখ্য,—কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো ব্যক্ত। ব্যাকটিরিয়া, অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অজ্ঞান, ভ্রান্তমত, কুসংস্কার, কদাচার, কুপ্রথা, পাপের সামাজিক বা দৈহিক বীজ (criminal taint), রোগদুষ্ট বংশবীজ (hereditary disease)—এই সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে হইবে। হত্যাক্ষেত্রে নয়, এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই শক্তি বা বীর্য্য আহরণ করিতে হইবে। Will to power প্রতাপ শৌর্য্য অদম্যতেজ অসীম সাহস

আত্মোৎসর্গ—এইসকল বীরের ধর্ম্ম অভ্যাস ও সাধন করিবার ইহাই সমীচীন ক্ষেত্র। এইরূপেই অতিমানবতত্ত্ব এবং সুপ্রজননতত্ত্ব ভ্রান্তিমুক্ত হইয়া এ যুগের সেবাধর্ম্মকে পরিস্ফুট ও সার্থক করিয়া তুলিবে।

কিন্তু এই সেবার প্রাণশক্তি এখানে নয়। ইহার অন্তরালে যে মানুষের আত্মশক্তি আছে, তাহাতেই। প্রেমই সেই আত্মশক্তি,—মানুষে মানুষে যে প্রেম, কোনো অরূপের প্রেম নয়। মানুষকে প্রথম মানুষ বলিয়া প্রেম করিতে হইবে। ভগবৎসন্তান বলিয়া নয়, ভগবানের অবতার বলিয়াও নয়। সে-সকল পরে আসিবে। আধুনিক সমাজধর্ম্মের প্রস্থান (starting point) এই মানবপ্রেমে। আর-এক জনের যে আত্মসম্পদ, আত্মাধিকার আছে, সেই অধিকারে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করাই নূতন মানব-ধর্ম্ম। আর এই মানব ধর্ম্মের মূলমন্ত্র তিনটি ঃ—(১) অপূর্ণকে পূর্ণতর করিতে গিয়াই পূর্ণতা পাওয়া যায় ; ইহাই আত্মার পূর্ণতাসাধন (The life universal in the personal life) ; (২) পূর্ণতরের আত্মোৎসর্গ ব্যতীত অপূর্ণের জীবন মিলে না। (৩) সর্ব্বমুক্তি বিনা কাহারো মুক্তি নাই, অপরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ না করিলে আমিও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিব না। কৈবল্য নয়, নির্ব্বাণ নয়, বোধিসত্ত্বই এ যুগের আদর্শ। আর বোধিসত্ত্ব-আদর্শ লক্ষ্য করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবার জন্য যে চারিটি সংগ্রহবস্তু নির্দ্দিষ্ট আছে,—দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্য্যা অর্থাৎ লোকহিত, এবং সমানার্থতা (co-operation towards a common end) তাহার মধ্যে যে চরমসংগ্রহ সমানার্থতা তাহাই এ যুগের প্রথম সাধ্য। কেবল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা বা উপেক্ষায় চলিবে না, তাহাও স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ববোধ ছাড়াইয়া উঠে নাই, বিশ্বাত্মার বিশ্বজীবনের (Life Universal) সহিত একীভূত হইতে পারে নাই। তাই সমানার্থতা চাই ; সকলে একার্থ হইয়া একাসনে বসিয়া একপ্রাণে একধ্যানে বিশ্বমানবের মুক্তিসাধন করাই একমাত্র সাধন। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে ঽয়নায়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

হিতসাধন

বন্ধুগণ, আপনাদের অবিদিত নাই যে এদেশে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি এই সুন্দর নিয়ম প্রচলিত আছে যে কেহ তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে প্রতিনমস্কারে তাঁহারা সেই নরনারীকে বলেন, 'নমো নারায়ণ'। আমি জানি না প্রত্যেক সন্ন্যাসী অপর নরনারীকে নারায়ণ বলিয়া উপলব্ধি করেন কিনা। কিন্তু ইহা জানি যে সেবাধর্ম্মকে যদি আমরা সজীব করিতে চাই, যদি জীবনে তাহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে চাই, তবে নরনারীকে কৃপাপাত্র জ্ঞান করিলে হইবে না—প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে ভগবানের সজীবরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহা হইলেই সেবাধর্ম্ম সফলতা লাভ করিবে।

কেবল যে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীই প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে বলেন—'এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥'—তাঁহারাই যে কেবল জীবে জীবে ভগবানের বিভূতি দর্শন করেন, তাহা নহে। ভক্তিগ্রন্থ ভাগবতেরও ঐ শিক্ষা—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেৎ বহু মানয়ন।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবান্ ইতি॥

এখানে ভাগবতের ঋষি শিক্ষা দিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীব, সে যতই পাপী যতই তাপী যতই হীন যতই দীন যতই মলিন হউক না কেন—তাহাকে যেন আমরা বহুমান সহকারে পূজা করি, কারণ তাহার মধ্যে ভগবান্ জীবভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। খৃষ্টীয় সাধু সেণ্টপলের নিকটও আমরা ঐ শিক্ষাই পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—Know ye not that ye are the tabernacles of God and that the Most High dwelleth in thee. অতএব প্রত্যেক জীব ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি। এই কথা স্মরণ রাখিয়া যদি আমরা সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, এই ভাবে ভাবিত হইয়া যদি আমরা জনসেবায় প্রবৃত্ত হই, তবেই আমাদের সেবা সার্থক হইবে। জীবকে আমরা যে সেবা দান করিব, তাহা যেন শ্রদ্ধার

সহিত দান করি, তবেই সে সেবাদান সফল হইবে, নতুবা নহে।

উপনিষদে উপদেশ পাইয়াছি—শ্রদ্ধয়া দেয়ং, হ্রিয়া দেয়ং, ভিয়া দেয়ং, সম্বিদা দেয়ং, অশ্রদ্ধয়া ন দেয়ং—শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে, সম্ভ্রমের সহিত সংযমের সহিত দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা সেই প্রাচীন ঋষি-বাক্যের সার্থকতা করিব—আমরা সম্ভ্রমের সহিত সংযমের সহিত শ্রদ্ধার সহিত দান করিব। জীবের প্রতি সম্ভ্রমবুদ্ধি যেন আমাদের হিতসাধন-মণ্ডলীর মূলমন্ত্র হয়।

ডাক্তার শীল তাঁহার অভিভাষণে জনহিতসাধনের যে মূল তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, সেবার ফলে তাহারই উদ্বোধন করিতে হইবে। কৃপার দ্বারা নয়—শিক্ষার দ্বারা, সংযমের দ্বারা, সম্ভ্রমের দ্বারা সেই শক্তিকে আকর্ষণ করিতে হইবে, সেই সুপ্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। তবেই প্রকৃত জনসেবা হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা আমাদের সমক্ষে যে কার্য্যতালিকা * উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে নানা কার্য্যের উল্লেখ আছে। কার্য্য যেন শতবাহু আন্দোলন করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। কিন্তু আমাদিগের কি জনবল কি ধনবল আছে যাহার আশায় আমরা এই দুঃসাধ্য কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সাহসী হইব? কিন্তু তথাপি আমরা নিরুৎসাহ হইব না। কিছুদিন হইতে আমাদের যুবকমণ্ডলীর মধ্যে যে সেবার ভাব জাগ্রৎ দেখিতেছি, অর্দ্ধোদয় যোগে এবং জলপ্লাবনে তাঁহারা যেভাবে জনসেবায় আত্মদান করিয়াছিলেন, তাহাতে আশা হয় এই দুরূহ ব্রত তাহাদের সাহায্যেই সফল হইবে। ইহার সফলতা প্রাচুর্য্যের দানে নহে, বহু অর্থের সমন্বয়ে নহে, কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত, সম্ভ্রমের সহিত, নরনারীকে নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া সেবায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের সেবার দ্বারা এ ব্রতের সফলতা হইবে। আর এক কথা। যাঁহারা এ দেশের উন্নতির আশা করেন, যাঁহারা কামনা করেন যে এদেশ জাতীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অন্যান্য শক্তিশালীজাতির সহিত এ জাতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইবে, জনসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া ভিন্ন তাঁহাদের সে আশা, সে কামনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার অনুষ্ঠানপত্রে পতিত ও নিগৃহীতদের উদ্ধারের ব্যবস্থাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। রোগীর শুশ্রূষা সহজ, দরিদ্রের দারিদ্র্য নিবারণ সহজ, কিন্তু পতিতের উদ্ধারসাধন সহজ নহে। কেবলমাত্র মহাপুরুষেরাই পতিতের পাতিত্যে আপনাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া পতিতের উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। উপনিষদের ঋষি বহুদিন পূর্ব্বে জলদনির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছিলেন—ব্রহ্ম দাশাঃ ব্রহ্ম কিতবাঃ—পতিতের মধ্যে বঞ্চকের মধ্যেও ব্রহ্ম রহিয়াছেন—সকলের হৃদয়ে তাঁহার পদচিহ্ন বিদ্যমান। অতএব কেহই ঘৃণ্য নহে, কেহই ত্যাজ্য নহে। পাপী তাপী পতিত নিগৃহীত—সকলেরই আমরা সেবা করিব। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি আমরা এই ব্রতে অগ্রসর হই, তবেই আমাদের সফলতা হইবে এবং আমরা ভগবানের আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইব।*

* ফাল্গুনের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

* বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর প্রারম্ভিক সভায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক কথিত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বসন্তের উৎসব

শীতপ্রধান দেশে শীতকালে মনে হয় যেন প্রকৃতির মৃত্যু হইয়াছে। ঘাস দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ গাছেই পাতা থাকে না। আমাদের দেশেও শীতের শেষে প্রবল বাতাসে অনেক গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। তখন গাছগুলি মরিয়া গিয়াছে বলিয়া যে আমরা মনে করি না, তা এইজন্য যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর দেখা গিয়াছে যে ঝরা পাতার জায়গায় আবার নূতন পাতা গজায়। তাই আমরা ইহাই স্থির করিয়া বসিয়া থাকি যে গাছগুলি মরে নাই, আবার পাতায় ফুলে ফলে সুশোভিত হইবে।

বাস্তবিক তাহাই ঘটে। পাতা ফুল ফল গাছের মধ্যে কোথায় যেন লুকাইয়া ছিল। বসন্তের দূত দখিনা হাওয়া বহিবার উপক্রমেই, তাহারা ঋতুরাজের সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসে, এবং পশুপক্ষীর সহিত মিলিয়া উৎসব করিতে থাকে।

মানুষ অনেক বৎসর বাঁচে, এবং তাহার জীবনে অনেকবার বসন্তে প্রকৃতির এই নব জাগরণ, এই উৎসব লক্ষিত হয়। সেইজন্য শীতের পর পৃথিবীর নবীন মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে বলিয়া দূরদর্শী অদূরদর্শী সকলেই আশা করে। আশা পূর্ণও হয়।

জাতির জীবন মানুষের জীবনের মত অল্পকালস্থায়ী নয়। জাতীয় জীবনের শীতও দুই-তিন-মাস-ব্যাপী, কিম্বা দুই-তিন-বৎসর-ব্যাপী নহে। উহা বহুশতাব্দীব্যাপী হইতে পারে। সুতরাং কোন জাতির জীবনে শীত ও শীতের পর বসন্তের জীবনদায়িনী শক্তি প্রত্যক্ষ করা অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। এইজন্য ঐতিহাসিকের চক্ষু দিয়া নানা জাতির জীবনে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর তিরোভাব ও আবির্ভাব দেখিতে হয়। তাহা দেখিলে আর এরূপ কোন সন্দেহ থাকে না যে শীতই জাতিবিশেষের জীবনের শেষ ঋতু; তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে শীতের পর বসন্ত আসিবে। উহার উৎসব করিতে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে না পারি, কিন্তু মানসনেত্রে আমাদের, উহা দেখিবার শক্তি জন্মে।

আমরা এমন এক যুগে জন্মিয়াছি ও বাঁচিয়া আছি যখন আমাদের দেশে না হউক, আর কোন কোন দেশে শীতের পর বসন্তের সজীবতা আসিয়াছে। তাই শুধু অতীত ইতিহাসের মধ্যে নয়, সমসাময়িক ইতিহাসেও বসন্তের হাওয়ার শব্দ যেন শুনিতে পাইতেছি, উহার স্পর্শ যেন আমাদিগকে পুলকিত করিতেছে। যে ঝড়ে পাতা ঝরিয়া পড়ে, দু-একটা ডাল ভাঙ্গিয়া যায়, গাছও উন্মূলিত হয়, হয় ত বা তাহাই বসন্তের নকীব। কিম্বা আমাদের দেশেও হয় ত দখিনা বাতাস বহিতেছে; আমরা বহুকাল শীতে আড়ষ্ট ও অসাড় থাকায় কিম্বা এখনও ভয়ে লেপ কাঁথা জড়াইয়া থাকায় উহা অনুভব করিতে পারিতেছি না।

এই অনুমান সত্য হউক বা না হউক, আমাদের জাতীয় জীবনে বসন্ত যে আসিবে, আসিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত।

জাতীয় জীবনে শীতের পর বসন্তের আগমন সম্বন্ধে ইতিহাসের সাক্ষ্যই চূড়ান্ত সাক্ষ্য নয়। যদি ইতিহাস বলিত যে এরূপ অতীত কালে কখন ঘটে নাই, তাহা হইলেও আমরা বলিতাম, "কাল নিরবধি; অতীতে যাহা হয় নাই, ভবিষ্যতে তাহা হইতে পারে। অনন্তশক্তিশালী বিধাতা তাঁহার সমুদয় লীলা অতীতেই শেষ করিয়া চুকিয়াছেন, ইহা সত্য নহে। ভবিষ্যতেও তাঁহার বিধানের নূতন নূতন অভিব্যক্তি হইবে।" মানবহৃদয়ের আশা, মানবহৃদয়ের উন্মুখতা, ইতিহাস অপেক্ষাও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী। অতএব বসন্ত আসিবে। কেমন করিয়া, তাহা জানি না; কিন্তু আসিবে।

দেশজননীর তরুণ পুত্রকন্যাগণ, জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের পত্র-পুষ্পফলে সুসজ্জিত হইয়া আপনারা বসন্তের উৎসব করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।

গোপাল কৃষ্ণ গোখলে

গোপাল কৃষ্ণ গোখলের অকালমৃত্যুতে ভারতবাসী যেরূপ শোক করিতেছেন, এরূপ শোকের কারণ বহুকাল ঘটে নাই। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারেন, এমন কাহাকেও এখন দেখা যাইতেছে না। দেশের মধ্যে তিনিই যে একমাত্র বুদ্ধিমান্, বাগ্মী, রাষ্ট্রীয় নানাবিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নয়। এরূপ লোক আরও আছেন। কিন্তু তিনি দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য যেরূপ আর-সব কাজ, আর-সব সুখ, আর-সব চিন্তা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ত্যাগী তাঁহার সমকক্ষ এমন লোক কোথায়? কিন্তু আমরা নিরাশ হইতে পারি না। যিনি গোখলেকে গড়িয়াছিলেন, তিনি নিজের কাজ করাইবার জন্য আরও মানুষ গড়িতেছেন।

উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে এই দেশভক্ত মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে। পাশ্চাত্য অনেক দেশের লোকের জীবনে ইহা শক্তির জোয়ারের বয়স। আমাদের দেশে অধিকাংশের শক্তিতে এই সময় ভাটা পড়ে, অনেকের মৃত্যু হয়।

গোপাল কৃষ্ণ গোখলে।

সামাজিক কুপ্রথা, শিক্ষা ও পরীক্ষাপ্রণালীর দোষ, দূষিত জলবায়ু ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অন্যান্য অবস্থা, এ সবই আমাদের অল্লায়ুতার কারণ। কিন্তু মনের উপর রাষ্ট্রীয় অবসাদ, দুরবস্থা ও নৈরাশ্যের চাপও যে অন্যতম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোখলে মহাশয়ের মৃত্যু যে এবম্বিধ একটি কারণে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ঘটাইয়াছে, একথা মান্দ্রাজের দৈনিক পত্র নিউ ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে পব্লিক্ সার্ভিস্ কমিশনের সভ্যরূপে তাঁহাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ইংরেজ সাক্ষীদের মুখে সমস্বরে উচ্চারিত এইকথা শুনিতে হইয়াছে যে তাঁহার স্বদেশবাসীরা অতি অকর্ম্মণ্য, কোন দায়িত্বের, সাহসের, শক্তির কাজের ভার নির্ভর করিয়া তাহাদের উপর দেওয়া যায় না। ইহা যে তাঁহার মত স্বদেশপ্রেমিকের পক্ষে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বাস্তবিক মানুষের দিক্ দিয়া দেখিলে, বা মানুষের কাছে কিছু পাইব এইরূপ আশার উপর নির্ভর করিতে গেলে আমাদের নিরাশ হইবারই কথা। কিন্তু আত্মশক্তি ও ভগবৎশক্তিতে বিশ্বাসী হইলে অবস্থার প্রতিকূলতা যত বেশী হয়, অন্তরের উৎসাহ তত বাড়ে, বাহিরে আকাশ যত ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়, অন্তরে আশার দীপ ততই উজ্জ্বল হইতে থাকে।

ঊনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে গোখলের মৃত্যু হইয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের মূল্য দৈর্ঘ্য দিয়া নিরূপণ করা যায় না। কোন মানুষের জীবনের মূল্য স্থির করিতে হইলে বুঝিতে হয়, তিনি কি হইয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, এবং কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন। গোখলে দোষত্রুটিশূন্য ছিলেন, কখন কোন ভুল করেন নাই কিম্বা তাঁহার রাষ্ট্রীয় মতে সকলে সায় দিতে পারেন, বা তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য, একথা কেহ বলিবেন না, বলিবার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু তিনি যে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানী, স্বদেশপ্রেমিক ও দেশভক্ত, পরিশ্রমী ও শ্রমোৎসুক, দেশের জন্য অপমানসহিষ্ণু, দেশবাসীর ঔদাসীন্যসত্ত্বেও দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাশীল, এবং মিতবাক্ ছিলেন, তাহা বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না। আঠার বৎসর বয়সে তিনি বি এ পাস করেন, কুড়ি বৎসর বয়সে গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে অধ্যাপক হন। এইরূপে ত্যাগে ও আত্মোৎসর্গে যে কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয়, আত্মবলিদানে তাহার সমাপ্তি হইয়াছে। তিনি কাজ করিয়াছেন অনেক। কিন্তু কাজ অপেক্ষা বেশী মূল্যবান এইটুকু যে তিনি কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করেন নাই, দেশের জন্য খাটিতে খাটিতে মরিয়াছেন। গোখলে ছাড়া রাজনীতিক্ষেত্রে আর যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহারা সব মেকী মানুষ, স্বার্থপর, একথা আমরা বলি না, মনেও করি না। কিন্তু অন্য সকলের মধ্যে যাঁহারা ভাল, যাঁহারা দেশভক্ত, যাঁহারা অন্তঃসারশূন্য নহেন, তাঁহাদেরও নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত, পরিবারবর্গের সুখসম্পদের জন্য, সঞ্চয়ের জন্য, অনেক সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয়। তাঁহাদের মধ্যে গোখলে অপেক্ষা শক্তিমান্ লোক থাকিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা গোখলের সমকক্ষ দেশসেবক নহেন,—একাগ্রতা ও একনিষ্ঠার অভাবে, এবং ত্যাগের অল্পতায়।

দেশের জন্য বহু সেবকের প্রয়োজন। এখন সকল প্রদেশেই গোখলের স্মৃতিরক্ষার কথা হইতেছে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রথম উপায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবক-সমিতিকে স্থায়ী করা। তাহা করিতে হইলে উহার অর্থাভাব দূর করা আবশ্যক, এবং উহাতে আরও অধিকসংখ্যক যুবকের যোগ দেওয়া প্রয়োজন। ভারত-সেবক-সমিতি যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে অনেকগুলি দেশসেবক এইরূপেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই সমিতির মূল মতগুলি সকল দেশভক্ত গ্রহণ করেন না, শ্রীযুক্ত গান্ধির মত দেশভক্তও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই সমিতির মূল মতে ভারতের ভাগ্যকে ব্রিটিশ রাজশক্তির সহিত যে ভাবে জড়িত মনে করা হইয়াছে, তাহা বহু দেশভক্তের মনঃপূত হইবে না। এই হেতু যাঁহারা দেশের রাষ্ট্রীয় পরিচর্য্যার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত, তাঁহারাও সকলে ইহার সভ্য হইতে পারিবেন না। তাঁহারা অন্যরূপ দল বাঁধিয়া কিম্বা একা একা কাজ করিতে পারেন। এরূপ লোক যদি অনেক পাওয়া যায়, তাহা হইলে গোখলে শিক্ষিতদের উপর একদা যে জন্য যে কর বসাইতে চাহিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

এই কর টাকা কড়ি বা ধানচালে দেয় নয়। গোখলের দাবী এই ছিল যে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া বাহির হন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ২।৫ জন দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করুন। অনেক জায়গায় বণিকেরা বিক্রয়লব্ধ অর্থের টাকায় এক পয়সা ঈশ্বরবৃত্তি রাখিয়া দেন। তাহা বারোয়ারী পূজায় বা কোন সৎকার্য্যে খরচ করা হয়। গোখলে যেন শিক্ষিতদিগকে ইহাই বলিয়াছিলেন, "তোমরা তোমাদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ একজনকে ঈশ্বরবৃত্তিস্বরূপ দাও। তিনি ভগবানের সেবায়, দেশের কাজে লাগুন।" এমন কোন কোন লোকের কথা জানা আছে, যাঁহারা নিজে বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিলেন বা করিতেছেন, অথচ যাঁহাদের মুখ হইতে অপরকে ত্যাগী হইবার উপদেশ ও উত্তেজনা বাহির হইয়াছে। এরূপ উপদেশ ও উত্তেজনা ব্যর্থ হইবেই, এমন বলা যায় না; কিন্তু নিস্ফল হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া উচিত নয়। গোখলে নিজে ত্যাগী ছিলেন; তাঁহার দাবী গ্রাহ্য হইবে।

কিন্তু আমরা আমাদের মধ্য হইতে ২।১ জনকে দিয়াই কি দায়মুক্ত হইব? তাহা হইবার নয়; আমরা যে সবাই ঋণী। আমাদের সকলেরই কতকটা শক্তি, সময়, উপার্জ্জন, সম্পত্তি পূর্ণমাত্রায় সাক্ষাৎভাবে সেবায় নিয়োজিত হওয়া চাই। বাকী যাহা নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য ব্যয়িত হইবে, তাহাও পরোক্ষভাবে সেবার জন্য হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য যাহাতে কাহারও নিজের বা পরিবারবর্গের বা অপরের মনুষ্যত্ব কমে, এরূপ কিছু করা অকর্ত্তব্য। আমার স্বাস্থ্য সামর্থ্য রক্ষার জন্য, মনকে প্রফুল্ল ও উৎসাহী রাখিবার জন্য যে শক্তি সময় ও অর্থ ব্যয় করিব, তাহা সেবারই জন্য। সন্তানদের শিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষাদির জন্য যাহা করিব, তাহা তাহদিগকে সমর্থ সেবক করিবার জন্য। যদি সুন্দর গৃহনির্ম্মাণ করি, তাহা কেবল আরামে থাকিবার জন্য নয়, স্বদেশের শোভাবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা, এবং শিল্পোন্নতির জন্যও করিব। এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের আদর্শের আভাস পাওয়া যাইবে। আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে পরিণত করা দুঃসাধ্য, হয় ত অসাধ্য। কিন্তু উহা মনের মধ্যে থাকিলে মানুষ ক্ষুদ্র সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের দাস হয় না।

দেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলিদ্বারা আমাদের মতানুযায়ী কোন আইন হয় না, মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে অনেক ব্যবস্থা হয়; দেশের লোক যে খাজনা ট্যাক্স দেয়, তাহা স্থাপিত হওয়া বা তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আমাদের মতের অপেক্ষা রাখে না, আমাদের অমত হইলেও ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের মত পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। রাজস্ব কি কি বাবতে কি কি উদ্দেশ্যে কি পরিমাণে খরচ হইবে, তাহা বিবেচনার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয় বটে, কিন্তু বেসরকারী সভ্যেরা যতই তর্ক করুন, যুক্তি দেখান, রাজস্বসচিবের নির্দ্ধারণ টলে না। অপ্রধান অবান্তর বিষয়ে সামান্য পরিবর্ত্তন কদাচিৎ হয় বটে। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া সরকারী সভ্যদের মত খণ্ডনের জন্য অধ্যয়ন করিয়া প্রস্তুত হওয়া তাহার জন্য জীবনপাত করা, একদিক দিয়া শক্তির, ব্যর্থপ্রয়োগ,

সুতরাং অপচয় বলা যাইতে পারে। গোখলের শক্তির এইরূপ অপচয় কিছু হইয়াছে। কিন্তু এই কার্য্যে শক্তিপ্রয়োগের সাফল্যও আছে। ব্যবস্থাপক সভায় কার্য্যতঃ আমাদের মতের জয় না হইলেও দেশবাসী যদি ইহা বুঝিতে পারে যে সত্য ও ন্যায় আমাদের দিকে, তাহা হইলে তাহা পরম লাভ। অতএব লোকশিক্ষার জন্য ও লোকমতকে প্রবল করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে ও বাহিরে রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক। পরিণামে প্রবল লোকমতের নিকট রাজভৃত্যদের মতের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের প্রতিনিধিরা নিজনিজ মতকে যদি সত্যের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাহা হইলে বহু নীরস বিষয়ের অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু অনেক সভ্যের এরূপে প্রস্তুত হইবার মত শিক্ষা ও মানসিক শক্তি নাই। যাঁহারা শিক্ষা ও বুদ্ধিতে হীন নহেন, তাঁহারাও যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। এইজন্য ব্যবস্থাপক সভার কাজ করিয়া দেশের যতটুকু মঙ্গল করা যাইতে পারে, তাহা করিতে হইলে রাজনীতি ও অর্থনীতির চর্চ্চাকে জীবনের একমাত্র, অন্ততঃ, প্রধান কাজ করা দরকার। এরূপ করিতে না পারিলে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়া, দেশের দিক্ হইতে, নিষ্প্রয়োজন ও নিষ্ফল। গোখলে ইহা করিয়াছিলেন বলিয়া সরকারী সভ্যেরাও তাঁহার শক্তি অনুভব করিয়াছিলেন।

মনে করা যাক যে আমাদের প্রতিনিধিরা ব্যবস্থাপক সভায় ও অন্যত্র খুব সারবান্ কথা বলিলেন, মনে করা যাক যে তাহা খবরের কাগজে দেশভাষায় অনুবাদিত হইল। লোকে তাহা পড়িলে ত লোকমত গড়িয়া উঠিবে? কিন্তু পড়ে কে? দেশের অধিকাংশ লোকই যে নিরক্ষর। এইজন্য সর্ব্বসাধারণকে লেখাপড়া শিখান দরকার। তাহার উপায় কি? গোখলে ইহার জন্য আইন করাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। ইহা একরূপ নিশ্চিত যে দেশে শিক্ষার বিস্তার যত ধীরে ধীরে হয়, নানাপ্রকার কারণ দেখাইয়া ও নানা উপায়ে, শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীরা তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু আমরা খুব শীঘ্র শিক্ষার বিস্তার চাই। পাঠশালা স্কুল কলেজ স্থাপনে অনেক বিঘ্ন। তথাপি তাহা করিতে হইবে। কিন্তু অন্য নানা উপায়ও অবলম্বন করা আবশ্যক। সকলে ভাবুন, পরামর্শ করুন, লিখুন, বলুন। আমরা শিক্ষার বিস্তারের একটি সহজ উপায় নীচে নির্দ্দেশ করিতেছি।

লেখাপড়া-জানা লোকদের প্রতি।

আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা প্রত্যেক লেখাপড়া-জানা লোকের জন্য। কিন্তু ছাত্রী ও ছাত্রদের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

যাঁহাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া শেষ হইল, তাঁহাদের সংখ্যা মোটামুটি সাড়ে বার হাজার। এই সাড়ে বার হাজার ছাত্র ও ছাত্রী সাড়ে তিন মাস অবসর পাইবেন। তাহার পর শীঘ্রই আরো কয়েক হাজার ছাত্র ও ছাত্রীর ইণ্টারমীডিয়েট ও বি এ পরীক্ষা হইয়া যাইবে। তাঁহারাও তিন মাস অবসর পাইবেন। এই বহু সহস্র ছাত্রছাত্রী অবসরকালে প্রত্যেকে যদি একটি করিয়াও নিরক্ষর বালকবালিকা বা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া দেন, তাহা হইলে জুলাই-মাসে কলেজ খুলিবার পূর্ব্বেই দেশের মধ্যে প্রায় বিশ-হাজার লিখনপঠনক্ষম লোক বাড়িয়া যাইবে। আমরা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে কেবল একজন নিরক্ষর মানুষকে লিখিতে পড়িতে শিখাইবার ভার লইতে বলিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেকে যদি তিনমাস ধরিয়া প্রত্যহ একঘণ্টা করিয়া সময় দেন, তাহা হইলে অন্ততঃ পাঁচজন লোককে ঐ সময়ে লিখিতে পড়িতে শিখান যায়। তাহা হইলে তিনমাস পরে লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ বাড়িতে পারে।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা দিবেন না, সে-সব ছাত্রছাত্রীরও শীঘ্র দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইবে। যাঁহারা পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন অধীতব্য বিষয় থাকিবে না; সুতরাং তাঁহাদের খুব বেশী অবসর থাকিবে। কিন্তু যাঁহারা কোন পরীক্ষা দেন নাই, তাঁহাদের ছুটির মধ্যে পুরাতন পঠিত বিষয় আবার পড়িতে হইবে, নূতন কিছু কিছু শিখিতে বা

অনুশীলন করিতে হইবে। এইজন্য তাঁহাদের অবসর খুব বেশী থাকিবে না। তথাপি তাঁহারা এক আধ ঘণ্টা সময় নিশ্চয়ই দিতে পারিবেন। এইরূপে তাঁহারাও অতি অল্প আয়াসে গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে প্রত্যেকে অন্ততঃ এক জনকে লিখিতে পড়িতে শিখাইতে পারেন। তাহা হইলে আরও কত হাজার লোক যে আগামী তিনমাসের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম হয়, তাহা বলা যায় না।

আমাদের এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা খুব সোজা। ইহা অপেক্ষা সহজ দেশের সেবা আর নাই। এরূপ কাজ এখনই কোন কোন ছাত্রছাত্রী করিতেছেন। ইহার জন্য বিদ্যালয়গৃহ চাই না, বেঞ্চি চেয়ার টেবিল বোর্ড চাই না, ইন্স্পেক্টরের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী চাই না, সরকারী সাহায্য চাই না, অগাধ পাণ্ডিত্য চাই না, বড় বড় লাইব্রেরী চাই না, হাজার হাজার বা শত শত টাকা বা পয়সা চাই না। চাই কেবল সেবা করিবার আগ্রহ। যে বিদ্যা স্কুলের নীচের ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের জানা আছে, তাহাতেই কাজ চলিবে। ২।৪ পয়সা দামের বহি যা চাই, তা অনেকস্থলে শিক্ষার্থীরাই কিনিতে পারিবে, শিক্ষার্থীরও অভাব হইবে না। কোন শিক্ষার্থী যদি দুটি কি চারটি পয়সা খরচ করিতে না পারে, তাহা হইলে শিক্ষাদাতা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তাহা ব্যয় করা কঠিন হইবে না। যাঁহাদের বাড়ী এরূপ গ্রামে যেখানে বহির দোকান নাই তাঁহারা সহর হইতে ২।১ খানা অক্ষর-পরিচয়ের বহি ও তাহার পর পাঠ্য ২।১ খানা সোজা বহি কিনিয়া লইয়া যাইতে ভুলিবেন না।

ছাত্রছাত্রী ছাড়া আর যে-সব শিক্ষিত পুরুষ ও নারী আছেন, তাঁহারাও দেশের নিরক্ষর অবস্থা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হউন। যাঁহার নিজের পড়াইবার সময় নাই, তিনি বহি দিন্, স্কুলকলেজের বেতন দিন্, নিজের গৃহে ক্লাস খুলিবার স্থান দিন্, নৈশবিদ্যালয়ে আলোর খরচ দিন্, যেপ্রকারে পারেন সাহায্য করুন। সেবার যে বিমল আনন্দ তাহা হইতে কেহ বঞ্চিত থাকিবেন না। আনন্দ, জীবনের সার্থকতা ও পূর্ণতা, শক্তি, সবাই খুঁজিয়া বেড়ায়। সেবার পথে এই সবই মিলে।

দেশের ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল শ্রেণীর একতা জন্মাইবার শ্রেষ্ঠপথ এবং একমাত্র পথ এই সেবা। সেবার ক্ষেত্র বঙ্গদেশে কত বিস্তৃত, এবং কতপ্রকারে সেবা করা যাইতে পারে, তাহা আমরা গতমাসের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি। নিরক্ষরকে লেখাপড়া শিখান তাহার মধ্যে একটি উপায় এবং সকলের চেয়ে সোজা উপায়।

লর্ড রিপনের মূর্ত্তি।

গতমাসে বড়লাট কলিকাতার গড়ের মাঠে দুটি মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। একটি বড়লাট মিণ্টোর, অপরটি বড়লাট রিপনের। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ আমাদের দেশের লোকের টাকায় নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ দেশী লোকের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত আর একটিও মূর্ত্তি গড়ের মাঠে নাই। শিল্পের দিক দিয়াও এই মূর্ত্তিটি খুব ভাল হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইহাই গড়ের মাঠের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূর্ত্তি। ইহাতে রিপনের মহানুভবতা ও মানব-প্রেম সুব্যক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনকালের ইতিহাসে লর্ড রিপন ধর্ম্মনিষ্ঠ রিপন (Ripon the Righteous) নামে পরিচিত। তিনি যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, ভারতপ্রবাসী ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের প্রতিকূলতায় তাহার সবটা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতবাসীর অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ফৌজদারী আইনে ও বিচারকার্য্যে ভারতবাসী ও ইংরেজকে সমান সুবিধা ও অধিকার দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন ইলবার্ট সাহেব ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। তাঁহার নাম অনুসারে প্রস্তাবিত আইন ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীরা এত চটিয়াছিল যে তাহারা রিপনকে, ইল্‌বার্টকে এবং সমুদয় ভারতবাসীকে গালাগালি দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, রিপনকে বলপূর্ব্বক চুরি করিয়া জাহাজে চড়াইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে চালান করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। রিপন ও ইলবার্টের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। একটা রফা হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবাসীর সুবিধা হয় নাই। স্থানিক স্বায়ত্ত

শাসনের ক্ষমতা দিয়া, অর্থাৎ মিউনিসিপালিটি, জেলা বোর্ড, প্রভৃতিকে স্থানীয় রাস্তাঘাট নর্দামা জলসরবরাহ প্রাথমিক শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা দিয়া, দেশবাসীদিগকে রাষ্ট্রীয়কার্যাপরিচালনে অভ্যস্ত ও সমর্থ করিবার চেষ্টাও লর্ড রিপন করিয়াছিলেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, স্থানিক কার্য্যনির্ব্বাহ আরও ভাল করিয়া হইবে বলিয়া নয়, কিন্তু লোকদিগকে রাষ্ট্রীয় কার্য্যসম্পাদনে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে

লর্ড রিপন।

স্থানিক বিষয়ে ক্ষমতা দিতে চান। অর্থাৎ তিনি ইহা জানিতেন যে প্রথম প্রথম লোকেরা ভুল ভ্রান্তি করিবে; কিন্তু তাহাদের শিক্ষার জন্য ইহা সহ্য করা উচিত। এক্ষেত্রেও তিনি যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার স্বজাতীয় ভারতপ্রবাসীদের বাধায় তাহা হয় নাই। তিনি এডুকেশন কমিশন বসাইয়া শিক্ষার, বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার, বিস্তার ও উন্নতির জন্য, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দেশবাসীদের উদ্যমকে উৎসাহিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষানীতির বিপরীত নীতি এখন অনেক স্থলে অনুসৃত হইতেছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাপত্রে ইহা বলিয়া গিয়াছেন যে ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হইবে না। অর্থাৎ বিচারালয়ে উভয়ের অধিকার ও সুবিধা সমান হইবে, এবং রাজকার্য্যে নিয়োগের সময় কেবল যোগ্যতা দেখা হইবে, জাতি ধর্ম্ম জন্মস্থান বা গায়ের রঙের বিচার করা হইবে না। এই ঘোষণাপত্র সম্যক্‌রূপে অনুসৃত হয় না বটে কিন্তু ইহা একটা ফাঁকি, সিপাহী বিদ্রোহের পর লোকদিগকে ঠাণ্ডা করিবার ইহা একটা কৌশল, এমন কথাও মুখ ফুটিয়া ইংরেজেরা সাধারণতঃ বলেন না। লর্ড রিপনের সময় একজন খ্যাতনামা ইংরেজ মহারাণীর ঘোষণা কূটনীতিপ্রসূত, এইরূপ ইঙ্গিত করায় লর্ড রিপন, "ধর্ম্মনিষ্ঠতা জাতিকে উন্নত করে" (Righteousness exalteth a nation), বাইবেলের এই উক্তি উচ্চারণ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন।

তিনি দেশভাষায় পরিচালিত খবরের-কাগজ সম্বন্ধীয় আইন উঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনরায় স্বাধীনতা দেন। মহীশূর রাজ্য দেশীয় রাজার হস্তে পুনরার্পণ করেন। উহা এখন সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল রাজ্যগুলির মধ্যে একটি। কৃষিবিভাগের দ্বারা, তগাবী ঋণদান প্রবর্ত্তন দ্বারা, এবং যৌথঋণদানসমিতির প্রস্তাবদ্বারা রাইয়তদের হিতসাধন চেষ্টা করেন। লবণের উপর ট্যাক্স তিনি কমাইয়া দেন। তিনি এইরূপ আরও অনেক কাজ করেন। কিন্তু তাঁহার সম্পন্ন বা সমারব্ধ কাজের মধ্যে তাঁহার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না, যেমন তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে পাওয়া যায়।

ম্হাত্রের নির্ম্মিত নূতন মূর্ত্তি।

বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রে সম্প্রতি মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা চমরাজেন্দ্র বোদিয়ার

মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা চমরাজেন্দ্র বোদিয়ার।

মহোদয়ের যে প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমরা তাহার ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি দিলাম। বর্ত্তমান মহারাজা এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা করিবারই কথা। মূর্ত্তিটিতে বেশ একটি সজীব ভাব আছে। উহাতে কোন আড়ষ্টতা নাই। উহার কারিগরীও প্রশংসনীয়। বিখ্যাত লোকদের মূর্ত্তিস্থাপন আজকাল ভারতবর্ষে বিরল নয়। ব্রিটিশ রাজত্বকালে আগে আগে যত মানবমূর্ত্তি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা বিদেশ হইতে প্রস্তুত করিয়া আনা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কেননা যে মানুষটির মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে, উহা ঠিক তাঁহার চেহারার মত না হইলে পাশ্চাত্যরীতিসিদ্ধ হয় না। আধুনিক কালে সেরূপ মূর্ত্তিনির্ম্মাণপদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। এখন কিন্তু আর সে কথা বলা চলে না। ম্হাত্রের মত শিল্পী ঘরে থাকিতে বাহিরে যাইবার যে প্রয়োজন নাই, কেবল তাই নয়; বাহিরে যাওয়া অনুচিত। ইহা আমরা "স্বদেশী" ভাব হইতে বলিতেছি না। "স্বদেশী" ভাব হইতে অনেক ক্ষেত্রে দেশী জিনিষ কিছু নিরেশ হইলেও সরেশ বিদেশী জিনিষের বদলে তাহাই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ম্হাত্রের নির্ম্মিত মূর্ত্তিটি নিরেশ নয়, কলিকাতার গড়ের মাঠের দামী দামী বহু বিদেশী মূর্ত্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"রাজনৈতিক" দস্যুতা।

ডাকাতেরা দেশের লোকের টাকা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেছে। অনেক সময় গুপ্তধনের সন্ধান পাইবার জন্য অনেক গৃহস্থকে ভীষণ যন্ত্রণা দিতেছে। কখন কখন দস্যুদিগকে বাধা দিলে বা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে তাহারা গৃহস্থের বাড়ীর বা গ্রামের কাহারও কাহারও প্রাণবধ করিতেছে। এক্ষেত্রে যদি কেহ মনে করে যে এই দস্যুদের সঙ্গে দেশের লোকদের সহানুভূতি বা যোগ আছে, তাহা

হইলে তাঁহার মত ভ্রান্ত আর কে? যাহারা দস্যুদের দলভুক্ত, অর্থাৎ যাহারা নিজে ডাকাতি করে, বা ডাকাতদিগকে সন্ধান বলিয়া দেয়, বা ডাকাতি করিয়া প্রাপ্ত টাকাকড়ি রাখে বা জিনিষ বিক্রী করিয়া দেয়, কেবল তাহাদেরই পরস্পরের সঙ্গে যোগ থাকিবার কথা। কিন্তু, তাহারা সাড়েচার কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে কয়েক শত হইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং এস্থলে বঙ্গের সমুদয় লোককে, সমুদয় ভদ্রলোককে, সমুদয় শিক্ষিত যুবককে বা সমুদয় ছাত্রকে সন্দেহ করা অতি গর্হিত কার্য্য। যতগুলি ডাকাতি হয়, তাহার সবগুলিকে "রাজনৈতিক" ডাকাতি বলা যেমন ভুল তেমনি বেকুবীও বটে। কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গের লাটের মন্ত্রীসভার তদানীন্তন অন্যতম সভ্য সার্ উইলিয়ম ডিউক্ দেখাইয়াছিলেন যে অন্যান্য কোন কোন প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে দস্যুতা কম হয়, এবং এ প্রদেশে যতগুলি দস্যুতা হয়, তাহার মধ্যে সরকারী মতেও শতকরা মাত্র তিনটিকে "রাজনৈতিক" দস্যুতা বলা যাইতে পারে।

অবিচারে সব ডাকাতিকে "রাজনৈতিক" আখ্যা দেওয়া ত অনুচিত বটেই, "রাজনৈতিক দস্যুতা" কথার ব্যবহার হইতেই অনেক কুফল ফলিতেছে। স্কুলের ছেলেরা তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার এবং একজন দস্যুর কথোপকথন পড়ে। তাহাতে ডাকাতির জন্য ধৃত দস্যুকে আলেকজান্দার তিরস্কার করায় দস্যু দেখায় যে আলেকজান্দার বৃহৎভাবে সুকার্য্য ও কুকার্য্য যাহা যাহা করিয়াছেন, দস্যু ক্ষুদ্রভাবে ঠিক্ সেই সমস্তই করিয়াছে। ইংরেজী বিখ্যাত রয়্যাল রীডার্স গ্রন্থাবলীতে এই আখ্যান আছে। লেখক ইহার দ্বারা বালকবালিকাদিগকে এই উপদেশ দিতে চাহিয়াছিলেন যে দিগ্বিজয়ীকে লোকে বীর বলিয়া গৌরবমণ্ডিত করিলে বা বন্দনা করিলেও, বাস্তবিক তাহার অনেক কার্য্য দস্যুর কার্য্যের মতই জঘন্য ও নিন্দনীয়। কিন্তু পৃথিবীর সভ্যসমাজে এপর্য্যন্ত বিজয়ী যোদ্ধারা, বৈধযুদ্ধ ও অধর্ম্মযুদ্ধ উভয়েরই জন্য সমভাবে, যশ ও গৌরব লাভ করায়, কখন কখন বালকবালিকারা ঐ আখ্যানের রচয়িতার উদ্দেশ্যানুরূপ শিক্ষালাভ করে না; তাহারা দিগ্বিজয়ীকে দস্যুর মত দুর্বৃত্ত মনে না করিয়া, দস্যুকে দিগ্বিজয়ীর লব্ধ সম্মানের কিয়ৎপরিমাণে অধিকারী মনে করে। কোন দস্যুকে সাধারণ দস্যু না বলিয়া "রাজনৈতিক" দস্যু বলিলে তাহার নিজের মনেও এই ভাব আসিতে পারে যে, পররাষ্ট্রবিজয়ী যোদ্ধা যেমন যশ ও গৌরব পায়, সে-ও তাহা পাইবার অধিকারী, অধিকন্তু অল্পবয়স্ক ও সুবিবেচনায় অক্ষম বালক ও যুবকদের মনেও সাহসী দস্যুদের প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব জন্মে। ইহা সম্পূর্ণরূপে অবাঞ্ছনীয়। দস্যু যে, সে দস্যু; তাহার উদ্দেশ্য বা ভাল যাহাই হউক, তাহার কাজ গর্হিত ও নিন্দনীয়। অতএব সমুদয় দস্যুকে এক শ্রেণীতে ফেলা উচিত। কতকগুলি বা অনেকগুলি দস্যুতাকে "রাজনৈতিক" আখ্যা দিয়া পুলিশ নিজেদের চোর ধরিতে অক্ষমতা ঢাকিবার চেষ্টা করে। এরূপ চেষ্টা করিবার সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নয়।

অনেক বালক ও যুবক কেবল সাহস দেখানটাকেই বড় জিনিষ মনে করিয়া বিপথে চালিত হয়। সাহস ত বাঘ চিতা-বাঘ পিঁপড়া বোলতারও আছে। তাহাদিগকে কেহ শ্রেষ্ঠ জীব মনে করে না। সাহসের কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহার উপর নিন্দা প্রশংসা নির্ভর করে। দিয়াশলাইয়ের বাক্স কাছে থাকিলে, তাহার দ্বারা আগুন জ্বালিয়া রাঁধিয়া শত শত অনাথ আতুরকে খাওয়াইতে পার, ষ্টীম এঞ্জিনের দ্বারা রেলগাড়ী চালাইতে পার, কল কারখানা চালাইতে পার, আবার লোকের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিতেও পার। সর্ব্বত্রই একই আগুনের কাজ। কিন্তু কোন কাজ নিন্দনীয়, কোন কাজ বা প্রশংসনীয়। তেমনই সাহস যখন সৎকার্য্যের জন্য দেখান হয়, তখন তাহা ভাল; কুকার্য্যের জন্য দেখান হইলে তাহা মন্দ।

আমরা বহুকাল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলাম যে আমাদের দেশের একটুও শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোকের ছেলে ডাকাত হইতে পারে; এখনও বিশ্বাস করিতে বড় ক্লেশ বোধ হয়। কিন্তু এখন বোধ হয় আর অবিশ্বাস করা যায় না যে কেহ কেহ ডাকাতের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। পুলিশের ও অন্যান্য কাহারও

কাহারও মত এই যে এই দস্যুরা ডাকাতি দ্বারা প্রাপ্ত অর্থে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে চায়। যদি বাস্তবিক তাহাদের এরূপ উদ্দেশ্য বা বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। পরাধীনতা অপেক্ষা স্বাধীনতা যে ভাল, তাহা বুঝিতে বেশী জ্ঞান বুদ্ধির দরকার হয় না। পাইলে কে না স্বাধীন হইতে চায়? কিন্তু তাহার উপযোগী অবস্থা, উপায়, প্রাপ্ত স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্যতা, ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচ্য। উপায় সম্বন্ধে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বা অন্য উচ্চ বিবেচ্য বিষয়ের বিবেচনা না করিয়াও বলা যাইতে পারে, স্বাধীনতা লাভ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এবং যুদ্ধবিদ্যার আধুনিক অবস্থায় এই বিপথগামী যুবকদের কল্পিত উপায়ে হইতেই পাবে না। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত প্রধান প্রধান দেশের মধ্যে দৈনিক যুদ্ধব্যয় ইংলণ্ডের সকলের চেয়ে কম; তাহাও রোজ প্রায় দুই কোটি টাকা। "রাজনৈতিক দস্যু"রা যদি ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কতটুকু সময়ের যুদ্ধের খরচা তাহাদের ভাণ্ডারে আছে? ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতেই কোটি টাকা সাহায্য করা হইয়াছে। তাহার পর অস্ত্রের কথা। এখন যুদ্ধ প্রধানতঃ বড় বড় কামানের ব্যাপার। রিভলভার্ দুপাঁচটা লুকাইয়া চোরাইয়া সংগ্রহ বিদ্রোহেচ্ছুরা করিতে পারে, কিন্তু বড় বড় কামান ত পকেটের মধ্যে লুকাইয়া আনা যাইতে পারে না। রাশি রাশি গোলা গুলি টোটা বারুদ মানি-ব্যাগের মধ্যে সঞ্চিত হইতে পারে না। যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য আজকাল কয়েক হাজার বা কয়েক অযুত হইলে চলে না। জার্ম্মেনীর ইতিমধ্যে ত্রিশলক্ষ সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে বলিয়া ফরাশিরা অনুমান করে। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষকে কেহ স্বাধীন করিতে চাহিলে তাহাদের মোটামুটি এককোটি সুশিক্ষিত স্থলসৈন্য দরকার হইবে। কেননা মনে রাখিতে হইবে যে রুশিয়া ফ্রান্স ও জাপান ইংরেজদের বন্ধু। বিদ্রোহেচ্ছুদের কিন্তু একহাজার বা একশত কুচকাওয়াজে অভ্যস্ত সুশিক্ষিত সৈন্যও ত দেখিতে পাইতেছি না। এককোটি সৈন্যকে কুচকাওয়াজ শিক্ষা কে দিবে, কোথায় দিবে, তাহাও ত জানি না। আঁধার গলির আঁধার ঘরে কল্পনার প্রশস্ত ময়দানে একাজ হয় না। এখন দেখা যাইতেছে যে খুব শক্তিশালী নানা রকমের যুদ্ধজাহাজ এবং আকাশযান না থাকিলে কাহারও আধুনিকযুদ্ধে জিতিবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। বিদ্রোহপ্রয়াসীদের ভারতের স্বাধীনতালাভপ্রয়াসীদের জাহাজ নাই, আকাশযান নাই, নৌবিদ্যা জানা নাই, ব্যোমনাবিকতাও জানা নাই। যে দেশের একটু বা বহুবিস্তৃত সমুদ্রকূল আছে, তাহার স্বাধীনতা লাভ বা রক্ষা, কোনটিই, প্রবল রণতরীবিভাগ ভিন্ন কল্পনাও করা যায় না। যদি মনে করা যায়, যে, কোন কারণে ভারতবর্ষে ব্রিটিশরাজত্ব ২।১ মাস বা বৎসর পরে শেষ হইয়া যাইবে, তাহা হইলেও স্বাধীনতা রক্ষার কি আয়োজন আছে?

এমন এক সময় ছিল যখন একপ্রকার খণ্ডযুদ্ধ (guerilla warfare) দ্বারা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করা যাইত; যেমন মোগল রাজত্বকালে রাজপুতেরা ও মরাঠারা কখন কখন করিয়াছিল। কিন্তু সে কাল আর নাই। কতকগুলা ঢাল তলোয়ার সড়কিতে এখন আর লড়াই ফতে হয় না। ২।১টা বোমা হাতে ছুড়িয়াও কেহ বোমা ও শেল্ (shell) ছুড়িবার তোপের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারে না।

অতএব আমরা বলি, যাঁহারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ চান, তাঁহারা সকল দিক্ বেশ ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া, অকারণ অমূল্য জীবন, সময় ও শক্তির অপব্যয় হইতে নিবৃত্ত হউন।

আমাদের ধারণা এই যে, সব না হউক, অধিকাংশ ডাকাতিই পেশাদারী ডাকাতি, কেবল টাকার জন্য করা। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যের ডাকাতি যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে, উদ্দেশ্য পেশাদারী না হইয়া আর যাহাই হউক, পরের ধন অপহরণ অতি গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। ইহা দ্বারা কখনও কল্যাণ হইতে পারে না। উদ্দেশ্য ভাল হইলে যে-কোন উপায়কে বৈধ মনে করা যায় (The end justifies the means), ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। অর্থাৎ অসাধু উপায়ে সৎ কাজ হইতে

পারে, ইহা যাহারা ভাবে, তাহারা সৎ যে কি তাহা জানেই না। সৎ যাহা তাহা ভিতরে বাহিরে উদ্দেশ্যে ফলে সব দিক দিয়া সৎ। মোগল রাজত্বকালে মরাঠা নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ খুব মহৎকাজ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও দ্বারা স্বাধীনতালাভ বা অন্য মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ লুণ্ঠন অবলম্বিত হওয়ায় কালে লুণ্ঠনই অনেক নেতার, "বর্গী"দের, এবং পিণ্ডারী দস্যুদের প্রধান বা একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। ইহা মরাঠাদের অধঃপতনের এবং ভারতবর্ষে বিদেশীশক্তির প্রাধান্যের অন্যতম কারণ। ইতিহাস ভাল করিয়া পড়িলে আমাদের একথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

যে-সকল যুবক স্বাধীনতা চান, তাঁহাদের স্বাধীনতা কথাটার অর্থও ভাল করিয়া বুঝা উচিত।

স্বাধীনতার অর্থ।

একরকমের স্বাধীনতা এই যে, দেশের রাজা সেই দেশের, সেই দেশের অধিবাসী কোন জাতি হইতে উদ্ভূত, এবং সেই দেশেই থাকেন। এরূপ রাজা যদি যথেচ্ছাচারী হন, তাহা হইলেও সে দেশকে স্বাধীন বলা হয়। কিন্তু এরূপ স্বাধীনতা সন্তোষজনক নহে। যদি সন্তোষজনক হইত, তাহা হইলে তুরস্কের মুসলমান অধিবাসীরা সুলতান আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইত না। বর্ত্তমান সুলতান প্রজাবর্গের প্রতিনিধি দ্বারা নির্দ্ধারিত শাসনপ্রণালী অনুসারে চলিতে এবং তাহাদের সাহায্যে আইন করিতে বাধ্য। চীনের সম্রাট মাঞ্চুবংশের লোক ছিলেন, মাঞ্চু অভিজাতবর্গ প্রধান প্রধান কাজ পাইত। মাঞ্চুরা চীনেরই অধিবাসী হইয়া গিয়াছিল। তথাপি চীনের লোকেরা সন্তুষ্ট হয় নাই। জাপানেও জাপানেরই দেশী সম্রাট রাজত্ব করিতেন, কিন্তু সামুরাই অভিধেয় ক্ষত্রিয় অভিজাতেরাই প্রধান প্রধান রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। জাপানীরা তাহাতে সন্তুষ্ট ছিল না। এখন জাপানে সম্রাট প্রজাতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে রাজত্ব করেন, এবং সকলশ্রেণীর প্রজাই উচ্চতম রাজকার্য্য পাইবার অধিকারী। অতএব দেখা যাইতেছে যে দেশী রাজা বা দেশের শ্রেণীবিশেষ শাসনকর্ত্তা হইলেই দেশকে স্বাধীন বলা উচিত নয়। স্বাধীনতার সার বস্তু এই যে প্রজারা নিজে বা তাহাদের প্রতিনিধিরা আইন করিবে, ট্যাক্স বসাইবে কমাইবে বাড়াইবে, ট্যাক্সদ্বারা প্রাপ্ত রাজস্ব একমাত্র দেশের লোকের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিবে, দেশের লোকেরা জাতিধর্ম্মশ্রেণী নির্ব্বিশেষে যোগ্যতা অনুসারে যে-কোন উচ্চ বা অনুচ্চ পদ পাইবে, কাহারও উপর জুলুম জবরদস্তী হইবে না, এবং আইন-সঙ্গত বিচার ব্যতিরেকে কেহ কাহারও সম্পত্তির উপর বা ব্যক্তিগত দৈহিক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে বা প্রাণবধ করিতে পারিবে না। করিলে, যে করিবে তাহার দণ্ড হইবে।

যদি কেহ মানুষকে যন্ত্রণা দিয়া, প্রাণে মারিবার ভয় দেখাইয়া, বা প্রাণে মারিয়া তাহার ধন অপহরণ করে, তাহা হইলে এখানে ত স্বাধীনতার মূলনীতিভঙ্গ সম্পূর্ণরূপেই হইল। শ্যাম দেশকে জাতিকে স্বাধীন করিতে চায়; কিন্তু রামও যে দেশের একজন, রামকেও লইয়াও জাতি। রামের উপর জুলুম জবরদস্তি, রামের সর্ব্বস্ব অপহরণ, রামের প্রাণবধ দ্বারা শ্যাম যাহা করিতে চায়, তাহাকে শ্যাম যে নামই দিকনা কেন, তাহা স্বাধীনতা নহে। ইতিহাস খুঁজিয়া ১।১ টা বর্ত্তমান সময়ে অপ্রযোজ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্যামের পক্ষসমর্থনের চেষ্টা করা বৃথা। আমরা ইতিহাসের দৃষ্টান্ত অপেক্ষা মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে বড় জিনিষ বলিয়া মানি। তা ছাড়া, ইতিহাসে যেখানেই দেশের একশ্রেণীর লোক অন্যশ্রেণীর লোকের উপর অত্যাচার করিয়া দেশকে তথাকথিত স্বাধীনতা দিতে চাহিয়াছে, সেখানেই (যেমন প্রথম ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে ও পরে) স্বাধীনতার নামে ভীষণ অত্যাচার ও রক্তপাত হইয়াছে, এবং নূতন নামে পরাধীনতা আসিয়াছে।

আমরা ত্রিকালদর্শী নহি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে কি না, হইলে কখন হইবে, বা কি উপায়ে হইবে, তাহা আমরা মানস দিব্যচক্ষুতে পরিষ্কাররূপে দেখি নাই; সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলাম না। আমরা

হাতের কাছে যে কাজের একান্ত প্রয়োজন দেখিতেছি, তাহাই সকলকে করিতে অনুরোধ করিতে পারি। সেই কাজ, দেশের সকল জাতির সকল ধর্ম্মের নরনারী শিশু যুবা বৃদ্ধকে যথাসম্ভব সুস্থ, জ্ঞানী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ করা।

শ্রীযুক্ত গান্ধি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী।

ভারতসন্তানদের রাষ্ট্রীয় অবস্থার উন্নতির জন্য যাঁহারা কিছু করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মোহন-

শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্ম্মচাঁদ গান্ধি।
শোকের বেশে।

দাস কর্ম্মচাঁদ গান্ধি মহাশয় অদ্বিতীয়। নেতৃত্বশক্তি আধুনিক সময়ে এমন আর কোন ভারতবাসীর দেখা যায় নাই; নিজের দলের দরিদ্রতম অজ্ঞতম ব্যক্তির সহিত আনন্দে সমদুঃখভাগী এমন আর একজন নেতাও ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি দলের লোকদের সঙ্গে স্বদেশের ও স্বজাতির অধিকার ও ইজ্জৎ রক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ জেলে গিয়াছেন; স্বদেশী ও বিদেশী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও আহত হইয়াছেন; কিন্তু কখনও স্বদেশী বা বিদেশী কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনপ্রকার অবজ্ঞা, বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসাব্যঞ্জক কোন কথা বলেন নাই বা লেখেন নাই। অথচ নিজের মতে বরাবর পাহাড়ের মত অটল ও দৃঢ় ছিলেন। রাষ্ট্রীয় সম্মান ও অধিকার লাভের সংগ্রামে এই যে হৃদয়কে অপ্রেম ও প্রতিহিংসা হইতে বিমুক্ত রাখিবার চেষ্টা, ইহাতেও গান্ধিমহাশয় ভারতীয় নেতাদের মধ্যে অদ্বিতীয়।

যেমন তিনি, তেমনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী। তিনি কেবল নামে নয় কাজেও সহধর্ম্মিণী। স্বামীর মত, দক্ষিণআফ্রিকানিবাসিনী আরও অনেক ভারতনারীর মত, তিনি বার বার জেলে গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রবধূও সেই দলে ছিলেন। যখন ভারতবাসীরা কোন কোন সহরে জিনিষ ফেরী করিয়া বেচিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, তখন আরও অনেকের সঙ্গে গান্ধিজায়া ঝুড়ি মাথায় করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করিয়া কার্য্যতঃ এই নিষেধের প্রতিবাদ করেন ও তজ্জন্য দণ্ডিত হন। মনে রাখিতে হইবে, গান্ধি রাজমন্ত্রীর পুত্র, তাঁহার স্ত্রী রাজমন্ত্রীর দুহিতা ও পুত্রবধূ; এবং গান্ধি নিজে ব্যারিষ্টারী করিয়া মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করিতেন। দরিদ্রতমের সমদুঃখভাগী হইবার জন্য তাঁহারা রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করেন। গান্ধি মহাশয় ফলাহারী এবং খালি পায়ে থাকেন। কাহার সঙ্গে খাইবেন, সে বিষয়ে কিন্তু তিনি কোন জাতিবিচার করেন না। তিনি সম্প্রতি সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। হাজার হাজার মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, বাঙ্গালী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিল। পথের দুধারে লোকে লোকারণ্য। তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। এহেন লোকের আগমনে কলিকাতা ধন্য হইয়াছে।

জীবনের পূর্ণতালাভের সুযোগ।

আমাদের আরও কিছু বক্তব্য আছে। তাহা না বলিলে আমাদের সমালোচনা, পরামর্শ ও অনুরোধ নিতান্ত একপেশে হইয়া যায়।

খবরের কাগজে দেখা যাইতেছে যে বিলাতে এখন অপরাধী ও বেকার ভবঘুরের সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ এই যে অলস, কর্ম্মহীন, বা সাহস দেখাইতে ইচ্ছুক লোকেরা সব সৈন্য হইয়া গিয়াছে। তাহারা একটা কাজ পাইয়াছে। ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল এবং বর্ত্তমান দৃষ্টান্ত হইতেও প্রমাণ হইতেছে যে মানুষকে আইনভঙ্গ অপরাধ হইতে রক্ষা করিতে হইলে কড়া আইন করা ও পুলিশের সংখ্যা বাড়াইয়া তাহাদিগকে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া, প্রকৃষ্ট উপায় নহে। মানুষের অন্নবস্ত্রের অভাব, কর্ম্মের অভাব দূর করা আবশ্যক, এবং যাহারা বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া সাহস দেখাইতে চায়, তাহাদের সৎপথে থাকিয়াই সাহস প্রদর্শনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত।

আমাদের ধারণা এবং পূর্ব্বে উল্লিখিত ডিউক সাহেবের ডাকাতিবিষয়ক বৃত্তান্ত হইতেও জানা যায় যে বঙ্গের অধিকাংশ ডাকাতি পেশাদারী ডাকাতি; ২।১টা "রাজনৈতিক" দস্যুতা হইতে পারে। পেশাদারী ডাকাতির একটা প্রধান কারণ অন্নাভাব এবং সৎপথে থাকিয়া জীবিকানির্ব্বাহের যথেষ্ট উপায়ের অভাব। আধুনিক সভ্যদেশসমূহে গবর্ণমেণ্ট মানুষের দারিদ্র্যমোচন, দারিদ্র্যের মূল উৎপাটন, এবং কর্ম্মহীন লোকদের কর্ম্মের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশেও গবর্ণমেণ্টকে ইহা করিতে হইবে। যুবকদিগকে কেবল ইহা বলিলেই চলিবে না যে "তোমরা সবাই সরকারী চাকরী চাও কেন বা উকীল হইতে চাও কেন? গবর্ণমেণ্ট কি সকলকে চাকরী দিতে পারেন? উকীলও ত ঢের হইয়াছে।" তাহাদিগকে কৃষিশিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে উপার্জ্জনের নানা নূতন নূতন পথ দেখাইয়া দিতে হইবে, তাহার মত শিক্ষা দিতে হইবে, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দ্বারা, কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত এবং তল্লব্ধ জ্ঞানবিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া, এবং কোন কোন স্থলে কারখানা স্থাপনের জন্য সরকারী আর্থিক সাহায্য দিয়া কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইবে। আমাদের দেশটা সৃষ্টিছাড়া দেশ নয়, এবং আমরাও সৃষ্টিছাড়া জাতি নই। অন্যান্য দেশে যেরূপ কারণে যেরূপ ফল ফলিয়াছে, যেরূপ উপায়ে যে রোগের প্রতিকার হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ কারণে সেইরূপ ফল ফলিবে, এবং সামাজিক বা নৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলেও অন্যদেশের মানব প্রকৃতি এবং আমাদের দেশের মানব প্রকৃতি একই রকমের বলিয়া মনে করিতে হইবে।

যাঁহারা পাকা রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহারা কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না, কোন জাতিকেই নগণ্য তুচ্ছ জ্ঞান করেন না। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব এক ছোটলাট সার্ এডোআর্ড বেকার একবার দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন, "I am not afraid of driving sedition underground", "গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষের বা বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ্য বক্তৃতায় বা খবরের কাগজে প্রকাশ না পাইয়া যদি গোপনে গোপনে কাজ করে, তাহাতে আমি ভীত নই।" এই কথা যে বেশ জবরদস্ত হাকিমের মত বলা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে বক্তার রাজনীতিতে অনভিজ্ঞতাও প্রকাশ পাইয়াছিল। এরূপ কথা বলায়, এবং ইহার অনুরূপ আইন পাস হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের ইষ্টানিষ্ট কি হইয়াছে, তাহা এখন আমাদের আলোচ্য নহে; কিন্তু ইহাতে যে আমাদের অনেক যুবককে (বক্তার সেরূপ কোন অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য না থাকিলেও, বা তাহা ঘটিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা না থাকিলেও) পরোক্ষভাবে বিপথে চালিত করিয়াছে, আমরা এইরূপ অনুমান করি; কিন্তু তাহাও এখন আমাদের বক্তব্য নয়।

আমরা বলিতে চাই যে সার্ এডোআর্ড বেকারের মত অনেক শাসনকর্ত্তার ধারণা আছে, যে, আমাদের দেশের যুবকেরা অন্যান্য দেশের যুবকদের মত নয়। সেটা কিন্তু ভুল। সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মানুষের স্বভাবই এই

যে সে বিপদের মোহনবাঁশী শুনিলেই নিজের অনিষ্টের আশঙ্কা ভুলিয়া গিয়া তাহার দিকে ধাবিত হয়।" অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশের লোকেও বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া সাহস দেখাইতে পৌরুষ দেখাইতে চায়। "দেখাইতে চায়" বলাটা ভুল হইতেছে। বিপদ্‌কে অগ্রাহ্য করা, সাহসের কাজ করা, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করা, এই সব হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা লাভের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সাধনের উপায়। সভ্য ও অসভ্য দেশসকলে, সৎপথে থাকিয়া, আইনভঙ্গ না করিয়া, লোকে নানা কাজের ভিতর দিয়া এইরূপ উপায়ে জীবনের পূর্ণতা লাভ করে। আমাদের দেশেও, বিপদ্‌কে অগ্রাহ্য না করিলে, প্রবল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম না করিলে, শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত না করিলে, যাহাদের পৌরুষ চরিতার্থ হয় না, আইন-সঙ্গত পথে তাহাদের সেই চরিতার্থতা লাভের উপায় গবর্ণমেণ্টের এবং দেশের লোকদের করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শাসনকর্ত্তারা বিশ্বাস করুন, দেশের লোকেরা বিশ্বাস করুন, মধ্যযুগের রাজপুতদের মত বিপৎকামী মরণপ্রেমিক লোক এখনও ভারতবর্ষে জন্মে! ইহাদের প্রকৃতির অনুরূপ আইনসঙ্গত কাজ জুটাইয়া দিন্‌।

কাহারও কাহারও কেমন একটা ভুল ধারণা আছে, যে, বীর হইতে, মানুষ হইতে, বলিলেই তাহারা ভাবে যেন লোককে রক্তপাত করিতে উত্তেজিত করা হই-তেছে। লোকে যাহাই ভাবুক, আমরা গুপ্ত বা প্রকাশ্য নরহত্যাকারীদিগকে বীর ত মনে করিই না, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের সাহসিকতা প্রযুক্ত বা হাজার হাজার যোদ্ধার রণোন্মাদের সংক্রামকতার বশে মানুষ মারিতে মারিতে নিজেদের প্রাণ হারায়, তাহারাও নিশ্চয়ই এক-প্রকারের শৌর্য্য দেখাইলেও, তাহাদের চেয়ে তাহাদিগকেই খুব বেশী বীর বলিয়া মনে করি যাহারা বিভীষিকাপূর্ণ সংক্রামক মহামারীর সময় রোগীর সেবা করে, নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য উৎপীড়কদের দ্বারা কারারুদ্ধ, আহত, বা নিহত হয়, বা অধিকাংশ লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাস, শক্তিশালী সম্প্রদায়ের স্বার্থ, বা দেশের কদাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, দৈহিক স্বাধীনতা, এমন কি প্রাণকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করে। গুণ্ডামি ও বীরত্বের প্রভেদ ভাল করিয়া বুঝা সকলেরই, বিশেষ করিয়া যুবকদের কর্ত্তব্য। বীরত্বের প্রধান উপাদান সাহসের সদ্ব্যবহার। শুধু নির্ভীকতা থাকিলে হইবে না, তাহার সদ্ব্যবহার চাই। প্রতিহিংসা, নারীপ্রেমমূলক ঈর্ষ্যা, বা অন্যবিধ কারণে মানুষ খুন করিয়া হন্তা নিজে থানায় হাজির হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রত্যেক জেলায় পাওয়া যাইবে। তাহাদিগকে কেহ বীর মনে করে না। অতএব বোমা ছুড়িয়া বা গুলি মারিয়া পলায়ন করিলে বা ধরা দিলেই, তাহাকে বীর বলিতে হইবে, ইহা মনে করা অতি অকল্যাণকর ভ্রম।

অনেক সরকারী কর্ম্মচারী "মনুষ্যত্ব", "পৌরুষ", "বীর", প্রভৃতি শব্দকে বিভীষিকাপূর্ণ মনে করেন। তাঁহাদের জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা আবশ্যক। ১৯১২ সালের ৬ই জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা বহুসংখ্যক স্কুলকলেজ জালের মত দেশ ছাইয়া ফেলুক, এবং তাহা হইতে রাজভক্ত, পৌরুষপূর্ণ এবং কার্য্যক্ষম লোক সকল বাহির হউক।" পৌরু-ষের অনুকূল ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করুন।

ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ দলাদলি ঝগড়া, এসব লইয়া থাকিলে জীবনের পূর্ণতা লাভ অসম্ভব। জন-সমাজের হিতকর বড় বড় কাজ, দায়িত্বপূর্ণ বড় বড় কাজ, যাহাতে নেতৃত্বের, শক্তির প্রয়োজন, এরূপ কাজ করিতে পাইলে তবে জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়। সকলে বিশ্বাস করুন, ভারতবাসীরাও এই পূর্ণতার পথের পথিক হইবার উপযুক্ত; তাহাদেরও এরূপ বড় হইবার ও বড় কাজ করিবার যোগ্যতা আছে বা জন্মিতে পারে। অতএব কৃত্রিম উপায়ে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কোন দিকে দেওয়াল তুলিয়া বা দ্বার রুদ্ধ করিয়া যেন রাখা না হয়। ইহাতে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয়, এবং তাহাদের অনিষ্ট হয়।

অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে এই হেতু মনের মধ্যে বিরোধী ভাব জন্মে। যাহাদের মাথা ঠাণ্ডা নয়, যাহাদের ধৈর্য্য কম, প্রতিকারের ঠিক উপায় সম্বন্ধে

বিবেচনা করিবার শক্তি কম, তাহারা আইনভঙ্গ করিলে তাহাদিগকেই দোষী স্থির করা হয় বটে, এবং তাহারা যে দণ্ডার্হ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বুঝিতে বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না, যে, যেমন মেঘের যে বিন্দু হইতে বিজলী চমকে বা বজ্র পড়ে, কেবল সেই অংশই তাড়িতশক্তিতে পূর্ণ নয়, সমস্ত মেঘটাই তাড়িতে ভরা এবং অন্য যে মেঘ বা অপর বস্তু পর্য্যন্ত বিজলীরেখা বিস্তৃত হয় তাহাও বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত তাড়িতে ভরা; তেমনি প্রতিহিংসাজনিত সর্ব্বপ্রকার আইনভঙ্গ ভারতের অধিবাসী ও প্রবাসী নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মন-কষাকষি বা অন্য বিরুদ্ধ ভাব আছে, তাহারই ফল। এ বিষয়ে উভয়পক্ষই অল্পাধিক দোষী। অতএব এইরূপ অবাঞ্ছনীয় অবস্থার প্রকৃত প্রতিকার শুধু দণ্ডনীয়দিগকে দণ্ড দেওয়া নয়, বিরুদ্ধ ভাবের উত্তরোত্তর হ্রাস ও বিনাশসাধনই শ্রেষ্ঠ প্রতিকার।

বিরোধী ভাবের জন্ম ও বিনাশ।

বিরোধীভাবের উৎপত্তির একটা কারণ দেখাইয়াছি। আরও নানা কারণ আছে। দু একটার উল্লেখ করিতেছি। কেহ কোন কারণে পুলিশের সন্দেহভাজন হইল; কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার বা অভিযুক্ত করিবার মত কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। কিম্বা হয়ত সে অভিযুক্ত ও হাজতে আবদ্ধ হইল এবং বিচারে দণ্ডিত হইল বা বেকসুর খালাস পাইল। এই রকমে পুলিসের সন্দেহভাজন অনেক লোক আছে, যাহারা বাস্তবিক সম্পূর্ণ নিরপরাধ বা যাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। এইরূপ কোন লোক কোন কলেজে পড়িতে গেলে তাহার শিক্ষালাভ দুঃসাধ্য, অনেকস্থলে অসম্ভব, হয়; চাকরী করিতে গেলে সে চাকরী পায় না, পাইলেও পুলিশবিভাগের প্রভাবে চাকরী থাকে না। এই প্রকারে তাহাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে। আর এক প্রকারে এই সব লোক বাঁচিয়া থাকাটাকে আরামের বিষয় মনে করিতে পারে না। কোথাও একটা কিছু ডাকাতি বা খুনজখম হইল, অমনি প্রমাণ থাক্ বা না থাক্ এই সব লোক গ্রেপ্তার হইল। সম্প্রতি বড়লাটের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে বহুসংখ্যক যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁরপর তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিবামাত্র তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হয় নাই, কোন বিচারকের নিকটও লইয়া যাওয়া হয় নাই, জামীনও চাওয়া হয় নাই। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের প্রজাদের দৈহিক স্বাধীনতা বিনা অভিযোগে বা বিনা বিচারে কেহ নষ্ট করিতে পারে না, এইরূপ একটা সাধারণ ধারণা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এরূপস্থলে বা অন্যান্য স্থলে বিনা দোষে অবরুদ্ধ লোকেরা ও তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা আনন্দিত হয় না। তাহাদের মনে বিরোধী ভাবই জন্মে।

যেখানে যেখানে মানুষ বিনাদোষে অন্যায় ভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত বা উৎপীড়িত হয়, সেখানেই বিরোধী ভাব সঞ্চিত হইতে থাকে।

যাঁহাদের শক্তি আছে, তাঁহাদের দেখা উচিত, যাহাতে দেশে মরিয়া লোকের সংখ্যা না বাড়িয়া কমিতে থাকে। কড়া শাসনে মরিয়া লোকদের খুব বেশী আসে যায় না; তাহাতে কিন্তু নিরীহ লোকদের অসুবিধা ও কষ্ট হয়। দণ্ড দিবার শক্তি প্রয়োগে ও শাসন করিবার শক্তি প্রয়োগে এক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। মানবপ্রীতি ও ন্যায়পরায়ণতা দ্বারাই বিরোধী ভাব ও বিরুদ্ধ চেষ্টা প্রশমিত ও বিনষ্ট হইতে পারে।

বিজলীর চমক সম্বন্ধে একটি ইংরাজী প্রবন্ধে দেখিলাম যে কোন মেঘে বেশী তাড়িতশক্তি সঞ্চিত হইলে তাহা বিজলীর চমক বা বজ্রপাতের আকার ধারণ করে। শেষে বলা হইতেছে—"Rain discharges the electricity quietly to earth, and lightning frequently ceases with rain." অর্থাৎ বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মেঘের তাড়িত পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছে, এবং অনেক সময় বৃষ্টি থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজলীও থামে।" ইহা পড়িয়া আমাদের মনে হইল মানুষের মধ্যেও পরস্পরের সহিত জড়ীয় বা অন্য প্রকারের হানাহানি থামিয়া যায়, যদি প্রীতির বারিপাত হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত প্রীতি হওয়া চাই। হাতে রাখিবার জন্য

মুরুব্বিয়ানা বা অনুগ্রহ এ নাম পাইতে পারে না; পক্ষান্তরে ভয় বা স্বার্থপ্রণোদিত খোসামোদও এ নামের অযোগ্য।

দস্যুতা ও অস্ত্র-আইন।

দেশের লোককে অস্ত্রহীন ও অসহায় জানায় যে ডাকাতদের বুকের পাটা বাড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য অনেকেই বলিতেছেন, অন্ততঃ যে সব লোককে গবর্ণমেণ্ট কতকটা বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহাদিগকে অস্ত্র রাখিবার ও ব্যবহার করিবার অনুমতি দেওয়া হউক। এ বিষয়ে বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি এক প্রশ্নও জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। তাহার উত্তরে গবর্ণমেণ্টের মত জানিতে পারা গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে যদি ধনী মহাজন, সওদাগর, জমীদার প্রভৃতি ব্যক্তিরা পেন্সনপ্রাপ্ত পশ্চিমা সিপাহীদিগকে রক্ষী নিযুক্ত করেন, তবে তাহাদিগকে অস্ত্র রাখিবার অধিকার দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা কেন গবর্ণমেণ্টকে এরূপ উত্তর দিতে পরামর্শ দিয়াছেন, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; কারণ "পরচিত্ত অন্ধকার।" কিন্তু লোকে অনুমান করিতেছে যে, হয়, সরকারী কর্ম্মচারীরা বাঙালীকে অস্ত্র দিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না, নয়, তাহাদিগকে এরূপ ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া অবজ্ঞা করেন, যে তাহারা অস্ত্র পাইলেও দস্যু তাড়াইতে পারিবে, এরূপ ভরসা রাখেন না। বিশ্বাস অবিশ্বাস কাহাকেও জোর করিয়া করান যায় না। সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু অস্ত্রচালনায় বাঙ্গালী হয়ত সমর্থ হইতেও পারে। কারণ যে দস্যুরা অস্ত্র চালাইয়া ডাকাতি করে, তাহারাও অনেকে বাঙালী; যদি আইনবিরুদ্ধ কাজ করিবার বেলায় কতকগুলি বাঙালী অস্ত্র চালাইতে পারে, তাহা হইলে আত্মরক্ষারূপ যে আইনসঙ্গত কার্য্য তাহার জন্য অন্য কতকগুলি বাঙালী কেন অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না? দু-এক স্থলে গৃহলক্ষ্মীরাও ত রণরঙ্গিণী হইয়া ডাকাতদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। অস্ত্র আইনের কড়াকড়িতে দেশে শিকারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। তথাপি এখনও অনেকে বাঘ ভাল্লুক মারে।

গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে হইলে ধনীদের অপমানবোধ হইবার সম্ভাবনা। এমনি অনেক ধনী সশস্ত্র চাকর রাখেন; কিন্তু এ সর্ত্তে রাখেন না যে তাঁহাদের নিজের অস্ত্রব্যবহারে অধিকার থাকিবে না। কিন্তু চাকর যে অধিকার পাইবে, মনিব তাহা পাইবে না, এ সর্ত্তে মান ইজ্জত থাকে কেমন করিয়া? ইহাতে চাকরও ত মনিবকে অবজ্ঞা করিতে পারে। বর্ত্তমানে ধনীরা কেবল ডাকাতদের ভয়ে ভীত; তাহার উপর, নিজে নিরস্ত্র এবং চাকর সশস্ত্র এরূপ অবস্থা ঘটিলে চাকরদের কৃপারও ভিখারী হইতে হইবে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট পুনর্বিবেচনা করিলে ভাল হয়। দস্যুরা যেমন করিয়া হউক অস্ত্রসংগ্রহ করিবে, কিন্তু নির্দ্দোষ লোকেরা সহজ সর্ত্তে অস্ত্র পাইবে না, এরূপ অবস্থা দেশের শান্তিরক্ষার অনুকূল নয়। ইহা দ্বারা সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি লোকের অনুরাগ ও সদ্ভাব না বাড়িবার সম্ভাবনা।

অনাথাশ্রম।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের মীর আসাদ আলী জিজ্ঞাসা করেন যে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের কতগুলি অনাথাশ্রম আছে। তাহার উত্তরে জানা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান অনাথাশ্রমের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ:—

প্রদেশ	হিন্দু	মুসলমান	মোট
মান্দ্রাজ	৩	৫	৮
বোম্বাই	১৪	৯	২৩
বাংলা	৩	৪	৭
আগ্রা অযোধ্যা	১১	১৩	২৪
পঞ্জাব	১২	৭	১৯
বেহার	২	১	৩
মধ্যপ্রদেশ	২	২	৪
আসাম	১	০	১
	৪৮	৪১	৮৯

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে সমুদয় ভারতবর্ষে মোটামুটি ৮৯টি অনাথাশ্রম আছে। হিন্দুদের ৪৮টির মধ্যে কেবল ২৬টিতে বালিকা রাখিবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে।

মুসলমানদের ৪১ টির মধ্যে কেবল ১৪ টি আশ্রম বালিকা লইতে প্রস্তুত। আরও অধিকসংখ্যক আশ্রমে অনাথা বালিকাদের বাস ও শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের সংখ্যার সিকির কিছু বেশী। অথচ তাহারা হিন্দুদের প্রায় সমান সমান অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছে। হিন্দুরা এ বিষয়ে মুসলমানদের চেয়ে পশ্চাৎপদ কেন, তাহা চিন্তার বিষয়। একান্নবর্ত্তী প্রথা প্রচলিত থাকায়, অনাথাশ্রম স্থাপিত না হইলেও অনেক পিতৃমাতৃহীন শিশু প্রতিপালিত হয়। কিন্তু এই প্রথা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও আছে। হিন্দুরা যে মুসলমানদের চেয়ে দয়াধর্ম্মে নিকৃষ্ট তাহাও বোধ হয় না। মুসলমানদের আয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দানকার্য্যে ব্যয়িত হইবার ব্যবস্থা তাহাদের শাস্ত্রে আছে। হিন্দুদের শাস্ত্রে এরূপ একটা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও হিন্দুদের মত জাতিভেদ বা বর্ণভেদ নাই। এইজন্য তাহাদের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা দুঃস্থ অসহায় নিম্নশ্রেণীর বালকবালিকাদের জন্য যতটা প্রাণের টান অনুভব করে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের হৃদয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বালকবালিকাদের জন্য ততটা দরদ সম্ভবতঃ নাই। আমরা যে সব কারণ অনুমান করিতেছি, তাহা অমূলক হইলে, অন্য কি কি কারণ থাকিতে পারে তাহা অনুসন্ধেয়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় কি পরিমাণে নিজের নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, তাহা তত্তৎপ্রদেশের নিম্নলিখিত হিন্দুমুসলমান অধিবাসীর সংখ্যার তালিকার সহিত অনাথাশ্রমের তালিকার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে।

প্রদেশ	হিন্দুঅধিবাসী	মুসলমানঅধিবাসী
মান্দ্রাজ	৩৬৮ লক্ষ	২৭ লক্ষ
বোম্বাই	১৪৯ "	৪০ "
বাংলা	২০৩ "	২৩৯ "
আগ্রা-অযোধ্যা	৪০২ "	৬৬ "
পঞ্জাব	৮৬ "	১০৯ "
বেহার	২৮৩ "	৩৬ "
মধ্যপ্রদেশ	১১৪ "	৫ "
আসাম	৩৬ "	১৮ "

উভয় তালিকা তুলনা করিয়া দেখা যাইতেছে, মান্দ্রাজ বোম্বাই, বাংলা, আগ্রা-অযোধ্যা, বেহার এবং মধ্য-প্রদেশে অধিবাসীর সংখ্যা অনুসারে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানেরা অনাথদের দুঃখ নিবারণে অধিক সচেষ্ট। কেবলমাত্র পঞ্জাব ও আসামে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে এবিষয়ে অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণ। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ সকলের তুলনায় আমরা সকলেই এ বিষয়ে অত্যন্ত হীন। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েল্‌স্‌ ও আয়ার্লণ্ডের লোক-সংখ্যা বাংলাদেশের সমান। অথচ বিলাতে, ছোটগুলি বাদ দিয়া, প্রধান প্রধান অনাথাশ্রমই আছে ৬৮টি; বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমানদের আছে মাত্র ৭ টি। সকল প্রদেশের সঙ্গে বিলাতের তুলনা নীচের তালিকা দ্বারা করা যাইতে পারে।

দেশ	অধিবাসী	অনাথাশ্রম
বিলাত	৪৫১ লক্ষ	৬৮
মান্দ্রাজ	৪১৪ "	৮
বোম্বাই	১৯৬ "	২১
বাংলা	৪৫৪ "	৭
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৭১ "	২৫
পঞ্জাব	১৯৯ "	১৯
বেহার	৩৪৪ "	৩
মধ্যপ্রদেশ	১৩৯ "	৪
আসাম	৬৭ "	১

এই তালিকা হইতে ইহাও দেখা যাইতেছে যে অধিবাসীর সংখ্যা বিবেচনা করিলে অনাথদের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদাসীন মান্দ্রাজ, বাঙ্গলা ও বেহার। ভারতীয় প্রদেশগুলির মধ্যে বোম্বাই সকলের চেয়ে সচেষ্ট, তাহার পর পঞ্জাব, এবং তাহার পর আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ। কোন্ কোন্ প্রদেশের মুসলমানেরা এবং কোন্ কোন্ প্রদেশের হিন্দুরা কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ তাহাও আমাদের তালিকাগুলি হইতে স্থির করা যায়। তাহা পাঠকেরা সহজেই করিতে পারিবেন। তবে, যে দেশে কোন সম্প্রদায়ই কর্ত্তব্যপালনে যথেষ্ট মনোযোগী নহেন, তথায় উনিশ কুড়ির বিচার করিয়া কি হইবে?

স্কুলে ছাত্রের সংখ্যা সম্বন্ধে মত।

সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাসগ্রাম ভাঙড়া-ভাবলায় তিনি একটি মধ্যইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। উহার ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ হর্নেল তথায় গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি এক বক্তৃতায় বলেন; "He was not in favour of large schools, his view was that 400 or 500 boys were as many as any one headmaster could look after." "তিনি বৃহৎ স্কুল সকলের পক্ষপাতী নহেন; তাঁহার মত এই যে, যে-কোন এক জন হেডমাষ্টার ৪০০ বা ৫০০র বেশী ছেলের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না।"

তত্ত্বাবধানের মানেটা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। ভারতের বড়লাট ভারতের সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের মঙ্গলামঙ্গল দেখেন। বঙ্গের লাট সাড়ে বার কোটি লোকের মঙ্গলামঙ্গল দেখেন। বোম্বাইয়ের লাট সাড়ে উনিশ কোটি লোকের তত্ত্বাবধান করেন। বোম্বায়ের লাট অপেক্ষাকৃত অল্পলোকের শাসনকর্ত্তা বলিয়া বঙ্গের লাটের দ্বিগুণ অপেক্ষাও ভাল বা বেশী কাজ করেন, কিম্বা সাড়ে উনিশ কোটি লোকের বেশী মানুষের খবরদারী কোন গবর্ণর করিতে পারেন না, এমন অদ্ভুত কথা ত কেহ বলে না। আসল কথা, যেমন লাট সাহেবেরা নিজের হাতে সব কাজ করেন না, নিজের চোখে সব জিনিষ দেখেন না, অধিকাংশ কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সহকারীদের সাহায্যে, তেমনি হেড্‌মাষ্টারও নিজে সব ছেলের খবরদারী করেন না। তিনি মোটের উপর সমুদয় স্কুলের ছেলেদের বিনয় (discipline), শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন, এবং তদনুসারে কাজ হইতেছে কি না দেখেন; এবং তাহার উপর নিজেও ১।২টা ক্লাসে ১।১ বিষয় শিক্ষা দেন। প্রত্যেক ছেলের খবর ছেলে যে ক্লাসে পড়ে, তাহার শিক্ষকেরাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাখিতে পারেন। হেড্‌মাষ্টারকে এত সূক্ষ্মরূপে তত্ত্বাবধান করিতে হইলে ৪০০।৫০০ কেন, ১০০ ছেলেরও খবরদারী তিনি করিতে পারেন না। আজকাল সরকারী কর্ম্মচারীদের মহলে একটা ধুয়া উঠিয়াছে যে, বঙ্গের বড় বড় জেলাগুলা ভাঙিয়া ছোট ছোট জেলায় ভাগ করা উচিত। নতুবা ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে পারেন না। এই ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মানে কি, উদ্দেশ্য কি, ফলই বা কি, তাহার বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, বাংলা দেশের সকলের চেয়ে ছোট জেলা কটি, তাহার ম্যাজিষ্ট্রেটরা মোকদ্দমা বা তদন্ত উপলক্ষে ক'টি দেশী মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, অন্য উপলক্ষেই বা ক'টি দেশী মানুষের সঙ্গে কথা বলেন? বড় লাট, মেঝো লাট, ছোট লাট, কমিশ্যনার, ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহই নিজে তাঁহাদের শাসনাধীন সমুদয় লোকের তত্ত্বাবধান করেন না, করিতে পারেন না। কম বা বেশী সহকারীর সাহায্যে কাজ চালান। সুতরাং কোন্ রকম কর্ম্মচারীর অধীনে কত বড় ভূখণ্ড বা কত মানুষ রাখা যায়, তৎসম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা স্থির করা যায় না। তদ্রূপ, স্কুল বা কলেজে কত ছেলে থাকিলে হেড্‌মাষ্টার বা প্রিন্সিপ্যাল তাহা চালাইতে পারেন, কত হইলে পারেন না, তাহাও বলা যায় না। ৪০০ বা ৫০০র বেশী ছেলের তত্ত্বাবধান একজন হেড্‌মাষ্টার করিতে পারেন না, ইহা বলা গাজোরী মাত্র। আমরা এ বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক লিখিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন সভ্যদেশে কিরূপ বেশী বেশী ছাত্র এক এক স্কুলে পড়ে, তাহারও দৃষ্টান্ত দিয়াছি। কতকগুলি সংখ্যার পুনরুল্লেখ এবং কতকগুলির নূতন করিয়া উল্লেখ করিতেছি।

বিলাতের বিখ্যাত ইটন বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১০০০ এর উপর, বেড্‌ফোর্ড গ্রামার স্কুলের ৭৪০, চার্টারহাউস স্কুলের ৫৮০, চেল্টেনহামের ৫৭৫, ক্লিফ্‌টনের ৬০০, ডাল্‌উইচের ৬৬০, মার্লবরার ৬১০, সেন্টপলসের ৬০০, বার্মিংহাম কিং এডওয়ার্ডস্ স্কুলের দুইহাজার আটশত।

জাপানের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ১০০০এর উপর ছাত্র আছে। একটিতে, সাধারণ শিক্ষাবিভাগে ২৩০০ এবং উচ্চতর শিক্ষাবিভাগে ১২৭০ জন, মোট ৩৫৭০ জন ছাত্র আছে। টোকিওর একটি উচ্চশ্রেণীর স্কুলে ১০০০ এর উপর ছাত্র আছে। জাপানী উচ্চশ্রেণীর স্কুলগুলির গড় ছাত্রসংখ্যা ৬০০।

আমেরিকার টাস্কেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৫২৭; ওআশিংটন কলার্ড্ হাইস্কুলের ১৫০০; নিউ ইয়র্ক সহরের ১৪০সংখ্যক স্কুলটির ছাত্রসংখ্যা ৪২১৪, ৪২-সংখ্যক স্কুলটির ছাত্রসংখ্যা ৩১৪২, ১৮৪সংখ্যক স্কুলটির ছাত্রসংখ্যা ৩১৩৬; শিকাগোর হাইড্‌পার্ক্ হাইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৫৫৬, জ্যাক্সন্‌স্কুলের ১৯৫২, বার্স্কুলের ১৫১৯, ব্রায়েন্টস্কুলের ১৩২৭; ক্যান্সাস্ সিটির সেন্ট্র্যাল হাইস্কুলের ২৫৭৪; ডেস্ মইন্স্ ওয়েষ্ট হাইস্কুলের ১১৫৪; নিউইয়র্ক ওয়াশিংটন্ আর্ভিং হাইস্কুলের ৪৯৭১।

যে সব দেশের দৃষ্টান্ত দিলাম, তথাকার লোকেরা সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, শিক্ষাপ্রিয়, ধনী, এবং স্বাধীন। যদি প্রত্যেক স্কুলে ৪০০।৫০০র বেশী ছেলে থাকিলে তাহাদের শিক্ষা খারাপ হইত, তাহা হইলে তাহারা কখনই পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ অতি বৃহৎ বৃহৎ স্কুল থাকিতে দিত না। ছোট ছোট স্কুল যথেষ্টসংখ্যক খুলিতে তাহারা পারিত; কারণ তাহাদের টাকাও আছে, এবং তাহারা নিজেই নিজের দেশের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা বলিয়া কেহ বাধা দিতেও পারিত না। আমাদের দেশে শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীরা যথেষ্ট নূতন স্কুলও স্থাপন করিতেছেন না, আবার বর্ত্তমান স্কুলগুলিতে অল্পসংখ্যক ছাত্র যাহাতে শিক্ষা পায়, তজ্জন্য অনেক উচ্চ উচ্চ আদর্শের লম্বা-চৌড়া ফর্দ্দ করিয়া আমাদিগকে নির্ব্বাক্ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে আমাদের মনে অতি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতেছে।

প্রাথমিকশিক্ষার বঙ্গে হ্রাস ও অন্যত্র বৃদ্ধি।

আমরা ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি যে যেমন একদিকে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার হ্রাস হইতেছে, তেমনি অপরদিকে পঞ্জাব, আগ্রা-অযোধ্যা,

উত্তরপশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ-ও-বেরার, এবং ব্রহ্মদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বৃদ্ধি হইয়াছে।

আরও দুইটি প্রদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তাহার ছাত্র বাড়িয়াছে। ১৯১৩-১৪ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ৬২১টি বালকদের পাঠশালা বাড়িয়াছে এবং সমুদয় বালকপাঠশালায় ছেলে বাড়িয়াছে ২৭,১৭০। বালিকা-পাঠশালা বাড়িয়াছে ৭২টি এবং ছাত্রী বাড়িয়াছে ৯৮৩৯। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বালকপাঠশালা বাড়িয়াছে ৭৯৪ টি এবং ছাত্র বাড়িয়াছে ৭১২৩৮। বালিকাপাঠশালা ও তাহাতে ছাত্রীর বৃদ্ধির সংখ্যা এখনও জানিতে পারি নাই।

আর সব প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষারবিস্তার হইতেছে; বঙ্গদেশে উহার বিস্তারের পরিবর্ত্তে উহার ক্ষেত্র সংকীর্ণতর কেন হইতেছে, সর্ব্বসাধারণ শিক্ষাবিভাগের নিকট তাহার সন্তোষজনক কারণ জানিতে চাহুন।

বিলাতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার।

ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগ এইরূপ একটা আন্দাজ ধরিয়া রাখিয়াছেন যে দেশের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১৫ জন শিক্ষা পাইবার বয়সের মানুষ; অর্থাৎ কোন দেশে যদি যথেষ্ট স্কুলকলেজ থাকে, এবং সবাই নিজের প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে শিক্ষালয়ে পাঠায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে সে দেশের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট অধিবাসী সংখ্যার শতকরা ১৫ জন। আমাদের মনে হয় যে ইহা কম করিয়া ধরা হইয়াছে। কারণ, আমেরিকার ইউনাটেড ষ্টেটসের অধিবাসী-সংখ্যা মোটামোটি প্রায় ১০ কোটি; তথাকার কেবল সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে (কলেজ আদি না ধরিয়া) ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোটামোটি ২ কোটি। অর্থাৎ মোট অধিবাসী সংখ্যার শতকরা ২০ জন কেবল সাধারণ বিদ্যালয়েই পড়ে। কলেজাদি ধরিলে আরও বেশী হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মোট সর্ব্বপ্রকারের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল দু কোটি এগার লক্ষ দু হাজার একশত তের (২,১১,০২,১১৩)। সুতরাং আমাদের শিক্ষাবিভাগ যে ছাত্রছাত্রীর সম্ভবপর ঊর্দ্ধ সংখ্যা মোট অধিবাসীর শতকরা ১৫ জন ধরেন, তাহা নিতান্ত কম; ২১।২২ জন ধরিলে তবে ঠিক হয়। যাহা হউক ১৫ জনই যদি ঠিক বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের মোট অধিবাসী ৩,৬০,-৭০,৪৯২এর মধ্যে ছাত্রছাত্রীর ঊর্দ্ধসংখ্যা হয় ৫৪,১০,৫৬০। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে তথায় ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে, কলেজগুলি না ধরিয়া, কেবল নানা প্রকার স্কুলে ৫৬,২১,৬৬৩ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। যদি শতকরা ১৫ জনই ঊর্দ্ধসংখ্যা হইত, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত ২,১১,১০৩ ছাত্রছাত্রী কোথা হইতে আসিল? ইহার উপর আবার কলেজের ছাত্রছাত্রী আছে।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষীয় শিক্ষা-বিভাগের আন্দাজ অনুসারে শতকরা একশত জনেরও বেশী বালকবালিকা বিলাতে শিক্ষা পায়। তাহাতেও ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬ টি বাড়িয়াছিল। ইংলণ্ডের তুলনায় বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার অতি সামান্যই হইয়াছে। কিন্তু এখানকার শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীরা এমন যোগ্য লোক যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্রমশঃ কমিয়া চলিতেছে।

প্রাচীন-ভারতে ইস্পাত।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পশ্চিম চক্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত দিবাকর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর গোয়ালিয়র রাজ্যের বেশনগরে কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন। তথায় "খাম বাবা" নামক একটি স্তম্ভ আছে। উহার নীচে তিনি দু টুকরা লোহা পান। তাহার এক খণ্ড রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য তিনি সার রবার্ট হ্যাড-ফীল্‌ডের নিকট পাঠাইয়া দেন। উহা বিশ্লেষণ করিয়া উহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সার রবার্টের এরূপ ধারণা হয় যে তিনি ফারাডে সোসাইটীর এক অধিবেশনে উহার সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে গত কয়েক বৎসরে প্রাচীন লোহা ও তথাকথিত ইস্পা-তের যে সকল নমুনা তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহার কোনটিতেই তিনি এরূপ পরিমাণে অঙ্গার দেখিতে পান নাই, যাহাতে তাহাকে আধুনিক অর্থে ইস্পাত বলা চলে; ভাণ্ডারকর-প্রেরিত এই ইস্পাতের নমুনাটিই আধুনিক সময়ে প্রদর্শিত একমাত্র ধাতুখণ্ড যাহা অধিক পরিমাণে অঙ্গারমিশ্রণজাত ইস্পাত এবং যাহা জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শক্ত করা হইয়াছে। সার্ রবার্ট হ্যাড্‌ফীল্‌-ডের বিশ্লেষণ-ফল "এঞ্জিনীয়ারে" ছাপা হইয়াছে। তাহা দ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় যে ভাণ্ডারকরের নমুনাটি খাঁটি ইস্পাত। এতদিন কেবল সাধারণ লোকে নয়, প্রত্নতত্ত্ববিদেরাও মনে করিতেন যে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে হিন্দুরা ইস্পাতের ব্যবহার বা প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানিত না; তাঁহারা হয়ত এরূপ শুনিলে হাঁ করিয়া থাকিতেন যে প্রাচীন হিন্দুরা ইস্পাত নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, এমন কি খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০ অব্দে পারিতেন; কেন না "খাম বাবা" স্তম্ভটির ঐরূপ তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে যে প্রাচীন হিন্দুরা ইস্পাতের ব্যবহার জানিতেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তে অনেকে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন;

এবং এই সিদ্ধান্তের সমর্থক কোন বহুপ্রাচীন ইস্পাত-খণ্ডও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকরের আবিষ্কারে এবং সার্ রবার্ট হাড্ফীল্ডের বিশ্লেষণে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

ভাণ্ডারকরের আর একটি আবিষ্কার।

শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর খুব পুরাতন একটি ইটের প্রাচীর খুড়িয়া বাহির করিয়াছেন। তাহা গাঁথিবার জন্য যে মশলা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা বিশ্লেষণ করিবার জন্য তিনি পুণার কৃষিকলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ম্যানের নিকট পাঠাইয়া দেন। ম্যান সাহেব উহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে উহা চূর্ণমিশ্রিত এক রকম মশলা যাহা প্রাচীন ফিনিশিয় বা গ্রীকদের দ্বারা প্রস্তুত যে-কোন গাঁথনীর মশলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং যাহা প্রাচীন রোমানদের মশলার সমকক্ষ। ভাণ্ডারকর মহাশয়ের আবিষ্ক্রিয়া খুব আশ্চর্য্য রকমের। কারণ এ যাবৎ সমুদয় প্রত্নতাত্ত্বিকের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রাচীন হিন্দুরা চূর্ণমিশ্রিত গাঁথনীর মশলা ব্যবহার করিতে জানিত না, এবং উহা মুসলমানরা প্রথম ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করে। এই আবিষ্ক্রিয়ার জন্য শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর ধন্যবাদার্হ। মহারাজা শিন্ধিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক খননাদি কার্য্যের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এবং ভাণ্ডারকর মহোদয়ের অন্য সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য তিনি ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির কার্য্যকারিতা।

ভূদেব বাবু তাঁহার স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কল্পনার আশ্রয় লইয়া দেখাইয়াছেন, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মরাঠাদের জয় হইলে ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস কিরূপ হইত এবং কি প্রকারে ভারতের উন্নতি হইতে পারিত। বিধাতার হাতে উপায়ের অভাব নাই; উপায় নানা রকম। তিনি একই উদ্দেশ্য নানা প্রকারে সাধন করিতে পারেন। কোন না কোন পাশ্চাত্য শক্তির প্রভুত্ব ভিন্ন যে প্রাচ্য কোন দেশের উন্নতি হইতে পারে না, এমন নয়। জাপান স্বাধীন থাকিয়াই নূতন পথে চলিয়াছে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। চীনও পাশ্চাত্য কোন শক্তির অধীন না হইয়া উন্নতি করিতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শক্তির অধীন না হইলে এদেশের কোন উন্নতি হইতে পারিত না, এমন নয়। উন্নতি আরও অনেক রকমে হইতে পারিত।

কিন্তু কি হইতে পারিত, তাহা লইয়া কল্পনার খেলা চলিলেও, বাস্তব জগতে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইলে, কি হইয়াছে তাহাই অবলম্বন করিয়া পথ খুঁজিতে হয়। যেমন করিয়াই হউক, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। আমরা আমাদের বুদ্ধি অনুসারে পূর্ব্বে ইহা দেখাইয়াছি যে ব্রিটিশ শক্তিকে সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার মত আয়োজন কেহ করিতে পারিবে না। আমরা ইহাও দেখিতেছি, যে কারণেই হউক ভারতে দেশী এমন কোন শক্তি নাই, যাহা সমস্ত দেশকে এক রাখিতে পারে, দেশী এমন কোন শক্তি নাই যাহা দেশকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে। ভবিষ্যতে অবশ্য এরূপ শক্তি জন্মিতে পারে; কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। আমাদের আলোচ্য বর্ত্তমান অবস্থা। বর্ত্তমান অবস্থায় ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যোগ রক্ষা দ্বারা এদেশের যে দুটি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে তাহা প্রকারান্তরে এইমাত্র বলিলাম।

আর এক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে, দেশে পাশ্চাত্য ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রভৃতির শিক্ষা বিস্তার। আমরা যতটা যত শীঘ্র যেমন ভাবে চাই, তাহা না হইলেও, কিছু হইতেছে। প্রাচীনকালে ভারতে কোথাও কোথাও গণশক্তির অভিব্যক্তি (evolution of democracy) হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক কালে ইহা পাশ্চাত্য দুই মহাদেশ হইতে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইতেছে। যথেষ্ট পরিমাণে না হইলেও, ইংলণ্ডের সহিত যোগ থাকায় আমরা এই অভিব্যক্তির কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতার দিক্ দিয়া মানুষের সাম্য ভারতে পূর্ব্বেও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সাম্যের আকাঙ্ক্ষা আধুনিকালে ইংলণ্ডের সহিত সংস্পর্শে ভারতে আসার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদ ভাঙিতেছে এবং তথাকথিত "অস্পৃশ্য" "অনাচরণীয়" জাতিদের উন্নতি হইতেছে। এইরূপ আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। অবশ্য এই সকল ফল আরও নানাভাবে ফলিতে পারিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কি হইতে পারিত তাহার আলোচনা দ্বারা পথ নির্দ্ধারিত হয় না; বাস্তবের আলোচনা দ্বারা হয়।

মানুষের যদি হাড় ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার স্বচ্ছন্দ নড়াচড়া বন্ধ করিয়া, হাড় জোড়া লাগা পর্য্যন্ত, বাহির হইতে একটা বন্ধন দেওয়া দরকার হয়। একটা গাছের সঙ্গে ভিন্ন রকমের আর একটা গাছের কলম জোড়া লাগাইতে হইলে, জোড়ালাগা পর্য্যন্ত বাহিরের বন্ধন দরকার হয়। তামা দস্তা প্রভৃতি ধাতু মিশাইয়া গলাইয়া এক করিতে হইলে একটা পাত্রের দৃঢ় সীমার মধ্যে উহাদিগকে আটক রাখিয়া বাহির হইতে উত্তাপ দেওয়া আবশ্যক হয়। ব্রিটিশশক্তির কার্য্যকারিতা এই সকল উপমা হইতে বুঝা যাইবে। অতএব আমাদের মঙ্গলের জন্য ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগ হইতে যতটা কাজ পাওয়া যায়, তাহা লইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিদ্রোহের কল্পনা কেন পরিত্যাজ্য, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

সেবা-সাম *

আলগ্ হ'য়ে আল্‌গোছে কে আছিস্ জগতে
জগন্নাথের ডাক এসেছে আবার মরতে!
তফাৎ হ'য়ে তফাৎ ক'রে নাইক মহত্ব,
দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব!
পিছিয়ে যারা পড়ছে তাদের ধরে নে ভাই হাত,
মিলিয়ে নেব কণ্ঠ আবার চল্‌ব সাথে সাথ;
জগন্নাথের রথ চলেছে, জগতে জয় জয়,—
একটি কণ্ঠ থাক্‌লে নীরব অঙ্গহানি হয়;
সাথের সাথী পিছিয়ে রবে,—কাঁদবে নাকি মন?
এমন শোভাযাত্রা যে হায় ঠেক্‌বে অশোভন।

*　　*　　*　　*

চিত্তময়ী তিলোত্তমা ভাবাত্মিকা মোর,
মর্ত্তে এস নন্দনেরি নিয়ে স্বপন-ঘোর;
তোমার আঁখির অমল আভায় ফুটাও অন্ধ চোখ
আদর্শেরি দর্শনেতে জনম সফল হোক্।
জাগ কবির মানসরূপে বিশ্ব-মনস্কাম,—
সর্ব্বভূতে আত্মবোধে মহান্ সেবাসাম।

*　　*　　*　　*

এক অরূপের অঙ্গ মোরা লিপ্ত পরস্পর,—
নাড়ীর যোগে যুক্ত আছি নইক স্বতন্তর;
একটু কোথাও বাজ্‌লে বেদন বাজে সকল গায়,
পায়ের নখের ব্যথায় মাথার টনক নড়ে যায়;
ভিন্ন হ'য়ে থাক্‌ব কি, হায়, মন মানে না বুঝ্,—
ছিন্ন হ'য়ে বাঁচ্‌তে নারি নই রে পুরুভুজ।

*　　*　　*　　*

তফাৎ থেকে হিতের সাধন মোদের ধারা নয়,
ভিক্ষা দেওয়ার মতন দেওয়ায় ভর্‌বে না হৃদয়,
অনুগ্রহের পায়সে কেউ ঘেঁষ্‌বে না গন্ধে
আপন জেনে ক্ষুদ্ কুঁড়া দাও খাবে আনন্দে।
পরকে আপন জান্‌তে হবে ভুল্‌তে আপন পর
অগাধ স্নেহ অসীম ধৈর্য্য—অটুট নিরন্তর।
পিতার দৃঢ় ধৈর্য্য, মাতার গভীর মমতা
প্রত্যেকেরি মধ্যে মোদের পায় গো সমতা;
পিতার ধৈর্য্যে মানব-সেবা করব প্রতিদিন,
মাতার স্নেহ বিশ্বে দিয়ে শুধ্‌ব মাতৃঋণ।

*　　*　　*　　*

দীপ্তিহারা দীপ নিয়ে কে?—মুখটি মলিন গো!
চকমকি কার হাতে আছে?—জাগাও স্ফুলিঙ্গ,—
জাগাও শিখা—সঙ্গীরা সব মশাল জ্বেলে নিক্,
এক প্রদীপের প্রবর্ত্তনায় হোক্ আলো দশদিক্।
এক প্রদীপে দিকে দিকে সোনা ফলাবে,
একটি ধারা মরু-ভূমির মরম গলাবে।

*　　*　　*　　*

সত্যসাধক! এগিয়ে এস জ্ঞানের পূজারী,—
অজ্ঞ মনের অন্ধ গুহায় আলোক বিথারি'।
শিল্পী! কবি! সুন্দরেরি জাগাও সুষমা,—
অশোভনের আভাস—হ'তে দিয়ো না জমা।
কর্ম্মী! আনো সুধার কলস সিন্ধু মথিয়া
দুঃস্থ জনে সুস্থ কর আনন্দ দিয়া।
সুখী! তোমার সুখের ছবি পূর্ণ হ'তে দাও
দুখী হিয়ার দুঃখ হর হরষ যদি চাও।
নইলে মিছে শ্মশানে আর বাজিয়ো না বাঁশী,
হেস না ঐ অর্থবিহীন বীভৎস হাসি।
এস ওঝা! ভূতের বোঝা নামাও এবারে
নিজের রুগ্ন অঙ্গ জেনে রোগীর সেবা রে!
জীবনে হোক্ সফল নব ত্রিবিদ্যা-সাধন;
সহজ সেবা, সরল প্রীতি, চিত্ত প্রসাধন:

*　　*　　*　　*

বিশ্বদেবের বিরাট দেহে আমরা করি বাস,—
তপন-তারার নয়ন-তারার একটি নীলাকাশ।
এক বিনা দুই জানে না'ক একের উপাসক,
সবাই সফল না হ'লে তাই হব না সার্থক।
নিখিল-প্রাণের সঙ্গে মোদের ঐক্য-সাধনা,
হিয়ার মাঝে বিশ্ব-হিয়ার অমৃত-কণা।
সবার সাথে যুক্ত আছি চিত্তে জেনেছি
প্রীতির রঙে সেবার রাখী রাঙিয়ে এনেছি—
কাজ পেয়েছি লাজ গিয়েছে মেতেছে আজ প্রাণ,
চিত্তে ওঠে চিরদিনের চিরনূতন গান।

* বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর প্রারম্ভিক সভায় পঠিত।

বেঁচে মরে থাকব না আর আলগ্-আল্‌গোছে ;
লগ্ন শুভ, রাখ্‌ব না আজ শঙ্কা-সঙ্কোচে।
বাড়িয়ে বাহু ধরব বুকে, রাখ্‌ব মমত্ব,
মোদের তপে দগ্ধ হ'বে শুষ্ক মহত্ব;
মোদের তপে কোঁকড়া কুঁড়ির কুণ্ঠা হ'বে দূর
শতদলের সকল দলের স্ফূর্ত্তি পরিপূর।
জগন্নাথের রথ চলিল,—উঠেছে জয় রব
উদ্বোধিত চিত্ত,—আজি সেবা-মহোৎসব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রেমের মর্ম্মর-স্বপ্ন

পৃথিবীতে মানুষের হাতের তৈরি কত শত অদ্ভুত আশ্চর্য্য সামগ্রী আছে, কিন্তু এমন জিনিষ খুব অল্পই আছে যাহা কাল ও দেশের অতীত হইয়া বিশ্ববাসীর ভাবময় বিস্ময়ের বিষয় হইয়া আছে। এরূপ সামগ্রীর মধ্যে তাজমহল প্রধান। কালে কালে দেশে দেশে ইহা কবির শিল্পীর ভাবুকের আরাধ্য ও বন্দনীয় হইয়া আছে। ইহার সৌন্দর্য্যসুষমা যেন ধারণার অতীত, অফুরন্ত, এবং অতীন্দ্রিয়। তাই কবি ভাবুক ও শিল্পীরা কত রকমে ইহার সৌন্দর্য্য বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত বলার পরও সকলকেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইয়াছে, নাঃ কিছুই বলা হইল না। যে প্রতিভা হইতে ইহার সৃষ্টি সেইজাতীয় প্রতিভা নহিলে ইহার বর্ণনা করিবে কে?

একজন ভাবুক তাজমহল দেখিয়া বলিয়াছেন—"লোকে বলে তাজমহল গড়িতে তিন কোটি টাকা ও কুড়ি হাজার লোকের চোদ্দ বৎসরের শ্রমসাধনা ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু আমি জানি উহার জন্মের কাহিনী—জ্যোৎস্না রাত্রিতে হিমালয়ের তুষার কিরীটে চাঁদের চুম্বনে তাহার জন্ম। স্বপ্নের পরীরা জ্যোৎস্না-মাখা তুষাররাশি শাদা মেঘের উপর বহন করিয়া আনিয়া এই প্রেমের স্মৃতিমন্দির গড়িয়াছিল; কোমল কমনীয় নিটোল গম্বুজটি একটি বেলী ফুলের কুঁড়ির কাছে তাহার মাধুরী ধার করিয়া তবে গড়া হইয়াছিল। রাতারাতি স্বপ্নের পরীরা ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল; উষাতে সূর্য্য যখন অরুণ আঁখি মেলিয়া জাগিল, তখনকার তাহার বিস্ময়-রাগ তাজের সর্ব্বাঙ্গে একটি মোহলাবণ্য মণ্ডিত করিয়া দিয়া গেল।"

সিড্‌নী লো তাজমহল সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"জগতে কতকগুলি এমন জিনিষ আছে, যাহাদের কিছুতেই সাধারণ করিয়া ফেলা যায় না। তাজমহল তাহাদের মধ্যে প্রধান। অতিপরিচয়েও ইহার সৌন্দর্য্য পুরাতন মনে হয় না; ইহার নববধূর ন্যায় ভাব কিছুতেই ঘুচে না। কত কবি কত ছন্দে ইহার বর্ণনার ব্যর্থপ্রয়াস

তাজমহল।

করিয়াছেন, সার এড্‌উইন আর্নল্ড অমিত্রাক্ষর ছন্দে ইহার মুণ্ডপাত করিয়াছেন; কত শিল্পী কত রকম উপায়ে ইহার রূপকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এই কুমারী সুন্দরীর চিরন্তন নবীনতা এত অত্যাচারেও একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।"

বেয়ার্ড টেলার তাজমহলের তোরণ দেখিয়াই আত্মহারা। সুন্দরীর অবগুণ্ঠন যেমন তাহার সৌন্দর্য্য
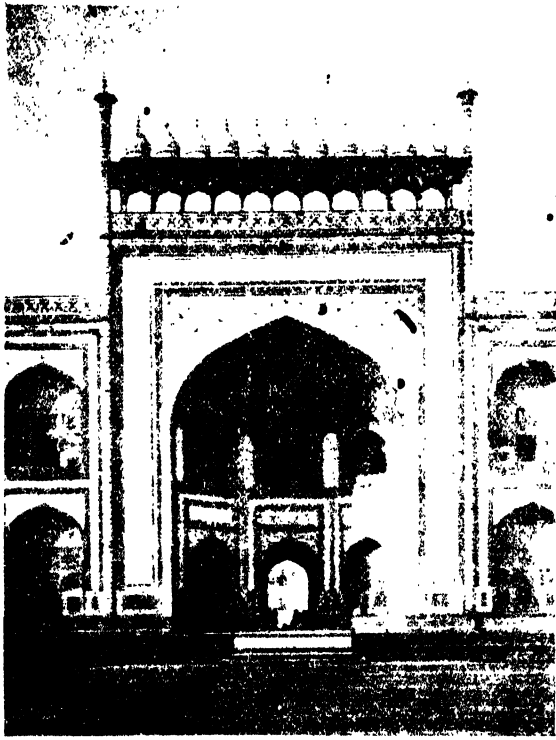
তাজমহলের তোরণ।

বাড়াইয়া তোলে, তাজের তোরণও তেমনি। এই তোরণের ললাটে আরবী বচন মর্ম্মর-অক্ষরে লেখা আছে—যাহার অন্তর পবিত্র নয় সে যেন ভগবানের ফুলবাগানের অন্তরে না প্রবেশ করে!

ষ্টীভেন্স বলিয়াছেন—"তাজমহলের দুধারে তিন-গম্বুজের লাল পাথরের বাড়ী; অগ্নিলোহিত এই বাড়ী দুটির মাঝখানে চুনির মাঝে মুক্তার মতো নিটোল সুন্দর তাজটি! তাজের চারিদিককার বাড়ী ঘর, তোরণ চত্বর, বাগান কেয়ারি, ফোয়ারা জল, উৎকীর্ণ লিপি প্রভৃতির মাঝখানে শুধু চোখে পড়ে কল্পনার চেয়েও সুন্দর তাজমহল; কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায় সকলের সহিত তাজের কি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য; যেমন তাজমহল তেমনি তাহার আশেপাশের সমস্ত বিভূতিই নিখুঁত! এ যেন আরব্য উপন্যাসের পরীর কাহিনী!"

কেহ কেহ প্রথম সাক্ষাতে তাজমহলের পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না। একজন দর্শক লিখিয়াছেন—"প্রথম সাক্ষাতের অসন্তোষ শীঘ্রই অনুতাপে পরিণত হয়। তারপর ছায়াস্নিগ্ধ তাজমহলের কোলে মর্ম্মর-জালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলোর চুমকির উঁকিঝুঁকি দেখিতে দেখিতে মন সৌন্দর্য্যের রসে পূর্ণ হইয়া আসে।"

এই মর্ম্মর-জালির সমতুল্য সামগ্রী জগতে আর নাই। ফার্গুসন ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"দেয়ালে দেয়ালে মিনার কাজকরা পুষ্পপত্র ও বিচিত্র নক্সার জালি সমগ্র তাজটির মতনই সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস।"

একজন লিখিয়াছেন—"তাজমহলের যে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য তাহা তাহার উপকরণ ও বর্ণের মাহাত্ম্যে, আর গঠনশিল্পের অসম্ভব রকমের সাদাসিধা কারুকৌশলে!"

তাজমহলের সৌন্দর্য্য খুলে ভালো সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আলোকে বা জ্যোৎস্নার অবাধ প্লাবনে।

"স্তব্ধ নিঃশব্দ রজনীর জ্যোৎস্না-সাগরে একটি মুক্তাবিন্দুর মতো স্বচ্ছ টলটল করে তাজমহল। সেই নিস্তব্ধতার পথ বাহিয়া সমস্ত সৌন্দর্য্য তরুণী সুন্দরীর মতো যেন দর্শকের হৃদয়ের মধ্যে নামিয়া আসে।"

ল্যাণ্ডর তাজমহলের বর্ণনা করিয়াছেন—"যখন সন্ধ্যার গৈরিক রাগিণী মন উদাস করিয়া পশ্চিমে মিলাইয়া যায়, যখন যমুনার কালো জলে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হইয়া পড়ে, যখন মৃদু বাতাসে পিপল গাছের পাতায় পাতায় কাঁপনি জাগে, যখন একটা একটা বাদুড় দীর্ঘ কালো ডানা মেলিয়া নিঃশব্দে স্বচ্ছ নীল আকাশের বুক চিরিয়া দ্রুত উড়িয়া যায়, তখন তাজমহল চোখে দেখা যাক আর না-যাক, প্রাণের মধ্যে তাজমহলের সকল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে—মনে হয়, এখানে বাদশাহের পরমপ্রেয়সী শয়ান আছেন, আর তাঁহার পাশে আসিয়া ঠাঁই পাইয়াছেন হৃতরাজ্য হৃতসিংহাসন শোকার্ত্ত বাদশাহ! তখন মনে হয় মানুষের যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, তাহা এই তাজের অন্তরে নিহিত আছে! তাজমহল মহিমামণ্ডিত অপূর্ব্ব সুন্দর প্রেমের স্বস্তিক—পৃথিবীতে যতকাল নরনারীর প্রেম জাগ্রত জীবন্ত থাকিবে ততদিন মুগ্ধ নরনারী মমতাজমহলের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া এখানে আসিবেই আসিবে। সে শ্রদ্ধা শুধু সেই

সুন্দরী প্রণয়িনীরই প্রাপ্য—তাহা সম্রাট শাহান্‌শা শাহ-জাহানের নহে, তাহা শিল্পী ওস্তাদ ইসা খাঁর নহে! যে পূজা তাঁহারই যিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, যিনি প্রাণভরা ভালবাসা পাইয়াছিলেন।"

ষ্টীভেন্স তাঁহার In India নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন —"শাজাহান! শাজাহান! তোমার নাম তীব্র সুরার ন্যায় অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলে! শাজাহান, তোমার বেগমের চরণকমল শ্বেতপাথরের মেঝেতে আপনাদের রূপ দেখিত, তাহাদের অঙ্গলাবণ্য শীশমহলের টলটলে পারার উপর উপচিয়া পড়িত! শাজাহান, তোমার আঙ্গুরিনা বাগে ময়ূর পেখম ধরিত;—শম্মন বুরুজে সুনহলী আঙিনায় তোমার প্রেয়সীর প্রণয়লীলা চলিত। শাজাহান, আঙ্গুরিনা বাগ, সুনহলী আঙিনা, শম্মন বুরুজ, শীশমহল—শুধু নামগুলিতেই মাদকভরা যাদুর কুহক জড়ানো আছে! লাল কালো পাপড়ির মাঝে বেলীর কুঁড়িটির মতো তাজমহল যখন দেখি তখন সৌন্দর্য্যের নেশায় ভাবের ভোরে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতে থাকে!—মনে হয় যেন শাজাহান তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহ, ঐশ্বর্য্য সম্পদ, শ্বেতপাথরের বাড়ী আর মসজিদ, আনন্দ উল্লাস, দুঃখ বেদনা, প্রণয় পরিতাপ সমস্ত, লইয়া মনের মধ্যে মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছেন।"

উইলোবি বলেন—"চিত্রের বিষয়টা তুচ্ছ, তাহার মধ্যে ভাবের প্রেরণা যতটুকু থাকে সেইটুকুই সব। স্রষ্টার মন যত ঐশ্বর্য্যশালী ও উন্নত তাহার সৃষ্টির মধ্যে তত বেশী সম্পদ দেখিতে পাওয়া যায়। রং বা পলস্তা, সে ত শিল্পীর ভাবকে আকার দিবার ভাষা—রঙে বা পলস্তায় শিল্পীর রসসাধনা আকার পাইয়া উঠে।

"তাজমহলের তোরণ পার হইলেই মনে হয় একটি সুন্দরী তরুণী যেন ঘোমটা খুলিয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। এই রমণীয় রমণীর ভাবটি শিল্পী ইমারতের মধ্যে আরোপ করিয়া রাখিয়াছেন। শোকার্ত্ত বাদশাহের প্রণয়িনীর সকল শ্রী ও মহিমা তাঁহার এই স্মৃতিমন্দিরে অমর হইয়া আছে। অমল শুভ্র মর্ম্মর পাথরের জলবিন্দুর ন্যায় টলটলে গম্বুজটি নীল আকাশ ও নীল যমুনার মাঝখানে শুক্তির মাঝে মুক্তার ন্যায় দিনের রাতের বিচিত্র
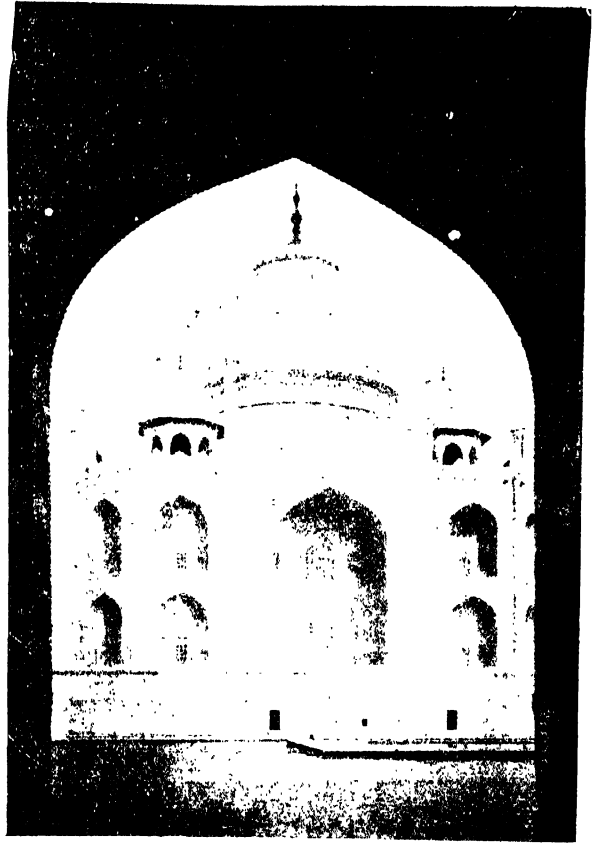
তোরণের ফাঁকে তাজমহল।

আলোকের বর্ণবৈচিত্র্যে ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়াই থাকিতেছে। অরুণ-আলো উষাকালে যখন তাহার উপর আসিয়া পড়ে তখন যেন মনে হয় নবোঢ়া তরুণী ফুলশয্যার প্রভাতে জাগিয়া উঠিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে! দুপ্রহরে সে সম্রাজ্ঞীর ন্যায় শান্ত গম্ভীর মহিমময়ী! তারপর যখন সন্ধ্যা আসে তখন যেন বহুদিন-মৃত সুন্দরীর আত্মার মতো তাজমহল সবুজ আলোর মধ্যখানে আকাশ বাতাস জুড়িয়া বসে, তাহার বিরহ যেন অন্তর বাহির বিবশ করিয়া তোলে! আবার যখন চাঁদ উঠে, যখন জ্যোৎস্না-ধারায় তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে তখন আর দুঃখ থাকে না—এ যেন প্রেমময়ীর পরিপূর্ণ আনন্দের অপরূপ বিকাশ!

"হিন্দু শিল্পী ভাবকে রূপ দিতে চিরকালই পটু। তাজমহল সেই প্রণয়ের রূপ, রমণীর ভাবরূপ!"
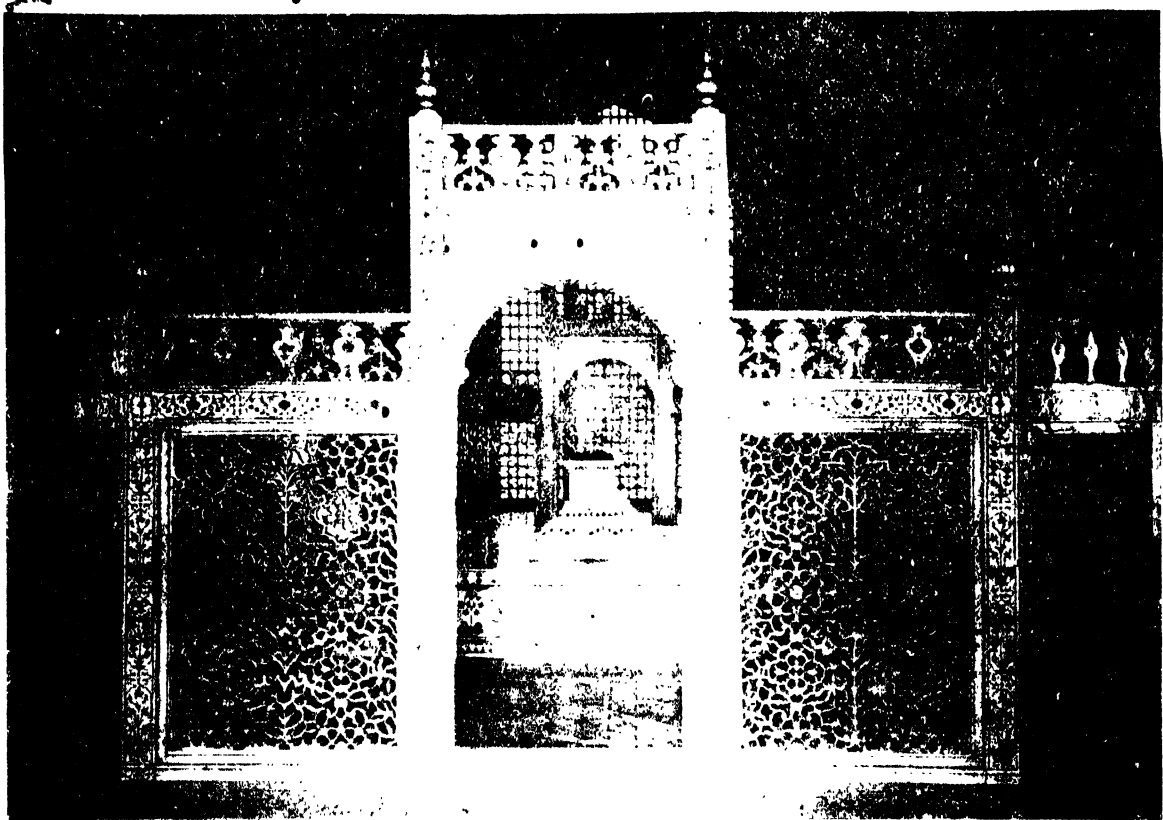
তাজমহলের মর্ম্মর-জাল।

এই শেষের কথায় হাভেলও সায় দিয়াছেন।

অবনীন্দ্রনাথ শাজাহানের তাজমহলের স্বপ্ন, তাজমহল নির্ম্মাণের পরিকল্পনা প্রভৃতি চিত্রেও এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন।

করুণানিধান তাজমহল দেখিয়া লিখিয়াছেন—

বাঁশীর রাগিণী মূরছি রয়েছে
মর্ম্মর-রূপ ধরি।

* * *

মোহিনী তরুণী মূরতি ধরিল
হিন্দোলে উপবনে,
শিশু স্মর তার তূণীর হারায়ে
মূরছিল দু চরণে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন—

"'খাসা'! 'বেশ'! 'চমৎকার'! 'কেয়াবাৎ'! 'তোফা'!
—কহিয়াছে নানাবিধ সকলেই বটে
দেখিয়াছে, তাজ, কভু যে তোমার শোভা
উপবন-অভ্যন্তরে যমুনার তটে।
কেহ কহিয়াছে তুমি 'বিশ্বে পরীভূমি';
কেহ কহে 'অষ্টম বিস্ময়'; কেহ কহে
'মর্ম্মরে গঠিত এক প্রেমস্বপ্ন তুমি'।
আমি জানি তুমি তার একটিও নহে;
আমি কহি,—না না, আমি কিছু নাহি কহি,
আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি, আর স্তব্ধ হয়ে রহি।

* * *

কভু এ বিশ্বের ইতিহাসে
হয়নি রচিত বর্ণে, ছন্দে, কিংবা স্বরে
এ হেন বিলাপ। * * *
সুন্দর অতুল হর্ম্ম্য! হে প্রস্তরীভূত
প্রেমাশ্রু! হে বিয়োগের পাষাণ প্রতিমা!

মর্ম্মরে রচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস!—আপ্লুত
অনন্ত আক্ষেপে, শুভ্র হে মৌন মহিমা!"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।
* * *
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।"

নেপালপ্রবাসী কাপ্তেন রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার

প্রবাসীর পাঠকপাঠিকাগণ এপর্য্যন্ত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, আইন প্রভৃতির ক্ষেত্রে কীর্ত্তি রাখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের বিষয়ই শুনিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের সমক্ষে অদ্য সম্পূর্ণ বিভিন্নক্ষেত্রে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবাসীবাঙ্গালীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থিত করিতেছি। তাঁহার নাম ক্যাপ্টেন রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার। নেপালে আধুনিক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম। তিনি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা শ্রমশীলতা ও কর্ম্মদক্ষতাগুণে আশানুরূপ উন্নতি এবং বিদেশে বিভিন্ন রাজদরবারে বিশেষ আদর ও সম্মানলাভ করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণবাবু নেপালের রয়াল ইঞ্জিনীয়র (Royal Engineer) পদে বহুবর্ষ দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং নেপালেই বাস করিতেছেন।

অভিভাবকের অর্থের অসচ্ছলতা-নিবন্ধন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপরীক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় যাঁহারা প্রার্থনীয় উন্নতির আশা বিসর্জ্জন দিয়া নিতান্তই জীবিকার্জ্জনের অনুরোধে কোন একটা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া নিরুৎসাহে জীবনের মূল্যবান্ দিনগুলি কাটাইতেছেন তাঁহারা এই সদাসচেষ্ট স্বাবলম্বী পুরুষের কর্ম্মজীবনের কাহিনী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃত উদ্যমশীল ও উন্নতি-প্রয়াসী হইলে একজন সামান্য কর্ম্ম হইতেও অসামান্য উন্নতিলাভে সমর্থ হন।

১২৩৫ সালে হাবড়া দফরপুর নামক স্থানে রাজকৃষ্ণবাবু জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামেই তাঁহার বাল্যশিক্ষা হয়। তৎপরে গ্রাম্যস্কুলে সামান্যরকম বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিখিয়া তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। পিতা ৺ মাধবচন্দ্র কর্ম্মকারের কৃষিকর্ম্মে এবং লোহার কুলুপ, হাত-কোদাল প্রভৃতি বিক্রয়ের অর্থে সাংসারিক অসচ্ছলতাই দূর হয় নাই, তাহাতে পুত্রের শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহ করা যে অসম্ভব ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। স্কুলের শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া বালক রাজকৃষ্ণ পিতার আর্থিক কষ্ট দূর করিবার নানা উপায় চিন্তা করিতে করিতে ভগ্নীপতি গুরুদাস কর্ম্মকারের সহিত গার্ডেন কোম্পানীর কারখানায় ৭৲ টাকা বেতনে প্রথমে কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু এখানে জাহাজ মেরামতের কর্ম্ম ভিন্ন আর কোন কর্ম্ম শিখিবার সুযোগ না থাকায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী বালক এক বৎসর পরে এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হাবড়ার "গ্যাঞ্জেস্ কোম্পানীতে" কর্ম্ম করিতে থাকেন। এখানে তাঁহার কলকারখানা সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় শিক্ষার সুযোগ ঘটে। চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক রাজকৃষ্ণের কঠিন শ্রমশীলতা, উদ্যম, অধ্যবসায় ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি কারখানার ম্যানেজার ও ইঞ্জিনীয়র ম্যাকলেডে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহেব তাঁহার কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমে ৭৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করেন এবং স্বহস্তে তাহাকে বহুকার্য্য শিখাইয়া দেন এবং অন্য কোন কারখানার কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইলে অপরাপর কর্ম্মচারী অপেক্ষা উপযুক্ত বোধে তাঁহাকেই সেইসকল স্থানে পাঠাইতে থাকেন। অপরাপর কোম্পানিতে জাহাজ মেরামতের কার্য্য এবং রেলওয়ে, ইঞ্জিন, বয়লার, জাহাজ, পুল প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও সংস্কারের জন্য তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় পাঠান হইত। এই সময় গভর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্পকাগজের কলের উন্নতির জন্য তাঁহাকে নূতন নূতন অংশ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। তখন এই ষ্ট্যাম্প কাগজের তিনটিমাত্র

ক্যাপ্টেন রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার।

কল ছিল এবং কতকগুলি হাতের জোরে চলিত। ইহার পর তিনি কিছুদিন গবর্ণমেণ্টের জরিপ ও গণিত বিষয়ক যন্ত্রনির্ম্মাণের কারখানায় কর্ম্ম করেন। এখানে তাঁহাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র, জরীপ সংক্রান্ত যন্ত্রাদি এবং বিশেষ করিয়া জমির কোণ মাপিবার যন্ত্র (Theodolite) নির্ম্মাণ করিতে হইত। এইরূপে নানা কার্য্যের সংস্পর্শে আসায় অল্পবয়সেই যন্ত্রশিল্পে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সহযোগী কারিগরদিগের সহিত বেশ সদ্ভাবে থাকিতেন এবং কঠিন কঠিন কর্ম্মসকল আনন্দ ও উৎসাহের সহিত শিক্ষা করিতেন। এখানে কর্ম্ম করিতে করিতে রাজকৃষ্ণবাবু শুনিতে পান যে গ্যাঞ্জেস কোম্পানি শীঘ্রই ফেল হইবে। ফলে হইলও তাহাই; কিন্তু তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হয় নাই; অধ্যক্ষ ম্যাকলেডে সাহেব এখান হইতে অবসর লইয়া হাবড়ার তেলকল ঘাটের নিকট "ভালকান ফাউণ্ড্রি" নামে একটি বড় রকমের কারখানা খুলিলেন, তাহাতে অন্যান্য কারিগরের সহিত রাজকৃষ্ণবাবুও আসিলেন। জাহাজ, রেলকোম্পানি, গবর্ণমেণ্ট এবং অপরাপর স্থানের অনেক কাজ এই কারখানায় হইতে লাগিল। পাঁচ ছয় বৎসর কারখানা চালাইবার পর ম্যাকলেডে সাহেব অন্য একজন ইংরেজকে স্বীয় স্থানে নিযুক্ত করিয়া বিলাত গমন করেন। বিলাত যাইবার কালে ম্যাকলেডে সাহেব তাঁহাকে একখানি উচ্চপ্রশংসাপত্র ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা দিয়া এই স্থানেই কর্ম্ম করিতে বলিলেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু আপন মনোভাব অন্যপ্রকারের ব্যক্ত করায় সাহেব সন্তোষের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লোকোমোটিভ বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে দুইখানি অনুরোধপত্র লিখিয়া দেন। ইহাতে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লোকো-ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৪০৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এখানে প্রায় দুই সহস্র কারিগরের মধ্যে আড়াইশত ইংরেজ কারিগর ছিল এবং লোকো-ইঞ্জিনীয়র বিভাগ একত্রেই ছিল। ইঞ্জিনীয়র বিভাগ পৃথক হইলে তথা হইতে যে টেণ্ডার দিবার নিয়ম প্রথম প্রচলিত হয় তাহাতে বাঙ্গালী বা ইংরেজ উভয়েরই টেণ্ডার দিবার অধিকার থাকায় এ বিষয়ে খুবই প্রতিযোগিতা ছিল। এই টেণ্ডার দেওয়া লাভজনক বিবেচনায় য়ুরোপীয়গণ তজ্জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন, কিন্তু একমাত্র রাজকৃষ্ণবাবু ভিন্ন আর কোন দেশীয় ইহাতে আকৃষ্ট হন নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই ইহার প্রথম টেণ্ডারদাতা। রাজকৃষ্ণবাবু নিজের তরফ হইতে ১২ জন কারিগর নিযুক্ত করিয়া একখানি মাত্র ইঞ্জিন ফিট করিয়া চালাইয়া দেখিলেন, একখানি ইঞ্জিন ফিট করিতে প্রায় বারশত টাকা লাগে; সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া তিনি পনের শত টাকার টেণ্ডার

দেন। ইতিপূর্ব্বে য়ুরোপীয় কারিগরেরা দুই হাজার টাকার টেণ্ডার দিয়াছিলেন, সুতরাং রাজকৃষ্ণবাবুর টেণ্ডারই মঞ্জুর হয়। ইহার দ্বারা তিনি সাংসারিক অসচ্ছলতা দূর করিবার পক্ষে বৃদ্ধপিতাকে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবেন এই আশায় প্রথমে উল্লসিত মনে উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এইসূত্রে টেণ্ডার গ্রহণে অকৃতকার্য্য সহযোগীদিগের শত্রুতায় তাঁহাকে কর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল গৃহে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়।

অতঃপর, তিনি স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার মানসে শালিখায় ময়দার কল নির্ম্মাণ করিতে কৃতসংকল্প হন, কিন্তু অর্থাভাবই ইহার একমাত্র অন্তরায় বুঝিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াও ঐ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার ঋণদাতা প্রথমে তাঁহার ময়দার কলের অংশীদার হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে যে সামান্য লাভ হইত তাহা বিভাগ করিলে কাহারও বিশেষ সাহায্য হইবে না বুঝিয়া এবং—"আমার টাকা এখন চাহি না, ভবিষ্যতে তোমার অবস্থার উন্নতি হইলে যখন ইচ্ছা শোধ করিও" এই বলিয়া তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকেই একমাত্র স্বত্বাধিকারী করিয়া নিজে কলের সংস্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু এই সদয় বন্ধুর সাহায্য পাইয়াও রাজকৃষ্ণবাবু আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিলেন না। প্রসিদ্ধ আশ্বিনের ঝড়ের সময় এই কল নির্ম্মিত হইয়াছিল; প্রকৃতই বহু ঝড় ঝঞ্ঝা বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে যে কল স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রয়োজনানুরূপ অর্থাভাবে তাহা বেশীদিন স্থায়ী হইল না, অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে তিনি উহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতৃবিয়োগ, ভ্রাতার সহিত মনান্তর এবং সেই সূত্রে মাতৃভূমি দফরপুর পরিত্যাগ করিয়া বেলুড়ে বাসস্থাপন প্রভৃতিতে কিছুকাল তাঁহাকে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়।

ময়দার কল বিক্রয় করিয়া রাজকৃষ্ণবাবু কয়েকমাস ঘুস্থুড়ির পুরাতন সূতার কলে কার্য্য করিয়া কলিকাতা টাঁকশালে (Government Mint) ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম্ম আরম্ভ করেন। এখানে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নূতন বিভাগের সমুদয় কল প্রস্তুত করিতে ও চালাইতে হইয়াছিল। এই সময় সিমলা পাহাড়ের নিকটস্থ কশৌলী নামক স্থানে সৈন্যদের রসদ যোগাইবার জন্য ময়দা ও পাঁউরুটীর কল বসাইবার প্রয়োজন হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের রসদ বিভাগ (Commissariat) হইতে মিণ্টের ইঞ্জিনীয়র ডাইক সাহেবের নিকট একজন সুদক্ষ কারিগর পাঠাইবার জন্য পত্র আসে; তিনি সকল কারিগরকে ডাকিয়া কশৌলী যাইবার প্রস্তাব করেন। রাজকৃষ্ণবাবু ব্যতীত আর কোন কারিগর ঐ সুদূর বিদেশে যাইতে রাজী না হওয়ায় তিনিই কশৌলী যাত্রা করেন। তখন সিমলা পর্য্যন্ত রেলপথ ছিল না, সুতরাং দিল্লী হইতে গরুর গাড়িতে কশৌলী পৌঁছিতে তাঁহার ৮।১০ দিন লাগিয়াছিল। এখানে তিনি কমিসেরিয়েটের গোমস্তা কানাইবাবুর বাসায় অবস্থান করেন। সাহেব রাজকৃষ্ণবাবুকে দেখিয়া খুব খুসী হন এবং ৫০৲ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করেন। এখানে আসিয়া তিনি প্রায় দুইমাসের মধ্যে তিনটি ময়দার কল ও তিনটি পাঁউরুটীর কল স্থাপন করিয়া এবং ছয় ঘোড়ার জোরের ইঞ্জিন বয়লার বসাইয়া কলে ময়দা ও রুটী তৈয়ার করিতে থাকেন। কমিসেরিয়েটের বড় সাহেব মেজর টেলার সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। কশৌলীর এই কলনির্ম্মাণকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার বৎসরাবধি পরে নাহান রাজ্য অম্বালা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া রাজকৃষ্ণবাবু দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দেশে ফিরিয়া কয়েক বৎসর পলতার জলের কল, ঘুস্থুড়ির পাটের কল, বালির কাগজের কল প্রভৃতি বহুস্থানে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিবার পর তাঁহার বন্দুক কামান প্রভৃতির কার্য্য শিখিবার অভিলাষ জন্মে এবং তিনি কাশিপুরের সরকারি কামানের কারখানায় কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এখানে কিছুকাল কর্ম্ম করিয়া দমদমায় গভর্ণমেণ্টের টোটা ও গুলির কারখানায় যান। তিনি এখানকার হেডমিস্ত্রী হন এবং এখানে প্রায় একশত কল বসান ও গোলাগুলি নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করেন। এই টোটাগুলির কারখানায় কর্ম্ম করিবার কালে পীড়াগ্রস্ত হওয়ায় তিনি প্রথমে কিছুদিনের ছুটি লয়েন এবং পরে

কর্ম্মত্যাগ করিয়া মাসাধিককাল গৃহে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকেন।

এই সময়ে নেপালে একজন কল কারখানা সম্বন্ধে সুদক্ষ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন জানিয়া এবং তথায় তাঁহার অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা বুঝিয়া নেপালের কলিকাতায় তাৎকালীন রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১৫০৲ টাকা বেতনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই ১২৭৬ সালের ফাল্গুনমাসে রাণাবাহাদুর যখন নেপালে প্রত্যাগত হন তখন রাজকৃষ্ণবাবু অপর পাঁচজন কারিগরের সহিত তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহাদের নাম শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কর্ম্মকার, দিগম্বরচন্দ্র লস্কর, গিরীশচন্দ্র কাঁসারী, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এবং যদুনাথ নন্দী।

তৎকালে নেপালের পাঁচ সরকার * অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ ছিলেন সুরেন্দ্রবিক্রম সা এবং তিনসরকার † বা মহারাজ অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন চন্দ্রসমসের জঙ্গ। এই সময় বীরসমসের জঙ্গ রাণাবাহাদুর নেপালের জঙ্গী লাট (Senior Commanding General) এবং রণউদ্দীপ সিং বাহাদুর সেনাপতি ছিলেন। মহারাজার চতুর্থ পুত্র বাবরজঙ্গ তৎকালে তোপখানার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহারই অধীনে এই কয়জন বাঙ্গালী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে টঙ্কশালায় (mint) কর্ম্ম আরম্ভ করেন, পুর্ব্বে এখানে মুদ্রা-সকল ডাইসে ফেলিয়া হাতে পিটিয়া নির্ম্মিত হইত; ছয়-সাতজন কর্ম্মচারী এজন্য নিযুক্ত ছিল। রাজকৃষ্ণবাবু এখানে প্রথম মেসিন-প্রেস প্রভৃতি বসাইয়া যন্ত্রযোগে মুদ্রা নির্ম্মাণের সুত্রপাত করেন। পরে এখান হইতে তাঁহাকে কামানবন্দুক নির্ম্মাণের কারখানায় বদলি করা হয়। এই কারখানায় ইতিপুর্ব্বে প্রাচীন প্রথামত কামান, বন্দুক ও গোলাগুলি এবং এনফিল্ড রাইফল ও বেঅনেট্ প্রস্তত হইত। রাজকৃষ্ণবাবু আসিবার পর এখানে উন্নতপ্রণালীর উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি আনাইয়া আধুনিক কালোপযোগী কামান বন্দুকাদি নির্ম্মিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার নিকট নেপালী কারিগরেরা কাজ শিখিতে লাগিল। এই কারখানার সমস্ত কল চালাইবার জন্য যে-পরিমাণ বলের আবশ্যক তাহা তিনি একটি ঝরণার জল খাল কাটিয়া আনিয়া তাহাতে পানিচক্র (Water Wheel) বসাইয়া নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুই বৎসর এইরূপে কর্ম্ম করিবার পর মহারাজা রাজকৃষ্ণবাবুকে এখানে স্থায়ী করিবার জন্য তাঁহার পরিবারবর্গকে আনিবার আদেশ করেন এবং এজন্য দুইমাসের ছুটি, পাথেয় নিমিত্ত দুইশত টাকা ও দুইমাসের অগ্রিম বেতন দেন। মহারাজার আদেশানুসারে সঙ্গীগণের সহিত রাজকৃষ্ণবাবু দেশে ফিরিয়া আসেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিজনগণকে লইয়া দ্বিতীয়বার নেপাল গমন করেন। এবার অপর পাঁচজন কারিগরকে লইয়া যাইবার আবশ্যক হয় নাই। নেপাল গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত একজন সিপাহী নিরাপদে পৌঁছিয়া দিবার জন্য পাটনা হইতে তাঁহাদের সঙ্গে ছিল।

রাজকৃষ্ণবাবু পুর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া খুব উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কারখানার শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় এবং এখানকার বাসিন্দার মত তাঁহাকে পরিবার পরিজনের সহিত স্থায়ীভাবে থাকিতে দেখিয়া মহারাজা তাঁহার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানদের প্রতিও মহারাজার স্নেহদৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁহাকে বাসবাটী ভিন্ন বাৎসরিক একশতটাকা আয়ের একখণ্ড জমি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মঙ্গলের জন্য মহারাজার বিশেষ চেষ্টা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১২৮৩ সালের ফাল্গুন মাসে মৃগয়ায় গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। মহারাজার এই আকস্মিক মৃত্যুতে রাজকৃষ্ণবাবু অত্যন্ত শোকানুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর রণউদ্দীপ সিং মহারাজা, এবং বীর সমসের জঙ্গ সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়বার নেপালে আসিয়া রাজকৃষ্ণবাবু দরবারস্কুলের প্রিন্সিপাল বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং রাজচিকিৎসক বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিয়াছিলেন।

মহারাজার মৃত্যুর পর রাজকৃষ্ণবাবুর সৌভাগ্যে ঈর্ষা-

* পাঁচ সরকার অর্থাৎ যাঁহার মুকুটে পাঁচটি হীরক-নক্ষত্র খচিত আছে।

† তিন সরকার অর্থাৎ যাঁহার মুকুটে তিনটি হীরক-নক্ষত্র খচিত আছে, ইনিই নেপালের প্রকৃত রাজা, কারণ ইঁহারই আদেশে যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

ষিত কতিপয় ব্যক্তি বিবিধপ্রকারে তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোনরূপে চারিবৎসর তিনি ঐ স্থানে কর্ম্ম করিয়া মহারাজা রণউদ্দীপ সিংহের নিকট পুরস্কৃত হইয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগত হন।

দেশে আসিয়া তিনি ঢালাইয়ের কারখানা খুলিয়াছিলেন এবং তাহাতে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা থাকায় আর পরের চাকরী না করিয়া এইরূপ স্বাধীন ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে অংশীদারগণের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া এই কারখানার সংস্রব ত্যাগ করেন। পরে, তিনি কিছুকাল বাবু উত্তমচরণ ঘোষের তেল ও ময়দার কলে ৪০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করেন। এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাঁহার বিশেষ ক্ষোভ ছিল না; ঈশ্বর যখন যে ভাবে যে কর্ম্মের মধ্যে তাঁহাকে ফেলিয়াছেন তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহাতেই উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই কলেও তিনি অন্যান্য কর্ম্মচারীর মত নিয়মিত কর্ম্মটুকুমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই, ইহার উন্নতিকল্পে কলের স্বত্বাধিকারীকে সম্মত করিয়া আরও ৬০টি নূতন কল বসান এবং ইহার সমধিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই সৎপরামর্শ দান ও বিবিধ চেষ্টা করেন। ইহাতে কলের স্বত্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন।

যখন নেপালের কর্ম্মের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াই সামান্য বেতনে এই ময়দার কলে কর্ম্ম করিতেছেন সেই সময়ে এক নূতন সংবাদ রাজকৃষ্ণ বাবুর কর্ণগোচর হইল; একদিন তিনি তাঁহার এক বন্ধুর নিকট শুনিলেন এখান হইতে বারজন সুদক্ষ কারিগর কাবুলের আমীরের নিকট পাঠান হইবে। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আবার রাজকৃষ্ণবাবুর নূতন স্থানে কর্ম্ম করিবার ও প্রবাসে বাস করিবার বাসনা জাগিল, এবং নবীন উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ হইল। কালবিলম্ব না করিয়া বন্ধুর নিকট হইতে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি আমীরের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার পুরাতন কয়েকখানি নিদর্শনপত্র দেখিয়া তাঁহাকে একজন কলকারখানা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া প্রতিনিধি মহাশয়ের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি তাঁহাকে কাবুলে যাইবার জন্য ১ মাসের অগ্রিম বেতন ১৫০৲ টাকা দিয়া যাত্রার দিন স্থির করিতে আদেশ করিলেন।

ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিনে আমীর সাহেবের প্রতিনিধি মহম্মদ ইস্মাইল খাঁর তত্ত্বাবধানে আরও বারজন কারিগরের সহিত রাজকৃষ্ণবাবু কাবুল যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সাতদিনে পেশোয়ার পৌঁছেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কাবুল গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত লোকজন ও তাঁবু অশ্বাদি না আসায় তাঁহারা তথায় দুইমাসকাল অপেক্ষা করিতে বাধ্য হন। পরে আড়াই মাসে সকলে কাবুলে পৌঁছেন; পথে একস্থানে ডাকাতের হাতে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু কাবুল গবর্ণমেণ্টের ১২ জন সৈনিক সঙ্গে থাকায় ডাকাতেরা কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। কাবুলে তাঁহাদের বাসের নিমিত্ত দরবার হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটি সুসজ্জিত দ্বিতল গৃহ এবং রক্ষার জন্য ১২-জন সশস্ত্র পাঠান-সৈন্য, একজন হাওলদার, একজন জমাদার, মোট ১৪-জন লোক আমীর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বাসায় ৩ দিন অবস্থিতির পর ৪র্থ দিবসে আমীর আব্দর রহমন তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠান এবং ঐ সঙ্গে তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য একএকটি ঘোড়া দান করেন। বহুভাষাভিজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল শোভান আলি মহোদয়ের সঙ্গে তাঁহারা স্ব স্ব শরীররক্ষকের সহিত আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। এইসকল শরীররক্ষকের প্রতি আমীরের হুকুম ছিল যে যদি কাবুলে থাকিতে কখনও এই বাঙ্গালীদিগের শারীরিক কোন অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের গর্দ্দান লওয়া হইবে।

দরবারে আবদুল শোভান তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দিলে, আমীর তাঁহাদিগকে দেখিয়া এবং রাজকৃষ্ণবাবু নেপাল দরবারে কর্ম্ম করিয়াছেন শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় বলেন—"তোমরা যে ঈশ্বরকৃপায় সকলে নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছ তাহাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আমার দেশে কল কারখানা মোটেই নাই; আমার ইচ্ছা আছে এইবার হইতে দস্তুরমত কল কারখানা প্রস্তুত করাইব;

তোমরা আসিয়াছ, মনোযোগ দিয়া কাজ কর্ম্ম কর। আমি তোমাদের ভাল করিব। উপস্থিত তোমাকে এবং প্রিয়নাথকে অদ্য হইতে মাসে ৫০৲ টাকা ও বাকী কয়-জনকে ১০৲ টাকা হিসাবে মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া দিলাম।" সুতরাং কাবুলে পৌঁছিয়া প্রিয়নাথ বাবু ও রাজকৃষ্ণ বাবুর ২০০ শত করিয়া ও, অবশিষ্ট ১২ জনের ৭০৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত হইল। সকলে প্রায় এক ঘণ্টা কাল আমীরের নিকট অবস্থিতি করিবার পর বাসায় প্রত্যাগত হন।

আমীর তাঁহাদিগকে চাকরের মত জ্ঞান না করিয়া অতিথিস্বরূপ গ্রহণ করায় তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রথম তিন দিন প্রচুর আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তাঁহাদিগের সহিত কাবুলের বহু ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া প্রমোদমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত ভাবী কারখানার অধ্যক্ষ জান্ মহম্মদ খাঁও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; পূর্ব্বোক্ত সোভান আলি খাঁ তাঁহার সহিত বাঙ্গালী কয়জনের পরিচয় করিয়া দেন।

তিন দিবস পরে আমীরের আদেশে কারখানার কার্য্য আরম্ভ হয়। তাঁহাদের বাসা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে "বাবুর বাগ" নামক স্থানে কারখানা-বাড়ী এবং সঙ্গেসঙ্গেই কল বসান আরম্ভ হয়। কলগুলি ইতিপূর্ব্বেই ওয়ালটার লক কোম্পানীর (Walter Lock and Co.) মার্ফৎ কাবুলে আনান ছিল। এইসকল কল বসা-ইতে রাজকৃষ্ণ বাবুর ছয় মাস লাগিয়াছিল। তিনটি কারখানার মধ্যে ১নং কারখানা হাজার ফুট, ২নং পাঁচশত ফুট ও ৩নং কারখানা দুই শত ফুট জমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনটি কারখানায় সর্ব্বসমেত ২৫০ জন কারিগর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। স্থানীয় কারিগরেরা হাতের কাজই জানিত এবং যন্ত্র ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। পূর্ব্বে তাহারা হাতেই বন্দুক ও কামান প্রভৃতি তৈয়ার করিত। আমীর প্রতি সপ্তাহে একবার কারখানা দেখিতে আসিতেন। রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহার গমনাগমনের জন্য দরবার হইতে কারখানা পর্য্যন্ত রেল লাইন পাতিয়া দেন। এজন্য হিন্দুস্থান হইতে একটি পাঁচ ঘোড়া জোরের চলিষ্ণু কল আনা হইয়াছিল। কিন্তু ইঞ্জিনের উত্তাপে আমীরের কষ্ট হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর মত একখানি গাড়ী তৈয়ার করা হয়। এ সমুদয় কার্য্য রাজকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার সঙ্গীগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। ছয়মাস পরে কারখানা প্রস্তুত হইয়া যেদিন সর্ব্বপ্রথম কল চালান হয় সেদিন আমীর সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কলসমূহ সুচারুরূপে চলিতে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ঐ সঙ্গে তাঁহার পুরোহিত মুল্লা সাহেব আসিয়া এই কারখানার প্রত্যেক যন্ত্রটিকে আফ্‌গান-শাস্ত্রমতে পূজা করেন। ইহার পর আমীরের আদেশে সকলের জলযোগের নিমিত্ত মিষ্টান্ন ও মেওয়া বিতরিত হয় এবং ১৩ জন বাঙ্গালীকে আমীর উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য লুঙ্গীর পাগড়ী উপহার দিয়া বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া প্রস্থান করেন।

এগ্রিমেণ্ট অনুসারে আড়াই বৎসর পূর্ণ হইলে, রাজকৃষ্ণ বাবু সঙ্গীগণের সহিত আমীরের নিকট বিদায় প্রার্থনা করেন। আমীর তাঁহাদের কার্য্যের জন্য যারপর-নাই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া ও পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দেন। রাজকৃষ্ণ বাবুকে তিনি একখানি নিদর্শনপত্রসহ একটি অটোমেটিক ঘড়ি, কাবুলের একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গালিচা, নগদ দুইশত টাকা এবং একটি উত্তম অশ্ব পুরস্কারস্বরূপ দেন এবং বলেন—"তোমরা পুনরায় আসিও, এবার তোমায় ৫০০৲ শত টাকা বেতন করিয়া দিব।" আমীরের সদাশয়তায় তাঁহাদের কাবুলপ্রবাস যথেষ্ট সুখপ্রদ হইয়াছিল। তাঁহারা যখন কারখানায় কর্ম্ম করিতেন প্রতি সপ্তাহে আমীর-ভবন হইতে তাঁহাদের জন্য রাজভোগের উপযোগী মেওয়া প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী আসিত এবং আমীর প্রত্যহ তাঁহাদের সকলের কুশল-সংবাদ লইতেন। কাবুলে থাকিতে একবার রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রাণসংশয়কর বিপদ ঘটিয়াছিল; তিনি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন; সেই সময়ে আর-একজন অশ্বারোহী তীরবেগে আসিয়া তাঁহার অশ্বকে এমন ভাবে কষাঘাত করিয়া নিমেষে অন্তর্হিত হয়, যে, তাঁহার অশ্ব উন্মত্তের মত দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য

হইয়া ভয়ানক বেগে ছুটিতে থাকে, বহুক্ষণাবধি কোন প্রকারে তাহার গতির বেগ হ্রাস করিতে না পারিয়া অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া পড়েন; তাহাতে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু বহুদিবস তাঁহাকে রাজচিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। এ অবস্থায়ও আমীরের সদয় ব্যবহার তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। আসিবার সময় যেমন বন্দোবস্ত ছিল দেশে প্রত্যাগমনের সময়ও তাহাদের সেইরূপ ব্যবস্থা হইল. পথের সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতেই প্রদত্ত হইল। দুঃখের বিষয় এক বৎসর পরে এখানে নিউমোনিয়া রোগে একজন প্রধান কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইয়াছিল। বারজনের সহিত আসিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজকৃষ্ণবাবুকে ১১জন সঙ্গীর সহিত ফিরিতে হইল।

দেশে আসিবার অল্পদিন পরেই নেপাল দরবার হইতে মহারাজা বীর সমসের জঙ্গের আদেশক্রমে তাঁহার নামে এক পত্র আসে। পত্রে রাজকৃষ্ণবাবুকে পুনরায় নেপালের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ ছিল। কাবুল যাইবার পুর্ব্বে ঐরূপ পত্র আসিলে তিনি তৎপুর্ব্বে কাবুলের আড়াই বৎসরের এগ্রিমেণ্টে বদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া তখন তাহা অতি বিনীত ভাবে নেপালের মহারাজাকে জানাইয়াছিলেন। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এক্ষণে পুনরায় তাঁহার নিয়োগপত্র আসিলে, তিনি ২০০ শত টাকা বেতনে নেপালে গমন করিলেন। তাঁহার কাবুলযাত্রার সঙ্গী যদুনাথ নন্দী এবং অধরচন্দ্র কর্ম্মকারকে সঙ্গে লইলেন।

১২৯১ সালে রাজকৃষ্ণবাবু দ্বিতীয়বার নেপালের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন কল আনাইয়া একটি কামান বন্দুকের কারখানা * ও একটি টোটার কারখানা স্থাপিত করান। তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত অস্ত্রাদি দেখিয়া মহারাজ এতদূর সন্তুষ্ট হন যে ১২৯৩ সালে তাঁহাকে কাপ্তেন (Captain) পদে বরণ করেন. এবং তদুপযোগী জঙ্গী পোষাকের সহিত সম্মুখভাগে ডিম্বাকৃতি সোনার মোটা পাতে দেবীমূর্ত্তি-অঙ্কিত তকমা, উপর নিয়ে চাঁদ অর্থাৎ বহুমূল্য চুনি পান্না ও চতুর্দ্দিকে ৩০ হাত লম্বা সোনার তারে জড়িত সুদৃশ্য পাগড়ী উপহার প্রদান করেন। নেপালে যতগুলি বৈদেশিক কর্ম্মচারী ছিলেন তন্মধ্যে প্রথমে রাজকৃষ্ণ বাবুকেই নেপাল গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত রীতি অনুসারে পদস্থ করা হয়।

দুই বৎসর কর্ম্মের পর আবার তিনি দুই মাসের ছুটি পান এবং ছুটি হইতে ফিরিয়া নেপালে বৈদ্যুতিক আলোর প্রতিষ্ঠা করেন। নেপালে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইয়াছেন। এসময়ে কোন ইলেকৃট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিল না। যে ডাইনামো রাজকৃষ্ণবাবু প্রথম বসাইয়াছিলেন তাহা এক্ষণে মহারাজাধিরাজের প্রাসাদের অন্তঃপুরে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। এই কার্য্যে মহারাজাধিরাজ, মহারাজা, প্রধান সেনাপতি প্রমুখ রাজপুরুষগণকে পরম সন্তোষদান করিয়া উন্নত প্রণালীর কামান ও কামানের গাড়ী প্রস্তুত করিয়া তিনি ৫০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এবার তিনি মেশীন্ গন্, বা যন্ত্রচালিত কামান নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হন। নেপালের যাবতীয় কল কারখানা রাজকৃষ্ণবাবুর তত্ত্বাবধানে স্থাপিত ও উন্নত। এক্ষণে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নেপালেই অবস্থিতি করিতেছেন। নেপালে বাগমতী নদীর উপকূলে তাঁহার বাসস্থান।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

* পুর্ব্বে কামান বন্দুকের কারখানা বাঙ্গালীদেরও ছিল। বাঙ্গালী তত্ত্বাবধায়ক হরবল্লভ দাসের অধীনে, বাঙ্গালী কর্ম্মকার জনার্দ্দন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ইতিহাসলব্ধ সুবৃহৎ কামান "জাহানকোষা" তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। অবশ্য রাজকৃষ্ণ বাবুর শিক্ষা ও প্রতিভা স্বতন্ত্র। কলকারখানা সম্বন্ধীয় কার্য্য এমন নাই যাহা তিনি হাতে-কলমে করিয়া শেখেন নাই এবং এদেশে এমন যন্ত্রশিল্প-বিভাগ নাই যথায় কর্ম্ম করিয়া তিনি প্রভুদের সন্তোষ দান করেন নাই।

বিন্দু ও সিন্ধু

বিন্দু কহে, সিন্ধু তুমি অনন্ত অপার,
আমি অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, হেয় সবাকার।
সিন্ধু কহে, তুমি মম দেহপ্রাণময়,
নহ তুচ্ছ, বিন্দু বিনা সিন্ধু কোথা হয়?

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রাহা।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

(৪)

এখন আমরা ললিতবাবুর ভো ল ফে রা শব্দপ্রকরণের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সংস্কৃত ব য় স্ শব্দ বাঙ্‌লায় ব য় স (অকারান্ত) হইয়াছে। ইহার মূল প্রাকৃতই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতে বা পালিতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের প্রয়োগ মোটেই নাই। সংস্কৃত শ র দ্, ভি ষ ক্, প্রা বৃ ট্ (ষ্) ইত্যাদি প্রাকৃতে যথাক্রমে স র অ (= শরদ), ভি স অ (= ভিষক), পা উ স (= প্রাবৃষ) ইত্যাদি হইবে। আ শি স্ হইতে বাঙ্‌লায় আজকাল অনেকে আ শী ষ লিখেন। ললিত বাবু বলেন "আশীষে ইবর্ণের দীর্ঘত্ব আশীর্ব্বাদের দেখাদেখি, ইহা অশুদ্ধ। 'আশিষ'-শব্দের ভাল।" কিন্তু প্রাকৃতে আমরা ইবর্ণের দীর্ঘত্বই দেখিতে পাই — আ সী সা (হেমচন্দ্র, ৮.২.১৭৪), আ সী স (কুমারপাল-চরিতে, ১.৮৫)।

ম ঞ্জ রী শব্দ বাঙ্‌লায় মু ঞ্জ রী আকার ধারণ করিয়াছে। বহু দিন হইতেই এইরূপ হইয়াছে, এবং তাহার একমাত্র কারণ মূল শব্দটিকে কোমলতর করা। অকার অপেক্ষা উকারের ধ্বনি কোমলতর। যথা বা প অপেক্ষা বা পু অধিক মৃদু। সাধারণ লোকের মধ্যে মু ঞ্জ রী শুনা যায়। চণ্ডীদাসের

"স্বরূপ বিহনে　　　　রূপের জনম
কখন নাহিক হয়।"

ইত্যাদি পদে রহিয়াছে—

"মনে অনুগত　　　　মু ঞ্জ রী সহিত
ভাবিয়া দেখহ মনে।"

মুদ্রিত পাঠে কতটা নির্ভর করা যায় অবশ্য তাহা বিচার করিতে হইবে।

প্রাকৃতেও এইরূপ আছে, যেমন খ ড়্গ স্থানে খ ণ্ডু (=খাঁড়া) — প্রাকৃতসর্ব্বস্ব, ১৮.৭। প্রাকৃতসর্ব্বস্বকার এইরূপই বলিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয় খ ণ্ড হইতেই খ ণ্ডু হইয়াছে। সাধারণত খ ড়্গ হইতে প্রাকৃতে খ গ্গ হয় (প্রাকৃতলক্ষণ, ৩.৩)। অপভ্রংশ প্রাকৃতের প্রকৃতি দেখিলে ত এরূপ স্বরবিপর্য্যয় প্রতিপদেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। একথা আমরা পরে আবার তুলিব।

চ ক-চ ক হইতে বিশেষ্য চা ক চ ক্য সংস্কৃতে (বেদান্ত-পরিভাষা, ১) আছে, আবার চা ক চি ক্য শব্দও আছে (দ্র:— শব্দকোষ, ২৪৯১। চ ক চ ক শব্দের ন্যায় চি ক চি ক শব্দও বাঙ্‌লায় প্রযুক্ত হয়, যদিও সংস্কৃতে দেখিতে পাই নাই।

সংস্কৃতে দা র (পুংলিঙ্গ) এবং দা রা (আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ) উভয় শব্দই আছে। দা র সাধারণত বহুবচনে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু কখনো কখনো একবচনেও হইয়া থাকে (আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ১.১৪.২৪; গৌতমধর্ম্মশাস্ত্র, ২২.২৯)। ভাগবতে (৭.১৪.১১) দা রা ("আত্মনো দারাম্") আছে। অতএব পুংলিঙ্গ বহুবচনান্ত দা রাঃ পদের বিসর্গলোপে দা রা হয় নাই।

এইবার ললিতবাবুর প্রদর্শিত (১৩ পৃঃ) অ ল কা (= অলক), তি ল কা (= তিলক) প্রভৃতি শব্দে অকার-স্থানে আকার, এবং শি ল (= শিলা), বী ণ (= বীণা) প্রভৃতি শব্দে আকার-স্থানে অকার কোথা হইতে কিরূপে হইল একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

কেবল আধুনিক সাহিত্যে নহে, প্রাচীন সাহিত্যের সহিত যাঁহার স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে তিনিও বলিতেন যে, অতিপূর্ব্ব হইতেই বঙ্গভাষায় এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। উদাহরণরূপে একটিমাত্র এখানে উল্লেখ করিব:—

"আজু রজনী হম　ভাগে গমাওল
পেখল পি আ মুখ চ ন্দা।
জীবন যৌবন　সফল করি মানল
দশ দিশ ভেল নি র দ ন্দা॥
আজু মঝু গেহ　গেহ করি মানল
আজু মঝু দেহ ভেল দে হা।
আজু বিহি মোহে　অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু স ন্দে হা॥
সোই কোকিল অব　লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চ ন্দা।
পাঁচবাণ অব　লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু ম ন্দা॥
অব মঝু যব　পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহি মানব নিজ দে হা।
বিদ্যাপতি কহ　ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয় নব নে হা॥"

বিদ্যাপতি (পরিষৎ), ৪৮৪।

এইবার একটি প্রাকৃত কবিতা উদ্ধৃত করিব:—

"জসু মিত্ত ধ ণে সা　　　　সসুর গি রী সা
তহবি হু পীধণ দীস।
জই অমিঅহ ক ন্দা　　　　নিঅরহি চ ন্দা
তহবি হু ভোঅণ বীস॥
জই কণঅসুরঙ্গা　　　　গোরী অধঙ্গা
তহবি হু ডাকিণি সঙ্গ।
জো জসহি দিআবা　　　　দেব স হা বা
কবহু ণ হো তসু ভঙ্গ॥"

প্রাকৃতপিঙ্গল, ১.১৫৬।*

কবিতাটির অর্থ হইতেছে—ধনেশ (কুবের) যাঁহার মিত্র, গিরীশ (হিমালয়) যাঁহার শ্বশুর, তথাপি যাঁহার পরিধান দিক্; অমৃতকন্দ চন্দ্র নিকটে থাকিলেও ভোজন যাঁহার বিষ; কনকবর্ণা গৌরী অর্দ্ধাঙ্গ হইলেও ডাকিনীর সহিত যাঁহার সঙ্গ; এবং যিনি (ভক্তগণকে) যশ প্রদান করিয়া থাকেন: সেই (মহাদেব) দৈবস্বভাব, তাঁহার কোন ভঙ্গ (ক্ষয়) নাই।

এই কবিতাটি অপভ্রংশ প্রাকৃতে লিখিত। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ধ নে শ হইয়াছে ধ ণে সা (=ধনেশা); এইরূপ গি রী শ = গি রী সা (=গিরীশা); •ক ন্দ = •ক ন্দা; চ ন্দ্র = চ ন্দা (= চন্দ্রা); •স্ব ভা ব = •স হা বা (= •স্বভাবা)।

অপভ্রংশ প্রাকৃতের নিয়মই আছে "স্বরাণাং স্বরাঃ প্রায়োঽপভ্রংশে" (হেমচন্দ্র, ৮.৪.৩২৯); অপভ্রংশ প্রাকৃতে প্রায়ই এক স্বরের স্থানে আরএক স্বর হয়। প্রাকৃতসর্ব্বস্বকার (১৭.৫) সূত্রই করিয়াছেন যে, অপভ্রংশে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে অকারান্ত শব্দের অন্তস্থিত অকার প্রায়ই আকার হইয়া যায় ("অতোঽস্ত্রিয়াং ডা বহুলম্")। ত্রিবিক্রমও (৩.৩.৩২) এইরূপ বলিয়াছেন।

আবার আকার-স্থানে অকারও হয়। হেমচন্দ্র অপভ্রংশপ্রকরণে

* দ্রষ্টব্য—ঐ, ২.৬৬; "চ ন্দা কু ন্দা এ কা সা" ইত্যাদি।

ইহার উদাহরণ দিতে গিয়া (৮.৪.৩২৯) ললিতবাবুর প্রদর্শিত বী ণ (= বীণা) শব্দও ধরিয়াছেন; আবার বে ণ শব্দও হয়। বা হু শব্দ অপভ্রংশে বা হ, বা হা, বা হু এই তিন-প্রকারই হয়। এইরূপ অনেক।'

অপভ্রংশ প্রাকৃতের সহিত বঙ্গভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এইসকল শব্দও দেখাইয়া দিতেছে।

" দ ত্ত জা, মি ত্র জা প্রভৃতিকে (১৪ পৃঃ) এই প্রকরণের মধ্যে ফেলিয়া ললিতবাবু ইহাদিগকে আরও অদ্ভুত বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু অদ্ভুতত্ব দেখিতে পাইতেছি না। এই জাতীয় শব্দে দ ত্ত জ, মি ত্র জ প্রভৃতি শব্দে আকারটা পূর্ব্ববৎ অপভ্রংশ প্রাকৃতের প্রভাবে আসিয়াছে বলিলে একটা উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু আরো উত্তর আছে। এই আকারতত্ত্বটা আমরা একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিব।

সংস্কৃতের অন-ভাগান্ত শব্দসমূহের বাঙ্‌লায় অন-এর নকারের লোপ হয়, এবং অকার-স্থানে আকার হয়। যথা—

ম র ণ = ম রা
ক র ণ = ক রা
ত র ণ = ত রা
চ ল ন = চ লা
প চ ন = প চা
গ ল ন = গ লা
ধা র ণ = ধ রা
চূ ষ ণ = চূ ষা
ক র্ত্ত ন = (ক ট্ট ন =) কা টা
ব ণ্ট ন = বাঁ টা
ঘ র্ষ ণ = ঘ সা
ব র্দ্ধ ন = (ব ড্‌ঢ ন =) বা ড়া

ইত্যাদি।

মি ত্র জা প্রভৃতি স্থলে এরূপ কোন শব্দ থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

সংস্কৃতের অক-অন্ত শব্দ সমূহেরও বাঙলায় অক-এর ক লুপ্ত হয়, এবং অকার আকার হইয়া থাকে। প্রাকৃতের নিয়মে প্রথমে ক-স্থানে অ হয়, এবং তদনন্তর মা ত্রা ঠিক রাখিবার জন্য উভয় অকারে আকার হয়। যথা—

ক ণ্ট ক = (ক ণ্ট অ = ক ণ্টা =) কাঁ টা
মো দ ক = (মো অ অ =) মো আ
(অথবা মো য়া হইতে পারে)
ম স্ত ক = (ম থ অ = ম থা * =) মা থা
ম ণ্ড ক † = (ম ণ্ড অ =) ম ণ্ডা
পা ন ক ‡ = (পা ন অ =) পা না
চ ণ ক = (চ ণ অ =) চা না

এইরূপই ম শ ক = ম শা, মূ ল ক = মূ লা, মো চ ক = মো চা (কলার ফুল), § ইত্যাদি।

জা ত ক শব্দ এই প্রকরণের মধ্যে পতিত হইলেও বাঙ্‌লায় ইহা জা তা হয় না, না হইবার কারণ আছে। প্রাকৃতের নিয়মানুসারে অনাদিস্থিত অসংযুক্ত ক, গ, ত, দ-প্রভৃতি বর্ণের লোপ হইয়া থাকে (হেম. ৮. ১. ১৭৭)। এই নিয়মে জা ত ক শব্দ জা অ অ হইয়া যায়, * এবং ইহা হইতে সন্ধির নিয়মে উচ্চারণের সৌকর্য্যে জা হইয়া থাকে। সংস্কৃত হৃ দ য় যখন প্রাকৃতে হি য় অ আকার ধারণ করিল, তখনই আবার তাহা হইতে এইরূপেই আমরা হি য়া পদ পাইয়াছি।

জা ত শব্দ পুত্র-অর্থে বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ আছে (ঋ. স. ২. ২৫. ১; অথ. স. ১১. ৯. ৬; "জা ত (= পুত্র = বৎস) কথয়িতব্যং কথয়,"—উত্তরচরিত, ৪); এবং জা ত = জা ত ক (স্বার্থে ক)।

অতএব মিত্র-পুত্র, দত্ত-পুত্র অর্থে মি ত্র জা ত ক, দ ত্ত জা ত ক শব্দ হইতে মি ত্র জা, দ ত্ত জা শব্দ দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। মিত্র-পুত্র, দত্ত-পুত্র অর্থে মি ত্রে র পো, দ ত্তে র পো আমরা বলিয়া থাকি। পুত্রকে পিতা-মাতা বা পূর্ব্বপুরুষের নামের শব্দে ডাকিবার রীতি এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যথা—গা র্গ্য, ভা র দ্বা জ, জা ম দ গ্ন্য, পা ণ্ড ব, কু ন্তী পু ত্র, রা ধা পু ত্র সৌ মি ত্রি, সৌ ভ দ্র, জা ন কী, ইত্যাদি। পা দ যেমন প্রাকৃতে পা অ হইয়া বাঙ্‌লায় পা হইয়াছে, † জা ত শব্দও সেইরূপ প্রাকৃতে জা অ হইয়া বাঙ্‌লায় জা হইতে পারে। তুলনীয়:—যা ব ৎ = জা ব = জা অ = জা; তাবৎ = তা ব = তা অ = তা (হেমচন্দ্র, ৮. ১. ২৬৮, ২৭১; শুভচন্দ্র, ১. ৩. ৯০, ৯১)। অতএব মি ত্র জা ত, দ ত্ত জা ত শব্দও যথাক্রমে মি ত্র জা, দ ত্ত জা হইতে পারে।

দ ক্ষি ণা বা তা স, নি র্জ্জ লা দুধ, ইত্যাদি স্থলে ললিতবাবু বলিতে চাহেন, (১৪ পৃঃ) "স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণ ভাবে পদগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল, পরে ব্যাপ্তিগ্রহ (?) ঘটিয়াছে।" এখানে নানা-রূপ সমাধানের কুতর্ক বা কষ্টকল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অপভ্রংশ প্রাকৃতই এখানে যথার্থ উত্তর প্রদান করিবে। অপভ্রংশ প্রাকৃতে এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, আকারান্ত দেখিলেই শব্দটিকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া স্থির করিতে হইবে না। অপভ্রংশ প্রাকৃতের আকারপ্রাচুর্য্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রকৃতবিষয়ে অপভ্রংশ-কবিতা হইতে একটা উদাহরণ দিই:—

"পওহর মুহ ট্‌ঠিআ তহ অ হত্থ এক্কো দিআ
পুণো বি তহ সংঠিআ তহ অ গন্ধ সজ্জো কিআ।"

(সংস্কৃত)

পয়োধরো মুখে স্থিতঃ তথাচ হস্ত একো দত্তঃ
পুনরপি তথা সংস্থিতো তথা চ গন্ধঃ সজ্জঃ কৃতঃ।

প্রাকৃত কবিতায় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে প য়ো ধ র স্থি তা, এ ক দত্তা, গ ন্ধ কৃ তা। ইহা আলোচনা করিলে ললিতবাবুর প্রদর্শিত এইজাতীয় শব্দসমূহের সমাধানের জন্য আর কোনো দিকে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।

বী ণা, শি লা প্রভৃতি কিরূপে বী ণ, শি ল প্রভৃতি হইল, প্রসঙ্গত তাহা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি, আরও একটু বলিব। অপভ্রংশ প্রাকৃতের নিয়মই হইতেছে যে ইহাতে প্রায়ই দীর্ঘ হ্রস্ব, এবং হ্রস্ব দীর্ঘ হইয়া থাকে (হেমচন্দ্র, ৮. ৪. ৩৩০; মার্কণ্ডেয়, ১৭. ৯)।

* ম থা কম্পন্তা (মস্তকং কম্পতে)—প্রাকৃতপিঙ্গল, ২-১৮৩।

† বৃদ্ধ হারীতসংহিতায় (স্মৃতিসমুচ্চয়, আনন্দাশ্রম) এই শব্দটি বহুবার প্রযুক্ত দেখা যায় (৮. ৩৬৪, ৪১২, ৪৬২)।

‡ ঐ, ৮. ৩৬৫, ৪৪৩। মিছরী প্রভৃতির পা না বঙ্গভাষায় প্রসিদ্ধ।

§ দ্রষ্টব্য—"মো চা গর্ভপলাশম্", ঐ, ৮. ২৫৪।

* আবার এই দুইটি পদও হইতে পারে:—জা অ য়, জা য় য়।

† প্রাকৃতেও পা হইয়া থাকে, দ্রষ্টব্য—হেমচন্দ্র, ৮. ১. ২৭০; শুভচন্দ্র, ১. ৩. ৮৯।

এই নিয়মে সু ব র্ণ রে খা হইবে সু ব র্ণ রে হ। "পঢ়ম হোই চউরীস ম ত্ত" (প্রাকৃতপিঙ্গল, ১. ৭৭) মা ত্রা হইতে ম ত্তা স্থানে ম ত্ত হইয়াছে। ঈকার স্থানে হ্রস্ব ইকারের উদাহরণ দিই:—"কুম্ম চলন্তে ম হি চলই (প্রাকৃতপিঙ্গল, ১. ৮০), এখানে মহী স্থানে ম হি হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলী (পরিষৎ সংস্করণ) পাঠ করিল এরূপ উদাহরণ শত শত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ললিতবাবু মাং স-এর উচ্চারণ ম ং স শুনিয়াছেন, আমরাও এখানে (মালদহে) সাধারণ লোকের মধ্যে এইরূপ শুনিতেছি। ইহা সংস্কৃত হিসাবে অশুদ্ধ হইলেও প্রাকৃত হিসাবে বিশুদ্ধ। পালি-প্রাকৃতের নিয়মই হইতেছে অনুস্বার যোগ হইলেই দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হইয়া যায়, দীর্ঘ স্বরে অনুস্বার থাকে না (হেমচন্দ্র, ৮.১.৭০; শুভচন্দ্র, ১.২.৩৮)। আবার মাং স কে অনেক স্থানে মা স উচ্চারণ করা হয় (যথা, হা ড়-মা স)। প্রাকৃত বৈয়াকরণিকগণ ইহারও নিয়ম করিয়াছেন (হেমচন্দ্র, ৮.১.২৯; শুভচন্দ্র, ১.২.৩৪)।

এইবার ললিতবাবু প্রশ্ন তুলিয়াছেন—ইমন্-প্রত্যয়ান্ত নী লি ম ন্, র ক্তি ম ন্, ইত্যাদি শব্দের প্রথমার একবচনে নী লি ম, র ক্তি ম ইত্যাদি কিরূপে হইতে পারে? এবং কিরূপেই বা ঐসকল শব্দ বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে?—যথা, "ছুটিল একটি গোলা র ক্তি ম বরণ।" 'র ক্তি ম কপোল।' সংস্কৃতের মধ্যে ঢুকিয়া জোর জবরদস্তি করিয়া, কষ্টকল্পনা করিয়া ইহার সমাধান করিবার প্রয়োজন নাই, আর তাহা করিতে গেলেও নিষ্ফল হইবে। প্রাকৃত ও প্রাচীন সাহিত্যের নিকট ইহার সরল উত্তর পড়িয়া আছে। প্রাকৃতের সাধারণ নিয়মই এই যে, ইহাতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের সুবন্ত স্থানে শেষ ব্যঞ্জনটি লুপ্ত হইয়া যায়। যথা না ম ন্ হয় না ম, জ গ ৎ হয় জ গ (ইহা হইতেই জ গ ব ন্ধু)। এই রূপেই নী লি ম হওয়া প্রাকৃতে কোনরূপ বিরুদ্ধ নহে। তবে ম হি মা শব্দও প্রাকৃতে পাওয়া যাইবে। নী লি ম বিশেষণ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর ভাষাই দিবে। ভাষায় দেখিতেছি ইহা বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়। পূর্ব্বে (পালিপ্রকাশের ভূমিকা, ৪৭) ব ক্র হইতে ব ঙ্ক, বঙ্ক প্রভৃতি আলোচনার সময় ব ঙ্কি ম শব্দের উৎপত্তি ও তাহার বিশেষণরূপে প্রয়োগকে আমিও বি চি ত্র বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পরেই প্রাকৃতে প্রামাণিক প্রয়োগ দেখিয়া অর্দ্ধ তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি। প্রয়োগকর্ত্তা হইতেছেন মহাবৈয়াকরণিক হেমচন্দ্র। তিনি অপভ্রংশ প্রাকৃতে লিখিয়াছেন (৮.৪.৩৪৪)—

"জিবঁ জিব ব ঙ্কি ম লোচণহং।"
যথা যথা ব ক্র লোচনানাম্।

এই ব ঙ্কি ম শব্দটি বঙ্গভাষায় কিরূপ প্রচলিত বঙ্গের ব ঙ্কি ম চন্দ্রের নামেই তাহা প্রকাশিত। এই জাতীয় শব্দের বিশেষণরূপে প্রয়োগ যে, প্রাচীন আচার্য্যগণেরও সম্মত, তাহা দেখাইবার জন্য পদাবলী-সমূহ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব।

বিদ্যাপতি (পরিষৎ)—

অব ভেল যৌবন, ব ঙ্কি ম দীঠ।
উপজল লাজ, হাস ভেল মীঠ॥" পদ, ৭।
"পীন কনয়া কুচ কঠিন কঠোর।
ব ঙ্কি ম নয়নে চিত হরি লেল মোর॥" ৩৫৭।

"ব ঙ্কি ম গীম," ৩৩৭; দ্রষ্টব্য ৫০১ পৃঃ ৫; ইত্যাদি।

"হৃদয় কুসুম সম ম ধু রি ম বাণী।" ৩৭১; দ্রঃ-৮১৬।
"ভ ঙ্গি ম অঙ্গবিভঙ্গে।" ৫৪১।

এইরূপ অনেক।

জ্ঞানদাস (বৈষ্ণবপদাবলী, বসু.)—

"র ঙ্গি ম পাগিড়ী পেঁচ উড়িছে পবনে।" ১৬৭ পৃঃ। এই পদটি বিশেষণরূপে লক্ষণীয়; র ঙ্গ বিশেষ্য, তাহার পর বিশেষ্য প্রত্যয় ইমন্।

"ব ঙ্কি ম ঈষৎ বয়ান।" ২৩২ পৃ.।

গোবিন্দদাস (বৈষ্ণবপদাবলী, বসু.)—

"ধ ব লি ম কৌমুদী মিলি তনু চলই।" ২৬৪ পৃ.।
"নী লি ম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নী লি ম হার উজোর।" ২৮৯ পৃ.।

ললিতবাবু লিখিয়াছেন (২৩ পৃ.)—"'কালিমা' ও 'নীলিমা'তে সন্তুষ্ট না হইয়া অনেকে 'লালিমা'র আমদানি করিতেছেন।" আমি দেখিতেছি এ আমদানী নূতন নহে, অনেক প্রাচীন, বহুদিন হইতে ইহা লইয়া কারবার চলিতেছে। অতএব হঠাৎ ইহা তুলিয়া দিবার কারণ নাই। বিদ্যাপতি (পরিষৎ) লিখিয়াছেন—

"অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল।
উরজ উদয় থল লা লি ম দেল॥" পদ, ৪।

পদাবলী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় টীকা করিয়াছেন—"লালিম—লালিমা (মৈথিল শব্দ), লোহিতাভা।" লক্ষণীয়—এ স্থলে এই পদটি বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের উদ্ধৃত র ঙ্গি ম দ্রষ্টব্য।

এবারকার মত আমরা এইখানেই শেষ করি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

লাউ-কুমড়ার পোকা

লাউ-কুমড়ার অনেকপ্রকার কীট-শত্রু আছে। প্রায় সকলগুলিই কঠিন-পক্ষ জাতীয় (beetles)। ইহাদের মধ্যে একপ্রকার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনিষ্ট করে, এখানে তাহাদেরই কথা বলা যাইতেছে। নিম্নবাঙ্গলায় ইহারা "বাঘা-পোকা" বা "কাঁঠালেপোকা" নামে পরিচিত; ইংরেজীতে ইহাদিগকে Epilachna beetles বলে। বাঙ্গলাদেশের প্রায় সর্ব্বত্রেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব আছে; উড়িষ্যারও স্থানে স্থানে ইহাদের আক্রমণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। উদ্যান-শস্যের উপরেই ইহাদের অত্যাচার সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়; ক্ষেত্র-শস্যকে ইহারা বড় একটা আক্রমণ করে না। শুধু লাউ-কুমড়াই ইহাদের একমাত্র খাদ্য নয়; লাউ-কুমড়াজাতীয় (cucurbitaceous) সমস্ত গাছ, এমন কি আলু ও বেগুন গাছকেও ইহারা আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হয় না। ফুল বা ফলের ইহারা কোন অনিষ্ট করে না; শুধু পাতার উপরেই ইহাদের যত উপদ্রব।
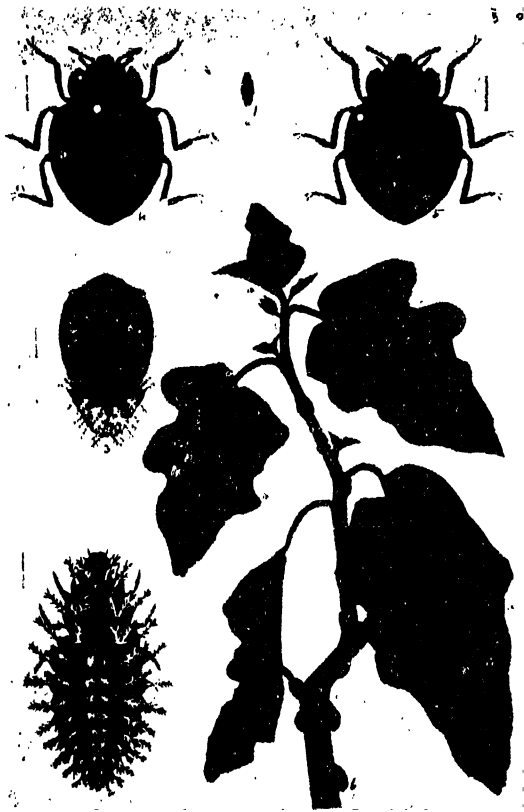
লাউ কুমড়ার পোকা (বর্দ্ধিতাকার)।
(১) ডিম ; (২) কীড়া ; (৩) গুটি ; (৪) ১২-দাগা বাঘা পোকা ; (৫) ২৮-দাগা বাঘা পোকা ; (৬) বেগুন গাছে—(a) ডিমের থোকা, (b) কীড়া পাতা খাইতেছে, (c) ডাঁটার উপর বিশ্রাম, (d) পূর্ণপক্ষ পোকা পাতা খাইতেছে।—ভারতীয় কৃষিবিভাগের কীটতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত টি বেনব্রিজ ফ্লেচার সাহেবের অনুগ্রহে প্রাপ্ত।

এই পোকা দেখিতে ছোট, গোল, মেটে লাল রঙের, ইহাদের আকার ও আয়তন আধখানা মটরদানার ন্যায় এবং উপরকার ডানার উপর ছোট ছোট গোল গোল কালো কালো দাগ থাকে। একজাতীয় পোকার উপর ১২টি এইরূপ দাগ থাকে, ইহাদিগকে 12-spotted epilachna বা বারো-ফোঁটার বাঘা পোকা বলে, আর একজাতীয় পোকার ২৮টি দাগ থাকে, ইহাদের নাম 28-spotted epilachna বা আটাশ-ফোঁটার বাঘা পোকা। স্ত্রী-পোকা পাতার উপর স্থানে স্থানে একসঙ্গে অনেকগুলি করিয়া ডিম পাড়ে। ডিমগুলির আকার লম্বা ও রং হলুদে। চার-পাঁচদিনের মধ্যে ঐসকল ডিম হইতে ছোট ছোট কীড়া (grubs) বাহির হইয়াই পাতার উপরকার অংশ (Epidermis) খাইতে আরম্ভ করে, ফলতঃ পাতাগুলি ঐসকল স্থানে শীর্ণ কুঞ্চিত হইয়া যায়। অধিক-সংখ্যক কীড়ার আক্রমণ হইলে গাছের প্রায় সমস্ত পাতাগুলিই এইরূপে শুকাইয়া যায় এবং গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ার দরুণ হয় একেবারে মরিয়া যায়, না হয় ফলধারণে অক্ষম হইয়া পড়ে। পূর্ণায়তন কীড়া দেখিতে হলুদবর্ণ, চেপ্টা, ডিম্বাকৃতি, প্রায় সিকি ইঞ্চি লম্বা এবং সর্ব্বাঙ্গ ছোট ছোট শুঁয়ায় পরিপূর্ণ। কীড়াগুলি পাতার সহিত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে এবং অল্প নড়ে। ২০।২৫ দিন ইহারা কীড়া অবস্থায় (larval stage) থাকে এবং এই অবস্থায়ই ইহারা অধিক ভক্ষণ করে। এই সময়ের মধ্যে ইহারা পাঁচ-ছয়-বার খোলস ছাড়ে। বিশ্রামাবস্থায় (Pupal Stage) ইহারা কোনপ্রকার গুটি (cocoon) বাঁধে না, অনাবৃতভাবে পশ্চাদ্ভাগের পা দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ডাল বা পাতা হইতে ঝুলিয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহারা একেবারেই ভক্ষণ করে না, নিশ্চল নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে। চার-পাঁচ-দিন পরে পূর্ণপরিণত (adult) পোকা বাহির হইয়া আসে, এবং যথাসময়ে নূতন পাতার উপর ডিম পাড়ে। পরিণত অবস্থায়ও ইহারা গাছের উপর অত্যাচার করিতে বিরত হয় না।

ইহাদের আক্রমণ-প্রতীকারের সহজ উপায় ইহাদিগকে হাতে খুঁটিয়া মারিয়া ফেলা বা আক্রান্ত পাতাগুলি ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া ফেলা; ইহাতে তাহাদের বংশ-বিস্তারের পথ বন্ধ হইয়া যায়। অত্যন্ত অল্প-সংখ্যক পোকার আক্রমণ হইলেও তাহাদের অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে একটি স্ত্রী-পোকা তিনশত পর্য্যন্ত ডিম পাড়িতে পারে; কত শীঘ্র ইহারা সংখ্যায় অধিক হইয়া উঠে ইহাতেই সহজে অনুমান হয়।

অনাক্রান্ত গাছে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিলে কেরোসিন তৈল ও কাঠের ছাই (wood ash) মিশাইয়া ছিটাইয়া দিলে কোন পোকার উপদ্রবের ভয় থাকে না, কারণ ইহাতে গাছের পাতা পোকার পক্ষে অত্যন্ত বিস্বাদ হইয়া পড়ে। অথচ ইহাতে গাছের কোন হানি হয় না।

আক্রান্ত গাছে আধসের (1lb) লেড ক্রোমেট (Lead chromate) বা আর্সেনিয়েট (Arseniate) প্রায় ৮মণ (64 gallons) জলে গুলিয়া ঝাঁঝরা-পিচকারি (Sprayer) দ্বারা ছিটাইয়া দিলে অতি শীঘ্র সকল পোকা মরিয়া যায়।

কৃষি কলেজ, সাবোর। শ্রীনির্ম্মল দেব।

কবরের দেশে দিন পনর

ত্রয়োদশ দিবস—নব্য মিশর।

১৯১১ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানবপরিষদের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, লোহিতাঙ্গ, পীতাঙ্গ ইত্যাদি জগতের সকলপ্রকার জাতি হইতে পণ্ডিতগণ সেই সভায় নিজ নিজ সমাজ, ধর্ম্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মানবজাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরস্পর সখ্য ও সৌহার্দ্দ্য বন্ধনই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুসাহিত্যপ্রচারক দার্শনিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই সভায় নেতৃত্বের পদে আহুত হন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে মহোদয় প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। আধুনিক মিশর সম্বন্ধেও একজন প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মহম্মদ সুরুর বে। ইনি কাইরো নগরের একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। অন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়সমূহে ইনি ওকালতী করেন। ফরাসী ভাষার সাহায্যে ইনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ফরাসী ভাষাতেই ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। মিশরের বর্ত্তমান সমাজে ইহাঁর মর্য্যাদা বেশ উচ্চ।

কাইরোর আর-একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাহগাত বে। ইনি চিকিৎসক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুসারে চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করেন। ইনি ইংরেজীতে বেশ লিখিতে পারেন। "প্যান্‌-ইস্‌লাম"-আন্দোলনের ইনি একজন নায়ক। জগতের মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী জনগণের ভবিষ্যৎ আদর্শ ইনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় মুসলমানেরা "প্যান্‌-ইস্‌লাম"-আন্দোলনকে অনেকটা হিন্দু-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু ডাক্তার বাহগাত বে মহাশয়ের আদর্শ অতি উচ্চ। জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে আধুনিক মুসলমান জাতিরাও নিজেদের যাহা দিবার তাহা দিয়া ইহাকে নব উপায়ে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিবে—ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। ভারতবাসী হিন্দুগণও তাহাই চাহে। বিশ্বের আধুনিক ইতিহাসে হিন্দুসভ্যতা তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া জগতের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবে—ইহাই বর্ত্তমান হিন্দুজাতির মর্ম্মকথা।

ডাক্তার বে মহাশয়ের বৈঠকখানায় আগাগোড়া স্বদেশী শিল্প, কারুকার্য্য ও চিত্র দেখিলাম। তাঁহার গৃহের ছাদ, প্রাচীর, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সকল জিনিষেই মুসলমানী কায়দার অলঙ্কার ও সাজসজ্জা রহিয়াছে। কোন স্থানেই নব্য আলোক বা "আলা-ফ্রাঙ্কা"র চিহ্ন দেখিলাম না। গৃহে যতগুলি ছবি রহিয়াছে সকলগুলিই মুসলমান-সমাজ-বিষয়ক। তুরস্কের ও মিশরের নানা দৃশ্য ও ঘটনা এই চিত্রাবলীর আলোচিত বিষয়।

আমাদের প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ কাইরোর "এল্‌—আজার" বা মসজিদ-বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্বে দেখিয়াছি। ইহার প্রভাবের কথাও পূর্ব্বে শুনিয়াছি। আজ কথায় কথায় আমাদের প্রদর্শক, বলিলেন,—"এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই আধুনিক ইংরেজ ও ফরাসী পণ্ডিতগণ আরবী ও মুসলমানী সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছেন। মুসলমান ব্যতীত অন্যধর্ম্মাবলম্বী লোকও এই স্থানে শিক্ষা পায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্‌লামবিষয়ক বিদ্যার প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ব্রকার্ড (Brochardt) এই মসজিদ-বিদ্যালয়েই প্রথম আরবী শিক্ষা করেন। ভারতীয় সেনাবিভাগের কাপ্তেন শ্রীযুক্ত স্যার উইলিয়ম বার্টনও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। পরে ইনি মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আবদাল্লা নাম গ্রহণ করেন। ভারতীয় মধ্যযুগ বা মুসলমান প্রভাবের কাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লেন পুল গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইনিও এই মসজিদ-বিদ্যালয়েরই ছাত্র।

আজ মিশরীয় মুসলমান-সমাজের এক নূতন উদ্যম ও কৃতিত্বের পরিচয় পাইলাম। এতদিন মিশরে সুকুমার শিল্প ও চিত্রকলা শিখাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মুসলমানদিগের প্রতিভা এই বিভাগে আদৌ আছে কি না তাহাই অনেকে সন্দেহ করিতেন। প্রায় সাত বৎসর

হইল মিশরের একজন বদান্য ধনী-কুমার ইউসুফ কামাল পাশা। ফরাসী বন্ধুগণের পরামর্শে কাইরো নগরে এক সুকুমার কলা-বিদ্যালয় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন! এই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় কুমার স্বয়ং বহন করিয়া আসিতেছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা এক্ষণে প্রায় ১৫০। ইহাদের অনেকেই দরিদ্র ও নিরক্ষর। কতিপয় ছাত্র বিনাবেতনে শিক্ষা পাইতেছে।

এই বিদ্যালয় দেখিতে গেলাম। সহরের সাধারণ মহাল্লায় এক মামুলি গৃহে বিদ্যালয় অবস্থিত। সকল ঘরে সমান ভাবে আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। জাঁকজমকপূর্ণ কাইরো নগরে এই বিদ্যালয় অতি দীন-হীন মলিন ভাবে জীবন যাপন করিতেছে।

কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এই নগণ্য বহিরাকৃতির অভ্যন্তরে যথার্থ প্রাণ বিরাজ করিতেছে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ একজন ফরাসী চিত্রকর। ইনি পূর্ব্বে সিংহল, শ্যাম, চীন প্রভৃতি দেশে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রগণের হাতের কাজ খুব ভাল করিয়া দেখাইলেন। প্রথম ছয় মাসের ভিতরই ছাত্রেরা কত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী-গৃহে যাইয়া তাহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইলাম। ইনি প্রত্যেক চিত্র, মৃত্তিকা-মূর্ত্তি, 'ডিজাইন' ইত্যাদির সম্মুখে লইয়া যাইয়া এই সমুদয়ের বিশেষত্ব বুঝাইতে লাগিলেন।

ইহাঁর শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। ইনি বলিলেন "আমি যখন প্রথম এই কার্য্য গ্রহণ করি, তখন আমাকে নানা লোকে না। উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন। কেহ বলিতেন, 'গ্রীক-রীতি অবলম্বন কর।' কেহ বলিতেন 'মুসলমানী কায়দার নকল শিখাও।' কেহ বলিতেন 'প্রাচীন মিশর হইতে শিক্ষার উপকরণ গ্রহণ কর।' আমি কাহারও পরামর্শে টলি নাই। আমি সকলকে বলিতাম, 'না, আমি কোন রীতিরই নকল করিব না। আমার ছাত্রেরা কোন আদর্শ, কায়দা, ছাঁচ বা রীতিই দাসের মত অনুসরণ করিবে না। তাহাদের নিজ মাথায় যাহা আসে আমি তাহাদিগকে তাহাই শিখাইব। স্বকীয় কল্পনাশক্তি, স্বকীয় উদ্ভাবনী-শক্তি, স্বকীয় চিন্তাশক্তির পুষ্টিসাধনই আমি পছন্দ করি।"

ফুল, ফল, লতা, পাতা, অলঙ্কার, মূর্ত্তি, বর্ণ-সমাবেশ, সবই তিনি এই উপায়ে ছাত্রদিগকে শিখাইয়াছেন। কোন ফর্ম্মুলা বা বাঁধাগৎ তাঁহার ছাত্রেরা শিখে নাই। স্বয়ং প্রকৃতি এবং নিজ নিজ সৌন্দর্য্যজ্ঞান তাহাদের শিক্ষকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং মিশরের লোকজন, কৃষি, শিল্প, উদ্ভিদ, ব্যবসায় ইত্যাদি তাহাদের আলোচ্য বিষয় দেখিতে পাইলাম।

প্যারিস-মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কতকগুলি মূর্ত্তি দেখা গেল। এই-সমুদয়ের মুখমণ্ডলে হৃদয়ের ভাব বেশ প্রকাশিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগঠনে মুসলমান যুবকেরা সত্যই কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে বুঝিতে পারিলাম।

ফরাসী অধ্যক্ষ মহাশয়কে অত্যন্ত উৎসাহশীল এবং কর্ম্মঠ বোধ হইল। তিনি শিল্পজগতে মিশরীয় মুসলমান-যুবকগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড়ই আশান্বিত। আক্ষেপের সহিত বলিলেন "আমি যদি ভারতবর্ষের এইরূপ কোন বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইতাম, তাহা হইলে এই কয়দিনে কত বেশী ফল দেখাইতে পারিতাম। এখানে গাধা পিটাইয়া মানুষ করিতে হইতেছে। ছাত্রেরা অনেকেই সাধারণ নিম্নশিক্ষাও পায় নাই। সামান্য গণিতও কেহ কেহ জানে না। তাহার উপর, তিন চারি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইহারা অন্নসংস্থানের উপায় বাহির করিতে বাধ্য হয়। এই-সকল উপকরণ লইয়া আমাকে কাজ করিতে হইতেছে। এ দিকে, মিশরবাসীর উৎসাহ বা সাহায্য ত বিন্দুমাত্র পাই না। কেহই বিদ্যালয়ে অর্থদান করিতে চাহেন না। নিজ নিজ বিলাসভোগে প্রায় সকল ধনীই ডুবিয়া আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই বিদ্যালয় থাকিলে আমার কাজের আদর হইত। বিদ্যালয় অল্পকালেই জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিত।"

আমি শুনিয়া হাসিলাম। পরে তিনি আবার বলিলেন "এইমাত্র সম্বল লইয়াও আমরা অসাধ্যসাধন করিয়াছি। আমাদের একটি ২২ বৎসর বয়স্ক ছাত্রকে প্যারিসের সর্ব্বোচ্চ শিল্পবিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছি। গতবৎসর

স্নেন্সকার পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রটি সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই পরীক্ষায় প্রায় ৩০০ ছাত্র উপস্থিত ছিল। ইউরোপের সকল দেশ হইতেই ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতা পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করে। আশ্চর্য্যের কথা, একজন মিশরীয় মুসলমান যুবক সকলকে হারাইয়া সর্ব্বোচ্চ আসন পাইয়াছে এই সুফলে খুসী হইয়া বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কুমার বাহাদুর তাহাকে বৃত্তি দিয়া Ecole des Beaux Arts a Paris নামক প্যারিসের জাতীয় কলা-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন।"

কাইরোর প্রাচীন মিশরতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়ামের কর্ত্তা প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ম্যাস্পেরো। এই চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষও একজন ফরাসী। আরবী মিউজিয়ামের সংলগ্ন গ্রন্থশালার কর্ত্তা একজন জার্ম্মান পণ্ডিত। কাইরোর পণ্ডিতমহল বাস্তবিকই ইউরোপীয় চিন্তাজগতের অন্যতম অংশ।

খেদিভের এই গ্রন্থশালাকে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর এবং বোম্বাইয়ের এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। মুসলমানী সাহিত্য ব্যতীত আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ এবং সংবাদপত্র, মানচিত্র ইত্যাদি সবই এখানে আছে। বসিয়া পড়িবার অতি সুবন্দোবস্ত দেখিলাম। বাড়ীঘর আসবাবপত্র কাইরো নগরের ঐশ্বর্য্যের অনুরূপই হইয়াছে। অট্টালিকা মুসলমানী আরাবেস্ক বা সারাসেন কায়দায় নির্ম্মিত।

এক বিভাগে কতকগুলি কোরান আলমারির ভিতর সাজান রহিয়াছে। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে বহু কোরান সংগৃহীত হইয়া এখানে রক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে এই-সমুদয় গ্রন্থ খেদিভ বা পাশাদিগের গৃহে অথবা ভিন্ন ভিন্ন মসজিদে পড়িয়া ছিল; এক্ষণে এই গ্রন্থশালায় সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই গৃহ দেখিলে ভারতবর্ষ হইতে স্পেন পর্য্যন্ত মুসলমান-জগতের বিভিন্ন প্রদেশে যুগে যুগে যে-সকল কোরান-গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কোরানগুলি প্রায়ই বৃহদাকার—প্রত্যেকখানিই সুবর্ণাক্ষরে লিখিত, নানাচিত্রে সুশোভিত। সপ্তম শতাব্দী হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক যুগের লিখনপ্রণালীও এই গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, এই কোরান সংগ্রহালয়ে প্রবেশ করিলে আরবী অক্ষরমালার বৈচিত্র্য ও ক্রমবিকাশ বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন মুসলমানী শিল্পেরও কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুসমাজে গ্রন্থ শেলাই করিবার ব্যবস্থা ছিল না। এইখানে বুঝিলাম মুসলমানেরা প্রথম হইতেই আধুনিক নিয়মে পুস্তক শেলাই করিতেন।

কোরান-বাঁধাই দেখিতে দেখিতে প্রাচীন মুসলমানদিগের মানচিত্র আঁকিবার প্রণালীও মনে পড়িল। আরবী মিউজিয়ামে দেখিয়াছি মক্কা ও মেদিনার পুরাতন মানচিত্র প্রাচীরে ঝুলিতেছে। এই মানচিত্রগুলি মুসলমানশিল্পীদিগের বিশেষত্ব বলিয়া বোধ হইল না। কারণ জয়পুরের অম্বরপ্রাসাদের এক গৃহের প্রাচীরে ঠিক্ এই রীতিতেই কতিপয় নগরের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। হিন্দুশিল্পীরা প্রাচীরগাত্রে উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র, অযোধ্যা এবং অন্যান্য নগরের সম্পূর্ণ দৃশ্য আঁকিয়া গিয়াছেন। মক্কা ও মেদিনার মানচিত্র, অযোধ্যা পাটলিপুত্র ইত্যাদির চিত্রের অনুরূপ। মুসলমান ও হিন্দু কারিগরগণ এক নিয়মেই জনপদসমূহের চিত্রাঙ্কন করিতেন। মধ্যযুগে ইয়োরোপের চিত্রকরগণও নগরসমূহ এই প্রণালীতেই আঁকিতেন।

চতুর্দ্দশ দিবস—যুবক মিশরের স্বাদেশিকতা।

আধুনিক মিশরবাসীর নবীন উৎসাহ ও উদ্যম শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাঁরা নব নব অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন। এই-সমুদয় দেখিলে নব্যমিশরের জীবনস্পন্দন বুঝিতে পারা যায়। ভবিষ্যতের আশা সম্বন্ধেও ধারণা জন্মে।

কুমার ইউসুফের প্রবর্ত্তিত সুকুমার-শিল্পবিদ্যালয়ে দেখিয়াছি মিশরীয় মুসলমানেরা অভাবনীয়রূপে নব নব পথে উন্নতি লাভ করিতেছে। মিশরবাসীর জাতীয় জীবনের সর্ব্বপ্রধান পরিচয় মিশর-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

এতদিন এখানে ফরাসী, জার্ম্মান, আমেরিকান্ ইত্যাদি জাতীয় পাদ্রীদের নানা বিদ্যালয়ে মিশরীয় মুসলমানেরা শিক্ষালাভ করিত। পরে সঙ্গতিপন্ন ছাত্রেরা ফরাসী, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার

জন্য যাইত। মিশরে উচ্চতম শিক্ষালাভের কোন ব্যবস্থা ছিল না। মিশর-সরকার হইতে নিম্ন ও মধ্য বিদ্যালয় মাত্র পরিচালিত হইত।

১৯০৮ সালে মিশরের জনসাধারণ স্বকীয় চেষ্টায় উচ্চশিক্ষার অভাব দূর করিবার জন্য নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় সকল দিক হইতেই যুবক মিশরের প্রতিকৃতিস্বরূপ। প্রথমতঃ, মিশর-সরকারের ধনভাণ্ডার হইতে ইহার জন্য অল্পমাত্র সাহায্য লওয়া হয়। কারণ মিশরের ধনী, নির্ধন, ব্যবসায়ী, জমিদার, আমীর ওমরাও সকলে সমবেত হইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিষয়ই মাতৃভাষায় শিখান হইয়া থাকে। আরবী ভাষায় উচ্চ বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থশ্রেণী যে নাই তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা আরবী ভাষার সাহায্যে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধ্যাপকেরা ফরাসী, জার্ম্মান বা ইংরেজী গ্রন্থ ব্যবহার করেন সত্য। কিন্তু আলোচনা, কথোপকথন, পঠনপাঠন, পরীক্ষা, সবই আরবী ভাষায় হইয়া থাকে। ফরাসী, ইংরেজী ইত্যাদি বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য ছাত্রেরা দ্বিতীয়ভাষা- ও সাহিত্য-স্বরূপ বিবেচনা করে। তৃতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ নিজ নিজ বক্তৃতা আরবী ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে বাধ্য। এই উপায়ে গত ৬।৭ বৎসরের ভিতর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিতও হইয়াছে। চতুর্থতঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তকগণ প্রথম হইতেই নিজ আদর্শ অনুসারে অধ্যাপক তৈয়ারী করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১৩ সালের মধ্যে ইহাঁরা ২৫ জন ছাত্র বিদেশে পাঠাইয়াছেন। পারী, বার্লিন, লণ্ডন, সুইজর্ল্যাণ্ড, ভিয়েনা, ও প্যাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাঁরা নানা বিষয় শিখিতেছেন। এই উপায়ে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মহলের সকল কেন্দ্রের সঙ্গে মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ সাধিত হইতেছে। এই ছাত্রেরা ফিরিয়া আসিলে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইবেন। ১৯২০ সালের পূর্ব্বেই এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বদেশী অধ্যাপকগণ উচ্চশিক্ষা বিতরণ করিতে থাকিবেন আশা করা যায়। এক্ষণে ইহাঁদের সমস্ত ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনভাণ্ডার হইতে বহন করা হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনারা আরবী ভাষাকেই ত মুখ্য জ্ঞান করিতে-তেছেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ফরাসী ভাষায় কেন দেখিতেছি? আপনাদের বিজ্ঞাপন-পত্র, ক্যালেণ্ডার, রিপোর্ট ইত্যাদি সকল কাগজ পত্রই ফরাসী ভাষায় লিখিয়াছেন কেন?" সম্পাদক মহাশয় হাসিয়া বলিলেন "আমরা এইসকল কাগজ পত্রই দুই ভাষায় প্রচার করিয়া থাকি—আরবী ও ফরাসী। আমাদের কার্য্যালয়ের হিসাবপত্র সবই আরবী ভাষায় রক্ষিত হয়। আরবী ভাষাতেই ক্যালেণ্ডারাদিও লেখা হয়। কিন্তু জগতের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিবার জন্য আমরা আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যতালিকা, শিক্ষাপ্রণালী, নিয়মকানুন, বিজ্ঞাপনপত্র, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি ফরাসী ভাষায়ও প্রকাশ করি।" তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনারা ২৫ জন ছাত্র বিদেশে পাঠাইয়াছেন শুনিলাম। ইহারা পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন, ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, প্রাণ-বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল বিদ্যাই শিখিতেছে। কেহ জার্ম্মান, কেহ ইতালীয়, কেহ ফরাসী, কেহ ইংরেজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিতেছে। অথচ তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আরবী ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইবে। ছাত্রদিগের সঙ্গে উচ্চতম ও দুরূহতম বিষয়েও মাতৃভাষায় আলোচনা চালাইতে হইবে। ইহারা কি এখান হইতে আরবী সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়া গিয়াছে? তাহা ত বোধ হয় না। কারণ ইহাদের বয়স দেখিতেছি ১৩ হইতে ২৫।২৬এর মধ্যে। দুই একজন মাত্র ৩০ বৎসর বয়স্ক।" সম্পাদক বলিলেন—"ইহার মধ্যে একটা রহস্য আছে। আপনি বোধ হয় কাইরো-নগরের "এল-আজার" বা মসজিদ-বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়াছেন। তাহাতে সকল জ্ঞান বিজ্ঞানই আরবী ভাষায় শিখান হয়। অবশ্য আধুনিক বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা সেখানে নাই। কিন্তু ওখানকার সেখ্ ও মৌলবীরা মাতৃভাষানিহিত বিদ্যাসমূহে সুপণ্ডিত। আমাদের এই নব্যবিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে

সেই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ আছে। আমাদের ছাত্রেরা উচ্চশিক্ষিত হইয়া যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা এই মৌলবী ও সেখদিগের সঙ্গে একত্র মিলিয়া কার্য্য করিবে। নব্যশিক্ষিত যাহা লিখিবে বা বলিবে তাহা প্রাচীন সেখের ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞানের সাহায্যে প্রকাশ করা হইবে। এইরূপে প্রাচীন ও নবীনের সমবায়ের দ্বারা আরবী সাহিত্যের পারিভাষিক শব্দ, এবং বিশিষ্ট উৎকর্ষ, আধুনিক জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজী ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ আবিষ্কারসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে। ক্রমশঃ নব্যশিক্ষিতেরা আরবী সাহিত্যে পারদর্শী হইয়া উঠিবে, এবং প্রাচীন সেখেরাও আধুনিক বিদ্যায় শিক্ষিত হইতে থাকিবেন।"

তিনি এই সময়ে একজন অন্ধ ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। "এই যুবক এল-আজার বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাটাইয়াছে। এক্ষণে আমাদের নব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এতদিন সে আরব্য দর্শন-সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছে। সম্প্রতি ফরাসী শিক্ষা করিয়া ফরাসী ভাষায়ও মন্দ জ্ঞান লাভ করে নাই। এই ছাত্র যাঁহার নিকট ফরাসী শিখিতেছে তাঁহার সঙ্গে একত্রে একখানা আরবীগ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছে। ইহাকে এক্ষণে ফ্রান্সে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এইরূপে প্রাচীনের ও নবীনের সংযোগে আমরা নবীন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিব স্থির করিয়াছি।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ-প্রতিষ্ঠা এখনও হয় নাই। একটা সুন্দর ভাড়াটিয়া গৃহে এক্ষণে কার্য্য চলিতেছে। বার জন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৫০। মুসলমান, খৃষ্টান, তুরকী, মিশরীয়, সুদানী, আল্‌জিয়ার, আফগানী, হিন্দুস্থানী, পারস্যদেশবাসী, সীরিয় ইত্যাদি নানা জাতীয় ছাত্র ইতিমধ্যেই এই শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিয়াছে। সম্প্রতি চারি বৎসর কাল-ব্যাপী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম বৎসর ছাত্রেরা যাহা শিখে তাহার পরীক্ষা প্রথম বৎসরেই গ্রহণ করা হয়। এইরূপে ছাত্রেরা চতুর্থ বৎসরে অবশিষ্ট বিষয় মাত্রের পরীক্ষা দিয়া থাকে।

কাল নব্যমিশরের একটি উৎসাহশীল কর্ম্মকেন্দ্রে গিয়াছিলাম। উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র, বিচারালয়ের উকীল, নগরের চিকিৎসক, এঞ্জিনীয়ার, বিচারপতি, অধ্যাপক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোক মিলিত হইয়া একটি ক্লাব স্থাপন করিয়াছেন। প্রায় ১০০০ লোক এই ক্লাবের সভ্য। বার্ষিক ১৫৲ করিয়া প্রত্যেককে চাঁদা দিতে হয়। সন্ধ্যার সময়ে ক্লাবে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একজন প্রসিদ্ধ উকীল আরবী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন। প্রায় ২০০ নবীন ও প্রবীণ লোক উপস্থিত। বক্তৃতার বিষয়—"মুসলমান আইনে উত্তরাধিকারীর স্বত্ব"। বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে ক্লাবের সম্পাদক ও কতিপয় সভ্যের সঙ্গে আলাপ হইল। সকলেই ফরাসী জানেন। ইংরেজী-জানা লোকের সংখ্যাও মন্দ নয়। এই ক্লাবে মাসে তিনচারি বার করিয়া বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যাঙ্কিং, আইন ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ প্রচারিত হয়। সাধারণতঃ আরবীতেই বক্তারা বলিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ফরাসী ভাষাতেও বক্তৃতা হয়। ক্লাবে গ্রন্থশালা এবং পাঠাগারও আছে।

ক্লাবের সঙ্গে, বলা বাহুল্য, খানা-ঘর আছে। মিশরীয়েরা খাওয়া পরা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী। মিশরের রাস্তায় ঘাটে কখনও কাহাকে অপরিষ্কার বা দীনহীন বেশে বাহির হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের বাড়ীঘরও বড় পরিপাটি। এই ক্লাবগৃহ কুমার ইউসুফের ভূমিতে তাঁহারই অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য-হিসাবে কাইরো-নগরের অন্যান্য সৌধের সঙ্গে ইহা সমকক্ষ।

সভ্যগণের সঙ্গে মুসলমান সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের বিষয়ে ইঁহারা কিছুই জানেন না দেখিলাম। ইঁহারা বলিলেন, "আমরা সাধারণতঃ ফরাসী সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকি। ইংরেজীর তত বেশী ধার ধারি না। কিন্তু ভারতের হিন্দু মুসলমানেরা ফরাসী জানেন না। তাঁহারা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত। তাহার পর আমাদের মাতৃভাষা আরবী। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা কি তাহা আমরা জানি না। কাজেই ধর্ম্মে ঐক্য থাকিলেও

ভাষার পার্থক্য থাকায় আমরা পরস্পর ভাব বিনিময় করিতে পারি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহা হইলে আপনারা জগতের মুসলমান-সমাজকে এক আদর্শে গড়িয়া তুলিতে আশা করেন কি করিয়া? প্যান-ইসলামের দীক্ষামন্ত্র আপনারা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারিতেছেন কি?"

ইহাঁরা বলিলেন "সত্য কথা, প্যান-ইস্‌লাম-আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মিশরে এই প্রচেষ্টার কার্য্য অতি অল্পই হইয়াছে। ইহার প্রভাব আমরা কিছুই অনুভব করি না। এমন কি তুরস্কের মুসলমানদের সঙ্গেই আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। উহাদের সঙ্গে মিশরীয় চিন্তা ও কর্ম্মের আদান প্রদান অতি অল্পই হয়। পারস্য, আফ্‌গানিস্থান ও হিন্দুস্থানের মুসলমানদিগকে আমরা চিনি না বলিলে দোষ হয় না। ইতিহাস-গ্রন্থে পড়িয়া থাকি মাত্র যে, ঐসকল দেশে আমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী নরনারীগণ বাস করে, এই পর্য্যন্ত। অধিকন্তু আমাদের সংবাদপত্রেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রকাশিত হয় না। মিশরে ও ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন উপায় এখন পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই।"

বড়ই বিস্ময়ের কথা, মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ আলিগড় কলেজের সংবাদ কিছুই রাখেন না। এমন কি, ভারতীয় মুসলমানেরা যে একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছেন সে খবরও এখানে পৌঁছে নাই। এই ক্লাবের উকীল, জজ, অধ্যাপক এবং ডাক্তারগণও আলিগড় সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ।

আধুনিক ভারতের বেশী লোক মিশরে আসিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। এখানকার শিক্ষিত মহলের নানা স্থানে ঘুরিয়া দেখিলাম নব্যভারতের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরগণের মধ্যে দুএকজন মাত্রের নাম ইহাঁরা শুনিয়াছেন।

বিবেকানন্দের বন্ধু স্বামী রামতীর্থ মিশরে আসিয়াছিলেন বুঝিতে পারিলাম। কাইরোর কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবান। একজনকে দেখিলাম তিনি কথায় বার্ত্তায় চালচলনে পূরাপুরি হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত। বেদান্তের উপদেশ ইহাঁর উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। দেখিলাম ইহাঁর জ্ঞান নিতান্ত অল্প নয়। আত্মতত্ত্ব বিষয়টা গভীর ভাবে তলাইয়া বুঝিবার জন্য ইনি যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছেন। দুই চারিটা হিন্দুদর্শনের বুকনি মাত্র আওড়াইতে শিখিয়াছেন তাহা নহে।"

মিশর-রাষ্ট্রের শিল্পবিভাগের দুইজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে পরিচিত হইলাম। ইহাঁরা ষ্টীম-এঞ্জিন, রেলওয়ে, জল-সরবরাহের কারখানা, রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করিতেছেন। মিশর-রাষ্ট্রের অনুবাদ-বিভাগে বৎসরে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হয়। অনূদিত গ্রন্থপ্রকাশের জন্যই প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা বার্ষিক খরচ হইয়া থাকে। অনুবাদ-কার্য্যের জন্য ছয়জন লোক সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন।

আজ কাইরো ত্যাগ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় চলিলাম। এই কয়দিনের মধ্যে মিশরের সঙ্গে মায়ার বন্ধন জন্মিয়া গিয়াছে, ষ্টেসনে মিশরীয় নবীন ও প্রবীণ বন্ধুগণ দেখা করিতে আসিলেন। মিশরীয়েরা হিন্দুস্থানের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া পুলকিত হইলাম। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করা গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মনে মনে মিশরের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান চিন্তা করিতে করিতে ব-দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তস্থিত শস্যক্ষেত্র ও পল্লীগৃহ দেখিতে লাগিলাম।

কাইরো হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে খোলা হয়। সৈয়দপাশা তখন মিশরের খেদিভ ছিলেন। ইহা সময়-হিসাবে জগতের দ্বিতীয় রেলপথ। সর্ব্বপ্রথম রেলপথ বিলাতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কাইরো ছাড়িয়া মোকাওম ও লীবিয়া পর্ব্বতমালাদ্বয় আর দেখিতে পাইলাম না। পোর্ট সৈয়দ হইতে কাইরো পর্য্যন্ত পথে যেসকল দৃশ্য চোখে পড়িয়াছিল বদ্বীপের এই পশ্চিম বাহুতে ঠিক সেইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম না। কারণ এ অঞ্চলে মরুভূমি নাই—কিন্তু পোর্ট-সৈয়দের পথে কিয়দংশে ধূলাবালুর প্রভাব অত্যধিক।

আলেকজান্দ্রিয়ার পথে মিশরের সাধারণ উর্ব্বর ভূমিই দৃষ্টিগোচর হইল। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ পল্লী এবং নগর দেখা গেল। নাইলের খাল এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকাময় শস্যক্ষেত্রও এই অঞ্চলের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

ক্রমশঃ বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। দূর হইতে সমুদ্রের উপরিস্থিত নীল উন্মুক্ত আকাশ দেখিতে পাইলাম। তখনও সমুদ্র দেখা গেল না। চারিদিকে বড় বড় খেজুর গাছ এবং আখের ক্ষেত। ভূমিও যেন কিছু বেশী উর্ব্বর।

ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। বন্দর কাইরো নগরেরই অনুরূপ। পোর্ট সৈয়দ অপেক্ষা বৃহত্তর সহর। ভূমধ্যসাগরের কূলে একটা ফরাসী হোটেলে আড্ডা লইলাম। গৃহ হইতে দেখা যায় যেন নীল সমুদ্র গর্জ্জন করিতে করিতে কূলবাসীকে কামড়াইতে আসিতেছে।

সন্ধ্যাকালে নগর দেখিতে বাহির হইলাম। সমস্ত সহরটাই নূতন, মহম্মদ আলির আমলে নির্ম্মিত। মুসলমান পাড়া ও বিদেশীয় টোলা দুইই নূতন। উভয়ই ১০০ বৎসরের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে।

কাইরো-নগরে প্রাচীনের স্মৃতি বিশেষরূপেই জড়িত। ওখানে প্রাচীনের পার্শ্বে নবীন মহাল্লা অবস্থিত এবং পুরাতন স্তরের উপর নূতন স্তরের বিন্যাস দেখিয়াছি। একসঙ্গে মধ্যযুগের কথা এবং আধুনিক কালের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আলেক্জান্দ্রিয়ার সমস্তই আধুনিক—সমস্তই পাশ্চাত্য ধরণের। মুসলমানী বাড়ীঘর খুব অল্প। মসজিদ্, কবর, গম্বুজ, মিনারেট ইত্যাদির সংখ্যা বেশী নয়। দেখিয়া মুসলমান রাষ্ট্রের বন্দর বা রাজধানী বলিয়া মনে হয় না।

কাইরোতে যতখানি ইউরোপ দেখিয়াছি এখানে তাহা অপেক্ষা বেশী ইউরোপ দেখিতে পাইতেছি। ইউরোপেই পদার্পণ করিয়াছি বলিতে পারি। বিলাস, ভোগ, কাফি-গৃহ, হোটেল, রাস্তাঘাট, দোকান ইত্যাদি সবই কাইরোর পাশ্চাত্য মহাল্লার সমকক্ষ, কোন অংশে হীন নয়—বরং বেশী। ইউরোপীয় জনগণের সংখ্যা অত্যধিক। কোন কোন গাড়োয়ান পর্য্যন্ত ইউরোপীয় লোক। মিশরে আছি কি নূতন কোন দেশে পদার্পণ করিয়াছি বুঝিতে সময় লাগে। কলিকাতা ও বোম্বাই দেখিয়া কাইরো এবং আলেক্জান্দ্রিয়ার ধারণা করা কঠিন।

রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও বাঁধান—তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাসমূহ পথের দুই ধারে আধুনিক রীতিতে সাজান। গৃহ-নির্ম্মাণের কৌশল আগাগোড়া পাশ্চাত্য ধরণের। সহরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড লম্বা চৌরাস্তা। কেন্দ্রস্থলে মহম্মদ আলির একটি প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। ইহা ধাতুনির্ম্মিত। অত্যুচ্চ প্রস্তরমঞ্চের উপর অবস্থিত। ফরাসী শিল্পী এই কারুকার্য্যের কর্ত্তা।

কাইরোর ন্যায় এখানেও খুব শীত পড়িয়াছে। ভূমধ্যসাগরের প্রবল বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা অনুভব করিতেছি। সকলের মুখেই শীতের কথা শুনিতে পাই। গ্রীষ্মকালে এত শীত ৩০।৪০ বৎসরের ভিতর কখনও মিশরে পড়ে নাই।

মিশরে দুই সপ্তাহ কাটাইলাম। মোটের উপর ৫০০৲ টাকা খরচ হইল। তাহা ছাড়া বোম্বাই হইতে পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত ভাড়াও লাগিয়াছে। অবশ্য যদি মিশরে ৪।৫ মাস বাস করিয়া লেখাপড়া করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে এত খরচ পড়িবে না। কারণ তাহা হইলে ধীরে ধীরে সকল জিনিস দেখা যাইতে পারিবে, সময়াভাবে তাড়াহুড়া করিতে হইবে না; তাহাতে ঘোড়ার গাড়ীর জন্য কম খরচ লাগিবে; প্রদর্শক-নিয়োগের প্রয়োজন হইবে না। অধিকন্তু বড় বড় হোটেলে না থাকিলেও চলিবে। সস্তায় বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করা সম্ভব। কাইরোতে বাড়ী-ভাড়ার দর কলিকাতার সমান। মাসিক ৭০।৭৫৲ টাকায় মধ্যম শ্রেণীর গৃহ পাওয়া যায়। খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাইরো হইতে মফঃস্বলে যাইতে হইলে কাইরোবাসী বন্ধুগণের সাহায্যে সেইসকল স্থানে হোটেল খুঁজিয়া লওয়া যাইবে। অধিকন্তু, মিশরীয়, ইউরোপীয় ও আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও সহজসাধ্য হইবে। কাইরোর বিদ্যালয়-সমূহে, জননায়কগণের ভবনে এবং মিউজিয়ামদ্বয়ে দুই এক সপ্তাহ যাতায়াত করিলেই যথেষ্ট সহানুভূতি পাওয়া যাইবে। মিশরীয়েরা ভারতীয়দিগকে আনন্দের সহিতই সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

কম সময়ে বেশী দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য বড় বড় হোটেলে বাস করা আবশ্যক হইয়াছে। কারণ

তাহা না হইলে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলাপ হয় না; তাঁহাদের গবেষণাপ্রণালীর পরিচয় পাওয়া অসম্ভব হয়। এইজন্য ব্যয়ের পরিমাণ কিছু বেশী পড়িয়াছে। অবশ্য যথাসম্ভব সংযত ভাবেই খরচ করিতে চেষ্টিত ছিলাম। যদি এক্ষণে আর দুই সপ্তাহ থাকিতে চাহি, তাহা হইলে সকল দিকেই খরচ কমাইয়া লইতে পারি। রাস্তা ঘাট সব চেনা হইয়া গিয়াছে, ট্রামে যাতায়াত করিতে পারি। বন্ধুগণের গৃহ সহরের সকল ভাগেই দুই একটা পাইব। হোটেলের ম্যাথর হইতে ম্যানেজার পর্য্যন্ত ১০।১২ জনকে বক্‌শিষ দিবার যন্ত্রণা হইতেও কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইব।

মাসিক ৩০০্ টাকা হিসাবে খরচ করিলে মিশরে একজনের চলিয়া যাইবে। এইরূপ খরচ করিয়া পাঁচ ছয় জন ভারতবাসী একত্র ৩।৪ মাস মিশরে কাটাইলে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক আলোচনার এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত হইতে পারে। যাঁহারা মিশরতত্ত্ব (Egyptology) শিক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে মিশরে আসিবেন তাঁহাদের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে এখানে না পৌঁছানই ভাল। কারণ সেপ্টেম্বর মাস হইতেই দুনিয়ার শিক্ষিত ও ধনী লোক মিশরে আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আসিতে থাকেন। অবশ্য বৎসরের সকল সময়েই পণ্ডিত ব্যক্তিগণের গমনাগমন চলিতে থাকে। তবে ঐ কয়মাসই মিশরের বিদেশীয়-"যোগ"। সুতরাং ভারতবাসীদেরও ঐ সময়েই এই বিদ্যাক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।

একসঙ্গে ৫।৬ জন আসিতে পারিলেই উপকার বেশী হয়। কেহ প্রাচীন মিশরের ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করিবেন; কেহ পুরাতন বাস্তুবিদ্যা, চিত্রাঙ্কন ও মূর্ত্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবেন এবং সেই-সমুদয়ের নকল-চিত্র গ্রহণ করিবেন; দেশের কৃষিশিল্পবাণিজ্য বুঝিবার জন্যও একজন লাগিয়া থাকিতে পারেন। এখানকার গাছগাছড়া ধাতু মৃত্তিকা প্রস্তর নদী খাল ইত্যাদিও বৈজ্ঞানিকের বিশেষ চিন্তার বিষয়। ফলতঃ, প্রত্নতাত্ত্বিক, চিত্রকর, ধনবিজ্ঞানবিৎ, এঞ্জিনীয়ার, কৃষিতত্ত্ববিৎ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় পণ্ডিত সমবেত হইয়া কর্ম্ম করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে। পরস্পরের সাহায্যে মিশরের প্রাচীন কথা এবং আধুনিক অবস্থা সহজে বুঝা যাইতে পারিবে। বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলাপ করিবার সময় ও সুবিধা হইবে।

এইরূপ এক পণ্ডিত-সংঘ মিশরে আসিলে মিশর হইতে বহু মূল্যবান পদার্থ অল্প কালের ভিতর ভারতে লইয়া যাইতে পারিবেন। ভারতবর্ষের অনেক কথাও মিশরে ছড়াইয়া পড়িবে। অধিকন্তু জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ, আমেরিকান্ ও অন্যান্য জাতীয় পণ্ডিতমহলে ভারততত্ত্ব, ও ভারতীয় বিদ্যা, অতি সহজে প্রবেশ লাভ করিবে।

যাঁহারা নিজ নিজ বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাঁহাদেরই অবশ্য এখানে আসা আবশ্যক। যাঁহারা চিত্র আঁকিয়া, গ্রন্থ লিখিয়া, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়া, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যোগ দান করিয়া, এবং বৈষয়িক তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ও জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন তাঁহারা না আসিলে বেশী উপকার হইবে না। জগতের পণ্ডিত-সভায় বিচরণ করিবার জন্য ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ও সাহিত্য-সেবীদিগের আগমনই কর্ত্তব্য। দুই এক জনের ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। আর কাহারও আরবী ভাষা এবং সাহিত্যের সহিত পরিচয় থাকিলে মুসলমানী যুগের মিশর বুঝিতে সাহায্য হইবে। দলের মধ্যে গায়ক এবং বাদক থাকিলে মন্দ হয় না, মিশরে ভারতীয় সঙ্গীত শুনা যাইতে পারিবে। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের সর্ব্ববিধ চিত্র প্রদর্শন করিবার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন এবং স্লাইড্‌স্ সঙ্গে রাখাও নিতান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় পণ্ডিতসংঘের এইরূপ মিশর-অভিযানে সর্ব্ব সমেত ১২,০০০্ টাকা লাগিতে পারে। ইহার দ্বারা ভারতের যত দিকে যত উপকার হইবে তাহার তুলনায় এই খরচ অতি সামান্য। হিন্দুস্থানের জন-নায়কগণ চেষ্টা করিলে কি মিশর-তত্ত্ব আলোচনার জন্য এক অভিযানের ব্যয় সংগ্রহ করিতে পারেন না?

পঞ্চদশ দিবস—আলেক্‌জাণ্ডার ও মহম্মদ আলি।

মহম্মদ আলির আলেকজান্ড্রিয়া দেখিলাম। একশত বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটা প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ

মঠও বর্ত্তমান ছিল। মহম্মদ আলির উদ্যোগে এই স্থানে এক অতি চমৎকার নগর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে।

মুসলমানেরা সপ্তম শতাব্দীতে মিশর দখল করেন। তখনও আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর প্রাচীন সমৃদ্ধি কথঞ্চিৎ ছিল। কিন্তু নূতন বিজেতারা সমুদ্রকূলের বাণিজ্যকেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া কাইরোতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই সময় হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহম্মদ আলি ইহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্য ও প্রাধান্য পুনরায় ফিরাইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। আজ বাস্তবিকই আলেকজান্দ্রিয়া পৃথিবীর অন্যতম ব্যবসায়-কেন্দ্র এবং ধনসম্পদের নিকেতন।

আলেকজাণ্ডার-প্রতিষ্ঠিত নগরীর চিতাভস্মের পার্শ্বেই আধুনিক মিশরের এই বন্দর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন গ্রীক সাম্রাজ্যের এই রাষ্ট্র-কেন্দ্র সমাজ-জীবন, বিদ্যা-চর্চ্চা এবং ব্যবসায়ের আধার ছিল। দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ প্রাচ্য-ও-প্রতীচ্য-সম্মিলনের উপায়স্বরূপই এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার জনগণের ভাববিনিময় ও কর্ম্মবিনিময়ের উদ্দেশ্যেই আলেকজান্দ্রিয়ার সর্ব্বপ্রথম ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল।

মিশরের সঙ্গে গ্রীসের এবং গ্রীসের সঙ্গে পারস্য ও হিন্দুস্থানের সভ্যতাগত আদানপ্রদান সাধন করিয়া এই জনপদ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সমগ্র জগতের চিন্তাবীর ও সাহিত্যসেবীগণ এই নগরে মিলিত হইয়া বিদ্যা-চর্চ্চা ও জ্ঞান বিতরণ করিতেন। বিদ্বৎসমিতি, সাহিত্য-সম্মিলন, বৈজ্ঞানিক-পরিষৎ ইত্যাদি চিন্তা-কেন্দ্রে নানা দেশীয় তথ্যের তুলনা সাধিত হইত। এই কেন্দ্র হইতেই ভাবস্রোত প্রবাহিত হইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে নব নব আদর্শ ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিতরণে সহায়তা করিত।

মহম্মদ আলির নগরীতে ব্যবসায়ের ঐশ্বর্য্য দেখিলাম। আলেকজাণ্ডারের নগরী অপেক্ষা ইহার সম্পদ কোন অংশে অল্প বিবেচনা করিবার কারণ নাই। কিন্তু আধুনিক নগরীকে সভ্যতা, শিক্ষা ও চিন্তার আন্দোলনের প্রস্রবণ-রূপে কোন হিসাবেই বর্ণনা করা যায় না। মানবেতিহাসে প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়াই তাহার আধুনিক উত্তরাধিকারী অপেক্ষা অধিকতর আদর ও গৌরবের যোগ্য।

খৃষ্টীয় যুগের প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আলেক্-জান্দ্রিয়া ধর্ম্ম-বিপ্লবের সুফল কুফল যৎপরোনাস্তি ভোগ করিয়াছে। আলেক্জাণ্ডারের পরবর্ত্তী গ্রীক টলেমিরা পুরাতন গ্রীক-মিশরীয় ধর্ম্মেই আস্থাবান্ ছিলেন। যখন ইহা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয় তখনও পুরাতন ধর্ম্মই প্রবল ছিল। এদিকে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতে থাকে। দুই ধর্ম্মাবলম্বী জনগণের মধ্যে বহুবার কলহ ও সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম-দ্বন্দ্বে আলেক্জান্দ্রিয়ায় একাধিক বার লোমহর্ষণ রক্তপাত সংঘটিত হইয়াছিল। কোন সম্রাটের আমলে খৃষ্টানদিগের দুর্গতি, কোন সম্রাটের আমলে প্রাচীনধর্ম্মাবলম্বীগণের দুর্গতি ঘটে। পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রীকো-রোমান মিশরীয় ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা ও বিদ্যালয় চিরদিনের মত ধ্বংস করা হয়। আলেক্জাণ্ডারের কীর্ত্তি নয় শত বৎসর ধরিয়া ভৌতিক দেহে এই স্থানে বিরাজ করিতে-ছিল। গোঁড়া খৃষ্টান রোমীয় সম্রাট জাষ্টিনিয়ান তাহার শেষ চিহ্ন সমূলে উৎপাটন করিলেন।

এই গেল ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। তাহার পর হইতে আলেকজান্দ্রিয়ায় "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই!" ইহার পূর্ব্ব হইতেই রোমান সম্রাটেরা তাঁহাদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী কনষ্টাণ্টি-নোপলকে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিতেছিলেন। আলেক্-জান্দ্রিয়া অপেক্ষা এই নগরের প্রতিই তাঁহাদের বেশী অনুরাগ ছিল। বিদ্যা, ব্যবসায়, ধর্ম্ম, সভ্যতা, সকল বিষয়েই কনষ্টাণ্টিনোপলকে তাঁহারা বিরাট কেন্দ্রে পরিণত করিতে উৎসাহী ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের ঔদাসীন্যে আলেক্জান্দ্রিয়া একটা সামান্য নগর মাত্রে পরিণত হইতেছিল। চতুর্থ শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত আলেক্জান্দ্রিয়ায় এই অবনতির যুগ চলিয়াছিল। পরে সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানেরা মিশর দখল করেন। তখন হইতে আলেক্জান্দ্রিয়ার মৃত্যুকাল। খৃষ্টান কনষ্টাণ্টিনোপল এবং মুসলমান কাইরো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ইহার ধ্বংসের কারণ হইল।

প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার কোন গৃহ এক্ষণে আর দেখা যায় না। স্থানে স্থানে দিল্লী, গৌড় প্রভৃতি নগরের

ধ্বংসচিহ্নের ন্যায় নানা চিহ্ন বর্ত্তমান। ভূগর্ভস্থিত কবর, মন্দির, ইট, প্রস্তর, স্তম্ভ, প্রাচীর, মূর্ত্তি ইত্যাদি দেখিয়া টলেমিরাজগণের, রোমান সম্রাটদিগের, এবং খৃষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বী জনসমূহের জীবনকথা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায় মাত্র। কিন্তু সেই বিরাট গ্রন্থালয়, সেই মিউজিয়াম ও সেই পরিষদমন্দিরের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

আধুনিক আলেকজান্দ্রিয়ায় একজন ইতালীয় পণ্ডিতের উদ্যোগে একটি মিউজিয়াম নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সংগ্রহালয় দেখিলেই মিশরে গ্রীক ও রোমীয় জীবনযাপন-প্রণালী বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন ফ্যারাওদিগের ধর্ম্ম, সমাজ, শিল্প ও সভ্যতা গ্রীক ও রোমান বিজেতা-দিগের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এই সংগ্রহালয়ের মূর্ত্তি, স্তম্ভ, চিত্র ইত্যাদি বস্তুসমূহ হইতে তাহার পরিষ্কার ধারণা জন্মে। মিশরীয় গ্রীক সভ্যতা এবং মিশরীয় রোমক সভ্যতার পরিচয় পাইবার পক্ষে এই মিউজিয়াম দর্শনই প্রধান সহায়।

ভারতবর্ষেও এইরূপ কতশত নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে, কত শত জনপদ লোকশূন্য হইয়াছে। মিশরের ন্যায় হিন্দুস্থানেও এক নগরের চিতাভস্মের উপর দ্বিতীয় নগরের জনগণ জীবনযাপন করিয়াছে—পূর্ব্ববর্ত্তী নগরের মৃত্তিকাস্তূপের পার্শ্বে বা উপরে নূতন নগরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে মিশরে ও ভারতে যুগে যুগে একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিন্যাস সাধিত হইয়াছে। কাইরো ও আলেকজান্দ্রিয়ার ন্যায় ভারতে প্রাচীন-স্মৃতিপূর্ণ শত শত নগর বর্ত্তমান-কালে দেখিতে পাই।

কিন্তু প্রাচীন মিশরে আর আধুনিক মিশরে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। হিন্দুস্থানের প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালে সেরূপ প্রভেদ নাই।

ফ্যারাওদিগের মেম্ফিস মৃত্তিকায় মিশিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মিশরের আদর্শ, চিন্তা, সমাজ, ধর্ম্ম, সবই লুপ্ত হইয়াছে। পীরামিড, মামি এবং স্ফিঙ্কসের গঠনকারীদিগের অস্থিমজ্জা ধূলিরূপে পরিণত হইলে মিশরে গ্রীকো-রোমান-খৃষ্টীয় আদর্শের জীবনযাত্রাপ্রণালী অবলম্বিত হইল। এই দুই ধরণের মানবসমাজের মধ্যে আদর্শগত সাম্য ও ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। আবার খৃষ্টীয় রোমান স্তরের উপর সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান প্রভাবের যুগধর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছে। এই যুগধর্ম্মের কার্য্য এখনও চলিতেছে। কিন্তু ইহার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগধর্ম্মের আদর্শগত সম্বন্ধ নাই বলিলেই চলে। মিশরের প্রাচীন, মধ্যম এবং আধুনিক স্তরসমূহ পরস্পর সম্বন্ধহীনভাবে বিন্যস্ত। প্রাচীন মিশর চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে—আধুনিক মিশর প্রাচীনের কোন নিদর্শনই বহন করে না। মেম্ফিসের জীবন উত্তরাধিকারসূত্রে কাইরোতে বিন্দুমাত্রও নামিয়া আসে নাই। মহম্মদ আলির আলেকজান্দ্রিয়ায় আলেকজান্দারের ভাবুকতা, এবং টলেমিবংশীয়দিগের আদর্শ ক্ষীণভাবেও প্রভাব বিস্তার করে না।

কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীনে ও নবীনে প্রকৃত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আধুনিক হিন্দু প্রাচীনতম আর্য্যেরই বংশধর। নব নব শক্তি হিন্দুস্থানবাসীরা অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুস্থানের নব নব স্তর পরস্পর সম্বন্ধহীন—একই ক্রমবিকশিত বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা। প্রাচীনকালে যে অনুষ্ঠানের শৈশব-অবস্থা দেখিয়াছি, তাহারই বয়োবৃদ্ধি বর্ত্তমান কালে দেখিতে পাইতেছি। মুসলমান-প্রভাবে ভারতবর্ষে মিশরের ন্যায় একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্তর বিন্যস্ত হইতে পারে নাই। মুসলমানজাতি ভারতের আদর্শকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দু নরনারীর কিয়দংশ মাত্র মাঝে মাঝে মুসলমান রাষ্ট্রের অধীন হইয়াছে—কিন্তু তাহাতেও তাহাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয় নাই। বরং নূতনধর্ম্মাবলম্বী সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুসমাজ অভিনব উপায়ে স্বকীয় বিকাশ লাভ করিয়াছে। আধুনিক কালে খৃষ্টীয় প্রভাব ভারতবর্ষে প্রবল ভাবে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু তাহাও ভারতের বিশেষত্ব নষ্ট করিতে পারে নাই। বরং ভারতের সনাতনী বাণীই নবযুগের নূতন আবেষ্টনের মধ্যে অধিকতর দৃঢ়তার সহিত প্রচারিত হইতেছে। ফলতঃ প্রাচীনের সঙ্গে মধ্যযুগের, এবং মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিকের জীবন্ত সম্বন্ধ ভারতবর্ষে দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন ভারতের সমাজ, ধর্ম্ম, বিদ্যা, সাহিত্য, ও শিল্প মরে নাই। প্রাচীন ভারত

বর্ত্তমানের মধ্যে এখনও জীবিত আছে—এবং ভবিষ্য ভারতের অস্থিমজ্জা সৃষ্টি করিতেছে।

ফ্যারাওদিগের মিশর মরিয়া গিয়াছে। পীরামিড গঠনকারী মিশরের কথা আজকাল প্রেত-তত্ত্ব মাত্র। কিন্তু প্রাচীন ভারতের কথা প্রেত-তত্ত্ব নয়—মরা জিনিষের আলোচনা নয়। ইহা জীবন-তত্ত্ব। সুতরাং মামুলি প্রত্ন-তত্ত্বের হিসাবে ভারত-শিল্প, ভারত-কলা, ভারত-সমাজ, ভারত-ধর্ম্ম, ভারত-সাহিত্য আলোচনা করিলে চলিবে না। Egyptology বা মিশর-তত্ত্ব এক্ষণে একটা বিদ্যা মাত্র। কিন্তু Indology বা ভারত-তত্ত্ব কেবল অন্যতম বিদ্যামাত্ররূপে বিবেচ্য নয়। ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী জীবন ও হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ এই ভারত-তত্ত্বের সঙ্গে গ্রথিত। সুতরাং মিশর-তত্ত্ব এবং ভারত-তত্ত্ব এক শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। মরা জিনিষের আলোচনায় কাহারও কিছু আসে যায় না। কিন্তু জীবন্ত পিতামাতার সমালোচনা বড় কঠিন ব্যাপার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মিশর-তত্ত্ব আলোচনা করিতে ভালবাসিবার ইহাই অন্যতম কারণ। কিন্তু ভারত-তত্ত্বের আলোচনায় তাঁহারা বেশী উৎসাহশীল নন। প্রাচীন মিশরের গৌরব বাড়াইলে বা কমাইলে আজ কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু প্রাচীনভারতের জাতীয় গৌরব বাড়াইলে বা কমাইলে আধুনিক ভারত-বাসীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠন সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য বা বাধা জন্মিবে।

মিশর দেখা হইয়া গেল। মিশরের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়াছি। ইহার নীল আকাশ ও মুক্তবায়ুর সংস্পর্শে চিত্তের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছি। ইহার শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্র দেখিয়া চোখ জুড়াইয়াছি। যেখানে গিয়াছি সেখানেই মিশরবাসীর দৃঢ় বাহু, শক্ত শরীর, সুপুষ্ট অবয়ব, প্রশস্ত বক্ষ এবং দীর্ঘ আকৃতির সংশ্রবে আসিয়াছি। দরিদ্র অশিক্ষিত ফেলা কৃষক হইতে শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত 'বে,' 'পাশা' পর্য্যন্ত মিশরের সকল সমাজেই স্বাস্থ্য, সামর্থ্য এবং শারীরিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। রাস্তায় বাজারে ষ্টেসনে ট্রামে কোথাও দুর্ব্বলতা ক্ষীণতা অস্বাস্থ্য রোগশীলতা দেখি নাই। মিশরের প্রাসাদ-সমূহ, মিশরের রাজপথ, মিশরবাসীর পোষাক পরিচ্ছদ, মিশরবাসীর আদবকায়দা, সবই উচ্চ শ্রেণীর উৎকর্ষ-বিজ্ঞাপক। প্রতিপদবিক্ষেপে মিশরের অতুল ঐশ্বর্য্য ও অসীম ধনসম্পদ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রতি পদবিক্ষেপে মিশরবাসীর ভোগবিলাসেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অন্নহীন বস্ত্রহীন অথবা অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট, অর্দ্ধবসনাবৃত দরিদ্রসমাজের ন্যায় কোন লোক-শ্রেণী মিশরে আছে কিনা সন্দেহ। নিতান্ত নিঃস্ব ভিক্ষাজীবী অনাহারশীর্ণ লোক মিশরে দেখিতে পাইলাম না।

বাহ্য জীবনের সকল সৌষ্ঠবই মিশরে পাইয়াছি। ভোগের দিক হইতে মিশরে আসিলে মিশর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। এই জন্যই বোধ হয় আরবীতে প্রবাদ রটিয়াছে—নাইলের জল একবার পেটে পড়িলে আবার ফিরিয়া মিশরে আসিতে হয়। মিশর বাস্তবিকপক্ষে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের এবং সুখভোগের আবাসভূমি।

কিন্তু মিশরের এই অতুল ঐশ্বর্য্যরাশির অভ্যন্তরেও আমি সুখী হইতে পারি নাই। কারণ এই বাহ্য সৌন্দর্য্য, বাহ্য দৃঢ়তা ও বাহ্য সম্পদের পশ্চাতে গভীরতর জীবনীশক্তির পরিচয় পাইলাম না। সর্ব্বত্রই মিশর-জননীর শোকতপ্ত নিঃশ্বাস মরুভূমির অগ্নিময় বায়ুর সঙ্গে অনুভব করিয়াছি। মিশরের উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে "পর দীপশিখা নগরে নগরে· তুমি যে-তিমিরে তুমি সে-তিমিরে।" মিশরের ধনসম্পদ মিশরবাসীর সম্পত্তি নয়—মিশরবাসীর চরিত্রে গাম্ভীর্য্য নাই—মিশর-বাসী ভবিষ্যতের পানে চাহে না।

বস্তুতঃ, মিশর স্বয়ংই সমস্ত দুনিয়ার সম্পত্তিবিশেষ। পৃথিবীর সকল জাতিই মিশরে বসিয়া নিজ নিজ স্বার্থ পুষ্ট করিতেছে। মিশরবাসীর জীবন এই অসংখ্য জাতি-সমূহের পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ষড়যন্ত্রের প্রভাবে ঐক্যহীন, কৌশলহীন, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মিশরীয় জনগণের কোন এক আদর্শ বা লক্ষ্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। অন্যান্য জাতিরা মিশরবাসীর শিক্ষা, দীক্ষা, রাষ্ট্র, সমাজ ও চিন্তাপ্রণালীকে যে আকার দিতে চাহিতেছে প্রায় সেইরূপই সাধিত হইতেছে। এই কারণে মিশরে বসিয়া মিশরাত্মাকে পাইলাম না—অন্যান্য

জাতিগণের ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাইলাম মাত্র।" মিশরের এই বারোয়ারীতলায় ফরাসীর, ইংরেজের, গ্রীকের, জার্ম্মানের, আমেরিকানের, রুসের, তুরস্কের, সকলেরই গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছি। এই ঘোরতর তাণ্ডব ও বেসুর বেতাল নৃত্যগীতের মধ্যে খাঁটি মিশরবাসীর সুর অতি ক্ষীণকণ্ঠে প্রচারিত হইতেছে কিনা সন্দেহ। তাহা বুঝিতে হইলে অতি দুরদৃষ্টি-সম্পন্ন পাকা সমজদার হওয়া আবশ্যক।

শ্রীপর্য্যটক।

(সমাপ্ত)

পিলীয়াস ও মেলিস্যাণ্ডা

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

দুর্গপ্রাসাদের একটি অনুচ্চ দরদালান।

[পরিচারিকাগণ একজায়গায় জড়ো হইয়া উপস্থিত; বাহিরে একটি বায়ু-প্রবেশপথের সম্মুখে কয়েকটি শিশু খেলা করিতেছে]

জনৈক বৃদ্ধা পরিচারিকা

একটু থাক দেখবে, একটু থাক দেখবে; আজই সন্ধ্যায় তা হবে। ওঁরা এখনই এসে আমাদের বলবেন ..

অন্য পরিচারিকা

ওঁরা আমাদের এসে বলবেন না ..কি যে করছেন ওঁরাই আর তা জানেন না...

তৃতীয় পরিচারিকা

এইখানে এস আমরা অপেক্ষা করি...

চতুর্থ পরিচারিকা

আমরা খুব ভালই জানতে পারব কখন উপরে যেতে হবে...

পঞ্চম পরিচারিকা

যখন সময় হবে তখন আমরা নিজের মতেই উপরে যাব...

ষষ্ঠ পরিচারিকা

বাড়ীটায় আর কোনও শব্দই শোনা যাচ্ছে না এখন...

সপ্তম পরিচারিকা

ঐ যে বাতাস-পথের সমুখে ছেলেরা খেলা করছে ওদের চুপ করতে বলা আমাদের উচিত।

অষ্টম পরিচারিকা

এখনি ওরা নিজে হতেই চুপ করবে।

নবম পরিচারিকা

এখনও সময় হয়নি...

[জনৈক বৃদ্ধা পরিচারিকার প্রবেশ]

বৃদ্ধা পরিচারিকা

কেউ এখন সে-ঘরে ঢুকতে পারছে না। আমি এক ঘণ্টার ওপর শুনলাম...কপাটের উপর বোধ হয় মাছি চলার শব্দ শুনতে পাওয়া যেত...কিছুই আমি শুনতে পেলাম না...

প্রথম পরিচারিকা

ওরা কি তাঁকে ঘরে একলা ফেলে রেখেছে?

বৃদ্ধা পরিচারিকা

না, না; আমার মনে হয় লোকে ঘর ভর্ত্তি।

প্রথম পরিচারিকা

ওঁরা আসবেন, ওঁরা আসবেন এখুনি...

বৃদ্ধা পরিচারিকা

ভগবান! ভগবান! এ বাড়ীতে যা ঢুকেছে তা সুখ নয়...এসব কথা বলবার নয়, তবে যা জানি যদি তা আমি বলতে পারতাম...

দ্বিতীয় পরিচারিকা

তুমিই না ওঁদের দরজার সামনে দেখতে পেয়েছিলে?

বৃদ্ধা পরিচারিকা

হাঁ, হাঁ; আমিই ওঁদের দেখতে পেয়েছিলাম। দরওয়ান বলে যে সে-ই ওঁদের প্রথম দেখেছিল; কিন্তু ঘুম ভাঙালাম তার আমিই। উপুড় হয়ে পড়ে পড়ে ও ঘুমুচ্ছিল, আর কিছুতেই জাগতে চাচ্ছিল না।—আর এখন এসে বলছে কিনা—আমিই ওদের আগে দেখতে পেয়েছি। এই কি উচিত?—জানলে, এই নীচে ভাঁড়ার-ঘরে যাবার জন্যে আলো জ্বালতে গিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে ফেললাম।—ভাল, কি করতে আমি ভাঁড়ারে গিয়েছিলাম? —আমার মনে হচ্ছে না এখন, কি করতে আমি ভাঁড়ারে গিয়েছিলাম।—যে রকমেই হোক, আমি খুব সকালে উঠেছিলাম; তখনও বেশ ফরসা হয়নি; আমি নিজেকে

বললাম.—উঠানটা পার হয়ে পরে আমি দরজাটা খুলব। বেশ তারপর, পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেলাম, আর দরজাটা খুললাম, যেন সেটা আর-সব দরজারই মত... ভগবান! ভগবান! কি দেখলাম আমি? আন্দাজ কর কি আমি দেখলাম?...

প্রথম পরিচারিকা

ওঁরা দরজার ঠিক সমুখেই ছিলেন?

বৃদ্ধা পরিচারিকা

দুইজনেই ওঁরা দরজার সমুখেই পড়ে ছিলেন!...ঠিক গরিব লোকের মত, যেন অনেক দিন খেতে পাননি...ওঁরা দুজনায় দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ ছিলেন, যেমন ছোট ছেলেরা ভয় পেলে করে। রাজবধূর প্রাণ প্রায় যায়-যায় হয়েছিল, আর গোলডের তরবারি নিজের পাশে বেঁধা ছিল... পাথরের উপর রক্ত পড়ছিল...

দ্বিতীয় পরিচারিকা

ছেলেগুলোকে চুপ করতে বলা আমাদের উচিত... বাতাস পথের সমুখে ওরা যত পারে চেঁচাচ্ছে...

তৃতীয় পরিচারিকা

নিজের কথাই আর নিজে শোনবার জো নেই...

চতুর্থ পরিচারিকা

কি আর করা যাবে; আমি ইতিপূর্ব্বেই চেষ্টা করেছি, ওরা কিছুতেই চুপ করবে না...

প্রথম পরিচারিকা

বোধ হয় উনি প্রায় সেরে উঠেছেন?

বৃদ্ধা পরিচারিকা

কে?

প্রথম পরিচারিকা

গোলড।

তৃতীয় পরিচারিকা

হাঁ, হাঁ; ওরা তাঁকে তাঁর স্ত্রীর ঘরে নিয়ে গেছে। এইমাত্র যাবার পথে ওঁদের সঙ্গে আমার দেখা হল। ওঁরা তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যেন তিনি মাতাল হয়েছেন। এখনও উনি একা চলতে পারেন না।

বৃদ্ধা পরিচারিকা

আত্মহত্যা করতে উনি পারেন নি; ওঁর দেহটা মস্ত; কিন্তু রাজবধূর আঘাত লেগেছিল অতি সামান্যই, আর তিনিই কিনা এখন মারা যাচ্ছেন...বুঝছ কিছু?

প্রথম পরিচারিকা

যেখানটায় লেগেছিল তুমি দেখেছ?

বৃদ্ধা পরিচারিকা

যেমন তোমাকে দেখছি এমনি স্পষ্ট দেখেছি, বুঝলে। —আমি সমস্তই দেখেছি, বুঝতে পারলে...আজ সকলের আগেই আমি দেখেছি...তাঁর ছোট, বাম স্তনটির উপর একটা অতি সামান্য আঘাত। একটা সামান্য আঘাত যাতে একটা পায়রাকেও মারতে পারে না। এটা কি ঠিক স্বাভাবিক বলে বোধ হয়?

প্রথম পরিচারিকা

হাঁ, হাঁ; এর তলায়-তলায় নিশ্চয় কিছু আছে...

দ্বিতীয় পরিচারিকা

হাঁ, কিন্তু তিন দিন আগে তাঁর ছেলে হয়েছে...

বৃদ্ধা পরিচারিকা

ঠিক তাই!...একেবারে মৃত্যুশয্যাতেই তাঁর ছেলে হল; এটা কি একটা বিশেষ ইঙ্গিত নয়?—আর কি রকম ছেলে! তোমরা দেখেছ তাকে?—একটা এতটুকু ক্ষীণ মেয়ে যা একটা ভিখারীও জন্ম দিতে চাইবে না... একটা ছোট মোমের পুতুল যা অতি আগেই এখানে এসে পড়েছে...একটা ছোট মোমের পুতুল যাকে বাঁচাবার জন্যে পশমে ঢেকে ঢুকে রাখতে হবে...হাঁ, হাঁ; এ বাড়ীতে যা ঢুকেছে তা সুখ নয়...

প্রথম পরিচারিকা

হাঁ, হাঁ; ভগবানের কল নড়েছে...

দ্বিতীয় পরিচারিকা

বিনা কারণে যে এ সমস্ত ঘটেছে এমন নয়...

তৃতীয় পরিচারিকা

আর তারপরে আমাদের দয়াল প্রভু পিলীয়াস... তিনি কোথায়? কেউ জানে না...

বৃদ্ধা পরিচারিকা

নিশ্চয় জানে; সকলেই জানে...কিন্তু কেউ সাহস করে সে কথা বলতে পারছে না...এ কথা বলবার জো নেই ..ও কথা বলবার জো নেই...কোনও কথাই আর বলবার জো নেই...সত্য কথা আর বলবার জো নেই... কিন্তু আমি জানি যে তাঁকে 'অন্ধের নির্ঝরের' তলে পাওয়া গেছে...কিন্তু কেউ, কেউ তাঁর এতটুকু চিহ্ন

দেখতে পায়নি...এখন বুঝলে, এখন বুঝলে, এ কেবল শেষের সেই দিনে সমস্ত জানতে পারা যাবে...

প্রথম পরিচারিকা

এখন আর এখানে ঘুমুতে আমার সাহস হয় না...

বৃদ্ধা পরিচারিকা

যখন একবার বিপদ এ বাড়ীতে ঢুকেছে, তখন আমরা চুপ করে থাকতে পারি কিন্তু...

তৃতীয় পরিচারিকা

হাঁ; কিন্তু বিপদই এসে খুঁজে ধরবে...

বৃদ্ধা পরিচারিকা

হাঁ, হাঁ; কিন্তু আমরা যেদিকে যেতে চাই সেদিকে যেতে পারি না...

চতুর্থ পরিচারিকা

আর যা করতে চাই তা করতে পারি না...

প্রথম পরিচারিকা

ওঁরা এখন আমাদের ভয় করে চলেন...

দ্বিতীয় পরিচারিকা

ওঁরা চুপচাপ আছেন, ওঁরা সবাই...

তৃতীয় পরিচারিকা

যাবার পথে ওঁরা চোখ নত করে যান।

চতুর্থ পরিচারিকা

সব সময়েই ওঁরা চুপিচুপি কথা বলেন।

পঞ্চম পরিচারিকা

মনে হতে পারে যেন ওঁরা সকলে জোট বেঁধে এ কাজটা করেছেন।

ষষ্ঠ পরিচারিকা

ওঁরা কি যে করেছেন, তা কিছু জানবার ত জো নেই...

সপ্তম পরিচারিকা

যখন মনিবরাই ভয় পেয়েছেন তখন আমরা কি করব?...

[নিস্তব্ধভাবে]

প্রথম পরিচারিকা

ছেলেদের ডাকাডাকি আর শুনছি না।

দ্বিতীয় পরিচারিকা

ওরা বাতাস-পথের সমুখে সব বসেছে।

তৃতীয় পরিচারিকা

পরস্পর গায়েগায়ে ঠেসাঠেসি করে ওরা বসেছে।

বৃদ্ধা পরিচারিকা

এখন আর বাড়ীটায় কোনও শব্দ শুনছি না...

প্রথম পরিচারিকা

ছেলেদের নিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না...

বৃদ্ধা পরিচারিকা

এস, এস; এখন উপরে যাবার সময় হয়েছে...

[নিঃশব্দে প্রস্থান]

* * *

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গপ্রাসাদের একটি কক্ষ।

[আর্কেল, গোলড ও ডাক্তার কক্ষের এক অংশে উপস্থিত। নিজের বিছানায় মেলিস্তাণ্ডা শুইয়া আছেন।]

ডাক্তার

কেবল এই সামান্য আঘাতটা থেকে উনি মারা যেতে পারেন না; পাখীও একটা এই আঘাতে মরতে পারে না...তাহলেই আর এঁর মৃত্যুর কারণ আপনি নন, বুঝলেন; আপনি এত ব্যস্ত হবেন না...ওঁর বাঁচবার জো ছিল না ..উনি জন্মেছিলেন বিনা উদ্দেশ্যে...মরবার জন্যে; আর এখন মৃত্যুর দিকে চলেছেন বিনা উদ্দেশ্যে... আর তারপর, এমন বলাও ত যায় না আমরা ওঁকে বাঁচাতে পারব না ..

আর্কেল

না, না; আমার বোধ হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর ঘরে আমরা বড় বেশী নিস্তব্ধ হয়ে থাকি...এটা অশুভ লক্ষণ... দেখ কেমন ঘুমুচ্ছে ও...ধীরে, ধীরে...মনে হয় যেন ওর আত্মা চিরকালের মত অসাড় হয়ে গেছে...

গোলড

বিনা কারণে আমি হত্যা করেছি! বিনা কারণে আমি হত্যা করেছি!...পাথরেরও অশ্রুবর্ষণ করাতে এই কি যথেষ্ট নয়! ওরা পরস্পর চুম্বন করছিল, যেন ছোট ছেলেদের মত...ওরা কেবল পরস্পর চুম্বন করেছিল... ওরা ছিল ভাই আর ভগ্নী...আর আমি, আর আমি হঠাৎ একেবারে...! অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমি এ রকম করে ফেললাম, বুঝলেন...আমা-সত্ত্বেও আমি এ রকম করে ফেললাম...

ডাক্তার

সাবধান ; উনি জাগছেন বোধ হয়...

মেলিস্যাণ্ডা

জানালা খুলে দাও ..জানালা খুলে দাও ..

আর্কেল

এই জানালাটা খুলে দিতে বলছ, মেলিস্যাণ্ডা ?

মেলিস্যাণ্ডা

না, না, ঐ বড় জানালাটা...ঐ বড় জানালাটা... আমি দেখতে পাই যেন...

আর্কেল

আজ সন্ধ্যায় সমুদ্রের হাওয়াটা একটু বেশী ঠাণ্ডা না ?

ডাক্তার

উনি যেমন বলছেন করুন...

মেলিস্যাণ্ডা

আঃ...ঐ কি সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে ?

আর্কেল

হাঁ ; সমুদ্রের উপর সূর্য্যাস্ত হচ্ছে ; আর বেলা নেই। কেমন বোধ করছ, মেলিস্যাণ্ডা ?

মেলিস্যাণ্ডা

ভাল, ভাল। আমাকে ও-কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন ? এত ভাল আর আমি কখনও বোধ করি নি। তা হলেও মনে হচ্ছে যেন আমি কিছু একটার কথা জানতাম...

আর্কেল

কি বলছ তুমি ? আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না...

মেলিস্যাণ্ডা

যা বলি আমি নিজেই তা সমস্ত বুঝিনা, জানলেন... কি যে বলি আমি তাই জানি না। আমি যা জানি তাই জানি না...আমি যা বলতে চাই তাই আর বলি না...

আর্কেল

শোন এখন, শোন এখন···তোমাকে এ রকম কথা বলতে শুনলেও আনন্দ হয় ; এই গেল কদিন তুমি একটু প্রলাপ বকছিলে, আর আমরা সব সময়ে তোমার কথা বুঝে উঠতে পারছিলাম না...কিন্তু এখন, সেসব অনেক দিনের কথা...

মেলিস্যাণ্ডা

জানি না...ঘরে আপনিই কেবল একা আছেন, দাদা ?

আর্কেল

না ; যে ডাক্তার তোমায় আরাম করেছেন তিনিও এখানে আছেন...

মেলিস্যাণ্ডা

আ...

আর্কেল

আর তারপর আর একজনও তা ছাড়া রয়েছে...

মেলিস্যাণ্ডা

কে সে ?

আর্কেল

সে রয়েছে...তুমি ভয় পেয়ো না · সে তোমার একটুও ক্ষতি করবে না, ঠিক জেনে রেখো...যদি তুমি ভয় পাও, সে চলে যাবে ..সে বড় দুঃখ পাচ্ছে...

মেলিস্যাণ্ডা

কে সে ?

আর্কেল

সে হচ্ছে...সে হচ্ছে তোমার স্বামী...সে হচ্ছে গোলড...

মেলিস্যাণ্ডা

গোলড এখানে রয়েছে ? সে কেন আমার খুব কাছে আসছে না ?

গোলড [বিছানার দিকে নিজেকে টানিয়া লইয়া গিয়া]

মেলিস্যাণ্ডা...মেলিস্যাণ্ডা...

মেলিস্যাণ্ডা

ও কি তুমি, গোলড ? তোমাকে আমি আর চিনতে পারছিলাম না...সন্ধ্যার আলো আমার চোখে লাগছে তাই জন্যে...দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলে কেন ? তুমি রোগা হয়ে গেছ আর বুড়ো হয়ে গেছ ·· আর আমাদের দেখা হয়েছিল কি অনেক দিন হল ?

গোলড [আর্কেল ও ডাক্তারের প্রতি]

ঘর থেকে একটু বাইরে যাবেন আপনারা, যদি কিছু মনে না করেন, যদি কিছু মনে না করেন...আমি দরজাটা সমস্ত খুলে রাখব এখন...এই একটুক্ষণ কেবল...আমি ওকে কিছু বলতে চাই ; না হলে আমি মরতে পারব না...যাবেন কি ? ঐ সিঁড়ির তলাটা পর্য্যন্ত যান ;

সেখান থেকে আসতে পারবেন খুব চট্‌ করে, চট্‌ করে ...এইটুকু আমায় অস্বীকার পাবেন না ..আমি অতিদীন হতভাগ্য। [আর্কেল ও ডাক্তারের প্রস্থান] মেলিস্থাণ্ডা, আমার জন্তে তোমার কি একটু দুঃখ হয় না, যেমন তোমার জন্তে আমার হচ্ছে? মেলিস্থাণ্ডা?...আমায় ক্ষমা কর, মেলিস্থাণ্ডা!

মেলিস্থাণ্ডা

হাঁ, হাঁ, তোমায় আমি ক্ষমা করলাম...কি আছে ক্ষমা করবার?...

গোলড

আমি তোমার প্রতি এত ভয়ানক অন্যায় করেছি, মেলিস্থাণ্ডা...কত যে অন্যায় করেছি তা তোমাকে বলতে পারি না...কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি এত স্পষ্ট আজ...প্রথম দিন হতেই।...আর এ পর্য্যন্ত যেসমস্ত আমি জানতাম না, এই সন্ধ্যায় তা আমার চোখের উপর ভেসে উঠছে...আর এসমস্তই আমার দোষ, যা-সমস্ত ঘটেছে, যা-সমস্ত ঘটবে...যদি আমি তা বলতে পারতাম, তুমি দেখতে কত স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি!...আমি সমস্তই দেখছি, আমি সমস্তই দেখছি!...কিন্তু আমি তোমায় এত ভাল বাসতাম!...আমি তোমায় এত ভাল বাসতাম!...আর এখন একজন কেউ মরতে চলেছে... আমিই সে মরতে চলেছি...আর আমি জানতে চাই... আর আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই...তুমি এটা ভুল বুঝবে না ত? আমি চাই...যে মরণের দিকে চলেছে তাকে সত্যটা বলা চাই-ই...সত্যটা তাকে জানতেই হবে, নইলে সে ঘুমুতে পারবে না...শপথ করে বল যে আমায় সত্য বলবে?

মেলিস্থাণ্ডা

হাঁ।

গোলড

পিলীয়াসকে তুমি ভালবাসতে?

মেলিস্থাণ্ডা

নিশ্চয়, হাঁ; আমি তাকে ভালবাসতাম। কোথায় সে?

গোলড

আমার কথা বুঝতে পারছ না? আমার কথা বুঝবে না? আমার বোধ হয়...আমার বোধ হয়... আচ্ছা, কথাটা এই, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তাকে তুমি অবৈধ ভাবে ভালবাসতে কি না?...তুমি কি...তুমি ভ্রষ্টা হয়েছিলে কি না? বল আমায়; বল আমায়, বল, বল, বল?—

মেলিস্থাণ্ডা

না, না; আমাদের কোনো দোষ স্পর্শ করে নি। আমাকে ও কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ?

গোলড

মেলিস্থাণ্ডা! আমায় সত্যটা বল, ভগবানের দোহাই!

মেলিস্থাণ্ডা

আমি কি তোমায় সত্য বলি নি?

গোলড

মরণের সময় এমন করে মিথ্যা বোলো না!

মেলিস্থাণ্ডা

কে মরছে?– সে কি আমি?

গোলড

তুমি, তুমি! আর আমি, আমিও, তোমার পরে!... আর সত্যটা আমাদের জানতেই হবে...শেষ পর্য্যন্ত সত্যটা আমরা জানবই, শুনতে পাচ্ছ?...সমস্ত আমাকে বল! সমস্ত আমাকে বল! আমি তোমাকে সমস্ত ক্ষমা করছি!...

মেলিস্থাণ্ডা

কিসের জন্যে, আমি মরতে যাচ্ছি? আমি জানতাম না...

গোলড

তুমি এখন জানলে!...এখন সময় হয়েছে! এখন সময় হয়েছে! এখন সময় হয়েছে! শীঘ্র বল! শীঘ্র বল!...সত্য! সত্য!...

মেলিস্থাণ্ডা

সত্য...সত্য...

গোলড

কোথায় তুমি? মেলিস্থাণ্ডা! কোথায় তুমি? এ ত ঠিক হচ্ছে না! মেলিস্থাণ্ডা! কোথায় তুমি? কোথায় যাচ্ছ তুমি? [কক্ষদ্বারের নিকট আর্কেল ও ডাক্তারকে দেখিতে পাইয়া।] হাঁ, হাঁ; আপনারা আসতে পারেন...কিছুই জানলাম না; সবই বৃথা, এখন আর উপায় নেই; এর মধ্যেই ও আমাদের থেকে অনেক

দূরে গেছে...আমি আর কখনই জানতে পারব না ..
আমায় এখানে অন্ধের মত মরতে হবে !...

আর্কেল

কি করেছ তুমি ? ওকে যে মেরে ফেলবে...

গোলড

এর মধ্যেই ওকে আমি মেরে ফেলেছি...

আর্কেল

মেলিস্যাণ্ডা...

মেলিস্যাণ্ডা

আপনি ডাকছেন, দাদা ?

আর্কেল

হাঁ, দিদি...কি করব এখন বল ত ;

মেলিস্যাণ্ডা

এ কি সত্যি এখানে শীত এসেছে ?

আর্কেল

কেন তা জিজ্ঞাসা করছ ?

মেলিস্যাণ্ডা

বড় ঠাণ্ডা লাগছে, আর গাছে একটাও পাতা নেই·

আর্কেল

শীত করছে তোমার ? জানালাগুলো বন্ধ করে দেব, বল ?

মেলিস্যাণ্ডা

না, না...যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সূর্য্য সাগরের খুব নীচে চলে যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত না।—ও খুব ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে ; তা হলে সত্যি শীত আরম্ভ হয়েছে ?

আর্কেল

হাঁ।—শীত তোমার ভাল লাগে না ?

মেলিস্যাণ্ডা

ওঃ ! না। শীতকে আমার ভয় করে।—আমার খুব ভয় করে সেই ভয়ানক শীতকে···

আর্কেল

একটু ভাল বোধ করছ ?

মেলিস্যাণ্ডা

হাঁ, হাঁ ; আর সে-সমস্ত উদ্বেগ মনেই আসছে না....

আর্কেল

তোমার ছেলেটি দেখবে ?

মেলিস্যাণ্ডা

কে ছেলে ?

আর্কেল

তোমার ছেলে।—তুমি যে এখন মা হয়েছ...তুমি যে একটি ছোট্ট মেয়েকে এখানে নিয়ে এসেছ...

মেলিস্যাণ্ডা

কোথায় সে ?

আর্কেল

এখানে...

মেলিস্যাণ্ডা

আশ্চর্য্য...ওকে নিতে আমি হাত তুলতে পারছি না.

আর্কেল

তার কারণ তুমি এখনও খুব দুর্ব্বল রয়েছ...আমিই ওকে ধরছি ; দেখ···

মেলিস্যাণ্ডা

ও হাসছে না...ও খুব ছোট...ও কাঁদবার জোগাড় করছে...ওকে দেখে আমার দুঃখ হয়

[ক্রমে ক্রমে পরিচারিকাগণ ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং নিঃশব্দে দেওয়ালের গায়ে সার দিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।]

গোলড [এস্তভাবে উঠিয়া]

এ কি ?—এখানে এই মেয়েগুলো কি করছে ?...

ডাক্তার

ওরা দাসী...

আর্কেল

কে ওদের ডেকে আনলে ?

ডাক্তার

সে আমি না...

গোলড

এখানে এসেছ কেন তোমরা ? কেউ তোমাদের ডাকেনি...এখানে কি করছ ?—তা হলে হয়েছে কি ?—উত্তর দাও !...

[পরিচারিকাগণ নিরুত্তর রহিল।]

আর্কেল

বেশী চীৎকার করে কথা বোলো না...ও এইবার ঘুমিয়ে পড়েছে ; ও চোখ বুজেছে এখন...

গোলড

এ ত...?

ডাক্তার

না, না ; দেখুন, নিশ্বাস পড়ছে...

ওর দুই চোখই অশ্রুপূর্ণ।—এখন এইবার ওর আত্মা বিলাপ করছে...ওর হাত দুখানি ছড়িয়ে দিচ্ছে কেন?—কি চাচ্ছে ও?

ডাক্তার

ছেলেটির দিকে ঐ রকম করছেন, নিশ্চয়। মাতৃ-স্নেহের প্রয়াস ঐ...

গোলড

এইবার? এইবার—তোমাকে বলতেই হবে, বল! বল!...

ডাক্তার

সম্ভবতঃ।

গোলড

এখুনি?...ওঃ! ওঃ! ওকে আমায় বলতেই হবে... চলে যান! চলে যান! ওর কাছে আমাকে একলা থাকতে দিন!

আর্কেল

না, না; আর বেশী কাছে এস না...ওকে আর বিরক্ত কোরো না...ফের আর ওকে কোন কথা বোলো না...তুমি জাননা আত্মা যে কি...

গোলড

আমার দোষ নেই · আমার দোষ নেই।

আর্কেল

চুপ...চুপ...এখন আমাদের চুপিচুপি কথা বলতে হবে।—ওকে আর আমাদের বিরক্ত করা হবে না...... মনুষ্যাত্মা অত্যন্ত মৌনী...মনুষ্যাত্মা নির্জ্জনে গোপনভাবে যেতেই ভালবাসে ..ভয়ে ভয়ে সে এত সহ্য করে থাকে... কিন্তু এ মনের দুঃখ, গোলড...কিন্তু এইসমস্ত দেখে মনের দুঃখ!...ওঃ! ওঃ! ওঃ!...

[এই সময় পরিচারিকাগণ কক্ষের প্রান্তে হঠাৎ জানু পাতিয়া বসিল।]

আর্কেল [ঘুরিয়া]

ও কি?

ডাক্তার [বিছানার নিকটে গিয়া দেহ স্পর্শ করিয়া]

ওবাই ঠিক...

[দীর্ঘ নিস্তব্ধতা]

আর্কেল

আমি কিছুই দেখলাম না।—তুমি ঠিক বুঝতে পারছ?...

ডাক্তার

হাঁ, হাঁ।

আর্কেল

আমি কিছুই শুনলাম না...এত শীঘ্র, এত শীঘ্র... একেবারে হঠাৎ ..একটা কথাও না বলে ও চলে গেল...

গোলড [কাঁদিতে কাঁদিতে]

ওঃ! ওঃ! ওঃ!

আর্কেল

এখানে আর থেকোনা; গোলড, ওর নিস্তব্ধতার দরকার, এখন···চুপ কর, চুপ কর...অতি ভয়ানক, কিন্তু এতে তোমার কিছু দোষ নেই...ও ছিল একটি এতটুকু ঠাণ্ডা মেয়ে, এত শান্ত, এত নিরীহ, আর এত নীরব...ও ছিল একটি ছোটখাট সামান্য রহস্য, জগতের অন্য সমস্তরই মত...ঐ শুয়ে রয়েছে ওখানে ও, যেন ওরি ছেলের মস্ত বড় একটি বোন...চুপ কর, চুপ কর...হায় ভগবান! হায় ভগবান!···আমিও পর্য্যন্ত এর কিছুই বুঝতে পারব না... চল আমরা এখান হতে যাই। এস; ছেলেটাকে এখানে রেখে কাজ নেই, এই ঘরে...ও-ই এখন বাঁচতে থাকবে, ওর বদলে···ও বেচারীর পালা এইবার আরম্ভ হয়েছে···

[নিঃশব্দে প্রস্থান।]

[সম্পূর্ণ।]

শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

ইথর ও জড়

ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি, আমরা যে আলোক দেখিতে পাই তাহা ইথর নামক একটা সর্ব্ব-ব্যাপী পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। এই ইথরকে কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই, বা স্পর্শ করিয়া অনুভব করে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই। ইথর না থাকিলে পৃথিবীর বোধ হয় অর্দ্ধেক কাজ বন্ধ থাকিত। ইথর না থাকিলে তাপ থাকিত না, (Maxwell) ম্যাক্সওয়েলের মতে

বিদ্যুতের মহিমময়ী শক্তি থাকিত না, ও কেলভিনের মতে জড় পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকিত না। প্রথমে ইথরের সহিত আলোকের কি সম্বন্ধ তাহা আলোচনা করা যাউক।

যদি দেখা যায় যে দুইটা বস্তু পরস্পর হইতে দূরে রহিয়াছে অথচ তাহাদের মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ঐ দুইটা বস্তুর মধ্যে কোনও রকম যোগ আছে। মনে করুন আপনি এখানে বসিয়া রহিয়াছেন ও আপনার কিছু দূরে আপনার কুকুর শুইয়া আছে, তাহার গলা হইতে একটা লম্বা দড়ি আপনার হাতে আসিয়াছে। আপনার কুকুরটাকে ডাকিবার ইচ্ছা হইল। আপনার ইচ্ছা হইলেই কিছু সে আপনার নিকট উঠিয়া আসিবে না; এই কার্য্যকারণ ঘটাইবার নিমিত্ত আপনার সহিত কুকুরের কোনও রকম যোগ আবশ্যক। দেখা যাউক, কি কি প্রকারে দূরে বসিয়া কুকুরের গায়ে হাত না দিয়া তাহাকে আপনি ডাকিতে পারেন।

১ম। আপনি যদি হাত নাড়েন তা' হইলে দড়িটা আন্দোলিত হইয়া কুকুরটাকে জাগাইয়া তুলিবে।

২য়। আপনি একটা ঢিল লইয়া কুকুরের গায়ে ফেলিতে পারেন।

৩য়। শিষ দিয়া কিম্বা কুকুরের নাম চেঁচাইয়া তাহাকে ডাকিতে পারেন।

প্রথম দুইটির বেলা আপনার ও কুকুরের মধ্যে কি যোগ রহিয়াছে তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু তৃতীয়টির বেলা আপাতদৃষ্টিতে কোনও যোগ নাই বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু তা হইলেও একটা যে যোগ আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা বিশেষ শক্ত নহে। এখানে আপনাদের উভয়ের মধ্যে বায়ু আছে। আপনি যাই শিষ দিলেন অমনি আপনার জিহ্বা সম্মুখের বায়ুকে আন্দোলিত করিল, সেই আন্দোলন বায়ুতে বহিয়া যাইয়া কুকুরের কর্ণপটহে আঘাত করিল। ফলে এই ভাবে ডাকা প্রথম উপায়ের ন্যায় দড়ি নাড়িয়া ডাকার মত, আপনি দড়িটাকে আন্দোলিত না করিয়া বায়ুটাকে আন্দোলিত করিলেন এই যা তফাত।

৪র্থ। আবার মনে করুন, আপনি একটা দর্পণ লইয়া তাহাতে সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত করিয়া, সেই আলোক কুকুরের চক্ষুর উপর ফেলিলেন। ইহাতে কুকুরটা অবশ্যই চমকাইয়া উঠিবে। এ ক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছার বাহন কি? আপনি রহিলেন এখানে, কুকুরটা রহিল ওখানে, আপনার হাতের দর্পণটা একটু নাড়া পাইবামাত্রই কুকুরটা জাগিয়া উঠিল! আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। যদি দেখি যে কোথাও কিছু নাই অথচ একটা জিনিষকে ছাড়িয়া দিবা মাত্রই সেটা সোজাসুজি উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে সেটাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার যতখানি কারণ বিদ্যমান, এখানেও ঠিক ততখানি কারণ বিদ্যমান, কেবল আমরা ছেলেবেলা হইতে এরূপ ব্যাপার দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি বলিয়া কিছুই আশ্চর্য্য মনে হয় না। আপনি বলিবেন, কেন, ঐ যে আলো আসিয়া দর্পণে পড়িয়া সেখান হইতে প্রতিফলিত হইয়া কুকুরের কাছে গেল। ঠিক কথা। নিউটনও কতকটা এইরূপ বলিয়াছিলেন, কেবল তিনি আলো না বলিয়া আলোর কণিকা বা Light Corpuscle বলিয়াছিলেন। তাহার মতে প্রত্যেক দীপ্তিমান বস্তু হইতে Corpuscle বা আলোর কণিকা অনবরত চারিদিকে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। এই রকম গোটাকয়েক Corpuscle বা কণিকা সূর্য্য হইতে আসিয়া দর্পণ হইতে ঠিকরাইয়া কুকুরের চক্ষুকে আঘাত করিল ও তাহার দৃষ্টি জন্মাইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এরূপভাবে ডাকা নিউটনের মতে কতকটা ঢিল ছুঁড়িয়া ডাকার মত, কেবল ঢিলের বদলে আপনি আলোর কণিকা ছুঁড়িলেন। (Huygens ও Young) হুইগেন্স ও ইয়ংএর মত অন্যরূপ। তাঁহারা বলিলেন আপনার ও কুকুরের মধ্যে—শুধু তাহাই কেন—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক স্থানেই ইথর নামে একটা সর্ব্বব্যাপী পদার্থ আছে। সূর্য্যের অণুগুলি অত্যধিক তাপের জন্য অনবরত ছুটাছুটি করিতেছে ও এই ইথরে ধাক্কা দিতেছে, এবং সূর্য্য হইতে ইথরে ধাক্কাপ্রসূত ঢেউ চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে; সেই ঢেউ আসিয়া আপনার দর্পণে লাগিল এবং সেখান হইতে প্রতিফলিত হইয়া কুকুরের চক্ষুতে লাগিয়া দৃষ্টিশক্তি জন্মাইল। সুতরাং ইহাদের মতে শেষোক্ত প্রকারে ডাকা নাম-ধরিয়া

ডাকারই মত, কেবল বায়ুতে ঢেউ না তুলিয়া ইথরে ঢেউ তুলিলেন, এবং কুকুরের কর্ণকে আঘাত না করিয়া চক্ষুকে আঘাত করিলেন।

কিন্তু এইখানে একটু গোল বাধিল। নিউটনের শিষ্যেরা বলিলেন যে যদি আলো ও শব্দ উভয়ই ঢেউ হইতে হইয়াছে তবে দুটার ব্যবহার এমন ভিন্ন কেন? আমি ঘরে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছি, যে-লোকটি ঘরের বাহিরে ঠিক দরজার সামনে দাঁড়াইয়াছে সেও আমার কথা শুনিতে পাইতেছে ও আবার যে ঘরের বাহিরে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়াছে সেও শুনিতে পাইতেছে। শব্দের ঢেউ দরজার কাছে গিয়া বাঁকিয়া ঐ লোকটির কাছে পৌঁছিতেছে। কিন্তু ঘরে আলো জ্বলিতেছে, দরজার বাহিরে ঠিক সোজাসুজি আলো যাইতেছে, আশেপাশে যাইতেছে না, দরজার আড়ালে যে-লোকটি দাঁড়াইয়া আছে সে মোটেই আলো পাইতেছে না। অর্থাৎ শব্দের ঢেউ কোণের কাছে বাধা পাইলে আশে-পাশে ছড়াইয়া পড়ে কিন্তু আলো ঠিক সোজাসুজি চলে, ছড়াইয়া পড়ে না। একই প্রকার ঢেউ হইতে উদ্ভূত দুইটা ব্যাপারের ব্যবহার এমন বিসদৃশ কেন? নিউটনের শিষ্যেরা ইহার উত্তর দিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, আলো ঢেউ নয়। আলোর কণিকা সোজাসুজি ছুটিয়া চলিয়াছে। এই মতবাদে আলোর রশ্মি, শব্দের ন্যায়, কোণের কাছে বাঁকিয়া ঘুরিয়া যায় না কেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। হুইগেন্স অন্য প্রকার উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, বাঁকেনা কে বলিল? বাঁকে, কিন্তু খুব অল্প। বাঁকার পরিমাণটা ঢেউএর দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। যে ঢেউ যত বেশী লম্বা, সেগুলি তত বেশী বাঁকে। শব্দের ঢেউগুলি দশবিশ ফুট লম্বা, আর আলোর ঢেউগুলি মোটে এক ইঞ্চির লক্ষভাগ। সুতরাং দুই রকম ঢেউই যে এক রকম ব্যবহার করিবে তাহা তোমরা কোনমতেই আশা করিতে পার না। মনে কর একটা অশীতিপর বৃদ্ধ ও একটা দুই মাসের শিশু উভয়েই মানুষ, এবং মানুষ বলিয়া একটা সাদৃশ্যও আছে, কিন্তু তাই বলিয়া দুই জনের ব্যবহার কখনও একপ্রকার হইতে পারে না। এ কথাগুলি হুইগেন্স কেবল মুখেই বলেন নাই। তিনি অঙ্ক কসিয়া দেখাইলেন যে যদি ছোট ঢেউ বড় গর্তের মধ্য দিয়া যায় তাহা হইলে আশ-পাশের ঢেউগুলা কাটাকাটি করিয়া নিস্তরঙ্গ হয় এবং সম্মুখের ঢেউটাই কেবল অগ্রসর হইতে থাকে। আলোক সাধারণতঃ যেসমস্ত গর্তের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে তাহাদের তুলনায় আলোকের ঢেউগুলা নিতান্তই ছোট, সুতরাং যেটুকু ঢেউ কোণের কাছে বাঁকে সেটুকু উপরোক্ত মন্তব্য অনুসারে কাটাকাটিতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বড় ঢেউ ছোট গর্তের মধ্য দিয়া যাইলে কাটা-কাটি করিয়া বিনষ্ট হইবার সুযোগ পায় না। শব্দের ঢেউগুলা আমাদের দরজা জানলার আয়তনের তুলনায় বড়। সুতরাং আমরা আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিলেও শব্দের ঢেউগুলা বাঁকিয়া ঘুরিয়া আমাদের কাছে পৌঁছিতে পারে।

আলো যে কোণের কাছে একটু বাঁকে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা বিশেষ শক্ত নহে। বাঁ চক্ষু বন্ধ করিয়া ডানচক্ষু দিয়া একটা দূরস্থিত আলোর শিখার দিকে তাকান; এইবার একখানা কার্ড লইয়া ধীরে ধীরে আলোটিকে আপনার চক্ষু হইতে বন্ধ করুন; যখন প্রায় সমস্তটা বন্ধ করিয়াছেন, তখন দেখিবেন যে কার্ডের দিকের আলোটা সাদা নহে, ইহা সাত-রঙা। শিখাটির সাদা আলো সাতটা রঙ মিলিয়া হইয়াছে; এই সাত রঙের আলো যদি একসঙ্গে আসিয়া চক্ষুকে আঘাত করে তাহা হইলে আমরা সাদা রঙ দেখি। এক্ষেত্রে, ঠিক কার্ডের পাশ দিয়া যে রশ্মির গোছা চক্ষে আসিতে-ছিল সেগুলি কার্ডের ধারে বাধা পাইয়া একটু বাঁকিয়া গেল। যদি সাতটা রঙের আলো এক রকমই বাঁকিত তা' হইলে আমরা সাদা রঙই দেখিতাম। কিন্তু বিভিন্ন রঙের আলোর ঢেউএর দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রকম। লাল আলোর ঢেউগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং নীল-বেগুনে ইত্যাদির ঢেউগুলি ছোট। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাঁকার পরিমাণ ঢেউএর দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে, সুতরাং বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন রকম বাঁকিয়া সাতটা রঙ উৎপন্ন করিল।

আলো যে ঢেউ হইতে প্রসূত তাহার আরও একটা

সুন্দর প্রমাণ ইয়ং সাহেব দিয়াছিলেন। মনে করুন স্থির জলে দুই জায়গায় ঢিল ফেলিয়া আপনি ঢেউ তুলিলেন। দুই জায়গা হইতে দুই দল ঢেউ গোলাকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। ঢেউগুলা উঁচুর পর নীচু, নীচুর পর উঁচু এইরূপে চারিদিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। এই দুইদল ঢেউ যেখানে ঠোকাঠুকি করিবে সেখানে জলের অবস্থা কি হইবে? যেখানে একই সময়ে দুইটা ঢেউএর দলের উঁচুটা আসিয়া পঁহুছিবে সেখানকার জলটা দ্বিগুণ উঁচু হইয়া উঠিবে। যেখানে একই সময়ে দুইটা দলের নীচুটা আসিয়া পঁহুছিবে সেখানকার জলটা দ্বিগুণ নীচু হইবে। কিন্তু যেখানে একই সময়ে একটা দলের "উঁচু" ও একটা দলের "নীচু" আসিয়া পঁহুছিবে সেখানে জলের অবস্থা কি হইবে? সেখানে উঁচু ও নীচু মিলিয়া জল স্থির ও নিথর হইয়া যাইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে জলে একটা জায়গায় একটা ঢিল ফেলিলে সমস্ত জায়গার জলটাই নাচিত ও ঢেউ তুলিত। কিন্তু দুই বা ততোধিক জায়গার জলটা আলোড়িত হইলে জায়গায় জায়গায়, আলোড়নে আলোড়নে মিলিয়া জল স্থির নিথর হইয়া যাইবে। জলে ঢেউএর বেলা যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে ইথরে আলোকের ঢেউএও ত এইরূপ হওয়া উচিত। আলোকে আলোকে মিলিয়া স্থানে স্থানে অন্ধকার হওয়া উচিত। ইয়ং এই সত্যটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে সত্যসত্যই আলোয় আলোয় মিলিয়া অন্ধকার হয়। তিনি আবার এই পরীক্ষা হইতে আলোর ঢেউএর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করিলেন।

ইয়ং যখন প্রথমে আলোকের-তরঙ্গ-মতবাদ প্রচার করেন তখন তিনি ইহাকে বায়ুতে শব্দের ঢেউএর মত মনে করিয়াছিলেন। ঢেউ দুই প্রকার।

১ম। প্রথম মনে করুন জলের উপর ঢেউ। এখানে ঢেউগুলি যে-মুখে চলে জলের কণাগুলি তাহার সহিত আড়াআড়িভাবে বা at right angles নাচিতে থাকে। (চিত্র দেখুন) এই প্রকারের কম্পনকে Transverse Vibration বলে। আমরা ইহাকে ১নং ঢেউ বলিব। এ প্রকারের ঢেউ কেবলমাত্র Solid বা কঠিন পদার্থে হয়।
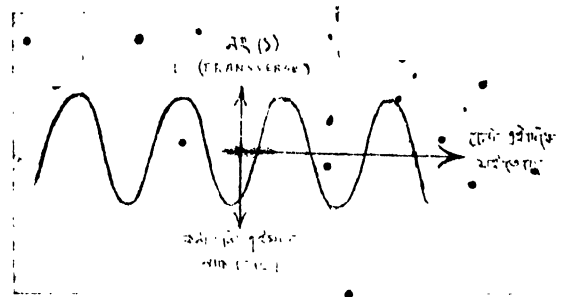
২য়। আবার মনে করুন আপনার সামনে একটা লম্বা স্প্রিং পড়িয়া রহিয়াছে। আপনি ইহার একধারে জোরে একটা ধাক্কা মারিলেন। একটা কম্পন বা ঢেউ স্প্রিংএর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া যাইবে।
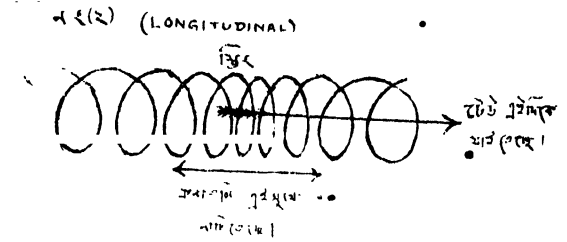
এখানে ঢেউ যেমুখে যাইতেছে স্প্রিংএর কণাগুলি সেই মুখেই আনাগোনা করিতেছে। (চিত্র) এ প্রকার ঢেউকে Longitudinal Vibration বলে। আমরা ইহাকে ২নং ঢেউ বলিব। এই প্রকার ঢেউ বায়বীয় পদার্থে সহজেই হয়। কঠিন পদার্থেও সময় সময় হয়।

ইয়ং ইথরকে বায়বীয় মনে করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে ইহাতে কেবল ২নং ঢেউই উঠে। কিন্তু পরে পরীক্ষায় প্রকাশিত হইল যে আলোকের ঢেউগুলা ১ নম্বরের। কিন্তু ১নং ঢেউ কেবলমাত্র কঠিন পদার্থে হইতে পারে, সুতরাং বলিতে হইল যে ইথর কঠিন। ইথরের এই গুণটিই ধারণা করা শক্ত। ইথর বায়বীয় হইলে দৃশ্যতঃ অনেক গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু একটা কঠিন (Solid) পদার্থের ভিতর কিরূপে এত বড় বড় গ্রহগণ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। জড় পদার্থের কয়েকটা গুণ এমন অদ্ভুত ভাবে ইথরে আছে যাহা আর কোনও কঠিন পদার্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা ইস্পাত অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ স্থিতিস্থাপিক

(Elastic)। ইহার গুরুত্ব (Density) এত বেশী যে তাহার তুলনায় আমাদের অতি গুরুদ্রব্য লৌহ বা স্বর্ণের গুরুত্ব নাই বলিলেই হয়। লর্ড কেলভিনের মতে জেলীর (Jelly) সহিত ইথরের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অবশ্য ইথরের গুরুত্বের সহিত ইহার তুলনাই হয় না; তথাপি জেলীতে নাড়া দিলে ইহাতে যেরকম কম্পন উঠে, ইথরে আলোকের কম্পনও ঠিক সেই ধরণের। আবার খানিকটা জেলীকে মোচড় দিলে তাহাতে যেরূপ টান (Strain) পড়ে ইথরেও সেইরূপ টান পড়ে। ইথরকে যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (Perfectly Elastic) ধরা যায় তাহা হইলে গ্রহগণের গতি বুঝা যাইতে পারে। একটা গ্রহ চলিবার সময় তাহার সম্মুখের ইথরকে চাড় দিয়া ফাঁক করে আবার সেই ইথরটাই বন্ধ হইবার সময় গ্রহের পশ্চাদ্ভাগে ঠিক সমান পরিমাণ চাপ দেয়, সুতরাং মোটের উপর ইথরকে ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে গ্রহটার কোনও শক্তির অপচয় বা বলের আবশ্যক হয় না।

কিন্তু ইহাতেও ইথরে তরঙ্গ মতবাদে একটা গোল রহিয়া গেল। কঠিন পদার্থে যখন ১নং Transverse ঢেউ তোলা যায় তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে ২নং Longitudinal ঢেউও উঠে। কিন্তু ইথরে অনেক খোঁজ করিয়াও ২নং ঢেউএর কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ ইহার উত্তরে বলেন যে ইথরে ২নং ঢেউ হয় বটে কিন্তু ইহার স্থিতিস্থাপকতা অসীম বলিয়া এরূপ ঢেউএর বেগও অসীম, সুতরাং আমরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি না।

লর্ড কেলভিন উক্ত ঢেউ না থাকার কারণ স্বরূপ Lalile or Contractile Ether নাম দিয়া ইথরে আরও কয়েকটা অদ্ভুত গুণ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সমগ্র ইথর বাহিরে বিশ্বের প্রান্তে কোনও বস্তুর সহিত আবদ্ধ আছে ও ক্রমাগত আপনাকে সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই মতে ২ নং ঢেউএর গতির বেগ অসীম না হইয়া শূন্য হয়।

ম্যাক্সওয়েল এই প্রকারের গোলযোগের মধ্যে না গিয়া একেবারে অন্যমত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! তোমরা গোড়াতেই ভুল করিয়াছ। আলোক যে ইথরের কম্পনপ্রসূত তাহা বেশ মানিলাম, কিন্তু কম্পনটা কিসের? এই কম্পনে ইথরের কণাগুলি যে নাচিতেছে তাহা তোমাদের কে বলিল? ইথরের অপর কোনও গুণের বা অবস্থারও কম্পন হইতে পারে। অপর গুণের কম্পন কিরূপ তাহা একটা উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। মনে করুন সেই স্প্রিংটা। ইহার এক প্রান্তে একটু ধাক্কা দিলে একটা কম্পন ইহার একদিক হইতে অপর দিকে চলিয়া যাইবে। এই কম্পনে স্প্রিংএর কণাগুলি কাঁপিতেছে। আবার মনে করুন, আপনি ঐ স্প্রিংটার একপ্রান্ত একটু উত্তপ্ত করিলেন, এই উত্তাপটা স্প্রিংএর লোহা বাহিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। ৫ সেকেণ্ড বাদে আপনি সেই প্রান্তটা বরফ দিয়া ঠাণ্ডা করুন এখন এই শৈত্যটা আগের উত্তাপের পিছনে পিছনে চলিয়া যাইবে। আবার ৫ সেকেণ্ড বাদে আপনি উত্তপ্ত করুন, এবার আবার এই উত্তাপটা অগ্রসর হইতে থাকিবে। এরূপে যদি আপনি ৫ সেকেণ্ড অন্তর স্প্রিংএর প্রান্তটা একবার উত্তপ্ত একবার ঠাণ্ডা করিতে থাকেন তা' হইলে একটা ঠাণ্ডা গরমের ঢেউ স্প্রিং বাহিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। এখানে ঢেউএর জন্য স্প্রিংএর কণাগুলি নাচিতেছে না। এই ঢেউ চক্ষে দেখিবার নহে, স্পর্শ করিয়া এই ঢেউএর অস্তিত্ব বুঝিতে পারিবেন। চক্ষে দেখিতে হইলে স্প্রিংটার মাঝখানে একটা থার্মোমিটার রাখুন, তাহার পারাটা ৫ সেকেণ্ড অন্তর তালে তালে নাচিতে থাকিবে।

স্প্রিংএর বেলা যেরূপ হইল, ইথরেও সেইরূপ হইতে পারে। ইথরে ঢেউ তুলিতে হইলে তাহার কণাগুলিকেই যে নাচাইতে হইবে এরূপ কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইথরের অপর কোনও গুণ বা অবস্থাকেও নাচাইয়া ইথরে ঢেউ তুলা যায়। মনে করুন আপনি অপরিচালক-দণ্ডসংযুক্ত (insulated) একটা ধাতু-গোলক রাখিলেন। এখন যদি ইহাকে সংযোগ তাড়িতযুক্ত করেন তাহা হইলে গোলকটার চারিধারের ইথরে টান (strain) পড়িবে। এখন গোলকটাকে তাড়িতবিযুক্ত (discharge) করিয়া তাহাকে বিয়োগ তাড়িতযুক্ত করুন আগের বেলা যেরকম টান পড়িয়াছিল এখন তাহার ঠিক উল্টা রকম টান পড়িবে। আগের টানের পিছনে পিছনে

এই টান ইথর বাহিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। গোলকটাকে আবার তাড়িতবিযুক্ত করিয়া সংযোগ তাড়িতযুক্ত করিয়া আবার পরক্ষণেই তাড়িতবিযুক্ত করুন; এইরূপ যদি খুব তাড়াতাড়ি করা যায় তা' হইলে একটা বৈদ্যুতিক টানের ঢেউ চারিদিকে ছুটিয়া চলিবে। ম্যাক্সওয়েল গণনা করিয়া বলিলেন যে এই ঢেউ সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশী হাজার মাইল বেগে চলিবে। আলোকও সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশী হাজার মাইল বেগে চলে। ইহা হইতে ম্যাক্সওয়েল অনুমান করিলেন যে আলোক, ইথরে বৈদ্যুতিক টানের ঢেউ মাত্র। ম্যাক্সওয়েল মোটে ৪৮ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আর তাঁহার মতের পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রমাণ দিয়া যাইতে পারেন নাই।

জার্ম্মেনিতে হার্জ পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি আলো না জ্বালিয়া অন্য বৈদ্যুতিক উপায়ে ইথরে ঢেউ উৎপাদন করেন এবং ঠিক সাধারণ আলোকের মত ইহার তির্য্যগাবর্ত্তন ও পরাবর্ত্তন প্রদর্শন করেন। হার্জের পর আমাদের দেশের অধ্যাপক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। তাঁহার যন্ত্রগুলি এত সুন্দর হইয়াছিল যে লর্ড কেলভিন ও কেম্ব্রিজের জে, জে টমসন মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করেন। ইথরে এই যে ঢেউগুলি হয়, এগুলির সহিত আলোকের এই মাত্র তফাৎ যে এগুলি আলোকের অপেক্ষা অনেক অধিক লম্বা। আলোকের ঢেউ মোটে এক ইঞ্চির লক্ষভাগ মাত্র ও ইথরের ঢেউ ১০০।১৫০ ফুট লম্বা। এই ঢেউগুলি লম্বা বলিয়া একটা বড় সুবিধা হইল। এগুলি সম্মুখে বাধা পাইলে বাঁকিয়া ঘুরিয়া যাইতে পারে, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাঁকার পরিমাণ ঢেউএর দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে।

ইটালিতে মার্কনি এই দেখিয়া ভাবিলেন, বাঃ! বেশ ত! যদি এক জায়গা হইতে আমি এইরূপে ইথরে ঢেউ তুলিতে থাকি, তাহা হইলে সেই ঢেউ পাহাড় পর্ব্বত না মানিয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিবে ও এই ঢেউ ধরিবার একটা যন্ত্র প্রস্তুত করিলে তাহার দ্বারা অনায়াসে টেলিগ্রাফের কাজ চলিতে পারে। লাভের মধ্যে টেলিগ্রাফের তারের খরচটুকু বাঁচিয়া যাইবে। ইহার পর মার্কনি তাঁহার এই চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া তারবিহীন তাড়িতবার্ত্তার উদ্ভাবন করিলেন।

আমরা এতক্ষণ ইথরকে দিয়া আলোক বহাইলাম ও টেলিগ্রাফের কাজ করাইলাম। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা ইহাকে দিয়া আরও একটা কাজ করাইয়াছেন।

এডিনবরার প্রফেসর টেট (Prof. Tait) একবার কেলভিনকে একটা বড় আশ্চর্য্য বস্তু দেখাইয়াছিলেন। একটা বড় কাচের বাক্সের একদিকের কতকটা ক্যাম্বিস (Canvas) দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার ভিতর বস্তু-বিশেষের ধূম প্রবিষ্ট করান হইয়াছিল। এখন এই ক্যাম্বিসের গায়ে টোকা মারিলে ভিতরের বায়ুতে গোলাকার আবর্ত্ত বা Vortex উৎপন্ন হয়। ভিতরে ধূম থাকাতে এগুলি বেশ সহজেই দেখা যায়। এই আবর্ত্ত বা ঘূর্ণীগুলার কয়েকটা বড় অদ্ভুত গুণ দেখা গেল। দুইটি আবর্ত্ত যদি পিছনে পিছনে—একটা একটু বেগে ও একটা একটু ধীরে—যায়, তা' হইলে যেটা আগে যাইতেছে সেটা দাঁড়াইয়া থাকে ও অপরটা নিকটে আসিবামাত্র নিজেকে সঙ্কুচিত করে, ও পশ্চাতেরটা একটু বড় হইয়া, ওটা এটার ভিতর দিয়া গলিয়া যায়, দুইটাতে ঠোকাঠুকি করিয়া বিনষ্ট হয় না। আবার যদি দুইটা ঘূর্ণী কোণাকুণি ভাবে চলিতে থাকে, তা হইলে যখন অল্প একটু দূরে থাকে, তখন পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু একটু বেশী কাছে আসিয়া দুইটাতে মিলিত হইবার পূর্ব্বেই ঠিক যেন ধাক্কা লাগিয়া রবারের বলের ন্যায় বিভিন্ন দিকে চলিয়া যায়। আবার আপনি যদি ইহাকে কাটিতে চেষ্টা করেন, তা' হইলে ঘূর্ণীটি আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া সরিয়া গিয়া নিজেকে রক্ষা করে। এই ঘূর্ণীগুলা অবশ্য কিছুক্ষণ বাদে বাক্সের গায়ে ও ধূমকণার পরস্পরের গায়ে লাগিয়া বিনষ্ট হয়, কিন্তু হেলম্হোলট্জ ইতিপূর্ব্বে গণিয়া বলিয়াছিলেন যে যদি কোনও ঘর্ষণশূন্য (Frictionless) পদার্থে এরূপ আবর্ত্ত বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে সেগুলা কখনও বিনষ্ট হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে এরূপ Frictionless mediumএ

কোনও নূতন ঘূর্ণী প্রস্তুত করা অসম্ভব। অর্থাৎ যদি কোনও ঘূর্ণী বা আবর্ত্ত থাকে তাহা হইলে তাহা চিরকাল থাকিবে ও যদি না থাকে তাহা হইলে কেহ প্রস্তুত করিতে পারিবে না। কেলভিন যখন টেট সাহেবের পরীক্ষা দেখেন তখন তাঁহার মনে এই গণনার কথা বিলক্ষণ জাগরূক ছিল। তিনি পরীক্ষা দেখিয়া বলিলেন, তবেই ত! ঠিক হইয়াছে। জড় পদার্থও অবিনশ্বর—ইহা কেহ ধ্বংসও করিতে পারে না, কেহ প্রস্তুতও করিতে পারে না; জড় পদার্থ আর কিছুই নয়, ইহা ইথরের ঘূর্ণী বা আবর্ত্ত মাত্র। ইথর Frictionless অঘৃষ্টব্য, সুতরাং ইহাতে যে-কয়েকটা আবর্ত্ত আছে তাহা অবিনশ্বর। আবার আমরা যেমন আবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে পারি না, সেইরূপ জড় পদার্থও সৃষ্টি করিতে পারি না।

নানা প্রকারের আবর্ত্ত।
[illegible]
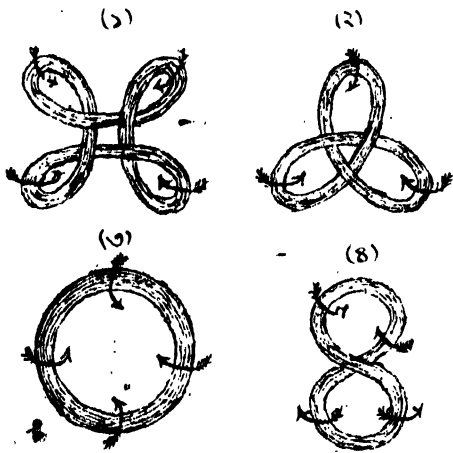
আবর্ত্ত নানা রকমের হইতে পারে। একটা একটা মূল পদার্থের একএকরূপ আবর্ত্ত। আবর্ত্ত নানা রকমের কিরূপ হইতে পারে তাহার চিত্র দেওয়া গেল। আবার দুই তিনটা আবর্ত্ত জড়াজড়ি করিয়া অণু বা দ্ব্যণুর সৃষ্টি করে। এই আবর্ত্তগুলা পরস্পরকে আকর্ষণ করে ও মাধ্যাকর্ষণের মূল এইখানেই।

এই মতবাদই যে জড়ের উৎপত্তির চরম কারণ তাহা অবশ্য কেলভিন জোর করিয়া বলিতে পারেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে ইহা আমার একটি স্বপ্ন বা খেয়াল মাত্র। কিন্তু এই স্বপ্ন গণিতের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ও ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আমরা বিজ্ঞানের একটি মহান্ সত্যের মূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

পূজার-ছুটি

(গল্প)

হরিহরপুরের জমাদারদের ছোট তরফের গৃহিণী নৃত্যকালী যখন পালিতা কন্যার বিবাহের পাত্রানুসন্ধানে বৎসরাবধি বিবিধ চেষ্টার পরও বার বার নিরাশ হইয়া দিন দিন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, সেই সময় একদিন প্রভাতে সহসা বাড়ীর পুরোহিত হীরেন্দ্রভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া সহাস্যমুখে সংবাদ দিলেন "মা! একটা সুসংবাদ আছে। কিরণের জন্যে একটি সুপাত্রের সন্ধান পেয়েছি।"

গৃহিণী আশাপূর্ণহৃদয়ে উৎসুকনেত্রে ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের কথার অবশিষ্ট অংশ শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্যমহাশয় তখন সবিস্তারে যাহা বলিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

গতকল্য তাঁহার কোন প্রয়োজনে তিনি গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসিত হইয়া পুষ্করিণীতটে গিয়া একটি অচেনা যুবককে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে দেখেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারেন যে উক্ত গ্রামের বাঁড়ুয্যেরা তাহাদের মেয়ের সহিত বিবাহ দিবার জন্য ছেলেটিকে কলিকাতা হইতে আনিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মেয়েটি কালো বলিয়া যুবকের বিবাহে ইচ্ছা নাই। শীঘ্রই সে ফিরিয়া যাইবে। তখন তিনি কিরণের কথা তাহাকে বলায় সে মেয়েটিকে আগে দেখিতে চাহিয়াছে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—ছেলেটি দেখতে কেমন? কত বয়স হবে?

ভট্টাচার্য্য অতি উৎসাহের সহিত বলিলেন—মা! আমি আজ বিকালে তাকে এখানে আনব। তুমি মেয়ে দেখাবার জোগাড় করে রাখ। সে এলেই দেখতে পাবে, আমি তোমার কেমন জামাই আনছি।

গৃহিণী বলিলেন—কিন্তু বাঁড়ুয্যেরা তাকে ঘরজামাই করে রাখতে এনেছিল। আমাদের এখন যে-রকম অবস্থা তাতে আমি তার সকল ভার ত নিতে পারব না, সেটা ত ভেবেছেন?

ভট্টাচার্য্যমহাশয় তাঁহার শিখাসমেত মস্তকটি আন্দোলন করিতে করিতে বলিলেন—মা! তুমি আমাকে কি এতই বোকা ঠাওরেছ নাকি? আমি সে-সব বিষয় না ঠিক করে কি মেয়ে দেখাবার কথা দিয়েছি? আমি তাকে স্পষ্টই বলেছি যে আমরা ঘরজামাই রাখতে পারব না। নিজেকে নিজের উপায় করে নিতে হবে। তবে তুমি যেমন পিতৃমাতৃহীন—তেমনি এখানেই চিরকাল থাকবে, আমরাই তোমাদের দেখাশোনা করব এবং পরে সুবিধামত তোমায় বাড়ীঘর করে দেবো এই পর্য্যন্ত। সে তাতে রাজী আছে।

এইবার গৃহিণীর মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথামত ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

২

যেদিন একমাত্র নরেন্দ্রকে লইয়া ১৭ বৎসর বয়সে নৃত্যকালী বিধবা হইয়াছিলেন সে আজ আঠার বৎসর পূর্ব্বের কথা। নরেন তখন এক বৎসরের। তখন তাঁহাদের একান্নবর্ত্তী সংসার ছিল। কিরণের পিতাই সংসারের ও সম্পত্তির সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন ও পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে পরমস্নেহে প্রতিপালন করিতেছিলেন। নরেনের জন্মের ৫ বৎসর পরে কিরণের জন্ম। তাহাকে ১০ দিনের রাখিয়া সূতিকাগৃহেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়। তদবধি কিরণ কাকিমার স্নেহের ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছে, তাঁহাকেই মা বলিয়া ডাকে। বড়বাবু দ্বিতীয়বার কলিকাতায় বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের পর হইতেই তাঁহার বিবিধ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এখন তিনি প্রায়ই কলিকাতাতেই থাকেন, মধ্যে মধ্যে ২।৪ দিনের জন্য গ্রামে আসেন। ক্রমশ তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের সন্তানাদি হইতে লাগিল। নরেন ও কিরণের প্রতি স্নেহের মাত্রা দিন দিন কমিতে লাগিল। বড়বাবু দুএক বার তাঁহার স্ত্রীকে স্বীয় গ্রামে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নী কিছুতেই আসেন নাই। তিনি বলিলেন—বাবা! ঐ বনজঙ্গল—ওখানে বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে, ও জায়গায় কি কোন ভদ্রলোকে থাকতে পারে? আমি বিয়ের আটদিনেই শ্বশুরবাড়ীর যে পরিচয় পেয়েছি তাতে আর জীবনে সে-মুখো হব না। তার উপর আবার ম্যালেরিয়া আছে! আমার এই কচি বাছাদের সেইখানে নিয়ে গিয়ে যমের মুখে তুলে দি আর কি!"

যত দিন যাইতে লাগিল গ্রামের লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল বড়বাবু নরেনকে পথে বসাইবার মতলবে আছেন। বিষয়ের আয় সমস্ত লইয়া কলিকাতায় স্ত্রীর গহনা ও কোম্পানীর কাগজ হইতেছে, আর-সমুদয় খরচের জন্য চারিদিকে দেনা করিতেছেন। নৃত্যকালীও এসব কথা শুনিতেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এক বৎসরের পিতৃহীন শিশুকে যিনি বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন তিনি কি কখন তার এমন সর্ব্বনাশ করিতে পারেন? কিন্তু তিনি স্পষ্টই দেখিতেন যে বাড়ীর প্রত্যেক ক্রিয়াকাণ্ড প্রত্যেক অনুষ্ঠান আগে যেমন সমারোহে সম্পন্ন হইত এখন ক্রমশ কমিতে কমিতে তাহা নামমাত্র রীতিরক্ষার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দোল দুর্গোৎসব অতিথিশালা ইত্যাদি প্রত্যেক অনুষ্ঠানের এমন শোচনীয় দশা দেখিয়া নরেন একদিন জেঠামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গম্ভীরমুখে বলিয়াছিলেন—'এখন আমাদের সময় বড় মন্দ যাইতেছে।' নরেন ইহার উপর আর একটি কথা বলিতে সাহস করে নাই। কিরণের বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছিল, নৃত্যকালী বারবার এ বিষয়ে তাহার পিতার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহা বিফল হইত। কিরণ দিন দিন তাহার পিতার মন হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতেছিল।

এইরূপে যখন সকলেরই মনে বড়বাবুর প্রতি অসন্তোষের মাত্রা বাড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদিন সহসা কলিকাতায় বড়বাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন। শোকের তীব্রতা মন্দীভূত হইলে যখন গ্রামের ভদ্রলোকগণ ও উভয় পক্ষের উকীল মোক্তার বিষয়ের অবস্থা দেখিতে গেলেন, তখন দেখা গেল সমস্ত সম্পত্তি ঋণে জড়িত—নগদ টাকা কিছুই নাই, ভাল ভাল পরগণাগুলি সব বন্ধক পড়িয়া আছে, অবস্থা অতি শোচনীয়। কলিকাতা হইতে

বড়বাবুর শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয় যে উকীল আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—বিষয়ের যখন এরূপ অবস্থা, তখন উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে উপস্থিত কিছুদিনের জন্য সমস্ত বিষয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকুক, তিনি বিষয়ের আয় হইতে নির্দ্দিষ্ট যে বৃত্তি দিবেন তাহাতেই এই দুই পক্ষের সংসার চলিবে। আয়ের অবশিষ্ট অংশ হইতে ঋণ পরিশোধ হইবে। পরে যখন বিষয় ঋণমুক্ত হইবে, তখন বড়বাবুর পুত্রগণ ও নরেন্দ্র বিষয় ভাগ করিয়া লইবেন।

নৃত্যকালী এ ব্যবস্থায় কিছুতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন আমি এতদিন নরেন্দ্রকে লইয়া অতি সামান্যভাবে দিন কাটাইয়াছি। আমার অংশের যে আয়—আমাদের উভয়ের সমস্ত খরচপত্র সম্পন্ন হইতে তাহার অর্দ্ধেকও লাগে নাই। আমার একমাত্র সন্তানের ভাত পৈতা পর্য্যন্ত ভাশুর বাড়ীতে দেন নাই, খরচ বেশী হইবে বলিয়া। বিষয়ের উপর এত দেনা হইবার কোন কারণ ছিল না। আমার শ্বশুরের এত নগদ টাকা ছিল তাহার কিছুই দেখিতেছি না। অথচ বিনা কারণে বিষয় দেনায় ডুবিয়া আছে। আমি এ দেনার অংশ লইতে পারিব না। আমার বিষয় হয় ভাগ করিয়া দেওয়া হোক—বড়বাবুর অংশ হইতে দেনা শোধ হইবে, নতুবা যাঁহারা এখন মধ্যস্থ হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা আদালতে আমায় বুঝাইয়া দিবেন কেন এত দেনা হইল।

মধ্যস্থগণ আর একবার তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। নৃত্যকালী বলিলেন, আমি ত মরিতে বসিয়াছি কিন্তু তবু এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া মরিব। আমার ধনবল নাই, লোকবল নাই; আমার সন্তান বালক, কিছুই জানে না—আমার যে পরিণাম কি হইবে তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছি। তবু আমি ইহা নীরবে সহ্য করিব না। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে।

যথাসময়ে উভয়পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। কিন্তু কিরণকে লইয়া নৃত্যকালীর বিপদ হইল। তাহার বয়স ১৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে যায়, বিবাহের কোন সুবিধা হইল না। এ বংশের মেয়েদের কখন বিবাহ দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দেওয়া রীতি নাই, অথচ বড়বাবু কিরণের জন্য টাকাকড়ি কিছুই রাখিয়া যান নাই, নৃত্যকালীর নিজের অবস্থাও এখন মন্দ। এ অবস্থায় কিরূপে পূর্ব্ব প্রথামত সকল ভার লইয়া নিজে কিরণের বিবাহ দেন ইহাই মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। শেষে তিনি এমন একটি পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন, যে চিরকাল তাঁহাদেরই নিকট থাকিবে অথচ একবারে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের উপর নির্ভর না করিয়া নিজে উপার্জ্জন করিতে পারিবে; তাহা হইলে বংশের মানও থাকে অর্থাৎ কিরণ চিরদিন পিতৃগৃহেই থাকে, এবং এখন কিরণের ও তাহার স্বামীর ভার তাঁহাদের বহিতে হয় না। তারপর তাহাদের মোকদ্দমা চুকিয়া গেলে কিরণ তাহার পিতার অংশ হইতে ন্যায়ানুসারে কিছু ত পাইবেই, আর তখন তিনিও সাধ্যানুসারে তাহাকে সাহায্য করিবেন। বৎসরাবধি এরূপ পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে যখন তিনি কিরণের বিবাহের আশা ত্যাগ করিবার উপক্রম করিয়াছেন এমন সময় হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বকথিত সুপাত্রের সন্ধান আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

৩

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিশোরী কিরণের লজ্জারক্ত সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ললিত একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। কন্যাপক্ষ বিবাহের যে যে সর্ত্ত করিলেন সে নির্ব্বিবাদে সমস্ত মানিয়া লইল। এই তরুণ যুবকের অনিন্দ্য সুকুমার রূপ দেখিয়া গৃহিনীর অন্তরেও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হইল। সুতরাং উভয় পক্ষেই বিবাহের আর কোন বাধা রহিল না। হীরেন্দ্রভট্টাচার্য্য শুভদিন দেখিয়া ললিতের সহিত কিরণের বিবাহ দিলেন। গৃহিণী স্নেহে গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া সকলকে বলিলেন—আমাদের যেমন মেয়ে তেমনি জামাই হয়েছে!

বস্তুতঃ এই যুবকটি অল্পদিনের মধ্যেই এই অপরিচিত স্থানের সকলেরই একান্ত প্রিয় হইয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও নৃত্যকালী তাহার বিনয়নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ; নরেন ত তার সঙ্গ একতিল ছাড়িতে চায় না, স্নান আহার বিশ্রাম ভ্রমণ মাছধরা সকল সময়েই ললিতকে সঙ্গে না রাখিলে কিছুতেই তার চলে না। গ্রামের যুবকবৃন্দ এই কলিকাতার ছেলেটির অসাধারণ বাক্পটুতায়, ও মধুর

পানে আকৃষ্ট হইয়া নির্ব্বিবাদে আপনাদের পরাভব মানিয়া লইয়া তাহার একান্ত অনুগত ও ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

একদিন মধ্যাহ্নে আহারের সময় নৃত্যকালী ললিতের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আপনাদের বৈষয়িক দুর্দ্দশার কথা তুলিয়া বলিলেন—বাবা! আমার দরিদ্রের ধন কিরণকে তোমার হাতে দিয়েছি! ওর সুখদুঃখের সকল ভার তোমার। আমি ত তার কিছুই করতে পারলাম না। নিজেই অকূলে ভাসছি। কখনো কূল পাব, কি ছেলেটার হাত ধরে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে, কিছুই ঠিক নেই। যা হবার আমাদের হবে, কিরণকে তুমি দেখো। বাছার মুখ চাইতে সংসারে আর কেউ নেই।

ললিত বলিল—মা! আপনি কিছু ভাববেন না। আমি অল্পবয়সে মা বাপ হারিয়েছি। ভগ্নী ও ভগ্নীপতি এতদিন আমায় মানুষ করেছেন। আমি সংসারী হয়ে আপনাদের সহায় পেয়েছি, আশ্রয় পেয়েছি, এই আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমরা পুরুষমানুষ—নিজের সংসার প্রতিপালনের জন্যে পরমুখাপেক্ষী হতে যাব কেন? আমি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরে যাব, আর একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখব। আদালত হতে আপনাদের ন্যায্য সম্পত্তি ফিরে পান ত ভালই, না হয় ত আমরা দুই ভাইয়ে উপার্জ্জন করব, আপনার কিসের ভাবনা? আপনি মিছে ভেবে শরীর মন খারাপ করবেন না। আপনি আশীর্ব্বাদ করলে নরেন ও আমি নিজেরাই নিজের উপায় করে নিতে পারব।

জামাতার কথা শুনিয়া নৃত্যকালীর দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় খোলা জানালার ধারে বসিয়া ললিত একখানি বই লইয়া অন্যমনস্কভাবে পড়িতেছিল ও কিরণ কাছে বসিয়া পান সাজিতেছিল ও মাঝে মাঝে একদৃষ্টে ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি স্বামীর প্রতি প্রেমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার কাছে ললিত সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সার, তার মুগ্ধদৃষ্টির সমক্ষে ললিত সর্ব্বগুণের আদর্শ। বাড়ীর লোকে যখন শতমুখে ললিতের প্রশংসা করে তখন সেকথা যেন তার কানে অমৃতবর্ষণ করিতে থাকে আর স্বামীর মুখ দেখিয়া দেখিয়া তাহার যেন তৃপ্তি হয় না। যাহাকে দেখিতে এত সাধ, লজ্জার দায়ে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবারও উপায় নাই। যখন সে সামনে থাকে তখন চক্ষু আপনা হইতেই নত হইয়া পড়ে। যখন সে ঘুমাইয়া থাকে বা অন্যদিকে চাহিয়া থাকে সেই অবসরে কিরণ লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাকে দেখিয়া লয়। আজ পাঠনিরত স্বামীর মুখের দিকে যখন সে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে তখন সহসা বই বন্ধ করিয়া ললিত তাহার দিকে চাহিল। চারিচক্ষু মিলিত হইবামাত্র কিরণ লজ্জায় মুখ নত করিল। ললিত হাসিয়া ডাকিল—কিরণ!

সে উত্তর দিল না। ললিত আবার বলিল—কি দেখছিলে বল ত?

কিরণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ললিত বলিল—আঃ! এ সময় পড়তে মোটেই ভাল লাগছে না। কিরণ! কাছে এস।

কিরণ পানসাজা শেষ করিয়া ধীরে ধীরে ডিবাটি লইয়া স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ললিত তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া মৃদু মৃদু গাহিল—

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর আয় লো কাছে আয়!

খোলা জানালা হইতে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ কিরণ ঘরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নীচের বাগান হইতে নানাফুলের মিশ্র সুবাস বাতাসে মিশিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছিল। ললিত কতক্ষণ কিরণের মুখখানি উভয়হস্তে তুলিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—কিরণ! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ঠিক উত্তর দেবে ত?

কিরণ একটু বিস্মিতদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, বলিল—কি কথা?

ললিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—কিরণ! তুমি ত জান আমি নিঃস্ব দরিদ্র, আমার কিছুই নেই। আমি অবশ্য তোমায় সুখী করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করব, কিন্তু মনে কর এখানে তোমরা যে ভাবে আছ যদি এমন ভাবে তোমায় না রাখতে পারি, তা হলে তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে না ত? আজ আমার প্রতি তোমার যে ভাব তখনও ঠিক তেমনি থাকবে ত?

কিরণের প্রফুল্ল মুখখানি তৎক্ষণাৎ ম্লান হইয়া গেল, সে সহসা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

ললিত তাহার হাতদুটি ধরিয়া সস্নেহে বলিল—বল কিরণ! তোমায় যা জিজ্ঞাসা করলাম তার উত্তর দাও।

কিরণ তখন উত্তেজিতস্বরে বলিল—তুমি কি আমাকে এতই নীচ মনে করেছ? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সে কি টাকার জন্য? তুমি আমার স্বামী বলেই তোমাকে ভালবাসি। তুমি ধনবানই হও আর দরিদ্রই হও আমি চিরদিন তোমায় এই ভাবেই পূজা করব। তুমি আমায় যে ভাবে রাখবে আমি তাতেই সুখী হব। কিন্তু যদি—যদি কখনও—এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর সে কিছুই বলিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ললিত ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল—এ কি কিরণ! এ কি ছেলেমানুষী তোমার! আমি একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা করেছি বই ত নয়? ছি! চুপ কর! তোমার চোখে জল দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। চুপ কর।

কিরণ স্বামীর বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি আমায় যত দুঃখেই রাখ না তাতে আমার কোন কষ্ট হবে না, কিন্তু যদি কখনও তোমার স্নেহ হারাই তা হলে আমি আর বাঁচতে পারব না।

আবার সে ললিতের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ললিত সেই সরলা বালিকার এই অকৃত্রিম প্রেমের উচ্ছ্বাসে স্তব্ধ হইয়া গিয়া আপনাকে শত ধিক্কার দিল। ইহাকেই সে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিল? তাহার মুখে কোন সান্ত্বনার কথা আসিল না। সে কেবল গভীর স্নেহের সহিত তাহার বালিকা পত্নীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ রোদনের পর কিরণ একটু শান্ত হইলে ললিত অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে বলিল—কিরণ! রাণী আমার! আমায় মাপ কর! আমি নিষ্ঠুরের মত তোমায় কষ্ট দিয়ে কাঁদিয়েছি। বল আমায় মাপ করলে?

কিরণ উত্তরে কিছু না বলিয়া দুইটি মৃণাল কোমল বাহুতে ললিতের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার মুখের উপর নিজের অশ্রুসজল মুখখানি রাখিল; তখনও তাহার কচি ওষ্ঠাধর দুটি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

৫

যদি এইভাবেই চিরকাল কাটিতে পারিত তাহা হইলে কোন পক্ষেই কিছু অশান্তির কারণ ঘটিত না। কিন্তু জগতে সব বিষয়েরই দুইটা দিক আছে এবং বিপরীত দিকটা সকলের সমান রুচিকর হয় না। ললিতেরও তাহাই হইল। সে সকলকে আশা দিয়াছিল বিস্তর—আর নিজেও মনে করিয়াছিল যে সে অনেক কিছুই করিবে। কিন্তু মানবের চিত্তের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! কার্য্যকালে তাহার দ্বারা কিছুই হইল না। সে কলিকাতার একটি উচ্ছৃঙ্খল যুবক, ধনী আত্মীয়ের বাড়ীতে দশটা আশ্রিতের মধ্যে থাকিয়া অযত্নে উপেক্ষায় কোনরূপে মানুষ হইয়াছে। বিশেষ ভাবে কাহারও নিকট হইতে যত্ন বা আদর পাওয়া তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। এখানে আসিয়া সকলের নিকট হইতে এত অধিক স্নেহ যত্ন পাইয়া ক্রমে তাহার চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। বাড়ীতে যাহাকে কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত না এখানে সে ইতর ভদ্র সর্ব্বসাধারণের নিকট রাজসম্মান পাইতেছে—সে কি যে-সে লোক, জমীদারের জামাতা! দিন দিন সে এত সুখী ও বিলাসী হইয়া পড়িতে লাগিল যে খানসামায় তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া না দিলে তার স্নান হয় না। আঁচাইবার সময় গাড়ু গামছা লইয়া চাকর না দাঁড়াইয়া থাকিলে সে বিরক্ত হয়।

প্রথম প্রথম কলিকাতায় গিয়া চাকরী করার কথা ঘন ঘন তার মনে উঠিত। কিন্তু সেখানে আবার দিদির বাড়ীতে সেই পূর্ব্বমত ভাবে থাকা ও পথে পথে কাজ খুঁজিয়া বেড়ানর দৃশ্যটি মনে উদিত হইলেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত ও ভাবিত সেই ত যাইতেই হইবে—তা আর দুই চারিদিন যাক তখন যাওয়া যাইবে। কিন্তু এমনি তার আলস্যপ্রিয় প্রকৃতি যে এ দুই চারিদিন শেষ হইতে হইতে ক্রমশ ছয় মাস হইয়া গেল কিন্তু তাহার বাহির হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে নরেনের যে মামলা চলিতেছিল তাহাতে প্রতিপক্ষের কথাই ন্যায্য বলিয়া প্রমাণ হইতেছিল। উপর্য্যুপরি দুই

তিনটি মামলায় নরেন হারিল। গ্রামের অনেকেই বিপক্ষদলে যোগ দিয়াছিল! কেবল ২।৪ জন প্রাচীন ধর্ম্মভীরু কর্ম্মচারীর সাহায্যে ও নিজ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে নৃত্যকালী মোকর্দ্দমা করিতেছিলেন। সুতরাং দিন দিন তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছিল। নানা দুঃখে দুশ্চিন্তায় অভাবে নৃত্যকালী চতুর্দ্দিক হইতে জড়াইয়া পড়িয়া দিন দিন উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। নরেন ত পথে দাঁড়াইয়াছে বলিলেই হয়, তার উপর ললিতের আচরণ দেখিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। জামাই মানুষ—জোর করিয়া কিছু বলাও যায় না। সে ত সব দেখিয়া শুনিয়াও বেশ আরামে দিন কাটাইতে পারিতেছে! একে ত পিতৃমাতৃহীন নিঃস্ব দেখিয়াই বিবাহ দিয়াছেন, তাহার উপর নিজের সাহায্য করিবার ক্ষমতাও গেল, ইহার উপর জামাতা যদি বাক্‌সর্ব্বস্ব অলস ও অকর্ম্মণ্য হয় তবে কিরণের দশা কি হইবে।

বিকালে রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া নৃত্যকালী তরকারী কুটিতেছিলেন, কাছে বসিয়া তাঁহার চিরদিনের সুহৃৎ বিনুঠাকুরঝি গল্প করিতেছিলেন।

বিন্দু পল্লীর মজুমদার-বাড়ীর কন্যা, অল্পবয়সে বিধবা হইয়া পিত্রালয়েই বাস করিতেন। যখন নৃত্যকালী একাদশ বর্ষ বয়সে কাঁদিতে কাঁদিতে এই অপরিচিত বৃহৎ পুরীতে নববধূরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে বিন্দুর সহিত তাঁহার সখীত্ববন্ধন দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল। সেই হইতে সুদিনে দুর্দ্দিনে অন্ততঃপক্ষে দিনান্তে একবারও দেখা না হইলে দুইজনেই হাঁফাইয়া উঠিতেন।

বিন্দু বলিতেছিলেন—যেদিন বড়কর্ত্তা দেশের এত মেয়ে থাকতে কলকাতায় বিয়ে করলেন আমরা ত তখন হতেই জানি যে এইবার গাঙ্গুলীদের এতদিনের বনেদী ঘর উচ্ছন্ন যাবার পথ করা হল। যে মেয়ে এতকালের মধ্যে শ্বশুরের ভিটায় একদিনের জন্যে পা দিল না, সে কি কখন শ্বশুরবাড়ীর কদর বোঝে? আমরা ত ছোটবেলা হতে দেখে আসছি বড়কর্ত্তা কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন? সেই মানুষকে কি মন্ত্র দিয়ে কি করেই ফেললে। একদিনের জন্যে মেয়েটার মুখ চাইতে দিলে না, ছেলেটাকে পথে বসালে? ছি! ছি! ছি! একি কম ঘেন্নার কথা?

নৃত্যকালী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—আমি আর কার দোষ দেবো বল ঠাকুরঝি? সবই আমার অদৃষ্টের দোষ। সংসারে এসে একদিনের জন্যে সুখী হতে পারলাম না। ভাশুর মরেও গেলেন, আমাকেও মেরে গেলেন। আমার দুধের বাছা নরু, ভাল মন্দ কিছু জানে না। এই কচি বয়সে তার মাথায় কি ভাবনার বোঝা-ই পড়ল বল দেখি? আজ ৬।৭ মাস সহরে ছোটাছুটি আর উকীল মোক্তারের বাড়ী ঘুরে ঘুরে আর ভাবনা চিন্তায় সে একেবারে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছে। একটা একটা মামলায় হার হচ্ছে আর তার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। বাছার আমার খাওয়ায় রুচি নেই, কোন সাধ আহ্লাদ নেই, অষ্টপ্রহর ভাবনায় কালি হয়ে গেল। ঘোরে ফেরে আর এসে কচি ছেলের মত আমার গলা জড়িয়ে বলে, মা! জেঠামণি আমার কি করে গেলেন? তার মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।

বিন্দুও কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—এ বয়সে লোকের ছেলে নেচে খেলে বেড়ায়, দুঃখের বার্ত্তা জানে না—এই কচি বয়সে বাছার এত দুর্দ্দশা—সবই তোমার কপালের দোষ, তা ছাড়া আর কি বলব?

নৃত্যকালী আবার বলিলেন—আরও দেখ, বিয়ে দিয়ে একটা পরের ছেলে ঘরে নিয়ে এলাম সেও কপালগুণে এমন হল? এই ত আমাদের অবস্থা দেখছে। এখন কোথায় নিজের চেষ্টাচরিত্র নিজে করবে, তা না বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদেরই গলগ্রহ হয়ে বসে আছে। দু পাঁচ দিন কথায় কথায় বলেও দেখেছি, কথায় যেমনটি, কাজে তা কিছুই নয়। মেয়ের ভাগ্যে যে এর পর কি হবে তাও জানি নে।

বিন্দু বলিলেন—দেখ ছোটবৌ! তুমি রাগই কর আর যা কর এ কথাটি আমি তোমার মেনে নিতে পারি নে। তুমি এ বিয়ে দিয়েই অন্যায় করেছ। ও জামাই যদি নিজে রোজগার করে ঘরকন্না করবে মনে করত তা হলে কি কখন বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী ঘরজামাই

হয়ে থাকত আসত? এটা ত তোমরা বুঝলে না? ভাল করে দেখ্‌লে না, শোনা না, পাঁচজনের পরামর্শ নিলে না, হঠাৎ একটা কাজ করে বসলে। সে এখন দিব্য আরামে আছে, কেন কষ্ট করতে যাবে? জানে, মেয়ের জন্যে আমার সকল উৎপাতই এরা সহ্য করবে।

কিরণ এতক্ষণ নীরবে বসিয়া শাক বাছিতেছিল। পিসিমার এই তীব্র সমালোচনা শুনিয়া তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। দুঃখে অভিমানে তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। সে আপনাকে সামলাইবার জন্য শাক বাছা ফেলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

পিসিমা তাহার রকম দেখিয়া অবাক হইয়া গালে হাত দিলেন। গৃহিণীও বিরক্ত হইয়া বলিলেন—মেয়ের রকম দেখছ একবার? আমিই কেবল ওর ভাবনা ভেবে মরছি, ও কি তা বোঝে? ও এখন আর সে কিরণ নেই। জামাইকে একটি কথা বললে মেয়ে একেবারে কেঁদে কেটে অনর্থ করবে।

তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন—আর না হবেই বা কেন? এখন ত আর সে ছেলেমানুষটি নেই—বড় হয়েছে, স্বামী চিনেছে, এখন ওর সামনে তার স্বামীর নিন্দা করলে ত তার কষ্ট হবেই। আমাদেরই এটা অন্যায়।

গৃহিণী মুখে এ কথা বলিলেন বটে কিন্তু কার্য্যতঃ সকল সময় তাহা ঘটিয়া উঠিত না। তিনি মনে মনে জামাতার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন সুতরাং এখন তাহার ছোট বড় সকল ত্রুটিই তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহা তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, এখন সেই-সকল সামান্য বিষয় লইয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ গজগজ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিরণের প্রফুল্ল মুখখানি ক্রমেই মলিন হইতে লাগিল। তবু সে প্রাণপণে ললিতকে এসকল অশান্তির বিষয় জানিতে দিত না। দুই একবার কথা-প্রসঙ্গে সে স্বামীকে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, ললিত তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করে নাই।

সেদিন প্রভাত হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে ও মাঝে মাঝে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। নরেন কলিকাতায় গিয়াছে। জেলাকোর্টে তাহার মোকর্দ্দমা হার হওয়ায় সে তাহার পক্ষীয় উকীলের পরামর্শে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে। এইখানেই তাহার ভাগ্যপরীক্ষা শেষ হইবে।

নৃত্যকালী রন্ধনশালায় রন্ধন করিতেছেন ও কিরণ তাঁহার সাহায্য করিতেছে। অর্থাভাবে একে একে দাস-দাসীদের বিদায় দিতে হইয়াছে। ঝি দুইজন আগেই গিয়াছিল; আজ পুরাতন ভৃত্য রামচরণকে প্রভাতে জবাব দিয়াছেন। তাহার ছয় মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছিল; নৃত্যকালী বহুকষ্টে টাকাগুলি শোধ করিয়া সাশ্রুনেত্রে তাহাকে বলিলেন—"বাবা! এখন আমার সময় বড় মন্দ—তুমি এখন যাও—যদি কখনও দিন আসে তবে আবার তোমায় ডেকে পাঠাব।" ভৃত্যও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছে। ঘোর দারিদ্র্য ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। অভাবের এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া নৃত্যকালীর অন্তর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল। দুইজনের কাহারও মুখে কথা নাই। দুজনে চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে নীরবে আপন আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছিলেন।

ললিত সকালে বেড়াইতে গিয়াছিল। বেলা বারোটার পর সে ফিরিয়া আসিল। প্রতিদিন তাহার ও নরেনের স্নানের যোগাড় করিয়া রাখা ও উভয়কে স্নান করান রামচরণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল। আজ যে সে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ললিত তাহা জানিত না। সে স্নান করিতে গিয়া কিছু প্রস্তুত দেখিতে না পাইয়া বিরক্ত হইয়া রামাকে ডাকিতে লাগিল ও তাহার গাফিলির জন্য অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল। গৃহিণী আজ সকাল হইতেই উত্তপ্ত হইয়া ছিলেন, সহসা তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি রন্ধনশালা হইতেই রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন—তেল মেখে পুকুরে গিয়ে দুটো ডুব দিয়ে এলেই ত হয়! এখানে আর রামা না হলে চান্ হয় না! বোনের বাড়ী কটা চাকর রাতদিন হামেহাল হাজির থাকত?

কিরণ ললিতের সাড়া পাইয়াই তাড়াতাড়ি উপরে যাইতেছিল; এই কথা তাহার কানে যাইবামাত্র সে

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ললিত যদি দ্বিতলের বারান্দা হইতে মার কথা শুনিতে পাইয়া থাকে তাহা হইলে সে কিরূপে আর তার কাছে মুখ দেখাইবে।

ললিত শাশুড়ীর কথা শুনিতে পাইয়াছিল। পূর্ব্বে সে কখনও কখনও ভাবভঙ্গীতে তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছে বটে কিন্তু অদ্যকার এ কঠোর আঘাতের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নৃত্যকালী নীচে আরও অনেক কথাই অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু আর কিছুই তাহার কানে যাইতেছিল না, কেবল তাহার কানে বাজিতেছিল—বোনের বাড়ী কটা চাকর খানসামা হাজির থাকত? সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে যে অতি দীন হীন অপরের গলগ্রহমাত্র একথা এতদিন তাহার স্মরণে ছিল না। কি দারুণ মোহেই আচ্ছন্ন হইয়া ছিল! অপরে কৃপা করিয়া একমুঠি অন্ন তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে আর সে তাহাই আহার করিয়া এই ঘৃণিত জীবন ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছে—জগতের সমক্ষে তাহার পরিচয় এই! ভাবিতে ভাবিতে তাহার মস্তক হইতে অগ্নি ছুটিতে লাগিল! যে এত ঘৃণিত, এত হীন, সে আবার পরের ভৃত্যের সেবা পাইতে বিলম্ব হইলে তাহাকে শাসন করিতে যায়! এ অপমান তাহার উপযুক্তই হইয়াছে! কাহারও দোষ নাই, তাহার নিজেরই সব দোষ। তাহার মধ্যে যে পুরুষত্বের অভিমান সুপ্তভাবে ছিল তাহা এই কষাঘাতে আজ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে! ললিত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যদি কখনও নিজের স্থান করিয়া স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারি তবেই আবার এ মুখ দেখাইব, নতুবা এই পর্য্যন্তই শেষ! এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র ললিত তীরবেগে ছুটিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে কিরণ দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পথ আগলাইয়া পড়িল ও কাঁদিয়া বলিল—আমার মাথা খাও, রাগ কোরো না! মায়ের কি মাথার ঠিক আছে? মা যেন দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছেন! মাপ কর, রাগ কোরো না! রামা নেই; আমি তোমার নাইবার জল তুলে এনে দিচ্ছি, লক্ষ্মীটি নাইবে চল।

কিন্তু ললিতের তখন ঘোর অপমানের উত্তেজনায় মাথার স্থিরতা ছিল না। সে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—কিরণ! যদি কখন মানুষ হতে পারি ত আবার দেখা হবে, নয় ত এই পর্য্যন্তই শেষ হল। তোমার অযোগ্য স্বামীকে ভুলে যাও!

কথা শেষ হইতে-না-হইতে ললিত চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

৫

দিন কাহারও জন্য আটকাইয়া থাকে না। নৃত্যকালীর সংসার ললিত চলিয়া যাওয়ার পরও চলিতেছে বটে কিন্তু কিরণ বুঝি থাকে না। যেদিন দ্বিপহরে সেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় ললিত চলিয়া গিয়াছে সেই হইতে সে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কেহ ডাকিলে কথা কয় না, স্নানাহারে রুচি নাই, লক্ষ্যহীন উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে এক একবার চাহে আর স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া থাকে। সেদিন যখন ললিতের রাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, নৃত্যকালী তাহার ৪।৫ জন প্রজাকে দিকে দিকে জামাতাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ছুটাইয়া পাঠাইয়া দিলেন ও উপরে গিয়া মূর্চ্ছিত কিরণকে বহু যত্নে সুস্থ করিলেন; সেই দিন কেবল সে একবার কথা কহিয়াছিল। যখন সকলে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল কোথাও জামাই বাবুকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, সেই সময় সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া নৃত্যকালীর গলা জড়াইয়া বলিয়াছিল—তিনি রাগ করে চলে গেছেন, মা! আর ফিরে আসবেন না। মা! কি হবে?

নৃত্যকালী তখন তাহাকে সান্ত্বনা করিবেন কি, আপনি উচ্চস্বরে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে কিরণ একবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কি সে মনে মনে ভাবে কাহাকেও কিছু বলে না, দিন দিন যেন ছায়ার মত বিছানায় মিশাইয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে ত্রিতলের ছাদে গিয়া দূর পথের শেষের দিকে চাহিয়া আপন মনে দাঁড়াইয়া থাকে। সে যদিও কাহাকে কিছু বলে না, তবু নৃত্যকালী বুঝিতে পারেন যে প্রতিদিনে প্রতিমুহূর্ত্তে সে যেন কাহার একটি কথার বা একটু সংবাদের জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ হইয়া আছে। তিনি তাহার অবস্থা দেখেন আর আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদেন—আহা বাছারে!

তোকে কিনা অবশেষে আমি হাতে করে মেরে ফেললাম। আহা, সে যে তাঁর কত যত্নের কত আদরের ধন! সে যে বড় দুঃখী! অজ্ঞানে মা হারাইয়াছে, বাপ থাকিতেও কখন একদিনের জন্য বাপের স্নেহ জানে না, কখন কাহারও কাছে আদর যত্ন পায় নাই, স্বামীর স্নেহ ও ভালবাসায় সে দুই দিনের জন্য সুখী হইয়াছিল, ক্রোধের বশে তিনি তাহার একি সর্ব্বনাশ করিলেন? আবার ললিতের উদ্দেশ্যেও তিনি প্রতিসন্ধ্যায় দেবমন্দিরে মাথা কুটিয়া আসেন—ওরে নিষ্ঠুর! ওরে পাষাণ! যে তোর জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছে একবার আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যা! আমার উপরে না হয় তুই রাগ করিতে পারিস, কিন্তু এমুখ কি করিয়া ভুলিলি?

চারিদিকে ললিতের অনেক অনুসন্ধান হইল; কলিকাতায় চারিদিকে, তাহার ভগ্নীর বাড়ীতে, কোথাও তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না। গ্রামের যে প্রবীণ কবিরাজ কিরণের চিকিৎসা করিতেছিলেন তিনি নৃত্যকালীকে বলিলেন—মা! আমি ঔষধ দিতেছি বটে কিন্তু ইহা মানসিক ব্যাধি, ঔষধে কিছু হইবে না। যদি শীঘ্র আপনার জামাতার সন্ধান না পাওয়া যায় তবে ইহার জীবনসংশয়। ইহার জীবনশক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতেছে।

নৃত্যকালীর সংসার বিন্দুঠাকুরঝি দেখিতেন, নৃত্যকালী কিরণকে লইয়া উপরে পড়িয়া থাকিতেন। তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দিন দিন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। এই পরিবার যখন এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে রোগ শোক অভাব দুঃখের ভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তখন একদিন সহসা দেবতার আশীর্ব্বাদের মত সুসংবাদ লইয়া হাসিমুখে নরেন আসিয়া বলিল—মা! হাইকোর্টের মামলায় আমাদের জিৎ হয়েছে! জজসাহেব বলেছেন—বলিতে বলিতে কিরণের শীর্ণ ম্লানমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে অবাক হইয়া বলিল—একি মা? বোনটির কি হয়েছে?

যে মামলার ফলাফলের উপর তাঁহাদের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছিল তাহাতে জয়ী হইয়াছেন শুনিয়া আজ নৃত্যকালীর আহ্লাদ হইল না। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন—ওরে নরেন, তোর যা কিছু আছে সব ললিতকে লিখে দেবো, তুই তাকে ফিরে আন্! তার জন্যে আমার সব যেতে বসেছে!

নরেন যখন একে একে সব কথা শুনিল, তখন তার চোখ দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে কিরণের কাছে আসিয়া ডাকিল—বোনটি!

কিরণ মুখ তুলিয়া চাহিল—তার মাথাটি ঘুরিয়া গিয়া নরেনের বুকে পড়িল। দাদার স্নেহের কোলে মুখ লুকাইয়া কিরণ বহুদিন পরে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। নরেন নিজের চোখ মুছিতে মুছিতে তাহাকে বলিল—তুই কিছু ভাবিসনে বোনটি! আমি যখন এসেছি তখন তোর কোন ভাবনা নেই। আমি আবার শীঘ্র কলিকাতায় যাব। যেখানেই থাকুক তাকে খুঁজে বের করে সঙ্গে নিয়ে তবে বাড়ী আসব। সে কতদিন লুকিয়ে থাকবে?

তিনচার দিন পরে একদিন বিকালে কিরণ নিজের ঘরে জানলার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় হাসিতে হাসিতে নরেন আসিয়া বলিল—বল দেখি বোনটি! আজ কি এনেছি?

কিরণ কিছু না বলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে দাদার বদ্ধমুষ্টির দিকে চাহিয়া রহিল। কোন বিষয় জানিতে বা কথা কহিতে তাহার কোন কৌতূহল বা উৎসাহ ছিল না। তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া নরেন হাসিয়া বলিল—বলতে পারলিনে? আচ্ছা আমি বলছি—বলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিল—ললিত খবর দিয়েছে—তোকে চিঠি লিখেছে। আমি ত বলেছিলাম কতদিন সে লুকিয়ে থাকবে? কিন্তু তুই এমনি ছেলেমানুষ, দেখদেখি ভেবে কি হয়ে গেছিস?—বলিয়া গভীর স্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া কোলের উপর চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়া নরেন বাহির হইয়া গেল।

কিরণের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া গেল। কতক্ষণ সে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় জানালা ধরিয়া ঝুঁকিয়া রহিল। এও কি আবার সম্ভব? যাহার আজ ছয় মাসের মধ্যে কোন সংবাদ না পাইয়া সে একেবারে আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল, আজ তাহারই সংবাদ আসিয়াছে! তবে ত তিনি কিরণকে একদিনের

জন্যও ভোলেন নাই? মৃদু মৃদু বাতাসে তাহার অবসন্ন দেহ একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সে কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠিখানা খুলিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

মির্জ্জাপুর

আমার কিরণ! আজ কতদিন পরে তোমায় চিঠি লিখছি। যেদিন দুর্জ্জয় অভিমানের বশে তোমায় ফেলে চলে এসেছিলাম তার পরে কতদিন কেটে গেছে। আমি কিন্তু একদিনের জন্য তোমার সেই কাতর মুখখানি ভুলতে পারিনি। জানি আমি আমার সংবাদ না পেয়ে তুমিও যে কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছ! কিন্তু আজ সেসব কথার দিন নয়। যেদিন আবার আমরা দুজনে মিলব সেই দিন দুজনেই পরস্পরের কথা বলব ও শুনব। আর সে দিনটির যে বেশী দেরী নেই সে কথা মনে করেও আমার অন্তর আনন্দে নৃত্য করছে।

সেদিন আমি অকূলে ভেসেছিলাম; ভগবানের কৃপায় কূল পেয়েছি। যাত্রাকালে তোমার মুখ দেখেছিলাম তাই যাত্রা শুভ হয়েছিল। আমার কোন কষ্ট হয় নি। আমি প্রথমে কলিকাতাতেই আসছিলাম। ঘটনাক্রমে গাড়ীতে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। কথায় কথায় তিনি বললেন, মির্জাপুরে তাঁর বৃহৎ কারবার; কলিকাতাতে ও অন্যান্য স্থানে শাখা আছে। তিনি নিজে মির্জাপুরে থাকেন ও মাঝে মাঝে আরসব স্থানে গিয়ে তত্ত্বাবধান করে আসেন। মির্জাপুরে তাঁর একটি ইংরেজী-জানা লোকের দরকার। সাহেব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা ও ইংরেজীতে চিঠিপত্র লেখা, এইসব কাজের জন্য তিনি উপস্থিত ১৫০৲ টাকা বেতন দিতে ও বাড়ী দিতে সম্মত আছেন। আমায় তিনি বললেন যে এই কাজটি করতে পারে এমন কোন লোক আপনার সন্ধানে আছে কি? আমি বললাম লোক নেই বটে, তবে আমি নিজে করতে প্রস্তুত আছি। তারপরে তার সঙ্গে এই সুদূর পশ্চিমে চলে এসেছি।

তুমি হয়ত এইবার রাগ করে বলবে তবে এতদিন কেন সংবাদ দাওনি? কেন দিইনি তা লিখছি। তোমার বোধ হয় মনে আছে একদিন সন্ধ্যার সময় মা বিন্দুপিসিমার কাছে দুঃখ করছিলেন যে এমন দুঃসময়ে বিবাহ দিলাম যে আমার কিরণকে একখানি গহনা দিতে পারলাম না। সেই কথা মনে পড়ায় আমি এ ছয়মাস অপেক্ষা করে বেতনের টাকা জমিয়ে দিদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি সেখান থেকে নূতন ফ্যাসানের গহনা গড়িয়ে তোমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের হাতে এবারে গিয়ে তোমায় সাজাব, সাধ আছে। এই সাধটুকুর জন্যে এতদিন এত কষ্ট সহ্য করেছি। এক এক সময় মনে হত আমি কি নিষ্ঠুর—যে আমাগতপ্রাণা সরলা আমি ভিন্ন জানে না, তাকে আমি বিনাদোষে কি যাতনাই দিচ্ছি। কতদিন তোমার মুখ মনে পড়ে নির্জ্জন ছাতে একলা বসে কত যে কেঁদেছি তা আর কি বলব। আমার কিরণ! এইবার আমাদের সব দুঃখের অবসান হয়েছে। বৈশাখ মাসে এসেছি—আজ আশ্বিন মাস পড়ল। আর ১৫ দিন পরে আমার পূজার ছুটি পড়বে। এই ছুটিতে গিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে আসব। তার পর থেকে আমাদের বাধাহীন মিলনের পথে আর কোন অন্তরায় থাকবে না।

এখানে আমি যে বাড়ীটি পেয়েছি যদিও ছোট কিন্তু বড় সুন্দর; চারিদিকে বাগান, মাঝে লতাপাতা-ঘেরা ছবিটির মত বাড়ীখানি। আমি মনের মত করে বাড়ীখানি সাজিয়েছি। আর আমাদের নূতন সংসারের সব গুছিয়ে রেখেছি। এখন কেবল দিন গুণছি কবে আমার হৃদয়ের রাণীকে আমার এ গৃহস্থালীর মধ্যে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করতে দেখব। আমার জীবনের ধ্রুবতারা তুমি—তোমার বিহনে আমার এসব সজ্জা অঙ্গহীন অশোভন হয়ে রয়েছে—এস আমার লক্ষ্মী—তোমার মঙ্গল চরণস্পর্শে আমার এ শূন্য গৃহ পূর্ণ হয়ে যাক!

মাকে আমার প্রণাম জানিও। তাঁর আশীর্ব্বাদেই আমি আমার কল্যাণের পথ খুঁজে পেয়েছি। নরেনের কি খবর? তার মোকর্দ্দমার কি হল? তুমি আমার অন্তরের ভালবাসা জানবে। আজ তবে আসি। আর ১৫ দিন পরে আবার আমাদের দেখা হবে। ইতি—

তোমার ললিত।

দেখিতে দেখিতে এ শুভসংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। গৃহিণী হাসিয়া কাঁদিয়া গ্রামের প্রত্যেক দেব-

মন্দিরে নানা উপচারে পূজা পাঠাইয়া দিলেন। গ্রামের লোক এ খবর ভাল করিয়া জানিবার জন্য জমীদারবাড়ীতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু কিরণের রুগ্ন শরীরে অপ্রত্যাশিত আনন্দের কোপ সহ্য হইল না। রাত্রি হইতে তাহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। শেষ রাত্রে অতিশয় কম্প দিয়া প্রবল জ্বরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কবিরাজ নাড়ী দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন, বলিলেন এ জ্বরত্যাগের সময় কি হয় বলা যায় না। নরেনকে বলিলেন—তুমি ত ললিতের ঠিকানা পাইয়াছ, তাহাকে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দাও, যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তবে যেন সংবাদ পাইবামাত্র চলিয়া আসে। নরেন বালকমাত্র—পূর্ব্বদিন ললিতের চিঠি দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে ভাবিয়াছিল এইবার তাহাদের সমস্ত কষ্ট ও উদ্বেগ দূর হইল, আজ এই নির্ঘাত কথা শুনিয়া সে একবারে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল, পরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল —কবিরাজ মশায়! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি ও কথা বলবেন না, আমার বোনটিকে বাঁচান।

দুইদিন অচেতন থাকিবার পর তৃতীয় দিনে কিরণের জ্ঞান হইল। সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নরেন ও কবিরাজ মহাশয় তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। নৃত্যকালীর উচ্চক্রন্দন ও নানাছন্দের বিলাপ কোনমতে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বিন্দু তাঁহাকে কিরণের ঘর হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়াছিলেন। কিরণ কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া নরেনকে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল—দাদা!

নরেন কাছে আসিয়া বলিল—কেন বোনটি?

"দাদা! পুজোর ছুটি হয়েছে কি?"

নরেন চোখ মুছিয়া বলিল—হয়েছে বই কি বোনটি! ললিত এল বলে!

কিরণ আর কথা বলিল না। শান্তির গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

এই সময় উদ্দাম ঝড়ের মত ছুটিয়া ললিত ঘরে প্রবেশ করিল। বারাণ্ডায় তাহাকে দেখিয়া গৃহিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—ওরে! এমনি করেই কি মেরে ফেলতে হয়রে? আমার সোনার প্রতিমা কিরণ—

বিন্দু তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

ললিত কোনদিকে না চাহিয়া পাগলের মত ডাকিল—কিরণ! কিরণ!

তাহার উদ্‌ভ্রান্ত বিকৃত কণ্ঠস্বর কক্ষময় প্রতিধ্বনিত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। কিরণের তখন পূজার ছুটি হইয়া গেছে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

যাকে রাখ সেই রাখে?

সেদিন হাটবার। গঞ্জের সমস্ত পথই কৃষক পুরুষ ও রমণীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

পুরুষেরা দৃঢ় পাদবিক্ষেপে দেহের সমস্ত ভারটা সম্মুখ ভাগে দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলা বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছিল। ক্রমাগত লাঙ্গল চালনা করিয়া তাহাদের কোমর বাঁকিয়া গিয়াছিল এবং বাম স্কন্ধে একটা মাংসপিণ্ড উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। শস্য কর্ত্তন করিয়া জানুর কাছটা ধনুকের আকার ধারণ করিয়াছিল। এইরূপ আরও কত কি কাজের জন্য তাহাদের সমস্ত শরীরটাই একরূপ বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের শরীর বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছিল তাহাদের চর্ম্মের মত মলিন, তৈল-চিক্কণ জামাগুলা। তাহাদের দেখিলেই মনে হইতেছিল যেন হস্ত-পদ ও-মস্তক-সমন্বিত একটি ব্যোমযান উড্ডায়নের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে!

কেহ কেহ গাভী বা গোবৎস লইয়া যাইতেছিল এবং তাহাদের পত্নীগণ সপত্র বৃক্ষশাখা হস্তে পশ্চাৎ হইতে তাহাদের তাড়না করিতেছিল।

অধিকাংশ রমণী কাঁধে ঝোড়া লইয়া যাইতেছিল; তাহার মধ্য হইতে হাঁস বা মোরগ মধ্যে মধ্যে মাথা তুলিতেছিল। পুরুষদিগের সহিত তাহারা সমানে পথ চলিতে পারিতেছিল না। গায়ে তাহাদের রং বেরঙের রঙিন কাপড়, মাথায় বেসাত।

তাহাদের পশ্চাতে একখানি গোরুর গাড়ী তাহার

শ্রুতিমধুর চক্রনিক্বণে সারা পথটা প্রতিধ্বনিত করিয়া দুইজন পুরুষ ও একটি রমণীকে লইয়া ঢিকাইয়া ঢিকাইয়া আসিতেছিল। রমণীটি বসিয়াছিল গাড়ীর পশ্চাতে; পড়িয়া যাইবার ভয়ে সে প্রাণপণে গাড়ীর পাশি দুইটা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া ছিল।

গঞ্জের হাটে বিষম জনসঙ্ঘ জমিয়া মানুষ ও পশুর মিলিত কলরবে স্থানটা পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। গরুর শিং, কৃষকের মাথার টোকা এবং রমণীদের বিচিত্র রঙের কাপড়ের ঘোমটা ঢেউয়ের মাথায় ফেনপুঞ্জের মতন সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।

পশুর খোঁয়াড়ের গন্ধ, দুগ্ধ ও ছানার গন্ধ এবং শুষ্ক ঘাস, মিষ্টান্ন ও কৃষকের গায়ের গন্ধ একত্রিত হইয়া সে এক বিশ্রীগন্ধে স্থানটা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

হরিচরণের বাড়ী ছিল বড়গাঁয়; সেও সেদিন এই হাটে আসিতেছিল; আসিতে আসিতে দেখিতে পাইল পথের উপর এক টুকরা দড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। বণিকসুলভ মিতব্যয়ী হরিচরণ ভাবিল—যাকে রাখ সেই রাখে; এটা কুড়াইয়া লইলে এক সময়ে কাজে লাগিতে পারে। বাতে তাহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল, তবুও অতিকষ্টে লাঠির উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া দড়ির টুকরাটি তুলিয়া লইল। তাহার পর সেটি সযত্নে গুটাইয়া রাখিতে রাখিতে সে মুখ তুলিয়া দেখিল খাবারের-দোকানওয়ালা হালুইকর মধু সা আপনার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে কি একটা সামান্য বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে একটু মনোমালিন্য হয়, সেই হইতেই উভয়ের মধ্যে একটা বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। শত্রু যে তাহাকে দড়িটা কুড়াইতে দেখিয়াছে এই কথা মনে হইবামাত্র হরিচরণের মনে একটু লজ্জা হইল। তাড়াতাড়ি সে সেটা হাতের মুঠার মধ্যে পুরিয়া ফেলিয়া কি যেন কি একটা হারাইয়া গিয়াছে এমনিভাবে পথের দিকে দেখিতে লাগিল; অবশেষে সে যেন হারানো দ্রব্যটা পাইল না, এমনি ভাবে সে স্থান ত্যাগ করিল, এবং মুখটি তুলিয়া দেহখানি বাঁকাইয়া হাটের দিকে অগ্রসর হইল।

ধীরপদচারী কোলাহলময় জনসঙ্ঘে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে আপনাকে মিশাইয়া ফেলিল। হাটের লোকগুলা তখন দরদস্তুর করিতে ব্যস্ত। কৃষকগণ গাভী পরীক্ষা করিতেছিল ও সঙ্গীদের কাছ হইতে হারাইয়া যাইবার ভয়ে চকিত চক্ষে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছিল। বিক্রেতাগণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিয়া তাহাদিগের বুদ্ধির বহর জানিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

রমণীগণ ক্রোড়ের নিকট ঝোড়া রাখিয়া বদ্ধপদ মোরগগুলা বাহিরে সাজাইয়া বিক্রয়ের আশায় বসিয়া ছিল। বেচারা মোরগগুলা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভয়বিহ্বল চক্ষে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

রমণীগণ অবিকৃত মুখে খরিদদারের দর শুনিয়া আপনাদের মুখ বাঁকাইয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেছিল; কিন্তু যখন দেখিতেছিল তাহাদের দর শুনিয়া খরিদদার চলিয়া যায় তখন উচ্চরবে ডাকিতে আরম্ভ করিতেছিল—"ওগো ও বাছা—ওগো—ওগো—নে যাও, নে যাও—আর দুটো পয়সা ধ'রে দিও।"

ক্রমে হাট জনশূন্য হইতে আরম্ভ করিল। এদিকে পেটা ঘড়িতে দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা পড়িল; বিদেশী ব্যাপারীরা আহারের অন্বেষণে দলে দলে মধু সার মিঠাইয়ের দোকানে প্রবেশ করিতে লাগিল।

মধু সার দোকানের উঠানটা নানারূপ শকটে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তাহার দোকান-ঘরেও তেমনি ভাবে সমাগত অতিথির দল জোটপাকাইয়া বসিয়া ছিল।

ভিয়ান-চড়ানো সুবৃহৎ চুল্লী হইতে বিকীর্ণ উত্তাপে আগন্তুকদিগের শীত নিবারণ হইতেছিল। তিন জন ভৃত্য নানাবিধ আহার্য্য লইয়া পরিবেষণ করিতেছিল; আগন্তুকগণ সেই সুখাদ্য দর্শনে প্রাণে একটা তৃপ্তির ভাব অনুভব করিতেছিল; তাহার সুগন্ধেই তাহাদিগের রসনা যে মোটেই লালাসিক্ত হইয়া উঠে নাই এমন কথাও বলা যায় না।

হাটের যাবতীয় কৃষক মধু সার বাঁধা খরিদদার ছিল। লোকটা নাকি বড়ই অমায়িক ও চতুর।

ঠোঙার পর ঠোঙা খাবার শেষ হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটীর পর ঘটী জলও ঢকঢক শব্দ করিয়া উঠিয়া যাইতেছিল। সকলেই আপন আপন খরিদ বিক্রয়ের গল্প করিতেছিল।

অকস্মাৎ প্রাঙ্গণে ঢোল বাজিয়া উঠিল।

মুখে একমুখ খাবার পুরিয়া বাম হস্তে খাবারের ঠোঙা ধরিয়া অনেকেই দ্বার এবং জানালার নিকট ছুটিয়া ব্যাপারটা কি দেখিতে গেল,—বসিয়া রহিল কেবল কয়েকটা বাদসা-কুড়ে, নড়িয়া বসাও যাহাদের পক্ষে কষ্টকর!

ঢোলের বাজনা থামিলে গ্রাম্য চৌকীদার তাহার স্বাভাবিক রাসভনিন্দিত কণ্ঠে, বিকট উচ্চারণভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল,—

"ভাই রে! আজকে এই হাটে দেশী বিদেশী যে কেউ আছ সবাইকে জানান যাচ্ছে যে আজকে বেলা নটা থেকে দশটার মধ্যে বড়গাঁ থেকে গঞ্জে আসবার পথে একটা কাল চামড়ার মনিব্যাগ হারিয়েছে, তাতে পাঁচশ টাকার নোট ছিল, আর খানকতক দরকারী কাগজ ছিল। এখানে যদি কেউ পেয়ে থাক তবে এখুনি থানায় গিয়ে দারোগা সাহেবকে ফিরিয়ে দিলে বিশ টাকা বকসিস মিলবে।"

লোকটা চলিয়া গেল। ঢোলের শব্দ ক্রমে দুর হইতে দুরতর প্রদেশে মিলাইয়া গেল।

লোকগুলা এইবার নব উৎসাহে এই বিষয়ে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। দারোগা সাহেবের ব্যাগটি ফেরৎ পাইবার আশা যে কত অল্প সে বিষয়ে মত প্রকাশ করিতেও তাহারা ক্ষান্ত হইল না।

ক্রমে আহার সমাপ্তপ্রায় হইয়া আসিল। ভোজন শেষ করিয়া সকলে যখন দাম চুকাইবার জন্য গেঁজের গেরো আলগা করিয়াছে ঠিক সেই সময়ে হেড কনেষ্টবল দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উদিত হইল।

"বড়গাঁর হরিচরণ নামে এখানে কেউ আছে কি?"

হরিচরণ দোকানের একপ্রান্তে বসিয়া কচুরী চিবাইতেছিল; সেইস্থান হইতে সে বলিয়া উঠিল,—"আজ্ঞে আছি বই কি, এই যে!"

পুলিশ-কর্ম্মচারী বলিল,—"হরিচরণ, তোমাকে একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। দারোগা সাহেব তোমাকে সেলাম দিয়েছেন।"

মনে তাহার একটু চাঞ্চল্যের ভাব জাগিয়া উঠিল, একটু বিরক্তিও যে না জাগিয়া উঠিয়াছিল এমন কথা বলা যায় না; বেতোরোগী বসিবার পর উঠিতে গেলে বড়ই কষ্ট অনুভব করে—হরিচরণ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বক্রদেহে উঠিয়া পড়িল, অভুক্ত খাবারের ঠোঙা হাত হইতে মাটিতে খসিয়া পড়িয়া গেল। ঈষদমুচ্চ সুরে,—"বেশ যাচ্ছি চল" বলিয়া কর্ম্মচারীর অনুসরণ করিল।

আরামকেদারায় দারোগা সাহেব তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। সে গাঁয়ের তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা; লোকটা গম্ভীর, বলিষ্ঠ ও বিলাসী।

তিনি বলিলেন,—"হরিচরণ, আজকে তোমায় কোন লোক বড়গাঁ থেকে গঞ্জে আসবার পথের মোড়ে খোয়া ব্যাগটা কুড়তে দেখেছে?"

ভয় ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া হরিচরণ দারোগা সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিল; দেখিল দারোগা সাহেব তাহাকে সম্পূর্ণ সন্দেহ করিতেছেন অথচ সে ইহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাইতেছে না।

"আমায়? আমায়—আমায় কুড়িয়ে নিতে দেখেছে?"

"হ্যাঁ তোমায়!"

"দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি মা কালীর নামে দিব্যি কচ্ছি, আমি ব্যাগ পাইনি;—ব্যাগের সম্বন্ধে কোন কথা জানিও না!"

"কিন্তু তোমায় নিতে দেখেছে।"

"দেখেছে? আমায়? কে? জানতে পারি কি?

"খাবারওয়ালা মধু সা!"

বৃদ্ধের সহসা সকল কথা মনে পড়িয়া গেল, ব্যাপারটাও কতকটা বুঝিতে পারিল। ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া বলিল—"ওঃ। সেই পাজি জানোয়ারটা আমায় দেখেছে! হা অদৃষ্ট! সে আমায় যা নিতে দেখেছে সে এই দড়ির টুকরো—হুজুর, ধর্ম্মাবতার, এই দেখুন সেই দড়ির টুকরো!"

ট্যাঁকের মধ্যে আঙুল গুঁজিয়া সে তখনি দড়ির টুক্‌রাটি বাহির করিয়া ফেলিল।

দারোগা সাহেব অবিশ্বাসে ঘাড় নাড়িলেন।

"হরিচরণ! মধু সার মত একজন বিশ্বাসী লোক যে

ঐ দড়ির টুকরোটাকে মনিব্যাগ ব'লে ভ্রম করেছে এ কথা ত আমার বিশ্বাসই হয় না।"

উত্তেজিত হরিচরণ উপরদিকে হাত তুলিয়া শপথ করিয়া বলিল,—"ভগবানের দোহাই, দোহাই দারোগা সাহেব, আমি সত্যি বলছি; আমি যদি মিথ্যে বলি ত আমার ইহপরকাল নষ্ট হবে; আমি ব্যাটার মাথা খাব।"

দারোগা সাহেব বলিতে লাগিলেন,—"ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার তুমি রাস্তার দিকে দেখছিলে দু'একটা টাকা যদি প'ড়ে গিয়ে থাকে!"

ভয়ে উৎকণ্ঠায় বৃদ্ধের শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল।

"এ কথা সে বল্লে!......বল্লে কি ক'রে!......এমন জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা......একজন নির্দ্দোষীকে মজাবার জন্যে বল্লে কি ক'রে?......অ্যাঁ বল্লে কি করে?"

কথাটার প্রতিবাদ করিয়াও সে কোন ফল পাইল না।

মধু সার ডাক পড়িল; লোকটা গল্পটি ঠিক পূর্ব্বের মত আবৃত্তি করিল। প্রায় একঘণ্টা পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগিল। অবশেষে হরিচরণের প্রার্থনায় তাহার সারা অঙ্গ-বস্ত্র অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

অবশেষে নিরুপায় দারোগা তাহাকে মুক্তি দিলেন এবং বলিয়া দিলেন হাকিমকে এখুনি একথা জানাইয়া তাঁহার পরামর্শমত কার্য্য করা হইবে।

কথাটা ইতিমধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ থানার বাহিরে আসিবামাত্র নানাবিধ লোকে তাহাকে নানা প্রশ্নে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কেহ কিন্তু একটুও সহানুভূতি দেখাইল না। সকলকেই সে দড়ির টুকরার গল্প বলিল; কেহই সে কথা বিশ্বাস করিল না, হাসিয়া উড়াইয়া দিল—এও কি আবার একটা কথা!

থামিতে থামিতে সে অগ্রসর হইতেছিল, পথিমধ্যে প্রত্যেক পরিচিত অপরিচিত ব্যক্তিকে দাঁড় করাইয়া পুনঃপুনঃ আপনার গল্পটা বলিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আসিয়াছিল তাহার প্রতিবাদ করিতেছিল এবং সেই দড়ির টুকরাটি দেখাইতেছিল। লোকে কিন্তু সে কথা কানেই তুলিতেছিল না। উত্তরে বলিতেছিল,—"যা, যা, আর বাজে বকিসনে!"

ক্রোধে ও বিরক্তিতে সে জরজর হইয়া উঠিল; লোকে তাহার কথায় বিশ্বাস না করায় প্রাণে একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল; কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া আপনার গল্পটাই পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। তিনজন প্রতিবেশীর সহিত সে গ্রামে ফিরিতেছিল, পথে যে-স্থানটায় দড়ির টুকরা কুড়াইয়া পাইয়াছিল তাহাদের সে স্থানটা দেখাইল এবং সারা পথটা আপনার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বলিতে বলিতে চলিল।

গ্রামে পৌঁছিয়া প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তিকে আপনার দুর্ভাগ্যের কথা বলিল কিন্তু কেহই বড় একটা সেসব কথা কানে তুলিল না।

সারারাত্রি দারুণ অস্বস্তিতে কাটিল।

পরদিন বেলা প্রায় একটার সময় গঞ্জের আড়তদারের খামারের একটা মজুর সেই মনিব্যাগটা দারোগা সাহেবের নিকট সর্ব্বসমেত ফেরৎ দিল।

সে লোকটা বলিল সে সেটা রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছিল; কিন্তু লেখাপড়া না জানায় ব্যাগের অধিকারীর নামটা না পড়িতে পারায় সেটা সে বাড়ী লইয়া গিয়া তাহার মনিবকে দিয়াছিল।

সারা গ্রামময় কথাটা ছড়াইয়া পড়িল। হরিচরণও সে কথা শুনিল; তখন পাড়াময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই কথা সকলকে বলিয়া আসিল। আজ তাহার আনন্দের দিন!

সে বলিল,—"ব্যাপারটার জন্যে আমি তত দুঃখিত হইনি কিন্তু বড় দুঃখ যে লোকে আমায় মিথ্যেবাদী মনে করেছিল। মিথ্যেবাদী অপবাদটা প্রাণে বড় লাগে।"

সারাদিন পথে ঘাটে যত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল সকলকেই আপনার দুর্ভাগ্যের কথা বলিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদিগকেও দাঁড় করাইয়া সকল কথা বলিতে ছাড়িল না। তাহার মনটা এখন অনেকটা শান্ত হইয়াছিল;—তবু কি একটা কি যেন তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু সেটা যে কি তাহা সে

ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না। লোকে যখন তাহার কাহিনী শুনিত তখন যেন তাহাদিগের চক্ষে বিদ্রূপের দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিত; যেন সম্পূর্ণ সেকথা বিশ্বাস করিত না। তাহার মনে হইত অন্তরালে লোকে যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে!

পরের মঙ্গলবার সে আবার গঞ্জের হাটে গেল; আপনার নির্দ্দোষিতার কাহিনী বলিতেই তাহার গমন। মধু সা আপনার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল। ও হাসে কেন?

সে এক কৃষককে আপনার কাহিনী বলিতে লাগিল। সে কিন্তু গল্পটা সম্পূর্ণ করিবার অবকাশটুকু অবধি তাহাকে না দিয়া বলিয়া উঠিল,—"ঢের হয়েছে, বুড়ো জোচ্চোর, পালা!"

হরিচরণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার মনের অস্বস্তি ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। লোকটা তাহাকে 'বুড়ো জোচ্চোর' বলিল কেন?

মধু সার দোকানে আহার করিতে বসিয়া সে সকলকে ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

জনৈক অশ্ববিক্রেতা বলিল,—"থাক না বাবা, ওসব চালাকি আমরাও বুঝি; তোমার দড়ির টুকরার গল্প ঢের শুনেছি।"

বাধা দিয়া হরিচরণ বলিল,—"কিন্তু সেই হারানো ব্যাগ যে পাওয়া গেছে তার কি?"

"বেশী খাঁটাও কেন চাঁদ! চিরকালই ত একজন কুড়োয় আর আর-একজন জমা দিতে আসে। চোরে চোরে মাস্তুত ভাই!"

হরিচরণ বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এতক্ষণে কথাটা সে বুঝিল। লোকের ধারণা সে-ই অন্যের মারফৎ মনিব্যাগ ফেরৎ পাঠাইয়াছে।

কথাটার প্রতিবাদ করিতে চাহিলে সমস্ত লোকগুলা হাসিয়া উঠিল।

সে আর আহার করিতে পারিল না; সকলের বিদ্রূপের বাণে জর্জ্জরিত হইয়া সে সেস্থান ত্যাগ করিল।

ক্রোধ অভিমান ও লজ্জায় গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল; এইবার তাহার প্রাণে আরও অশান্তি জাগিয়া উঠিল, তাহার কারণ লোকে যে তাহাকেই প্রধান অপরাধী ভাবিয়াছে তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। এ কলঙ্ক আর যাইবে না—সে আর কিছুতেই আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারিবে না! সকলেই তাহাকে চতুর ফন্দীবাজ জুয়াচোর মনে করিয়াছে! লোকের এই দারুণ অবিচারে তাহার বক্ষপঞ্জর যেন চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

আবার সে আপনার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল; ক্রমেই সেটা দীর্ঘতর হইয়া উঠিতেছিল; প্রতিবারেই সে নূতন কারণ দেখাইয়া আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চাহিতেছিল। প্রতিবাদ শপথ প্রভৃতি যত রকম হইতে পারে সকল রকমেই সে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহিতেছিল; গৃহে যখন একাকী থাকিত তখনও ঐ চিন্তা! তাহার আত্মপক্ষ সমর্থন যতই যুক্তিতর্কসমন্বিত হইয়া উঠিতেছিল লোকেও তাহার কথা ততই কম বিশ্বাস করিতেছিল।

শ্রোতারা তাহার অসাক্ষাতে বলিত,—"হুঁঃ! ওসব মিথ্যেবাদীর ওজর!"

কথাটা সেও শুনিল, লাভের মধ্যে তাহার প্রাণের যন্ত্রণাটা আরও বাড়িয়া গেল, আরও অশান্তিতে তাহার প্রাণ পূরিয়া উঠিল।

দিন দিন সে শুকাইয়া উঠিতেছিল।

লোকে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া 'দড়ির টুকরা' বলিয়া ডাকিত। দিন দিন তাহার প্রাণ শুকাইয়া উঠিতেছিল।

ডিসেম্বর মাসের শেষে সে শয্যাগ্রহণ করিল। জানুয়ারী মাসের প্রথমেই তাহার মৃত্যু হয়। শেষ অবধি সে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য বিকার-ঘোরে বলিয়াছিল,—"একটা ছোট দড়ির টুকর...... দড়ির টুকর......এই দেখুন দারোগা সাহেব।"

যাকে রাখ সেই কি রাখে? *

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* Mrs Ada Galsworthyর অনুমতিক্রমে Guy De Maupassantর ফরাসী গল্পের ইংরেজী হইতে অনূদিত।

যুরোপীয় যুদ্ধের ব্যঙ্গচিত্র

যুদ্ধদানব আমার হাতে ঢের জ্বালানি আছে,
নতুন-বছর-ভোর খুব চলবে।
—ডি নোটেনক্রেকার (আমষ্টারডাম)।

যুদ্ধ-দেবতার আহ্বান—যুদ্ধে যোগ দাও! ভয় নাই, এ সভ্য লোকের সভ্য যুদ্ধ। বেমালুম ক্ষত! অক্লেশ মৃত্যু। শুশ্রূষার বন্দোবস্ত আছে। হাঁসপাতালের দ্বার অবারিত, সেখানে হাত পা কাটা ছাঁটা খুব চমৎকার হয়। বেখরচা খাওয়া পরা! মৃত্যুর পর পরিবারের পেন্সন! এস যুদ্ধে যোগ দাও!—
ঈগল (ব্রুকলীন)।

স্বাধীনতার অবতার রুষজার শতমুখ চাবুক ঘুরাইয়া বলিতেছেন—এস বৎসগণ এস, আমরা স্বাধীনতার গান গাই—জগতের লোকে জানুক আমরা স্বাধীনতার জন্যই লড়িয়া মরিতেছি।

—যাক ভাইসব, যেতে দাও, শান্তি কর।

অজেয়।

কাইজার—দেখছ ত, আমার সঙ্গে বিবাদ করে তোমার সর্ব্বস্ব গেল।

বেলজিয়মের রাজা—কেবল আমার মনুষ্যত্ব বাদে।

—পঞ্চ।

নবনিযুক্ত সৈন্য!

ইভনিং সান।

কেজো প্রশ্ন

জাপান—ওঃ! তোমরা আমার এই হাতখানা ধার চাও? কিয়াওচাও চেয়েও বড় কিছু করতে পারে এই ত তোমাদের মত? অবশ্য এ কথা সত্য বটে। মজুরীর কথাটা তাহলে ঠিক করতে হয় ত?—

তোকিও পাক।

চুলোয় যাওয়া!
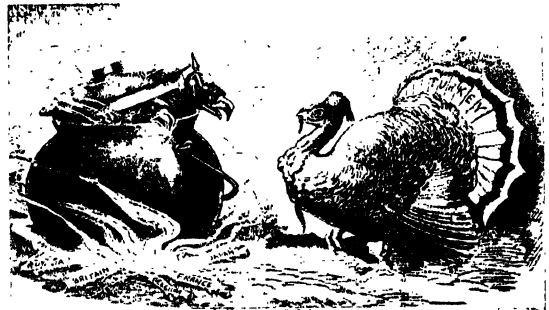
অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মান ঈগল টার্কিকে বলিতেছে—আও আও বুঢ়া মিঞা! আমরা বহুত আরামে আছি।

—জন বুল (লণ্ডন)।

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ?

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আদি কি ? এ কথা লইয়া বহুকাল হইতে বাদবিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে।

প্রথম মত এই যে, বুদ্ধদেব যজ্ঞে হাজার হাজার পশুবধ হয় দেখিয়া দয়ায় গলিয়া যান, ও যাহাতে পশুবধ নিবারণ হয়, তাহারই জন্য অহিংসা পরমধর্ম্ম—এই মত প্রচার করেন।

দ্বিতীয় মত এই যে, বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে উপনিষদের অদ্বৈত মত চলিয়া আসিতেছিল, বুদ্ধদেব সেই মতই আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাঁহার একটি নামই অদ্বয়বাদী। তাঁহার নির্ব্বাণে ও উপনিষদের অদ্বয়বাদে বিশেষ কিছু তফাৎ নাই। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদকে রামানুজের দল 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতৎ' বলিয়া গালি দিয়াছেন। তবে এ গালিতে ও ঐ মতে একটু তফাৎ আছে। রামানুজীয়া বলেন, শঙ্কর বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন ; আর ওমতে বলে, উপনিষদের প্রাচীন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেব অদ্বয়বাদী হইয়াছেন।

তৃতীয় মত এই যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাংখ্যমতের পরিণাম। সাংখ্যমত বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যমতে যেমন দর্শনসম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি গণিয়া সংখ্যাকরিয়া রাখে, বুদ্ধমতেও তাই। সাংখ্যের অষ্টবিকৃতি, তিন প্রমাণ, পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, অষ্টসিদ্ধি ইত্যাদি যেমন, বুদ্ধেরও সেইরূপ পঞ্চ স্কন্ধ, চতুরার্য্য সত্য, আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ প্রভৃতি। সাংখ্যদর্শন যেমন ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল, বুদ্ধদর্শনও তেমনি ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল। সেই ত্রিতাপ নাশ করিতে গিয়া সাংখ্যগণ বলিয়াছিল, আত্মাকে কেবল, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য, করিয়া দিতে পারিলেই ত্রিতাপ নাশ হয়। বুদ্ধ বলিলেন, না, সে হইতেই পারে না, কারণ আত্মা থাকিলেই তাহা "কেবল" হইয়া থাকিতে পারে না, অতএব আত্মাই নাই বলিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মণেরা সে সময়ে বড় অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন ; তাঁহারা আপনাদিগকে ভূদেব বলিয়া মনে করিতেন ; অন্য যে-কেহই হউক না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের পদানত হইয়াই থাকিতে হইবে। বুদ্ধদেব এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি আপামর সকলকেই মুক্তির উপদেশ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার দ্বেষই ধর্ম্মপ্রচারের কারণ।

আবার একদল আছেন তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মিয়াছিলেন। শাক্য শব্দ শক শব্দ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তিনিও শক ছিলেন। শকেদেরই ধর্ম্ম তিনি প্রচার করেন।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে, বুদ্ধদেবের গল্পটি সত্য নহে। উহা ইতিহাস নহে, উহা সূর্য্যসম্বন্ধীয় একটি প্রাচীন কল্পিত আখ্যায়িকা মাত্র। শাল গাছে ভর করিয়া মা দাঁড়াইলেন ও মায়ের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বুদ্ধদেব জন্মাইলেন, ইহা পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার দুইটি শালগাছের মাঝখানে গালে হাত দিয়া বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাও সূর্য্যের অস্তগমন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহারা এই আখ্যায়িকা সাজাইয়াছেন, তাঁহাদের সুবুদ্ধিরচনায় বাহাদুরী খুব আছে।

ভারতবর্ষের নিজস্ব কিছু থাকিতে পারে, একথা যাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব ও মার আর কেহই নহে, জোরোয়াষ্টারের মতের অহুরমজদা ও আহরিমান মাত্র। জোরোয়াষ্টারের মতে যেমন ভাল ও মন্দের লড়াইয়ে শেষে ভালরই জয় হইল, মন্দ হারিয়া গেল, এমতেও তেমনি বুদ্ধ জিতিলেন ও মার হারিয়া গেলেন।

যেখানে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এখন সেইখানে থাড়ু নামে এক জাতি বাস করে। উহারা বিশেষ সভ্য নহে। পূর্ব্বে উহাদিগকে চেরো বলিত, এখন খেড়ো হইয়া গিয়াছে। ছোটনাগপুরের অনেক অসভ্যজাতিই বলে যে তাহারা চেরোদের সন্তান, রোটাসগড়ের দিক হইতে অথবা তাহারও উত্তর হইতে তাহারা ছোটনাগপুরে আসিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে বঙ্গ বগধ ও চের নামে তিন জাতি আর্য্যদিগের শত্রু ছিল। উহাদের মধ্যে চেররাই এখনকার খেড়ো, উহাদের ধর্ম্মই বুদ্ধদেব সংস্কার করিয়া উত্তর ভারতের অনেক সুসভ্য দেশে প্রচার করেন। এও একটা মত আছে।

এই সমস্ত মতের সত্যতা বিচার করিতে গেলে প্রথম দেখিতে হইবে বুদ্ধদেব আর্য্য কি না। তিনি যে আর্য্য নন একথা বলিবে কিরূপে ? তিনি ইক্ষাকুবংশে জন্মান। ইক্ষাকুবংশ বেদেও প্রসিদ্ধ। তাঁহারও গোত্র আছে, গোতম গোত্রের কপিলমুনি শাক্যবংশের আদিগুরু। গোতমের নাম হইতেই শাক্যসিংহকে গৌতম বলিয়া ডাকা হয়। তখন গুরুর গোত্র লইয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর্য্যজাতির গোত্র হইত, প্রমাণ অশ্বঘোষের উক্তি।

শাক্যগণ ইক্ষাকু বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। তাঁহাদিগকে ইক্ষাকুরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বৈমাত্র ভাইয়ের উপকারের জন্যই তাড়ান হয়। পাটরাণীর ছেলেকে ত তাড়ান-শক্ত, সুতরাং তাঁহারা অন্য রাণীর ছেলেই হইবেন। রাজারা তখন অনেক বিবাহ করিতেন এবং বিবাহে জাতিবিচার বড় একটা করিতেন না। সুতরাং ভরতবংশ যেমন পাকা আর্য্য, শাক্য যে তেমন পাকা এরূপ বোধ হয় না। আর্য্যাবর্ত্তও সে সময়ে যে উভয় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাও বোধ হয় না। আর্য্য ও বঙ্গবগধ জাতির সন্ধিস্থলে শাক্যবংশীয় রাজধানী ছিল। এইরূপ নানা কারণে শাক্যেরা যে পাকা আর্য্য ছিলেন, সে বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ হয়।

তারপর যাগযজ্ঞে পশুহিংসা দেখিয়া বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্ম্মের উদ্রেক হয়, এ ত বুদ্ধের কোনও জীবন-চরিতে বলে না। ললিতবিস্তরে বলে না, মহাবস্তু-অবদানে বলে না, বুদ্ধচরিতে বলে না। পালি গ্রন্থেও বলে না। ঐটাই যদি প্রধান কারণ হইত, তাহা হইলে তাঁহার এত জীবনী, একখানি-না-একখানিতে এ কথাটা থাকিত। জৈনেরা বুদ্ধদেবের বহুপূর্ব্ব হইতে অহিংসাধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছিল।

উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের উৎপত্তি, একথা স্বীকার করা কঠিন। কারণ উপনিষদ্, বিশেষ তাহার অদ্বৈতবাদ, বুদ্ধদেবের সময়ে হইয়াছিল কি ? ব্রাহ্মণগুলি যজ্ঞ করিবার জন্য লেখা হয়। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি, যথা ছান্দোগ্য বৃহদারণ্য, ব্রাহ্মণের অংশ, যজ্ঞেই উহার ব্যবহার হইত। যাজ্ঞিকেরা এখনও উহা যজ্ঞের অংশ বলিয়াই ব্যবহার করেন। শঙ্করাচার্য্যের মত ব্যাখ্যা তাঁহারা করেন না। সেকালে যে-কোন সার কথা গুরুর কাছ হইতে শিখিতে হইত, তাহারই নাম উপনিষদ্ ছিল। অর্থশাস্ত্রের উপনিষদ ছিল, কামশাস্ত্রের উপনিষদ্ ছিল। বৌদ্ধেরাও উপনিষদ্ শব্দ বেশ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

উপনিষৎ বলিয়া একটি দর্শনের মত আমরা সর্ব্ব প্রথম হর্ষচরিতে দেখিতে পাই। কালিদাসও তাঁহার বিক্রমোর্ব্বশীতে বলিয়াছেন, "বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষম্"—এখানেও বেদান্ত শব্দের অর্থ

উপনিষৎ।' সুতরাং কালিদাস ও হর্ষরাজার সময়েই উপনিষদ্ একটা দার্শনিক মতের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু সে ত বুদ্ধের বহুকাল পরে। উপনিষদের যে এত প্রাদুর্ভাব এখন দেখা যাইতেছে, ইহা ত শঙ্করাচার্য্যের পর হইতেই হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আরও কথা, বৌদ্ধ-ধর্ম্মটাই কি গোড়ায় অদ্বৈতবাদ ছিল? সেটা মহাযানীরাই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে?

শকজাতি হইতে শাক্যজাতির উদ্ভব, এ কথাটাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ শকেরা ত শুঙ্গরাজাদের সময় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতে ভারতবর্ষে আসে। তাহাও আবার সুদূর পশ্চিমে পাঞ্জাবের কোণে। হিমালয় অতিক্রম করিয়া শকেদের আসা কোথাও দেখা যায় না। অধিকন্তু আমরা শাক্য শব্দের আর-একপ্রকার ব্যুৎপত্তি পাইয়াছি। তাহাতে সকল কথার সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, শাক নামে একরকম গাছ আছে। সেই গাছে ঘেরা জায়গায় বাস করেন বলিয়া বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপুরুষদের শাক্য বলিত। এ কথাটা বেশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নেপালের তরায়ে এখনও শকিয়া শালের গাছই অধিক। শাক গাছ হইতে শকিয়া শাল হইলে, শাক্য শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য হিমালয় ও তিব্বত পার হইয়া শকজাতির দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা অশ্বঘোষ একপ্রকার বলিয়াই গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গুরু আড়ার কলম ও উদ্রক দু'জনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। দুজনেই বলিয়াছিলেন, 'কেবল অর্থাৎ জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারিলেই মুক্তি হয়।' বুদ্ধ তাঁহাদের মত না মানিয়া বলিয়াছিলেন, "কেবল হইলেও অস্তিত্ব ত রহিল; অস্তিত্ব রহিলে নিঃসম্পর্ক হইবার জো নাই।" এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যদি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাংখ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে ত উহা আর্য্য-ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইল। আমার সেই কথাতেই সন্দেহ। সাংখ্য-মত কি বৈদিক আর্য্যগণের মত? শঙ্করাচার্য্য ত উহাকে বৌদ্ধাদি মতের ন্যায় অবৈদিক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন; তবে তিনি এত যত্ন করিয়া ও-মত খণ্ডন করেন কেন? মন্বাদিভিঃ কৈশ্চিৎ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতত্বাৎ। মনু প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্ট উহাকে গ্রহণ করিয়া-ছেন বলিয়া। সাংখ্যমত কপিলের মত, চিরকালের প্রবাদ। কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গবগধচেরাদিগের দেশে। গঙ্গাসাগর যাইতে কপিলআশ্রম আছে, কবতক্ষের ধারে কপিল মুনির গ্রাম। কপিল-বাস্তও কপিল মুনির বাস্ত। কারণ অশ্বঘোষ বলিতেছেন, গোতম কপিলো নাম মুনির্ধর্ম্মভৃতাং বরঃ। তাঁহারই বাস্তুতে কপিলবাস্তু নগর। বাস্তবিকও কপিলকে কেহ ঋষি বলে না। তাঁহার নাম করিতে গেলেই বলে আদিবিদ্বান্। বাল্মীকি যেমন আদি কবি, তিনিও তেমনি আদিবিদ্বান্। শ্বেতাশ্বতরে তাহাকে "পরমর্ষি" বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাব ভাষা ও মত দেখিলে এখানিকে নিতান্ত অল্প-দিনের পুস্তক বলিয়া বোধ হয়।

কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন—সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। কৌটিল্য ২০০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক। তাঁহার সময় অন্য দর্শন হয়ই নাই, হইলে তাহার মত সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের তাহা অবিদিত থাকিত না। সেই তিনটির মধ্যে লোকায়ত মত, লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ঐ নাম পাইয়াছে, উহার আদি নাই, ও-মত সর্ব্বত্র সকলেরই মত। খাও দাও সুখে থাক—এ মত আবার কে প্রচার করিতে যাইবে? সকলেই জানে, সকলেই বুঝে, ও সকলেই সেই মতে কার্য্য করে; সুতরাং উহার কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। যোগমত সাংখ্য-দর্শনেরই রূপান্তর মাত্র। দুইই দ্বৈতবাদী।

সাংখ্য ও যোগের যেসকল পুস্তক আছে সকলগুলিই নূতন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই তাহাদের মধ্যে পুরান। ঈশ্বরকৃষ্ণ খৃষ্টীয় পাঁচ শতের লোক। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেও সাংখ্যমতের পুস্তক ছিল; মাঠর ভাষ্যের কথা অনেক জায়গায় শুনিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ-শিখের দু'চারিটি বচন যোগভাষ্যকার ধরিয়াছেন। আসুরির একটি কবিতা একজন জৈনটীকাকার তুলিয়াছেন। মহাভারতে আসুরির নাম নাই, পঞ্চশিখের নাম আছে। তিনি জনক রাজার সভায় মিথিলায় উপস্থিত ছিলেন। কপিলের নিজের কোন বচন এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যে ২২টি সূত্র কপিলসূত্র বলিয়া চলিতেছে, তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা দেখিয়া লেখা বোধ হয়। কিন্তু অশ্বঘোষের লেখা ও কৌটিল্যের উক্তি দেখিয়া সাংখ্য যে খুব প্রাচীন তাহা বেশ অনুভব হয়।

সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে আদিবিদ্বান্ কপিলের নামও নাই গন্ধও নাই। আমাদের এখনকার ব্যবহারেও সাংখ্যমতের বড় বড় লোকগুলি মানুষ। ঋষিও নন, মুনিও নন। আমরা যে নিত্যতর্পণ করিয়া থাকি তাহাতে—

> সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
> কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।

বলিয়া যাঁহাদের তর্পণ করি, রঘুনন্দন বলেন তাঁহারা মনুষ্য। এই কবিতায় যাঁহাদের নাম আছে, তাঁহারা সকলেই সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য।

উপরের লেখা হইতে তিনটি কথা বুঝা যায়,—সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরান, উহা মানুষের করা এবং পূর্ব্ব দেশের মানুষের করা। উহা বৈদিক আর্য্যদের মত নহে, বঙ্গ বগধ বা চেরজাতির কোন আদিবিদ্বানের মত। যাঁহারা পুত্র পশু প্রভৃতি লাভের জন্য, পুষ্টি তুষ্টির জন্য, বড় জোর স্বর্গকামনায়, যাগযজ্ঞ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিতাপনাশের জন্য "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নির্লেপ নির্ব্বিকার" ইত্যাদি মত উদ্ভব হওয়া কঠিন। ইহা অনায়াসেই মনে হইতে পারে যে এই মত অন্যত্র উদ্ভূত হইয়া ক্রমে কোন কোন আর্য্য পণ্ডিত কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় আর্য্যগণের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। হেমাদ্রি বেশীদিনের লোক নহেন, তাঁহার সময় খৃষ্টীয় তের শতে; তিনি বলিতেছেন যে, যে ব্রাহ্মণ সাংখ্যমত জাল জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় পংক্তি-পাবন; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ কাপিল, সে পংক্তিবাহ্য। ইহাতেও অনুমান হয়, কপিলের কোন কোন সম্প্রদায়ের মত ব্রাহ্মণগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন; আর কোন কোন সম্প্রদায়ের মত একেবারেই গ্রহণ করেন নাই।

যদি সাংখ্য হইতেই বুদ্ধমতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বৈদিক আর্য্যমত হইতে উহার উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মে আরও অনেক জিনিষ আছে যাহা আর্য্যধর্ম্মের খুব বিরোধী। আর্য্যগণ তিন আশ্রম পালন না করিয়া ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। আপস্তম্ব প্রভৃতি সকল সূত্রকারেরই মত এই যে, ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থ, তাহার পর বানপ্রস্থ ও তাহার পর ভিক্ষু হইবে। কিন্তু বুদ্ধ উপদেশ দিতেন যে যখনই সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইবে, তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে পারিবে। এমন কি অতি শিশুকেও ভিক্ষু করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কয়েকটি নাবালগকে ভিক্ষু করায় কপিলবাস্তুতে বড় গোলমাল উপস্থিত হয়। তাহাতে বুদ্ধ-দেবের পিতা বুদ্ধকে বুঝাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে, নাবালগকে

শিষ্য করিতে হইলে তাহার পিতামাতার অনুমতি লইতে হইবে। ক্রমে বৌদ্ধ কর্ম্মাবাচায় দেখিতে পাওয়া যায়, একুশ বৎসরের পূর্ব্বে কাহাকেও দীক্ষা দেওয়া হইত না। যে কেহ দীক্ষা লইতে আসিত, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইত, তোমার বয়স একুশ বৎসর হইয়াছে ত? বহুকাল পরে শঙ্করাচার্য্য এই মত প্রকাশ করেন যে, 'যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'। এটি জাবালোপনিষদের বচন। সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেই এই উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল। উহা কোন ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত নহে, সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া সম্ভব নহে।

বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ হইতেও দেখা যায় উহা আর্য্যবিরোধী বেশ। আর্য্যগণ উষ্ণীষ ও উপানহ ভিন্ন চলিতেন না। মাথায় পাগড়ী ও পায়ে জুতা সবারই থাকিত। কিন্তু বৌদ্ধগণ বাঙ্গালীর মত খালি-মাথায় থাকিতেন এবং উপানহ ব্যবহার করিতেন না।

এইসকল নানা কারণে বোধ হয় যে, পূর্ব্বাঞ্চলে বঙ্গ বগধ ও চের নামে যে তিনটি সভ্য জাতি বাস করিতেন, তাহাদের সঙ্গে আর্য্যগণের মেলামেশায় বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। যে জায়গায় আর্য্যগণের পশ্চিমসীমা ও ঐ জাতিসকলের পূর্ব্বসীমা, সেইখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। উহা পূর্ব্বাঞ্চলে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, পশ্চিমাঞ্চলে উহার প্রাদুর্ভাব কখনই এত অধিক হয় নাই। পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র ও মৎস্যদেশে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, ইহার প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায় না।

(নারায়ণ, ফাল্গুন) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

দশকর্ম্মের ভাষা

ভারতের হিন্দু অধিবাসীগণ ভারতের দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েরই এক একটি ঐশী উৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। আর্য্য ঋষিগণ মনুষ্য ছিলেন; তাঁহারা কেবল স্বপ্রকাশ ব্রহ্মাদেশ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া মানবমণ্ডলীকে বুঝাইয়াছেন। এবম্বিধ ধারণা হইতে সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা এবং সংস্কৃত লিপিমালা দেবনাগরী বা দেবতাগণের আবাসস্থল হইতে উৎপন্ন বলিয়া সাধারণ্যে অভিহিত হয়। ভারতের সকল হিন্দু সম্প্রদায়ই ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যকলাপ সংস্কৃত ভাষায় সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

কিন্তু যতদিন সংস্কৃত ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা ছিল ততদিন উক্ত মন্ত্রাদির অর্থ বোধ করিতে দেশবাসীকে কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। অনেক দিন হইতেই ভারতের অধিবাসীবৃন্দের সহস্রে একজনও সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে বা বলিতে পারে না। সমগ্র হিন্দুজাতিকে পুনরায় অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি শিক্ষা দিয়া সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন করিবার কল্পনাও বাতুলের আশা মাত্র। এ অবস্থায় প্রাদেশিক ভাষাই আমাদের ভাব প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। মানুষ তাহার চিন্তারাশিকে ভাষায় গড়িয়া তুলিতে পারে বলিয়াই তাহার মহত্ত্ব। ধর্ম্মকার্য্য প্রাণের বস্তু; কাহাকে কি বলিয়া ডাকিতেছি, তাহা যদি হৃদয়ঙ্গম না হইল, তবে ত ভগবানকে ডাকিবার কোন তাৎপর্য্য থাকে না। কার্য্যের সহিত যদি চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও সমাবেশ না হইল, তবে জড়ে ও চৈতন্যময় মানুষে পার্থক্য রহিল কোথায়? মানুষ যদি পরের কথায় ভিন্ন নিজে চিন্তা করিতে না পারিল, তবে আর তাহার পৃথক ভাবে চিন্তাশক্তি লাভের কি প্রয়োজন ছিল? চিন্তার রাজ্য যে এখানে রুদ্ধ হইয়া গেল।—দর্শন বিজ্ঞান সবই যে বৃথা! বাস্তবিক আমাদের দেশে সকলই রুদ্ধ হইতে বসিয়াছে বা পূর্ব্বেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা ভগবানকে ডাকিতে হইলেও, এক দুর্ব্বোধ (আমাদের পক্ষে নির্ব্বোধ) ভাষার সাহায্যে ভগবানকে ডাকিয়া থাকি। নহিলে যে আমাদের 'জাতি যাইবে'। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা কল্পনাতেও আইসে না। আমাদের জাতীয় সকল ক্রিয়াই ধর্ম্মভাবপ্রসূত; কিন্তু বিবাহ, উপনয়ন, পূজা, আরাধনা, সকল বিষয়েই এক অবোধ্য ভাষায় ধর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইতে হয়।

নির্ব্বোধ চাষা কোন দুর্দ্দৈব বা পাপশান্তির জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ব্যবস্থা লইতে গেল। পণ্ডিত মহাশয় ১০।২০ টাকা প্রণামী পাইয়া লম্বা লম্বা কথা জোড়া দিয়া এক "পাঁতি" লিখিয়া দিলেন, কিন্তু হায়, নির্ব্বোধ বুঝিল না, কিম্বা বুঝিবার জন্য ইচ্ছাও করিল না, যে, সে কি পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইতেছে। কিন্তু তাহার "পাঁতি" যদি তাহার নিজের ভাষায় লিখিত হইত, তবে হয়ত তাহার অপরাধী হৃদয় আপন কর্ম্ম বুঝিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইত! কিন্তু সে যে যন্ত্র হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে এবং যন্ত্রের মত খাটিয়াই বিদায় লইবে।

ইহার কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অবারিত ব্রাহ্মণপ্রভাব ভারতের বিচারশক্তি চিরদিনের জন্য লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। তাই এই চিরন্তন ধর্ম্মকপটতা ও কর্ত্তব্যশৈথিল্য তাহার জন্যকে বিচলিত করিতে পারে নাই। যাহারা ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে এইরূপ ভিত্তিহীন ভাবে স্থায়ী করিতে চায়, তাহারা দিন দিন ক্ষয় ও ধ্বংসের পথে ছুটিবে না ত কি? এইসব কারণবশতই ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতেছে। আমাদের শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় ভাষা যুক্তিহীনতা ও হৃদয়হীনতার আশ্রয়ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে

আমরা বেদের ধার ধারি না, কিন্তু বিবাহ, উপনয়ন, পূজা পার্ব্বণে বৈদিক মন্ত্রের ঘটায় একএকজন বৈদিক সাজিয়া বসি।

সকল দেশেই ধর্ম্ম ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তত্তদ্দেশীয় ভাষায় সম্পন্ন হয়। কিন্তু পারিনা শুধু আমরা! কারণ আমরা যে দেশাচার-ও ব্রাহ্মণশাসিত একটি যন্ত্রমাত্র।

পুরোহিত নিজেও মন্ত্রার্থ জানেন না, অর্থশূন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেশাচার রক্ষা করেন। কাজেই মনে হয়, আমাদের দেশে দৈব কর্ম্মে আমাদের মাতৃভাষা ব্যবহৃত হইলে সুফল ভিন্ন কুফল ফলিবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি কত শত শত বিষয়ে পতিত হইতেছে—এই একটি বিষয় কিছুতেই তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে না। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত তাঁহাদের কাছে এ প্রস্তাব কখনই ভাল লাগিবে না। তাঁহারা নিজে ত সংস্কৃত জানেন। অন্যের জন্য তাঁহারা কখনও চিন্তা করেন না, বা করিতে আগ্রহও প্রকাশ করেন না। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসম্প্রদায় এই বিষয়ে অভাব উপলব্ধি করিয়া মাতৃভাষাকে দৈবক্রিয়ার ভাষারূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেশীয় খৃষ্টানগণও আপন আপন মাতৃভাষাকে তাঁহাদের "দশ কর্ম্মের" ভাষা করিয়াছেন।

ভক্তির পুতুল চৈতন্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাহার মাতৃভাষায় যে চিন্তালহরী তুলিয়াছিলেন, তাহা শুধু ব্রাহ্মণের মধ্যে নয়,—চণ্ডালের মধ্যেও ভগবৎভক্তি ও স্বাধীন চিন্তার স্রোত বহাইয়াছিল। তাই আজও ধানের ক্ষেতে, হাটের পথে, খেয়ার ঘাটেও হরিনামের অমৃত-ধারা শুনিতে পাওয়া যায়।

সংস্কৃত পবিত্র দেবভাষা,—আমার নিজ মাতৃভাষাও অপবিত্র

নহে। যে কার্য্য আমার মাতৃভাষায় করিতে পারি না তাহার পবিত্রতা ত উপলব্ধি করিতে পারি না। জানিনা ভারতের সহিত রক্ষণশীলতার কি এক নিগূঢ় সম্বন্ধ। ভারতের ধর্ম্ম চীন জাপানে যাইয়া, ভারতের ভাষা ত্যাগ করিতে পারিল, মানুষের কার্য্যোপযোগী হইবার জন্য তৎতৎদেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম ভারতে আসিয়া আবার রক্ষণশীলতায় বাঁধা পড়িয়া গেল। বুঝুন আর না বুঝুন, আরবী ভাষার মন্ত্রে আমাদের মত তাঁহাদিগকেও ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। এমন দিন কি আসিবে না যে যখন ভারতবাসী রক্ষণশীলতার বন্ধন কাটিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে?

(ভারতী, ফাল্গুন) শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী।

* *
*

প্রাচ্যের দান

প্রাচ্য প্রতীচ্যকে প্রধানতঃ কি কি বিষয় দান করিয়াছে?

১। অক্ষর-সৃষ্টি। মানবসভ্যতার প্রথম বিকাশের সময় কি করিয়া ইশারা করা ও কথা বলা ব্যতিরেকে লোককে লোক মনের ভাব বুঝাইতে পারে এবং চিন্তার ফলগুলি কি উপায়ে ভবিষ্যদ্বংশধরদিগের উপকারের জন্য স্থায়ীভাবে রাখিতে পারে, ইহা একটা বিষম সমস্যা ছিল। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ মিশরে প্রথমে সাঙ্কেতিক লেখার (Hieroglyphics) সৃষ্টি হয়। তাহাতেও অসুবিধা সম্পূর্ণ দূর না হওয়ায় ধনুকের তীরের ফলার ন্যায় (Cuneiform) একপ্রকার অক্ষরের সৃষ্টি হয়। বহু পণ্ডিতের মত যে, উহাও প্রথমে মিশরে উদ্ভাবিত হয়। আর অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মতে উহা প্রথমে আসিরিয়ায় উদ্ভাবিত হয়। মিশরীয় ও আসিরিয়ার সভ্যতা অনেকটা সমসাময়িক ও উভয়েই প্রাচ্য। ঐ দুইপ্রকার লেখার সংমিশ্রণে যে অক্ষরের উৎপত্তি হয়, তাহা মিশরবাসীদিগের নিকট হইতে ফিনিসিয়ানগণ গ্রহণ করেন ও তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রীকগণ প্রাপ্ত হন। অধুনা পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত অক্ষরসমূহ সেই অক্ষরের পরিমার্জ্জিত সংস্করণ মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্যদেশ, সভ্যতার অঙ্কুর অক্ষরের সৃষ্টির জন্য, প্রাচ্যের নিকট ঋণী।

২। কাগজ ও পার্চ্চমেণ্ট।—অক্ষর ত পাওয়া গেল, কিন্তু কাগজ নহিলে ত আর অক্ষর-সৃষ্টির সুফল সম্যক্‌রূপে মানুষের কাজে লাগান যায় না। কাগজ প্রথমে চীন দেশে প্রস্তুত হয় ও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাগজ চীনের একচেটিয়া পণ্য ছিল। চীনদিগের নিকট হইতেই উহা ইয়ুরোপে যায়। নোটের কাগজও (অর্থাৎ পার্চ্চমেণ্ট) সর্ব্বপ্রথমে প্রাচ্য-দেশে প্রস্তুত হয়। ইহার পার্চ্চমেণ্ট নামেই ইহা ধরা পড়ে। ইহা এসিয়া মাইনরে পারগামাস্ নামক স্থানে প্রথম প্রস্তুত হয়।

৩। ছাপাখানা ও ছাপার অক্ষর।—জার্ম্মানীতে ছাপার অক্ষর উদ্ভাবিত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে চীন-দেশে একপ্রকার ছাপানর প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

৪। সংখ্যা, দশমিক ভগ্নাংশ ও বীজগণিত।—অঙ্ক-শাস্ত্রের ১, ২ প্রভৃতি অঙ্কগুলির জন্ম হইয়াছিল ভারতবর্ষে, দশমিক-ভগ্নাংশও প্রথমে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় ও আরবদেশ হইয়া ইয়ুরোপে পৌঁছায়। বীজগণিত—এলজেব্রা এই আরবীয় নামে অধুনা প্রতীচ্য-দেশে পরিচিত হইলেও উহা যে ভারতবর্ষে উদ্ভূত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই এবং অদ্যাপি শ্রীধরাচার্য্যের অঙ্ক কসিবার প্রণালী স্বনামে ইয়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত আছে।

৫। জ্যামিতি।—যজুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে যজ্ঞভূমি ও বেদিনির্ম্মাণের জন্য কতকগুলি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার প্রয়োগ হইত। শুল্বসূত্র ও গ্রীক্‌দিগের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে সৌসাদৃশ্য অনেক। কোন কোন পণ্ডিত আবার বলেন যে, জ্যামিতি মিশরে প্রথমে আবিষ্কৃত হয়, কারণ মিশরে প্রতিবৎসর নীল নদের প্লাবনে জমির বিভাগচিহ্নগুলি নষ্ট হইয়া যাইত ও প্রতি বৎসর তাহার পুনর্নির্দ্দেশের নিমিত্ত জ্যামিতির উদ্ভব হয়। তাহা হইলেও ইহা প্রাচ্যের আবিষ্কার বলিতে হইবে। সাধারণ ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায় ইউক্লিডকেই জ্যামিতির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানেন। তিনি নামে গ্রীক্ হইলেও প্রাচ্য মিশরবাসী।

৬। সৌরবর্ষ।—চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া চান্দ্রমাস আবিষ্কার করা কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু এই চান্দ্রমাস প্রায় ২৯ দিনে হয়, সুতরাং চান্দ্রমাস অনুসারে বৎসর গণনা করিলে বৎসর ছোট হইয়া যায়, ৩৬৫ দিনে হয় না। তাহাতে মাসের সহিত গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতুর ঐক্য থাকে না, এই বিষম অসুবিধা ঘটে। কিন্তু বৎসরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা, ইহা আবিষ্কার করিল কাহারা? স্থিতিশীল (Conservative) মুসলমানগণ এখনও চান্দ্রমাসই গণনা করেন। বৈদিক কালে ভারতবর্ষে সৌর বৎসর অজ্ঞাত ছিল না। এই সৌর বৎসর অনুমান ৪৮২১ খ্রীঃ পূঃ বৎসরে মিশরে প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। মিশরবাসীগণ অতি প্রাচীন কালে পূর্ণ বৎসর যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় হয়, ইহা নির্দ্দেশ করেন। মিশরবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রীকগণ ঐ বৎসর লয়েন ও তাহাই অল্প একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া সমগ্র সভ্যজগতে গৃহীত হইয়াছে।

৭। জ্যোতিষ।—প্রাচ্য দেশের, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের দান।

৮। দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।—চীনদেশীয়দিগের দ্বারা প্রায় ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ বৎসরে উদ্ভাবিত হয়।

৯। বারুদ।—চীনেরা সর্ব্বপ্রথমে বারুদ সৃষ্টি করেন।

১০। যাদুবিদ্যা।—প্রাচীন পারস্যের ধর্ম্মে আমাদের দেশের ধর্ম্মের ন্যায় অনেক যাগ-যজ্ঞ-হোম-কর্ম্ম ছিল। সেগুলিকে ইয়ুরোপীয়েরা ভৌতিক ক্রিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন; কারণ, তাহার মর্ম্ম তাঁহারা আদৌ বুঝিতে পারিতেন না। বিধর্ম্মী পারস্যের পুরোহিতের নাম ছিল, ম্যাজি (Magi)। পারস্যের দেখাদেখি, পাশ্চাত্যগণও ভৌতিক ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। পারস্যের ম্যাজিদিগের নিকট প্রাপ্ত ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা অদ্যাপি ইয়ুরোপে ম্যাজিক (Magic) নামে অভিহিত হইয়া, পুরাকালের প্রাচ্যের নিকট পাশ্চাত্যের দানগ্রহণের সাক্ষ্য দিতেছে। Spiritualism এই জাঁকালো নাম দিয়া, আধুনিক ইয়ুরোপে যে ভুতুড়ে কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও আদি প্রাচ্য-দেশ।

১১। দর্শন। ইয়ুরোপে প্রবাদ আছে যে, থেলস্, এমপিডক্লিস্, অনাক্সাগোরাস্, ডিমোক্রিটাস্, পিথাগোরাস্ প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রাচ্যদেশে গমন করেন। এমন কি, এরূপ প্রবাদ আছে যে, পিথাগোরাস্ ভারতবর্ষে আসিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যান। দর্শন-শাস্ত্রে ভারতবর্ষ পুরাকাল হইতে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

(ক) ইলিয়াটিক মতের মুখ্য সূত্র—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এবং বিশ্বেশ্বরে অভেদ-জ্ঞান এবং অস্তিত্বে অভেদ এবং জড়পদার্থের অস্তিত্ব নাই, উহা কেবল কল্পনা মাত্র; এই মতগুলি উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনের মত।

(খ) এম্পিডক্লিসের সিদ্ধান্ত—যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহার নূতন করিয়া উৎপত্তি নাই এবং যাহা আছে, তাহার ধ্বংস নাই ; ইহাও সাংখ্যদর্শনের "অনন্ত" এবং "পদার্থের অবিনশ্বরতা" এই সিদ্ধান্তের ভাষাগত রূপান্তর মাত্র।

(গ) পিথাগোরাস্ গ্রীকধর্ম্ম দর্শন ও গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে যেসকল সিদ্ধান্ত প্রচার করেন, তাহা পিথাগোরাসের জন্মাইবার বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। পিথাগোরাসের পুনর্জন্ম-সম্বন্ধে অভিমত, তাঁহার পঞ্চভূত হইতে সমস্ত জড়-পদার্থের উৎপত্তি এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের অনুকরণ। পিথাগোরাসের পুনর্জন্মবাদ যে, দেশান্তর হইতে আনীত, তাহা গ্রীকগণই সর্ব্বপ্রথমে সকলকে জ্ঞাত করান।

(ঘ) তৎপরে নিয়োপ্ল্যাটোনিষ্টদিগের দার্শনিক সিদ্ধান্তসকল যে, সাংখ্যদর্শন হইতে গৃহীত, তাহা বেশ বুঝা যায়। যথা, প্লোটিনাসের মত—আত্মা সুখদুঃখের অতীত, কারণ সুখদুঃখ জড়-পদার্থেই সম্ভব, তাঁহার আত্মা ও জ্যোতিতে অভেদ-নির্দ্দেশ এবং জ্ঞানতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য দর্পণের উপমা প্রভৃতি স্পষ্টই সাংখ্যদর্শনের মত। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, জড়জগতের সহিত সম্বন্ধরহিত করিয়া তপস্যা করা আবশ্যক, ইহাও যোগদর্শনের মত। প্লোটিনাসের প্রধান শিষ্য পরফাইরির সাংখ্যদর্শনের নিকট ঋণ আরও অধিক। তিনি বলেন, আত্মা ও জড়দেহে অত্যন্ত প্রভেদ এবং আত্মা জড়দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে সর্ব্বস্থলে বিদ্যমান থাকিতে পারে এবং জগৎ অনাদি। পরফাইরি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন; সে সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণ প্রভাবে প্রচলিত। সুতরাং বৌদ্ধদিগের অনুকরণে তিনিও জীববলি ও প্রাণীসংহারের বিরুদ্ধে মত দিয়া গিয়াছেন।

(ঙ) খৃষ্টান নষ্টিক ধর্ম্মের (Gnosticism) উপর ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব অতিশয় প্রবল। নষ্টিকদিগের, আত্মা ও জড়-দেহে বিশেষ পার্থক্য, জ্ঞানের জড়দেহ-বিচ্ছেদে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, আত্মা ও দিব্যজ্যোতিতে অভেদ প্রভৃতি মতগুলি সাংখ্যদর্শনের মত। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের ত্রিগুণাত্মক বিভাগানুযায়ী নষ্টিকগণও মনুষ্য-দিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বার্দ্দিসেন সাংখ্যদর্শনের লিঙ্গশরীরের অনুকরণে এক সূক্ষ্মশরীরেরই পরিকল্পনা করিয়াছেন।

(চ) হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রের প্রভাব অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ এবং এখনও জর্ম্মান দার্শনিকগণ ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের অভিমত ঋণগ্রহণ করিতেছেন।

১২। চিকিৎসা।—খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি মনীষীগণের পুস্তকসকল আরবীয়গণ ভাষান্তরিত করেন। আরবীয়-গণের নিকট হইতে উহা ইয়ুরোপে যায়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উক্ত ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থসমূহের আরবীয় অনুবাদ ইয়ুরোপীয়গণের প্রধান সম্বল ছিল। কৃত্রিম নাসিকা-প্রস্তুত ইয়ুরো-পীয়গণ ভারতবর্ষ-অধিকারের পর এ দেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছেন।

১৩। রসায়ন।—রসায়ন-শাস্ত্রেও ভারতবর্ষ প্রতীচ্যকে ঋণদান করিয়াছে। পাশ্চাত্য যে প্রাচ্যের নিকট হইতে রসায়ন-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত পরমাণুবাদ (Atomic theory) তাহার প্রকৃত প্রমাণ। কণাদ সর্ব্বপ্রথমে ঐ তত্ত্ব প্রচার করেন। পরে আরবদেশবাসীগণ কর্ত্তৃক উহা গৃহীত ও প্রতীচ্যে প্রেরিত হয়।

১৪। ভাষাতত্ত্ব।—সংস্কৃত ব্যাকরণের ন্যায় এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত ব্যাকরণ পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ দেখিয়াই বপ্, গ্রিম প্রভৃতি ইয়ুরোপীয়দিগের ভাষাতত্ত্বে চোখ খুলিয়াছে ও কিলজজির এত প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৫। কথা-সাহিত্য।—আমাদের পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের ন্যায় গল্পচ্ছলে বালকদিগের এরূপ উপদেশগ্রন্থ পৃথিবীতে আর নাই। পাশ্চাত্যদেশে এমন কোন ভাষা আছে কি না সন্দেহ, যাহাতে এই গ্রন্থদ্বয় ভাষান্তরিত না হইয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে আরবীয়গণ ভারত হইতে গ্রহণ করেন, পরে পারস্যের মধ্য দিয়া, ইহা ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তাঁহারা ইহার নাম দিয়া-ছিলেন—Fables of Pilpay। তাহারই রূপান্তর ঈশপের গল্প।

১৬। বাণিজ্য ও মুদ্রা।—প্রাচ্য ফিনিসিয়ানদিগের নিকট প্রতীচ্য বাণিজ্য শিক্ষা করিয়াছে। মানবসভ্যতার প্রারম্ভে মুদ্রা বলিয়া বস্তু ছিল না। ব্যবসায়-বাণিজ্য সকলই বিনিময়ে (Barter System) হইত। এই অসুবিধা-দূরীকরণার্থ লিডিয়া দেশের বণিক্‌সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথমে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলিত করেন। লিডিয়াবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রীকগণ মুদ্রার প্রচলনপ্রথা শিক্ষা করেন ও স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি নানা ধাতুর মুদ্রাঙ্কন করেন। গ্রীস্ হইতে মুদ্রা সমগ্র ইয়ুরোপে প্রচলিত হয়।

১৭। কাচ।—একদল পণ্ডিতের মত, কাচ ফিনিসিয়ায় প্রথম নির্ম্মিত হয়। আর একদল বলেন, উহা সিরিয়ায় সর্ব্বপ্রথমে তৈয়ারি হয়। বিলাতের আধুনিক শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক পেট্রি (Petrie) বলেন, উহা মিশরদেশে প্রথমে নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষে মহাভারতের সময়ও কাচ ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সাহেবী-মতে প্রায় খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরে হইয়াছিল। ভারত-নির্ম্মিত কাচের জিনিষের রোমরাজ্যে বড় আদর ছিল।

১৮। চীনামাটির দ্রব্য (Pottery)।—প্রথমে কোথায় তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহা উহার নামেই পরিচয় পাওয়া যায়। উহা চীনদেশ ব্যতীত ক্যালডিয়া এবং মিশরেও প্রস্তুত হইয়াছিল এবং চীনামাটির দ্রব্য ঐ দুই দেশবাসীদিগের ব্যবসায়ের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। সেই প্রাচীন কালের মিশরীয় ও ক্যালডিয়ার চীনামাটির পাত্রগুলি অদ্যাপি পাশ্চাত্যদিগের বিস্ময় উৎপাদন করে।

১৯। ছাতা।—ছত্র প্রাচ্যভূমির জাতীয় সম্পত্তি। প্রাচ্য-দেশবাসীগণের অনেক গার্হস্থ্যকার্য্যে উহা ব্যবহৃত হয়। এমন কি, রাজপদের অন্যতম চিহ্নই ছত্র এবং রাজারও একারণে নাম ছত্রপতি। ভারতবর্ষে, মিশরে ও চীনে, পাশ্চাত্য-দেশসকলের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই ছত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পরে প্রাচ্যদেশ হইতে উহা রোমে যায়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রতীচ্য, ছাতা কাহাকে বলে, জানিত না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে একজন ইংরেজ, চীনদেশ হইতে একটি ছাতা বিলাতে লইয়া যান। তিনি যেদিন ঐ ছাতা মাথায় দিয়া লণ্ডন সহরের রাজপথে প্রথম বাহির হইলেন, সেদিন সহরসুদ্ধ লোক ঐ অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল এবং অবশেষে কতকগুলি লোক ঐ ছাতার দৃশ্য-দর্শন অসহ্য বোধ করিয়া ডেলা ছুড়িয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

২০। মণিমুক্তা ইত্যাদি।—আজকাল ইয়ুরোপীয়গণ যেসকল বস্তু লইয়া ব্যবসায় করিতেছেন, তাহার মধ্যেও অনেক জিনিষ তাঁহারা প্রাচ্য-দেশ হইতে প্রথমে গ্রহণ করেন। যথা—মণিমুক্তা, রেশম, সূক্ষ্ম বস্ত্র (মসলিন), পাকা রং প্রভৃতি বাণিজ্য-দ্রব্যগুলি তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বা আরবদেশ হইতে লইয়াছেন। শীতবস্ত্রের সাহেবী Kashmere (কাশ্মীরী) নাম হইতেই উহা যে ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক প্রতীচ্যকে দান, তাহা বোধ হয়, সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

২১। চা।—চীন দেশ হইতে পাশ্চাত্যে গিয়াছে। কথিত আছে, যখন চা প্রথমে বিলাতে ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়, তখন

অধিকাংশ লোকেই উহার ব্যবহারে অনভিজ্ঞতাবশতঃ উহা জলে সিদ্ধ করিয়া, জল ফেলিয়া দিয়া, পাতাগুলিতে চিনি মিশ্রিত করিয়া, ভক্ষণ করিয়াছিল।

২২। দাবাখেলা।—আমাদের দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে রামের সহিত যুদ্ধের প্রাক্কালে রাণী মন্দোদরী রাবণকে একরূপ খেলায় আহ্বান করেন ও বলেন যে, এই খেলার ফল দেখিয়াই তিনি বলিয়া দিবেন, রামের সহিত যুদ্ধে রাবণ জয়ী হইবেন কি না। ক্রীড়াটিও সেই কারণে একটি যুদ্ধের সর্ব্বাঙ্গের অনুকরণ। সেই ত্রেতা যুগ হইতে ভারতবর্ষের হীনবীর্য্য (?) অধিবাসীবৃন্দ গৃহে বসিয়া এই চতুরঙ্গ ক্রীড়া দ্বারা বোধ হয় তাঁহাদের যুদ্ধের সাধ মিটাইতেন। তাহার পর আরবদেশবাসীগণ উহা শিক্ষা করিয়া পারস্যকে তাহা শিক্ষা দেন। এবং পারস্য হইতে ঐ ক্রীড়া 'চেস্' (Chess, পারস্য সাহ শব্দের অপভ্রংশ) নামে পাশ্চাত্য রণকুশল জাতিদিগের মধ্যে নিজের প্রসার-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে।

২৩। ধর্ম্ম।—পৃথিবীতে সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই প্রাচ্যদেশে উৎপত্তি-লাভ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, য়িহুদিধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মেরই জন্মভূমি এসিয়া মহাদেশ।

২৪। পূজা-পদ্ধতি।—মিশর হইতে সভ্যতার-অঙ্কুর-গ্রহণ-কালে গ্রীস্ ও রোম মিশরদেশীয় পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করেন; এমন কি, মিশর-দেশীয় দেবতা পর্য্যন্ত তাঁহাদের দেবতাগণের মধ্যে স্থান পান। কাল-ক্রমে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেবতা গেলেন বটে, কিন্তু পূজাপদ্ধতি রহিয়া গেল।

২৫। মঠ।—অশোক রাজা হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকল্পে প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মঠ-প্রথা ভারতবর্ষেই ছিল, তৎপূর্ব্বে আর কোন জাতির মধ্যেই উহা ছিল না। মিশরে ভিক্ষুসম্প্রদায় গমনের পর হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে মঠ-প্রথার স্থাপনা হয়। মিশর হইতেই এই Monastic System গ্রীসের মধ্য দিয়া সমগ্র ইয়ুরোপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাও ইয়ুরোপের নিজস্ব নহে।

(ভারতবর্ষ, ফাল্গুন) শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধর্ম্মপাল

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজ গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া যান। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া ধর্ম্মপাল দেব দুর্গ হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণ-পুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্য অমৃতানন্দকে যুবরাজ ও কল্যাণী দেবীর সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে সংবাদ পৌছিল যে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাডুবির পর সপ্তগ্রামে পৌছিয়া-ছেন। গৌড় হইতে মহারাজকে খুঁজিবার জন্য দুই দল সৈন্য প্রেরিত হইল। পথে ধর্ম্মপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। এবং গোপালদেব ধর্ম্মপাল ও কল্যাণী দেবীকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কল্যাণীর মাতা কল্যাণীকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত সামন্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত পুরুষোত্তম খুল্লতাত-কর্ত্তৃক হৃতসিংহাসন ও রাজ্যতাড়িত কান্যকুব্জরাজের পুত্রকে অভয় দিয়া গৌড়ে আনিয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সংবাদ জানিয়া কান্যকুব্জরাজ গুর্জ্জররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। পথে সন্ন্যাসী দূতকে ঠকাইয়া তাহার পত্র পড়িয়া লইলেন। গুর্জ্জররাজ সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধ মনে করিয়া সমস্ত বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবার উপক্রম করিলেন। এদিকে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কৌশলে ধর্ম্মপাল সমস্ত বৌদ্ধকে প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। সম্রাট ধর্ম্মপাল সামন্তরাজদিগকে সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মপাল বারাণসী জয় করিয়াছেন শুনিয়া কান্যকুব্জ ছাড়িয়া ইন্দ্রায়ুধ গুর্জ্জরে পলায়ন করিলেন এবং গুর্জ্জর-রাজকে ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথে সংবাদ পাইলেন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া গুর্জ্জরগণ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছে। ধর্ম্মপাল পথ হইতে আবার ফিরিলেন।]

দশম পরিচ্ছেদ।

আর কত দিন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তথাপি সর্ব্বানন্দ ফিরিলেন না; তখন অমলাদেবী অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন। সর্ব্বানন্দ কখন এত অধিকক্ষণ গৃহের বাহিরে থাকিতে পারিতেন না, তিনি দণ্ডে দণ্ডে গৃহে আসিয়া অমলাকে দেখিয়া যাইতেন। সেই সর্ব্বানন্দ যখন রজনীর প্রথম প্রহরেও গৃহে ফিরিলেন না, তখন অমলাদেবী প্রদীপ হস্তে তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলেন। একাকিনী স্বামীর বয়স্যগণের গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিয়া অমলা অবশেষে ভ্রাতৃগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নিশীথরাত্রিতে একাকিনী প্রদীপ হস্তে গৃহদ্বারে অমলাকে দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃবধূ অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। অমলাদেবীর ভ্রাতা শয়ন করিয়া ছিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন।

তাঁহার আহ্বানে দুইচারিজন প্রতিবেশী শয্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইল। সন্ধ্যার পরে কেহই সর্ব্বানন্দকে দেখিতে পায় নাই। নিশীথ রাত্রিতে গ্রামসীমা হইতে গ্রামসীমা পর্য্যন্ত সর্ব্বানন্দের অন্বেষণ হইল; কিন্তু সর্ব্বানন্দকে মিলিল না। অমলা কুটীরদ্বার রুদ্ধ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে ভ্রাতার সহিত পিতৃগৃহে আসিলেন।

পরদিন প্রভাতে পুনরায় সর্ব্বানন্দের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। গ্রামবাসীগণ পালিতক হইতে আরম্ভ করিয়া দশক্রোশ পর্য্যন্ত সর্ব্বানন্দের অনুসন্ধান করিয়া আসিল, কিন্তু সর্ব্বানন্দকে মিলিল না। অমলা পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে অমলাদেবীর ভ্রাতা বরাহরাতভট্ট রাজধানীতে আহুত হইলেন। তাঁহার পিতা বিশ্বরাতভট্ট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য জগৎবিখ্যাত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন; গৌড়েশ্বরের প্রধান সচিব গর্গদেব বহু অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে রাজধানীতে বাস করাইতে পারেন নাই। বিশ্বরাতের মৃত্যুর পরে বরাহরাতকে ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে প্রায়ই গৌড়ে যাইতে হইত। তিনি অল্প দিনের মধ্যে গর্গদেবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়মগধে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক নূতন রাজপদের সৃষ্টি হইয়াছিল। গর্গদেব বরাহরাতকে একটি রাজপদ গ্রহণের জন্য বহুদিন হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে মূর্খ, নির্ব্বোধ পুরুষোত্তমের পরিবর্ত্তে বরাহরাতভট্টকে পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করেন; কিন্তু রাজ্ঞা দেদ্দদেবী কোনমতেই কুলপুরোহিত ত্যাগে স্বীকৃত না হওয়ায় গর্গদেবকে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে মহাক্ষপটলিকের পদ শূন্য হওয়ায় গর্গদেব বরাহরাতকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। প্রধান অমাত্যের অনুরোধে বরাহরাতভট্ট রাজপদ গ্রহণ করিয়া সপরিবারে গৌড়ে আসিলেন। দুঃখিনী অমলাও সেই সঙ্গে পিতৃগৃহ ও শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সহিত রাজধানীতে আসিলেন। সুচতুর, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল, কর্ম্মপটু ভট্টপুত্র অতি অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে গর্গদেব তাঁহাকে বর্দ্ধমানভুক্তির ধর্ম্মাধিকারপদ প্রদান করিয়া রাঢ়দেশে প্রেরণ করিলেন। তখন প্রতি ভুক্তিতে বিচারকার্য্যের জন্য একএকজন ধর্ম্মাধিকার নিযুক্ত থাকিতেন। প্রধান বিচারপতি বা মহাধর্ম্মাধিকৃত রাজধানীতে অবস্থান করিতেন। প্রতি ভুক্তির ধর্ম্মাধিকারগণের অধীনে প্রতি মণ্ডলে ও বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মাধিকরণ ছিল। বরাহরাত রাঢ়দেশে আসিয়া ঢেক্করীয় নগরে বাস করিতে লাগিলেন। অমলাদেবীও ভ্রাতৃবধূর সহিত রাঢ়ে আসিলেন।

কান্যকুব্জ হইতে ধর্ম্মপালদেবের বিজয়যাত্রার সংবাদ গৌড়রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিল। বহু নূতন গৌড়ীয় সেনা কান্যকুব্জে প্রেরিত হইল। রাঢ়দেশ হইতে যাহারা কান্যকুব্জে যাইত বরাহরাত তাহাদিগকে সর্ব্বানন্দের অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেন, তথাপি সর্ব্বানন্দের কোন সন্ধান মিলিল না। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, সমবেত গুর্জ্জররাজচক্র কান্যকুব্জরাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন, গুর্জ্জরযুদ্ধে বহু সৈন্যের আবশ্যক। সেনা সংগৃহীত হইতেছে, অবিলম্বে মহাকুমার বাক্‌পাল লক্ষ সেনা লইয়া কান্যকুব্জে যাইবেন। ইহা শুনিয়া বরাহরাত মধ্যদেশে সর্ব্বানন্দের অনুসন্ধানের জন্য রাজপুত্রকে অনুরোধ করিতে গর্গদেবকে পত্র লিখিলেন। মহামন্ত্রী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বাক্‌পাল সর্ব্বানন্দের সন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বর্ষান্তে বাক্‌পালদেব কান্যকুব্জ যাত্রা করিলেন।

একদিন অপরাহ্নে ঢেক্করীয় নগরে একটি অট্টালিকার সম্মুখে বসিয়া জনৈক মলিনবেশা যুবতী নারায়ণের সান্ধ্যপূজার আয়োজন করিতেছিলেন; অট্টালিকার অলিন্দে বসিয়া আর-একটি যুবতী শিশুপুত্র ক্রোড়ে লইয়া প্রথমার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। দ্বিতীয়া বলিতেছিলেন, "ঠাকুরঝি, এত দাসদাসী থাকিতে তুমি নিজে পরিশ্রম করিয়া শরীর নষ্ট করিতেছ কেন?"

প্রথমা নূতন প্রদীপে ঘৃত দিতে দিতে কহিলেন, "কি করিব বউ, কাজ লইয়া ভাল থাকি। যদি একা বসিয়া থাকিতে হইত তাহা হইলে এতদিনে বোধ হয় পাগল হইয়া যাইতাম।"

"অত ভাবিও না, সে কোথায় যাইবে? এইখানে তাহার মন বাঁধা আছে। সে একদিন ফিরিবেই ফিরিবে।"

"কৈ ফিরিলেন বউ, দেখিতে দেখিতে বৎসর ফিরিতে চলিল। যিনি আমাকে না দেখিলে আত্মহারা হইতেন, একদণ্ডে জগৎ অন্ধকার দেখিতেন, তিনি কেমন করিয়া এতদিন আমাকে না দেখিয়া আছেন? তিনি কি আর আছেন? থাকিলে এতদিন নিশ্চয়ই ফিরিতেন। বউ, আমাকে দেখিতে পাইবেন না বলিয়া তিনি বিদেশে যাইতেন না। আমাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে হইবে বলিয়া তিনি বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করিতে যাইতে পারেন নাই। এই হতভাগিনীর জন্যই সেই ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরখানি তাঁহার এত মধুর বোধ হইত। তিনি কেমন করিয়া আমাকে ছাড়িয়া এতদিন আছেন? তিনি নাই। তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়া রাখিয়াছ, থাকিলে এত দিনের মধ্যে একদিন আবার অমল বলিয়া কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেন।"

প্রথমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, দ্বিতীয়ার নয়নকোণেও দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি অলক্ষিতে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া ননদিনীর নিকটে নামিয়া আসিলেন এবং অমলাদেবীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "ছি দিদি, কাঁদিও না, তাঁহার অমঙ্গল করিও না। পুরুষ মানুষ, অনেকদিন গৃহে বসিয়া ছিলেন, সেইজন্যই বোধ হয় অর্থোপার্জ্জন করিতে বিদেশে গিয়াছেন।"

ভ্রাতৃবধূর কথা শুনিয়া অমলাদেবীর পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, অশ্রুর উৎস আর বাধা মানিল না, তিনি আবেগরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বউ, আমি আপন হাতে আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি; তিনি স্বেচ্ছায় বিদেশে যান নাই, আমিই তাঁহার দেশত্যাগের মূল।"

কণ্ঠরুদ্ধ হইল, অমলাদেবীর ভ্রাতৃবধূ ননদিনীকে শান্ত করিবার জন্য কহিলেন, "তাহাতে তোমার দোষ কি বোন?" কিন্তু তাঁহার কথায় বিপরীত ফল হইল। অমলাদেবী আকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও কথা বলিও না বলিও না, আমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তিনি এই হতভাগিনীকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেন নাই, আমিই তাঁহাকে গৃহত্যাগী করিয়াছি। বউ, তখনও দেবতা চিনিতে পারি নাই, তিনি কে তাহা বুঝিতে পারি নাই, সেইজন্যই আমার এমন সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি ইচ্ছা করিয়া সিংহাসন হইতে দেবতা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছি; এখন আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। সে দেবতা কি আর ফিরিবে? তিনি কি আবার ফিরিয়া আসিবেন? আর কি কখনও কুটীরদ্বারে দাঁড়াইয়া অমলা বলিয়া ডাকিবেন? তাঁহার চঞ্চল নয়ন দুইটি আর কি কখনও গৃহকোণে আমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে?"

ননদিনী ও ভ্রাতৃজায়া অট্টালিকার সম্মুখে বসিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অমলার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র পূজার উপকরণ লইয়া চারিদিকে ছড়াইতে লাগিল। দুইজনের একজনও তাহা দেখিতে পাইলেন না। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, গৃহে গৃহে দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল, ঢেকরীয় গ্রামের গৃহে গৃহে শঙ্খঘণ্টার মঙ্গলধ্বনি আরম্ভ হইল। তখন অমলাদেবীর জ্ঞান হইল, তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পূজার আয়োজন করিতে বসিলেন। এমন সময় কে ডাক দিল। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া আহ্বানকারী দূর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "অমলা, ভয় নাই, আমি।"

অমলাদেবী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কে? দাদা?"

উত্তর হইল, "হাঁ।"

"আমরা তোমার কণ্ঠস্বর চিনিতে না পারিয়া বড় ভয় পাইয়াছিলাম। ফিরিতে এত রাত্রি হইল যে?"

"গৌড় হইতে বড় দুঃসংবাদ আসিয়াছে, সেইজন্য কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইল।"

"কি সংবাদ দাদা? তিনি কি তবে নাই?"

"না অমল, সে কথা নহে। আমাদিগের নূতন সেনা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, মহারাজাধিরাজ গুর্জ্জরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন, তাহারা কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া লইয়াছে।"

অমলাদেবী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ওঃ।"

ভ্রাতা, ভগিনী ও ভ্রাতৃজায়া নীরবে অট্টালিকার প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয়ভাগ সমাপ্ত।

চতুর্থ ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

খাদ্যান্বেষণে।

ধর্ম্মপালদেব সসৈন্যে কান্যকুব্জের দিকে ফিরিলেন। দুই তিন দিনের পথ অগ্রসর হইয়াই তাঁহারা গুর্জ্জর রণনীতির বিশেষ পরিচয় পাইলেন। তাঁহারা যতই কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই দেখিতে লাগিলেন যে, দেশ জনশূন্য, গ্রাম ও নগর-সমূহ অগ্নিদাহে বিনষ্ট, ক্ষেত্রসমূহে নবজাত শস্য হস্তী ও অশ্বের পদদলিত; কান্যকুব্জরাজ্যের অবস্থা দেখিয়া ধর্ম্ম-পালদেবের গোপালদেবের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্বে গৌড়-দেশের অবস্থা মনে পড়িয়া গেল। দুই তিন দিন পরে সেনাগণের এবং ভারবাহী পশুগণের আহার্য্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ভীষ্মদেব অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। গৌড়ীয় সেনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। অশ্বারোহী সেনা লইয়া জয়বর্দ্ধন, বিমলনন্দী, কমলসিংহ প্রভৃতি নায়কগণ প্রতিদিন প্রভাতে দূরে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে যাইতেন; তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে, গুর্জ্জর অশ্বারোহীগণ দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া গ্রামবাসীগণকে হত্যা করিয়া গিয়াছে, গ্রামে বা নগরে অগ্নিসংযোগ করিয়া গিয়াছে, আহার্য্যদ্রব্য ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা আহার্য্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে গুর্জ্জরগণ তাঁহাদিগকে বাধা দিত না, কিন্তু আহার্য্য সংগৃহীত হইলে শকুনির ন্যায় সহস্র সহস্র গুর্জ্জর অশ্বা-রোহী আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিত, অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গৌড়ীয় সেনানায়কগণকে সংগৃহীত আহার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইত। গৌড়ীয় সেনাদলে দিন দিন অশ্বারোহীর সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল, অথচ এইরূপ যুদ্ধে অশ্বারোহী সেনারই আবশ্যক, পদাতিক সেনা নিষ্প্রয়োজন। অর্দ্ধাহারে, কখনও অনশনে পথ চলিয়া গৌড়েশ্বর দশমদিবসে কান্য-কুব্জ নগরে পৌঁছিলেন। গুর্জ্জর নায়কগণ তাঁহাকে বিনা বাধায় অবরুদ্ধ নগরে প্রবেশ করিতে দিলেন। কিন্তু সেনাপতি ভীষ্মদেব গঙ্গাতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে, লক্ষ লক্ষ গুর্জ্জরসেনা তাঁহাদিগকে আক্র-মণ করিয়া পরাজিত করিল, ভীষ্মদেব বাধ্য হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন পঙ্গপালের ন্যায় গুর্জ্জরসেনা কান্যকুব্জ নগরের চারিদিক বেষ্টন করিল।

নগরে প্রবেশ করিয়াই ভীষ্মদেব মন্ত্রণা করিতে বসি-লেন। নূতন গৌড়ীয়সেনা তখনও বহুদূরে, শতক্রোশের মধ্যেও কোনস্থানে মিত্রসেনা নাই। নগরে পানীয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু আহার্য্য সামগ্রী অধিক নাই; সুতরাং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ভীষ্মদেব সকলকে এইকথা বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন, "যুদ্ধে কোন ক্ষত্রিয়ই ইচ্ছা করিয়া পশ্চাৎপদ হয় না, কিন্তু অনর্থক বলক্ষয়ের কোনই আবশ্যক নাই। নগরে সহস্র সহস্র অধিবাসী আছে, সহস্র সহস্র সেনা আছে, তাহাদিগের অন্নসংস্থান কতদিন হইতে পারে?"

চক্রায়ুধ কহিলেন, "একমাসের অধিক নহে।"

"তাহার পরে কি হইবে?"

"পরাজয় অথবা মৃত্যু!"

"মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যোদ্ধা অস্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং সে মৃত্যুকে ভয় করে না। পরা-জয়ে অপমান আছে, দীর্ঘকাল অর্দ্ধাশনে অবরুদ্ধ থাকিলে নাগরিকগণ স্থির থাকিবে না, সুতরাং তখন ভিতরে বাহিরে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে!"

এই সময়ে ধর্ম্মপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে উপায় কি?"

ভ.ষ্ম।— আমার মতে কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত। নূতন সেনা লইয়া মধ্যদেশ অধিকার করিতে অধিক দিন লাগিবে না। তবে অধিকৃতভূমি বিনাযুদ্ধে পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই দুঃখের বিষয়।

ধর্ম্ম।— ভীষ্মদেব! আমি বিনাযুদ্ধে কান্যকুব্জরাজ্য পরিত্যাগ করিতে অশক্ত। আমরা যদি যুদ্ধে নিহত হই, তাহা হইলে গৌড়ের কোন ক্ষতি হইবে না; কিন্তু পশ্চাৎপদ হইলে গুর্জ্জরগণ চিরকাল গৌড়ীয়সেনার অপ-যশ ঘোষণা করিবে।

ভীষ্ম।— কিন্তু মহারাজ, পশ্চাৎপদ হওয়া পরাজয় নহে—

ধর্ম্ম।—তাহা হইবে না ভীষ্মদেব। নগর-মধ্যে সহস্র সহস্র গৌড়ীয়সেনা আছে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা মরিতে প্রস্তুত আছে তাহারা আমার সহিত থাকুক, অবশিষ্ট সেনা লইয়া আপনারা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া যান। নূতন সেনা ও আহার্য্য লইয়া আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

ভীষ্ম।— মহারাজ, আমি বৃদ্ধ, আমি ফিরিয়া যাইব, আর আপনাকে এই শত্রুবেষ্টিত দুর্গমধ্যে রাখিয়া যাইব? ইহাই কি গৌড়েশ্বরের ন্যায়বিচার?

ধর্ম্ম।— ভীষ্মদেব, এই আমার প্রথম অভিযান, আমি বিনাযুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইব না।

ভীষ্ম।— মহারাজ, আমি আপনাকে শত্রুবেষ্টিত কান্যকুব্জে রাখিয়া কোন মুখে দেশে ফিরিব?

সেই স্থানে প্রধান প্রধান গৌড়ীয় সামন্ত ও নায়কগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কৌতুকপূর্ণ নেত্রে উভয়ের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এই সময়ে জয়বর্দ্ধন বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে কাহারও ফিরিবার প্রয়োজন নাই।" পশ্চাৎ হইতে রণসিংহ কহিলেন, "আছে জয়বর্দ্ধন। অবরুদ্ধ দুর্গে প্রতিদিন বলক্ষয় হইয়া থাকে, নূতনসেনা ও আহার্য্য সংগ্রহের জন্য ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক।"

ভীষ্ম।— তবে তাহাই হউক। দুর্গে এখন কত অশ্বারোহী আছে?

বিমলনন্দী।— পঞ্চবিংশ সহস্রের অধিক নহে।

ভীষ্ম।— পঞ্চবিংশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কে প্রতিষ্ঠানে ফিরিতে প্রস্তুত আছে?

বিমল।— সকলেই।

ভীষ্ম।— নন্দীপুত্র কি ব্যঙ্গ করিতেছ?

বিমল।— প্রভু, আপনাকে বিদ্রূপ করে এমন সাহস কাহার আছে। তবে বিমলনন্দী পঞ্চবিংশ সহস্র অশ্বারোহী পাইলে ভিল্লমালে যাইতে প্রস্তুত আছে, প্রতিষ্ঠান দূরের কথা।

ভীষ্ম।— বিমল, অবরুদ্ধ নগরে অশ্বারোহী সেনার কোনই প্রয়োজন নাই। সমস্ত অশ্বারোহী না পাঠাইলে অশ্বের আহার্য্য যোগাইতে হইবে।

ধর্ম্ম।— তাত, তাহার জন্য চিন্তিত হইবেন না। দশ সহস্র সেনা লইয়া কে গুর্জ্জর স্কন্ধাবার ভেদ করিতে প্রস্তুত আছে?

জয়বর্দ্ধন।— আমি।

কমলসিংহ।— আমি মহারাজ।

বিমল।— মহারাজ আমি পঞ্চসহস্র সৈন্য পাইলেও যাইব।

ভীষ্ম।— একাধিক সামন্তের যাইবার আবশ্যকতা নাই।

ধর্ম্ম।— বিমল, তুমি যাইতে পাইবে না।

বিমলনন্দী ক্ষুণ্নমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

"অপরাধ নহে বিমল, অন্য কার্য্য আছে।"

ভীষ্ম।— জয় ও কমল উভয়েই যাইতে প্রস্তুত আছে, মহারাজ কি আদেশ করেন?

ধর্ম্ম।— জয়বর্দ্ধনকে প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করুন।

কমল।— আমি কি অপরাধ করিলাম মহারাজ?

ধর্ম্ম।— তোমরা আমাকে পাগল করিবে দেখিতে পাইতেছি। অপরাধ নহে কমল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধে যাইবে।

কমল।— আপনার সহিত?

ভীষ্ম।— মহারাজ, কোথায় যুদ্ধে যাইবেন?

ধর্ম্ম।— সে কথা পরে বলিতেছি। জয়, তুমি কল্য প্রত্যূষে যাত্রা করিবে, যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিবে, যত শীঘ্র পার প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইবে। নূতন সেনা যত পার সংগ্রহ করিয়া আনিবে এবং অশ্বারোহী সেনা লইয়া প্রতিষ্ঠানের পথ মুক্ত রাখিবে। প্রয়াগ হইতে গৌড়ে বলিয়া পাঠাইও যে লক্ষ পদাতিক ও পঞ্চাশৎসহস্র অশ্বারোহী সেনা আবশ্যক।

জয়।— উত্তম। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

ভীষ্ম।— মহারাজ, অবশিষ্ট অশ্বারোহী?

ধর্ম্ম।— তাত, কল্য প্রাতে আমিও যুদ্ধে যাইব।

ভীষ্ম।— মহারাজ?

"হাঁ। আমি, কমল ও বিমল অবশিষ্ট অশ্বারোহী সেনা লইয়া পশ্চিমদিকে আহার্য্যের সন্ধানে যাইব।"

"পশ্চিমদিকে?"

"হাঁ। জয় পূর্ব্বদিকে যাইতেছে, আমি পশ্চিমদিকে যাইব।"

এই সময়ে রণসিংহ, প্রমথসিংহ, বীরদেব প্রভৃতি প্রৌঢ় সেনানায়কগণ বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ আমরাও যাইব।"

ধর্ম্মপাল সহাস্যবদনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আপনারা ভীষ্মদেবের পার্শ্বরক্ষা করিবেন। আমরা অধিকদূর যাইব না, দুই-এক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।"

পরদিন প্রভাতে কান্যকুব্জ নগরের পূর্ব্বতোরণ হইতে দশসহস্র গৌড়ীয় অশ্বারোহী বাহির হইয়া গুর্জ্জর স্কন্ধাবার আক্রমণ করিল, গুর্জ্জরসেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা স্কন্ধাবার ভেদ করিয়া পূর্ব্বদিকে পলায়ন করিল। গুর্জ্জর অশ্বারোহীগণ দুই চারি ক্রোশ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ফিরিয়া আসিল। যে মুহূর্ত্তে জয়বর্দ্ধন প্রতিষ্ঠানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ধর্ম্মপালদেব পঞ্চদশসহস্র সেনা সঙ্গে লইয়া নগরের পশ্চিম তোরণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রবল ঝটিকার সম্মুখে মেঘপুঞ্জ যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, গুর্জ্জরসেনা সহসা আক্রান্ত হইয়া সেইরূপ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে পঞ্চদশসহস্র অশ্বারোহী অশ্বখুরোত্থিত ধূলির মেঘমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

* *
*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মূক-সৈনিক।

এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরে জনৈক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ সেনা প্রতিষ্ঠানদুর্গের তোরণের সম্মুখে বসিয়া ছিল, তাহার অনতিদূরে অপর কয়েকজন সেনা মৃদুস্বরে বাক্যালাপ করিতেছিল। প্রথম সৈনিক বোধ হয় অন্যান্য সেনাগণের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল না, কারণ, তাহাদিগের কথোপকথন তাহার সম্বন্ধীয় হইলেও, সে মুখ ফিরাইয়া ভাগীরথীর পরপারস্থিত আম্রকুঞ্জের উপরে অস্তাচলগামী তপনের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়াছিল। একজন সৈনিক কহিল, "দেখ ভাই, আজ কয়দিন ধরিয়া বোবার কথা আরও কমিয়া গিয়াছে। বোবা একেই ত বোবা, তাহার উপর যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া একেবারেই কথা বন্ধ করিয়াছে।"

দ্বিঃ সৈঃ।— লোকটা কে ভাই ?

প্রঃ সৈঃ।— দেখিতে ত ঠিক রাজপুত্রের মত, বোধ হয় অভিজাতবংশের লোক।

দ্বিঃ সৈঃ।— দেখ ভাই, লোকটা পণ্ডিত লোক, সেদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিবার সময়ে কত মন্ত্র আওড়াইতেছিল।

প্রঃ সৈঃ।— আমরা যেদিন সেনাপতির প্রাসাদ রক্ষা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম, সেদিন বোবা প্রাসাদের স্তম্ভে খড়ি দিয়া কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছিল। উদ্ধবঘোষ কবিতা দেখিয়া কতই সুখ্যাতি করিলেন, কিন্তু তিনি যখন লেখকের নাম জানিতে চাহিলেন, তখন বোবা কিছুতেই নিজের পরিচয় দিল না, অথচ আমি স্বচক্ষে উহাকে লিখিতে দেখিয়াছি।

দ্বিঃ সৈঃ।— কথা কহে না কেন ভাই ? আর, কি করিয়াই বা কথা না কহিয়া থাকে ? কতদিন দেশ ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি, কখনও ফিরিব কি না তাহার নিশ্চয় নাই। এখন দেশের লোকের কথা শুনিলেও প্রাণে কতটা শান্তি পাই। লোকটা কি করিয়াই বা কথা না কহিয়া থাকে ?

প্রঃ সৈঃ।— কে জানে ভাই। আমি হইলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইতাম।

সূর্য্যদেব পাতালে নামিয়া গেলেন, অন্ধকার ঘন হইয়া আসিল, দুর্গের চূড়া হইতে বারত্রয় তূর্য্যধ্বনি হইল। তাহা শুনিয়া দীর্ঘাকার সেনা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তৃণাসন ছাড়িয়া উঠিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া অন্যান্য সেনাগণও উঠিয়া দাঁড়াইল। দুর্গাভ্যন্তর হইতে আর-একদল সেনা বাহির হইয়া আসিল। দীর্ঘাকার পুরুষ তাহাদিগের নায়কের হস্তে দুর্গদ্বারের রোধনক প্রদান করিয়া সঙ্গীগণের সহিত দুর্গে প্রবেশ করিল। তোরণের অন্তর্দ্দেশে একজন বর্ম্মাবৃত সৈনিক বোধ হয় তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, দীর্ঘাকার সৈনিক দুর্গে প্রবেশ করিবামাত্র সে তাঁহাকে কহিল, "নায়ক,

সেনাপতি আপনাকে তাঁহার আবাসে আহ্বান করিয়াছেন।" দীর্ঘাকার সৈনা অন্যপথ অবলম্বন করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে সেনাপতির আবাসের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতি উদ্ধবঘোষ বোধ হয় উৎসুকচিত্তে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সৈনিক তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিল। উদ্ধবঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"নায়ক গুরুদত্ত।"

"তুমিই একবার একাকী সংবাদ সংগ্রহ করিতে রেবাতীর পর্য্যন্ত গিয়াছিলে?"

সৈনিক অভিবাদন করিল। উদ্ধবঘোষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৈনিকগণ কি তোমাকে 'মূক সৈনিক' আখ্যা প্রদান করিয়াছে?"

"হাঁ।"

"অদ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি। তুমি কখন কৌশাম্বী গিয়াছ?"

"দুই-তিনবার গিয়াছি।"

"আবশ্যক হইলে অন্ধকার রাত্রিতে যাইতে পারিবে?"

"হাঁ।"

"উত্তম। তুমি এখনই যাত্রা কর। কয়দিন যাবত প্রভাস-পর্ব্বত-শীর্ষে সমস্তরাত্রি অগ্নি জ্বলিতেছে,—ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। গুর্জ্জররাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তোমরা দেশে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ দেখিয়া এই সংবাদ তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করি নাই। মহারাজ গৌড়ে ফিরিতেছিলেন, তিনি গুর্জ্জরযুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুনরায় কান্যকুব্জে গিয়াছেন। তুমি কৌশাম্বীতে গিয়া দূর হইতে সংবাদ লইয়া আইস। আমার বোধ হয় গুর্জ্জরসেনা কৌশাম্বী-দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। পথ বিপদসঙ্কুল, রজনীর শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠানে ফিরিবার চেষ্টা করিও।"

সৈনিক অভিবাদন করিয়া ফিরিল; কিন্তু উদ্ধবঘোষ তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া কহিলেন, "গুরুদত্ত, শুনিয়া যাও।"

সৈনিক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় অভিবাদন করিল। উদ্ধবঘোষ কহিলেন, "তুমি একাকী যাইবে?"

'হাঁ।'

"যদি তুমি নিহত হও, তাহা হইলে কেমন করিয়া সংবাদ পাইব?"

"আমি যদি কল্য দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে জানিবেন যে আমার মৃত্যু হইয়াছে।"

"দ্বিতীয় ব্যক্তি সঙ্গে লইবে না?"

"না।"

"উত্তম। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

গুরুদত্ত প্রতিষ্ঠানদুর্গের প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া মন্দুরা হইতে একটি অশ্ব বাছিয়া লইলেন এবং দুর্গের বাহিরে আসিয়া অশ্বারোহণে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতিষ্ঠান হইতে কৌশাম্বী পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, বলবান অশ্ব রজনীর দ্বিতীয়প্রহরের শেষভাগে কৌশাম্বী নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইল। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগে প্রভাস-পর্ব্বত ব্যতীত অপর কোন পর্ব্বত নাই, পর্ব্বতের চারিদিক বেষ্টন করিয়া কৌশাম্বীনগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুরুদত্ত প্রতিষ্ঠান হইতেই পর্ব্বত-শীর্ষে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড লক্ষ্য করিয়া অশ্বচালনা করিতেছিলেন। তিনি নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, পর্ব্বতশীর্ষে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে। গগনস্পর্শী অগ্নিশিখাসমূহের আলোকে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, নগরপ্রাচীরের বাহিরে বিস্তৃত স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছে এবং রাত্রিকালেও গুর্জ্জরসেনা নগর আক্রমণ করিতে বিরত হয় নাই। দূর হইতেই কৌশাম্বীর অবস্থা জানিতে পারিয়া গুরুদত্ত প্রতিষ্ঠানাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একক্রোশ অতিবাহিত হইলে গুরুদত্তের মনে হইল যে বহু অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। তিনি অশ্বসমেত পথিপার্শ্বস্থিত গভীর জলশূন্য গর্ত্তে অবতরণ করিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে সহস্র সহস্র অশ্বারোহী প্রতিষ্ঠানের পথ অবলম্বন করিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহারা যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে অশ্বচালনা করিতেছিল, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে দুইএকজন অস্ফুটস্বরে কথা কহিতেছিল। একজন অশ্বারোহী গৌড়ীয়ভাষায় অপরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন পর্ব্বতে আগুন জ্বলিতেছে?"

"বোধ হয় প্রভাতে।"

"তাহা হইলে আমরা কতদূর আসিলাম ?"

"প্রতিষ্ঠানের নিকটে আসিয়াছি। প্রয়াগ বোধ হয় আর দুই প্রহরের পথ।"

তাহাদিগকে গৌড়ীয়ভাষা ব্যবহার করিতে দেখিয়া গুরুদত্তের সাহস হইল। তিনি অশ্বারোহণে স্বপথে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে "গৌড়েশ্বরের জয় হউক" বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সেনাদল দাঁড়াইল; একজন অশ্বারোহী তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?" গুরুদত্ত আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, অশ্বারোহী তাঁহাকে সেনাদলের মধ্যস্থলে জয়বর্দ্ধনের নিকটে লইয়া গেল। জয়বর্দ্ধন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, কৌশাম্বী নগর গুর্জ্জরসেনা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানে উদ্ধবঘোষ তখনও সে সংবাদ জানিতে পারেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৌশাম্বীদুর্গ রক্ষায় কে নিযুক্ত আছে ?" গুরুদত্ত কহিলেন, "নারায়ণদত্ত।"

"তাঁহার অধীনে কত সেনা আছে ?"

"দ্বিসহস্রের অধিক নহে।"

"গুর্জ্জরশিবিরে কত সেনা আছে ?"

"প্রায় দশসহস্র।"

জয়বর্দ্ধন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সেনাদলের নায়কগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা আসিলে তিনি কহিলেন, "দশসহস্র গুর্জ্জরসেনা কৌশাম্বী আক্রমণ করিয়াছে, প্রতিষ্ঠান মাত্র দুইপ্রহরের পথ, পশ্চাতে শত্রুসেনা রাখিয়া যাওয়া উচিত কি ?" নায়কগণ একবাক্যে কৌশাম্বী উদ্ধারের পরামর্শ দিলেন। জয়বর্দ্ধন গুরুদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পথপ্রদর্শন করিতে পারিবে ?"

"পারিব।"

"চল, আমরা এখনই কৌশাম্বী উদ্ধার করিব।"

একদণ্ড পরে দশসহস্র অনশনক্লিষ্ট গৌড়ীয় অশ্বারোহী ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীমবেগে গুর্জ্জরশিবির আক্রমণ করিল। গুর্জ্জরসেনা বিশ্রাম করিতেছিল, তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে জয়বর্দ্ধন স্কন্ধাবার অধিকার করিয়া কৌশাম্বী নগরে প্রবেশ করিলেন। দশসহস্র গৌড়ীয়সেনা অষ্টসহস্রের অধিক গুর্জ্জর বন্দী করিল।

দিবসের দ্বিতীয়প্রহরের শেষভাগে উদ্ধবঘোষ প্রতিষ্ঠান দুর্গের পশ্চিমতোরণে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এবং বারিম্বার কৌশাম্বীপথের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, দুর্গমধ্যে প্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সেই সময়ে কৌশাম্বীর পথে ধূলিরাশি উত্থিত হইল। অবিলম্বে জনৈক ঘর্ম্মাক্তকলেবর ধূলিধূসরিত-পরিচ্ছদ অশ্বারোহী তোরণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি উদ্ধবঘোষকে দেখিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল এবং অভিবাদন করিয়া কহিল, "সমস্ত মঙ্গল। গুর্জ্জরসেনা কৌশাম্বী অবরোধ করিয়াছিল, সেইজন্য নারায়ণদত্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া ছিলেন। কল্য রাত্রিতে জয়বর্দ্ধন গুর্জ্জরসেনা তাড়াইয়া দিয়া কৌশাম্বীতে প্রবেশ করিয়াছেন।"

"সাধু গুরুদত্ত! মহারাজের কোন সংবাদ পাইলে ?"

"তিনি কান্যকুব্জনগরে অবরুদ্ধ আছেন।"

"তবে তাঁহার সেনা চক্রায়ুধের সেনার সহিত মিলিত হইয়াছে ?"

"হাঁ।"

"গুরুদত্ত, তুমি কি জাতি ?"

"প্রভু, আমি ব্রাহ্মণ।"

"তুমি বিশ্রাম করিতে যাও; সন্ধ্যাকালে আমার আবাসে আসিও।" (ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অশ্রু ও অনুতাপ

যবে অনুতাপ সব গ্লানি পাপ করিল ভস্মচূর্ণ,
অশ্রু গঙ্গা ভাসাইল তায় দূর-দূরান্তে তূর্ণ।
অনুতাপ যবে হলকর্ষণে কোমল করিল চিত্ত,
অশ্রু শোভালো খর বর্ষণে শস্যশ্যামল বিত্তে।
অনুতাপ যবে বিজয়োন্নত দাঁড়ালো শিবির-কক্ষে
অশ্রুহীরক বিজয়মাল্য দুলিল তাহার বক্ষে।
নারায়ণ যবে অনুতাপ-রূপে অবতরিলেন মর্ত্ত্যে
লক্ষ্মী তখন অশ্রুর রূপে মিলিলেন আঁখি-বর্ত্মে।

শ্রীকালিদাস রায়।

পঞ্চশস্য।

পাস্তুর ও তাঁহার জার্ম্মান্ উপাধি (B.M.J.)।

ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জার্ম্মানীর অধ্যাপকগণ যে-সকল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে তাঁহারা একেএকে সেগুলি প্রত্যর্পণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষভাব জার্ম্মানীর হাড়ের মধ্যে কতদূর অবধি প্রবেশ করিয়াছে, এই ঘটনা হইতে তাহা স্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমাদের পাস্তুরের কথা মনে হইতেছে। পাস্তুরও এক সময়ে জার্ম্মানীর প্রদত্ত উপাধি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র ছিল।

বীজাণুর (Micro-organisms) আবিষ্কার ও উৎসেচনক্রিয়ার (Fermentation) রহস্য প্রকাশ করিয়া পাস্তুর জগতে অমরকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পৃথিবীর নানাদেশের বিদ্বৎসভা হইতে তিনি ইহার জন্য বিবিধ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে জার্ম্মানীর বন্ বিশ্ববিদ্যালয় পাস্তুরকে Doctor of Medicine উপাধি প্রদান করেন। পাস্তুর এই উপাধিটিকে বিশেষ গৌরবের জিনিস মনে করিয়া বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতেন। পারী নগরীতে বহুকাল হইতে একটি জীববিদ্যার মিউজিয়াম ছিল। শত্রু মিত্র, দেশীবিদেশী সকল ব্যক্তিই এই প্রাচীন বিদ্যামন্দিরটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে জার্ম্মান সৈনিকেরা গোলা বর্ষণ করিয়া এই প্রাচীন মন্দিরটিকে ধূলিসাৎ করে। ইহাতে পাস্তুরের মনে ভীষণ ক্রোধের উদয় হয়। ৮ই জানুয়ারী তারিখে তিনি বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে একখানি পত্র লিখেন। পত্রখানিতে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত উপাধিকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহার উল্লেখ করিয়া, পরে লেখেন—"কিন্তু এখন আপনাদের প্রদত্ত সনন্দখানি দেখিলেই আমার মনে প্রবল ঘৃণার ভাব উদয় না হইয়া যায় না। ইহা আর এখন আমার নিকট গৌরবের জিনিস নয়, বিজাতীয় অপমানের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে লোকটাকে আমার দেশবাসীরা একটা পরম অভিশাপের স্বরূপ জ্ঞান করিতেছে, তাহার নামাঙ্কিত পত্রে আমার নাম থাকিতে দেখা, আমার পক্ষে এখন একেবারে অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আপনি ও অন্যান্য খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ যাঁহারা এই সনন্দে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার পূর্ব্বেকার শ্রদ্ধার কিছুমাত্র হ্রাস না হইলেও এই ডিপ্লোমাখানি আমি আর রাখিতে পারি না। এই পত্রের সহিত ডিপ্লোমাখানি আপনাদের প্রত্যর্পণ করিলাম। আপনাদের ক্যালেণ্ডার (Calendar) ও সীণ্ডিকেটের (Syndicate) অন্যান্য কাগজপত্র হইতে আমার নামটি কাটিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত জ্ঞান করিব। আমার এই ব্যবহার নিশ্চয় আপনাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের এ অবস্থায় যাহা করা উচিত, আমি তাহাই করিয়াছি মাত্র। যে দুর্বৃত্ত নিজের পাপ-অহমিকাবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠজাতির সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার ভণ্ডামি ও নিষ্ঠুরতা আমার হৃদয়ে কী ভীষণ রোষাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে, ডিপ্লোমাখানি ফিরাইয়া দিয়া আমি তাহাই প্রকাশ করিলাম মাত্র।"

জার্ম্মানী হইতে পাস্তুর এই পত্রের যে উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহারও বিশেষত্ব বড় কম ছিল না। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

"মহাশয়,

নিম্নস্বাক্ষরকারী যিনি এখন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-সম্মিলনী বিভাগের অধ্যক্ষের পদে অধিরূঢ় আছেন, তিনি সম্মিলনীর আদেশানুসারে আপনাকে জানাইতেছেন যে আপনি মহামহিমান্বিত সম্রাট উইলহেল্মের অবমাননা করিয়া সমস্ত জার্ম্মানীঋণীর অসম্মান-ভাজন হইয়াছেন।

(স্বাক্ষর) ডাঃ মরিস নৌম্যান্।

পুঃ

আপনার হস্তলিপি রাখিলে সম্মিলনীর দপ্তরখানা কলঙ্কিত হইবে বলিয়া আপনার পত্রখানি ফেরত দেওয়া গেল।"

পাস্তুর এই শিষ্ট পত্রখানির প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া লিখিলেন—

"অধ্যক্ষ মহাশয়, কালের এমনও পরিবর্ত্তন হয়, যে সময় জার্ম্মানীর ঘৃণা ফরাসীর কাছে গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়—ঠিক সেই রকম গৌরব বার্দ্ধ ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে আমাকে আপনারা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বড় পরিতাপের বিষয়, যে, আপনার আমার মত যাহারা আজীবন শুধু সত্য ও উন্নতিরই অনুসরণ করিয়াছে তাহারা নিজেদের মধ্যে এরূপ অশিষ্টভাবে পত্রবিনিময় করিবে। আপনাদের সম্রাট বর্ত্তমান যুদ্ধব্যাপারটিকে যেরূপ দাঁড় করাইয়াছেন, ইহা তাহারই একটা ফল মাত্র। আপনি কলঙ্কের কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার পত্র প্রত্যর্পণ করিলেই কি জার্ম্মানী কলঙ্কমুক্ত হইল বিবেচনা করেন? এই যুদ্ধে আপনার দেশবাসীরা যে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা যুগযুগান্তর ধরিয়া বিরাজ করিতে থাকিবে, এ আপনি নিশ্চয় জানিবেন।"

পাস্তুর যাহা বলিয়াছিলেন, এ সময়ও জার্ম্মানদের প্রতি তাহা যে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ না হয় এমন নহে। অর্দ্ধশতাব্দীর শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা জার্ম্মান অধ্যাপকগণের প্রকৃতির ও জার্ম্মান সৈনিক-দিগের নিষ্ঠুরবৃত্তির কোনই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে নাই।

* * *

সমর-সঙ্গীত (B. M. J.)।

বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে যে-সকল কবিতা রচিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদের মধ্যে ভাল মন্দ মাঝারি সকল রকমেরই কবিতা আছে। ইংলণ্ডের রাজকবি রবার্ট ব্রীজেস্, কিপ্‌-লিঙ্, উইলিয়াম্ ওয়াট্সন্ প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিগণও যে একবারে নীরব আছেন, তাহা নহে। লোকে কিন্তু ইহাঁদের বীণার তারে যে-পরিমাণ ঝঙ্কারের আশা করিয়াছিল, এখনপর্য্যন্ত তাহার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। বর্ত্তমান মহাসমর তাঁহাদের কবিতা-সুন্দরীকে যেন ততখানি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। ইহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, বিষয়টা এত ভীষণ, ইহার ঘটনারাজি এতই হাতের নিকটে এবং কবিদের নিজের স্বার্থ ইহার সহিত এরূপ ভাবে জড়িত, যে, খুব ওস্তাদ আর্টিষ্টের পক্ষেও এ অবস্থায় আর্টকে বাঁচাইয়া, বিশুদ্ধ কলানুরাগীর মনের ভাব লইয়া কবিতা রচনা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। মেসেনিয়ান যুদ্ধকালে কবি টিরটিউসের সমরসঙ্গীতগুলি স্পার্টান্ যোদ্ধাদের হৃদয়ে বীররসের উদ্রেক করিত। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে যে-সকল যুদ্ধসঙ্গীত গীত হয় সেগুলি গানের মজলিসের পক্ষে যতটা উপযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের পক্ষে ততটা নহে। ক্যাম্বেল্ বা ডিবিডিনের সমরসঙ্গীতগুলি সৈনিকদের মধ্যে কোন সময়েই সেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই।

"It's a long, long way to Tipperary" নামক সঙ্গীতটিই আজকাল সৈনিকদের সকলের অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। আশ্চর্য্য এই যে এই প্রসিদ্ধ গীতটির রচনার সহিত যুদ্ধের কোনই সম্বন্ধ নাই। সৈনিক-বিভাগে নূতন-প্রবিষ্ট যোদ্ধারা হ্যাম্পষ্টেড্ হীথ বা কাওয়াজের (drilling) ক্ষেত্রে যাত্রাকালে "John Brown's body lies mouldering in the dust" নামক সুন্দর গীতটি গান করিতে থাকে। আমেরিকার ঘরোয়া যুদ্ধ উপলক্ষে এ সঙ্গীতটি রচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে যে-সকল গান রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে হেরল্ড্ বেগবি প্রণীত "The homes they leave behind" নামক গানটিই আমাদের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। ওয়াল্টার রুবেল এই গানটিতে সুরযোজনা করিয়া দিয়াছেন। এনক ও পুত্রগণ ইহার স্বরলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইবে, তাহার প্রায় সমস্ত অংশটাই জাতীয়-সাহায্য-ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে। এই গানটির কথা ও সুর উভয়ই খুব উপযোগী হইয়াছে। স্বদেশভক্তদের হৃদয়ে দেশানুরাগ জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে ইহার যে শক্তি আছে একথা আমরা স্বীকার করি। সঙ্গীতটি রচনাকালে কবির মনে কিরূপ ভাবের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছিল নিম্নের কয়পঙ্‌ক্তি হইতেই তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।—

"Men are rolling up in thousands,
And they've flung their jobs behind,
They have kissed their girls and mothers,
And they've told them not to mind.
You have called them to the colours
Where the battle breaks and foams ;
Well ! They're rolling up in thousands,
It's for you to help their homes."

কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে চলেছে সেনা
পিছনে ফেলিয়া ঘরকন্নার লেনা ও দেনা ;
বিদায় নিয়েছে মাতারে প্রণমি প্রিয়ারে চুমি,
বলেছে তাদের, যা হবার হবে ভেবোনা তুমি ;
ডেকেছ তাদের নিশানের তলে হইতে জড়ো,
যুদ্ধের ঝড়ে মরণের বান যেথায় বড় ;
ডেকেছ বলিয়া হাজারে হাজারে তারা ত আসে,
গৃহ পরিবার রহিল তাহার তোমারই আশে।

ডাক্তার এফ্ বার্ক্কার ওয়েলস্ এই যুদ্ধ উপলক্ষে দুখানি ক্ষুদ্র গীতি-কাব্য লিখিয়াছেন। এই পুস্তকদ্বয়ের লাভের অংশও জাতীয়-সাহায্য-ভাণ্ডারে প্রেরিত হইবে। পুস্তক দুখানির নাম—"1914, a War Poem" ও "The Roll of the Drum." প্রথম খানিতে কবি কাইজারকে নিন্দা করিয়াছেন এবং শেষে যাহা ঘটিবে পাঠককে তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন :—

"The Teuton sword shall yet be sheathed in shame
And every blade engraven "Ichabad"."

জার্ম্মানীর তরবারি খাপে মুখ গুঁজিবে লজ্জায়,
প্রত্যেক ফলকে তার লেখা হবে 'ঘোর পরাজয়'।

দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে ইংরেজ সৈন্যের বীরত্ব ঘোষিত হইয়াছে ;—

"They hail from the castle and slum ;
They heed not the wounds that are galling ;
They die to the roll of the drum."

প্রাসাদ-দুলাল এসেছে যুদ্ধে এসেছে জীর্ণ কুটিরবাসী,
যন্ত্রণা দুখ কত ক্ষতি কত অক্লেশে তারা সহিছে হাসি।
মরণযাত্রা করিছে তাহারা যেমনি বাজিছে ভেরী ও বাঁশি।

* *
*

বর্ত্তমান যুদ্ধব্যাপারে জার্ম্মান মনীষীগণের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপ্রকাশ—(B. M. J.)।

ইউরোপে এই যে ভীষণ সমর চলিতেছে, তাহাতে যে শুধু জার্ম্মানীর লোক-সাধারণের মতিভ্রম ঘটিয়াছে তাহা নহে, জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণও ইহার হাত এড়াইতে পারেন নাই। অথবা ইহাও সম্ভব হইতে পারে—টিউটনিক জাতির মনের মধ্যে যে স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা ছিল, এই যুদ্ধব্যাপারে তাহা স্পষ্টাকারে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্কীর্ণ মনের ধর্ম্মই এই যে, ইহা উদার ভাবে কোন বিষয় বিচার করিতে পারে না : নিজের মতটিকে বজায় রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল যুক্তির অবতারণা করিতে থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানদের যে কোন দোষ নাই, এই কথাটি প্রমাণ করিবার জন্য জার্ম্মান পণ্ডিতগণ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। এমন কি, অধ্যাপক হুগো মুনষ্ট্যারবুর্গ যিনি নবাবিষ্কৃত মনোবিজ্ঞান (Psychology) বিদ্যার জন্মদাতা বলিলেই হয়, তিনিও ইহার হাত হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই। তিনি আমেরিকাবাসীদের বুঝাইতে চাহেন যে, তাঁহার দেশবাসীরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ : জার্ম্মানীর উন্নতিতে ঈর্ষাপরায়ণ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের অত্যাচার হইতে আত্ম-রক্ষার জন্যই তাঁহাদের এই যুদ্ধ-অভিযান। অধ্যাপক হেকেলও এই একই সুরে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই-সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত সত্যঘটনা সম্বন্ধে কি করিয়া সহসা এরূপ অন্ধ হইয়া পড়িলেন, আমাদের নিকট তাহা আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। বার্লিনের মনোবিজ্ঞান পরিষদের (Berlin Society of Psychology) সভাপতি অধ্যাপক এলবার্ট মোল এই যুদ্ধসম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে অধ্যাপক মহাশয়ের সরলতাও যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যদিকে নির্লজ্জতাও কম প্রকাশ পায় নাই। জার্ম্মান সৈন্যগণ বেলজিয়ামে যে-সকল পাশব আচরণ করিয়াছে, ইনি মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে সে-সকল সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অধ্যাপক মোল্ (Moll) আমাদের বুঝাইতে চাহেন এসব আকস্মিক উত্তেজনা (hysteria) ও চিত্তভ্রমের (hallucinations) লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; রমণীর সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে, নিরপরাধ আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে, গৃহগুলি আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, শান্তিপূর্ণ দেশটা মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, এ সকলই সত্য ; কিন্তু এ-সকলের জন্য জার্ম্মানীকে দোষ দেওয়া অন্যায় ; বেলজিয়ামের গভর্ণমেণ্ট বেলজিয়ামবাসীদের এতদিন ধরিয়া যে অজ্ঞানের মধ্যে রাখিয়াছিল ইহা তাহারই প্রায়শ্চিত্ত : বেলজিয়ানরা এতদিন ধরিয়া যেন একটা মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, জার্ম্মানী তাহাদের সেই মোহপাশ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে ; জ্ঞান যে কি পদার্থ জার্ম্মানদের নিকট হইতে বেলজিয়ানরা আজ তাহা শিক্ষা করিতে সমর্থ হইল। আমাদের আশা আছে বেলজিয়াম এ শিক্ষা ইহ জীবনে আর ভুলিতে পারিবে না। জার্ম্মানীর অত্যাচারে বেলজিয়ামে যে কমিশন্ বসিয়াছিল, ডাক্তার মোল্ সেই কমিশনের মন্তব্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। কমিশন না হয় মিথ্যাই বলিল—কিন্তু লুভ্যাঁর

ধূমায়মান ভগ্নাবশেষগুলি? তাহারাও কি মিথ্যা বলিতেছে? রীমস ও মালাইনসের ভগ্নদশাপ্রাপ্ত গির্জাগুলি? তাহারাও কি মিথ্যা বলিতেছে? জার্ম্মানরা যেখানেই সুবিধা পাইয়াছে অকারণ রক্তপাত এবং ধ্বংসের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। তথাপি ডাক্তার মোল্ অতিশয় মিষ্ট কথায় আমাদের বলিতে চাহেন বেল্‌জিয়ান্‌দের অজ্ঞতাই এই অনর্থের একমাত্র কারণ। এই-সকল দেখিয়া আমাদের বলিতে হয়—প্রবল দেশানুরাগ মনোবিজ্ঞান-পরিষদের সভাপতির সাধারণ জ্ঞান (Common sense) ও মনুষ্যত্বকে একবারে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কিম্বা তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞানেই আমাদের প্রতারিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। ডাক্তার মোলের নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে, তিনি হতভাগ্য বেল্‌জিয়ান্‌দের উপর তাঁহার মনোবিজ্ঞান খাটাইতে চেষ্টা না করিয়া তাঁহার স্বদেশের মহাপ্রভুদের প্রতি খাটাইতে চেষ্টা করুন না কেন। ইহাতে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। হিষ্টিরিয়া (hysteria), মতিভ্রম (hallucination), গর্ব্বোন্মাদ (megalomania) প্রভৃতি অনুশীলনের পক্ষে জার্ম্মানী এ সময় খুবই উপযুক্ত ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইক্‌স-লা-শাপেলের ডাক্তার কাউফমান (Dr. Kaufmann) কোয়েলনিশে ট্সাইটুং (Koelnische Zeitung) পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ডাক্তার মোলকে সেখানি পড়িয়া দেখিতে বলি। জার্ম্মান সৈনিকদের সত্য-মিথ্যার জ্ঞান কিরূপ লোপ পাইয়াছে পত্রখানি পড়িলেই ডাক্তার মোল্ তাহা বুঝিতে পারিবেন। হিষ্টিরিয়া ও মতিভ্রম শুধু যে বেলজিয়ানদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে, তাহা নহে; তাঁহার দেশবাসীরা এসকলের দ্বারা কম আক্রান্ত নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

জার্ম্মানীর মনের জোর সম্বন্ধে ব্যার্গসঁর অভিমত।

বুলেতাঁ দা আর্মে পত্রিকায় ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত আঁরি ব্যার্গসঁ জার্ম্মানীর অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে—জার্ম্মানীর উদ্যম ও উৎসাহ মিথ্যা আদর্শে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং সে মিথ্যা যেদিন ধরা পড়িবে সেদিন জার্ম্মানীর সমস্ত উদ্যম উৎসাহ বালির-উপর-ভিত-গাড়া ইমারতের মতন এক নিমেষে হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইবে। মনের জোরই জোর। তাহার একবার অভাব ঘটিলে বস্তুপুঞ্জের অজস্র আয়োজনও কাহাকেও আর বলীয়ান করিয়া রাখিতে পারে না। ব্যক্তির বেলা যেমন, জাতির বেলাও তেমনি, নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ আদর্শেই তাহার শক্তির উৎস নিহিত থাকে; যখন মানুষ বাহিরের চাপে দমিয়া যাইতে থাকে তখন তাহাকে সেই বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আদর্শই বল জোগায়। জার্ম্মানী ফ্রান্সের মহাবিপ্লবের নিকট হইতে যে ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষা ও পরস্বত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও মনুষ্যত্বের প্রতি সম্ভ্রম করিতে শিক্ষা করিয়াছিল তাহা এখন সে অগ্রাহ্য করিয়া 'জোর যার মুলুক তার' নীতি অনুসরণ করিতেছে। জোরের দাবি ছাড়া যে আরও অন্যরকম দাবি মনুষ্য-সমাজে থাকিতে পারে সে কথা জার্ম্মানী ভুলিয়া বসিয়াছে। কিন্তু গায়ের জোরই জগতে একমাত্র জোর নয়, আর তাহার দাবিই একমাত্র দাবি নয়; ন্যায়ধর্ম্মের দাবিই বড় দাবি এবং মনের জোরই বড় জোর। জার্ম্মানী গায়ের জোরে জোরালো মনে করিয়া নিজেকে খুব তারিফ করিতেছে, এবং তাহাই এখন তাহাকে গতিশক্তি ও উদ্যম জোগাইতেছে; তাহার বস্তুপুঞ্জের প্রতি নির্ভরতাই এখন তাহার মনের জোরের কারণ; এই বস্তুপুঞ্জ যখন নিঃশেষ হইয়া যাইবে বা একবার যখন সে বুঝিবে যে এত আয়োজন সত্ত্বেও সে শত্রুর দেশ জয় করিয়াও মন জয় করিতে পারে নাই, বা একবার বলের পরাজয়ে তাহার বলের মোহ যখন টুটিয়া যাইবে, তখন আর সে আপনাকে ঠেকনো দিয়া খাড়া করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। জার্ম্মানী আপনার পুঁজি ভাঙিয়া খাইতেছে, নূতন সঞ্চয়ের পথ সে রাখে নাই; সে আপনাকে আপনি অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে, যে-সমস্ত শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষ বা জাতিকে নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত করে তাহা হইতে সে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। শক্তি ইন্ধনের ন্যায় অল্পে অল্পে আপনাকে ক্ষয় করিয়া সাহস উৎপন্ন করে; কিন্তু জার্ম্মানী শক্তি ও সাহস একসঙ্গেই খরচ করিতেছে—তাহার দেউলিয়া হইতে আর দেরি নাই, তাহার জাতীয় জীবনের চুল্লী শীঘ্রই ভস্মসার হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

* *
*

প্রসাধন-চিত্র—

আমেরিকার চিত্রকর শ্যানলেয়ার (Chanler) প্রসাধন-চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রতীচ্য শিল্পে প্রাচ্য শিল্পপদ্ধতি প্রবেশ করাইয়াছেন। এজন্য শিল্প-সমঝদারেরা তাঁহাকে রুশ চিত্রকর বাক্‌স্টের সহিত তুলনা করেন। (বাক্‌স্টের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে)।

রঙের লুকোচুরি।
জিরাফগুলি গাছের ফাঁকের আলোছায়ার ন্যায় চিত্রকরা বলিয়া চট করিয়া শত্রুর চোখে পড়ে না। শ্যানলেয়ার এই ব্যাপারটিকে সুসমঞ্জসভাবে প্রসাধন-চিত্রের বিষয় করিয়াছেন।

শ্যানলেয়ার আপনার ছবিতে প্রাচ্য দৃশ্য, প্রাচ্য জীব জন্তু, প্রাচ্য অবাস্তব অঙ্কনরীতিতে চিত্র করিয়া প্রতীচ্য বস্তুতন্ত্র শিল্পে খুব একটা নাড়া দিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত জীবজন্তুগুলি বস্তুতন্ত্রতা বা বাস্তবিকতার কাছে ঘেঁসে না; গাছপালাগুলি মনগড়া (conventional); জলস্রোত বা তরঙ্গমালা ফটোগ্রাফের হুবহু নকল হইতে একেবারেই

জঙ্গলের দৃশ্য।
জঙ্গলের বিচিত্র গাছপালা ও জন্তু জানোয়ার মিলিয়া স্ট্যানলেয়ায়ের হাতে সুন্দর একখানি প্রসাধন চিত্র গড়িয়া তুলিয়াছে।

বিভিন্ন। এই ভাবুক চিত্রকর জীবজন্তু ও তাঁহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের দৃশ্য মিলাইয়া যে অবাস্তব মনগড়া চিত্র অঙ্কিত করেন তাহা সবটা মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে; দর্শকের মনে বিচিত্র রস ও ভাব সঞ্চার করে; এবং এইখানেই শিল্পের সার্থকতা এবং ইহাই প্রাচ্য শিল্পের প্রাণের কথা।

গদ্য-লেখকেরা কবির ন্যায় বাচাল নয়—

কবিদের ভারি সুবিধা—জুতসই করিয়া দু লাইন লিখিলেই তাহাদের একটা কিছু বলা হইয়া যায়, গদ্য লেখককে তাহার জায়গায় অন্তত এক পাতা লিখিতে হয়।

কমার্সিয়াল আপীল পত্রিকায় একজন লেখক এজন্য দুঃখ করিয়াছেন যে যুদ্ধ বাধিতে-না-বাধিতে সকল দেশের কত কবিই কত না কবিতা লিখিলেন; কিন্তু একজনও ঔপন্যাসিক যুদ্ধ লইয়া এ পর্য্যন্ত একখানা উপন্যাস, এমন কি একটা ছোটগল্পও, লিখেন নাই।

আগেকার কালে মহাকাব্যের বিষয়ই ছিল যুদ্ধ; কিন্তু সে যুদ্ধের কারণ হইত রমণীলাভের প্রতিযোগিতা। আজকালকার যুদ্ধের কারণ পরস্ব পহরণ বা বাণিজ্যপ্রতিদ্বন্দ্বিতা। আগেকার যোদ্ধারা ছিল সব ব্যক্তিগত বীর, যুদ্ধ ছিল সেইসব বীরের বাহাদুরি ও মহত্ত্ব প্রকাশের অবসর। আর আজকালকার যুদ্ধ সমষ্টিগত, ব্যূহবদ্ধ, চোরাগোপ্তা, যন্ত্রসাধ্য। সুতরাং আজকালকার যুদ্ধে কবিত্বের বা সাহিত্যের সরঞ্জাম বড় অল্প। অধিকন্তু আজকালকার যুদ্ধে কবি ও লেখককেও বীণাপাণির বাহন হংসের পুচ্ছ কলম ফেলিয়া বন্দুক ধরিতে হয়। সুতরাং বিনাইয়া বিনাইয়া রচনা করিবার লোক ও অবসর দুইএরই অভাব। বাচাল কবি তাড়াতাড়ি দুচার লাইন লিখিবার যে অবসরটুকু পায়, ভারিক্বি গদ্য-লেখকের সেই সময়টুকুতে কিছুই সৃষ্টি করিবার জো নাই।

* *
*

সূর্য্যকিরণের ওজন—

কোনো দ্রব্যের ওজন মানে তাহার বস্তুপিণ্ডের উপরে মাধ্যাকর্ষণের টান। সূর্য্যকিরণের ন্যায় বস্তুকেও পৃথিবী কি আকর্ষণ করে? কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আলোকের বর্ণচ্ছত্রের কাছে একটা বড় চুম্বক রাখিয়া জিমান দেখাইয়াছিলেন যে বর্ণচ্ছত্র চুম্বকের টানে বাঁকিয়া যায়। এক্ষণে আইনষ্টাইন, নর্ডষ্ট্রম, এভারশেড, ফ্রেমিডলেক প্রমুখ জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকেরা স্বতন্ত্রভাবে দেখাইয়াছেন যে সূর্য্যকিরণ মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হয়; উচ্চস্থানে ও নিম্নস্থানের কিরণ একইভাবে পড়ে না; বর্ণচ্ছত্রেরও তারতম্য ঘটে। ইহা হইতে বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে সূর্য্য-কিরণকেও পৃথিবী আকর্ষণ করে; অর্থাৎ সূর্য্যকিরণেরও ওজন বা ভার আছে।

* *
*

সমুদ্রের ঢেউ।
স্ট্যানলেয়ার সমুদ্রের ঢেউগুলিকে মনগড়া আকার দিয়া সামুদ্রিক মাছ ও পাখী, জাহাজ ও মেঘ দিয়া সাজাইয়া একখানি চমৎকার প্রসাধন চিত্র তৈয়ার করিয়াছেন।

কোরানের একাংশের প্রাচীন লিপি—

প্রাচীনকালে কাগজ সুলভ ছিল না; এজন্য চামড়ার কাগজের উপর একবার একটা কিছু লেখা হইলে এবং সে লেখার কাজ হইয়া চুকিয়া গেলে সেই লেখা মিটাইয়া ফেলিয়া তাহার উপর আবার নূতন কিছু লেখা হইত। ১৮৯৫ সালে এইরূপ একখানি লেপা-মিটাইয়া-

কোরানের প্রাচীন পুথির একখানি পাতা।

এই কোরান অশুদ্ধ বলিয়া বাতিল করা হইয়াছিল ; পুরাকালে কাগজ দুর্লভ ছিল বলিয়া কোরানের মন্ত্র মিটাইয়া ফেলিয়া তাহার উপর খৃষ্টপন্থীরা আরবী অক্ষরে ভজন লিখিয়াছিল। সুতরাং তলার লিপি কোরানের ও উপরকার লিপি খৃষ্টভজনের। কোরানের পাতাখানি মাঝে ভাঁজিয়া উহার লিপির আড়াআড়ি দিকে খৃষ্টভজন দুই পাতায় লেখা হইয়াছিল, সম্ভবত ৯ম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে। পুরাতন কালি খুব ঘন কালো বলিয়া ও তাহার উপর হাইড্রো-সালফাইড অফ এমোনিয়া দেওয়াতে লেখা এখনও খুব স্পষ্ট পড়া যায়।

লেখা চামড়ার কাগজ পাওয়া যায় ; তাহা পাঠ করিয়া দেখা যায় যে সেই কাগজের উপরকার লেখা প্রাচীন খৃষ্টপন্থী সাধুভক্তদের রচিত আরবী ভাষায় ভজন ; বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন যে এই লেখা ৯ম খৃষ্টীয় শতাব্দীর। আরবী ভাষায় রচিত খৃষ্টান ভজনের নীচেকার যে লেখা তাহা কোরানের একাংশ—এক নূতন রকমের ছাঁদে লেখা, সে ছাঁদ না নশ্‌কী, আর কুফিক : আধুনিক কোরানের সহিত ঐ লেখার বানানেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে : উহাতে হামজা বা স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। আরবী লেখায় ঐসমস্ত চিহ্ন অষ্টম শতাব্দীতে প্রচলিত হয় ; সুতরাং প্রাপ্ত লিপিটি অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বেকার লেখা।

এই লিপির অধিকারিণী শ্রীমতী লিউইস মনে করেন যে খলিফা ওসমান কোরানের যে-সমস্ত পুথি নষ্ট করিতে হুকুম করিয়াছিলেন এই লিপিটি সেই-সব পুথির কোনো একখানির অংশ। খলিফা ওসমান প্রাচীন পাঠ নষ্ট করাইয়া জায়েদ-ইবন্-থাবিতকে দিয়া নূতন পাঠ ঠিক করিয়া নূতন প্রণালীতে কোরানের বচনবিন্যাস করান। সেকালে রচনা নষ্ট করিতে হইলে লেখা মিটাইয়া কাগজ বাঁচানো হইত। সুতরাং যাহা এককালে মুসলমানের সমাদরের বস্তু ছিল, খলিফার আদেশে তাহা পরিত্যক্ত হইলে সেই লেখা-মিটানো কাগজ খৃষ্টপন্থীদের কাছে বিক্রয় করা হইয়া থাকিবে; খৃষ্টানেরা তাহাতে আপনাদের ধর্ম্মসঙ্গত ভজন লিখিয়াছিলেন।

প্রাচীন কালে শ্রুতিপরম্পরাতেই মন্ত্র রক্ষিত হইত হজরত মহম্মদের বাণী তাঁহার মৃত্যুর পনর বৎসর পরে ক্রমে ক্রমে লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। যে সুরাহ্ বা বচনটি যত দীর্ঘ হইত তাহা তত বেশী দিন লিখিত থাকিত; মন্ত্র একবার মুখস্থ হইয়া গেলে লিপির আর আবশ্যক বা আদর থাকিত না। এই-সমস্ত লিপির সংগ্রহ কোরান। হাতে হাতে মুখে মুখে ফিরিতে ফিরিতে একই বচনের বিভিন্ন রূপ ও অর্থগত পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছিল। খলিফা ওসমান এই বিভিন্নতার সামঞ্জস্য করিবার জন্য প্রাচীন লিপি নষ্ট করিয়া একবিধ পাঠের কোরান লিপিবদ্ধ করান এবং তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া প্রচার করেন। প্রাচ্য দেশের লোকেদের ধারণা যে মন্ত্র অশুদ্ধ হইলে কর্ম্ম পণ্ড হয়; অধিকন্তু মুসলমান ধর্ম্মের সমবেত উপাসনাপদ্ধতিতে নমাজের সময় ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মন্ত্র উচ্চারণ করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটা অনিবার্য্য; এইসব কারণে খলিফা ওসমান একটি প্রামাণ্য পাঠের কোরান রচনা করাইয়া সমস্ত মুসলমানের তাহাই অবলম্বনীয় বলিয়া প্রচার করেন। ওসমানের আদেশে কোরান লিপিবদ্ধ করিবার বারো বৎসর পূর্ব্বে আর একবার ওমারের প্ররোচনায় ও আবু বকরের আদেশে ঐ জায়েদই কোরান লিপিবদ্ধ করেন। জায়েদের লেখা দুই সময়ের দুই কোরানে বিস্তর পাঠভেদ দেখা যায়; কিন্তু সে-সমস্ত ভেদ নগণ্য বিষয়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থে পয়গম্বরের বাণীই সংগৃহীত আছে এবং তাহা একালপর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া গিয়াছে। ডাক্তার মিঙ্গানা বলেন যে এই লিপিটি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর হওয়া সম্ভব; সুতরাং ইহা অতি প্রাচীন।

এই লিপিতে যে সুরাহ্ গুলি লিখিয়া মুছিয়া ফেলা হইয়াছিল তাহা আবছায়া আবছায়া এখনো পড়িতে পারা যায়। কতকগুলি সুরাহ্ বা বচনের অর্থ এই—

যাহার জ্ঞান নাই তাহার উপদেশ মানিয়ো না; ভগবানের কাছে তাহা তোমার কোনো কাজেই লাগিবে না।

যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলে তাহাদের কল্যাণ হয় এবং তাহাদের লেখাতেই পথের উদ্দেশ পাওয়া যায়।

যাহারা অবিশ্বাসী ঈশ্বর তাহাদিগকে চালনা করেন না।

তোমার ঈশ্বর তোমাকে অহরহ বলিতেছেন এক তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও পূজা করিয়ো না।

তোমরা যাহা লুকাও বা প্রকাশ কর, ঈশ্বরের কিছুই অজানা থাকে না।

ওহে বিশ্বাসী, যখন তোমাদের ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে বলা হইল তখন কিসে তোমাদের মাটির দিকেই টানিয়া রাখিল?

এই দুবার-লেখা কাগজখানির একখানি ফটোগ্রাফ মডার্ণ রিভিউতে অধ্যাপক হোমারশ্যাম কক্স প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহা হইতেই সেই ছবি ও বর্ণনা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

য়ুরোপের চাকরো মেয়ে—

ফ্রান্সের লা ব্যুরো সিন্দিকাল ইন্টারনাসিওনাল গণনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে কত মেয়ে চাকরী করে তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। লে দকুমাঁ দ্যু প্রোগ্রেস হইতে সেই তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দেশ	চাকরো মেয়ের সংখ্যা	শতকরা
ফ্রান্স	৪৯৫০০০০	৫৩.৩
অষ্ট্রীয়া	৫৬৮৪০০০	৫১.৫
ইটালী	৫২৮৪০০০	৫০.১
সুইজারল্যাণ্ড	১৫৫৬০০০	৪৬.৯
জার্ম্মানী	৯৪৯২০০০	৪৫.৫
বেলজিয়ম	৯৪৮০০০	৪১.৯
হাঙ্গেরী	২৮৮৫০০০	৪৫.১
ইংলণ্ড	৫৩০৯০০০	৪৪.৯
ডেনমার্ক	৩৫২০০০	৪৪.৯
স্পেন	১৯৫১০০০	৩৯.৯
নরওয়ে	৩৭৭০০০	৩৯.৫
আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ	৫৩২৯০০০	৩৮.৪
সুইডেন	৫৫১০০০	৩৮.৪
হলাণ্ড	২৩৩০০০	৫৭.৮
রুশিয়া	৫২৭৬০০০	২৪.৯

এই তালিকা হইতে বুঝা যায় যে য়ুরোপের সামাজিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য শিক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রমণীর উপযোগীতা, সহকারিতা কত মূল্যবান এবং সেজন্য তাহাদের প্রভাব জীবনযাত্রায় কত বেশী! আর ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে কত? যৎসামান্য। উত্তর ভারতের স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানশিন। সুতরাং উত্তরভারতের শতকরা হার দাক্ষিণভারত অপেক্ষাও অল্প। সংখ্যা নির্ণয় করা উচিত।

* *
*

ঘেয়ো দাঁত ও অপকর্ম্মের সম্পর্ক—

যেসব ছোট ছোট ছেলে মেয়ে অপকর্ম্ম করিয়া আদালত হইতে দণ্ডিত হয় তাহাদের প্রায় সকলেরই দাঁত ঘেয়ো হইতে দেখা যায়। অনেকে মনে করেন খারাপ দাঁতের সঙ্গে অপকর্ম্মপ্রবৃত্তির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমেরিকান মেডিসিন পত্রিকার মতে উহার একটি অপরটির কারণ নয়; উহারা উভয়েই অপর একটি কারণের কার্য্য; সে কারণটি খাদ্যপুষ্টির অভাব। অল্পাহার ও কদাহার হইতে বালকবালিকার দেহযন্ত্র যেরূপ বিকলতা প্রাপ্ত হয় তাহার ফলে তাহাদিগকে অপকর্ম্মপ্রবণ করিয়া তোলে; সংসর্গ ও আবেষ্টনের প্রভাব যেমন বালক বালিকাকে সু বা কু করে, যথেষ্ট বা উৎকৃষ্ট আহারের অভাব হইতেও তাহাদের চরিত্র তেমনি অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অধিকন্তু দেখা যায় যে যাহার শরীর যত অপুষ্ট ও অপটু তাহার মন তত দুর্ব্বল, এবং তাহার মনের উপর মন্দ সংসর্গ বা মন্দ আবেষ্টনের প্রভাব তত বেশী। সুতরাং বালকবালিকার চরিত্রসংশোধনের ভার নীতিশিক্ষকদের হাত হইতে ডাক্তার ও অন্নদাতাদের হাতে গিয়া পড়িতেছে। অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া যাহাদের বুদ্ধি তাহাদের দাঁত ভালো হয় না; দাঁত খারাপ হইলে চর্ব্বণে ব্যাঘাত ঘটে; চর্ব্বণের ব্যাঘাতে হজমের ব্যাঘাত; হজমের ব্যাঘাতে স্বাস্থ্যহানি; স্বাস্থ্যহানি হইতে মন খারাপ; খারাপ মন হইতে অপকর্ম্মের সৃষ্টি। সুতরাং সমাজহিতেচ্ছুদের প্রধান কর্ত্তব্য সকলকার সুখাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং ডাক্তারদের কর্ত্তব্য ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খারাপ দাঁত ভালো করিয়া মেরামত করিয়া দেওয়া।

প্রবাসী-বাঙ্গালী

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দত্ত।

গোয়ালিয়র ভিক্টোরিয়া কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দত্ত মহাশয় ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ঘি-কমলা গ্রাম। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং তৎকালে উচ্চশিক্ষার প্রতি লোকের তাদৃশ অনুরাগ না থাকায়, ইঁহার শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই। জানকীবাবু প্রথমে গুরুমহাশয়ের নিকট কিঞ্চিৎ লেখাপড়া করিয়াছিলেন; তৎপরে পাংশার বঙ্গবিদ্যালয়ে কিছুদিন বাঙ্গালা শিখিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে কুষ্টিয়ার স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন ও তথায় ৩।৪ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে ফরিদপুর ইংরেজী স্কুল হইতে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এণ্ট্রান্স্ পাশ করিবার পর কলেজে শিক্ষালাভ করা তাঁহার নিকট বড়ই সমস্যাজনক হইয়া উঠে। অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যভঙ্গ এই সময়ে তাঁহার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক জন্মায়। জানকীবাবু কিন্তু সে প্রতিবন্ধকে ভগ্নোদ্যম হন নাই। কেবল আত্মনির্ভরের বলে তিনি রংপুর কলেজ হইতে বৃত্তি লইয়া এফ-এ পড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু হইলে কি হয়, শঙ্কটাপন্ন পীড়ার জন্য সেবার পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। তৎপরে তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র জোয়ার্দ্দার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তিনি পশ্চিমে গমন করেন এবং যথাক্রমে আগ্রার সেণ্টজন্স কলেজ হইতে ফার্ষ্ট আর্টস্ ও লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ ক্যানিং কলেজ হইতে ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে বি-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। এই সময়ে তাঁহার শ্বশুরমহাশয় গোয়ালিয়রের রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত থাকায় তাঁহারই উপদেশমত জানকীবাবু গোয়ালিয়রস্কুলে অ্যাসিষ্টাণ্ট হেড্‌মাষ্টারের কার্য্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার গোয়ালিয়ার বাসের সূচনা।

গোয়ালিয়রে চাকুরীগ্রহণকালে উক্ত ষ্টেটের শিক্ষা-বিভাগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। একটিমাত্র সাধারণ স্কুল; তাহাতে সংস্কৃত, আরবী, পারসিক, হিন্দী উর্দ্দু এবং তৎসঙ্গে সামান্য ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত। এই বিদ্যালয়টিকে হাতে পাইয়া এবং ইহাই তাঁহার ভাবী কর্ম্মক্ষেত্র বিবেচনায় জানকীবাবু জীবনের সমস্ত জ্ঞান, উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বারা উহার উন্নতিবিধানে কৃতসংকল্প হইলেন। গুণগ্রাহী রাজপুরুষ ও রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণাবলী ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া অচিরে তাঁহার প্রতি প্রীত হন এবং যাহাতে শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন হয় তজ্জন্য তাঁহার সহায়তা করিতে থাকেন। তাঁহারই ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে উক্ত বিদ্যালয়টি কালে ইংরেজী এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হইল; দিন দিন উহার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল এবং উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক ছাত্র প্রবেশিকা

অধ্যাপক জানকীনাথ দত্ত।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। ইহার পর ক্রমে স্কুল হইতে কলেজের সৃষ্টি ও তৎসহ জানকীবাবুর অধ্যাপক-পদ-প্রাপ্তি। এইবার তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হইল। কলেজের সাজসরঞ্জাম, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি, লাইব্রেরীর পুস্তকাদি,—যেখানে যে-দ্রব্যের প্রয়োজন তদ্বিষয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁহার মতানুসারে চলিতে লাগিলেন। এককথায় কলেজ-গঠন-সংক্রান্ত সমস্ত ভার প্রধানতঃ

তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। স্বয়ং মহারাজ কলেজের কার্য্যপ্রণালী ও সফলতা দর্শনে এত সন্তুষ্ট হইলেন যে উহার জন্য অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া প্রকাণ্ড কারুকার্য্য-সম্পন্ন প্রস্তরভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। গোয়ালিয়রের রাজধানী লস্করনগরের এই কলেজ উক্তরাজ্যের একটি প্রধান দৃশ্য। আজকাল এই ষ্টেটের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট অন্যান্য বিভাগের মধ্যে একটি প্রধান বিভাগ এবং ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অব্‌ এডুকেশন ইহার প্রধান রাজকর্ম্মচারী। এখন শত শত প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী স্কুল, ইন্‌ডষ্ট্রীয়াল্ স্কুল ও টেক্‌নিক্যাল স্কুল রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে। সহস্র সহস্র বালক এই বিদ্যামন্দির হইতে শিক্ষালাভ করিয়া জীবিকার্জ্জন ও সম্মানলাভ করিতেছেন। গোয়ালিয়র কলেজের ছাত্রগণ এখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিজ্ঞান শাস্ত্রে সুশিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত। এবং তাহা যে জানকী বাবুরই চেষ্টার ফল তাহা ইন্সপেক্‌টর জেনেরল অফ এডুকেশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীকার করিয়াছেন। গোয়ালিয়র ষ্টেট হইতে বৃত্তি লইয়া মেধাবী ছাত্রগণ নানা বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে গমন করিতেছেন। উক্ত ষ্টেটের শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও পরিপুষ্টির মূলকারণ একজন বাঙ্গালী। ইহা মনে করিলে আনন্দ হয়।

জানকীবাবু ত্রিশবৎসরকাল গোয়ালিয়র ষ্টেটে নিযুক্ত আছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি একাধিকবার অস্থায়ী ভাবে কলেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য করিয়াও যথেষ্ট প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইনস্‌পেক্টর জেনারেল মহোদয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কয়েকখানি পত্রে তাঁহার শিক্ষাদানের পটুতা ও একাগ্রতা সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাবাক্য লিখিয়াছেন।

কলেজের ১৯১২-১৩ অব্দের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে বর্ত্তমান প্রিন্সিপ্যাল রেডেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"I cannot conclude this report without expressing my sense of appreciation of the quite invaluable services rendered to me throughout the year by Babu Janki Nath Dutta B. A., the Senior Professor of the College. His unrivalled experience of education in Gwalior, his shrewdness and unvarying courtesy, his wide knowledge of both local and Indian customs and affairs, the great strength of his remarkable popularity among all grades of students, and above all, his unassuming friendship and confidence have been placed unselfishly and unstintingly at my disposal since the first day of my charge. Most of the reforms which have been successfully carried through are due to his initiative ; not one of them could have lasted for a day without his unvarying support and advice."

জানকীবাবুর প্রতিপত্তি যে কেবল শিক্ষাবিভাগেই সীমাবদ্ধ তাহা নয়। তিনি গত ১০।১২বৎসর যাবত লস্কর মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বর ও অস্থায়ীভাবে চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। গত ১৯১১ খৃঃ অব্দের আদমসুমারির কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। কারণ, গণনার কিছু পূর্ব্ব হইতে উক্ত নগরে প্লেগের আবির্ভাব হওয়ায় তত্রত্য অধিবাসীবর্গ পলায়নপর হয়। স্থানীয় যে কয়েকজন কর্ম্মচারী গণনার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা বারম্বার চেষ্টা করিয়াও অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সংখ্যা-নির্দ্ধারণে সমর্থ হন নাই। এইসকল লোকের মনে সংস্কার জন্মিয়াছিল যে প্লেগবিধিব বলে তাহাদের উপর অযথা জুলুম করা হইবে। স্থানীয় কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ জানকীবাবুর উপরই উহার ভার অর্পণ করেন। বলাবাহুল্য ইহার ফল অতীব সন্তোষজনক হইয়াছিল ও তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ও গোয়ালিয়র ষ্টেট হইতে প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহারই উদ্যোগে ঐ বৎসর প্লেগনিবারণকল্পে একটি সমিতি গঠিত ও তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক গৃহ পরিষ্কৃত, পরিমার্জ্জিত ও সংশোধিত হইয়াছিল বলিয়া অনেক দরিদ্র পরিবার প্লেগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

জানকীবাবু আরও কয়েকটি স্থানীয় সমিতির কার্য্য-পরিচালকের দলভুক্ত আছেন। তন্মধ্যে "কন্যাধর্ম্ম সংবর্দ্ধিনীসভা," "মাধব ফ্রি রিডিংরুম ও লাইব্রেরী" ও "অস্পৃশ্যজাতি শিক্ষালয়" (School for the boys of the Depressed Class) উল্লেখযোগ্য।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

অধ্যাপক রায়বাহাদুর অভয়াচরণ সান্ন্যাল।

অধ্যাপক রায়বাহাদুর অভয়াচরণ সান্ন্যাল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট বাঁকীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার পিতা আফিঙের ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতেন। তাঁহার প্রপিতামহ ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ সান্ন্যাল মহাশয় রাণী ভবানীর একজন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার সহিত কাশী গমন করেন। সেই অবধি ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস রাজসাহীর অন্তর্গত হলদা-খলসী একরূপ পরিত্যক্ত হয়।

অভয়াচরণ পাটনা কলীজিয়েট স্কুলে দ্বিতীয়শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কাশীস্থ বাঙ্গালাটোলা প্রিপারেটরী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অধ্যাপক অভয়াচরণ সান্ন্যাল।

কাশীর কুঈন্স্ কলেজ হইতে ১৮৭৫ সালে এফ-এ এবং এলাহাবাদ মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে ১৮৭৬ ও ১৮৭৯ সালে বি-এ ও এম্-এ পাশ করেন। তিনি বলেন যে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া এম্-এ পাশ করা পর্য্যন্ত বরাবর বৃত্তি পাইয়াছিলেন বলিয়া কোনরূপে লেখাপড়া শিখিতে পারিয়াছেন।

শিক্ষাসমাপনের পর ১৮৭৯।৮০ সালে সান্ন্যাল মহাশয় আটমাসের নিমিত্ত বাঁকুড়াজেলার বিষ্ণুপুর এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের হেড্মাষ্টার ছিলেন। ১৮৮০ সালের ২রা আগষ্ট এলাহাবাদ মিওর কলেজের সহকারী বিজ্ঞানাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সালে কাশীতে কুঈন্স্ কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপকের পদে বদলী হন। এখানে এই পদ হইতে তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট পেন্‌সন গ্রহণ করেন।

তিনি কয়েক বৎসর হইতে কাশীর বাঙ্গালী-টোলা হাইস্কুল কমিটির সভাপতি এবং এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য আছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯১৩ সালে রায়বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন। তিনি পেন্‌সন লইবার পর কাশীস্থ সেণ্ট্যাল হিন্দুকলেজে অবৈতনিক বিজ্ঞানাধ্যাপকের কাজ করিতেছেন।

সুযোগ্য অধ্যাপক বলিয়া এবং অতি অমায়িক পরোপকারী ব্যক্তি বলিয়া সান্ন্যাল মহাশয়ের সুখ্যাতি আছে।

অধ্যাপক অন্নদাপ্রসাদ সরকার।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর পঞ্জাবের কসৌলী নামক পার্ব্বত্য নগরে অন্নদাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষদের নিবাস হুগলী জেলার ভাণ্ডাগ্রামে। ইহাঁর পিতা ৺ বাবু বিপ্রদাস সরকার অনেক বৎসর কমিসারিয়েট বিভাগে এবং কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট রেল-ওয়েতে কাজ করিয়াছিলেন।

অন্নদাপ্রসাদ বাল্যকালে মুলতান, লাহোর, অম্বালা, ও সাহারাণপুরে নানা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া, এলাহাবাদের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন, এবং তথা হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্কুল ফ্যাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর মিওর সেণ্ট্র্যাল কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতর পরীক্ষা-সকলে উত্তীর্ণ হইয়া, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রসায়নীবিদ্যায় প্রথম বিভাগে ডি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনজন ডি-এস্‌সি উপাধিধারী আছেন। তন্মধ্যে ডাক্তার সরকারই রসায়নী বিদ্যায় একমাত্র ডি-এস্‌সি। বি-এস্‌সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার

করায় তিনি স্বর্ণময়ী-উমাচরণ-পদক প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানে পারদর্শিতার জন্য প্যারীচরণ-মুখোপাধ্যায়-স্বর্ণপদক এবং ভিক্টোরিয়া-জুবিলি-রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন।

ডি-এস্‌সি উপাধি পাইবার পর ডাক্তার সরকার তিন বৎসর মাসিক একশত টাকা করিয়া গবেষণাবৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেন্টের প্রাদেশিক সার্ভিসে রসায়নীবিদ্যার অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি অনেকবার অস্থায়ীভাবে গবর্ণমেন্টের মিটিয়রলজিষ্টের কাজ করিয়াছেন।

অধ্যাপক অন্নদাপ্রসাদ সরকার।

মিওর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও রসায়নীবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার হিলের সহযোগে ডাক্তার সরকার জার্ন্যাল অব্ দি কেমিক্যাল সোসাইটীতে শিউলী ফুলের রং সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। হাইড্রোফ্লুওরিক দ্রাবকের পরিচালকতা (the conductivity of hydrofluoric acid) সম্বন্ধে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটীতে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রেরণ করেন।

ডাক্তার সরকার অস্থায়ীভাবে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির জীবতত্ত্ববিদের (biologistএর) কাজও করিয়াছেন।

* * *

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল ১২৯১ সালের ১৫ই কার্ত্তিক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমাস্থিত জাহানাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ মদনমোহন বল। উপেন্দ্রনাথ দুইমাস বয়সে পিতৃহীন হন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে ও তাঁহার দুই ভগিনীকে অতি কষ্টে মানুষ করিয়াছেন। তিনি উপেন্দ্রনাথকে সাতিশয় যত্নের সহিত লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। কাঁথি এণ্ট্রেন্স্ স্কুলে পড়িবার সময়েই তাঁহাকে কখন কখন গৃহশিক্ষকের কাজ করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময়ই তাঁহার বিবাহের বন্দোবস্ত হয়। তিনি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন; তৎপরে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া হাতে ৩।৪টি মাত্র টাকা লইয়া গ্রামের একটি ছাত্রের সহিত তিনি কলিকাতায় আসেন ও রিপন কলেজে ভর্ত্তি হন। কাঁথির ছেলেদের একটি মেস ছিল। সেই মেসের ছাত্রেরা এবং আর কয়েক জন বন্ধু তাঁহার খরচ চালাইতেন। মধ্যে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে প্রায় একমাস একবেলা হোটেলে আহার করিয়া কলেজ যাইতেন, এবং রাত্রে অনাহারে থাকিতেন। এফ্-এ পাশের পর বহু কষ্টে তিনি বি-এ পড়েন। কিছুদিন গৃহশিক্ষকতা করেন। কিছুদিন মাসিক ১৫ টাকা বেতনে এবং পরে কমিশনের বন্দোবস্তে বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-ও-শিল্প-শিক্ষা-সমিতির জন্য সকাল ও সন্ধ্যা চাঁদা আদায় এবং দুপর বেলা কলেজে অধ্যয়ন করেন। নানা অসুবিধা হওয়ায় কলেজ ছাড়িয়া ঐ সমিতির আফিসে ১৫ টাকা বেতনের চাকরী করেন এবং সিটিকলেজে প্লীডারসিপ্ ক্লাশে ভর্ত্তি হন। অতঃপর ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বর্গীয় গোখলে মহাশয় তাঁহাকে ২০ টাকা বেতনে ইণ্ডিয়া কাগজের গ্রাহক
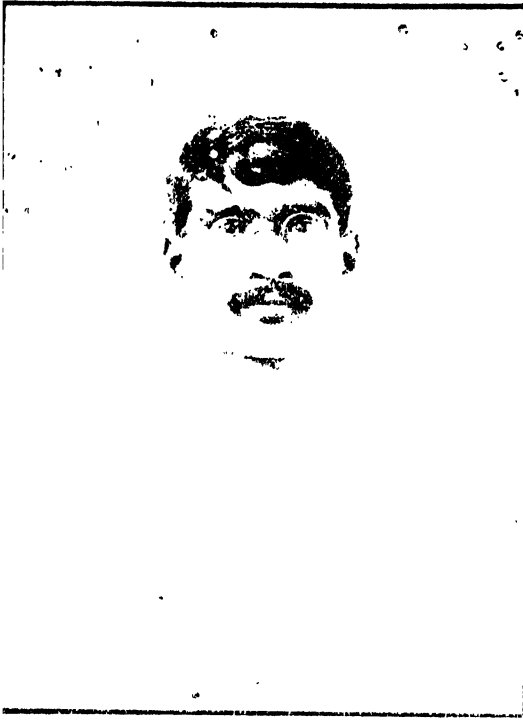
অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল।

সংগ্রহের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। জুলাইমাসে আবার সিটি-কলেজে বিনাবেতনে ভর্ত্তি হন। সকালে ইণ্ডিয়ার গ্রাহক সংগ্রহ, তাহার পর কলেজে পড়া, এবং তাহার পর আফিসে হিসাব রাখা, মাঝে মাঝে গৃহশিক্ষকতা। এইরূপ নানা অসুবিধার মধ্যে উপেন্দ্র বাবু বি-এ পাশ করেন।

তার পর এম-এ পড়িবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তখন কিছুদিন বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটে কেরানী-গিরি করেন, কিন্তু পারিশ্রমিক কিছুই পান নাই। এই কাজ করিয়া এম্-এ পড়া চলিবে না ভাবিয়া ডভ্‌টন কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষক হন, এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে এম্-এ পড়িতে থাকেন। ইহাতে অসুবিধা হওয়ায় চাকরী ছাড়িয়া দেন। তাহার পর দু জায়গায় গৃহশিক্ষকতা করিতেন এবং থিয়লজিক্যাল কলেজে ২০৲ বৃত্তি পাইতেন। অতঃপর কিছুদিন সিটিকলেজে অধ্যাপনা ও ব্রাহ্মবালকদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কয়েকমাস ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের সম্পাদকের কাজও করেন। এইভাবে নানা কাজের মধ্যে তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এম্-এ পাশ করেন।

এম্-এ পাশের পর ব্রাহ্মবালকদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকার সহকারী-সম্পাদকতা এবং কুচবিহার কলেজের অধ্যাপকতা করিয়া উপেন্দ্রবাবু এক্ষণে লক্ষ্ণৌএর ক্যানিং কলেজে ইতিহাসের সহকারী-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন।

কলিকাতায় তিনি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের উপাসক-মণ্ডলীর সহকারী সম্পাদক, ছাত্রসমাজের সম্পাদক এবং অনুন্নত জাতিসকলের শিক্ষাবিধায়িনী সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

লক্ষ্ণৌয়ে তিনি ছাত্রদের সমাজসেবকমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ইহার সভাপতি। এই মণ্ডলী একটি নৈশবিদ্যালয় চালাইতেছেন। উপেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে ক্যানিং কলেজ হইতে একটি পত্রিকা বাহির হইতেছে। তিনি পত্রিকা-কমিটির সম্পাদক।

অধ্যাপক রেভারেণ্ড বি, কে, মুখার্জ্জি।

অধ্যাপক রেভারেণ্ড বি, কে, মুখার্জ্জি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের আদি নিবাস চব্বিশ পরগণায়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা সম্পন্ন গৃহস্থ ও ভূম্যধিকারী ছিলেন।

তিনি কলিকাতার মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশন হইতে গ্রাজুয়েট হন। তিনি দিল্লীর সেণ্টষ্টিফেন্স্ কলেজের, ইন্দোরে সি, এম, কলেজের এবং কানপুরের ক্রাইষ্ট্‌চার্চ কলেজের অধ্যাপকতা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বোম্বাই, করাচী এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশে অনেকগুলি এণ্ট্রেন্স-স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের কাজ করিয়াছেন।

১৯০৬ সালে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের পৌরোহিত্য-কার্য্যে দীক্ষিত হইয়া বোম্বাইয়ের হিন্দুস্থানী মিশনের ভার প্রাপ্ত হন। তিনি শিক্ষাসংক্রান্ত মিশনরী; শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ দানের উভয়কার্য্যই করিয়া থাকেন। উপদেশ ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে দেন। অধিকন্তু তিনি কানপুরের এস্, পি, জি, স্কুলের ম্যানেজার।

অধ্যাপক রেভারেণ্ড বি কে মুখার্জ্জি।

তিনি ভারতীতে "জৈন ধর্ম্মের ইতিহাস" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এবং হিতবাদীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। এক্ষণে তিনি এডুকেশ্যনাল রিভিউ ও অন্যান্য ইংরেজী কাগজে লিখিয়া থাকেন। তিনি এখন আধুনিক বাংলাভাষায় বিদেশী উপাদান এবং বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

আজমগড় জেলায় ভীষণ প্লেগের মহামারী হয়। ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঐ জেলায় প্লেগ-রোগীদের পরিচর্য্যা করেন। তাঁহার নিকট প্লেগরোগের ঔষধের একটি ব্যবস্থাপত্র ছিল। তিনি বলেন যে তদনুসারে চিকিৎসা করায় শতকরা ৮৫ জন রোগী আরোগ্য লাভ করিত। তিনি রোগীদিগকে দেখিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া ছাড়া প্রয়োজনমত তাহাদিগকে পথ্যও দান করিতেন।

তিনি বাংলা ও ইংরেজী ছাড়া সংস্কৃত, লাটীন, গ্রীক, হিন্দী-উর্দ্দু এবং আসামীয় ভাষা জানেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার মরাঠী, গুজরাটী, কানাড়ী ও সিন্ধী ভাষার কাজ-চলা-গোছ জ্ঞান আছে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন কলিকাতা ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম জজ ৺ব্যারিষ্টার রাজকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। সতীশচন্দ্র কলিকাতায় সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন।

তিনি ১৭ বৎসর বয়সে খবরের কাগজে লিখিতে আরম্ভ করেন। পাইয়োনীয়ার, ইংলিশম্যান, সিবিল ও মিলিটারী গেজেট প্রভৃতি ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত কাগজে এবং লণ্ডনের নানা সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রে বহুবিষয়ে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তিনি বেঙ্গলীর সহকারী সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান ডেলীনিউসের সহকারী সম্পাদক এবং পাঁচ বৎসর রেঙ্গুন গেজেটের সহকারী সম্পাদকের কাজ করিয়াছেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ন্যাল নামক কাগজের সংস্রবে তিনি তিন বৎসর কাজ করেন। কমার্স নামক বাণিজ্যিক সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদকের পদে এক বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি দিল্লীর মর্নিংপোষ্ট নামক ইংরেজী দৈনিকের দুই বৎসর সম্পাদকতা করেন। বোম্বাই ক্রনিক্‌ল্ নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজের প্রথম সংখ্যা হইতে তিনি সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত আছেন।

তিনি "Visitors' Guide to Delhi" এবং "All about the Durbar" নামক দুখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। "Delhi : the Imperial City" নামক পুস্তক ডেনিং সাহেবের সহযোগে লিখিত।

লক্ষ্ণৌ এড্‌ভোকেটের বর্ত্তমান সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

১২৬৬ সালের মাঘ মাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। জেলা যশোহরের অন্তর্গত বিদ্যানন্দকাটি গ্রামে ইঁহাদের আদিম বাসস্থান। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ৺ষষ্ঠীবর ঘোষ শান্তিপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আদালতে নাজিরের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নড়াইল স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে কএক বৎসর যাবৎ কলিকাতায় অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাভ্যাস সাঙ্গ করিয়া তিনি আইনের পরীক্ষা দিলেন। তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া যশোহরের জজ-আদালতে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। আইন পরীক্ষা দিবার কিয়ৎকাল অগ্রে সাগরদাঁড়ি গ্রামে ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং ওকালতি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ভার ইঁহার মস্তকে পড়িল। ওকালতি ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার কয়েকটি বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় তিনি যশোহর হইতে কলিকাতায় গিয়া দৈনিক হিন্দুপ্যাট্রিয়টের সহকারী সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে ৺শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী হিন্দুপ্যাট্রিয়টের সম্পাদক ছিলেন। শ্রীশবাবু নামে সম্পাদক ছিলেন। কার্য্য প্রায় সমস্তই সুরেন্দ্রনাথ ও একজন ফিরিঙ্গি এই দুইজনে চালাইতেন। কিছুকাল পরে শ্রীশবাবুর মৃত্যু হইলে সুরেন্দ্রনাথ আবার বিপদে পড়িলেন। স্বনামখ্যাত রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় হিন্দুপ্যাট্রিয়টের একজন ট্রষ্টি। তিনি হিন্দুপ্যাট্রিয়টের সমস্ত ভার ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ হিন্দুপ্যাট্রিয়টের "সম্পাদন"-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া বিজয়চন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যক্তিবিশেষের কুদৃষ্টিতে পড়িলেন, তাহাতে তাঁহার লেখা বিজয়বাবুর চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপা হইবার সুযোগ পাইত না।

ইহার কিছুদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌ এড্‌ভোকেটের সহযোগী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্ণৌ চলিয়া আসিলেন। ৺গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা ঐ সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু সম্পাদনকার্য্য অধিকাংশই সুরেন্দ্রনাথের করিতে হইত—গঙ্গাপ্রসাদ বাবু অল্প কিছু লিখিতেন এবং কাগজের সুরের ব্যতিক্রম হইল কিনা সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি এ প্রদেশের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর মৃত্যুর পর হইতে উক্ত সংবাদপত্রের সমস্ত ভার সুরেন্দ্রনাথের হস্তে পড়ে। এখন এড্‌ভোকেট রাজা পৃথ্বীপাল সিংহের সম্পত্তি। একজন প্রবীণ বাঙ্গালী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু পূর্ব্ববৎ সহযোগী সম্পাদক আছেন।

বঙ্গভাষার চর্চ্চা করা সুরেন্দ্রনাথের নিতান্ত ইচ্ছা। কিন্তু তাঁহার সময় অল্প। তাঁহার ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাসের কিয়দংশ "আর্য্যাবর্ত্তে" বাহির হইয়াছে

অধ্যাপক নীলমণি ধর।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া নগরে ১৮৪৪ খৃঃ অক্টোবর মাসে নীলমণিবাবুর জন্ম হয়। পিতার নাম ৺হরিনারায়ণ ধর, মাতার নাম ৺আনন্দময়ী, পিতামহের নাম ৺কালীচরণ ধর।

শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা সহরে তাঁহার সহোদরের বাটীতে আসিয়া বাস করেন।

তখন কলিকাতা সহরে অল্পসংখ্যক ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। মাতুলালয় হইতে অনেক দূর নিমতলার ঘাটে মহাত্মা ডফ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সেই বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স এবং এফ-এ পাস করেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ভাল ভাল শিক্ষকের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ডাঃ ডফ স্বয়ং মনোবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ইংরেজি পড়াইতেন, রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ড বাইবেল পড়াইতেন। অবস্থা ভাল না থাকায় ছাত্রবৃত্তিই নীলমণিবাবুর ভরসা ছিল। এণ্ট্রান্সে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাই এফ-এ পড়িতে পারিয়াছিলেন। এফ-এ তে ছাত্রবৃত্তি পান নাই; তাই কলেজ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

কলিকাতার নিকট কোন্নগর গ্রামে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত যে ইংরেজি বিদ্যালয় আছে তাহাতে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং শিক্ষকতা করিতে করিতেই বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কোন্নগরে চারিবৎসর চাকরি করিয়া হাওড়া গভর্ণমেণ্ট জেলা ইস্কুলে তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে দুই বৎসর চাকরি করেন। তাঁহার এখানকার ছাত্রদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৺প্রসন্নকুমার লাহিড়ি, যিনি মেট্রোপলিটান কলেজে বিখ্যাত ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনবিহারী রায়, যিনি এক্ষণে পেনসন লইয়া গিরিডিতে বাস করিতেছেন। তাহার পর কলিকাতা হিন্দু ইস্কুলে নিযুক্ত হন। এখানে ৬ বৎসর চাকরি করেন। এখানে তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত এটর্ণি ও স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু। হিন্দু ইস্কুলে চাকরি করিবার সময় নীলমণি বাবু বি-এল পরীক্ষা দেন। তাহার পর মেদিনীপুরে ১২ বৎসর ওকালতি করেন। মেদিনীপুরে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবনসংশয় হইয়াছিল, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যান। সেখানে তিনমাস থাকিয়া কিছু উপকার লাভ করেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস ভিন্ন ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না ভাবিয়া আগ্রা কলেজের আইন-অধ্যাপকের চাকরি গ্রহণ করেন। তদবধি ২৫ বৎসর আগ্রাতেই বাস করিতেছেন।

অধ্যাপক শ্রীনীলমণি ধর।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত বাল্যাবস্থা হইতে তাঁহার যোগ আছে; সেইজন্য তাঁহার খৃষ্টান অধ্যাপকগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে এবং একেশ্বরবাদের সপক্ষে তিনি তাঁহাদিগের সহিত তর্ক করিতেন বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন এ ছেলেটি অন্য অন্য ছেলেকে খৃষ্টান হইতে দিতেছে না। সে সময়ে অনেক ছেলেই খৃষ্টান হইত। তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে

যাঁহারা খৃষ্টান হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রেভারেণ্ড ৺ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল কালিপদ গুপ্ত উল্লেখযোগ্য। কোন্নগর স্কুলে মাষ্টার থাকিবার সময় ১৮৭৩ খৃঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট নীলমণিবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন দীক্ষার জন্য তাঁহাকে মহর্ষির নিকট উপস্থিত করেন।

বাল্যকাল হইতে সুরাপান-নিবারণী সভার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। সে সময়ে কলিকাতা সহরে রেভারেণ্ড সি, এইচ, এ, ডল নামক একজন ইউনিটেরিয়ান বা একেশ্বরবাদী প্রচারক ছিলেন; তিনি তাঁহাকে ও বিখ্যাত বাগ্মী ও স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একত্রে সুরাপানের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করান। নীলমণি বাবু মেদিনীপুরে সুরাপান-নিবারণী সভার সম্পাদক ছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া নানাপ্রকার শুভকার্য্যের সূচনা করেন তখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুরাপান-নিবারণী পত্রিকা "মদ না গরল" নীলমণি বাবুকে সম্পাদন করিতে দেন।

এলাহাবাদের ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ৺ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নীলমণিবাবুর বন্ধু ছিলেন। তাঁহারও অবস্থা ভাল না থাকায় তিনিও তাঁহার সহিত ডফসাহেবের কলেজে পড়িতেন। এক দিনে এক সময়ে তাঁহারা উভয়ে মহর্ষির নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি আগ্রার ছোট আদালতের জজ ছিলেন। তাঁহারই যত্নে নীলমণিবাবুর আগ্রা কলেজে চাকরি হয়। তিনি তাঁহাকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন। তাঁহার অনুগ্রহ নীলমণিবাবু ভুলিতে পারিবেন না।

স্বপ্নসহায়

শুষ্ক অতীতের পুণ্য-বেদিকার 'পরে
স্মৃতি-ধূপ-দীপ থাক চিরদিন তরে;
শুধু এই স্বপ্নশ্রান্ত পরাণে আমার
মায়ার আলোকে তব বাঁচুক আবার
ম্রিয়মাণ মধুমাস, করি জাগরূক
আলোর অনন্তলীলা, গাহিবার সুখ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পুস্তক-পরিচয়

প্রাকৃতিকী—শ্রীজগদানন্দ রায়-প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৩০৩ পৃষ্ঠা। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট। মূল্য ২৲ টাকা।

এই পুস্তকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ তত্ত্ব বত্রিশটি প্রবন্ধে সরলভাষায় ও সহজভাবে সাধারণ লোকের বোধগম্য করিয়া বিবৃত হইয়াছে এবং বহু চিত্র সেই বর্ণনা বিশদতর করিয়া তুলিয়াছে। জগদানন্দবাবুর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধরচনায় পটুতা ও সরল রচনাভঙ্গি কাহারই অবিদিত নহে; পাঠকেরা এই পুস্তকে বিজ্ঞানের বিবিধ পুরাতন ও অতিনূতন তত্ত্ব সহজবোধ্য রকমে হাতের কাছে পাইবেন। সরস ভাবে লেখা বিজ্ঞানের বই উপন্যাসের অপেক্ষাও কৌতুকপ্রদ ও সুখপাঠ্য; জগদানন্দবাবু বাংলাভাষায় সেইরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান প্রেস বইখানির বাহ্যসৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া পাঠকের আনন্দবর্দ্ধনের সহায়তা করিয়াছেন।

মহাভারত—শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী-প্রণীত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এণ্টিক কাগজে পাইকা অক্ষরে ছাপা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২৩৬ পৃষ্ঠা। পট্টবদ্ধ। মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাভারত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলেদের মহাভারত যে শ্রেণীর ইহাও সেই শ্রেণীর অর্থাৎ ইহাতে কেবল মাত্র কুরুপাণ্ডবের কাহিনী সঙ্কলিত ও অবান্তর কাহিনী-সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা বিদ্যালয়পাঠ্য হইবার উপযুক্ত; কিন্তু গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত ভারী, সমাসবহুল, সংস্কৃতশব্দে পরিপূর্ণ।

সচিত্র আরব জাতির ইতিহাস—(তৃতীয় খণ্ড)—শ্রীশেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ-সঙ্কলিত, রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের A Short History of the Saracens নামক প্রসিদ্ধ ও উপাদেয় ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ। প্রকাশক শ্রীশেখ মফিজউদ্দিন আহমদ, দলগ্রাম, তুষভাণ্ডার, রংপুর। ২০০ পৃষ্ঠা। সচিত্র। পত্রবদ্ধ। মূল্য পাঁচ সিকা।

এই খণ্ডে স্পেনের উম্মিয়াবংশীয় খলিফাগণের ইতিবৃত্ত, স্পেনের খৃষ্টানরাজ ফার্ডিনাণ্ড ও রাজ্ঞী ইজাবেলা কর্তৃক স্পেনীয় মোসলমানগণকে বিতাড়িত করার কাহিনী, মোরক্কোর ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় খলিফাগণের রাজত্বকাল, সিসিলী দ্বীপে আরবগণের বিবরণ ও তাহাদের দ্বারা ইটালী আক্রমণ এবং মিশরের ফাতেমিন বংশীয় খলিফাগণের শাসনকালের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

যে মুসলমানেরা এককালে সমস্ত ইয়ুরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় আপনাদের প্রভুত্ব ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহাদের তাৎকালীন ক্ষমতা ও সভ্যতার ইতিহাস সকল শিক্ষাভিমানী ও শিক্ষালাভেচ্ছু ব্যক্তির জানা উচিত। অথচ গ্রন্থকার দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে ঋণ করিয়া তাঁহাকে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে হইতেছে। এমন উপাদেয় বিচিত্রঘটনারম্য কৌতূহলোদ্দীপক বইও যদি আমাদের দেশে বিক্রয় না হয় তবে তাহা বড়ই পরিতাপ ও লজ্জার কথা।

গ্রন্থখানির ভাষায় ও বিদেশী নামের উচ্চারণ অনুবাদে কিছু ত্রুটি আছে। যথা—শার্ল্‌মাঞ, চ্যারলাম্যাগনি নহে; এক্স-লা-শাপেল্‌, আইক্সলা চেপিলী নহে; Basque উচ্চারণ বাস্ক, ব্যাসকোয়েস নহে।

হোমিওপ্যাথিক মতে আদর্শ গৃহচিকিৎসা—১৪।১ নং বনফিল্ড্স্ লেন কলিকাতা, দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাসি হইতে এস এন চৌধুরী কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২৬৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য দশ আনা।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মোটামুটি তত্ত্ব; সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধের নাম, ক্রম, ও প্রয়োগবিধি; ঔষধের রোগাধিকার; রোগের নিদান ও চিকিৎসা; ঔষধের পরস্পর সম্বন্ধ ও সম্পর্ক; পথ্য ও অপথ্য; সংক্ষিপ্ত চিকিৎসায় ঔষধ নির্দ্দেশ ও ঔষধের বিশদ ও বিশেষ অধিকার প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত, ব্যাখ্যাত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঔষধ ও রোগের বাংলা নামের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি নাম দেওয়াতে বুঝিবার পক্ষে অধিক সুবিধা হইয়াছে। কতকগুলি এমন রোগের চিকিৎসা দেওয়া হইয়াছে যেগুলি আকস্মিক বা হওয়ামাত্র সাংঘাতিক নহে, এবং যেগুলির চিকিৎসা সহজে চিকিৎসক-নিরপেক্ষ হইয়া হওয়ার জো নাই; আমাদের মনে হয় এরূপ ব্যাধির চিকিৎসা বাদ দিয়া বা সংক্ষেপ করিয়া, আকস্মিক সাংঘাতিক ও সচরাচর পরিবারে ঘটে এমন রোগের চিকিৎসা আর-একটু বিশদ করিলে ভালো হইত। তথাপি গ্রন্থখানি গৃহস্থের উপকারে লাগিবে। প্রথম শিক্ষার্থীর সুবিধাজনক করিয়া চিকিৎসাবিধানের বহুবিধ সঙ্কেত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক—প্রকৃতঘটনামূলক উপন্যাস, শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত, সাধনপুর, চট্টগ্রাম, শরৎ পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ১২ অং ৬০+১৵৹ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৶৹ আনা। প্রথম অংশ উপন্যাস, দ্বিতীয় অংশ আদিনাথ ও চন্দ্রনাথ তীর্থের বিবরণ। গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ আয় সাধারণ পাঠাগার শরৎ পুস্তকালয়ে দেওয়া হইবে।

শরৎ-লীলা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক কবিতাচ্ছন্দে অনূদিত, প্রকাশকের নির্দ্দেশ নাই, গ্রন্থকারের ঠিকানা রাজপুর, পাশ্চাত্যপাড়া, সোনারপুর পোষ্ট আপিস, ২৪ পরগণা। মূল্য পাঁচ আনা। ৬৮ পৃষ্ঠা পাইকা টাইপে ছাপা। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণকাহিনী পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদে মাধুর্য্য বা কবিত্ব কিছুমাত্রও নাই।

রঙ্গিলা—শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত-প্রণীত, ৬৫।১ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট কলিকাতা শিশু-প্রেস হইতে প্রকাশিত। ৬৪ পৃষ্ঠা, সচিত্র, রঙিন প্রচ্ছদ, মূল্য চার আনা। শিশুপাঠ্য ছড়ার বই; ছড়ার বিষয়গুলি হাস্যোদ্দীপক, মজাদার, সুতরাং শিশুদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবে।

সাহানা—শ্রীসুনীতি দেবী-প্রণীত, প্রকাশক শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, কেশবধাম, বেনারস সিটি। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ৭৭ পৃষ্ঠা, পাইকা টাইপে কুন্তলীন প্রেসের পরিষ্কার ছাপা। মূল্য আট আনা।

পদ্যেরই বই। মাঝখানে তিনটি গদ্য রচনাও আছে। লেখিকার ৮ বৎসর হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে রচিত।

সচিত্র রাজস্থান—শ্রীঅবনীমোহন মুখোপাধ্যায়-প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস উপন্যাসের ছায়ায় লিখিত, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত, পনর দিন অন্তর এক এক খণ্ড বাহির হইবে। আমরা তিনখণ্ড পাইয়াছি; তিন খণ্ডে শিলাদিত্য, গুহ, নাগাদিত্য ও বাপ্পার কাহিনী আছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক আনা। প্রাপ্তিস্থান ২০০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

ভাষা উপন্যাসের উপযুক্ত নহে, অত্যন্ত ভারী, সংস্কৃত শব্দ ও সমাসের জগদ্দল পাথর ভাষার বুকে চাপানো। অথচ গ্রন্থকার 'নিবেদনে' করিয়াছেন "রাজস্থানের ইতিহাস সরল ভাষায় পাঠকের রুচিকর পন্থা অন্বেষণ করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ লিখেন নাই। সেইজন্য আমি ...... সরল ভাষায় ...... প্রকাশ করিলাম।" গ্রন্থকার কি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপূর্ব্ব সুন্দর "রাজকাহিনী" বা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দীর পদ্য রাজস্থানের বা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজস্থানের খোঁজ রাখেন না? ঐগুলি থাকিতে গ্রন্থকারের পণ্ডশ্রম করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না।

মোহমুদ্গর—মূল ও পদ্যানুবাদ। শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত। প্রকাশক শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য্য, পাথরীকুল, পোষ্ট সাতগাঁও, শ্রীহট্ট। মূল্য এক আনা।

অনুবাদ বেশ ভালোই হইয়াছে।

নরসুন্দর-সমাজ—ডাক্তার শ্রীকেদারনাথ শীল কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা, সিরাজগঞ্জ কাওয়াকোলা নরসুন্দর-সমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক আনা।

শিক্ষা ও জ্ঞানই মানুষের উন্নতির ও সম্মান লাভের একমাত্র উপায়। সমগ্র বঙ্গদেশে ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯ শত ৯৪ জন নাপিতের বাস,—তন্মধ্যে পুরুষ ২২৩৪৭৬, স্ত্রীলোক ২১২৫১৮। তাঁহাদের মধ্যে মাত্র ৪৬৪৪২ জন লেখাপড়া জানেন, ৩৭৬১ জন ইংরেজী-শিক্ষিত। অর্থাৎ হাজারকরা ১৮৭ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারেন, অবশিষ্ট ৮১৩ জন একেবারে মূর্খ; শতকরা হিসাবে ১৭।১৮ জন লিখিতে পড়িতে পারেন, অবশিষ্ট ৮২।৮৩ জন নিরক্ষর। অন্যান্য জাতির তুলনায় এই অজ্ঞানতার পরিমাণ নরসুন্দর-সমাজে অত্যন্ত বেশী। ইহা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া বক্তা তাঁহার স্বজাতীয় নরনারীকে শিক্ষালাভে উদ্যোগী হইতে বলিয়াছেন এবং এ কর্ম্ম যে শিক্ষিত নাপিতদিগেরই প্রধান কর্ত্তব্য তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোকেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের জাতীয় দুর্গতি নিবারণের একমাত্র পন্থা এই শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ। যে জাতি বা সমাজ যত শিক্ষিত ও জ্ঞানবান তাহা তত উন্নত, ইহা প্রমাণিত সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য।

গানের খাতা—(প্রথম শতক)—রচয়িতা শ্রীকরণচাঁদ দরবেশ, প্রকাশক শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৮ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য আট আনা।

গ্রন্থকারের বালককালের লেখা রাধা কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ প্রভৃতির প্রতি ভক্তি ও প্রার্থনামূলক এই গানগুলি। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে এইসকল গান নাকি বৈষ্ণব বৈরাগীরা লোকপরম্পরায় শুনিয়া শিখিয়া পথে ঘাটে গাহিয়া থাকেন। কিন্তু মুখে মুখে ফিরিতে ফিরিতে গানের পদবিকৃতি ঘটে। তাহাই নিবারণের জন্য এই গ্রন্থন। গানের দুই একটি চরণে মরমিয়ার দরদী রস একটু আধটু সম্পৃক্ত হইয়াছে; কিন্তু কবিত্বরস, যাহা গানের প্রাণ তাহা, একশ গানের একটাতেও একবিন্দু পাইলাম না। মামুলি তত্ত্বকথা ও কটমট শব্দের ঘনঘটা আছে প্রচুর।

মূর্চ্ছনা—(গীতিকাব্য)—শ্রীহৃষীকেশ মল্লিক প্রণীত। প্রকাশক এস সি আঢ্য কোম্পানি, কলিকাতা। পাইকা টাইপে চেরি প্রেসে পরিষ্কার ছাপা। রেশমী কাপড়ে বাঁধা। মূল্য পাঁচ সিকা। সচিত্র।

অনেকগুলি খণ্ড কবিতা আছে। চুম্বন নামক কবিতার একটি

ইংরেজি অনুবাদ The Philsophy of Kiss গ্রন্থশেষে লেখক for his European friends সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। এই কবিতা ও অনুবাদ শেলীর The Philosophy of Love নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটির paraphrase অর্থাৎ বিশদীকৃত রূপ। সমুদ্র নামক কবিতাটিতে সমুদ্রে সূর্য্যোদয়ের বর্ণনাটি বাস্তব ছবির হিসাবে সুন্দর হইয়াছে, কবিত্বও যে একেবারে নাই এমন নহে,—সূর্য্যোদয়ে অরুণচ্ছটা

নীল প্রান্তে দেয় দেখা
রাঙা রাঙা হাসি কিবা নয়নরঞ্জন।
* * * *
দেখিতে দেখিতে শেষে
রাঙা ছবি উঠে ভেসে,
সুবর্ণের থালা-প্রায় আধ-মগ্ন থাকে।
এসে কে রূপসী বালা
যেন মেজে দিল থালা
হেমের কলসী শেষে উলটিয়া রাখে।
* * * *
জেগে জেগে সারা রাত
রাঙা চোখে দিননাথ

যখন উদয় হইলেন, তখন

প্রত্যেক রঙের পরে
অতি শুভ্র আভা ধরে
ফেটে ফেটে ফুটে ওঠে রজতের ছটা॥

যাঁহারা সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই বর্ণনা আপনাদের অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া দেখিলে আনন্দ পাইবেন।

তাজমহলকে কবি বলিয়াছেন—

এ নহে উচ্ছাস, শুধু কবির কল্পনা,
দূরাগত বাঁশরীর সুস্বর আলাপ ;
এ সমাধি প্রেমিকের প্রেমের স্থাপনা—
পাষাণে রাখিয়া গেছে অনন্ত বিলাপ।
* * * *
এ মহামন্দির গড়া প্রেমের স্বপনে।

অন্যান্য কবিতাগুলি নিতান্তই সাধারণ, কিন্তু তাহাদেরও মধ্যে এক এক পংক্তিভাবুক কবির পরিচয় অকস্মাৎ দিয়া যায়।

আদব-কায়দা শিক্ষা—শ্রীসৈয়দ আবু মোহাম্মদ এস্‌মাইল হোসেন সিরাজী কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ১১৭ পৃষ্ঠা। পাইকা অক্ষরে ছাপা, মূল্য আট আনা।

গ্রন্থকারের মতে মুসলমান ধর্ম্মই জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং মুসলমানী আদব কায়দাতেই ভদ্রতার চূড়ান্ত পরিচয়, সুতরাং সকলেরই মুসলমানী আদব-কায়দা শিক্ষা করা উচিত। এই সূত্রে গ্রন্থকার বাঙালী হিন্দুদের উপর স্থানে অস্থানে বড়ই উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার নিজের আদব কায়দার উৎকর্ষ সুন্দরভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙালী হিন্দুর অপরাধ তাহারা "কালিমাখা হাঁড়ির মতো" খালি মাথা লইয়া যথা তথা বিচরণ করে, ধুতি পরে, মুসলমানেরা তাহাদের অনুকরণ বিবিধ বিষয়ে করে। কিন্তু সিরাজী মহাশয়ের নামে সিরাজের গন্ধ থাকিলেও তাঁহার সহিত আরব পারস্যের সম্পর্ক বাস্তবিক কতখানি তাহা আমরা জানি না। ফটোগ্রাফে তুরস্ক সৈনিকের বেশে তাঁহাকে দেখিতেছি। কিন্তু এখন বোধহয় তিনি বুঝিতেছেন যে

"বোঁটা যবে কাটা গেল, বুঝিল সে খাঁটি
সূর্য্য তার কেহ নয়, সবি তার মাটি।"

তিনি নামে ও পোষাকে যতই বিদেশী হোন না কেন, তিনি বাঙালী। সুতরাং বাঙালী মুসলমানের নাম বাংলা ভাষায় রাখা হইলে তাঁহার ক্রোধ করা অন্যায় ; আরবের লোকের নাম আরবীতে হইবে, বাঙালীর নহে—তা সে ধর্ম্মে যাহাই হোক না কেন। গ্রন্থকারের গালির ভাষা অত্যন্ত অসংযত, অভদ্র, একেবারে আদব কায়দার মুণ্ডপাত, তবু তাহা বাংলা।

যাহাই হোক এই গ্রন্থখানিতে আদব কায়দার অনেক কথা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হিন্দু মুসলমান সকলেরই ধীর ও নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার যোগ্য। অনেক শিক্ষণীয় ও পালনীয় কথা ইহাতে আছে।

তুরস্ক ভ্রমণ—শ্রীসৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী প্রণীত। কলিকাতা ১১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট হইতে শাহাজাহান কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

বিগত বলকান-তুর্কী যুদ্ধের সময় সিরাজী সাহেব বঙ্গীয় মোসলেম সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ আহতদিগের সেবার জন্য তুরস্কে গিয়াছিলেন। তুরস্কের যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্র, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনযাত্রা-প্রণালী, দর্শনীয় স্থান, দৃশ্য ও বস্তু প্রভৃতি নিজের চোখে দেখিয়া এই পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি বহু বিচিত্র তথ্যে পূর্ণ হওয়ায় অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে নব্য তুর্কীর প্রাণের কথা অনেক জানিতে পারা যায়। লেখক তুর্কী রমণীর স্বাধীন ও অনবরুদ্ধ অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া এই পুস্তকে ভারতবর্ষের রমণী-সমাজের অবরোধপ্রথার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। এই গ্রন্থ সাধারণের নিকট সমাদর লাভের যোগ্য, কারণ একজন বাঙালী নিজের চোখে এমন দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন যাহা সচরাচর কাহারও দেখার সুবিধা হয় না, এবং এই গ্রন্থে সেই বাঙালীর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তুর্কী নারী-জীবন—শ্রীসৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রণীত। রঙ্গপুর লালবাড়ীনিবাসী শ্রীমুন্সী মোহাম্মদ শাফায়েতুল্যা চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা।

এই পুস্তিকায় তুর্কী নারীদিগের গার্হস্থ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। তাঁহারা শিক্ষিতা, অনবরুদ্ধা, কর্ম্মনিপুণা ও কর্ম্মঠ ; তাঁহারা বহুপ্রকারে সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় পুরুষদের সহকারিতা করিয়া থাকেন। অবরোধবাসিনী অশিক্ষিতা ভীরু বঙ্গ-ললনাদের এই আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। গ্রন্থকার শিক্ষিত ও বহুদেশদর্শনে-মার্জ্জিতবুদ্ধি বলিয়া অবরোধপ্রথা ও অজ্ঞান অশিক্ষার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। আমাদের মুসলমান ও হিন্দু সমাজ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলে দেশে শুভকর্ম্মের সূচনা সহজ হইয়া আসিবে।

স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা - পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার শ্রীসৈয়দ সিরাজীর প্রণীত। মূল্য তিন আনা।

এককালে মুসলমানেরা স্পেন অধিকার করিয়া য়ুরোপের শিক্ষা-দাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্পেনের কর্ডোভা নগরী শিক্ষা সভ্যতা শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই পুস্তকে সেই কর্ডোভার বৃত্তান্ত ও ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কোরানের উপাখ্যান—সচিত্র—শ্রীআবদুল লতিফ কর্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য আড়াই আনা। আমরা এই পুস্তকের প্রথম

সংস্করণের প্রশংসা করিয়াছিলাম। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে দেখিয়া প্রীত হইলাম। ইহা হিন্দুমুসলমান সকলেরই অবশ্যপাঠ্য।

সাল-তামামি

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদের নিকট সমালোচনার জন্য বহুদিন হইতে আছে; উপযুক্ত সমালোচক বা আমাদের সময়ের অভাবে ইহাদের সমালোচনা হইয়া উঠে নাই; এই ক্রটির জন্য আমরা গ্রন্থকারদিগের নিকট সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—
৩ শোভা—শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।
৪ বিচিত্রপ্রসঙ্গ—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।
৫ পোষ্যপুত্র—শ্রীঅনুরূপা দেবী।
৬ দারিদ্র্য ও সমবায়—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ।
৭ বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র—শ্রীবিনয়কুমার সরকার।
৮ রামেশ্বর দুর্গ—শ্রীঅমলানন্দ বসু।
৯ পুরোহিত—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র।
১০ চিতোরকুমার—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র লাহিড়ী।
১১ আকাশপ্রদীপ—শ্রীসুধরঞ্জন রায়।
১২ প্রকৃতি—শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।
১৩ রবীন্দ্রপ্রতিভা—শ্রীমৌলবী একরামউদ্দীন।
১৪ গীতাঞ্জলি-সমালোচনা—শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।
১৫ ভীষ্ম—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।
১৬ নির্ব্বাণ—শ্রীহীরালাল দত্ত।
১৭ মন্দার-কুসুম—শ্রীপ্রফুল্লনলিনী ঘোষ।
১৮ জাতিভেদ—শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।
১৯ তপোবন—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।
২০ ধ্যানলোক— ,,
২১ পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—শ্রীবিনোদবিহারী রায়।
২২ স্বাধীন-সন্ধান—শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২৩ আর্য রামায়ণে বাল্মীকি—শ্রীশ্রীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।
২৪ কৃতবোধ—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।
২৫ আস্তিক-তত্ত্ব—শ্রীদীননাথ মিত্র।
২৬ কোচবিহার অনাথ আশ্রমের বাৎসরিক রিপোর্ট।
২৭ স্পেনবিজয় কাব্য—শ্রীসৈয়দ সিরাজী।
২৮ সোহ্‌রাব-বধ কাব্য—শ্রীআবুল-মা-আলী মহম্মদ হামিদ আলী।
২৯ আমাদের জীবন—রেভারেণ্ড ডনক্যান।
৩০ গ্রাম্য-উপাখ্যান—৺রাজনারায়ণ বসু।
৩১ বৈদ্যজাতির ইতিহাস—শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত।
৩২ পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—শ্রীবিনোদবিহারী রায়।
৩৩ রহস্যভেদ অতুলকৃষ্ণ।
৩৪ তুঁত ও রেশমশিল্প সম্বন্ধে উপদেশ—শ্রীমন্মথনাথ দে।
৩৫ Social Problem—Sailendrakrishna Deb.
৩৬। Iron in Ancient India—Panchanan Neogi.
৩৭। শশাঙ্ক—শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায়।

বর-বীর

(রবীন্দ্রনাথের "বন্দীবীর"-এর অনুকরণে)

গঙ্গানদীর তীরে,
গগনচুম্বী শিরে,
থাকিয়া থাকিয়া মুরজ-মন্দ্রে
গরজে বরের বাপ,
অপ্রতিহত-দাপ!
হাজার কণ্ঠে "পুত্রের জয়"
ধ্বনিয়া উঠিল শেষ,
নূতন জাগিয়া দেশ
নূতন পাশের লিষ্টের পানে
চাহিল৷ নির্নিমেষ।

"কনক নিরঞ্জন"—
মহারব উঠে, ঘটকেরা ছুটে,
করে বাংগ ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
আশা বাজে ঝন্ ঝন্
বঙ্গজ আজি গরজি উঠিল
"কনক নিরঞ্জন।"

নগর-সৌধকূটে,
হোথা বার বার মেয়ের বাবার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।
কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে
নিবিড় নিশীথ টুটে?
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠিছে ফুটে?
গঙ্গা নদীর তীরে,
যত লোভাতুর ক্ষিপ্তকুকুর
মুক্ত হইল কি রে
লক্ষ বক্ষ চিরে
শুষিবারে প্রাণ মদ্য সমান?
বীরগণ প্রেয়সীরে
রক্ততিলক ললাটে পরাবে
বিনা পয়সায় কি রে?

পাত্রী দেখার ক্ষণে।
রহিল আঁকড়ি বলয় মাকড়ি
চেন ঘড়ী আদি সনে
মেয়ের বাবার পঞ্জরগুলা
বরপক্ষীয়গণে।
সেদিন কঠিন রণে,
"বাঁচান বাঁচান! আর কত চান?"
কন্যাকর্ত্তা ভণে।
হর্ত্তার দল অর্থপাগল
"দি'ন দি'ন" গরজনে।

বাংলার ঘরে ঘরে
কন্যারে হেরি হন্যা হইল
কেরাণী দেনার ডরে।
কান্নার রোল পড়ে
"জাত রাখা দায়, ভাত মারা যায়,"
বাংলার ঘরে ঘরে।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বেতালের বৈঠক

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক মাসে প্রশ্ন মুদ্রিত করিব; প্রবাসীর সকল পাঠকপাঠিকাই অনুগ্রহ করিয়া সেই প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। যে মত বা উত্তরটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক ব্যক্তি পাঠাইবেন আমরা তাহাই প্রকাশ করিব; সে উত্তরের সহিত সম্পাদকের মতামতের কোনো সম্পর্কই থাকিবে না। কোনো উত্তর সম্বন্ধে অন্তত দুইটি মত এক না হইলে তাহা প্রকাশ করা যাইবে না। বিশেষজ্ঞের মত বা উত্তর পাইলে তাহা সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইবে। ইহাদ্বারা পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে চিন্তা উদ্বোধিত এবং জিজ্ঞাসা বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আশা করি। যে মাসে প্রশ্ন প্রকাশিত হইবে সেই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌঁছা আবশ্যক, তাহার পর যে-সকল উত্তর আসিবে, তাহা বিবেচিত হইবে না।]

ইতিহাসে বিখ্যাত পুরুষ।

(১) প্রতাপসিংহ (২) শিবাজি (৩) অশোক (৪) বুদ্ধদেব (৫) পৃথ্বিরাজ (৬) আকবর (৭ক) প্রতাপাদিত্য (৭খ) কালিদাস (৯) রণজিতসিংহ (১০) বিক্রমাদিত্য (১১ক) শঙ্করাচার্য্য (১১খ) আরংজীব।

ইতিহাসে বিখ্যাত নারী।

(১) পদ্মিনী (২) নুরজাহান (৩ক) রিজিয়া (৩খ) অহল্যাবাই (৫ক) সংযুক্তা (৫খ) চাঁদসুলতানা (৫গ) দুর্গাবতী (৫ঘ) মীরাবাই (৯) ধাত্রীপান্না (১০ক) রাণীভবানী (১০খ) লক্ষ্মীবাই (১২ক) খনা (১২খ) লীলাবতী।

ইতিহাসে বিখ্যাত স্থান।

(১) দিল্লী বা ইন্দ্রপ্রস্থ (২) পাটলীপুত্র বা পাটনা (৩ক) চিতোর (৩খ) পানিপথ (৩গ) আগ্রা (৬) পলাশী (৭) সারনাথ বা কাশী (৮) গৌড় (৯ক) চিলিয়ানওয়ালা (৯খ) কানপুর (১১ক) পুরী (১১খ) হলদিঘাট (১১গ) নালন্দা।

নূতন প্রশ্ন।

১। বাংলাভাষাকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করিয়াছেন বা করিতেছেন এরূপ দুজন [রবীন্দ্রনাথ ছাড়া] জীবিত ব্যক্তির নাম করুন।

২। বিদেশীভাষার পুস্তকের অনুবাদ বা অনুসরণ করিয়া লেখা বাংলাভাষার পাঁচখানি সাহিত্য-রসপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের নাম করুন।

৩। গভর্ণর জেনারেলদিগের মধ্যে কোন্ মহাত্মা সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালী প্রজার হিতসাধন করিয়াছেন।

গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে 'বেতালের বৈঠকে' বিদেশীয় ভাষা হইতে অনুবাদযোগ্য যেসকল পুস্তকের তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই নাটক বা নভেল। বিদেশীয় ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে আরও অনেক পুস্তক আছে যাহা নাটক বা নভেল অপেক্ষা অধিক আবশ্যকীয় ও যাহা বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালায় অনুবাদযোগ্য। আমার ক্ষুদ্র মত-অনুযায়ী একটি তালিকা নিম্নে দিলাম

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকর্ত্তা—
1. Self-Help	Samuel Smiles.
2. Life and Labour	Do.
3. Character	Do.
4. Children's Book of Moral Lessons (1st to 5th series)	F. J. Gould.
5. Moral Tales	Mrs. Edgeworth.
6. Swiss Family Robinson	Kingston.

পুস্তকের নাম		গ্রন্থকর্ত্তা—
7.	Autobiography	Benjamin Franklin.
8.	Parables from Nature	Mrs. Gatty.
9.	The Pleasures of Life	Lord Avebury.
10.	The Beauties of Nature	Do.
11.	The Use of Life	Lord Avebury.
12.	Natural History of Selbourne	Gibbert White.
13.	Voyages	Captain Cook
14.	Travels	Mungo Park.
15.	Life of William Carry	George Smith.
16.	Modern Science and Modern Thought	Samuel.
17.	Human Origin	Do.
18.	Plant Life	Grant Allen.
19.	Sagacity and Morality of Plants	J. E. Taylor.
20.	Origin of Species	Charles Darwin.
21.	A Journal of Researches	Do.
22.	Animals and Plants under Domestication	Do.
23.	Primitive Man	Edward Clodd.
24.	Prehistoric Times	Lord Avebury.
	The Origin of Civilisation and Primitive Condition of Man	Do.
26.	Pioneers of Evolution	Edward Clodd.
27.	Easy Outline of Evolution	Dennis Hird.
28.	The Naturalist on the River Amazon	H. W. Bates.
29.	Life of Jesus	Ernest Renan.
30.	The Bible in School	J. A. Picton.
31.	Rights of Man	Thomas Paine.
32.	The Age of Reason	Do.
33.	The New Light on Old Problems	J. Wilson.
34.	Evolution of the Idea of God	Grant Allen.
35.	The Riddle of the Universe	Ernest Haeckel.
36.	Wonders of Life	Do.
37.	Man's Place in Nature	T. H. Huxley.
38.	Lectures and Essays	Do.
39.	Ethics of the Great Religions	Ch. T. Gorham.
40.	Fields, Factories and Workshops	Prince Kropotkin.
41.	Ants, Bees and Wasps	Lord Avebury.
42.	Flowers, Fruits and Leaves	Do.

উপরি লিখিত তালিকার মধ্যে ২।৪ খানি পুস্তক পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া থাকিতে পারে, তাহা আমার জানা নাই। ইতি

নিঃ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেন।

আমরা উপরিলিখিত তালিকার কয়েকখানি পুস্তকের নাম পূর্ব্ববারেও পাইয়াছিলাম; কিন্তু অধিকসংখ্যক ভোট না পাওয়ায় সেগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আমরা আমাদের পাঠকদের নিকট হইতে যে উত্তর পাই তাহার অধিকাংশের ভোটে যেরূপ স্থির হয় আমরা তাহাই প্রকাশ করি মাত্র, উত্তরের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের কোনো সম্পর্ক নাই। সম্পাদক

আলোচনা

খোকা

ফাল্গুনের "প্রবাসীতে" পণ্ডিতপ্রবর বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় "খোকা" শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত তোক শব্দ হইতেই বাঙ্গলা 'খোকা' শব্দের উৎপত্তি। এ বিষয়ে পার্শ্ববর্ত্তী ওড়িয়া ভাষাতেও প্রমাণ পাইতেছি। ওড়িয়াতে শিশুকে টোকা বলে। মেয়েকে বলে টুকী (আমাদের খুকীর মত)। একজন উড়িষ্যাদেশীয় টোলের অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে সংস্কৃত তোক শব্দ হইতে টোকা ও টুকী শব্দ আসিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে বাঙ্গলা খোকা শব্দও এই সংস্কৃত তোক শব্দ হইতে আসিয়াছে। তিনি পূর্ব্ব হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত জানিতেন না।

উড়িষ্যা-প্রবাসী।

দেশের কথা

প্রায় নিত্যনূতন ডাকাতির সংবাদে দেশের সর্ব্বত্রই ভীষণ আশঙ্কার কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, এদেশে ডাকাতির সংখ্যা দিন দিন যেরূপ অপ্রতিহত-গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে ধনপ্রাণ নিরাপদ ভাবিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও জনসাধারণের নিশ্চিন্ত থাকা কঠিন। বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যে-সকল ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তাহার ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত হইলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। সংপ্রতি 'যশোহর', 'বরিশাল-হিতৈষী', 'গৌড়-দূত', 'প্রতিকার' প্রভৃতি বিবিধ সংবাদপত্রে উহার যে কয়েকটি ঘটনা প্রকাশিত বা উদ্ধৃত হইতেছে তাহা হইতেও উহার ভীষণতম সংখ্যাধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ-সকল পত্রে প্রকাশ, ইতিমধ্যে 'তারকেশ্বর বাজিতপুরে', 'কুমিল্লার লাকসাম থানার অন্তর্গত বাগমারা গ্রামের জমিদার বাবু গিরীশচন্দ্র রায় চৌধুরীর বাড়ীতে', 'নাটোর মহকুমার অন্তর্গত ধারাইল গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ীতে', 'জলপাইগুড়ি জেলার পিটমারীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে', 'রংপুর জেলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের বাবু কালীনাথ সরকারের বাটীতে', 'চাকদহের নিকটবর্ত্তী খয়রামারা গ্রামের বাবু প্রসন্নকুমার

সরকার ও সহায়মণ্ডলের বাটীতে', '২৪ পরগণা হাসনাবাদ কুলিয়াগ্রামে মহিমচন্দ্র ঘোষ নামক একব্যক্তির বাড়ী', 'হুগলী আরামবাগ নাটপুর গ্রামে এক হিন্দুরমণীর বাড়ী' 'ফরিদপুর মুরসেদপুর মাচনা গ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ নামক এক ব্যক্তির বাড়ী', 'বাখরগঞ্জ গাড়ুরিয়া গ্রামে রামকৃষ্ণ দাস নামক এক ব্যক্তির বাড়ী', 'বাখরগঞ্জ রাজপুর বারাইয়া গ্রামে অনাবাদ হাওলাদার নামক একব্যক্তির বাড়ী', 'বাখরগঞ্জ কতুয়ালী থানার অধীন কালিজিয়া নামক গ্রামে তোরাপ সরদার নামক একব্যক্তির বাটীতে', 'হুগলী দাইপাড়া গ্রামে পাঁচুরী দাসী নাম্নী এক রমণীর' ও 'শশীময়ী দাসী নাম্নী আর এক রমণীর বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল।' এতদ্ব্যতীত একদিকে যেমন আরো কয়েক স্থানে ডাকাতির বিফল চেষ্টা হইয়াছে, অন্যদিকে প্রকাশ্য দিবালোকে 'কলিকাতা হইতে খিদিরপুরের পথে' ও 'বেলেঘাটার এক চাউলের আড়তে' মোটরগাড়ীসহযোগে দস্যুতার অভিনব সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ এইসকল সংবাদে আত্মরক্ষার-অধিকারচ্যুত জনসম্প্রদায় ভবিষ্যতের বিপদাশঙ্কায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা যেমন আবশ্যক, তেমনি আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করাও প্রয়োজনীয়। হুগলীজেলার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্থানীয় ডাকাতি নিবারণের জন্য একটি 'ভিলেজ ডিফেন্স্ পার্টি' অর্থাৎ 'গ্রামসংরক্ষিণীসমিতি' গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমিতির সভ্যদিগকে নিম্নোদ্ধৃত মর্ম্মের সনন্দ প্রদান করা হইতেছে।

"এতৎদ্বারা আপনাকে অত্র জেলার.........থানার অন্তর্গত...... গ্রামের 'গ্রাম সংরক্ষিণী সমিতি'র মেম্বর নিযুক্ত করা গেল।

চোর, ডাকাইত, এবং দস্যু প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আপনার প্রতিবাসীগণকে রক্ষা করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এতৎদ্বারা আপনাকে আরও অবগত করা যাইতেছে যে, যদি আপনি একজন সশস্ত্র ডাকাইত ধরিতে পারেন, তাহা হইলে ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন, একজন অস্ত্রবিহীন ডাকাইত ধরিতে পারিলে ৫০০ পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাইবেন, এবং অন্যান্য চোর ধরিতে পারিলেও আপনাকে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া যাইবে। আপনার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

কর্ত্তব্য-কর্ম্ম।

১। আপনার বাটীতে লাঠি, বর্শা, তীর, ধনুক কিম্বা অন্য অস্ত্রাদি এবং প্রস্তর বা ইষ্টক-খণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন।

২। কোনরূপ গোলমাল শুনিবামাত্রই আপনি সমিতির অন্যান্য মেম্বরগণের সহিত সুবিধাজনক স্থানে সমবেত হইবেন, এবং সকলে লাঠি, ইষ্টক ও অন্যান্য অস্ত্রাদি লইয়া একযোগে দৃঢ়পরিকর হইয়া দস্যুগণকে আক্রমণ করিবেন, এবং তাহাদের যতগুলিকে পারেন ধৃত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইবেন।

৩। ধৃত-সংবাদ থানায় অতি সত্বর পাঠাইবেন ও ধৃত ব্যক্তি যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে সে পক্ষে বিশেষ সাবধান হইবেন।

বিশেষ মন্তব্য।—পুরস্কার।

(১) সশস্ত্র ডাকাইত ধরিতে পারিলে ১,৫০০৲ টাকা।
(২) অস্ত্রবিহীন ডাকাইত ধরিতে পারিলে ৫০০৲ টাকা।"
(বাঙ্গালী)

পুলিশসাহেবের এ উদ্যম প্রসংসার্হ, সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতি স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনে কতদূর সাফল্যলাভ করিবে বলা যায় না। আমরা 'বাঁকুড়াদর্পণে'র কথায়ই এস্থলে বলিতেছি—

"পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের উক্ত সনন্দ কিরূপ কার্য্যকর হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। বর্ত্তমানে ডাকাইতেরা পিস্তল আদি ভীষণ অস্ত্র লইয়া ডাকাইতি করিতে যায়। লাঠি ও দুটো ঢিলের বলে তাহাদের সম্মুখীন হওয়া যে লোকের পক্ষে কিরূপ সম্ভবপর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।"

বাস্তবিক কেবলমাত্র ঢিল-পাটকেল লইয়া আধুনিক সশস্ত্র দস্যুর সম্মুখীন হওয়া সমীচীন বলিয়া কেহই মনে করিতে পারেন না। 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' এ সময়ের সঙ্কট-সমস্যা দেখিয়া প্রবীণের ন্যায় বলিতেছেন—

"প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে যে ডাকাতের দল আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত। বন্দুকের ভয়ে গ্রামবাসীরা তাহাদের নিকটে ঘেঁষিতে পারে না। এদিকে অস্ত্র-আইনের কঠোরতার ফলে দেশ একপ্রকার অস্ত্রশূন্য। গবর্ণমেণ্ট এই সমস্যার সমাধান করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের ধনপ্রাণ নিরাপদ করুন। আমাদের মতে গ্রামে গ্রামে প্রধান ও বিশ্বস্ত লোকদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া সরকার হইতে তাঁহাদিগকে বন্দুক দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। ভারতবাসী যদি একান্তই এই অনুগ্রহ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে অন্ততপক্ষে "লাইসেন্স" আইনের কঠোরতা ও হেঙ্গাম একটু শিথিল করিয়া দিলেও অনেকটা উপকার হইত। ফল যে-কোন উপায়ে হউক, প্রতিকার আবশ্যক।"

টাঙ্গাইলের ইসলাম-রবিও ঐ কথায়ই সায় দিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"কি কারণে জানি না এইসব ডাকাতির কোনও কূল-কিনারার খবর পাওয়া যায় না। জনসাধারণ এইসব কার্য্যে পুলিশের সহায়তা করে না ইহা এক পক্ষের কথা। অন্য পক্ষ বলেন অস্ত্র আইনের কঠোরতায় এই চুরী-ডাকাতির সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। যেখানে ডাকাতি, সেইখানেই প্রাণনাশকর অস্ত্রের ভীতি-প্রদর্শনের সংবাদ আমাদের কানে আসে। গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবিধান-কল্পে কি করিতেছেন? ভয়ানক লুট-তরাজ ও ডাকাতির

সময় গ্রামবাসীর হাতে অস্ত্র থাকিলে তাহারা চুপ করিয়া থাকিবে কেন? বাঁশের কঞ্চি হাতে করিয়া কে প্রাণ হারাইবার জন্য ডাকাইত-দলের সম্মুখে উপস্থিত হইবে? কাজেই ডাকাইতদের একটু গন্ধ পাইলেই তাহাদিগকে বাধা প্রদান তো দূরের কথা বরং প্রতিবাসী বলবান ব্যক্তিও নিজের প্রাণটি বাঁচাইবার জন্য ঝোপ-জঙ্গলে মাথা দেয়। গবর্ণমেণ্ট শুধু পুলিসের উপর বিশ্বাস করিয়া দেশবাসীকে এই কার্য্যে সহায়তাকারী মনে না করিলে সে বড় দুঃখের বিষয় হইবে। আমাদের বিশ্বাস গ্রামবাসীর হাতে অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ প্রদান না করা পর্য্যন্ত বোধ হয় এই ঘৃণিত দস্যুবৃত্তির দমন হইবে না।"

প্রজার ও রাজার মধ্যে বিশ্বাসের ভাব বর্ত্তমান থাকাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় এবং এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কার্য্য করা উভয়েরই কর্ত্তব্য। শ্রীরামপুরের ছাত্রসম্প্রদায় স্থানীয় ডাকাতি দমনার্থ পর্য্যায়ক্রমে রাত্রি জাগিয়া পাড়ায় পাড়ায় পাহারার বন্দোবস্তের নিমিত্ত এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করায় পুলিশ এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একার্য্যে তাহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন। সেই সূত্রে 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' বলিয়াছেন—

"পুলীশের বড়-কর্ত্তারা যদি বালকগণকে বিশ্বাসের চক্ষে দেখেন তাহা হইলে এদেশ হইতে পনর আনা ডাকাতি উঠিয়া যাইবে।"

'বীরভূমবার্ত্তা'ও এ সম্বন্ধে অনুরূপ কথা বলিয়াছেন—

"পুলিসপক্ষ যদি ছাত্রদিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন তবে উভয় পক্ষ মিলিয়া মিশিয়া দেশের শান্তি-রক্ষার বন্দোবস্ত তো উত্তম ব্যবস্থাই।"

এদিকে যেমন ডাকাতি, অন্যদিকে চুরির সংখ্যাও বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাঁকুড়া-দর্পণে প্রকাশ—

"সিন্দ্ চুরি ও ছিঁচ্‌কে চুরির উপদ্রব বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে।"

কিন্তু, ডাকাতির মূলে যাহাই থাকুক না কেন, এইরূপ চুরি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ দেশের দুর্ভিক্ষ বলিয়াই মনে হয়। 'ত্রিপুরা-হিতৈষী'-পত্রে এসম্বন্ধে একটি ঘটনাও প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পত্রে প্রকাশ—

"গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরি খুব হইতেছে। সাদুল্লাপুরনিবাসী জনৈক মুসলমান সুপারি চুরি করিয়াছিল। বাগানের মালিক তাহাকে ধরিয়া জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লইয়া যায়। সে চুরি করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এবং বলিয়াছে, 'হুজুর ছেলেপিলেগুলি আজ দুই দিন যাবৎ অনাহারে আছে; কাহারো কাজ করিয়া দুটো পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিতেছি না, কেহই কাজ করাইতেছে না; কাচ্চাবাচ্চাদের কান্না আর সহ্য হইতেছে না, পেটের জ্বালায় চুরি করিয়াছি। জীবনে আর কখনও এমন কার্য্য করি নাই।' ম্যাজিষ্ট্রেট দয়া করিয়া তাহাকে খালাস দিয়াছেন।"

দেশব্যাপী অন্নকষ্টে এবং ব্যারামপীড়ায় জনসাধারণের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে ইজ্জত রক্ষা হওয়ার উপায় তো নাই-ই, যাহারা অনশনের জ্বালায় আত্ম-হত্যা করিতে পরাঙ্মুখ তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া এইরূপ অপকর্ম্ম করিয়াই আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইতেছে।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও কৃষককুলের এরূপ দুর্দ্দশার অবসান যে শীঘ্র হইবে তাহারও বড় আশা নাই। কারণ বর্ত্তমান বৎসরের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বর্ত্তমানের অভাবই দূর করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। এ বিষয়ের প্রমাণার্থ 'মেদিনীবান্ধব' হইতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ জানা মহাশয়ের অভিজ্ঞতামূলক মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"আমি নিজে কতক জমি আবাদ করিয়াছিলাম, তাহাতে কি পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে নিম্নলিখিত হিসাব দেখিলেই স্পষ্টই বিদিত হইবে। ১২৮২ সালে মাজনামুঠা ও জলামুঠা ষ্টেট্ জরিপের পর মিঃ প্রাইস্ সাহেব যে রিপোর্ট দেন, তাহার ৪২ পৃষ্ঠায় এক বিঘা জমি আবাদের খরচা নিম্নলিখিতরূপ লিখিত আছে—

১৬ সের বীজধান্য—	।/০
৭টা লাঙ্গল /১০ হিঃ—	॥৵১০
বেন প্রস্তুত জন্য ২টা মজুর /১০ হিঃ—	৵/০
চারা ধান-গাছ রোপণ জন্য ৫টা মজুর /১০ হিঃ—	।৶১০
ধান্য কাটিবার জন্য ৪টা মজুর —ঐ—	।৵০
ধান্য বহন ,, ২টা ঐ—ঐ—	৶০
ধান্য ঝাড়ান ,, ২টা ঐ—ঐ	৶০
যন্ত্রাদি ক্ষতিপূরণ—	৵০
মোট	২॥০

বিঘাপ্রতি কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা জানিবার জন্য মিঃ প্রাইস বহু অনুসন্ধান করিয়া শেষে স্থির করেন যে, ৮।১।০ (৮মণ ১১ সের ৪ ছটাক) ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য ৸০ আনা দরে ৬॥/৪ এবং খড়ের মূল্য ॥০ আনা, মোট ৭/৪ এক বিঘা জমিতে আয় হইতে পারে। ইহার মধ্যে আবাদ-খরচা ২॥০ টাকা ও খাজনা ১॥৶০ বাদ দিলে কৃষকগণ প্রতি-বিঘায় ২৸৵৪ লাভ করে। ইহা ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। এখন অবশ্যই মজুরির মূল্য বাড়িয়াছে, জমিতে ঘাস বেশী জন্মাইলে ৭টা লাঙ্গলে এক বিঘা জমি চষিতে পারা যায় না। গত বৎসর জমি পতিত থাকায় এই বৎসর চাষের সময় বিস্তর ঘাস জন্মিয়াছিল। সেজন্য কোন কোন স্থলে বিঘায় ১০ খানি লাঙ্গল আবশ্যক হইয়াছিল। গড়ে ৮ খানি লাঙ্গল ধরিয়া বর্ত্তমান বৎসর বিঘা প্রতি আবাদের খরচা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৬ সের বীজধান্য—	৸০
৮ খানি লাঙ্গল ।৵০ হিঃ—	৩৲
১৫টা মজুর ।০ হিঃ—	৩৸০
অতিরিক্ত ঘাস উৎপাটন জন্য ১টা মজুর—	।০
যন্ত্রাদির ক্ষতিপূরণ—	।০
মোট	৮৲

এই বৎসর গড় ধান্যের দাম ৩।০ হইয়াছিল, বীজ ধান্যের মূল্য আরও অধিক ছিল। আমরা গড় ৩৲ টাকা হিসাব ধরিয়াছি। মজুরী-মূল্য কত ছিল তাহার প্রমাণ গবর্ণমেণ্টের বহু জমা-খরচে রহিয়াছে। চাষের জন্য প্রায়ই টাকায় ৩টা মজুর পাওয়া যায়, সেস্থলে টাকায় ৪টা মজুর ধরা হইয়াছে। এরূপ অর্থব্যয়ে বিঘাপ্রতি কেবল মাত্র ৪/০ মণ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। ২॥০ টাকা মণ দরে ৪/০ মণ ধান্যের মূল্য ১০৲ টাকা ও খড়ের মূল্য ১৲ টাকা মোট ১১৲ টাকা পাওয়া গেল। আবাদ-খরচা ৮৲ টাকা ও খাজনা ১৸/০ বাদ দিলে কেবলমাত্র ১৶০ আনা লাভ থাকে। এমতাবস্থায় দুই বৎসরের খাজনা বাকী আছে। তাহা এককালীন পরিশোধ করিতে হইলে আরও ॥৶০ আনা ঋণ করিতে হইবে।

আমি কতক জমি আবাদ করাইয়াছিলাম, তন্মধ্যে ৮ বিঘা জমির ধান্য ঝাড়াই মলাই করিয়া মোট ৩৩॥০ মণ ধান্য পাইয়াছি। বাকী জমির ধান্য ঝাড়ান হয় নাই। উহার মূল্য বর্ত্তমান বাজার-দরে ৮২॥০ টাকা, খড় সমেত মোট মূল্য ৯০॥০ টাকা। আবাদ-খরচা প্রায় ৬০৲ টাকা। আমার নিজের কয়েকখানি লাঙ্গল ছিল বলিয়া পূর্ব্বোক্ত হিসাব অপেক্ষা কিছু কম খরচা হইয়াছে। দুই বৎসরের খাজনা প্রায় ৩১৲ টাকা দিতে হইবে। মোট আয় ৯০॥০ টাকা,আবাদ-খরচা ও খাজনা সমেত মোট ব্যয়—৯১৲ টাকা। ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, খাজনা পরিশোধের জন্য ॥০ আনা অতিরিক্ত না দিলে জমি রক্ষা করা কঠিন। খড়ের মূল্য যাহা হিসাব করা হইল, তাহা নিজ হইতে দিতে হইবে, নতুবা হিসাব ঠিক হইবে না।

কেবল আমার জমিতে যে বিঘাপ্রতি ৪/০ মণ ধান্য জন্মিয়াছে তাহা নহে, প্রায়ই গড়ে গভীর জমিতে ঐরূপ শস্য পাওয়া যাইবে। কেনেল পাড়ের নিকট দুই বিঘা চড়া জমি ছিল, তাহাতে মোট ১৸২ একমণ বত্রিশ সের ধান্য ও দুই বোঝা খড় পাওয়া গিয়াছে। এই দুই বিঘা জমিতে কি লাভ হইয়াছে তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। সর্ব্বত্রই ডাঙ্গা জমির ফসল ঐপ্রকার শোচনীয় হইয়াছে, জলের অভাব ও পোকার উপদ্রব এই উভয়বিধ কারণে যথেষ্ট শস্যহানিও ঘটিয়াছে। কিন্তু সে হিসাব এস্থলে বাদ দিতেছি। যথেষ্ট গভীর মাঠে কোন কোন জমিতে ৫.৬ মণ ফসল পাওয়া যাইতে পারে, তবে ঐপ্রকার জমির পরিমাণ নিতান্ত অল্প। প্রথমতঃ ধান ঝাড়াই মলাই করিলে বোধ হয় ৭।৮ মণ ফসল পাওয়া যাইবে, কিন্তু ভুষির ভাগ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় ধান্যের ভাগ অল্প হইয়াছে। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যিনি যেপ্রকার হিসাব করুন না কেন, আবাদ-খরচা, ধান্যের পরিমাণ ও মূল্য খাজনা প্রভৃতি হিসাব করিলে কৃষকের হাতে কিছুই থাকিবে না। তারপর গত বৎসরের ঋণ প্রভৃতি ত আছেই। এইসব বিপদ হইতে রক্ষা পাইলে আর-এক বৎসর সংসার-খরচ চালাইতে হইবে ও পুনরায় জমি আবাদ করিতে হইবে। তাহার খরচা কে দিবে?"

আমরা দুর্ভিক্ষের ভীষণতা বুঝাইবার সময়ে প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু বর্ত্তমানযুগের ক্রমবর্দ্ধনশীল অন্নসঙ্কটের কাছে সে মন্বন্তরও নিতান্ত তুচ্ছ। এদেশে দুর্ভিক্ষ বলিতে প্রাচীনকালে দেশের কিরূপ অবস্থা বুঝাইত এবং ঐ দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি দিন দিন কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, 'বীরভূমবার্ত্তা' তাহার একটি কৌতূহলজনক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা উহার অংশবিশেষ এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

"সে কালের 'দুর্ভিক্ষ' অল্পস্থায়ী ছিল, এ কালের "অন্নকষ্ট", প্রাণঘাতী জ্বরের মত আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। তাই সদাশয় ভারতেশ্বরের গৌরবময় সিংহাসন-তলেও ক্ষুধার্ত্তের আকুল আর্ত্তনাদ। অদৃষ্টের বিস্ময়ী বিড়ম্বনায়, দুর্ভিক্ষ-দমনের এত আয়োজন, এত 'রয়াল কামিশন', এত 'রাজবিধি-সঙ্কলন, এত 'টাকা সঞ্চয়' প্রবল স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া যাইতেছে। ভারতবাসী অস্থিচর্ম্মসার, অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া পলে পলে প্রজ্বলিত পাবকে পুড়িতেছে। প্রকৃতি রাক্ষসী কোটী কোটী সন্তানের শ্মশানে কঙ্কালের করতালি বাজাইয়া বিধাতার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টির বুকে, অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনিতেছে। বলিতে পার ভাই এ অন্নকষ্টের মূল কোথায়?

সেকালের 'দুর্ভিক্ষের' সঙ্গে একালের 'অন্নকষ্টে'র একবার তুলনা করা যাক। খিলিজি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা জেলালুদ্দীন ফিরোজ শা যখন দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট তখন ভারতে 'দুর্ভিক্ষ' হইয়াছিল; সে দুর্ভিক্ষে একসের চাউল এক জিতাল মূল্যে বিক্রীত হয়, জিতাল অনেকটা আমাদের পয়সার মত, ৫০ জিতালে এক টাকা হইত। এই দুর্ভিক্ষ একবর্ষ কাল স্থায়ী হয়। ইতিহাস বলে তখন অনেক নরনারী অন্নাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে আর-একবার ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ-কল্পে, শস্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া সম্রাট যে একখানি অনুশাসনপত্র প্রজাগণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় তখন

গম	একমণ	সাড়ে সাত	জিতাল
যব	,,	পাঁচ	,,
চাউল	,,	চারি	,,
মাষকলাই	,,	পাঁচ	,,
ছোলা	,,	পাঁচ	,,
মটর	,,	তিন	,,
লবণ	,,	তিন	,,
চিনি	একসের	দেড়	,,
ঘৃত	আড়াই সের	এক	,,

মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। ইহাতেই তখন কত লোকাকার!

তারপর, ৯৬২ হিজিরায় (১৫৫৪ খ্রীঃ) মহম্মদ আদিলশার আমলে, দিল্লী ও আগরা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তখন ১ সের জোয়ারীর মূল্য ২॥০ দাম। ৪০ চল্লিশ দামে এক টাকা। এই দুর্ভিক্ষ দুই বৎসর ব্যাপিয়া ছিল। ৯৮২ হিজিরায় (১৫৭৪ খ্রীঃ) আকবর সাহের শাসনকালে গুজরাটে একবার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। তখন—

এক মণ গমের	মূল্য	১২ দাম
,, যবের	,,	৮ ,,
,, চালের	,,	॥০ আনা হইতে ২৲ টাকা
,, কলাই	,,	১৬ দাম,
,, মুগ	,,	১৮ ,,
,, ছোলার	,,	সাড়ে ষোল দাম

এক মণ গমের	মূল্য	১২ দাম
,, মটর	,,	১২ ,,
,, ময়দা	,,	২২-২৫ ,,
,, তৈল	,,	৮০
,, ঘৃত	,,	১০৫
,, ছাগ-মাংস	,,	১।/০ আনা
,, দুগ্ধ	,,	৷৷৵ আনা

এইরূপ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বাবু অনেক গ্রন্থ হইতে এইসকল তালিকা সংগ্রহ করেন।

সাজাহানের রাজ্যকালে, দৌলতাবাদ প্রভৃতি স্থানে আরও একবার দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। সে দুর্ভিক্ষ একবৎসর ধরিয়া ছিল। সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, শায়েস্তা খাঁর শাসনকালে অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথমে টাকায় ৫।৬ মণ চাউল মিলিত। একথা এখন আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্পের চেয়েও বুঝি অসম্ভব! হায়! সেদিন আজ কোথায়?

১৭১০ খ্রীঃ অব্দে, কলিকাতা অঞ্চলে একবার দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময়ে চাউলের দর টাকায় এক মণ দশ সের। ১৭৫১-৫২ খ্রীঃ অব্দে যখন বর্গীর অত্যাচারে বঙ্গদেশ উৎপীড়িত, জর্জ্জরিত, এবং লুণ্ঠিত হইতেছিল, সেই দস্যু-বিপ্লবের সময় রাঢ় অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা যায়, তখন চাউলের মূল্য টাকায় ৩২ সের। তারপর যখন মুসলমান নবাবের শিথিল হস্ত হইতে অলস রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল, প্রবল-প্রতাপ, সূক্ষ্মদর্শী, রাজনীতি-নিপুণ ইংরেজ যখন এই ত্রিশ কোটি মানবের ভাগ্য-বিধাতা-রূপে বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন, বঙ্গদেশ তখন দুর্ভিক্ষের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে কাঁপিতেছিল। ইংরেজের সুশাসনে—লর্ড কর্ণওয়ালিসের সুব্যবস্থায় সে দুর্ভিক্ষ থামিয়া যায়। এই ভীষণ লোমহর্ষণকারী দুর্ভিক্ষের নামই "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।" সে সময়ে বাঙ্গলার কি শোচনীয় অবস্থা। সে চিরস্মরণীয় ঘটনা ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে, বাঙ্গালীর আবাল-বনিতা-বৃদ্ধের মুখে, পুরুষানুক্রমে প্রবাদ-গাথার মত প্রতিধ্বনিত হইবে। কিন্তু, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—সেও অতি তুচ্ছ, এখনকার এ অন্নকষ্টের সঙ্গে তার তুলনা হয় কি? যে দেশে একশত ব্যক্তির মধ্যে ৮০।৯০ জন কৃষিজীবী, সেই শস্য-শ্যামল উর্ব্বর দেশে আজ একমণ চাউলের মূল্য ৮ টাকা! তাই বলিতেছিলাম সেকালে দুর্ভিক্ষ ছিল বটে কিন্তু এমন সর্ব্বব্যাপী চিরস্থায়ী অন্নকষ্ট কখনই ছিল না। সে দুর্ভিক্ষ খড়ের আগুন; এ দুর্ভিক্ষ বিশ্বগ্রাসী দাবানল।

এ দুর্ভিক্ষের কারণ অনেক। তুমি বলিবে "অতিবৃষ্টি," আমি বলিব "অনাবৃষ্টি," রাম বলিবে "রপ্তানি," শ্যাম বলিবে "পৃথিবীতে লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে, তাই খাদ্যে সংকুলান হয় না।" কিন্তু আমরা বলি এসকল কারণ দুর্ভিক্ষের মূল কারণ নয়। এ দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ আমাদের শিল্পবাণিজ্যের অধোগতি।

আমাদের ভ্রম, কুসংস্কার, আর বিলাস-বাসনই আমাদের এই চিরস্থায়ী অন্নকষ্টকে ডাকিয়া আনিয়াছে। সে অন্নকষ্ট কি সহজে দূর হয়? * * * ভিক্ষায় কতদিন পেট ভরিবে? আর এই ত্রিশকোটী নরনারীকে নিত্য ভিক্ষাই বা কে দিবে? অন্নাভাবেই আমাদের দেশে এত মহামারী। দুর্ভিক্ষের শেষ না হইলে; অকালমৃত্যু অপমৃত্যু কিছুতেই দূর হইবে না।"

দেশের দুর্ভিক্ষের "একমাত্র কারণ" না হইলেও একতম কারণ যে 'শিল্পবাণিজ্যের অধোগতি', এবং 'আমাদের ভ্রম, কুসংস্কার আর বিলাস-ব্যসনই' যে উহাকে 'চিরস্থায়ী' করিবার পক্ষে কতকাংশে সহায়তা করিতেছে তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। বিদেশীয় বিলাসিতার অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা আমাদের সহজ-সাধ্য জাতীয় গৃহশিল্পকে কি-ভাবে উপেক্ষা করিতেছি চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' বাঁশের শিল্পের দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ঐ পত্রিকায় সত্যই উক্ত হইয়াছে—

"ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ আমাদের এই চট্টগ্রাম প্রদেশে, বাঁশের শিল্পজাত দ্রব্যের প্রভূত প্রচলন ছিল। কিন্তু তাহ এখন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বাঁশ সরু ও পাতলা করিয়া নানারূপে চিরিয়া ভারতবাসীর নিত্য ব্যবহার্য্য খোচনা, হাতা, লাই, টুকরী কুলা, জোঙ্গরা, ছাতি, লুই, চাই, চালুনী, ডালা, পেলো, ছিক, থার ফুলের সাজি, পানের বাটা, দুধ-ঢাকনী, ডুলা, বাক্স, পাখীর খাঁচ প্রভৃতি কত সুন্দর, পবিত্র, স্বল্পমূল্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী দ্রব্য প্রস্তু হইত। কালের কঠোর কষাঘাতে ইহাদের অনেক লুপ্ত হই যাইতেছে। বিদেশী দ্রব্য আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করত প্রয়োজন সাধন করিতেছে। টীনের ধুচনীর মূল্য হইতে কি বাঁশে ধুচনীর মূল্য কম নয়? উহা তেমন স্থায়ীও নয়। মরিচায় ধরিয় সত্বরই উহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। বাঁশের শিল্পজাত সমস্ত প্রাচীন দ্রব ও নূতন আমদানী টীন ষ্টীল এলুমিনিয়ম প্রভৃতিতে নির্ম্মিত দ্রব্যে তুলনায় কি মূল্যে, কি স্থায়িত্বে, কি সৌন্দর্য্যে, কি পবিত্রতায় কো দিকেই সুযোগ সুবিধা পরিদৃষ্ট হয় না। তবুও কেন আমাদের মতি বিপর্য্যয় ঘটিল, মনে স্বতই এই প্রশ্ন উদিত হয়। উত্তরে এই বল যাইতে পারে যে বিলাসিতার বিষ ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় প্রবে করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই এরূপ মতিবিভ্রম উপস্থিত হইতেছে গ্রামে পূর্ব্বে এমন অনেক পরিবার ছিল, যাহারা কেবলমা বাঁশের কাজ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অনেক ভদ্রপরি বারের সুগৃহিণী গৃহকর্ম্মের অবসরে নিজেদের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন। এখনও পল্লীগ্রামে তদ্রূপ ২।১ জন সুগৃহিণ দেখা যায়।"

এইরূপ বেত, দড়ি, খড় প্রভৃতি সহজলভ্য আরো অনেক সাধারণ জিনিস দ্বারা গৃহলক্ষ্মীগণ পূর্ব্বে নানারূপ অসাধারণ গুণপনার সহিত জাতীয় শিল্পরক্ষার সহায়তা করিতেন। কিন্তু এখন তাহার পরিচয় পাওয়া দুর্লভ। হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিগণ উপ- জীবিকার মূল বলিয়া পূর্ব্বে এইসকল শিল্পের যথেষ্ট চর্চ্চা করিত; অধুনা তাহাদের গৃহ হইতেও উহার নির্ব্বাসন হইতে চলিয়াছে। এদেশে প্রবর্ত্তিত নানা সৎবিধি ও অনুষ্ঠেয় বহু সৎকার্য্যের সঙ্গে এইরূপ ক্ষুদ্র অথচ আবশ্যকীয় শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রয়োজনানুরূপ না হইলেও, বিবিধ সৎকার্য্য ও সদনুষ্ঠানের প্রতি দেশের অনেকের অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়াই দেখা যাইতেছে। ইহা অতীব শুভ লক্ষণ। দেশের এই সঙ্কট-সময়ে যেদিকে যতটুকুই হউক, সৎকর্ম্মের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টামাত্রই সাধু। বর্ত্তমানে আমরা এক্ষেত্রে যে-সকল দৃষ্টান্ত পাইয়াছি তাহার দুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেশের বিত্ত-ও-শক্তিশালী অপরাপর সকলকেই উহার আদর্শ অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

"দশঘরার তালুকদার শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ রায় মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত দেশবাসীর জীবন-রক্ষার্থ একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত ৩১শে জানুয়ারী মহাসমারোহে তাহার দ্বারোদ্ঘাটনউৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিপিন বাবু বহু অধ্যাপক ও কাঙ্গালীকে অন্ন বস্ত্র দান করেন। তাঁহার এ সৎকার্য্য অবস্থাবান দেশবাসীর অনুকরণীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"—(যশোহর)

"পূর্ব্ববঙ্গের পুণ্যব্রতী ও দানশীলা ভূম্যধিকারিণী রাণী দীনমণি চৌধুরাণীর ব্যয়ে ঢাকায় বৈকুণ্ঠনাথ অনাথাশ্রম নামে একটি সেবা-ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাণী দীনমণির জয় হউক। তাঁহার পুণ্যে অনেক অনাথ ও দীন রোগী ঔষধ ও পথ্য লাভ করিয়া শান্তি লাভ করিবেন।"—(পুরুলিয়া-দর্পণ)।

"উত্তরপাড়ার বদান্য জমিদার রায় জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর কলিকাতার কিংস্ হাসপাতালের সাহায্যার্থ আপাততঃ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং আরও দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।"—(চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ)

সম্প্রতি উক্ত জমিদার লেডি কারমাইকেল নার্সিং হোম নামক হাবড়ার হাসপাতালের গৃহবিস্তারের জন্য ত্রিশহাজার টাকা দান করিয়াছেন।

"পোরজনা-গ্রামের কতিপয় লোকের সহায়তায় এক বৎসর যাবত এখানে 'শ্রীকৃষ্ণ-মঠ' নামে একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। এই মঠে অল্পবয়স্ক হিন্দু বালক-বালিকাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ভাবে রাখিয়া পাঠ অভ্যাস ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দ্বারা স্বধর্ম্মে অনুরাগী করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। তজ্জন্য ছয়টি বালক-বালিকাকে সম্প্রতি আহার ও বাসস্থান দিয়া রাখা হইবে। বর্ত্তমানে তিনটি বালক সংগ্রহ হইয়াছে। মঠের কলেবর বৃদ্ধি হইলে অনেক বালক-বালিকাই রাখা হইবে। একটি সেবক-সম্প্রদায় গঠিত হইবে, তাঁহারা পরহিতে জীবন উৎসর্গ ও সনাতন ধর্ম্ম প্রচারদ্বারা হিন্দুদিগের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের প্রকৃত উন্মেষ হয় তাহার বিশেষ চেষ্টায় রত থাকিবেন; ঐরূপ সেবক দুইটি সংগ্রহ হইয়াছে। মঠ-মন্দিরে প্রতিদিন নাম-সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে।"—(সুরাজ)

'সন্তোষের প্রাতঃস্মরণীয়া ভূম্যধিকারিণী রাণী দীনমণির দান দয়ার কথা এতদঞ্চলে নূতন পর্ব্ব নহে। * * * সম্প্রতি ঢাকা মিড্‌ফোর্ট্‌ হাসপাতালের "লেডি কারমাইকেল"-শুশ্রূষা-বিভাগটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।"—(ইসলামরবি)

এই-সকল সৎকার্য্যের সঙ্গে নিজামরাজ্যের সৎবিধির কথাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। "হিন্দু প্রকাশ—

"নিজাম রাজ্যে ষোল বৎসরের কমবয়স্ক বালক তামাক খাইতে পারিবে না, এই আইন জারি হইয়াছে। এদেশে ছেলেদের যেরূপ সিগারেট খাইবার ধুম পড়িয়াছে, তাহাতে এখানেও এইরূপ আইন হওয়া আবশ্যক।"

কিন্তু এদেশে এরূপ আইন জারি করিবার কর্ত্তা যাঁহারা তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা তো দেশবাসীরই একতম কর্ত্তব্য।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

প্রবাসীর পুরস্কার

নিম্নলিখিত ছোটগল্পগুলি পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। উপন্যাস একখানিও পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

	গল্পের নাম	লেখকের নাম	পুরস্কারের পরিমাণ
১।	অরুণা—	শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন	২৫~
২।	কর্প্পূরের মালা—	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া	২০~
৩।	অবিচার—	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৫~
৪।	অর্থমনর্থম্—	শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১২~
৫।	স্নেহহারা—	শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন	১০~
৬।	রুদ্রকান্ত—	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া	৮~
৭।	সতু—	শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু	৫~
৮।	গোবর গণেশ—	শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫~

অতিরিক্ত পুরস্কার

গল্পের নাম	লেখকের নাম	পুরস্কারের পরিমাণ
তাঁতি-বৌ—	শ্রীমতী বিজয়উজ্জয়িনী দেবী	৪~
মায়ের প্রাণ—	শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪~

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।